"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc
kabirul.dmc@gmail.com

উদ্বোধন

৪৮-শ বর্ষ

(১৩৫২ মাঘ হইতে ১৩৫৩ পৌষ)

সম্পাদক

স্বামী সুন্দরানন্দ

উদ্বোধন কার্য্যালয়

১নং উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

বার্ষিক মূল্য ৩১]

[প্রতি সংখ্যা ।৵০

উদ্বোধন—৪৮-শ বর্ষসূচী

(মাঘ, ১৩৫২—পৌষ, ১৩৫৩)

উদ্বোধন—বর্ষসূচী

উদ্বোধন

'উদ্বোধনে'র নববর্ষ

সম্পাদক

'উদ্বোধনে'র আর একটি বৎসর অনন্ত অতীত কালের কুক্ষিগত হইল। বর্তমান মাঘ মাসে এই মাসিক পত্র ৪৮ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিল। আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ তৎপ্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের মুখপত্ররূপে 'উদ্বোধন' স্থাপন করেন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল নরনারীর সকল দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির একমাত্র উপায়-স্বরূপে সর্ববন্ধনবিমুক্তির পথ-প্রদর্শন এই মাসিক পত্রের জীবনাদর্শ। এই মহান্ উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করিবার জন্য প্রায় অর্ধ শতাব্দী যাবৎ 'উদ্বোধন' তাহার প্রচ্ছদপট হইতে উপনিষদের ওজঃপ্রদ "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত" বাণী উদ্গীত করিয়া অসংখ্য প্রবন্ধ সহায়ে সকল মানুষকে উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। নববর্ষে উপনীত হইয়া "সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ। তয়োস্তু কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে॥"—'কর্মসন্ন্যাস ও নিষ্কাম কর্মযোগ উভয়ই মুক্তির পথ হইলেও কর্মসন্ন্যাস অপেক্ষা নিষ্কাম কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ', এই গীতোক্ত উপদেশের অনুসরণে সন্ন্যাসি-সংঘ-পরিচালিত 'উদ্বোধন' পুনরায় তাহার আরব্ধ কর্মে আত্মনিয়োগ করিবে।

যুগধর্মাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের সমগ্র গ্রন্থাবলী হইতে স্বতঃই উদ্‌ঘোষিত হইতেছে—বন্ধন খোল, বন্ধন খোল, বন্ধন খোল! আপনার বন্ধন খোল, অপরের বন্ধন খোল। আপনি বন্ধন-মুক্ত হও, অপরকে বন্ধন-মুক্ত কর। কারণ, অধীনতা বা বন্ধনই মানুষের সকল দুঃখ ও অশান্তির উৎস এবং স্বাধীনতা বা মুক্তিই মানুষের সকল সুখ ও শান্তির হেতু। মানুষের সর্ববিধ উন্নতির জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন স্বাধীনতা। ধর্মে সমাজে রাষ্ট্রে চিন্তায় কার্যে স্বাধীনতাই মানুষের উন্নতি এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ্য সহায়। এই স্বাধীনতা লাভ করিতে বা অধীনতার বন্ধনমুক্ত হইতে হইলে চাই—পরাধীনতাকে অত্যন্ত দুঃখপূর্ণ বলিয়া বোধ,—বন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ,—দাসত্ব হইতে মুক্ত হইবার জন্য ঐকান্তিক আগ্রহ। সোজা ভাষায় ইহারই নাম মুমুক্ষুত্ব। আমরা দেখিতে পাই—যে যে-বন্ধনকে অত্যন্ত দুঃখজনক বলিয়া মনে করে, সে সেই বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিয়া থাকে। যে যে-বন্ধনকে দুঃখের কারণ বলিয়া মনে করে না, সেই বন্ধন হইতে মুক্তি-লাভের চেষ্টাও তাহার দেখা যায় না। পক্ষান্তরে, মহা তামসিকতায় মজ্জমান যে মানুষের বন্ধনেই সুখ, সেই বদ্ধজীবকে মুক্তির উপদেশ দান

সম্পূর্ণ নিরর্থক। যিনি মুক্তি লাভ করিতে আন্তরিক আগ্রহান্বিত, তাঁহার বিশেষ ভাবে জানা দরকার যে, এই অবিদ্যাশ্রিত জগতে ভাল ও মন্দ এবং সুখ ও দুঃখ উভয়ই আপেক্ষিক এবং এই জন্য বন্ধনের কারণ। পরিপূর্ণ মুক্তি এই উভয় বন্ধনের সম্পূর্ণ বাহিরে। কিন্তু এই দুইটি পরস্পর আপেক্ষিক বন্ধন একই সময়ে দূর করিবার কোন উপায় নাই। এই জন্য সর্ববন্ধন বিমুক্ত হইতে হইলে প্রথমতঃ ভাল-সহায়ে মন্দ-বন্ধন ত্যাগ করিয়া পরে ভাল-বন্ধনও পরিত্যাগ করিতে হইবে। ইহা ঠিক একটি ভাল কাঁটা দিয়া দেহবিদ্ধ মন্দ কাঁটাটি তুলিয়া উভয় কাঁটাই ফেলিয়া দেওয়ার তুল্য। ইহা ভিন্ন সর্ববন্ধন-বিমুক্তির আর কোন পথ নাই। মনে রাখিতে হইবে যে, স্থূল সূক্ষ্ম কারণ আভ্যন্তর বাহ্য এবং ভাল মন্দ সকল বন্ধনমুক্তিই যথার্থ পরিপূর্ণ মুক্তি।

ইন্দ্রিয় মন দেহ প্রভৃতি প্রসূত উৎকট কাম প্রভুত্ব লোভ ঈর্ষা বিদ্বেষ, অসংযত কামনা বাসনা ও ব্যাধি শোক দুঃখ প্রভৃতি আভ্যন্তর বন্ধন সকল মানুষের পক্ষেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এই মন্দের বন্ধনগুলি কেবল ব্যক্তিগত অনিষ্টের কারণ নয়, পরন্তু পরিবার সংঘ সমাজ দেশ ও পৃথিবীর সকল নরনারীর অশেষ অকল্যাণের হেতু। আজ যে বিশ্বময় মানুষের অত্যুগ্র জিহীর্ষা ও জিঘাংসা, উচ্ছৃঙ্খল ভোগ ও সাম্রাজ্যলিপ্সা এবং প্রভুত্ব স্বার্থ বিরোধবিদ্বেষের তাণ্ডব নৃত্য চলিয়াছে, ইহা এই সকল বন্ধনেরই কুফল। এই আভ্যন্তর বন্ধনগুলি মানুষমাত্রেরই আত্মিক উন্নতি-পথেরও প্রবল বিঘ্ন। এতদ্ভিন্ন রাষ্ট্রীয় অধীনতা এবং তৎপ্রসূত দারিদ্র্য অশিক্ষা সাম্প্রদায়িকতা, সামাজিক দুর্নীতি ও কুসংস্কার প্রভৃতি বাহ্য বন্ধনও মানুষের পক্ষে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই মন্দের বন্ধনগুলি অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তির পক্ষে না হইলেও যে কোন জাতির পক্ষে মহা অনিষ্টের মূল। কারণ, এই বন্ধনসমূহ অধিকাংশ নরনারীর মনুষ্যত্বকে পঙ্গু করিয়া তাহাদিগকে পশুস্তরে উপনীত করে। এই বাহ্য বন্ধনগুলি মানুষের আভ্যন্তর বা আত্মিক উন্নতিরও প্রতি-বন্ধক। এই জন্য এই উভয়বিধ বন্ধনমুক্তির উপরই মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি এবং বিশ্বমানবের মধ্যে যথার্থ শান্তি-প্রতিষ্ঠা নির্ভর করে।

এই কারণে স্বামী বিবেকানন্দ আভ্যন্তর ও বাহ্য উভয়বিধ মন্দের বন্ধন দূর করিতে সকল নরনারীকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। তিনি সংযম ও ত্যাগ সহায়ে অন্তঃ ও বাহ্য প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনিয়া স্থূল সূক্ষ্ম কারণ সর্ববন্ধনবিমুক্ত হইতে সকলকে উপদেশ দিয়াছেন। সকল মানুষের সকল দুঃখ ও অশান্তি চিরতরে দূর করিয়া তাহাদিগকে শাশ্বত সুখ ও শান্তির অধিকারী করাই এই উপদেশদানের একমাত্র উদ্দেশ্য। উপনিষৎ সর্ববন্ধনবিমুক্তির মাহাত্ম্যপ্রচারে পঞ্চমুখ। এই জন্য মুক্তির বাণী প্রচার করিতে যাইয়া স্বামী বিবেকানন্দ উপনিষদের উপর অত্যন্ত জোর দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "মুক্তি বা স্বাধীনতা, দৈহিক স্বাধীনতা, মানসিক স্বাধীনতা আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা, ইহাই উপনিষদের মূলমন্ত্র। জগতের মধ্যে ইহাই একমাত্র শাস্ত্র, যাহাতে উদ্ধারের (salvation) কথা বলে না, মুক্তির কথা বলে। বলে—প্রকৃত বন্ধন হইতে মুক্ত হও, দুর্ব্বলতা হইতে মুক্ত হও।" অধিকাংশ ধর্মের অধিকাংশ পুরোহিতই এতকাল প্রচার করিয়াছেন যে, মানুষের মস্তকোপরি রহিয়াছেন "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং" ঈশ্বর এবং তাঁহার ন্যায়দণ্ড হইতে অব্যাহতি লাভের একমাত্র উপায় তাঁহার অহেতুক কৃপার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া এ জগতে সকল দুঃখ নির্বিচারে সহিয়া যাওয়া। কিন্তু উপনিষৎ ইহা স্বীকার করে না। এই মহান্ শাস্ত্র প্রচার করে যে, আত্মামাত্রই নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত

ব্রহ্মস্বরূপ এবং সকল জ্ঞান, সকল শক্তি ও সকল পবিত্রতার আধার। মানুষে মানুষে পার্থক্য কেবল আত্মার এই সকল শক্তিপ্রকাশের তারতম্যে। আত্মা স্বরূপতঃ নিত্যমুক্ত শিব। অবিদ্যা বা অজ্ঞান দৃষ্টিতেই তিনি পাশবদ্ধ জীব বলিয়া প্রতীত। এই অবিদ্যা বা অজ্ঞানরূপ মেঘ অপসারিত হইয়া জ্ঞান-সূর্য উদিত হইলেই প্রত্যক্ষ দেখা যায় যে, তিনি সর্ববন্ধনবিমুক্ত শিব। "পাশবদ্ধ জীব—পাশমুক্ত শিব", এই শাস্ত্রবাণী অতি সত্য। অবিদ্যাই জীবের পাশ। ইহার আয়ত্তাধীন সকল জ্ঞান চিন্তা ও কর্ম দেশ-কাল-পাত্রের অন্তর্গত বলিয়া উহারা কার্য-কারণ-বন্ধনে আবদ্ধ। প্রকৃত স্বাধীনতা বা মুক্তি দেশ-কাল-পাত্র ও কার্য-কারণ-বন্ধনাশ্রিত অবিদ্যার এলাকার সম্পূর্ণ বাহিরে। সুতরাং যথার্থ মুক্তিলাভ করিতে হইলে অবিদ্যার গণ্ডী অতিক্রম করিতেই হইবে। ইহার একমাত্র উপায়—অবিদ্যার স্বরূপ জ্ঞাত হওয়া। মরীচিকার স্বরূপ জানিতে পারিলে যেরূপ মরীচিকা-ভ্রম থাকে না এবং ইন্দ্রজালের রহস্য জানিলে যেরূপ উহা আর বিস্ময় জন্মাইতে পারে না, অবিদ্যা স্বরূপ বা রহস্য জানিলেও সেইরূপ উহা আর মানুষকে প্রতারিত করিতে পারে না। নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, নিষ্কাম নিঃস্বার্থ কর্ম, পরাভক্তি ও চিত্তবৃত্তিনিরোধ বা যোগ, ইহাদের মধ্যে এক একাধিক বা সকল উপায় অবলম্বনে আত্মার ব্রহ্মস্বরূপ পরিব্যক্ত করাই অবিদ্যা দূর করিবার উপায়। অবিদ্যা বিদূরিত হইলে সাধকের "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ"—'হৃদয়ের গ্রন্থিভেদ এবং সর্বসংশয় নাশ হয়', এবং তিনি চিরতরে সর্ববন্ধনবিমুক্ত হইয়া জীবন্মুক্ত হন। এই অবস্থালাভই মানব-জীবনের সর্বোচ্চ আদর্শ।

স্বামী বিবেকানন্দ এই অত্যুন্নত আদর্শ উদাত্ত কণ্ঠে প্রচার করিয়াছেন। তিনি পাশ্চাত্য দেশবাসীকে এই বেদান্তবেদ্য মুমুক্ষা বা মুক্তির বাণীই শুনাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "পাশ্চাত্যের মাটী এখন বীজ ফেলবার উপযুক্ত, খুব উর্ব্বরা। ওদেশের লোকেরা এখন ভোগের শেষসীমায় উঠেছে। ভোগে তৃপ্ত হয়ে এখন তাদের মন তাতে আর শান্তি পাচ্ছে না। একটা দারুণ অভাব বোধ করছে।" এই জন্যই পাশ্চাত্য জাতি বর্তমানে যথার্থ ত্যাগ বা সর্ববন্ধনবিমুক্তির আদর্শ গ্রহণের উপযুক্ত। পক্ষান্তরে, ভারতের জনসাধারণ পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ, অজ্ঞতা ও দারিদ্র্যের পাষাণ চাপে পিষ্ট এবং মহাতম ও কুসংস্কারের অতলগর্ভে নিমগ্ন বলিয়া সর্ববন্ধনবিমুক্তির উচ্চ আদর্শ গ্রহণে একেবারে অনুপযুক্ত! এই অত্যুচ্চ আদর্শ ভারতবাসীর মজ্জাগত হইলেও এই সকল কারণে তাহারা এই আদর্শে উপনীত হইতে বর্তমানে সম্পূর্ণ অসমর্থ। এই জন্য স্বামীজী তাহাদিগকে রজোগুণে উদ্দীপিত করিয়া কর্মতৎপরতার দ্বারা সর্বাগ্রে তাহাদের ঐহিক অভাবগুলি দূর করিবার উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "তোদের দেশের লোকগুলোর রক্ত যেন হৃদয়ে রুদ্ধ হয়ে রয়েছে—ধমনীতে যেন আর রক্ত ছুটে আসতে পারছে না—সর্ব্বাঙ্গে Paralysis (পক্ষাঘাত) হয়ে যেন এলিয়ে পড়েছে। আমি তাই এদের ভেতর রজোগুণ বাড়িয়ে কর্ম্মতৎপরতার দ্বারা এ দেশের লোকগুলোকে আগে ঐহিক জীবনসংগ্রামে সমর্থ করতে চাই। শরীরে বল নেই—হৃদয়ে উৎসাহ নেই—মস্তিষ্কে প্রতিভা নেই!—কি হবে রে, এই জড়পিণ্ডগুলোদ্বারা? আমি নেড়ে চেড়ে এদের ভিতর সাড় আনতে চাই—এজন্য আমার প্রাণান্ত পণ। বেদান্তের অমোঘ মন্ত্রবলে এদের জাগাব। 'উত্তিষ্ঠত—জাগ্রত' এই অভয়বাণী শুনাতেই আমার জন্ম। তোরা এই কার্য্যে আমার সহায় হ। যা গাঁয়ে গাঁয়ে, দেশে দেশে, এই অভয়বাণী আচণ্ডাল ব্রাহ্মণকে শুনাগে। সকলকে ধরে ধরে বলগে যা, তোমরা

অমিতবীর্য্য—অমৃতের অধিকারী। এইরূপে আগে রজঃশক্তির উদ্দীপনা কর—জীবন-সংগ্রামে সকলকে উপযুক্ত কর, তারপর পরজীবনে মুক্তির কথা তাদের বল। আগে ভেতরের শক্তি জাগ্রত করে দেশের লোকগুলোকে নিজের পায়ের উপর দাঁড় করা, উত্তম অশন বসন—উত্তম ভোগ আগে করতে শিখুক, তারপর সর্ব্বপ্রকার ভোগের বন্ধন থেকে কি করে মুক্ত হতে পারবে, তা বলে দে।”

এই উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করিবার জন্যই স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ স্থাপন করেন। এই মঠের উদ্দেশ্যসম্বন্ধে তিনি স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন : “প্রথমতঃ কতকগুলো ত্যাগী পুরুষের প্রয়োজন—যারা নিজেদের সংসারের জন্য না ভেবে পরের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হবে। আমি মঠ স্থাপন করে কতকগুলো বাল-সন্ন্যাসীকে তাই এরূপে তৈরী কচ্ছি।” এই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসিগণ তমসাচ্ছন্ন দেশবাসীকে উপনিষদের অভয়বাণী শুনাইয়া আত্মবিশ্বাস আত্মসম্মান এবং জন্মগত স্বাধীনতা স্বত্ব ও অধিকারে প্রবুদ্ধ করিবেন, তাহাদের অজ্ঞান-অন্ধকারাচ্ছন্ন পর্ণকুটিরে জ্ঞানের বাতি জ্বালাইবেন, জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে জনসাধারণের উত্তম খাদ্য, উত্তম বস্ত্র, উত্তম আবাস, উত্তম শিক্ষা, উত্তম ভোগ এবং রোগে উত্তম চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবেন এবং শেষে শাশ্বত সুখ ও শান্তিলাভের উপায়রূপে তাহাদিগকে বেদান্তের সর্ববন্ধনবিমুক্তির বার্তা শুনাইবেন, ইহাই ছিল স্বামীজীর আন্তরিক অভিপ্রায়। তিনি বোধিসত্ত্বগণের ন্যায় আপন মুক্তিকামনাকেও তুচ্ছ করিয়া এই জনহিতকর কার্যে আত্মনিয়োগ করিতে মঠের সন্ন্যাসিগণকে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, “নিজের মুক্তি নিয়ে কি হবে ?—মুক্তিকামনাও তো মহা স্বার্থপরতা। ফেলে দে মুক্তি—আমি যে কাজে লেগেছি, সেই কাজে লেগে যা।” অন্যত্র—“ ‘বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়’ সন্ন্যাসীর জন্ম। যথার্থ সন্ন্যাসীরা নিজেদের মুক্তি পর্য্যন্ত উপেক্ষা করেন—জগতের ভাল করতেই তাঁদের জন্ম। সন্ন্যাসগ্রহণ করে যাঁরা এই ideal (উচ্চলক্ষ্য) ভুলে যায়—বৃথৈব তস্য জীবনম্।”

এই মহান্ উদ্দেশ্যসাধনই শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের জীবনব্রত। এই ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য ‘উদ্বোধন’ নববর্ষে পদার্পণ করিয়া সহৃদয় ব্যক্তিগণের সাহায্য ও সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণপ্রাতঃস্মরণ-স্তোত্রম্

স্বামী প্রশান্তানন্দ

প্রাতঃ স্মরামি জগতঃ ভব-ভাব-হেতুম্।
হেতুং লয়স্য চ ভবাম্বুধি-পার-সেতুম্।
লীলা-বিলাস-বিলসদ্-বপুসং সুধীশম্।
শ্রীরামকৃষ্ণমবতার-বরং তমীশম্॥

প্রাতর্নমামি কলি-দোষ-দাহাতি-দক্ষম্।
আনন্দ-কন্দমরবিন্দ-দলায়তাক্ষম্॥
যঃ কাম-কাঞ্চনমহো তনু-বাঙ্মনোভিঃ।
রেজে বিহায় ভুবি সংযত-বাক্ সদাভীঃ॥

প্রাতর্ভজামি ভজতাং ভব-ভার-হারম্।
পাপৌঘহং করুণয়া ধৃত-দেহ-ভারম্॥
যোগীশ্বরং পরম-হংস-বরং প্রশান্তম্।
মূর্দ্ধারবিন্দ-মকরন্দ-মধুব্রতং তম্॥

হিন্দুশাস্ত্র

স্বামী চিন্ময়ানন্দ

চতুর্দ্দশ বিদ্যাস্থান ও হিন্দুশাস্ত্র বিভাগ

শাস্ত্রের তাৎপর্য্য জগৎকারণ[1], সর্ব্বজ্ঞ[2], পরমেশ্বরে। শাস্ত্রই বিদ্যা ও ধর্ম্ম-সমূহের স্থান বা আশ্রয়। হিন্দুদিগের বিভিন্ন বিদ্যার স্থান অনাদি বেদ। ঋক্[3], যজুঃ[4], সাম[5] ও অথর্ব্ব[6] নামক চারি বেদ; শিক্ষা[7], ব্যাকরণ[8], নিরুক্ত[9], ছন্দঃ[10], জ্যোতিষ[11] ও কল্প[12] বেদ-সমূহের

১ 'স…ইদং সর্ব্বমসৃজত' (তৈঃ ২-৬); 'তদৈক্ষত' (ছাঃ ৬-২-৩); 'ত্বত্তোঽস্য জন্ম-স্থিতি-সংযমান্ বিভো' (ভাঃ ১০-৩-১৯); 'যতো বা ইমানি' (তৈঃ ৩-১); 'যো ব্রহ্মাণম্' (শ্বেঃ ৬-১৮); 'তস্মাৎ…নাম রূপমন্নঞ্চ জায়তে' (মুঃ ১-১-৯); 'সৃজতে বিশ্বমেতৎ' (শ্বেঃ ৪-৯); 'লোকানসৃজত' (ঐঃ ১-১-১,২); 'স প্রাণমসৃজত' (প্রঃ ৬।৪)।

২ মুঃ ১-১-৯ ও ২-২-৭।

৩ পাদবদ্ধ গায়ত্রী আদি ছন্দোবিশিষ্ট এবং যজ্ঞে 'হোতা' নামক পুরোহিতের প্রয়োগার্থ মন্ত্র-রূপ 'ঋগ্‌বেদ'।

৪ 'অধ্বর্য্যু' নামক পুরোহিত দ্বারা যজ্ঞে আহুতি দানে বিনিয়োগ নিমিত্ত মন্ত্র-বিশিষ্ট গদ্যরূপ 'যজুর্ব্বেদ'। 'যজুর্যজতেরিতি' (নিরুক্তম্, ৭-৩-৬)।

৫ পাদবদ্ধ ছন্দোবিশিষ্ট ও 'উদ্গাতা' নামক পুরোহিতের গীতির জন্য মন্ত্ররূপ 'সাম-বেদ'।

৬ শান্তি, পৌষ্টিক ও আভিচারিক আদি কর্ম্ম-সমূহের প্রতিপাদক মন্ত্রবিশিষ্ট 'অথর্ব্ব-বেদ'।

৭ যে গ্রন্থে 'বর্ণ' (অ, আ, ক, খ, আদি), 'স্বর' (উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত), 'মাত্রা' (হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত), 'বল' (বর্ণ-উচ্চারণে সহায়ক তালু আদি আট প্রযত্ন-স্থান ও প্রযত্ন—শিক্ষা, ১৩,৩৮), 'সাম' (অতি দ্রুত, বিলম্বিত আদি দোষ-রহিত ও মাধুর্য্য-গুণযুক্ত উচ্চারণ-রূপ 'সমতা') এবং 'সন্তান' (সংহিতা, 'সন্ধি' আদি) উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাকে 'শিক্ষা' বলে (তৈঃ আঃ ৭-২)। যেমন, 'পাণিনি-শিক্ষা' এবং প্রত্যেক বেদের 'প্রাতিশাখ্য' নামক 'শিক্ষা'-গ্রন্থ।

৮ প্রকৃতি, প্রত্যয় আদির উপদেশপূর্ব্বক (বৈদিক) শব্দ-সমূহের স্বরূপ ও অর্থ-নির্ব্বাচনে সহায়ক ব্যাকরণ। 'রক্ষোহাগম-লঘ্বসন্দেহাঃ প্রয়োজনম্' (বররুচি); 'রক্ষার্থং বেদানামধ্যেয়ং ব্যাকরণম্' (মহাভাষ্য, ১-১-১)।

৯ অর্থবোধের জন্য যে গ্রন্থে পদ-সমূহ 'নি' নিরপেক্ষ রূপে 'উক্ত' হইয়াছে, অথবা পদ-সমূহের সম্ভাবিত অবয়বার্থ যাহাতে 'নি' নিঃশেষরূপে 'উক্ত' হইয়াছে, তাহাই 'নিরুক্ত'। নিঘণ্টু (অধ্যায় ১-৩), নিগম (অঃ ৪) ও দেবতা-কাণ্ড (অঃ ৫) নামক তিন কাণ্ডে, পাঁচ অধ্যায়ে, মহামুনি 'যাস্ক' দ্বারা রচিত বৈদিক কোষ 'নিরুক্ত' গ্রন্থ।

১০ গায়ত্রী (২৪ অক্ষরের), উষ্ণিক্ (২৮), অনুষ্টুপ (৩২), বৃহতী (৩৬), পঙ্‌ক্তি (৪০), ত্রিষ্টুপ (৪৪) ও জগতী (৪৮ অক্ষরের) সাত বৈদিক ছন্দঃ। 'পিঙ্গল-ছন্দঃশাস্ত্র' আদি ছন্দ-গ্রন্থ। 'ছন্দাংসি ছাদনাৎ' (নিরুক্ত ৩—৬)।

১১ 'যজ্ঞ-কালার্থ-সিদ্ধয়ে'—যজ্ঞাদির বিশিষ্টকালের অবগতির জন্য জ্যোতিষের প্রয়োজন। যেমন, 'ফল্গুনী-পূর্ণমাসে দীক্ষেরন্' (তাণ্ড্য-মহাব্রাহ্মণ, ৫-৯-১,৩), 'কৃত্তিকাস্বগ্নিমাদধীত' (তৈঃ ব্রাঃ ১-১-২-১), গর্গ, পরাশর আদি কৃত জ্যোতিষ গ্রন্থ।

১২ যে গ্রন্থে যজ্ঞের প্রয়োগ-বিধি-সমূহ কল্পিত ও সমর্থিত হইয়াছে, তাহাকে 'কল্প' বলে; অর্থাৎ বৈদিক অনুষ্ঠানাদির ক্রম-বিশেষ কল্প-সূত্র-সমূহ হইতে জানা যায়। হোতা নামক পুরোহিতের প্রয়োগ-বিধিজ্ঞাপক 'আশ্বলায়ন' আদি কৃত, অধ্বর্য্যু নামক পুরোহিতের প্রয়োগাদি জ্ঞাপক 'আপস্তম্ব' আদি কৃত ও উদ্গাতার প্রয়োগজ্ঞাপক 'লাট্যায়ন' আদিকৃত 'কল্প-সূত্র'।

'ষড়ঙ্গ'—ছয় অঙ্গ; এই চারি বেদ[১৩] ও ছয় অঙ্গ[১৪] এবং পুরাণ[১৫], ন্যায়[১৬], মীমাংসা[১৭] ও ধর্ম্মশাস্ত্রকে চতুর্দ্দশবিদ্যা ও ধর্ম্মের 'স্থান'[১৮] বলে। পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা ও ধর্ম্মশাস্ত্রকে 'উপাঙ্গ'ও বলা হয়। সমস্ত উপপুরাণ[১৯] পুরাণ-সমূহের, বৈশেষিক[২০] শাস্ত্র 'ন্যায়ের', বেদান্ত-শাস্ত্র মীমাংসা ও মহাভারতের অন্তর্গত। এতদ্ভিন্ন রামায়ণ[২১], সাংখ্য[২২], পাতঞ্জল[২৩], পাশুপত[২৪] এবং বৈষ্ণব[২৫] আদি শাস্ত্র 'ধর্ম্মশাস্ত্রের' অন্তর্ভুক্ত। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর আদির 'স্মৃতি'[২৬] সমূহও ধর্ম্মশাস্ত্র। মহাভারত ও রামায়ণ ধর্ম্মশাস্ত্র হইয়াও 'ইতিহাস' নামে প্রসিদ্ধ। আয়ুর্ব্বেদ [২৭], ধনুর্ব্বেদ (শস্ত্র-বিদ্যা), গান্ধর্ব্ববেদ [২৮] (গীত, বাদ্য, নৃত্য আদি কলা-বিদ্যা) এবং অর্থশাস্ত্র (নীতিশাস্ত্র, শিল্প-শাস্ত্র আদি)-কে চারি 'উপবেদ' বলে। এই উপবেদকে গণনায় গ্রহণ করিলে মোট

১৩ 'বেদ' শব্দের নির্ব্বচন পৃঃ ৬ ও টিপ্পনী ৩৬ দ্রষ্টব্য।

১৪ 'ছন্দঃ পাদৌ তু বেদস্য, হস্তৌ কল্পোঽথ পঠ্যতে।
জ্যোতিষাময়নং চক্ষু নিরুক্তং শ্রোত্রমুচ্যতে॥
শিক্ষা প্রাণং তু বেদস্য মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্।
তস্মাৎ সাঙ্গমধীত্যৈব, ব্রহ্ম-লোকে মহীয়তে॥
(শিক্ষা, ৪১, ৪২)।

১৫ বাদরায়ণ ব্যাসকৃত ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, শিব, ভাগবত, নারদ, মার্কণ্ডেয়, অগ্নি, ভবিষ্য, ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত, লিঙ্গ, বরাহ, স্কন্দ, বামন, কূর্ম্ম, মৎস্য, গরুড় ও ব্রহ্মাণ্ড, মোট এই অষ্টাদশ 'পুরাণ' গ্রন্থ।

১৬ 'গৌতম' কৃত পঞ্চাধ্যায়ী 'ন্যায়-শাস্ত্র'।

১৭ কর্ম্ম-কাণ্ডের 'পূর্ব্বমীমাংসা' ও জ্ঞান-কাণ্ডের 'উত্তর-মীমাংসা'। 'জৈমিনি' কৃত দ্বাদশাধ্যায়ী 'কর্ম্ম-মীমাংসা'এবং বাদরায়ণ 'ব্যাস' কৃত চতুরধ্যায়ী (১৬ পাদে) 'শারীরক-মীমাংসা' ('ব্রহ্ম-সূত্র'); বিস্তৃত বিবরণ 'প্রস্থান-ত্রয়ে' দ্রষ্টব্য।

১৮ 'পুরাণ-ন্যায়-মীমাংসা-ধর্ম্মশাস্ত্রাঙ্গ-মিশ্রিতাঃ।
বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্ম্মস্য চ চতুর্দ্দশ॥'
—যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা, ১—৩।

১৯ সনৎকুমার, নারসিংহ, নারদ (কৌমার), শিব-ধর্ম্ম, দুর্ব্বাসের, নারদীয়, কাপিল, মানব, ঔশনস, ব্রহ্মাণ্ড, বারুণ, কালিকা, মাহেশ্বর, শাম্ব, সৌর, পরাশর ও দুই 'ভাগবত', মোট এই অষ্টাদশ 'উপপুরাণ'; (হেমাদ্রি)। কোথাও কোথাও উপর্যুক্ত তৃতীয় উপপুরাণ 'নারদ' স্থানে 'নান্দ'-পাঠও দেখা যায়। অন্যত্র বাসিষ্ঠ্য, বাশিষ্ঠ-লৈঙ্গ, মারীচ, ভার্গব আদি উপপুরাণেরও নাম শুনা যায়।

২০ 'কণাদ' প্রণীত দশাধ্যায়ী 'বৈশেষিক-শাস্ত্র'।

২১ 'রামায়ণ' বলিতে এখানে কেবল মহামুনি বাল্মীকি কৃত 'রামায়ণ'ই ধরিতে হইবে। বাঙ্গলা ভাষায় প্রসিদ্ধ 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ' ও হিন্দীতে গোস্বামী তুলসীদাস কৃত 'রাম-চরিত-মানস' বাল্মীকি-কৃত মূল রামায়ণের সঙ্গে যতটুকু মেলে ততটুকু পর্য্যন্তই কেবল তাহাদের 'রামায়ণ' রূপ ও তাহা মূল রামায়ণেরই অন্তর্ভূত বুঝিতে হইবে। কারণ, গোস্বামীজী স্বয়ং বলিয়াছেন যে তিনি 'রাঃ চঃ মাঃ'তে 'রামায়ণ' হইতেও অতিরিক্ত অন্য বিষয়-সমূহেরও সমাবেশ করিয়াছেন; যথা—"নানা-পুরাণ-নিগমাগম-সম্মতং…কচিদন্যতোঽপি" (তুলসী-বাল-কাণ্ড, শ্লোক ৭)। বস্তুতঃ উপর্যুক্ত দুইখানি রামায়ণ স্থানে স্থানে শ্রুতি-স্মৃতি-মূলক স্বতন্ত্র তত্ত্বোপদেশে ও অনুপম কবিত্ব-ঝঙ্কারে পরিপূর্ণ।

২২ 'কপিল' কৃত ষড়ধ্যায়ী 'সাংখ্য-শাস্ত্র'। ইহা দ্বারা প্রকৃতি-পুরুষের বিবেক-জন্য জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে।

২৩ 'পতঞ্জলি' কৃত পাদ-চতুষ্টয়-বিশিষ্ট 'যোগশাস্ত্র'।

২৪ 'পশু'—কার্য্যরূপ জীব, এবং 'পতি'—কারণরূপ ঈশ্বর। পঞ্চাধ্যায়ী পাশুপত যোগশাস্ত্র।

২৫ বৈষ্ণব—যেমন নারদীয় 'পঞ্চরাত্রম্', 'ভক্তিসূত্র' আদি।

২৬ মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, বিষ্ণু, যম, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ, দক্ষ, সংবর্ত্ত, শাতাতপ, পরাশর, গৌতম, শংখ, লিখিত, হারীত, আপস্তম্ব, উশনা, ব্যাস, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, দেবল, নারদ, পৈঠিনসী আদিকৃত বর্ণাশ্রমাদির ধর্ম-সমূহ-প্রকাশক 'ধর্মশাস্ত্র'।

২৭ 'সুশ্রুত,' 'বাগ্‌ভট' আদি কৃত গ্রন্থ।

২৮ 'ভরত' আদি কৃত নাট্য-শাস্ত্র আদি।

অষ্টাদশ[২৯] 'বিদ্যা-স্থান' ধরা যায়। সম্ভবতঃ, অর্থ-শাস্ত্র, শস্ত্র-বিদ্যা আদির পরমেশ্বরে সাক্ষাৎ তাৎপর্য্য না থাকায় যাজ্ঞবল্ক্য 'বিদ্যাস্থান'-সমূহের মধ্যে ইহাদের গণনা করেন নাই।

অপৌরুষেয় বেদ বা শ্রুতি এবং মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ

বেদ পরমেশ্বরের (ব্রহ্মের) 'নিঃশ্বসিত'[৩০] রূপ ; এই জন্য ব্রহ্মকেই বেদের কর্ত্তা[৩১] বা কারণ বলে। বেদ পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের মত পরবর্ত্তী কল্পেও[৩২] আবিভূর্ত হইয়া থাকে ; এই জন্যই ইহাকে 'নিত্য' বলা হয়। সুতরাং বেদ কোনও 'পুরুষ' (মনুষ্য বা দেবতা আদি) দ্বারা নির্ম্মিত বা রচিত নহে বলিয়া ইহা 'অপৌরুষেয়'। এই অপৌরুষেয় ও নিত্য ঋগ্‌বেদ আদি শাস্ত্রের কারণ বা কর্ত্তা বলিয়া ব্রহ্ম 'সর্ব্বজ্ঞ' নামে উপচরিত[৩৩] হইয়া থাকেন। যদিও ব্রহ্মই বেদের হেতু বা কর্ত্তা, তবুও ব্রহ্ম-বিষয়ক জ্ঞান বেদ হইতেই[৩৪] হইয়া থাকে ; বেদ ভিন্ন অন্য প্রমাণ[৩৫] সমূহ দ্বারা ব্রহ্মকে জানা যায় না। সুতরাং ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে ধর্ম্ম[৩৬] ও ব্রহ্মের প্রতিপাদক অপৌরুষেয় প্রমাণ-বাক্য বেদ[৩৭]। বেদের অপর (রূঢ়) নাম 'শ্রুতি'। কারণ বেদের আবির্ভাব[৩৮] হইতে গুরু-শিষ্য-পরম্পরায় 'শ্রুত' হইয়াই ইহা সংসারে প্রকটিত রহিয়াছে ; এবং 'বেদ' হইতে শ্রুত হইয়াই 'বেদ' (বেদন-জ্ঞান) হইয়া থাকে। কারণ ইন্দ্রিয়াতীত ও অজ্ঞাত তত্ত্ব-বিষয়ক জ্ঞান বেদ হইতে বা বেদের শ্রবণ বা শ্রুতি' (শোনা) হইতেই হইয়া থাকে। এবংবিধ (ইন্দ্রিয়াতীত ও অজ্ঞাত তত্ত্ব-বিষয়ক) জ্ঞানের অন্য কোনও সাধন নাই। এজন্য, যাহা হইতে শ্রুতি বা শ্রবণ-জন্য প্রমা[৩৯] উৎপন্ন হয়, সেই 'বেদ'কেই 'শ্রুতি' বলা হয়। অতএব, প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারা যে (কর্ম্মাঙ্গ বিধি ও আত্মতত্ত্ব-বিষয়ক জ্ঞানের) উপায় কোনও প্রকারে জানা যায় না, তাহার 'বেদন' (জ্ঞান) কেবল 'বেদ' হইতেই হইয়া থাকে। এইজন্যই বেদের 'বেদত্ব'[৪০]

২৯ অষ্টাদশ বিদ্যাস্থান—

'অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা-ন্যায়-বিস্তরঃ।
ধর্ম্ম-শাস্ত্রং পুরাণং চ বিদ্যা হ্যেতাশ্চতুর্দ্দশ ॥
আয়ুর্ব্বেদো ধনুর্ব্বেদো গান্ধর্ব্বশ্চেতি তে ত্রয়ঃ।
অর্থ-শাস্ত্রং চতুর্থং তু বিদ্যা হ্যষ্টাদশৈব তু ॥'
—হেমাদ্রি (?)।

৩০ 'অস্য মহতো, ভূতস্য নিঃশ্বসিতম্' (বৃঃ ২-৪-১০) ; 'নিঃশ্বাস-ভূতা মে বিষ্ণোর্ব্বেদা জাতা সুবিস্তরাঃ' (মুক্তিক, ১-৯)।

৩১ 'যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি' (শ্বেঃ, ৬-১৮)।

৩২ 'পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ' (শ্বেঃ, ৬-১৮) ; যথা-পূর্ব্বমকল্পয়ৎ' (ঋগ্‌বেদ)।

৩৩ 'উপচরিত' বলা হইয়াছে, যেহেতু ব্রহ্মই 'সর্ব্ব (সর্ব্ব-স্বরূপ) ও 'জ্ঞ' (জ্ঞপ্তি-জ্ঞান-স্বরূপ) ; সুতরাং 'সর্ব্ব-স্বরূপ (ব্রহ্ম) 'সর্ব্ব ব্যতিরিক্ত না হইয়া, 'সর্ব্বকে (বস্তুতঃ 'কর্ম্ম রূপে) কিরূপে জানিবেন ? তাই অজ্ঞান-অধ্যস্ত, কল্পিত, বস্তু-সমূহের জ্ঞাতা রূপে ব্রহ্মের ('কর্ম্ম'-'কর্ত্তা' রূপ) সর্ব্বজ্ঞত্ব উপচরিত হইয়া থাকে।

৩৪ ব্রহ্মজ্ঞান বেদ হইতেই—'বেদ-হেতুরপি ব্রহ্ম তদ্‌বেদাদেব মীয়তে' (লঘু-বার্ত্তিক, ১-১-৩)।

৩৫ বেদ-ভিন্ন অন্য প্রমাণ দ্বারা অজ্ঞেয়—'নাবেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তম্' (তৈঃ ব্রাঃ, ৩-১২-৯)।

৩৬ ব্রাহ্মণাদি বর্ণের ও গৃহস্থাদি আশ্রমে অনুষ্ঠান-যোগ্য কর্ত্তব্য।

৩৭ "অলৌকিক পুরুষার্থ লাভের উপায় 'বেত্তি অনেন'—ইহা দ্বারা জানা যায়, ইহাই 'বেদ' শব্দের নির্ব্বচন।" (সায়ণ-ভাষ্য)।

৩৮ পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-কল্পানুরূপ প্রতি কল্পের প্রারম্ভে বৈখরী শব্দময় বেদ আবিভূর্ত হইয়া থাকে। বৈখরী শব্দ-রাশির বিনাশে প্রলয়ান্তেও নিত্য 'বেদ' কখনও বিনষ্ট হয় না।

৩৯ পৃঃ ১৩

৪০ 'প্রত্যক্ষেণানুমিত্যা বা যস্তূপায়ো ন বুধ্যতে।
এতংবিদন্তি বেদেন তস্মাৎ বেদস্য 'বেদতা' ॥'
(নিরুক্ত)

সিদ্ধ হয়। এ বেদ মন্ত্র[৪১] ও ব্রাহ্মণ[৪২] অংশে বিভক্ত। মন্ত্রভাগকে 'সংহিতা'ও বলে। ঋগ্‌বেদ-সংহিতা আদি চারি সংহিতা[৪৩] বেদের মন্ত্র-ভাগ। 'সংহিতা' অংশ হইতে অতিরিক্ত ব্রাহ্মণ-ভাগে[৪৪] ব্রাহ্মণ, আরণ্যক[৪৫] ও উপনিষৎ আদি বিভাগ রহিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন বেদের ভিন্ন ভিন্ন বহু শাখা[৪৬] এবং বিভিন্ন শাখাতে বিভিন্ন সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষৎ আছে।

উপনিষৎ

'উপনিষৎ' শব্দের তাৎপর্য ব্রহ্মবিদ্যা। উপনিষৎ শব্দ 'উপ' ও 'নি' উপসর্গ পূর্ব্বক 'সদ্‌' ধাতুতে 'ক্বিপ্‌' (উপ-নি-সদ্‌+ক্বিপ্‌) প্রত্যয় দ্বারা হইয়াছে। 'সদ্‌' ধাতুর এখানে তিনটী অর্থ মানা হয়—বিশরণ (নাশ), গতি ও অবসাদন (শিথিল করা)। 'উপ' শব্দের অর্থ 'সমীপ' ও 'নি' শব্দের অর্থ 'নিশ্চয়'। এই প্রকারে ইহার তাৎপর্য হইতেছে যে, যে ব্যক্তি উপনিষৎ-শব্দবাচ্য ব্রহ্মবিদ্যার 'উপ'—সমীপে যাইয়া অর্থাৎ ব্রহ্মবিৎ গুরুর নিকট উহা প্রাপ্ত হইয়া (শুনিয়া), উহাতে নিষ্ঠাপূর্ব্বক, 'নি'—নিশ্চয় করতঃ পরিশীলন করিয়া থাকে, অর্থাৎ যে ব্যক্তি ভক্তি, শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা পূর্ব্বক আত্মভাবে ব্রহ্ম-বিদ্যার 'সমীপে' যাইয়া থাকে, ঐ ব্রহ্মবিদ্যা সেই ব্যক্তির গর্ভ, জন্ম, জরা ও রোগ আদি অনর্থ-সমূহের বিশরণ-হিংসন (ছেদন) অর্থাৎ বিনাশ করিয়া দেয়। এই জন্য 'উপনিষৎ' শব্দে উপর্যুক্ত 'বিদ্যা'কেই বলা হইয়া থাকে। অথবা, (খ) মুমুক্ষুদিগকে এ ব্রহ্মবিদ্যা পর-ব্রহ্মকে প্রাপ্ত করাইয়া দেয়,অর্থাৎ অপ্রাপ্তবৎ ব্রহ্মের প্রাপ্তি—ব্রহ্ম পর্য্যন্ত গতি-করাইয়া দেয়। ব্রহ্মের সমীপবর্ত্তী করাইয়া দেয় বলিয়া ব্রহ্মবিদ্যাকে 'উপনিষৎ' বলে। অথবা, (গ) এ বিদ্যা সংসারের বীজ বা কারণ রূপ অবিদ্যা আদির অত্যন্ত অবসাদন বা বিনাস করাইয়া দেয়, এ জন্যও ইহার নাম' উপনিষৎ'। এই রূপে 'সদ্‌' ধাতু হইতে ব্রহ্ম-বিদ্যা বুঝাইবার জন্য 'উপনিষৎ' শব্দ[৪৭] ব্যুৎপন্ন ও সিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু গ্রন্থও বিদ্যা-লাভেরই নিমিত্তরূপ ; এজন্য (ব্রহ্ম-বিদ্যার প্রকাশক

৪১ 'মন্ত্রা মননাৎ'—যাহা দ্বারা 'মনন'করা যায়, তাহাই 'মন্ত্র'। (নিরুক্ত ৩—৬)

৪২ 'মন্ত্র-ব্রাহ্মণয়োর্ব্বেদ-নামধেয়ম্‌' (আপস্তম্ব, যজ্ঞ-পরিভাষা ৩১)।

৪৩ চারি সংহিতা—ঋগবেদ-সংহিতা, যজুর্বেদ-সংহিতা, সাম-বেদ-সংহিতা ও অথর্ব-বেদ-সংহিতা।

৪৪ সংহিতা অংশ হইতে ভিন্ন ব্রাহ্মণ-ভাগ তিন প্রকারের ; যথা—(১) উৎপত্তি, অধিকার, বিনিয়োগ ও প্রয়োগ রূপ 'বিধি' স্বরূপ, (২) গুণবাদ, অনুবাদ ও ভূতার্থ-বাদরূপ 'অর্থবাদ' স্বরূপ এবং (৩) উক্ত চারিপ্রকার 'বিধি' ও তিনপ্রকার 'অর্থবাদ' হইতে অতিরিক্ত 'বেদান্ত-বাক্য' স্বরূপ। এই ত্রিবিধ (১—বিধি, ২—অর্থবাদ ও ৩—বেদান্ত) রূপ-সমন্বিত 'ব্রাহ্মণ' অংশ।

৪৫ আরণ্যক—অরণ্যেঽনূচ্যমানত্বাদারণ্যকম্‌'— এই উপাসনাদিবিশিষ্ট অংশ অরণ্যে পঠিত—অনুশীলিত—হয় বলিয়া ইহাকে 'আরণ্যক' বলা হয়।

—(বৃঃ আঃ শাঙ্কর-ভাষ্য)

৪৬ মুক্তিক উপনিষৎ পাঠে জানা যায় যে ঋগ্‌বেদের ২১ শাখা, যজুর্ব্বেদের ১০৯, সামবেদের ১০০০ ও অথর্ব্ব-বেদের ৫০ শাখা। (মুক্তিক উঃ ১—১১, ১২)। কিন্তু গ্রন্থরূপে আজকাল সব শাখা পাওয়া যায় না। ইহাদের মধ্যে ঋগ্‌বেদের শৈশিরীয় শাখা, যজুর্বেদের কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন শাখা, সামবেদের কৌথুম শাখা ও অথর্ব্ব-বেদের শৌনক শাখাই কেবল এখন পাওয়া যায়। উপর্যুক্ত প্রতি শাখায় একখানি করিয়া উপনিষৎ আছে ; এইরূপ মোট ১১৮০খানি উপনিষৎ, যাহার মধ্যে ১০৮ খানি উপনিষদের উল্লেখ মুক্তিক-উপনিষদে পাওয়া যায়। (মুক্তিক উঃ ১।৩০—৪০)।

৪৭ 'উপনিষৎ' শব্দের উপরি-উক্ত তিনপ্রকারের নির্ব্বাচন 'কঠ' ও 'মুণ্ডক' উপনিষদের শ্রীশাঙ্কর-ভাষ্যের অবলম্বনে দেওয়া হইল।

ও অপৌরুষেয়) গ্রন্থও 'উপনিষৎ' শব্দ দ্বারা কথিত হইয়া থাকে।

প্রস্থানত্রয়

প্রারম্ভে বলা হইয়াছে যে বিদ্যা ও ধর্ম্মের স্থান শাস্ত্র; এবং শাস্ত্রও চতুর্দ্দশ অথবা মতান্তরে অষ্টাদশ। বিভিন্ন সম্পূর্ণ বিদ্যা মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যাই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ। সামান্যতঃ বিদ্যা-সমূহের স্থান শাস্ত্র। কিন্তু বিশিষ্ট বিদ্যা—ব্রহ্মবিদ্যার বিশিষ্ট স্থানরূপ শাস্ত্রকে 'প্র-স্থান' ('প্র'—প্রকৃষ্ট অর্থাৎ সর্ব্বোত্তম'স্থান') বলা হইয়া থাকে। ব্রহ্মবিদ্যার প্রকাশক প্রস্থান, স্বরূপে তিন প্রকার; যথা—(১) যাহা স্বরূপে অনাদি ও অপৌরুষেয় এবং গুরু-পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে, তাহাকে 'শ্রুতি-প্রস্থান' বলে। এই রূপে সম্পূর্ণ 'উপনিষৎ'গুলিই 'শ্রুতি-প্রস্থান'। (২) শ্রুতি-মূলক জ্ঞান ও ধর্ম্মের স্থান, যাহা কোনও বিশিষ্ট পুরুষ দ্বারা স্মরণ করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাকে 'স্মৃতি' বলে। (মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, হারীত আদি কৃত) সমস্ত স্মৃতি-গ্রন্থই মনুষ্য-রূপ ঋষিগণ প্রণীত। কিন্তু স্বীয় মায়াদ্বারা মনুষ্য-রূপধারী সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণদ্বারা 'গীতা' গীত বা কথিত হইয়াছে। এজন্য 'গীতা' সমস্ত স্মৃতি-গ্রন্থ মধ্যে এক প্রমুখ স্থান অধিকার করিয়া আছে এবং উহা বস্তুতই অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ। কেবল ইহাই নহে, পৌরুষেয় হইলেও, গীতা 'মায়াদ্বারা পুরুষ'-রূপধারী ভগবান্ কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে বলিয়া, পরমেশ্বরের নিঃশ্বসিত-রূপ অপৌরুষেয় বেদের মত উহা মান্য ও পূজ্য। সুতরাং এ গ্রন্থ (শ্রুতিরই মত) অবশ্য বিদ্যার 'প্র'—প্রকৃষ্ট বা বিশিষ্ট 'স্থান' তাহাতে সন্দেহ নাই। এজন্য 'গীতা'কে মুখ্যতঃ দ্বিতীয় 'প্রস্থান' বলা হয়। স্বরূপে স্মৃতি-রূপ বলিয়া ইহাকে 'স্মৃতি-প্রস্থান'ও বলে। (৩) যাহাতে সম্পূর্ণ শ্রুতি ও স্মৃতি-সমূহের (স্মৃতি-গ্রন্থ-সমুদায় মধ্যে মুখ্যতঃ ভগবদ্গীতা-শাস্ত্রের) বিষয় একত্র সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে, যাহার মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় ব্রহ্ম ও ব্রহ্ম-বিদ্যা, যাহার স্বরূপ সম্পূর্ণ বেদের মর্ম্মজ্ঞ ভগবান্ বাদরায়ণ ব্যাস প্রকাশ করিয়াছেন ও যাহার সংজ্ঞাই 'ব্রহ্ম-সূত্র' বা 'বেদান্ত-সূত্রে' মানা হইয়াছে, ঐ গ্রন্থও অবশ্য এক 'প্র'—প্রকৃষ্ট 'স্থান' বা ব্রহ্মবিদ্যাপ্রকাশক এক বিশিষ্ট অবলম্বন। 'ব্রহ্ম-সূত্রে' সমস্ত উপনিষদের প্রতিপাদ্য বিষয় সূত্রাকারে গ্রথিত আছে। অবৈদিক[৪৮] মত-সমূহ খণ্ডন করিয়া ন্যায়-যুক্তি সহায়ে বৈদিক যথার্থ মত প্রতিপাদন করা হইয়াছে বলিয়া ইহাকে 'ন্যায়-প্রস্থান'ও বলে। সম্পূর্ণ বর্ণ ও আশ্রমাদির ধর্মসমূহ এবং সমস্ত কর্ম্ম-সমুচ্চিত বিদ্যা হইতে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্ম-বিদ্যার সর্ব্বোত্তম স্থান—'প্রস্থান' রূপ এই তিন প্রস্থান[৪৯] 'প্রস্থান-ত্রয়' বা 'প্রস্থান-ত্রয়ী নামে ব্রহ্মজ্ঞ-সম্প্রদায়-বিৎ জনগণমধ্যে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে।

আরম্ভবাদ

ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ জানিবার জন্য প্রস্থান-সমূহে উহাকে জগতের মূল বা কারণ[৫০] রূপ বলা

৪৮ (১) মাধ্যমিক বৌদ্ধদের শূন্যবাদ, (২) যোগাচার বৌদ্ধদের আন্তর ক্ষণিক-বিজ্ঞান-বাদ, (৩) সৌত্রান্তিক-দিগের জ্ঞানাকার ক্ষণিক-বাহ্যার্থ-বাদ, (৪) বৈভাষিক-দিগের প্রত্যক্ষ ক্ষণিক-বাহ্যার্থ-বাদ, ও (৫) চার্ব্বাক্দিগের দেহাত্মবাদ, (৬) দিগম্বরদিগের দেহ হইতে পৃথক্ পরিমিত আত্ম-বাদ, ইত্যাদি, অবৈদিক মত।

৪৯ (১) শ্রুতি-প্রস্থান—কঠ, কেন, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, ঈশ, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক. কৌষীতকী, শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ আদি; (২) স্মৃতি-প্রস্থান —শ্রীমদ্ভবদ্গীতা আদি; (৩) ন্যায়-প্রস্থান—বাদরায়ণ ব্যাস প্রণীত ব্রহ্ম-সূত্র (উত্তর-মীমাংসা)। জিজ্ঞাসুদিগের 'শাঙ্কর-ভাষ্য' সহিত বা শাঙ্কর-ভাষ্যের অনুযায়ী অনুবাদ, টীকা, টিপ্পনী আদি সহিত এই 'প্রস্থান-ত্রয়' অবশ্য পড়া ও পড়িয়া তাৎপর্য্যের মনন করা বাঞ্ছনীয়।

৫০ জগৎকারণ ব্রহ্মই; সাংখ্যের 'প্রধান' বা ন্যায়-শাস্ত্রের 'পরমাণু' আদি অন্য কিছুই জগতের কারণ নহে।

হইয়াছে। কোনও কার্য্য-পদার্থের 'কারণ' কার্য্য-রূপে যখন প্রকটিত হয়, তখন উহা 'আরম্ভ' বা 'পরিণাম' অথবা 'বিবর্ত্ত' রূপে ভাষিত হইয়া থাকে। শাস্ত্রসমূহের স্বয়ংপাঠীদিগের মধ্যে, বিভিন্ন শাস্ত্র পড়িয়া, কেহ কেহ 'আরম্ভবাদ'কে বাস্তব সত্য মনে করেন এবং কেহ বা 'পরিণামবাদ'-কেই যথার্থ সত্যরূপে গ্রহণ করেন। পৃথিবী, বায়ু, অগ্নি ও জল এই চারি তত্ত্বের পরমাণুই দ্ব্যণুক, ত্রসরেণু আদি ক্রমে ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত জগতের 'আরম্ভ' করিয়া থাকে। এই রূপে পৃথিবী আদির পরমাণু হইতে ক্রমশঃ স্থূল ভাবাপন্ন 'অসৎ কার্য্য'ই উৎপন্ন হইয়াছে। যাহা কিছু সাবয়ব—অবয়ব-যুক্ত দ্রব্য দেখা যায়, সেই সমস্তই স্বীয় অনুকূল সংযোগযুক্ত উপরি-উক্ত দ্রব্যসমূহ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই অবয়বাবয়বি-বিভাগ—অবয়ব ও অবয়বীর বিশ্লেষণ—যেখানে গিয়া নিবৃত্ত হয়, সেই নূতনতম পরিমাণ-প্রাপ্ত অবয়বকে 'পরমাণু' বলে। পরমাণু পরমাণুতে সংযোগ হইয়া 'দ্ব্যণুক' হইয়া থাকে। কিন্তু দ্ব্যণুক বা ছয় পরমাণু মিলিয়া 'ত্রসরেণু' হয়। এইরূপে পরে দ্ব্যণুক ত্রসরেণু আদি ক্রমে স্থূল অগ্নি, জল, পৃথিবী আদি ও ইন্দ্রিয়-সহিত শরীরাদি উৎপন্ন হইয়াছে। পর্ব্বত, সমুদ্রাদি-সমন্বিত এ সম্পূর্ণ জগৎ সাবয়ব এবং সাবয়ব বলিয়াই উৎপত্তিমান্ ও বিনাশী। কোনও 'কার্য্য'ই 'কারণ'কে ছাড়িয়া উৎপন্ন হইতে পারে না; এইজন্য 'পরমাণু' জগতের কারণ [৫১]—কার্য্য অসৎ, কারণই সত্য; কেননা, নাশশীল পৃথিবী আদির পরমাণু পর্য্যন্তই বিভাগ হইয়া থাকে। বৈশেষিকদিগের ইহাই 'পরমাণু-কারণবাদ'। তর্ক ও মীমাংসা-শাস্ত্রিগণও [৫২] 'আরম্ভবাদ'ই মানিয়া থাকেন।

পরিণামবাদ

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণময় 'প্রধান'ই 'মহৎ', 'অহঙ্কার' আদি ক্রমে জগদাকারে পরিণত হইয়াছে। উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বেও কার্য্যপদার্থ সূক্ষ্ম-রূপে বর্ত্তমান থাকে; পরে ঐ সূক্ষ্ম কার্য্য জগৎ-কারণ 'মহৎ' আদির 'পরিণাম' হইতে স্থূল 'সৎকার্য্য' রূপে প্রকটিত হয়। ইহাই, দ্বিতীয় পক্ষ, 'পরিণামবাদ',—যাহা সাংখ্য, যোগ, পাতঞ্জলশাস্ত্র ও পাশুপত মতাবলম্বিগণ মানিয়া থাকেন। সাংখ্যদিগের 'প্রধানের' পরিণাম না মানিয়া প্রাচীন বৈষ্ণবগণ জগৎ 'ব্রহ্মের পরিণাম' রূপ মানিয়াছেন।

বিবর্ত্তবাদ

স্বয়ংজ্যোতিঃ, সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ও দ্বিতীয়বস্তু-রহিত এবং সর্ব্বদা একরূপ ব্রহ্ম স্বীয় মায়াদ্বারা জগৎরূপে কল্পিত হইয়া থাকেন। এ কল্পনাই মিথ্যা; এজন্য মিথ্যা কল্পনার কার্য্যও মিথ্যা। যেমন, রজ্জুতে মিথ্যা-কল্পিত সর্প মিথ্যা। ইহাই 'বিবর্ত্তবাদ'; কারণ রজ্জুর সর্প-রূপে বিবর্ত্ত হইবার মত অদ্বিতীয় ব্রহ্মই জগৎ-রূপে বিবর্ত্তিত হইয়াছেন। সম্পূর্ণ প্রস্থান-শাস্ত্রের অন্তিম প্রতিপাদ্য বিবর্ত্তবাদ; কারণ প্রস্থান-ত্রয়ের প্রতিপাদ্যই হইতেছে একমাত্র, অদ্বিতীয়—অন্য দ্বিতীয়-বস্তু-রহিত পরমেশ্বর (ব্রহ্ম)।

বাদত্রয়ের তাৎপর্য্য

বিদ্যা-সমূহের বিভিন্ন 'স্থানে' (শাস্ত্রে) আরম্ভ-বাদ পরিণামবাদ আদি দেখিয়া ইহাদের মধ্যে

ব্রহ্ম-সূত্র, ১-১-৫; ১-১-১৮; ১-৪-২৮; ও ২-১-৪; এবং এখানেও পৃঃ ১ এ. টিপ্পনী ১, দ্রষ্টব্য।

৫১, ৫ নম্বর টীকা দ্রষ্টব্য।

৫২ তাঁহারা এতদতিরিক্ত 'অপূর্ব্ব' হইতেই কর্ম্ম-ফলের 'আরম্ভ' মানিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে ঈশ্বর কর্ম্ম-ফল-সিদ্ধির জন্য অকিঞ্চিৎকর। এখানে 'মীমাংসাশাস্ত্রী' অর্থে পূর্ব্বমীমাংসানুগামী বা কর্ম্ম-কাণ্ডী বুঝিতে হইবে।

কোনও একটীকে মানিয়া লইয়া শাস্ত্র-সমুদায়ের যথার্থ তাৎপর্য্য না বুঝিয়াই লোকে পরস্পর ঈর্ষ্যা, দ্বেষ ও কলহাদি করিয়া থাকে। কিন্তু শাস্ত্রকার মুনিগণ তো ভ্রান্ত ছিলেন না! বিভিন্ন প্রকারের বুদ্ধি-বৃত্তি-যুক্ত মনুষ্যদিগের জন্য তাঁহারা বিভিন্ন প্রকারের 'উপায়' উদ্ভাবিত করিয়া গিয়াছেন। তাৎপর্য্য ইহাই যে সাংসারিক বস্তুসমূহের চাকচিক্যে মোহিত হইয়া মানুষ নাস্তিক হইতে থাকে ও জগৎকারণ পরমেশ্বরকেও অস্বীকার করিতে আরম্ভ করে। যখন মানুষ জগতের কারণ-রূপ পদার্থের অন্বেষণ করিতে থাকে, তখন ক্রমশঃ পরমাণু-কারণবাদ বা প্রধান-কারণবাদ আদির অসম্ভাবনা ও ভ্রান্তি বুঝিয়া সে ব্রহ্ম-পরিণামবাদে পৌছে। এই অবস্থায় তাহার এই রূপ বোধ হয় যে, 'দুধের পরিণাম দই' এর মত ব্রহ্মেরই পরিণাম এই জগৎ আদি সব কিছু হইয়াছে। এই পর্য্যন্ত বিশ্বাস বা বুদ্ধি-বৃত্তি স্থির হইলে ক্রমশঃ পরমেশ্বরে মিথ্যা-কল্পিত জগৎ-রূপ কার্য্য বা ব্রহ্ম-বিবর্ত্তবাদ সহজেই বুদ্ধি-গোচর হয়।

তত্ত্ব এক এবং জ্ঞানও এক

যোগ্যতম গুরুর উপদেশ না লইয়া (শাস্ত্র-বিৎ আচার্য্য সমীপে না পড়িয়া) স্বয়ংপাঠী ব্যক্তিরাই শাস্ত্র-সমূহের বেদ-বিরুদ্ধ তাৎপর্য্য বুঝিয়া বসেন; এবং স্বীয় সাংস্কৃতিক, ব্যক্তিগত বুদ্ধি-প্রত্যয়দ্বারা, যেমন খুসি ব্যাখ্যা করিয়া নানা প্রকারের অবৈদিক মার্গগামী হইয়া থাকেন। নিজ নিজ বুদ্ধিপ্রত্যয়ের দৌড় অনুসারে নানা ব্যক্তিদ্বারা নানা মত, মার্গ (মজহব) বা সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। তত্ত্বতঃ 'বস্তু' এক; অতএব এক অদ্বিতীয় বস্তুবিষয়ক যথার্থ জ্ঞানও 'এক' রূপই হওয়া উচিত। সন্দেহ-বিকল্পাদি রহিত এই যথার্থ জ্ঞানের প্রকাশক উপনিষৎ।

শ্রীশ্রীমহারাজের কথা

শ্রী—

প্রথম দিন দর্শনের পর থেকেই প্রতিবারে বলতেন, "মশাই, আবার আসবেন, আবার আসবেন।" কিছুদিন যাতায়াতের পর একদিন স্বপ্নে দেখলাম, আমি মঠের ফটকের বাইরে, আর মহারাজ প্রভৃতি ভিতরে রয়েছেন। মনটা খারাপ হয়ে গেল। একদিন সকালে মহারাজকে বললাম, "এতদিন আসছি, এখনও মনে হচ্ছে বাইরে পড়ে আছি।" তিনি তৎক্ষণাৎ বললেন, "ওসব কথা আমার সঙ্গে নয়, বাবুরাম মহারাজকে বল গে।" আমি ভাবলুম। ওঁকে জানিয়েছি, আর কি দরকার? কিন্তু এই হল প্রথম অপরাধ।

স্নানের পর মহারাজকে প্রণাম করব, কিন্তু কোথাও তাঁকে খুঁজে পেলুম না। চায়ের টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, দেখি তিনি উপর থেকে নেমে এলেন। তারপরই আরম্ভ হল বেঞ্চে বসে বিচার। মহীতোষ মহারাজ, হরি মহারাজ প্রভৃতি অনেকে দাঁড়িয়ে। মহারাজ বলতে লাগলেন, "মশাই কি বলে শুনুন। তুমি যা' বললে ওর moral (নীতি) কি বুঝেছ?

এখান থেকে গিয়ে বাড়ীতে কি recapitulate (পুনরাবৃত্তি) কর? যাও ঘোষ পাড়ায়, যাও, তিন দিনে করে দেবে; ভক্ত হও, ভক্ত হও।"

হরি মহারাজ কেবল বলতে লাগলেন, "ঠিক ঠিক।" মহারাজ—"মশাই, মহাপুরুষদের কথা,—'সাধ করে পরেছি ফোঁটা, পুঁছব কেমন করে গো' (রামপ্রসাদ)।" এর পর অনেক্ষণ আরও কি কি যে বললেন, আমার মাথায় ঢুকল না, মাথা কেমন করতে লাগল। তিন দিন মাথায় বেদনা হয়ে রইল। ভাবলুম, কি এমন গুরুতর অপরাধ করলুম যার জন্য এতটা বিরক্ত হলেন? অনেকেই তো এরকম বলেছেন, ওঁরাও তো ঠাকুরকে বলেছেন, তবে আমার উপর এতটা কেন? কথাশেষে মহীতোষ মহারাজ আমাকে বললেন, "ওটা আপনার উপর দিয়ে হয়ে গেল। অনেক সাধুর পর্য্যন্ত আক্কেল হল।" এই অপরাধের গুরুত্ব দীর্ঘ ৪০ বৎসরেও আমি ঠিক বুঝতে পারি নি। আমি নির্ব্বাক হয়ে গেলাম। প্রসাদ পেয়ে ভিজিটর রুমে (Visitors' room) ঝুম্ মেরে পড়ে আছি, না নিদ্রা—না জাগরণ। হঠাৎ একজন সোজা আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার নাম কি? আপনাকে মহারাজ উপরে ডাকছেন।" উপরে লাইব্রেরী ঘরে মহারাজ ও শরৎ মহারাজ বসে এবং বাবুরাম মহারাজ পেছনে দাঁড়িয়ে। যত চিঠিপত্র খোলা হচ্ছে—জবাব দেওয়া হবে। যাওয়া মাত্র মহারাজ বললেন, "মশাই আমাদের উপর রাগ করেছে, আমাদের সঙ্গে কথা কবে না, আমাদের মিটিংএ যাবে না।" আমি বল্লুম, "আমি কি এমন কথা—?" অমনি বলে উঠলেন, "বলনি!" আরও চলত। বাবুরাম মহারাজ আমাকে চোখটিপে চুপ করতে বললেন। আমিও তাই করলাম। তারপর বিকেলে নীচে পূর্ব্বদিকের বারান্দায় প্রশ্নোত্তর ক্লাস হচ্ছে মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ ও মহাপুরুষ মহারাজ বেঞ্চে বসে আছেন, নীচে সতরঞ্চে আগন্তুকগণ। "কার কি জিজ্ঞাস্য আছে জিজ্ঞেস করুন," বলে দু' একটা কথার পর মহারাজ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে?" আমি জবাব দিলাম, "না, আমার কিছু জিজ্ঞাস্য নেই।" তখন মহারাজ মহাপুরুষ মহারাজকে জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা মশাই, এই যে কেউ কেউ বলে, 'এখানে এতদিন আসছি কিছু হচ্ছে না', এর মানে কি?" তিনি উত্তর করলেন, "তারা আরও চায়, পেট ভরছেনা।" মহারাজ বললেন, "আচ্ছা মশাই, এও তো হ'তে পারে—তা দেওয়া যাচ্ছে পৌঁছুচ্ছে না, দেরী হচ্ছে।" তিনি বললেন, "হাঁ তা'ও হতে পারে।" এর বহুদিন পরে যখন মহাপুরুষ মহারাজ মঠের প্রেসিডেন্ট, আমি একদিন বললুম, "মহারাজ, অনেকের জন্যে আপনাকে অনুরোধ করলাম, কৈ আমার নিজের জন্যে তো কিছু বলা হল না।" তিনি বললেন, "আবার কি দাগার উপর দাগা বুলুবে? তোমাদের যা' করবার তা' মহারাজ, মা-ঠাকরুণ, বাবুরাম মহারাজ এঁরা সব করে গেছেন।"

মহারাজ—(জনৈক ভক্তকে) "একসঙ্গে (স্বামী-স্ত্রী) থাকতে গেলে মিলেমিশে থাকতে হয়। তা না হলে একজনকে তফাৎ হ'তে হয়।" (অপর একজনকে) "পাঁচজনের সঙ্গে থাকতে হ'লে মিলেমিশে থাকতে হয়।" (কুঞ্জলালকে) "চুপ করে বসে থাকা ভাল নয়, একটা কিছু কাজ করা ভাল। যাও, পাতকুয়ার তলার ঘাস ছেঁড়গে।" খানিক পরে একজনকে পাঠালেন, "যাও, ডেকে নিয়ে এস, আর ঘাস ছিঁড়তে হবে না।" পশ্চিমদিকের চায়ের টেবিলে বসে গাইলেন, "বনকুসুমের মধুর সৌরভে তোমায় রাখিব সখা হে।"

(জনৈক ব্রহ্মচারীকে) "তোমাকে ভুবনেশ্বরে পাঠালুম ধ্যানভজন করবে বলে। তুমি বার বার লিখতে লাগলে, 'আমার কাশী যাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে।' যাও কাশীতে গিয়ে রোগীদের গু ঘাঁটগে।"

একদিন একজন ব্রহ্মচারীকে বললেন, "কি ব্রহ্মচারী, পান খাওয়া হচ্ছে যে?" ক— মামাকে একদিন শ্মশানে যেতে বারণ করলেন। বললেন, "ওতে লোক hard-hearted হয়ে যায়।" একদিন দেখলাম, অভেদানন্দ স্বামীকে নৌকায় তুলে দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এলেন। তারপর word-making খেলতে বসলেন। হেরে যাচ্ছেন দেখে একজন বললেন, "মহারাজ হেরে যাচ্ছেন।" মহারাজ জবাব দিলেন, "মশাই, এজগতে জেতাটা কিছু নয়, হারাই ভাল।" একদিন জনৈক ভক্তকে বললেন, "এই তো প্রণাম করলেন, আবার কেন? মশাই, পেন্নাম ফেন্নামে কিছু নেই, ভালবাসাটাই জিনিস। নাক টিপেই বস, আর যাই কর, সত্যি কথা কইতে জিব বেরিয়ে যাবে।" জনৈক গৃহী ভক্তকে বললেন, "ভোগ কি আর করবে?" অপর একজনকে বললেন, "একমুঠো টাকা রোজগার করতে কত কষ্ট করতে হয়, আর ভগবান লাভ করতে কষ্ট করতে হবে না? 'যৎ ভূমা তৎ সুখং, নাল্পে সুখমস্তি।' মশাই, আমি আর কাকে কি বলব? সাক্ষাৎ দেখছি, যে একবার রামকৃষ্ণের দুয়ারে মাথা ঠুকেছে, ঠাকুর তার সঙ্গে সঙ্গে ফিরছেন।" জনৈক ভক্তকে জিজ্ঞেস করলেন, "হাঁরে, অমুকের খবর জানিস?" ভক্ত—"না মহারাজ, তার স্বভাব খারাপ হয়েছে, আমরা আর তার সংস্রবে থাকি না।" মহারাজ— "সে কি রে, তোদের ভালবাসা কি বেশ্যার ভালবাসা? আমি তো কারুর দোষ দেখি না।" ভক্ত (কথাপ্রসঙ্গে)—"তা বলে কি পরিবারের মতে চলতে হবে? সে যা বলবে, তাই শুনতে হবে?" মহারাজ—"সে কিরে, শুনবি না? সে যে সুখস্থান।" অপর ভক্তকে—"যা বললুম (সাধন ভজন সম্বন্ধে) যদি কর তো পাবে সুখ, নইলে অন্যরকম করতে হবে। কর্ম্মফল ভুগতেই হবে। কলিকাল! তিন পাদ পাপ, এক পাদ পুণ্য।" একদিন বললেন, "পোড়া ম্যালেরিয়ার জ্বালায় পালিয়ে পালিয়ে বেড়াই। তা নইলে এমন সোনার মঠ ছেড়ে কোথাও যেতে ইচ্ছে করে কি, মশাই?" একদিন বলছেন, "সারা ভারতবর্ষটা ঘুরে এলাম, কৈ ভবিষ্যৎ বলতে পারে এমন লোক তো দেখলাম না মশাই।" পরে জনৈক ভক্তকে—"কুষ্ঠি ফুষ্ঠি ওসব যদি করবে তো এখানে কেন? তাদের কাছে যাও।"

একব্যক্তি সাতজনের কাছে মন্ত্র নিয়েও শান্তি পান নি। মহারাজ তাঁকে বললেন, "বেশ, এখন কি করছ?" উত্তর—"এখন কোনটাই জপ করি না।" মহারাজ—"বেশ আরও ভাল।" প্রশ্ন—"এখন কি করব?" মহারাজ—"এখন ওই সাতটা মন্ত্রই একবার করে জপ করবে। যেটা ভাল লাগবে, সেইটাই জপ করবে বেশী করে।"

কোন এক ভদ্রলোক পুরোহিত জ্যোতিষীর উৎসাহে শেয়ার কিনে বিপন্ন হয়ে মহারাজের শরণাগত হয়। রামকৃষ্ণপুরে নবগোপাল বাবুর বাড়ীতে মহারাজ রামলাল দাদাকে বললেন, "এই এসেছেন। এখন বাড়ী ঘর যায়।" বলে জপ করে দিলেন। লোকটি সেযাত্রা কোন রকমে রক্ষা পেয়ে গেল। মহারাজ তাকে বলেছিলেন, "কেন তুমি একাজ করেছিলে? অমুক চাটুয্যে করে, তার মাগ ছেলে নেই; সে এক। তুমি ছা-পোষা মানুষ, তুমি কেন একাজ করতে গেলে? এখানকার কাউকে জিজ্ঞেস করেছিলে কি? কারু দেখাদেখি করতে গিছলে? কে তোমাকে

একাজ করতে বললে? কেউ উৎসাহ দিয়েছিল? রাতারাতি বড় মানুষ হতে গিছলে? পয়সা করাটা কি এতই সহজ? একখানা ইংরেজী বইয়ে পড়লাম, 'বিধবার সর্ব্বস্ব হরণ', ইত্যাদি কত কি করতে হয়। জান না এযুগে যাঁরা সৎপথে থাকবে তাঁদের রুক্ষ মাথায় তেল জুটবে না।"

এক জনের বাড়ীতে কলেরায় একদিনে দুটি মৃত্যু হয়। মহারাজ তাকে বললেন, "পড়ে গেলে কি পড়ে পড়েই কাঁদতে হবে, উঠতে হবেনা?"

এক জনকে ঘি খেতে বলেছিলেন। সে বললে, "আগে খেতুম, এখন বাড়ী করে দেনা হয়েছে, তাই বন্ধ।" তিনি বললেন, "ঐটে লোকে বড় ভুল করে, শেষে ধনেপ্রাণে মারা যায়।" সে ব্যক্তির কাকার ঐ দশা ঘটেছিল।

এক জনের সম্বন্ধে বললেন, "—কে ভাল মানুষ পেয়ে সব্বাই ঠকায়।"

একদিন জনৈক ভদ্রলোক বললেন, "মহারাজ, কোঠারের সেই বাবাজী মরে গেছে।"

মহারাজ তাতে বললেন, "জান তুমি মরে গেছে? মরে গেছে?"

এক দিন জনৈক ভক্তকে দেখাইয়া মহারাজ বললেন, "এই লোকটির বাইরে সাদা ভেতরটা গেরুয়া।" মহারাজকে জনৈক ভক্ত বললেন, "মহারাজ, আগে স্বামীজীর উৎসবে দরিদ্র-নারায়ণ সেবা হ'ত, এখন সব ভক্তরা বসে পড়ছে।" মহারাজ একটু চুপ করে থেকে জবাব দিলেন, "দেখুন, এটা যখন আরম্ভ হয় তখন দরিদ্র ছিল। এখন চতুর্দ্দিকে কলকারখানা হয়ে তারা দুমুঠো খেতে পায়। এখন এরাই দরিদ্র—ছা-পোষা লোক, সংসারে খেতে পায় না।"

এক জন মহারাজকে অনুযোগ করে বললেন, "মহারাজ, আপনি সকলের সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টি করেন, কাউকে ভগবানের কথা বলেন না।" উত্তরে তিনি বললেন, "দেখুন এরা সব সংসারে জ্বলে পুড়ে এখানে আসে, আনন্দ পাবে বলে।" একদিন কথা প্রসঙ্গে বললেন, "এ এক রকম বেশ, মশাই, কারু ভেতর দেখবার জো নেই—কে কতদূর এগিয়েছে বোঝবার জো নেই।" শরীরের কথায় একদিন বললেন, "কখন রোগা কখন মোটা। কি হবে কতগুলা মেদ বাড়িয়ে?"

জনৈক ভক্তকে—"তোমার পরিবারের গর্ভাবস্থা। এলোপ্যাথি কেন করছ? হোমিওপ্যাথ দেখাও না।" অপর একজনকে—"রোগটা কি, ডাক্তারকে দিয়ে diagnosis ঠিক করে নিয়ে তারপর যেমন case (অসুখ) বুঝবেন সেই রকম করা ভাল—এলোপ্যাথি, কি হোমিওপ্যাথি, কি কবিরাজী।" শ্রীযুত শ্যামদাস কবিরাজকে—"কবিরাজ মশাই, একটা কথা বলব, শুনবেন?" কবিরাজ—"কি, বলুন।" মহারাজ—"ব্রহ্মবিদ্যাই বিদ্যা, আর সব অবিদ্যা।" জনৈক ভক্ত কোন জ্যোতিষীর ভুল ধরেছিলেন। মহারাজ তাঁকে বললেন, "শেষটা এই হল—বিদ্যার অহঙ্কার!" কোন ভক্ত কলকাতায় থেকেও এক বৎসর মহারাজের সাথে দেখা করেন নি। গুরু যখন ডাকবেন তখন দেখা করবেন—এই প্রতিজ্ঞা। মহারাজ যখন বলরাম মন্দিরে তখন তাঁকে ডেকেছিলেন। তিনি ছোট ঘরটিতে ঢুকলেন—পককেশ। মহারাজ খানিক চেয়ে থেকে বললেন, "ও—এস, ভেবোনা, এক একবার আসবে, এখানে বেড়িয়ে যাবে।"

আর একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, "কেমন আছ?" তিনি বললেন, "ভাল নয়।" মহারাজ "—কেন?" উত্তর—"আর ধ্যান হয় না।" মহারাজ—"একবার করে সকালে বসবে।"

খোকা মহারাজ তাঁকে বলেছিলেন, "তুমি বিশ্বাস কর, আর তোমাকে খাটতে হবে না।"

একদিন বললেন, "যে কোন বিষয়েই হোক, একেবারে মগ্ন হয়ে যেতে হয়। তা' নইলে হয় না। দেখুন মশাই, এই হলদে গাঁদাগুলো লাল গাঁদার সঙ্গে থেকে লাল হয়ে গেল।" জনৈক ভক্ত তাঁর মাকে জগন্নাথ দর্শনে নিয়ে গিয়েছিলেন। মহারাজ তখন পুরীতে। তিনি বার বার বললেন, "তোমার মায়ের জগন্নাথ দর্শন হল।"

একজনের ছেলের চরিত্রদোষ হয়েছিল। মহারাজ বললেন, "তিনি কেন যে অত strict হয়েছেন! আর সে (ছেলেটা) দই খেয়ে ভাঁড় ফেলে দিক না।" জনৈক ভক্তকে—"ননীলাল, সব ভোলা যায়, ভগবানকে ভোলা যায় না।" আর একজনকে—"জপধ্যান parallel (পাশাপাশি) যাবে। এখন এই রকম কর, এর পর বলে দেব।" মঠে স্বামীজীর মন্দিরের মূর্তিটি দেখে বললেন, "স্বামীজীর এই মূর্তিটি বেশ, অ্যালানে ভাব।"

একদিন কুকুর উচ্ছিষ্ট খাচ্ছে দেখে বললেন, "মায়ের আমার কত মুখেই খেতে ইচ্ছে হয়।" জনৈক ভক্তকে, "ভগবানের কাছে কিছু চাইবে না। ভক্তি পর্যন্ত না চাইতে পারলে ভাল হয়।" কাশীতে একজনকে বললেন, "মশাই, সংসারে মাগছেলেরা খেতে পাচ্ছেনা, আর উনি এখানে এসে রাবড়ী ওড়াচ্ছেন!" অপর ভক্তকে—"সাধন ভজনের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য চাই।" এই প্রসঙ্গে বললেন, "এক পয়সার চিংড়িমাছ এনে গুষ্টিশুদ্ধ খাবে। ঈশ্বর দেখতে গিয়ে ভূত দেখে বসে থাকে।" অপর ভক্তকে— "ডিস্‌পেপ্‌সিয়াটাও (অজীর্ণটাও) ম্যালেরিয়া। poisonটা (বিষটা) ওদিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। চা খেয়ে ম্যালেরিয়া কমে না। ম্যালেরিয়ার জায়গায় সকালে খালি পেটে থাকতে নেই, একটু কিছু খেতে হয়। গরম জলটা পেটে পড়ে, তাই।" এই প্রসঙ্গে একজনের কথা তুলে বললেন, "চা খেয়ে খেয়ে লিভারটা একেবারে খারাপ করেছেন।" গঙ্গাতীরে প্রতিপদের চন্দ্রোদয় দেখে ভক্তিভরে বার বার 'জয় জয়' বলে প্রণাম করতে লাগলেন। জনৈক ভক্ত উৎসবের সময় মঠে নাগরদোলায় চড়তে চাইছিলেন না। মহারাজ তখন তাঁকে বললেন, "এর একটা মানে আছে।"

এক ব্যক্তির কাকার অসুখ, বাঁচবার আশা নেই। তিনি মহারাজকে বললেন, "মনটা ভাল নয়, কাকা বোধ হয় বাঁচবেন না।" তিনি বললেন, "ওতে কি তোমার অসুবিধা হবে? জেনে রেখো এখানে চিরদিনের জন্য কেউ নয়।"

"যে রকম দিনকাল পড়েছে একটু কৃপণ হওয়া ভাল, কিন্তু লক্ষ্মীছাড়া হওয়া ভাল নয়।"

জনৈক ভক্তকে চা ফুঁ দিয়ে খেতে দেখে বললেন, "মশাই, এখনকার ডাক্তারদের মত চায়ে ফুঁ দেওয়া ভাল নয়, ওতে পেট ফাঁপে।" একজনকে বললেন, "সকলেরই একটু exercise (ব্যায়াম) করা দরকার।" তখনই আর একজনকে বললেন, "তোমার দরকার নেই, তোমার active life (খাটুনীর জীবন)।" জনৈক ভক্তকে একদিন বললেন, "রাত্রে কি খাও?" "আজ্ঞে, ভাত খাই।"—"রুটি খেও, ওতে একটু বল রাখে। যবের আটায় হাতীর মত বল হয়।"

কাশীতে একদিন বলেছিলেন, "ভোগ কি আর করবে?" অন্য সময়ে—"ভোগ করবে, কৃতজ্ঞ হয়ে ভোগ করতে হয়। বিবিধ সুখের পর অন্তে পরমপদ—এওতো শাস্ত্রে আছে?"

"মশাই, তীর্থে এসেছেন, তা-ও মাছ খাচ্ছেন। তীর্থে এসেও কি মাছ না খেলে নয়? কাশীতে এসেছেন শরীর শোধরাতে, বাজারের মাংস কিনে খেয়েছেন। যদি মাংস খাবার ইচ্ছেই হয়েছিল, আমাকে বললেন না কেন, আমি দুর্গাবাড়ী থেকে পূজো দিয়ে বলিদানের মাংস আনিয়ে খাওয়াতাম।"

মহারাজ কারও পত্র পেয়ে বললেন,—"কিছু হয়ে থাকে তো তা নিয়ে আবার ঢাক পিটে বেড়ান কেন?" শরৎ মহারাজকে বললেন, "লিখে দাও ইন্দ্রিয়ের বিষয় থেকে মনটাকে তুলে নিতে।" আর একদিন বলেছিলেন, "মশাই, এই সব লোকের self-respect (আত্মসম্মান জ্ঞান) নেই। আমার যেখানে নিমন্ত্রণ হয়, সেখানেই গিয়ে উপস্থিত হয়, ভাবে না যে অত লোকের আয়োজন হয়েছে কি না।"

কুঞ্জবাবু—"মহারাজ, অমুক বাবু বললেন, মহারাজের ভালবাসা ভোলবার নয়।" মহারাজ মুখখানা লাল করে গম্ভীর হ'য়ে বললেন, "কুঞ্জলাল, ভালবাসতে পাল্লুম কৈ? ভালবাসতে কি জানি? ভালবাসতে কি শিখেছি?" একদিন বললেন, "এখনকার থিয়োরি মশাই, brain থেকে হজম হয়।" আর একদিন একজনকে বলেছিলেন, "(ভগবৎ) প্রসঙ্গ ভাল, প্রসঙ্গ চাই, প্রসঙ্গ দরকার।"

আমোদর*

স্বামী প্রেমেশানন্দ

আমোদর, তুমি নটবর,
ললিত বঙ্কিম নৃত্যভঙ্গি তব অতি মনোহর।
কলকল ছলছল গাহে স্বচ্ছ স্বল্প জল,
চরণে নূপুর যেন রুনু ঝুনু বাজে নিরন্তর।
নটবর, তুমি মনোহর।

আমোদর, তুমি কী সুন্দর,
ঐশ্বর্যরহিত রূপে তব চিরদিন চিত্ত মুগ্ধ মোর।
পল্লী বালিকার প্রায় আভরণহীন কায়,
নিরলস ক্ষীনতনু, স্নেহেভরা তোমার অন্তর।
না চলে বাণিজ্যতরী, তীরে নাহি দেউল নগর,
নিত্যসঙ্গী পল্লীছায়া, শস্যক্ষেত্র, শ্যামলপ্রান্তর।
তব রূপে চিত্ত মুগ্ধ মোর,
আমোদর, তুমি কী সুন্দর!

আমোদর, তুমি নদরাজ,
তোমার ঐশ্বর্য হেরি সিন্ধু ব্রহ্মপুত্র পায় লাজ।
সগুণ নির্গুণ হরি, লীলা দেহে অবতরি,
মানব-মানবী রূপে, উভতীরে করিলা বিরাজ।
চরণ পরশ করি গঙ্গাসম পূত বারি,
তীরে শোভে লীলাভূমি, অপর সম্পদে কিবা কাজ।
তোমার ঐশ্বর্য হেরি সিন্ধু ব্রহ্মপুত্র পায় লাজ।
তুমি নদরাজ!

আমোদর, নিরৈশ্বর্য মাধুর্যআকর,
নব যুগে তাই তুমি রামকৃষ্ণ লীলাসহচর।
নদী গিরি যত হেরি, তোমারে ভুলিতে নারি,
সদা জাগে মনে তব সৌম্য শান্ত ক্ষীণ কলেবর।
তবরূপে চিত্ত মুগ্ধ মোর।
আমোদর, রামকৃষ্ণ লীলা সহচর।

আমোদর, ঘুরি নানা দেশ
হেরিলাম, মিথ্যা ফিরে ধরিয়া সত্যের রম্য বেশ
হেরিলাম, মনমুখে কলহ প্রবল,
প্রবেশি মন্দিরে মঠে, পুণ্যতীর্থে গঙ্গাতটে,
'কলি' ফিরে দম্ভ ভরে রাজ বেশে সহ দলবল।
রামকৃষ্ণ-স্মৃতিপূত তব তীর এখনও নির্মল,
সেথা নাই 'সভ্যতার' মধুমাখা তীব্র হলাহল।
তব তীর এখনও বিমল।

আমোদর, দয়াকরে, অকুণ্ঠ অভয় তীরে—
মোরে দাও স্থান,
জীবনের ভার বহি বড় শ্রান্ত ক্লান্ত মন প্রাণ।
ছাড়িয়াছি ভুক্তি মুক্তি আশ,
আছে মাত্র এক অভিলাষ,
শেষ দিনে তব তীরে, ফেলি যেন চরম নিঃশ্বাস।

* শ্রীশ্রীসারদাদেবীর জন্মভূমি জয়রামবাটী গ্রামের উত্তর প্রান্তে পূর্বমুখে এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মভূমি কামারপুকুরের পশ্চিমে দক্ষিণ মুখে একটী ক্ষুদ্র নদী বহিয়া চলিয়াছে, তাহার নাম আমোদর।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ ও সঙ্গীত*

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ প্রভৃতিতেও সঙ্গীতের উল্লেখ আছে এবং তাতে আশ্চর্য্য হবারও কিছু নেই। পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারত এসব কিছু আকাশ থেকে পড়ে নি, এরা সমাজের ভেতর পৃথিবীর মাটিতেই জন্মেছে, মাল মসলা উপকরণ সব কিছু কাহিনীই সমাজের ইতিহাস ও সত্য ঘটনাকে অবলম্বন কোরেই এরা গড়ে উঠেছে। তবে গ্রন্থকারদের হাতে পড়ে যে তাতে অলৌকিকতার ছোঁয়াচও কিছু লাগে নি—তা নয়, কিছু কিছু হয়েছেই। তখনকার লেখার বা প্রকাশ কর্‌বার ধরন-ধারণই ছিল বোধ হয় এরকম যে, একটু আধটু বেশী কোরে বা আশ্চর্য্যের কিছু না বল্লে ঘটনা বা কাহিনীর মহিমা ঠিক ঠিক দেখান হবে না। তবে যাই হোক, একথা আমরা মানি যে, সমাজকে অর্থাৎ সমাজের ঘটনাগুলোকে অবলম্বন কোরেই যখন ঐ সকল বিবরণ গড়ে উঠেছে তখন অলৌকিকতা বা রূপক অনেক অনেক বাদ দিলেও ঐতিহাসিকতা ওদের ভেতর পাওয়া যাবেই; একেবারে ওসব ঠাকুরমার ঝুলি বোলে পরিগণিত হবে না।

সঙ্গীতের কাহিনী বল্‌তে গেলে সত্যি আমাদের দুঃখই হয় যে, সঙ্গীতের আমরা কাল্‌চার করি বটে কিন্তু ঠিক ঠিক তার অনুশীলন থেকে বঞ্চিতই আছি। আগেকার মানে প্রতিশাখ্য, শিক্ষা বা নাট্যশাস্ত্রের যুগের কথা না হয় আমরা ছেড়েই দিচ্ছি, কিন্তু এই পুরাণের ভেতরও যে সব যোগসূত্রের ওলট-পালট ও জগা-খিঁচুড়ির ব্যাপার লক্ষ্য করা যায় তাতে দুঃখ কর্‌বারই কথা বটে; অন্ততঃ তাঁরাই করবেন যাঁরা সত্যিকার সঙ্গীতের বিকাশ ও ইতিহাসের হদিশ কিছু কিছু দেখতে চান। মার্কণ্ডেয় পুরাণে সঙ্গীতের আলোচনা আমরা অন্যত্র করেছি।[১] অন্যান্য পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ও হরিবংশ নিয়েও আমাদের আলোচনা কর্‌বার ইচ্ছে আছে এই জন্যে যে, পাণ্ডিত্যের জাহির কর্‌তে নয়, ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে লক্ষ্য কর্‌তে যে, সমাজের বুকের ওপর দিয়ে সঙ্গীতের প্রগতি ছুট্‌তে ছুট্‌তে কি ভাবে বহুমুখী, ভিন্নমুখী ও এলোমেলো হোয়ে গেছে! সত্যিই পরিতাপের বিষয় বৈ কি! সমাজের ভেতর এখন আমাদের সঙ্গীতের জাগরণ অনেক পরিমাণে হয়েছে। শিক্ষিত যাঁরা, সঙ্গীতের ভেতর কিছু আছে কি-না এরকম একটা দেখার কৌতূহলও তাঁদের ভেতর কিছু এসেছে। অনেকে রিসার্চ্চও যে কর্‌ছেন না তা নয়। কিন্তু দুঃখের কথা হোল, তাঁদের ভেতর সঙ্গীতকে মানে সঙ্গীতের বিকাশ ও ইতিহাসকে ঠিক সমগ্রভাবে দেখার মত প্রচেষ্টা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। আমাদের মোট কথা এই — ঐতিহাসিক দৃষ্টির অভাব এখনো দেশে যথেষ্টই রয়েছে।

১ প্রবাসী—অগ্রহায়ণ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

* প্রবন্ধলেখক *"A Survey of Indian Music in Epics"* নাম দিয়া পুরাণে সঙ্গীতের আলোচনা সম্বন্ধে ইংরাজীতে একখানি পুস্তক শীঘ্রই প্রকাশ করিতেছেন।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে মধ্যমখণ্ডে ১৪শ অধ্যায়ের ঠিক ঠিক ১৭শ শ্লোক থেকেই সঙ্গীতের প্রসঙ্গ আরম্ভ হয়েছে। তার আগে দেবর্ষি নারদ সঙ্গীতের ভূমিকা বীণাপাণিকে নিয়ে আরম্ভ করেছেন। শ্রীহরি বিষ্ণু সেখানে শ্রোতা এবং নারদ একমাত্র বক্তা। জায়গায় জায়গায় শুকদেব ও মহাদেবও প্রসঙ্গে যোগ দিয়েছেন।

১৪শ অধ্যায়ের ১৫শ শ্লোকে লক্ষ্য করবার বিষয়—সেখানে বলা হয়েছে: "গানন্তু পরমং ব্রহ্ম।" সেখানে 'গান' কথারই উল্লেখ করা হয়েছে—'সঙ্গীত' শব্দ ব্যবহার করা হয় নি। অবশ্য কেন হয় নি, তার প্রসঙ্গ বা ইতিহাস এখানে আরম্ভ না করাই ভাল। তবে একথা ঠিক যে, 'সঙ্গীত' শব্দটা তখনও অর্থাৎ পুরাণের যুগেও একেবারে চল্‌তি হয় নি। এর পর আবার গান পরমব্রহ্মের আসনেও কৌলীন্য লাভ করেছেন দেখা যায়। শিক্ষাবলী থেকে আরম্ভ কোরে ভরত, দত্তিল এমন কি মতঙ্গও ঠিক এত বড় সম্মান সঙ্গীতকে দিতে পারেন নি। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে লক্ষ্য কর্‌বার প্রধান বিষয় হোল এই, নিম্নলিখিত অভ্যাস বা সাধনগুলি সঙ্গীতের সমাজ ও পদ্ধতিতে বেশ সুসঙ্গত ভাবেই তখন প্রবেশ করেছে। যেমন,

(ক) গান—'ব্রহ্ম' ও অব্যয়।

(খ) "যথাবিধিকৃতং গানং"। এখানে 'যথাবিধি' শব্দে নিয়ম বোঝাচ্ছে। নিয়ম মানে সঙ্গীতে বাঁধাধরা নিয়ম অর্থাৎ শ্রুতি, অলঙ্কার, গমক, তান, মূর্চ্ছনা, তাল, লয় এসব ব্যবহার কর্‌তে হবে। এই নিয়ম আর অনিয়মের ধারা ও যুগ সম্বন্ধে সঙ্গীতের অনুশীলনকারীরা ভালই জানেন। এথেকেই 'মার্গ' ও 'দেশী' ভাগ হয়ে গেছে। সঙ্গীতরত্নাকরের টীকাকার কল্লিনাথ ও রত্নাকরের পরবর্ত্তী গ্রন্থকারেরা এসব নিয়ে যথেষ্ট আলোচনাও করেছেন।

(গ) "স্বরবন্ধবিশেষেণ রসসাক্ষাৎকরী তু সা।" স্বরসম্বলিত হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। শিক্ষাকার নারদ ও যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির সময়ে রস নিয়ে বেশী আলোচনা না হোলেও নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের সময় থেকেই দেখা যায় শৃঙ্গার, হাস্য, রৌদ্র, করুণ ইত্যাদি রস নিয়ে বিচার হোয়ে গেছে। আর পুরাণেও তার উল্লেখ রয়েছে।

(ঘ) 'মূলাধারাদি পদ্ম ও সে সকল পদ্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারা।' বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণকার অবশ্য মূলাধারেরই কেবল নামোল্লেখ করেছেন, আর বলেছেন: "বসেদগ্নিস্তস্মান্নাদোঽভিপদ্যতে॥" অর্থাৎ সেই মূলাধারে অগ্নি রয়েছেন এবং তিনিই 'নাদ' কিনা 'নাদব্রহ্ম'। এর পর 'পঞ্চস্থানানি' বোলে নাভি, হৃদি, কণ্ঠ এদের নাম করা হয়েছে। অর্থাৎ সঙ্গীতে যে নাদই প্রধান এটাই দেখাবার জন্যে নাদের উৎপত্তি-প্রণালীও বর্ণনা করা হয়েছে।

এখানে বিশেষ লক্ষ্য কর্‌বার বিষয় যোগ ও দর্শনের কথা। শিক্ষাকার নারদ, দত্তিল বা ভরত এঁরা দর্শন বা যোগ নিয়ে মোটেই মাথা ঘামান নি। এখানে দেখা যাচ্ছে—সূক্ষ্ম চিন্তার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ধ্যান, যোগ, দর্শন ও মুক্তি—এ সব জটিল প্রশ্নের জাগরণ সঙ্গীত সাধনায়ও এসে দেখা দিয়েছে। নাদ আসলে শব্দ হোলেও দর্শনের যুগে ইনিই আবার মোক্ষদাতা ব্রহ্ম রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। এই নাদ—ব্যক্ত ও অব্যক্ত একথাও বলা হয়েছে। অবশ্য সঙ্গীত-গ্রন্থকারদের ভেতর প্রথম ঠিক ঠিক বল্‌তে গেলে শার্ঙ্গদেবই 'আহত ও অনাহত' এই বোলে নাদের দুটী রূপের বর্ণনা করেছেন। শার্ঙ্গদেবের পরবর্ত্তী সকলেই আবার শার্ঙ্গদেবকেই অনুসরণ করেছেন।

(ঙ) শ্রুতি এখানেও দ্বাবিংশতি: "দয়াবত্যাদয়ঃ"; অর্থাৎ দয়াবতী প্রভৃতি—এই কথাই

বলেছেন। কিন্তু ভরত বা দত্তিলের সঙ্গে শ্রুতির সংখ্যা মিল হোলেও নামে যথেষ্ট তফাৎ আছে। তবে সপ্তস্বরের শ্রুতিবিভাগে নাট্যশাস্ত্রকারের সঙ্গে মিল আছে।

(চ) সপ্তস্বর বা তিন সপ্তক সম্বন্ধে কোন মতভেদ নেই।

(ছ) তারপর গণ্ডগোল হোল যখন বলা হয়েছে: "রাগিণ্যশ্চৈব রাগাশ্চ।" সঙ্গীতে রাগ ও রাগিণীদের আবির্ভাব এখানে পরিষ্কারই দেখা যাচ্ছে। রাগ ও রাগিণীদের নাম দত্তিল বা ভরত কিছু বলেন নি। তবে অনেকে নাকি ভরতের নাট্যশাস্ত্রেও রাগের সন্ধান দিয়ে থাকেন ২৮শ অধ্যায়ের ৩২শ শ্লোকটিতে যেমন: "যস্মিন্ বসতি রাগস্তু" থেকে। কিন্তু এটা মোটেই সমীচীন নয়। কেননা একথা একেবারেই সর্ব্ববাদিসম্মত যে, ভরতের সময়ে জাতি-গানেরই প্রচলন ছিল —রাগ ও রাগিণীদের তখনও নামকরণ ও বিভাগ হয় নি। রাগ ও রাগিণীর আভাস দেন সর্ব্বপ্রথমে বৃহদ্দেশীকার মতঙ্গই। মতঙ্গই বল্‌তে গেলে প্রথমে কি রকম কোরে জাতি থেকে রাগ-রাগিণীদের সৃষ্টি হোল এটা দেখিয়েছেন।

(জ) "আরোহী চাবরোহী চ সঞ্চারী তেন তে ত্রিধা।"—এই 'ত্রিধা' কিনা তিন স্বরের কথা বলেছেন। নাট্যশাস্ত্রে ভরত প্রভৃতি সকলে চার স্বর বলেছেন: আরোহী, অবরোহী, স্থায়ী ও সঞ্চারী। এখানে 'ত্রিধা' থাকায় একটু আশ্চর্য্য হবারই কথা বটে।

(ঝ) রাগ বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের মতে ৬টাই: কামদ, বসন্ত, মল্লার, বিভাষক, গান্ধার ও দীপক। নাট্যশাস্ত্রে এ ছয় রাগের বালাই নেই। অথচ গায়ক-সম্প্রদায়ের ভেতর এখনও চল্‌তি আছে যে, রাগ ও রাগিণী পাওয়া যায় ভরতের মতে, হনুমন্ত মতে, কল্লিনাথের মতে ও সোমেশ্বরের মতে। কিন্তু ভরতের মতে বল্‌তে—কোন্ ভরত? এ সমস্যার মীমাংসা এখনো পর্য্যন্ত হয় নি। নাট্যশাস্ত্রকার ভরত তো (আগেই বলেছি) রাগ-রাগিণীর কোন ভাগ বা নাম করেন নি। তবে বিভিন্ন জায়গায় রক্ষিত সংস্কৃত পুঁথিতে আমরা সঙ্গীতের তালিকায় ৫ জন ভরতের নাম পাই। ৫ জনেরই নাকি আবার সব গ্রন্থ আছে। কিন্তু এক নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের ছাড়া আর কোন বই-ই এখনো পর্য্যন্ত ছাপা হয় নি।[২] সুতরাং কোন্ ভরতের মতে যে রাগ ও তাদের রাগিণী এখনো পর্য্যন্ত সঙ্গীতের সমাজে চলে আস্‌ছে তা নির্দ্ধারিত হয় নি বা কেউ নির্দ্ধারণ করেছেন কিনা এখনো পর্য্যন্ত তা আমাদের জানা নেই।

তারপর ৫ বা ৬ রাগের নাম নিয়েও মতভেদের আর অন্ত নেই। রাগের সংখ্যা ছয়ের চেয়েও আবার কারো কারো মতে বেশী আছে। এক কথায় বলা যায়—যাঁর যেমন খুশী তিনি তেমনি রাগের সংখ্যা বা তাদের উল্লেখ করে গেছেন। একজন যাকে বল্‌ছেন রাগ, আর একজন তাকে বল্‌ছেন রাগিণী। সঙ্গীতের সম্প্রদায় না হয় অনেকই ছিল একথা ধরে নিতে পারি, কিন্তু তাদের ভেতর পরস্পরের আদান-প্রদান কেন যে হোত না তা বোঝা যায় না। আদান প্রদান হলে মনে হয় অত মতভেদের কোন কারণ থাকৃত না।

(ঞ) রাগিণীর সংখ্যা প্রত্যেক রাগেরই ৬টী করে। যেমন কামোদ রাগের স্ত্রী বা রাগিণী হোল: মায়ূরী, তোটিকা, গৌড়ী, বরাড়ী, বিলোলিকা ও ধানশ্রী। এরকম ৬টী আবার কামোদ রাগের স্ত্রীদের দাসী যেমন: বাগীশ্বরী, শারদী, শ্যামা, বৃন্দাবনী, বৈজয়ন্তী ও জয়ন্তী। পরন্তু হোলেন কামোদের নিজের কিঙ্কর। এরকম কোরে আর ৫টী রাগের ৬টী কোরে রাগিণী,

২ ভরতের প্রণীত 'নটসূত্র' নাকি শোনা যায় ছাপা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইনি কোন্ ভরত একথা এখনও জানা যায় নি।

রাগিণীদের ৬টী কোরে দাসী ও রাগের কিঙ্কর আছে। তবে বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের এ রাগ, রাগিণী, দাসী ও কিঙ্করদের নাম ও বর্ণনা অন্য সকলের সঙ্গে প্রায় মেলে না।

(ট) এখানে রাগ-রাগিণীদের ধ্যানের উল্লেখও দেখা যায়। বিকাশের একটা ক্রমবিবর্দ্ধমান স্তরের ভেতর দিয়ে যদি সঙ্গীতের প্রত্যেক জিনিসটাই বিকশিত হোতে থাকে তা হোলে তাদের ভেতর একটা নিয়ম-শৃঙ্খলা অবশ্যই পাওয়া যাবে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই পুরাণগুলিতেও বিশেষ কোরে বৃহদ্ধর্ম্মে তার ব্যতিক্রমই দেখা যায়। ধ্যানের কোন হদিশই নাট্যশাস্ত্র থেকে মায় রত্নাকর, রাগবিবোধ, পারিজাত বা নারায়ণ কোনটারই ভেতর পাওয়া যায় নি। সঙ্গীতদর্পণই এদিক দিয়ে বলা যায় প্রথম। কিন্তু বৃহদ্ধর্ম্মে আমরা দেখি আবার গান্ধার রাগের ধ্যান দেওয়া হয়েছে। গান্ধাররাগ মহাদেবের আহ্বানে আবির্ভূত হলেন আর তাঁর অঙ্গের কান্তি হোল :

"লসৎসুহেমাভরণং সমুজ্জ্বল-
নবাম্বুদাভাসমপূর্ব্বসুন্দরম্।
গৃহীতপীতাম্বরপঙ্কজদ্বয়ম্।"

অর্থাৎ 'শরীর মনোহর ও হেমাভরণভূষিত কটিদেশে পীতবাস ও দুহাতে দুটী পদ্ম। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরম রমণীয় ও শরীরের কান্তি নবঘনবৎ শ্যামল।' এখানে গান্ধার রাগের আসন কল্পনা করা হয়েছে 'স্বর্ণাসন'।

এরকম সমস্ত রাগ-রাগিণীদেরই ধ্যান যে ছিল এটা বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণকারের অভিপ্রায় ধরে নেওয়া যায়। কারণ গান্ধারের পর মহাদেব শ্রীহরি বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে আবার শ্রী-রাগিণীর গান করেছিলেন এবং সেখানে শ্রী-রাগিণীরও ধ্যান দেওয়া আছে।

আধ্যাত্মিকতার আবশ্যকতা অবশ্য সব জিনিসেই আছে ও থাকা উচিত; আর এটা আমরা অস্বীকারও করি না; কিন্তু দুঃখের কথা হয় সেখানে যেখানে ধ্যান রূপক ও ভাবাবেশের প্রভাব ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী ও বিকাশের যোগসূত্রকে একেবারে অতিক্রম করে যায়। প্রত্যেক জিনিসের জন্মান, বাড়া বা প্রসারের এক একটা দিনপঞ্জিকা আছেই। সকল জিনিসেরই জাগতিক ও আধ্যাত্মিক দুটো দিক আছে এটাও স্বীকার করতে হবে। কিন্তু জাগতিকের অস্তিত্বকে আগে মেনে নিয়ে তার পরে আধ্যাত্মিকের কল্পনা করা সমীচীন। সঙ্গীতের বেলায়ও তাই। তার বিকাশ কলা বা বিদ্যা হিসাবে স্বর ও শ্রুতিকে অবলম্বন কোরেই প্রথমে হয়েছিল এবং সে সবের নজিরও আছে শিক্ষা, নাট্যশাস্ত্র, বৃহদ্দেশী, রাগবিবোধ ও পারিজাত প্রভৃতিতে। ঐতিহাসিক বা স্বাভাবিক বিকাশের স্তরই হোল প্রথমে Realistic থেকে Idealistic-এ ও তারপর Monistic ও Transcendental-এ; অর্থাৎ স্থূল—সূক্ষ্ম—কারণ ও কারণের পর মহাকারণে। প্রত্যেক জিনিসের বিকাশে ক্রমিক স্তরকে অস্বীকার করা মোটেই যায় না। সঙ্গীতেও সেটাই মেনে নিতে হবে। ধ্যান বা রূপকল্পনা অনেক পরের যুগেই হয়েছিল। সূক্ষ্মাভিমুখী মানুষের মন শুধু স্থূল বা জড়কে নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে না পেরে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মাতীত তত্ত্বের দিকেই ক্রমশঃ অগ্রসর হয়েছিল। এখনো তাই। কাজেই সঙ্গীতে স্বর, শ্রুতি, অলঙ্কার ও মূর্চ্ছনা এইভাবে আরম্ভ করে সাধকের মন ক্রমশঃ নাদব্রহ্মে ও রাগ-রাগিণীদের ধ্যানের আনন্দে ডুবে যাওয়ায় কোন অস্বাভাবিকতা নেই।

এই বৃহদ্ধর্ম্মেই আছে যে নারদ ঠিক বিধিমত রাগ-রাগিণীদের আলাপ না করার জন্যে "কশ্চিৎ স্থানপরিভ্রষ্টঃ খঞ্জঃ পথি রুক্ষা স্থিতঃ। কশ্চিৎ কাণো ভিন্নবর্ণঃ কশ্চিদ্রাগোঽপি বিহ্বলঃ॥" অর্থাৎ রাগ-রাগিণীদের ভেতর কেহ

স্থানভ্রষ্ট, কেহ খঞ্জ, কেহ কেহ রোগগ্রস্ত, বিবর্ণ ও বিহ্বল হয়েছিল। রাগ-রাগিণীদের ওপর নারদের এই অবিচার দেখে দেবী সরস্বতী আর স্থির থাকৃতে পারলেন না; তিনি 'বস্ত্রাঞ্চলে লজ্জায় মুখমণ্ডল আবৃত কোরে' হাস্‌তে লাগলেন। তারপর নারায়ণের কৃপায় নারদ আবার রাগ-রাগিণীদের সদ্‌গতি করেছিলেন।

পুনরায় বলা হয়েছে যে, মহাদেবের গানে নারায়ণ দ্রবীভূত হোয়ে গেলেন এবং তা থেকে গঙ্গার উৎপত্তি হোল: "তদা নীরময়ী গঙ্গা বভূব পাপনাশিনী।" গঙ্গাকে জলময়ী দেখে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা অমনি "কমণ্ডলৌ তদা ব্রহ্মা নিহিতং ব্রহ্ম-দুর্লভম্;" অর্থাৎ ব্রহ্মা ব্রহ্মবারি গঙ্গাকে নিজের কমণ্ডলুর মধ্যে রক্ষা করেছিলেন।

কাহিনী দুটীর ঐতিহাসিকতা অবশ্য আমরা মেনে নিতে রাজী নই। এখানে 'আদিত্যো বৈ যূপঃ"--আদিত্য অর্থাৎ সূর্য্যই যূপ, আদিত্যকে পরবর্ত্তী শাস্ত্রকারেরা যেমন অর্থবাদ বোলেই ধরে নিয়েছিলেন।[৩] এখানে গল্প দুটীর বেলায়ও আমরা বল্‌ব—সঙ্গীতের প্রশংসা ও মাহাত্ম্য দেখাবার জন্যেই কাহিনী দুটীর অবতারণা করা হয়েছে মাত্র।

৩ তবে বৈদিক গবেষণাকারীরা আজকালকার দিনে আবার "আদিত্যো বৈ যূপঃ"—কথার ভেতর আদিত্যকে ঠিক অর্থবাদ বা প্রশংসাসূচক বল্‌তে রাজী নন। যূপের ধারণা বৈদিক যুগে আদিত্য বা সূর্য্য থেকেই কল্পিত হোয়েছিল; পরবর্ত্তী কালের সমাজ তার হদিশ ভুলেই গিছলো বল্‌তে হবে।

স্বভাব কারখানা

অধ্যাপক শ্রীসুবর্ণকমল রায়, এম্‌-এস্‌সি

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে একটি বিরাট রাসায়নিক কারখানা তাহা কাহারও অস্বীকার করার উপায় নাই। যতই ইহার পিছনে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি ততই সর্ব্বত্র রাসায়নিকের লীলা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। উদ্ভিদ-জগৎ জৈব রসায়নের এক বৈচিত্র্যময় সৃষ্টি। এই রসায়নের অনুগ্রহে মানুষ আজ অনেকগুলি স্বভাবজাত পদার্থ গবেষণাগারে তৈরী করিতে সক্ষম হইয়াছে। তন্মধ্যে নীল, মঞ্জিষ্ঠা, কর্পূর, রবার, কুইনাইন ইত্যাদি প্রধান। এই প্রস্তুতির ব্যাপারে দুইএর মধ্যে পার্থক্য দৃষ্ট হয়। আমাদের কারখানাগুলি যেন অস্বাভাবিক শক্তি, উৎসাহ ও কর্ম্মতৎপরতার পরিচয় দিয়া থাকে। স্বভাবসুন্দর স্নিগ্ধতা, সমতা ও শান্তি সেখানে নাই। একটি রাসায়নিক কারখানায় প্রবেশ করিলেই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমাদের বোধগম্য হয়। রসায়নের সঙ্গে পদার্থবিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্র প্রভৃতি জোট পাকাইয়া এক বিরাট কর্ম্মযজ্ঞের সূচনা করে। মানুষগুলিও যেন যন্ত্রের সঙ্গে মিশিয়া প্রত্যেকে এক একটি যন্ত্রবিশেষ হইয়া উঠে। কখনও বিপুল তাপ, কখনও বিপুল চাপ, ঘূর্ণমান রাশি রাশি যন্ত্রের ভীম রব হয় বিজ্ঞানীর চিরসঙ্গী। মৌলিক-গুলি যেন তাপ, চাপ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার প্রক্রিয়ায় দিশাহারা হইয়া রাসায়নিকের হাতে আত্মসমর্পন করে। অঙ্গার, হাইড্রোজেন, পরমাণুগুলি রবারের কারখানায় রবাররূপ ধারণ করিয়া থাকে। অঙ্গার, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও

নাইট্রোজেনগুলি নীলের কারখানায় নীলবর্ণ গ্রহণ করে। অবশ্য প্রত্যেকটি নিজস্ব উপাদান ও পদ্ধতিতে তৈরী হয়। ইহাই আমাদের বর্ত্তমান কারখানার পরিচয়।

স্বভাব কারখানায় কিরূপ কাজ সাধিত হয় তাহার আভ্যন্তর খবর আমরা কমই জানি। সেখানেও বিরাট কাজের আয়োজন আছে। কিন্তু প্রাকৃতিক কারখানায় হৈ চৈ নাই। সেখানে তাপের প্রাখর্য্য নাই, স্নিগ্ধতা আছে, চাপের প্রাবল্য নাই, সহজতা আছে। গাছপালা আমাদের জন্য শর্করা তৈয়ার করে। কারখানার অভ্যন্তরবর্ত্তী বিস্তারিত পরিচয় না জানিলেও যে সামান্য রহস্য আমাদের বুদ্ধিগোচর হইয়াছে তাহাতেই আমাদিগকে মুগ্ধ ও পরিতৃপ্ত করিয়া ফেলে। প্রাকৃতিক রাজ্যে শর্করা ও শ্বেতসার তৈয়ার হয় অঙ্গার ও জলবাষ্পের রাসায়নিক সহ-যোগিতায়। ব্যোমচারী স্বচ্ছন্দ নৃত্যপরায়ণ অঙ্গার গ্যাস (Carbon dioxide) ধরাস্থ অম্বুরাশির সঙ্গে যোগসাধন করিয়া তপনতাপে উদ্বুদ্ধ হইয়া গাছপালার সবুজ বর্ণের (Chlorophyll) মধ্যস্থতায় যে সুন্দর মধুর শর্করা ও শ্বেতসার তৈয়ার করিতেছে তাহা নিশ্চয়ই একটি পরিপূর্ণ কিন্তু অপরিস্ফুট রাসায়নিক কারখানার পরিচয়। এই কারখানা হইতে মক্ষিকা মধুরূপ শর্করা আহরণ করে। এই কারখানা হইতেই সাধারণ মানুষ ইক্ষুরসরূপ অতি উপাদেয় খাদ্য পাইয়া থাকে। কারখানার মালিক যিনিই হউন, কাজটী সমাধা করেন অতি সঙ্গোপনে। এ সৃষ্টির পেছনে একটী শান্ত সমাহিত ভাবধারা বিরাজ করে। সূর্য্যদেবের অনাবিল শক্তিপুঞ্জকে শৃঙ্খলিত করিয়া সহজ সুষ্ঠুভাবে মেসিনবাদের মধ্যে পরিবেষণে যে কারখানার সূত্রপাত হইয়াছে তাহা নিশ্চয়ই অতীব মহান্ আদর্শস্থানীয়। এ হেন কারখানার গঠন-ভঙ্গি ও বিধি-ব্যবস্থা যদি আমরা পণ্ডিতম্মন্যগণ জানিতে পারি, তবে সম্ভবতঃ আমাদের সমাজের বর্ত্তমান সমররূপ তাণ্ডবলীলার অবসান হয়। সে দিন কবে আসিবে জানি না। মানুষ যেন ধীরে, অতি ধীরে সেই মহান্ শক্তির সঙ্কেতধ্বনি শুনিতে পাইতেছে।

দার্শনিক চিন্তিত, এ কোন্ রাসায়নিক খেলা? প্রকৃতির সবুজ ভাণ্ডে কে এই মনোরম ফল সাজাইয়া রাখিল? বিজ্ঞানী অনুসন্ধানে রত হইলেন। অসীম ধৈর্য্যের সঙ্গে তিনি ইহার পিছনে ছুটিলেন। আজ পর্য্যন্ত প্রকৃত চাবি-কাঠিটি তাঁহাদের হস্তগত না হইলেও কতকটা আলোর সন্ধান যে তাঁহারা পাইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। জল-বাষ্প ও অঙ্গার গ্যাস সূর্য্যতাপের মধ্যস্থতায় ফরম্যাল্‌ডিহাইড (Formaldehyde) নামে একটি রাসায়নিক পদার্থ পাইয়া থাকে। রাসায়নিক সত্য সত্যই ঐ ফারম্যালডিহাইডকে উদ্ধার করিয়াছেন। এই পদার্থটিই যে ক্রমশঃ শর্করারূপ পরিগ্রহ করে তাহাও তাঁহারা প্রমাণ করিয়াছেন। সম্পূর্ণ রাসায়নিক প্রক্রিয়াটি পরিস্ফুট হইয়া উঠে নাই, একটি অন্ধকার বা ধূম্রজালের বেষ্টনী যেন সবটা পরিবেষ্টন করিয়া আছে। মনে হয় যেন ব্যাপারটি অতি সহজ—অঙ্গার গ্যাস, বাষ্প ও সূর্য্যতাপের কোলাকুলি। ক্লোরোফিন একটি নিমিত্ত (Catalyst) মাত্র। এ চতুর রস-রাজ কে? তাঁহার সঙ্কেতটি কি? ব্যবসার গূঢ় রহস্য (trade secret) তিনি কি আগ্‌-লাইয়া থাকিবেন? সত্যই এইটি যেদিন ধরা পড়িবে সেদিন যন্ত্রদৈত্যের তাণ্ডবনৃত্য হইতে আমরা রক্ষা পাইব। স্বভাব কারিগরের মত রাসায়নিক তাহার নিত্যকার শর্করা রচনা করিবেন। সভ্যতার বরপুত্র মানুষ তখন ফিরিয়া পাইবে তাহার সহজ, সরল সমাহিত জীবন। এই নবজাগরণের বিপর্য্যয় ভাঙ্গিয়া গিয়া আবার ফুটিয়া উঠিবে সেই শিবসুন্দর ধ্যানমগ্ন রূপ। কর্ম্মস্রোত একবিন্দু হ্রাস পাইবে না, কেবলমাত্র নীরব বিশ্বকর্ম্মার সুরের সঙ্গে আমরাও সুর মিলাইয়া দিব। অজানার সঙ্গে জানার যোগসাধন হইবে।

ত্রিধর্ম

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার, আই-সি-এস্

প্রজাপতির চরণতলে
জানাইয়া নতি
দেব্‌তা মানুষ অসুর কহেন
"তোমারি সন্ততি
আমরা সবাই ব্রহ্মচর্যে
শুদ্ধ করি চিত
তোমার কাছে দীক্ষা নিতে
আসিয়াছি পিতঃ।"
প্রজাপতি সস্নেহে কন
দেবতাদের কানে—
"দ-অক্ষরে দীক্ষা দিলাম
বুঝলে কিছু মানে?"
দেব্‌তা বলেন, "আত্মদমন?
তাতেই হব ব্রতী?"
"ঠিক বুঝেছ, ব্রতী হ'য়ো",
বলেন প্রজাপতি।

মানুষেরেও সেই কথাটি
কহেন কানে কানে—
"দ-অক্ষরে দীক্ষা দিনু,
বুঝলে ইহার মানে?"
মানুষ বলেন, "দান করা চাই?
তাহাতে সদ্গতি?"
"ঠিক বুঝেছ বৎস আমার,"
কহেন প্রজাপতি।

অসুরে ডাক দিয়ে শেষে
বলেন তাহার কানে,
"দ-অক্ষরেই দীক্ষা তোমার,
বুঝেছো তো মানে?"
অসুর কহেন, "দয়া করা?—
দীক্ষা কঠিন অতি।"
"ঠিক বুঝেছ, দয়া কোরো",
কহেন প্রজাপতি।

দেব্‌তা কিছু ভোগবিলাসী,
সংযমই তাঁর ব্রত,
মানুষ লোভী, লোভ জিনিতে
দানেতে হোক্ রত।
অসুর কিছু কুটিলস্বভাব,
নেই কো দয়া-মায়া,
তাহার তরে শ্রেষ্ঠ সাধন
দুঃস্থ জনে দয়া।

দেব্‌তা মানুষ অসুর বলে
ভিন্ন প্রাণী নাই,
মানুষই সব তিন স্বভাবের
দেখতে মোরা পাই।
তিন স্বভাবের কম বেশি গুণ
প্রতিজনেই আছে,
দেব্‌তা মানুষ অসুর রাজেন
প্রতিহিয়ার মাঝে।
সবার তরে তাই তো সদাই
এ তিন বিধান রবে—
'দমন করো, দান করো হে,
দয়া কর সবে।'

আজিও সেই দৈববাণী
দ-দ-দ-গর্জনে
মেঘের গরজনের রূপে
বলছে জনে জনে—
'দমন করো, দান করো হে,
দয়া করো সবে।'—
বিপুল বাণীর প্রতিধ্বনি
বাজছে নভে নভে॥

ভারতীয় নারীর ভবিষ্যৎ শিক্ষা

ভগিনী নিবেদিতা

অনুবাদিকা—শ্রীমতী বেলারাণী দে, এম্-এ

আধুনিক যুগের মন বিজ্ঞান, পুরাতত্ত্ব ও ভূগোলবিদ্যা এই তিনটি পরিধির মধ্যে বিচরণ করে এবং ইহাদের সাহায্যে সকল প্রকার চিন্তাধারাকে উপলব্ধি করিতে চেষ্টিত হয়। সুতরাং বর্ত্তমান ভারতের কর্ম্মপ্রচেষ্টা জাতীয়তা-বোধকে কেন্দ্র করিয়া অগ্রসর হইতেছে। এই জাতীয়তা-বোধকে আমাদের বিভিন্ন প্রথা, জাতি, ভাষা ও অন্যান্য উপাদানে গঠিত স্বজাতির ইতিহাস অধ্যয়নের ফল বলিয়া মনে করিতে হইবে। সেই ভাবে আমাদের নগরগুলির অবস্থিতি ও যুগে যুগে তাহাদের পরিবর্ত্তনের কাহিনী পাঠ করিয়া আমাদের পৌর চেতনা জাগরিত করা আবশ্যক।

আবার কোন একটি জাতিকে কেবলমাত্র তাহার অতীতের এবং নিজস্ব পরিস্থিতির সহিত বিচার করিলেই চলিবে না, অন্যান্য জাতির সহিতও তাহাকে তুলনা করিতে হইবে। এই স্থানে আমাদের ভৌগোলিক জ্ঞানের আবশ্যকতা আসিয়া পড়িতেছে। তাহার পর ইতিহাসকে ভৌগোলিক আলোকে ও ভূগোলকে ঐতিহাসিক আলোকে অধ্যয়ন করিতে হইবে। আদর্শ আধুনিক নারীর গৌরব ও মর্য্যাদার বৃহত্তর অংশ তাঁহার এই জ্ঞানের উপর নির্ভর করিবে। তাঁহার গৃহ যেন তারকার আলোকে উজ্জ্বল বিশ্বের পটভূমিকায় একরাত্রির জন্য প্রোথিত তাঁবুস্বরূপ। প্রতিটি গতিশীল মুহূর্ত্ত যেন অনন্ত কাল-স্রোতের একটি বিন্দুমাত্র। তাঁহার আয়ত্তের মধ্য দিয়াই সেটি যেন বাধাহীন ভাবে চলিয়া যাইতেছে এবং তিনি ইচ্ছামত সেটিকে শান্তি অথবা দুঃখ বিধানের জন্য ব্যবহার করিতে পারেন। এই জাতীয় মনোবৃত্তির অন্তরালে রহিয়াছে কঠিন মানসিক অনুশীলন। ব্যক্তিগত সময়ের সহিত স্থান কালের যে আনুগতিক সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহা বর্ত্তমান ভাবের পক্ষে যথোপযুক্ত নহে। উপরন্তু আধুনিক মন তথ্য এবং তাহার সহিত সত্য ও বিজ্ঞানের সম্বন্ধ জানিতে চায়। অন্যান্য যুগে প্রচলিত সত্যের ধারণা হইতে এই বিশেষ সত্যের রূপটী সম্ভবতঃ অধিক অভ্রান্ত নহে। কিন্তু ইহাই যুগের বৈশিষ্ট্য এবং বর্ত্তমান বিশ্বসংগ্রামে যাঁহারা উত্তীর্ণ হইবেন তাঁহাদের এই সত্য উপলব্ধি করিতে হইবে। তথাপি এই বহুবাঞ্ছিত নির্দ্ধারিত সত্য অসীম ও সুবিস্তৃত ভাবধারার ক্ষুদ্র অংশ মাত্র—সেই ভাবধারার মধ্যে বিবর্ত্তন ও বিজ্ঞানের বিভাগীকরণ ইতিহাসের ও ভূগোলের কার্য্য করিয়া থাকে।

প্রকৃতি, পৃথিবী এবং কাল এই তিনটি প্রতীকের সাহায্যে আধুনিক মন নিজের স্বরূপ জানিতে পারে। শিক্ষার সাহায্যে ইহাদের সম্পূর্ণ ব্যবহার করিবার পন্থা মানুষ এখনও আবিষ্কার করিতে পারে নাই। ব্যক্তিগত সত্তা ইহাদেরই স্বরূপ নির্ণয় করিবার সংগ্রামভূমি। প্রত্যেক শিক্ষাকেন্দ্রে এই প্রচেষ্টাকে মতবাদে রূপান্তরিত করিবার প্রয়াস নিহিত রহিয়াছে। যাঁহারা ভারতীয় নারীর নিকট বর্ত্তমান ভাবধারা বহন করিবার

ভার গ্রহণ করিবেন তাঁহাদের যে ভাবে ইচ্ছা কাজ আরম্ভ করিয়া নিজেদের জীবনযুদ্ধে উদ্দেশ্য সাধনের শ্রেষ্ঠতর উপায় শিক্ষা করা উচিত। ভাবটি একবার গ্রহণ করিতে পারিলে পরিশেষে ভারতীয় নারীরাই একজন অপরকে শিক্ষা দিতে পারিবে। মধ্যবর্ত্তী সময়টিতে সকল গ্রহণযোগ্য উপায়ই অবলম্বন করা উচিত। ভ্রাম্যমাণ ভাগবত-ব্যাখ্যা অথবা কথকতা বা ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে বিভিন্ন তীর্থস্থানের দৃশ্যপট দেখাইয়া ভূগোলবিদ্যাকে জনপ্রিয় করিতে পারা যায়; এই উপায়েই রামায়ণ ও মহাভারতের বহির্ভূত ইতিহাস সম্বন্ধে লোকের পরিচয় ঘটান যাইতে পারে। এই ভ্রাম্যমাণ শিক্ষকদের দ্বারা সমবেত জনতা এবং পর্দ্দার অন্তরালে মহিলাদের সম্মুখে শরীররক্ষা ও স্বাস্থ্যবিধান এবং চারিপাশের জীবজন্তু, বৃক্ষলতার সম্বন্ধে সরল বক্তৃতা দেওয়া যাইতে পারে। কেবলমাত্র ছায়াচিত্রই ভাব, চিত্র ও মাতৃভাষাকে একত্রে সর্ব্বপ্রথম বাস্তবে রূপায়িত করিবার যন্ত্রবিশেষ। স্বদেশপ্রেম প্রচার করিবার পূর্ব্বে যে দেশকে ভালবাসিতে হইবে সে সম্বন্ধে আমাদের ধারণা হওয়া প্রয়োজন। যে বিষয়ে তাহারা কল্পনা করিতে পারে না সে সম্বন্ধে নারীসমাজ কি ভাবে উৎসাহিত হইতে পারিবে ?

কোন কঠিন সমস্যার সমাধান করিতে হইলে ছোট বড় বিদ্যালয়, গৃহের মধ্যে ও বাহিরের শিক্ষাকেন্দ্র, প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষালয় সবগুলিই একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু এইগুলি ভারতীয় শিক্ষাধারার অনুযায়ী হওয়া উচিত; তাহার বিপরীত হওয়া কখনও উচিত নহে। মনকে বিদ্যালয় ও গৃহ দুইটী বিরুদ্ধ জগতের মধ্যে সংস্থাপিত করিলে তাহা বিনষ্ট হইতে বাধ্য। গৃহশিক্ষার আদর্শকে নীতিগতভাবে সমর্থন করাই বিদ্যালয়ের চরম উদ্দেশ্য এবং গৃহে, বিদ্যালয়ে অধীত বিষয়কে শ্রেষ্ঠস্থান দান করা উচিত। এই সংস্কার কোনরূপ ব্যতিক্রম নারীসমাজের গভীর অজ্ঞতারই পরিচায়ক হইবে।

বালকদের মত বালিকাদের জীবনের পক্ষেও বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে অপরিহার্য্য করিয়া তুলিবার মধ্যে আমরা এমন কিছু প্রতিষ্ঠা করিতে যাইতেছি যাহা কখনও অস্বীকৃত হইবে না। প্রত্যেক যুগকেই তাহার উত্তরকালের বিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতির বিরাট সমস্যার দায়িত্বকে বহন করিতে হইবে। ইহা মানবসমাজের একটি চিরন্তন ও স্বাভাবিক কার্য্য। কিন্তু বর্ত্তমানে স্ত্রীশিক্ষা-সমস্যার অধিকাংশই সময়ের অসুবিধার উপর নির্ভর করিতেছে। আমাদের দেশকে প্রচণ্ড পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়াই লইয়া যাইতে হইবে। একবার আধুনিক যুগ-চেতনার মূল বিষয়টি আমাদের ভারতীয় মাতৃভাষা-গুলির মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইলে সকল সমস্যার অবসান ঘটিবে। কারণ বিদ্যালয় বা শিক্ষকদের অপেক্ষা আমরা মাতৃভাষা হইতে অধিক শিক্ষা লাভ করিতে পারিব। সেই গৌরবময় দিনকে আনিবার জন্য মহামাতৃকা স্বয়ং বিরাট আধ্যাত্মিক বীরদিগের শপথ ও সেবাকে আহ্বান করিতেছেন। নারীজাতির মধ্যে শিক্ষা সুচারুরূপে ও সুগভীর ভাবে প্রবিষ্ট হওয়ার জন্য শত শত যুবকের সংঘবদ্ধ হইবার প্রয়োজন। সম্ভবতঃ অধিকাংশ ছাত্রই ছুটীর সময় বৎসরে বারটি করিয়া পাঠ তাহাদের নিজ নিজ গৃহে ও গ্রামে শিখাইবার জন্য প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইতে পারেন। এই জাতীয় প্রচেষ্টা মোটেই আয়াসলব্ধ নহে, অথচ ইহার দ্বারা কত পরিমাণ কাজ করা যাইতে পারে !

মাতৃভাষার সাহিত্যকে গঠন করিবার কার্য্যে অনেকে আত্মনিয়োগ করিতে পারেন; যে সকল অজ্ঞাত স্থানে শিক্ষকের পদচিহ্ন কখনও পড়িতে পারে না সেখানে পুস্তকাদি ও সাময়িক পত্রিকাগুলি যাহাতে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে

পারে তাহার চেষ্টা করিতে পারেন। পাঠাগার বা গ্রন্থসমূহকে মূক বিশ্ববিদ্যালয় বলা যাইতে পারে। বুদ্ধ বা অশোক, চন্দ্রগুপ্ত বা আকবর সম্বন্ধে জানিতে হইলে যদি বিদেশী ভাষাই প্রথমে আয়ত্ত করিয়া লইতে হয় তাহা হইলে ভারতীয় মহিলারা ভারতের ইতিহাস কেমন করিয়া বুঝিবেন? আপনাদের উচ্চ আশা গোপনে রাখিয়া যাঁহারা নারী ও জনগণের নিকট আধুনিক জ্ঞানের বার্তা বহন করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা ভবিষ্যতে গৌরবের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিবেন।

নারীসমাজের পক্ষ হইতে প্রথম যুগে পুরুষদেরই এই কার্য্যে অগ্রগামী হইতে হইবে বলিয়া অনেকে হয়ত তাঁহাদের এই মহানুভবতা এবং নিষ্ঠার সম্ভাবনাকে উপহাস করিবেন। যাঁহারা ভারতীয়দের গভীর ভাবে জানেন তাঁহারা এই অশ্রদ্ধা প্রদর্শন অনুমোদন করিতে পারেন না। ভারতের সামাজিক জীবনের ভিত্তি সুদৃঢ়। এখানকার সভ্যতা ক্রমোন্নতি-পূর্ণ, সমষ্টিগত, আধ্যাত্মিক ও পরার্থপর। জনৈক ভারতীয়, রামমোহন রায়ের অনুপ্রেরণাতেই সতীদাহ প্রথা রহিত হইয়াছিল। আবার এক বিবাহকে আদর্শ বিবাহ বলিয়া প্রচলন করিবার কালে বাংলার বিদ্যাসাগরের নিকট হইতেই প্রথম উৎসাহ আসিয়াছিল। প্রাচ্যে অন্তরের কোন স্বার্থপ্রসূত আন্দোলন দ্বারা মহৎ সংস্কার ও সুখসুবিধার প্রসার সাধিত হয় না। বিপক্ষদল স্বতঃপ্রবৃত্ত ও মহাপ্রাণতায় অনুপ্রাণিত হইয়া অধিকার দান করিয়া থাকে। অথবা যদি কোন নারী কোন তীব্র প্রয়োজনের তাড়না অনুভব করিয়া কোন অন্যায়ের সংশোধন দাবী করেন তিনি কি নর ও নারী উভয়ের মাতৃস্থানীয়া হন না? তিনি কি পুত্রকে যে ব্রতে নিয়োজিত করিতে চান সেই বিষয়ে শৈশবেই তাহাকে অনুপ্রাণিত করিতে পারেন না? এই ভাবে তিনি কি তাঁহার দুর্ব্বল হস্ত যে অস্ত্র চালনা করিতে সক্ষম তাহা অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী অস্ত্র শাণিত করিতে পারেন না? বিদ্যাসাগর-জননী এই শ্রেণীর নারী ছিলেন এবং এই জাতীয় উৎসাহই তাঁহাকে নারীসমাজের পৃষ্ঠপোষক করিয়াছিল।

যে সমস্যা লইয়া আমরা আলোচনা করিতেছি তাহার ভার বর্ত্তমান শতাব্দী যে সকল নবীন বিদ্যার পূজারীগণের হস্তে অর্পণ করিতে চান তাঁহাদের প্রতি একটি সতর্ক ও নির্দ্দেশ-বাণী আছে। সমালোচনা ও নিরুৎসাহ দ্বারা কখনও শিক্ষা বিস্তার সম্ভব হয় না। যিনি শিক্ষার্থীর মধ্যে মহান্ বস্তুর সন্ধান পান একমাত্র তিনিই যোগ্য শিক্ষক হইতে পারেন। কেবল মাত্র ভারতীয় জীবনের মহত্ত্বের দ্বারাই আমরা ভারত-বহির্ভূত জগতের মহত্ত্বের আভাস দিতে পারি। স্বদেশবাসীকে ভালবাসিয়াই আমরা মানবপ্রেম শিখিতে পারি। ভারতীয় নারীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে গভীর আস্থাই আমাদের সেই ভাবী যুগের অভ্যুদয়ের যোগ্য করিয়া তুলিবে। যে নারী স্বীয় জীবনে সমগ্র ভারতের অতীত গৌরব হৃদয়ঙ্গম করেন তাঁহারই কল্পনার আশাপথে নবীন বিদ্যার প্রচারককে উৎসর্গ করা হউক। সেই প্রচারক আশা করুন ও একান্তভাবে প্রার্থনা করুন যেন আমাদের এই যুগেই সমস্ত গ্রামে গ্রামে গান্ধারীর মত মহীয়সী, সাবিত্রীর মত পতিপরায়ণা, সাহসিনী, সীতার মত শুদ্ধমতি ও কোমলপ্রাণা রমণী আমরা দেখিতে পাই। ভবিষ্যতের পদতলে অতীত যেন পক্ষস্বরূপ হইয়া বিরাজ করে। অতীতের সাফল্য অনাগত সাফল্যের ধাপস্বরূপ হউক। প্রত্যেক ভারতীয় নারীই যেন আমাদের নিকট সেই মহামাতৃকার সত্তা লইয়া এবং মূর্ত্তিমতী জন্মভূমির কৃষ্টি ও স্বদেশ-রক্ষয়িত্রীরূপে আবির্ভূতা হন। ভূম্যা দেবী! গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী! বন্দে মাতরম্।

শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী

[১৯০৮।১৫ই আগষ্ট—১৯০৯।১৪ই আগষ্ট]

(তৃতীয়াংশ)

অরবিন্দের পক্ষসমর্থনে মিঃ সি আর দাশ—নরেন গোঁসাইর হত্যার পর, এবং কানাই ও সত্যেনের ফাঁসির কিছু পূর্ব্বে, মিঃ সি আর দাশ আলিপুরে মিঃ বীচ্‌ক্রফ্‌টের সেশন কোর্টে অরবিন্দের পক্ষ সমর্থনের জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। এ-সম্বন্ধে উত্তরপাড়া বক্তৃতায় অরবিন্দ যাহা বলিয়াছেন তাহা তুলিয়া দিতেছি—

Afterwards when the trial opened in the Sessions Court, I began to write many instructions for my Counsel as to what was false in the evidence against me and on what points the witnesses might be cross-examined. Then something happened which I had not expected. The arrangements which had been made for my defence were suddenly changed and another Counsel stood there to defend me. He came unexpectedly,—a friend of mine, but I did not know that he was coming. You have all heard the name of the man who put away from him all other thoughts and abandoned all his practices, who sat up half the night day after day for months and broke his health to save me,—Srijut Chittaranjan Das. When I saw him, I was satisfied; but I still thought it necessary to write instructions. Then all that was put from me and I had the message from within, "This is the man who will save you from the snares put around your feet. Put aside those papers. It is not you who will instruct him. I will instruct him." From that time I did not of myself speak a word to my Counsel about the case or give a single instruction, and if ever I was asked a question, I always found that my answer did not help the case. I had left it to him and he took it entirely into his hands with what results you know."—(Speeches of Aurobindo Ghose: Uttarpara Speech, pp. 58-59)

মিঃ সি আর দাশ সম্পর্কে অরবিন্দের কতদূর গভীর বিশ্বাস ছিল তাহা তাঁহার এই উক্তি হইতেই বুঝা যায়।

মিঃ সি আর দাশ আদালতকে স্পষ্ট বলিলেন যে, অরবিন্দ তাঁহার দেশের জন্য, জাতির জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা চাহিয়াছেন। এবং এই পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ তাঁহার লেখায় ও বক্তৃতায় প্রচার করিয়াছেন। ইহাতে যদি কোন অপরাধ হইয়া থাকে, তবে সেই অপরাধের চরম শাস্তি নিতে তিনি প্রস্তুত আছেন। মিঃ সি আর দাশ আদালতকে বলিলেন :

"If it is suggested that I preached the ideal of freedom, to my country which is against the law, I plead guilty to the charge. If that is the law here, I say I

have done that and I request you to convict me...If it is an offence to preach the ideal of freedom, I admit having done it,—I have never disputed it. It is for that that I have given up all the prospects of my life. It is for that, that I came to Calcutta to live for it and to labour for it. It has been the one thought of my waking hours, the dream of my sleep. If that is my offence, there is no necessity to bring witness into the box to depose to different things in connection with that. Here am I and I admit it. If that is my offence, let it be so stated and I am cheerful to bear any punishment. ..I felt I was called upon to preach to my country to make them realise that India had a mission to perform in the comity of Nations. If that is my fault, you can chain me, imprison me but you will never get out of me a denial of that charge. I venture to submit under no section of the law do I come for the preaching of that ideal of freedom and with regard to the deeds with which I have been charged, I submit there is no evidence on the record and it is absolutely inconsistent with everything that I taught, that I wrote and with every tendency of my mind discovered in the evidence."
—(Life-Work of Sri Aurobindo; Jyotish Chandra Ghose; pp. 184-85)

এই পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ অরবিন্দ জেলে আবদ্ধ হইবার ১৯ দিন পূর্ব্বে বারুইপুর বক্তৃতাতে বলিয়াছেন :

"We preach the gospel of unqualified Swaraj"—(Baruipur speech, 12th April, 1908).

জেল হইতে মুক্তি পাইয়া ১৯০৯। ২৩শে জুন ঝালকাঠি বক্তৃতাতেও মিঃ সি আর দাশের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন :

"We seek the fulfilment of our life as a nation...Swaraj is not the colonial form of Government nor any form of Government. It means the fulfilment of our national life...There are some who fear to use the word "freedom", but I have always used the word because it has been the *mantra* of my life to aspire towards freedom of my nation. And when I was last in jail, I clung to that *mantra*; and through the mouth of my Counsel I used the word persistently. When he said for me—and it was said not only on my behalf, but of all who cherish this ideal—was this: If to aspire to independence and preach freedom is a crime, you can cast me into jail and there bind me with chains. If to preach freedom is a crime, then I am a criminal and let me be punished."

—(Speeches of Aurobindo Ghose, Jhalakati speech; pp. 86-88)

বাঙ্গলার স্বদেশীযুগ অরবিন্দের ভিতর দিয়া—ভারতবর্ষকে এই পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ দিয়াছে। এবং ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে অরবিন্দের কৌঁসিলী মিঃ সি আর দাশ এই পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শকে ইংরেজের আদালতে বৈধ বলিয়া স্বীকার করাইয়া লইয়াছেন। মিঃ দাশের এই কৃতিত্ব ইতিহাসে অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে।

পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ আমরা পাইলাম। এখন তাহা লাভ করিবার উপায় কি? মিঃ দাশ অরবিন্দের পক্ষ হইতে বলিলেন যে, অরবিন্দ এই পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (Passive resistance) এর উপায় অবলম্বন করিতে বলিলেন এবং কোনরূপ হিংস্র উপায়

অবলম্বন করিতে নিষেধ করিলেন। মিঃ দাশ বলিতেছেন :

When you find Aurobindo leaving Baroda and coming to Calcutta you find that the doctrines he preaches are not doctrines of violence but doctrine of Passive Resistance. It is not bombs but sufferings. He deprecates secret societies and violence and enjoins them to suffer. ...... The ideals of independence and the means suggested are those of Passive Resistance...

অরবিন্দ "বন্দেমাতরম্"-এর কর্ণধার ছিলেন। মিঃ দাশ বলিতেছেন :

According to the *Bande Mataram*, the ideal of freedom must be attained by passive resistance, *Swadeshi*, Boycott, National Education, Courts of Arbitration, etc.

এখন দেখা যাক, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বস্তুটি কি। মিঃ দাশ ইহার অতি নিপুণ ও বিশদ আলোচনা করিয়া বলিতেছেন :

If there is a law which is unjust and offensive against the development of the nation, break that law by all means and take the consequences. He never asked you to apply force in a single utterance of his either in the press or on the platform. If the Government thought fit to bring in a law which hinders you from attaining that salvation, Aurobindo's advice is to break that law if necessary in the sense of not obeying it. You owe it to your conscience; you owe it to your God. If the law says you must go to jail, go to jail. That was the cardinal feature of the doctrine of passive resistance which Aurobindo preached.

নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের মধ্যে শুধু অসহযোগ নয়, আমরা খোলসা গান্ধীযুগের আইন-অমান্য (Civil Disobedience)-ও পাইলাম। অরবিন্দ এক স্থানে বলিয়াছিলেন যে, দেশের মাটিকে আমাদের রক্ত দ্বারা সার দিতে হইবে ("manuring the soil with their blood")। মিঃ দাশ বলেন, এরকম জিনিস কখনও সম্ভবপর নয়। ইহা একটা metaphor মাত্র। আবার এই প্রসঙ্গেই তিনি নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের অবতারণা করিয়া গবর্ণমেণ্টকে ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করিবার কথাও বলেন।

...If passive resistance could be so well organised that all the people refused to pay taxes... there would be firing of guns and the result of that would be that the people would be weltering in blood.

তারপর মিঃ দাশ বলেন যে, ইংরেজজাতি বারংবার গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে এই নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ অবলম্বন করিয়াছে।

Is not the doctrine of passive resistance preached throughout the world on the same footing? Is it peculiar to this country—this movement which has met with such abusing language from Mr. Norton? Have not the people of England done it over and over again? I say that this is the same doctrine that Aurobindo was preaching almost up to the very day when those handcuffs were put on his hand.

গান্ধীযুগে অসহযোগ ও আইন-অমান্য আন্দোলনের দিনে, বাঙ্গলার স্বদেশী যুগে বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দ, মিঃ সি আর দাশ নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে গিয়া যে আইন-অমান্য ও ট্যাক্স বন্ধ করার কথা বলিয়াছিলেন তাহা,—ভারতের অন্য প্রদেশ দূরের কথা,—অনেক

বাঙ্গালীই ঠিক মত মনে রাখিতে পারেন নাই। বাঙ্গালী খুব সহজেই নিজের ইতিহাস ভুলিয়া যায়।

নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ কথাটা বিপিনচন্দ্রই প্রথম বলেন। অরবিন্দও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। বিপিনচন্দ্রের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ দ্বারাই মিঃ দাশ অরবিন্দকে সমর্থন করিলেন। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ যে বৈধ এবং আইনসঙ্গত ইহাও মিঃ দাশ আদালতে প্রমাণ করিলেন। মিঃ দাশের এই কৃতিত্বও কম গৌরবের কথা নয়। ইতিহাস কখনও ইহা ভুলিতে পারিবে না।

মিঃ দাশ স্বদেশী যুগের গঠনমূলক প্রোগ্রামের কথা উত্থাপন করিয়া বলেন যে, অরবিন্দ ঐ গঠনমূলক প্রোগ্রাম সম্পূর্ণ সমর্থন করিতেন। কিন্তু "যুগান্তর"-এর বিপ্লবী দল গঠনমূলক কার্য্য আদৌ সমর্থন করিতেন না। তাঁহারা বলিতেন, দেশ স্বাধীন না হইলে, দেশের লোকের হাতে ক্ষমতা না আসিলে, কোন গঠনমূলক কার্য্য করা সম্ভব নয়। সুতরাং মিঃ দাশ বলেন যে, গঠনমূলক কার্য্য সমর্থন করায় প্রমাণই হইতেছে যে অরবিন্দ বিপ্লবী নহেন। মিঃ দাশের বক্তৃতা তুলিয়া দিতেছি :

Aurobindo has advocated national education, *Swadeshi,* boycott and court of arbitration whereas the *Jagantar* in its articles headed the *Suchona* holds that no progress of the country is possible without independence. Talk of *Swadeshi,* the *Jugantar* laughs at it. Talk of National Education, arbitration court, the *Jugantar* says all that is a pastime. No progress of the country can ever take place unless you have absolute independence. This is the essential difference between the principles of the *Bande-Mataram* and the *Jugantar.* Mr. Das here read articles from the *Sandhya, Nabasakti,* and other papers to show the difference in the tone of their writings.

অতঃপর মিঃ দাশ বলিলেন, যদি একটি বোমা নিয়া অরবিন্দের নিকট উপস্থিত করিয়া বলা হয়, "ইহা কি আমি যে-কোন ইংরাজকে প্রথম দেখিব তাহারই উপর নিক্ষেপ করিব ?" ইহার উত্তরে অরবিন্দ বলিবেন যে, "এই কার্য্য দ্বারা কি দেশ স্বাধীন হইবে ?" উত্তর হইবে, "না, তাহা হইবে না।" তখন তিনি নিশ্চয়ই বোমানিক্ষেপ নিষেধ করিবেন।

এই সময় হাকিম মিঃ বীচক্রফ্‌ট এক ভয়ঙ্কর প্রশ্ন মিঃ দাশকে জিজ্ঞাসা করিলেন। "যদি বোমা-নিক্ষেপে অভীপ্সিত কার্য্য সিদ্ধ হয়, তবে কি অরবিন্দ বোমানিক্ষেপের আদেশ দিবেন ?" এই ভয়ঙ্কর প্রশ্নের উত্তরে মিঃ দাশ নির্ভীক কণ্ঠে বলিলেন যে, "হাঁ—তা' দিবেন।" ইংরেজের আদালতে এমন কথা ইতিপূর্ব্বে আর কোনও কৌঁসিলী বলেন নাই। মিঃ দাশের কথা তুলিয়া দিতেছি :

"His Honour :—If effective, use it ?

Mr. Das :—If the oppression increases to such an extent and people are so united together, and have got such resource at their back that they think they can fight the Government in battle as it were they might do it, but not now.

His Honour :—He goes back to the utilitarian method, if you are strong enough to fight.

Mr. Das :—Yes."

"আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজ"-এর বিচারাভিনয়ের সময় ইহা লিখিতে গিয়া মনে হইতেছে, আজ মিঃ সি আর দাশ বাঁচিয়া থাকিলে "আজাদ হিন্দ ফৌজ"-এর পক্ষ সমর্থন করিতে দাঁড়াইয়া কি কথাই না বলিতেন।

মিঃ দাশ বলেন, এদেশে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট পরগাছার মত দেশের উপর শিকড় গাড়িয়া ইহার রস শোষণ করিতেছে। এই বিদেশী গবর্ণমেণ্ট আমাদের জাতির স্বাভাবিক বিকাশ নয়। সুতরাং অরবিন্দ ইহার উচ্ছেদ কামনা করিতেছেন। মিঃ দাশ বলিতেছেন ঃ

In language of Aurobindo you have got here an authority which has not sprung from the nation as a part of its organism. The Government has not sprung here from within the people as the Government of other countries ..... I object to the Government of this country, not because it is an autocratic Government, not because it is not a democratic Government nor to its particular actions which are criticised by others. My objection is based on philosophy that this Government has not sprung from the people as a part of an organism.

অরবিন্দ কারারুদ্ধ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে, কিশোরগঞ্জে পল্লী সমিতির উপর যে বক্তৃতা দেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন ঃ

"..Foreign rule is inorganic and therefore tends to disintegrate the subject body-politic by destroying its proper organs and centres of life."

মিঃ দাশ আদালতে অরবিন্দের কিশোরগঞ্জের বক্তৃতারই প্রতিধ্বনি করিলেন।

তারপর মিঃ দাশ যে অতুলনীয় ভাষায় তাঁহার বক্তৃতা শেষ করিলেন, ভবিষ্যতের ইতিহাস তাঁহার প্রত্যেকটি কথা সত্য বলিয়া প্রমাণ করিয়া দিয়াছে ঃ

"I appeal in the name of the very ideal that Aurobindo preached and in the name of all the traditions of our country...

"My appeal to you therefore is that a man like this who is being charged with the offences imputed to him stands not only before the bar in this Court but stands before the bar of the High Court of History and my appeal to you is this: That long after this controversy is hushed in silence, long after this turmoil, this agitation ceases, long after he is dead and gone, he will be looked upon as the poet of patriotism, as the prophet of nationalism and the lover of humanity. Long after he is dead and gone his words will be echoed and re-echoed not only in India, but across distant seas and lands. Therefore I say that a man in his position is not only standing before the bar of this Court but before the bar of the High Court of History."

অরবিন্দের কারামুক্তি—মিঃ দাশের বক্তৃতায় হাকিম মিঃ বীচক্রফ্‌টের মন ভিজিল। পুলিশ বাহিনী মিঃ নর্টনের মারফৎ অরবিন্দের বিরুদ্ধে যে সকল প্রমাণ আদালতে দাখিল করিয়াছিল, মিঃ দাশ সেই সমস্ত প্রমাণ অগ্রাহ্য বলিয়া উড়াইয়া দিলেন—ধোপে টিকিল না। অরবিন্দ বেকসুর খালাস হইলেন। ১৯০৯। ৬ই মে মিঃ বীচক্রফ্‌টের রায় বাহির হইল।

অরবিন্দের সঙ্গে দেবব্রত বসু, নিখিলেশ্বর, হেমেন্দ্র, শচীন্দ্র, নরেন্দ্র বক্সী, নলিনী গুপ্ত, বিজয় নাগ, ধরণী গুপ্ত, নগেন্দ্র গুপ্ত, পূর্ণ সেন, বীরেন্দ্র ঘোষ, প্রভাস দে, দীনদয়াল, বিজয় ভট্টাচার্য্য, কুঞ্জ সাহা ও হেম সেন—সর্ব্বসমেত এই ১৭ জন মুক্তিলাভ করিলেন। বাকী ১৯ জনের মধ্যে বারীন ও উল্লাসের ফাঁসির হুকুম হইয়াছিল। উপেন্দ্র, হৃষীকেশ, বীরেন সেন, ইন্দ্রনাথ, বিভূতি, সুধীর, ইন্দু, অবিনাশ, শৈলেন ও হেমচন্দ্রের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাস, অধিকন্তু সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত।

নিরাপদ, শিশির ও পরেশের দশ বছর দ্বীপান্তর। সুশীল, বালকৃষ্ণ সাত বছর দ্বীপান্তর আর কৃষ্ণজীবন এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড লাভ করিয়াছিল। আর একজন—অশোক নন্দী—বিচার শেষ হইবার আগেই মারা যায়।

মিঃ বীচক্রফ্‌টের রায় বাহির হইবার পর মিঃ সি আর দাশ হাইকোর্টে আপীল করিলেন। ১৯০৯। নভেম্বর মাসে হাইকোর্টের রায় বাহির হইল। বারীন্দ্র ও উল্লাসকরের ফাঁসির হুকুম বন্ধ হইয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের হুকুম হইল। দ্বীপান্তরের যাত্রীরা ১৯০৯।১১ই ডিসেম্বর আলিপুর হইতে রওনা হইলেন।

অরবিন্দের নিকট বারীন্দ্রের পত্র—হাইকোর্টে যখন আপীল চলিতেছে, তখন জেল হইতে বারীন্দ্র অরবিন্দকে সাতখানি পত্র গোপনে লিখিয়াছিলেন। অরবিন্দও সেই সাতটি পত্রের উত্তর দিয়াছিলেন। বারীন্দ্র লিখিতেছেন—

"সে বাহিরে অরবিন্দের নিকট আমার পত্র লইয়া যাইতে রাজী হইল। আমার সেজদা তখন আমার ন-মেশো কৃষ্ণকুমার মিত্রের বাড়ি, সঞ্জীবনী কার্য্যালয়ে আছেন। মেশো মহাশয় তখন দেশান্তরী দশায় (deportation) বাঙলার বাহিরে আবদ্ধ। এই লা—আমার সাত খানি পত্র ক্রমে ক্রমে সেজদার কাছে লইয়া যায় এবং আমায় তাহার উত্তরও আনিয়া দেয়। প্রথেমে সে প্রতি পত্রের জন্য ৫৲ লইত, শেষে আমাদের সৌহার্দ্দ্য জমিয়া উঠিলে সাধন লইতে ব্যাকুল হইলে লা—আর কিছুই লইত না।" —(বারীন্দ্রের আত্ম-কাহিনী, পৃঃ ১১০)

"সেজদা' তাঁর সাতটি পত্রে আমায় বুঝাইবার প্রয়াস করিলেন যে, আমার ক্রিয়াসাধনার অবস্থা শেষ হইয়াছে, এখন সর্ব্ব-ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ভগবৎসমর্পিত না হইলে আর উন্নতি হইবে না।" (পৃঃ ১১১)

দুই ভ্রাতার মধ্যে জেল হইতে বাহিরে, এখন সাধন-তত্ত্বের প্রসঙ্গ চলিতেছে।

অরবিন্দের কারামুক্তির পর মিঃ সি আর দাশ অল্প কিছুদিনের জন্য দার্জ্জিলিঙ্‌ গমন করেন। সেখানে রাস্তায় একদিন ভগিনী নিবেদিতার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ভগিনী নিবেদিতার হাতে একটি গোলাপ ফুল ছিল। নিবেদিতা হাসিতে হাসিতে মিঃ দাশের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এবং সেই গোলাপ ফুলটি মিঃ দাশের কোটের বোতামের ছিদ্রে গুঁজিয়া দিয়া বলিলেন, "আমি আপনাকে মহৎ বলিয়াই জানিতাম। কিন্তু আপনি এত মহৎ তাহা জানিতাম না।" (I knew you to be great, but I did not know you are so great.) সমগ্র দেশবাসী ভগিনী নিবেদিতার সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া তাঁহার কথার সমর্থন করিবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি?

মূরতি পরমানন্দ

শ্রীনিশীথনাথ সর্ব্বাধিকারী

ভারতের—যুগান্তের—
মহামানবের কত
কল্পনা, কামনা, স্বপ্ন,
আকুল আকুতি শত,
শত শত শতাব্দীর—
শতধারা সাধনার,
রসধারা আহরিয়া
যুগে যুগে অনিবার
ধরেছ করুণাঘন
মুরতি পরমানন্দ,—
অরবিন্দ শতদল—
গর্ভে ভরা মকরন্দ।
শতাব্দীর শত শত
মহাজীবন সঙ্গীত
মহাভারতের—যেন
মহাকাব্যে বিকশিত;
ছন্দে ছন্দে বাজে তার
আনন্দের সপ্ত সুর,—
কত রস, কত বাণী,
কত গীতি সুমধুর।

অভাবীয় প্রতিযোগিতা

শ্রীবিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য্য, ন্যায়াচার্য্য, তর্কতীর্থ

জগতে ভাব ও অভাব ভেদে বস্তু দুই প্রকার। আমাদের প্রত্যক্ষ বিষয় ঘট, পট, মঠ এই সকল বস্তু ভাব-পদার্থ, এবং ঘট নাই, পট নাই, পট নষ্ট হইয়াছে, ঘট উৎপন্ন হইবে, এইটি ঘট নয় পট প্রভৃতি প্রতীতির বিষয়বস্তুকে অভাব-পদার্থ বলিয়া বর্ণনা করা হয়।

অভাবের সামান্যলক্ষণ 'ভাবভিন্নত্বম্'। ঘট-নাই ইত্যাদি জ্ঞানের বিষয় কোন ভাবপদার্থের অন্তর্গত না হওয়ায় উক্ত লক্ষণ ঘট নাই ইত্যাদি অভাবে সমন্বিত হইল। ঘট-নাই ইত্যাদি স্থলে ঘটপদের দ্বারা ঘটকে বুঝান হইতেছে, এবং নাই পদের দ্বারা অভাবকে বুঝান হইতেছে। সুতরাং, ঘট নাই ইহার অর্থ ঘটের অভাব। ঘটের অভাব এইরূপ অর্থে ঘটের এই ষষ্ঠী বিভক্তি থাকায় ঘটসম্বন্ধ-যুক্ত অভাব প্রতীত হইতেছে। যেমন রামের পুস্তক, শ্যামের কলম ইত্যাদি বাক্যে রামের সম্বন্ধযুক্ত পুস্তককে এবং শ্যামের সম্বন্ধযুক্ত কলমকে বুঝায়; কিন্তু, যে পুস্তকে রামের কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই, অথবা যে কলমে শ্যামের কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই, সেই পুস্তক বা সেই কলমকে বুঝায় না। সুতরাং যে অভাব ঘটের সম্বন্ধযুক্ত তাহাকেই ঘটের অভাব ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা হয়। অতএব ঘট ও অভাবের একটী সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে। অভাবরূপ পদার্থের সহিত কোন বস্তুর সংযোগ সমবায়াদি সম্বন্ধ সম্ভব নয় বলিয়া উক্ত সম্বন্ধ সংযোগ সমবায়াদি স্বরূপ নহে। অথচ, পূর্ব্বোক্ত যুক্তির দ্বারা একটি সম্বন্ধ প্রমাণিত হইতেছে। সুতরাং প্রসিদ্ধ সম্বন্ধগুলির বাধ থাকায় প্রসিদ্ধ সম্বন্ধ ভিন্ন একটী সম্বন্ধ কল্পিত হইতেছে। এই নবকল্পিত সম্বন্ধটীর নাম প্রতি-যোগিতা। উক্ত সম্বন্ধ কল্পিত বলিয়া উহা অলীক বা মিথ্যা নহে। দার্শনিকগণ সৎ কল্পনাপ্রসূত বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন। সুতরাং ঘটের সম্বন্ধ-(প্রতিযোগিতা) যুক্ত (বিশিষ্ট) যে অভাব তাহাকেই ঘটাভাব বলিয়া অভিহিত করা যাইতেছে।

এইরূপ প্রতিযোগিতার সহিতও ঘটের সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, যে সম্বন্ধের সহিত যে বস্তুর কোন প্রকার সম্পর্ক নাই সেই সম্বন্ধে সেই বস্তু থাকিতে পারে না। যেমন যে সংযোগের সহিত ঘটের কোন প্রকার সম্পর্ক নাই (পটের সংযোগ) সেই সংযোগ সম্বন্ধে (পটের সংযোগ সম্বন্ধে) ঘট কোথাও থাকিতে পারে না। সুতরাং এই কল্পিত প্রতিযোগিতা নামক সম্বন্ধকে যদি ঘট ও অভাবের মধ্যবর্ত্তী সম্বন্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তবে ঘটের সহিত প্রতি-যোগিতার আরও একটী সম্বন্ধ কল্পনা করিতে হইবে। এই সম্বন্ধের নাম বৃত্তিত্ব। "যস্যাভাবঃ স প্রতিযোগী", যাহার অভাব তাহাকে প্রতিযোগী বলা হয়, যেমন ঘটের অভাবের প্রতিযোগী ঘট, পটের অভাবের প্রতিযোগী পট। প্রতিযোগিন্ শব্দের উত্তর তদ্বৃত্তি (তাহাতে থাকে) অসাধারণ ধর্ম্ম (অপরে থাকে না), এরূপ অর্থ বুঝাইতে তল্ প্রত্যয় করিয়া প্রতিযোগিতাপদ নিষ্পন্ন হওয়ায় প্রতি-যোগিবৃত্তি কোন বিশেষ বস্তুকে প্রতিযোগিতা পদের

দ্বারা বুঝাইতেছে। ঘটের অভাব স্থলে ঘট প্রতিযোগী অতএব ঘটের সহিত প্রতিযোগিতার বৃত্তিত্বরূপ সম্বন্ধ প্রমাণিত হইল।

এইপ্রকার অভাবের সহিতও প্রতিযোগিতার একটী সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক। কারণ যেখানে যে সম্বন্ধটি বিদ্যমান নাই, সেখানে সেই সম্বন্ধে কোন বস্তু থাকিতে পারে না। যেমন, যে সংযোগ ভূতলে বিদ্যমান নাই, সেই সংযোগ সম্বন্ধে ভূতলে কোন বস্তু থাকিতে পারে না। সুতরাং প্রতিযোগিতা সম্বন্ধ অবলম্বন করিয়া অভাবের মধ্যে কোন বস্তুকে রাখিতে হইলে প্রতিযোগিতার সহিত অভাবের একটি সম্বন্ধ কল্পনা করিতে হইবে। এই সম্বন্ধ সংযোগ বা সমবায়াদি হইতে পারে না। কারণ, অভাবের সহিত কোন বস্তুর সংযোগ বা সমবায় সম্বন্ধ সম্ভব নহে, এবং পূর্ব্বোক্ত বৃত্তিত্ব-নামক সম্বন্ধও হইতে পারে না। যেহেতু প্রতিযোগিতা প্রতিযোগিবৃত্তিধর্ম্ম, উহা অভাবে থাকে না। অতএব এই সকল সম্বন্ধাতিরিক্ত নিরূপকত্ব-নামক আরও একটী সম্বন্ধ কল্পনা করিতে হইতেছে। অতএব ঘটাভাব বলিতে আমরা বুঝিব ঘটবৃত্তি অর্থাৎ ঘটের মধ্যে থাকে যে প্রতিযোগিতা সেই প্রতিযোগিতার নিরূপক অভাব। এই অভাবেরই আকার অর্থাৎ প্রকাশক শব্দ ঘট-নাই এইরূপ হইয়া থাকে।

অভাবের প্রতিযোগিতা বিশেষ বিশেষ স্থলে বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয় ইহা স্বীকার করিতে হইবে। অন্যথা অভাবের সহিত প্রতিযোগীর বিরোধিতা কল্পনা করা যাইবে না! কারণ, ঘটের সহিত অভাবের বিরোধিতা সর্ব্বজনানুভবসিদ্ধ। যে অধিকরণে ঘট থাকে অথবা ঘটের জ্ঞান হয় সেই অধিকরণে ঘটের অভাব থাকে না এবং ঘটের অভাবের জ্ঞানও হয় না। যদি ঘটনিষ্ঠ অর্থাৎ ঘটে থাকে যে প্রতিযোগিতা সেই প্রতিযোগিতা-নিরূপক অভাবের সহিত ঘটের বিরোধিতা কল্পনা করা হয়, তবে নীল ঘটের অধিকরণে পীত ঘটের অভাব থাকিতে, অথবা পীত ঘটের অভাবের জ্ঞান হইতে পারে না। কারণ, পীতঘটাভাবও ঘটনিষ্ঠ যে প্রতিযোগিতা সেই প্রতিযোগিতানিরূপক অভাব। অতএব এই সর্ব্বজনানুসিদ্ধ বিরোধিতা রক্ষা করিতে হইলে ঘট-সামান্যাভাবের সহিত যাবৎ ঘটের বিরোধিতা কল্পনা করিতে হইবে। একপ্রকার ঘটের অভাবকে ঘটসামান্যাভাব বলা হয়, এবং সামান্যাভাব হইতে ভিন্ন একপ্রকার ঘটের অভাবকে ঘটবিশেষাভাব বলা হয়। ঘট-নাই এই প্রকারে যে অভাবের প্রতীতি হয় তাহা ঘট-সামান্যাভাব এবং নীল ঘট নাই, পীত ঘট নাই এই প্রকারে যে সকল নীল-পীতাদিবিশেষণযুক্ত ঘটাভাব জ্ঞাত হয় তাহা ঘটবিশেষাভাব। এই ঘটবিশেষাভাব, নীলঘটাভাব, পীতাঘটাভাব, এতদ্ ঘটাভাব, অপর ঘটাভাব ইত্যাদি ভেদে অনন্ত। এই সামান্যাভাব এবং বিশেষাভাবের মধ্যে ঘট-সামান্যাভাবের সহিত যাবৎ ঘটের বিরোধিতা। অর্থাৎ ঘট-নাই এই অভাবের সহিত প্রত্যেক ঘটেরই বিরোধিতা। যেখানে একটী ঘটও আছে সেখানে ঘট-নাই এইরূপ ঘটসামান্যাভাব থাকিবে না, এবং যেখানে একটী ঘটের নিশ্চয় হইয়াছে সেখানে ঘট নাই এইপ্রকার জ্ঞানও হয় না। সুতরাং উক্ত ঘটসামান্যাভাবের সহিত ঘটমাত্রেরই বিরোধিতা আছে। কিন্তু বিশেষাভাবের সহিত যাবতীয় ঘটের বিরোধিতা নাই। কারণ, যেখানে পীত বা শ্বেত ঘট বিদ্যমান আছে সেখানেও নীল ঘট নাই এই প্রকার ঘটবিশেষাভাব থাকে। সুতরাং নীলঘটাভাব, পীতঘটাভাব ইত্যাদি ঘট-বিশেষাভাবের সহিত যাবৎ ঘটের বিরোধিতা নাই। সুতরাং ঘটসামান্যাভাব বুদ্ধির প্রতি ঘট-নিশ্চয় প্রতিবন্ধক এই প্রকার বিরোধিতা কল্পনা করিতে হইবে। এই ঘটসামান্যাভাব অর্থে ঘটত্ব মাত্রাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার অভাব। অর্থাৎ যে

অভাবের প্রতিযোগিতা ঘটত্বরূপ ধর্ম্মের দ্বারাই অবচ্ছিন্ন, অন্য ধর্ম্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন নহে, সেইরূপ প্রতিযোগিতার নিরূপক অভাবই ঘটসামান্যাভাব।

অভাবের জ্ঞানের বিষয়ীভূত প্রতিযোগীর মধ্যে বিশেষণ এবং প্রতিযোগীতে বর্ত্তমান যে ধর্ম্ম তাহাকে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক বলা হয়। যেমন ঘট-নাই এই অভাবস্থলে ঘটত্ব প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক। ঘট-নাই এইরূপ বুদ্ধিতে উক্ত ঘটত্বরূপ ধর্ম্মটী প্রতিযোগী ঘটের মধ্যে বিশেষণ হইয়াছে, এবং ঘটরূপ প্রতিযোগীতে বৃত্তিও হইয়াছে। অতএব ঘটত্বরূপ ধর্ম্মটী উক্তস্থলে প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হইল। এই ঘটত্বমাত্রাবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা সেই প্রতিযোগিতার নিরূপক অভাবকে ঘটসামান্যাভাব বলিয়া বুঝিতে হইবে। এই স্থলে অবচ্ছিন্ন পদের অর্থ বিশিষ্ট। এই বিশেষ্যবিশেষণভাব সামানাধিকরণ্য নামক সম্বন্ধকে অবলম্বন করিয়া হইয়াছে। যে দুইটী বস্তু একটী অধিকরণে থাকে তাহারা পরস্পর সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধে একটীর দ্বারা অপরটী বিশিষ্ট হয়। ঘট নাই এই অভাবস্থলে ঘটত্বরূপ ধর্ম্মটী পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হইল, এবং প্রতিযোগিতা সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধে ঘটত্ববিশিষ্ট হইয়াছে। এই অভাবের প্রতিযোগিতাটী কেবলমাত্র ঘটত্বরূপ ধর্ম্মের দ্বারাই অবচ্ছিন্ন, ঘটত্ব ভিন্ন অন্য কোন ধর্ম্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয় নাই। যেহেতু, ঘট নাই এইরূপ অভাব জ্ঞানের বিষয়ীভূত প্রতিযোগীতে ঘটভিন্ন অপর কোন ধর্ম্ম বিশেষণ না হওয়ায় ঘটত্বাতিরিক্ত কোন ধর্ম্ম প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইবে না। সুতরাং এই স্থলে প্রতিযোগিতা ঘটত্ব ভিন্ন অপর কোন ধর্ম্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হওয়া অসম্ভব। অতএব ঘট-নাই এই অভাবটী ঘট সামান্যাভাব বলিয়া বুঝা গেল। এই অভাবের সহিত যাবতীয় ঘটেরই বিরোধিতা আছে। যেখানে এইরূপ ঘটসামান্যাভাব অর্থাৎ ঘট নাই এই প্রকারের অভাব থাকে সেখানে একটীও ঘট বিদ্যমান বা জ্ঞায়মান না হওয়ায় উক্ত বিরোধিতা অক্ষুণ্ণ রহিল। সুতরাং ঘটনাই এই ভাবে আমরা যেরূপ অভাবের প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি বস্তুতঃ সেই অভাবটি ঘটত্বমাত্রাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার নিরূপক। নীল ঘট নাই এই অভাব ঘটসামান্যাভাব নহে। যেহেতু, এই অভাবের প্রতিযোগিতা কেবল মাত্র ঘটত্বের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয় নাই। উক্ত অভাববুদ্ধিতে প্রতিযোগী মধ্যে যেমন ঘটত্ব বিশেষণ সেইরূপ নীলত্বও বিশেষণ হইয়াছে। সুতরাং নীল ঘট-নাই এই আকারের অভাবের সহিত ঘটের বিরোধিতার সম্ভাবনা নাই।

এই প্রকারে প্রতিযোগিতা বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধের দ্বারাও অবচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। যেমন সংযোগ সম্বন্ধে ঘটাভাব ও সমবায় সম্বন্ধে ঘটাভাব এই অভাব দুইটীই ঘটসামান্যাভাব, অথচ এই দুইটী অভাব ভিন্ন ভিন্ন। যেহেতু, পূর্ব্বোক্ত অভাবটী সংযোগসম্বন্ধে ঘটের অধিকরণ ভূতলে থাকে না, আর দ্বিতীয় অভাবটী তাদৃশ অধিকরণে থাকে, কিন্তু সমবায় সম্বন্ধে ঘটের অধিকরণ কপালাদিতে থাকে না। প্রথমটী কপালাদিতেও থাকে। অতএব এই অভাব দুইটী একত্র থাকে না বলিয়া ইহা বিভিন্ন প্রকারে জ্ঞায়মান একই অভাব এইরূপ বলা যাইবে না। সাধারণতঃ প্রতিযোগী বা প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম অভাবের বৈলক্ষণ্য সম্পাদন করিয়া থাকে। কিন্তু উক্তস্থলে দুইটি অভাবেরই প্রতিযোগী এবং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম একই। সুতরাং কাহার দ্বারা অভাবের বৈলক্ষণ্য সম্পাদিত হইবে?

ইহার উত্তরে বলিতে হইবে যে অনুভবসিদ্ধ অভাবের বিভেদ রক্ষা করিতে হইলে অভাবও প্রতিযোগীর সহিত কল্পিত যে প্রতিযোগিতা-নামক

সম্বন্ধ তাহার সহিত সংযোগ বা সমবায় সম্বন্ধের সম্পর্ক স্বীকার করিতে হইবে। যেমন সংযোগ সম্বন্ধে ঘটাভাব এই কথার দ্বারা সংযোগসম্পর্কযুক্ত প্রতিযোগিতা নামক সম্বন্ধকে অবলম্বন করিয়া ঘটবিশিষ্ট অভাবকে বুঝাইবে, এবং সমবায় সম্বন্ধে ঘটাভাব ইত্যাদি স্থলে সমবায়সম্পর্কান্বিত প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে ঘটবিশিষ্ট অভাবকে বুঝাইবে। যে অধিকরণে (ভূতলাদিতে) সংযোগ সম্বন্ধে ঘট আছে, সেখানে যে ঘটাভাব বিদ্যমান থাকে ঐ অভাবটী সংযোগ সম্পর্কযুক্ত প্রতিযোগিতাসম্বন্ধে ঘটবিশিষ্ট অভাব নহে এবং যেখানে (ঘটের অবয়ব কপালাদিতে) সমবায় সম্বন্ধে ঘট আছে, সেখানে বর্ত্তমান ঘটের অভাবটী সমবায় সম্পর্কযুক্ত প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে ঘটবিশিষ্ট নহে। কারণ, সংযোগসম্পর্কান্বিত প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে ঘটবিশিষ্ট অভাবের সংযোগসম্বন্ধে ঘটের সহিত বিরোধিতা আছে। অর্থাৎ সংযোগসম্বন্ধে যেখানে ঘট থাকে বা ঘটের নিশ্চয় হয়, সেখানে সংযোগ সম্পর্কান্বিত প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে ঘটবিশিষ্ট অভাব থাকে না, বা তাদৃশ অভাবের জ্ঞান হয় না। এইরূপ সমবায় সম্পর্কান্বিত প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে ঘটবিশিষ্ট অভাবের সমবায় সম্বন্ধে ঘটের সহিত বিরোধিতা আছে। অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধে যেখানে ঘট থাকে বা ঘটের নিশ্চয় হয়, সেখানে সমবায় সম্পর্কান্বিত প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে ঘটবিশিষ্ট অভাব থাকে না বা তাদৃশ অভাবের জ্ঞান হয় না। সুতরাং একটী অভাবের সহিত সংযোগ সম্বন্ধে ঘটের বিরোধিতা, অপরটীর সহিত সমবায় সম্বন্ধে ঘটের বিরোধিতা, এই প্রকারে অভাবের বৈলক্ষণ্য সম্পাদন করিতে হইবে। এই প্রতিযোগিতার সহিত সংযোগাদির যে সম্পর্ক কল্পনা করা হইল সেই সম্পর্কেরই নাম অবচ্ছিন্নত্ব। সুতরাং প্রতিযোগিতার মধ্যে সংযোগাদি সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব স্বীকৃত হইল। প্রতিযোগিতার মধ্যে সংযোগাদি সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব স্বীকার করিলেই প্রতিযোগিতা সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন ইহাও বলা হইল।

স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীবিবেকানন্দ পাল, এম্-এ

যুক্ত করিয়া ধর্ম্মের সাথে সেবার মহান্ ব্রতে,
সুপ্ত মানবে জাগায়ে তুলিয়া চালালে নূতন পথে।
মুক্ত করিলে বন্ধন যত, দুর্ব্বলে দিলে বল,
ভাইয়ের দুঃখ মুছাইতে ভাই হল বুঝি চঞ্চল।
ত্যাগের মন্ত্রে নিল যে দীক্ষা ছাড়ি সম্পদ সুখ
দেশের দশের কল্যাণ সাধি উজল করিল মুখ।

তোমার শিক্ষা সফল আজিকে তাদের কাজের মাঝে,
অগ্রণী তারা দুঃখ মুছাতে, সকল সেবার কাজে।
মুগ্ধ জগৎ তাকায়ে দেখিছে তোমার কীর্ত্তি পানে,
ভক্তি গর্ব্ব উছলি উঠিছে মোদের সবার প্রাণে।
এমনি করিয়া যুগ যুগ ধরি' মূর্ত্ত হইও তুমি,
ধন্য করিও জগৎ আর তোমার জন্মভূমি।

দীপ্ত পরশে জগতে জাগায়ে ধরাতে আনিও স্বর্গ,
জন্মদিনেতে লহ হে দেবতা, মোদের ভক্তি অর্ঘ্য।

শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের কথা

স্বামী অপূর্ব্বানন্দ

১৯৩০-৩১ সনে বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের ঘুম বড় একটা হত না। সর্ব্বক্ষণই কোন না কোন দিব্যভাবের প্রেরণায় বিমলানন্দে বিভোর হয়ে থাকতেন। দিনের বেলা মঠের সাধুব্রহ্মচারী ও অগণিত ভক্তদের সঙ্গে নানাবিধ প্রসঙ্গের ভেতর দিয়ে তাঁর মনের সেই আনন্দের ভাব ফুটে বেরুত। কখনও কখনও এত উচ্চাবস্থার কথা বলতেন যে অনেকেই তার মর্ম্ম গ্রহণে সমর্থ হত না। তাই এক এক সময় দুঃখ করে আপন মনেই বলতেন, "এ সব কাকেই বা বলি আর কেই বা বুঝবে! এরা তো সব এরাজ্যে ছেলেমানুষ। থাকতেন যদি মহারাজ, এ সময় তাঁকে বলে নিজেও শান্তি পেতাম, আর তিনিও কত আনন্দিত হতেন।"

রাত্রিবেলা বিশেষ করে তাঁর খুবই ভাবান্তর লক্ষিত হত। কখনও আত্মারাম হয়ে মনের আনন্দে বিভোর হয়ে গুন গুন করে গান গাইছেন, কখনও বা উপনিষৎ, গীতা, চণ্ডী বা ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থের শ্লোক আবৃত্তি করছেন, আবৃত্তি করতে করতে ক্ষণে ক্ষণে চুপ হয়ে যাচ্ছেন। অনেক সময়ই তাঁর বাহ্যিক জগৎ বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার জ্ঞান থাকত না।

একদিন তিনি তক্তাপোশের উপর চুপ করে বসে আছেন—চক্ষু মুদ্রিত, রাত প্রায় দুটা। সমগ্র মঠ নিস্তব্ধ। অনেক ক্ষণ এই ভাবে ধ্যানস্থ হয়ে বসে থাকার পর ধীরে ধীরে আপন মনেই যেন আবৃত্তি করতে লাগলেন—

"আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥
বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥"

পরে নিকটস্থ সেবককে লক্ষ্য করে বল্লেন—"এর অর্থ কি জানিস্?" সেবক মৌন হয়ে থাকায় তিনি নিজেই বলতে লাগলেন—"যেমন নানা নদনদী দ্বারা সদাপরিপূর্ণস্বভাব ও অচলভাবে অবস্থিত সমুদ্রের মধ্যে জলরাশি প্রবেশ করে অথচ সমুদ্র তাতে মোটেই উদ্বেলিত হয় না, তেমনি সমুদ্রবৎ সদাপরিপূর্ণ ও ব্রহ্মানন্দস্থিত জ্ঞানীর হৃদয়ে প্রারব্ধ বশতঃ কামনাসকল প্রবেশ করে সত্য কিন্তু তাতে তাঁর মন আদৌ বিচলিত হয় না। তিনি কৈবল্যরূপ শান্তিলাভে আত্মারাম হয়ে থাকেন। কিন্তু ভোগকামনাশীল ব্যক্তি শান্তি পায় না। যে ব্যক্তি সমস্ত কামনা বাসনা পরিত্যাগ করে নিঃস্পৃহ, নিরহঙ্কার ও মমত্ববুদ্ধিশূন্য হয়ে বিচরণ করেন তিনিই প্রকৃত শান্তি লাভ করেন।

"কামনা বাসনা থাকলে শান্তি লাভ হয় না। আর সেই কামনা ভগবৎকৃপা ছাড়া সমূলে বিনষ্ট হওয়াও সম্ভবপর নয়। ঠাকুর কৃপা করে আমার কামনা-বাসনা একেবারে মুছে দিয়েছেন, কোন বাসনা নেই। এই শরীরটা কেবল তাঁর কাজের জন্য রয়েছে; আমি তো শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব। এ শরীরটাও যে আছে তাই অনেক সময় মনে হয় না—তবে প্রভুর অনেক কাজ এই শরীর দিয়ে করাবেন, তাই তিনি এইটি এখনও রেখেছেন। আমার কিন্তু কোন কামনা বাসনা নেই, বুঝলি?

আমি ব্রহ্মানন্দস্বরূপ।” এই বলে ধীর স্থির হয়ে বসে রইলেন। দিব্য স্নিগ্ধহাস্যে তাঁর সমগ্র বদনমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তিনি ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মানন্দসাগরে ডুবে গেলেন। তখন তাঁর চেহারা একেবারে বদলে গেছে, তিনি যেন এক নূতন মানুষ। তাঁর দিকে তাকাতে ভয় হচ্ছিল। অনেক ক্ষণ পরে আপন মনেই বলতে লাগলেন—“মা আমায় কৃপা করে সব দিয়েছেন, তাঁর ভাণ্ডার সব খালি করে আমায় পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। আমার তাঁর কাছে চাইবার কিছুই নেই, তাঁর কৃপায় সব লাভ হয়েছে। ‘যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।’ তবু যে এ শরীরটা কেন রেখেছেন, তিনিই জানেন।”

* * * * *

অন্য একদিন গভীর রাতে মহাপুরুষজী খাটে বসে আছেন, ধ্যানস্থ। শারীরিক অসুস্থতার জন্য সেবকগণ পালা করে তাঁর সেবার জন্য সারারাত জেগে থাকত। অনেক ক্ষণ ধ্যানস্থ থাকার পরে এক একবার চোখ মেলে দেখে আবার চোখ বুজে বসে থাকেন। এমন সময় হঠাৎ একটী বিড়াল ঘরের মেজেতে মিউ মিউ করে ডেকে উঠল। তিনিও সেদিকে তাকিয়ে হাতযোড় করে বিড়ালের উদ্দেশ্যে প্রণাম করলেন। তিনি যে বিড়ালকে প্রণাম করছিলেন নিকটস্থ সেবক প্রথমটায় তা বুঝতে পারে নি, সেজন্য একটু সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকাতেই তিনি বল্লেন, “দেখ, ঠাকুর আমাকে এখন এমন অবস্থায় রেখেছেন যে সবই দেখছি ‘চিন্ময়’; ঘর-দোর, খাট-বিছানা এবং সর্ব্ব প্রাণীর ভেতরই সেই এক অনাদি চৈতন্য খেলা করছেন, কেবল নামের প্রভেদ মাত্র, কিন্তু মূলে সব একই বেশ পরিষ্কার দেখছি। অনেক চেষ্টা করেও সে ভাবটা সামলাতে পাচ্ছিনে। সবই চৈতন্যময়। এই বিড়ালটারও ভেতর সেই চৈতন্যের প্রকাশ জ্বল্ জ্বল্ করছে। এই ভাবেই ঠাকুর ভরপুর করে রেখেছেন। লোকজন আসে যায়, কথাবার্ত্তা বলতে হয় বলি, সাধারণ কাজকর্ম্ম বা আহারাদি করতে হয় করি—যেন অভ্যাস বশতঃ করে যাই, কিন্তু এসব থেকে মন একটু তুলে নিলেই দেখি সর্ব্বত্রই সেই চৈতন্যের খেলা। নাম, রূপ—এসব তো অতি নিম্নস্তরের ব্যাপার। নাম, রূপের উপরে মন গেলেই ব্যস্! তখন সবই চৈতন্যময়। এসব বলে বোঝাবার জিনিষ নয়। যার সে অবস্থা হয় সেই জানে।” আরও কত কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু অতটুকু বলেই হঠাৎ চুপ হয়ে গেলেন। সেবক মুগ্ধপ্রাণে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

* * * *

“শুধু গুরুসেবা করলেই সব হবে না। সঙ্গে সঙ্গে সাধন-ভজনও বিশেষ দরকার,” এ কথা তিনি সেবকদের খুবই বলতেন, এবং সাধনভজন না করে খালি মহাপুরুষদের সঙ্গ করা বা সেবা করায় অহঙ্কার অভিমান এসে পড়ার খুবই সম্ভাবনা—সে বিষয়েও সেবকদের সতর্ক করে দিতেন। একদিন গভীর রাতে জনৈক সেবককে বললেন—“দেখ্, সেবা কচ্ছিস্ এ খুব ভাল। ঠাকুরের মহা কৃপা তোর উপর যে তাঁর এক সন্তানের সেবা তিনি তোর দ্বারা করিয়ে নিচ্ছেন। কিন্তু বাবা, সঙ্গে সঙ্গে সাধন ভজনও করা চাই। নিয়মিত জপধ্যান, সাধন-ভজন করলে তবেই ঠাকুর যে কি ছিলেন তা ঠিক ঠিক উপলব্ধি হবে। আমাদের (গুরুর) উপর মানুষবুদ্ধি এলেই মারা যাবি। ভগবদ্‌বুদ্ধি আনার জন্য চাই তীব্র সাধনা। তীব্র সাধন-ভজনের দ্বারা মন সংস্কৃত হলে সেই শুদ্ধ মনে ভগবদ্ভাব প্রতিফলিত হয়। আমরা

তো ঠাকুরকে দেখেছি, তাঁর সঙ্গ করেছি, তাঁর কৃপা পেয়েছি, তবু তিনি আমাদের দ্বারা কত উগ্র সাধনা করিয়ে নিয়েছেন। তিনি যে ভগবান, তিনি যে এসেছিলেন জগৎকে মুক্তি দেবার জন্য, তা কি আমরাই প্রথমটায় ঠিক ঠিক ধরতে পেরেছিলাম? ক্রমে সাধন-ভজনের দ্বারা এই জ্ঞান পাকা হয়ে গেছে—অবশ্য তাঁর কৃপা ছাড়া কিছুই হয় না। তবে ব্যাকুল হয়ে চাইলে, কাতর হয়ে ডাকলে তিনি কৃপা করেনও। তিনি যে ভগবান—সাক্ষাৎ দেবাদিদেব জগন্নাথ—তা পরে বুঝতে পেরেছি। তাঁর ঠিক ঠিক স্বরূপ তিনি কৃপা করে জানিয়ে দিয়েছেন।

"জপ করবি গভীর রাতে। মহানিশায় জপ করলে খুব শীঘ্র শীঘ্র ফল পাবি। সমগ্র মন-প্রাণ আনন্দে ভরে যাবে। এত আনন্দ পাবি যে জপ ছেড়ে আর উঠতে ইচ্ছে হবে না। এই তো আমার সেবার জন্য জেগে থাকতে হয়, এ সময় বসে বসে জপ করবি। এখানে তো আর সব সময় কাজ থাকে না। কখনও কখনও দৈবাৎ কোন কাজের দরকার হয়—এ তো বেশ সুবিধে। খুব জপ করবি বুঝলি? একেবারে ডুবে যেতে হবে। ভাসা ভাসা হলে তাতে কিছু হবে না। যতটুকুই করবি তন্ময় হয়ে করতে হবে, তবেই আনন্দ পাবি। তাইতো ঠাকুর গাইতেন—'ডুব দে রে মন কালী বলে হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে।' যে কোন কাজে ডুবে যেতে না পারলে আনন্দ নেই। তিনি দেখেন প্রাণ, আন্তরিকতা, তিনি সময় দেখেন না। আর ধ্যানজপ নিত্য নিয়মিত করলে মন শুদ্ধ হয় এবং ভাব হৃদয়ে পাকা হয়ে যায়। নিত্য নিরন্তর অভ্যাস করা চাই। তাইতো গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন, 'অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে।' ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে নিত্য ডেকে যা, দেখবি যে সেই ব্রহ্মশক্তি কুলকুণ্ডলিনী জেগে উঠবেন, ব্রহ্মানন্দের রাস্তা খুলে দেবেন। সেই মা প্রসন্না হলেই সব হল। চণ্ডীতে আছে—'সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।' সেই তিনিই প্রসন্না হয়ে মনুষ্যগণের মুক্তির জন্য বর দান করেন। তিনি দুহাত বাড়িয়ে আছেন দেবার জন্য কিন্তু নিচ্ছে কে? তাঁর কাছে একটু কাতরপ্রাণে চাইলেই তিনি সব দিয়ে দেন—ভক্তি, মুক্তি, সব।

"বাড়ী ঘর ছেড়ে এসেছিস্ ভগবান্ লাভ করবি বলে। ঐতো জীবনের উদ্দেশ্য। আসলে যেন ভুল না হয়ে যায়। খুব খেটে নিরন্তর জপ ধ্যান করে ঠাকুরকে হৃদয়ে একবার প্রতিষ্ঠিত করে নে, তখন খালি আনন্দ, খুব মজায় থাকবি। সব শরীরেরই নাশ আছে। আমাদের শরীরই বা আর ক' দিন? একে তো বৃদ্ধ শরীর, এখন চলে গেলেই হল। তখন সব অন্ধকার দেখবি। কিন্তু জপ ধ্যান করে যদি ইষ্ট উপলব্ধি করে ফেলতে পারিস্ তো তখন দেখবি যে গুরু ইষ্ট একই এবং গুরু তোর হৃদয়মন্দিরেই রয়েছেন। দেহনাশে গুরুর নাশ হয় না। তোদের ভালবাসি বলেই এত বলছি, তোদের যাতে প্রকৃত কল্যাণ হয় তাইতো আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।"

* * * *

অন্য সময় প্রসঙ্গান্তরে বলেছিলেন "একমাত্র তোরাই যে আমার সেবা কচ্ছিস্ আর খুব বড় কাজ কচ্ছিস্ অমন যদি ভাবিস্ তো মস্ত ভুল করবি, বুঝলি? এই এক ছিলিম তামাক সেজে দিয়ে, বা একটু কিছু এগিয়ে দিয়ে, একটু দেহের সেবা করলেই বুঝি খুব সেবা করা হল? তা নয়। অনেক দূরে থেকেও প্রভুর কাজ করলেই আমাদের সেবা করা হয়। ঠাকুরই হলেন আমাদের অন্তরাত্মা। যারা হাজার হাজার মাইল দূরে থেকেও কায়মনোবাক্যে প্রভুর কাজ কচ্ছে—সাধনভজনদ্বারা প্রভুকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করছে—তারা আমাদের খুবই প্রিয়, তারাও আমাদের সেবা

কচ্ছে। তাঁকে সেবাদ্বারা তুষ্ট করলেই আমরা তুষ্ট। 'তস্মিংস্তুষ্টে জগত্তুষ্টম্।' প্রভুর কাজ করে তোদের গুরুসেবাফলের চাইতে তারা আরও বেশী ফল পাবে জানবি।"

*   *   *   *

১৯২৭ সনের শেষ ভাগ হতে ১৯২৮ সনের প্রথম পর্য্যন্ত কাশীতে অবস্থানকালীন মহাপুরুষ মহারাজ প্রায় ৫০জন ভক্ত নরনারীকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়েছিলেন। কাশী শিবক্ষেত্র, সেজন্য ইতিপূর্ব্বে স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ বা স্বামী সারদানন্দ মহারাজ প্রভৃতি ঠাকুরের অন্তরঙ্গ শিষ্যদের মধ্যে কেউই কাশীতে মন্ত্রদীক্ষা দেননি অথচ মহাপুরুষ মহারাজ এ নিয়মের ব্যতিক্রম কেন করলেন এ ভেবে অনেক সাধু ও সেবকদের মনে কেমন একটা খট্‌কার সৃষ্টি হয়েছিল। সেই সন্দেহ নিরাকরণের জন্য একদিন জনৈক সেবক তাঁকে জিজ্ঞেস করে, "মহারাজ, শুনেছিলাম যে পূজনীয় মহারাজ প্রভৃতি কেউই কাশীতে দীক্ষা দিতেন না, কিন্তু আপনি তো এখানে দীক্ষা দিচ্ছেন?" সেবকের এই প্রশ্ন শুনে তিনি খানিকক্ষণ খুব গম্ভীর হয়ে রইলেন; পরে ধীরে ধীরে বল্লেন—"দেখ বাবা, আমি দীক্ষা দিচ্ছি এ বুদ্ধি আমার মোটেই নেই। ঠাকুর কৃপা করে আমার ভেতর গুরুবুদ্ধি কখনও দেন নি। জগদ্‌গুরু হলেন শঙ্কর আর এযুগে ঠাকুর। তিনিই ভক্তদের প্রাণে প্রেরণা দিয়ে এখানে নিয়ে আসেন, আবার তিনিই আমাদের ভেতরে বসে যা বলান তাই বলে দিই মাত্র।"

*   *   *   *   *

কাশীতে অদ্বৈতাশ্রমের দোতলার উপরের একটী কোণের ঘরে মহাপুরুষ মহারাজ থাকতেন। শীতকাল। অনেক সাধুব্রহ্মচারীতে দু আশ্রম পরিপূর্ণ। অনেকে মহাপুরুষজীর পূতসঙ্গ লাভ করবার জন্যও সেখানে সমবেত। আর নিত্যই বহু ভক্তের ভীড়, যেন ছোটখাট উৎসব, আনন্দের মেলা। একদিন সকালে যথারীতি দু আশ্রমের সাধুরা এসে একে একে তাঁকে প্রণাম করে আশীর্ব্বাদ নিয়ে ফিরে যাচ্ছেন—এমন সময় জনৈক সন্ন্যাসীকে লক্ষ্য করে তিনি বল্লেন, "দেখ, কাল রাত্রে একটা ভারি মজা হয়েছে। গভীর রাত, শুয়ে আছি, হঠাৎ দেখি যে এক শ্বেতকায় পুরুষ, জটাজূটধারী, ত্রিনয়ন, সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর দিব্য কান্তিতে চারদিক্ আলোকিত হয়ে গেছে। আহা! কি সুন্দর কমনীয় মূর্ত্তি, কি সকরুণ চাহনি! তাঁকে দেখামাত্রই ভেতর থেকে মহাবায়ু একেবারে গড় গড় করে উপরের দিকে উঠতে লাগল—ক্রমে সমাধিস্থ হয়ে পড়লাম, খুব আনন্দ। এমন সময় দেখি যে সে মূর্ত্তি ক্রমে বিলীন হয়ে গেলেন এবং তাঁর স্থানে ঠাকুর দাঁড়িয়ে আছেন—সহাস্যবদন—হাত দিয়ে ইসারা করে বল্লেন—'তোর এখনও থাকতে হবে, আরও কিছু কাজ বাকী আছে।' ঠাকুরের এই বলার সঙ্গে সঙ্গেই মন আবার নীচের দিকে আসতে লাগল এবং ক্রমে বায়ুর ক্রিয়াও চলতে লাগল। সবই তাঁর ইচ্ছা! আমি কিন্তু বেশ আনন্দে ছিলাম। তিনি আর কেউ নন, সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ।"

সন্ন্যাসী—"আপনি কি স্বপ্নে দর্শন করেছিলেন?"

মহাপুরুষজী—"না হে, জেগে জেগে।"

এইমাত্র বলেই সে কথা চাপা দিয়ে অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন।

*   *   *   *

বেলুড় মঠে সকালবেলা সাধুব্রহ্মচারীদের মধ্যে অনেকেই প্রণাম করে চলে গেছেন। জনৈক সন্ন্যাসী প্রণামান্তর নিজের প্রাণের মহা অশান্তি ও নৈরাশ্যের কথা অতি কাতর ভাবে নিবেদন করায় মহাপুরুষজী বল্লেন, "ভয় কি বাবা, শরণাগত হয়ে পড়ে থাক তাঁর দুয়ারে, তিনি কাউকেও বিমুখ করেন না।"

সন্ন্যাসী—"এতদিন বৃথাই কেটে গেল, এখনও ভগবান্ লাভ হল না, শান্তি লাভ হল না। এক এক সময় দারুণ অবিশ্বাস মনকে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলে। এতকাল আপনাদের যে সব উপদেশবাক্য শুনেছি সে সবেতেও সন্দেহ এসে যায়।"

এই শুনে মহাপুরুষ মহারাজের মুখমণ্ডল একেবারে লাল হয়ে উঠল। তিনি একটু উত্তেজিত হয়ে বল্লেন, "দেখ বাবা, ঠাকুর যদি সত্য হন তো আমরাও সত্য। যা বলছি ঠিক ঠিক বলছি। আমরা লোক ঠকাতে আসিনি। যদি আমরা ডুবি তো তোমরাও ডুববে। কিন্তু তাঁর কৃপায় জেনেছি যে আমরা ডুবব না, আর তোমরাও ডুববে না।"

* * * * *

সে সময় মহাপুরুষ মহারাজ খুব বেশী চলাফেরা করতে পারেন না। সেজন্য একজন সেবকের উপর ভার পড়েছিল সে রোজ বিকেলে এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা সারা মঠ ঘুরে অসুস্থ সাধুব্রহ্মচারীদের, গরুবাছুর গুলির এবং মঠের অন্যান্য যাবতীয় কাজ-কর্ম্মের খবর নিয়ে সব তাঁকে বিস্তারিতভাবে জানাবে। একদিন যথারীতি সব খবরাদি নিয়ে সেবক উপরে গিয়ে দেখে যে মহাপুরুষজী একা খুব গম্ভীর ভাবে বসে আছেন—চক্ষু অর্দ্ধ-নিমীলিত, যেন জোর করে বাইরের দিকে তাকাচ্ছেন। সেবক সামনে গিয়ে দাঁড়াতে অন্য দিনের ন্যায় কোন প্রশ্নই করলেন না। মনে হল যেন সেবকের উপস্থিতি তিনি আদৌ জানতে পারেন নি। তাঁর এই রকম ভাবান্তর দেখে সে স্তম্ভিত হয়ে একপাশে সরে গেল। এইভাবে অনেকক্ষণ অতিবাহিত হবার পর যখন তিনি এদিক সেদিক একটু দেখতে লাগলেন তখন সেবক সামনে গিয়ে অন্য দিনের ন্যায় সব খবর বলতে আরম্ভ করামাত্রই মহাপুরুষজী ধীর ভাবে বল্লেন, "দেখ, আমার কাছে এ জগৎটার কোন অস্তিত্বই নেই, একমাত্র ব্রহ্মই রয়েছেন। নেহাৎ মনটাকে নীচে নামিয়ে রাখবার জন্য কথাবার্ত্তাও বলি আর পাঁচ রকম খবরাখবরও নিই।" এইমাত্র বলে পুনরায় গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন। সেদিন আর কোন খবরই শুনলেন না।

* * * * *

"দেখ, বরাহনগর মঠে স্বামীজীর সঙ্গে থাকতে এক আশ্চর্য্য ঘটনা হয়েছিল। তখন আমরা উপরের হলঘরে সকলে একসঙ্গেই শুতাম। বিছানাপত্র তো তেমন কিছুই ছিল না। প্রকাণ্ড একটা মশারি ছিল তাই খাটিয়ে সকলে একই মশারির নীচে শোওয়া যেত। এক রাত্রে স্বামীজীর পাশে শুয়ে আছি। সে মশারির ভেতর শশী মহারাজ প্রভৃতি আরও কে কে ছিলেন। গভীর রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যেতে দেখি মশারির ভেতর একেবারে আলোকিত হয়ে গেছে। স্বামীজী তো আমার পাশেই শুয়েছিলেন, কিন্তু দেখি যে তিনি সেখানে নেই, তাঁর পরিবর্ত্তে সেখানে ছোট ছোট সাত আট বছরের ছেলের মত, উলঙ্গ, সুন্দর, জটাজূটধারী, শ্বেতবর্ণ অনেকগুলি শিব শুয়ে আছেন। তাঁদেরই অঙ্গচ্ছটাতে সব আলোকিত হয়ে গেছে। আমি তো তাই দেখে একেবারে আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। প্রথমটায় ব্যাপার কি কিছুই বুঝতে পারলাম না, মনে হল এ চোখের ভ্রম; ভাল করে চোখ রগড়ে আবার দেখলাম ঠিক তেমনি ভাবে ছোট ছোট শিবগুলি দিব্যি শুয়ে আছেন। তখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে রইলাম—শুতে ইচ্ছা হচ্ছিল না, ভয়ও হচ্ছিল যে পাছে ঘুমের ঘোরে আমার পা শিবদের গায়ে লেগে যায়। সে রাতটা প্রায় ধ্যান করেই কাটিয়ে দিলাম। ভোর হতে দেখি যে স্বামীজী যেমন শুয়েছিলেন তেমনিই শুয়ে রয়েছেন। সকালে তাঁকে সব বল্লাম। তিনি শুনে খুব হাসতে লাগলেন। অনেক দিন পরে হঠাৎ বীরেশ্বর শিবের স্তোত্র* পড়ে দেখি যে তাঁর ধ্যানে ঠিক ঐরূপ বর্ণনা রয়েছে। তখন বুঝলাম যে আমি ঠিকই দেখেছিলাম। স্বামীজীর স্বরূপই তাই। ঐ শিবের অংশেই তাঁর জন্ম কি না, তাই ঐ রকম দর্শন হয়েছিল।"

* বীরেশ্বরস্তোত্রম্

বিভূতিভূষিতং বালমষ্টবর্ষাকৃতিং শিশুম্।
আকর্ণপূর্ণনেত্রঞ্চ সুবক্ত্রদশনচ্ছদম্ ॥
চারুপিঙ্গজটামৌলিং নগ্নং প্রহসিতাননম্।
শৈশবোচিতনেপথ্যধারিণং চিত্তহারিণম্ ॥ ইত্যাদি

বিভূতিভূষিত অষ্টমবর্ষবয়স্ক বালক, আকর্ণবিস্তৃতনয়ন এবং বদন ও দন্তপাটী সুন্দর। মস্তকে সুন্দর পিঙ্গলবর্ণের জটা, নগ্ন ও সহাস্য বদন, অঙ্গে শৈশবোচিত মনোহর অলঙ্কার। ইত্যাদি।

নেশার স্বরূপ

শ্রীভোলানাথ দাস

(১)

নেশা বলিতে সাধারণ ভাবে আমরা কী বুঝি? প্রথমতঃ, নেশার সহিত আসক্তির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে; একদিক দিয়া দেখিতে গেলে কোনো ক্ষতিকর বিষয়ে গভীর আসক্তিই নেশার প্রধান লক্ষণ। এই আসক্তি এতো প্রবল যে, তাহার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করা মানুষের প্রায় দুঃসাধ্য। পতঙ্গ যেমন আলোকের আকর্ষণে প্রলুব্ধ ও মোহিত হইয়া দীপশিখায় পড়িয়া প্রাণ হারায়, দুর্ব্বলহৃদয় মানুষও সেইরূপ আসক্তির আকর্ষণে মুগ্ধ হইয়া সর্ব্বনাশা নেশার আগুনে ঝাঁপাইয়া পড়ে। আলোকের যেমন একটা লোভনীয় রঙ্ থাকে, আসক্তিরও সেইরূপ প্রলোভন দেখাইবার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। এই প্রলোভনেরই ষড়যন্ত্রে মানুষ অন্ধ হইয়া দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতায় নিজের পাদমূলেই কুঠারাঘাত করিয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ, নেশার প্রতারণাশক্তি খুব বেশী। কোন কোন ক্ষেত্রে নেশা রোগযন্ত্রণা দূরীভূত করে, এবং শরীরে ও মনে সজীবতা ও স্ফূর্ত্তি আনয়ন করে। অনেক সময় নেশা মানসিক শক্তিসমূহকে উদ্দীপ্ত করিয়া দেয় এবং চিন্তা-শক্তিকে যেন একাগ্র করিয়া তোলে। নেশার এই সকল 'উপকারিতা' যে সম্পূর্ণ বাহ্য এবং অন্তঃসারশূন্য ভ্রমমাত্র, তাহা একটু বিবেচনা করিলেই পরিষ্কার বোঝা যাইবে।

তৃতীয়তঃ, নেশা সাধারণতঃ একটি কু-অভ্যাস। কোনো একটি কার্য্য পুনঃপুনঃ সম্পাদন করিতে থাকিলে মন তাহাতে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে এবং পরে নির্দ্দিষ্ট সময় আসিলে, অল্পবিস্তর স্বয়ংক্রিয় ভাবেই তাহা নিষ্পন্ন হইয়া যায়। ভালোই হউক আর মন্দই হউক অভ্যাসের শক্তি বড় প্রবল; বিশেষতঃ পাপপথের কয়েকটি আপাত-মধুর প্রলোভন আছে বলিয়া, কু-অভ্যাসের ক্ষমতা অনেক সময়েই প্রবলতররূপে দেখা দেয়। কু-অভ্যাসের ফলে মানুষের বিচারশক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং তাহার মানসিক ও শারীরিক ক্ষমতার অপচয় ঘটিয়া থাকে। 'মানুষ অভ্যাসের দাস'; —নেশা কিন্তু মানুষকে একেবারে ক্রীতদাস করিয়া ফেলে। নেশায় আসক্ত ব্যক্তি ইচ্ছার স্বাধীনতা হারাইয়া ক্রীতদাসেরই মত তাহার অভ্যাসের হুকুম অনুসারে উঠে ও বসে।

(২)

বিবেক-বুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষের সহিত সাম্‌না-সাম্‌নি লড়াই করিবার মত শক্তি নেশার নাই। সুতরাং নেশা মানুষের সহিত হঠাৎ মুখামুখি সাক্ষাৎ করিতে কদাচিৎ রাজী হয়। কূটনীতি-বিশারদ দুর্ব্বল শত্রুর মত নেশাও গুপ্ত কৌশলের সাহায্যে কার্য্যোদ্ধার করিবার ফন্দী খোঁজে। কুটিল শত্রু ছদ্মবেশে কোনো গুপ্তস্থানে লুকাইয়া থাকে, এবং প্রতিপক্ষকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য বহু চর প্রেরণ করে। চরগণ ছলনার সাহায্যে প্রতিপক্ষকে ভুলাইয়া ঐ গুপ্তস্থানে লইয়া আসিলে ছদ্মবেশী শত্রু বন্ধুবেশে অগ্রসর হইয়া হাসিতে হাসিতে হঠাৎ তাহাকে বন্দী

করিয়া ফেলে। নেশার আক্রমণও কতকটা এইরূপ শঠতাপূর্ণ।

মানুষের হৃদয়ে সৎপ্রবৃত্তি ও অসৎপ্রবৃত্তি—দুইই ঠিক পাশাপাশি বিরাজ করিতেছে। সৎপ্রবৃত্তি যতক্ষণ পর্য্যন্ত অসৎপ্রবৃত্তির উপর কর্তৃত্ব করিতে পারে, ন্যায়তৃষ্ণা যতক্ষণ পর্য্যন্ত অন্যায়ের উত্তেজনাকে স্বাভাবিক ভাবেই দমন করিয়া রাখিতে পারে, মানুষের প্রাণে ততক্ষণ পর্য্যন্ত যথার্থ শান্তি বিরাজ করে। পাপের বিবিধ প্রলোভনে সমস্ত মনটা যখন দুলিয়া উঠে, হৃদয়ের অসৎপ্রবৃত্তিও তখন বাহির হইতে শক্তিসঞ্চয় করিয়া লইয়া বিবেকের শাসনকে অবহেলা করিবার চেষ্টা পায়, এবং মানুষের শান্তিপূর্ণ মনে অশান্তির ঝড় উঠে। পাপ-প্রবৃত্তি যত শক্তি সংগ্রহ করিতে থাকে, হৃদয়ের এই ঝড়ের বেগও তত বৰ্দ্ধিত হইতে থাকে। পরিশেষে এমন এক সময় আসে, যখন ঝড়ের বেগ এতো বাড়িয়া যায় যে, মানুষের মন আর নিজেকে খাড়া রাখিতে পারে না, টলিয়া পাপের গভীর গর্ত্তে পড়িয়া যায়।

মানুষের মানসিক যুদ্ধের এই শোচনীয় পরিণতিই তাহার সকল প্রকার অধঃপতনের মূল কারণ। কিন্তু যুদ্ধের এই দৃশ্যটা সচরাচর আমাদের চোখে পড়ে না। সংসারের ঘূর্ণাবর্ত্তে নিমজ্জিত মানুষ নিজের মনটিকে একান্ত করিয়া দেখিবার মত অবসর বড় একটা খুঁজিয়া পায় না; তাই মনের অভ্যন্তরে সংঘটিত অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও তাহার কাছে সম্পূর্ণ অজানা থাকিয়া যায়; অথবা, মনের অন্দর মহল হইতে কদাচিৎ দু-একটা ইসারা আসিলেও সেই ইসারার অর্থোদ্ধার করাকে সে প্রয়োজনীয় কার্য্য বলিয়া মনে করিতে পারে না। এই অবহেলা বা অমনোযোগিতার ফলে মানুষ অসতর্ক হয়, এবং তাহার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে সুপ্ত পাপপ্রবৃত্তি জাগরিত হইয়া এই পরম অবসরে ধীরে ধীরে শক্তিসঞ্চয় করিয়া লইয়া অবশেষে একদিন অতি প্রবল হইয়া উঠে।

প্রবল পাপপ্রবৃত্তি সাধারণতঃ ভোগের দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষারূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। উৎকট ভোগবাসনা মানুষকে দিগ্‌ভ্রষ্ট করিয়া ফেলে, এবং বিপথকে পরম রমণীয় সুপথ বলিয়া নির্দ্দেশ করে। মানবমনের এই সময়ের বিশিষ্ট অবস্থাটিই নেশার গুপ্ত আক্রমণের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল অবস্থা!

নেশা ধরিবার পূর্ব্বক্ষণে বিবেকের নিষেধের কণ্ঠরোধ করিয়া মানুষের মনে পাপপথে অগ্রসর হইবার বহু প্রকার প্রেরণা উদিত হইতে থাকে। এই সকল প্রেরণা কতকগুলি যুক্তি দেখাইয়া মনটিকে সম্পূর্ণভাবে পাপের হস্তে তুলিয়া দিতে চায়। এই যুক্তিগুলি এমন লোভনীয় এবং শক্তিশালী যে, ইহাদের কথা ভাবিতে গেলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

একটি ছেলে যখন সিগারেট খাওয়া ধরিতে যায়, তখন তাহার মনে সাধারণতঃ এইরূপ যুক্তির উদয় হয়:—সে ভাবে, ধূমপানের অভ্যাস খারাপ কিসে? সহস্র সহস্র লোক অবিরত ধূমপান করিয়া চলিয়াছে;—উহাদের মধ্যে কাহারও তো সহসা স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বরং, আঙ্গুলের ফাঁকে সিগারেট গুঁজিয়া উহারা যখন তাহাতে লম্বা টান দেয়, এবং পরক্ষণেই হাল্‌কাভাবে কুণ্ডলীকৃত ধূম পরিত্যাগ করে তখন তাহাদের আধুনিকোচিত কায়দা দেখিলে কতজনেরই না মনপ্রাণ একেবারে বিমোহিত হইয়া পড়ে!

শারীরিক বা মানসিক যন্ত্রণা লাঘব করিবার জন্যও অনেকে নেশা ধরে। এক্ষেত্রে ছদ্মবেশী প্রলোভন উপকারকের মূর্ত্তি ধরিয়া মানুষকে প্রতারিত করিয়া থাকে। দুর্ব্বলহৃদয় ব্যক্তিগণ

সাংসারিক শোক-দুঃখকে বিস্মৃত হইবার জন্য এই জঘন্য পথে পা বাড়ায়।

যাঁহারা অম্বলের অসুখে বহু বৎসর যাবৎ ভুগিয়া সকল প্রকার চিকিৎসা করাইয়া অবশেষে সম্পূর্ণ হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই আফিং ধরেন। এই শ্রেণীর কয়েকজন রোগীকে আমি যৎকিঞ্চিৎ আহারের অব্যবহিত পরেই, বা আহারের সঙ্গেই একতাল করিয়া আফিং এবং তৎসহ খানিকটা করিয়া সোডা উদরসাৎ করিতে দেখিয়াছি। এই সকল অস্বাভাবিক অভ্যাস কিরূপ বিপজ্জনক, তাহা সহজেই অনুমেয়।

হাঁপানি বা অনিদ্রা রোগে আক্রান্ত রোগিগণকে প্রায়ই আফিং বা মর্‌ফিয়া ব্যবহার করিতে দেখা যায়। বাতরোগের প্রতিষেধকরূপেও আফিঙ্গের ব্যবহার সর্ব্বজনবিদিত।

আমাদের দেশের নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিত ব্যক্তিগণের উপর নেশার প্রভাব অত্যন্ত বেশী। সাঁওতাল, বাগ্‌দী প্রভৃতি জাতির স্ত্রী-পুরুষ ও ছেলে-মেয়ের মধ্যে মদ্য ও তাড়ির প্রচলন একেবারে আতঙ্কজনক বলিলেই চলে। দেশের এই অবজ্ঞাত ও অখ্যাত দরিদ্রগণ সারাদিনের পরিশ্রমের পর ক্লান্তিনাশের জন্য সুরাদেবীর ভজনা করিতে প্রায় বাধ্য হইয়া থাকে। তাহাদের দেহের ও মনের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কোনও স্বাভাবিক ব্যবস্থা আমরা এপর্য্যন্ত করিতে পারিলাম না!

নেশার শারীরিক ও মানসিক ফলাফল সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে দেখা যায় যে, উহা মানুষের স্বাভাবিক শান্ত মনকে উত্তেজিত অথবা নিস্তেজ করিয়া দেয়। আফিং প্রভৃতি কয়েকটি দ্রব্য শরীরের স্নায়ুসমূহকে নিস্তেজ করিয়া দেয়। প্রায় সকল প্রকার মাদকদ্রব্যই মস্তিষ্কের কেন্দ্রবিশেষকে আক্রমণ করে এবং তাহার ফলে মানুষ নিজের শরীরটিকে খাড়া রাখিয়া সোজাভাবে চলিতে পারে না।

তামাকজাতীয় মাদকদ্রব্যগুলি মস্তিষ্ক, হৃদ্‌যন্ত্র ও পরিপাকযন্ত্রের ক্ষতিসাধন করে, এবং মদ্য প্রভৃতি তরল বিষগুলি যকৃতের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে। মদ্যপায়িগণের অধিকাংশই তাই শেষে শূলবেদনার (Colic pain) রোগী হইয়া দাঁড়ায়। চা প্রভৃতি আকর্ষণগুলি অগ্নিমান্দ্য ঘটায়। সুপারি ও পানের অত্যধিক ব্যবহার যে আমাদের দেশে দন্তরোগীদের সংখ্যাবৃদ্ধির অন্যতম কারণ সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

সকলপ্রকার নেশাই মানুষের আয়ু ক্ষয় করে, এবং তাহার বল, বুদ্ধি ও মানসিক দৃঢ়তাকে ক্রমশঃ শিথিল করিয়া ফেলিয়া তাহাকে অকালে বৃদ্ধত্বে উপনীত করে। নেশায় আসক্ত ব্যক্তি সর্ব্বদাই বিবেকের দংশনে জর্জ্জরিত হয় এবং কি শরীরে কি মনে কদাপি একটুও যথার্থ সুখ বা শান্তি লাভ করিতে পারে না।

মদ্যপানের প্রবল স্পৃহায় কতলোকের সুখের সংসার ভস্মীভূত হইয়াছে, এবং কতশত শিক্ষিত ব্যক্তি এই নেশার বশীভূত হইয়া লোকসমাজে পদে পদে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইতেছেন! ধূমপানের প্রতি আসক্তি আমাদের দেশের ছাত্র ও যুবকগণের নৈতিক ও শারীরিক অধোগতির একটি প্রধান কারণ। ভারতবর্ষের অধিবাসীদের গড়পড়তা আয়ু অন্য যে কোন দেশের অধিবাসীদের তুলনায় শোচনীয়ভাবে কম; কিন্তু ইহার কারণ কি শুধু পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব? দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ, এবং বালকগণের অভিভাবকবৃন্দ যদি এই বিষয়টীর দিকে তেমন অবহিত না হন, তাহা হইলে আমাদের জাতীয় উন্নতি কোনকালে হইবে কি না, সে সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ আছে।

মানব সমাজের উপর নেশার অনিষ্টকর প্রভাবের কথা কোনোকালে কাহারও অজানা ছিল না।

প্রাচীন কাল হইতেই মানবজাতির উন্নতিকামী মহাত্মাগণ নেশার এই আধিপত্যটুকু নষ্ট করিবার জন্য যথেষ্ট প্রয়াস করিয়া আসিতেছেন ; মুসলমান ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা হইতে আরম্ভ করিয়া বুদ্ধ, মহাবীর, নানক প্রভৃতি সকলেই এই বিষয়টির দিকে যথেষ্ট মনোযোগ অর্পণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের নিঃস্বার্থ প্রচারের ফলে অনেকেই নেশার অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছিলেন। হিন্দু-ধর্ম্মের নিস্পৃহ জীবনযাত্রার আদর্শ নেশার আক্রমণকে বহুল পরিমাণে হীনবল করিয়া দিয়াছে।

তথাপি প্রকৃত কথা বলিতে গেলে, ধর্ম্মের অনুশাসন বা বাধানিষেধের ফলে মনুষ্যসমাজের উপর নেশার আধিপত্যটুকু কতটা কমিয়াছে, সেকথা ভাবিয়া দেখা দরকার। বস্তুতঃ, ধর্ম্ম এযাবৎ কখনও সার্ব্বজনীন ভাবে মানুষের পাপ-প্রবৃত্তিকে দমাইয়া দিতে পারে নাই। কাহার দোষে ইহা ঘটিল, বলা দুরূহ ; মনে হয়, দোষটা ধর্ম্মের নহে, দোষ মানবজাতির চারিত্রিক গঠনের। কারণ, কেহ কেহ ধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ হইতে তাঁহাদের চরিত্র গঠনের উপযোগী মূল্যবান উপকরণ সংগ্রহ করিয়া লইয়াছেন, একথা যদিও সত্য, তথাপি মনুষ্যসমাজের একটা বৃহত্তর অংশ যে উচ্চ আদর্শ লইয়া মোটেই মাথা ঘামায় না, একথাও মিথ্যা নহে। ভোগ ও ত্যাগের অদ্ভুত সংমিশ্রণের উপর নির্ভর করিয়াই অধিকাংশ মানুষ আজও তাহাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে ; ভোগের আকাঙ্ক্ষাকে তাহারা কখনও পুরাপুরিভাবে ত্যাগ করিতে চায় না। সুতরাং ধর্ম্মের জন্য নেশার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানোর প্রস্তাব সকলের মনঃপূত নাও হইতে পারে।

অথচ আদর্শবিহীন জীবনও কদাপি নৈতিক বা শারীরিক দুর্ব্বলতার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না। পাপের আক্রমণ রোধ করিতে হইলে, যে প্রকারেই হউক, যুদ্ধের আদর্শ একটা অবশ্যই থাকা চাই। এই আদর্শের ভিত্তি সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত চিন্তা বা স্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। অর্থাৎ দুর্ব্বলতার সহিত সংগ্রাম চালাইব কী উদ্দেশ্যে, সে সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা আমার মনে সর্ব্বাগ্রে দৃঢ় হওয়া আবশ্যক। মানসিক দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় দিলে, শারীরিক শক্তি ক্ষয় হইয়া থাকে ; সুতরাং শারীরিক শক্তি লাভের জন্য যিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাঁহার পক্ষে নেশার হাত হইতে আত্মরক্ষা করিয়া থাকা প্রয়োজন। সেইরূপ, ছাত্রগণ বুদ্ধিবৃত্তিকে সতেজ রাখার জন্য, যুবকগণ শরীরকে কর্ম্মঠ রাখিবার জন্য, ধার্ম্মিকগণ ঈশ্বরের পায়ে যথার্থভাবে মনপ্রাণ অর্পণ করিবার উদ্দেশ্যে নেশার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিতে পারেন।

আদর্শের অভাব কী? নিজের দেহটিকে কিসে আরামে রাখিব, এ সম্বন্ধে আমরা সর্ব্বদা খুব সচেতন। জগতে যে শুধু স্বার্থকেই একমাত্র পূজনীয় বলিয়া মনে করে, তাহারও আদর্শের অভাব ঘটিবে না। কারণ, স্বার্থ বলিতে যদি নিজের সুখ অন্বেষণ বুঝায়, তাহা হইলে যথার্থ সুখ কোথায় পাওয়া যায়, একথা না ভাবিলে চলে না। রুগ্ন শরীর-মন লইয়া কে কবে প্রকৃত সুখ-শান্তির আস্বাদ পাইয়াছে?

আর স্বার্থ অর্থে যদি স্বীয় মঙ্গল বুঝায়, তাহা হইলে স্বার্থলোলুপের ভাবনা তো আরও বাড়িয়া যায়! অপর দশজনের অমঙ্গল করিয়া নিজের মঙ্গল বিধান করা অসম্ভব ; এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে, তুমি পাপের পথে থাকিয়া কখনও যথার্থ তৃপ্তি পাইতে পার না। ধরিয়া লওয়া গেল, নেশা করা তোমার পক্ষে ভালো ; কিন্তু স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি যে, দেশের অধিকাংশ লোকের পক্ষেই এই অভ্যাস সর্ব্বনাশকর। তোমার নেশা করা দেখিয়া পাঁচজনে শিখিতেছে এবং তোমার সুখের পাল্লায় পড়িয়া গোটা দেশটা উৎসন্ন যাইতেছে ;—অতএব বিচার করিয়া দেখিতে গেলে, তুমি তোমার

কু-অভ্যাসের ফলে, নিজেকে লইয়া গোটা মানবজাতিটাকেই ডুবাইতেছ।

ব্যক্তিগত ভাবে আদর্শ ঠিক করিয়া লইবার পর অত্যন্ত সতর্কতার সহিত জীবনের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। আদর্শের গায়ে যাঁহারা আঁচড় পড়িতে দেন না, নেশার গুপ্ত-আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করা তাঁহাদের পক্ষে মোটেই কঠিন হইবে না। কিন্তু একথা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা উচিত যে কখন্ কোন্ দিক দিয়া কিভাবে নেশার আক্রমণ দেখা দিবে, তাহার কোনই স্থিরতা নাই। তবে ভরসার কথা এই যে, বুদ্ধিমান্ সতর্ক ব্যক্তি বিপদের গন্ধ পাইয়া সহজেই নিজেকে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করিয়া লইতে পারেন। গ্রামে ব্যাঘ্রের আবির্ভাব হইলে চতুষ্পদ জন্তুরা স্বাভাবিক ক্ষমতাবলে তাহা জানিতে পারে, এইরূপ জনপ্রবাদ; তেমনি মনের আশে পাশে প্রলোভন উপস্থিত হইলেই মানুষ স্বভাবজ শক্তিবলেই তাহা বুঝিতে পারে। মনের এই সতর্কতার ইঙ্গিত মানুষমাত্রেরই হৃদয়ে জাগে। তবে, রেলপথের ধারে 'সিগ্ন্যাল' ঠিক থাকিলেও লাইনের গোলমালে যেমন সময় সময় নানা দুর্ঘটনা ঘটিয়া যায়, সেইরূপ মনের ঐ সাবধানবাণী পুনঃপুনঃ উচ্চারিত হওয়া সত্ত্বেও আদর্শের অভাবে পথ পরিষ্কার না থাকায় মানুষ অধঃপতিত হয়। সুতরাং গন্তব্যপথটা ঠিক থাকিলে আত্মরক্ষা করা খুবই সহজ হইয়া যায়।

নেশার আক্রমণ হইতে যিনি তফাৎ থাকিতে চান, তাঁহার পক্ষে নেশাখোরদের সহিত মেলামেশা যথাসম্ভব ত্যাগ করা আবশ্যক। হৃদয়ের অস্বাভাবিক ভোগবাসনাকে তিনি অঙ্কুরে বিনষ্ট করিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট হইবেন এবং নিজেকে সর্ব্বদাই এক অদম্য শক্তিতে উদ্দৃপ্ত বলিয়া বিশ্বাস করিবেন। যদি তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহার নিকট শক্তি লাভের জন্য প্রার্থনা জানান, তাহা হইলে ফল সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম হইবে বলিয়া মনে হয়। ঈশ্বরভক্তি যে প্রলোভনকে জয় করিবার একটি সহজ ও কার্য্যকরী উপায়, একথা সকলেরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। অধর্ম্মকে দূর করিবার সহজতম উপায় ধীরে ধীরে নিজেকে উন্নত জীবনযাপনের আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া তোলা। সুতরাং যিনি চতুর, তিনি এই পথ অবলম্বন করিয়া অক্লেশে সকল প্রলোভন অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবেন।

কোনো কোনো দেশের শাসনকর্তৃপক্ষ নেশাখোর স্বদেশীয়গণের দুর্দশা দেখিয়া আইন করিয়া নেশার আধিপত্য দেশ হইতে উঠাইয়া দিতে চেষ্টা করেন। আবার অনেক স্থলে তাঁহারা মাদকদ্রব্যাদির উপর দুর্ব্বহ শুল্ক বা কর বসাইয়া প্রত্যক্ষ ভাবে রাজতহবিল ভারী করিয়া তুলিতে এবং পরোক্ষ ভাবে নেশার প্রভাবপ্রতিপত্তি কম করিতে সযত্ন হন। প্রথম ক্ষেত্রে কাজ মন্দ হয় না, কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তাঁহাদের সাধুচেষ্টা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইয়া যায়। আসল কথা এই যে, মানুষের হৃদয়ে স্বভাবতঃ যদি কোনো পরিবর্ত্তন না আসে, তাহা হইলে বাহিরের সহস্র শক্তিও সেখানে বড় একটা ঠাঁই পায় না। আইনের প্যাঁচে ফেলিয়া চোরকে দিনকতকের জন্য সাধুভাবে জীবনযাপন করিতে বাধ্য করা যাইতে পারে, কিন্তু আইন তাহাকে প্রকৃত সাধু কখনও তৈরী করিতে পারিবে না। সুযোগ পাইবামাত্র 'সাধু' তাহার লোটা কম্বল ত্যাগ করিয়া লাঠি ও সিঁদকাঠি হাতে লইবে। সুতরাং সাধু যদি সাজিতে চাও, নিজের চেষ্টাতেই সাজ, ব্যক্তিগত সামর্থ্যের উপর নির্ভর কর; বাহির হইতে শক্তি আহরণ কর আপত্তি নাই, কিন্তু অপরের মুখাপেক্ষী হইলে চলিবে না। নিজের পায়ে ভর দিয়া যে দাঁড়াইতে পারে, চলিতে পারে, পথ বলিয়া দিলে ফল হয় শুধু তাহারই; নিজের মঙ্গল যে চায় না, এজগতে কে তাহার মঙ্গল বিধান করিতে পারে?

নেশার মরণ-আলিঙ্গনে যে একবার ধরা দিয়াছে, তাহার পক্ষে সে বজ্রবন্ধন হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া বড়ই কঠিন। নেশার বিষাক্ত চুম্বনে যে ঘোর আছে, তাহার আকর্ষণ কাটাইয়া উঠা সত্যসত্যই এক দুঃসাধ্য কর্ম্ম। কিন্তু যতই কষ্টসাধ্য হউক, নেশার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া একেবারে অসাধ্য নয়। কু-অভ্যাস ক্রমশঃ একটী মানসিক রোগে পরিণত হইতে থাকে বলিয়া দৃঢ় ইচ্ছা ব্যতীত কোনো নেশাই ত্যাগ করা যায় না। দৃঢ় সঙ্কল্পই এই রোগের প্রকৃত ধন্বন্তরি। দৃঢ় ইচ্ছা শক্তি পশ্চাতে না থাকিলে হঠাৎ নেশা বন্ধ করার ফলে শরীরে যে সব অস্বস্তি প্রকাশ পায়, তাহাতেই মন অত্যন্ত কাবু হইয়া পড়ে; এবং পুনরায় নেশা না ধরা পর্য্যন্ত শরীরের এই অস্বস্তি এবং মনের এই নির্জীবভাব কিছুতেই যেন কাটিতে চায় না।

যাহারা নেশার অত্যন্ত ভক্ত, ভক্তির আধিক্য-বশতঃ তাহারা যখন কোন কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে, নিতান্ত দায়ে পড়িয়াই তাহাদিগকে হয়তো সেই সময় ভক্তির বন্ধনটিকে শিথিল অথবা ছিন্ন করিয়া দিতে হয়। তাহাদের মঙ্গল-কামী বন্ধু ও আত্মীয়বর্গ সম্ভবতঃ মনে মনে বড় আশা পোষণ করেন যে, ভক্তগণ বুঝি এইবার পরিত্রাণ পাইল! কিন্তু তাঁহাদের আশাকুসুম প্রায়ই শূন্যে মিশিয়া যায়। কারণ, রোগ হইতে মুক্ত হইবামাত্র মুক্তিকামী ভক্তগণ ছিন্ন অথবা শিথিল ভক্তিরজ্জুটিকে পুনরায় বাগাইয়া লইতে সযত্ন হইয়া থাকে।

মোহবশতঃ অনেকে ধীরে ধীরে নেশার হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার চেষ্টা করে; তাহারা জানে না, অথবা জানিয়াও একথা স্বীকার করে না যে পাপ এরূপ লঘুহৃদয় বলিদিগকে সহজে যূপকাষ্ঠ হইতে পলাইতে দেয় না। এই যূপকাষ্ঠ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে হইলে, দড়াদড়ি ছিঁড়িয়া একলম্ফে অদৃশ্য হইতে হয়;—রহিয়া বসিয়া পাঁচদিক চিন্তা করিয়া মুক্তি পাওয়ার সহজ পথ খুঁজিতে গেলে এখানে দিশাহারা হওয়া ছাড়া অন্যগতি নাই।

নেশার আলিঙ্গন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে হইলে প্রথমেই কয়েকটি বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মে হাত দিতে হইবে। প্রথমতঃ, নেশা ত্যাগ করিলে সাময়িক ভাবে শরীরে যে সকল অস্বাস্থ্যসূচক লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে, সেগুলিকে মুখ বুজিয়া সহ্য করিবার শপথ গ্রহণ করিতে হইবে; স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই সব যন্ত্রণা অল্পদিনস্থায়ী মানসিক ভ্রমমাত্র।

দ্বিতীয়তঃ, নেশা ত্যাগ করিবার পর ভবিষ্যতে কখনও কাহারও অনুরোধে ঐ পরিত্যক্ত নেশার আস্বাদগ্রহণ করিতে যাইব না—বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে। অনেক সময় নেশাখোর বন্ধুবান্ধবগণ পাপের আলিঙ্গন হইতে সদ্যমুক্ত ব্যক্তিকে অনুরোধ উপরোধ দ্বারা কৃতার্থ করিয়া তাহাকে পুনরায় ভুলপথে লইয়া যাইতে চায়;—সুতরাং এ বিষয়ে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন না করিলে পুনর্ব্বার সর্ব্বনাশ হইতে বিলম্ব হয় না।

দুরারোগ্য রোগের যন্ত্রণা যাহাদের মনকে নেশায় আসক্ত করিয়া তোলে, মানসিক দুর্ব্বলতা-বশতঃ তাহারা নেশার উপকারক মূর্ত্তিটিকে এতো বেশী ভালোবাসিয়া ফেলে যে, কোনক্রমেই তাহাদের এ ভালোবাসাটুকু কমিতে চায় না। এই শ্রেণীর দৈহিক ও মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণ নেশার হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য সাধারণতঃ কোন চেষ্টা করিতে রাজী হয় না; অথবা, কেহ কেহ একটু আধটু চেষ্টা করিলেও তাহাদের সে চেষ্টার জোর এতোই অল্প যে, তাহাতে প্রকৃতপক্ষে কোনো কাজই হয় না। এই শেষোক্ত শ্রেণীর ব্যক্তিগণকে এই বলিয়া

'আশ্বাস' দেওয়া যাইতে পারে যে, রোগযন্ত্রণার উপশম করিবার মত কোনো শক্তি নেশার নাই। নেশা যন্ত্রণাকে ভুলাইয়া দেয়, কিন্তু কখনও রোগকে স্থায়ীভাবে দূরীভূত করিতে পারে না। বিস্মৃত যন্ত্রণা দিনে দিনে সঞ্চিত হইতে থাকে এবং অবশেষে একদিন বিপুল বিক্রমে আত্মপ্রকাশ করিয়া রোগীর আশা-ভরসাকে সমূলে নাশ করে। সেই জন্যই দেখা যায় যে, পেটের অসুখের জন্য যাঁহারা আফিং ধরেন তাঁহাদের মৃত্যু সাধারণতঃ ঐ পেটের অসুখেই হইয়া থাকে। সুতরাং নেশা মানুষের বন্ধু নহে—শত্রু।

নেশার গুণমুগ্ধ রোগিগণের মধ্যে কেহ কেহ হয়তো বলিবেন, 'প্রতিদিন নিয়মিতভাবে রোগ-যন্ত্রণায় কষ্ট পাওয়ার চেয়ে, বহুদিনের বিস্মৃতির পর মৃত্যু সে তো অনেক ভালো!" কিন্তু এরূপ কাপুরুষোচিত মৃত্যু কদাপি মানুষের কাম্য হইতে পারে না। দুরারোগ্য ব্যাধি মানুষ সাধারণতঃ অসংযম ও অনিয়মের ফলে আপনি সৃষ্টি করে; সুতরাং তাহার রোগযন্ত্রণার জন্য সে অপর কাহাকেও (অদৃষ্টকে তো নহেই) দায়ী করিতে পারে না। যন্ত্রণা দূর করিবার মত ঔষধ যদি সে সংগ্রহ করিতে না পারে, নিজের সৃষ্ট রোগের কষ্টটুকুকে অবশ্যই তাহাকে সহ্য করিয়া চলিতে হইবে। এই শ্রেণীর রোগিগণ ঔষধে কোন উপকার পায় না কেন, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে দেখা যায় যে, তাহারা তাহাদের উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রার মোহটিকে কিছুতেই ত্যাগ করিতে চায় না। অনিয়মী রোগী ঔষধই সেবন করুক, অথবা নেশারই আশ্রয় গ্রহণ করুক, মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া তাহার সাধ্যাতীত।

নেশা ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প মনে মনে স্থির ও দৃঢ় করিয়া লইবার পর হঠাৎ একদিন উহার সহিত সকল সংস্রব একেবারে রহিত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। পাপের আলিঙ্গন হইতে এইরূপে মুক্তি পাইবার চেষ্টা করিলে মনের বল অত্যন্ত বাড়িয়া যায়, এবং এই বর্দ্ধিত মনোবলই মানুষকে সকল প্রলোভনের ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরে। নেশা ত্যাগ করিবার এই পন্থাই যথার্থ বীরের পন্থা। নিজের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস লইয়া এই পথ অবলম্বন করিলে, মানুষ সমস্ত প্রলোভনের মোহকেই কাটাইয়া উঠিতে পারিবে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, পাপ বা দুর্ব্বলতার চক্রান্তে পড়িয়া, দেহ ও প্রাণে হীনবল হইয়া নির্জ্জীব জড় পদার্থের মত, অথবা বিবেকবিহীন পশুর মত কোনোমতে জীবনটিকে কাটাইয়া দিবার জন্য মানুষ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে নাই। ঈশ্বরের অংশসম্ভূত মানব জ্ঞানে ও বলে, শিক্ষায় দীক্ষায়, চরিত্রের দৃঢ়তায়, পবিত্রতা ও সংযমে যে একদিন দেবত্বে উপনীত হইবে, সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই নাই। সে অনাগত যুগ কতদূরে আজও আমরা তাহা জানি না। শুধু এইটুকু জানি যে, পৃথিবীর অধিবাসী প্রত্যেকটী মানুষ যেদিন আদর্শ মানবরূপে নিজেকে জগৎ-সমক্ষে প্রকটিত করিতে পারিবেন, মানুষের সভ্যতা ও সাধনা সেদিন চরমোৎকর্ষ লাভ করিবে। আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত সাধনার বলিষ্ঠতার উপর ভিত্তি করিয়াই সেই শুভ দিনের আবির্ভাব-সংবাদ একদিন বিশ্বময় ঘোষিত হইবে।

শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের কথা

স্বামী সিদ্ধানন্দ

জনৈক ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ছেলের মৃত্যু হওয়ায় তিনি শোকে বিহ্বল হইয়া শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের নিকট আসিয়াছেন। মহারাজ সব শুনিয়া বলিলেন, 'বিপদ কিছু নয়! ছেলে কি আপনার? এই মায়ার সংসারে চিরকাল এরূপ জন্মমৃত্যু হয়ে থাকে। জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ। এ কি আপনার পুত্র? আপনার বলে কি আছে বলুন ত? সুখ ও দুঃখে সমান জ্ঞান দরকার। শোকে কেন কাতর হবেন? শরীর কি চিরদিন থাকে? মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কেন আপনি অধীর হচ্ছেন?'

মহারাজের এই কথা শুধু শুষ্ক উপদেশ মাত্র ছিল না। নিজের সুগভীর আধ্যাত্মিক উৎসধারা হইতে প্রবাহিত হইত বলিয়া পুত্র-শোকাতুর ব্রাহ্মণের হৃদয়ে তাহা প্রকৃত শান্তি আনিয়া দিয়াছিল।

* * *

লাটু মহারাজের অসুস্থাবস্থায় এক ভদ্রলোক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, আপনি তো ইচ্ছা করলেই মনের শক্তিতে নিজের ব্যাধি আরোগ্য করতে পারেন?" তিনি বলিলেন, "ভোগ শেষ না হলে আমার মুক্তি হবে না। কর্ম্মভোগ শেষ না হলে আবার জন্ম। কর্ম্ম-অনুসারে শরীরের যা ভোগ আছে হয়ে যাক, সুখ ও দুঃখ ত এই শরীরের।"

* * *

ত্রৈলোক্য নামে একটী ছেলে সাধু হইতে মঠে গিয়াছিল। অনুপযুক্ততার জন্য তাহাকে রাখা হইল না। শ্রীশ্রীলাটু মহারাজ দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে আশ্রয় দিলেন। প্রথমে ছেলেটী ভালই ছিল। শেষে তাহার ভাবের পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। সে স্বেচ্ছায় অন্য পথে চলিয়া গেল। তখন আমরা লাটু মহারাজের স্নেহ ও ভালবাসা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিলাম। ছেলেটিকে বারবার বুঝাইতেছিলেন, "ওরে তুই থাক, তুই থাক, থাকলে তোর ভাল হবে।" সে যে কি স্নেহমাখা স্বর তাহা যে শুনিয়াছে তাহারই মনে গাঁথা রহিয়াছে। কিন্তু ছেলেটীর প্রবল প্রারব্ধ! সে মহারাজের কথা শুনিল না। একটি ছেলে সাধু হইয়া শ্রীভগবানের নামে জীবন কাটাইবে ইহার জন্য সেই সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর অপার্থিব ব্যাকুলতা দেখিয়া আমরা সত্যই সে দিন অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

লাটু মহারাজ সেদিন বলিয়াছিলেন "ওরে দ্যাখ, একটী ছেলে সাধু হবে এ যেন মহা-মায়ার রাজত্বে অসহ্য। ছেলে মরে যায় সেও যেন ভাল। সাধু হবে, পবিত্র হবে, এ অবিদ্যা মায়া সব সময় বাধা দেয়।"

* * *

লেখকের পূর্ব্বাশ্রমের এক আত্মীয়া লাটু মহারাজের দর্শনার্থ কাশীতে আসেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল মহারাজের কথঞ্চিৎ সেবাদি করেন। কথা উঠিতেই মহারাজ বলিলেন, "আরে সাধুসেবা মহাপুণ্য, বিশেষ কাশীতে। তোমরা একদিন সাধুদের ভাণ্ডারা দাও।" সেই মত ব্যবস্থা হইল। লাট মহারাজের আনন্দ

আর ধরে না। তিনি সমস্ত দিন সব দেখা শুনা করিলেন। অতি ব্যগ্র ভাবে সাধুসেবার প্রয়োজনে সর্ব্বক্ষণ নিয়োজিত রহিলেন। নিজের আহার নামমাত্র। ভক্তটী ইহাতে বড় কাতর হইলেন। যাহার জন্য সব আয়োজন তিনি ত কিছুই গ্রহণ করিলেন না। ভক্তটী বারবার অনুরোধ করায় বলিলেন, "আচ্ছা—কাল তুমি আমাকে খাইও, তা'হলেই হবে।" সাধুসেবা ছিল লাটু মহারাজের সাধনার অঙ্গ। সাধুদের প্রকৃতপক্ষেই তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণ জ্ঞান করিতেন।

* * *

জনৈক ভক্ত অফিসে সাধারণ কাজ করেন। তাঁহার ছেলেপুলেও আছে ২।৩ টী। লাটু মহারাজের দর্শনাভিলাষী হইয়া আসিলে তিনি বলিলেন, "আর কেন? অল্প মাইনে। বেশী ছেলেমেয়ে হলে জড়িয়ে পড়বে। সংযমী হও। রাত্রে এখানেই শোবে। এখানেই থাক।" এই ভক্তটী বহুদিন লাটু মহারাজের সঙ্গ করিয়াছিলেন।

* * *

লাটু মহারাজ শ্রাদ্ধাদি খুঁটিনাটি কার্য্য মানিয়া চলিতেন। কোন ভক্ত কাশীধামে আসিলে গয়াধামে মৃত পিতামাতার উদ্দেশে পিণ্ডদানের আবশ্যকতা খুব জোর দিয়া বলিতেন। কেহ এ বিষয়ে আপত্তি করিলে বলিতেন, "তোমার বুঝি 'মরা গরু ঘাস খায় না' ভাব? না তা নয়, কিছুতেই নয়। এসব আছে। এসব সত্য। বিষ্ণুপাদপদ্মে পিণ্ড দিলে সত্যিই মৃতের সদ্‌গতি হয়। আর ওখান (গয়াধাম) থেকেই তো ঠাকুরের উৎপত্তি। ওস্থানের মাহাত্ম্য আছে বৈ কি!"

* * *

একবার জনৈক ভদ্রলোকের মাতাঠাকুরাণী দুর্ঘটনায় মারা যান। গয়াধামে প্রেতশিলায় তাঁহার উদ্দেশে পিণ্ডদানের জন্য লাটু মহারাজ নিজে তত্ত্বাবধান করিয়া সমস্ত ব্যবস্থাদি করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রাদ্ধকালে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি বলিয়াছিলেন, "সাধুর শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মে উপস্থিত থাকা ভাল নয়। সাধুর এসব কাজের সময় থাক্‌তে নেই।"

* * *

একবার জনৈক ভক্ত লাটু মহারাজকে চিঠি লিখেন যে তাঁহার কন্যার বিবাহ দিবেন না। লাটু মহারাজ বলিয়াছিলেন, "না না, কখনই না, মেয়ের সংস্কার নষ্ট করে দিতে লিখে দে। সংস্কার নষ্ট হয়ে যাবার পর মেয়ে বাপের বাড়ীতে থাক্‌তে পারে।" একদিন তিনি বলিয়াছিলেন, "ওরে বাপমার সেবা হাজার টাকা থাকলেও ছেলেরা করে না, মেয়েরাই করে। তাই মেয়ের বিয়ের সংস্কার নষ্ট হয়ে গেলে সে বাপমার কাছে থাক্‌লে তাদের ভাল হয়।"

* * *

রামরাজাতলার শঙ্কর মঠের মোহান্ত একবার লাটু মহারাজকে দর্শন করিতে আসেন। মহারাজ তখন কাশীধামে এক ভাড়াটিয়া বাড়ীতে থাকিতেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি তাঁহাকে তাঁহার মঠের খবর জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, "মহারাজ, তাঁর ইচ্ছায় ভাল ভাবেই চল্‌ছে, আমি আর কি? তিনিই ত সব।" তখন উক্ত সন্ন্যাসীর সুনাম বাহির হইয়াছিল এবং শঙ্কর মঠেরও বেশ খ্যাতি হইয়াছিল। লাটু মহারাজ তাঁহার কথায় উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "এ কি? তোমার এই দীনহীনভাব কেন? আমি জানি করনেওয়ালা তিনি। কিন্তু এই ভাব ভিতরে রাখাই ভাল। বল্‌তে হবে বই কি যে, এ বাড়ী আমার, এসব আমার। এই যে আমি এই বাড়ীভাড়া করে আছি, তা কি বলব না? বলব বই কি। ওভাব ভিতরে থাক্ যে তিনিই সব।" পরে তাঁহাকে বলিলেন, "কাল এখানে তুমি

খাবে, আমি কিন্তু মাছ খাই। তুমি আমার সঙ্গে খাবে তো?" সন্ন্যাসী একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "খাবো"। পরদিন বহু যত্ন করিয়া তাঁহাকে পরিতোষসহকারে খাওয়াইয়াছিলেন এবং নিজে তাঁহার পাশে বসিয়া মাছ খাইয়াছিলেন। লাটু মহারাজ প্রত্যহই যে মাছ খাইতেন এমন নহে। কিন্তু উক্ত সন্ন্যাসীর ভাব পরিবর্ত্তনের জন্য ঐরূপ করিয়াছিলেন।

* * *

কাশীধামে অনাদি শিব তিলভাণ্ডেশ্বর দর্শন করিবার কথা আমাদের প্রায়ই বলিতেন। ওখানে যে সকল সন্ন্যাসী বিগ্রহের সেবাদি করেন, তাঁহাদের বড়ই কষ্ট। একবার ওখানকার জনৈক সাধু প্রসাদ নিতে আসেন। তাঁহার খুব সর্দ্দি হইয়াছিল। লাটু মহারাজ তাঁহাকে চা খাইতে বলেন। তিনি বলিলেন, "মহারাজ, চা খেয়ে কি হবে? ভোর ৪টায় উঠে গঙ্গাস্নান করে প্রভুর পূজো তো করতে হবে? এখন সামান্য চা খেয়ে আর কি উপকার পাবো?" উত্তর শুনে লাটু মহারাজ বলিলেন, "দেখ দেখি, ওরা কত কষ্ট করে প্রভুর সেবা করে? ওদের খুব কল্যাণ হবে।"

* * *

একদিন লাটু মহারাজ জনৈক স্ত্রীভক্তকে বলিয়াছিলেন, "শুধু গঙ্গাস্নান করে আর কি হবে? দুমুঠো চাল ভিখিরিকে দিও, তাতে অশেষ কল্যাণ হবে। সকলকে পয়সা দিতে না পার, একজনকে দুমুঠো চালও দিও, নইলে শুধু গঙ্গাস্নানে কি ফল?"

সমালোচনা

ভারতের পরিচয়—শ্রীমতী নলিনীপ্রভা দত্ত, এম্-এ প্রণীত। প্রকাশক বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪নং বঙ্কিম চাটুর্জ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১১৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, মূল্য একটাকা।

ভারতে—বিশেষতঃ বাংলাদেশে কিরূপ আদর্শে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন হওয়া উচিত বিদুষী লেখিকা তাই নিয়ে কয়েকটী প্রবন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। বইখানির সুদীর্ঘ ভূমিকার উপসংহারে তিনি বলেছেন, "শিক্ষাসম্বন্ধে যে সব আলোচনা করেছি তাতে সর্ব্বসাধারণের শিক্ষার বিষয় উল্লেখ আছে সত্য, কিন্তু মেয়েদের শিক্ষার বিষয়ই আমার 'ভারতের পরিচয়ের' প্রধান উদ্দেশ্য। গ্রন্থ-রচয়িত্রীর গভীর চিন্তাশীলতা, উদার দৃষ্টিভঙ্গী, প্রবল স্বদেশানুরাগ এবং ভারতীয় আধ্যাত্মিক আদর্শে একান্ত শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা আলোচ্য বিষয়কে সমুজ্জ্বল করেছে। শিক্ষার নামে যে বিজাতীয় বিষ শিক্ষিত সমাজে প্রবেশ করে সমগ্র জাতকে দুর্ব্বল ও জাতীয় আদর্শে আস্থাহীন করে তুলছে তার প্রতিকারকল্পে শিক্ষার কিরূপ ব্যবস্থা ও আদর্শ হওয়া কর্ত্তব্য লেখিকা নানা যুক্তিসহায়ে আবেগ-ময়ী ও মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় তা লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি আক্ষেপ করে লিখেছেন, "অনুকরণ-বৃত্তিসম্পন্ন, পরানুগ্রহ-ভিক্ষাবৃত্তিধারী ভারতের অধিবাসী এককালে তাদের আত্মার সন্ধান করেছিল ইংলণ্ডে, আর এখন করছে রাশিয়ায়।"

বইখানির ভাষা ঝর ঝরে সতেজ, মধুর ও প্রাঞ্জল। প্রচ্ছদপটটী অতিসুন্দর হয়েছে। এর পরিকল্পনা করেছেন শ্রীযুত আশু বন্দ্যোপাধ্যায়।

"ভারতের পরিচয়ে"র এই খণ্ড প্রথম অংশ। লেখিকা ভূমিকায় লিখেছেন "শীঘ্রই দ্বিতীয় অংশ বাহির হইবে।" আমরা তার প্রতীক্ষায় রইলাম। শিক্ষিত সমাজে এই গ্রন্থের যে আদর হবে এ বিষয়ে আমাদের অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

(১) এ পৃথিবী আমার নয়, (২) ছোটও কিশোরদের গান, (৩) শেষ তীর্থ এ পৃথিবী—দিগন্ত সেন প্রণীত। তিনখানিই কবিতার বই। প্রথম বইখানি ১৬।২ জে, ডোভার লেন, বালিগঞ্জ, কলিকাতা-স্থিত নূতন সাহিত্য ভবন হইতে প্রমোদ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক এবং শেষোক্ত দুইখানি ২৩, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-স্থিত আর, এন্ চ্যাটার্জী এণ্ড কোং হইতে শ্রীরামগোবিন্দ চ্যাটার্জী কর্তৃক প্রকাশিত। প্রথম বইখানির মূল্য ১৲ এবং অন্য দুইখানির প্রত্যেকখানির মূল্য ১।০।

প্রথম বইখানি গদ্য কবিতাসমষ্টি। অতি আধুনিক বাংলা সাহিত্যে গদ্য কবিতার বেশ প্রচলন হইয়াছে। সমালোচনার নিষ্করুণ কশাঘাতে ইহা প্রথম অবস্থাতে পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু আঘাতের ভিতর দিয়াই পরোক্ষভাবে কবি-প্রতিভা তাহার সৌরভ বিকিরণ করিয়াছে। গদ্য কবিতার একটি আন্তর ছন্দোবন্ধন রহিয়াছে। এই বন্ধনই ইহাকে ব্যবহারিক গদ্য হইতে পৃথক করিয়াছে—কবিতাপদবাচ্য করিয়াছে। বইখানিতে নয়টি কবিতা আছে। কবি বিশ্বমাতৃকার উপাসক। তাঁহার প্রাণ চায়—

অসংখ্য মার আহ্বানে
একদিন আমার আপন মার কাছে
ফিরে যাবো;
যে মা সব মার হয়ে
আমাকে কোলে তুলে নেবে,
অসীমের অনন্ত স্নেহে।

* * *

তারপর একদিন ঘুমিয়ে পড়বো
শিশুর মতো হয়ে,
জন্ম জন্মান্তরের ব্যক্তিত্বের অভিমান হারিয়ে,
চির সুষুপ্তির মাধুর্যে,
সেই অনন্তলোকের পরম মাতৃত্বের স্বর্ণাঞ্চলে।

'এ পৃথিবী' সত্যই 'আমার নয়'। এই পৃথিবী আমাকে দিয়াছে কি? প্রেমের ব্যর্থতা, বাসনার লোলুপতা—এই ত পৃথিবীর মাটিতে আমার সঞ্চয়। ছিলাম স্বর্গের দেবতা, ফিরিয়া যাইব মর্তের পুঞ্জীভূত কালিমা লইয়া। 'হেথা সুখ ইচ্ছ মতিমান্?' আমাদের কবিও পৃথিবীর ধূলিজর্জরিত হইয়া নির্বিণ্ণ—

একদিন দুঃসাহসে ভর করে
এসেছিলুম এ জগতে
মায়ার অলীক প্রহসন দেখে নিতে,
স্বর্গের দৌলত খাটিয়ে;
আজ ধিক্কার আসে,—
কোন কুগ্রহের হানাবাড়ীতে
একটা মূল্যবান জীবনের রাত কাটালুম।

অনবদ্য সুন্দর ও অনাবিল রসপরিবেশক দিগন্ত সেনের কবিতা-সৌরভ দিগন্তে বিস্তৃত হউক।

দ্বিতীয় বইখানিতে ১৫টি গান আছে। প্রত্যেকটির স্বরলিপি দেওয়া হইয়াছে। হিমালয়-প্রশস্তিতে কবি গাহিয়াছেন—

প্রোজ্জ্বল-জ্যোতি-ধ্যায়ক মহা-গৈরিক আশ্রয়,
সুন্দর-শিব-সত্য-তত্ত্ব-মস্তক হিমালয়।

দলিত পিষ্ট সর্বহারার দুঃখেও কিশোর প্রাণ কাতর। তাই তাহাদের কেবলমাত্র আনন্দের কলকাকলী নয়, তাহাদের সঙ্গীতের মধ্যে আজ সৌহার্দ্য ও সমবেদনার ঝঙ্কার—

আমরা যে ভাই
দুখিদের গান গাই,

যারা নিত্য দুঃখে, বিষাদ মুখে
বইছে বেদন যুগে যুগে,
তাদের মোরা ডেকে ডেকে
আনবরে সবার আগে।

নবযুগের কিশোরের স্বপ্ন হইল যুগ যুগান্তের যাহা কিছু অন্যায়, যাহা কিছু অসত্য তাহাকে বিতাড়িত করিতে হইবে, ধরণীকে মেঘনির্মুক্ত চন্দ্রের মত নির্মল এবং নবভাবের দীপ্তিতে ভাস্বর করিয়া তুলিতে হইবে—

জয় হ'ল ধরণীতে কাহাদের,
শোন শোন সে যে হবে আমাদের।
ধরার বুকে অগ্নিবাণী দেবো হানি,
ঘুচাব হে হিংসা দ্বন্দ্ব দুঃখ গ্লানি।
জাগাবো রে বার বার নূতনের ছন্দ,
মিথ্যার দুয়ার রবে যুগে যুগে বন্ধ।

কবি দেখিতেছি পৃথিবীর প্রতি আবার আকর্ষণ অনুভব করিতেছেন। কিশোরদের সঙ্গে সুর মিলাইয়া তিনি নূতন পৃথিবীর পরিকল্পনায় বিভোর—

ধরায় রচিব তীর্থ-লোক,
রথের মন্ত্র ধ্বনিছে ধূলি,
প্রভাতী গাহিবে আঁধারের রাত্রি
চলার পথের চলেছি যাত্রী।

কিশোরের স্বপ্ন সার্থক ও বাস্তবে রূপায়িত হইবে নিঃসন্দেহে। 'সুদিনের লাগি' আর বসিয়া থাকিতে হইবে না।

তৃতীয় বইখানিতে কবি দুঃখবাদী (pessimist) নন। একদিন পৃথিবীকে তিনি আপন মনে করিতে পারেন নাই। আজ কিন্তু তাঁহার কাছে 'শেষ তীর্থ এ পৃথিবী'। আজ তিনি শান্ত, সমাহিত, দুঃখ-শোকের সংঘাতের বাহিরে, নির্দ্বন্দ্ব; আজ তাঁহার সঙ্কল্প—

তোমায় দেখে নিতে হবে, সেই অঙ্গুষ্ঠমাত্র মহান্ পুরুষকে।

দুর্জ্জয় জগতের পার্ব্বত্য মন্দিরে।

এই মাটির পৃথিবীর দুর্গন্ধ আবেষ্টনী কবিকে আর পীড়িত করে না, এখানেই তাঁহার অন্তিম আকূতি—

আমার এ অহং পৃথিবীকে ব্যাপ্ত করে আছে
তাই এ ক্রন্দন,
এ সংসার।

*　　　　　*

হে বিধাতা! আমার এ অহংকে
তোমার সবল হস্তে
মুছে দিতে পারো দাও;
যে কলঙ্ক আমার পরম জ্যোতিকে
কত কাল থেকে ঢেকে রেখেছে!
তাহলে আমি একবার মুক্তির আনন্দে
অট্টহাসি হেসে উঠতে পারি,
—আমি ঐ অথর্ব্ব মিথ্যাকে
জয় করেছি!

এই 'অথর্ব্ব মিথ্যার' জগদ্দল পাথর আমাদের বুকের উপর। তাহাকে অপসৃত করিতে হইবে ত্যাগ দ্বারা, বীর্য দ্বারা, নির্দ্বন্দ্বভাবের আশ্রয় দ্বারা। তবেই ত হইবে 'শেষ তীর্থ এ পৃথিবী'!

উপরি-উক্ত তিনখানি বইয়েরই মুদ্রণপ্রভৃতি প্রশংসনীয়। ইহাদের বহুল প্রচার কামনা করি।

অধ্যাপক শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, এম্-এ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

আচার্য শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব—আগামী ১০ই মাঘ বৃহস্পতিবার আচার্য শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের চতুরশীতিতম জন্মতিথি-পূজা অনুষ্ঠিত হইবে।

কলিকাতা, বাগবাজার, শ্রীশ্রীমায়ের বাটীতে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জন্মোৎসব—গত ১০ই পৌষ শ্রীশ্রীমায়ের বাটীতে শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণীর জন্মতিথিপূজাদি যথানিয়মে সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে প্রায় এক হাজার ভক্ত নরনারী উপস্থিত হইয়াছিলেন।

জয়রামবাটী মাতৃমন্দিরে শ্রীশ্রীমাতা ঠাকুরাণীর জন্মোৎসব—গত ১০ই পৌষ পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর শুভ ত্রিনবতিতম জন্মোৎসব সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্ত নরনারীর সমাগম হইয়াছিল। অতি প্রত্যুষ হইতেই পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ ও ভোগাদির পর প্রায় এক হাজার ভক্ত নরনারী প্রসাদ পাইয়াছিলেন। সন্ধ্যায় আরাত্রিক ও ভজনের পর শ্রীশ্রীমার পূতজীবনী পঠিত হইলে অধ্যক্ষ স্বামী পরমেশ্বরানন্দজী শ্রীশ্রীমার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া সকলকে আনন্দ দান করেন।

পুরীতে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জন্মোৎসব—গত ১০ই পৌষ স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশন বিধবা ভবনে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জন্মোৎসব সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ভোরে মঙ্গল-আরাত্রিক ও ভজন, পূর্বাহ্ণে পূজা হোম ও চণ্ডীপাঠ হয়। মধ্যাহ্নে স্থানীয় কালী-কীর্তন সম্প্রদায় কর্তৃক কীর্তন হইবার পর প্রায় পাঁচ শত ভক্ত আশ্রমে বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্নে প্রায় চারি শত দরিদ্র-নারায়ণের সেবা এবং সন্ধ্যায় আরাত্রিক ও ভজন হয়। পরদিন স্থানীয় বালিকাদের অভিনীত "সাবিত্রী সত্যবান" নাটকটি বেশ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। সহরের বহু বিশিষ্ট ভদ্রমহিলা এই নাটককাভিনয় দর্শনে বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছেন।

বেদান্ত সোসাইটি, উত্তর ক্যালিফোর্নিয়া, স্যান্‌ফ্যান্‌সিস্‌কো—এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দজী গত নভেম্বর মাসে প্রতি রবিবার ও বুধবার নিম্নলিখিত বক্তৃতা দিয়াছেন: (১) "ভগবান্ জীবনস্বরূপ এবং ভগবান মৃত্যুস্বরূপ" (২) "প্রকৃত মানব ও দৃষ্ট মানব" (৩) "স্বতঃ-সিদ্ধ জ্ঞানের অভ্যাস" (৪) "সমষ্টিজ্ঞান বনাম ব্যষ্টি জ্ঞান," (৫) "আপনারা কেন জন্মিয়াছেন?" (৬) "কঠোর অভ্যাসসমূহ, ধর্মজীবনে উহাদের স্থান" (৭) "কিভাবে আমরা ভগবানকে দর্শন করিতে পারি?" (৮) "ঈশ্বরের সঙ্গে বিচরণ"।

এতদ্ব্যতীত প্রতি শুক্রবার তিনি বেদান্তশাস্ত্র আলোচনা ও নারদীয় ভক্তিসূত্র পাঠ করিয়াছেন এবং সমাগত ব্যক্তিগণকে ধ্যান-ধারণাদি শিক্ষা দিয়াছেন। ছেলেবেলা হইতেই যাহাতে বালক-বালিকাগণ সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন ও জগতের সকল ধর্মগুরুর প্রতি ভক্তিপরায়ণ হয় এবং ধর্মজীবন যাপনে ব্রতী হইতে পারে তজ্জন্য প্রতি রবিবার স্বামীজী তাঁহাদিগকে বেদান্ত শাস্ত্রাবলম্বনে উপদেশ দান করিয়াছেন।

রামকৃষ্ণ বেদান্ত কেন্দ্র, সিয়াট্‌ল্, ওয়াশিংটন—১৯৪৪ সনের অক্টোবর হইতে ১৯৪৫ সনের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কার্য-বিবরণী—যুদ্ধজনিত নানাপ্রকার বিপর্যয়ের মধ্যদিয়াও এই প্রতিষ্ঠানটি আলোচ্য বর্ষে সন্তোষজনক ভাবে কার্য করিয়াছে। আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী বিবিদিষানন্দজী

প্রতি রবিবার সাধারণ্যে বিভিন্ন বিষয়ে বেদান্তের 'চিন্তা ও অভ্যাস' (theory and practice) অবলম্বনে বক্তৃতা দিয়াছেন। প্রতি মঙ্গলবার শ্রীমদ্ভাগবত এবং প্রতি শুক্রবার শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত ও পতঞ্জলির যোগদর্শন পাঠ করিয়াছেন এবং প্রতি শুক্রবার আশ্রমের সভ্য ও ছাত্রদিগকে ধ্যান-ধারণাদি শিক্ষা দিয়াছেন।

আলোচ্য বর্ষে আশ্রমে শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গাপূজা বিশেষ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর জন্মতিথি-পূজা সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তিথি-পূজা উপলক্ষে পোর্টল্যাণ্ড বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী দেবাত্মানন্দজী শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও উপদেশ সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ভগবান বুদ্ধদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে স্বামী বিবিদিষানন্দজী বুদ্ধদেব সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। এতদ্ব্যতীত এখানে বড়দিন এবং "ইষ্টার" উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই প্রতিষ্ঠান-পরিচালিত লাইব্রেরীতে ভারতীয় ধর্ম, দর্শন ও সংস্কৃতি সম্বন্ধীয় অনেক নূতন পুস্তক সংগ্রহ করা হইয়াছে।

আশা করা যায় যে সর্ববিধ্বংসী যুদ্ধের অবসান হওয়ায় স্বভাবতই শ্রান্ত ক্লান্ত জনগণের অনেকে বেদান্তের সুমহান্ আদর্শের মধ্যে আশ্রয় এবং শান্তি পাইবেন।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র—গত ২৬শে অগ্রহায়ণ অবসরপ্রাপ্ত বিচারক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় ৫৫বি মহানির্বাণ রোড, কলিকাতা, নিজভবনে ৬২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। ন্যায়বান বিচারক ও সুসাহিত্যিক বলিয়া তিনি খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। পরলোক সম্বন্ধে তৎপ্রণীত "লোকান্তর" নামক গ্রন্থখানি সুধীসমাজে বিশেষ সমাদৃত। "পারায়ণ" নামে তাঁহার অপর একটি ধর্মগ্রন্থ যন্ত্রস্থ। সুরেন্দ্র বাবু শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। তাঁহার ধর্মপ্রাণতা, নিরভিমানিতা ও পরার্থপরতা আদর্শস্থানীয় ছিল। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি।

পরলোকে শ্রীযুক্তা ইন্দুপ্রভা দেবী—'বসুমতী সাহিত্য মন্দির' এবং 'দৈনিক বসুমতী'র স্বত্বাধিকারী স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা ইন্দুপ্রভা দেবী গত ২রা পৌষ বেলা ১২-৪৫ মিনিটের সময় ৪৬ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার একমাত্র সুযোগ্য পুত্র শ্রীমান রামচন্দ্রের মৃত্যুর দুই মাসের মধ্যেই তাঁহার স্বামীও পরলোক গমন করেন। এই নিদারুণ দুর্ঘটনাজনিত শোকই তাঁহার মৃত্যুর প্রধান কারণ। তাঁহার চারি কন্যা ও একমাত্র পৌত্রী বিদ্যমান।

ইন্দুপ্রভা দেবী কটকের ব্যবহারজীবী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা ছিলেন। তাঁহার ধর্মভাব ও দানশীলতা প্রশংসনীয় ছিল। তিনি তাঁহার স্বর্গীয় পুত্রের স্মৃতিরক্ষার্থ খড়দহের নিকট রহড়া গ্রামে একটি অনাথালয় প্রতিষ্ঠার জন্য আসবাবসহ কয়েকটি বাড়ী ও বাগান, তিন লক্ষ টাকার কোম্পানী কাগজ ও নগদ দশ হাজার টাকা রামকৃষ্ণ মিশনকে দান করিয়াছেন। তথায় রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক একটি 'বালক আশ্রম' পরিচালিত হইতেছে। এতদ্ভিন্ন তিনি তাঁহার স্বর্গীয় স্বামীর ইচ্ছানুসারে

নারিকেলডাঙ্গায় (সুরো) "উপেন্দ্রনাথ মেমোরিয়াল হাসপাতাল" স্থাপন করিয়াছেন।

আমরা এই পুণ্যশীলা মহিলার পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি।

গৌরীপুরে (আসাম) শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জন্মোৎসব—গত ১০ই পৌষ শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জন্মতিথি উপলক্ষে এখানে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে প্রাতে মঙ্গল আরতি, বাল্যভোগ, পূর্বাহ্নে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর বিশেষ পূজা, হোম ও চণ্ডীপাঠ, মধ্যাহ্নে ভোগ, অপরাহ্নে মহিলা-সম্মেলন, সন্ধ্যায় আরতি ও রাত্রে কীর্তন হয়। শ্রীযুক্তা অবলাবালা গাঙ্গুলী মহাশয়া সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভায় বহু মহিলা আগমন করিয়া শ্রীশ্রীমাতৃ দেবীর পবিত্র জীবন-কথা শ্রবণ করেন। প্রসাদ বিতরণের পর উৎসবকার্য শেষ হয়।

সাতক্ষীরা (খুলনা) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথিপূজা—গত ১০ই পৌষ এই প্রতিষ্ঠানে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি-পূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এইদিন পূর্বাহ্নে শ্রীশ্রীঠাকুরের ও শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজাদির পর মধ্যাহ্নে মহিলা ভক্তগণ প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় আশ্রমের ভজনাদি অন্তে আশ্রমের সভাপতি শ্রীযুক্ত নির্মলকুমার ঘোষ মহাশয় শ্রীশ্রীমায়ের জীবনাদর্শ সম্বন্ধে বক্তৃতা দান করিলে উৎসব কার্য শেষ হয়।

বিবেকানন্দ সোসাইটি, কলিকাতা—গত পৌষ মাসে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী, পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজ ও শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের শুভ জন্মতিথি সোসাইটি-ভবনে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে বেলুড় মঠের স্বামী নির্লেপানন্দজী শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী ও শ্রীশ্রীবাবুরাম মহারাজের এবং স্বামী সুন্দরানন্দজী শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের দিব্য জীবনী আলোচনা করেন। পূজা-অর্চনা, শ্রীশ্রীকালীকীর্তন, শ্রীশ্রীরামনামসংকীর্তন ও প্রসাদ বিতরণ উৎসবের অঙ্গ ছিল। শ্রীযুক্ত রমণী কুমার দত্তগুপ্ত, বি-এল মহাশয় বড়দিন উপলক্ষে "যীশুখৃষ্টের আবির্ভাব ও বাণী" এবং ১লা জানুয়ারী শ্রীরামকৃষ্ণ-কল্পতরু দিবসে "কল্পতরুর ইতিহাস ও সার্থকতা" এবং "গুরু-শিষ্য-দীক্ষা" সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

কলমা (ঢাকা) রামকৃষ্ণ সেবা-সমিতিতে শ্রী শ্রী মা তা ঠা কু রা ণী র জন্মোৎসব—গত ১০ই পৌষ এই প্রতিষ্ঠানে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জন্মোৎসব সুন্দর ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের স্বামী হরিহরানন্দজী এবং স্বামী নির্বেদানন্দজী এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ায়, ইহা স্থানীয় ভক্তমণ্ডলীর নিকট বিশেষভাবে উদ্দীপনাপ্রদ হইয়াছিল। দূরবর্তী অঞ্চল হইতেও বহু প্রবীণ ও নবীন ভক্ত সাগ্রহে উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। পূর্বাহ্নে মহিলাদের ভজন এবং শ্রীশ্রীমায়ের কথা পাঠ হয়। মধ্যাহ্নে প্রায় দুইশত নরনারী প্রসাদ গ্রহণে পরিতৃপ্ত হন। অপরাহ্নে স্বামী হরিহরানন্দজীর সভাপতিত্বে আহূত এক সভায় শ্রীযুক্ত বিনোদেশ্বর দাসগুপ্ত, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র কান্ত সরকার, স্বামী নির্বেদানন্দজী ও সভাপতি মহারাজ শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর প্রসঙ্গ আলোচনা করেন। কুমারী আনন্দময়ী মাঝে মাঝে ভক্তিরসাপ্লুত ভজন সঙ্গীত গাহিয়া সকলকে আনন্দ দেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-কল্পতরু উৎসব—গত ১৭ই পৌষ কলিকাতা বিডন্ ষ্ট্রীটস্থ শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকুমার নাগ মহাশয়ের বাসভবনে এই উৎসব সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতিকৃতি সুন্দর রূপে সাজান হইয়াছিল। পূজাদি অন্তে বহু ভক্ত নরনারী প্রসাদ গ্রহণে পরিতৃপ্ত হন। অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত রমণীকুমার দত্তগুপ্ত, বি-এল, শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেন ও স্বামী সুন্দরানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কল্পতরু ভাবগ্রহণ সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

উদ্বোধন

পরমহংসদেব

স্বর্গীয় জগৎ মোহন সেন

যথা যথা হয় ধর্মের গ্লানি
তথা তথা তুমি আবির্ভূত
তাই তথাগত যুগে যুগে তুমি
এই পৃথ্বীরে করিলে পূত।
এবার আসিলে অক্ষরহীন
দীন পূজারীর ছদ্মরূপে,
বজ্র অনল জ্বালিবার তরে
ভেদবুদ্ধির অন্ধকূপে।
গোষ্পদ কূপ হ'ল একাকার
তব করুণার কলস্রোতে,
উদার বক্ষে কূপমণ্ডূকে
বিলালে মুক্তি বিমোহ হ'তে।
ভোগবতী হ'য়ে হারাল শুদ্ধি!
বঙ্গের বুকে গঙ্গামাতা,
তাই তারি কূলে গেরুয়া ঝাণ্ডা
তুলিলে আবার যুগত্রাতা।
বিশ্বমানবে বাঁধিলে উদার
প্রেমের অটুট কঠিন ডোরে,
আজো যদি বলি তুমি চলে গেছ,
সে শুধু আপন মোহের ঘোরে।
আজি হেরি তুমি কোটিধা হয়েছ
বহু কোটি কোটি জীবন ভরি'
অগণন নর-নারায়ণ মাঝে
হে দেবতা তোমা প্রণাম করি
সহস্রশিরা, সহস্রাক্ষ,
সহস্রপাদ তোমারে নতি,
অণোরণীয়ান্ মহামহীয়ান্
প্রণমি তোমারে বিশ্বপতি।

বেদান্ত এবং কম্‌মিউনিজম্‌*

সম্পাদক

পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ তৎপ্রণীত "বর্তমান ভারত" নামক বাংলা পুস্তকে লিখিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারি বর্ণ পর্যায়ক্রমে মানব-সমাজের উপর প্রভুত্ব করিবে। মানবেতিহাসের প্রারম্ভে সমাজের উপর ব্রাহ্মণদের আধিপত্য ছিল। তখন দলের প্রধান ব্যক্তি কেবল প্রধান শাসক ও আইন-প্রণেতা ছিলেন না, পরন্তু প্রধান পুরোহিতও ছিলেন। পুরোহিতকুলের প্রাধান্য হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষাত্রশক্তি বা সামরিক জনশক্তি মস্তক উত্তোলন করে। ইহাকে শৌর্য বা শস্ত্রদক্ষতার যুগ বলা হয়। এই যুগে রাজা ও প্রধান নায়কগণ পৌরুষ ও শারীরিক শক্তি বলে সমাজের উপর কর্তৃত্ব করিয়াছেন। পরবর্তী কালে শ্রমশিল্প ও বাণিজ্যবিস্তার এবং শক্তিশালী ব্যবসা-সংঘসমূহের উন্নতির ফলে মহাজন ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর ধনিকগণ জনগণের উপর সর্বাপেক্ষা বেশি প্রভাব বিস্তার করেন এবং যোদ্ধা বা ক্ষত্রিয়গণ ধনিকদের নিয়োজিত ভৃত্যরূপে নিম্নস্থান প্রাপ্ত হন। এই মহাজন ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর ধনবানগণ বা সকল জাতির বৈশ্যগণ মানব-সমাজের উপর এখনও প্রভুত্ব করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের দিন শেষ হইয়াছে। এই শ্রেণীর প্রভাব ও শক্তি যে শীঘ্রই শূদ্রশ্রেণীর করতলগত হইবে তাহার সকল লক্ষণ দেখা যাইতেছে। এই শূদ্রগণই কৃষিক্ষেত্রের চাষী ও কারখানার শ্রমিক। সমাজের নিম্নস্তরের এই নর-নারীগণই ধনিকদের মিলের এককালীন পেষণীয় শস্যবিশেষ! স্বামীজীর ভবিষ্যৎ বাণী—এই শূদ্রশ্রেণীই তাহাদের লাংগল কাস্তে ও হাতুড়ি লইয়া অভ্যুত্থিত হইবে এবং সমাজ পরিচালন করিবে।

বলসেভিক রাশিয়ার জার্মানবিজয় স্পষ্টরূপে ভবিষ্যৎ ইহাই নির্দেশ করিতেছে যে, কম্‌মিউনিষ্ট্‌ রাশিয়া বর্তমান ইউরোপের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিবে এবং তাহার (রাশিয়ার) মনোবিজ্ঞান পরবর্তী বংশধরগণের সমাজ-জীবন নূতন করিয়া গঠন করিতে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করিবে।

ভারতবর্ষেও আমরা এই নূতন আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া হইতে মুক্ত থাকিতে পারিব না। সম্প্রতি কম্‌মিউনিষ্ট্‌ শ্রমিক কৃষাণ ও অন্যান্য আন্দোলনের ভিতর দিয়া ইহার অনেক লক্ষণ দেখা যাইতেছে। ইহাদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, কোন্‌ দিকে হাওয়া বহিতেছে। স্বামী বিবেকানন্দ দৃঢ়তা সহকারে বলিয়াছেন—কৃষিক্ষেত্র, হাট-বাজার, শ্রমিকদের জনাকীর্ণ জীর্ণ কুটির এবং কুলীদের শোচনীয় বস্তি হইতে নূতন ভারত অভ্যুদয় লাভ করিবে। উচ্চবর্ণ এই নবোত্থিত জনগণকে সম্পূর্ণ সাহায্য করিবে অথবা শূন্যে বিলীন হইবে। ইহা নিশ্চয়ই হইবে এবং কেহই এই স্রোতের গতি রোধ করিতে পারিবে না। বর্তমান ভারতের মালিক ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বৈশ্যমনোবৃত্তি বা দোকানদারী মস্তিষ্কসঞ্জাত। শূদ্রশ্রেণীর নব আন্দোলনের ফলে যে শক্তি উদ্ভূত হইবে, উহার নিকট এই গবর্ণমেণ্টকে ক্ষমতা অর্পণ করিতেই হইবে।

কিন্তু এই শূদ্র-জাগরণসহজাত একটি বিপদ আছে। যদি শূদ্রগণ উচ্চশ্রেণীর সংস্কৃতিবর্জিত হইয়া

* "Prabuddha Bharat" পত্রিকায় শ্রীমৎ স্বামী শর্বানন্দ মহারাজ লিখিত "Vedanta and Communism" শীর্ষক প্রবন্ধের অনুবাদ।

শূদ্ররূপেই অভ্যুত্থিত হন, তাহা হইলে ইহাই সম্ভব যে, তাঁহাদের প্রাধান্যকালে স্থূল শারীরিক বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হইবে। ইহার ফলে ভারতের প্রাচীন আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি জড়বাদের স্তূপের নিম্নে সমাধি লাভ করিবে। এই অবস্থায় প্রাচীন ভারতের মৃত্যু হইবে এবং ইহার স্থলে নূতন সংকর ভারত জন্মগ্রহণ করিবে। ইহা কেবল ভারতের পক্ষে নহে, পরন্তু সমগ্র জগতের পক্ষেও বিশেষ ক্ষতির কারণ হইবে। বিশ্বমানবকে ভারতের শ্রেষ্ঠ দান—তাহার আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে ভারতবর্ষ যুগে যুগে তাহার আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির বার্তাবাহকগণকে বহির্জগতে পাঠাইতেছে এবং এই ভাবে সে মানব-জীবনকে মহান্ উদ্দেশ্যে উন্নত করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং ইহা স্বাভাবিক যে, ভারতের আধ্যাত্মিক মৃত্যু হইলে এই দুর্ঘটনায় সমগ্র জগৎ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

এই ভীষণ আকস্মিক বিপদ্‌পাৎ হইতে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিবার একটিমাত্র উপায় আছে: উচ্চ-শ্রেণীর আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি শূদ্রগণকে অবশ্য দিতে হইবে, এবং তাঁহাদিগকে বেদবেদ্য আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির আলোকে শিক্ষিত ও সজীব করিয়া তুলিতে হইবে। এখনও যদি উচ্চশ্রেণী জনগণের জন্য আন্তরিক অনুভব করেন এবং কেবল তাহাদের মানসিক শিক্ষা ও জাগতিক উন্নতি নয়, পরন্তু তাহাদের আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি ও উপযুক্ত ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলেই আমরা গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ভারতের আশা করিতে পারি।

বেদের আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির সুর বেদান্ত বা উপনিষৎসমূহে যে ভাবে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, উহা কয়েকটি কথায় প্রকাশ করা যাইতে পারে: এই জগতের চরম সত্তা এক আধ্যাত্মিক উপাদান বা ব্রহ্ম। এই দৃশ্যমান্ জগতের আপেক্ষিক বা কার্যকরী মূল্য থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা অবিমিশ্র সত্য নহে। প্রত্যেক জীবাত্মা মূলতঃ সেই দৈব আধ্যাত্মিক সত্তা। স্বচ্ছ বুদ্ধিদ্বারা বুঝিয়া সমাজক্ষেত্রে নৈতিক আচরণসহায়ে জীবনের উন্নতি বা ক্রমবিকাশ সাধনই মানুষের অন্তর্নিহিত সেই দেবত্বের ক্রমবর্ধমান অনুভূতির উপায়। সংক্ষেপতঃ বেদের আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির মানে—মানুষের আধ্যাত্মিক জ্ঞানের জাগরণ। ইহা নূতন আলোকে সকল বিষয়ের মূল্য নির্ণয় এবং প্রেম ও সেবাদ্বারা জড়প্রকৃতির বন্ধন হইতে মানুষকে মুক্ত করিবে।

বেদান্তের এই ভাব আধুনিক কম্‌মিউনিজ্‌ম্ বা সোশ্যালিজ্‌ম্ সম্মত। বেদান্ত বিশেষ জোরের সহিত বলে যে, সকল নরনারীই মূলতঃ সমান এবং ভোগে সকলেরই স্বাভাবিক অধিকার আছে। মানুষের জাতি বর্ণ বা স্ত্রী-পুরুষ সঞ্জাত সকল ভেদই বাহ্যিক এবং এই জন্য ইহা সত্য নয়। সকল মানুষের প্রধানতঃ একই আধ্যাত্মিক উপাদান—আত্মা, এই জন্য সকলেরই আত্মপ্রকাশের এবং পৃথিবীর সকল ভোগের সমান সুবিধা নিশ্চয়ই থাকা উচিত। এই দিক দিয়া কম্‌মিউনিষ্ট্ রাশিয়ার ন্যায় দেশের শাসনকার্যও সত্যসত্যই জনসাধারণের হিতার্থে জনগণের দ্বারা পরিচালিত হওয়া দরকার। আত্মসমৃদ্ধির জন্য দেশের কোন দলবিশেষের সকলের উপর প্রভুত্ব করিবার চেষ্টা করা সঙ্গত নয়। বর্তমানে ভারতের শাসকশ্রেণী আপনাদিগকে জনসাধারণের প্রভু মনে করেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রকৃতপক্ষে মনে করা উচিত যে, তাঁহারা জনগণের ভৃত্য।

কিন্তু মানব-সমাজের প্রতি বেদান্ত ও কম্‌মিউ-নিজ্‌ম্-এর দৃষ্টিভঙ্গির মুখ্য বিষয়গত বিশেষ পার্থক্য আছে। কম্‌মিউনিষ্ট্ স্থূল শরীরকে ভিত্তি করিয়া তাঁহাদের মৌলিক তথ্য প্রচারের চেষ্টা করেন। বৈদান্তিকের মতবাদের ভিত্তি আত্মার শাশ্বত আধ্যাত্মিক সত্যের উপর স্থাপিত। স্থূল শরীর

বা বুদ্ধির দিক হইতে সকল মানুষকে সমান বলা নিশ্চয়ই সত্য নয়। কারণ, শারীরিক ও মানসিক উভয় দিক দিয়াই সকল মানুষ সমান নহে। আমরা দেখি যে, ব্যক্তিগত ও জাতিগত ভাবে মানুষের শারীরিক ও বুদ্ধিশক্তি সম্বন্ধীয় গঠন পৃথক্। এই জন্য শক্তিমান ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ সর্বদা দুর্বল ও নির্বোধগণের উপর প্রভুত্ব করেন। ইহা প্রকৃতির স্থূল দিকের প্রাকৃতিক নিয়ম—অরণ্যের আইন। জীবনের বা প্রকৃতির কোন আধ্যাত্মিক ভিত্তি স্বীকার না করিলে অন্য কোনও দৃষ্টিভঙ্গি ঐ নিয়ম বা আইনকে পরিবর্তন করিতে পারে না ; কেননা, উহা হইবে মিথ্যা ও অবাস্তব। সুতরাং যে কোন ধরনের কম্‌মিউনিজ্‌ম্ বা সোশ্যালিজ্‌ম্ জীবনের আধ্যাত্মিক ভিত্তির সত্যতা অস্বীকার করিয়া অর্থনৈতিক সমাজনৈতিক বা রাজনৈতিক অলীক দর্শনের ভিত্তির উপর উহার মতবাদ স্থাপনের চেষ্টা করে, উহা পরিণামে বিনষ্ট হইবেই।

মানুষের—তথা সকল জীবনের প্রকৃত সমতা আধ্যাত্মিক সমভূমিতে। কারণ, সকল মানুষের একই আত্মা। সকল নৈতিক বিধিই অহিংসা প্রেম পরার্থপরতা সংযম প্রভৃতি গুণ অভ্যাস করিতে বলে। নীতিবাদী দার্শনিকগণ বিশ্বাস করেন যে, আমাদের সৌন্দর্যবোধের ন্যায় ভালবোধও স্বভাবজ ও মৌলিক। ভালর ক্রমবর্ধমান অনুভূতির উপরই মানুষের নৈতিক উন্নতি অবশ্য নির্ভর করে। বেদান্ত সত্য ও সুন্দর—সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্-এর সহিত ভালর অনন্যতা প্রতিপাদন করে। আমাদের আত্মা ইহাদেরই সমষ্টি। এই জন্য আমরা সহজ জ্ঞানদ্বারা আত্মার অস্তিত্ব বুঝিতে পারি। কাজেই ইহা স্বতঃপ্রমাণিত যে, যদি আমরা নৈতিক ভাবগুলিকে কেবল অর্থনীতি বা হিতবাদ ভিত্তির উপর স্থাপন করি, তাহা হইলে ইহা অলীক দর্শন হইয়া দাঁড়াইবে। কেননা ইহা কখনও আমাদের নৈতিক প্রকৃতি মহত্ত্বমণ্ডিত অথবা নৈতিক চরিত্র উন্নত করিতে পারিবে না। উপকারিতা কি আমাদের রুচিবিজ্ঞান-বিষয়ক বোধের উন্নতিসাধন করিতে পারে? নিশ্চয়ই পারে না। এইরূপে হিতবাদ প্রকৃত পক্ষে কখনও আমাদের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি সাধন এবং নীতিবোধকে বিশুদ্ধ করিতে পারিবে না। জগতের প্রধান প্রধান নীতিপরায়ণ ব্যক্তিগণ ধার্মিক ও জ্ঞানী ছিলেন, রাজনীতিজ্ঞ বা ব্যবসায়ী ছিলেন না। কাজেই ইহা অবিসংবাদী সত্য যে, আধ্যাত্মিক সত্যের উপর জীবনের ভিত্তি স্থাপন করিতে এবং আধ্যাত্মিক মূলতত্ত্বের নিয়মাধীন করিতে শিক্ষা না দিলে মানুষকে কখনও প্রকৃত ধার্মিক ও নীতিপরায়ণ করা সম্ভব নহে। অধিকন্তু, যে সমাজের নৈতিক নিয়ম দৃঢ় নয় এবং যে সমাজ নীতির নংগর ছাড়িয়া সরিয়া গিয়াছে, সে সমাজ পরিণামে অসভ্যতায় মগ্ন হইতে বাধ্য। এই কারণে সমাজ পরিচালকগণের মানব-সমাজের মৌলিক ভিত্তি এবং মানবজীবন সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকা বিশেষ আবশ্যক। সমাজ ও জীবনের মূল ভিত্তিসম্বন্ধে বেদান্ত যুক্তিপূর্ণ ও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা করিতে পারে। অতএব ভারতের ভাবী কম্‌মিউনিষ্টকে মস্কো হইতে প্রেরণালাভ করিবার ও পরিচালিত হইবার চেষ্টা অবশ্য ত্যাগ করিতে হইবে। পক্ষান্তরে আলোক ও আদেশের জন্য তাঁহাকে উপনিষদে ফিরিয়া যাইতে হইবে এবং তাঁহাকে এক নূতন ধরনের কম্‌মিউনিজ্‌ম্ বা সোশ্যালিজ্‌মই দেখাইতে হইবে। একমাত্র এইরূপ কম্‌মিউনিজ্‌ম্ বা সোশ্যালিজ্‌মই মানবতাকে বর্বরতা হইতে রক্ষা করিতে পারে। এইরূপে আমাদের শূদ্রগণও ব্রাহ্মণে পরিণত হইয়া বাঁচিতে পারেন।

মিশরের রাজর্ষি আখনাটন

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতাব্দীতে মিশরে রাজর্ষি আখনাটনের আবির্ভাব হয়। ঐতিহাসিক যুগে তিনিই সর্বপ্রথম একটী ধর্মমত প্রচারে প্রয়াসী হন। সেইজন্য ব্রেস্টেড্ সাহেব তাঁহার গ্রন্থে[১] তাঁহাকে প্রথম ঐতিহাসিক ব্যক্তিরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। প্রাগৈতিহাসিক মিশরের তমসাবৃত আকাশে তিনি ধূমকেতুর মত উদিত হইয়া অনতিদীর্ঘকাল পরে অদৃশ্য হন। প্রায় তিন হাজার বৎসর জগৎ মিশরীয় রাজর্ষির কথা বিস্মৃত হয়। হঠাৎ প্রত্নতাত্ত্বিকগণ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তাঁহাকে আবিষ্কার করেন। মিঃ বাইকি তাঁহার পুস্তকে[২] বলেন, "প্রাচ্যের প্রাচীন রাজগণের সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যত লিখিত হইয়াছে, এক আখনাটনের সম্বন্ধে তদপেক্ষা অধিক গত চল্লিশ বৎসরে লিখিত হইয়াছে। এই মহাপুরুষের মহত্ত্বসম্বন্ধে যদিও ইহা অভ্রান্ত প্রমাণ নহে, তথাপি ইহার দ্বারা অন্ততঃ এইটুকু নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় যে, তিনি অতীতের এক অদ্ভুত ব্যক্তি।" প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারে আখনাটনের মামীকৃত দেহ, পত্রাবলী, প্রতিকৃতি ও প্রস্তর-মূর্তি প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে। স্বীয় রাজপ্রাসাদের যে মেজেতে তিনি পায়চারি করিতেন উহার প্রস্তরখণ্ডগুলি পর্যন্ত অদ্যাপি বর্তমান।

১ Religion and Thought in Ancient Egypt (p. 339) By Breasted. রাজর্ষির সংক্ষিপ্ত বিবরণের জন্য চার্লস ফ্রান্সিস্ পটার কৃত The Story of Religion গ্রন্থে আখনাটন শীর্ষক অধ্যায় এবং বিস্তৃত বিবরণের জন্য সাবিত্রী দেবী রচিত Joy of the Sun পুস্তক দ্রষ্টব্য।

২ The Amarna Age By Baikie (p. 234

মিশরের রাজধানী কাইরো শহরের দুই শতাধিক মাইল দক্ষিণে নাইল নদীর তীরে যে প্রাচীন ধ্বংসস্তূপরাশি আছে, তথায় এক কৃষক নারী ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে মাটী খুঁড়িতে ছিল। পুরাণ কাঁচা ইঁট পচিয়া যে সার উৎপন্ন হয়, তাহা মিশরীয় কৃষকের শস্যোৎপাদনের জন্য বিশেষ আবশ্যক। এই সার খুঁড়িয়া বাহির করাই ছিল ঐ নারীর উদ্দেশ্য। কিন্তু সে খুঁড়িতে খুড়িতে ভূমিগর্ভে একটী গৃহে কয়েক শত কাঁচা ইঁট পাইল। ইঁটগুলির উপর কি ছাপ মারা ছিল। অল্পমূল্যে সে এইগুলি প্রতিবেশীর নিকট বিক্রয় করে। প্রতিবেশী ব্যবসায়ীকে দেখাইলে সে উহাদের নমুনা ফ্রান্সে পাঠায়। ফ্রান্সের বিশেষজ্ঞগণ পরীক্ষান্তে জানিলেন—মিশরীয় দুই রাজার ও পার্শ্ববর্তী রাজ্যের মধ্যে রাষ্ট্রবিষয়ক যে পত্রব্যবহার হইয়াছিল এই ইষ্টকফলকগুলি তাহার রেকর্ড (ট্যাবলেট)। এই রাজা দুই জনের নাম আখনাটন এবং তাঁহার পিতা তৃতীয় আমেনহোটেপ। এইগুলির মধ্যে মাত্র ৩৫০টী ট্যাবলেট রক্ষিত হইয়াছে—বাকীগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সিরিয়া, সাইপ্রাশ, ব্যালন, হিট্টাইট, মিট্টানি রাজাদের সহিত মিশরীয় রাজদ্বয়ের পত্রব্যবহার এই ট্যাবলেটসমূহে ছাপা আছে। ইষ্টকগুলি টেলেল-অমর্না (Tellel Amarna) নামক জেলায় পাওয়া যায় বলিয়া এইগুলি টেলেল অমর্না পত্রাবলী নামে বিখ্যাত। পত্রগুলি ব্যাবিলোনিয়ান ভাষায় লিখিত। ইহা হইতে জানা যায় যে, খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্দশ বা পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভূমধ্য-সাগরীয় রাজ্যসমূহে ব্যাবিলোনীয় ভাষা ছিল রাষ্ট্রভাষা। খ্রীষ্টপূর্ব ষোড়শ হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী

পর্যন্ত যুগকে ঐতিহাসিকগণ অমর্না যুগ বলে।

১৯০৩ খ্রীঃ আখনাটনের পিতামহ ৪র্থ থুটমোসের (Thutmose) সমাধি থীবিসে (Thebes) এবং দুই বৎসর পরে ইউয়া (Yuaa) এবং তুয়াউ (Tuau) নামক তাঁহার মাতার মাতা-পিতার সমাধিদ্বয় আবিষ্কৃত হয়। ১৯০৭ খ্রীঃ আখনাটনের মাতা রাণী তিয় (Tiy) এর সমাধিও পাওয়া গিয়াছে; তাহার মধ্যে আখনাটনের মামী (সংরক্ষিত মৃতদেহ) ছিল। ১৯২২ খ্রীঃ আখনাটনের জামাতা টুটানখামেন (Tutan khamen)-এর সমাধি আবিষ্কৃত হয়; তাহাতে মিশরের প্রসিদ্ধ অষ্টাদশ রাজবংশের অনেক রেকর্ড ছিল। ধর্মের ইতিহাস অধ্যায়নার্থীর নিকট উক্ত আবিষ্কার বিশেষ মূল্যবান্। আখনাটন সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই ঐতিহাসিক উপন্যাস রচিত হইয়াছে। ঈশা, মুসা, মহম্মদ প্রমুখ যে সকল ধর্মগুরু পরবর্তী কালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাঁহাদের আকৃতি সম্বন্ধে বিশেষ তথ্য পাওয়া যায় না; কিন্তু আখনাটন প্রাগৈতিহাসিক যুগে আবির্ভূত হইলেও তাঁহার আকৃতি বিষয়ে স্পষ্ট ভাবে অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। তাঁহার বৃহৎ মস্তক, দীর্ঘ গলা, লম্বা উদর, মোটা জানু প্রভৃতি হইতে বোঝা যায়, ফারাওদিগের (Pharaoh) মধ্যে তাঁহার চেহারা অদ্ভুত প্রকারের ছিল। শিল্পিগণকে তিনি বলিতেন, 'আমি দেখতে যেমন, ঠিক তেমনি ভাবে আমার চেহারা অঙ্কিত বা খোদিত কর।' সেইজন্যই বোধ হয় আখনাটনের এত মূর্তি, চিত্র ও বাষ্ট তৈয়ার হইয়াছিল। রাণী নেফারতিতি (Nefertiti) এবং রাজকুমারীগণের প্রাপ্ত চিত্রাদি অপেক্ষাকৃত সুন্দর। নেফারতিতি ছিলেন আখনাটনের সহোদরা ভগ্নী। মিশরের অষ্টাদশ রাজবংশে ভ্রাতা-ভগ্নীর মধ্যে বিবাহ চলিত। আখনাটন রাজা হইলেও ধর্মজগতের আকাশে তাঁহাকে প্রথম জ্যোতিষ্ক বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমাংশে যখন আখনাটন আবির্ভূত হন, তখন মিশর সামরিক শক্তিতে জাতিগণের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিল। তাঁহার জন্মের প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্বে পিরামিডসকল নির্মিত হয়। আবার তাঁহার জন্মের দুই শত বৎসর পূর্বে অষ্টাদশ রাজবংশের উদ্ভব হয়। এই রাজবংশের আবির্ভাবের সময় হইতে প্রায় দুই শতাব্দী মিশর জ্ঞানগরিমায় জগতের অধিনায়ক ছিল। মিশরের এই গৌরবময় যুগেই আখনাটন জন্মগ্রহণ করিয়া স্বীয় প্রতিভায় জাতীয় গৌরব সমৃদ্ধ করেন।

অষ্টাদশ রাজবংশের যখন উদ্ভব হয়, তখন রাজা প্রথম আহামোস (Ahmose) হাইক্সস্ (Hyksos) অর্থাৎ মেষপালক রাজাগণকে বিতাড়িত করিয়া প্যালেষ্টাইন ও ফিনিসিয়া অধিকার করেন। থুত্মোসিস্ (Thutmosis) প্রমুখ অন্যান্য মিশরীয় রাজারাও যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন। থুত্মোসিস্ মিশরের সাম্রাজ্য-স্থাপকরূপে কথিত। এই সকল যুদ্ধে বহু দেশের সম্পদ লুণ্ঠন করিয়া মিশর সমৃদ্ধ হয়। তন্মধ্যে মেগিড্ডো (Megiddo) যুদ্ধের কথা বাইবেলে আছে। রাজা তৃতীয় আমেনহোটেপের সময় মিশরের সম্পদ অতুলনীয় ছিল। তখন রাজপরিবার অত্যন্ত বিলাসে থাকিত। আমেনহোটেপকে সেইজন্য লোকে বিলাসী সম্রাট বলিত এবং থীবিসে তাঁহার দরবার ঐশ্বর্যে ও গৌরবে সলোমনের রাজধানীকেও পরাস্ত করিয়াছিল। মিশর তখন পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ রাজ্য, এবং ইহার রাজধানী থীবিস নগরে বিভিন্ন দেশের রাজদূত, বণিক ও শিল্পিগণ বাস করিত। আর্থার ওয়াইগাল তাঁহার গ্রন্থে[৩] লিখিয়াছেন; 'প্যালেষ্টাইন ও সিরিয়া তখন মিশরের করদরাজ্য ছিল। সমুদ্রতীরবর্তী ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি যুবক ফারাও আমেনহোটেপকে

৩ Akhnaton, Pharaoh of Egypt by Arthur Weigall নামক পুস্তকের ২৯-৩০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

উপহার প্রেরণ করিত। সাইপ্রাস, ক্রীট ও গ্রীক দ্বীপপুঞ্জ মিশরীয় ভাবাপন্ন হয়। সোমালিল্যাণ্ড পর্যন্ত লোহিত সাগরের সমগ্র উপকূল এবং সিনাই দেশ ফারাও'র রাজ্যভুক্ত ছিল। সুদানের নীগ্রো জাতি মিশরে দাসরূপে ব্যবহৃত হইত। মিশরের রাজধানীতে যে প্রাসাদরাজি শোভা পাইত এবং ভোগবিলাস ছিল তাহা অন্য দেশে—এমন কি ব্যাবিলনেও অজ্ঞাত ছিল। মিশরের সম্পদ এত অপরিমিত ছিল যে, রাজা ও রাজকর্মচারিগণের টেবিলে এবং ধর্মমন্দিরসমূহে বহুপ্রকার মূল্যবান অসংখ্য স্বর্ণপাত্র দৃষ্ট হইত। থীবিসের মহিমা, আনন্দোৎসব, জলক্রীড়া, মৃগয়া ও রাজভোজ প্রভৃতি পড়িলে আরব্যোপন্যাসের গল্পের কথা মনে হয়।

যখন তৃতীয় আমেনহোটেপ দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ বর্ষের বালক ছিলেন তখন তিনি তদপেক্ষা অল্প-বয়স্কা বালিকা টিয়'র পাণিগ্রহণ করেন। টিয়'র পিতৃ-পরিচয় অজ্ঞাত; তবে তিনি সমধিক বিচক্ষণ ও চরিত্রবতী ছিলেন। বিবাহের দশ বৎসর পরে রাজা রাণীর জন্য যে সুন্দর সৌধ থীবিসের নিকটবর্তী নাইল নদীতীরে নির্মিত হয়, উহার মেজে, ও দেওয়ালগাত্রে বন্য পশু ও পক্ষী এবং পালিত পায়রা ও মৎস্য প্রভৃতির চিত্র অঙ্কিত ছিল। উক্ত রাজপ্রাসাদ আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহার চিত্রাবলী এখনও দর্শকের বিস্ময়োৎপাদন করে। পর বৎসর রাজা রাণীকে একটী কৃত্রিম হ্রদ উপহার দেন। ইহার স্মারকলিপি হইতে জানা যায়, রাজদম্পতী যে নৌকায় এই হ্রদে বিহার করিতেন তাহার নাম তেহেন আতেন (Tehen-Aten)। তেহেন আতেন শব্দের অর্থ উজ্জ্বল সূর্যমণ্ডল। রাজা সূর্যোপাসক ছিলেন। এক মাইল দীর্ঘ এই হ্রদটী এক পক্ষের মধ্যেই খোদিত হয় এবং উহার মৃত্তিকারাশি অদূরে ফেলিয়া ক্ষুদ্র পাহাড়ে পরিণত করা হয়। পাহাড়গুলি ফলফুলের বাগানে আবৃত করা হইলে এইগুলি ব্যাবিলনের দোদুল্যমান বাগানের ন্যায় রমণীয় হইয়াছিল। রাণী তিয়'র গর্ভে রাজার চারিটী কুমারী ও একটী কুমার জন্মে। পুত্রটী খ্রীষ্টপূর্ব ১৩৮৮ অব্দে জন্মগ্রহণ করে। পুত্রের নাম রাখা হয় আমেন-হোটেপ। পুত্র চতুর্থ আমেনহোটেপরূপে পিতার সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজা হইবার কয়েক বৎসর পরে তিনি নিজের নাম রাখিলেন আখনাটন। পুত্রলাভের কিছুকাল পরে রাজা অসুস্থ হন এবং পুত্র যখন ত্রয়োদশ বর্ষে পদার্পণ করেন তখন মৃত্যুমুখে পতিত হন। পিতার মৃত্যুর পরে আখনাটন মিশরের রাজসিংহাসন অধিকার করেন। রাজা আমেনহোটেপের মৃত্যুতে মিট্টানী রাজা তুষরাট্ট আখনাটনকে যে পত্র দেন তাহা হইতে জানা যায় তুষরাট্ট রাজার মৃত্যুশোকে অভিভূত হইয়া এক রাত্রি উপবাস ও ক্রন্দন করিয়া কাটান। তুষরাট্টের পত্রে লেখা আছে—'মিশরে স্বর্ণ মৃত্তিকাতুল্য সুলভ।'

প্রথমে আখনাটন বিধবা বিমাতা টাডুখিপাকে (Tadukhipa) বিবাহ করেন। এই প্রকার অদ্ভুত প্রথার অভাব প্রাচীন মিশরে ছিল না। পরে তিনি স্বীয় ভগ্নী নেফারতিতির সহিত পরিণীত হন। বিধবা বিমাতার পাণিগ্রহণ ইহুদী ও অন্যান্য প্রাচীন জাতির অন্যতম প্রথা। যে সল (Saul) খ্রীষ্টান জগতে পল নামে প্রসিদ্ধ, সেই সলের প্রভু কাপ্তেন আবনার (Abner) সলের মৃত্যুর পরে তাহার উপপত্নীকে গ্রহণ করেন। বাইবেলে ডেভিড সম্বন্ধীয় আখ্যায়িকাতে এই প্রথার স্পষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়। রাজা ডেভিডের মৃত্যুর পূর্বেই তাঁহার সিংহাসন লইয়া বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হয়। আবসালম (Absalom) সিংহাসন লাভের উদ্দেশ্যে প্রাসাদোপরি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সমক্ষে পিতার দশটী উপপত্নীর পাণিগ্রহণ করেন। আবসালোম আহিথোফেল (Ahitophel)

নামক রাজপরামর্শ দাতার পরামর্শেই উক্ত কর্মে প্রবৃত্ত হন। আহিথোফেলের পরামর্শ তখন ইসরেল দেশে দেবাদেশরূপে গৃহীত হইত। কিন্তু পিতা ডেভিডের মৃত্যুর পূর্বেই আবসালোমের মৃত্যু হওয়ায় রাজা দ্বিতীয় পুত্র সলোমনকে ভাবী রাজারূপে মনোনীত করেন। ইহা কেবলমাত্র ইহুদী প্রথা নহে। গ্রীস, ডেনমার্ক ও ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশেও তখন এই প্রথা নীতিবিরুদ্ধ ছিল না। ফ্রেজার তাঁহার গ্রন্থে[৪] এইপ্রথার বহু উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। থীবিসের রাজা লাইয়াসকে হত্যা করিয়া পুত্র ইডিপাস বিমাতাকে বিবাহ করেন। সুতরাং আখনাটন কোন অনৈতিক আচরণ করেন নাই, প্রচলিত প্রথারই অনুগমন করিয়াছিলেন মাত্র।

আখনাটন রাজকার্যে তত মনোযোগী ছিলেন না। প্রাচীন কুপ্রথার অবসানকল্পে তিনি নব ধর্মপ্রচারে মনোনিবেশ করেন। তিনি স্বীয় ভগ্নী নেফারতিতিকে অতিশয় ভালবাসিতেন এবং তাঁহার সঙ্গে রথে চড়িয়া রাজপথে বিচরণ করিতেন। নেফারতিতি খুব সুন্দরী ও স্নেহ-পরায়ণা ছিলেন। বার্লিনে রক্ষিত তাঁহার সুচিত্রিত মূর্তি দেখিলে প্রাচীন মিশরের নারী-মূর্তির বেশ ধারণা করা যায়। আখনাটনের আমলে মিশরে নব জাগরণ আসে। আটেন (Aten) ধর্মের প্রবর্তকরূপেই আখনাটন অমর। তখন মিশরের ধর্ম অত্যন্ত জটিল ছিল। নানা প্রকার ধর্মমত কুসংস্কারে বিজড়িত হইয়া কিম্ভূতকিমাকার হইয়াছিল। আমেন (Amen) ছিলেন তদানীন্তন মিশরের প্রধান দেবতা। আমেনের পুরোহিতগণই ছিল মিশরের ধর্মধ্বজী। আমেনধর্ম ছিল রাজধর্ম। মিশরে তখন বহু দেবতার পূজা হইত এবং প্রত্যেক দেবতার এক একটী বিশেষ উপাসনা-কেন্দ্র ছিল। ইহা সত্ত্বেও দেশের সর্বত্র রা (Ra) নামক সূর্যদেবতার পূজা হইত। ভূমধ্যসাগর ও মেসো-পোটেমিয়ার পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহে তখন রা-দেবতা পূজা পাইতেন। সম্রাট তৃতীয় থুত্‌মোসের সময় রা-দেবের উপাসনা সমধিকভাবে মিশরে প্রচারিত হয়। আমেন দেবতার পুরোহিতগণ দেশের ধর্মভাব সংরক্ষণের জন্য রা-দেবকে গ্রহণপূর্বক আমেন-রা নামক নূতন দেবতার সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু এই দেবতা জনপ্রিয় হইলেন না। তখন রাজা আখনাটন আটেন দেবতার উপাসনা প্রবর্তন করেন। আটেন শব্দের অর্থ সূর্যমণ্ডল। থীবিস মহানগরীতে আটেনদেবের বিশাল মন্দির ছিল। আটেনদেবের স্থূল মূর্তি নাই; তিনি রশ্মিময়, তেজোময়। তাঁহার স্থূল মূর্তি প্রস্তুত করা রাজার নিষেধ ছিল। সূর্যের মূর্তি উপাসনা করিতে হইবে না; সূর্যের মধ্যে যে শক্তি বা তেজ জগতে পতিত হইয়া সকল প্রাণীকে সঞ্জীবিত করে তাহারই ধারণা ও ধ্যান করিতে হইবে। ইহাই আখনাটনের উপদেশ।

প্রাচীন মিশরে জীবন-প্রতীককে আংখ (Ankh) বলিত। ইংরাজি টি অক্ষরের উপর ডিম্বাকৃতি চিহ্ন দিলে যাহা হয়, আংখ তদ্রূপ। তখন মন্দির, প্রাসাদাদির গাত্রে যে সকল চিত্র অংকিত হইত তাহাতে আটেন বা সূর্যমণ্ডল আঁকা থাকিত। সূর্যমণ্ডল হইতে রশ্মিরাশি নিঃসৃত হইয়া পৃথিবীর সকল ব্যক্তি ও বস্তুর অঙ্গে নিপতিত হইতেছে। প্রত্যেক রশ্মি সমাপ্ত হইত আংখ-শোভিত ক্ষুদ্র হস্তে। মিশর হইতে আংখ-প্রতীক নানা ধর্মে প্রবেশ করে। খ্রীষ্টান ধর্মে যে 'হস্তধৃত ক্রশ' চিহ্ন দেখা যায়, তাহা আংখের নব সংস্করণ মাত্র। আতেন বা আংখ প্রতীকের সারতত্ত্ব এই যে, সূর্যতেজ হইতে সকল প্রকার জীবনী শক্তি আগত হয়।

৪ Golden Bough by Frazer

সম্রাটের সহায়তায় নবীন ধর্ম দ্রুত বেগে চতুর্দিকে প্রচারিত হইল। আঁমেন দেবতার পুরোহিতগণ প্রাচীন ধর্ম সংরক্ষণের জন্য প্রাণপণ করিলেন। আখনাটন আমেন নগরীতে আটেন দেবতার মন্দির নির্মাণ করিয়া ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি থীবিস নগরীর নূতন নামকরণ করিলেন 'আতেন জ্যোতি' বা 'সূর্যতেজ'। দেশে ধর্মবিপ্লব দেখা দিল। তাঁহার রাজত্বের ষষ্ঠ বৎসরে তিনি পূর্ব নাম ত্যাগ করিয়া নূতন নাম, আখনাটন গ্রহণ করেন। আখনাটন নামের অর্থ যাঁহার উপর আতেনদেব সন্তুষ্ট। আতেন দেবতা আমেনকে পরাভূত করিয়া দেশময় প্রচারিত হইলেন। যে বৎসর সম্রাট আখনাটন নাম গ্রহণ করেন, সেই বৎসর তিনি ঊনবিংশ বৎসর বয়সে পদার্পণ করেন। স্বপ্রবর্তিত আতেন ধর্মের বহুল প্রচারের জন্য তিনি সর্বত্র আমেনদেবের পূজা ও আমেন মন্দির বন্ধ করিয়া দিলেন। গোঁড়ামির আতিশয্যে তিনি আমেন নামটী পর্যন্ত মুছিয়া ফেলিলেন। যেখানে যেখানে আমেন নাম লিখিত বা খোদিত ছিল তাঁহার অলঙ্ঘ্য আদেশে সেই সকল নিশ্চিহ্ন করা হইল। স্বীয় পিতার নাম এবং অন্যান্য দেবতাকেও তিনি দেশ হইতে নির্বাসিত করিলেন। থীবিস নগরবাসিগণ পুরোহিতগণের দ্বারা তাঁহাদের তীব্র প্রতিবাদ জানাইল। আখনাটন তাহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাহাদিগকে শাস্তি দিলেন, কিন্তু তাহাতে ধর্মবিদ্রোহের অগ্নি নির্বাপিত হইল না। তিনি থীবিস হইতে রাজধানী অন্যত্র লইয়া গেলেন। তৎপরিবর্তে সিরিয়া, ইথিওপিয়া এবং নাইল নদীর তীরে বহুদূরে তিনটী ধর্মরাজধানী স্থাপিত হইল। সিরিয়াস্থ রাজধানীর কোন খবর জানা যায় নাই। ইথিওপিয়াস্থ রাজধানীর নাম ছিল, 'আতেন-রত্ন' এবং তৃতীয় রাজধানীর নাম 'আতেন-জগৎ' বা আখিতাতেন।

তাঁহার রাজত্বের অষ্টম বর্ষে আখনাটন থীবিস নগরী পরিত্যাগ করিয়া নব রাজধানীতে গমন করেন। সঙ্গে ছিল নেফারতিতি ও তাঁহার তিন কন্যা—মেরীতাতেন, মাকিতাতেন এবং আংখসেনতাতেন। অদ্যাপিও তেলেল আর্মনা সহরের গৌরব বিদ্যমান। কিন্তু যখন উহা আখিতাতেন ছিল তখন নিশ্চয়ই কবি ও শিল্পিগণের চিত্তাকর্ষণ করিত। প্রাচীন ধর্মের বিরোধিতা হইতে মুক্ত হইয়া নবধর্ম সর্বত্র বিস্তৃত হইল। আখিতাতেন নগরে রাজারাণী বাস করিতে লাগিলেন। ইহাকে 'মিশরের স্বর্গ' বলা হইত। রোম, কাশী প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত ধর্মনগরীর ন্যায় আখিতাতেন মিশরের শ্রেষ্ঠ দেবস্থান ছিল। ধর্মজ্যোতিতে আখনাটনের জীবন উজ্জ্বল হইয়াছিল। জীবনের সকল ক্ষেত্রে ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি অভিনব আদর্শ প্রচার করিলেন। সুদূর অতীতে জীবন ও ধর্মের এই অদ্ভুত সমন্বয় আখনাটন কিরূপে করিলেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। তিনি রাজা হইয়াও নবধর্ম সংস্থাপক ঋষি। তাঁহার ধর্মশিক্ষা কি ছিল তাহাও আমরা জানিতে পারি। অন্যান্য ধর্মগুরুদিগের বাণী নকলকারী সম্পাদক বা ব্যাখ্যাকারের হাতে পড়িয়া বিকৃত হইয়াছে। কিন্তু মিশরের এই রাজর্ষির মৌলিক বাণী আমাদের হস্তগত হইয়াছে। পুরাণ বাইবেলের প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপি দশম শতাব্দীর, নূতন বাইবেলের প্রাচীনতম নকল চতুর্থ শতাব্দীর, কিন্তু আখনাটনের বাণীর লিপি খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতাব্দীর। আখনাটনের জীবনকালে তাঁহার সমসাময়িকগণের স্মৃতি-সৌধ গাত্রে তাঁহার বাণীর অবিকৃত লিপি পাওয়া গিয়াছে। আতেন ধর্ম খুব উদার ছিল। যে কোন ধর্মের সহিত উহার মূলসূত্রগুলিকে তুলনা করিলে এই ধর্মের অভিনবত্ব বোঝা যায়। আতেনদেবের উপাসনার জন্য

আখনাটন যে স্তবগুলি রচনা করিয়াছিলেন তাহা লিপিতে রক্ষিত আছে। এই স্তবগুলিতে আতেন ধর্মের সারতত্ত্ব নিহিত। অধিকাংশ স্তবগুলিই ক্ষুদ্র। কিন্তু সম্রাটের প্রধান সহচর আয় (Ay)-এর স্মৃতিমন্দিরে একটী দীর্ঘ স্তব লিখিত হয়। এই স্তবটী ধর্মসাহিত্যের একটী রত্ন। অধ্যাপক ব্রেষ্টেড্ তাঁহার গ্রন্থে[৫] উক্ত স্তবের একটী সুন্দর ইংরাজি অনুবাদ দিয়াছেন। ইহার সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল:

"হে সূর্যদেব, প্রাতঃকালে তোমার উদয় কি মনোহর! হে প্রাণময় আতেন, পূর্বদিগন্তে উদিত হইয়া যখন তুমি পৃথিবীকে তোমার আলোকে উজ্জ্বল কর, তখন তোমার তেজে সকল ভূত প্রাণবান হয়। হে জীবনদেবতা, তুমি এত দূরে, এত উর্ধ্বে থাকিলেও নিত্য আমরা তোমার পূত স্পর্শ পাই। তোমার পদচিহ্নই দিবস। আবার যখন তুমি সন্ধ্যায় অস্তগমন কর, জগৎ শ্মশানবৎ তমসাবৃত হয়, মানুষ নিদ্রিত হয়। তোমার তিরোভাবে মর্তধাম মৃতলোকবৎ নীরব, নিষ্কর্ম হয়। পুনরায় তোমার আবির্ভাবে জগৎ জাগ্রত ও কর্মরত হয়, অন্ধকার তিরোহিত হয়, মানবের অলস অঙ্গে প্রাণ সঞ্চারিত হয়, মিশরময় উৎসব আরম্ভ হয়, মিশরবাসিগণ করযোড়ে তোমার উপাসনা করে। তোমার উপস্থিতিতে গৃহপালিত ও বন্য পশুপক্ষি-সমূহ যাতায়াত ও আহারান্বেষণ করে। নাইল নদীতে নৌকাদি জলযানের গমনাগমন হয়, সমুদ্রে মৎস্যগুলি জলোপরি লম্ফপ্রদানাদি দ্বারা তোমাকে প্রণাম নিবেদন করে। তোমার তেজে মাতৃগর্ভে শিশু সৃষ্ট হয়, প্রসূত শিশু ক্রন্দন ও স্তন্যপান করে, মৃতদেহ সঞ্জীবিত হয়, ডিম্বের মধ্যে পক্ষীশাবক জীবিত থাকে এবং ডিম্ব ভগ্ন হইলে আকাশে উড়িয়া বেড়ায়। হে আতেন, তোমার কর্মাবলী অসংখ্য। তুমিই একমাত্র দেবতা; তুমিই ধরা সৃষ্টি করিয়াছ। বিশ্বসৃজনের পূর্বে তুমি একাকী আকাশে বিদ্যমান ছিলে। তোমার আকর্ষণে নাইল নদী স্বর্গ হইতে মর্তে সমাগত। হে বিশ্বনিয়ন্তা, হে অনন্তদেব, তোমার তেজে আমার উদ্যানরাশিতে ফুল ফোটে, ফল পাকে। তুমি স্বর্গেরও স্রষ্টা এবং ষড়ঋতুর কর্তা। তুমি আমার হৃদয়-কন্দরে বিরাজিত। হে দেব, তুমি বিশ্বব্যাপী। তোমার সন্তান আখনাটন ব্যতীত অন্য কেহ তোমার স্বরূপ অবগত নহে। তুমিই আমাকে শক্তিমান ও জ্ঞানবান করিয়াছ। তোমার শক্তিতেই আমি শক্তিশালী এবং প্রাণিগণ জীবিত। আমিও নেফারতিতি উভয়েই তোমার দেহ হইতেই সমাগত হইয়াছি।"

রাজা ডেভিড রচিত ইহুদী সঙ্গীতের (Psalm) সহিত এই মিশরীয় স্তোত্রের নিকট সাদৃশ্য আছে। আখনাটনের এই সূর্যস্তব ধর্মসাহিত্যের এক আদিম রচনা।

রাজর্ষি আখনাটন তাঁহার জীবনের শেষ একাদশ বৎসর ধর্মনগরী আখিতাতেনে বাস করিয়াছিলেন। এই রাজধানীর আয়ুষ্কাল দীর্ঘ হইল না। রাজ্যের আয় হ্রাস হওয়ায় রাজর্ষি আর পূর্ববৎ বিলাসে থাকিতে পারেন নাই। আতেন ধর্মে ভগবৎ ভক্তি ও মানব-প্রেম প্রচারিত হয়। আখনাটন তাহা সাধ্যমত পালন করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহার সত্যনিষ্ঠা অসাধারণ ছিল। তিনি সূর্যোপাসক। সূর্যকিরণ যে দেশে পতিত হয়, তাহা সূর্যক্ষেত্র, দেবস্থান। ইহার বিরুদ্ধে তিনি অস্ত্রধারণ করিবেন কিরূপে? সুতরাং পার্শ্ববর্তী করদ রাজ্যগুলি এই সুযোগে কর প্রদান প্রথমে হ্রাস ও পরে বন্ধ করিয়া শেষে স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। আখনাটন শান্তিবাদী ও অহিংসনীতি পরায়ণ ছিলেন বলিয়া

৫ A History of Egypt By Prof. Breasted পুস্তকের ৩৭১-৭৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তাঁহার রাজ্যকাল অল্প হইল। সিমিয়ন স্ট্রান্স্কি তাঁহার গ্রন্থে* লিখিয়াছেন, "বর্তমান যুগের খ্রীষ্টান রাজা ও দেশশাসকগণের নীতি ও আচরণ কোন অংশে আখনাটন অপেক্ষা ভাল নহে। আখনাটনের উদাহরণ তাঁহাদের অনুকরণীয়।" আখনাটনের রাজনীতিতে সাম্রাজ্য ধ্বংসোন্মুখ দেখিয়া মিশরবাসিগণ অসন্তোষ প্রকাশ করিল; দেশে অন্তর্বিপ্লব দেখা দিল। আমেন পুরোহিতগণ সুযোগ বুঝিয়া ষড়যন্ত্র করিল। রাজর্ষি এই প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে পথ হারাইলেন। তিনি ত্রিশ বা একত্রিশ বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন। শেষ বৎসর তিনি তাঁহার জুবিলি (Jubilee) উৎসব করিলেন। তাঁহার কোন পুত্র ছিল না—সাতটী কন্যা ছিল। প্রথম কন্যা মেরীতাতেন এবং তৃতীয় কন্যা আংখসেনতাতেন যথাক্রমে স্মেংক্কার (Smenkhkar) এবং তুতানখামেনের সহিত পরিণীতা হয়। জামাতা স্মেংক্কার যুবরাজরূপে মনোনীত হইলেন। মহারাজ আখনাটনের স্বাস্থ্যভগ্ন হওয়ায় তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তাঁহার মৃতদেহ তাঁহার প্রিয় রাজধানীর পশ্চাদ্বর্তী পাহাড়ে মহাসমারোহে কবর দেওয়া হইল। তাঁহার মৃত্যুর পর যুবরাজ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার রাজ্যকাল মাত্র কয়েক মাস স্থায়ী হইল! তাঁহার পরে রাজজামাতা তুতানখামেন সম্রাট হন। তিনি আতেনদেবকে বিসর্জন দিয়া আমেন দেবের পূজা প্রচার পূর্বক দেশে শান্তি স্থাপন করেন। সম্রাট তুতানখামেন প্রায় নয় বৎসর পূজা প্রচার পূর্বক দেশে শান্তি স্থাপন করিলেন। সম্রাট তুতানখামেন প্রায় নয় বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার দ্বারা থাবিস নগরীতে পুনরায় রাজধানী স্থাপিত হইল। তুতানখামেনের কবরস্থান ১৯২২ সালে আবিষ্কৃত হইয়াছে। আতেন ধর্মের উন্নতি ও পতন ধর্মেতিহাসের এক বিস্ময়কর অধ্যায়। প্রচলিত বহুদেববাদের পরিবর্তে সমগ্র মিশরকে এক দেববাদে একদশকের মধ্যে দীক্ষিত করিবার প্রচেষ্টা বাতুলতা মাত্র। এই ক্ষিপ্রকারিতার জন্য আখনাটন নিরাশ হইলেন। প্রাচীন মিশরের ধর্মে যে সকল দেবতা পূজিত হইত তাহাদের অনেকে পশুমস্তকবিশিষ্ট। গজেন্দ্রমস্তক গণেশাদি দেবতা হইতে প্রতীত হয়। প্রাচীন ভারতেও এইরূপ দেবতা ছিল।

বহুদেববাদের স্থানে এক দেববাদ প্রতিষ্ঠা করা শিক্ষাসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ। আখনাটন প্রবর্তিত আতেনধর্ম দার্শনিক তত্ত্বোপরি স্থাপিত এবং আতেন দেব নিরাকার ভাবময় দেবতা। এই ধর্মকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মিশরবাসিগণ গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইল। আতেন ধর্ম প্রধানতঃ রাজ পরিবার এবং রাজ কর্মচারিগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল বলিলেই হয়। মিশরের শিক্ষা ও সভ্যতা তখন এইরূপ উদার ধর্মমত গ্রহণের উপযুক্ত হয় নাই। মিশরীয় সমাজ তখন উদার মতাবলম্বনের জন্য প্রস্তুত ছিল না। সেইজন্য আতেন ধর্মের এত শীঘ্র পতন হইল। আতেন ধর্মের পতনের পরে আমেন ধর্ম এত কুসংস্কারাবৃত হইল যে, মিশরীয় ধর্ম অদ্যাপিও সেই কুসংস্কারমুক্ত হইয়া আতেন ধর্মের উদারতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। অবশ্য আতেন ধর্মের নৈতিক ভিত্তিও সুদৃঢ় ছিল না। এই জন্যই বোধ হয় ইহা দেশবাসীর হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে নাই। কিন্তু উহার উদার ভাব মিশরে আবার সম্বুদ্ধ হইবে। যাহা একবার হইয়াছে, তাহা আবার হইবেই; ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। দিব্যজ্যোতি এক এক মহাপুরুষের মধ্যদিয়া এক এক দেশে পতিত হয়, কিন্তু মানুষের অজ্ঞানান্ধকার এত প্রগাঢ় যে, তাহাতে স্বর্গীয় আলোক অচিরে নির্বাপিত হয়।

* King Akhnaton by Simeon Strunsky গ্রন্থ দেখুন।

আর্থার ওয়াইগাল তাঁহার গ্রন্থে [৭] লিখিয়াছেন : "আখনাটন মহাপুরুষ ছিলেন। স্মরণাতীত কালের এই রাজর্ষি যে উদাহরণ দেখাইয়াছেন তাহা বর্তমান যুগেও অনুকরণ-যোগ্য। অন্যান্য ধর্মগুরুদের ন্যায় তিনি ধর্মের জন্য সর্বস্বপণ করিয়াছিলেন। যতদিন রাজহংস কালবর্ণ না হয়, যতদিন কাক শ্বেতবর্ণ না হয়, যতদিন হিমাচল চলমান না হয় এবং যতদিন সমুদ্র নদীতে লীন না হয় ততদিন আখনাটনের ধর্মমতের মূল্য থাকিবে।"

১৯০৭ খ্রীঃ মিশরীয় রাজাদের কবরস্থান হইতে আখনাটনের মামীকৃত মৃতদেহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাঁহার মৃতদেহের পদতলে স্বর্ণপত্রে লিখিত একটী প্রার্থনা পাওয়া গিয়াছে। আতেনদেবের উদ্দেশ্যে এই স্তব রাজর্ষি কর্তৃক রচিত হইয়াছিল। ডাঃ আলান গার্ডিনারের (Dr. Alan Gardiner) ইংরাজি অনুবাদ হইতে ইহার সারাংশ এখানে দেওয়া হইল : "হে আতেনদেব, তোমার মুখনিঃসৃত পবিত্র বায়ুই আমি নিঃশ্বাসরূপে গ্রহণ করি। হে সূর্য্যদেব, নিত্য তোমার সৌন্দর্য দর্শনে আমি পুলকিত হই। তোমার মধুর স্বর শুনিতে আমার আন্তরিক ইচ্ছা, তোমার আলোকে আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সতেজ হউক। আমার দিকে তোমার মঙ্গলময় হস্ত প্রসারিত কর। আমি উহা ধারণ করিয়া তোমার পদানুগ হই। হে দেব, অনন্তের সুরে আমার নাম উচ্চারণ করিয়া আমাকে ধন্য কর।"

৭ Akhnaton, Pharaoh of Egypt by Arthur Weigall পুস্তকের ২৫১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মানবের ভগবান

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষাল, এম্-এ, বি-এল্

যদি জীবনে জীবনে হাতা হাতি চলে
আর চলে যদি দ্বন্দ্ব,
মনে জাগে ভয় দ্বিধা অপমান
সংশয় আর সন্দ',
ক্ষোভের ব্যথায় ভরে যায় যদি
স্বপনের নীলাকাশ,
ব্যর্থতা আর পরাজয়ে শুধু
ভরা হয় ইতিহাস,
শূন্য জীবনে হাত ড়িয়ে মরা
আয়ুর চক্রবন্ধে,
প্রেমের নাটক চলে অভিনয়
ভোগ-বিলাসের মর্ত্যে,
দৈত্যের মতো জীবনের রথ
ঘর্ঘরি বেগে চলে,
চক্রে তাহার বক্ষ রক্ত
যাবো কি গো শুধু ঢেলে ?
জগত ভরিয়া নেমেছে আঁধার
যুগযুগান্ত ধরি,
কেন আর এই বৃথা অপমান
আলোকের ভান করি !

এই বিশ্বের নাট মন্দিরে
নট-নটী আজ যত
সকলেই তারা প্রদীপ নেভাতে
যদি হয় আজ রত,
প্রগতির আজ শিখর চূড়ায়
কামান যদি বা আজিকে গুঁড়ায়,
(যদি) নিজের স্থিতির সুপ্তি নেশায়
সভ্যতা হয় শেষ,
শিব-শঙ্কর হঠাৎ আজিকে
পরেন রুদ্রবেশ,
চাহিনা ডাকিতে নিষ্ঠুর সেই
মানবের ভগবানে,
যাহার নয়নে অগ্নি জ্বলেছে
হিংসা জেগেছে গানে।
তার চেয়ে মোর সেই বরণীয়
মৃত্যু নদীর পারে,
যার ইঙ্গিত নিভৃত ক্ষণে
পাইয়াছি বারে বারে।

মহাপুরুষ মহারাজের কথা

স্বামী অপূর্বানন্দ

বেলুড় মঠে মহাপুরুষ মহারাজের স্বাস্থ্য ক্রমেই ভেঙ্গে পড়ছিল। চলাফেরা এক রকম প্রায় বন্ধ। নীচে নেমে বেড়ান তো দূরের কথা, উপরেও অন্যের সাহায্য ব্যতীত বড় একটা হাঁটতে পারেন না। সেই সময় তিনি একদিন বলেছিলেন—"বাইরের activity (কাজ) যত কমে যাচ্ছে ভেতরের activity ততই বেড়ে চলেছে। সেই পরমানন্দের খনি তো ভেতরেই, এখন এই ভাবেই চলবে, এই-ই ঠাকুরের ইচ্ছা।" আর প্রায়ই মধুর স্বরে এই গানটী গাইতেন—'শমন আসার পথ ঘুচেছে, (আমার) মনের সন্দ দূরে গেছে!' ইত্যাদি। নিজের দর্শনাদির কথাও মাঝে মাঝে কিছু বলতেন। একদিন সন্ধ্যাবেলা, তখনও ঠাকুরের আরাত্রিক আরম্ভ হয় নি, সবেমাত্র ঘরে ঘরে আলো জ্বালা হয়েছে—মহাপুরুষ মহারাজ ঠাকুরঘরের দিকে মুখ করে চুপচাপ বসেছিলেন। হঠাৎ বলে উঠলেন—"দে দে, আমায় বিশ্বনাথের বিভূতি দে, আর বিছানার উপর একখানি গরদের চাদর তাড়াতাড়ি পেতে দে। আহা, এই যে ঠাকুর এসেছেন, মহাদেব এসেছেন।" এই বলতে বলতে হঠাৎ ধ্যানস্থ হয়ে পড়লেন। সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত ঐ ভাবে ছিলেন।

একদিন বিকেলবেলা—"এইমাত্র স্বামীজী ও মহারাজ এসেছিলেন; বল্লেন—'চল, তারকদা।' তোরা দেখতে পেলি নি? এই যে সামনে দাঁড়িয়েছিলেন।"

* * * * *

আত্মস্থ পুরুষদের ছোটখাট কাজকর্ম বা কথাবার্তার ভেতরও একটা গূঢ় অর্থ নিহিত থাকে। সাধারণ মানব নিজেদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির মাপকাঠির দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের কার্যাবলী বিচার করে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হলে অনেক সময়ই নির্ভুল হয় না। অনুমান ১৯১৩ সনে কঠিন রক্তামাশয়ে ভোগার পর হতেই মহাপুরুষ মহারাজ আহারাদি সম্বন্ধে খুব বেশী বিবেচনা করে চলতেন। তাঁর দুপুরের আহার ছিল সাধারণ ঝোল ভাত ও সামান্য ভাতে-ভাত। পূজনীয় শরৎ মহারাজ সেই ঝোলকে ঠাট্টা করে নাম দিয়েছিলেন—"মহাপুরুষের ঝোল"। রাত্রের আহারও তেমনি অল্প। কিন্তু ১৯৩৩ সনে সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর বাক্‌শক্তি একেবারে রোধ হয়ে যাবার প্রায় দেড় বৎসর পূর্ব হতে তিনি সেবকদের কখনও কখনও কোন ভাল জিনিস রান্নার ফরমাস করতেন, বা কোন বিশেষ জিনিস খাবার ইচ্ছা প্রকাশ করতেন। তাঁর এই প্রকার ভাবান্তর মঠের সমগ্র সাধুমণ্ডলী ও সেবকদের মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল, বিশেষ সে সময়ে তাঁর শরীর খুবই খারাপ এবং ডাক্তাররাও তাঁকে অনেক সময় কেবলমাত্র জলীয় পদার্থ খেয়েই থাকতে বলতেন।

একদিন সকালবেলা চুপচাপ অনেক ক্ষণ বসে থেকে হঠাৎ বল্লেন—"দেখ, ঠাকুরের কথামৃতে 'পাঁকাল মাছের কথা আছে। ঠাকুর বলেছেন, পাঁকালমাছ পাঁকে থাকে কিন্তু তার গায়ে পাঁকের দাগটি পর্যন্ত লাগে না। তেমনি কেউ যদি ভগবান লাভ করে সংসারে থাকে, তাঁর মনে আর সংসারের ছাপ পড়বে না।' আচ্ছা, এই পাঁকাল মাছ কিরকম একবার দেখতে হবে। আর খেয়েও দেখতে হবে পাঁকাল মাছ কেমন।" অনেক চেষ্টা

করে বরাহনগরের এক মেছুনীর সাহায্যে কয়েকটী পাঁকালমাছ জোগাড় করা হল। তিনি দেখে ভারী খুসি, বালকের মত আনন্দ করতে লাগলেন। রান্নাকরে তাঁকে দেওয়া হলে, তিনি সামান্য একটু মুখে দিয়ে দুএকবার নাড়াচাড়া করে ফেলে দিয়ে হাসতে হাসতে বল্লেন—"এই হয়ে গেল পাঁকাল মাছ খাওয়া। ইচ্ছে হয়েছিল তাই একটু খেয়ে দেখলাম। তা কে জানে বাপু যদি এইটুকু বাসনার জন্যই আবার জন্ম নিতে হয়?"

সন্ন্যাসরোগের মাত্র কয়েকদিন পূর্বে—তখনও বাজারে ভাল আম উঠেনি—তাঁর পাকা আম খাবার ইচ্ছে হয়। কলকাতার সব বাজারে সন্ধান করে শিয়ালদহের বাজার হতে কয়েকটী আম তাঁর জন্য আনা হল। তিনি সবগুলি ঠাকুরের ভোগের জন্য দিয়ে নিজের জন্য একটীমাত্র রাখলেন এবং খাবার সময় ঐটের রস করে দেবার জন্য সেবককে আদেশ দিলেন। সে সময় তিনি হাঁপানিতে খুবই কষ্ট পাচ্ছিলেন, তার উপর আমের রস খেলে যে কি ভয়ানক অনিষ্ট হবে তা ভেবেই সেবকগণ উৎকণ্ঠিত হলেন। অগত্যা তাঁকে ডাক্তারদের নাম করে আমের রস না খাবার জন্য বারংবার অনুরোধ করা সত্বেও তিনি গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন—"আমি বলছি, খাব।"

আহারাদি শেষ হবার সময় যখন আমের রস তাঁর সামনে দেওয়া হল তিনি একটু মুখে দিয়ে বল্লেন—"আমার আমের রস খাওয়া হয়ে গেছে। ইচ্ছা হয়েছিল, তাই একটু মুখে দিলুম। * * * * আমি কি লোভ করে খাই? আমি যে কেন এটা ওটা একটু একটু চেয়ে খাই তার অর্থ তোমরা কি বুঝবে?" পরে একটু উত্তেজিত হয়ে বল্লেন,—"খাবার জন্য আমায় বলতে এসেছে! জান, ইচ্ছামাত্র এক্ষুণিই এই শরীর পর্যন্ত ছেড়ে দিতে পারি? তা তুচ্ছ খাওয়া! স্বামীজী কেন মহাপুরুষ নাম রেখেছিলেন?" * * * * ইত্যাদি অনেক কথা সেদিন বলেছিলেন এবং সারাদিনই গম্ভীর হয়েছিলেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন অন্য রাজ্যে বিচরণ করছেন।

* * * *

জনৈকা স্ত্রীভক্তের একমাত্র সন্তান কঠিন রোগাক্রান্ত হয়। চিকিৎসাদিতে রোগের উপশম না হয়ে যখন ডাক্তারদের মতে রোগীর বাঁচবার কোনই আশা নেই, তখন সে স্ত্রীভক্তটী অনন্যোপায় হয়ে মহাপুরুষজীর চরণপ্রান্তে উপনীত হয়ে কেঁদে কেঁদে বল্লে—"বাবা, আপনি একবার বলুন—আমার ছেলেটী ভাল হয়ে যাবে।" মহাপুরুষজী ধীরভাবে সব শুনলেন। স্ত্রীভক্তটীর বারংবার কাতর প্রার্থনার পরে তিনি বল্লেন—"ঠাকুরের ইচ্ছা হয় তো সেরে যাবে।" কিন্তু ছেলেটী কয়েক দিনের মধ্যেই মারা যায়। তখন একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে সে তাঁর নিকট খুব বিলাপ করে কাঁদতে কাঁদতে অনুযোগ করে বল্লে—'আপনি তো বলেছিলেন ছেলে ভাল হয়ে যাবে, তবে যে মারা গেল? আমি এখন কি নিয়ে থাকব?' ইত্যাদি। স্ত্রীভক্তটী বারবারই তাঁকে এই বলে অনুযোগ করে কাঁদতে লাগল। সে কী কান্না! তখন মহাপুরুষজী বল্লেন—"দেখ মা, আমি জানতুম যে ছেলে বাঁচবে না, কিন্তু তুমি যে ছেলের মা। মার সামনে কি করে বলি যে তোমার ছেলে মারা যাবে। তাই বাধ্য হয়ে বলেছিলাম যে ঠাকুরের ইচ্ছা হয় তো ভাল হয়ে যাবে। তুমি কেঁদো না মা। আমি বলছি ঠাকুর তোমার প্রাণের সব শোক তাপ মুছে দেবেন। তুমি এখন হতে ঠাকুরকেই তোমার সন্তান বলে ভেবো। তিনি কৃপা করে তোমার সব অভাব পূর্ণ করে দেবেন, তোমার প্রাণে অপার্থিব শান্তি দেবেন।" তাঁর আশ্বাসবাণী ও আশীর্বাদ পেয়ে স্ত্রী-ভক্তটীর প্রাণ শান্ত হয়ে গেল এবং পরে তার জীবনে অদ্ভুত পরিবর্তন এসেছিল।

* * * * *

শাস্ত্রে আছে যে আধিকারিক পুরুষগণ একমাত্র দয়াবৃত্তি অবলম্বন করে জগতে অবস্থান করেন এবং সময় সময় সেই দয়াবৃত্তির স্রোত এত প্রবল হয় যে উহা প্রকৃতির নিয়মের গণ্ডীকে উল্লঙ্ঘন করেও প্রবাহিত হয়। মানবের শোকদুঃখ মোচনের জন্য তাঁদের সত্যসঙ্কল্প মনের ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে অনেক সময় অসম্ভবও সম্ভব হয়ে থাকে। মহাপুরুষ মহারাজের জীবনেও এই প্রকার বহু ঘটনা সঙ্ঘটিত হয়েছে—যাকে সাধারণ কথায় miracle (অলৌকিক শক্তি) বলা যেতে পারে, কিন্তু পরদুঃখমোচন ও অপার দয়াই তাঁকে ঐ সকল কাজে প্রণোদিত করেছিল—অলৌকিক শক্তি দেখাবার জন্য নয়।

একদিন বিকেলবেলা মহাপুরুষজী নিজের ঘরে পশ্চিমাস্য হয়ে বসে আছেন। এমন সময় কলকাতা-বাসী অপরিচিত কয়েক জন সম্ভ্রান্ত লোক তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেন। তাঁদের সঙ্গে রুক্ষ ও আলুলায়িত-কেশা, রোরুদ্যমানা, পাগলিনীর মত একজন স্ত্রীলোকও ছিলেন। তাঁদের দেখেই মনে হল যেন সকলেই দারুণ শোকসন্তপ্ত। তাঁরা নিজেদের পরিচয় দিয়ে বল্লেন যে মাত্র কয়েক দিন পূর্বে তাঁদের একমাত্র ছেলে—বয়স আঠার বৎসর, খুব বলিষ্ঠকায়—অপঘাতে মারা গেছে। সেই অবধি বিশেষ করে তার জননী (সমাগতা স্ত্রীলোকটী) আহার নিদ্রা ত্যাগ করে উন্মাদের ন্যায় দিবারাত্রি কান্নাকাটি করছে, কিছুতেই শান্ত হচ্ছে না। মৃতের পিতা কাঁদতে কাঁদতে করজোড়ে মহাপুরুষ মহারাজকে বল্লেন—"বাবা, আপনার নাম শুনে বড় আশা করে এসেছি। (নিজের স্ত্রীকে দেখিয়ে) একে বাঁচান। আমি তো কোন রকমে সামলে নেব, কিন্তু এ আর বাঁচবে না; আহার নিদ্রা ছেড়েছে, আর দিনরাত কেবল কান্নাকাটি করছে; কখনও আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে, কিছুতেই শান্ত করা যাচ্ছে না।" সেই মহিলাটী ততক্ষণ কেবল "বংশী, বংশী, বাবা, তোকে আর দেখতে পাব না?" বলে আর্তনাদ করে কাঁদছিলেন। বড়ই করুণ দৃশ্য! মহাপুরুষজী কিন্তু ধীর স্থির ভাবে বসে আছেন। এতক্ষণ একটী কথাও বলেন নি। পরে যেন আপন মনেই বল্লেন—"আহা, এ নিদারুণ শোকে কি সান্ত্বনা দেব? এখন ওদের মন যেন তপ্ত লোহার মত হয়ে রয়েছে। ঠাকুর, তুমি সবই দেখছ, এদের প্রাণে একটু সান্ত্বনা দাও।" পরে ঐ ভদ্রলোকদের দিকে তাকিয়ে বল্লেন—"আমি যে আপনাদের কি বলে সান্ত্বনা দেব তা ভেবেই পাচ্ছিনে, এ দুঃসহ শোক একমাত্র শ্রীভগবানই নিবারণ করতে পারেন। তিনি দয়াময়, অথচ কেন যে এহেন কঠিন শোকতাপ দেন তা তিনিই জানেন।" মহাপুরুষ মহারাজ আরও কি বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় শোকাতুরা স্ত্রীলোকটী তাঁর পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলেন—"বাবা, আমি কি আমার বংশীকে আর দেখতে পাব না? একটীবারমাত্র আমি তাকে দেখতে চাই, তা হলে আমার আর কোন দুঃখ থাকবে না। আমার বংশীকে একটী-বারমাত্র আমায় দেখান। সে কোথায় কিভাবে আছে, কি করছে, আমি দেখব।" মহাপুরুষ মহারাজ যতই বলছেন—"তাকে কি করে আর দেখবে মা? মৃত ব্যক্তিকে কি আর দেখতে পাওয়া যায়? ঠাকুরকে ডাক, তিনিই তোমার প্রাণে শান্তি দেবেন। আমি বলছি মা, তাঁর কৃপায় সব ঠিক হয়ে যাবে, ক্রমে প্রাণে শান্তি পাবে। তিনি তোমার ছেলের আত্মার সদ্গতি করবেন।" ছেলের মা কিন্তু কিছুতেই প্রবোধ মানেন না। তিনি মহাপুরুষজীর পা জড়িয়ে ধরে অনবরত রোদন করতে লাগলেন আর তাঁর পূর্বোক্ত প্রার্থনা জানাতে লাগলেন। দেখতে দেখতে মহাপুরুষ মহারাজের মুখমণ্ডল লাল হয়ে উঠল। তিনি সামনে দেয়ালস্থিত ঠাকুরের ছবির দিকে একবার তাকিয়ে যেন দেবাবিষ্টের ন্যায় বল্লেন—

"একবার দেখলেই তো শান্তি হবে? তা আমি বলছি ঠাকুরের ইচ্ছায় তাকে দেখতে পাবে।" এইমাত্র বলার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ঘর একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেল, মনে হল এ যেন দৈববাণী। সকলেই একেবারে স্তম্ভিত। মৃতের জনক-জননী উভয়েরই কান্নাকাটি আর্তনাদ সব থেমে গেল। তাঁর ঐ কথা কয়টি যেন মন্ত্রশক্তির মত তাঁদের প্রাণে ক্রিয়া করল, তাঁরা ক্রমে শান্ত ও আশ্বস্ত হলেন। তখন সকলকে ঠাকুরের প্রসাদ এনে দেওয়া হল। তাঁরাও ঠাকুর দর্শন করে বিদায় নিলেন। তাঁরা তো চলে গেলেন কিন্তু সেবকরা এবং মঠের অন্যান্য যাঁরা সে সময় উপস্থিত ছিলেন সকলেরই মনে এ ব্যাপার এক মহা আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। মৃত ব্যক্তিকে পুনরায় দেখা কি সম্ভব? মহাপুরুষ মহারাজের কথা শেষটায় মিথ্যা হয়ে যাবে না তো? ইত্যাদি।

ঐ ঘটনার ২।৩ দিন পরে একদিন বিকেলবেলা হঠাৎ সেই মৃতের জনক-জননী উভয়েই এসে হাজির। এখন তাঁরা যেন নূতন মানুষ। যে জননী সেদিন পাগলিনীর ন্যায় এসেছিলেন তিনি এখন হাসতে হাসতে উপরে এসে মহাপুরুষজীর চরণপ্রান্তে ভক্তিভরে প্রণাম করে বল্লেন—"বাবা, আমার আর কোন দুঃখ নেই। আপনার দয়ায় আমি বংশীকে দেখেছি। সে বেশ আনন্দে আছে। দেখলাম, সে বাঁশী নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে খেলে বেড়াচ্ছে। আপনার কৃপায় আমি বংশীকেও দেখেছি আর শ্রীভগবানকেও দর্শন করেছি।"

মহাপুরুষজী খুব আবেগভরে বল্লেন,—"আমি কিছুই জানিনে মা। (ঠাকুরের ছবির দিকে দেখিয়ে) ঠাকুরই সব করেছেন। তিনিই আমাদের অন্তরাত্মা। জয় প্রভু! ধন্য প্রভু!"

* * * *

একদিন কৃ···মহারাজ মহাপুরুষজীর নিকট জনৈক ব্রহ্মচারীর সম্বন্ধে নানা অভিযোগ করছিলেন। তিনি সব শুনে বল্লেন, "দেখ কৃ···, ঠাকুর বলতেন বিন্দুতে সিন্ধু দেখতে হয়। তিনি যে শুধু একথা মুখেই বলতেন তা নয়, তাঁর দৃষ্টিই ছিল সেই রকম, তা না হলে আমরাই কি তাঁর আশ্রয়ে থাকতে পারতাম? দোষ না দেখে তিনি কৃপা করে আমাদের টেনে নিয়েছিলেন বলেই তো আমরা তাঁর আশ্রয় পেয়েছিলাম। একেবারে দোষ না আছে কার? এখানে সকলেই perfect (সর্বাঙ্গ সুন্দর) হতে এসেছে, কিন্তু perfect হয়ে তো কেউ এখানে আসে নি? অমন একটু আধটু দোষ ক্রমে ঠাকুরের কৃপায় সব শুধ্‌রে যাবে। কোন রকমে তাঁর আশ্রয়ে পড়ে থাকতে পারলেই তিনি কৃপা করে ক্রমে সব ঠিক করে নেবেন।" মহাপুরুষজীর এসব কথা শুনেও কৃ···মহারাজ পুনরায় বল্লেন—"আপনি ডেকে তাকে একটু ধমকে দিলে বোধ হয় ঠিক হয়। তার সম্বন্ধে আপনি ইতিপূর্বে যা শুনেছিলেন ওসব বোধ হয় ঠিক নয়। আমি খুব ভাল রকম জেনেই আপনাকে বলছি।" তখন মহাপুরুষজী হঠাৎ খুব গম্ভীর হয়ে একটু দৃঢ়স্বরে বল্লেন,—"দেখ কৃ··, তুমি কি আমার চাইতেও বেশী অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন? ঠাকুরের কৃপায় আমরা এক নজরে সব বুঝতে পারি, লোকের ভেতর-বাইর সব দেখতে পাই। ঠাকুর বহুভাবে আমাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন। সে সব তোমায় কি বলব? কাউকেই বলবার নয়। কে কেমন লোক, কার হবে না হবে এসব আমরা খুব জানি। খালি বললে বা ধম্‌কালে মানুষের দোষ শোধ্‌রায় না। পার তো নিজ আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারা লোকের মনের গতি ফিরিয়ে দাও।" মহাপুরুষজীর গাম্ভীর্য ও চোখমুখের দীপ্তি দেখে কৃ··মহারাজ একেবারে হাত জোড় করে তাঁর চরণে মাথা রেখে বল্লেন, "মহারাজ, আমি বুঝতে পারি নি, আমার অপরাধ নেবেন না, আমায় ক্ষমা করুন।" তখন তিনি বল্লেন, "যদি কাউকে শোধরাতে হয় তো তার জন্য

ঠাকুরের কাছে খুব প্রার্থনা কর। ঠাকুরকে বল। তিনিই যদি দয়া করেন তবেই মানুষের মনের গতি চকিতে পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে।" ক···মহারাজ চলে যাবার পর তিনি বলেছিলেন,—"ঠাকুরের আশ্রয়ে যারা এসেছে তারা কেউই কম নয়, সব জাত সাপের বাচ্চা। নূতন ব্রহ্মচারীই হোক্ আর অতি প্রাচীন সাধুই হোক্। কত জন্মের সুকৃতির ফলে এই পবিত্র সঙ্ঘে আশ্রয় লাভ হয়!"

মহাপুরুষ মহারাজের কৃপা সকলের উপরেই সমভাবে বর্ষিত হত এবং সকলেরই কল্যাণকামনায় তিনি সদা নিরত থাকতেন। অনেক সময় দেখা গেছে যে, যারা নানা হীনবৃত্তি অবলম্বন করে শ্রীশ্রীঠাকুরের পবিত্র সঙ্ঘকে বিশ্লেষণ করতেও কুণ্ঠিত হয় নি, তাদের জন্যও পৃথক পৃথক ভাবে তাদের নাম করে তিনি ঠাকুরের নিকট খুব কাতর ভাবে প্রার্থনা করতেন।

* * * *

সর্বভাবময় শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরঙ্গ পার্ষদদের জীবনেও নানাভাবের বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়। তাঁরাও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাব আশ্রয় করে ভগবল্লীলা সম্ভোগ করতেন। বেলুড় মঠে অবস্থানকালীন এক সময়ে মহাপুরুষ মহারাজের এমনি একটা ভাব এসেছিল যে মঠের সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী বা ভক্ত নরনারী বালক-বালিকা যে কেউ তাঁকে দর্শন করতে আসত, তাদের প্রত্যেককেই তিনি আগে হাতযোড় করে প্রণাম করতেন, আর সকলকেই কিছু না খাইয়ে তৃপ্ত হতে পারতেন না। তাঁর ঘরের পাশের ছাদের উপর নিত্য নানাজাতীয় পাখীর খাওয়াবার ব্যবস্থা ছিল। তিনি বালকের মত আনন্দ করে পাখীগুলির খাওয়া দেখতেন।

কোন কোন দিন সকালবেলা দেখা যেত যে তিনি নিজের বিছানার উপর, কথামৃত, গীতা, চণ্ডী, হিতোপদেশ, ঠাকুরমার ঝুলি, একটা খঞ্জনী, লাঠী ও ছবির বই ইত্যাদি নানা জিনিস নিয়ে বসে আছেন—যেন পাঁচ বছরের একটী বালক! আর ইচ্ছা মত সব জিনিস নাড়াচাড়া করছেন। হয়তো একটু খঞ্জনী বাজালেন, "ঠাকুরমার ঝুলি' একটু পড়লেন, আবার হাসতে হাসতে লাঠী হাতে করে সেবকদের শাসাচ্ছেন। তিনি যে কেন এমন করছিলেন তার একটু আভাস পাওয়া যায় তাঁর একদিনকার কথা থেকে। জনৈক সেবককে কথায় কথায় বলেছিলেন —"দেখ, মনটা সব সময়ই নির্গুণের দিকে ছুটে যেতে চায়, তাই এসব পাঁচ রকম জিনিস নিয়ে মনকে নামিয়ে রাখবার চেষ্টা করি। মা যেমন খেলনা দিয়ে ছেলেদের ভুলিয়ে রাখেন, তেমন আমিও মনকে পাঁচ রকমে ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা করছি।"

মহাপুরুষ মহারাজের শেষ তিন চার বৎসর তাঁর নিকট অগণিত দীক্ষাপ্রার্থী ও ভক্তের সমাগম হত। তিনিও নিজ শরীরের প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে অকাতরে সকলকে কৃপা করতেন। সে সময় দেখা যেত যে তিনি রোজই বেলা ৯টা নাগাদ কাপড় ছেড়ে গঙ্গাজলে হাতমুখ ধুয়ে দীক্ষার্থীদের কৃপা করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকতেন। তিনি কাউকে বিমুখ করতেন না। একদিন পনর জনকে দীক্ষা দিয়ে পরে বলেছিলেন—"বাবা, ঠাকুর বলতেন—এক আধ জনকে দেখেশুনে দিতে হয় কিন্তু এখন তো একেবারে বাঁধ ভেঙ্গে গেছে। তিনিই জানেন কেন যে এত লোকের হৃদয়ে প্রেরণা দিয়ে এখানে নিয়ে আসছেন। তাঁর ইচ্ছা, আমি আর কি করব বল? এইভাবে এই বুড়ো শরীরটা যে আর কত দিন বইতে পারবো তা তিনিই জানেন।"

* * * *

একদিন কথাপ্রসঙ্গে মহাপুরুষ মহারাজ জনৈক

সেবককে লক্ষ্য করে বলেছিলেন—"দেখ্ বাবা, তোদের জীবনের আদর্শ হল ঠাকুর, আর তিনি ছিলেন ত্যাগীর বাদশা। তোরা তাঁরই আশ্রয়ে এসেছিস্, একথা সর্বক্ষণ স্মরণ রাখবি। তাঁর এই পবিত্র সঙ্ঘে স্থান পেয়েছিস্ সেও মহা সৌভাগ্যের কথা। তোদের উপর কত বড় দায়িত্ব যে আছে তা ভেবে দেখবি। আমাদের শরীর আর কত দিন? এর পরে তোদের দেখেই লোক শিখবে। ত্যাগই হল সন্ন্যাস-জীবনের ভূষণ। যে যত ত্যাগ করতে পারে সে তত ভগবানের দিকে এগুচ্ছে। খাঁটি সন্ন্যাসী হওয়া খুবই কঠিন। খালি বিরজা-হোম করে গেরুয়া পরলেই সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। যে কায়মনোবাক্যে সব এষণা ত্যাগ করতে পেরেছে, সেই হল ঠিক ঠিক সন্ন্যাসী। যত পারিস্ ত্যাগ করে যা; দেখবি সময়ে দরকার হলে মা এত দেবেন যে সামলাতে পারবি নি। তবে কি জানিস্ সঞ্চয় করতে নেই, এমন কি সঞ্চয়বুদ্ধিও রাখতে নেই। ঠিক সাঁকোর জলের মত—একধার দিয়ে আসবে আর এক দিক্ দিয়ে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু যেই সঞ্চয় করেছিস্ তো আর আসবে না। তখন ময়লা জমতে সুরু করবে। আর কখনও কোন জিনিস চাইতে নেই। তাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে তাঁর আশ্রয়ে পড়ে থাক্। যখন যা দরকার মা সব দেবেন। এই দেখ্ না, এখন এত জিনিসপত্র, খাবার-দাবার, কাপড়-চোপড় সব আসছে যে সামলান দায়। তাই ভাবি ঠাকুরের কি ইচ্ছা! এমনও দিন গেছে যখন বরাহনগর মঠে থাকতে একখানা কাপড়ই সকলে মিলে পরতাম, আর এখন নিত্য নূতন গরদ পরলেও ফুরায় না। তবে কি জানিস্, তাঁর দয়ায় মনটা তখনও যা ছিল এখনও তাই। পরনে কাপড় ছিল না বলে মনে কোন দুঃখ ছিল না, কোন অভাববোধও হত না। তিনি কৃপা করে ভরপুর আনন্দ দিয়েছিলেন। এই দেখ্ না, তোরা তো এখন আমায় দুহাত গদির উপর শুইয়ে রেখেছিস্ কিন্তু আমার মনে হয় সেই কাশীর কথা—যখন শীতকালে কেমন খড় পেতে তার উপর শুয়ে থাকতাম। তাতে যা আনন্দ তা এর সঙ্গে তুলনাই হয় না।"

* * * *

একদিন সকালে দীক্ষার সমস্ত আয়োজন করে দিয়ে সেবক নিত্যকার মত তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে আস্‌ছিলেন। তাকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখে বল্লেন,—"থাক না, তাতে আর হয়েছে কি? দীক্ষার মন্ত্র কে না জানে? আর ও সব মন্ত্র তো বইতেই ছাপা আছে। তবে কি জান বাবা, ঐ মন্ত্রই সিদ্ধগুরুর মুখ থেকে বেরুলে তাতে মন্ত্র চেতন হয়। নইলে তো ওটা শব্দমাত্র। গুরু নিজ শক্তি বলে মন্ত্র চেতন করে দেন, আর শিষ্যের কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রতা করে দেন। এই হল আসল ব্যাপার।"

নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষগণ যেন শ্রীভগবানের জীবন্ত-বিগ্রহ। তাঁদের সাহচর্য ও সেবা জীবকে ভগবৎসান্নিধ্যে নিয়ে যায়। কিন্তু তাঁদের সেবা বা সঙ্গ করা খুবই কঠিন ব্যাপার। বরং দেববিগ্রহের সেবাপূজা সে তুলনায় সহজ। সাধনভজনদ্বারা চিত্ত শুদ্ধ না হলে মহাপুরুষের প্রকৃত সেবা করা সম্ভব নয়। আর চাই ঐকান্তিক নিষ্ঠা। সাধনচতুষ্টয়-সম্পন্ন না হয়ে মহাপুরুষদের সেবা করতে গেলে সেবাপরাধ হবার খুবই সম্ভাবনা।

মহাপুরুষ মহারাজের জনৈক সেবক নিজেকে একবার সেবাপরাধে অপরাধী মনে করে এক দিন তাঁকে একান্তে দীনভাবে জিজ্ঞেস করেছিলেন—"মহারাজ, আপনার সেবা করতে অনেক সময়েই বহু ত্রুটি হয়ে যায় এবং আপনিও খুব বিরক্তি-

প্রকাশ করেন। আপনারা সত্যসঙ্কল্প মহাপুরুষ। আপনাদের মুখ দিয়ে যা বেরুবে তা তো সত্য হয়ে যাবে এবং আপনাদের বিরক্তিতে আমার তো মহা অকল্যাণ হবে। এ অবস্থায় আমার কি করা উচিত তা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি নে।" সেবকের কথা শুনে মহাপুরুষ মহারাজ খানিকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে মৌন হয়ে রইলেন। করুণা ও স্নেহে তাঁর মুখমণ্ডলে এক স্বর্গীয় আভা ফুটে বেরুতে লাগল। পরে খুবই আবেগভরে স্নেহপূর্ণ স্বরে বল্লেন—"দেখ বাবা, ঠাকুর এসেছিলেন জগতের কল্যাণের জন্য, আমরাও তাঁরই সঙ্গে এসেছি। জীবের কল্যাণ কামনা করা ছাড়া আর কোন কামনা আমাদের নেই। স্বপ্নেও কখনও কারও অকল্যাণ কামনা করি না। আর ঠাকুরও আমাদের দ্বারা কারও কোন প্রকার অনিষ্ট বা অকল্যাণ হতে দেবেন না। তোমরা আমার কাছে রয়েছ, সর্বক্ষণ আমার সেবা করছ, তোমাদের ভাল-মন্দর সমস্ত ভার ঠাকুর আমার উপর দিয়েছেন। সেজন্য তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি সব শুধ্‌রে নিতে হচ্ছে। তোমাদের ভালর জন্যই অনেক সময় গালমন্দ পর্যন্ত করি, কিন্তু সে সবই বাহ্যিক। অন্তরে আছে স্নেহ, ভালবাসা আর দয়া। নইলে কাছে রাখা কেন? এইটে খুব জানবে যে সবই তেমাদের ভালর জন্যই করি। তোমাদের শোধ্‌রাবার জন্য—তোমাদের জীবনের গতি যাতে সর্বতোভাবে ভগবন্মুখী হয় সেজন্য প্রয়োজন বোধে অনেক সময় কঠিন ব্যবহারও করে থাকি এবং কেন এমন করি তা-ও বেশ ভাল করে জেনেই করে থাকি—ক্রোধের বশবর্তী হয়ে নয়। ঠাকুরের কাছে তোমাদের কল্যাণের জন্য কত যে প্রার্থনা করতে হয়, তার এতটুকুও যদি জানতে পারতে তাহলে তোমার মনে এমন আশঙ্কা কখনই উঠত না। তা ছাড়া 'ক্রোধোঽপি দেবস্য বরেণ তুল্যঃ।' আমাদের ক্রোধও বরের মত জানবে।"

* * * *

মহাপুরুষ মহারাজ সেবার মঠে বাসন্তী পুজো করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু সময় সংকীর্ণতার দরুন তা আর সম্ভব হয় নি। সে সম্বন্ধে একদিন কথাপ্রসঙ্গে জনৈক সেবক বলেছিলেন —"মহারাজ, আপনার যখন বাসন্তীপুজো করার বাসনা হয়েছে তখন নিশ্চয়ই হয়ে যাবে।" সেবক খুব সাধারণভাবেই একথা বলেছিল, কিন্তু 'আপনার বাসনা হয়েছিল' একথা শুনে তিনি যেন চমকে উঠে বল্লেন—"আঁ্যা, কি বল্‌লি? বাসনা? আমার বাসনা হয়েছিল? ঠাকুরের কৃপায় আমার কোন বাসনা নেই। বিন্দুমাত্রও নয়।" তখন সেবক নিজের ভুল বুঝতে পেরে বল্লেন—"না মহারাজ, আপনার শুভ ইচ্ছা যখন হয়েছিল—।" তখন তিনি বল্লেন—"হাঁ, আমাদের শুভ ইচ্ছায়, তাঁর কৃপায় সব হতে পারে। তবে আমার ঠাকুর ছাড়া পৃথক্ অস্তিত্বও নেই, আর আলাদা কোন ইচ্ছাও নেই। তাঁর ইচ্ছা যা হয় তাই হবে।"

হিন্দুশাস্ত্র

স্বামী চিন্ময়ানন্দ

বেদান্ত

শাস্ত্রের বিভাগপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে বেদান্ত বেদের অন্তভাগ, ব্রাহ্মণাংশ বা ব্রাহ্মণ-ভাগ ব্রাহ্মণ[1], আরণ্যক ও উপনিষৎ রূপে বিভক্ত। 'বেদ'-এর 'অন্ত'ভাগ বলিয়া উপনিষৎকে 'বেদান্ত'ও বলা হয়; এবং স্বরূপে এই উপনিষৎ বেদ-রূপ বলিয়া ইহাকে 'বেদ' বা 'শ্রুতি'ও বলা হইয়া থাকে।

ব্রহ্মজ্ঞান উপনিষদ্‌গম্য

প্রাচীনতম হিন্দু-সংস্কৃতির বিষয় কিছু জানিতে হইলে উপনিষৎ-সমূহ অধ্যয়ন অবশ্য করা উচিত। যেখানে প্রত্যক্ষাদি কোনও লৌকিক প্রমাণের গতি নাই, যাহা প্রত্যক্ষ-মূলক লিঙ্গব্যাপী অনুমানদ্বারাও নির্ধারণ করা যায় না, তাহাকে জানিবার একমাত্র সাধন শ্রুতি—উপনিষৎ। অন্য প্রমাণদ্বারা অবাধিত ও অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান 'প্রমা'। এই প্রমার সাধনকে 'প্রমাণ' বলে। প্রত্যক্ষ আদি প্রমাণদ্বারা যাহা জ্ঞাত হওয়া যায় না এবং প্রত্যক্ষ, অনুমান আদি প্রমাণসমূহদ্বারা যাহা অবাধিত, সেই ব্রহ্ম-বিষয়ক জ্ঞান উপনিষৎ হইতেই হইয়া থাকে। এই জন্য ব্রহ্মকে 'ঔপনিষদ্ পুরুষ'[2] বলা হইয়াছে। এই ব্রহ্ম-বিষয়ক জ্ঞান শ্রুতিতে গুরুর[3] উপদেশ এবং উপনিষদের শ্রবণ-জন্য প্রজ্ঞাদ্বারাই হইয়া থাকে। এই শ্রবণজন্য প্রজ্ঞালাভও উপনিষদের যথার্থ তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিবার উপরেই নির্ভর করে।

উপনিষদের মুখ্য আলোচ্য বিষয়

অধিকাংশ উপনিষদেরই প্রারম্ভে উপাসনাদি ও শেষে ব্রহ্ম-বিদ্যার উপদেশ পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ কঠ-উপনিষৎ পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে উহার প্রারম্ভে স্বর্গ-লাভের সাধন-রূপ কর্ম ও 'উপাসনা' সমুচ্চিত 'অগ্নি-বিজ্ঞান' কর্মের উপদেশ দানের পর, কর্মনিরপেক্ষ ব্রহ্ম-বিদ্যার বিস্তৃত বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। শ্রুতি লৌকিক নীরসতাপূর্ণ ব্রহ্ম-বিদ্যার, গুরু-শিষ্য-সংবাদরূপ আখ্যায়িকার প্রশ্নোত্তর ছলে উপদেশ করিয়াছেন। আত্মার স্বরূপ কি? মৃত্যুর পরে আত্মা থাকে, কি থাকে না? ঈশ্বর আছেন কি নাই? যদি থাকেন, তবে তাঁহার সঙ্গে জগৎ ও জীবের কি সম্বন্ধ? ব্রহ্ম বস্তু কি? তাঁহাকে কিরূপে জানা যায়? সর্বসাধারণে তিনি জ্ঞাত কেন হন না? আর তাঁহাকে জানিয়া লাভই বা কি? এইরূপ বহু প্রশ্নের মীমাংসা এই উপনিষৎ পাঠে হইয়া থাকে।

উপনিষৎ পাঠের প্রয়োজন কি?

সম্পূর্ণ উপনিষদের পরিসমাপ্তি আত্মার যথার্থ স্বরূপ নিরূপণে। উপনিষৎ আত্মার যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ করিয়া জীব-আত্ম-সম্বন্ধী অনাদি অজ্ঞান

১ এই ব্রাহ্মণ অংশ কর্মচোদনা ব্রাহ্মণানি—কর্মসমূহের বিধিরূপ।

২ ঔপনিষদ্ পুরুষ—'তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি' (বৃঃ ৩-৯-২৬)।

৩ গুরু—'আচার্যবান্ পুরুষো বেদ' (ছাঃ ৬-১৪-২); 'প্রাপ্য বরান্' (কঃ ১-৩-১৪); 'গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ' (মুঃ ১-২-১২); 'তস্মৈ মা ব্রূয়া নিধিপায় ব্রহ্মান্' (নিরুক্ত, ২-১)।

নিবৃত্ত করিয়া জীবের শোক মোহ আদি ধর্ম-সমূহের বিচ্ছেদ-সাধক আত্মৈকত্ব বিজ্ঞান উৎপন্ন করিয়া দেয়। উপনিষদে কথিত আত্মাকে সাক্ষাৎ জানিয়া জীব মৃত্যুর মুখ হইতে মুক্ত হয়। ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া জীব বিরজঃ (ধর্ম ও অধর্ম হইতে রহিত) ও বিমৃত্যু[৫] (অমর) হয়। উপনিষদুক্ত ব্রহ্ম-জ্ঞান-প্রাপ্ত ব্যক্তি জীবিত অবস্থাতেই মুক্ত হইয়া ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিয়া থাকেন, এবং এই দৃশ্যমান পাঞ্চভৌতিক শরীর পতিত হইবার পরে, আর কখনও তাঁহাকে শরীর গ্রহণ করিতে হয় না। এইরূপ অজ্ঞানের নিবৃত্তি ও পরমানন্দ-প্রাপ্তিরূপ 'প্রয়োজন' উপনিষদের জ্ঞানদ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে।

অনুবন্ধ-চতুষ্টয়

'উপনিষৎ' শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্বাচন-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, ইহার 'অধিকারী' কে? যিনি মুমুক্ষু এবং যিনি জিজ্ঞাসু (এই তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক), তিনিই এই উপনিষৎ-পাঠের ও জ্ঞানমার্গের অধিকারী। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে আত্মার স্বরূপ-নিরূপণ ও ব্রহ্মাত্মৈক্য-জ্ঞানই এই উপনিষদ্-গ্রন্থসমূহের বিষয়। পূর্বোক্ত 'প্রয়োজনের' সহিত ইহার প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদক-রূপ সম্বন্ধও স্পষ্ট বোঝা যায়। অতএব এইরূপ অধিকারী, বিষয়, প্রয়োজন ও সম্বন্ধরূপ 'অনুবন্ধ[৬]-চতুষ্টয়-যুক্ত উপনিষদ্-গ্রন্থ ব্রহ্ম-তত্ত্বের জিজ্ঞাসু মাত্রেরই অধ্যয়ন ও তদ্বিষয়ক জ্ঞান লাভ করা বাঞ্ছনীয়।

উপসংহার

প্রস্থান-গ্রন্থ-সমূহ পাঠের ফলে সম্পূর্ণ বেদান্তের চরম সিদ্ধান্ত এইরূপ অনুভূত হয় যে—"ব্রহ্মাত্মৈক্য-জ্ঞানাদেব মুক্তিরিতি বস্তু-গতিঃ; মতান্তরাশ্রয়ণে তদভাবাদ্ মোক্ষাসিদ্ধিঃ। কিঞ্চ, আত্মানমন্যথা জ্ঞাত্বা তৎপাপেন সংসারান্ধ-কূপে পতেৎ, 'অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি', 'যে কে চাত্মহনো জনাঃ' ইতি শ্রুতে"—ব্রহ্মাত্মৈক্য-জ্ঞান (ব্রহ্ম ও আত্মা এক—'ব্রহ্মই আমি'[৭]—এইরূপ অভেদ-জ্ঞান)

৪ কঠঃ ১-৩-১৫।

৫ কঠঃ ২-৩-১৮ দ্রষ্টব্য।

৬ অনুবন্ধ—গ্রন্থের অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজনের প্রত্যেকের অগ্র-পশ্চাৎস্থিত সংগতি-জ্ঞাপক সংজ্ঞা।

৭ 'ব্রহ্মই আমি'—'অহং ব্রহ্মাস্মি' (বৃঃ ১-৪-১০) এই মহাবাক্যের আক্ষরিক অর্থ—আমি (অহং) ব্রহ্ম হইতেছি (অস্মি)। এখানে 'ব্রহ্মই আমি' (হইতেছেন) এইরূপ বিধেয় রূপে দেওয়া হইয়াছে। ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে—মূল পদার্থত্রয় অনুসারে 'আমিই ব্রহ্ম হইতেছি' (হইতেছি—'am' বা 'হুঁ,' হিন্দীতে) এই রূপ অর্থে 'আমি'-ত্বের ('অহং'-ভাবের) পূর্ণতঃ অভাব দেখা যায় না; এবং এই প্রকার অর্থ মননের ফলে অনেক সাধকের মনে 'আমি বেদান্তী' এই গর্ব থাকিয়া যায় (অর্থাৎ তাঁহারা স্বীয় ব্রহ্মত্বের বা 'আমিই ব্রহ্মের' 'অহং'-ভাব রাখিয়া থাকেন)। অন্য তাৎপর্যে ('আমি'কেই বিধেয় রূপ না করিয়া) 'ব্রহ্ম'কেই বিধেয় রূপ মানিবার ফলে 'আমি' আদি সমস্তই ('যুস্মৎ,' 'অস্মৎ'—তুমি, আমি—আদি শব্দ-গোচর সম্পূর্ণ পদার্থ অর্থাৎ তুমি, আমি ও জগৎ আদি শব্দ-বাচ্য সমগ্র প্রপঞ্চ) ব্রহ্মতে অন্তর্ভূত হইয়া যায়। এই প্রকার তাৎপর্য গ্রহণ করিলে সাধকের এইরূপ বোধ হইতে থাকে যে এক মাত্র 'ব্রহ্মই আছেন' (আছেন—is, 'হায়,' হিন্দীতে)। পরন্তু অন্য 'আমি' আদি শব্দ-বাচ্য কোনও, ব্রহ্মাতিরিক্ত, ব্যক্তি বা পদার্থ আদি কোথাও কখনও নাই। মিথ্যা-কল্পিত বা অজ্ঞান-অধ্যস্ত কোনও পদার্থ না থাকা ও এক মাত্র ব্রহ্মই শেষে থাকা অর্থাৎ এইরূপ বোধ হওয়া যে কোথাও কখনও ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত (ব্রহ্ম ভিন্ন) অন্য বস্তু নাই, ইহাই যথার্থ জ্ঞান বা সম্যগ্ দর্শন। অতএব মুমুক্ষু সাধকদিগের জন্য 'ব্রহ্ম'ই আমি—Brahman 'is' I কিন্তু I, 'am' Brahman ('আমি'ই ব্রহ্ম) নহে—প্রারম্ভে এইরূপ তাৎপর্যের মনন করাই নিঃসন্দেহ ও নির্ভর-জনক। এইরূপ তাৎপর্য গ্রহণ করিলে সাধকের মনে প্রবর্তক অবস্থায়, ভক্তি-ভাবের সঙ্গেও বিরোধ হয় না; কারণ সাধক এইরূপ নিঃসঙ্কোচে ভাবিতে পারেন যে 'তিনি'ই অর্থাৎ ভক্তের সগুণ বা নির্গুণ ঈশ্বরই সব

হইতেই মুক্তি হইয়া থাকে। ইহাই তত্ত্ব—ইহাই বাস্তব সত্য। এতদ্ব্যতিরিক্ত অন্য মত-সমূহের আশ্রয় করিলে ইহা (জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য-জ্ঞান) হয় না। এই জন্য অন্য মত-সমূহের আশ্রয়ে মোক্ষসিদ্ধিও হইতে পারে না। অধিকন্তু, এই ঐক্যজ্ঞানের বিপরীত, আত্মাকে অন্যথা (অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন তত্ত্ব-স্বরূপ) জ্ঞানরূপ মিথ্যা জ্ঞান হইলে, ঐ পাপে সংসাররূপী অন্ধকূপে পড়িতে হয়। 'অবিদ্যা-রূপ অন্ধ তমসাচ্ছন্ন (নরকে) প্রবেশ করিয়া থাকে' (ঈশ, ৯-১২), 'যে আত্মঘাতী (অজ্ঞানী), সে অসুরদের যোগ্য লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে' (ঈশ, ৩), ইত্যাদি শ্রুতি-সমূহ হইতে এবং 'যে ব্যক্তি আত্মার যাহা সত্যরূপ (জগৎকারণ, সর্ব-স্বরূপ, এক অখণ্ড ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন তত্ত্বরূপ), তাহা হইতে অন্যরূপ বুঝিয়া থাকে, সে চোর, সে আত্মঘাতী; এবং এমন কোন পাপ নাই, যাহা ঐ আত্মাপহারী চোর দ্বারা কৃত হইতে পারে না।' এই স্মৃতি-বচন[৮] হইতেও জানা যায় যে 'অজ্ঞানী' তো আত্মাপহারী চোর, আত্মঘাতী[৯] ও পাপী, এবং সে (এই আত্ম-জ্ঞানাভাব-বশতঃ) অন্ধকারময় নরকগামী হইয়া থাকে। অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তিমাত্রেরই স্বীয় কল্যাণের জন্য শাস্ত্র-সমুদায়ের শীর্ষ-স্থানীয় প্রস্থান-ত্রয় শ্রদ্ধা-পূর্বক অধ্যয়ন এবং বেদান্ত-বাক্য-সমূহ বিশেষ রূপে বিচার করা অবশ্য কর্তব্য।

কিছু (জগৎ-প্রপঞ্চ আদি) হইয়াছেন। এইরূপে অগ্রসর হইলে দ্বৈত-দর্শী ভক্তও ক্রমশঃ ঈশ্বর (ব্রহ্ম) পরিণাম-বাদরূপ ভাব অবলম্বনে, পরে যথার্থ ব্রহ্ম-স্বরূপ-জ্ঞান পর্যন্ত সহজেই পৌঁছিতে পারেন; এবং তাঁহার পক্ষে উপরি উক্ত তাৎপর্যের মননে তথাকথিত 'ভক্তি' ও 'জ্ঞানে'র মধ্যেও অসামঞ্জস্য বা বিরোধের আতঙ্ক হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

৮ "যোঽন্যথা সন্তমাত্মানমন্যথা প্রতিপদ্যতে।
কিং তেন ন কৃতং পাপং চোরেণাত্মাপহারিণা॥"

৯ শরীরের মৃত্যুতে আত্মার 'ঘাত' (হনন, মৃত্যু) মনে করে বলিয়া আত্ম-তত্ত্বানভিজ্ঞ অজ্ঞানীকে 'আত্মঘাতী' বলা হয়। (ঈশ, ৩)।

তৃষিত

শ্রীশিবশম্ভু সরকার, এম্-এ

তোমার করুণা যদি এক বিন্দু পায় মোর প্রাণ
এ ঊষর মরুভূমে দেখা দিবে নব মরূদ্যান
নবীন কাকলি লয়ে! ঝরণার কল কল ধ্বনি
বালির নীরস বক্ষে ফোটাইবে মুগ্ধ সুরধুনি
স্বপনের ইন্দ্রজাল বুনি'! হেথা কত শব্দ, কত সুর
অনাহত আনন্দের লীলায়িত অম্লান মধুর
ধরার পাথার সাথে বেঁধে দিবে আকাশের বীণা
জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পূর্ণতার নাহিক সীমানা।

* * * *

এক কণা বারি তরে যে চাতক কণ্ঠ ফাটি মরে—
বাতাসের স্তরে স্তরে আর্তনাদ কাঁপে থরে থরে
ব্যথার রুধিরপ্লুত ভারে। তার যদি মিলে জল
কণ্ঠ যদি গেয়ে উঠে হিল্লোলিত আবেগ-বিহ্বল
প্রভাত সূর্য্যের স্তবে! তার গান—তার প্রেম-ঋক্
তোমার প্রেমের বেদে হবে নাকি অনির্ব্বাণ লিখ্
অনন্ত কালের পটে! নিষ্ফল ঐ জীবন-বাসনা
তোমার স্ফুরণ-মন্ত্রে উদ্বেলিত অসহ্য কামনা
আলোকের মধু লাগি করে যাবে শুধু হায় হায়—
চিরদিন—পথহীন—নদী খোঁজে সিন্ধু-কিনারায়!

শ্রীশ্রীমহারাজের কথা

শ্রী—

পূজনীয় শ্রীশ্রীমহারাজ জনৈক ভক্তকে বললেন, "ধর্ম্মের first step (প্রথম সোপান) হলো character (চরিত্র)। Characterটি ভাল হওয়া চাই। Sex এর ধারণা পালটে দিতে হবে।"

অপর একজন ভক্তের কথার উত্তরে বললেন, "আপনি কি history লিখবেন নাকি মশায়? কোথায় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মঠ, কোথায় কি করে বেড়াচ্ছেন? যান বিমলাময়ীর মন্দিরে গিয়ে বসে চণ্ডীপাঠ করুন গে, যান।" আর এক জনকে বললেন, "তাকে বোলো যেন তার গর্ভধারিণীকে রোজ সকালে উঠেই প্রণাম করে। আর যে মন্ত্র নিয়েছে, তা যেন জপ করে।"

একজন ভক্ত জিজ্ঞেস করলেন, "শুনেছি, কুলগুরুর কাছে মন্ত্র নিলেও মহাপুরুষের কাছে সেই মন্ত্রের চৈতন্য সম্পাদন করে নিয়ে জপ করলে বেশী ফল হয়।" মহারাজ তৎক্ষণাৎ জীবকেটে হাত নেড়ে বললেন, "ও আর দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে প্রকাশ করতে নেই।" এই ব্যক্তির মা বাটীতে মহারাজকে নিয়ে খাওয়াবার ইচ্ছে করায় তিনি বলেছিলেন, "কেন আর মিছে খরচ-পত্র করবে, এখানেও ত সেই তোমাদেরই খাচ্ছি।" সে ব্যক্তির মায়ের গঙ্গাযাত্রার সময় পুত্রকে মঠে পাঁচ টাকা দিতে বলে যান। মহারাজ শুনে বললেন, "ঐ টাকাটা দিয়ে আমি কাশীতে সধবা-ভোজনের ব্যবস্থা করে দেব; কাশীতে সধবা-ভোজনের খুব ফল।"

মহারাজ এক দিন বলেছিলেন। "যখন সাধু হয়েছি, তখন গাছতলাই সার করেছি, এ ঘর আর ও ঘর কি, যে ঘরই দিক্ না! পয়সা থাকাও দোষ, না থাকাও দোষ।"

কেদার বাবুকে বললেন, "মশাই, মঠে আসবার নেশাটা রাখবেন।" অপর এক জনকে—"তোমার কি changeএ (বায়ু পরিবর্ত্তনে) যাবার অবস্থা? তার চাইতে অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে পড়ে থাক।"

একদিন বলেছিলেন, "এক একবার স্বর্গে থেকে এসে দেখে যাব ছেলেরা সব কি করছে।"

মঠে প্রেমানন্দ-ধাম নির্ম্মিত হবার আগে স্থানাভাবে ছেলেরা যে যেখানে পারে পড়ে থাকতো দেখে বলেছিলেন, "মশায় নরমুণ্ড সব গড়গড়ি যায় দেখে প্রাণটা কেমন করে।"

আর একদিন মহারাজ ভাবমুখে বললেন, "ভার দেয় কে? ভার নেয় কে? ভার দিলে ঝড়ের এঁটো পাতা হয়ে পড়ে থাকতে হবে না?"

একদিন জনৈক ভক্তকে বললেন, "ত্রিশ থেকে চল্লিশ পর্য্যন্ত এক রকম সময়, আবার চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ এক রকম যায়। যখন খিদে ছিল, তখন ভিক্ষে জোটেনি। ঝরনার জল আজলা আজলা খেয়েছি পেট ভরাবার জন্য। তাতে খিদে আরও বেড়ে যেত। আর এখন হজম করতে পারি না, এখন চারদিক থেকে নেমন্তন্ন আসছে।"

মহারাজ এক দিন বললেন,

"শুদ্ধমনে কারু কল্যাণ কামনা করলে হবে না?"

"কাশীতে বেঁচেও সুখ মরেও সুখ।"

"মন স্থির হল তো হয়েই গেল।"

"ননীলাল, এঁরা অনেক কষ্ট করে (উৎসবের)

আয়োজন করবেন, বেলা হলে বা পরিবেশনের কিছু ত্রুটি হলে রাগ কোরো না।”

“কেউ যদি সারা জীবনের মধ্যে একবারও ভগবানকে সর্ব্বান্তঃকরণে ডাকে তো তার জীবনটা ধন্য হয়ে যায়।”

“কোন এক ভদ্রলোকের স্ত্রী তাঁর স্বামীর নিন্দা করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে বলরাম-মন্দিরে যান, মহারাজ (অন্তরে) তা জানতে পেরে তিনি কিছু বলবার আগেই তাঁর স্বামীর অশেষ প্রশংসা করে বললেন, “শিবতুল্য লোক।”

অপর এক জনকে বলেছিলেন,

“তুমি এখন কত পাও ?”

“আজ্ঞে একশ দশ টাকা।”

“কিছু বাঁচে ?”

“আজ্ঞে না।”

“দশ টাকাও ফেলে রাখতে পার না ? আমার এক দিদিমা বুড়ী ছিলেন, তিনি অল্প পয়সায় গুছিয়ে চালাতেন !”

“তোমরা ঐটে বড় ভুল কর, ঋষিদের মধ্যেও অনেকে বিবাহিত ছিলেন।”

একবার মহারাজের ঘরে প্রসঙ্গক্রমে হরিমহারাজ বললেন, “সমাধি করিয়ে দেওয়া যায় না ?” মহারাজ তখন পীড়িত। তিনি বললেন, “হুঁ, তাও করিয়ে দেওয়া যায়।”

একজন গৃহীভক্ত, ছেলে মেয়ের বাপ, এখনও তিনি জীবিত। মহারাজ তাঁর সম্বন্ধে বললেন, “বাহাদুর ছেলে বাবা, তিন তিনবার সমাধি !” একদিন মহারাজ তাঁকে ধ্যান ঘরে চাবি দিয়ে নিজের কাছে চাবি রেখে দিলেন। কয়েক ঘণ্টা পর খুলে দিলেন।

দুজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ এক আপিসে কাজ করতেন। তাঁদের মধ্যে তর্ক হয়—‘ঈশ্বর আছেন কি না।’ উভয়ে আপিসের কাজের পর বড়-বাজার থেকে নৌকাযোগে মঠে উপস্থিত হয়ে মহারাজকে জিজ্ঞেস করেন, “আপনি ঈশ্বর দর্শন করেছেন কি ?” মহারাজ উত্তর দেন, “কৈ, ঈশ্বর বলে একটা কিছু ত দেখি নি।” এতে তাঁরা বড়ই খুশি হয়ে বললেন, “উনিই যখন দেখেন নি তখন আমাদের ত কথাই নেই।”

এক দিন মহারাজ জনৈক সাধুকে বলেছিলেন, “ঠাকুর নিয়ে বেশ আছো, তা লোকে স্ত্রী নিয়েও বেশ আছে !” যখন সংসারের খাটুনিতে অবসন্ন হয়েছি তখন বলেছেন, “কেন কর্ম্মযোগ !” আবার এক সময়ে বললেন, “কাদের জন্যই বা কচ্ছ ?” কাউকে বললেন, “সাধু হয়েছিলে কি কতকগুলো বাড়ী করবার জন্যে ?”

জ্যোতিষের বই লেখার জন্য বললেন, “আরে রাম রাম ! কি অবিদ্যার আলোচনা করছে ?” জনৈক সাধুর সম্বন্ধে বলছেন, “As a Sadhu he is perfect but as a worker he is a failure (সাধু হিসেবে তিনি খুব চমৎকার, কিন্তু কর্ম্মী হিসেবে তিনি সফলতা লাভ করতে পারেন নি)।

বেলতলায় একটি ছেলে পশ্চিমমুখো হয়ে বসে ধ্যান করছিল। মহারাজ তাকে বললেন, “উত্তরমুখো হয়ে বোস্, যখন আল্লা নাম জপ করবি তখন পশ্চিমমুখো হয়ে বসবি।”

একজন ব্রহ্মচারী চন্দ্রকিরণে বসে ধ্যান করছিলেন। মহারাজ ওরূপ বসতে নিষেধ করে বললেন, “চন্দ্রকিরণ কামবর্দ্ধক।”

এক দিন মঠের ঘাটে স্নান করছি। রামবাবুর ছেলে ঋষিকে খানসামা স্নান করিয়ে দিচ্ছিল। ছেলের পায়ে ঠাকুরের কবচ ঠেকাতে সে তুললে। চাকর ও সবাই দেখলো। মহারাজ বারান্দা থেকে দেখতে পেয়ে ডেকে পাঠালেন। মহারাজ জিজ্ঞেস করলেন, “কে আজ পুজো করেছিল ?” একজন বললেন, “আমি।” মহারাজ—“তুলে রাখা হয় নি ?” “ভুলে গেছলাম।” মহারাজ গম্ভীর হয়ে গেলেন। খানিক পরে বললেন, “এ ছেলে বড়

সোজা ছেলে নয়।" এর অল্পদিন পরেই ছেলেটির দেহত্যাগ হয়। এই কবচ ঠাকুরের দারুণ গাত্রদাহ নিবারণের জন্য মহাপুরুষ মহারাজের পিতা তাঁকে ধারণ করতে দিয়েছিলেন।

একদিন বিকেলে মহারাজ ঘরের সামনের বারান্দায় চেয়ারে উপবিষ্ট, দু'ধারে সাধুভক্তরা দণ্ডায়মান। জনৈক ভক্ত এসে মহারাজকে প্রণাম করলে তিনি তাঁকে বললেন, "এঁদেরও (অন্যান্য সাধুদের) প্রণাম করুন ; নইলে এঁরা আবার মনে করবেন, ওঁকেই খালি সকলে প্রণাম করে, আমাদের কেউ করে না।"

"রাম নাম বড় শুদ্ধ নাম।"

"মানুষ কি করবে ? কি দোষ, ভগবানই ইন্দ্রিয়-গুলিকে বহির্মুখ করে দিয়েছেন, মানুষ কি করবে বলুন।"

এক দিন রামবাবুর শিষ্য হরিমোহন সিংহকে বললেন, 'মোহনদা, রামবাবুর ঋণ শোধবার নয়।'

জনৈক ভদ্রলোক তাঁর সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি মঠকে দান করতে চান। বাবুরাম মহারাজ মহারাজের নিকট একথা উত্থাপন করলে তিনি বললেন, "বাবুরাম দা, শেষটা এই হল ? ওরা আমাদের কাছে ত্যাগ স্বীকার করতে শিখলে, আর আমরা কি না গ্রহণ করা শিখলাম !"

কোন এক ভদ্রলোক বিপদে পড়ে মহারাজকে লিখলে তিনি তার উত্তরে লিখলেন, "মাঝি যেমন উত্তাল তরঙ্গে কিছুতেই নৌকাকে বিচলিত হ'তে দেয় না, আপনার অবস্থাও সেইরূপ।"

এক ব্রাহ্মণ প্রায় রবিবারেই প্রচুর তরকারি পিঠে ঝুলিয়ে নিয়ে আসতেন। একদিন মহারাজ দেখে বললেন, "এ বেশ মশাই, আমরা তপস্যা করি আর আপনারা সরবরাহ করুন, যেমন আগে ছিল।"

"কি হল, দয়াধর্ম্ম কি পৃথিবী থেকে উঠে গেল ?"

"এদেশের বিধবাদের যত্ন করা উচিত, ওঁরা ব্রহ্মচারিণী"

একদিন সন্ধ্যের পর মহারাজ পূর্ব্বদিকে নীচের বারান্দায় থামে ঠেস্ দিয়ে ছোট বেঞ্চে বসে আছেন। জনৈক ভদ্রলোক নীচের সিঁড়িতে বসে বললেন, "আমার একটু জিজ্ঞেস করবার আছে।"

উঃ—"কি, বলুন।"

প্রঃ—"আমার কাছে গুটি কতক ছেলে থাকে, তাদের কি রকম আহার দেব, মাছ মাংস ?"

উঃ—"রুই মাছের মুড়ো।"

প্রঃ—"মাংস ?"

উঃ—"সপ্তাহে এক দিন।"

প্রঃ—"পেঁয়াজ ?"

উঃ—"ঐ মাংসের সঙ্গে, আলাদা নয়।"

প্রঃ—"মহারাজকে একটা কথা বলব ?"

উঃ—"বলুন।"

প্রঃ—"আজ্ঞে, কিসে প্রাণে শান্তি হয় ?"

উঃ—"দেখুন, সত্যি কথা কইবেন, বাপ-মায়ের সেবা করবেন, more or less (অল্পবিস্তর) ভগবানকে ডাকবেন, এই। সংসারে আর কিছু নেই।"

একজন ভক্তকে, "মশাই, জানবেন, আমি মনে করলে আপনাদের ওখানকার সকল লোককে এক-দিনে ভক্ত করে দিতে পারি। জানলেন মশাই ? জানলেন ? আমার এমন ক্ষমতা আছে।" এই বলে খিল খিল করে হাসতে লাগলেন।

বাবুরাম মহারাজ এক জনের সম্বন্ধে মহারাজকে বললেন, "ভক্তলোক।" মহারাজ—"ভক্ত করে নাও।"

"উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবঃ।"

দেহত্যাগের পূর্ব্বে পীড়িত অবস্থায় মাষ্টার মহাশয়কে বলেছিলেন, "তাঁর পাদপদ্মে ভক্তিই সার, কি বলেন ?"

শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী

(১৯০৮। ১৫ই আগষ্ট—১৯০৯। ১৪ই আগষ্ট)

(চতুর্থাংশ)

উত্তরপাড়া বক্তৃতা (১৯০৯, মে)—

অরবিন্দ এক বৎসর আলিপুর জেলে বাস করিয়া ১৯০৯, ৬ই মে বাহিরে আসিলেন এবং তাঁহার ন-মেশোমশায়, কৃষ্ণকুমার মিত্রের বাড়ী—৬নং কলেজ স্কোয়ারে আসিয়া উঠিলেন। এই বাড়ীতেই দশ মাস থাকিয়া ১৯১০, ফেব্রুয়ারীর শেষে চন্দননগর প্রস্থান করিলেন। সুতরাং জেল হইতে বাহির হইয়া মাত্র দশ মাস তাঁহার কর্ম্মজীবন। ইহার পরে মার্চ্চ মাসে চন্দননগরে শ্রীমতিলাল রায়ের বাড়ীতে অজ্ঞাতবাস, এবং ১৯১০, এপ্রিল হইতে অদ্যাবধি পণ্ডিচেরীতে অবস্থান।

জেল হইতে বাহির হইয়াই ("just after acquittal") উত্তরপাড়ায় ধর্ম্মরক্ষিণী সভায় তিনি প্রথম বক্তৃতা করেন। নানা কারণে এই বক্তৃতাটি অরবিন্দের একটি প্রসিদ্ধ বক্তৃতার মধ্যে গণ্য হইয়াছে।

অরবিন্দ বলিলেন যে, যে সমস্ত কথা তিনি বলিতে চাহিয়াছিলেন, ঈশ্বর তাঁহাকে তাহা বলিতে দিলেন না। তৎপরিবর্ত্তে, ঈশ্বর তাঁহাকে যাহা বলিতে বলিলেন, তিনি এই বক্তৃতায় কেবল সেই সমস্ত কথাই বলিলেন।

"This is the word that has been put into my mouth to speak to you today, what I intended to speak has been put away from me, and beyond what is given to me I have nothing to say....Even in these few minutes a word has been suggested to me which I had no wish to speak. The thing I had in my mind He has thrown from it and what I speak is under an impulse and a compulsion."

সুতরাং আদ্যোপান্ত এই বক্তৃতাটি ঈশ্বর অরবিন্দের মুখ দিয়া বলাইয়া আমাদিগকে শুনাইলেন। এই বক্তৃতার ভালমন্দ যা-কিছু দায়িত্ব সমস্তই ঈশ্বরের—অরবিন্দের নহে। এই বক্তৃতার সমালোচনা করিতে হইলে, ঈশ্বরের প্রত্যাদেশের সমালোচনা করিতে হয়। কিন্তু তাহা এক অতি— আমাদের দেশে—বিপজ্জনক কথা। ঈশ্বরের এ রকম প্রত্যাদেশ, ধর্ম্মজগতে পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ এবং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু রাজনীতিক্ষেত্রে তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল বলেন নাই। পরবর্ত্তী যুগে, মহাত্মা গান্ধী যদি বা কিছু চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা অরবিন্দের মতো এতটা এ রকমের নহে। রাজনীতিক্ষেত্রে এ রকম ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ সম্পূর্ণ নূতন। উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারে এই রকমের "ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ" প্রয়োগ করিয়াছিলেন কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের উদীয়মান যুক্তিবাদী যুবকেরা তাহা মানে নাই। এবং "ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ" প্রয়োগ করার দরুন তাঁহারা কেশবচন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

তারপর অরবিন্দ বলিলেন, কারাবাসকালে ঈশ্বর তাঁহার হাতে গীতা আনিয়া দিলেন।

ঈশ্বরের শক্তি তাঁহার মধ্যে প্রবেশ করিল এবং তিনি গীতার সাধনা আরম্ভ করিলেন।

"Then He placed the Gita in my hands. His strength entered into me and I was able to do the *Sadhan* of the Gita."

এই গীতার সাধন তিনি এইরূপে ব্যক্ত করিলেন যে, দুঃখে উদ্বিগ্ন হইবে না, সুখে বিগতস্পৃহ হইবে, এবং কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষা করিবে না; নিজের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিবে, কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছায় কার্য্য করিয়া যাইবে। কিন্তু কোনটি ঈশ্বরের ইচ্ছা আর কোনটি যে নিজের ইচ্ছা তাহা সকলে বুঝিয়া উঠিতে পারে না। মুস্কিল সেইখানে। এবং নিজের ইচ্ছাকেই ঈশ্বরের ইচ্ছা বলিয়া ভ্রম করার আশঙ্কাও খুব বেশী থাকিয়া যায়।

এই সাধনের ফলে, তিনি কারাগারের সর্ব্বত্রই ঈশ্বরকে দেখিতে লাগিলেন। এই ঈশ্বরকে তিনি বাসুদেব, নারায়ণ এবং শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া অভিহিত করিলেন। কারাগারের উচ্চ প্রাচীরকে তিনি আর প্রাচীর দেখিলেন না—দেখিলেন, বাসুদেব। কারাগারের মধ্যে একটি বৃক্ষ ছিল, কিন্তু তাহাকে তিনি আর বৃক্ষ দেখিলেন না—দেখিলেন, বাসুদেব দাঁড়াইয়া আছেন। যে সকল প্রহরীরা পাহারা দিতেছিল, তাহাদিগকেও তিনি দেখিলেন যে, বাসুদেব বা নারায়ণ পাহারা দিতেছেন!

"I looked at the jail that secluded me from men and it was no longer by its high walls that I was imprisoned; no, it was Vasudeva who surrounded me. I walked under the branches of the tree in front of my cell but it was not the tree. I knew it was Vasudeva, it was Srikrishna whom I saw standing there and holding over me His shade. I looked at the bars of my cell, the very grating that did duty for a door and again I saw Vasudeva. It was Narayana who was guarding and standing sentry over me."

অরবিন্দ কিছু মিথ্যা কথা বলেন নাই। তিনি সত্যই যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহাই বলিয়াছেন। প্রত্যক্ষবাদী বলিবেন, ইহা অরবিন্দের দৃষ্টিভ্রম। কেন না, যে বস্তু যাহা নয়, তিনি সেই বস্তুতে তাহা দেখিয়াছেন। কারাগারের প্রাচীর, বৃক্ষ বা প্রহরী, কেহই বাসুদেব বা নারায়ণ বা শ্রীকৃষ্ণ নহেন। কিন্তু বিজ্ঞানবাদী (subjective idealist) বলিবেন যে, অরবিন্দ সাধনার এমন একটি উচ্চস্তরে উঠিয়াছেন যে সর্ব্বভূতে তাঁহার ঈশ্বর দর্শন হইতেছে। তাঁহার দৃষ্টিভ্রম হয় নাই, পরন্তু তিনি দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের যুগে চৈতন্যচরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়া গিয়াছেন—"যাহা যাহা নেত্র পড়ে তাহা তাহা কৃষ্ণ স্ফুরে।" যাহা চৈতন্যের যুগে সম্ভব হইয়াছিল, অরবিন্দ স্বদেশী-যুগে তাহাই সম্ভব করিলেন।

অরবিন্দ সংশয়বাদী ও ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসহীন ছিলেন। কিন্তু ঈশ্বর কারাগারে তাঁহাকে দেখা দিয়া এবং তাঁহার সহিত কথা বলিয়া তাঁহার সমস্ত সংশয় দূর করিয়া দিলেন।

"The agnostic was in me, the atheist was in me, sceptic was in me and I was not absolutely sure that there was a God at all."

তারপর, ঈশ্বর অরবিন্দকে বলিলেন,—

"This is the *Sanatana Dharma,* this is the eternal religion which you did not really know before, but which I have now revealed to you. The agnostic and the sceptic in you have been answered, for I have given you proofs within and without you, physical and subjective, which have satisfied you."

জেলের ভিতর ঈশ্বরের সহিত এইরূপ

মুখোমুখী দেখাসাক্ষাৎ ও কথাবার্ত্তা বলা, এক পরম আশ্চর্য্যের বিষয়। এক্ষেত্রে অরবিন্দ, বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী সকলকেই গুম্ভিত করিয়া দিয়াছেন। Indian Social Reformer বাচালতার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া অরবিন্দকে এজন্য ঠাট্টা-বিদ্রূপও কম করেন নাই। অবশ্য, অরবিন্দও তাহার উত্তর দিয়াছেন।

অরবিন্দ বৈদান্তিক হইলেও মায়াবাদী নহেন, লীলাবাদী—যদিও গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে তিনি, বিপিন পালের মাদ্রাজ বক্তৃতা অনুসরণ করিয়া অনেকবার বৈদান্তিক মায়াবাদ প্রয়োগ করিয়াছেন। অরবিন্দ এই বক্তৃতায় আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন যে তিনি বাল্যাবধি বিলাতী আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ হওয়ায় হিন্দুধর্ম্মের তত্ত্ব আগে বুঝিতেও পারেন নাই এবং বিশ্বাসও করেন নাই। কিন্তু জেলের গুহার মধ্যে অবস্থান কালে ঈশ্বর আসিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

"He showed me His wonders and made me realise the utter truth of the Hindu religion. I had had many doubts before. I was brought up in England amongst foreign ideas and an atmosphere entirely foreign."

এক বৎসর কারাবাস কালে অরবিন্দের জীবনে কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন, কি অভাবনীয় কাণ্ডই না ঘটিয়াছে! অরবিন্দের কোনও চরিত-লেখকই ইহা বিশদরূপে ও সবিস্তারে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারেন না।

এই বক্তৃতায় রাজনীতির প্রসঙ্গও কিছু আছে। অরবিন্দ জেলে যাইবার পূর্ব্বে যে উৎসাহ ও উদ্যম দেখাইয়া গিয়াছিলেন তাহা সন্ত্রাসবাদ ও গভর্ণমেণ্টের দমননীতির ফলে মুমূর্ষু অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। অরবিন্দ যাঁহাদের সঙ্গে কাজ করিতেন তাঁহারা কেহই দেশে নাই। তিলক মান্দালয় দুর্গে আবদ্ধ, বিপিনপাল বিলাতে, অপর নয়জন নেতা নির্ব্বাসনে;—তিনি সম্পূর্ণ একা। এ অবস্থায় তাঁহার মনের ভাব তিনি নিজেই প্রকাশ করিতেছেন।

"Others whom I was accustomed to find working beside me are absent. The storm that swept over the country has scattered them far and wide. It is I this time who have spent one year in seclusion, and now that I come out I find all changed......I looked around for those to whom I had been accustomed to look for counsel and inspiration. I did not find them...When I went to jail, the whole country was alive with the cry of Bande Mataram,...When I came out of jail, I hastened for that cry, but there was instead a silence. A hush had fallen on the country and men seemed bewildered......I too did not know which way to move, I too did not know what was next to be done."

অরবিন্দ আরও অত্যাচার চাহিয়াছিলেন (Wanted more Repression, 1907/19th July)। এখন সেই অত্যাচারের নগ্ন রূপ তিনি দেখিতে পাইলেন। কিন্তু তিনি যেরকম ঈশ্বর ভক্ত হইয়াছেন, তাহাতে তিনি ইহার মধ্যেও ঈশ্বরের হস্ত নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবেন।

"...It was the Almighty power of God which had raised that cry, that hope, so it was the same power which had sent down that silence. He who was in the shouting and movement was also in the pause and the hush."

ঈশ্বর ভক্তেরা কিছুতেই দমিবার পাত্র নহেন। প্রত্যক্ষ অমঙ্গলের মধ্যেও তাঁহারা ভবিষ্যৎ মঙ্গল কল্পনা করেন।

তারপর, তিনি তাঁহার অনুচর যুবকদের প্রশংসা করিলেন। এবং ঈশ্বর অরবিন্দকে বলিলেন যে, এই সব বন্দী যুবকরাই দেশের

উদ্ধার সাধন করিবেন, এবং "ইহারা তোমার অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ"।

"Then I found myself among these young men and in many of them I discovered a mighty courage, a power of self-effacement in comparison with which I was nothing. I saw one or two who were not only superior to me in force and character,—very many were that,—but in the promise of that intellectual ability on which I prided myself. He said to me, 'This is the young generation, the new and mighty nation that is arising at my command. They are greater than yourself'."

সন্ত্রাসবাদী যুবকেরাও ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ এবং আদেশ দুই-ই পাইলেন। অরবিন্দ সন্ত্রাসবাদী যুবকদের সম্বন্ধে সর্ব্বদাই প্রশংসাসূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। যিনি সন্ত্রাসবাদের প্রবর্ত্তক, তাঁহার পক্ষে ইহা খুব স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়।

এইবার এই বক্তৃতার সব চেয়ে যাহা গুরুতর কথা, তাহাই বলিতেছি। জেলের ভিতর ঈশ্বর অরবিন্দের নিকট আসিয়া, হিন্দুধর্ম্ম যে সনাতন ধর্ম্ম তাহা বুঝাইয়া দিলেন এবং জগতে এই সনাতন ধর্ম্ম প্রচার করিবার আদেশ দিলেন। এবং এই সনাতন ধর্ম্ম প্রচারের জন্যই ভারতবর্ষের উত্থান, অর্থাৎ স্বাধীনতা প্রয়োজন। কথাটা দাঁড়াইল এইরূপ যে, জগতে সনাতন অর্থাৎ হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করাই হইল আসল উদ্দেশ্য, রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ তাহার একটা উপায় মাত্র। সুতরাং এই আন্দোলন মুখ্যভাবে ধর্ম্মের আন্দোলন এবং গৌণভাবে রাজনৈতিক আন্দোলন।

"When you go forth, speak to your nation always this word that it is for the *Sanatana Dharma* that they arise, it is for the world and not for themselves that they arise."

অরবিন্দ এই বক্তৃতায় তাঁহার বোম্বাই বক্তৃতার (১৯০৮, ১৯শে জানুয়ারী) কথা উল্লেখ করিয়াছেন। উল্লেখ করার প্রয়োজন হইয়াছিল, কেন না, বোম্বাই-এর বক্তৃতায় যাহা বলিয়াছিলেন, উত্তরপাড়া বক্তৃতায় তাহার বিপরীত কথা বলিলেন। বোম্বাই বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছিলেন যে জাতীয়তাবাদ (nationalism) আমাদের ধর্ম্ম (religion), বাঙ্গলা দেশ ধর্ম্ম হিসাবেই জাতীয়তাবাদকে গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু উত্তরপাড়া বক্তৃতায় বলিলেন যে, সনাতন ধর্ম্মই আমাদের জাতীয়তাবাদ। বোম্বাই বক্তৃতায় জোর দেওয়া হইল জাতীয়তাবাদের উপর, আর উত্তরপাড়া বক্তৃতায় জোর দেওয়া হইল সনাতন ধর্ম্মের উপর। এই পার্থক্য তিনি নিজেও স্বীকার করিয়াছেন।

"I spoke once before with this force in me and I said then that this movement is not a political movement and that nationalism is not politics but a religion, a creed, a faith. I say it again today, but I put it in another way. *I say no longer that nationalism is a creed, a religion, a faith*; I say that it is the *Sanatana Dharma* which for us is nationalism."

মিঃ সি আর দাস অরবিন্দের পক্ষ সমর্থন করিতে গিয়া অরবিন্দের স্ত্রীর নিকট লিখিত এক পত্রের (১৯০৫, ৩০শে আগষ্ট) এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন যে, অরবিন্দ স্বদেশী আন্দোলন ছাড়াও জগতে বেদান্তধর্ম্ম প্রচারের জন্য আর একটি আন্দোলন সুরু করিবেন। অবশ্য মিঃ নর্টন এই আর একটি আন্দোলনের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন—সন্ত্রাসবাদের আন্দোলন। মিঃ নর্টনের ব্যাখ্যাই অধিকতর ইতিহাসসম্মত বলিয়া মনে হয়। অরবিন্দ তাঁহার স্ত্রীকে বাঙ্গলায় যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার ইংরাজী অনুবাদ এইরূপ :—
"I have had to spend a lot of

money on account of the *Swadeshi* movement. I have another movement in view which requires unlimited money."

মিঃ সি আর দাস বলিলেন,—

"I submit, this movement is not the movement of bomb. Aurobindo's idea was to start an extensive movement of *Vedantism*. He desired to spread it not only all over India, but all over the world....You must not forget that it is not a matter of conjecture that *Vedantism* may be carried outside India. It has already been carried into America and also into England, though not to the same extent into the latter."

এখানে মিঃ সি আর দাস স্পষ্টই স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকা ও ইংলণ্ডে হিন্দুধর্ম্ম প্রচারের কথাই উল্লেখ করিলেন। এবং অরবিন্দ তাঁহার "another movement" এ স্বামী বিবেকানন্দের অনুগামী হইয়া জগতে বেদান্তধর্ম্ম প্রচার করিবেন, এই কথাই খোলসা বলিলেন। অরবিন্দ মিঃ সি আর দাশের বক্তৃতা মন দিয়াই শুনিয়াছিলেন। এবং ইহা তাঁহার উত্তরপাড়া বক্তৃতা দিবার সময় বিস্মরণ হইবার কথাও নয়। সুতরাং জগতে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম প্রচারের জন্য ভারতবর্ষের উত্থান প্রয়োজন, এই ধর্ম্ম ও রাজনীতির সংমিশ্রণমূলক বক্তৃতা স্পষ্টই স্বামী বিবেকানন্দের অনুগামী। জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক, অরবিন্দ এক্ষেত্রে মুখ্যভাবে স্বামী বিবেকানন্দ এবং গৌণভাবে মিঃ সি আর দাশকে অনুসরণ করিয়াছেন।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে বিপিন পাল সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের তরফ হইতে বেদান্তধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়াছিলেন। তখন সেখানে এক মার্কিণ বন্ধু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, তোমরা পরাধীন জাতি, তোমাদের কথা কেহ শুনিবে না। আগে তোমাদের দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া আমাদের মত স্বাধীন হইয়া আইস, তখন তোমাদের কথা শুনিব। মার্কিণ বন্ধুর এই কথায় লজ্জা পাইয়া বিপিনচন্দ্র দেশে ফিরিয়া আসিয়া "নিউ ইণ্ডিয়া" পত্রিকা প্রকাশ করিয়া চরমপন্থী রাজনীতি চর্চ্চা আরম্ভ করেন।

এখন প্রশ্ন, অরবিন্দের সনাতন ধর্ম্ম প্রচারের জন্য দেশের স্বাধীনতা আগে প্রয়োজন কি না? যদি তা না হয়, তবে দেশকে পরাধীন রাখিয়াই কি অরবিন্দ জগতে সনাতন ধর্ম্ম প্রচারের জন্য বহির্গত হইবেন? হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

"অরবিন্দ অবতার বনবার জন্য অস্থির হয়ে পড়লেন। ...ধর্ম্মকে উপায়-স্বরূপ ধ'রে নিয়ে বিপ্লব প্রচারের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সুরু করলেন।...পলিটিক্সের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার মিলন করতে গিয়ে করলেন ধোঁয়ার সৃষ্টি।" [বাঙ্গলায় বিপ্লবপ্রচেষ্টা, পৃঃ ২০১]

মিঃ সি আর দাশ অরবিন্দকে "prophet of nationalism" বলিয়া আলিপুর বোমার মামলায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। অরবিন্দ বঙ্কিম-অনুপ্রাণিত হইয়া nationalismকে ধর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। পরে, এখন সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মকেই nationalism বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। তিনি prophet বা messiah-র ভূমিকাই গ্রহণ করিয়া উত্তরপাড়া বক্তৃতাটি দিলেন।

অরবিন্দ রাজনীতি হইতে সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইলেন। এই পরিবর্ত্তন অরবিন্দের জীবনে এক অতি গুরুতর পরিবর্ত্তন। ভবিষ্যৎ পণ্ডিচেরী জীবনের বীজ এই উত্তরপাড়া বক্তৃতার মধ্যে অঙ্কুরোদ্গম করিয়াছে। অরবিন্দ যখন সন্ত্রাসবাদ লইয়া প্রথম প্রবেশ করেন, তখন দেখিয়াছি বগলামুখীর পূজা—ভবানী মন্দির—মা কালী। নিজেকে তিনি "কালী" বলিয়াই স্বাক্ষর করিতেন। এই বক্তৃতায় দেখিতেছি, গীতা হস্তে শ্রীকৃষ্ণ—বাসুদেব বা নারায়ণ।

"কর্ম্মযোগিন্"-এর প্রচ্ছদপটেও দেখিতে পাইব, কুরুক্ষেত্রে অশ্বরজ্জু হস্তে রথারূঢ় শ্রীকৃষ্ণ।

১৯০৯, জুনমাস—জুন মাসে অরবিন্দকে খুব কর্ম্মে ব্যস্ত দেখিতে পাই। তিলক ও বিপিনচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে তিনিই এখন একাই ভারতবর্ষে মডারেট বিরোধী,—নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ-বাদী চরমপন্থী দলের নেতৃত্ব করিতে আরম্ভ করিলেন। মিঃ সি আর দাশ, বারীন্দ্র প্রভৃতির ফাঁসির হুকুম রদ করিবার জন্য হাইকোর্টে আপীল করিয়া ঝুলাঝুলি করিতেছেন, কিন্তু সেদিকে সময় ক্ষেপণ না করিয়া রাজনীতি ক্ষেত্রে অরবিন্দ ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। ১৩ই জুন তিনি বীডন্ স্কোয়ারে বক্তৃতা দিলেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সভাপতি হইয়াছিলেন। পাঁচ দিন পর, ১৯শে জুন, "কর্ম্মযোগিন্" পত্রিকা প্রকাশ করিলেন। তিন দিন পর, ২৩শে জুন, ঝালকাটিতে (বরিশাল) বক্তৃতা দিলেন। এইরূপে জুন মাস শেষ হইয়া গেল।

বীডন্ স্কোয়ারে বক্তৃতা—এই বক্তৃতায় প্রথমেই তিনি গভর্ণমেণ্টের দমন-নীতির কথা বলিলেন। নয় জন নেতার নির্ব্বাসনের কথা উল্লেখ করিলেন। দমন-নীতিসম্পর্কে তিনি, তাঁহার আগের মতই বহাল রাখিয়া বক্তৃতা দিলেন। তিনি বলিলেন, আন্দোলন যখনই নিব' নিব' হইয়া আসে তখনই একটা রাজ-অত্যাচার আসিয়া ইহাকে দ্বিগুণ তেজে প্রজ্জ্বালিত করিয়া দেয়! সুতরাং আমাদের পক্ষে ইহা মন্দ নয়, ভাল।

"He had always found that when Swadeshi was flagging or the Boycott beginning to relax, it only needed an act of repression on the part of the authorities to give it vigour."

তারপরে বলিলেন, অন্য জাতিরা স্বাধীনতা লাভের জন্য যে মূল্য দিয়াছে ইহা তাহার তুলনায় কিছুই নহে।

"This was nothing compared with the price other nations had paid for their liberty."

অবশ্য, এখনকার মত তখন নিরস্ত্র, অহিংস ছাত্র-শোভাযাত্রীদের উপর পুলিশের বেপরোয়া গুলি চালাইয়া হত এবং বহু আহত করা আরম্ভ হয় নাই।

তারপরে বলিলেন, অতীতে আমরা দেশের প্রতি কর্ত্তব্য করি নাই; এখন তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ এই অত্যাচার বুক পাতিয়া নিতে হইবে।

"That was the price it had to pay for its previous lapses from national duty."

তারপর মর্লির শাসন-সংস্কারের কথা তুলিয়া বলিলেন যে, ইহা অত্যন্ত ভুয়া, মেকী এবং ফাঁকি। ইহা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ক্ষমতাকে খর্ব্ব করিবে, এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে কলহের সৃষ্টি করিবে।

"The so-called Introduction of the elective principle was a shame and the power given was nothing...It would deminish the political power of the educated class which was the brain and backbone of the nation, it would sow discord among the various communities. This was not a real reform, but reaction."

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্য অরবিন্দ এখন কিছু দরদ দেখাইলেন বটে, কিন্তু ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে "ইন্দু-প্রকাশ"এ প্রবন্ধ লিখিবার সময় শিক্ষিত সম্প্রদায়কে বিলক্ষণ উপেক্ষা করিয়া "প্রলেটরিয়ট" দের (Proletariate) উত্থানের জন্য খুব জোর লিখিয়াছিলেন। তখন যে "বুর্জয়েস" (bourgeois)-নীতি তাঁহার লেখনী হইতে অজস্র শরবর্ষণ সহ্য করিয়াছে, এখন ঘটনাচক্রে তিনিই সেই বুর্জয়েস-সম্প্রদায়ের —অবশ্য চরমপন্থী দলের—একমাত্র কর্ণধার।

তারপর তিনি বলিলেন যে, তিনি চৌদ্দ বৎসর

বিলাতে ছিলেন। ইংরেজ জাতি এবং তাহাদের রাজনীতি তিনি ভাল রূপেই জানেন। তাহারা মাত্র সেইটুকু ক্ষমতাই আমাদিগকে দিবেন যাহা না দিয়া উপায় নাই। অতিরিক্ত কিছুই দিবেন না।

"He had been in England for fourteen years and knew something of the English people and their politics......They would only give just as much as they could not help giving."

এই বক্তৃতাটি উত্তরপাড়া বক্তৃতার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে পৃথক। ইহা যুক্তিপূর্ণ ও সুসংবদ্ধ। অরবিন্দের নেতৃত্বের ক্ষমতার পরিচয় আমরা পাইতেছি।

"কর্ম্মযোগিন্" পত্রিকা প্রকাশ (১৯০৯, ১৯শে জুন)—অরবিন্দ জেল হইতে বাহির হওয়ার পর, পুনরায় "বন্দেমাতরম্" পত্রিকা প্রকাশ করার প্রস্তাব তাঁহার নিকট করা হইল। তিনি রাজী হইলেন না। তার পরিবর্ত্তে তিনি "কর্ম্মযোগিন্" প্রকাশ করিলেন। "বন্দেমাতরম্" হইতে "কর্ম্মযোগিন্"-এর আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গী যতটা পৃথক, ঠিক ততটাই পরিবর্ত্তন তাঁহার জীবনে আসিয়া গিয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও স্বামী বিবেকানন্দ—"কর্ম্মযোগিন্"-এর প্রথম সংখ্যাতেই অরবিন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের কথা দিয়া আরম্ভ করিলেন। গ্রেপ্তার হইবার সময়, তাঁহার ঘরে দক্ষিণেশ্বরের মাটি ছিল। এ মাটি লইয়া পুলিশ এবং রসায়নবিদ্‌গণ কত কাণ্ডই না করিলেন! গ্রেপ্তারের পূর্ব্বেই তিনি দক্ষিণেশ্বরের মাটির প্রভাবে আসিয়া পড়িয়াছিলেন। দীর্ঘ কারাবাসের পর, জেল হইতে বাহির হইয়া "কর্ম্মযোগিন্"-এর প্রথম প্রবন্ধেই আবার শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের কথাই তুলিলেন। অরবিন্দের উপর সন্ত্রাসবাদের প্রবর্ত্তন কালে আমরা দেখিয়াছি বঙ্কিমের প্রভাব। "কর্ম্মযোগিন্"-এর সূচনাতেই দেখিতেছি, শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের প্রভাব। পরিবর্ত্তনমুখে হয়তো এই প্রভাব হইতেও তিনি কালে কিছুটা মুক্ত হইবেন। কিন্তু সে পরের ইতিহাস। এখন আলোচনার সময় নয়।

অরবিন্দ লিখিলেন যে, শঙ্করাচার্য্য অপেক্ষা শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ পূর্ণতর সমন্বয় দিয়া গিয়াছেন। উপনিষদ্‌ই আমাদের প্রামাণ্য। শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদী ভাষ্য, অনেক ভাষ্যের মধ্যে একটি।

"Ramakrishna and Vivekananda gave more perfect synthesis than Sankaracharya. Not Sankar, but Upanishad is the authority. Sankar's *mayabad* is only one of the many interpretations."—[Karmayogin, June 19th]

অরবিন্দ মায়াবাদী শঙ্কর হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দকে পৃথক করিয়া দেখিলেন। শুধু তাই নয়, শঙ্করাচার্য্য অপেক্ষা এতদুভয়ের সমন্বয়কে উচ্চস্থান দিলেন। এ বিষয়ে আমি আমার অন্য এক গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।* শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে রাজা রামমোহন এবং শেষভাগে স্বামী বিবেকানন্দ, উভয়েই শঙ্করানুগামী মায়াবাদী ছিলেন। এবং পরমহংসদেব তোতাপুরী-নির্দ্দিষ্ট নির্বিকল্প সমাধিতে ক্ষমতাপন্ন ও বিশ্বাসী ছিলেন। তবে আচার্য্য শঙ্কর যেমন অন্যান্য বাদগুলিকে প্রখর যুক্তির শাণিত কুঠারে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া দিয়াছেন, এবং অস্বীকার করিয়াছেন,—শ্রীরামকৃষ্ণ বা বিবেকানন্দ মায়াবাদ ও পূর্ণ অদ্বৈতবাদ সাধনের চরম পরিণতি স্বীকার করিয়াও অন্যান্য বাদগুলিকে, মায় মূর্ত্তিপূজা, পরিহার করেন নাই। তফাৎ

* "স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙ্গলায় উনবিংশ শতাব্দী" —পৃঃ ৩৭-৫০।

এইখানে। অরবিন্দ পরমহংসদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের সমন্বয়কে দার্শনিক মতবাদের দিক হইতেই দেখিয়াছেন। পণ্ডিত মোক্ষমুলারের মত পরমহংসদেবের সমন্বয়কে সাধনপথে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের দিক হইতে সম্ভবতঃ দেখেন নাই।

বিপিনচন্দ্রের প্রতি অরবিন্দ—বিপিনচন্দ্র ইংলণ্ডে থাকিয়া যে সকল কার্য্য করিতেছেন, অরবিন্দ তাহা পছন্দ করিতেছেন না। "কর্ম্মযোগিন্"-এর প্রথম সংখ্যাতেই অরবিন্দ লিখিলেন,—

"For Bepin Babu's mission there would not be a worse place than England, a worse audience than the British people. Self-helf and passive resistance are not the things to preach before the English people in England....The first three or four issues of *'Swaraj'* were disappointing. In this month's issue Bepin Babu seems to have recovered the copious vein of thought, the subtle and flexible reasoning, the just and original view of his subject, which made one wait with impatience for every fresh number of *'New India'*. His attitude towards pro-Mahomedan policy in the Reform Scheme has consistently been adopted by the Nationalist party in Bengal."—[*Ibid*]

"স্বরাজ"-এর বহু প্রবন্ধ "কর্ম্মযোগিন্-এ পুনর্মুদ্রিত হইতেছে। সাত সমুদ্র তের নদীর পার হইতে বিপিনচন্দ্রের সহিত অরবিন্দের একটা যোগাযোগ রক্ষিত হইতেছে। মিঃ তিলক মান্দালয় দুর্গে আবদ্ধ, তাঁহার সহিত যোগাযোগের কোনই উপায় নাই। তিলক গীতারহস্য লিখিতেছেন।

"কর্ম্মযোগিন্"-এ লেখা হইল—ইউরোপ অপেক্ষা এসিয়ার জাতিসকলের জীবনীশক্তি বেশী। ইহা স্বামী বিবেকানন্দের কথার প্রতিধ্বনি। তিনটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল: (১) রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্ঘের অন্দোলন, (২) বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী স্বদেশী আন্দোলন, (৩) অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর-প্রবর্ত্তিত ভারতীয় চিত্রকলার আন্দোলন। সম্ভবতঃ তৃতীয় দৃষ্টান্তে ভগিনী নিবেদিতার প্রভাব বিদ্যমান রহিয়াছে।

২০শে জুন নাসিকের উকীল মিঃ প্রধান বোম্বাই-এ এক বক্তৃতা দিয়া বলিলেন যে, ভারতবাসীর সম্মুখে দুইটি আদর্শ রাজনীতি-ক্ষেত্রে দেখা দিয়াছে। একটি, ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন—ইহার নেতা মিঃ গোখলে; আর একটি, পূর্ণ স্বাধীনতা—ইহার প্রবর্ত্তক শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল।

অরবিন্দের যোগ—অরবিন্দ এই সংখ্যাতেই লিখিলেন যে, যোগের গূঢ় তত্ত্ব মানবজাতির নিকট এখন প্রকাশিত হওয়া উচিত। তাহা না হইলে মনুষ্যজাতি ক্রমোন্নতির পথে ইহার পরের উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে পারিবে না।

"Yoga must be revealed to mankind, because without it mankind cannot take the next step in the human evolution."

পণ্ডিচেরী আশ্রমে বসিয়া যোগপথে অরবিন্দ যে দিব্যমানব সৃষ্টি করিবার পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহার বীজও "কর্ম্মযোগিন্"-এর প্রথম সংখ্যাতেই অঙ্কুরোদ্গম করিয়াছে।

সারদামণি ঃ দক্ষিণেশ্বরে মিলনপূর্ণিমা

কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়, এম্-এ

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস। এবার এসে দক্ষিণেশ্বরে সারদামণির দীর্ঘ দিন কাটে। মাঝে কয়েকবার কয়েক দিনের জন্ম তিনি জয়রামবাটী ও কামারপুকুরে গেছলেন। স্বামীর সান্নিধ্যে এই দিনগুলো যেন তাঁর জীবনে মিলনপূর্ণিমাস্বরূপ। নহবতের ঘরখানি ছোট্ট, ঢোকবার দরজা এত নীচু যে ভাল করে মাথা হেঁট না করলে তা দিয়ে ঢোকা যেত না। সেই ঘরখানিই সারদামণির সারা সংসার। সেখানেই শোওয়া, রান্না, ভাঁড়ার রাখা, অতিথিদের বসিয়ে গল্প করা। এর জন্ম তাঁর মনে কিছুমাত্র বিরক্তি ছিল না। তাঁর অনাসক্ত মনে তাঁর চারিদিকে ঐশ্বর্য স্বষ্টি করার অপরূপ শক্তি-ছিল। তাই পার্থিব ঐশ্বর্যের ভারে তাঁর সংসারযাত্রা বাইরের আড়ম্বরে পূর্ণ হয় নি বলে মনে কোন দিন কষ্ট অনুভব করেন নি। অথচ সেই সংসারের মধ্যে বিরাগীর বিশৃঙ্খলাও কোথাও দেখা যেত না। বরং দৈনন্দিন জীবনে নির্লিপ্ত শৃঙ্খলাই ছিল সারদামণির একটি বড় বৈশিষ্ট্য। তাঁদের স্বামীস্ত্রীর এই সময়কার জীবনের কথা কাব্যের মত মধুর। যদি কোন সমসাময়িক চিত্রকর সে সময়ের প্রতি-দিনের ঘটনাগুলি নিজের চোখে দেখে তুলির স্পর্শে এঁকে রেখে যেতেন, তাহলে আজ সেগুলি রঙিন রেখার একখানি অমর কাব্যরূপে গণ্য হত। সংসারের সব চাওয়াপাওয়া যাঁরা জীবন থেকে নিঃশেষে বর্জন করেছিলেন, শূন্য পুঁজি দিয়ে তাঁরাই গড়ে তুলেছিলেন একখানি নিখুঁত, নিরুপম সংসার। দূর থেকে মনে হয়, শূন্যের সমষ্টি দিয়ে একি অপূর্ব গণিতের স্বষ্টি! পৃথিবীতে কিছুই তাঁরা নিজেদের বলে রাখেন নি বলেই হয়ত পৃথিবী গিয়ে তাঁদের ঘরে বাসা বেঁধেছিল।

সারদামণি আপনাকে কঠিন কাজের মালায় বেঁধে রেখেছিলেন। প্রতিদিন ভোর তিনটের সময় মন্দিরের অপর কোন কর্মচারী ওঠবার আগে তিনি উঠতেন। তারপর গঙ্গাস্নান সেরে জপধ্যান করতেন। বড়মন্দিরে সারাদিন নানা মানুষের যাতায়াত। কত কর্মচারী; গাঁয়ের মেয়ে সারদামণি কারুর সামনে বার হতেন না। সারা দিন আপন ছোট ঘরখানির মধ্যে বসে বসে কাজ করতেন। কাজের তাঁর শেষ ছিল না। প্রায়ই স্বামীর শরীর ভাল থাকত না। খাবার সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান না হলে তাঁর আমাসা হত। তাই তাঁর জন্ম বিশেষ সাবধানে আলাদা রান্না করতে হত। শ্রীরামকৃষ্ণের নাম তখন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রতিদিন তাঁর কাছে নানা লোক আসতে শুরু করেছিল। রোজই কয়েক জন ভক্ত ও অতিথির খাবার আয়োজন করতে হত। স্বামীর জন্মদিনে ত অন্ততঃ পঞ্চাশ জনের রান্না হত। ভক্তদের রান্নার মধ্যে আবার নানা খুঁটিনাটি ছিল। নরেন কড়াই শুঁটির তরকারি খেতে ভালবাসতেন, রামচন্দ্র চাইতেন চাপাটি, রাখালের মনোমত ছিল খিচুড়ী। সারদামণি সকলের রুচি লক্ষ্য করতেন, ভক্তেরা এলে একান্ত আনন্দে পরস্পরের রুচিমত রান্না করে দিতেন। কাজে তিনি খুব পটু ছিলেন, কাজ করতে তাঁর দেরি হত না। এটা নেই, ওটা নেই বলে কেউ তাঁকে কোন দিন অভিযোগ করতেও শোনে নি। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই তিনি খুব

গোছালো মানুষ ছিলেন। সংসারের ধোয়ামাজার কাজও কিছু কিছু তাঁকে করতে হত। রাত হলে অন্ধকারে তিনি গঙ্গার ঘাটে যেতেন। একবার এমনি অন্ধকারে ঘাটে নামছেন—হাতে কোনও আলো নেই। এমন সময় সিঁড়ির উপর কি একটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পায়ে লাগল। তিনি চমকে উঠলেন। ততক্ষণে জানোয়ারটা দৌড়ে লাফিয়ে পড়ল জলে। তিনি দেখতে পেলেন একটা বড় কুমীর, অন্ধকারে ঘাটের উপর উঠে শুয়েছিল।

এত কাজের মধ্যেও তাঁর সমগ্র মন পড়ে থাকত স্বামীর সেবায়। খাওয়ানাওয়া সম্বন্ধে স্বামী ছিলেন নিতান্ত ছেলেমানুষের মতন। কখন থালার ভাত দেখে শিউরে উঠে বলতেন, এত ভাত খাব না। কখন বাটিতে দুধ দেখে অসুখের ভয়ে খেতে চাইতেন না। মায়ের মত স্নেহে সারদামণি খুব চেপে চেপে ভাত বেড়ে দিতেন যাতে থালায় খুব কম দেখায়। দুধ ঘন করে জ্বাল দিয়ে ক্ষীরের মত করে দিতেন যাতে তিনি বেশি বলে ফেলে না রাখেন। কবে শরীর কেমন থাকে সেই বুঝে দরকার মত তরিতরকারি রান্না করে দিতেন। এ বিষয়ে তাঁর এতই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল যে তিনি দক্ষিণেশ্বর থেকে চলে গেলে শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ অসুবিধা হত, প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়তেন।

স্ত্রীর সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণেরও আদরযত্নের সীমা ছিল না। স্ত্রীর স্বাস্থ্যের সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ লক্ষ্য ছিল। সারা দিন একলা একলা বন্ধ ঘরে স্ত্রীকে কাটাতে হয়। তিনি বলতেন, বুনো পাখি খাঁচায় রাতদিন থাকলে বেতে যায়। মাঝে মাঝে পাড়ায় বেড়াতে যাবে। দুপুরে মন্দিরের সকলে খাওয়ার পর যখন বিশ্রাম করত সেই সময় কোন কোন দিন তিনি নিজেই স্ত্রীকে সঙ্গে করে মন্দিরের ফটক পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসতেন। জানাশোনা বাড়িতে গিয়ে সারদামণি গল্প করে দেখাশোনা করে ফিরে আসতেন।

স্ত্রীর জীবন যাতে সব দিক থেকে সুন্দর হয়ে ওঠে সেদিকে তাঁর বিশেষ নজর ছিল। তিনি বলতেন, কর্ম করতে হয়, মেয়েলোকের বসে থাকতে নেই, বসে থাকলে নানা রকম বাজে চিন্তা—কুচিন্তা সব আসে। একদিন দুপুরে সারদামণি চুপ করে বসে আছেন দেখে তিনি কতকগুলি পাট এনে বললেন, এগুলো দিয়ে আমাকে শিকে পাকিয়ে দাও, আমি সন্দেশ রাখব ছেলেদের জন্যে।

আর একদিন তিনি শ্রীযুক্ত বেণী পালের বাগানে যান। কথা ছিল, সেখানে রাতে থাকবেন। কিন্তু কোন কারণে তাঁর সেখানে রাত কাটাতে ইচ্ছে হল না। দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এলেন। তখন প্রায় একটা। সারদামণি ঘুমুচ্ছিলেন, মন্দিরের ফটকে গাড়ির শব্দে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। বুঝতে পারলেন, স্বামী ফিরে এসেছেন। স্বামীর সুখস্বাচ্ছন্দ্যের চিন্তায় ভরপুর ছিল তাঁর মন। প্রথমেই ভাবলেন স্বামীর খাওয়ার কথা। "ভাবলুম, ওমা, কি হবে, যদি না খেয়ে এসে থাকেন! কি খেতে দেব এই রাত্তিরে? অন্য দিন কিছু না কিছু ঘরে রাখতুম, এই সুজি হোক, যাই হোক। কেন না কখন খেতে চেয়ে বসবেন ঠিক ত ছিল না তা। সেদিন রাত্তিরে ফিরবেন না জেনে কিছুই রাখিনি।" মন্দিরের সকলেই তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। কোথাও থেকে খাবার আনা সম্ভব নয়। সারদামণি বিছানা ছেড়ে উঠে ব্যাকুল হয়ে ঝিকে ডেকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করলেন, ও যদুর মা, কি হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ ততক্ষণে এসে হাজির হয়েছেন নিজের ঘরে। পাশের বাড়িতে নহবতের ঘরে স্ত্রীর ভাবনার কথা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। ঝি কিছু বলবার আগেই তাঁর ঘর থেকে চেঁচিয়ে

বলে দিলেন, তোমরা ভেব না গো, আমরা খেয়ে এসেছি। এমনি আর একটি ঘটনায় স্ত্রীর সম্বন্ধে খুঁটিনাটি বিষয়ে স্বামীর কিরূপ নজর ছিল তা বোঝা যায়। স্বামী-স্ত্রী দুজনের মধ্যেই পরস্পরের সুখসুবিধার দিকে একটি আকুল ব্যগ্রতা ছিল। "দক্ষিণেশ্বরে থাকতে একদিন আমি রঙ্গন ফুল আর যুঁই ফুল দিয়ে সাত লহর গড়ে মালা গেঁথেছি। বিকেল বেলা গেঁথে পাথরের বাটিতে জল দিয়ে রাখতেই কুঁড়িগুলি সব ফুটে উঠল। মাকে পরাতে কালীঘরে পাঠিয়ে দিলুম। গয়না খুলে মাকে ফুলের মালা পরানো হয়েছে। এমন সময়ে ঠাকুর মাকে দেখতে গিয়েছেন, দেখে একেবারে ভাবে বিভোর। বারবার বলতে লাগলেন, আহা, কাল রঙে কি সুন্দরই মানিয়েছে। জিজ্ঞেস করলেন, কে এমন মালা গেঁথেছে ? আমি গেঁথে পাঠিয়েছি একজন বলাতে তিনি বললেন, আহা, তাকে একবার ডেকে নিয়ে এস গো, মালা পরে মায়ের কি রূপ খুলেছে একবার দেখে যাক। বৃন্দে ঝি গিয়ে আমাকে ডেকে নিয়ে এল। মন্দিরের কাছে আসতেই দেখি, বলরামবাবু, রামবাবু এঁরা সব মায়ের মন্দিরের দিকে আসছেন, আমি তখন কোথায় লুকুই! বৃন্দের আঁচলটি টেনে ঢাকা দিয়ে তার আড়ালে পেছনের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গেলুম। ওমা, ঠাকুর তা জানতে পেরে বলছেন, "ওগো, ওদিক দিয়ে উঠো না। সেদিন এক মেছুনী উঠতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে মরেছে। সামনের দিক দিয়েই এস না।"

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে টাকা ছুঁতে পারতেন না, কিন্তু জানতেন, গয়নার উপর মেয়েদের স্বাভাবিক ঝোঁক। নির্লোভ সারদামণির মন চাওয়াপাওয়ার যত উর্ধ্বেই উঠে থাক পাছে তাঁর এই স্বাভাবিক ইচ্ছা অপূর্ণ থাকে সেজন্যে হৃদয়কে দিয়ে গয়না গড়িয়ে দিয়েছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর কোন ঢাকঢাক ভাব ছিল না। অন্তরঙ্গেরা সবই জানতেন। এ সম্বন্ধে কথা উঠলে মধুর রহস্যের হাসি হেসে বলতেন, ওরে, আমার সঙ্গে ওর এই সম্বন্ধ যে!

কিন্তু সারদামণির লোভহীনতা ছিল অকৃত্রিম। এ নিয়ে তাঁর মধ্যে জাহির করার কোন চেষ্টা কোন দিন দেখা যেত না। পরমহংসের স্ত্রী তিনি। গয়না পেয়ে নিজের লোভহীনতা দেখাবার জন্য অনায়াসেই তা না পরে ফেরত দিতে পারতেন। সাধারণ লোকের কাছে তাতে হয়ত তাঁর বেশি প্রশংসা লাভের সম্ভাবনা থাকত। কিন্তু তিনি সে সব কিছু কখনও করেন নি। আধুনিক সামাজিক চলনের তুলনায় তিনি খুব শিক্ষিতা ছিলেন না। জয়রামবাটীতে সামান্য লেখাপড়া শিখেছিলেন। স্বামীর শেষ অসুখের সময় কাশীপুরে থাকতে নিজের চেষ্টায় একজন পরিচিতা সঙ্গিনীর কাছে সেই সামান্য জ্ঞান ঝালিয়ে নিতে পেরেছিলেন মাত্র। কিন্তু তাঁর আচারে ব্যবহারে চিরদিন অসামান্য ব্যক্তিত্ব ও ধারণাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতের মেয়েদের ইতিহাসে সারদামণি অপূর্ব রত্ন।

তাঁর নির্লোভ ভাব কত গভীর ছিল একদিনের ঘটনায় তার পরিচয় পাওয়া যায়। ছেলেবেলা থেকেই তিনি কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যে মানুষ হয়েছেন। সে দারিদ্র্যের বাইরের রূপ যেমন ভয়ঙ্কর তেমনি দুঃসহ। জীবনে এই দুঃসহ পীড়ন সহ্য করেও পার্থিব সম্পদকে যিনি তুচ্ছ করতে পারেন তাঁকে লোকে দেব অংশে জন্ম বলে পূজা করবে না ত করবে কাকে! শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে তখন রাতদিন ধর্মকামী মানুষের যাতায়াত। কত রকমের মানুষ আসেন, কত রকমের তাঁদের কামনা! শ্রীযুক্ত লছমীনারায়ণ বলে একজন মাড়োয়ারী ভক্ত একদিন পরমহংসদেবকে বললেন, আমি আপনার সেবার জন্য দশ হাজার

টাকা দিচ্ছি। আপনি নিলে আমার খুব আনন্দ হবে।

এ কথা শুনে পরমহংসদেবের মাথায় যেন কে করাত বসিয়ে দিলে। এত দিন পরে আবার টাকার প্রলোভন! তিনি বললেন, না, টাকা আমি ছুঁই না।

—আপনি না নেন, হুকুম করুন, সারদা দেবীর নামে এই টাকা লিখে দিই।

বিশেষ পীড়াপীড়িতে পরমহংসদেব স্ত্রীকে ডেকে বললেন, ওগো, এক ভক্ত দশ হাজার টাকা দিতে চাইছে। আমি নিতে পারব না বলে তোমার নামে দিতে চাইছে। তুমি নাও না কেন, কি বল?

সারদামণির মধ্যে কোন ফাঁকি ছিল না, তাঁর ভিতরটা গড়ে উঠেছিল নিখুঁত ভাবে। সহজ ধারণাশক্তিতে তাঁর মন ছিল অসামান্য। স্বামীর কথা শুনে তিনি বিন্দুমাত্র ইতস্তত: না করে জবাব দিলেন, তা কেমন করে হবে? টাকা নেওয়া হবে না। আমি নিলে ও টাকা ত তোমারই নেওয়া হবে। কেন না, আমার কাছে থাকলে তোমার সেবা ও অন্যান্য দরকারে খরচ না করে থাকতে পারব না। ফলে সেই তোমারই নেওয়া হবে। তোমাকে লোকে এত মানে, এত শ্রদ্ধাভক্তি করে তোমার ত্যাগের জন্যে। এ টাকা কিছুতেই নেওয়া হবে না।

সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীস্বামীর স্ত্রী হিসাবে সারদা-মণির ভবিষ্যৎ ছিল অনিশ্চয়তার অন্ধকারে। পরবর্তী কালে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলী যে বিপুল প্রতিপত্তি লাভ করেছিলেন তখন তার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। সে সময়ে নারীসুলভ সামান্য কিছু ভবিষ্যৎ সঞ্চয়ের চেষ্টা করলে তাঁর পক্ষে কিছুই অস্বাভাবিক হত না। কিন্তু সেদিন তাঁর মনে সে চিন্তা বিন্দুমাত্র জাগে নি। এতে শুধু নির্লোভতা নয়, স্বামীর উপর তাঁর অনন্যসাধারণ নির্ভরশীলতারও পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন পরমহংসদেবের যোগ্য সহধর্মিণী। স্বামীর আদর্শকে কিছুমাত্র দ্বিধা না রেখে মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন।

সুবিবেচনা তাঁর চরিত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। এই সুবিবেচনার জন্যই তাঁদের দাম্পত্য-জীবনের সুখ ও শান্তি কখনও ক্ষুণ্ণ হয় নি। একবার পাণিহাটীর মহোৎসবে সাঙ্গোপাঙ্গ শিষ্যদের নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের যাবার ব্যবস্থা হল। সঙ্গে স্ত্রী-ভক্তেরা যাচ্ছেন, স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠল, সারদামণি যাবেন কি না। সকল দিকে দৃষ্টিশীল শ্রীরামকৃষ্ণ জানতেন, স্ত্রী সঙ্গে গেলে বৈষ্ণবদের উৎসবে সমবেত খুঁতসন্ধানী ভিড়ের মানুষেরা তাঁদের নিয়ে নানা ঠাট্টা করতে পারে। তাই স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যেতে তিনি খুব উৎসাহী ছিলেন না। তবু এ সব বিষয়ে স্ত্রীর উপর কোনও দিন নিজের ইচ্ছা জোর করে চাপিয়ে দিতেন না। তাই একজন স্ত্রীভক্তকে দিয়ে সারদামণিকে বলে পাঠালেন, এরা ত সব যাচ্ছে, যদি তোমার ইচ্ছে হয় ত চল। বুদ্ধিমতী সুবিবেচিকা স্ত্রী নিমেষে ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। "উনি আমাকে যেভাবে যেতে বলে পাঠালেন তাতেই বুঝতে পারলুম, উনি মন খুলে অনুমতি দিচ্ছেন না। তাহলে বলতেন, হ্যাঁ, যাবে বই কি।" সারদামণি ঘুরিয়ে জবাব দিলেন, অনেক লোক ওঁর সঙ্গে যাচ্ছে। পেনিটিতেও খুব ভিড় হবে। অত ভিড়ে নৌকা থেকে নেমে ওখানে উৎসব দেখা আমার পক্ষে মুস্কিল। আমি যাব না। সারদামণির অনুমান যে অক্ষরে অক্ষরে সত্যি তার প্রমাণ পরে শ্রীরামকৃষ্ণের মন্তব্যে পাওয়া গেছল। তিনি বলেছিলেন, অত ভিড়, তার উপর ভাবসমাধির জন্যে আমাকে সকলে লক্ষ্য করছিল। ও সঙ্গে না গিয়ে ভালই করেছে। ওকে সঙ্গে দেখলে লোকে বলত, হংসহংসী এসেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদামণি দক্ষিণেশ্বরে কয়েক

হাত দূরে বাস করতেন বটে কিন্তু সব সময়ে প্রতিদিন তাঁদের দেখাশোনা হত না। অনেক সময় হয়ত কয়েক মাস ধরে পরস্পরের দেখা নেই। নিজের নিজের জীবনের মধ্যে দুজনেই ডুবে আছেন। কিন্তু তাঁদের ভালবাসার সীমা ছিল না। ছোট ছোট ঘটনাতেই মানুষের মনের সত্যিকার ছবি ভেসে ওঠে। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের কানে এল স্ত্রীর ভীষণ মাথা ধরেছে। আশ্রিত জনের সামান্যমাত্র দুঃখে নির্বিকার সন্ন্যাসীর কি দরদই না ছিল! তিনি মহা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, ওষুধের ব্যবস্থা করলেন। কি কারণে এ রকম মাথা ধরতে পারে তাই ভাবতে ভাবতে বারবার ভাইপো রামলালকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, "ওরে রামলাল, মাথা ধরল কেন রে?" তিনি ছিলেন নিঃস্বার্থ ভালবাসার ঐন্দ্রজালিক। ভালবাসা দিয়ে কেমন করে মানুষের মন জয় করতে হয় তা জানতেন। পরে বাংলাদেশের রাজধানীর সম্পন্ন ঘরের যে সব ছেলের দল গৃহপরিবারের স্নেহের সংশ্রব,—জীবনের সকল ভোগের আশা ত্যাগ করে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন, তাঁর শিষ্য হয়েছিলেন তা পরমহংসের শক্তি দেখে নয়—তাঁর ভালবাসার বাঁধনহারা বন্ধনে জড়িয়ে পড়ে।

সারদামণির মন ছিল করুণায় ভরা। তিনি স্বামীর মধ্যে নিজের সর্বস্ব সঁপে দিয়েছিলেন যন্ত্রের মত নয়—পরনির্ভর দাসীর মত নয়। এই সমর্পণ আন্তরিক ও অকুণ্ঠিত ছিল বলেই এর ফলে তাঁর ব্যক্তিত্ব নষ্ট হয় নি, বরং আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। সেই ব্যক্তিত্বের মূল প্রকাশ ছিল স্নেহশীল করুণায়। মায়ের মন নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন। অন্তরের অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে সেই মা-ই তাঁর মধ্যে পরম বিকাশ লাভ করেছিল। দক্ষিণেশ্বরে একবার একজন বৈষ্ণবী এসে হাজির হল—তার হাবভাব একটু পাগলাটে ছিল। মধুর ভাবের সাধনা করত সে। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণকে বললে, ভগবানকে যেমন স্বামী বলে দেখি, তোমার মধ্যেও দেখি সেই স্বামীকে। একথা শুনে পরমহংসদেব ভীষণ বিরক্ত হলেন। তিনি বৈষ্ণবীকে ভয়ঙ্কর বকতে লাগলেন। তাঁর সেই রুদ্র মূর্তি দেখে সকলেই ভয় পেয়ে গেল। সারদামণি সব কথা শুনে বৈষ্ণবীকে নিজের কাছে ডেকে পাঠালেন। তাকে মেয়ের মত আদর যত্ন করে বললেন, ওঁর কাছে তুমি গেলে উনি রাগ করেন। তা ওঁর কাছে আর যেও না। তুমি মা আমার কাছে এস।

তাঁদের অপরূপ দাম্পত্যজীবন যে কি অপরিসীম মাধুর্যে ভরা ছিল তার ছবি সারদামণির পরিণত বয়সের একদিনের কথায় চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে। সারদামণি সেদিন আত্মবিশ্লেষণের মেজাজে ছিলেন—ফেলে আসা গতজীবনের টুকটাক স্মৃতির কথা কেবলই তাঁর মনে পড়ছিল। পাশের অনুরাগী শিষ্যার সঙ্গে কথা বলতে বলতে প্রায়ই এসে পড়ছিল সেই স্মৃতির ছবি। তাঁর পরিচিত কোন মহিলার অশান্তির কথা আলোচনা করতে করতে হঠাৎ তাঁর অন্তরে ভেসে উঠল আপন জীবনের সব চেয়ে সুখের দিনগুলি। তিনি আত্মগতভাবে বলে উঠলেন, আহা, তিনি আমার সঙ্গে কি ব্যবহারই করতেন! একদিনও মনে ব্যথা পাবার মত কিছু বলেন নি। কথনও ফুলটি দিয়েও ঘা দেন নি। একদিন দক্ষিণেশ্বরে আমি তাঁর ঘরে থাবার রাখতে গেছি, লক্ষ্মী রেখে যাচ্ছে মনে করে তিনি বললেন, দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যাস্। আমি বললুম, আচ্ছা। আমার গলার স্বর শুনে তিনি চমকে উঠে বললেন, কে,—তুমি? তুমি এসেছ বুঝতে পারি নি। আমি মনে করেছিলুম লক্ষ্মী, কিছু মনে করো নি ত? কথন আমাকে তুমি ছাড়া তুই বলেন নি।

নানা বিষয়ে গাঁয়ের মেয়ে সারদামণির মন অত্যন্ত আধুনিকবোধসম্পন্ন ছিল। স্বামীর ব্যক্তিমর্যাদাপ্রকাশক ব্যবহারের মধ্যে অকৃত্রিম প্রীতি ও সামাজিক সম্পর্কের যে সূক্ষ্মতা ও গভীরতা ছিল তা তিনি বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। দক্ষিণেশ্বরের দাম্পত্যজীবনের দিনগুলিকেই তিনি বারবার জীবনের চরম সুখের দিন বলে স্মরণ করে গেছেন।*

* লেখকের "সারদামণির জীবনকথা" শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

কামারপুকুর

স্বামী প্রেমেশানন্দ

চল কামারপুকুর,
ওরে চিত্ত-উপবাসী,
ব্যর্থশ্রমে ক্লান্ত, পথভ্রান্ত, তৃষ্ণাতুর,
জীবনের অপূর্ণতা গ্লানি অপমান
সেথা হবে দূর,
চল কামারপুকুর।

হের ধরাতল
দৈত্যদানবের ক্রীড়াস্থল,
সব ঠাঁই নাচিয়া বেড়ায় ক্রূর খল !
অবাধে মন্দিরে পশি' দেবের নৈবেদ্য গ্রাসি'
কাড়াকাড়ি করে যত শ্মশান-কুকুর,
চল চল কামার-পুকুর।

লাজহীন নগ্ন বর্বরতা
রম্যবেশে সভ্যভাষে কহে পুণ্যকথা,
জ্ঞানালোক নির্বাপিত
ধরা মগ্ন ঘোর অন্ধকারে,
দিবসে তস্কর দস্যু নির্ভয়ে বিহরে।
জুড়ি' দীনকাঙ্গালের মাংসাস্থিপঞ্জর,
রচি' রম্যহর্ম্যশ্রেণী সজ্জিত নগর,
বিকাশি বিকট দন্ত হাস্য করে পিশাচ নিষ্ঠুর,
চল যাই কামারপুকুর।

নিরানন্দ মানব-জীবন,
শঙ্কিত কুণ্ঠিত ভীত নিত্য প্রাণমন,
'কি হয়' 'কি হয় কবে'—ধরাপূর্ণ এই রবে,
বৃথা হেথা সুখ অন্বেষণ।
শান্তির দুরাশা শুধু কবির কল্পনা সুমধুর
চল চল কামারপুকুর।

মরুবুকে সুরম্য উদ্যান
জুড়াইতে তপ্ত দেহ-প্রাণ
বঙ্গপল্লী ছায়াতলে শান্তি মূর্তিমান।
তুচ্ছ ছাই-মাটিলাগি নিলাজ ফিরিছ মাগি
অজ্ঞাতে দুর্গম পথে অশান্ত অন্তর,
হও তৃপ্ত অবগাহি সম্মুখেতে হের চাহি
রামকৃষ্ণ-লীলা-স্মৃতি-সুধা-সরোবর।
যত ক্ষুধা যত তৃষা মিছে কাঁদা মিছে হাসা
মিছে ঘোরা যাওয়া আসা আজ হবে দূর,
চল যাই কামারপুকুর।

সেথা চির-বসন্ত প্রকাশ,
অভিমান-কৃষ্ণমেঘ-মুক্ত চিত্তাকাশ,
তাই হের জীবনের অনাবৃত অবাধ বিকাশ,
বিকচকমলে যেন সুষমা সুবাস।
বিদ্যাবুদ্ধি শাস্ত্রজ্ঞান ধনকুল হতমান,
জ্বলে না হৃদয়-কুণ্ডে লালসা অনল।
ব্যথা নাই সুখ সনে, নাহি দ্বন্দ্ব বাক্যমনে,
কর্মসহচর সেথা নহে অকুশল।
সরল সুন্দর শুভ একতানে বাঁধিয়াছে সুর
চল যাই কামারপুকুর।

একবিন্দু আনন্দের তরে
একসিন্ধু স্বেদবিন্দু ঝরে !
এই প্রাণভরে চাওয়া, ক্ষণেকের তরে পাওয়া,
কেঁদে ফিরে যাওয়া শূন্যবুকে শূন্যমনে।
ওরে অন্ধ মূঢ় মন, কেন এত আয়োজন,
জীবন কাটালি মিছে আশার ছলনে।
আর নহে অবহেলা, চল চল এই বেলা,
রামকৃষ্ণ-লীলাভূমি আমোদর তীরে,
সেথায় পথের ধূলি রাখিয়াছে বুকে তুলি
চরণ-পরশ-তাঁর পতিতের তরে।
ওরে ছোট, ওরে দীন, পতিত কাঙ্গাল হীন,
সর্বহারা বেদনা-বিধুর,
অসমতা অপমান আজ চির অবসান,
সেথা দুঃখ-লেশহীন আনন্দ প্রচুর
জীবন উৎসবময়, মরণ মধুর
চল চল কামারপুকুর।

দিবাস্বপ্ন

ব্রহ্মচারী শীতাংশু শেখর

বর্ত্তমানে এমন অনেক বিষয় এত দ্রুত এগিয়ে চলেছে যে তার সঙ্গে সংযোগ রাখা কঠিন। এরি মাঝে বিজ্ঞানের বিভিন্নশাখায় উন্নতির মরসুম লেগে গেছে, মনস্তত্ত্বের সুপ্ত বীজ সহসা বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়েছে, যার কিছু আগেই বিশেষ কোন আকার ছিল না তার অবয়ব গড়ে উঠেছে। এই প্রবন্ধে মনস্তত্ত্বের একটা কৌতুকাবহ অথচ কর্ম্মবহুল জীবন-ভঙ্গীর ছায়াচিত্র নিয়ে কিছু আলোচনা করব—যতদুর সম্ভব technicalities বাদ দিয়ে।

নিশীথে ঘুমপরী এসে আমাদের স্বপ্নরাজ্যে নিয়ে যায়: কিন্তু একটু খেয়াল করলেই আমরা দেখতে পাই—প্রচণ্ড দিবালোকে জাগ্রত অবস্থায়ও আমরা স্বপ্নের জাল বুনি—অলীক কল্পনার মিহি সুতার সাহায্যে, এবং এ সুতা এত মিহি যে তা বাস্তবের এতটুকু পরশও প্রায়ই সহ্য করতে পারে না। একটি উদাহরণ দিচ্ছি:

একজন কিশোরের বিদ্যালয়ের বাৎসরিক পরীক্ষা এসেছে। একটু আগেও সে সংস্কৃত পড়ছিল, এখন আর পড়ছে না, খোলা বইএর উপর চোখ রেখে কি যেন ভাবছে বেহুঁস হ'য়ে। মনে তখন তার জগৎজোড়া উৎসবের বিহ্বলতা—কল্পনার নবীন রাগে পাতলা ফানুস তখন রাঙা হয়ে উঠেছে। এমন সময় মা এসে ডাকলেন—"কিরে, তোর পড়া হ'ল, খাবি চল।" কিশোর শুনতে পেলে না—তার সাধারণ মনকে ও-ডাক স্পর্শই করলে না;—কেমন যেন এক নিঃসাড় নিদ্রা তাকে আবিষ্ট করে রেখেছিল। মা আবার ডাকলেন—তখন সে লজ্জিত হ'য়ে তাড়াতাড়ি মার কথার উত্তর দিল। এরূপ ঘটনা প্রায়ই দেখা যায়। এর কারণ কি? অন্যে যে যাই বলুন, মনোবিদ্ বলবেন—দিবাস্বপ্ন। কিশোর হয়ত তখন তার ঐ গোপনীয় অপরূপ মুহূর্ত্তে অভিভূত হ'য়ে ভাবছিল—সে সংস্কৃত পরীক্ষায় প্রথমস্থান অধিকার করেছে (যদিও সে জানে যে তা, তার পক্ষে অসম্ভব—এমন কি, সে হয়ত, আগের বারের পরীক্ষার মত সংস্কৃতে ফেল্ করবে)।

সাধারণ লোক ঐ নিগূঢ় রহস্যের মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে বলবে—ও খেয়াল থেকে উদ্ভূত; কিন্তু মনোবিদ্ বলবেন,—না, তা নয়—ঐ দিবাস্বপ্নেরও কারণ রয়েছে। তাঁরা বলবেন—"এ জগৎ কঠোর সত্যের জগৎ। এখানে প্রতি মুহূর্ত্তে মানবের দুরূহ জয়-চেষ্টা সার্থক হ'য়ে উঠে না কিন্তু তবুও মানুষ প্রতিষ্ঠা চায়; এবং এই প্রতিষ্ঠা চাওয়ার অবসরে সে প্রত্যক্ষ জগতে বাধা পেয়ে বিনাবিপত্তিতে স্বপ্নরাজ্যে নিজের প্রতিষ্ঠা খোঁজে—অলীক কল্পনার আশ্রয় নেয়—লক্ষ চিন্তার রঙীন স্বপ্নে রাঙিয়ে তোলে তার অপটু মনের নীলাকাশ। এই স্বপ্নরাজ্যের ক্ষুদ্র তুচ্ছ প্রতিষ্ঠা তাকে সান্ত্বনা যোগায়। এখানে এই কিশোর তার সংস্কৃতের পরীক্ষাপত্রে "ফুলমার্কস্" (full marks) দিতে পারে। কেন না এই স্বপ্নরাজ্যের অধীশ্বর সে নিজে; এ রাজ্যের প্রসারিত পরিবেশ তার করায়ত্ত। এখানে সে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে; ফলে সে তার মানসিক প্রবৃত্তির উত্তরোল উল্লাসকে

কতকাংশে রূপায়িত কোরে নিজের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করে—অনায়ত্ত বাস্তবের সাংঘাতিক সংঘাতকে ছিটকে ফেলে দিয়ে। তা না হলে, তার বাহ্যিক বন্ধন ছিন্ন করবার দুর্ব্বার প্রয়াস যদি সব দিক থেকে বাধা প্রাপ্ত হ'ত, তবে নিঃশব্দ বেদনায় সে হয় ত পাগল হ'য়ে যেত। এই জন্যই —ঐ অতৃপ্ত বাসনার স্থূল তৃপ্তিতেই—দিবাস্বপ্নের সম্যক্ সার্থকতা।

ফ্রয়েডের মতে দিবাস্বপ্ন যৌন প্রবৃত্তির প্রকাশ মাত্র (এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল যে ফ্রয়েডের যৌন প্রবৃত্তি খুব ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়, সাধারণ আভিধানিক অর্থ এতে প্রযোজ্য নয়। শুধু অপ্রত্যাশিত নয়, অপ্রাসঙ্গিক বলেই ঐ বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যায় বিরত হচ্ছি)। "এড্‌লার" ও "জাং" কিন্তু "ফ্রয়েড"কে এ বিষয়ে সমর্থন করেন না; তাঁরা দিবাস্বপ্নের মূলে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তিকেও আর একটা কারণ বলে মনে করেন। আবার, "ম্যাক্‌ডুগাল" ও "ড্রেভার" দিবাস্বপ্নের মূলে 'ইড্" (Id) বা অবচেতন মনের প্রবৃত্তিকে স্বীকার করে চলেন; এবং এই "ইড্" এর সঙ্গে চেতন-মনের "ইন্‌ষ্টিঙ্ক্‌ট্" (instinct) বা সহজ প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বকে দিবাস্বপ্নের মূল কারণ বলে নির্দ্দেশ দেন।

দিবাস্বপ্ন সাধারণতঃ দুপ্রকারের:—

(ক) যুদ্ধজয়ী দিবাস্বপ্ন (conquering herotype)

(খ) আঘাতগ্রাহী দিবাস্বপ্ন (suffering herotype)

প্রথমোক্ত প্রকারের দিবাস্বপ্নে নায়ক নিজেকে স্বপ্নরাজ্যে সর্ব্বজয়ী কোরে তোলে—বাহিরের তাগিদ ও আঘাতকে অগ্রাহ্য কোরে। এবং কল্পনার সাহায্যে, সকলে তাকে প্রশংসায় আপ্লুত করে তুলছে দেখতে পায়। এ প্রকারের দিবাস্বপ্নের উদাহরণ পূর্ব্বেই দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় প্রকারের দিবাস্বপ্নে নায়ক নিজেকে হেয় কোরে তোলে; যেমন—নায়কের যাকে ভাল লাগে না তাকে হয়ত স্বপ্নে খুন করতে চলেছে, কিন্তু শেষে সে নিজেই ভীষণ আঘাত পেয়েছে—দেখছে—আর পাঁচজনে তার এই বিপর্য্যয়ে, তাকে গভীর সহানুভূতি দেখাচ্ছে, এবং এই সহানুভূতি অর্জ্জনেই তার আনন্দ।

সর্ব্বাবস্থার লোকের মধ্যেই দিবাস্বপ্ন দেখা দেয়। কতকাংশে ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু যখন দিবাস্বপ্ন শুধু স্বপ্নই থাকে—তাকে বাস্তবে পরিণত করার সাহস ও সংহতি যখন স্বপ্নদ্রষ্টার অপরিচয়ের আড়ালে থাকে, তখন ঐ দিবাস্বপ্ন অস্বাভাবিক। ঐ অস্বাভাবিক দিবাস্বপ্নের অবান্তর অলীক ও ফেনিয়ে-তোলা কল্পনার কুহকে দিবাস্বপ্নদ্রষ্টা দিনদিন নীরস নিঃসঙ্গ ও নিশ্চেষ্ট হয়ে উঠে, বাস্তব জীবনে ঘাতপ্রতিঘাতের কঠোর আক্রমণকে যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলে। সাধারণ জীবনের শুদ্ধ সত্য প্রাণ-প্রবাহে সে নিজেকে একেলা মন্থর গতিতে বাহিত করতে যত্নবান হয়। ফলে ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক কর্ত্তব্য তার কাছে কোনদিনই সহজ ও সাবলীল হয়ে উঠে না—কেবলমাত্র অসঙ্গত-মিথ্যা-কল্পনাবিলাসী হয়ে সে বাস্তবজীবনে মনে প্রাণে জীবন্মৃত হয়ে থাকে। আকাশকুসুমের গন্ধ-পাওয়া মন কোনদিনই বাস্তবজীবনের সংঘাত-সহিষ্ণু মনকে মেনে নিতে পারে না।

বাল্যকালে দিবাস্বপ্ন ও কার্য্যকরী কল্পনার (creative imagination) মধ্যে প্রভেদ নির্ণয় করা বড় শক্ত, তবে যৌবনাবস্থার পর থেকে ঐ কার্য্যকরী কল্পনা ও দিবাস্বপ্নের বিভিন্ন স্তরকে কতকাংশে বিভক্ত করা সহজ। কিন্তু আর একদিক থেকে দেখ্‌লে এটা বেশ শক্ত—কারণ শেষোক্ত বয়সে কেউ তার বিচিত্র সম্ভাবনার দিবাস্বপ্ন, দ্বিধা সংকোচ সরিয়ে, অন্যের কর্ণগোচর করতে চায় না—হাস্যাস্পদ হবার ভয়ে। ফলে,

যে প্রদত্ত বিষয়-সমূহ অবলম্বন কোরে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া চলে, তার অভাব ঘটে প্রচুর।

মনোবিদের মতে—পাগল, আধপাগল ও অধিক দিবাস্বপ্ন-দ্রষ্টার প্রবৃত্তিগত বিশ্লেষণের মধ্যে গুণ-গত কোন প্রভেদ নাই; তবে মাত্রা বা পরিমাণগত পার্থক্য রয়েছে। দিবাস্বপ্নের আত্যন্তিক পরিণতি যে মানবকে উন্মাদ করে তুলতে পারে—এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ মেলে না।

স্বাভাবিক পর্য্যায়ের দিবাস্বপ্ন—যা কার্য্যকরী কল্পনার খোরাক জোগায়—বাল্যকালে কিছুটা প্রয়োজন; তা না হ'লে গল্প-সাহিত্যের ঐশ্বর্য্য, উজ্জ্বল ভাষার শিল্প, চিত্র, কবিতা প্রভৃতি কলাবিদ্যার উন্নতি হওয়া সম্ভব হ'ত না। তবে শিক্ষায়তনে পাঠদানকালে দিবাস্বপ্ন-বিলাসীকে কোনক্রমেই সহ্য করা উচিত নয়। কিন্তু মজা হচ্ছে এই যে দিবাস্বপ্নবিলাসীরা ক্লাসে এত স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে এবং তাদের চোখে মুখে, ইসারায় ইঙ্গিতে, উদ্বেলিত বিস্ময়ে, মনঃসংযোগের এমন একটা ছাপ থাকে যে তাদের চেনা শক্ত। তবে মাঝে মাঝে প্রতি বালককে কিছু কিছু জিজ্ঞাসা করে এই রোগের চিকিৎসা করা যেতে পারে।

বাস্তবের উগ্রমূর্ত্তি যখন অপটু মানবের মানসক্ষুধাকে একটুও আমল দেয় না, তখন ঐ দিবাস্বপ্ন যে এই প্রকারের মানবের ব্যথার সাথী, দুঃখের দোসর একথা মনোবিদ্ ব্যতীত ইতর জনের স্বীকার করে নেওয়ার কৌতুকপ্রিয়তাকে স্বার্থপরতাপ্রসূত আমন্ত্রণ বলা যায় কি?

মুক্তিপরশ

শ্রীনকুলেশ্বর পাল, বি-এল্

আমি যে তোমারে নিশিদিন খুঁজে ফিরি,
তুমি আপনারে কল্পগুহায়
আঁধারে রাখিছ ঘিরি।

সুরের মাঝারে আমি ভেসে যাই,
তাইতো তোমারে ছুঁতে নাহি পাই,
অস্তাচলের তিমিরেতে ডুবি
না হেরি উদয়গিরি।

হিংসামুখর ঢেউগুলি দুলে দুলে,
সিন্ধুর বুকে ফেনিল পাহাড়
আছাড়িয়া পড়ে কুলে।

তোমার প্রেমের গভীর আলোক,
আঁখিতে আমার প্রতিভাত হোক,
সন্ধ্যামেঘের রক্ত পাথারে
আমারে লও হে তুলি।

অরূপের মাঝে রূপের মাধুরি জাগে,
ওপারের কূলে প্রভাতী আলোয়
তুলির পরশ লাগে।
মাথা রেখে আজি বিরাটের পায়,
শেষ ক'রে দেব সব সংশয়।
অশান্ত মোর লুব্ধ হৃদয়
মুক্তিপরশ মাগে।

স্বামী বিবেকানন্দ ও যুগধর্ম

শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, বি-এল্

ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব যাঁহাকে প্রথমদিন দক্ষিণেশ্বরে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "বিষয়ী লোকের আবাসভূমি কলিকাতায় এত বড় সত্ত্বগুণী আধার থাকাও সম্ভবে! জানি আমি, প্রভো, তুমি সেই সপ্তর্ষিমণ্ডলের ঋষি, নররূপী নারায়ণ, জীবের দুর্গতি নিবারণ করিতে পুনঃ শরীর ধারণ করিয়াছ।" যাঁহার মহিমা কীর্তন করিতে যাইয়া জনৈক ভক্ত বন্দনা করিয়াছেন, "মূর্তমহেশ্বরমুজ্জ্বল-ভাস্করমিষ্টমমরনরবন্দ্যম্," (মূর্তিমান্ শিব, দীপ্তিশালী সূর্যের ন্যায় তেজস্বী, দেবতা ও নরগণের বন্দনীয় ইষ্টদেবকে প্রণাম করি)। যাঁহার সম্বন্ধে বাংলার কবি গাহিয়াছিলেন, "বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী ছুটেছে জগৎময়, —বাঙ্গালীর ছেলে ব্যাঘ্রে ও বৃষভে ঘটাবে সমন্বয়"। মার্কিণের চিকাগো ধর্মসভায় যাঁহার আলোড়নকারী মহাশক্তি দেখিয়া 'New York Herald' (নিউ ইয়র্ক হেরল্ড) পত্রিকা যাঁহাকে 'Cyclonic Hindu' বা 'ঝড়ো হিন্দু' নামে অভিহিত করিয়াছিলেন, সেই মহাশক্তিধর স্বদেশপ্রেমিক ঋষি, নবীন ভারতের জনক, ক্ষাত্রবীর্য ও ব্রহ্মতেজের মূর্তবিগ্রহ, মহান্ কর্মযোগী ও মানবপ্রেমিক ধর্মাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের চতুরশীতিতম শুভ জন্মতিথি-দিবস উপলক্ষে তাঁহার পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে এ বৎসর আমরা জগৎবাসিগণ আমাদের আন্তরিক ভক্তি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করিতেছি।

বর্তমান তমসাচ্ছন্ন রণক্লান্ত শান্তিকামী জগতের নিকট স্বামী বিবেকানন্দের প্রেম, সৌভ্রাত্র, সেবা, আত্ম-প্রত্যয়, মহাবীর্য ও ঈশ্বরানুভূতির বাণী অমোঘ আলোক-বর্তিকা স্বরূপ। পৃথিবীর সমস্ত অনর্থ, দুঃখ ও অশান্তির অব্যর্থ মহৌষধ ধর্ম। তথাপি আমরা ইহাও জানি যে আধুনিক যুগের অনেক লোক ধর্মে আস্থা হারাইয়া ফেলিয়াছেন; তাঁহারা ধর্ম চান না একথা বলা চলে না; এই বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের যুগের উপযোগী ধর্ম খুঁজিয়া পান না বলিয়াই সাধারণ্যে প্রচলিত ধর্মে তাঁহাদের আস্থা কম। স্বামী বিবেকানন্দ জগতের নিকট যে ধর্মের আদর্শ প্রচার করিয়াছেন উহার সহিত বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের কোন বিরোধ নাই—ইহা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিমূলক।

আমরা এখন যে যুগে বাস করিতেছি উহা বিজ্ঞান, যুক্তিবাদ ও মানবকল্যাণসাধনের যুগ। যুগোপযোগী ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গী ও আদর্শ হইবে বিজ্ঞানসম্মত, যুক্তিমূলক ও জনহিতকর। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ বিবেকানন্দ তাই এ যুগের উপযোগী এক বিজ্ঞানসম্মত, যুক্তিমূলক ও জনকল্যাণবিধায়ক ধর্ম প্রচার করিয়াছেন। ফলে তৎপ্রচারিত ধর্ম যে কেবলমাত্র প্রাচ্যদেশেই সর্বজনগ্রাহ্য হইয়াছে তাহা নহে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, যুক্তিবাদ, মানবকল্যাণ ও বস্তুতন্ত্রের উপাসক পাশ্চাত্যবাসিগণের নিকটও উহা সমধিক আদরণীয় ও গ্রহণীয় হইয়াছে। যে ধর্ম প্রকৃত মনুষ্যত্ব, মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশ, সিংহসাহসিকতা, অমিত চরিত্রবল, সেবাপরায়ণতা, স্বাধীন চিন্তাশীলতা, অফুরন্ত

বীর্যবত্তা ও ঈশ্বরানুভূতি আনিয়া দেয়, সেই ধর্মই স্বামী বিবেকানন্দ প্রচার করিয়াছেন।

ধর্মাচার্য বিবেকানন্দ ধর্মের নামে সর্বপ্রকার কুহেলিকাচ্ছন্ন, রহস্যপূর্ণ, গুপ্ত, অবিজ্ঞেয় ভাবসমূহ প্রচারের ঘোর বিরোধী ছিলেন। মিথ্যাভয়, প্রতারণা, প্ররোচনা বা প্রলোভন দেখাইয়া, চোখে ঠুলি দিয়া তিনি কখনও ধর্ম প্রচার করেন নাই। তাঁহার ধর্ম কেবল স্বল্পসংখ্যক সাধক বা দীক্ষিতজনের জন্য অভিপ্রেত নয়, অন্যের নিকট দুর্বোধ্য গূঢ় গোপনীয় বিষয় নয়। তিনি কেবল কতকগুলি মতবাদ অন্ধ বিশ্বাস, রীতি-নীতি ও আচার-অনুষ্ঠান প্রতিপালন, নিয়ম-নিষ্ঠা, পূজা-পার্বণকেই ধর্ম বলিয়া মনে করিতেন না। তিনি পোষাকী ধর্মে বিশ্বাস করিতেন না —বিশেষ দিনে নব ও পবিত্র পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া ধর্মানুষ্ঠানে যোগদান এবং তৎপ্রতি অত্যধিক অনুরাগ প্রদর্শনকেই ধর্মের যথার্থ স্বরূপ বলিয়া মনে করিতেন না। আত্মানুভূতি, মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের সম্যক্ বিকাশ, সত্যের সাক্ষাৎকারকেই স্বামী বিবেকানন্দ ধর্মের সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য ও আদর্শ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। ধর্ম প্রচার করিতে গিয়া স্বামিজী সত্যের প্রত্যক্ষানুভূতি বা সাক্ষাৎকারের উপরেই সমধিক জোর দিয়াছেন।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও অনুসন্ধান প্রত্যক্ষদর্শন ও পরীক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত। বিজ্ঞানের এই দাবীর প্রতি বিবেকানন্দ সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন। মহাজনবাক্য, ঋষিগণপ্রদর্শিত অনুশাসন ও সাধনপ্রণালীসকল জীবনে আচরণ, অনুসরণ ও পরীক্ষা করিয়া সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করিবার জন্য তিনি সকলকে আহ্বান করিয়াছেন। বিজ্ঞান অপেক্ষা অধিকতর সুনিশ্চিত ও দৃঢ়তর ভিত্তির উপর ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। ধর্মাবলম্বনে চরম সত্যে উপনীত হইতে পারে কিন্তু বৈজ্ঞানিক তাহার অবলম্বিত প্রণালীদ্বারা তথায় কখনও পৌঁছিবার আশা করিতে পারে না। বিজ্ঞান প্রত্যক্ষদর্শনমূলক সন্দেহ নাই কিন্তু চরম সত্য সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক মত গবেষণা ও অনুসন্ধানদ্বারা প্রাপ্ত তৎকালীন সিদ্ধান্তের সহিত কেবলমাত্র সম্পর্কিত ; ইহা ভাবীকালের অনুসন্ধান ও পরীক্ষা-লব্ধ উন্নততর সিদ্ধান্ত দ্বারা পরিবর্তন, পরিবর্জন ও পরিবর্ধন সাপেক্ষ। পক্ষান্তরে, ধর্মরাজ্যে আমরা আত্মানুভূতিদ্বারা সেই চরম সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করি যাহা নিত্য, শাশ্বত, চিরন্তন, অব্যয় ও অপরিণামী। বিবেকানন্দ বেদান্তপ্রতিপাদ্য ধর্ম প্রচার করিয়াছেন—তাঁহার বৈদান্তিক ধর্মের লক্ষ্য ও আদর্শ মানুষের অন্তর্নিহিত ব্রহ্মত্বের বা দেবত্বের পরিস্ফুরণ। বর্তমান জগতের নিকট তাঁহার ধর্মের বাণী :—"প্রত্যেক মানুষই স্বরূপতঃ ঈশ্বর ; জীবনের উদ্দেশ্য অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতি দমন করিয়া অন্তর্নিহিত সেই ব্রহ্মত্ব বা দেবত্বের বিকাশসাধন। এই আত্মবিকাশের কাজ সম্পন্ন করিতে হইবে কর্ম অথবা ভক্তি অথবা যোগ অথবা জ্ঞানের দ্বারা। এই আত্ম-সাক্ষাৎকারই মুক্তি। ধর্ম বলিতে ইহাই সব। মতবাদে অন্ধবিশ্বাস, যাগ-যজ্ঞ, ক্রিয়াকলাপ, আচার-অনুষ্ঠান, নিয়ম-নিষ্ঠা, পূজা-পার্বণ, ধর্মগ্রন্থ, মন্দির প্রভৃতি ধর্মের গৌণ বস্তু।" নরকের ভীতি, স্বর্গের প্রতিশ্রুতি, হতভাগ্য পাপিগণের উপর চিরন্তন অভিশাপবর্ষণ প্রভৃতির কথা আমরা বিবেকানন্দের ধর্মাদর্শে দেখিতে পাই না। উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত—বেদান্তের এই বজ্রনির্ঘোষই স্বামিজীর ধর্মের উদাত্ত বাণী।

বিবেকানন্দের ধর্মে মানবকল্যাণের যথোপযোগী স্থান ও মর্যাদা আছে। জীবনের উন্নতি ও মানবজাতির প্রগতির দাবী বিবেকানন্দের ধর্ম সম্পূর্ণরূপে পূরণ করিয়াছে। দরিদ্র, পদদলিত, আর্ত, নিপীড়িত জনগণের দুঃখে তাঁহার করুণার্দ্র বিশাল হৃদয় কাঁদিয়াছিল। ইহারাই তাঁহার ঈশ্বর। সর্বপ্রকার দুঃখ-ক্লেশ হইতে দরিদ্র ও আর্তগণকে

মুক্ত করিতে তিনি পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতেও প্রস্তুত ছিলেন। যে প্রকৃতিবাদ (naturalism) মানুষকে শুধু প্রকৃতি হইতে সমুদ্ভুত বলিয়া মনে করে বিবেকানন্দ সেই প্রকৃতিবাদের বিরোধী ছিলেন। জনকল্যাণকে তিনি এক নূতন রূপ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার 'নরনারায়ণ'বাদ বা শিবজ্ঞানে জীবসেবা এক অভূতপূর্ব ও অনন্যসাধারণ কর্মের আদর্শ। দেহের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান ও বিষয়সম্ভোগের প্রকৃষ্ট সুযোগ প্রদান করিয়াই আমরা মানুষের প্রতি শ্রেষ্ঠ কর্তব্য সম্পাদন করি না। মানুষকে তাহার অন্তর্নিহিত দেবত্বের সন্ধান দিতে হইবে। মানুষ যে অমৃতের সন্তান, এ বিষয়ে তাহার চেতনা জাগ্রত করিতে হইবে। বিবেকানন্দের ধর্মের মূলমন্ত্র ছিল—প্রথমে নিজে ঈশ্বর হও, তৎপর অপরকে ঈশ্বর করিও। মানুষ আত্মসাক্ষাৎকার করিবে, নিজের ভিতর ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া জীবনের সর্ব দুঃখ, ক্লেশ ও দ্বন্দ্ব হইতে বিমুক্ত হইবে এবং অপরকেও তদ্রূপ হইতে সহায়তা করিবে।

স্বামী বিবেকানন্দের বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিমূলক মানবকল্যাণকর যুগধর্ম অনুসরণ করিলে আধুনিক জগতের লোকগণ তাহাদের জীবনের সকল জটিল সমস্যার অব্যর্থ সমাধান করিতে পারিবেন।

শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে গীতার শিক্ষা

শ্রীঅহিভূষণ দে চৌধুরী

কৃষ্ণ ব'লছেন, 'আমি (প্রত্যগাত্মা) অব্যয় অমৃত সনাতন ও অব্যভিচারী সুখস্বরূপ ব্রহ্মের (পরমাত্মার) প্রতিষ্ঠা।' 'অক্ষর, অব্যক্ত—যাকে সূর্য্য, চন্দ্র, পাবক প্রকাশ ক'রতে পারে না—যেখানে গেলে আর ফিরতে হয় না, সেই আমার পরমধাম।' 'স্বর্গলোক হ'তেও ফিরে আসতে হয়, কিন্তু আমাকে পেলে আর ফিরে আসতে হয় না।' কৃষ্ণ এখানে নির্গুণ পরব্রহ্ম বা তুরীয় ব্রহ্মেরই সঙ্গে নিজের অভেদত্ব জানাচ্ছেন। ছান্দোগ্যোপনিষদে দেখা যায়, নারদ সনৎকুমারকে জিজ্ঞাসা ক'রছেন—'সুখ কি?' উত্তরে সনৎকুমার বল্লেন—'ভূমাই সুখ।' আবার সেই ভূমা সুখের পরিচয়ে ব'লছেন—'যাকে অন্য কিছুই দেখে না, অন্য কিছুই শোনে না, অন্য কিছুই জানতে পারে না—তাই ভূমা।' কৃষ্ণের 'আমিই সুখস্বরূপ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা' বাক্যের লক্ষ্য এই ভূমা; কেন না, ভূমাই সুখের পর্য্যাপ্তি। আর ভূমাতে যখন কোন রকম ক্রিয়াজন্য জ্ঞানের লেশ মাত্র থাকে না, তখন এই ভূমাই বা কে? কৃষ্ণের 'ব্রহ্মলোক' কথাটীর অর্থ—'ব্রহ্মার লোক বা সগুণ-ব্রহ্ম।' নির্গুণ পরব্রহ্মের জ্ঞান ব্যতীত পরামুক্তি হবার উপায় নেই। কাজেই, কৃষ্ণ যখন 'আমাকে পেলে আর ফিরে আসতে হয় না' ব'লছেন, তখন তিনি কোন্ ব্রহ্ম? কৃষ্ণের 'প্রতিষ্ঠা' বাক্যটীরও বিশেষ সার্থকতা আছে। এখানে 'প্রতিষ্ঠা' অর্থে—'প্রকাশ'। আর প্রকাশ তাকেই বলে, যখন সেই বস্তু স্বয়ংই ব্যক্ত হয়। স্বয়ং পরব্রহ্মই কৃষ্ণরূপে অভিব্যক্ত। তাই 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্

স্বয়ম্।' কৃষ্ণ যে পরব্রহ্মেরই সাক্ষাৎ প্রকাশ, ভাগবতকার কৃষ্ণ এটা আরও স্পষ্ট ক'রে দেখিয়েছেন। কৃষ্ণ ব'লছেন—'সৃষ্টির আগে যখন সৎ ও অসৎ কিছুই ছিল না, তখন "কেবল আমি"ই ছিলাম।' আবার ভগবানের দেওয়া দিব্যচক্ষু পেয়ে অর্জ্জুন যখন কৃষ্ণকে বলছেন—'যা সৎ ও অসতের পরে, তুমি সেই অক্ষর', তখন অর্জ্জুনের এই কথার প্রামাণ্যও বড় কম নয়! নির্গুণ পরব্রহ্ম বা তুরীয় ব্রহ্মকে উপনিষদ্ যে ভাবে নির্দ্দেশ ক'রেছেন, গীতা-ভাগবত কৃষ্ণকেও ঠিক সেই ভাবেই বিশেষিত ক'রেছেন। উপনিষদ্ কেবল নির্গুণ পরব্রহ্মকেই মায়ার অতীত ব'লেছেন। সগুণব্রহ্ম দূর হ'তেই মায়াকে ঈক্ষণ করুন অথবা যুক্ত হ'য়েই করুন, তিনি কিন্তু একবারে মায়ার অতীত নন। ভাগবত ব'লছেন—'সাক্ষাৎ নির্গুণ পুরুষ হরিই কেবল মায়ার অতীত।' শ্রুতি পরব্রহ্মকে কোন রকম বিশেষণে বিশেষিত ক'রতে না পেরে শেষে 'নেতি নেতি' বলেছেন। ভাগবতে দেখা যায়, শ্রোতগণ কৃষ্ণকে লক্ষ্য ক'রে ব'লছেন—'শ্রুতি সব আপনাকে তন্ন তন্ন ক'রে বর্ণনা ক'রতে না পেরে শেষে আপনাতেই পর্য্যবসিত হ'য়েছে।' উপনিষদে তুরীয় ব্রহ্মই সবার পর। কৃষ্ণ ব'লছেন, 'আমা হ'তে পরতর অন্য কিছুই নেই।' গীতায় কৃষ্ণ ব'লছেন 'যে কোন দেবতার পূজো ক'রলে আমারই পূজা করা হয়।' আবার ভাগবত ব'লছেন—'গাছের গোড়ায় জল দিলে যেমন তার সকল অঙ্গই পায়, সেই রকম কৃষ্ণের পুজোতেও সকল দেবতার পুজো হয়।' কৃষ্ণের তুরীয়ত্ব সম্বন্ধে এই সব শাস্ত্রবাক্য কি অস্বীকার করা যায়?

এখন প্রশ্ন এই—কৃষ্ণ যদি নির্গুণ পরব্রহ্মই হন, তবে গীতা ভাগবতের বহু জায়গায় কৃষ্ণ নিজেকে যে স্রষ্টা ব'লেছেন, তা সঙ্গত হয় কি ক'রে? অর্থাৎ সৃষ্টি যখন গুণাত্মক, তখন তার স্রষ্টা নির্গুণ হবেন কি ক'রে? আবার কার্য্যকারণ ভাবের নিয়ম অনুসারে যখন কারণ হ'লেই তা আবার অন্য কিছুর কার্য্য হবেই, তখন নির্গুণকে কারণ ব'ল্লে তা সৎ অসতের (কার্য্যকারণের) পর হয় কি ক'রে? নির্গুণ পরব্রহ্ম যখন পরম পুরুষ ও পরমা প্রকৃতিভাবে অভিব্যক্ত হন—গীতা যাকে পরা-অপরা প্রকৃতি ব'লেছেন, তখন তাঁর প্রকৃতিরূপ কাজ দেখে তাঁতে শক্তির অনুমান করা হয়। কেন না, কেবল কাজ দেখেই শক্তিকে অনুমানে মেনে নেওয়া সম্ভব! কারণ, শক্তিকে কেউ কখন দেখতে পায় না। আবার শক্তির সেই কাজ নষ্ট হ'য়ে গেলে, শক্তির বিকাশ দেখা যায় না। এইজন্য শক্তি আর তার কাজ ভেল্কি ছাড়া বস্তুতঃ কিছুই নয় বলাই ঠিক। অতীন্দ্রিয় বিষয়ে যখন শ্রুতিই একমাত্র প্রমাণ—একথা ব্যাসও 'শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ' সূত্রে স্পষ্ট ক'রে ব'লেছেন,—তখন শ্রুতি পরব্রহ্মের সাক্ষাৎ স্বরূপকে 'ভেতরে বাইরে কেবল ঘন চৈতন্য' বলায় সেখানে দ্বিতীয় বস্তুর সত্তা নেই। অর্থাৎ, 'নেতি নেতি' ক'রে সমুদয় জ্ঞেয় বস্তুকে বাদ দিলে জ্ঞেয় অভাবে যখন জ্ঞাতাও থাকে না, তখন জ্ঞাতা-জ্ঞেয়ের মূল সেই 'জ্ঞানস্বরূপ'কে বাদ দিচ্ছে কে? কাজেই, পরব্রহ্মের পরম পুরুষ বা পরমজ্ঞাতা ও পরমা প্রকৃতি বা পরম জ্ঞেয়ভাবে অভিব্যক্ত হওয়াটা ভেল্কি মাত্র;—'প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।' এই প্রকৃতি হ'তেই গুণের উৎপত্তি;—'গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।' তাই পরব্রহ্মের সাক্ষাৎ স্বরূপ নিত্য নির্গুণই। গুণাতীত না হ'লে যে মুক্তিই হয় না, আবার মুক্তিও যখন পরব্রহ্মের স্বরূপেই স্থিতি, তখন সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম যদি নির্গুণ না হন, তবে তো মোক্ষশাস্ত্রের কোন মূল্যই থাকে না!

নির্গুণই যে 'অনাদি' সৃষ্টিরও আদি কারণ,

ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্ত তার দৃষ্টান্ত। এই সূক্তে ঋষি ব'লছেন—'তখন অসৎও ছিল না, সৎও ছিল না।' উপনিষদ্ গীতা প্রভৃতি নির্গুণকেই সদসতের পর ব'লেছেন। কাজেই, এখানে ঋষির দৃষ্টি অবশ্য সেইখানে গিয়েছে ব'লতে হবে—যেখানে সৃষ্টিও নেই, স্রষ্টাও নেই। সমষ্টির কূটে আছেন যে পরমপুরুষ বা সগুণব্রহ্ম, গীতা যাঁকে পরাপ্রকৃতি ব'লছেন—যা সমষ্টি ও ব্যষ্টি ভেদে ঈশ্বরাত্মিকা ও জীবভূতা হ'য়ে সমষ্টিকূটে পরমপুরুষ বা সগুণব্রহ্মরূপে অপরা প্রকৃতিকে নিয়ে সমুদয় সৃষ্টি করেন, তিনি সৎ-অসতের (কার্য্য-কারণের) পর বা অজ্ঞেয় নন। তাই শ্রুতি সগুণব্রহ্মকে লক্ষ্য ক'রে ব'লেছেন—'জ্ঞানপ্রসাদে বিশুদ্ধ সত্ত্বযোগী ধ্যানরত হ'য়ে সেই নিষ্কল পুরুষকে দর্শন করে।' ঋষির দৃষ্টি যে এখানে সগুণে নয়—নির্গুণেই, তা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। তাই ব'লেছেন—প্রাণক্রিয়ার মূল সেই এক চৈতন্যই আপন শক্তিতে ছিলেন ;—'আনীদবাতং স্বধয়া তদেকম্।' এখানে এই যে, 'স্বধা' শব্দ আছে, এর অর্থ 'মায়া' হ'লেও, এই সূক্ত নির্গুণেরই প্রস্তাবক। কেন না, যা অধিষ্ঠানের কিছু মাত্র হ্রাস-বৃদ্ধি করে না অথচ সেই অধিষ্ঠানেই নানাপ্রকার সৃষ্টি করে, তাই তো মায়া—ভেল্কি—ইন্দ্রজাল! কাজেই নির্গুণব্রহ্ম এই ভেল্কির সৃষ্টি করায়, তিনি সগুণ সৃষ্টির কারণ হ'লেও নিত্য নির্গুণই থাকেন। স্বধা যদি সদ্বস্তু হ'ত তা'হলে এখানে 'একম্' শব্দটী স্ববিরোধী হ'ত ;—যেমন 'সস্ত্রীক এক ছিল' ব'ল্লে হয়! তাই ছান্দোগ্যোপনিষদে দেখা যায়, ভূমার পরিচয়ে নারদ জিজ্ঞাসা ক'রছেন—ভূমা কিসে প্রতিষ্ঠিত? উত্তরে সনৎকুমার ব'ল্লেন—স্বীয় মহিমায় ;—'স্বে মহিম্নি।' এই 'স্বে মহিম্নি' আর স্বধা একই। তারপর সনৎকুমার নিজেই ব'ল্লেন, যদি তুমি জানতে চাও ভূমা কিসে প্রতিষ্ঠিত, তবেই ঐ উত্তর; ঠিক ঠিক যদি শুনতে চাও, তবে—ভূমা কোন মহিমাতেই প্রতিষ্ঠিত নয়,—'ন মহিম্নি।' কেন না, সর্ব্বাশ্রয়ের আবার আশ্রয় কি? কাজেই, 'স্বধা' বা 'স্বে মহিম্নি' পরমার্থতঃ কিছুই নয়—ভেল্কিই। তাই ঐ সূক্তে ঋষি সঙ্গে সঙ্গেই ব'লছেন—তাহা ব্যতীত কিংবা তাহার বাহিরে আর অন্য কিছুই ছিল না। ইনিই যদি সগুণ ব্রহ্ম হন, তা হ'লে চরম বিশ্লেষণ নির্গুণ ব্রহ্মকে অতিশয়োক্তি বা নিরর্থক বলতে হয়—আবার যে অদ্বৈতবাদ বেদের গৌরব মুকুটস্বরূপ, তাও খ'সে পড়ে! ঋষি আবারও ব'লছেন, 'যিনি পরব্যোমের অধ্যক্ষ তিনিই ইহা জানেন অথবা জানেন না।' এখানে 'পরব্যোমাধ্যক্ষ' কথার অর্থ—'দেশকাল বস্তু দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন পরমজ্ঞাতৃপদে প্রতিষ্ঠিত।' যদিও সগুণব্রহ্ম মায়াতীত অর্থাৎ দেশকাল বস্তুর বাইরে নন তথাপি কিন্তু এখানে পরব্যোমাধ্যক্ষকে দেশকালবস্তুদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন পরমজ্ঞাতৃপদে প্রতিষ্ঠিত বলায়, আরও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে—নির্গুণব্রহ্ম মায়ার কৌশলে প্রথমেই যে পরমপুরুষ বা পরমজ্ঞাতৃভাবে অভিব্যক্ত হন, এখানে ঋষি তাঁরই কথা ব'লছেন। এখন তিনিও যাঁকে হয়তো জানেন, নয়তো জানেন না, কে সেই 'জ্ঞানস্বরূপ' যাঁকে জানার আর দ্বিতীয় জ্ঞান নেই? আর ঋষি যখন ব'লছেন, সেই এক তপের মহিমায় প্রকট হ'য়েছিলেন, তখন এখানে নির্গুণ ছাড়া যে সগুণ আদপেই বিবক্ষিত নয়, তা তো খুবই সহজ উপলব্ধি। কেন না, নির্গুণব্রহ্ম মায়ার কৌশলে ব্যক্ত হ'লে তবেই তো সগুণের সত্তা? সগুণ তো আর নিজের স্রষ্টা নিজে নয়! শ্রুতি ব'লছেন—ব্রহ্ম নিজেকেই নিজে উৎপন্ন ক'রলেন—'তদাত্মানং স্বয়মকুরু।' শ্রুতি ব্রহ্মকেই যে নিমিত্তোপাদন দুই কারণই ব'লেছেন, তা সগুণ ব্রহ্মে কোন রকমেই সঙ্গত হয় না। সগুণব্রহ্ম নিজে কেবল

নিমিত্ত কারণ; তিনি প্রকৃতির উপাদান নিয়ে সৃষ্টি করেন। কিন্তু নির্গুণব্রহ্ম মায়ার কৌশলে নিজেই দুই ভাবে অভিব্যক্ত হন ব'লে তিনি একাই নিমিত্তোপাদান দু'ই। তাই নির্গুণব্রহ্মই অভিন্ননিমিত্তোপাদান কারণ; এবং মায়ার কৌশলে বা অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিবলে স্ব-স্বরূপেই সৃষ্টি দর্শন করান। একেই দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ বলে। গীতায় কৃষ্ণ ব'লছেন, 'আমার প্রকৃতিদ্বয়ই যা কিছু সব সৃষ্টি করে; কিন্তু আমিই জগতের উৎপত্তি ও লয়ের কারণ।' আর এই জন্যই কৃষ্ণকে 'সর্ব্বকারণ-কারণম্' বলা হয়। গীতা প্রকৃতি-পুরুষ যে 'অনাদি' ব'লেছেন, তার অর্থ 'আদি নেই' নয়; প্রকৃতি-পুরুষ, পরমার্থতঃ দুয়ের কোনই কারণ নেই —তাই অনাদি। আর পরব্রহ্ম প্রকৃতি-পুরুষ দুয়ের পূর্ব্বসিদ্ধ অধিষ্ঠান বলে—'অনাদিমৎ।' কৃষ্ণকেও তাই 'অনাদিরাদিগোবিন্দঃ' বলা হয়। নির্গুণব্রহ্মকে অনাদিরও আদি না বল্লে অদ্বৈতবাদ ব্যর্থ হয়। তাই আচার্য্য শঙ্কর নির্গুণব্রহ্মকেই মূল স্রষ্টা ব'লেছেন। শঙ্করের অসাধারণত্বই তাঁর অধ্যাসবাদমূলক অদ্বৈতবাদ। নির্গুণব্রহ্মকে কারণ ব'ল্লে তিনিও যে কার্য্য-কারণ-ভাবের নিয়ম অনুসারে অন্য কিছুর কার্য্য হবেনই, একথা বলা চলে না;—তাতে 'অনবস্থা দোষ' হয়। তা ছাড়া, নির্গুণ ব্রহ্ম যখন পরমার্থতঃ কারণ নন, কেবল মায়ার কৌশলে স্বয়ংই অভিব্যক্ত হন, তখন অবশ্য তাঁর অভিব্যক্তির পর হ'তেই কার্য্য-কারণ-ভাবের নিয়ম সুরু হয় ব'লতে হবে;—যেমন, নির্গুণ হ'তে গুণোৎপত্তির পর,—গুণাগুণেষু বর্ত্তন্তে। নির্গুণব্রহ্ম যখন সকলেরই পর, তখন 'কেন' শব্দটী তাঁর প্রতি প্রয়োগ করা চলে না;—তিনি এ সব যা কিছুর বাইরে বলেই—'সর্ব্বপর'। ব্যাসও 'সর্ব্বধর্ম্মোপ-পত্তেশ্চ' সূত্রে এই কথাই ব'লেছেন।

কৃষ্ণ 'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাম্' বাক্যে স্বমুখে নিজেকেই তুরীয় ব্রহ্মের সাক্ষাৎ প্রকাশ বলায় তাঁর তুরীয়ত্বে কোন বিবাদ রহিল না বটে; কিন্তু উপনিষদ্, ব্রহ্মসূত্র ও গীতা, এই প্রস্থানত্রয় এক বাক্যে নির্গুণোপাসনাকে শ্রেষ্ঠ বলায় মানুষরূপধারী কৃষ্ণের উপাসনায় নির্ব্বিবাদ হওয়া যায় কৈ? এখন এই সমস্যারই সমাধান দেখা যাক্।

কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে দিব্যচক্ষু দেওয়ার পর, অর্জ্জুন তাঁর দিব্যচক্ষে দেখলেন—কৃষ্ণ তুরীয়ও বটেন, সমষ্টি-ব্যষ্টি-কূটে অবস্থিত সগুনব্রহ্ম ও প্রত্যগাত্মাও বটেন; বিশ্বরূপ বিরাট্ও বটেন, আবার সাধুদের পরিত্রাণ, অসাধুদের বিনাশের জন্য মানুষের রূপ ধরে স্বয়ংই আমার সম্মুখে উপস্থিতও বটেন। কাজেই নির্গুণোপাসনা শ্রেষ্ঠ হলেও, কৃষ্ণ যখন স্বয়ংই তিনি, তখন কি আর মানুষরূপ ধ'রলেও কৃষ্ণের উপাসনা ও অক্ষর-অব্যক্তোপাসনার ফলের কোন পার্থক্য হ'তে পারে? তাই অর্জ্জুন ঐ দুই উপাসনার কথাই জিজ্ঞাসা করায় উত্তরে কৃষ্ণও 'অব্যক্তোপাসকও আমাকেই পায়, কিন্তু আমার উপাসককে আমিই মৃত্যুসংসার সাগর হ'তে অচিরেই উদ্ধার করি' বলিলেন। 'অব্যক্তের উপাসনা দুঃখের' বলায়, নির্গুণোপাসনা গীতার মতেও শ্রেষ্ঠ হলেও, মানুষরূপধারী কৃষ্ণের উপাসনাই গীতার মত। আর কৃষ্ণ মানুষরূপ ধরলেই অর্জ্জুন যখন তাঁকেই লক্ষ্য ক'রে ব'লছেন 'আপনাকে' এবং কৃষ্ণও মানুষরূপ ধ'রেই ব'লছেন 'আমাকে', তখন এখানে কৃষ্ণের মানুষরূপ ছেড়ে তাঁর অন্য আর কোন রূপের কল্পনা করলে তাতে 'প্রত্যক্ষহানি দোষ' হয়।

গীতা যে কৃষ্ণের ব্যক্ত মনুষ্যরূপেরই উপাসনা ক'রতে ব'লছেন, তা 'সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে একমাত্র আমাকেই শরণ গ্রহণ কর' এই বাক্য হ'তে আরও সুস্পষ্ট বোঝা যায়। কেন না, তিনি অর্জ্জুনকে যে সর্ব্বধর্ম্ম ত্যাগের কথা

ব'লছেন, অর্জ্জুনের সেই সর্ব্বধর্ম্ম ভাল রকমই জানা ছিল; নতুবা কৃষ্ণের অর্জ্জুনকে সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রতে বলা নিরর্থক হ'য়ে পড়ে। কৃষ্ণ গীতায় যে সব ধর্ম্মের কথা পূর্ব্বে অর্জ্জুনকে বলেছেন,—তা বাদ দিলে, প্রকৃত ধর্ম্ম নামের যোগ্য আর কি এমন ধর্ম্ম অবশিষ্ট থাকে—যাকে লক্ষ্য ক'রে সর্ব্ব-ধর্ম্ম ত্যাগ করতে ব'লবেন? বিশেষতঃ একই বক্তা যেখানে বহু মত বলেন, সেইখানে সবশেষে তিনি তাঁর নিজের মতটী ব'লবার সময়ে 'সব ছেড়ে এইটাই কর' এই রকমই ব'লে থাকেন; নতুবা তা একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক হয়। কাজেই এখানে 'সর্ব্বধর্ম্ম' কথাটীর অর্থ—গীতায় যে সব ধর্ম্ম কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে পূর্ব্বে বলেছেন। অর্থাৎ নির্গুণো-পাসনা, সগুণব্রহ্মোপাসনা, প্রত্যগাত্মোপাসনা, বিশ্বরূপোপাসনা, দেবোপাসনা, যাগ যজ্ঞ যত কিছু পরমেশ্বরকে লাভের উপায়—তৎসমুদয়ই। পূর্ব্ব-কথিত গীতার উক্ত সব ধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রলে কি এমন ধর্ম্ম বাকি থাকে,—যাকে লক্ষ্য ক'রে কৃষ্ণ ব'লছেন 'এক মাত্র আমাকেই শরণ গ্রহণ কর'? এখানে যে কৃষ্ণ 'সর্ব্বগুহ্যতম আমার পরম বাক্য শোন' ব'লছেন, তা কি—'মানুষ হয়ে সাক্ষাৎ ভগবান্ হ'তে পারে' এইটী বিশ্বাস করান খুবই কঠিন ব'লে নয় কি?—আর এই জন্যেই তো—'আমার জন্মকর্ম্ম অলৌকিক, দেব-ঋষিও তা জানে না' ব'লেছেন! আবার যে—'আমি সত্য প্রতিজ্ঞা ক'রে ব'লছি, তুমি আমাকেই পাবে' ব'ল্লেন, এরও অভিপ্রায় কি—'মানুষের আকার ধ'রেছি ব'লে তুমি আমাকে সন্দেহ ক'র না —আমি সত্য প্রতিজ্ঞা ক'রে ব'লছি এ হ'তে তুমি আমার যা অব্যয় অনুত্তম ভাব তাই পাবে' এই নয়? কেন না, কৃষ্ণ তো মানুষরূপে অর্জ্জুনের অপ্রাপ্ত নন! ফল কথা, কৃষ্ণ যদি এখানে তাঁর ব্যক্ত মানুষরূপেরই উপাসনার কথা না ব'লবেন, তবে তো গীতার—'আমার জন্মকর্ম্ম অলৌকিক', 'আমার বহু জন্ম অতীত হ'য়েছে', 'সুরগণ ও মহর্ষিগণও আমার জন্ম জানে না', 'আমার অব্যয় অনুত্তম পরমভাব না জেনে অব্যক্ত আমাকে অবুদ্ধেরা ব্যক্তিভাবাপন্ন মনে করে', 'যোগমায়া-সমাবৃত থাকায় আমি সকলের নিকট প্রকৃত স্বরূপে প্রকাশ পাই না, তাই এই মূঢ়রা আমাকে অজ অব্যয় ব'লে জানতে পারে না', 'আমার ভূতমহেশ্বর পরমভাব জানতে না পারায় মূঢ়গণ মনুষ্যরূপধারী আমাকে অবজ্ঞা করে', 'মায়ার দ্বারা অপহৃতজ্ঞান আসুর ভাব আশ্রয়কারী দুষ্কৃতিসম্পন্ন মূঢ় নরাধম আমাকে ভজনা করে না', 'কিন্তু দৈবীপ্রকৃতি আশ্রয়কারী মহাত্মাগণ আমাকে ভূতগণের আদি ও অব্যয় জানিয়া অনন্যমনে ভজনা করে', এই সব বাক্য নিরর্থক হয়। বাস্তবিক নামরূপাদি কতকগুলি গুণের আরোপপূর্ব্বক ব্রহ্মের যে কাল্পনিক সগুণভাব, তা তো স্বরূপতঃ এক রকম নির্গুণই—মাত্র নামেই সগুণ। কাজেই, মনুষ্য-রূপধারী জীবন্ত প্রত্যক্ষ ঈশ্বরই ব্রহ্মের সগুণরূপ। আর কৃষ্ণও ব্রহ্মের অংশ বা বিভূতি নন, তিনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মই। কৃষ্ণ, সগুণভাবে নির্গুণ ব্রহ্মের চরম অভিব্যক্তি। ব্রহ্মসূত্রকার 'জগদ্ব্যাপারবর্জ্জম্' সূত্রে মুক্তপুরুষদের সঙ্গে যে নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরের পার্থক্য উল্লেখ ক'রেছেন, সেই নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বর-ভাবে মানব-ভূমিকায় পরব্রহ্মই কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ। তাই ঈশ্বর-প্রেম সম্ভোগেচ্ছু মুক্ত পুরুষেরাও কৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি ক'রে থাকেন। আবার, মনুষ্যরূপে ব্যক্ত হ'লেও, কৃষ্ণের ব্যক্তভাব যে সাধারণ নয়, তা কৃষ্ণই—'নারদ, তুমি আমার যে রূপ দেখছ তা আমার মায়া; তাই ব'লে তুমি এমনও বুঝো না, সমস্ত ভূতের গুণের দ্বারা আমি যুক্ত,' এই বাক্যে স্পষ্ট ক'রে ব'লেছেন। ভাগবতে ব্রহ্মা কৃষ্ণকে ব'লেছেন—'আপনার এই শ্রীমূর্ত্তি ভূতময় নয়—স্বেচ্ছাময়।' অবশ্য যাঁরা উত্তম অধিকারী—যাঁরা কৃষ্ণের অব্যয় অনুত্তম পরম ভাবের উপাসনা

ক'রতে সক্ষম, তাঁরা তো আপন শক্তিতেই উদ্ধার হবেন। কিন্তু যারা অধম অধিকারী—যারা অর্জ্জুনের মত সকল দিকেই দিশেহারা, তাদের তো —'নাস্ত্যেব গতিরন্যথা!' তবে ব্যাস যে ব'লেছেন —'ন প্রতীকে ন হি সঃ', তা কিন্তু কৃষ্ণকে বাদ দিয়ে! তাই ব্যাস নিজেই ব'লেছেন—'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।' আগুনে হাত জেনে দিলেও পুড়বে, না জেনে দিলেও পুড়বে। তাই ব্রজগোপীদের কৃষ্ণে ঈশ্বরবুদ্ধি না থাকলেও, কেবল দ্রব্যগুণেই উদ্ধার হয়েছিল। এখন এ সম্বন্ধে কথা এই—অর্জ্জুনের জন্যেই যখন গীতা-প্রচার এবং কৃষ্ণও অর্জ্জুনকে 'যা তোমার পক্ষে হিতকর আমার সেই সর্ব্বগুহ্যতম পরম বাক্য শোন' ব'লে সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে একমাত্র আমাকেই শরণ গ্রহণ কর' ব'লছেন, তখন কৃষ্ণের ব্যক্ত মনুষ্যরূপেরই উপাসনা কি গীতার শিক্ষা নয়?

স্বামী বিবেকানন্দ ব'লেছেন—"আমরা জানি, আরম্ভ জানিতে পারিলে আমরা পরিণামও জানিতে পারিব। এইরূপ, অন্ত জানিতে পারিলেই আদি জানিতে পারিব। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে ইহা নিশ্চয় যে এ সমুদয় ক্রমবিকাশশীল জীব প্রবাহের এক প্রান্ত জীবাণু, অপর প্রান্ত পূর্ণ মানব। অন্তে পূর্ণমানবকে দেখিতেছি, সুতরাং আদিতেও যে তিনি অবস্থিত ইহা স্বতঃসিদ্ধ। জীবাণু হইতে উহার আরম্ভ এবং পূর্ণমানবে সমাপ্তি। অতএব আদির ঐ জীবাণু অবশ্যই উচ্চতম চৈতন্যের ক্রমসঙ্কুচিত অবস্থা। আর যখন ঐ চৈতন্য ক্রমবিকাশবাদীদের মতে, সৃষ্টির শেষ বস্তু হইল, তাহা হইলে চৈতন্যই আবার সৃষ্টির নিয়ন্তা—সৃষ্টির কারণ হইবেন। আদিতে সেই অনন্ত বিশ্বব্যাপী চৈতন্য ছিলেন। সেই বিশ্বব্যাপী চৈতন্যকেই লোকে প্রভু, ভগবান, খৃষ্ট, বুদ্ধ বা ব্রহ্ম বলিয়া থাকে। সেই পুরুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিবিম্ব—'পূর্ণমানব'। ইঁহাদের উপাসনা অবশ্যই করিতে হইবে। তাঁহারা অনন্ত আত্মার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশস্বরূপ। আপনি, আমি, ঈশ্বর সম্বন্ধে যে কোন ধারণা করি না কেন, ইঁহারা তাহা হইতে উচ্চতর; একজন পূর্ণ-মানব এই সকল ধারণা হইতে শ্রেষ্ঠতর। ঈশ্বর সম্বন্ধে তুমি আমি যতটা ধারণা করিতে পারি, তাহা অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণ অনেক বড়। আমরা আমাদের মনে যতদূর উচ্চ আদর্শের চিন্তা করিতে পারি, বুদ্ধ তদপেক্ষা উচ্চতর আদর্শ, জীবন্ত আদর্শ। সেই জন্যই সর্ব্বপ্রকার কাল্পনিক দেবতাকেও পদচ্যুত করিয়া তাঁহারা চিরকাল মানবের পূজা পাইয়া আসিয়াছেন। 'কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও খ্রীষ্টের ন্যায় মনুষ্যের উপাসনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা।"

স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভৌমিক, বি-এল্

স্বার্থের লোলুপ জিহ্বা লেলিহান আজি চারিভিতে
অপরেরে রিক্ত করি চায় নিজে সব লুঠে নিতে।
অবিচার, অত্যাচার, নির্ব্বিচারে পর-নিপীড়ন
করি, দুর্ব্বলের রক্ত অকাতরে করিছে শোষণ।
হরিয়া মুখের গ্রাস সর্ব্বহারা ক্ষুধাক্লিষ্ট জনে
মৃত্যুমুখে দিতে ডালি, প্রাণে কিছু সঙ্কোচ না মানে;
মদগর্ব্বিত বলদর্পীরা সবে করে কাড়াকাড়ি
অবারিত বসুধায় নিতে নিজ কুক্ষিগত করি।
রক্ষকের বেশে সাজি গর্ব্বোদ্ধত অবিচার
সকল মানবে হায় করিয়াছে পশু নরাকার!
"ত্যাগে শান্তি" ভারতের শাশ্বত যে মরমের বাণী
ভোগের দুর্ব্বার লোভ আনিয়াছে তাতে হীন গ্লানি।
তোমার উদাত্ত বাণী ঐশ্বর্য্যের মোহের কুহকে
ভুলি ফেরে নিরন্তর ধরিবারে মরীচিকা সুখে।
তুমি বলেছিলে দেব, পূজিবারে জীবরূপী শিবে,
সর্ব্বভূতগুহাবাসী, অন্য কোথা তাঁরে খুঁজে পাবে।
বহুরূপে নিত্য প্রভু ফিরিছেন ধরণী ধূলায়
বলেছিলে কায়মন অর্পণ করিতে তাঁর পায়।
বিভ্রান্ত জগতে লুপ্ত ন্যায়, সত্য, ধর্ম্ম-দীপ্তশিখা;
আঁধারে দেখাতে পথ কে জ্বালিবে জ্ঞানের বর্ত্তিকা?
শাশ্বত ধর্ম্মের তেজে তেজোদৃপ্ত তুমি মহীয়ান্,
ভারতের বুকে পুনঃ সঞ্চারিত কর নব প্রাণ।
বিশ্বজয়কারী সেই অনুপম বীরসাজে সাজি,
দুষ্কৃত নাশন তরে অরিন্দম, এস তুমি আজি।

সমালোচনা

Life Beyond Death (মৃত্যুর পর জীবন)—'অধ্যাত্মরহস্য' ও 'জীববাদ' ('Mystery of Psyche and Spiritualism') বিষয়ে সমালোচনাপূর্ণ গবেষণাগ্রন্থ। স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত। শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ হইতে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী, এ্যান্টিক্ কাগজে ছাপা, ২৯৩ পৃষ্ঠায় পূর্ণ। স্বামী অভেদানন্দজীর সুন্দর প্রতিকৃতি ও কয়েকটি ছবি-সম্বলিত। পরিপাটী বাঁধাই। মূল্য ৬৷৷০ টাকা মাত্র।

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজ যুগাবতার শ্রীশ্রীঠাকুরের শিষ্য এবং অন্তরঙ্গ ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ হইতে সুদূর প্রতীচ্যে, বিশেষতঃ আমেরিকায় তিনি সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসর ধরিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের 'বাণী' এবং বেদান্ত প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। এই দীর্ঘ কালের মধ্যে তিনি ইংলণ্ড ও আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে বহু বক্তৃতাদি করিয়া বেড়াইয়াছেন। এই সকল বক্তৃতায় তিনি যে কেবল শ্রীভগবানের 'বাণী' ও বেদান্তের কথাই বলিয়াছেন, তাহা নহে, অন্যান্য অবশ্য জ্ঞাতব্য বহুবিধ বিষয়ের উপরও চিন্তাশীল বক্তৃতা করিয়াছেন। অধ্যাত্ম-রহস্য, জীববাদ, মৃত্যুর পরবর্ত্তী জীবন বিষয়েও তিনি বহু বক্তৃতা দিয়াছেন। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থখানি তাঁহার ঐ সকল ভাষণ হইতে সংগৃহীত এবং "অভেদানন্দ-স্মৃতি"-গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ডরূপে প্রকাশিত।

গ্রন্থখানি ষোলটী অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। প্রত্যেক অধ্যায়ই অভেদানন্দজীর এক একটী বক্তৃতা। এই বক্তৃতাগুলি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, প্রাচীন ও নবীন মত-বাদসমূহের বৈজ্ঞানিক ও বৈদান্তিক সমালোচনায় পূর্ণ, গভীর গবেষণায় সমুজ্জ্বল। অধ্যাত্মতত্ত্ব কি, জীববাদ কাহাকে বলে, জড়বাদ ও জীববাদের প্রভেদ, জীববাদের শ্রেষ্ঠত্ব, মৃত্যু কাহাকে বলে, মানুষের মৃত্যুর স্বরূপ কি, মৃত্যু বিষয়ে বৈজ্ঞানিক ও বৈদান্তিক তথ্যকথা, মৃত্যু ও উৎক্রান্তি, মৃত্যুর পরে জীবের অবস্থা, উৎক্রান্তি ও পরলোক, দক্ষিণ ও উত্তর (বাম) পথ, পরলোকে বিশ্বাসের কথা, পর-লোক-গতি ও জন্মান্তর গ্রহণ, 'প্রেত্যভাব' ও 'পুন-র্মৃত্যু,' কর্ম্মবাদ ও পুনর্জ্জন্ম, কর্ম্মবাদের বৈজ্ঞানিক রহস্য, প্রেত্যভাবের পর্য্যবেক্ষণ ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা, 'মধ্যস্থ' অবলম্বনে প্রেতাবির্ভাব, বৈজ্ঞানিক মতবাদে ইহার স্বীকৃতি, বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের বৈদান্তিক সমালোচনা, মৃতব্যক্তিবিশেষের আনয়ন, ৺বলরামবাবু (বসুর) আগমন, ৺যোগানন্দ স্বামীর আবির্ভাব ও তৎকর্তৃক 'শ্লেট্-লিখন,' ভণ্ড-মধ্যস্থের কথা, মধ্যস্থ হওয়ায় আধ্যাত্মিক অকল্যাণ, প্রভৃতি বহুবিধ বিষয় প্রকাশিত বক্তৃতাগুলির গর্ভে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই সকল প্রসঙ্গে স্বামীজী নিজ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষার কথাও সরল প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

বেদ-বেদান্ত, আবেস্তা-বাইবেল, পুরাণ-কোরাণ প্রভৃতি প্রাচীন, তথা অর্ব্বাচীন কালের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক সাহিত্যে অধ্যাত্মতত্ত্ব, জীববাদ এবং জীবের প্রেত্যভাব বিষয়ে যে সকল কথা, কাহিনী ও পরীক্ষার ব্যাখ্যা আছে, বৈজ্ঞানিক ও বৈদান্তিক দৃষ্টিতে তিনি তৎসমুদয়ের পর্য্যালোচনা প্রতীচ্য বিদ্বৎসমাজে পরিবেশন করিয়াছেন।

প্রকাশিত বক্তৃতাগুলিতে তিনি দেখাইয়াছেন, প্রতীচ্যে অতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক

চিন্তার ধারা উত্তরোত্তর কেমন নিশ্চিত ভাবে বেদান্তের দিকে ঢলিয়া পড়িতেছে। জড়বাদীর মতে, এই বিচিত্র-বিশাল বিশ্ব অপ্রাণ পরমাণু-পুঞ্জের অবুদ্ধি-পরিচালিত আকস্মিক সঙ্ঘাত মাত্র।

বৈদান্তিক স্বামীজী ইহার তীব্র সমালোচনা করিয়া বৈজ্ঞানিক সমাজে সদম্ভে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, বিশ্বরচনার পশ্চাতে একটি 'ঈক্ষণ' বা 'অভিসন্ধি'র সমাচার পাওয়া যায়। অতএব কেবল তমগুণান্বিত অন্ধ অপ্রাণ জড়বর্গ এই বৈচিত্র্যপূর্ণ বিশাল বিশ্বের মূলীভূত কারণ হইতে পারে না। সৃষ্টির আদিতে একমাত্র পরমাত্মাই ছিলেন। তাঁহারই 'ঈক্ষণ' হইতে এই বিশাল বিরাট বিশ্বের আবির্ভাব।

জড়বাদী বলেন, 'প্রাণ' ও 'মন' (life and mind) জড়বর্গের বিভিন্ন বিপরিণাম হইতে অবান্তর উদ্ভাবন মাত্র (merely products of matter)।

বৈদান্তিক দেখাইলেন, চিন্ময়ী প্রাণশক্তির 'প্রচেষ্টা' হইতে গুণান্বিত জড়কণার অভ্যুদয়। বৈচিত্র্যপূর্ণ এই বিরাট বিশ্ব, এই সমস্তই সগুণে নিগূঢ়া চিন্ময়ী প্রাণশক্তির লীলা-বিলাসের বিপরিণাম।

জড়বাদী দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তন্মতে দেহের নাশে চৈতন্যের বিলোপ অবশ্যম্ভাবী। আর তথাকথিত যে চিন্তা, তাহা যকৃৎ হইতে পিত্তের ন্যায় মস্তিক হইতে নিঃসৃত হইয়া থাকে মাত্র।

তিনি দেখাইয়াছেন, দেহের নাশে আত্মার বিনাশ কোথায় সম্ভবে? আত্মা যে অজর, অক্ষর, অমর বস্তু। জীবের প্রাণাদির উৎক্রান্তিতে দেহেরই বিনাশ দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমাদের এই যে দেহ ইহা অশরীরী আত্মার অধিষ্ঠান মাত্র। শরীর চিৎসম্বিৎ নহে, বরং চিৎসম্বিৎই স্বীয় করণ হিসাবে শরীর নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। আর মস্তিষ্ক করণ মাত্র। স্বামীজী ব্যাখ্যা করিয়াছেন—সৃষ্টি-প্রক্রিয়ায় সেই পরমাত্মা হইতেই এই বিচিত্র জগৎ ও বিবিধ জীব আবির্ভূত ও কল্পান্তে তিরোহিত হয়।

এই প্রসঙ্গে তিনি বিশ্বের বিভিন্ন জাতির ইতিহাস ও ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে স্বর্গ-নরকাদি পারলৌকিক বিষয়ে তাঁহাদের জ্ঞান ও বিশ্বাসের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণী সকল প্রদান করিয়াছেন, তাহা যেমন সুখপাঠ্য তেমনই উপাদেয়।

জীবের জন্মপ্রসঙ্গে স্বামীজী বুঝাইয়াছেন, চিদাত্মা ব্রহ্ম হইতে চিদংশ জীব ব্যবহারে আত্মভেদ-সিদ্ধির জন্য দেহ ধারণে দেহি-পদবাচ্য হইয়া থাকেন। স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ ভেদে এই দেহীই যথাক্রমে শরীরাত্মা, তৈজসাত্মা এবং প্রাজ্ঞ নামে অভিহিত। শরীর জীর্ণ হইলে দেহী নাভিশ্বাসী হইয়া এই স্থূল দেহ পরিত্যাগ করে; ইহাই মৃত্যু।

কিন্তু দেহী অজর, অক্ষর, অমর। অতএব দেহেরই মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুকালে জীবের ইন্দ্রিয়শক্তি ও প্রাণ হৃদয়ে পুঞ্জীভূত হইলে, ইহা প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। এই দীপ্তিতে জীব নবদ্বারী দেহের কোনও একটি দ্বার দিয়া উৎক্রমণ করে। উৎক্রান্ত জীবের সহিত তাহার স্বোপার্জ্জিত বিদ্যা, অতৃপ্ত বাসনা এবং সুকৃতিদুষ্কৃতি তাহাদের সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ দেহকে আশ্রয় করিয়া চলিয়া যায়।

কিন্তু জীব যায় কোথায়?—এই প্রসঙ্গে তিনি বুঝাইয়াছেন, ব্রহ্ম-বিজ্ঞানী জীবন্মুক্তের দেহপাতে তাঁহার প্রাণাদির উৎক্রমণ নাই। তাঁহার প্রেত্যভাব কোথা হইতে আসিবে?—ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মই হইয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহার পরলোকগতি বা প্রাণাদির উৎক্রমণের সম্ভাবনা আদৌ নাই।

এই প্রসঙ্গে এই কথা বলিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, জীবন্মুক্তের প্রেত্যভাবের পর পরমাত্মপ্রাপ্তির কথা ও উদাহরণ শাস্ত্রে

আছে। কিন্তু স্বামীজী তাহা স্বীকার করেন না। শতপথব্রাহ্মণে আছে, 'আমার আত্মা প্রেত্যভাবের পর সেই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইবেন।' (—১০।৬।৩।২)। উদাহরণ স্বরূপে দেখান যাইতে পারে যে, জীবন্মুক্ত বামদেব দেহভেদান্তে ঊর্দ্ধলোকে গমন করিয়া (শরীরভেদাৎ ঊর্দ্ধম্ উৎক্রম্য) অমুক লোকে পরমাত্মা বা অমৃত লাভ করিয়াছিলেন। (—ঐতরেয় ২।৪)।

সে যাহা হউক, স্বামীজীর মতে জীবন্মুক্ত ব্যতীত অন্যলোক স্বোপার্জ্জিত বিদ্যাদি লইয়া পরলোক গমন করে এবং নিজ নিজ কর্ম্মানুরূপ দেহ পরিগ্রহ করিয়া থাকে। পিতৃলোক, গন্ধর্ব্বলোক প্রভৃতি বহুবিধ লোকের কথা শাস্ত্রে আছে। এই সকলের মধ্যে কোনও একটীতে জীব নিজকর্ম্মানুরূপে গমন করে। জলোকার ন্যায় জীব অন্য আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বটী হইতে আপনাকে সংস্থত করিয়া থাকে। এই সকল লোকে কর্ম্মানুরূপ ফলভোগ শেষ হইলে জীব পুনরায় যে ইহলোক হইতে মহাপ্রয়াণ করিয়াছিল, তাহাতেই প্রত্যাগমন করে। ইহাই —"পুনর্জন্ম।"

স্বামীজীর মতে মানুষ স্বীয় কর্ম্মবিপাকে জন্মান্তর গ্রহণ করিলেও মনুষ্যাপেক্ষা নিকৃষ্ট যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করে না। কিন্তু শাস্ত্রে মানুষের নিকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণের কথা আছে। মুণ্ডক উপনিষদে (১।২।১০) আছে, "ইমং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি।"—অর্থাৎ স্বর্গলোকে ভোগের দ্বারা পুণ্যকর্ম্ম ক্ষয়িত হইলে, জীব ইহলোকে বা তদপেক্ষা হীনতর লোকে প্রবেশ করিয়া থাকে।

কোন কোন ধর্ম্মমতে মৃত্যুর পর হয় অক্ষয় স্বর্গ, না হয় অনন্ত নরক। কিন্তু এই মতবাদ স্বামীজী তীব্রভাবে খণ্ডন করিয়াছেন।

এইরূপে তিনি দেখাইয়াছেন, জড়বাদীর মতে জীবের মৃত্যুতে শ্মশানে তাহার যে সমস্তই ফুরাইয়া যায় তাহা নহে। বিশেষতঃ মৃত ব্যক্তির প্রেত্যভাব, তাহার পুনরাবির্ভাব প্রভৃতি যাহা অধুনাতন কালে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহাই জড়বাদের মূলে শাণিত কুঠারাঘাত করিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ, বেদান্তচিন্তামণি

চার পুণ্যস্থান—শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ প্রণীত। প্রকাশক—মহাবোধি সোসাইটি, ৪এ বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি-অধ্যাপক ডাঃ বেণীমাধব বড়ুয়া লিখিত 'মুখবন্ধ' সম্বলিত। ৯৪ পৃষ্ঠা, বাঁধান মূল্য ১৲ টাকা।

গ্রন্থকার সুলেখক, আজীবন সাহিত্যসেবী ও তীর্থপর্যটক। ভারতের তীর্থসম্বন্ধে তাঁহার উপাদেয় গ্রন্থখানি ইতিপূর্বেই পাঠকদের প্রিয় হইয়াছে। সমালোচ্য পুস্তকে লুম্বিনী, বুদ্ধগয়া, সারনাথ ও কুশীনগর—এই চারি বৌদ্ধ তীর্থের তথ্যপূর্ণ বিবরণ আছে। লুম্বিনী ভগবান বুদ্ধের জন্মস্থান, বুদ্ধগয়া তাঁহার বুদ্ধত্বলাভের স্থান, সারনাথ তাঁহার ধর্মচক্র প্রবর্তনের স্থান এবং কুশীনগর তাঁহার মহাপ্রয়াণের স্থান। সম্রাট অশোক রাজ্যাভিষেকের পরে আচার্য উপগুপ্তের সহিত এই তীর্থচতুষ্টয় পরিদর্শন করিয়া সেই সকল স্থানে শিলাস্তম্ভ নির্মাণ করেন। এই চার পুণ্যস্থানে যে সকল দর্শনীয় ও স্মরণীয় বস্তু আছে তাহাদের সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক তথ্য এই পুস্তকে প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণিত। তীর্থযাত্রীর পক্ষে ইহা অবশ্যপাঠ্য। ১২।১৩ খানি চিত্র থাকায় বইখানি সুখপাঠ্য হইয়াছে। কিন্তু, চিত্র-সূচী ও বিষয়-সূচীর অভাবে পাঠকের অসুবিধা হইবে। রাজগৃহ ও অন্যান্য প্রধান বৌদ্ধতীর্থের বর্ণনা ইহার অন্তর্ভুক্ত হইলে বইখানি আরও সুন্দর হইত। হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় পাঠকই ইহা পাঠে উপকৃত হইবেন। পুস্তকের নাম 'চার বৌদ্ধতীর্থ' রাখিলে যথার্থ হইত।

ডাঃ বড়ুয়া মুখবন্ধে দুইটী অপ্রাসঙ্গিক কথা

বলিয়াছেন। যথা (১) "পুরাতন হিন্দু-তীর্থযাত্রার মূলে ছিল, অন্ধবিশ্বাস বা কুসংস্কার।" (২) "বৌদ্ধধর্ম হইতে হিন্দুদিগের মূর্তিপূজার বা পৌত্তলিকতার উদ্ভব হয় নাই, ইহা অবধারিত সত্য।" হিন্দুদিগের অন্ধ বিশ্বাস বা কুসংস্কার নাই—একথা আমি বলি না। কিন্তু বৌদ্ধগণ কি ইহা হইতে মুক্ত?—ইহাই জিজ্ঞাস্য। সিংহল ও বর্মা—এই দুই বৌদ্ধ দেশে কয়েক বৎসর অবস্থান কালে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি—বৌদ্ধগণের অন্ধ বিশ্বাস বা কুসংস্কার হিন্দুগণের অপেক্ষা অনেকাংশে অধিক। ডাঃ বড়ুয়ার দ্বিতীয় মন্তব্য সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, প্রাগ্বৌদ্ধ যুগে হিন্দু-পৌত্তলিকতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেক ঐতিহাসিক সন্দিহান। সুতরাং তাঁহার অবধারিত সত্য সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট সংশয় আছে। তবে বৌদ্ধ যুগে হিন্দুপৌত্তলিকতার উৎপত্তি না হইলেও ইহার যে সমধিক পরিপুষ্টি হইয়াছিল তাহার প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া এই সামান্য সমালোচনাকে দীর্ঘ করিতে ইচ্ছা করি না। মুখবন্ধ-লেখকের এই ভ্রান্ত ধারণাদ্বয় হিন্দু পাঠক-পাঠিকার হৃদয়ে গভীরভাবে আঘাত করিবে।

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি-পূজা—আগামী ২১শে ফাল্গুন, মঙ্গলবার, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একাদশাধিকশততম জন্মতিথিপূজা অনুষ্ঠিত হইবে।

পুরী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব—এই প্রতিষ্ঠানে গত ১০ই মাঘ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রাতে উপনিষৎ পাঠ, পূজা এবং হোম হইলে দ্বিপ্রহরে প্রায় এক হাজার দরিদ্র-নারায়ণ প্রসাদ গ্রহণ করেন। পরদিন প্রাতে শ্রীশ্রীমহাবীরের পূজা, রামনাম সংকীর্তন ও সন্ধ্যায় জনসভার অধিবেশন হয়। ইহাতে পুরী-কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গিরিজা শঙ্কর রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র দেব, শ্রীযুক্ত শ্যামাকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গোলক বিহারী ধল, শ্রীযুক্ত হেমজাকান্ত মৈত্র, শ্রীযুক্ত বাসুদেব মিশ্র ও রায় বাহাদুর শ্রীশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি ইংরাজী বাংলা ও উড়িয়া ভাষায় স্বামীজীর মাহাত্ম্য কীর্তন করেন। ১২ই মাঘ সকালবেলা পূজা ও ভজনের পর স্থানীয় বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রীদের মধ্যে নানাবিধ ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা এবং স্থানীয় বালকদিগের দ্বারা "যুগধর্ম" নামক একটি একাঙ্ক নাটক বিশেষ সমারোহের সহিত পুরী টাউন হলে অভিনীত হয়। এই উৎসব উপলক্ষে স্থানীয় কলেজের ছাত্রদের মধ্যে "বর্তমান ভারতে স্বামী বিবেকানন্দের স্থান" শীর্ষক রচনা-প্রতিযোগিতায় শ্রীমান অমরেন্দ্র নাথ ঘোষ শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া শ্রীযুক্ত কুমুদ বন্ধু সেন প্রদত্ত দশ টাকা পুরস্কার লাভ করিয়াছে।

বাঁকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব—গত ১০ই মাঘ এই প্রতিষ্ঠানে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি উৎসব সম্পাদিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে প্রাতে মঙ্গলারতি, ঊষাকীর্তন, পূজা, হোম ও ভজনাদি, দ্বিপ্রহরে প্রসাদ বিতরণ এবং বৈকালে মঠাধ্যক্ষ স্বামী মহেশ্বরানন্দজীর সভাপতিত্বে একটি সভার অধিবেশন হয়। ইহাতে মঠের কতিপয় সন্ন্যাসী, বাঁকুড়ার জেলা ও সেসন্স্ জজ্ শ্রীযুক্ত অনুকূল চন্দ্র সান্যাল প্রভৃতি স্বামীজীর জীবনী, বাণী ও কার্যাবলী সম্বন্ধে সুললিত ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করিয়া সমবেত নরনারীর প্রাণে উৎসাহ সঞ্চার করেন।

আসানসোল শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব—গত ১৩ই মাঘ এই প্রতিষ্ঠানে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে একটি বিরাট জনসভা হয়।

ইহাতে স্থানীয় কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ অবিনাশ চন্দ্র বসু, এম্‌-এ, পি-এইচ্‌-ডি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। 'আসানসোল হিতৈষী' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত নির্মলপদ চট্টোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী, বার্ণপুরের এডুকেশন্যাল অফিসার শ্রীযুক্ত শশাঙ্কশেখর ভট্টাচার্য, বার্ণপুর বিবেকানন্দ সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্র সেন, ই-আই-রেলওয়ের অফিসার শ্রীযুক্ত শঙ্করীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এবং আশ্রম-সম্পাদক স্বামী মৃত্যুঞ্জয়ানন্দজী স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও আদর্শ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া সকলকে বিশেষ ভাবে মুগ্ধ করেন। সভাপতি মহাশয় অতঃপর পাটনা রামকৃষ্ণ আশ্রম হইতে প্রাপ্ত ১০টি রৌপ্যপদক ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ করেন।

ময়মনসিংহ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম—কিছু দিন হয় স্বামী শর্বানন্দজী ময়মনসিংহ শহরে আগমন করিয়া এই আশ্রম-প্রাঙ্গণে "বর্তমান জাতীয় সমস্যা ও বিবেকানন্দ" এবং স্থানীয় অলকা সিনেমা হলে "বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ" শীর্ষক দুইটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা দান করিয়াছেন। এই আশ্রমে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী ও শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের জন্মতিথি উপলক্ষে পূজা পাঠ ও প্রসাদ বিতরণাদি যথানিয়মে সম্পন্ন হইয়াছে।

মালদহ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব—যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের শুভ জন্মোৎসব উপলক্ষে গত ১০ই মাঘ পূর্বাহ্নে বিশেষ পূজা, হোম ও ভোগাদি হয়। প্রায় চারি শত ভক্ত নর-নারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্নে স্থানীয় কলেজের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে কলেজের এবং বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণের একটি সভা হয়। ইহাতে ছাত্রছাত্রী-বৃন্দ যুগ-প্রবর্তক স্বামীজীর বিভিন্নমুখী প্রতিভা ও অবদান সম্বন্ধে সঙ্গীতে, প্রবন্ধে, আবৃত্তিতে ও বক্তৃতায় উপস্থিত নরনারীদিগকে আনন্দ দান করে। পরবর্তী রবিবার আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী পরশিবানন্দজীর সভাপতিত্বে সাধারণ সভা হয়। ইহাতে স্থানীয় কলেজের দুই জন অধ্যাপক, সেরি-কালচার সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট প্রভৃতি এবং সভাপতি স্বামীজীর জীবন ও বাণী সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দান করেন।

বিবিধ-সংবাদ

কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটিতে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব—এই প্রতিষ্ঠানে গত ১৩ই মাঘ যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি উপলক্ষে এক বিশেষ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। বেলুড় মঠের স্বামী পবিত্রানন্দজী, শ্রীযুক্ত রমণী কুমার দত্তগুপ্ত বি-এল্‌ ও শ্রীযুক্ত সুপ্রকাশ চক্রবর্তী স্বামীজীর জীবনী সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। সভান্তে খড়দহ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের সভ্যগণ সুমধুর শ্রীশ্রীকালীকীর্তন করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দ বর্ধন করেন। পরে প্রসাদ বিতরিত হইলে উৎসব-কার্য শেষ হয়।

খুলনা গীতামন্দিরে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব—শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উপলক্ষে এই প্রতিষ্ঠানে গত ৬ই মাঘ বিশেষ পূজাদি হয় এবং অনেকে প্রসাদ গ্রহণ করেন। একটি মহিলা-শোভাযাত্রা কীর্তনসহ নগর পরিভ্রমণ করে। অপরাহ্নে গীতামন্দির-প্রাঙ্গণে দৌলতপুর কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন মজুমদার, এম্‌-এ মহাশয়ের সভাপতিত্বে আহূত এক মহিলা-সভায় বেলুড় মঠের স্বামী সুন্দরানন্দজী শ্রীশ্রীমার জীবনী ও উপদেশ সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। পরদিন স্থানীয় আর্যধর্মসভা-হলে ইঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে আহূত এক জনসভায় স্বামীজী স্বামী বিবেকানন্দের প্রবর্তিত সেবাধর্মসম্বন্ধে আলোচনা করেন। ৮ই মাঘ উক্ত স্বামীজী দৌলতপুর কলেজে "স্বামী বিবেকানন্দের জাতিগঠন-প্রণালী" সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দিয়াছেন।

হলদিয়া (ঢাকা) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবক সমিতিতে স্বামী বিবেকানন্দের স্মরণোৎসব—গত ১০ই মাঘ হলদিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবক সমিতির উদ্যোগে স্বামীজীর স্মরণোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত লালমোহন সাহা মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি সভার অনুষ্ঠান হয়। ইহাতে ডাঃ শ্রীযুক্ত অনাদি চরণ মিত্র, শ্রীযুক্ত রাধাশ্যাম সাহা ও শ্রীযুক্ত অনন্তলাল সাহা ও সভাপতি মহাশয় স্বামীজীর জীবনী সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

শ্রীরাজপুর শ্রীরাধারমণ সাধনাশ্রমে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি উৎসব—গত ১০ই মাঘ এই আশ্রমে যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব উৎসব যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে বিশেষ পূজাপাঠ, হোম, কীর্তন ও তদীয় লোককল্যাণকর আদর্শ জীবনী আলোচিত হয়। অপরাহ্ণে প্রসাদ বিতরণ ও সন্ধ্যায় সঙ্গীতের একটি জলসা হইয়াছে।

নবপ্রকাশিত পুস্তক

Our Education—(ইংরাজী) স্বামী নির্বেদানন্দ প্রণীত। প্রকাশক বিদ্যামন্দির, ঢাকুরিয়া (২৪ পরগণা)। ১৫৯ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ৩৸০ আনা।

বাঁকুড়ায় দুর্ভিক্ষ সেবাকার্য্য

রামকৃষ্ণ মিশনের আবেদন

বৃষ্টির অভাবে ফসল না হওয়ায় বাঁকুড়া জেলায় দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাবের কথা জনসাধারণ অবগত আছেন। রামকৃষ্ণ মিশন গত সেপ্টেম্বর মাস হইতে ঐ জেলার সদর, গঙ্গাজলঘাটী ও বড়জোড়া থানার ৭৩ খানি গ্রামে সেবাকার্য্য চালাইয়া আসিতেছেন। জানুয়ারীর দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্য্যন্ত মোট ৯৭৮ মণ ১২ সের চাউল, ১৪৬৬ খানি কম্বল, ১৭৪ খানি চাদর, ২০ খানি কাপড় ও ১৭৩০৲ নগদ বিতরণ করা হইয়াছে। সাপ্তাহিক সাহায্যপ্রাপ্ত দুঃস্থগণের সর্বোচ্চ সংখ্যা ২৭০৭ ছিল। এতদ্ব্যতীত প্রায় ৩ পাউণ্ড ২ আউন্স কুইনাইন, ৮০০০ খাদ্যপ্রাণ বড়ি, ২৫০০ মেপাক্রিন বড়ি ও ১৪ সের গুঁড়া দুগ্ধ রোগীদিগের মধ্যে বিতরিত হইয়াছে।

নূতন চাউল উঠার পরও লোকের দুর্দ্দশার বিশেষ হ্রাস হয় নাই। অন্নের ও বস্ত্রের যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে। কিন্তু সম্মুখে আরও ভীষণ সময় আসিতেছে। এদিকে আমাদের দুর্ভিক্ষ-ভাণ্ডারে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ নাই। তাই আসন্ন সঙ্কটকালের সম্মুখীন হইবার জন্য আমাদিগকে বাধ্য হইয়া সাময়িক ভাবে সেবাকার্য্য বন্ধ করিতে হইতেছে। সহস্র সহস্র নরনারীকে মৃত্যুর গ্রাস হইতে রক্ষা করিতে হইলে শীঘ্র আবার কার্য্য আরম্ভ করিয়া ব্যাপকভাবে উহা চালাইতে হইবে।

এইজন্য আমরা সকল সহৃদয় দেশবাসীর নিকট আবেদন করিতেছি, তাঁহারা যেন দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট ভ্রাতাভগিনীগণের সেবাকল্পে অবিলম্বে আমাদিগকে মুক্তহস্তে অর্থসাহায্য করেন। এই উদ্দেশ্যে যিনি যাহা দান করিবেন তাহা নিম্নলিখিত ঠিকানায় সাদরে গৃহীত ও তাহার প্রাপ্তিস্বীকার করা হইবে :—(১) সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা হাওড়া, (২) কার্য্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন কার্য্যালয়, ১নং উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা, (৩) কার্য্যাধ্যক্ষ, অদ্বৈত আশ্রম, ৪নং ওয়েলিংটন লেন, কলিকাতা।

(স্বাঃ) স্বামী মাধবানন্দ
সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন

উদ্বোধন
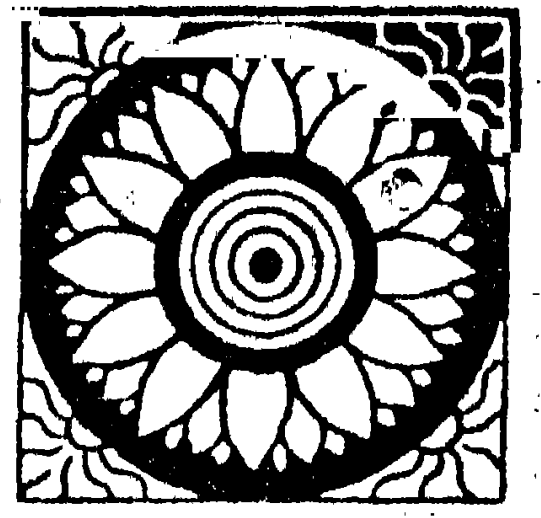
অস্পৃশ্য জাতীয় ধর্মাচার্য

সম্পাদক

মধ্যযুগে তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতীয় হিন্দুদের মধ্যে অনেক ধর্মাচার্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই মহাপুরুষদের অনন্যসাধারণ ধর্মভাব সত্যনিষ্ঠা অহিংসা ত্যাগ বৈরাগ্য সাধনা ও উপদেশ হিন্দুর ধর্মেতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। এই আচার্যগণ সাধনার সর্বোচ্চ স্তরে আরোহণ করিয়া এক একটি বিরাট ধর্মসম্প্রদায় প্রবর্তন করেন। বর্তমানেও অগণন নরনারী এই ধর্মাচার্যদের প্রচারিত ধর্মের অনুসরণ করিয়া শান্তি লাভ করিতেছেন। তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ প্রথমে এই ধর্মপ্রবর্তকদের উপর নির্মম ভাবে অত্যাচারের অভিযান চালাইলেও শেষে ইঁহাদের অসাধারণ সাধুতা ও আধ্যাত্মিক মহত্ত্বের নিকট মস্তক অবনত করিতে—এমন কি অনেকে শিষ্যত্ব স্বীকার করিতেও দ্বিধা করেন নাই। আমরা এই প্রবন্ধে এইরূপ কয়েক জন ধর্মাচার্য-সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

বৈষ্ণবাচার্য রামানন্দের সাধন-ক্ষেত্র প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবতীর্থ শ্রীরঙ্গম্ পুণ্যতোয়া কাবেরী নদীর তীরে অবস্থিত। এখানকার মন্দিরে শ্রীরঙ্গনাথ (বিষ্ণু) বিশেষ সমারোহ সহকারে নিত্য পূজিত। শ্রীরঙ্গমের ঠিক সোজা স্বল্পপরিসর কাবেরী নদীর অপর তীরে একটি ক্ষুদ্র গ্রামে অস্পৃশ্য প্যারিয়া সাধক তীরুপ্পন আলোয়ার জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীরঙ্গনাথের দর্শন দূরের কথা এই তীর্থক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার অধিকারও অস্পৃশ্য জাতির ছিল না। তীরুপ্পন সাধন-ভজননিষ্ঠ হইলেও মন্দিরে যাইয়া বিগ্রহ দর্শনে বঞ্চিত ছিলেন। কিন্তু রঙ্গনাথের প্রতি এই বৈষ্ণব সাধকের আন্তরিক ভক্তি ছিল অপরিসীম। তিনি প্রতিদিন কাবেরী নদীর তীরে বসিয়া শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরের উচ্চচূড়ার দিকে চাহিয়া নিবিষ্ট মনে ধ্যান ও বীণা সহযোগে ভজন করিতেন এবং তাঁহার দর্শনের জন্য আকুল ভাবে প্রার্থনা জানাইতেন। কয়েক বৎসর পর একদিন এই মন্দিরের প্রধান পুরোহিত লোকসারঙ্গ মুনি বিগ্রহের অভিষেকের জন্য প্রাতে কাবেরী নদী হইতে জল আনিতে আসিয়া দেখিতে পাইলেন যে, অপর তীরে অস্পৃশ্য তীরুপ্পন বসিয়া আছেন। তাঁহার ছায়া পড়িয়া নদীর জল অশুদ্ধ হইয়াছে মনে করিয়া পুরোহিতপ্রবর তাঁহাকে ঐ স্থান ত্যাগ করিতে ইঙ্গিত করেন! কিন্তু তীরুপ্পন আলোয়ার তখন গভীর ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। এ জন্য লোকসারঙ্গের ইঙ্গিতে সাড়া দেওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া পুরোহিত মহাশয় তাঁহার অঙ্গে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করেন। ইহার আঘাতে তাঁহার মস্তক হইতে রক্ত নিঃসৃত হইতে থাকে। তিনি নদীর অপর তীরে লোকসারঙ্গকে দেখিয়া এই ঘটনার কারণ

বুঝিয়া শান্তভাবে স্থান ত্যাগ করেন। লোকসারঙ্গ মুনি জল আনিয়া পূজা আরম্ভ করিলে আকাশ হইতে অশরীরী রঙ্গনাথ তাঁহাকে বলিলেন : “তীরুপ্পন আমার পরম ভক্ত। তুমি তাঁহাকে স্কন্ধে করিয়া এইখানে আমার নিকট আনয়ন কর।” রঙ্গনাথের প্রতি এই ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের ভক্তি-বিশ্বাস ছিল অকৃত্রিম। তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে চিরন্তন রীতি উপেক্ষা করিয়া তীরুপ্পনের পর্ণকুটিরে যাইয়া উপস্থিত হন এবং তাঁহার সানুনয় প্রতিবাদ সত্বেও তাঁহাকে স্কন্ধে করিয়া গর্ভমন্দিরে রঙ্গনাথের সম্মুখে উপস্থিত করেন। এই জন্য এই সাধকপ্রবর ‘মুনিবাহন’ নামে পরিচিত। প্রবাদ আছে যে, মুনিবাহন রঙ্গনাথের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত ভক্তিরসাত্মক একটি থেবারম্ (তামিল স্তব) পাঠ করিয়া তাঁহার অঙ্গে লয়প্রাপ্ত হন। এই সাধকের পুণ্যস্মৃতিরক্ষার্থে রঙ্গনাথের মন্দিরের সন্নিকটে একটি ছোট মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। ইহাতে তীরুপ্পন আলোয়ারের মূর্তি ব্রাহ্মণ-পুরোহিত কর্তৃক নিত্য পূজিত এবং প্রতিবৎসর বিশেষ আড়ম্বর সহকারে তাঁহার জন্মোৎসব হইত। বর্তমানে এই মন্দিরের কোন অস্তিত্ব দেখা যায় না। যাহা হ'ক, এই ঘটনাটি দক্ষিণী ব্রাহ্মণ-পুরোহিতদের কল্পনাতীত গোঁড়ামির সঙ্গে ঔদার্য ও ভক্তির সংমিশ্রণে যথার্থ ই অপূর্ব।

ইহারই অনুরূপ আর একটি ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায় দক্ষিণ-ভারতের অস্পৃশ্য প্যারিয়া সাধক নন্দের পুণ্য জীবনী পাঠে। প্রসিদ্ধ শৈব-তীর্থক্ষেত্র চিদম্বরমের নিকট একটি ক্ষুদ্র পল্লী-গ্রামে এই মহাত্মার আবাস ছিল। তিনি অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। এ জন্য তাঁহাকে চাকরি করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে হইত। কিন্তু তিনি সকল কাজকর্মের মধ্যেও নটরাজ শিবকে সর্বদা স্মরণ-মনন করিতেন এবং অবসর পাইলেই ধ্যানস্থ হইতেন। চিদম্বরমের মন্দিরে নটরাজ বিশেষ জাঁকজমক সহকারে নিত্য পূজিত। বিভিন্ন প্রদেশের বহু হিন্দু—বিশেষতঃ দক্ষিণ-ভারতের শৈব মাত্রই এই পবিত্র তীর্থে আসিয়া নটরাজকে দর্শন করেন। উৎসব পার্বণ উপলক্ষে এখানে বহু ভক্ত নর-নারীর সমাগম হইয়া থাকে। একবার একটি বিশেষ পর্বোপলক্ষে চিদম্বরমে বহু যাত্রী যাইতেছেন দেখিয়া সাধক নন্দ তথায় যাইতে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু এই মন্দিরে অস্পৃশ্য প্যারিয়া জাতির প্রবেশাধিকার ছিল না। তথাকথিত উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ তাঁহার এই সংকল্প জানিয়া তাঁহাকে বিদ্রূপ করেন। ইহাতে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া অধিকতর আগ্রহের সহিত নটরাজের দর্শনের জন্য দিবারাত্রি আকুল ভাবে প্রার্থনা করিতে থাকেন। অনেক দিন পর তাঁহার ঐকান্তিক প্রার্থনা কার্যকরী হইল। ভক্ত-বৎসল নটরাজ অস্পৃশ্য সাধক নন্দকে মন্দিরে আনয়ন করিতে মন্দিরের প্রধান পুরোহিতকে স্বপ্নে আদেশ দিলেন। এই পুরোহিত অন্যান্য পুরোহিত-গণকে নটরাজের আদেশের কথা বলিলে কেহই ইহা বিশ্বাস করিলেন না। কিন্তু প্রধান পুরোহিত সাধক নন্দকে মন্দিরে উপস্থিত করিবার জন্য স্বপ্নে পুনঃ পুনঃ নটরাজের আদেশ পাইতে লাগিলেন। অবশেষে এই পুরোহিতের ঐকান্তিক অনুরোধে অন্যান্য পুরোহিতগণ পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, মন্দিরের সম্মুখে প্রজ্বালিত অগ্নির উপর দিয়া নগ্ন পদে অক্ষত শরীরে আসিতে সমর্থ হইলে নন্দকে বিগ্রহ দর্শন করিতে দেওয়া হইবে। তাঁহারা মনে করিলেন যে, প্যারিয়া নন্দ যথার্থ পবিত্র ও ধার্মিক না হইলে জ্বলন্ত আগুনের উপর দিয়া আসিতে সাহস পাইবেন না। সাধক নন্দ পুরোহিতদের এই প্রস্তাবে আনন্দের সহিত সম্মতি প্রকাশ করিলেন। এ জন্য একটি বিশেষ দিনে মন্দিরের সম্মুখে মন্ত্রপূত অগ্নি প্রজ্বালিত করা হইল। নন্দ অবগাহন করিয়া নটরাজের উদ্দেশ্যে এক অশ্রুতপূর্ব ভক্তি-

রসাত্মক থেবারম্ (তামিলস্তব) করজোড়ে পাঠ করিতে করিতে অবলীলাক্রমে সেই জ্বলন্ত আগুনের উপর দিয়া বিগ্রহের দিকে অগ্রসর হইলেন। জনশ্রুতি আছে যে, তাঁহার প্রার্থনার প্রভাবে নাটমন্দিরে নটরাজের সম্মুখস্থিত পাষাণ-বৃষটি এক পাশে সরিয়া গিয়াছিল। থেবারম্ পাঠ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অস্পৃশ্য সাধক নন্দ নটরাজের শ্রীঅঙ্গে লীন হইয়াছিলেন। তাঁহার এই থেবারমটি বর্তমানেও দক্ষিণ-ভারতের শৈব ভক্তগণ কর্তৃক ভক্তিসহকারে নিত্য পঠিত হইয়া থাকে। ইহা তামিল-সাহিত্যেরও একটি অমূল্য সম্পদ বলিয়া পরিগণিত।

মহারাষ্ট্রের প্রসিদ্ধ অস্পৃশ্য জাতীয় সাধক ছোক্কার জীবনেও এইরূপ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। এই মহাপুরুষ মহারাষ্ট্রের বিখ্যাত তীর্থ পণ্ডরপুরের নিকটে একটি পল্লীগ্রামে সাধন-ভজন করিতেন। তিনি অতিশূদ্র বা অন্ত্যজ জাতি-ভুক্ত বলিয়া উচ্চ শ্রেণীর মন্দিরে যাইয়া বিগ্রহ দর্শনের অধিকারে বঞ্চিত ছিলেন। পণ্ডরপুর-মন্দিরে বিষ্ণুমূর্তি বিশেষ আড়ম্বর সহকারে নিত্য পূজিত। অস্পৃশ্য সাধক ছোক্কা বিষ্ণুর পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি সর্বদা তন্ময় হইয়া বিষ্ণুর নামজপ এবং মন্দিরস্থিত বিষ্ণুকে দর্শনের জন্য তাঁহার নিকট আকুল ভাবে প্রার্থনা করিতেন। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু বিষ্ণু দীর্ঘ কাল পর ভক্তের প্রার্থনা শুনিয়াছিলেন। তিনি সাধক ছোক্কাকে মন্দিরে তাঁহার সম্মুখে আনয়ন করিবার জন্য প্রধান পুরোহিতকে স্বপ্নে আদেশ দিয়াছিলেন। পুরোহিতগণ ছোক্কার অসাধারণ ধর্মভাব ও ঐকান্তিক ভক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে সসম্মানে বিগ্রহের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন। এই অস্পৃশ্য সাধকের ভক্তিভাব ও উপদেশে মুগ্ধ হইয়া উচ্চ বর্ণের অনেকে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।

যুক্তপ্রদেশের খ্যাতনামা বৈষ্ণবাচার্য রামানন্দ নানাতীর্থ পর্যটনকালে তৎকালীন সামাজিক নিয়ম লংঘন করায় সমাজচ্যুত হইয়া একটি বিস্তীর্ণ বৈষ্ণব-সম্প্রদায় প্রবর্তন করেন। তাঁহার প্রবর্তিত সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ "রামানন্দী বৈষ্ণব" নামে পরিচিত। চর্মকারজাতীয় রুহিদাস, জোলা-জাতীয় মুসলমান কবীরদাস ও ক্ষৌরকারজাতীয় সেনা আচার্য রামানন্দের প্রধান শিষ্য ছিলেন। এই সাধকত্রয় অস্পৃশ্যজাতি-ভুক্ত হইয়াও এক একটি বৃহৎ হিন্দুধর্মসম্প্রদায় প্রবর্তন করেন। বৈষ্ণব-শাস্ত্র 'ভক্তমালে' লিখিত আছে যে, রুহিদাস চর্মকারের কাজ করিবার সময় সর্বদা বিষ্ণুনাম জপ করিতেন। তিনি আধ্যাত্মিকতায় অসাধারণ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। এই মহাপুরুষের নামে প্রতিষ্ঠিত "রুইদাসী সম্প্রদায়ের" প্রভাব ভারতের কয়েকটি প্রদেশের চর্মকারজাতির মধ্যে বর্তমানেও অত্যন্ত ব্যাপক। রুহিদাসের শিষ্যা রাজরাণী মীরাবাঈ খ্যাতনামা বৈষ্ণব সাধিকারূপে একটি ধর্মসম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেন। অনেকে বলেন যে, মোগল-যুগের অন্যতম সাধক সুরদাস রুহিদাসের শিষ্য ছিলেন। সম্রাট্ আকবর সুরদাসের সঙ্গে ধর্মপ্রসঙ্গ করিতেন। আচার্য রামানন্দের অপর শিষ্য অস্পৃশ্য সাধক কবীরদাস হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের সমন্বয় প্রচারে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তাঁহার উপদেশ—'দোঁহাবলী' সকল সম্প্রদায় কর্তৃক বিশেষ সমাদৃত। সাধক কবীরদাসের শিষ্য তুলসীদাস উচ্চশ্রেণীর সাধকরূপে সকল হিন্দুকর্তৃক বিশেষ সম্মানিত। তৎপ্রণীত 'রামায়ণ' বিশেষ আগ্রহ সহকারে পঠিত হইয়া থাকে। কবীরের অন্যতম শিষ্য গুরু নানক শিখধর্মের প্রবর্তক। কবীরের পুত্র মুসলমান কামালও খ্যাতনামা হিন্দুসাধক ছিলেন। কামালের শিষ্য সন্ত দাদূ মুসলমান হইয়াও একটি হিন্দুধর্ম-সম্প্রদায়ের প্রবর্তকরূপে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন।

সাধক দাদুর সর্বধর্মসমন্বয়-মূলক উপদেশ অতি উপাদেয়। এই মহাপুরুষের মুসলমান-শিষ্য গরীবদাস উন্নত স্তরের সাধক বলিয়া সম্মানিত।

এই সকল খ্যাতনামা সাধক ব্যতীত অস্পৃশ্য জাতীয় ধর্মাচার্যদের তালিকায় দক্ষিণ-ভারতের শৈব সাধক তীরুবাল্লুবা, নম্পোদোয়ান, চোকামেলা, যুক্তপ্রদেশের সধ্ন এবং বাংলার বৈষ্ণবসাধক মুসলমান হরিদাস ও বলরাম হাড়ী প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আচার্য তীরুবাল্লুবা অস্পৃশ্য প্যারিয়া জাতিভুক্ত হইয়াও উচ্চ শ্রেণীর শৈবসাধক ছিলেন। এই মহাপুরুষ পাণ্ডিত্যের জন্য দক্ষিণ-ভারতের সরস্বতী নামে আখ্যাত। তৎপ্রণীত গ্রন্থাবলী দক্ষিণের পঞ্চম তামিল বেদ বলিয়া সম্মানিত। মান্দ্রাজ শহরের উপকণ্ঠে এই তামিল-সাধকের নামে একটি মন্দির আছে। ইহাতে তাঁহার মূর্তি বর্তমানেও নিত্য পূজিত হইতেছে। নম্পোদোয়ান অস্পৃশ্য জাতীয় খ্যাতনামা শৈব সাধক ছিলেন। মাদুরার বিখ্যাত মন্দিরে এই তামিল সাধকের মূর্তি অদ্যাবধি ব্রাহ্মণ-পুরোহিতগণ কর্তৃক নিত্য পূজিত এবং তাঁহার বাৎসরিক জন্মতিথি প্রতিপালিত হয়। চোকামেলা তামিল দেশের অস্পৃশ্য শ্রেণীর খ্যাতনামা শৈব সাধক এবং সধ্ন যুক্তপ্রদেশের অস্পৃশ্য ধুনুরী জাতিভুক্ত উচ্চ শ্রেণীর সাধক বলিয়া সম্মানিত। এই শেষোক্ত মহাত্মার শিষ্য-প্রশিষ্যগণ 'সধ্নপন্থী' নামে পরিচিত। বর্তমানেও এই সম্প্রদায়ের যথেষ্ট প্রভাব আছে। মুসলমান-জাতীয় হরিদাস বাংলার প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ শিষ্য ছিলেন। বর্তমানেও বৈষ্ণবমাত্রই তাঁহার প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। বলরাম অস্পৃশ্য হাড়ী জাতীয় হইয়াও উচ্চস্তরের সাধক বলিয়া প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। হাড়ী জাতির মধ্যে তাঁহার প্রবর্তিত ধর্মসম্প্রদায়ের প্রভাব অসাধারণ। অনুসন্ধান করিলে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এইরূপ আরও বহু অস্পৃশ্য ধর্মাচার্যের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। এই তথাকথিত অস্পৃশ্য ধর্মাচার্যগণের প্রবর্তিত উদার ধর্মমত একদিকে যেমন নিম্নশ্রেণীর অগণন হিন্দু নরনারীকে ধর্ম ও নীতিপরায়ণ করিয়া রাখিয়াছে এবং অহিন্দু ধর্মের কবল হইতে রক্ষা করিতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে, অপর দিকে উহা তেমন বিভিন্ন প্রদেশের লোক-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন এবং হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির উৎকর্ষ সম্পাদনেও কম সাহায্য করে নাই।*

* মৎপ্রণীত "Hinduism And Untouchability" পুস্তকে এই সকল বিষয় সবিস্তার আলোচনা করা হইয়াছে। ইহা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।—উঃ সঃ

জীবনযজ্ঞ

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়, বি-এ

দেহের সমিধে জন্ম কালচক্রে যে দিন জগতে,
জ্বলিতেছি এ বিশ্বের মহাযজ্ঞে সেই দিন হতে
বিশ্বের জীবনকুণ্ডে মোরা করি আহুতি বহন,
এর বেশি কিছু নয়, জ্বলে তার আত্মার দহন।
কেহ ধিকি ধিকি জ্বলি, গুমে গুমে বহুদিন পুড়ে,
কেহ দাউ দাউ জ্বলি, দুদিনেই ভস্ম হ'য়ে উড়ে।
কোটি কোটি শিখা লয়ে বিশ্বব্যাপী অনল বিস্তার,
আমাদের প্রাণশিখা কোথা ডুবে তাহার মাঝার।
বৃথা ক্ষোভ বৃথা লোভ লোল জিহ্বা জ্বলার উল্লাস,
যদিবা ফুরায়ে আসে তার সনে পায়ত বিনাশ
জ্বলার যাতনা জ্বালা। মোরা শুধু ইন্ধন, ইন্ধন,
আমরা যাজ্ঞিক নই—এই সত্য ভুলি বহুক্ষণ।
অভিমান, আশা, তৃষা, ধর্ম্মাধর্ম্ম, ইহ পরকাল,
সাধ হায় দহ্যমান সমিধের ধূমের জঞ্জাল।
অনলে আলোক আছে, চারিদিকে ছায়া পড়ে তার,
অনল নিভিয়া গেলে কিছু নাই সবি অন্ধকার।
এ বিরাট যজ্ঞকুণ্ডে জ্বলি পুড়ি যত দিন পারি,
মহাকাল ভস্মস্তূপে একমুষ্টি শেষে যাবে বাড়ি'।
নির্বাণ ক'বার হয়? মোরা আর আসিব না ফিরে
ভস্মে কি আগুন জ্বলে? শেষ তার জাহ্নবীর তীরে।

য়ুরেনিয়ম-বিভাজন

অধ্যাপক শ্রীতারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, এম্‌-এস্‌ সি

পৃথিবীব্যাপী মহাসমর শেষ হইল। বিজ্ঞানের দিক হইতে এই মহাসমর বিপ্লব আনিয়াছে। পরমাণুর অন্তর্নিহিত শক্তিকে যে কাজে লাগান যাইতে পারে তাহা প্রমাণিত হইল এ্যাটম বোমা সৃষ্টিতে। যুদ্ধের প্রায় শেষ অবস্থায় হের হিটলার দম্ভভরে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে যুদ্ধের শেষের সাত দিন পৃথিবী যে ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ করিবে সেজন্য ভগবান যেন তাঁহাকে ক্ষমা করেন। এই সময় জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিকগণ এ্যাটম বোমার নির্ম্মাণকৌশল প্রায় আয়ত্তে আনিয়া ফেলিয়াছিলেন কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত হিটলার কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এদিকে মিত্রপক্ষের দুইটি এ্যাটম বোমা মহাযুদ্ধের উপর যবনিকা টানিয়া দিল। যে আণবিক শক্তি ধ্বংসকার্য্যেই ব্যবহৃত হইল তাহা দ্বারা মানুষের হিতসাধন করাও সম্ভব। বিজ্ঞানী এখন সেইদিকে চিন্তা করিতেছেন। এই শক্তির অপব্যবহার না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

বিজ্ঞানী আজ পর্য্যন্ত ৯২টি মৌলিক পদার্থের সন্ধান পাইয়াছেন। মৌলিক পদার্থসমূহকে তাহাদের আণবিক সংখ্যা অনুযায়ী সাজান হইয়াছে। মৌলিক পদার্থের পরমাণু বিশ্লেষণ করিয়া জানা গিয়াছে যে পরমাণুর দুইটি ভাগ—একটি অন্তঃস্থ কেন্দ্রক এবং অপরটি বহিঃস্থ ইলেকট্রন। যে পরমাণুর বহিঃস্থ ইলেকট্রন একটি তাহার আণবিক সংখ্যাও এক; যার ইলেকট্রন দুইটি তার আণবিক সংখ্যাও দুই। আজ পর্য্যন্ত য়ুরেনিয়মই সর্ব্বাপেক্ষা ভারী পদার্থ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ইহার বহিঃস্থ ইলেকট্রন সংখ্যা ৯২। প্রোটন ও নিউট্রন কণিকা দ্বারা পরমাণুর কেন্দ্রক গঠিত। প্রোটনের বিদ্যুৎ ধনাত্মক, ইলেকট্রনের বিদ্যুৎ ঋণাত্মক এবং উভয়ের বিদ্যুৎ সমপরিমাণ। নিউট্রন বিদ্যুৎশূন্য। প্রোটনের ভড় ইলেকট্রনের ভড় অপেক্ষা প্রায় ২০০০ গুণ বেশী এবং সেই কারণে ইলেকট্রন ভড়শূন্য বলিয়া ধরা হয়। প্রতি পরমাণুতে যত সংখ্যক প্রোটন ঠিক তত সংখ্যক ইলেকট্রন; কাজেই পরমাণু সাধারণ অবস্থায় বিদ্যুৎশূন্য। প্রোটন ও নিউট্রনের ভড় সমান এবং প্রোটন ও নিউট্রনের সংখ্যার তারতম্য অনুসারে পদার্থের ভড় কম বেশী হয়। হাইড্রোজেন পরমাণুতে প্রোটন ও ইলেকট্রন একটি করিয়া আছে—সেইজন্য ইহার ভড় এক এবং আণবিক সংখ্যাও এক। হিলিয়ম পরমাণুর কেন্দ্রকে দুইটি প্রোটন ও দুইটি নিউট্রন এবং কেন্দ্রকের বাহিরে দুইটি ইলেকট্রন আবর্ত্তিত হইতেছে। সুতরাং হিলিয়মের ভড় চার এবং আণবিক সংখ্যা দুই। এইরূপে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থকে সাজান হইয়াছে। এখন য়ুরেনিয়ম অপেক্ষা ভারী মৌলিক পদার্থ কেন দেখা যায় না, ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া বিজ্ঞানী দেখিলেন যে আণবিক সংখ্যা ৮০ বা তদপেক্ষা বেশী হইলে পরমাণু আপনা হইতে ভাঙ্গিয়া গিয়া তেজ নির্গত করে। এরূপ পরমাণুকে তেজস্ক্রিয় বলা হয়। থোরিয়াম, রেডিয়ম, য়ুরেনিয়ম প্রভৃতি এইরূপ তেজস্ক্রিয় পদার্থ। অনেকগুলি প্রোটন একত্রে কেন্দ্রকের ভিতর অবস্থিত থাকিলে বৈদ্যুতিক বিকর্ষণের ফলে তাহারা

পরস্পরের নিকট হইতে ছুটিয়া বাহিরে যাইতে চায়। পরমাণুর কেন্দ্রকে প্রোটন সংখ্যা ৮০ বা ইহার বেশী হইলেই পরমাণুর কেন্দ্রকের প্রোটন ছুটিয়া বাহির হইয়া আসে। ফলে এইরূপ পরমাণুর ভাঙ্গন ঘটিয়া থাকে। প্রোটনসংখ্যা যত বেশী হইবে ভাঙ্গনের তীব্রতাও তত বেশী হইবার সম্ভাবনা। সেইজন্য য়ুরেনিয়ম পরমাণু সর্ব্বদাই ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। য়ুরেনিয়ম অপেক্ষা ভারী পদার্থ থাকিলে তাহাতে প্রোটনসংখ্যা অধিক হইবার কথা। কাজেই সেই পদার্থের পরমাণুতে ভাঙ্গন এত দ্রুত ঘটিতে পারে যে সেরূপ পরমাণু সামান্য সময়ের জন্যও টিকিতে পারে না। এই জন্যই সম্ভবতঃ য়ুরেনিয়ম অপেক্ষা ভারী পদার্থের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। য়ুরেনিয়ম পরমাণু আপনা হইতে ভাঙ্গিয়া ক্রমাগতঃ অন্য পরমাণুতে পরিবর্ত্তিত হইয়া অবশেষে সীসকে রূপান্তরিত হয়। পরমাণু-কেন্দ্রকের গঠন আলোচনা করিয়া বিজ্ঞানী দেখিলেন যে কেন্দ্রক প্রচণ্ডশক্তির আধার। এই শক্তিকে বাহিরে আনিয়া কাজে লাগাইবার উপায় আবিষ্কার করাই ছিল বিজ্ঞানীর সাধনা। বিজ্ঞানী তাহাতে সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছেন।

কেবল পরমাণু হইতে প্রোটন নিউট্রন বাহির করিয়া আনিলে বা পরমাণুর কেন্দ্রকে প্রোটন নিউট্রন প্রবিষ্ট করাইয়া দিতে পারিলে নূতন পরমাণু গঠিত হয়। ইটালিদেশীয় বৈজ্ঞানিক ফার্মির দৃষ্টি নূতন পরমাণু সৃষ্টির দিকে আকৃষ্ট হইল। তিনি য়ুরেনিয়ম পরমাণুর কেন্দ্রকে নিউট্রন প্রবেশ করাইয়া য়ুরেনিয়মোত্তর অর্থাৎ য়ুরেনিয়ম অপেক্ষা ভারী মৌলিক পদার্থ গঠন করিতে চেষ্টা করিলেন এবং ৯৩ সংখ্যক পরমাণু সৃষ্টি করিতে কৃতকার্য্য হইলেন। তিনি এই মৌলিক পদার্থকে "নেপচুনিয়ম" নামে অভিহিত করিয়া মুসোলিনীর নিকট আবেদন জানাইলেন যে এই নূতন পদার্থটির নাম দিতে চাহেন "মুসোলিনিয়ম"। মুসোলিনী ইহাতে আপত্তি প্রকাশ করিলেন; কারণ নেপচুনিয়ম পরমাণু সৃষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভাঙ্গিয়া অন্য পরমাণুতে পরিবর্ত্তিত হয়। ইহার কোন স্থায়িত্ব নাই এবং এরূপ ক্ষণস্থায়ী পদার্থের সহিত তিনি নিজের নাম যুক্ত করিতে রাজী নহেন।

ফার্মির আবিষ্কারবার্ত্তা প্রচারিত হইলে জার্মান বৈজ্ঞানিক অটো হ্যান ও ডাঃ ষ্ট্রাস্‌ম্যান ফার্মির পদ্ধতিতে য়ুরেনিয়ম লইয়া পরীক্ষা সুরু করিলেন। ১৯৩৯ সনে তাঁহাদের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হইলে পৃথিবীর বিজ্ঞানী সমাজে আলোড়ন পড়িয়া গেল। হ্যান দেখাইলেন যে নিউট্রন দ্বারা য়ুরেনিয়ম পরমাণুর কেন্দ্রকে আঘাত করিলে কেন্দ্রকটি দুইটি টুকরায় ভাঙ্গিয়া যায় এবং এই টুকরা দুইটির একটি বেরিয়ম এবং অপরটি ক্রিপটন। হ্যানের মত দক্ষ রসায়নবিদের পক্ষেই একটি টুকরাকে বেরিয়ম বলিয়া বোঝা সম্ভব হইয়াছিল। অনেকের ধারণা ছিল উহা রেডিয়ম—বেরিয়ম নহে। রেডিয়ম ও বেরিয়মের রাসায়নিক ধর্ম্ম প্রায় এক রকমের। ইহার পূর্ব্বে পরমাণুর কেন্দ্রকে নিউট্রন বা প্রোটন দ্বারা আঘাতের ফলে কেন্দ্রক হইতে দু একটি প্রোটন বা নিউট্রন নির্গত করিতে পারা গিয়াছিল কিন্তু নিউট্রনের সংঘর্ষে কেন্দ্রক ভাঙ্গিয়া দুইটি টুকরা হওয়া এই প্রথম। এই ভাঙ্গিয়া যাওয়ার নাম দেওয়া হইল য়ুরেনিয়ম-বিভাজন। হ্যান আরও দেখাইলেন যে এই টুকরা দুইটি অতিশয় তীব্র গতিতে পরস্পরের নিকট হইতে সরিয়া যায় এবং প্রচণ্ড তেজ নির্গত করে। ১৯৩৯ সনে অধ্যাপক জুলিয়েঁ৷ এবং তাঁহার সহকর্ম্মী ডাঃ হল্বন ও কোয়ারস্‌কি দেখাইলেন যে যখন বহিঃস্থ নিউট্রনের আঘাতে য়ুরেনিয়ম কেন্দ্রক ভাঙ্গিয়া যায় তখন প্রত্যেক য়ুরেনিয়ম কেন্দ্রক হইতে অন্ততঃ নিউট্রন নির্গত হয়। এই নিউট্রন

আবার দুইটি যুরেনিয়ম কেন্দ্রকের বিভাজন ঘটায়। ফলে চারটি নিউট্রন নির্গত হয় এবং এই চারটি নিউট্রন আরও চারটি কেন্দ্রকের বিভাজন ঘটাইতে পারে। সুতরাং বহিঃস্থ নিউট্রন দ্বারা একবার যুরেনিয়ম কেন্দ্রকে বিভাজন ঘটিলে কেন্দ্রকনিঃসৃত নিউট্রনই বাকী যুরেনিয়ম পরমাণুর বিভাজনক্রিয়া ঘটাইয়া থাকে। এইরূপে বিভাজনক্রিয়া চলিয়া অবশেষে যখন আঘাতকারী নিউট্রনের সংখ্যা অবশিষ্ট যুরেনিয়ম পরমাণুসমূহের কেন্দ্রকবিভাজনের ফলে যত সংখ্যক নিউট্রন নির্গত হইতে পারে তাহার সংখ্যার সমান হয় তখন বিভাজনক্রিয়া বন্ধ হয়। এই অবিষ্কারের ফলে পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ শক্তিকে কার্য্যকরী করিবার স্বপ্ন সফল হইল।

বহিঃস্থ ইলেকট্রন সংখ্যার উপর পরমাণুর রাসায়নিক ধর্ম্ম নির্ভর করে এবং কেন্দ্রকস্থ প্রোটন ও নিউট্রনের সংখ্যা পরমাণুর ভড় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয়। যদি কেন্দ্রক হইতে দু একটি নিউট্রন সরাইয়া লওয়া যায় তথাপি পদার্থের রাসায়নিক ধর্ম্ম ঠিক থাকে এবং এরূপ অবস্থায় নূতন পদার্থকে পূর্ব্বের পদার্থের 'আইসোটোপ' বলা হয়। সাধারণ যুরেনিয়মের সহিত হাজারকরা ৭ ভাগ পরিমিত এক প্রকার যুরেনিয়ম মিশ্রিত থাকে। সাধারণ যুরেনিয়ম পরমাণুর ভড় ২৩৮ কিন্তু এই প্রকার যুরেনিয়মের ভড় ২৩৫ অর্থাৎ ইহার পরমাণুর কেন্দ্রকে তিনটি নিউট্রন কম আছে। ইহাকে যুরেনিয়মের ২৩৫ আইসোটোপ বলা হয়। যুরেনিয়মের এইরূপ আরও একটি আইসোটোপ আছে যাহার পরমাণুর ভড় ২৩৪। হ্যানের যুরেনিয়ম-বিভাজন বার্ত্তা প্রচারিত হইলে বিখ্যাত বিজ্ঞানী অধ্যাপক নীল বর্ ১৯৩৯ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে গণিতসাহায্যে প্রমাণ করিলেন যে ২৩৮ যুরেনিয়মে তখনই বিভাজন ঘটিবে যখন অত্যন্ত বেগশালী নিউট্রন ইহার কেন্দ্রকে আঘাত করিবে কিন্তু স্বল্পবেগ-সম্পন্ন নিউট্রনের স্পর্শে ২৩৫ যুরেনিয়মে বিভাজন ঘটিবে এবং স্বল্পগতি বিশিষ্ট নিউট্রন দ্বারাই ২৩৫ যুরেনিয়মে বিভাজন ক্রিয়া উত্তমরূপে হইবে। ১৯৪০ সালের মার্চ্চ মাসে যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানাগারে পরীক্ষা দ্বারা এই তথ্য সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইল। এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক। নিউট্রনের আঘাতজনিত শক্তিতেই যে ২৩৫ যুরেনিয়ম ভাঙ্গিয়া যায় তাহা নহে। বন্দুকে ট্রিগার টানিলে গুলি নির্গত হয় বটে কিন্তু ট্রিগারের ধাক্কায় গুলি নিক্ষিপ্ত হয় না, সেইরূপ নিউট্রন পরমাণুর কেন্দ্রকের উপর আসিয়া পড়িলে কেন্দ্রকে তীব্র স্পন্দন সৃষ্টি হয় এবং এই স্পন্দনের ফলেই বিভাজন ঘটিয়া থাকে।

২৩৮ যুরেনিয়মকে স্বল্পগতিবিশিষ্ট নিউট্রন দ্বারা আঘাত করিলে কেন্দ্রকের বিভাজন হয় না; বরং কেন্দ্রক এই নিউট্রন শোষণ করিয়া লয়। ফলে ৯২ সংখ্যক যুরেনিয়ম পরমাণু প্রথমে ৯৩ সংখ্যক মৌলিক পদার্থ নেপচুনিয়ম ও পরে ৯৪ সংখ্যক মৌলিক পদার্থ প্লুটোনিয়মে পরিবর্ত্তিত হয়। নেপচুনিয়ম ও প্লুটোনিয়ম উভয়ই যুরেনিয়মোত্তর মৌলিক পদার্থ এবং প্রকৃতিতে এরূপ পদার্থের অস্তিত্ব নাই। বিজ্ঞানাগারেই প্রথম ইহাদের জন্ম হইয়াছে। প্লুটোনিয়মের বিভাজন ক্রিয়া অনেকটা ২৩৫ যুরেনিয়মের মত। সেইজন্য ইহার একটা বিশেষ প্রাধান্য আছে এবং ভবিষ্যতের পৃথিবীতে সম্ভবতঃ প্লুটোনিয়ম বিভাজন দ্বারাই শক্তি নির্গত করিয়া যন্ত্র চালনা করা হইবে। থোরিয়ম এবং প্রোট্যাক্টোনিয়ম ধাতুতেও বিভাজন ঘটে কিন্তু ইহাদের বিভাজনক্রিয়া অনেকটা ২৩৮ যুরেনিয়মের মত তেমন তীব্রভাবে হয় না, তীব্র বেগযুক্ত নিউট্রন সম্পাতেই বিভাজন ঘটে।

ইহা হইতে দেখা যায় যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় যেমন কয়লা বা তেল পুড়াইয়া বা টি, এন্, টির বিস্ফোরণ ঘটাইয়া যে তেজ উৎপন্ন হয় পরমাণু-নিঃসৃত তেজ তাহা হইতে ভিন্ন কারণে উৎপন্ন

হইয়া থাকে এবং পরমাণুর তেজ দ্বারাই সূর্য্য ও নক্ষত্রের তাপ রক্ষিত হইতেছে।

এ্যাটম বোমাতে ২৩৫ য়ুরেনিয়ম ব্যবহার করা হইয়াছে। ২৩৫ য়ুরেনিয়মকে স্বল্পবেগযুক্ত নিউট্রন দ্বারা আঘাত করা হয়। ইহাতে য়ুরেনিয়ম পরমাণুর কেন্দ্রকের বিভাজন ঘটে এবং বিভাজনের ফলে যে নিউট্রন উৎপন্ন হয় তাহা দ্বারা পরবর্ত্তী বিভাজন ঘটিয়া থাকে। ২৩৫ য়ুরেনিয়মের একটি বিশেষত্ব আছে। ইহার এমন একটি পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট আছে যাহা অপেক্ষা কম হইলে নিউট্রন দ্বারা আঘাত করিলেও এই য়ুরেনিয়মের বিভাজন ঘটিবে না। এই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ২৩৫ য়ুরেনিয়ম নাড়াচাড়ায় ভয়ের কারণ নাই। কারণ ইহাতে বিভাজন হয় না। কিন্তু এই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অপেক্ষা পরিমাণ একটু বেশী হইলেই নিউট্রনের আঘাতে বিভাজন ঘটিবে। এ্যাটম বোমায় এই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অপেক্ষা সামান্য কম পরিমাণ ২৩৫ য়ুরেনিয়মের দুইটি অংশ পৃথকভাবে রাখা হয়। বোমা বিস্ফোরণের অব্যবহিত পূর্ব্বে দুইটি অংশকে একত্র করিয়া দেওয়া হয় এবং স্বল্পবেগবিশিষ্ট নিউট্রন দ্বারা আঘাত করা হয়। দুইটি অংশের পরিমাণ একত্রে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অপেক্ষা বেশী বলিয়া নিউট্রনের সংঘাতে বিভাজন তথা বিস্ফোরণ ঘটিবে। এই বিস্ফোরণ ঘটিতে এক সেকেণ্ডেরও কম সময় লাগে ; ফলে বোমার অভ্যন্তরের তাপমাত্রা সহস্র লক্ষ ডিগ্রী এবং মধ্যস্থ বায়ুর চাপ বহিঃস্থ বায়ুর চাপ অপেক্ষা সহস্র লক্ষ গুণ বেশী হয়। এই তীব্র তাপের ফলে চতুষ্পার্শ্বে অবস্থিত বস্তুসমূহ ভস্মীভূত হইয়া যায় এবং বাতাসের প্রচণ্ড প্রসারণের ফলে (বোমার অভ্যন্তরের বায়ুর চাপ এতই বেশী হয় যে বোমা ফাটিবার পর এই বায়ুর গতি হয় সেকেণ্ডে ১০০ মাইল কি তাহারও বেশী; প্রবল ঝড়ের সময়েও বায়ুর গতি ঘণ্টায় ১০০ মাইলের বেশী হয় না) কয়েক মাইলের মধ্যে অবস্থিত ঘরবাড়ী চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়।

য়ুরেনিয়মবিভাজনে যে শক্তি নির্গত হয় তাহার সহিত অতি বিস্ফোরক টি, এন, টির তুলনা করিয়া দেখা যায় যে মোটামুটি ৮০০০ টন টি, এন, টির বিস্ফোরণ এক পাউণ্ড ২২৫ য়ুরেনিয়মের বিস্ফোরণের সমান। কিন্তু য়ুরেনিয়মবিভাজনই আণবিক শক্তির শেষ কথা নহে। য়ুরেনিয়মবিভাজনের সময়ে খানিকটা অংশ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়—বাকী অংশ জড়পদার্থরূপে বর্ত্তমান থাকে। যেটুকু য়ুরেনিয়ম শক্তিতে রূপান্তরিত হয় তাহার ফলেই এরূপ তীব্র তেজ সৃষ্টি হয়। যদি সম্পূর্ণ য়ুরেনিয়ম শক্তিতে রূপান্তরিত হইত তবে আরও সহস্রগুণ তেজ পাওয়া যাইত অর্থাৎ এ্যাটম বোমার ধ্বংসকারিতা আরও সহস্রগুণ বৃদ্ধি পাইত। তেমন দিন যেন না আসে।

১৯০৫ সালে আইনষ্টাইন আপেক্ষিকবাদ হইতে প্রমাণ করিয়াছিলেন যে জড়কে সম্পূর্ণভাবে শক্তিতে পরিবর্ত্তিত করিতে পারিলে এক পাউণ্ড পরিমাণ যে কোন জড়পদার্থ হইতে যে পরিমাণ তেজ নির্গত হইবে, ৯,০০০,০০০, টন কয়লা পুড়াইয়া সেই পরিমাণ তেজ পাওয়া যায়। আইনষ্টাইনের এই মত অনেকেই বিশ্বাস করিতে চাহেন নাই। ইহার প্রায় বিশ বৎসর পর অধ্যাপক রাদারফোর্ডের পরীক্ষা হইতে আইনষ্টাইনের মতবাদের সত্যতা প্রমাণিত হইল। য়ুরেনিয়ম-বিভাজনের ফলে শক্তি উৎপন্ন হইবার মূল কারণ জড়ের শক্তিতে রূপান্তর গ্রহণ। পৃথিবীব্যাপী মহাসমরের জন্যই বিজ্ঞানীর পক্ষে পরমাণুর অন্তর্নিহিত শক্তিকে কাজে অর্থাৎ ধ্বংস কার্য্যে ব্যবহারের উপায় আবিষ্কার করা সম্ভব হইয়াছে। কারণ যুদ্ধ জয়ের জন্য এ্যাটম বোমার ন্যায় মারণাস্ত্রের প্রয়োজন ছিল। যদি যুদ্ধ না বাধিত তবে আণবিক শক্তির ব্যাপার লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন ছিল না। সেইজন্যই একজন বিজ্ঞানী বলিয়াছেন যে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য পাইলে পদার্থ বিজ্ঞানের যে কোন ভাল ছাত্র হাজার হাজার এ্যাটম বোমা প্রস্তুত করিতে পারে। এক একটি এ্যাটম বোমা নির্ম্মাণে দুই শত লক্ষ ডলারের বেশী ব্যয় হয়। মানুষ মানুষকে মারিবার জন্য যেরূপ কল কৌশল উদ্ভাবন করিতে পারে এবং সেজন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিয়া থাকে লোককল্যাণের জন্য তাহার শতাংশের একাংশও করে না। এ্যাটম বোমার প্রয়োজন শেষ হইয়াছে। এখন এই আণবিক শক্তিকে যাহাতে লোকের হিতসাধনে প্রয়োগ করা যায়, মানুষের জীবনযাত্রা যাহাতে সহজ ও সুগম হয়, বিজ্ঞানীর দৃষ্টি সেদিকে ফিরিয়া আসিলেই জগতের মঙ্গল।

বেদান্তাচার্য গৌড়পাদ

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

শঙ্করাচার্যের পূর্বে যে সকল বেদান্তাচার্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন, গৌড়পাদ তাঁহাদিগের শীর্ষস্থানীয়। গৌড়পাদ শঙ্করের পরমগুরু; শঙ্করের গুরু গোবিন্দপাদ, গোবিন্দপাদের গুরু গৌড়পাদ। মাণ্ডুক্য উপনিষদের উপর গৌড়পাদের যে কারিকা আছে, তাহা উপনিষদাবলীর পরেই আদি বেদান্তগ্রন্থ। মাণ্ডুক্য-কারিকাকাররূপেই গৌড়পাদ সুপরিচিত। তাঁহার দার্শনিক মতকে অজাতবাদ বলা হয়। দার্শনিক দৃষ্টিতে শঙ্কর-বেদান্ত বা বিবর্তবাদের সহিত অজাতবাদের কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে।

গৌড়পাদের প্রকৃত নাম কী ছিল, সেই বিষয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতদ্বৈধ আছে। সাধারণতঃ তিনি গৌড়পাদ নামেই পরিচিত। মাণ্ডুক্য-কারিকার চারিটী প্রকরণের অন্তে এই নামই দৃষ্ট হয়। সদাশিব ব্রহ্মেন্দ্র তাঁহার জগৎগুরু-রত্নমালাস্তবে[১] এই নাম গ্রহণ করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য তদ্রচিত শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্-ভাষ্যে তাঁহাকে গৌড়পাদাচার্য বলিয়াছেন। বিদ্যারণ্যকৃত 'পঞ্চদশী' (২-২৩) এবং সায়ণ-রচিত তৈত্তিরীয়-আরণ্যক-ভাষ্যে (৭-২) গৌড়াচার্য নাম পাওয়া যায়। সুরেশ্বরাচার্যের নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিতে তিনি শুধু গৌড়নামেই উল্লিখিত। ইহা হইতে মনে হয় তাঁহার প্রকৃত নাম গৌড় এবং পাদ, পদ, চরণ বা আচার্য তাঁহার সম্মানসূচক উপাধি মাত্র। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আবির্ভূত বালকৃষ্ণানন্দ সরস্বতী তাঁহার 'শারীরক মীমাংসাভাষ্যবার্তিকে' গৌড়পাদকে কেবল গৌড় নামেই অভিহিত করিয়াছেন। 'নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি'র চন্দ্রিকানামক টীকাকার জ্ঞানোত্তম উক্ত নাম সমর্থন করেন।

সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মাণ্ডুক্য-কারিকার যে ইংরাজি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার উপক্রমণিকায় মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী লিখিয়াছেন যে, আচার্য গৌড়পাদ বাঙ্গালী ছিলেন। এই শুভ সংবাদ বাঙ্গালীর নিকট অশেষ আনন্দদায়ক, সন্দেহ নাই। পূর্বে গৌড়পাদের মত বৈদান্তিক বাংলায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়াই পরবর্তী কালে এই দেশে মধুসূদন সরস্বতীর মত বৈদান্তিকের আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছিল। বর্তমান মালদহের অদূরে অবস্থিত গৌড় ছিল প্রাচীন বাংলার রাজধানী। মৎস্যপুরাণ (১২-৩০), কূর্মপুরাণ (১-২০-৯) এবং লিঙ্গপুরাণ (১-১-৬৫) অনুসারে উত্তরবঙ্গ এবং তৎপার্শ্ববর্তী জেলাগুলিই গৌড়দেশ। আধুনিক গবেষণা হইতেও ইহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়। শ্রীহারাণচন্দ্র চাক্লাদার একটী পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধে[২] ইহার অনুকূল বহু যুক্তি দিয়াছেন। গৌড়দেশীয়গণকে গৌড় বলার প্রথা অদ্যাপি বর্তমান। এখনও উত্তরাখণ্ডে কোন কোন বাঙ্গালী সাধুর নামের সঙ্গে গৌড়শব্দ সংযুক্ত দেখা যায়। পূর্বে বিদ্যাচর্চার জন্য গৌড়দেশের

১ এই স্তবের উপর আত্মবোধেন্দ্র সরস্বতীর একটী টীকা আছে। সটীক স্তবটী কুম্ভকোনম্ শ্রীবিদ্যা প্রেস হইতে বেদান্তপঞ্চপ্রকরণী গ্রন্থের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে।

২ পুণা হইতে প্রকাশিত Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute (Vol. III, Part I, p 43) পত্রিকা দ্রষ্টব্য।

এত প্রখ্যাতি ছিল যে, উহার অধিবাসী বা উহা হইতে প্রত্যাগত বা এমন কি উহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত ব্যক্তিকেও গৌড় বলা হইত। যোগবাশিষ্ঠসার বা লঘুযোগবাশিষ্ঠের রচয়িতা অভীনন্দ কাশ্মীরী হইলেও তিনি গৌড় নামে অভিহিত হইতেন। বিখ্যাত নৈয়ায়িক গদাধর ভট্টাচার্যের সহপাঠী এবং অদ্বৈত-সিদ্ধির লঘুচন্দ্রিকা নামক টীকাকার ব্রহ্মানন্দ গৌড়দেশে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই গৌড়দেশীয় না হইয়াও গৌড়াখ্যা প্রাপ্ত হন। গৌড়ের সহিত অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধ থাকিলেও তখন উক্ত আখ্যালাভ হইত। এইরূপ প্রথার উল্লেখ সংস্কৃত শাস্ত্রে আছে। মীমাংসাদর্শনের শবরভাষ্যে (১-৩-২৩) আছে: "মথুরায়াম্ অভিপ্রস্থিতো মাথুর ইতি; মথুরায়াং বসন্ মথুরায়াঃ নির্গতাঃ চ" অর্থাৎ মথুরা হইতে আগত, বা মথুরাপ্রবাসী বা মথুরাযাত্রীকেও মাথুর বলে। বালকৃষ্ণানন্দ সরস্বতী তাঁহার উল্লিখিত গ্রন্থে (৯-১২) গৌড়পাদ সম্বন্ধে যে অভিনব মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন: "গৌড়চরণাঃ কুরুক্ষেত্র-দেশগত-হিররাবতীনদীতীরভব-গৌড়জাতি-শ্রেষ্ঠাঃ দেশবিশেষভবজাতিনাম্নৈব প্রসিদ্ধাঃ। দ্বাপরযুগমারভ্যৈব সমাধিনিষ্ঠত্বেন আধুনিকজনৈঃ অপরিজ্ঞাত-বিশেষ-অভিধানাঃ সামান্যনাম্নৈব লোক-বিখ্যাতাঃ।" অর্থাৎ কুরুক্ষেত্র দেশে হিররাবতী নামে এক নদী ছিল। এই নদীতীরে যে সকল গৌড়দেশীয় ব্যক্তি বাস করিতেন গৌড়পাদ ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আচার্য দ্বাপরযুগ হইতে সমাধিনিষ্ঠ ছিলেন বলিয়া আধুনিক ব্যক্তিগণ তাঁহার বিশেষ নাম জানেন না। সেইজন্য তিনি সাধারণ নামেই বিখ্যাত।" ওয়ালেশার (Wallesar) সাহেবের মতে গৌড়পাদ নামক কোন ব্যক্তি ছিলেন না; মাণ্ডুক্যকারিকা প্রাচীন সম্প্রদায়ের শাস্ত্র মাত্র। পণ্ডিত বিধুশেখর উক্ত মত বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন না।

গৌড়পাদের আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে গবেষক-গণের মতে বিশেষ মতানৈক্য আছে। তাঁহার জীবন বৃত্তান্তও কিছুই পাওয়া যায় না। কাশী অচ্যুত প্রেস হইতে ব্রহ্মসূত্রের যে সুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, উহাতে কাশী গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ গোপীনাথ কবিরাজ লিখিত একটী হিন্দী ভূমিকা আছে। যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থে গৌড়পাদের সম্বন্ধে কিছু কথা আছে উক্ত ভূমিকাতে পণ্ডিত গোপীনাথ তাঁহাদের নাম দিয়াছেন। বইগুলির নাম যথা: (১) মাধবাচার্যের শঙ্করদিগ্বিজয়, (২) আনন্দগিরির শঙ্করবিজয়, (৩) রাজচূড়ামণিকৃত শঙ্করাভ্যুদয়, (৪) চিদ্বিলাসকৃত শঙ্করবিজয়, (৫) সদানন্দ-রচিত শঙ্করবিজয়, (৬) সর্বজ্ঞ সদাশিববোধ কৃত পুণ্যশ্লোকমঞ্জরী, (৭) আত্মবোধ প্রণীত পুণ্যশ্লোক-মঞ্জরী-পরিশিষ্ট, এবং (৮) সদাশিব ব্রহ্মেন্দ্রকৃত গুরুরত্নমালা ও তদুপরি আত্মবোধেন্দ্রকৃত সুষুমা নামক টীকা। কথিত আছে যে, গৌড়পাদের সহিত তাঁহার সুযোগ্য প্রশিষ্য শঙ্করের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। গুরুরত্নমালার দশম শ্লোকটী এই: "অভিযুঞ্জদ্-আয়াচ্য-পূজ্যপাদান্ অপলুন্থাদিনিষাকসিদ্ধনেতৃন্ অথ গৌড়পাদান্ ফণীশভাষ্য-প্রথমাচার্যক-পণ্ডিতান্ প্রপদ্যে।" অর্থাৎ গৌড়পাদ অপলুন্থ প্রভৃতি নিষাক সিদ্ধ সাধকগণের গুরু। তাঁহার শ্রীচরণ আয়াচ্য কর্তৃক পূজিত ইত্যাদি। এই অংশের টীকায় আত্মবোধেন্দ্র হরিমিশ্রের 'গৌড়পাদোল্লাস' এবং রামভদ্র দীক্ষিতের 'পতঞ্জলিবিলাস' এই দুই গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। এই দুই পুস্তকেও গৌড়পাদের কিঞ্চিৎ তথ্য আছে। আত্মবোধেন্দ্রের মতে গৌড়পাদ শুকদেবের শিষ্য এবং তিনি হিমালয়-শিখরে গুরুর আদেশে আত্ম-জ্ঞানলাভার্থ কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। হিমালয়ে গৌড়পাদের তপস্যা সম্বন্ধে মাণ্ডুক্য

উপনিষদের নারায়ণকৃত টীকাতে আছে : "গৌড়পাদ দ্বাপর যুগের শেষে আবির্ভূত হন। তিনি শুকদেবের শিষ্য এবং শঙ্করাচার্যের পরম গুরু। তিনি মাণ্ডুক্য উপনিষদের চারিটী অংশের চারি প্রকরণে বিভক্ত কারিকাবলী রচনা করিয়াছেন। বদরিকা আশ্রমে তাঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া নারায়ণদেব তাঁহাকে দর্শনদান করিয়া বরপ্রদান করেন। এই বরপ্রভাবে এক পর্বতগুহায় তিনি প্রবেশপূর্বক ধ্যানমগ্ন হন, যাহাতে কলিযুগে জাত মানবের সহিত তাঁহার আদৌ সাক্ষাৎ না হয়। এই অবস্থায় শঙ্কর তাঁহার সমীপে যাইয়া লোক কল্যাণার্থ বাহিরে আসিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন। গৌড়পাদ প্রশিষ্যের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন, কিন্তু লালমাটীতে বটপত্রে মাণ্ডুক্য কারিকা-বলী লিখিয়া শঙ্করকে প্রদান করেন"[৩]।

আত্মবোধেন্দ্র আরও লিখিয়াছেন : "গৌড়পাদের প্রভাবে আয়ার্চ্যপ্রমুখ অনেকের বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে ভ্রান্তমত বিনষ্ট হয়। তক্ষশীলাধীশ শাক্যপ্রভৃতি এবং অপলুন্দ-দামীশাদি অপরান্তযোগিগণ আয়ার্চ্যের সেবা করিতেন। ওসমণ্ড্ ডি বঁভয়ার প্রিউল্ক্স্ কৃত "এপোলোনিয়াসের ভারত ভ্রমণ" গ্রন্থ[৪] হইতে জানা যায়—উক্ত অপলুন্দ টায়ানার পাইথাগোরাস-মতাবলম্বী দার্শনিক এপোলোনিয়াস ব্যতীত অন্য কেহ নহেন। এপোলোনিয়াস খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে আবির্ভূত হন। তিনি ভারতে আগমনপূর্বক তক্ষশীলাধীশ প্রাবৃতির দরবারে অবস্থান করেন। দামীশ ছিলেন এপোলোনিয়াসের মিত্র ও সহযাত্রী। এবং আয়ার্চ্য ছিলেন জনৈক গ্রীক রাজা। গুরুরত্নমালার মতেও গৌড়পাদের সহিত কয়েকজন গ্রীকের যোগাযোগ ছিল।

ভাববিবেক (৫০০-৫৫০), শান্তরক্ষিত (৭০৫-৭৬২ খ্রীঃ) এবং তৎশিষ্য কমলশীল এই বৌদ্ধ দার্শনিকত্রয় গৌড়পাদের কারিকা উদ্ধার করিয়াছেন। মাধ্যমকহৃদয়-কারিকা এবং উহার টীকা, তর্কজ্বালা, ভাববিবেক কর্তৃক রচিত। তর্কজ্বালা টীকার অষ্টম অধ্যায়ের দশম হইতে ত্রয়োদশ পর্যন্ত চারিটী শ্লোক গৌড়পাদকারিকা হইতে গৃহীত বলিয়া মনে হয়। মাধ্যমকালংকার-কারিকা এবং উহার টীকার রচয়িতা ছিলেন শান্তরক্ষিত। শান্তরক্ষিতের কারিকার উপর কমলশীলের পঞ্জিকা আছে। শান্তরক্ষিত তাঁহার কারিকায় গৌড়পাদের যে দশটী কারিকা উদ্ধার করিয়াছেন কমলশীল তাঁহার পঞ্জিকায় তাহা স্বীকার করেন। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে ভাববিবেক শান্তরক্ষিত এবং কমলশীল গৌড়পাদকারিকার সহিত পরিচিত ছিলেন। সুতরাং গৌড়পাদের আবির্ভাব কালকে ভাববিবেকের পূর্বে স্থির করিতে হয়। এই প্রমাণের দ্বারা পণ্ডিত বিধুশেখর ৫০০ খ্রীষ্টাব্দকে গৌড়পাদের আবির্ভাব কাল রূপে নির্দেশ করেন।

অন্যদিকে গৌড়পাদ নাগার্জুন (২০০ খ্রীঃ), তৎশিষ্য আচার্যদেব এবং মৈত্রেয়নাথ (৪০০ খ্রীঃ) প্রমুখ বৌদ্ধ দার্শনিকগণের বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন। সুতরাং ৪০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে গৌড়পাদের আবির্ভাব নির্দেশকরা অযৌক্তিক। ৪০০ খ্রীষ্টাব্দে আবির্ভূত বসুবন্ধুর অভিধর্মকোষ নামে একখানি বৌদ্ধ গ্রন্থ আছে। যশোমিত্র ইহার উপর যে টীকা রচনা করিয়াছেন তাহার নাম অভিধর্ম-কোষব্যাখ্যা। যশোমিত্রের টীকা হইতে জানা যায় অভিধর্মকোষের উপর গুণমতি ও বসুমিত্রের দুইটী টীকা ছিল। গুণমতির আবির্ভাব কাল ৪২৫ খ্রীষ্টাব্দ। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যশোমিত্র

৩ এই প্রকার অন্যান্য প্রবাদের জন্য ই. হুলস্ক (E. Hultzsch) কৃত Report of Sanskrit Manuscripts in South India দ্রষ্টব্য।

৪ The Indian Travels of Apollonius of Tyana by Osmond de Beanvoir Priaulx নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

পঞ্চম শতাব্দীর লোক। গৌড়পাদের একটী কারিকা (৪-১৩) অভিধর্মকোষব্যাখ্যার একটী শ্লোকের উপর স্থাপিত বলিয়া পণ্ডিত বিধুশেখর অনুমান করেন গৌড়পাদ নিশ্চয়ই পঞ্চম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন।

আদিশেষকৃত "পরমার্থসার" নামে একটী বেদান্ত গ্রন্থ আছে। পরমার্থসারের অন্য নাম 'আর্য-পঞ্চাশীতি'। কোন কোন পণ্ডিতের মতে আদিশেষ মহাভাষ্যকার পাণিনি ব্যতীত অন্য কেহ নহেন। এই গ্রন্থের অভিনবগুপ্তকৃত একটী পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ আছে। পরমার্থসারের কয়েকটী শ্লোকের সহিত গৌড়পাদের কয়েকটী কারিকার সাদৃশ্য-দর্শনে পণ্ডিত বিধুশেখর মনে করেন গৌড়পাদ আদিশেষ বা পাণিনির পূর্ববর্তী। বাচস্পতি মিশ্র শঙ্করের পরবর্তী ও বেদান্তদর্শনের বিখ্যাত টীকাকার এবং ৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে আবির্ভূত। বাচস্পতি তাঁহার ভামতীতে (৩-৩-২৯) ব্রহ্মসূত্রের অন্যতম ভাষ্যকার ভাস্করকে সমালোচনা করিয়াছেন। আদিশেষের গ্রন্থে মনু-সংহিতার সৃষ্টিতত্ত্ব এবং ভাস্কর-দর্শনের সংমিশ্রণ আছে। সুতরাং আদিশেষ নিশ্চয়ই ভাস্কর-দর্শনের সহিত পরিচিত ছিলেন। সুতরাং আদিশেষ গৌড়-পাদের পরবর্তী। অধ্যাপক বি এল আত্রেয় তাঁহার গ্রন্থে[৫] নিশ্চয় করিয়াছেন যে, গৌড়পাদ-কারিকা যোগবাশিষ্ঠের পরবর্তী; কিন্তু পণ্ডিত বিধুশেখর অকাট্য যুক্তি দ্বারা উক্ত মত খণ্ডন করিয়াছেন। সুতরাং পঞ্চম শতাব্দীকে গৌড়পাদের আবির্ভাব কালরূপে নির্ণয়করা যুক্তিসঙ্গত।

মাণ্ডুক্য-কারিকা ব্যতীত গৌড়পাদের অন্যান্য গ্রন্থ আছে। যথা—প্রথমতঃ ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্য-কারিকার উপর ভাষ্য। দ্বিতীয়তঃ উত্তরগীতার ভাষ্য। তৃতীয়তঃ নৃসিংহোত্তরতাপনী উপনিষদের উপরও গৌড়পাদের একটী টীকা আছে। চতুর্থতঃ এবং পঞ্চমতঃ সুভগোদয় এবং শ্রীবিদ্যারত্নসূত্র নামক দুইটী তন্ত্রগ্রন্থ। ষষ্ঠতঃ দুর্গাসপ্তশতীর টীকা শ্রীশ্রীচণ্ডীর উপর ভাস্কর রায়ের গুপ্তবতী নামক যে টীকা আছে তাহাতে গৌড়পাদ-রচিত দুর্গাসপ্তশতী-টীকার উল্লেখ আছে। উক্ত টীকার একটী পাণ্ডুলিপি তাঞ্জোরস্থিত গ্রন্থাগারে ছিল। কিন্তু উহার অধিকাংশ অপহৃত হইয়াছে। গৌড়পাদ অদ্বৈতবাদী হইয়াও কিরূপে তন্ত্রগ্রন্থ রচনা করিলেন? এই প্রশ্নের উত্তরে পণ্ডিত বিধুশেখর বলেন যে, উহা অসম্ভব নহে। শঙ্করাচার্যও বেদান্তবাদী হইয়াও অনেক দেবীস্তোত্র রচনা করিয়াছেন। প্রগল্‌ভাচার্যকৃত শ্রীবিদ্যার্ণব গ্রন্থে আছে যে শঙ্করা-চার্য একটী তন্ত্র-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁহার লিখিত একখানি তন্ত্রগ্রন্থও আছে।

অন্যান্য গ্রন্থ সত্ত্বেও মাণ্ডুক্যকারিকাই গৌড়পাদের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। উহা মাণ্ডুক্যোপনিষদের টীকামাত্র। গৌড়পাদকারিকার উপর শঙ্করাচার্যের একটি ভাষ্য ও তদুপরি আনন্দগিরির টীকা আছে। গৌড়পাদকারিকার বাংলা এবং বহু ইংরাজি অনুবাদ হইয়াছে। গৌড়পাদী, আগমশাস্ত্র প্রভৃতি অন্যান্য নামেও মাণ্ডুক্য-কারিকা অভিহিত। গৌড়পাদীতে মাত্র চারিটী প্রকরণ আছে। প্রথমটীর নাম আগমপ্রকরণ ও উহাতে ২৮টী শ্লোক আছে। দ্বিতীয়টির নাম বৈতথ্যপ্রকরণ; উহাতে ৩৮টী শ্লোক। তৃতীয়টীর নাম অদ্বৈতপ্রকরণ; উহাতে ৪৮টী শ্লোক। চতুর্থটীর নাম অলাত-শান্তিপ্রকরণ ও উহাতে একশত শ্লোক। অতএব গৌড়পাদকারিকা ২১৪ শ্লোকে সম্পূর্ণ।

গৌড়পাদের দার্শনিক মতের নাম অজাতবাদ। অপরপক্ষে তৎপ্রশিষ্য শঙ্করের দর্শনকে বিবর্তবাদ বলা হয়। বিবর্ত অর্থে মিথ্যাপ্রতীতি। শঙ্করের মতে জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত মাত্র, বিশ্বপ্রপঞ্চ ব্রহ্মে অধ্যস্ত। অজাতবাদ ও বিবর্তবাদের মধ্যে তত্ত্বতঃ

৫ Yogavasistha and its Philosophy by B. L. Atreya দ্রষ্টব্য।

কোন পার্থক্য নাই। আমার মতে বিদেহ মুক্তি ও জীবন্মুক্তির অবস্থাদ্বয়ের দৃষ্টিতে এই মতবাদদ্বয় প্রতিষ্ঠিত। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী শিষ্য স্বামী শিবানন্দ বলিতেন: "গৃহের মধ্যে উন্মুক্ত দরজার কাছে দাঁড়ান এবং তাহার বাহিরে অবস্থান যেমন, এই দুই অবস্থাদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্যও তেমনি বা ততটুকু।" অজাতবাদিগণ সৃষ্টি স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে জগৎ সৃষ্ট বা জাত হয় নাই। মাণ্ডুক্যকারিকার অদ্বৈতপ্রকরণে বিংশ শ্লোকটী এই:

অজাতস্যৈব ভাবস্য জাতিমিচ্ছন্তি বাদিনঃ।
অজাতো হ্যমৃতো ভাবো মর্ত্যতাং কথমেষ্যতি॥

অর্থাৎ সৃষ্টিচিন্তকগণ বা দ্বৈতবাদিগণ অজাত-বস্তুর জন্ম ইচ্ছা করেন। অজাত অমৃত ব্রহ্মবস্তুর জন্ম বা মৃত্যু কিরূপে সম্ভব? উক্ত গ্রন্থের অলাতশান্তি-প্রকরণের দ্বিতীয় কারিকাতে আছে—সর্বসত্ত্বসুখ অস্পর্শযোগের কথা। গৌড়পাদ উক্ত যোগের আচার্যকে প্রণতি জানাইতেছেন। অজাতবাদকে অস্পর্শযোগ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শঙ্করের মতে অস্পর্শযোগ উপনিষদে প্রসিদ্ধ। কোন কোন উপনিষদে এইরূপ যোগের বর্ণনা থাকিলেও উক্ত শব্দের ব্যবহার কোনও উপনিষদে নাই। একটী কারিকাতে (৩-৩৭) গৌড়পাদ অস্পর্শযোগকে সকৃজ্জ্যোতি, অচল, অভয় ও সুপ্রশান্ত সমাধি নাম দিয়াছেন। উহা অসম্প্রজ্ঞাত বা নির্বিকল্প সমাধির অবস্থা বলিয়াই মনে হয়। অভিসময়ালঙ্কারা লোক নামক বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থে উক্ত অবস্থার নাম 'অস্পর্শবিহার'। উক্ত যোগে ইন্দ্রিয়সমূহের সহিত ইন্দ্রিয়বস্তুনিচয়ের সম্বন্ধ সংছিন্ন হয়, মনোনাশ হয় এবং ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে উহাকে ভূমানন্দ বলা হইয়াছে। এই অবস্থাতে ব্রহ্মাতিরিক্ত অন্য কিছু শ্রুত, দৃষ্ট বা জ্ঞাত হয় না। ইহাই গীতাতে ত্রিগুণাতীত অবস্থা বা ব্রহ্মনির্বাণ নামে বর্ণিত।

বন্ধু

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

নীরব নিশীথে যবে সঙ্গহীন প্রাণ
ব্যথাতুর চাহি ফিরে ব্যথীর সন্ধান
গভীর অন্তরে তব মূক স্তব্ধ বাণী
নিমেষে যাতনা হরে অভয় প্রদানি।
অতীতের যত ক্ষতি যত না শূন্যতা
পলকে কর তো পূর্ণ ধ্রুব শান্তি দাতা।

নিখিলের ভালবাসা যতেক মিতালি
তোমার নিবিড় সৌখ্যে পুঞ্জিত সকলি।
একক এ জীবনের চলিবার পথে—
জানি তুমি আছ মোর সদা সাথে সাথে।
পৃথিবীর বন্ধুহীন রিক্ত দীন জনে
তোমার ঐশ্বর্য্য-লোকে তুলিয়া কেমনে

করিলে সম্রাট্ তুমি, হে সখা আমার,
অখিল সংযুক্ত সে যে তুমি যুক্ত যার।

শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী

[১৯০৮।১৫ই আগষ্ট—১৯০৯।১৪ই আগষ্ট]

(পঞ্চমাংশ)

ঝালকাঠি বক্তৃতা—"কর্ম্মযোগিন্" প্রকাশের দুই দিন পরে অরবিন্দ ঝালকাঠি (বরিশাল) যাত্রা করিলেন। সেখানে এক প্রকাশ্য সভায়, ২৩শে জুন, দেড়ঘণ্টাব্যাপী একটি বক্তৃতা দিলেন। পরের দিন প্রাতে কলিকাতা অভিমুখে রওয়ানা হইলেন।

বক্তৃতার প্রারম্ভেই তিনি বলিলেন—

"When I come to Barisal, I come to the chosen temple of the Mother, I come to a sacred *Pithasthan* of the national spirit—I come to the birth-place and field of work of Aswini Kumar Dutt."

তিনি অশ্বিনীকুমার দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতির বিনা বিচারে নির্ব্বাসনের কথা তুলিলেন। লর্ড মর্লি এই বিনাবিচারে নির্ব্বাসন সমর্থন করায় তিনি তাহার প্রতিবাদ করিলেন।

"Lord Morley says it is a good law. We say it is a lawless law, a dishonest law,—a law that is in any real sense of the word, no law at all."

তিনি বলিলেন যে আমাদের মধ্যে "বিভীষণ" শ্রেণীর ব্যক্তি আছে—

"There is a sprinkling of *Vibhisans* among us—men who for their own ends are willing to tell any lie that they think will please the authorities or injure their personal enemies."

সম্ভবতঃ সেদিন ঝড় হইয়াছিল। তাই তিনি বলিয়াছেন—

"Storm has swept over us to-day. I saw it come, I saw the striding of the storm blast and the rush of the rain and as I saw it an idea came to me. What is this storm that is so mighty and sweeps with such fury upon us? And I said in my heart, "It is God who rides abroad on the wings of the hurricane,—it is the might and force of the Lord that manifested itself and His Almighty hands that seized and shook the roof so violently over our heads today. A storm like this has swept also our national life."

তিনি গভর্ণমেণ্টের অত্যাচারের কথা তুলিয়া বলিলেন—

"Repression is nothing but the hammer of God that is beating us into shape so that we may be moulded into a mighty nation and an instrument for His work in the world."

পরে আমাদের জাতীয় আন্দোলনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলিলেন—

"We seek the fulfilment of our life as a nation......Swaraj is not the colonial form of Government nor any form of Government. It means the fulfilment of our

national life......we shall not perish as a nation, but live as a nation."

কি উপায়ে আমরা আমাদের উদ্দেশ্য সফল করিতে পারিব? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিতেছেন—

"We seek it by feeling our separateness and pushing forward our individual self-fulfilment by what we call Swadeshi—Swadeshi in commerce, in politics, in education, in law and administration, in every branch of national activity. No doubt this means independence, it means freedom; but it does not mean rebellion. There are some who fear to use the word, 'freedom'; but I have always used the word because it has been the *mantra* of my life to aspire towards freedom of my nation. And when I was last in jail, I clung to that *mantra*; and through the mouth of my counsel I used this word persistently."

গভর্ণমেণ্টকে সতর্ক করিয়া অরবিন্দ বলিতেছেন—

"Your repression cannot for ever continue, for it will bring anarchy into the country. You will not be able to continue your administration if this repression remains permanent. Your Government will become disorganised; the trade you are using such means to save, will languish and capital be frightened from the country."

এই সতর্কবাণীর মধ্যেই আমরা প্রথম আভাস পাই যে, অরবিন্দ গভর্ণমেণ্টকে দমন-নীতি পরিহার করিতে বলিতেছেন। কিন্তু তথাপি তিনি আত্মসংযম (self-restraint) অথবা 'discipline'এর অজুহাতে তাঁহার দেশবাসীকে অত্যাচারের নিকট মাথা নীচু করিবার সদুপদেশ দেন নাই। তিনি বলিতেছেন—

"There are some who think that by lowering our heads the country will escape repression. That is not my opinion. It is by looking the storm in the face and meeting it with a high courage, fortitude and endurance that the nation can be saved......The storm may come down on us again and with greater violence. Then remember this, brave its fury, feel your strength, train your strength in the struggle with the violence of the wind, and by that strength hold down the roof over the temple of the Mother."

উত্তরপাড়া বক্তৃতায় মনে হইয়াছে যেন সনাতন ধর্ম্মই অরবিন্দের মনের সবটা জুড়িয়া বসিয়া আছে। রাজনীতি একটু দূরে সরিয়া গিয়াছে। কিন্তু বীডন্ স্কোয়ারের পর এই ঝালকাঠি বক্তৃতায় দেখিতে পাইতেছি যে, দেশের স্বাধীনতা লাভ করাই অরবিন্দের জীবনের মূল মন্ত্র এবং জেলে থাকাকালীন তিনি সর্ব্বদা এই মন্ত্রই জপ করিতেন এবং তাঁহার কৌঁশুলী মিঃ সি আর দাশের মুখ দিয়া তিনি আদালতে বারংবার এই কথা বলাইতে ও স্বীকার করাইতে জেদ করিয়াছেন।

অরবিন্দ জেলে থাকাকালীন শুধু বাসুদেব বা নারায়ণ দর্শন করেন নাই, দেশকে স্বাধীন করিবার স্বপ্নও দেখিয়াছেন এবং দেশকে স্বাধীন করিবার মন্ত্র জপ করিয়াছেন। যাঁহারা শুধু ভগবান দেখেন, অথচ দেশের স্বাধীনতা বা পরাধীনতার কথা স্বপ্নেও ভাবেন না—চিন্তার মধ্যেও আনেন না—অরবিন্দ সে শ্রেণীর মানুষ নহেন। অনেকের মতে এক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব তাঁহার মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় দেখা যাইতেছে।

ভগিনী নিবেদিতা—অরবিন্দ জেল হইতে খালাস পাইলে পর ভগিনী নিবেদিতা তাঁহার স্কুলের তোরণদ্বার মঙ্গলঘট, কদলীবৃক্ষ, আম্রপল্লব

প্রভৃতি দ্বারা সজ্জিত করিয়াছিলেন এবং স্কুলের মেয়েদের লইয়া একটি মাঙ্গলিক উৎসব করিয়াছিলেন। দার্জ্জিলিঙে মিঃ সি আর দাশকে ধন্যবাদ দিতে গিয়া তাঁহার কোটের বোতামের ঘরে লাল রঙের গোলাপ ফুল গুঁজিয়া দিয়াছিলেন ও তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "আপনি মহৎ জানিতাম; কিন্তু এতো মহৎ তা' জানিতাম না।" অরবিন্দের প্রতি ভগিনী নিবেদিতার পূর্ণ সহানুভূতি ছিল এবং রাজনৈতিক ব্যাপারে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। অরবিন্দ খুব কম লোকের বাড়ীতেই যাতায়াত করিতেন, কিন্তু তিনি বোসপাড়া লেন্-এ ভগিনী নিবেদিতার বাড়ীতে দেখা করিতে আসিতেন। স্যর্ জগদীশচন্দ্র বসুর পত্নী লেডী অবলা বসু এ কথা আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, জগদীশ বসু এবং অরবিন্দ ঘোষ উভয়েই নিবেদিতার বোসপাড়া লেনের বাড়ীতে দেখাসাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। নিবেদিতাই স্বামী বিবেকানন্দের "রাজযোগ" বইখানি অরবিন্দকে প্রথম পড়িতে দেন। এই সামান্য ঘটনাটি পরে কি বিপুল আকার ধারণ করিয়াছে!

আর এ কথাও প্রমাণ হইয়া গিয়াছে যে, অরবিন্দ "কর্ম্মযোগিন্" অফিস হইতে চন্দননগর যাইবার পথে, রাত্রিতে ভগিনী নিবেদিতার বোসপাড়া লেনের বাড়ীতে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ও পরামর্শ করিয়াছেন। অরবিন্দ শ্রীরামচন্দ্র মজুমদারকে ভগিনী নিবেদিতার নিকট পাঠাইয়া নিবেদিতার মত জানিতে চাহিয়াছিলেন। ভগিনী নিবেদিতা শ্রীরামচন্দ্র মজুমদারকে বলিয়াছিলেন,—"Tell your chief (অরবিন্দ) to hide and the hidden chief, through intermediary, shall do many things." অরবিন্দ শ্রীরামচন্দ্র মজুমদারকে বলিয়াছিলেন,—"Mother Kali, through Sister Nivedita, ordered me to hide."

সুতরাং জেল হইতে খালাস হওয়ার পর অরবিন্দের সহিত ভগিনী নিবেদিতার দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করা স্বাভাবিক। এই দেখা সাক্ষাতের ফলে "কর্ম্মযোগিন্" পত্রিকার গোড়াকার সংখ্যাগুলির মধ্যেই আমরা দুইটি বিষয়ে অরবিন্দের উপর ভগিনী নিবেদিতার প্রভাব লক্ষ্য করি। একটি—শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ; এবং আর একটি—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরপ্রবর্ত্তিত ভারতীয় চিত্রকলা। নিবেদিতা এই দুইটি বিষয়ে অরবিন্দকে যে যথেষ্ট প্রেরণা দিয়াছিলেন তাহা "কর্ম্মযোগিন্"-এ অরবিন্দের লেখা হইতেই প্রমাণ পাই। আর এই দুইটি বিষয়ে ভগিনী নিবেদিতার যে উৎসাহ ও উদ্যম তখন দেখা গিয়াছে, এরূপ বাঙ্গলা দেশে আর কাহারও মধ্যে দেখা যায় নাই।

এ কথা সর্ব্বজনবিদিত যে, অরবিন্দ চন্দননগর চলিয়া গেলে অরবিন্দের অনুরোধে ভগিনী নিবেদিতাই "কর্ম্মযোগিন্"-এর ভার গ্রহণ করিয়া উহা চালাইয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ—অরবিন্দ "কর্ম্মযোগিন্"-এ লিখিয়াছেন,—

"...It was when the flower of the educated youth of Calcutta bowed down at the feet of an illiterate Hindu ascetic, a self-illuminated ecstatic and 'mystic' without a single trace or touch of the alien thought or education upon him that the battle was won. The going forth of Vivekananda, marked out by the master as the heroic soul destined to take the world between his two hands and change it, was the first visible sign to the world that India was awake not only to survive but to conquer."—("*The Awakening Soul of India,*" Karmayogin)

অরবিন্দের উপর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী

বিবেকানন্দের প্রভাব প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে। এবং এ বিষয়ে ভগিনী নিবেদিতার সহযোগিতা ও সহায়তাও অনুমান করা যাইতেছে। এ অনুমান মিথ্যা নয়, কেন না সহযোগিতার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

তারপর অরবিন্দ লিখিলেন—

"That which Vivekananda received and strove to develop, has not yet materialised. The truth of the future that Bijoy Goswami hid within himself, has not yet been revealed utterly to his disciples. A less discreet revelation prepares, a more concrete force manifests, but where it comes, when it comes, none knoweth." —(*"In Either Base"*, Karmayogin)

উল্লিখিত মন্তব্যটি অরবিন্দের নিজের। তিনি খুব সংক্ষেপে লিখিয়াছেন। অনেকের পক্ষেই ইহা সহজবোধ্য হইবে না। জাতির জীবনে ও চিন্তা-ধারায় শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীবিজয়-কৃষ্ণ গোস্বামী যে প্রেরণা ঢালিয়া দিয়াছেন তাহা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইবে, পরিপুষ্ট হইবে, বিপুল আকার ধারণ করিবে—এই অর্থ করাই সমীচীন মনে হয়।

অবনীন্দ্রনাথ-প্রবর্ত্তিত ভারতীয় চিত্রকলা—অরবিন্দের সহিত "কর্ম্মযোগিন্" প্রকাশের সূচনা হইতেই যে ভগিনী নিবেদিতার যোগাযোগ ছিল, তাহার প্রমাণ পাই অবনীন্দ্রনাথ-প্রবর্ত্তিত চিত্রকলার উপর অরবিন্দের বিস্তৃত আলোচনা হইতে। এই নূতন চিত্রাঙ্কনপদ্ধতির উপর ভগিনী নিবেদিতাই যে অরবিন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সহানুভূতিমূলক আলোচনাকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিলেন, ইহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। অরবিন্দ লিখিয়াছেন—

"In Bengal again, the national spirit is seeking to satisfy itself in art and, for the first time since the decline of the Mughols, a new school of national art is developing itself, the school of which Abanindranath Tagore is the founder and master. It is still troubled by the foreign though Asiatic influence from which its master started, and has something of an exotic appearance, but the development and self-emancipation of the national self from this temporary domination can already be watched and followed. There again, it is the spirit of Bengal that expresses itself. The attempt to express in form and limit something of that which is formless and illimitable is the attempt of Indian art. The Greeks, aiming at a smaller and more easily attainable end, achieved a more perfect success. Their instinct for physical form was greater than ours, our instinct for psychic shape and colour was superior. Our future art must solve the problem of expressing the soul in the object, the great Indian aim, while achieving anew the triumphant combination of perfect interpretative form and colour. No Indian has so strong an instinct for form as the Bengali. In addition to the innate Vedantism of all Indian races, he has an all-powerful impulse towards delicacy, grace and strength and it is these qualities to which the new school of art has instinctively turned in its first inception. Unable to find a perfect model in the scanty relics of old Indian art, it was only natural that it should turn to Japan for help, for delicacy and grace are there triumphant. But Japan has not the secret of expressing the deepest soul in the object, it has not the aim. And the Bengali spirit means more than the union of delicacy,

grace and strength; it has the lyrical mystic impulse; it has the passion for clarity and concreteness and as in our literature, so in our art we see these tendencies emerging—an emotion of beauty, a nameless sweetness and spirituality pervading the clear line and form. Here too is the free spirit of the nation beginning to emancipate itself from the foreign limitations and shackles."—(*The Awakening Soul of India*" Karmayogin)

অরবিন্দ চন্দননগর প্রস্থানের মাত্র সপ্তাহ খানেক পূর্ব্বে (৯ই ফাল্গুন, ১৩১৬) 'ধর্ম্ম' পত্রিকায় ভারতীয় চিত্রবিদ্যা সম্পর্কে বাঙ্গলা ভাষায় ঠিক এই কথাগুলি লিখিয়া গিয়াছেন—

"শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অসাধারণ প্রতিভার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া কয়েকজন যুবক লুপ্ত ভারতীয় চিত্রবিদ্যার পুনরুদ্ধার করিতেছেন, তাঁহাদের প্রতিভার গুণে বঙ্গদেশে নূতন যুগের সূচনা হইতেছে। ইহার পর আশা করা যায় যে ভারত ইংরাজের চোখে না দেখিয়া নিজ চোখে দেখিবে, পাশ্চাত্যের অনুকরণ পরিত্যাগ করিয়া নিজ প্রাঞ্জল বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া আবার চিত্রিত রূপ ও বর্ণে ভারতের সনাতন ভাব ব্যক্ত করিবে।

"ভারতীয় চিত্রকর ও অন্যান্য শিল্পী যে ঠিক বাহ্য জগতের অনুকরণ করেন না, ইহা সত্য। কিন্তু সামর্থ্যের অভাবে নহে, তাঁহাদের উদ্দেশ্য বাহ্য দৃশ্য ও আকৃতি অতিক্রম করিয়া অন্তঃস্থ ভাব ও সত্য প্রকাশ করা।... পাশ্চাত্য বাহিরের মিথ্যা অনুভব লইয়া ব্যস্ত, তাঁহারা ছায়ার ভক্ত। পাশ্চাত্য নাম-রূপে অনুরক্ত, আমরা নিত্যবস্তু না পাইয়া কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতে পারি না। এই প্রভেদ যেমন ধর্ম্মে, দর্শনে, সাহিত্যে—তেমনিই চিত্র-বিদ্যায় ও স্থাপত্যবিদ্যায় সর্ব্বত্র প্রকাশ পায়।"

১৯০৯, জুলাই—বিলাতে স্যর কার্জ্জন উইলি খুন—১লা জুলাই মদনলাল ধিঙ্গড়া নামে একজন পাঞ্জাবী ছাত্র বিলাতে স্যর কার্জ্জন উইলি (Sir Curzon Wyllie) নামে একজন সাহেবকে খুন করেন। খুন করিবার কারণ, ধিঙ্গড়া নিজে বলিয়াছেন—

"I attempted to shed English blood intentionally and of purpose as an humble protest against the inhuman transportations and hangings of Indian youths......I do not want to say anything in defence of myself, but simply to prove the justice of my deed. I hold the English people responsible for the murder of 80 millions of Indian people in the last 50 years, and they are also responsible for taking away £ 100,000,000 every year from India to this country. Just as the Germans have no right to occupy this country, so the English have no right to occupy India."

১৯০৯, ফেব্রুয়ারী মাসে, আলিপুর গভর্ণমেণ্টের উকীল আশুতোষ বিশ্বাসকে—অরবিন্দ প্রভৃতি জেলে থাকার সময়েই—খুন করে। বাঙ্গলার সন্ত্রাসবাদের দেখাদেখি, বিলাতেও একটি ছোট সন্ত্রাসবাদী দল সৃষ্টি হইয়াছিল। শ্যামজি কৃষ্ণবর্ম্মা ইহার পরিচালক ছিলেন বলিয়া প্রকাশ। অরবিন্দ এই হত্যা সম্বন্ধে (৩১শে জুলাই) লিখিয়াছেন—

"**Madanlal Dhingra**:—We have no wish whatever to load the memory of this unfortunate young man with curses and denunciation. If a random patriotism was at its back, we have little hope that reflection will induce him to change his views .. Here his country remains behind to bear the consequences of his act."

ইহার মাত্র সাত দিন পূর্ব্বে (২৪শে জুলাই)—

"Kali when she enters into a man cares nothing for rationality and possibility."

মিঃ গোখ্লে এই গর্হিত কাজের জন্য ধিঙ্গড়াকে ধিক্কার দিলেন। লজ্জায় ও ক্ষোভে তাঁহার মাথা

মাটিতে নুইয়া পড়িল। অরবিন্দের সে রকম কিছুই হইল না। সন্ত্রাসবাদের প্রবর্ত্তক অরবিন্দ ধিঙ্গড়াকে ধিক্কার দিতে পারিলেন না। তাঁহার কলম হইতে উহা নির্গত হইবার কথা নয়।

ধিঙ্গড়া তাঁহার কাজের সমর্থনকল্পে গভর্ণমেণ্টের অত্যাচারের কথাই স্পষ্ট উল্লেখ করিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, গভর্ণমেণ্টের অত্যাচারই সন্ত্রাসবাদকে জন্ম দেয়—সৃষ্টি করে। ইহা একজন সন্ত্রাসবাদীর নিজের কথা, কোনও কল্পনা বা theory নয়।

মিঃ গোখ্‌লের পুণা-বক্তৃতা—মিঃ গোখ্‌লে ৮ই জুলাই স্যর কার্জ্জন উইলিকে হত্যার সাত দিন পর, পুণাতে এক বক্তৃতা দিলেন। তিনি বলিলেন, আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় ইংরেজের অধীন থাকা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। শান্তিপূর্ণ উপায়ে, অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধে স্বাধীনতা লাভ করা যাইবে না। যাহারা পূর্ণ স্বাধীনতার কথা বলে তাহারা পাগলা-গারদের বাহিরে পাগল মাত্র। অরবিন্দ ১৭ই জুলাই গোখ্‌লের এই বক্তৃতার জবাব দিলেন—"Exit Vibhishan", অর্থাৎ মিঃ গোখ্‌লে আমাদের দেশে একজন দেশদ্রোহী ও স্বজাতিদ্রোহী, ত্রেতাযুগের বিভীষণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। মিঃ গোখ্‌লের মতে, মিঃ তিলক, বিপিনচন্দ্র ও অরবিন্দ—ইঁহারা সকলেই পাগলাগারদের বাহিরে পাগল মাত্র!

বিপিন পাল সম্পর্কে অরবিন্দ লিখিলেন যে, বিপিন পাল ইংলণ্ডে গিয়া দেখিলেন শ্যামজী কৃষ্ণবর্ম্মা সন্ত্রাসবাদের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন, সুতরাং তিনি তাঁহার সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়াছেন। বিপিনচন্দ্র এদেশে "বন্দেমাতরম্"-এর বিখ্যাত সম্পাদক ছিলেন এবং প্রসিদ্ধ মাদ্রাজ বক্তৃতার অদ্ভুত ক্ষমতাশালী বক্তারূপে পরিচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের নিকট তিনি আসন্ন বিপ্লবের একজন নেতারূপে এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে একজন ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক ব্যক্তি বলিয়া বিবেচিত হইতেন। কিন্তু সেই বিপিন পালই এখন লণ্ডনে গিয়া একজন শান্ত, শিষ্ট সাংবাদিকরূপে পরিগণিত হইতেছেন।

হাওড়া-বক্তৃতা—অরবিন্দ হাওড়ায় এক বক্তৃতা দেন। ১৭ই জুলাই ঐ বক্তৃতা 'কর্ম্মযোগিন্'-এ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করে। বক্তৃতার বিষয় ছিল—"The Right of Association". গভর্ণমেণ্ট জনসাধারণের সভা, সংবাদপত্র ও ব্যায়াম-সমিতিগুলির উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়াছেন। অরবিন্দ বলেন যে, এইগুলি একটা জাতির প্রাথমিক অধিকার ("These are primary rights of a modern nation.")। এই প্রাথমিক অধিকার হইতে গভর্ণমেণ্ট আমাদিগকে বলপূর্ব্বক বঞ্চিত করিতেছেন এবং এই অধিকার না পাইলে আমরা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ শান্তিপূর্ণ উপায়ে চালাইতে পারি না। দেখিতেছি, অরবিন্দের দৃষ্টিভঙ্গীর কিছুটা পরিবর্ত্তন হইতে চলিয়াছে। ঠিক দুই বৎসর আগে—"আরো অত্যাচার চাই" যে তিনি বলিয়াছিলেন, এখন তাহা বলিতেছেন না। এখন তিনি বুঝিতেছেন যে, অত্যাচারে সন্ত্রাসবাদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ মারা যায়। বিপিন পাল ইহা ১৯০৬ খৃষ্টাব্দেই বলিয়াছিলেন।

কলেজ স্কোয়ার-বক্তৃতা—১৮ই জুলাই অরবিন্দ কলেজ স্কোয়ারে সভাপতি হইয়া একটি বক্তৃতা দিলেন। ২৪শে জুলাই উহা 'কর্ম্মযোগিন্'-এ প্রকাশিত হয়। অরবিন্দ তাঁহার বক্তৃতায় বলিলেন যে, বিলাতে কার্জ্জন উইলির হত্যার কথা উল্লেখ করিয়া ছোটলাট বাহাদুর শাসাইয়াছেন যে ভারতবর্ষের লোকেরা যদি গভর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা না করিয়া চলে, তবে গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে এই দেশবাসীর উপর ভীষণ অত্যাচার (violent repression) আরম্ভ হইবে। অরবিন্দ

খুব স্পষ্ট ভাষায় ইহার উত্তর দেন। অরবিন্দ বলেন—(১) গভর্ণমেণ্ট ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করিলে সন্ত্রাসবাদও ভয়ঙ্কর রূপে বাড়িয়া যাইবে, সুতরাং গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইবে। (২) সভাসমিতি ও সংবাদপত্র ইত্যাদির স্বাধীনতারূপ জাতির প্রাথমিক অধিকার যদি গভর্ণমেণ্ট স্বীকার না করেন, তবে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (passive resistance) শান্তিপূর্ণ উপায়ে চালানো যাইতে পারে না। (৩) আর, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ শান্তিপূর্ণ উপায়ে চালাইবার পথ যদি গভর্ণমেণ্ট বন্ধ করিয়া দেন, তবে সন্ত্রাসবাদ (terrorism) অতি ভয়ঙ্কররূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। (৪) মিঃ গোখ্‌লে তাঁহার পুণা বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে, অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের দ্বারা, স্বাধীনতা লাভ করা যাইবে না। ইহার ফলে সন্ত্রাসবাদিগণ দ্বিগুণ উৎসাহে সন্ত্রাসবাদ চালাইতে আরম্ভ করিবেন।

মিঃ গোখ্‌লের বিরুদ্ধে এই শেষোক্ত সমালোচনাটি লণ্ডনে "স্বরাজ" পত্রিকায় বিপিন পালই প্রথম প্রকাশ করেন। অরবিন্দ বিপিন পালের সহিত একমত হইতেছেন।

জুলাই মাসে অরবিন্দ 'কর্ম্মযোগিন্'-এ অনেক কিছু লিখিলেন; এবং হাওড়া ও কলেজ স্কোয়ারে বক্তৃতা দিলেন। জুন মাসে গভর্ণমেণ্টের অত্যাচারকে যে চক্ষে দেখিয়াছেন এবং যে ভাষায় উহার তাৎপর্য্য বীডনস্কোয়ার ও ঝালকাঠি (বরিশাল) বক্তৃতায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন, জুলাই মাসে হাওড়া ও কলেজস্কোয়ারের বক্তৃতায় ঠিক সেরূপটি করিলেন না। তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী কিছুটা পরিবর্ত্তিত হইতে চলিয়াছে এবং তিনি ক্রমে বিপিন পালের সহিত একমত হইতে চলিয়াছেন। বিপিন পাল ১৯০৬ খৃষ্টাব্দেই বলিয়াছিলেন, গভর্ণমেণ্টের অসহনীয় অত্যাচার জাতির মেরুদণ্ডকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবে; ফলে, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ চলিবে না—মারা যাইবে। অরবিন্দ তখন ইহা গ্রাহ্য করেন নাই।

দেশবাসীকে অরবিন্দের খোলা-চিঠি (৩১শে জুলাই)—১লা জুলাই বিলাতে ধিঙ্গড়া কার্জ্জন উইলিকে রিভল্‌ভারের গুলির দ্বারা গুপ্তহত্যা করিলেন। ইহা মাসের প্রথম দিনের কাণ্ড। আর মাসের শেষ দিন ৩১শে জুলাই অরবিন্দ আসন্ন গ্রেপ্তারের আশঙ্কায় দেশবাসীকে তাঁহার রাজনৈতিক মতামত সম্পর্কে চরম নির্দ্দেশ দিয়া "খোলা-চিঠি" লিখিলেন।

"Rumour that Calcutta police submitted a case for my deportation to the Government...In case of my deportation and if I do not return from it, it may stand as my last political will and testament to my countrymen.

1 Strict regard to law—self-help and passive resistance
2 No control, no co-operation
3 United Congress
4 Boycott—political and economic
5 Organisation of provinces
6 Co-operation among the workers."

১৯০৯ আগষ্ট, বিলাতে বিপিন পাল—কার্জ্জন উইলির গুপ্তহত্যার পর শুধু অরবিন্দকেই বাঙ্গলা দেশে গ্রেপ্তারের গুজব রটিল না, বিলাতে বিপিন পালকেও ইহা বিচলিত করিল। তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য যাহা লিখিলেন, ৭ই আগষ্ট 'কর্ম্মযোগিন্' বিপিন বাবুর সেই কথাগুলি ছাপাইয়া দিল। বিপিন বাবু লিখিলেন—

"If to condemn the official repression which has been the psychological cause and origin of the various acts of violence in Bengal be a crime, I plead guilty to it and challenge to be brought to trial for it. If to found and edit the *Bande Mataram*

be a crime, I cannot help pleading guilty to it also. But it is significant that no prosecution was started against this paper so long as I was in charge of it, though it openly declared absolute autonomy as the nationalist ideal.

"In India, or elsewhere, I have nothing to alter or to amend in anything that I have written and said during the last five or six years. If those opinions are criminal, why was I not prosecuted for them? I have never been hauled up for sedition even in India, where almost anything can be construed as such.

"My photo has, I hear, racently been proscribed by an Indian judge as seditious, but the original yet stands uncondemned."

গভর্ণমেণ্ট নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধবাদীদিগকে সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন বলিয়াই মনে করিয়া থাকেন। ইহা মনে করিবার কিছুটা কারণ যে না আছে, তাহা নয়। বিপিনচন্দ্র অবশ্য গোড়া হইতেই নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধকে সন্ত্রাসবাদ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিজেও দেখিয়াছেন, এবং দেশবাসীকেও দেখিতে বলিয়াছেন। কিন্তু অরবিন্দ সেরূপটি করেন নাই। তিনি প্রথমে সন্ত্রাসবাদ, পরে সন্ত্রাসবাদ ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ, এই দুই ভূমিকা গ্রহণ করিয়া কাজ করিয়া আসিয়াছেন। গভর্ণমেণ্টের ইহা কিছু অবিদিত থাকিবার কথা নয়।

কুমারটুলি-বক্তৃতা—অরবিন্দ ৭ই আগষ্টের পূর্ব্বেই এই বক্তৃতা দেন। তিনি নিস্তব্ধতা, গোখ্‌লের পুণা-বক্তৃতা, গভর্ণমেণ্টের মডারেটতোষণ ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ দমন নীতি, বয়কট, এবং ৭ই আগষ্ট জাতীয় উৎসব সম্বন্ধে বলেন। তারপর নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ সম্বন্ধে বলেন যে, ইহা নৈতিক বলের উপর ভিত্তি করিয়া এমন এক বিপ্লব ও পরিবর্ত্তন আনিবে যাহা জগতের ইতিহাসে ইতিপূর্ব্বে আর দেখা যায় নাই। "Passive Resistance will bring a peaceful revolution based on moral force, unprecedented in history."

বিপিন পাল ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ হইতে এই কথাই বলিয়া আসিতেছেন। মিঃ সি আর দাশ আলিপুর বোমার মামলায় অরবিন্দের পক্ষ সমর্থন করিতে দাঁড়াইয়া এই কথাই বলিয়াছেন। অরবিন্দ জেল হইতে বাহির হইবার তিন মাস পর কুমারটুলিতে সেই কথাই বলিলেন। পরবর্ত্তী যুগে মহাত্মা গান্ধীও এই কথাই বলিবেন। বাঙ্গলার স্বদেশী যুগে যাহা একটা চিন্তাধারা বা তত্ত্বরূপে প্রচারিত হইতেছিল, পরবর্ত্তী অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনের যুগে বাঙ্গলার সেই তত্ত্বকথা মহাত্মা গান্ধীর প্রেরণায় সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িল ও কার্য্যে পরিণত হইল।

৭ই আগষ্ট—বয়কট উৎসবে ভূপেন বসু সভাপতি হইলেন, অরবিন্দ 'কর্ম্মযোগিন্'-এ লিখিলেন—মহারাষ্ট্রে মিঃ তিলক যেমন গণপতি ও শিবাজী উৎসব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, বাঙ্গালীও সেইরূপ ৭ই আগষ্ট ও ১৬ই অক্টোবর জাতীয় উৎসব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইহা আমাদের জাতীয় জাগরণের পবিত্র দিন।

"Ganapati and Shivaji festivals by Mr. Tilak, and 7th August and 16th October in Bengal are equally national festivals. It is our sacred day of awakening."

স্বরাজ পত্রিকায় বিপিন পাল অরবিন্দের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী ছাপাইলেন। ১৪ই আগষ্ট 'কর্ম্মযোগিন্'-এ উহা পুনর্মুদ্রিত হইল।

সূর্য্যবন্দনা

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

হে প্রভাত,
হে কল্যাণময় !
হে অগাধ,
আনন্দ, বিস্ময় !
মালিন্য-দুর্গের বন্ধদ্বার,
চূর্ণ কর নাশি' অন্ধকার,
নিশীথের বিরুদ্ধ অন্তরে
জাগো সূর্য্য জাগো জ্যোতির্ম্ময়,
ঝিল্লীমন্দ্র মনের মর্ম্মরে—
তমোহন্তা কর দুঃখ জয়।

দিকে দিকে—
মৃত্যুর প্রবাহ,
ধরিত্রীকে
শোকের প্রদাহ—
নিত্য দেয় অন্ধকার হ'তে—
ত্রিবিধ দুঃখের অগ্নিস্রোতে—
হাসিকান্না সমুদ্রের বুকে
ক্ষুব্ধ প্রাণ তরঙ্গ চঞ্চল,
আর্ত্ত ধরা অতৃপ্তির দুখে—
কাঁদে মেলি' শস্যের অঞ্চল।

জগতের—
পরিক্রমা পথে,
মহতের—
তপস্যার রথে,
স্থিতপ্রজ্ঞ সাধনা মিহির—
জ্বলে যথা নাশিয়া তিমির,
অবিচ্ছিন্ন আলোর স্পন্দনে
চিদানন্দ জাগো ভগবান
অনিত্যের তামস ক্রন্দনে
হে আদিত্য জাগো জ্যোতিষ্মান্।

পঞ্জিকা

স্বামী চিন্ময়ানন্দ

পঞ্জিকার অপর নাম 'পঞ্চাঙ্গ'। বার, তিথি, নক্ষত্র, যোগ ও করণরূপ 'পঞ্চ অঙ্গ' বিশিষ্ট বলিয়া পঞ্জিকাকে 'পঞ্চাঙ্গ' বলে। পঞ্চাঙ্গ অক্ষরে না লিখিয়া 'অঙ্ক' দ্বারাও লেখা যায়। রূঢ়-প্রয়োগে এই জন্য পঞ্চাঙ্গ বা পঞ্জিকাকে 'পঞ্চাঙ্ক'ও বলা হয়। পঞ্চ অঙ্ক বিশিষ্ট অবয়বে, গুপ্তপ্রেস পি এম্ বাগচী ও বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকাদিতে, দিন-পঞ্জিকার বাম দিকে 'দিবা-মান' আদির নিম্নে দেওয়া থাকে। কেবল বঙ্গদেশেই নহে, ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র হিন্দুগণ সকল মাঙ্গলিক কার্য্যেই শুভাশুভ দিন ও লগ্নের জন্য পঞ্জিকার ব্যবহার করিয়া থাকেন। জন্ম-কুণ্ডলী প্রস্তুত করিবার জন্য তো পৃথিবীর সকল দেশে সকল ধর্ম্মাবলম্বীই এখন শুদ্ধ পঞ্জিকার উপযোগিতা বুঝিতে পারিয়াছেন। দেশ-বিদেশে অসংখ্য বিভিন্ন পঞ্জিকার প্রাদুর্ভাবে জন-সাধারণে পঞ্জিকার শুদ্ধাশুদ্ধি-সম্বন্ধে এক বিরাট্ সন্দেহ ও ভীতির সঞ্চার হইয়াছে। এই জন্য উপর্য্যুক্ত বার, তিথি আদি পঞ্চাঙ্গের শুদ্ধতাই এই প্রবন্ধের সংক্ষেপে আলোচ্য বিষয়।

বার ও দিন বা তারিখ

রবি হইতে শনি পর্য্যন্ত সপ্তাহে সাতটী বার। কিন্তু এই বারের আরম্ভ সময় কখন? আরব দেশে যখন জ্যোতিষবিদ্যা ছিল না, তখন সেখানকার অধিবাসীরা সূর্য্যাস্তের পরে পশ্চিমাকাশে যখন চন্দ্রের সূক্ষ্ম কলা দেখা যায় তখন হইতে মাসের প্রথম দিন ও বারের আরম্ভ মানিতেন। এইরূপে দ্বিতীয় দিন সূর্য্যাস্তের সময় পয়লা তারিখের শেষ ও দ্বিতীয় তারিখের আরম্ভ মানিতেন। পাশ্চাত্য দেশেও সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত অর্থাৎ প্রথম রাত্রি ও শেষ দিন রূপ 'বার' মানা হয়। আজ কাল তাঁহারা রাত্রি ১২ টা হইতে বার ও তারিখের প্রারম্ভ মানিতেছেন। কিন্তু ধর্ম্ম-কার্য্যে এখনও তাঁহারা সূর্য্যাস্ত হইতেই দিনের আরম্ভ মানেন; যেমন যীশুখৃষ্টের জন্ম-দিবসের উৎসব তাঁহারা ২৪ শে ডিসেম্বর সূর্য্যাস্তের পর হইতে ২৫শে ডিসেম্বর সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত মানিয়া থাকেন। ভারতবাসী হিন্দুগণ সূর্য্যোদয় হইতে দিনের আরম্ভ মানেন ও পূর্ব্ববর্ত্তী দিনেরই শেষ-রূপে রাত্রির নাম-করণ করিয়া থাকেন। ১৯৩৩ খৃঃ হইতে পাশ্চাত্য শিক্ষা-নবীসেরা রাত্রি ১২টা হইতে পূর্ব্ববর্ত্তী বার পরবর্ত্তী বার রূপে, যেমন রবিবারকে সোমবারে, সকল কার্য্যেই পরিবর্ত্তিত করিতে শিখিয়াছেন। কারণ ঐ সন হইতেই পাশ্চাত্য 'নটিক্যাল এলম্যানাক্' (নাবিক পঞ্জিকা) আদির অনুকরণে 'মডার্ণ এষ্ট্রলজী এফীমেরাইড্‌স্' আদি পঞ্জিকা বার, দিন বা তারিখের প্রারম্ভ মধ্যরাত্রি হইতে মানিতে আরম্ভ করিয়াছে ও গ্রহস্ফুট আদিও (দিন ১২ টার পরিবর্ত্তে) মধ্যরাত্রি-সময়ের দিয়া আসিতেছে।

ইংরেজের অনুকরণে আমাদের দেশেও রাত্রি ১২টায় বার ও তারিখ বদলান প্রচার হইতেছে। আমাদের দেশে অনেকে পাশ্চাত্যানুকরণের ফলে রাত্রি ১২টায় বার ও তারিখ বদলাইয়া থাকেন, এমন কি বিশ্বাসও করেন যে ঠিক "০" ঘণ্টার (রাত্রি ১২ টার) পরই পূর্ব্ব দিন গিয়া পর দিন আরম্ভ হইল। রাজার অনুকরণ করে প্রজা, রাজধানীর অনুসরণ করে সাম্রাজ্যের লোক। সমগ্র

সাম্রাজ্যের প্রধান রাজধানী লণ্ডন শহরে যখন দিন ও তারিখ বদলানো হয়, তাহারই অনুকরণে যদি আমরাও দিন ও তারিখ বদলাই তাহা হইলে লণ্ডন শহরে গির্জ্জার রাত্রি ১২ টার ঘণ্টা যদি রেডিওতে শুনানো যায়, তবে কি ঐ শব্দ কলিকাতায় রাত্রি ১২ টায় শুনা যায়? অথবা, সকাল বেলা ষ্ট্যাণ্ডার্ড সময় ৫-৩০ মিঃ-এ বা স্থানীয় সময় ৫ টা ৫৪ মিঃ-এ শুনা যায়? যদি পরানুকরণই করিতে হয়, তবে সে অনুকরণ অক্ষরশঃ করা উচিত। আমাদের দেশে প্রচলিত সম্বতের মধ্য-ভাগ প্রায় ১লা অক্টোবর; বাঙ্গলা সনেরও ষষ্ঠ মাস আশ্বিন; অতএব বৎসরের মধ্যভাগ প্রায় আশ্বিনেরই শেষ। সুতরাং সৌর বৎসরের মধ্যভাগে, যেমন ৪ঠা অক্টোবর, ১৯৪৫ (১৮ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৩৫২ সাল) রাত্রি ১২টায় যদি লণ্ডন রেডিওতে দিন ও তারিখের পরিবর্ত্তনের সূচনা দেওয়া হয়, তবে তাহা কলিকাতায় স্থানীয় সময় ৫ টা ৫৪ মিঃ (ষ্ট্যাণ্ডার্ড ৫-৩০ মিঃ) এ শুনা যাইবে। কলিকাতায় সূর্য্যোদয়ই হইতেছে ৫ই অক্টোবর ঘঃ ৫।৫৪।৫ সেকেণ্ডে (বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা, ১৩৫২ সাল, পৃঃ ১৩১)। সুতরাং এতদনুসারেও কলিকাতায় আমাদের দিন ও তারিখ উদয়-কালেই বদলাইল; ৫ ঘণ্টা ৫৪ মিঃ পূর্ব্বে বদলায় নাই। এই জন্য ভ-চক্রে সারা বৎসরে সূর্য্যের উত্তর দক্ষিণ ক্রান্তির (declination) জন্য সূর্য্যোদয়ে কম-বেশী কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিলেও উদয়-কালেই দিন-তারিখ বদলাইবার নিয়ম আমাদের দেশে প্রাচীন ও নবীন সকল প্রকারেই রীতি-সঙ্গত ও সমীচীন, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং বঙ্গদেশে সূর্য্যোদয় হইতে প্রতি বারের আরম্ভ ও সম্পূর্ণ রাত্রি-ভাগ পূর্ব্ববর্ত্তী বারেরই শেষ ভাগ এইরূপ মানাই যুক্তিসঙ্গত।

তারিখ

"রাশি-সংক্রমণাৎ সৌরো দর্শান্তশ্চান্দ্র-মাসকঃ।" এক সংক্রান্তি হইতে পরবর্ত্তী সংক্রান্তি পর্য্যন্ত অর্থাৎ মেষের আদি স্থির বিন্দু হইতে প্রতি ত্রিশ অংশ অন্তরে সূর্য্যকেন্দ্র আসিলে এক সৌর মাস হইয়া থাকে; এবং অমান্ত চান্দ্র মাস ধরা হয়। এই সৌর-মাসের দিন সংখ্যার নাম তারিখ বা 'গতে'। পশ্চিম ভারতে ইংরাজী মাসের 'তারিখ' ও ভারতীয় সৌর-মাসের দিন-সংখ্যাকে 'গতে' বা 'সৌর-তিথি বলা হয়। কিন্তু পূর্ণ দিন-সংখ্যায়, যেমন সূর্য্যোদয় কালেই মাস পূর্ণ হয় না, দিন মধ্যে মাসান্ত হইলে সাংসারিক ব্যবহারের অসুবিধা হয়, এই জন্য প্রচলিত মাস পূর্ণ দিন-সংখ্যক। প্রচলিত প্রথা ইহাই যে মধ্যরাত্রির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে কোনও সময়ে সংক্রান্তি' হইলে বঙ্গদেশে ঐ দিনকে মাসান্ত ধরা হয় এবং মধ্যরাত্রির পরে সংক্রমণ হইলে পর দিন মাসান্ত ধরা হয়। পশ্চিম ভারতে এই মাসান্তকেই অর্থাৎ সংক্রমণ দিবসই পরবর্ত্তী মাসের মাস-পয়লা বা ১ 'গতে' মানা হয়। মাসের দিন-সংখ্যারূপ তারিখকে সৌর-তিথি বলা হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে সূর্য্যের গতি প্রতি দিনে প্রায় এক অংশ (degree) এবং এক মাসে ত্রিশ অংশ অতিক্রম করিবার ফলে প্রায় নিকটবর্ত্তী পূর্ণ অংশ

১ ভূ-কেন্দ্রীয় দৃষ্টিতে সূর্য্যের দুই প্রকারের গতি প্রতীত হয়:—(১) বার্ষিক বা অয়ন-গতি ও (২) দৈনিক গতি। (১) বার্ষিক গতিতে ভ-চক্রে মেষাদি এক এক রাশির বৈশাখাদি এক এক মাসে ভোগ হইয়া থাকে। মাসান্তে এক রাশিস্থ সূর্য্যের অন্য রাশিতে গতিকেই 'সংক্রান্তি' বলে। (২) দৈনিক গতিতে ১২টী রাশিতেই প্রত্যহ সূর্য্যের সঞ্চার হয়। যে রাশিতে উদয় হয়, দিবা রাত্রিতে ১২টী রাশির ভোগান্তে পুনরায় পরদিন, একমাস যাবৎ, ঐ রাশিতেই সূর্য্য উদিত হন। এইরূপে উদিত রাশিকে অর্থাৎ প্রায় ১৷।২ ঘণ্টা পর পর যে রাশি পূর্ব্ব ক্ষিতিজে উদিত হয়, তাহাকে "লগ্ন" বলে।

সংখ্যা (nearest integral number) পরিমিত তারিখ-সংখ্যাই গ্রহণ করা উচিত। অবশ্য ৩২ দিনের মাসে (ক্বচিৎ কথনও ৩১ দিনের মাসেও) এই নিয়মের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে। কিন্তু বঙ্গদেশে বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা ও গুপ্তপ্রেস আদি দ্বারা প্রকাশিত পঞ্জিকাসমূহে তারিখেরও অমিল দেখা যায়। দিন ১২ টা অথবা সন্ধ্যাকালে সূর্য্য-স্ফুট (বৈশাখাদি মাসজ্ঞাপক রাশিতে সূর্য্যের যত অংশ ও কলা ভুক্ত হইয়াছে) অনুসারে নিকটবর্ত্তী পূর্ণ অংশ সংখ্যা (অধিকাংশ মাসে পরবর্ত্তী পূর্ণ সংখ্যাই) মাসের দিন-সংখ্যা হওয়া উচিত। সুতরাং প্রচলিত পঞ্জিকা-সমূহে এইরূপ সিদ্ধান্ত অনুসারে কোন পঞ্জিকায় দিন-সংখ্যারূপ তারিখ মিলিয়া থাকে, তাহা পাঠকগণ অনায়াসে দৈনন্দিন রবিস্ফুট অনুসারে মিলাইয়া দেখিতে পারেন।

তিথি

ভ-চক্র ৩৬০ অংশে (degree) বিভক্ত। ইহার ৩০ অংশে এক রাশি; এই রূপ ১২ রাশিতে[২] সূর্য্যের পরিভ্রমণের সময় ৩৬৫.২৬ দিন এবং চন্দ্রের ২৭.৩২২ দিন অর্থাৎ প্রায় ২৭ দিন আট ঘণ্টা। সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়াই সকল গ্রহ, নক্ষত্রাদি পরিভ্রমণ করিতেছে। ইহারই (অর্থাৎ Heliocentric longitudes of the stars and planets এর) ভূ-কেন্দ্রীয় (Geocentric) দুরত্বই পঞ্জিকাদি গণনায় লওয়া হয়। সূর্য্য ও চন্দ্র যদি ভ-চক্রে (Zodiac) এক বিন্দু হইতে পরিভ্রমণ আরম্ভ করে, তবে উহারা পুনরায় ঐ বিন্দুতে পৌঁছিবে (৩৬০ অংশ চন্দ্রের পরিভ্রমণের পরে) প্রায় ২৯ দিন ১২ ঘণ্টা বাদে। চন্দ্রের পরিভ্রমণের আরম্ভ ধরা হয় যখন সূর্য্য ও চন্দ্র যে কোনও রাশির সম-সংখ্যক অংশে থাকে অর্থাৎ চন্দ্রস্ফুট হইতে সূর্য্যস্ফুট বাদ দিলে অংশ, কলা আদি সবই শূন্য হইবে। এই শূন্য অংশাত্মক অন্তর-কাল হইতে যখন চন্দ্র ও সূর্য্যের স্ফুটের অন্তর ১২ অংশ হয়, তখন প্রতিপদ তিথির অন্ত হয় ও দ্বিতীয়ার আরম্ভ হয়। এই প্রকারে ২৪ অংশে দ্বিতীয়ার শেষ; ৩৬ অংশের অন্তরে তৃতীয়া ও ৪৮ অংশে বা ১ রাশি ১৮ অংশে চতুর্থী তিথির অন্ত হয়। এই রূপে (৩৬০ + ১২) ৩০ তিথিতে এক চান্দ্র-মাস হয়। ১২ অংশে এক তিথি ধরিবার হেতু[৩] ইহাই যে সূর্য্যের দৈনিক গতি প্রায় ১ অংশ (১ অংশ বা ৬০ কলার কিছু বেশী সৌর মধ্যম গতি) ও চন্দ্রের দৈনিক মধ্যম গতি (mean motion) ১৩.২ অংশ। সুতরাং দিন রাত্রি ২৪ ঘণ্টায় চন্দ্র সূর্য্য হইতে ১২ অংশ আগে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। ভূ-কেন্দ্রীয় দৃষ্টিতে সূর্য্য হইতে এইরূপ চন্দ্রের বারো অংশের অগ্রগতি পরিমিত সময়কেই এক তিথি-কাল ধরা হয়। পৃথিবীতে সকল দেশেই সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ ও নক্ষত্রের গতির এক সেকেণ্ডেরও দাশমিক পরিমিত সময়ের পর্য্যন্ত শুদ্ধতা-যুক্ত পর্য্যবেক্ষণের নিমিত্ত শক্তিশালী দুরবীণ আদি সমেত পর্য্যবেক্ষণ-শালার সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং সূর্য্য ও চন্দ্রাদির শুদ্ধ স্ফুটের (longitudes) গণনা সম্ভব হওয়া সম্বন্ধে তিল মাত্র সন্দেহ কোনও শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রের আছে বলিয়া মনে হয় না। পঞ্জিকাতে প্রদত্ত তিথ্যন্তকালে পর্য্যবেক্ষণ-শালায় ধৃত চন্দ্র ও সূর্য্যের স্ফুটের অন্তর লইয়া দেখিলে যদি ঐ সময়ে তিথ্যন্ত যথার্থই সংঘটিত হয়, তবে ঐ পঞ্জিকা অবশ্যই শুদ্ধ পঞ্জিকা তাহাতে বিন্দু-মাত্র সন্দেহ নাই। গণিত-জ্যোতিষ

২ ১২ রাশি—মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন।

৩ হেতু—"অর্কাৎ বিনিঃসৃতং প্রাচীং যদ্‌
যাত্যহরহঃ শশী।
তচ্চান্দ্র-মাসম্‌ অংশৈস্তু জ্ঞেয়া দ্বাদশভিঃ তিথিঃ ॥"
—সূর্য্য-সিদ্ধান্ত।

(Astronomy) অনুসারে প্রাপ্ত চন্দ্র ও সূর্য্যের স্ফুটাংশ বাদ দিয়া উপর্য্যুক্ত রীতি অনুসারে সকল পঞ্জিকারই তিথির অন্ত বা তিথির প্রারম্ভ পরীক্ষা করা যাইতে পারে। আমাদের দেশে সূর্য্য-সিদ্ধান্তের পরে আর জ্যোতিষ-শাস্ত্রের সংস্কার হয় নাই বা সংস্কার করিবার মত যোগ্য সংস্কৃত ভাষা ও জ্যোতিষিক গণিতজ্ঞ মেধার একাধারে আজ পর্য্যন্ত আবির্ভাব হয় নাই। বরাহ মিহিরের সময়েও 'বৃহৎ-সংহিতা' আদিতে আমরা সংস্কারের আভাস পাই। সুতরাং এই দীর্ঘ কয় শতাব্দীর সংস্কার না হওয়ায় ক্রান্তি-বৃত্ততে (Plane of Ecliptic) যে অন্তর হইয়া পড়িয়াছে, সেই জন্য চন্দ্র-সূর্য্য-স্ফুট-নিরপেক্ষ প্রাচীন স্বতন্ত্র তিথি-গণনাদির গ্রন্থ[৪] অনুসারে তিথি গণনা দৃষ্ট-প্রমাণ-সহ হইতেছে না। অন্য প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অবিরোধী অজ্ঞাত বস্তু-বিষয়ক প্রমাণই শাস্ত্র। কিন্তু জ্যোতিষ-শাস্ত্রের যে অংশ (চন্দ্র, সূর্য্য আদির স্ফুট-গণনা) দৃষ্ট—প্রত্যক্ষ—প্রমাণের বিরোধী হইয়া পড়িয়াছে, তাহারই অনুকরণ করা কতখানি যুক্তিযুক্ত তাহা বুদ্ধিমান ও অন্ধ 'গোঁড়ামি' শূন্য ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন। পঞ্জিকায় মুদ্রিত তিথির উপরই হিন্দু জন-সাধারণের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ ও ধর্ম্ম-কর্ম্ম নির্ভর করে। শিক্ষিত ব্যক্তিদের উচিত সূর্য্য ও চন্দ্রের নির্ভুল স্ফুট গগন-পর্য্যবেক্ষণ-শালা হইতে জানিয়া উভয়ের ব্যবধান গ্রহণ পূর্ব্বক তিথি সাধন করিয়া দেখা যে, পি এম্ বাগচী, গুপ্তপ্রেস, বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা, বটকৃষ্ণ পাল, ডাঃ কার্ত্তিক বোস ও মিঃ এন্ সি লাহিড়ী, এম্ এ আদির প্রকাশিত পঞ্জিকা-সমূহের মধ্যে কোন কোন পঞ্জিকার তিথি আদি নির্ভুল। মান-মন্দিরে প্রত্যক্ষিত রবি ও চন্দ্রের স্ফুট হইতে গণিত তিথিই সর্ব্বতোভাবে গ্রাহ্য হওয়া উচিত। সাধারণ হিন্দু জন-সমূহের পক্ষেও দৃষ্ট-বিরুদ্ধ, মান-মন্দিরে প্রত্যক্ষিত সত্য বস্তু-বিষয়ে, অদৃষ্ট-ফল শ্রাদ্ধ-কর্ম্মে বাপ-দাদার 'নতিজা' দেখাইয়া বিড়াল বাঁধিয়া শ্রাদ্ধের বিধানরূপ, ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত মানিয়া চলা যুক্তি-সিদ্ধ নহে।

নক্ষত্র

ভ-চক্রকে ১২ ভাগে বিভক্ত করিয়া ৩০ অংশে এক রাশি ও ২৭ ভাগে বিভক্ত করিয়া (৩৬০°÷২৭) প্রতি ১৩ অংশ ২০ কলা পরিমিত ভাগে এক এক 'নক্ষত্র' ধরা হয়। এইরূপে নক্ষত্র[৫] ২৭টি; সুতরাং ২$\frac{১}{৪}$ নক্ষত্রে এক রাশি হইতেছে। যাত্রাদি সকল শুভ কর্ম্মেই বিশুদ্ধ নক্ষত্রের দরকার। প্রচলিত পঞ্জিকা-সমূহের মধ্যে নক্ষত্রেরও অন্ত বা আরম্ভ একই সময়ে দেখা যায় না। বিংশোত্তরীয়, অষ্টোত্তরীয় আদি জন্ম-দশা গণনায়ও শুদ্ধ নক্ষত্র-মান জানা আবশ্যক। নির্ভুল চন্দ্রের স্ফুট দ্বারা পঞ্জিকার নক্ষত্রেরও শুদ্ধাশুদ্ধির বিচার করা যায়। মেষরাশির চন্দ্রস্ফুট যখন ১৩ অংশ ২০ কলা হইবে, তখন অশ্বিনী নক্ষত্রের শেষ হইবে ও ভরণী আরম্ভ হইবে; এই রূপে মেষের ২৬ অংশ ৪০ কলায় চন্দ্র উপস্থিত হইলে ভরণী নক্ষত্রের অন্ত হইবে। সুতরাং বাজারে প্রচলিত সকল পঞ্জিকারই নক্ষত্রান্ত-কালও শুদ্ধ কি না তাহা জানিবার উপায় মান-মন্দিরে প্রত্যক্ষিত

৪ যখন চন্দ্র-সূর্য্যনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র 'তিথি-গণনার' গ্রন্থ ও সারনী সমূহ তৈয়ার করা হইয়াছিল, তখন তাহাতে তখনকার ক্রান্তি-বৃত্তের সংস্কার আদি অবশ্য অন্তর্ভুক্ত ছিল; কিন্তু এত দীর্ঘ দিনের সংস্কার উহাতে না হওয়ার ফলেই ঐ সকল প্রাচীন গ্রন্থানুযায়ী গণিত তিথি-সমূহ ইদানীন্তন ক্রান্তি-বৃত্তের অন্তরাদির জন্য ও বিবিধ সংস্কার-শুদ্ধি-যোগ্য জটিল চান্দ্র-গতি-জন্য সংস্কার রহিত হওয়ায় নির্ভুল হইতেছে না।

৫ ২৭ নক্ষত্র—অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্ব্বফাল্গুনী, উত্তরফাল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্ব্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ ও রেবতী।

চন্দ্রের নিভুর্ল স্ফুট (Geocentric Longitude) জানিয়া যে দিন যে সময়ে এই সকল পঞ্জিকার অশ্বিনী-নক্ষত্রান্তকাল দেওয়া হইয়াছে, ঐ সময়ে চন্দ্রের স্ফুট ১৩ অংশ ২০ কলা যথার্থতঃ হয় কি না, তাহা দেখা। এই রূপে ১৩ অংশ ২০ কলা পরিমিত সময়ের চন্দ্র-স্ফুটের 'মাপকাঠি' লইয়া সকল নক্ষত্রান্তকালই পঞ্জিকায় পরীক্ষা করা যাইতে পারে। তাহা হইলে দেখা যাইবে কোন কোন খানি শুদ্ধ ও ভ্রমশূন্য পঞ্জিকা।

যোগ

বিষ্কুম্ভ, প্রীতি, আয়ুষ্মান্ আদি ২৭টী যোগ[৬]। রবি ও চন্দ্রের স্ফুট যোগ করিলে এই 'যোগ' পাওয়া যায়। ২৭টী যোগ বলিয়া প্রতি যোগের ব্যাপকতা ১৩ অংশ ২০ কলা। যখন রবি ও চন্দ্রের নিভুর্ল স্ফুট যোগ করিলে ১৩ অংশ ২০ কলা হয়, তখনই প্রথম যোগ (বিষ্কুম্ভ) শেষ হয় ও দ্বিতীয় (প্রীতি) যোগ আরম্ভ হয়। এইরূপে সকল যোগ সাধিত হয়। যে সকল পঞ্জিকায় রবি ও চন্দ্রের নিভুর্ল স্ফুট গণিত হয় না, সেই সকল পঞ্জিকার তিথি ও নক্ষত্রের ন্যায় যোগও অশুদ্ধ ও তাহাদের অন্তকালও ভ্রান্ত-সময়-জ্ঞাপক, তাহাতে সন্দেহ নাই।

করণ

'করণ' ১১টী[৭]। 'বব' হইতে 'বিষ্টি' ৭টী চর-করণ ও 'শকুনি' হইতে 'কিস্তুঘ্ন' নামক ৪টি ধ্রুব-করণ। শুক্লা প্রতিপদের শেষার্দ্ধ 'বব' ও দ্বিতীয়ার প্রথমার্দ্ধ 'বালব' ইত্যাদি ক্রমে কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত প্রত্যেক তিথিতে দুইটি করিয়া 'করণ' হয়। অবশিষ্ট 'শকুনি' আদি চারিটী করণ কৃষ্ণা চতুর্দশীর শেষার্দ্ধ হইতে শুক্লা প্রতিপদের প্রথমার্দ্ধ ভাগ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এই তিথি ভিন্ন শকুনি আদি করণ-চতুষ্টয় অন্য কোনও তিথিতে হয় না, এই জন্য ইহাদিগকে ধ্রুব-করণ বলে। সুতরাং দেখা যাইতেছে পঞ্জিকার অন্যতম অঙ্গ 'করণ' গণনাও তিথির অবয়বের উপরই নির্ভর করিতেছে এবং তিথিও রবি ও চন্দ্রের নিভুর্ল স্ফুটের উপরই নির্ভর করে।

আদি-বিন্দু

'আদি-বিন্দু' হইতে পঞ্জিকার সমস্ত গ্রহাদি সংস্থান নিরূপিত হয়। কিন্তু গোল-বৃত্ততে কোথাও অন্ত বা আদি-বিন্দু নাই। যেটী ইচ্ছা সেইটীই 'আদি' বিন্দু ধরা যায়। কিন্তু জ্যোতিষের গণনার সুবিধার জন্য একটা স্থির ভাবে আদি-বিন্দু লওয়া দরকার। পাশ্চাত্য জ্যোতিষে বাসন্ত-ক্রান্তি-পাত-বিন্দুকে (Vernal Equinoxial point) 'আদি-বিন্দু' মানা হয়। কিন্তু ঐ বিন্দু স্থির নহে, বৎসরে উহা প্রায় ৫০.২৬ সেকেণ্ড পশ্চাদ্‌গমন করিয়া থাকে। এই পশ্চাদ্‌গমনের কারণ এই যে পৃথিবী উত্তর-দক্ষিণে (মেরুর দিকে) চ্যাপটা (flat) ও বিষুব-বৃত্তের (Equator) দিকে ঝুঁকানো (bulging)। মেরুদ্বয়ের স্পর্শকারী ব্যাস (Diameter) বিষুব-বৃত্তের ব্যাস হইতে ২৬ মাইল কম। উক্ত ক্রান্তি-পাত বিন্দু, যখন সূর্য্য দক্ষিণ হইতে উত্তরে যাইবার পথে বিষুব-বৃত্তকে লঙ্ঘন করে, তখনকার। এই 'বিন্দু' হইতেই বিষুব-বৃত্তের (Equator) ও ক্রান্তি-বৃত্তের (Ecliptic) দূরত্ব অংশ ও কলা (degrees and minutes) রূপে লওয়া হয়; এবং এই বিন্দুকে মেষরাশির আরম্ভ (First point of Aries, the first sign of the Zodiac) ধরা হয়। পৃথিবীর বার্ষিক গতিতে, পৃথিবী সম্পূর্ণ গোল

৬ ২৭ যোগ—বিষ্কুম্ভ, প্রীতি, আয়ুষ্মান্, সৌভাগ্য, শোভন, অতিগণ্ড, সুকর্ম্মা, ধৃতি, শূল, গণ্ড, বৃদ্ধি, ধ্রুব, ব্যাঘাত, হর্ষণ, বজ্র, অসৃক্, ব্যতীপাত, বরীয়ান্, পরিঘ, শিব, সিদ্ধ, সাধ্য, শুভ, শুক্র, ব্রহ্ম, ইন্দ্র ও বৈধৃতি।

৭ ১১ করণ—বব, বালব, কৌলব, তৈতিল, গর, বণিজ, বিষ্টি এবং শকুনি, চতুষ্পাদ, নাগ ও কিস্তুঘ্ন।

না হওয়ার ফলে, একটু পরিবর্ত্তন ঘটে; অর্থাৎ সূর্য্য বৎসরে যে দিন যে সময়ে পৃথিবী-পৃষ্ঠস্থ বিষুব-বৃত্তের (Geographical বা Mundane Equator) ঠিক উপরে আসিল, আগামী বৎসরে বিষুব-বৃত্তের উপরে (পৃথিবীর গতি-ভঙ্গীর, পূর্ব্বোক্ত কারণে, অনিয়মবশতঃ) আর গত বৎসরের ঠিক সেই 'বিন্দুর' উপরে উপস্থিত হয় না। সূর্য্যাদি গ্রহ, নক্ষত্রের ক্রান্তি-বৃত্তের (Plane of Ecliptic) কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে না; কিন্তু পৃথিবীর গতির জন্য বিষুব-বৃত্তের (Plane of Equator) প্রতিবৎসরে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে এই ক্রান্তি-পাত-বিন্দু স্থির নহে; সুতরাং পাশ্চাত্য জ্যোতিষে গৃহীত মেষের এই আদি-বিন্দুও স্থির নহে। হিন্দু জ্যোতিষ স্থির আদি-বিন্দু গ্রহণ করে। বাসন্ত-ক্রান্তি-পাতের দিন, যে দিন দিবা ও রাত্রি সমান, সন্ধ্যায় সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে যদি পূর্ব্ব-ক্ষিতিজে কোনও উজ্জ্বল তারা দেখা যায়, তবে তাহার ঠিক ১৮০ অংশ দূরে ক্রান্তি-পাত-বৃত্তে মেষ-রাশির আরম্ভক ঐ আদি-বিন্দু হইবে। কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে এই দিনেই (বাসন্ত-ক্রান্তি-পাত-দিবসে) সন্ধ্যায় পূর্ব্ব ক্ষিতিজে (eastern horizon) চিত্রা নক্ষত্র (Alpha Virginis) উদিত হইয়াছিল; এবং এই তারা হইতে ১৮০ অংশ দূরে (অর্থাৎ সূর্য্যোদয়-কালে) বিষুব-বৃত্তের উপর পূর্ব্বোক্ত আদি-বিন্দুও এক (একত্রে) ছিল। ঐ বৎসরে সূর্য্যের 'মীন' ছাড়িয়া 'মেষে' সংক্রমণের দিন অর্থাৎ চৈত্র মাস শেষ হইয়া বৈশাখের আরম্ভ-কালীন সংক্রান্তি দিবসে এই বাসন্ত ক্রান্তি-পাত (Vernal Equinox) সংঘটিত হইয়াছিল। ঐ দিনের ঐ (সম্মিলিত) বিন্দুকেই[৮] স্থির আদি-বিন্দু রূপে হিন্দু-জ্যোতিষে লওয়া হইয়াছে।

অয়নাংশ

উপর্য্যুক্ত স্থির আদি-বিন্দু হইতে সকল স্পষ্ট বাসন্ত-ক্রান্তি-পাত-বিন্দুর 'অন্তর' অয়নাংশ। যে দিন যে বৎসরে মেষ-সংক্রান্তি দিবসে (চৈত্র-গতে বৈশাখের আরম্ভ সময়ে) দিন ও রাত্রি সমান (Equinox) ছিল ঐ দিন বিষুব-বৃত্তের (Plane of Equator) ও ক্রান্তি-বৃত্তের (Plane of Ecliptic) উপরে মেষ-রাশির প্রারম্ভিক 'আদি' বিন্দু একই ছিল। অর্থাৎ পাশ্চাত্য জ্যোতিষে গৃহীত 'সচল' আদি-বিন্দু ও প্রাচ্য জ্যোতিষের মেষের 'স্থির' আদি-বিন্দু এক অভিন্ন, ছিল। পরে প্রতি বৎসরে ঐ বাসন্ত-ক্রান্তি-পাত-বিন্দু প্রায় ৫০ সেকেণ্ড (মধ্যম পরিমাণ) পশ্চাদ্ গমন করিতে থাকে (ইদানীং ৫০.২৬ সেকেণ্ড)। এই রূপে ৭২ বৎসর পরে ১ অংশ অর্থাৎ বৈশাখ-সংক্রান্তির (চৈত্রের শেষ) এক দিন পূর্ব্বে ঐ বাসন্ত-ক্রান্তি-পাত (Equinox) সংঘটিত হয়। এই বিন্দু-দ্বয়ের ঐক্য ২৮৫' ৪৫ খৃষ্টাব্দে হইয়াছিল; এবং তাহার প্রায় ২৬০০০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে বা পরেও ঐক্য হইবে। এইরূপে ৫০.২৬ সেকেণ্ড বা প্রায় ৭২ বৎসরে এক অংশ বেগে সরিতে সরিতে বাসন্ত-ক্রান্তি-পাত-বিন্দু ১৩৫২ সনে, ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে ২১এ মাঘ ঘঃ ১১।২৭ মিঃ কলিকাতা সময়ে হইবে, যখন সূর্য্য-স্ফুট মীন-রাশির ৬ অংশ ৫৫ কলা (রাশ্যাদি, ১১ ৬° ৫৪′ ৩১″ বিঃ সিঃ পঃ) ও চন্দ্র স্ফুট রাশ্যাদি ৬।১৫°।৩৯′ হইবে। এই সূর্য্য-স্ফুটে অংশাদি ২৩° ৫′ ২৯″ যোগ দিলে

[৮] হিন্দু-মতেও 'চিত্রা' হইতে কিংবা 'রেবতী' (যেটী অতি ক্ষুদ্র তারা—5th Magnitude এর) হইতে দূরত্ব লইয়া 'আদি-বিন্দু' গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা লইয়া মত-ভেদ থাকিলেও ভারতীয় মিঃ কেতকার আদি ও অন্যান্য বিশিষ্ট জ্যোতিষীদের গবেষণার ফলে চিত্রা হইতেই আদি-বিন্দু লওয়া যুক্তিযুক্ত প্রমাণিত হইয়াছে। বরাহমিহিরের 'পঞ্চ-সিদ্ধান্তিকা' ও তদুদ্ধৃত 'সূর্য্য-সিদ্ধান্ত' ও এই 'চিত্রা' নক্ষত্রের গ্রহণের বিরোধী নহে।

আগামী মেষ সংক্রান্তি (১৩৫৩) বা চৈত্র গিয়া বৈশাখ-প্রদ সময়ের সূর্য্য স্ফুট মেষের ০ অংশ ০ কলা পাওয়া যাইবে। একটী দৃষ্টান্ত লইয়া বিষয়টী দেখা যাউক—'বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা'য় ১৩৫২ সনের প্রারম্ভে ১৩ই এপ্রিল ঘঃ ৩।৯ মিঃ অপরাহ্নে সূর্য্য-সংক্রমণ (বিঃ সিঃ পঃ, পৃঃ ১) হয় অর্থাৎ রবি মেষে প্রবিষ্ট হন। ১৩৫১ সনে, ১৯৪৫ খৃঃ ২১ শে মার্চ্চ ঘঃ ৫।৩১ মিঃ প্রাতঃকালে বাসন্ত-ক্রান্তি-পাত-বিন্দু সময়ে সূর্য্য স্ফুট রাশ্যাদি ১১—৬—°৫৫′—২১″ বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে পাওয়া যায়। সুতরাং রাশ্যাদি ১২ ০°—০′—০″ (মেষ-প্রারম্ভ) হইতে উহা বিয়োগ করিলে 'অন্তর' ২৩°—৪′—৩৯″ পাওয়া যায়। এই অন্তরই (২৩ অংশ ৪ কলা ৩৯ বিকলা) ১৩৫১ সনের চৈত্র মাসের ও উপর্য্যক্ত ২৩°—৫′—২৯″ অংশাদিই ১৩৫২, চৈত্রমাসের বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকায় গৃহীত অয়নাংশ। এই রূপে আগামী ১৩৫৩ সনে বৈশাখ মাসে বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা মতে ২৩ অংশ ৫ কলা ৩৩ বিকলা অয়নাংশ[৯] হইবে। বঙ্গদেশীয় অপর একখানি বিশেষ প্রচলিত পঞ্জিকায় (পৃঃ ১ এ) অয়নাংশ ১৩৫২ সনের প্রারম্ভদিবসের ২১° — ৪১′ — ২৪″ ধরা হইয়াছে ও সংক্রান্তি-সময় ১৩ই এপ্রিল, ১৯৪৫ দিবা ঘঃ ১।২৪।৪৯ দেওয়া আছে। সূর্য্যের গতি ১ অংশে পূর্ণ এক দিন ধরিলেও তদনুসারে ২১ অংশে ২১ দিন পূর্ব্বে বাসন্ত-ক্রান্তি-পাত সংঘটনের দিবস পাওয়া যায়, অর্থাৎ এই পঞ্জিকা মতে তাহা হইলে ২৩ শে মার্চ্চ বাসন্ত-ক্রান্তি-পাত (Vernal Equinox) দিবস হওয়া উচিত। কিন্তু প্রতি ৭২ বৎসরে প্রায় এক দিন পশ্চাদ্ গমন করিতে করিতে ইদানীং, সকলেই জানেন যে, ২১শে মার্চ্চ বাসন্ত-ক্রান্তি-পাত (Vernal Equinox) ও ২৩শে সেপ্টেম্বর শারদ-ক্রান্তি-পাত (Autumnal Equinox) সংঘটিত হইতেছে। ভবিষ্যতে কয়েক বৎসর পরে এই দিন ২০শে মার্চ্চে সরিয়া যাইবে; কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইহা ২২শে মার্চ্চ দিবসে ছিল। অতএব এই দ্বিতীয় পঞ্জিকা খানির অয়নাংশানুসারে প্রাপ্ত ক্রান্তি-পাত-বিন্দু (২৩শে মার্চ্চে) দৃষ্ট-সংঘটন-বিরুদ্ধ হইয়া পড়িতেছে।

উপর্য্যুক্ত বার্ষিক অয়ন-গতির অন্তর-সমূহের (Annual precession of Equinoxes) সমগ্র যোগ ফল (Total precessions of Equinoxes) ইদানীন্তন "অয়নাংশ" যাহা পঞ্জিকায় দেওয়া হয়। এই অয়নাংশ 'সায়ন" চন্দ্র-সূর্য্যাদির স্ফুটে বাদ দিয়া প্রাপ্ত 'নিরয়ন' স্ফুট যুক্ত স্পষ্ট চন্দ্র ও রবি হইতেই তিথি ও নক্ষত্রাদি পঞ্চাঙ্গ গণনার শুদ্ধতা সহজেই পরীক্ষা করা যায়। ইদানীং ক্রান্তি-বৃত্ত (Plane of Ecliptic) বিষুব-বৃত্ত (Plane of Equator) হইতে ২৩°—২৬′—৪৬″ পরিমিত অন্তরে[১০] অবস্থিত হইয়াছে। এই ক্রান্তি-বৃত্তে গতিশীল চন্দ্র সূর্য্যাদি গ্রহগণের ভূ-কেন্দ্রীয় (Geocentric) দূরত্ব (Longitudes বা স্ফুট) যাহা গগন-পর্য্যবেক্ষণ-শালায় (মানমন্দিরে) গণিত হয়, তাহাই 'সায়ন' স্ফুট অর্থাৎ সমগ্র বার্ষিক অয়নগতি দ্বারা বিচ্ছিন্ন বা পরিবর্ত্তনশীল অংশ যাহাতে সংস্কার (বিয়োগ) করা হয় নাই। এই সায়ন-স্ফুট হইতে, পূর্ব্বোক্ত স্থির আদিবিন্দু হইতে গৃহীত অন্তর রূপে

৯ এই প্রবন্ধটী লিখিবার সময় অগ্রহায়ণ মাস, ১৩৫২। ১৩৫৩ সালের 'বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা' এখনও মুদ্রিত হয় নাই। উহা মুদ্রিত হইলে, আমরা আশা করি, তাহাতে ১লা বৈশাখ, ১৩৫৩ সনের অয়নাংশ ২৩ অংশ ৫ কলা ৩৩ বিকলা দেখিতে পাইব। বার্ষিক অয়ন-গতির জন্য সংস্কার বশতঃ অতি অগণ্য এক 'বিকলার' মাত্র ইহাতে পার্থক্য হইলেও হইতে পারে।

১০ ইহাই ইদানীন্তন 'True' obliquity of the Ecliptic : 'mean'—23° 26′ 46·7″. (Vide, "Indian Ephemeris, 1946", Page 5; By Mr. N. C. Lahiri, M. A.)

সমগ্র বার্ষিক অয়নাংশ (Total precessions of Equinoxes, since the conjunction of the 'fixed' and 'movable' first points of Aries) বিয়োগ করিলে নিরয়ন গ্রহ-স্ফুট পাওয়া যায়। এই নিরয়ন গ্রহ-স্ফুটই বঙ্গীয় সকল দিন-পঞ্জিকার বামপার্শ্বে স্তম্ভে দেওয়া থাকে। পাশ্চাত্য (Raphaels Astronomical Ephemeris, Nautical Almanac, Modern Astrology Ephemeris, Connaissance des Jemp আদি) পঞ্জিকা-সমূহে যথা-সাময়িক গণিত 'সায়ন' গ্রহ-স্ফুট দেওয়া থাকে। পাশ্চাত্য দৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকার 'সায়ন' গ্রহস্ফুট হইতে ইদানীন্তন 'অয়নাংশ' বিয়োগ করিলে বাঙ্গলা দেশীয় বা ভারতীয় শুদ্ধ পঞ্জিকা-সমূহের সকলেরই "নিরয়ন" গ্রহস্ফুট অবশ্য মিলিবে। দৃষ্টবস্তু বিষয়ে 'বিকল্প' হইতে পারে না। সুতরাং যে পঞ্জিকায় এই দৃক্‌-সিদ্ধ ফল মিলিবে না "তাহাও ঠিক, এটীও ঠিক" এরূপ বিভিন্ন পঞ্জিকায় দৃষ্ট বস্তু-বিষয়ক সংঘটনে বিরুদ্ধ কল্পনা কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে? সুতরাং প্রাচ্য ও পশ্চাত্য সকল দেশের গবেষণা-মূলক দৃক্‌-সিদ্ধ জ্যোতিষ-সিদ্ধান্ত বিরোধী ভ্রান্ত পঞ্জিকা-সমূহের সূর্য্য ও চন্দ্র স্ফুটের গ্রহণে, ও তদনুযায়ী ভ্রমপূর্ণ তিথি, নক্ষত্র, যোগ ও করণাদি যুক্ত পঞ্জিকার ব্যবহারে, হিন্দুর ক্রিয়া-কলাপের—পূজা, পার্ব্বণ, জন্ম-তিথি, বিবাহ, শ্রাদ্ধ ও ব্রত, উপবাস আদি ধর্ম্ম-কর্ম্ম-সমূহের—যথার্থ দিন, সময় ও লগ্নের নিরূপণ ঠিক ঠিক না হওয়ায় কত দূর ধার্ম্মিক অনুষ্ঠানের ও যাত্রাদি শুভ কর্ম্মের[১১] বিপর্য্যয় ঘটিতেছে, তাহার অনুসন্ধান ও বিচার বুদ্ধিমান্ শিক্ষিত ব্যক্তি-মাত্রেরই অবশ্য করা যুক্তিসঙ্গত।

১১ নির্ভুল গ্রহাবস্থান ও গ্রহ-স্পষ্ট এবং শুদ্ধ নক্ষত্র-মানাদি যুক্ত পঞ্জিকা অবলম্বনে 'জন্ম-কুণ্ডলী নির্ম্মিত না হইলে কোষ্ঠী-বিচার-জন্য শুভাশুভ সূক্ষ্ম ফলও ঠিক ঠিক মেলে না।

মহাপুরুষ মহারাজের কথা

স্বামী অপূর্বানন্দ

বেলুড় মঠ, ১৯২৩ সনের মে মাস—সিন্ধু-দেশবাসী জনৈক ভক্তের দীক্ষা হয়েছে। ভক্তটী ইতিপূর্বে স্বপ্নে মন্ত্র পেয়েছিলেন, কিন্তু তার মর্ম কিছুই বুঝতে না পারায় তাঁর মন খুবই অস্থির হয়েছিল। তিনি মহাপুরুষ মহারাজকে চিঠির দ্বারা তাঁর মনের সব অবস্থা জানিয়ে তাঁকে দর্শন করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অনুমতি পেয়ে ভক্তটি সুদূর সিন্ধুদেশ হতে প্রাণের আবেগে ছুটে এসেছেন বেলুড়মঠে মহাপুরুষজীর চরণপ্রান্তে।

গঙ্গাজলে হাতমুখ ধুয়ে নববস্ত্র পরিধান করে বেলা প্রায় ১০টার সময় মহাপুরুষজী ঠাকুরঘরে গেলেন এবং যথাবিধি শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজাদি সমাপনান্তর সেই ভক্তটীকে দীক্ষা দিলেন। দীক্ষাদি শেষ করে ছাতের উপর দিয়ে ঠাকুরঘর হতে নিজ প্রকোষ্ঠে যখন ফিরে এলেন তখন তাঁর সমস্ত মুখ-মণ্ডলে এক দিব্যভাব ফুটে বেরুচ্ছিল। চেয়ারে উপবেশন না করে ভাবাবেশে টলতে টলতে হাততালি দিয়ে গাইতে লাগলেন—

"সদ্‌গুরু পাওয়ে ভেদ বতাওয়ে জ্ঞান করে উপদেশ।
কোয়লেকা ময়লা ছুটে যব্ আগ্ করে পরবেশ॥"

সে যে কী তন্ময়তা তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষু, মন যেন কোন্ অতীন্দ্রিয় রাজ্যে বিচরণ করছে আর তিনি তদ্গতচিত্ত হয়ে সারা ঘরময় পায়চারা করে ঐ দু লাইন মাত্র গাইছেন। মুখমণ্ডল রক্তিমাভ। যেন জোর করে কখনও একটু চোখ মেলে পশ্চিম দিকের দেয়ালে স্থাপিত শ্রীশ্রীঠাকুরের বড় ছবিখানির দিকে এক একবার একটু তাকাচ্ছেন। বাহ্য জগতের কোনই হুঁস নেই। তাঁর স্বভাবমধুর কণ্ঠস্বর খুবই মিষ্ট শোনাচ্ছিল। অনেকক্ষণ ঐভাবে কেটে গেল। শেষটায় এলোথেলো ভাবে চেয়ারে উপবেশন করে চক্ষু মুদ্রিত করে বসে রইলেন। মাঝে মাঝে অস্ফুটস্বরে হৃদয়ের অন্তস্তল হতে "জয় প্রভু! দীনশরণ! করুণাময় প্রভু! জয় মা!" উচ্চারণ করছিলেন।

দীক্ষিত ভক্তটী মহাপুরুষজীর নির্দ্দেশানুসারে এতক্ষণ ঠাকুরঘরের বারান্দায় বসে ধ্যান করছিলেন। পরে তিনি ঠাকুরঘর হতে এসে খুব ভক্তিভরে মহাপুরুষজীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হয়ে তাঁর চরণতলে উপবেশন করে করযোড়ে অশ্রুপূর্ণলোচনে বললেন,—"আপনার দয়ায় আজ প্রাণে শান্তিলাভ করেছি। স্বপ্নে মন্ত্র পাওয়া অবধি মন বড়ই অস্থির হয়ে পড়েছিল, কিছুতেই শান্তি পাচ্ছিলাম না, একেবারে পাগলের ন্যায় হয়ে পড়েছিলাম। আজ আপনার মুখ হতে স্বপ্নপ্রাপ্ত সেই মন্ত্রই পেয়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে স্বপ্নে যা দেখেছিলাম সবই সত্যি এবং স্বপ্নে আমায় যিনি কৃপা করেছিলেন তিনি আপনিই।"

মহাপুরুষজী—"বাবা, ঠাকুরই তোমাকে তাঁর শ্রীচরণে আশ্রয় দেবেন বলে কৃপা করেছেন। তিনি কৃপাময়, অহেতুক কৃপাসিন্ধু; জীবের উদ্ধারের জন্যই এযুগে নরদেহ ধারণ করে এসেছেন। আমরা তাঁর চরণাশ্রিত দাস মাত্র। কৃপা করবার মালিক তিনি। স্বয়ং ভগবানই কৃপা করতে পারেন—আমি তো এই জানি। শাস্ত্রেও আছে যে যখন কোন সদ্‌গুরু শিষ্যকে দীক্ষা দেন তখন স্বয়ং ভগবানই সেই গুরুহৃদয়ে আবির্ভূত হয়ে শিষ্যের প্রাণে শক্তিসঞ্চার করেন। গুরু স্বয়ং ভগবান। মানুষ কখনও গুরু হতে পারে না। তোমার পূর্বজন্মার্জিত বহু সুকৃতির ফলে পতিতপাবন পরম দয়াল শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে আশ্রয় পেলে। আজ আমি তোমাকে তাঁর চরণে সঁপে দিয়েছি—তাঁর চরণে উৎসর্গ করেছি। আজ হতে ঠাকুর তোমার ইহকাল পরকালের সমস্ত ভার গ্রহণ করেছেন।

ভক্ত—"আমি তো মহারাজ, ঠাকুরকে দেখতে পাচ্ছিনে। আমি জানি যে আপনিই কৃপা করেছেন।"

মহাপুরুষজী—"তা তুমি ভাবতে পার কিন্তু আমি জানি যে ঠাকুরই তোমায় কৃপা করেছেন। আজ হতে তুমি তাঁর হয়ে গেলে। এখন হতে ঠাকুরকে আরও দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর। অন্তরে বাহিরে তাঁকে দেখবার চেষ্টা কর। তাঁকে খুব আপনার মনে করবে। এ সংসার তো দু দিনের। পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয় স্বজন—এসব সম্বন্ধ মায়িক—দু দিনকার। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমাদের যে সম্বন্ধ তা চিরকালের, দেহের নাশে সে সম্বন্ধ নষ্ট হয় না। আজ যে অমোঘ বীজ তোমার হৃদয়ে বপন করা হল তা প্রেমভক্তিরূপ বারিসিঞ্চনে দিন দিন বর্ধিত হয়ে মহা অমৃতবৃক্ষে পরিণত হবে এবং চতুর্বর্গ ফল দান করে তোমার সমগ্র জীবন মধুময় করে দেবে। তুমি পূর্ণকাম হয়ে যাবে।"

ভক্ত—"আমি তো মায়ামুগ্ধ সংসারী জীব। নানা বন্ধনের ভেতর পড়ে আছি। সংসার বিপাকে ডুবে গিয়ে যাতে আপনার শ্রীচরণ ভুলে না যাই এই আশীর্বাদ করুন। সংসারে কিভাবে থাকতে হবে, যাতে একেবারে ডুবে না যাই—সে বিষয়ে একটু উপদেশ দিন। এ অধমকে যে করেই হোক্ ত্রাণ করতেই হবে।"

এই বলে ভক্তটী সাশ্রুনয়নে মহাপুরুষজীর চরণযুগল ধারণ করলেন। ভক্তটীর ব্যাকুলতা দেখে তাঁর প্রদীপ্ত মুখমণ্ডলে করুণার ছবি ফুটে উঠল। তিনি কম্পিতস্বরে স্নেহভরে বললেন—"বাবা, তোমাকে তো বলেছি, আজ তোমাকে ঠাকুরের চরণে সঁপে দিয়েছি, আর তিনি তোমায় গ্রহণও করেছেন, তোমার সব ভার তিনি নিয়েছেন। তোমাকে ত্রাণ করবেন বলেই তো তিনি তোমার প্রাণে দিব্য প্রেরণা দিয়ে এখানে এনেছেন। আজ তোমার নবজীবন লাভ হল। ঠাকুর যদি সত্য হন তো আমরা যা বলছি তাও সত্য। তুমি কায়মনোবাক্যে তাঁর শরণাপন্ন হও। তোমার সমস্ত ভার তাঁর উপর সঁপে দিয়ে ঠাকুরকে কাতর প্রাণে ডেকে যাও। ব্যস, আর কিছু করতে হবে না। তিনি সর্বাবস্থায় তোমায় দেখবেন। আর যে সংসারে কি ভাবে থাকতে হবে জিজ্ঞেস করছ তা ঠাকুরের কথাতেই আছে যে, সংসারে সব কাজ করবে কিন্তু মন রাখবে ঈশ্বরে। যেমন বড়মানুষের বাড়ীর দাসী সব কাজ কচ্ছে কিন্তু সারাটী মন পড়ে আছে দেশে নিজের বাড়ীর দিকে। তেমনি সংসারে থাকতে হবে অনাসক্ত হয়ে—স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়স্বজন সকলেরই সেবা-যত্ন করবে কিন্তু প্রাণে প্রাণে জানবে যে তোমার একমাত্র আপনার জন শ্রীভগবান। তিনি ছাড়া তোমার আর আপনার কেউ নেই। তাবলে স্ত্রীপুত্রদের অবহেলা করবে না। ভগবানের প্রেরিত জীব জ্ঞানে তাদের সেবা করবে, তাদের সঙ্গে ভগবৎ প্রসঙ্গ করবে এবং তাদের মনও যাতে ভগবন্মুখী হয় তার চেষ্টা করবে। সংসারে থাকবে, কিন্তু মন যেন সংসারে আবদ্ধ হয়ে না থাকে। আর ঠাকুর যেমন বলতেন—'বিচার করা খুব দরকার। সংসার অনিত্য, ঈশ্বরই একমাত্র নিত্য ও সত্য বস্তু। টাকায় কি হয়? ভাত হয়, ডাল হয়, কাপড় হয়, থাকবার জায়গা হয়, এই পর্যন্ত। কিন্তু তাতে ভগবান লাভ হয় না। অতএব টাকা কখনও জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না। এর নাম বিচার।

"খুব বেশী worldly ambition (সাংসারিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা) মনে স্থান পেতে দিও না। সাধারণ ভাবে জীবনযাত্রার বন্দোবস্ত তো করে নিয়েছ। তাতেই সন্তুষ্ট থাকবে। মনের স্বাভাবিক গতিই নিম্নদিকে—কামকাঞ্চন ও মানযশ ইত্যাদির দিকে। সেই ছড়ানো মনকে গুটিয়ে এনে শ্রীভগবানের পাদপদ্মে লীন করতে হবে। জীবনে সব চাইতে বড় ambition (উচ্চাকাঙ্ক্ষা) ভগবান্ লাভ।"

খানিক পরে জনৈক সেবক শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদ মহাপুরুষজীর আহারার্থে নিয়ে এল। তিনি খাবার আসনে বসলেন কিন্তু দীক্ষা দিয়ে ঠাকুর ঘর হতে আসার পর হতেই খুব অন্তর্মুখ ভাব। কেমন যেন একটা নেশার ঘোর লেগেই আছে—চক্ষু প্রায় নিমীলিত, আহারের দিকে মোটেই মন নেই—অভ্যাসবশতঃ নিঃশব্দে ধীরে ধীরে খেয়ে যাচ্ছেন। একটু কথাবার্তা বললে হয় তো তাঁর মন আহারের দিকে আসতে পারে এই ভেবে সেবক নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে, একটু প্রসঙ্গের অবতারণা করার উদ্দেশ্যে বলল—"মহারাজ, আজ দীক্ষা দিতে ঠাকুরঘরে অনেকক্ষণ থাকতে হয়েছিল।" মহাপুরুষজী যেন সুপ্তোত্থিতের ন্যায় একটু চমকে উঠে বল্লেন—"হাঁ। আহা লোকটী খুবই ভক্তিমান্। ওর উপর ঠাকুরের বিশেষ কৃপা আছে, তা না হলে অত ভক্তি হয় না। কে কেমন আধার দীক্ষা দেবার সময় বুঝতে পারা যায়। যাদের আধার খুব ভাল তারা মন্ত্র পাওয়া মাত্রই বিহ্বল হয়ে পড়ে, অশ্রু, পুলক, কম্পন—এই সব হতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রতা হয়ে উঠে, আর

সহজেই ধ্যানস্থ হয়ে পড়ে। এ ভক্তটীও দেখলাম তাই। মন্ত্র শোনামাত্রই সর্বাঙ্গে কম্পন ও একটু পরেই পুলক হতে লাগল এবং ক্রমে ধ্যানস্থ হয়ে পড়ল। আর কী প্রেমাশ্রু! দু চোখের কোণ দিয়ে ধারা বয়ে পড়ছিল। আমারও খুব আনন্দ হচ্ছিল। ঠিক ঠিক ভক্তকে মন্ত্র দিয়ে খুবই আনন্দ হয়; মন্ত্র দেওয়া সার্থক হয়। যাদের মন্ত্র পাবার ঠিক সময় হয়েছে তাদের হৃদয়পদ্ম যেন মন্ত্র পাবার জন্য বিকশিত ও উন্মুখ হয়ে থাকে। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল ঠাকুরের দয়ার কথা। আহা! তিনি কত ভাবে কত লোককে কৃপা করছেন। দেশ বিদেশের কত লোক যে তাঁর কৃপা পাচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। ধন্য প্রভু!"

সেবক—"দীক্ষামন্ত্র পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সকলের তো মহারাজ, এতটা উদ্দীপন হয় না। যাদের অত উচ্চ আধার নয় আপনাদের কৃপা পেয়ে তাদের কি কোন কল্যাণ হবে না?"

মহাপুরুষজী—"তা কেন হবে না? তাদেরও হবে, তবে একটু দেরীতে হবে। সিদ্ধ গুরুর এমন শক্তি আছে যে শিষ্যের মনকে তৈরী করে নিতে পারেন এবং খুব অল্প দিনের মধ্যে তার জীবনের গতি আধ্যাত্মিকতার দিকে ফিরিয়ে দিতে পারেন। সিদ্ধ মন্ত্রের শক্তি অমোঘ, বিশেষ করে সেই সিদ্ধ মন্ত্রশক্তি যদি আত্মজ্ঞ গুরুর ভেতর দিয়ে সংক্রমিত হয়। ঠাকুর বলতেন, 'সদ্‌গুরুর কৃপা হলে জীবের অহংকার তিন ডাকে ঘুচে যায়। আর গুরু কাঁচা হলে শিষ্যের সংসার বন্ধন কাটে না, শিষ্য মুক্ত হয় না'।"

কাশীধাম

শ্রীকেশব চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, কবিভূষণ, বি-এ

হিন্দুদের বহু তীর্থস্থানের মধ্যে কাশীধামের স্থান সর্ব্বাগ্রে। প্রাচীন কাল হইতেই কাশীধামের পরিচয় জানা যায়। প্রবাদ আছে—স্বয়ং বিশ্বেশ্বর এই অদ্বিতীয় ধাম নির্ম্মাণ করিয়া অন্নপূর্ণার সহিত এখানে বাস করিয়া থাকেন। এই ধামে বাস করিলে সকল পাপতাপ দূরীভূত হইয়া যায় এবং এখানে মৃত্যু হইলে লোক শিবত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহা বিশ্বেশ্বরেরই বিধান।

বিশ্বেশ্বর শিবের ত্রিশূলের উপরে কাশীধাম প্রতিষ্ঠিত। তাই কাশী ভিতরে থাকিয়াও পৃথিবীর বাহিরে। উহার সীমানার একটা পঞ্চক্রোশী পরিমাণ আছে। উহা কাশীকেন্দ্রস্থিত বিশ্বেশ্বরের মন্দির হইতে ক্রোশপরিমিত পঞ্চ ব্যাসার্দ্ধে পল্লবিত হইয়া বিরাজ করিতেছে। উহার এক দিকের সীমারেখায় অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি গঙ্গা একস্রোতে প্রবাহিত হইয়া শিবের ললাটনেত্রকে প্রতিফলিত করিতেছে। অন্নপূর্ণার প্রসাদে সেখানে অনাহারে কেহই থাকে না। নন্দী দ্বাররক্ষী হইলেও সে ধামে পাপী তাপী সকলেরই অবাধ প্রবেশের অধিকার রহিয়াছে।

পুরাণে আছে দানবীর মহারাজ হরিশ্চন্দ্র মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে সসাগরা পৃথিবী দান করিয়াছিলেন।

সেই দানের অধিকারে সসাগরা পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্যের অধিকারী হইয়া বিশ্বামিত্র হরিশ্চন্দ্রকে কোথাও বাসস্থান দিতে স্বীকৃত না হওয়ায় হরিশ্চন্দ্র "তবে আমি কোথায় থাকিব" জিজ্ঞাসা করিলেন। বিশ্বামিত্র তাঁহাকে কাশীতে গিয়া বাস করিবার পরামর্শ দিলেন; যেহেতু কাশী পৃথিবীর ভিতরে নয়—বিশ্বামিত্রের অধিকারের বাহিরে তদনুসারে হরিশ্চন্দ্র কাশীতে গিয়া বাস করিতে থাকেন।

ব্যাসকাশী নামে আর একটা কাশী আছে। প্রবাদ আছে—সেখানে মরিলে লোক গাধা হইয়া থাকে, এবং বেদব্যাস সেই কাশী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কল্প ছিল যোগবলে সেই কাশীকেও শিবের কাশীর সমান ফলদায়ক করিয়া তুলিবেন। কোন অভিপ্রায়ে বাধা প্রাপ্ত হইয়াই তিনি এই প্রতিযোগিতায় হস্তক্ষেপ করেন। তাঁহার অভিযোগ সম্বন্ধে নানারূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে। উহার বিস্তৃত বিবরণ নিষ্প্রয়োজন।

নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইলে অন্নপূর্ণা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশে বার বার গিয়া ব্যাসদেবকে "এখানে ম'লে কি হয়?" এই একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে থাকেন। ব্যাসদেব দুই চারিবার "শিব হয়" এই উত্তর করিয়া শেষে বিরক্তিভরে যেই একবার "গাধা হয়" বলিলেন, অমনি "তথাস্তু" বলিয়া স্বরূপ ধারণ পূর্ব্বক অন্নপূর্ণা অন্তর্হিতা হইলেন। ছলনার আশ্রয় নিয়া তিনি এইভাবে ব্যাসের চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দেন এবং কৌশলে কাশীধামের অদ্বিতীয়ত্ব রক্ষা করেন।

প্রবাদে ও পৌরাণিক উপাখ্যানে কাশীধামের এই সব মাহাত্ম্য চিরকাল কীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। উহাদের উপরে দৃঢ় বিশ্বাস থাকায় হিন্দুসাধারণ কাশীক্ষেত্রকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান বলিয়া মানেন। তাই তীর্থযাত্রা ব্যপদেশে বহুলোক কাশীতে গিয়া থাকে এবং মৃত্যুকাল নিকটবর্ত্তী মনে করিয়া বৃদ্ধবয়সে অনেকে কাশীবাসী হয়।

বর্ত্তমানে কাশী একটি বড় সহর। উহার সমৃদ্ধিও যথেষ্ট। তাই স্থায়ী অধিবাসীর সংখ্যা খুব বেশী। আর ইংরাজদের আমলে রেল লাইন বিস্তৃত হওয়ায় অল্প সময়ে ও সামান্য ব্যয়ে যাতায়াত করা যায় বলিয়া তীর্থযাত্রীর সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। জলবায়ু উৎকৃষ্ট ও স্থান স্বাস্থ্যকর, এই জন্য বায়ু পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে এবং চাকরী বা ব্যবসায় অবলম্বনে অর্থোপার্জ্জনের জন্য বহুলোক কাশীতে অবস্থান করিয়া থাকে। অবাধ প্রবেশের অধিকার থাকায় বহু দুষ্ট ও মহাপাপী ওখানে গিয়া গা ঢাকা দিয়া থাকে।

এই সব কারণে কাশীর জনসংখ্যার সহিত মৃত্যুসংখ্যাও দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। মৃতদের মধ্যে এমন সব বিধর্ম্মীও থাকে, যাহারা শিব করিতে চাহিলেও শিব হইতে প্রস্তুত নয়। আর—

অন্যস্থানে কৃতং পাপং বারাণস্যাং বিনশ্যতি।
বারাণস্যাং কৃতং পাপং বজ্রলেপো ভবিষ্যতি॥

এই প্রচলিত কথানুসারে হিন্দুদের মধ্যেও যাহারা সেখানে পাপকার্য্য করে তাহাদের শিবত্বপ্রাপ্তি সম্বন্ধে সন্দেহ জাগিয়া থাকে।

তাই 'কাশীতে যে মরে সেই শিব হয়' এ কথা সত্য হয় কি প্রকারে? আর যেখানে গেলে সমস্ত পাপ দূর হয়, সেখানে পাপবৃত্তি জাগে কি করিয়া—পাপকার্য্য করেই বা কিরূপে? এইরূপ রহস্যমূলক অনেক প্রশ্ন আজকাল স্বভাবতই উঠিয়া থাকে। জনৈক প্রাচীন পণ্ডিত এক "ফাঁকি" আবিষ্কার করিয়া উহার সমাধান করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

তিনি বলিয়াছেন—"কাশীর পঞ্চক্রোশীর একটা আকৃতি-বৈশিষ্ট্য আছে। হাতের পাঁচটা আঙ্গুল বিস্তৃত করিয়া ভূমিতলে রক্ষা করিলে, যেমন পাঁচটা আঙ্গুলে আক্রান্ত স্থান ও তাহাদের প্রত্যেক দু'দুটার মধ্যবর্ত্তী ফাঁক—দুই-ই এক পরিধির মধ্যে

থাকে, তেমনি কাশীর পঞ্চক্রোশী আয়তনের মধ্যেও পল্লবাকৃতি পঞ্চ ব্যাসার্দ্ধে আক্রান্ত স্থান ও তাহাদের প্রত্যেক দু'দুটার অন্তর্বর্ত্তী ফাঁক দুই-ই রহিয়াছে। বিশ্বেশ্বরের ব্যবস্থায় বিধর্ম্মী ও পাপীরা ঐ ফাঁকে পড়িয়া মরে, আর যাহারা পাপকার্য্য করে, তাহারা ঐ ফাঁকে থাকিয়াই করে বলিয়া শিবত্বপ্রাপ্তি সম্বন্ধে বা কাশীতে পাপ করে কিরূপে, এই আপত্তি সম্বন্ধে কোনরূপ অসামঞ্জস্য ঘটিতে পারে না।" এই মীমাংসা বা গোঁজামিলের উপরে অনেক আপত্তি চলিতে পারে বলিয়া উহার কোন গুরুত্ব স্বীকার করা যায় না।

আর ভূতলের সঙ্গে একই সমতলে থাকায় ও বাহিরের অন্যান্য স্থানের ন্যায় একই মৃত্তিকাস্তরে —একই ভাবে ঘনসংবদ্ধ হওয়ায়, বিশেষ অন্য সব স্থানের ন্যায় একই ভাবে ভূমিকম্পে কম্পিত হওয়ায় কাশী যে পৃথিবীর বাহিরে—শিবের ত্রিশূলের উপরে অবস্থিত, এই কথাও অপ্রমাণিত হইয়া যায়। তাহা ছাড়া মুসলমান কি ইংরাজ রাজার আমলে, কেবল কাশী কেন—পৃথিবীর কোথাও যে বিশ্বেশ্বরের আধিপত্য আছে, এমন তো মনে হয় না। এইরূপ যুক্তিতর্কের মুখে পৌরাণিক উপাখ্যান বা প্রাচীন প্রবাদ কোনটাই আজকাল টিকাইয়া রাখা অত্যন্ত কঠিন।

তবে কি ওসব কথার কোন মূল্যই নাই? উহাদের মূলেও কি কোন সত্য নাই? এত লোকের বিশ্বাস কি শুধু মিথ্যা বা শূন্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এতকাল চলিয়া আসিতেছে? হিন্দুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান কি শূন্যগর্ভ চাতুর্য্যের বলে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে? এ সব প্রশ্নের কোনটারই ঠিক সদুত্তর হয় না। চার্ব্বাকের ন্যায় নাস্তিকও যেখানে পরাস্ত হইয়াছিল, সেখানকার কিছুই অগ্রাহ্য করিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

যিনি সত্য-স্বরূপ—যিনি সর্ব্বব্যাপী—যিনি অসীম অনন্ত, যাঁহার অবস্থিতি সম্বন্ধে উপনিষৎ বলিতেছেন—

সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥

—যাঁহার বিষয়ে অন্যান্য দর্শন এবং ধর্ম্মশাস্ত্রেও ঐ একই কথা বলিতেছে, তাঁহার অব্যাপ্তি কোথাও নাই বা থাকিতে পারে না! সেই সত্যস্বরূপ সর্ব্বত্রই আছেন,—দেশকালপাত্রে, প্রাণ মন মুখে—অনুভূতি ভাব ও বাক্যে—তাঁহার অভাব কোথাও নাই। থাকিলে সে অভাব যেখানেই থাক, সেই খানেই তাঁহার সর্ব্বস্বরূপত্বে—সর্ব্বব্যাপিত্বে—অসীমত্বে—অনন্তত্বে এমনি একটা ছেদ আসিয়া পড়ে, যাহাকে কিছুতেই নিরাশ করা যায় না। প্রত্যেক পদার্থে—প্রত্যেক অণু-পরমাণুতে পর্য্যন্ত সে সত্য সনাতন হইয়া আছে!

সুতরাং কাশীধাম সম্বন্ধে যে সব প্রবাদ বা উপাখ্যান আছে, তাহার ভিতরেও সত্য আছে। তবে সে সত্য কোথায় নিহিত আছে, সে বিষয়ে একটু বিশেষ অনুসন্ধান আবশ্যক।

এই পৃথিবীতে এমন কি পদার্থ আছে, যাহা পৃথিবীর ভিতরে থাকিয়াও বাহিরে?—যাহা অপূর্ব্ব — অদ্বিতীয় — যাহার নির্ম্মাণকার্য্য স্বয়ং বিশ্বেশ্বরই করিয়াছেন—যাহার অধিপতিও তিনি নিজেই! সে জিনিষটা পাইলে, তার সম্বন্ধে অন্যান্য সব কথাই এক এক করিয়া আলোচনা করা যাইতে পারে।

অন্য কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন নাই। প্রথমে 'আমি' বলিতে যাহাকে বুঝা যায় তাহাকেই ধরা যাক্। সেই তো পৃথিবীর ভিতরে থাকিয়াও বাহিরে। তাহার ভৌতিক দেহটার সহিত বহির্জ্জগতের সমস্ত পদার্থের সকল প্রকারে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। চন্দ্রসূর্য্যাদিগ্রহ, ক্ষিতি অপ্ তেজ প্রভৃতি পঞ্চ মহাভূত, সমস্ত উদ্ভিদ ও প্রাণিজগৎ —সকলের সহিত উহার উপাদানগত, বাধ্য-

বাধকতারূপ ও নিয়মাধীনতামূলক ঐক্য বা মিল রহিয়াছে। উহার উপরে তাহাদের আধিপত্যও যথেষ্ট। ভারাকর্ষণশক্তিতে তাহাদের অনেকেই এক নিমেষে উহাকে ধূলিসাৎ করিয়া দিতে পারে;—তাহাদের বাহিরে উহার যাইবার কোন উপায় নাই। তাই স্বরূপভাবে 'আমি' এই পৃথিবীর ভিতরেই।

কিন্তু অরূপভাবে 'আমি' সেই পৃথিবীর বাহিরে। সে আমির উপাদানও উহাদের অধিকারের বাহিরে। উহার সঙ্গে তাহার বা তাহাদের বাধ্যবাধকতার বা নিয়মানুবর্ত্তিতার কোন বন্ধনই নাই। উহার অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব কোনটাই তাহাদের উপর নির্ভর করে না। উহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, সুতরাং পৃথিব্যাদির বাহিরে। অরূপ 'আমি' এক অপূর্ব্ব—অদ্বিতীয় পদার্থই! তাহার নির্ম্মাতা স্বয়ং বিশ্বেশ্বরই—তাহার অধিপতিও তিনি নিজেই। আর কাহারও এমন শক্তি নাই যে, তাহাকে নির্ম্মাণ করে। আধিপত্য তো দূরের কথা, অন্য কাহারও এমন শক্তি নাই যে, তাহাতে প্রবেশ করে।

অতএব পূর্ব্বের কয়টা লক্ষণযুক্ত একটা পদার্থ পাওয়া গেল, যাহাকে সত্য কাশী বলিলে আপত্তির কারণ বোধ হয় কিছু থাকিবে না। এখন কাশীর অন্যান্য লক্ষণগুলিও তাহাতে ঠিক মিলে কিনা তাহা ক্রমশঃ আলোচনা করা আবশ্যক।

সে বিশ্বেশ্বর শিবের ত্রিশূলের উপরে প্রতিষ্ঠিত কি না? হাঁ, সে শিবের ত্রিশূলের উপরেই প্রতিষ্ঠিত; কারণ বোধ বা জ্ঞানই আত্মার বা 'আমি'র স্বরূপ। ইহা ধর্ম্মশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। সেই জ্ঞানস্বরূপ 'আমি'র প্রতিষ্ঠা সৎ-চিৎ-আনন্দ-রূপ ত্রিশূলের উপরেই। সেই ত্রিশূল বিশ্বেশ্বরের হাতেই থাকে; সেই জন্যই তাঁহাকে জ্ঞানদাতা জগদ্‌গুরু বলা হয়। তিনি ভিন্ন আর কেহ সেই জ্ঞান বা জ্ঞানের ত্রিশূল দান করিতে পারেন না।

তিনি এমনি দয়াময়—এমনি প্রেমময় যে, আমার যাহা মূল কামনা—আমার যাহা চরম অভীষ্ট প্রথমেই তিনি তাহা আমাকে দিয়া রাখিয়াছেন। শুধু দেন নাই—তাহার উপরেই আমাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

আমার মূল কামনা—আমার চরম অভীষ্ট কি? প্রথমতঃ নিজের অস্তিত্ব বা সৎ-রূপ। কিন্তু জড় বা অচেতন অস্তিত্ব কেহই চায় না, তাই দ্বিতীয়তঃ চাই চেতন অস্তিত্ব বা সৎ-চিৎ-রূপ, আর নিরানন্দ চেতন অস্তিত্ব কেহই চায় না; তাই তৃতীয়তঃ চাই আনন্দময় চেতন অস্তিত্ব বা সৎ-চিৎ-আনন্দ-রূপ। আমার প্রার্থনার আদিও সেই—অন্তও সেই—এক 'সচ্চিদানন্দ'! সেই সৎ-চিৎ-আনন্দ-রূপ জ্ঞানের ত্রিশূলের উপরেই 'আমি' কাশীর প্রতিষ্ঠা।

জ্ঞান যে বিশ্বেশ্বরের ত্রিশূলই, তাহার অন্য প্রমাণও আছে। ত্রিশূল অতি অদ্ভুত সংহারাস্ত্র। সংহারকর্ত্তা যখন বিশ্বেশ্বর, তখন ঐ জ্ঞানের ত্রিশূলের দ্বারাই আমাদের সংহার করিয়া থাকেন। তাঁহার কৃপায় যখন পরাজ্ঞানের উদয় হয় তখন আমার আর তাঁহার ভিন্ন আর কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না—সকলই সেই জ্ঞানের ত্রিশূলে সংহার প্রাপ্ত হইয়া যায়। সর্ব্বশেষে 'আমি'র সংহার হইলেই জ্ঞানের চরিতার্থতা লাভ হইয়া থাকে।

এখন 'আমি' কাশীর প্রতিষ্ঠা যে বিশ্বেশ্বরের ত্রিশূলের উপরে এবং উহা যে ভিতরে থাকিয়াও পৃথিবীর বাহিরে, তাহা নিশ্চিত হইয়া গেল। আর ভূমিকম্পেও যে সেই কাশী কম্পিত হয় না, তাহাও স্থির হইল। আর সেখানে যে পাপী তাপী—স্বধর্ম্মী বিধর্ম্মী—সকলেরই অবাধ প্রবেশাধিকার আছে সে কথাও স্থিরীকৃত হইল। কারণ 'আমি'র অধিকারী সকলেই সমান।

'আমি' কাশীর পঞ্চক্রোশী আয়তন ;—জ্ঞানই যখন 'আমি' কাশীর স্বরূপ, তখন তাহার কেন্দ্র হইতে পাঁচটা ব্যাসার্দ্ধই বাহির হইয়া বাহ্য জগতের সমস্ত তথ্যগ্রহণ করিতেছে। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ই সেই পাঁচটা ব্যাসার্দ্ধ। উহাদের দ্বারাই 'আমি' কাশী পল্লবিত হইয়া নিজের বিস্তার সাধন করিয়া থাকে। ক্রোশ শব্দটা উহাদের প্রত্যেকের দৈর্ঘ্য নির্ণয়ার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে; উহা তীর্থকাশী সম্বন্ধে অসঙ্গত না হইলেও আমিরূপ কাশী সম্বন্ধে সঙ্গত হয় না। তাহার ক্ষেত্রে ক্রোশ অর্থে অতি দীর্ঘ—অপরিমিত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ব্যাস বা ব্যাসার্দ্ধ রূপরসগন্ধাদি আহরণার্থ পঞ্চ মহাভূতের শেষ সীমা পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে ;—তাহাদের গতিপথ অপরিমিত—অসীম। এখন 'আমি' কাশীর পঞ্চ ক্রোশীর পরিমিতির মীমাংসাও হইয়া গেল।

পঞ্চক্রোশী ব্যাসার্দ্ধ সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের সমাধানটা আর আলোচনা না করাই ভাল। কারণ তাঁহার ব্যাসার্দ্ধ শিকড় গাড়িয়া বসে ;—যেহেতু ফাঁক রক্ষা করা তাঁহার চাই-ই! কিন্তু 'আমি'কাশীর ব্যাস কি ব্যাসার্দ্ধের ফাঁক মোটেই নাই,—প্রত্যেক বিন্দুর ভিতর দিয়া সে পরিধি ঘুরিয়া বেড়ায়,—তাহার অনাক্রান্ত স্থান একটুও নাই!—ফাঁকের তাহার কোন প্রয়োজনই নাই। জগন্মণ্ডলের পরিধির সহিত তাহার পরিধি সে একীভূত করিয়া লইতে পারে। তাহা করিলেও ফাঁক রক্ষা করার প্রয়োজন তাহার মোটেই নাই। প্রত্যুত তাহার সকলই 'সম'।

একদিকের সীমারেখায় একস্রোতা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি গঙ্গা প্রবাহিতা—'আমি'কাশীর পক্ষে সেটা কিরূপ?

'আমি' কাশীর পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের ব্যাসার্দ্ধ-মুখে প্রবৃত্তি, আসক্তি বা ভোগের শেষ সীমায় পৌঁছিলে পতিত-পাবন করুণাময় ভগবানের করুণাধারা পতিতপাবনী গঙ্গারূপে দর্শনদান করিয়া থাকে। জ্ঞানেন্দ্রিয়রূপ ব্যাসার্দ্ধের সীমারেখা মণ্ডলাকৃতিই হইয়া থাকে। সুতরাং সেই সীমা-রেখায় প্রবাহিতা করুণাগঙ্গা একদিকে অর্দ্ধচন্দ্রা-কৃতি হওয়াই স্বাভাবিক। সেই গঙ্গায় ডুব দিলে সমস্ত পাপতাপ দূর হইয়া যায়। আর জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মুখ তখন বিরক্তি, নিবৃত্তি বা ত্যাগের পথে ফিরিয়া বিশ্বেশ্বরের মন্দির সেই 'আমি'র কেন্দ্রাভিমুখে ছুটিয়া থাকে।

পক্ষান্তরে ও গঙ্গাকে জ্ঞানগঙ্গাও বলা যাইতে পারে। কারণ যে অজ্ঞানের হেতুতে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বহির্মুখী ভোগপ্রবৃত্তি জাগে, সেই ইন্দ্রিয়গণের গতিপথের শেষসীমায় পৌঁছিলে বিশ্বেশ্বরের অনুগ্রহে জ্ঞানের বিকাশ হইয়া থাকে। অজ্ঞানের চরম সীমায় জ্ঞানের বিকাশ স্বাভাবিক। সেই জ্ঞানপ্রবাহ জ্ঞাননেত্রের অর্দ্ধ-চন্দ্রাকৃতি ধারণ করিয়া ইন্দ্রিয়ব্যাসের সীমারেখায় প্রবাহিত হইয়া থাকে। তাহাতে ডুব দিলেও সমস্ত পাপতাপ দূরীভূত হইয়া যায় এবং ইন্দ্রিয়-গণের ব্যাসার্দ্ধমুখ বিরক্তি, নিবৃত্তি ও ত্যাগের পথে ঘুরিয়া 'আমি'কাশীর কেন্দ্রাভিমুখে ধাবিত হইয়া থাকে। সেই করুণাগঙ্গা বা জ্ঞানগঙ্গা চিরকাল একস্রোতা—তার গতি কখনও বিপরীত দিকে যায় না। সুতরাং 'আমি'কাশীর পক্ষে গঙ্গার বিষয়েও সব কথা ঠিক মিলিয়া গেল।

কাশীতে পৌঁছিলেই সমস্ত পাপ ক্ষয় হয়। আর কাশীতে মরিলে শিব হয় ও ব্যাসকাশীতে মরিলে গাধা হয়। এই কথা তিনটি সঙ্গত হয় কিরূপে?

'আমি'কাশীর পক্ষে ও কথা তিনটিও অতি সঙ্গত। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ব্যাস-মুখ ফিরিয়া যখন বিশ্বেশ্বরের মন্দির সেই 'আমি'র কেন্দ্রের দিকে ছোটে, তখন 'আমি'কাশীতে পৌঁছিলেই—বা আত্মদর্শন ঘটিলেই সমস্ত পাপ ক্ষয় হইয়া যায়। আর সেখানে গিয়া কেন্দ্রস্থিত 'আমি'র প্রকৃত

অধিপতি বিশ্বেশ্বরকে দেখিতে পাইলে, তাঁহারই স্বরূপে বিলীন হইয়া শিবত্বই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 'আমি'কাশীতে আত্মদর্শন করিয়া কিম্বা আত্মস্থভাবে যাহার মৃত্যু ঘটে, তাহার মুক্তি নিশ্চিত।

আর পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় যখন কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত প্রবৃত্তি, আসক্তি বা ভোগের জন্য বহির্মুখী হইয়া তাহাদের ব্যাসমুখে ধাবমান হয়, তখন 'আমি'র ব্যাসস্থিত অবস্থায় বা ব্যাসকাশীতে মৃত্যু ঘটিলে গাধা হয়, কারণ মানব জন্ম লাভ করিয়া মৃত্যুকালেও যদি কাহারও দৃষ্টি কেন্দ্রের দিকে না ঘোরে, তবে তাহার 'গাধা' হওয়াই উচিত। সুতরাং পাপক্ষয় ও মৃত্যুফল সম্বন্ধে যে কথা তিনটি আছে, 'আমি'রূপ কাশীর ক্ষেত্রে তাহাও মিথ্যা নয়।

অন্নপূর্ণার প্রসাদে কাশীতে কেহই অনাহারে থাকে না বা কাহারও অন্নের অভাব হয় না।

ওটাও অতি সত্য কথা। 'আমি'কাশীর সন্ধান যে পাইয়াছে, সেখানে যে আত্মস্থ হইয়া থাকে, তাহার অন্নের অভাব হয়ই না। অন্নপূর্ণাই তাহা পূর্ণভাবে যোগাইয়া থাকেন। মুখের (দেহের) অন্ন, মনের অন্ন, প্রাণের অন্ন আর জ্ঞানের আত্মার বা 'আমি'র অন্ন—সবই পৃথক পৃথক। উহাদের একের অন্ন অন্যে গ্রহণ এমন কি স্পর্শও করে না। অন্নপূর্ণা (শিবশক্তি) তাহা পৃথকভাবে স্বরূপে বা বিশ্বপ্রকৃতিরূপে পরিবেশন করিয়া থাকেন। মুখের অন্ন ফলমূল শস্যাদি, মনের অন্ন—চিন্তা ও তাহার বিষয়, প্রাণের অন্ন—অনুভূতি ও তাহার বিষয়, আর জ্ঞানের অন্ন—আনন্দ,—যাহার বিষয়বস্তু অভিন্ন।

'আমি'রূপ কাশীতে আত্মস্থ অবস্থায় থাকিলে আনন্দময়ী অন্নপূর্ণা তাহাকে বুকে জড়াইয়া রাখেন এবং সেও আনন্দময় হইয়া যায়। তাহার আবার অন্নের অভাব কি? তাহার মনমুখপ্রাণ অন্তর্মুখী হইয়া একজ্ঞানের অন্তরে বিলীন হয়—তাহাদের পৃথক অন্ন আর চায় না—তাহারাও আনন্দই চায় ও পূর্ণভাবে তাহা পাইয়া থাকে। তাই 'আমি' কাশীতে অন্নপূর্ণার প্রসাদে অন্নের অভাব হয়ই না।

এখন দেখা যাইতেছে 'আমি'-রূপ কাশীতে তীর্থ কাশীর প্রবাদ ও উপাখ্যানগত সমস্ত লক্ষণই মিলিয়া গিয়াছে। সুতরাং 'আমি'ই সত্য কাশীধাম। আর শুধু হিন্দু নয়—অন্য সকল-ধর্ম্মাবলম্বীদের পক্ষেও 'আমি'কাশীর ফলাফল ঠিক একই রূপ। তাহাতে অসঙ্গতি মোটেই নাই।

একটি সত্য কাশী যখন পাওয়া গিয়াছে, তখন তীর্থ কাশীও মিথ্যা নয়। সেই আধ্যাত্মিক কাশীর আধিভৌতিক রূপ ঐ তীর্থ কাশীই। মূর্ত্তি, চিত্র বা যন্ত্রাদিতে স্বয়ং ভগবান ও অন্যান্য দেবদেবীর পূজা হিন্দুরা চিরকালই করিয়া আসিতেছে। সে সবকে প্রতীক বা স্মারক ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। শক্তিমান পূজক, উপাসক বা সাধক উহাতেই প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া ভগবান বা দেবদেবীর আবির্ভাব ঘটাইতে পারেন। প্রহ্লাদের সাধনার বলে স্ফটিকস্তম্ভের ভিতরেও ভগবানের আবির্ভাব হইয়াছিল! মার্কণ্ডেয়ের পূজা ও সত্য বিশ্বাসের বলে শিবলিঙ্গ বা শিবচিহ্নেও বিশ্বেশ্বরের আবির্ভাব হইয়াছিল।

তীর্থ কাশীধামকেও যদি ঐরূপ প্রতীক, স্মারক বা চিহ্ন বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলেও উহার সম্বন্ধে যে সব প্রবাদ বা উপাখ্যান আছে, তাহার কোনটাতেই বোধ হয়, আপত্তির কারণ থাকে না। তাহা ছাড়া সত্য বিশ্বাসেরও যে একটা অতি আশ্চর্য্য শক্তি আছে, তাহাকেও অগ্রাহ্য করা যায় না। অন্ধ হইলেও সত্য বিশ্বাস যাহাকে যেরূপে ভাবে, সে বস্তুতই তাহাই হইয়া যায়। সে দিক দিয়াও তীর্থস্থান বা তীর্থদেবতার একটা সার্থকতা আছে। কাজেই কোন প্রবাদ বা উপাখ্যান অসম্ভব মনে করিয়া, কোন তীর্থকে বা তীর্থ-

দেবতাকে উড়াইয়া দেওয়া চলে না--দিতে গেলে সেটা অন্যায় হয়।

আমার হয়ত না আছে বিশ্বাস—না আছে জ্ঞান! তার ফলে তীর্থে গিয়া কোন ফল পাই নাই। তাই বলিয়া কি সকলেরই সেইরূপ অবস্থা ঘটিবে? তাহা কখনই হইতে পারে না। আমরা প্রতীক বা স্মারক যাহাই বলি না, কাহারও হয়ত সত্য বিশ্বাসের বলে কাশীর ঐ বিশ্বেশ্বরের মূর্ত্তিতেই ঠিক বিশ্বেশ্বরের দর্শন লাভ হইতে পারে। কাহারও হয়ত ঐ প্রতীক, স্মারক বা চিহ্নের প্রভাবে জ্ঞানের উন্মেষ হওয়ায় আত্মদর্শন ঘটিয়া যাইতে পারে। সুতরাং যাহা যে ভাবে চলিতেছে, তাহাকে সেই ভাবে চলিতে দেওয়াই ভাল।

ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের বেলায় পরমতাসহিষ্ণুতাকে একটা দোষ বলিয়া আমরা ধারণা করি, কিন্তু নিজেদের বেলায় নিজেদেরই চিরকালের মত বা সংস্কার নষ্ট করিবার জন্য বা উহাকে উপহাস করিবার জন্য নানা যুক্তিতর্ক তুলিতে ইতস্ততঃ করি না। ওটাও যে পরমতাসহিষ্ণুতার প্রকারান্তর। তাই ওটাও অত্যন্ত দোষের বিষয়।

বিবেকানন্দ-বোধন

শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য, বি-এ

যাহাদের দ্বারদেশে সর্বহারা হে সন্ন্যাস-চারি
আপনারে রিক্ত করে' দিয়ে এলে অমৃত নিঙাড়ি,
তারাই আজিকে হায়! জ্ঞান-গুরু ভারতের দ্বারে
গৃধ্রের নখর লয়ে ফিরে আসে সমর সম্ভারে!
বুদ্ধের অমৃত রাজ্যে প্রতিদানে মৃত্যুবাণ হানি,
আণব-প্রলয় ঢালি আপনার বিজয়ের বাণী
লিখে যায় ভস্মপুঞ্জে! তারা চায় তব গৃহে আসি
তুলে নিয়ে যেতে শুধু মৃত্তিকার উপাদানরাশি।
চিত্ত ছেড়ে বিত্তলোভ! হাসিব কি, কাঁদিব ব্যথায়
বুঝিতে পারি না আমি, বুঝাতেও পারি না যে হায়!
জাগাও জাগাও পুনঃ, ফুটাও আত্মার শতদল;
ওদের কামান হতে আমাদের ধর্ম মহাবল
ছিল যে অনেক দামী, কত ধ্রুব, কত যে মহান্!
'দীনের সে গুপ্তধন' আজ তাহা কে করে প্রমাণ?
আজি কি ঘুমায়ে রবে পূরবের গণ-চিত্ত-তলে
শুধু স্মৃতিশিখারূপে? উঠিবে না, উঠিবে না জ্বলে,
বিদ্ধ করি পশ্চিমের সূচীভেদ্য অধ্যাত্ম আঁধার
জ্ঞানাঞ্জন শলাকায় সূর্যতেজে প্রাচ্য এশিয়ার
শাশ্বত দায়িত্ব লয়ে? ঐহিক মুক্তির পিপাসায়
আজ যবে গণমর্ম ভরি উঠে দুর্দম ব্যথায়
আমি জানি—মোক্ষকাম জাগে শুধু তীব্র দুঃখবাদে।
যে বাণী গিয়াছ রাখি একদিন অগ্নিগর্ভ ছাঁদে
বিকাশের ধরণীতে মরে না সে সত্য অবিনাশী।
মূর্তসেবা মূর্তত্যাগ সর্বত্যাগী হে বীর সন্ন্যাসি

পুনঃ আসি লক্ষ হৃদে তোল ধ্বনি, বেদান্ত-বিষাণ,
বাজিয়ে জাগাও সবে গাহি সেই 'উঠ জাগ' গান।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে বর্ষা

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী, বি-এ

বর্ষা যুগে যুগে কাব্যের রসদ যোগাইয়া আসিতেছে। বর্ষার সমারোহ, তাহার অন্ধকার, তাহার দীপ্তি, তাহার চাঞ্চল্য, তাহার গাম্ভীর্য্য কবির চক্ষে চিরকাল বিভিন্নরূপে দেখা দেয়। মেঘ চিরপুরাতন, অথচ চির-নূতন। মেঘ আপন নিত্য-নূতন চিত্র কবি-হৃদয়ে অঙ্কিত করে।

প্রকৃতি-চিত্তের সহিত মানব-চিত্তের একটি নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে—এই কথাটি মহাকবি কালিদাস প্রথম আবিষ্কার করেন। তিনি দেখাইয়াছেন—বর্ষা বা মেঘ শুধু ঋতু নয়, সে 'রক্ত-মাংস গঠিত একটি জীবন্ত পুরুষ।' সে মানবের সুখ-দুঃখের সমভাগী। সাধারণতঃ পাঠকেরা মেঘদূতকে প্রাচীন ভারতের নাগরিক জীবনের বিরহ-মিলনের 'অন্তর্গূঢ় বাষ্পাকুল বিচ্ছেদ-ক্রন্দন' বলিয়াই জানেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—ইহা শুধু বিরহ-কাতর যক্ষের নির্ব্বাসন নহে, 'রবিহীন মণিদীপ্ত প্রদোষের দেশে'র কল্পলোক হইতে আমাদেরও নির্ব্বাসন। কারণ—

> সশরীরে কোন্ নর গেছে সেইখানে,
> মানস-সরসী-তীরে বিরহ শয়ানে।

তাই 'মুক্তগতি মেঘপৃষ্ঠে' বস্তুজগৎ হইতে ইন্দ্রিয়াতীত জগতে সকলকে যাইতে হয়। 'পূর্ণ মেঘে মেদুর অম্বরে' প্রাচীন ভারতের চিত্র কবির মানস নয়নে ভাসিয়া উঠিয়াছে।

একমাত্র মেঘ ব্যতীত নির্ব্বাসিত আমাদিগকে আর কেহই 'কামনার মোক্ষধাম অলকার মাঝে' লইয়া যাইতে সমর্থ নয়।

আর একটা জিনিষ রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের কাব্যে পাইয়াছেন তাহা, অনন্তের সহিত চির-বুভুক্ষু মানব-হৃদয়ের মিলনের সুর। তাই কবি তাঁহার 'মেঘদূত' কবিতায় বলিয়াছেন—

> ভাবিতেছি অর্দ্ধরাত্রি অনিদ্র নয়ান,
> কে দিয়েছে হেন শাপ, কেন ব্যবধান
> কেন ঊর্দ্ধে চেয়ে কাঁদে রুদ্ধ মনোরথ ?
> কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ ?

নির্ব্বাসিত যক্ষের ন্যায় ক্ষণিকের জন্যও তিনি ভুলিতে পারেন নাই—তাঁহার 'সৌন্দর্য্যের আদিসৃষ্টি'-কর্ত্তা বিরাটের আবাসস্থল—'লক্ষ্মীর বিলাসপুরী।' কবিগুরুর বিরহ বেদনার সুর Wordsworth-এর কথায় বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে—

> Not in entire forgetfulness
> —And not in utter nakedness,
> But trailing clouds of glory do we come
> From God who is our home.

অন্তরের এত বড় ঐশ্বর্য্য, সৃজনী প্রতিভার এই গুরুত্ব যেন কল্পনার অতীত। গানে, কবিতায়, গল্পে, প্রবন্ধে, নাট্যে, সমালোচনায় উপন্যাসে, চিত্রাঙ্কনে রবীন্দ্র প্রতিভার যে অপরূপ বিকাশ দেখা যায়, যে কোন জাতির ইতিহাসে তাহা দুর্লভ। ভারতীর বরপুত্র, বহুমুখী প্রতিভার উৎসস্থল রবীন্দ্রনাথকে বর্ষা-কাব্যের ভিতর দিয়া সম্পূর্ণভাবে না হইলেও অনেকটা ধরা যায়। তাঁহার বর্ষা-সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখিতে পাইব তিনি কালিদাসকেও অনেকাংশে ছাড়াইয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বর্ষার কবি। তিনি বর্ষাকে সমস্ত অন্তরের সত্তা দিয়া ভালবাসেন। কবি এই বর্ষার ভিতর দিয়া 'অন্তরতমের' স্পর্শ অনুভব করিয়াছেন।

কাব্যের চরম সার্থকতা সেইখানে, যেখানে কবি প্রকৃতির আনন্দে আত্মহারা হইয়া অন্তরতম প্রদেশে বিরাটের হর্ষ-স্পর্শটুকু প্রকৃতির রসে রসমণ্ডিত করিয়া রূপ দেন। তাই কবিগুরুর বর্ষাসৃষ্টি অপরূপ মাধুর্যময় হইয়া উঠিয়াছে। মনোরম ভাবগাম্ভীর্য্যে ঝঙ্কৃত কবিগুরুর এই বর্ষাকাব্য তাঁহার হৃদয়ে কখন কিরূপ ভাবে আঘাত করিয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা এখানে করিব।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য-জীবনের উন্মেষ 'জল পড়ে পাতা নড়ে' চরণটিতে। যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে ইহা অতি সামান্য, কিন্তু ছন্দের যে প্রথম চরণধ্বনি তাঁহার অন্তরে অঙ্কিত হইল—তাহাই তাঁহার কাব্যালোকের পথপ্রদর্শক। তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন—"বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান।"—এ ছড়াটা যেন শৈশবের মেঘদূত। বাল্যকালে তিনি বহিঃপ্রকৃতির সহিত অবাধ মেলামেশার সুযোগ পান নাই। কারণ সর্ব্বদা তাঁহাকে শাসনের নজরবন্দীতে থাকিতে হইত। তাই তাঁহার বন্দীপ্রাণ মুক্ত প্রকৃতিতে মিশিবার জন্য সর্ব্বদা ছট্ ফট্ করিত। জীবন-স্মৃতিতে একস্থানে লিখিয়াছেন—'আমাদের বাড়ীর ছাদটার পিছনে দেখিলাম ঘন সজল নীল মেঘ রাশীকৃত হইয়া আছে—মনটা তখনি এক নিমেষে নিবিড় আনন্দে আবৃত হইয়া গেল—সেই মুহূর্ত্তের কথা আজিও আমি ভুলিতে পারি নাই। সকালে জাগিবামাত্রই সমস্ত পৃথিবীর জীবনোল্লাসে আমার মনকে তাহার খেলার সঙ্গীর মত ডাকিয়া বাহির করিত, মধ্যাহ্নে সমস্ত আকাশ এবং প্রহর যেন সুতীব্র হইয়া উঠিয়া আপন গভীরতার মধ্যে আমাকে বিবাগী করিয়া দিত এবং রাত্রির অন্ধকার যে মায়া-পথের গোপন দরজাটি খুলিয়া দিত তাহা সম্ভব অসম্ভবের সীমানা ছাড়াইয়া রূপকথার অপরূপ রাজ্যে সাত সমুদ্র তের নদী পার করিয়া লইয়া যাইত।'

এই যে কারা-প্রাচীরে আবদ্ধ অন্তর-বেদনা তাহা নীচের কয়েক চরণে চিত্রিত করিয়াছেন—

রৌদ্র মাখান অলস বেলায়
তরু মর্ম্মরে ছায়ার খেলায়
কী মুরতি তব নীলাকাশশায়ী
নয়নে উঠে যে আভাসি
হে সুদূর, আমি উদাসী।

রবীন্দ্রনাথ বর্ষাকে একস্থানে ক্ষত্রিয়রূপে বর্ণনা করিয়াছেন—"বর্ষা মেঘের পাগড়ি পরিয়া অগ্রে আসিয়া দেখা দেয়, দিগ্বিজয় করাই তাহার কাজ। তমালতালী বনরাজির নীলতম প্রান্ত হইতে তাহার রথের ঘর্ঘর ধ্বনি শুনা যায়।" কাল-বৈশাখীর ঝড় গেরুয়া পতাকা উড়াইয়া ঘোড়সওয়ারের বেশে মাঝে মাঝে কবির চক্ষে দেখা দেয়। বঙ্গে বর্গীর অত্যাচার নৃশংসরূপে দেখা দিয়াছিল। ঝড়ের দৌরাত্ম্য বর্গীর অত্যাচারের চেয়ে একটুকুও কম নয়—

বর্গী-সৈন্যের মত,
কাঁপিয়ে দিয়েছে শাল সেগুনকে,
নুইয়ে দিয়েছে ঝাউয়ের মাথা,
হায় হায় রব তুলেছে বাঁশের বনে,
কলাবাগানে করেছে দুঃশাসনের দৌরাত্ম্য।

কবি পুব-সাগরের পার হইতে আগত সাপুড়িয়া রূপে বর্ষা-প্রকৃতির যে রূপ চিত্রিত করিয়াছেন তাহা সুর-মাধুর্য্যের এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। গানটি পড়ার সঙ্গে সাপ ও সাপুড়িয়া যুগপৎ মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া শ্রোতার মানস-পটে উদিত হয়। সাপের সকল প্রকার characteristics ইহাতে সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কবি নিজে প্রত্যক্ষভাবে বর্ষার লীলা-বৈচিত্র্য দেখিয়াছেন এবং সেই দেখার আনন্দ অপরকে অনুভব করিতে সাহায্য করিয়াছেন direct painting এর মধ্য দিয়া—

ওড়না ওড়ায় বর্ষার মেঘে দিগঙ্গনার নৃত্য
হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে ঝলমল করে চিত্ত।
প্রভাত বেলায় হেলাভরে করে অরুণ মেঘেরে তুচ্ছ
উদ্ধত যত শাখার শিখরে রডোডেনড্রন গুচ্ছ।

নীচের কয়েক লাইনে কবিবর বর্ষাপ্রকৃতির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন—

সূর্য্যাস্ত সীমার—রঙীন পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে
ব্যস্তবেগে বেরিয়ে পড়ল মেঘের ভীড়,
বুঝি ইন্দ্রলোকের আগুন-লাগা হাতিশালা থেকে
গাঁ গাঁ শব্দে ছুটছে ঐরাবতের কাল কাল শাবক শুঁড়
আছড়িয়ে
মেঘের গায়ে গায়ে দগ্ দগ্ করছে লাল আলো,
তার ছিন্ন ত্বকের রক্তরেখা।
বিদ্যুৎ লাফ মারছে মেঘের থেকে মেঘে
চালাচ্ছে ঝক্‌ঝকে খাঁড়া
বজ্রশব্দে গর্জে উঠছে দিগন্ত,
তীক্ষ্ণ হাওয়া সাঁই সাঁই শান দিচ্ছে আর চালাচ্ছে ছুরি
অন্ধকারের পাঁজরের ভিতর দিয়ে।

এখানে কবি মেঘের সকল প্রকার লীলা-বৈচিত্র্য সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। এইরূপ প্রকৃতির বিশ্লেষণ একমাত্র রবীন্দ্রনাথেই সম্ভব। শ্রদ্ধেয় শিল্পী শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত বলেন—"চিত্রকরদের ন্যায় প্রকৃতির বর্ণবৈচিত্র্য কবিদের মনকেও আলোড়িত করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বর্ণের অনেক উল্লেখ আছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কালারিষ্টদের মধ্যে তাঁর স্থান হইতে পারে। প্রকৃতির নানাবর্ণের এরকম সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ এবং সূক্ষ্ম অনুভূতি রবীন্দ্রনাথের কাব্যের ন্যায় আর কোথাও দেখা যায় না। প্রকৃতির বর্ণ-বৈচিত্র্য তাঁর শিল্পী মনকে কি ভাবে আন্দোলিত করিয়াছে, তাঁর কাব্যে প্রচুর উদাহরণ আছে।"

কবির চক্ষে বর্ষা একটি বিশিষ্ট ঋতু। বর্ষার সমকক্ষ আর কোন ঋতুই নয়। বর্ষা সমস্ত বৎসরকে ভাঙ্গিয়া একাকার করিয়া দেয়—

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতি সৌরভ রভসে
ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা
শ্যামগম্ভীর সরসা।

ছন্দের মধ্যে যেন একটা মুরজ-ধ্বনি হইতেছে। কবির মনের মধ্যে একটি artistic ভাবের বিকাশ এখানে দেখিতে পাই। প্রতীচ্য কবি সৌন্দর্য্যবাদ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—'A thing of beauty is a joy for ever' (Keats). আর প্রাচ্য কবি রবীন্দ্রনাথ এই সৌন্দর্য্যবাদ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—'প্রতিদিন উষাকালে অন্ধকার রাত্রির প্রান্তে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়েছি এই কথাটি উপলব্ধি করবার জন্যে যে, যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি। আমি সেই বিরাট সত্তাকে আমার অনুভবে স্পর্শ করতে চেয়েচি যিনি সকল সত্তার আত্মীয় সম্বন্ধের ঐক্যতত্ত্ব, যাঁর খুসীতেই নিরন্তর অসংখ্য রূপের প্রকাশে বিচিত্রভাবে আমার প্রাণ খুসি হ'য়ে উঠেচে, ব'লে উঠচে কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ; যাতে কোনো প্রয়োজন নেই তাও আনন্দের টানে টানবে, এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপারের চরম অর্থ যার মধ্যে।' এই সঙ্গে কীট্‌সের Beauty Truth সত্য-সুন্দর বাণী তুলনীয়।

প্রকৃতির বিভিন্ন সৌন্দর্য্যের মধ্যে তাহার উদ্দাম গতিবেগও একটি সৌন্দর্য্য। প্রকৃতির উদ্দাম গতিবেগ কবিকে পাগল করিয়াছে। প্রকৃতির এই উদ্দাম শক্তি একদিকে ধ্বংস করিতেছে, আর একদিকে সৃষ্টি রক্ষা করিতেছে।

A wild spirit, which art moving everywhere
Destroyer and preserver ; hear, oh, hear !
(Shelley)

রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির এই উদ্দাম শক্তির সহিত সমানতালে তাল রাখিয়া সমগ্র বিশ্বের নর-নারীকে কর্ত্তব্য-পথে অগ্রসর হইতে আহ্বান করিলেন। তিনি জানেন প্রকৃতির এই উদ্দাম গতিবেগের অংশ গ্রহণ করিতে পারিলে নিখিল মানব-সমাজ স্বীয় শক্তিতে নটরাজের প্রলয় নাচন অনুভব করিবে।

চাবো না পশ্চাতে মোরা, মানিব না বন্ধন ক্রন্দন,
হেরিব না দিক,

গণিব না দিনক্ষণ, করিব না বিতর্ক বিচার,
উদ্দাম পথিক।
মুহূর্ত্তে করিব পান মৃত্যুর ফেনিল উন্মত্ততা
উপকণ্ঠ ভরি,—
ক্ষিন্ন শীর্ণ জীবনের শত লক্ষ ধিক্কার লাঞ্ছনা
উৎসর্জ্জন করি। (বর্ষশেষ)

নীচের লাইন কয়টিতে কবির অন্তরের সুপ্ত চেতনা তাঁহার সমস্ত দ্বিধা-সঙ্কোচ ও অবসাদ-গ্লানি ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে—

শ্যেনসম অকস্মাৎ ছিন্ন ক'রে ঊর্দ্ধে লয়ে যাও
পঙ্ক-কুণ্ড হ'তে,
মহান্ মৃত্যুর সাথে মুখামুখি ক'রে দাও মোরে
বজ্রের আলোতে।

রবীন্দ্রনাথ নিজের কবি-চেতনা দিয়া নিখিল মানবের গোপন অন্তঃপুরের চেতনা অনুভব করেন।

আজিকে দুয়ার রুদ্ধ ভবনে ভবনে
জনহীন পথ কাঁদিছে ক্ষুব্ধ পবনে
চমকে দীপ্ত দামিনী!

এই বর্ষার মধ্যে কবি অতীতের সৌন্দর্য্যের অস্পষ্ট আভাসে যেমন একদিকে পুলকিত, তেমনি অন্যদিকে কেমন যেন একটি মিশ্রিত পুলকবেদনায় ব্যথিত। বর্ষাঋতুর বর্ষণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশরী যেন নিরন্তর করুণ সুরে বাজিয়া বাজিয়া সংসারের সমস্ত বিরহিণী রাধাকে আকর্ষণ করে।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রকৃতই প্রকৃতির শিশু। তাঁহার সেই শিশুপ্রকৃতির সন্ধান সেইখানে পাওয়া যাইবে যে প্রকৃতির তানে ময়ূর পেখম ধরিয়া কেকাস্বরে নৃত্য করিতে থাকে। প্রকৃতির বর্ষণ ধারায় তাঁহার শিশু-প্রাণ নাচিয়া উঠে—

হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে
ময়ূরের মত নাচে রে
হৃদয় নাচে রে।
শত বরণের ভাব-উচ্ছ্বাস
কলাপের মতো করিছে বিকাশ;
আকুল পরাণ আকাশে চাহিয়া
উল্লাসে কারে যাচে রে।

রবীন্দ্রনাথ 'রোম্যাণ্টিক' কবি। অসীমের (Infinite) প্রতি অনন্ত অভিসারপ্রবণতা 'রোম্যাণ্টিক' কবিতার সারবস্তু। ইহা শেলীর—'Devotion to Something Afar' এবং কীট্‌সের—'Fellowship with Essence'. ইহা রবীন্দ্রনাথের—'হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোনো খানে।' কবিগুরুর মতে সসীমের সমস্ত বন্ধন অতিক্রম করিয়া অন্তহীন নিরুদ্দেশ যাত্রা-পথে চলাই মানব-অন্তরাত্মার চিরন্তন ধর্ম্ম। তাই বিশ্বের অসীমতা কবিকে আহ্বান করে,—তাঁহার বিরাট বক্ষে টানিয়া নিতে চায়।

ভিজে হাওয়ায় থেকে থেকে
কোন সাথী মোর যায় যে ডেকে;
একলা দিনের বুকের ভিতর
ব্যথার তুফান তোলে।

কবি রহস্যের পূজারী। তাঁহার মনের মধ্যে কল্পনাপ্রিয়, রহস্যপ্রিয় যে অনুভূতি রহিয়াছে তাহাকে তিনি উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। জন্মের পূর্ব্বে কি ছিল এবং মৃত্যুর পর কি আছে —সমস্তই মানুষের কাছে দুর্জ্ঞেয়। এই জন্ম-মৃত্যুর রহস্যের মাঝখানে ক্ষণিক বিশ্রামের নাট্য-শালায় মানুষ পরিপূর্ণভাবে অমরত্বের আস্বাদন করিতে চায়,—চেষ্টা, অনুসন্ধান, সহিষ্ণুতা এবং নিরতিশয় দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়া। অস্পষ্ট রহস্য-প্রিয়তার আভাস, মগ্ন-চেতনা এবং রূপান্তরিত স্বপ্নের রঙে রঞ্জিত অনুভূতির কাছে জগৎ-দৃশ্যের সমস্ত তুচ্ছ পদার্থ কোথায় যেন লয় প্রাপ্ত হইয়া যাইতে চায়। এই রহস্যকে কেহই পরিপূর্ণ ভাবে বুঝিতে পারে না। ইহা কবি-চিত্তের অতিশয় নিজস্ব অনুভূতি। কবির 'কোন ছায়াবিতানে' 'বহু যুগের চিরজাগ্রত প্রতীক্ষায়' কোন কিছু রহিয়াছে—এই অনুভূতিই কবির পক্ষে যথেষ্ট।

তিনি কোন প্রকার যুক্তি তর্কের নিক্তির ওজনে রহস্যের প্রতি তাঁহার এই শ্রদ্ধাটুকু, বিশ্বাসটুকু নষ্ট হইতে দিতে চাহেন না। ইহা কবি-হৃদয়ের 'নিভৃত নির্জ্জন ঘরের' নিজস্ব সম্পদ্। মানবের সমস্ত যুক্তি-তর্ক থামিয়া যায় রহস্যের মৃদু এবং স্নিগ্ধ মধুর সংস্পর্শে আসিয়া। তাইত মেঘ-মেদুর আকাশের প্রতি চাহিলে মন-প্রাণ অকারণে শ্যামলিত হইয়া উঠে। এই যে 'অকারণত্ব' ইহা একমাত্র অনুভূতির ব্যাপার, বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়া অপরকে বুঝান যায় না। কবির কথাই বলিতে পারি।

আমার একটি কথা বাঁশী জানে,
বাঁশীই জানে।
ভ'রে রৈল বুকের তলা
কারো কাছে হয়নি বলা
কেবল ব'লে গেলেম বাঁশীর
কানে কানে।

মেঘ কবিকে তাঁহার চেনা পৃথিবীর অভ্যস্ত গণ্ডির বাহিরে লইয়া যায় এবং তাঁহার নয়নে নীল অঞ্জনের ছায়াপাত করে।

নয়নে আমার সজল মেঘের
নীল অঞ্জন লেগেছে,
নয়নে লেগেছে।
নবতৃণদলে ঘন বন ছায়ে
হরষ আমার দিয়েছি বিছায়ে,
পুলকিত নীপনিকুঞ্জে আজি
বিকশিত প্রাণ জেগেছে।

এই যে রহস্যের দাবী কবি-মনের উপর ভিত্তিভূমি গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহা কবি-গুরুর কথায় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—'চকিত বিদ্যুতের আলোকে আজ যাত্রায় বাহির হইবে—জাতি-পুষ্পসুগন্ধি বনান্ত হইতে আহ্বান আসিল—কোন ছায়াবিতানে বসিয়া আছে বহুযুগের চিরজাগ্রত প্রতীক্ষা।'—পরিচয়।

ইহার কোন স্পষ্ট অর্থ হয় না, অথচ প্রাণে এক অব্যক্ত মোহনভাবের অনুভূতি এনে দেয়। এই অনুভূতির সৌন্দর্য্যটুকুই কি আমাদের পক্ষে যথেষ্ট নয়?

রবীন্দ্রনাথ মানবিকতার (Humanism) পূজারী। তিনি বর্ষাকে শুধু বর্ষা হিসাবে দেখেন নাই। বর্ষাকে তিনি প্রাণময়ী নারীরূপে কাব্যে চিত্রিত করিয়া তাহাকে মানবধর্ম্মী (Humanised) করিয়া তুলিয়াছেন।

বর্ষা মানুষের মনে বিরহব্যথা জাগাইয়া মিলন-কামনা কিরূপ তীক্ষ্ণতর করিয়া তোলে তাহাও কবির সূক্ষ্মতম অন্তর্দৃষ্টিকে এড়ায় নাই।

ওগো নদীকূলে তীর-তৃণদলে
কে বসে অমল বসনে
শ্যামল বসনে?
সুদূর গগনে কাহারে সে চায়?
ঘাট ছেড়ে ঘট কোথা ভেসে যায়
নবমালতীর কচি দলগুলি
আনমনে কাটে দশনে।

এই যে বর্ষার চিত্র কবি অঙ্কিত করিয়াছেন—লিওনার্দো দা ভিন্সি, মাইকেল এঞ্জেলো, র‍্যাফেল্ প্রভৃতি পাশ্চাত্য শিল্পিগণের চিত্রের মত কি 'ইম্প্রেসিভ' নয়? বাস্তবিকই শিল্পী হিসাবেও কবি আমাদের নমস্য।

কবির দার্শনিক মনোভাব (Platonic conception) নীচের কয়েক লাইনে দেখিতে পাই। বস্তুগত সত্তার (objective reality) অসারত্ব ঘোষণা করিয়া কবি 'শ্রাবণ বরিষণে' অধ্যাত্ম বা কবি-মানসের পূজা করিতে চান।

সমাজ সংসার মিছে সব,
মিছে জীবনের কলরব।
* * * * *
শ্রাবণ বরিষণে একদা গৃহকোণে
দু-কথা বলি যদি কাছে তার
তাহাতে আসে যাবে কী বা কার?

রবীন্দ্রনাথ অন্তর এবং বাহির বিশ্বের লীলা-সহযোগে 'আত্মার' স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন —বিশ্বচৈতন্যের অখণ্ড সমগ্রতা লাভ করিয়াছেন। কীট্‌সের কথার সুরে সুর মিলাইয়া বলিতে পারি—He rises into a sort of oneness. কবি তাঁহার 'জীবন-স্মৃতি'তে লিখিয়াছেন—"ক্ষুদ্রকে লইয়াই বৃহৎ, সীমাকে লইয়াই অসীম, প্রেমকে লইয়াই মুক্তি। প্রেমের আলো যখনি পাই, তখনি যেখানে চোখ মেলি, সেখানেই দেখি সীমার মধ্যেও সীমা নাই। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য যে কেবল মাত্র আমারই মনের মরীচিকা নহে, তাহার মধ্যে যে অসীমের আনন্দই প্রকাশ পাইতেছে, সেই জন্যই এই সৌন্দর্য্যের কাছে আমরা আপনাকে ভুলিয়া যাই। আমার নিজের প্রথম জীবনে আমি যেমন একদিন আমার অন্তরের একটা অনির্দেশ্যতাময় অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাহিরের সহজ অধিকারটি হারাইয়াছিলাম, অবশেষে সেই বাহির হইতেই একটি মনোহর আলোক হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে প্রকৃতির সঙ্গে পরিপূর্ণ করিয়া মিলাইয়া দিল। আমার সমস্ত কাব্যরচনার ইহা একটি ভূমিকা। আমার তো মনে হয় আমার কাব্য রচনার এই একটি মাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে 'সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধনার পালা'।" এই অসীম-সসীমের লীলার মধ্যে কবি উপলব্ধি করিয়াছেন ভূমাকে, পরমাত্মাকে, সসীম যেমন অসীমের জন্য ব্যাকুল তেমনই অসীমও সসীমের জন্য ব্যাকুল—'আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে।' প্রাকৃতিক দৃশ্য তাঁহার কাছে শুধু নৈসর্গিক দৃশ্যমাত্র নহে; ইহা কবির কাছে দেখা দিয়াছে অনন্তের, অসীমের বারতা নিয়া—ইহাই রবীন্দ্রনাথের mysticism, প্রকৃতির লীলার মধ্যে অতিপ্রাকৃতের লীলা কবি উপলব্ধি করিয়াছেন। এই যে প্রাচীন ভারতের উপনিষদের বাণী—'ব্রহ্ম এব ইদং বিশ্বং,' 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'—ইহাকে তিনি পুনরাবৃত্তি করেন নাই, স্বীয় সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা সঞ্জীবিত করিয়াছেন। কবি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন—'উপনিষদের তত্ত্বকে আমি জীবনের সাধনা বলে' গ্রহণ করেছি।' কবির নিজস্ব সৃজনী শক্তিতে উপনিষদের বাণীগুলি অপূর্ব্ব মহীয়ান্ এবং প্রাণবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে—'কাণের ভিতর দিয়া মরমে' পৌঁছিয়াছে। অধ্যাপক স্যার রাধাকৃষ্ণন্ বলিয়াছেন—"Rabindranath by his power of imagination has breathed life into the dry bones of the ancient Philosophy of India and made it to live" (Philosophy of Rabindranath).

আজ প্রকৃতির শিশু তাঁহার নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া অবিনশ্বর রহস্যময়ের অভিসারে গমন করিয়াছেন। আজ তিনি তাঁহার চির-কামনার প্রেমাস্পদের সহিত মিলিত হইয়াছেন—'অকূল শান্তি ও বিপুল বিরতি' লাভ করিয়াছেন। বর্ষাকালে বর্ষণশীল বর্ষা-সৌন্দর্য্য তাহার আজন্ম পূজারীর স্মৃতি আমাদের মনে চিরদিন জাগাইয়া তুলিবে। কারণ ইহা কবির একান্ত অভিলাষ। সুদীর্ঘজীবনব্যাপী রূপরসসম্ভোগময় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের মধ্যে কবি মানবপ্রকৃতির আলো-ছায়ার লুকোচুরি প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিয়াছেন। এই যে প্রকৃতির সহিত লুকোচুরি খেলিবার প্রবৃত্তি,—এই যে আনন্দরস পানের প্রবল ইচ্ছা, ইহাকেই অশরীরী ব্যক্তি-দেহে রূপরস-সম্ভোগবর্জ্জিত ইন্দ্রিয়াতীত জগত-চেতনার মধ্যে কবিগুরু কামনা করেন। তাই তিনি বলিয়াছেন—

বাদ্‌লা যখন পড়বে ঝ'রে
রাতে শুয়ে ভাববি মোরে,
ঝরঝরানি গান গা'ব ঐ বনে।
জানলা দিয়ে মেঘের থেকে
চমক মেরে যাব দেখে,
আমার হাসি পড়বে কি তোর মনে?

রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার বিচার দুই এক কথায় সম্ভব নহে। রবীন্দ্র-কাব্য আলোচনা করিতে গেলে স্বতঃই মনে হয় যেন কিছুই বলা হইল না,—যেন অসম্পূর্ণ থাকিয়া গেল। সমুদ্র যেমন বিশাল এবং গভীর রহস্যময়, তেমনি এই রবীন্দ্র-কাব্য অবর্ণনীয়, ভাব-ঐশ্বর্য্যে অনির্ব্বচনীয়, অপূর্ব্ব স্বপ্ন-কল্পনার রসমণ্ডিত। তিনি কাব্য-শতদল-পদ্মের মধু প্রাণ ভরিয়া পান করিয়াছেন এবং আমাদিগকেও তাহার এক আধটুকু কণিকা দানে ধন্য করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের আদর্শ ও সাধনা

শ্রীপুষ্পিতারঞ্জন মুখোপাধ্যায়

শ্রীমদ্ভাগবত এক মহা সমন্বয়গ্রন্থ। এই গ্রন্থে পূর্ব্ব হইতে প্রচারিত সর্ব্বপ্রকার সত্যেরই সমন্বয় করা হইয়াছে। ভাগবত কোনও মতের প্রতিবাদ করেন নাই, কোনও পথের নিন্দা করেন নাই। এই গ্রন্থকে 'নিগমকল্পতরো-র্গলিতং ফলং' বলা হইয়াছে। বেদরূপ কল্পবৃক্ষের ইহা গলিত ফল। কল্পতরুর নিকট যেমন যে যাহা চায় তাহাই পায়, সেইরূপ বেদের নিকট সকল প্রকার অধিকারীই নিজ নিজ লক্ষ্য ও রুচি অনুযায়ী সাধনপথ প্রাপ্ত হইবেন। কেহ চায় মুক্তি, কেহ চায় ভুক্তি। সকলের প্রকৃতিও সমান নহে, সেই জন্য ধর্ম্ম-সাধনায় এবং বিশেষতঃ হিন্দুদিগের প্রাচীন শাস্ত্র আলোচনা করিতে গেলে অধিকারী ভেদ মানিতেই হইবে। বেদে সকল প্রকার অধিকারীর উপযুক্ত ধর্ম্মমত আছে এবং যখন শ্রীমদ্ভাগবত বেদরূপ কল্পবৃক্ষের ফল তখন ইহার মধ্যেও একটা মহা সমন্বয় আছে। ভাগবত আলোচনা করিলেই আমরা এই সমন্বয় দেখিতে পাইব। ভাগবত এমন একটা ভূমিতে দাঁড়াইয়াছেন যেস্থান হইতে সকল মতের ও পথের যথার্থ মূল্য নির্দ্ধারণ করা সম্ভব। এই ভূমি শুদ্ধা ভক্তি বা নির্গুণ ভক্তির ভূমি এবং ইহাই ভাগবত ধর্ম্মের আদর্শ। এই গ্রন্থে তত্ত্বকথা এমন অপূর্ব্বভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে যে সকল প্রকারের অধি-কারীই ইহা হইতে নিজ নিজ আধ্যাত্মিক জীবনের পুষ্টিলাভ করিতে পারিবেন। এ এক মহারহস্যময় গ্রন্থ—আমাদের জীবন যত উন্নত ও পবিত্র হইবে ততই ইহার মধ্যে নূতন নূতন তত্ত্ব আমরা পাইব। শ্রীকৃষ্ণের রূপ সম্বন্ধে বৈষ্ণব কবি বলিয়াছেন—

জনম অবধি হাম রূপ নিহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণে হি পশিল
শ্রুতি পথে পরশ না গেল॥
কত মধু যামিনী রভসে গোঙায়নু
না বুঝল কিহন কেলি।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়ে জুড়ানো না গেল॥

ইহার অর্থ এই যে কৃষ্ণরূপের তুলনায় জগতে আর রূপ নাই যে রূপের তত্ত্ব বুঝিলে মানুষ—ভিখারী মানুষ আর সসীম জগতের দ্বারে দ্বারে রূপ অন্বেষণ করিয়া ফিরিবে না। শ্রীমদ্ভাগবতও তেম্নি। এ যেন দিগন্তরেখা। মাঠে দাঁড়াইয়া দেখিলাম—দিগন্তরেখা, যেখানে আকাশ অবনত হইয়া শ্যামল পৃথিবীর মুখ চুম্বন করিতেছে। মনে করিলাম—ঐ খানে যাইব, বাহির হইলাম, যতই যাইতেছি নূতন নূতন দেশ দেখিয়া আনন্দ পাইতেছি, কিন্তু দিগন্তরেখা প্রথমেও যত দূরে ছিল এখনও ঠিক তত দূরেই রহিয়া গিয়াছে, ইহাই অনন্তের আদর্শ।

ভূমিকা আরও দীর্ঘ না করিয়া বলা যায় যে নির্গুণা বা অহেতুকী ভক্তি প্রচার করাই শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যতম উদ্দেশ্য। মানুষ যে পথই আশ্রয় করুক না কেন এই নির্গুণা ভক্তির ভূমিতে আরোহণ না করিতে পারিলে কিছুই হইল না। মানুষের রুচি ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী যে ধর্ম্মের আদর্শ ও সাধনপদ্ধতি ভিন্ন ভিন্নরূপ হইবে, তাহা শ্রীমদ্ভাগবত অতীব সুন্দর

ভাবেই প্রচার করিয়াছেন। সকলধর্ম্মই এক স্থান হইতে আসিয়াছে, সকল ধর্ম্মেরই লক্ষ্য এক, একথা বেশ ভাল করিয়া উপলব্ধি করা উচিত। যুগাবতার পরমহংসদেব বলিতেন, 'যত মত তত পথ।'

শ্রীমদ্ভাগবতের মতে যিনি যে ধর্ম্মাবলম্বী হউন না কেন, তিনি যদি নির্গুণা বা অহেতুকী ভক্তির দিকে অগ্রসর না হন তাহা হইলে ধর্ম্মসাধনার সার্থকতা নাই। এই নির্গুণা ভক্তিই ধর্ম্মের তুলাদণ্ড। প্রত্যেক অনুষ্ঠান বা সাধনা এই তুলাদণ্ডে ওজন করিতে হইবে এবং এই দিকেই লক্ষ্য রাখিয়া আমাদের সাধনভজন চালাইয়া যাইতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থের প্রথমেই একথা অতীব স্পষ্টাকারে বলা হইয়াছে—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সংপ্রসীদতি॥ ১।২।৬

ধর্ম্ম দুই প্রকার—প্রবৃত্তিলক্ষণ ও নিবৃত্তিলক্ষণ। যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা ফলাভিসন্ধানরহিতা এবং বিঘ্নকর্ত্তৃক অপ্রতিহতা ভক্তি সেই অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণে জন্মিয়া থাকে তাহাই পরধর্ম্ম, তদ্দ্বারা আত্মার প্রসাদ লাভ হইয়া থাকে। পুনরায় বলিতেছেন—

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥
১।২।৮

যাহা ধর্ম্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ তাহা সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত হইলেও যদ্দ্বারা হরিকথায় রতি না হয় তদ্বিষয়ক শ্রম নিষ্ফল।

আরও বলিতেছেন—

অতঃ পুংভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ।
স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্ম্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্॥
১।২।১৩

পুরুষসকলকর্ত্তৃক বর্ণাশ্রম বিভাগক্রমে যে কোনও ধর্ম্ম সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত হউক, যদি তদ্দ্বারা হরি পরিতোষণ হয় তবেই তাহা সার্থক। সেইজন্য শেষে বলিয়াছেন—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥

যতক্ষণ পর্য্যন্ত নির্ব্বেদ না আসে কিংবা ভগবানের কথা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা না হয় ততক্ষণই নানা কার্য্য অনুষ্ঠান করিবে। অতএব ভগবান্ অধোক্ষজে অহেতুকী ও অব্যবহিতা ভক্তিই একমাত্র আদর্শ এবং ইহাই ভাগবতের মত। এই জন্য ভাগবত-গ্রন্থের প্রথমেই বলা হইয়াছে—

"ধর্ম্মপ্রোজ্ঝিতকিতবোঽত্র।"

যে ধর্ম্ম শুধু অর্থ কাম ও মোক্ষের সহায়ক তাহাকে ভাগবত ছল ধর্ম্ম বলিয়াছেন। যে ধর্ম্মে ভগবানে প্রীতি-প্রেম উৎপন্ন না করায় তাহা ধর্ম্মপদবাচ্য নহে।

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোকেই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য ধর্ম্মমত বলা লইয়াছে। শ্রীধরস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভে দ্বিতীয় শ্লোকের টীকাতেই 'কেবলমীশ্বরারাধনলক্ষণো ধর্ম্মঃ নিরূপ্যতে' এই বলিয়া ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াছেন। ভাগবত ধর্ম্মের প্রধান কথা এই যে এই ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া যাঁহারা ঈশ্বরের আরাধনা করেন তাঁহারা ঐহিক সুখ-সুবিধা বা মৃত্যুর পরে স্বর্গের প্রত্যাশী নহেন। এমন কি মোক্ষের আকাঙ্ক্ষাও তাঁহাদের নাই। যাঁহারা "ধনং দেহি রূপং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি" বলিয়া ঈশ্বরের আরাধনা করেন, তাঁহাদের ঈশ্বর লক্ষ্য নহেন, উপলক্ষ্য মাত্র, উপেয় বা উদ্দেশ্য নহেন, উপায় মাত্র।

ঈশ্বরের আনন্দ ও রস অনুভব করিবার প্রয়াসই ভাগবত ধর্ম্মের সাধনা।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিতেন, মানুষ ঐশ্বর্য্য ভালবাসে, তাই ভগবানের ঐশ্বর্য্য বর্ণনা করে—ঐশ্বর্য্যের কথা বলিতে ভালবাসে। কিন্তু তিনি যে 'রসো বৈ সঃ', তিনি যে রসরাজ, রসের সমুদ্র, এ

কথা মানুষ বোঝে না। মানুষ ভগবানকে দূরে রাখিয়া অন্তরের শ্রদ্ধা ভক্তি দেয়, কিন্তু প্রেম দিতে কাতর।

রবীন্দ্র নাথের গানে আছে—

"দেবতা জেনে দূরে রই দাঁড়ায়ে
বন্ধু বলে দু হাত ধরিলে।"

এই কথাটী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাকার সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট করিয়াছেন—

"ঐশ্বর্য্য জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য শিথিল প্রেমে নহে মোর প্রীত॥
আমারে যে যে ভক্ত ভজে যে যে ভাবে।
আমি সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে॥
মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন।
অতি হীন জ্ঞানে করেন তাড়ন ভর্ৎসন॥
প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন।
বেদস্তুতি হিতে তাহে হরে মোর মন॥"

সাধারণতঃ ভয় বা লোভ দ্বারা চালিত হইয়া যে ঈশ্বরের উপাসনা তাহা ঈশ্বরের উপাসনা নহে। তবে ইহা মন্দের ভাল। তুমি যখন ঈশ্বরকে ভয় করিতেছ, তখন ঈশ্বরের নিকট স্তুতি করিয়া কিছু আদায় করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছ, তুমি তখন ঈশ্বরতত্ত্বসম্বন্ধে কিছুই বোঝ নাই। সাধারণ লোকের ধারণা—ঈশ্বর মানব ও জগতের বহিঃস্থিত আকাশের ঊর্দ্ধে কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৃথিবীর রাজাদের ন্যায় বসিয়া আছেন। জড়বুদ্ধির দ্বারা চালিত হইয়া দেশ কাল ও অবস্থার দ্বারা খণ্ডিত করিয়া দেখাই যাহাদের অধিকারের সীমা, তাহারা জ্ঞানময় ভাবময়রূপে অন্তরাত্মা ও অন্তর্য্যামীরূপে সেই পূর্ণ তত্ত্বের ধারণা করিতে একেবারেই অক্ষম। এই সব নিম্নাধিকারীর পক্ষে ঐ ধর্ম্ম প্রয়োজন তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাই মানবের শেষ ধর্ম্ম নহে।

ভগবান্ যে আনন্দময়, রসময় এ কথা আমরা ভুলিয়া যাই। উপনিষদে আছে—

"তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ, প্রেয়ো বিত্তাৎ, প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ যদন্তরতমং তদয়মাত্মা।" বৃহদারণ্যক, ১-৪-৮। তিনি পুত্র হইতে প্রিয়তর, বিত্ত হইতে প্রিয়তর, আপনার বলিতে মানবের যাহা কিছু আছে সকলের হইতে প্রিয়তর। তিনি অন্তরতম। আবার বেদে এমন কথাও আছে যে মানুষ যে সমস্ত বস্তুকে ভালবাসে সেই সমস্ত বস্তুর জন্য ভালবাসে না, সেই আত্মা বা পরমাত্মার জন্যই ভালবাসে—

ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি
আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি,
ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি
আত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি।
বৃহদারণ্যক, ২।৪।৫

মানুষ ভগবান্‌কে দূরে রাখিতে চায়; তিনি কিন্তু তাহাকে আপন করিয়া লইবার জন্য ব্যস্ত। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন তুমি আমায় যা হোক কিছু দাও—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে
ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥

হোক সে জিনিষ তুচ্ছ ফল পাতা বা জল কিন্তু যা দিবে তা ভক্তির সহিত দিও। আবার বলিলেন—এ সবও যদি না দিতে চাও তবে—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্॥

হে অর্জ্জুন, যা কিছু কর, খাওয়া শোওয়া বসা সব তাতেই আমাকে সঙ্গে লও না কেন? আমার কথা সব সময়েই সব কাজেই একটু ভাবিও, একটু দরদ দিয়া ভাবিও।

শ্রীকৃষ্ণলীলায় ভগবান্ মানুষকে তাঁহার নিজের করিবার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চেষ্টা করিয়াছেন। চৌর্য্যলীলায় ভগবান্ জোর করিয়া ক্ষীর সর ননী লইয়াছেন। কারণ, দেওয়ার অভ্যাস মানুষের নাই।

ভক্ত বলিবেন যে ওগো আমি তো তোমায় কিছু দিব না, দিবার অভ্যাস আমার নাই। তুমি এস, জোর করিয়া আমার আমার বলিয়া যাহা লইয়া ডুবিয়া আছি, তাহাই লও। নিজে এসে বদ্ধ দুয়ার ভাঙ্গিয়া দাও। চাহিও না—চাহিলে পাইবে না, চাহিয়া তো দেখিয়াছ ; তবে কেন আর সে প্রহসন ?

শ্রীকৃষ্ণলীলায় পরিপূর্ণ মাধুর্য্য—বিশেষতঃ ব্রজলীলায়। কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্ এই তত্ত্ব ভাগবত প্রতিপাদন করিয়াছেন। তিনি তাঁহার প্রকট লীলায় পূর্ণতম, পূর্ণতর ও পূর্ণ এই তিন ভাবে প্রকাশিত। বৃন্দাবনে তিনি পূর্ণতম, পুরদ্বয়ে অর্থাৎ মথুরায় ও দ্বারকায় তিনি পূর্ণতর, কুরুক্ষেত্রে তিনি পূর্ণ। কুরুক্ষেত্র প্রধানতঃ জ্ঞানধাম। কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ The guide and philosopher, মথুরায় ও দ্বারকায় তাঁহার চিৎভাবের লীলা। পুরদ্বয় প্রধানতঃ কর্ম্মধাম—এখানে কৃষ্ণ The king and the ruler. বৃন্দাবনে আনন্দভাবের লীলা —প্রধানতঃ শুদ্ধাভক্তি-ধাম বৃন্দাবনে কৃষ্ণ 'অপ্রাকৃত নবীন মদন'—The object of transcendental or spiritual love.

এই প্রেম ব্রজগোপীদের সাধনায় পূর্ণ হইয়াছিল। তাঁহারা নন্দনন্দনকে নন্দনন্দনেরই জন্য ভালবাসিতেন, কোনও উদ্দেশ্য লইয়া নহে। প্রতিদান তাঁহারা চাহেন নাই, তাই শ্রীভগবান্ মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন—

> ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
> স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
> যা মাভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
> সংবৃশ্চ্য তদ্ বঃ প্রতিযাতু
> সাধুনা॥

শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে বলিলেন—

তোমরা দুশ্ছেদ্য গৃহশৃঙ্খল নিঃশেষে ছেদন করিয়া সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিষ্কাম ভাবে একমাত্র আমাকেই আশ্রয় করিয়াছ, আমি দেবতাদিগের পরমায়ু পাইলেও তোমাদের এই সদাচারের প্রতিশোধ দিতে পারিব না। অতএব তোমরাই আপনাপন উদারতার গুণে আমার ঋণ পরিশোধ করিয়া লও।

ভগবান্ যে এইরূপে নরলীলায় মানুষের সহিত মিশিয়া প্রেম যাজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীভগবানের অনন্ত কৃপারই প্রকাশ মাত্র। এইজন্য চৈতন্যচরিতামৃতকার বলিলেন—

> কৃষ্ণের যতেক লীলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
> নরবপু যাহাতে প্রকাশ।

যে বিশেষ করুণায় ভগবান্ পৃথিবীতে প্রকট হইয়া এই প্রপঞ্চে লীলা করিয়াছিলেন তাঁহার নাম যোগমায়া। ইহা মায়া ও বন্ধন, ইহাতে মমত্বের আবর্ত্তও আছে ; কিন্তু ইহা বিজ্ঞান দার্শনিকের ভাষায় উন্মুখ মোহিনীমায়া। ইহা আমাদিগকে ঈশ্বর হইতে বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয় না। আমাদিগকে ঈশ্বরের সহিত নিবিড় ভাবে বাঁধিয়া দেয়। পূর্ব্বে মানুষ শুনিয়াছিল বৈরাগী হও, ভালবাসার রস হৃদয় হইতে শুকাইয়া ফেল, তবে ভগবান্‌কে পাইবে। এখন নূতন বাণী শুনিল—এই রস বাড়াইতে আরম্ভ কর, বেশী করিয়া ভালবাস, এই ভালবাসার মধ্যদিয়াই তাঁহাকে পাইবে, তিনি প্রেমাস্পদ। তাই উদ্ধবকে গোপীরা বলিয়াছেন—

> 'বিরাগ যোগ কঠিন উদ্ধব
> হামে না করাব হো।'

ভাগবত বলিয়াছেন—

আমাদের প্রচলিত ধারণা যে ভগবান্ জগদ্ব্যাপারে কতকগুলি নিয়ম-কানুন করিয়া দিয়া বসিয়া আছেন। নিজে তিনি উদাসীন। মানুষ এই নিয়মের অনুবর্ত্তন করিলে মঙ্গল হইবে, শ্রেয়ঃ হইবে। যদি ঈশ্বরের সহিত বিশ্বের এই সম্বন্ধ হয়, তাহা হইলে কর্ম্মের শাসন অলঙ্ঘনীয় হইয়া দাঁড়ায়, মানুষের স্বাধীনতা

বা ঈশ্বরের করুণার স্থান থাকে না। তাহা হইলে বলিতে হয়—

নো ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি।
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্॥

ভোগ ব্যতীত শত কোটি কল্পেও কর্ম্ম ক্ষয় হয় না, কৃত কর্ম্মের শুভাশুভ অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। ভাগবত কর্ম্মবাদ স্বীকার করেন। জন্মান্তর ও কর্ম্মবাদ হিন্দুসাধনার বিশেষত্ব। কর্ম্মবাদ সত্য হইলেও বিশেষ অবস্থায় ইহা হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়।

ভাগবতের মতে ঈশ্বর শুধু বিশ্বাতীত (Transcendent) নহেন, তিনি বিশ্বানুগ (Immanent)। তিনি জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। সেইজন্য প্রথম শ্লোকেই ভাগবত বলিলেন "অন্বয়াৎ ইতরশ্চ"। তিনি সদ্রূপে বর্ত্তমান বলিয়াই জগৎ আছে। যাহা অবস্তু অর্থাৎ যাহা নাই তাহাতে তিনি নাই। তিনি যখন জগতে রহিয়াছেন তখন করুণার উৎস নিত্য উৎসারিত। সুতরাং বিশেষ ক্ষেত্রে কর্ম্মের হস্তেও অব্যাহতি আছে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিতেন, হাজার বছরের অন্ধকার ঘর, একটা দেশলাই জ্বাললে সব অন্ধকার পালিয়ে যায়। তেমি ভগবৎকৃপায় সমস্ত পাপ তাপ কর্ম্মফল হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। অজামিল চরিত্রে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। মানুষের অপরাধেরও সীমা নাই। তাঁহার করুণা-পারাবারেরও পার নাই। তাই ব্রহ্মসঙ্গীতে আছে—

"গাওহে তাঁহার নাম রচিত যাঁহার
বিশ্বধাম,
দয়ার যাঁর নাহি বিরাম, ঝরে
অবিরত ধারে।"

ভাগবতও উপনিষদের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে॥

নিজের মধ্যেই ঈশ্বর রহিয়াছেন, তাঁহাকে দেখিতে পাইলেই মানবের হৃদয়গ্রন্থি অর্থাৎ অহঙ্কারের বাঁধন কাটিয়া যায়, সকল সংশয় দূর হয় ও তাহার সকল কর্ম্ম (সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও ক্রিয়মাণ) ক্ষয় হইয়া থাকে।

এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়া এই সার-সত্যে উপনীত হওয়া গেল যে নিষ্কাম ভক্তি বা নির্গুণা ভক্তিই ভাগবতের আদর্শ। এই আদর্শই ধর্ম্মসাধনার ধ্রুবনক্ষত্রস্বরূপ। এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমাদের সাধন ভজন চালাইয়া যাইতে হইবে। জীবের পঞ্চম পুরুষার্থ যে কৃষ্ণপ্রেম, ভগবদ্ভক্তি তাহাই শ্রীমদ্ভাগবত প্রতিপন্ন করিলেন।

দ্বিতীয় কথা—ভাগবত ধর্ম্মের উদারতা ও বিশ্বজনীনতা। সকল ধর্ম্মমতের সমন্বয় ইহাতে করা হইয়াছে। মহিম্নঃস্তবের কথা ভাগবত সম্বন্ধে প্রযোজ্য—

ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং
বৈষ্ণবমিতি।
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ॥
রুচীনাং বৈচিত্র্যাৎ ঋজুকুটিলনানাপথজুষাং।
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥

বেদের কর্ম্মকাণ্ড, অষ্টাঙ্গ যোগ, শিব মত, বৈষ্ণব মত সমস্তই তত্ত্বতঃ এক। মানুষের রুচি ও অধিকার অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন পথ ধরিয়া অগ্রসর হয় কিন্তু তাহাতে কি যায় আসে? নদী-সকলের মধ্যে কোনটি সোজা পথে কোনটি বাঁকা পথে চলিয়াছে, কিন্তু সকলেই শেষে সমুদ্রে মিশিবে।

তৃতীয় কথা—শ্রীভগবানের আনন্দ ও রস অনুভব করিবার প্রয়াসই ভাগবত ধর্ম্ম। অনন্ত বিশ্বের মধ্য দিয়া আনন্দময় ভগবানের অনন্ত বৈচিত্র্যময় সত্তার স্পন্দনগুলি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আসিয়া আমাদিগকে স্পর্শ করিতেছে, জাগাইয়া তুলিতেছে। ভাগবতের সমস্ত লীলার মধ্যে এই মাধুর্য্য ভাব দেখান হইয়াছে। বৃন্দাবনে বাঁশি বাজাইয়া গোপীদের মন চুরি, দুষ্ট বালক হইয়া ননী চুরি সমস্ত বিষয় এই মাধুর্য্যভাবের মধ্য দিয়া অনুভব করিতে হইবে। সেইজন্য ভাগবত বলিলেন—

পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ।
১।১।৩

বৈষ্ণব কবি বলিলেন—

অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান নিম্বফলে
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র মুকুলে।
অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্ক জ্ঞান
কৃষ্ণনামামৃত পান করে ভাগ্যবান্॥

রসিক ভক্তের নিকট এই নিবেদন যে তাঁহারা ভাগবত রস পান করুন, জীবন ধন্য হইবে।

সমালোচনা

Sri Aurovindo : Some Views on the International Problem:— শ্রীঅনিলবরণ রায় প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীঅরবিন্দ লাইব্রেরী, ১৬ শম্ভুদাস ষ্ট্রীট, জর্জটাউন, মান্দ্রাজ। ২০ পৃষ্ঠা। মূল্য দুই আনা।

গ্রন্থকার চিন্তাশীল লেখক এবং পণ্ডিচেরী অরবিন্দ আশ্রমের সাধক। তাঁহাকে অরবিন্দ-বাণীর মুখপাত্র ও ভাষ্যকার বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শ্রীঅরবিন্দের দর্শন ও বাণী প্রচারই তাঁহার জীবন-ব্রত। ইংরাজি ও বাংলায় বহু পুস্তক ও প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি এই মহৎকার্যে বহু বৎসর যাবৎ ব্রতী আছেন। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাতে লেখক তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সরল যুক্তির আলোকে আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের মত সংক্ষেপে ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রথম মহাসমরের অন্তে বিজিত জাতিগণ যখন শান্তি সংস্থাপনের প্রযত্ন করিতেছিলেন তখন শ্রীঅরবিন্দ আর্য-পত্রিকায় যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছে। পূর্বে স্থাপিত শান্তি যে সাময়িক এবং লীগ অব নেশনস্ অস্থায়ী তাহা শ্রীঅরবিন্দ অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা জানিয়াছিলেন। তাঁহার মতে যত দিন জগতের একটী জাতিও পরাধীন থাকিবে, এবং সবল স্বাধীন জাতি অত্যাচার ও অধিকারের লোভ সংবরণ না করিবে, তত দিন বিশ্বশান্তি অল্পায়ু হইবে। মানবঐক্যের আদর্শ শীর্ষক ইংরাজি গ্রন্থে পণ্ডিচেরীর মৌন মহাপুরুষ এই বিষয়ে বিশদ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। আলোচ্য পুস্তিকা-খানিকে সেই গ্রন্থের উপক্রমণিকা বা পরিশিষ্টরূপে পড়া যাইতে পারে।

Essentials of Hahnemann's Organon of Medicine :—ডাঃ এন. সি. বসু, এম. ডি. সি. এইচ. প্রণীত। প্রকাশক—পাইলট পাব্‌লিশিং কোং, ৩৭।২ খেলাত বাবু লেন, কাশীপুর, কলিকাতা। ২৮০ পৃষ্ঠা। মূল্য পাঁচ টাকা।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় বাংলা দেশে হোমিওপ্যাথির বিশেষ প্রচার হইয়াছে। বাংলা দেশে যত হোমিওপ্যাথিক পুস্তক, কলেজ ও ডাক্তার আছেন, ভারতের অন্য কোন প্রদেশে তত হয় নাই। তাহা সত্ত্বেও দুঃখের এবং আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বাংলার জনসাধারণ এখনও এলোপ্যাথিতে যত বিশ্বাসী, হোমিও-প্যাথিতে তত বিশ্বাসী নহে। সেইজন্য বাংলায় তথা সমগ্র ভারতে হোমিওপ্যাথির আরও প্রচার হওয়া আবশ্যক। আলোচ্য পুস্তকখানি সেই পথের উজ্জ্বল আলোকস্তম্ভ। হ্যানিম্যানের 'অর্গ্যানন অব মেডিসিন' বইখানি হোমিওপ্যাথির বেদ। উহাতে হোমিওপ্যাথির তত্ত্বগুলি সূত্রাকারে ব্যক্ত। আমেরিকান ডাক্তার কেণ্ট কর্তৃক ইহার উপর যে প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা আছে তাহা অর্গ্যাননের টীকারূপে পঠিত হয়। আলোচ্য গ্রন্থটী কেণ্টের পুস্তক সদৃশ ও সমকক্ষ। গ্রন্থকার প্রবীণ হোমিওপ্যাথ, শিশুরোগ সংহিতা প্রভৃতি কয়েক-খানি হোমিও গ্রন্থের প্রণেতা এবং কয়েকটী হোমিও পত্রিকার সম্পাদক। কেণ্টের মত ডাঃ বসু তাঁহার এই পুস্তকে হ্যানিম্যানের অর্গ্যাননের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা সরল ও প্রাঞ্জল। কেণ্টের বইয়ের মত ডাঃ বসুর গ্রন্থও অর্গ্যাননের টীকারূপে পঠিত হইবার যোগ্য। বইখানি বাংলার জেনারেল কাউন্সিল এ্যাণ্ড ষ্টেট্ ফেকাল্টি অব মেডিসিনের কারিকিউলাম অনুযায়ী লিখিত। ইহাতে হোমিওপ্যাথির প্রতিষ্ঠাতা হ্যানিম্যানের

সংক্ষিপ্ত জীবনীও আছে। ভারতীয় হোমিও ছাত্রগণের উহা অবশ্য পাঠ্য। আমি কেন্টের বইখানি উত্তমরূপে পাঠ করিয়াছি। সুতরাং আমি মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি ডাঃ বসুর বই কেন্টের বই অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে, বরং অনেকাংশে উৎকৃষ্ট। আমরা সমগ্র ভারতে এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

Marxism and the Indian Ideal :—শ্রীব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী প্রণীত। সার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের ভূমিকা সম্বলিত। প্রকাশক—থ্যাকার স্পিঙ্ক এণ্ড কোং লিমিটেড, কলিকাতা। ৬৫ পৃষ্ঠা। মূল্য এক টাকা।

প্রবুদ্ধ ভারতে রুশিয়ার মার্ক্‌স্‌বাদ প্রতিষ্ঠার জন্য একদল ভারতীয় যুবক প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। রুশিয়াতে উক্ত বাদ আংশিক সফলতা লাভ করায় তাঁহারা মনে করেন—ভারতেও উহা প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু নবীন উৎসাহ ও আশার চাঞ্চল্যে তাঁহারা এই দেশের বৈশিষ্ট্য বিস্মৃত হইয়াছেন। ভারতের ধর্মময় ভূমিতে জড়বাদমূলক মার্ক্‌স্‌বাদ বাঁচিবে কিরূপে? লেখক হিন্দুসমাজের আদর্শটী সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া রাষ্ট্রনীতিতে ভারতীয় ও ইউরোপীয় দৃষ্টির মূলগত পার্থক্য সুস্পষ্ট করিয়াছেন। তাঁহার মতে ভারতীয় আদর্শটী আধ্যাত্মিক ভিত্তিতে সংস্থাপিত ও পরিপূর্ণ, এবং মার্ক্‌সের মতবাদ মানবসমাজের আংশিক আদর্শমাত্র। হিন্দু-সমাজ ধর্মভিত্তিতে দণ্ডায়মান হইয়াও আধুনিক সভ্যতার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং যন্ত্রব্যবহার অস্বীকার করিতেছে না। লেখক সরলভাবে এই পুস্তকে দেখাইয়াছেন যে, ভারতের ভবিষ্যৎ সমাজ প্রাচীন পন্থা ত্যাগ না করিয়াই মার্ক্‌স্‌-বাদের মূলমন্ত্রটী গ্রহণ করিতে সমর্থ। এইরূপে আমাদের দেশে যে অভিনব সমাজ সৃষ্ট হইবে তাহা শুধু দেশোপযোগী হইবে না, উহা অনেকাংশে রুশিয়ার সমাজ অপেক্ষা উন্নত হইবে। যে সকল বাঙ্গালী যুবক কার্ল মার্ক্‌সের বাণীতে মুগ্ধ হইয়া ভারতীয় সমাজের তত্ত্বকথাটী অবহেলা করিতেছেন তাঁহাদিগকে এই ছোট বইখানি পড়িতে অনুরোধ করি।

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

বেলুড় মঠে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের জন্মতিথিপূজা-উৎসব—গত ২১ শে ফাল্গুন, মঙ্গলবার, বেলুড় মঠে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের একাদশাধিকশততম জন্মতিথিপূজা-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে প্রাতে মঙ্গলারতি, বেদপাঠ, উষাকীর্তন, লীলাপ্রসঙ্গপাঠ, দশাবতার ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ পূজা, কথামৃতপাঠ, ভজন, কীর্তন এবং অপরাহ্ণে স্বামী পবিত্রানন্দজীর সভা-পতিত্বে মঠ-প্রাঙ্গণে এক জন-সভার অধিবেশন হয়। ইহাতে স্বামী গম্ভীরানন্দজী ও শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেন মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বহুমুখী ভাবসম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। রাত্রে কালী-কীর্তন, দশমহাবিদ্যার পূজা ও হোম হইলে ১০ জন সন্ন্যাস এবং ১৬ জন ব্রহ্মচর্য ব্রত গ্রহণ করেন। এই উৎসবে আনুমানিক দশ হাজার ভক্ত নর-নারী যোগদান করিয়াছিলেন।

চারি বৎসর পরে এবার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে গত ২৬শে ফাল্গুন,

রবিবার, বেলুড়মঠে, দুই লক্ষাধিক ভক্ত নর-নারীর সমাবেশ হয়। সারাদিনব্যাপী অসংখ্য লোক মোটর, বাস, প্রাইভেট গাড়ী, রিকসা, ষ্টীমার, নৌকা প্রভৃতিতে এবং পায়ে হাঁটিয়া মঠে আসেন। এবারও সকলকে বসাইয়া প্রসাদ দেওয়া সম্ভব হয় নাই। বহু ভক্তকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হইয়াছে। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাইক্রো-ফোনযোগে বিভিন্ন ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও উপদেশ কেন্দ্র করিয়া সঙ্গীত পুস্তকপাঠ ও আলোচনার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত কালীকীর্তন, হরিকীর্তন, চণ্ডীর গান এবং ঐক্যতান-বাদকদলসমূহ উৎসবক্ষেত্রটিকে মুখরিত করিয়া রাখিয়াছিল। এই উপলক্ষে মিষ্টান্ন, পানীয়, ছবি, পুস্তক প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর প্রায় দুই শত দোকান বসিয়াছিল। সহস্র সহস্র ভক্তকে বিনা-মূল্যে শীতল পানীয় এবং চা সরবরাহ করা হইয়াছে। হারাণ এবং প্রাপ্তি মোট ৫২টি ক্ষেত্রে ঘটে। ২২ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়। এতদুপ-লক্ষে প্রায় ১২০০ স্বেচ্ছাসেবকের সমবায়ে গঠিত ৩০টি বাহিনী বিশেষ কৃতিত্বের সহিত এই উৎসব-কার্য নির্বাহ করিয়াছেন।

বেদান্ত সোসাইটি, পোর্টল্যাণ্ড—১৯৪৪ সনের নভেম্বর হইতে ১৯৪৫ সনের অক্টোবর পর্যন্ত কার্য-বিবরণী—যুদ্ধের অস্বাভাবিক পরিস্থিতি-জনিত নানাবিধ অভাবনীয় অবস্থার মধ্য দিয়া আলোচ্য বর্ষে এই সোসাইটির কার্য সম্পাদিত হইয়াছে। আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী দেবাত্মানন্দজী পূর্বের ন্যায় এবারও নিয়মিত ভাবে গীতা, বিবেকচূড়ামণি ইত্যাদির আলোচনা, ছাত্রদিগকে ধ্যানধারণাদি শিক্ষাদান এবং বক্তৃতাদি করিয়াছেন।

এই প্রতিষ্ঠানে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা, শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও ভগবান বুদ্ধদেবের জন্মোৎসব এবং শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা ও শ্রীশ্রীকালীপূজা, বড়দিন, নববর্ষ ও ইষ্টার উৎসব সমারোহে সম্পাদিত হইয়াছে।

বেদান্ত সোসাইটি, প্রভিডেন্স—১৯৪৪ ও ৪৫ সনের কার্য-বিবরণী—১৯২৮ সনে স্বামী অখিলানন্দজী কর্তৃক এই আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত হয়। দুই জন স্থানীয় ভক্ত ২২৪ নং এঞ্জেল ষ্ট্রীটস্থ যে (তিনতলা) বাড়ীখানি দান করিয়াছেন তাহাতে একটি ক্ষুদ্র ভজনপ্রকোষ্ঠ, লাইব্রেরী, অফিস, দৈনিক পূজার জন্য মন্দির এবং বাসগৃহ আছে।

স্বামীজী নিয়মিত ভাবে প্রতি রবিবার এবং মঙ্গলবার শাস্ত্র আলোচনা, উপদেশ দান এবং ধ্যানধারণাদি শিক্ষাদান করিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে প্রভিডেন্স এবং পার্শ্ববর্তী শহরের বহু গির্জা, সমিতি, সংঘ, বন্ধুবান্ধব এবং ছাত্রদের আহ্বানে তিনি নানা স্থানে ভারতবর্ষ এবং হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। ব্রাউন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে (প্রভিডেন্স) এবং রচেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে (নিউইয়র্ক) তিনি ধারাবাহিকরূপে কয়েকটি বক্তৃতা দিয়াছেন। স্থানীয় অনেক সমিতির সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট আছেন। এতদ্ভিন্ন স্বামীজী মাঝে মাঝে রেডিও যোগেও বক্তৃতা করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, বুদ্ধদেব, শ্রীকৃষ্ণ ও যীশুখ্রীষ্টের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে স্বামী বোধানন্দজী, স্বামী যতীশ্বরানন্দজী, স্বামী বিশ্বানন্দজী এবং স্বামী সৎপ্রকাশানন্দজী বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে আসিয়া বক্তৃতাদি করিয়াছেন।

রামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটি, বোষ্টন—১৯৪৪ ও ৪৫ সনের কার্য-বিবরণী—১৯৪১ সনের মার্চ মাসে স্বামী অখিলানন্দজী কর্তৃক একটি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়। ১৯৪২ সনে তাঁহার একজন বিশিষ্ট বন্ধু বে ষ্টেট রোডে (ডীয়ারফিল্ড ষ্ট্রীট) মনোরম প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিত একটি বাড়ী আশ্রমের কার্যের জন্য

দান করেন। বর্তমানে এই বাড়ীতেই আশ্রমটি অবস্থিত।

স্বামীজী প্রতি রবিবার ও বৃহস্পতিবার শাস্ত্রাদি আলোচনা করিয়াছেন এবং ধ্যানধারণাদি সম্বন্ধে সমাগত ভদ্রমণ্ডলীকে উপদেশ দিয়াছেন। প্রতি শুক্রবার ও শনিবার দুপুরবেলা ভক্ত এবং ছাত্রদিগকে সাধন-ভজন সম্বন্ধে শিক্ষাদান করিয়াছেন। ইহা ছাড়া বোষ্টন বিশ্ববিদ্যালয়, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়, টাফ্‌টস্ কলেজ এবং বোষ্টন ও পার্শ্ববর্তী সহরের কয়েকটী বিদ্যালয়ে মনোবিজ্ঞান, এবং ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে তিনি বক্তৃতা দিয়াছেন। বিভিন্ন সংঘ-সমিতি হইতেও বক্তৃতাদি করিবার এবং উহাদের সভ্য হইবার জন্য তিনি আহূত হইয়াছিলেন। ১৯৪৫ সনে নিউইয়র্কে বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্ম সম্বন্ধীয় জাতীয় সম্মিলনে তিনি যোগদান করিয়াছিলেন। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় আলোচ্য বর্ষদ্বয়েও তিনি যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ছাত্র-সম্মিলনীতে ধারাবাহিকরূপে অনেকগুলি বক্তৃতা করিয়াছেন।

এই প্রতিষ্ঠানে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং বুদ্ধদেব, শ্রীকৃষ্ণ ও যীশুখ্রীষ্টের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। স্বামী বোধানন্দজী, স্বামী যতীশ্বরানন্দজী, স্বামী বিশ্বানন্দজী, স্বামী নিখিলানন্দজী এবং স্বামী সৎপ্রকাশানন্দজী এই কেন্দ্রে এই দুই বৎসর বক্তৃতাদি করিয়াছেন।

রাজকোট (কাথিওয়ার) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে বসন্তোৎসব—কিছু দিন হয় এই প্রতিষ্ঠানে বসন্তোৎসব উপলক্ষে এই প্রদেশে সর্বপ্রথম মূর্তিতে সরস্বতী পূজা এবং কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত, বক্তৃতা, প্রবন্ধ ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হইয়াছে। এই উপলক্ষে আহূত দুইটি সভায় স্থানীয় ধর্মেন্দ্র সিংজী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ডাঃ আর কে যাজনিক ও ডাঃ ডি এইচ বারিয়াবা সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। আশ্রম-পরিচালিত বিবেকানন্দ গুরুকুলের ছাত্রগণ এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় যোগদানকারিগণকে পারিতোষিক দেওয়া হয়।

মেদিনীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব—গত ১০ই মাঘ হইতে ২০শে মাঘ পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানে শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের চতুরশীতিতম জন্মোৎসব সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রথম দিবস প্রভাতে মঙ্গল শঙ্খধ্বনি, উষাকীর্তন, পরে বিশেষ পূজা, পাঠ, হোম ইত্যাদি সম্পন্ন হয়। মধ্যাহ্নে অনেক ভক্ত নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্নে সঙ্গীতজ্ঞগণ কর্তৃক উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত গীত হয়। এই দিন শহরের ও উহার নিকটবর্তী স্কুলসমূহে স্বামীজীর প্রতিকৃতি পুষ্পমাল্যে সজ্জিত করিয়া তাঁহার মহামিলন বাণী ছাত্র-ছাত্রীগণ কর্তৃক পঠিত ও আলোচিত হয়। ১৩ই মাঘ হার্ডিঞ্জ স্কুলের ছাত্রগণ কর্তৃক আশ্রম-প্রাঙ্গণে রামনাম সংকীর্তন হইয়াছিল। ২০শে মাঘ স্থানীয় স্কুল ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীগণ রচনা ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। এই সভায় স্বামী পুণ্যানন্দজী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং কৃতী ছাত্র-ছাত্রীগণকে সভাপতি মহারাজ পুরস্কার দেন। অপরাহ্নে ডাক্তার বিজয়কৃষ্ণ সরকার এম্-বি মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে স্বামী পুণ্যানন্দজী ও চারণ-কবি শ্রীযুক্ত বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দান করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, জলপাইগুড়ি—১৯৪৪ সনের কার্য-বিবরণী—এই প্রতিষ্ঠানের কার্য তিন ভাগে বিভক্ত: সেবাবিভাগ, শিক্ষাবিভাগ ও প্রচারবিভাগ।

আলোচ্য বর্ষে এই মিশন-পরিচালিত দাতব্য ঔষধালয় হইতে ৮৮১৬ জন নূতন ও ১৬৪০৩ জন পুরাতন রোগীকে ঔষধ দেওয়া হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে ২ জন কুষ্ঠ, ৫১ জন কালাজ্বর ও ৩ জন যক্ষ্মা রোগী ছিলেন। ৩৫৮ জন রোগীকে অস্ত্রোপচার করা হইয়াছে।

বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের অর্থানুকূল্যে শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি বাড়ী নির্মিত হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট-নিয়োজিত একজন শিক্ষিতা লেডী হেল্‌থ্ ভিজিটার (Lady Health Visitor)-এর সাহচর্যে এইখানে ধাত্রীবিদ্যাও শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। আলোচ্য বর্ষে ১১ জন ধাত্রী শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। এই বৎসর ধাত্রীগণ ৭২ জন প্রসূতিকে প্রথম হইতে প্রসবের সময় পর্যন্ত দেখাশুনা করিয়াছেন এবং ৪১ জনের বাড়ীতে যাইয়া বিনা পারিশ্রমিকে প্রসব করাইয়া-

ছেন। ইহা ছাড়া ১৮৫ জন জননী ও ১৩৩ জন শিশু শিশুমঙ্গল হাসপাতালে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ৩০২৪ জন দুঃস্থা মাতা ও শিশুকে দুধ দেওয়া হইয়াছে। প্রসূতিগণের শিক্ষার জন্য এই শহরে ৭টি ম্যাজিক লণ্ঠন বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। স্থানীয় মহিলা সমিতি ও বঙ্গীয় সরকারের জনস্বাস্থ্য-বিভাগ শিশুদের জামাকাপড়, দুধ, নিউভিট, গ্লাক্সো এবং অর্থ দ্বারা বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

আলোচ্য বর্ষে মিশনের ছাত্রাবাসে ১০জন এবং হরিজন-বিদ্যালয়ে ২০ জন ছাত্র ছিল। আশ্রমের সাহায্যকেন্দ্র হইতে মোট ৫৪৫৮৯ জন দুঃস্থ নরনারী এবং শিশুকে ৩৭১/০ মণ দুধ দেওয়া হইয়াছে।

এই প্রতিষ্ঠানে প্রতিবৎসর শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী এবং স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

স্থানীয় জেলাস্কুলে প্রতি শনিবার সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা হয়। এই বৎসর অনুরূপ ২২টি বক্তৃতা ও আলোচনা সভা হইয়াছে। স্থানীয় বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিবেকানন্দ-রচনা-প্রতিযোগিতা হইয়া থাকে। প্রথম স্থান অধিকারীকে ১০ মাসের স্কুলের বেতন দেওয়া হয়। এই বৎসর জেলাস্কুলের একটি ছাত্র প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে।

আশ্রমের পাঠাগারে ১০০০ খানা পুস্তক আছে। আলোচ্য বর্ষে ৮৩৮ খানা পুস্তক পাঠের নিমিত্ত বাড়ীতে দেওয়া হইয়াছিল।

এই বৎসরে আশ্রমের মোট আয় ১৪,১২১৲১৫ এবং মোট ব্যয় ৯,৬২৭৲১৫।

বহরমপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতি-উৎসব—গত ৬ই ফাল্গুন সন্ধ্যায় বহরমপুর গ্র্যাণ্ড হলে আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় প্রবীণ ব্যবহারজীবী শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ রায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শহরের অধিকাংশ বিদ্বজ্জনের উপস্থিতিতে উদ্বোধনের স্বামী সুন্দরানন্দজী বর্তমান ভারত তথা বিশ্বসমস্যার সমাধানে স্বামীজীর "নর-নারায়ণবাদ" গ্রহণের আবশ্যকতা সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দেন। স্থানীয় সব জজ শ্রীযুক্ত পুষ্পিতারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্বোধন বক্তৃতা মনোজ্ঞ হইয়াছিল।

পর দিন লালবাগ শহরে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বসু, মুনসেফ মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক জন-সভায় স্বামীজী "শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শ" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। হিন্দুমুসলমাননির্বিশেষে বহু নরনারী এই সভায় যোগদান করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন।

নব প্রকাশিত পুস্তক

Brihadaranyakopanisad—মায়লাপুর, মান্দ্রাজ, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত। দেবনাগরীতে মূল শ্লোক ও প্রতি শব্দের ইংরাজী অন্বয় ও ব্যাখ্যা। ৬০৫ পৃষ্ঠা, ডবল ক্রাউন, উত্তম বাঁধাই, মূল্য ৫৲ টাকা।

The Eternal Companion—Spiritual Teachings of Swami Brahmananda—স্বামী প্রভবানন্দ প্রণীত। মায়লাপুর, মান্দ্রাজ, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত। স্বামী ব্রহ্মানন্দের উপদেশ ও কথোপকথন। ২৮৭ পৃষ্ঠা, পকেট সাইজ, বাঁধাই, মূল্য ২৷০ আনা।

Thus Spake Vivekananda—মায়লাপুর, মান্দ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত। ৫৯ পৃষ্ঠা, পকেট সাইজ, সুদৃশ্য বাঁধাই, মূল্য ॥০ আনা।

Our Women—স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত। করাচী শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত। ভারতীয় নারী সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের অভিমতের সংগ্রহ। ৪৭ পৃষ্ঠা, ডবল ক্রাউন, মূল্য ॥০ আনা।

My Life and Mission—স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত। অদ্বৈত আশ্রম, মায়াবতী (আলমোড়া) হইতে স্বামী পবিত্রানন্দ কর্তৃক প্রকাশিত। পরিশিষ্টে স্বামী বিবেকানন্দের বাণীসহ ১৯০০ সনে পেসাডোনা, ক্যালিফর্নিয়া, সেক্সপিয়ার ক্লাবে প্রদত্ত একটি বক্তৃতা। ৩৭ পৃষ্ঠা, মূল্য ॥০ আনা।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ বসু—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরম ভক্ত স্বর্গীয় বলরাম বসু মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং স্বর্গীয় সাধুপ্রসাদ বসু মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ বসু মহাশয় গত ৬ই ফাল্গুন সোমবার রাত্রে ৫৭নং রামকান্ত বসু ষ্ট্রীটে (বলরাম-মন্দির) ৫৯ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। নিত্যানন্দ বাবু শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর মন্ত্রশিষ্য এবং শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরঙ্গ শিষ্যদিগের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি দুই পুত্র, পুত্রবধূ এবং দুই পৌত্র রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি।

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমে শ্রীগৌরীমার জন্মোৎসব—গত ২রা ফাল্গুন মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশীতে পুণ্যশীলা শ্রীগৌরীমার আবির্ভাব উপলক্ষে কলিকাতা ও নবদ্বীপ আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমার বিশেষ পূজাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে শ্রীশ্রীমার প্রতিকৃতি পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল।

কলিকাতা-কেন্দ্রে সন্ন্যাসিনী অজিতা ভজন-সঙ্গীত, সন্ন্যাসিনী অসীমা গুরুবন্দনা, সন্ন্যাসিনী দুর্গামাতা শ্রীরামকৃষ্ণ-নামমাহাত্ম্যকীর্তন ও গীতার ব্যাখ্যা করেন। কুমারী অম্বা আবৃত্তি এবং কুমারী ঝরনা গৌরীমাতার স্তব পাঠ করিলে উৎসব শেষ হয়। নবদ্বীপ-কেন্দ্রে কুমারীদের বেদগান, আবৃত্তি এবং ভজন-সঙ্গীত অন্তে শ্রীযুক্তা সুব্রতাপুরী দেবী "গৌরীমাতা ও তাঁহার নারায়ণলীলা" এবং সুমিত্রা দেবী "গীতার বিশ্বরূপ" সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

জব্বলপুরে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি-উৎসব—কিছু দিন হয় জব্বলপুরে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি-উৎসব দুই সপ্তাহ-ব্যাপী অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ লাইব্রেরীর সদস্যবৃন্দের চেষ্টায় স্বামী শর্বানন্দজী এই শহরে আগমন করিয়া বিভিন্ন স্থানে বাঙ্গলা, ইংরাজী ও হিন্দী ভাষায় সুমধুর বক্তৃতা করেন। জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকলেই তাঁহার উপদেশপূর্ণ বক্তৃতায় এতই মুগ্ধ হইয়াছেন যে তাঁহারা এই শহরে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন স্থাপন করিয়া ধর্মপ্রচার ও সেবাকার্য স্থায়ীভাবে পরিচালনের চেষ্টা করিতেছেন।

খুলনা শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব—গত ৫ই ফাল্গুন এই শহরে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে দুই শতাধিক দরিদ্রকে চাউল দেওয়া হইয়াছে। সন্ধ্যায় খুলনা আর্যসভাগৃহে স্থানীয় একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি বৃহৎ জনসভা হয়। ইহাতে দৌলতপুর কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন মজুমদার, খুলনা মহিলা কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুত পৃথ্বীশ চন্দ্র নিয়োগী এবং সেনহাটি হাইস্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীযুত শ্যামাপদ সেন মহাশয় স্বামীজীর বিভিন্ন ভাব অবলম্বন করিয়া বক্তৃতা করেন। সভায় বহু ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত হইয়াছিলেন।

উদ্বোধন

রাশিয়ায় শিক্ষার উন্নতি

সম্পাদক

জারের রাজত্বকালে রাশিয়ার জনসাধারণ শিক্ষায় ইউরোপের সকল দেশের পশ্চাতে ছিল। তথাকার শহরগুলিতেও স্কুল-কলেজের সংখ্যা বেশি ছিল না। গ্রামঅঞ্চলে পাঁচ ছয় মাইল ব্যবধান এক একটি স্কুলে অতি অল্পসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করিত। এই বিরাট দেশের ১৭,০৪,৬৭,১৮৬ জন অধিবাসীর মধ্যে ১৯১৪ সনে শতকরা মাত্র ৩'৩ জন বিভিন্ন প্রকার বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। দেশের শিশু ও তরুণদের মধ্যে শতকরা ৮০ জন শিক্ষা লাভের কোন সুযোগ পায় নাই। অন্ত-বিপ্লবের অবসানে রাশিয়ার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির প্রধান উপায়রূপে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারকার্যে বিশেষ ভাবে মনোনিবেশ করেন। ১৯১৮ সনে অক্টোবর-বিপ্লবের পরেই ১৭ বৎসর বয়স্কদের জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা-নীতি গৃহীত হইলেও ইহা কার্যে পরিণত করা সম্ভব হয় নাই। ১৯৩১ সনে সমগ্র দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হয়। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক (১৯৩৮-৪২ সন) পরিকল্পনা অনুসারে শহরে মাধ্যমিক ও গ্রামে সপ্তম মান পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। জারের আমলে ১৯১৪ সনে মাত্র ৮১,৩৭,০০০ জন ছাত্র-ছাত্রী স্কুলে অধ্যয়ন করিত, সোভিয়েট শাসন কালে ১৯৩৮ সনে ৪,৭৪,৪২,১০০ জন ছাত্রছাত্রী অধ্যয়ন করিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে কলেজের ছাত্রছাত্রীসংখ্যা ১,১২,০০০ জন হইতে ৬,০১,০০০ জনে পরিণত হয়। ১৯৩৩ সন হইতে ১৯৩৮ সনের মধ্যে ২০,৬০৭টি স্কুল-কলেজ গড়িয়া উঠে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুসারে ১৯৪২ সনে স্কুল-কলেজের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি করিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ১৯১১ সনে সমগ্র রাশিয়ায় ৯২,৪০০ জন শিক্ষক ছিলেন, ১৯৪২ সনে ১০,০০,০০০ জন শিক্ষক শিক্ষাদান করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন হাজার হাজার অতিরিক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া বয়স্ক নরনারীকে লেখাপড়া শিখান হইতেছে। এই ভাবে গত বিশ বৎসরের মধ্যে চারি কোটি বয়স্ক নরনারীকে লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। বিপ্লবের পর ১৯১৮ সন হইতে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট দেশবাসীর নিরক্ষরতা দূর করিতে বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিতেছেন। ইহার ফলে জারদের আমলে দুই শত বৎসরে যেরূপ শিক্ষাবিস্তার সম্ভব হয় নাই, সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট বিশ বৎসরের মধ্যে তাহা কার্যে পরিণত করিয়াছেন। এ জন্য বিপুল অর্থ

ব্যয়িত হইয়াছে। ১৯১৩ সনে জারের রাজত্বকালে মাত্র ১৩৬৭ লক্ষ রুবেল শিক্ষাদানকার্যে ব্যয় করা হইয়াছিল, ১৯৩৭ সনে সোভিয়েট গবর্ণমেন্ট শিক্ষা-বিভাগের জন্য ৬১,৭৯০ লক্ষ রুবেল ব্যয় করিয়াছেন। বর্তমানে শিক্ষাবিভাগে ব্যয়ের পরিমাণ আরও অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সোভিয়েটতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে রাশিয়ায় নির্দিষ্ট সংখ্যক ইহুদী ছাত্রছাত্রী স্কুল-কলেজে পড়িবার সুযোগ পাইত। ইউক্রেন জর্জিয়া আর্মেনিয়া আজেরবাইজান বাইলো-রাশিয়া ও মধ্য-এসিয়ার জাতীয় বিদ্যালয়গুলি রুশ-সম্রাট বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। সোভিয়েট গবর্ণমেন্ট জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে সকল নরনারী-কেই তাহাদের নিজ নিজ ভাষায় শিক্ষালাভের অধিকার দিয়াছেন। পূর্বে সোভিয়েটের অন্তর্গত বাস্কির তুর্কমেনিয়ান আদিজিস কারাকাল্পাক নোগাই লেজগিন কাবার্দিনিয়ান চেচেন মর্দভিনিয়ান ইঙ্গুশ প্রমুখ ৪০টি জাতির কোন লিখিত ভাষা বা বর্ণমালাও ছিল না। এই জন্য এই সকল ভাষাভাষিগণ লেখাপড়া জানিত না। সোভিয়েট আমলে এই জাতিসমূহের ভাষায় বর্ণমালা সৃষ্টি করিয়া ইহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। বর্তমানে উজবেকীস্তানে ৩০টি, টার্কমেনিস্তানে ৫টি, কাজাখস্তানে ১৯টি, বাইলোরাশিয়ায় ২২টি, আর্মেনিয়ায় ৮টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। পূর্বে জর্জিয়ায় মাত্র একটি ও ইউক্রেনে মাত্র ১৫টি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, ইদানীং যথাক্রমে ১৮টি ও ৩৯টি বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠিয়াছে। উজবেকীস্তান ও টার্কমেনিস্তানে এখন শতকরা ৮০জন নরনারী লেখাপড়া জানেন। বিপ্লবের পূর্বে তাজিকীস্তানে কোন বিদ্যালয় ছিল না, বর্তমানে তথায় ২২০০ জন ছাত্রছাত্রী শিক্ষালাভ করিতেছে। রাশিয়ার ১৭ কোটি ৪ লক্ষাধিক অধিবাসীর শিক্ষা-ব্যবস্থার সঙ্গে ভারতের ৪০ কোটি অধিবাসীর শিক্ষা-ব্যবস্থার তুলনা করিলে দেখা যায়, সমগ্র ভারতে মাত্র ২০টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে এবং শতকরা ১০জন মাত্র লেখাপড়া জানেন।

রাশিয়ায় বর্তমানে ৭১৬টি সাধারণ কলেজ, ৭২টি মেডিক্যাল কলেজ ও ২৫০০টি উচ্চ শ্রেণীর টেকনিক্যাল কলেজ পরিচালিত হইতেছে। এতদ্ভিন্ন ২৪৩,৩০০টি সমবায় কৃষিফার্ম, ৩৯৫৭টি ষ্টেট্‌ কৃষিফার্ম ও ৬৩৫০টি কৃষি-সরবরাহ কেন্দ্র, ৩৬৭টি কৃষি-গবেষণালয়, ৫০৭টি কৃষিপরীক্ষামূলক ফার্ম ও ৯০টি কৃষিস্টেশনে কৃষি, পশু-পক্ষী উৎপাদন পালন ও চিকিৎসা এবং দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রস্তুতকরণ, ট্রাক্টর চালন, ফসলকাটা, মটর চালন ও মেরামত প্রভৃতি কৃষিসম্বন্ধীয় নানাবিধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। কৃষিসংক্রান্ত শিক্ষালয়সমূহে কৃষকগণও অবসর সময়ে শিক্ষালাভ করেন। মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রী বিবিধ কলেজে শিক্ষালাভ করিতেছেন। ইহা ছাড়া হাজার হাজার ছোটবড় কারখানায় মাধ্যমিক ও শিল্পাদি শিক্ষা-দানের জন্য স্কুল আছে। এই স্কুলগুলিতে কার-খানার কর্মিগণ অবসর সময়ে শিক্ষালাভ করিয়া থাকেন। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শ্রমিকগণকে ইঞ্জিনিয়ার ও টেকনিসিয়ানে পরিণত করিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

ইদানীং রাশিয়ার সর্বত্র প্রাথমিক শিক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া মাধ্যমিক, উচ্চশিক্ষা এবং সর্ববিধ শিল্পশিক্ষা সম্পূর্ণ অবৈতনিক ভাবে দেওয়া হইতেছে। প্রাথমিক ও মাধ্যশিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ছাত্রছাত্রীগণ তাঁহাদের ইচ্ছামত উচ্চশিক্ষা বা কোন টেকনিক্যাল শিক্ষালাভ করেন। ষ্টেট হইতে এই সকল ছাত্রছাত্রীগণকে নিয়মিত ভাবে ভাতা দেওয়া হয়। উচ্চশিক্ষা লাভ করিলে প্রায় সকলেই ষ্টেটের বিভিন্ন বিভাগে দায়িত্বপূর্ণ কাজ পাইয়া থাকেন। যাঁহারা টেকনিক্যাল শিক্ষালাভ করেন, তাঁহাদেরও কাজের কোন অভাব হয় না।

সোভিয়েট রাশিয়ায় মেডিক্যাল স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, নার্সিং, কম্পাউণ্ডারী, ঔষধ প্রস্তুত ও বিক্রয় প্রভৃতি কার্য গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক পরিচালিত। এই সকল বিভাগে লক্ষ লক্ষ নরনারী শিক্ষালাভ করিয়া কার্য করিতেছেন। জারের আমলে সমগ্র রাশিয়ায় ৪৯,৪২৩টি ইন্‌ডোর বেড এবং ৪৬১১টি প্রসূতি-বেড ছিল, বর্তমানে ঐ বেডগুলি যথাক্রমে ১,৭৫,৯৫৫টি ও ৫৪,৩১৭টিতে পরিণত হইয়াছে। পূর্বে শিশু-হাসপাতাল ছিল মাত্র ৯টি, ইদানীং উহাদের সংখ্যা ৪৩৮৪টি। সোভিয়েট শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে রাশিয়ায় একটিও শিশু-শুশ্রূষা প্রতিষ্ঠান ও হেলথস্টেশন ছিল না, এখন যথাক্রমে ১৬২৬টি ও ৭৬৩১টি স্থাপিত হইয়াছে। ১৯১৩ সনে রাশিয়ায় চিকিৎসকের সংখ্যা ছিল ১৯,৭৮৫ জন, ১৯৪২ সনে ইঁহাদের সংখ্যা ১,৩২,০০০ জন। ইহা ছাড়া লক্ষ লক্ষ নরনারী ঔষধ প্রস্তুত ও বিক্রয়, কম্পাউণ্ডারী ও নার্সিং করিয়া স্বচ্ছন্দে জীবিকানির্বাহ করিতেছেন।

রাশিয়ার সকল নরনারী—বিশেষ করিয়া তরুণ-তরুণীগণকে নানা বিষয়ে উচ্চশিক্ষা দান করিয়া জাগতিক সকল বিষয়ে উন্নত করাই সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিস্তারের একমাত্র উদ্দেশ্য। যাহাতে দেশের প্রত্যেকটি নর ও নারী কোন বিষয়ে উচ্চশিক্ষা বা উচ্চ শ্রেণীর শিল্পশিক্ষা লাভ করিয়া স্বচ্ছন্দে জীবিকার্জন করিতে পারেন তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়। বালক-বালিকাদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির দিকে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের বিশেষ দৃষ্টি আছে। ১৪ বৎসরের কম বয়স্ক কোন বালক বা বালিকাকে শ্রমিকের কাজে এবং ১৭ বৎসরের কম বয়স্ক কোন তরুণ বা তরুণীকে অত্যন্ত শ্রমসাধ্য কোন কার্যে নিযুক্ত করা আইনতঃ নিষিদ্ধ। শ্রমিক বোর্ডের অনুমতি ভিন্ন ১৪ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর বয়স্ক কোন তরুণ বা তরুণীকে কোন চাকরি করিতে দেওয়া হয় না। দেশের ভবিষ্যৎ আশাস্থল বালক-বালিকা ও তরুণ-তরুণী-গণের স্বাস্থ্যোন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই এই সকল ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ব্যায়াম খেলাধূলা আমোদপ্রমোদ দেশভ্রমণ প্রভৃতি সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক শিক্ষার অঙ্গরূপে গৃহীত। বর্তমানে রাশিয়ায় ছেলেদের ব্যায়াম-শিক্ষার জন্য উপযুক্ত শিক্ষকদের অধীনে আধুনিক সাজসরঞ্জামযুক্ত ২৭১৩টি ব্যায়ামাগার, ২৭০০টি ফ্লাইং ক্লাব, ৩৫০টি জলক্রীড়াক্ষেত্র, ৬৫০টি ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা ক্ষেত্র ও ১২০০টি ক্রীড়াভূমি প্রভৃতি আছে। প্রতি বৎসর হাজার হাজার বয়স্ক ছাত্র-ছাত্রী ককেসাস ও মধ্য-এসিয়ার পর্বত-শিখরে আরোহণ করেন। এই অভিযানের সকল খরচ ষ্টেট হইতে দেওয়া হয়। গ্রীষ্মের বন্ধের সময় অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীই গ্রাম অঞ্চলে তাহাদের নিজ নিজ বাড়ীতে যায়। এই সময়ে কলকারখানার পক্ষ হইতে বড় বড় শহরের উপকণ্ঠে এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে ক্রিমিয়া ও ককেসাস পর্বতের পাদদেশে বালক-বালিকাদের ক্যাম্পের বন্দোবস্ত করা হয়। তাহারা কতক দিন ক্যাম্পে থাকিয়া দ্রষ্টব্য বিষয়গুলি পরিদর্শন করে। ১৯৩৯ সনে এইরূপ ক্যাম্পগুলিতে চৌদ্দ লক্ষ বালক-বালিকাকে স্থান দেওয়া হইয়াছিল। সময়ে সময়ে ভ্রাম্যমাণ ক্যাম্পেরও বন্দোবস্ত করা হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক ১৯৩৩-৭ সন পরিকল্পনা অনুসারে বালক-বালিকাদের জন্য ৮৬৪টি ক্লাব, ১৭০টি পার্ক ও বাগান, ১৭৪টি থিয়েটার ও সিনেমা, ৭৬০টি টেকনিক্যাল ও আর্ট স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। এক কোটির অধিক বালক-বালিকা এই স্কুলগুলিতে যোগদান করিয়াছিল। বর্তমানে ইহাদের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট দেশের প্রত্যেকটি বালক ও বালিকাকে ষ্টেটের খরচে শিক্ষাদান করিয়া বয়স্ক হইলে যোগ্যতা অনুসারে তাহাদিগকে কর্মে নিযুক্ত করেন। অধুনা রাশিয়ায় সকল শ্রেণীর নরনারীর মধ্যে নানাবিধ শিক্ষাবিস্তারের ফলে বেকার-সমস্যা সম্পূর্ণ দূর হইয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দ*

শ্রীতারাপদ চৌধুরী, বি-এ

গত অর্দ্ধশতাব্দী যাবৎ ভারতবর্ষে নবজাগরণ আমরা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। ভারত পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করিয়া পৃথিবীর অন্যান্য অভ্যুদয়শীল জাতির ন্যায় সগৌরবে মস্তক উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইবার জন্য সচেষ্ট। রাজনীতি, সমাজনীতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্ব্বক্ষেত্রেই এই জাগরণের ভাব সুস্পষ্ট এবং পুনঃ পুনঃ নানাভাবে প্রতিহত হইয়াও তাহাদের উন্নতিচেষ্টার বিরতি পরিলক্ষিত হইতেছে না। ভারতের এই নবজাগরণের মূলে স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষার প্রভাব সুস্পষ্ট। ভারত তাহার এই অভ্যুত্থানের প্রেরণা প্রধানভাবে পাইয়াছে সেই দিন যে দিন শিকাগোর ধর্ম্মমহাসভায় এই হিন্দুসন্ন্যাসীর মুখ হইতে ভারতের আধ্যাত্মিকতা ও দর্শনের বিজয়বাণী বিঘোষিত হইয়াছিল। তাঁহার বাণী সমগ্র পাশ্চাত্য জগতে প্রতিধ্বনিত হইয়া তাঁহার মাতৃভূমিতেও প্রতিধ্বনি তুলিয়াছিল। আবার যেদিন ভারতের মৃত্তিকায় ফিরিয়া আসিয়া এই দেশপ্রেমী সন্ন্যাসী গুরুগম্ভীরস্বরে বলিয়াছিলেন, "হে ভারত, ভুলিও না, তোমার আদর্শ সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী, তোমার আদর্শ সর্ব্বত্যাগী উমানাথ শঙ্কর, ভুলিও না, তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত, হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে ডাকিয়া বল, আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ……।" সেই দিন হইতেই ভারত তাহার আত্মসম্বিৎ পুনরায় ফিরিয়া পাইয়াছে। আত্মবিস্মৃত, পরাধীন, পরপদানত, পরানুকরণরত ভারতকে তাহার আত্মবিশ্বাস এইভাবে ফিরাইয়া না দিলে তাহার যে আজ কি অবস্থা হইত তাহা বলা যায় না। ব্যক্তিগত জীবনে যেমন জাতিগত জীবনেও তেমনি আত্মগ্লানিই সকল অধঃপতনের মূল কারণ। বিজিত ভারত এই আত্মগ্লানিতে অধীর হইয়া বিজেতা পাশ্চাত্যের বাহ্যচাকচিক্যময় সভ্যতার অনুকরণের অন্ধ আবেগে ছুটিয়া চলিয়াছিল বহ্নিমুখপ্রেপ্সু পতঙ্গের মত। স্বামী বিবেকানন্দের সাবধান বাণীই যে তাহাকে এই ঘোরতর অনিষ্টপাত হইতে রক্ষা করিয়াছে ইহা অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি মাত্রের নিকটই সুবিজ্ঞাত। স্বাধীনতাসম্পর্কে তিনি বলিয়াছিলেন :

"সর্ব্ববিষয়ে স্বাধীনতা অর্থাৎ মুক্তির দিকে অগ্রসর হওয়াই পরম পুরুষার্থ। যাহাতে অপরে শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হইতে পারে সে বিষয়ে সাহায্য করা এবং নিজেরও সেই দিকে অগ্রসর হওয়াই পরম পুরুষার্থ।" তিনি আরও বলিয়াছেন, "আগামী পঞ্চাশৎবর্ষ ধরিয়া পরম জননী মাতৃভূমিই তোমাদের আরাধ্যা দেবী হউন।"

স্বামিজীর এই সব বাণীই যুগযুগান্তরের নিদ্রাচ্ছন্ন ভারতে নবজাগরণ আনিয়া দিয়াছে। কুম্ভকর্ণ তাহার সুদীর্ঘ নিদ্রা ত্যাগ করিয়া জাগরিত হইতেছে। পরবর্ত্তী কালে ধর্ম্ম, রাষ্ট্র, সমাজ, সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান সর্ব্ববিষয়েই দেখিতে পাই এই মহা প্রতিভাশালী মহামনস্বী, মহামহিমময়, সর্ব্বত্যাগী, তত্ত্ববেত্তা সন্ন্যাসীর অপ্রতিহত প্রভাব।

সর্ব্বক্ষেত্রে স্বামিজীর অক্ষুণ্ণ প্রভাব দেখিয়া

* দিল্লী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে আচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দের ৮৪তম জন্মতিথি উপলক্ষে লেখককর্তৃক পঠিত।

তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার বিষয় চিন্তা করিয়া আমরা বিস্ময় সাগরে নিমজ্জিত না হইয়া থাকিতে পারি না। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন একাধারে মহাধর্ম্মবীর, মহাকর্ম্মবীর। তাঁহার প্রতিভা শুধু আধ্যাত্মিকতায়ই সীমাবদ্ধ ছিল না, সর্ব্বসাধারণের সর্ব্ববিধ ঐহিক কল্যাণের দিকেও সমভাবে প্রবাহিত হইত। সকল বিষয়েই তাঁহার মৌলিক চিন্তা ও বাণী তাঁহাকে সর্ব্বজনসমাদৃত সার্ব্বজনীন আদর্শে পরিণত করিয়াছে। তিনি একদিকে যেমন ধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ তত্ত্ববেত্তা ঋষি ছিলেন, অন্য-দিকে আবার তেমনি দার্শনিক, সাহিত্যিক, বক্তা, সংগীতজ্ঞ, বিজ্ঞানবিৎ, রাজনীতিজ্ঞ ও সমাজতত্ত্ববেত্তা ছিলেন। শারীরিক সৌন্দর্য্য এবং শক্তিতেও তিনি অসাধারণ ছিলেন। এই জন্যই সর্ব্বক্ষেত্রের কর্ম্মী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ কর্তৃকই তিনি সম্মানিত হইয়াছেন। আজকাল নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু সর্ব্বত্র সম্মানিত। ইহা বড়ই আনন্দের বিষয়, বিশেষতঃ বাঙালীর বড়ই গৌরবের বিষয়। নেতাজীকে প্রত্যক্ষভাবে দেখিবার এবং তাঁহার কথাবার্ত্তা বক্তৃতাদি শুনিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল; তাঁহার বক্তৃতাদির মধ্যে স্বামিজীর বাণীর প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইয়া এবং স্বামিজীর প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধার পরিচয় পাইয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি। এই প্রকার শ্রীঅরবিন্দ, মহাত্মা গান্ধী, কবিবর রবীন্দ্রনাথ, সর্ব্বপল্লী রাধা-কৃষ্ণন্ প্রভৃতি আধুনিক জনপ্রিয় নায়কগণের সকলের মধ্যেই স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব বিদ্যমান—প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে ইঁহারা সকলেই যে স্বামিজী কর্ত্তৃক প্রভাবিত হইয়াছেন ইহা অস্বীকার করা যায় না। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে আবার অকপটে ইহা ব্যক্তও করিয়াছেন।

উপরোক্ত নেতাগণ স্বামী বিবেকানন্দ কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত এবং অনুপ্রেরিত হইলেও স্ব স্ব যে ধারা অনুসরণ করিয়া দেশের ও দশের কল্যাণসাধনে ব্রতী আছেন তাহা হইতে স্বামী বিবেকানন্দের কর্ম্মধারার একটু বৈশিষ্ট্য আছে। স্বামী বিবেকানন্দ কোন বিষয় বিশেষের বহিরঙ্গ সংস্কারে ব্রতী না হইয়া দেশের আমূল সংস্কারে ব্রতী হইয়াছিলেন। তিনি জাতির অবনতির মূলকারণের উৎসাদন করিতে, জাতীয় শক্তিকে জাগরিত করিতে এবং জাতীয় কুণ্ডলিনীকে প্রবুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কোন জাতিই তাহার বৈশিষ্ট্যকে অবহেলা করিয়া জাগরিত হইতে পারে না এবং ঐ বৈশিষ্ট্যের উন্নতিতেই তাহার সর্ব্বপ্রকার উন্নতি, একথায় তিনি দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন। ভারতের বৈশিষ্ট্য কি তাহা অনুসন্ধান করিতে গিয়া স্বামিজী ধর্ম্মকেই দেখিতে পাইয়াছেন। তাই ধর্ম্মের প্রকৃত উন্নতিতেই যে ভার-তের অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার উন্নতি—একথা তিনি অভ্রান্তভাবে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ভারতবাসীকে আহ্বান করিয়া তিনি বলিয়াছেন, "তোমরা ধর্ম্মকে বিশ্বাস কর বা না কর, যদি জাতীয় জীবনকে অব্যাহত রাখিতে চাও তবে তোমাদিগকে এই ধর্ম্মরক্ষায় সচেষ্ট হইতেই হইবে।" কারণ "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।" যাহার যাহা স্বধর্ম্ম তাহা বর্জ্জন করিলে তাহার তাহাতে কখনও প্রকৃত কল্যাণ হইতে পারে না। ধর্ম্মই ভারতের স্বধর্ম্ম।

ভারতকে উন্নত করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে তাহাকে ধর্ম্মবিষয়ে উন্নত করিতে হইবে, সেই সঙ্গে অন্যান্য বিষয়েও উন্নতির চেষ্টা দেখিতে হইবে—ইহাই ছিল স্বামিজীর অভিমত। ধর্ম্ম বলিতে তিনি সাম্প্র-দায়িকতা, গোঁড়ামি, কুসংস্কার ও কতকগুলি উদ্দেশ্য-হীন তন্ত্রমন্ত্র ছিটাফোঁটা, আচার অনুষ্ঠান বা ভাব-প্রবণতায় কয়েকঘণ্টা হরিনামে উদ্দাম নৃত্য বুঝিতেন না। তাঁহার মতে মানুষের অন্তর্নিহিত ঈশ্বরত্বের বিকাশ সাধনই ধর্ম্ম। উপনিষৎ বলিতেছেন "তত্ত্বমসি", তুমিই সেই ব্রহ্ম। এই শ্রুতিসিদ্ধ মহাবাক্য যাহা এতকাল মুষ্টিমেয় সন্ন্যাসীর সম্পত্তি

হইয়া গিরিগুহা অরণ্যকন্দর এবং সাধুর আশ্রমে লুক্কায়িত ছিল তাহা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ছড়াইতে হইবে ইহাই স্বামিজীর অভিপ্রায়। প্রত্যেক মানুষই স্বরূপতঃ ব্রহ্ম একথা তাহাকে বুঝাইতে হইবে। আপামর সাধারণ সকলকেই জানাইতে হইবে যে তাহারা যথার্থতঃ শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বরূপ। বন্ধন পাপ তাপ, রোগশোক জরা মৃত্যু আত্মার ধর্ম্ম নহে, দেহমনরূপ উপাধিগত ভ্রান্তি মাত্র। এই উপাধিগত ভ্রান্তি হইতে বিমুক্ত হইয়া আত্মরূপে স্থিত হওয়াই জীবনের পরম পুরুষার্থ। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শাস্ত্র ও গুরুনির্দ্দিষ্ট বিশেষ পথে চলিতে কাহারও কোন বাধা নাই। উদ্দেশ্য এক হইলেও পথ ভিন্ন ভিন্ন, "যত মত তত পথ", সুতরাং মত পথ লইয়া বিবাদ বিসম্বাদের কোন কারণ নাই। যে যে কোন পথেই চলুক না কেন আন্তরিকতা ও বিশুদ্ধতা থাকিলে তাহাতেই সিদ্ধিলাভ সম্ভব।

ভারতকে সর্ব্বাগ্রে এই সার্ব্বজনীন ধর্ম্মাদর্শে উদ্বুদ্ধ করাই ছিল স্বামিজীর অভিপ্রেত। তবে সেই সঙ্গে লৌকিক শিক্ষার আবশ্যকতাও তিনি অস্বীকার করেন নাই। তিনি চাহিতেন প্রত্যেকে প্রকৃত মানুষ হইয়া গড়িয়া উঠুক, আর যাহা কিছু আপনা হইতেই আসিবে। প্রকৃত মনুষ্যত্বলাভের জন্য ধর্ম্ম ও নীতি যেমন অপরিহার্য্য তেমনই দৈহিক ও মানসিক সর্ব্ববিধ উন্নতিও আবশ্যক। শাস্ত্র বলিতেছেন, আশিষ্ঠ, দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ ও মেধাবী পুরুষই সকল প্রকার পুরুষার্থের অধিকারী। স্বামিজীও এমন কোন ধর্ম্মে বিশ্বাসী ছিলেন না যাহা মানুষকে সর্ব্বপ্রকারে শক্তিমান করিয়া না তোলে। তিনি প্রায়ই বলিতেন 'বীর্য্য—বীর্য্যই সাধুত্ব, দুর্ব্বলতাই পাপ'। ধর্ম্মের নামে কোন প্রকার দুর্ব্বলতার প্রতি তিনি খড়্গহস্ত ছিলেন। উপনিষৎ কথিত "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত", "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" এবং গীতোক্ত "ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে" প্রভৃতি শক্তিপ্রদ মন্ত্র সকলকেই তিনি ধর্ম্মের সার-শিক্ষা বলিয়া প্রচার করিতেন। তিনি চাহিতেন ধর্ম্মের এই সব বীর্য্যপ্রদ, আলোকপ্রদ শিক্ষাসকলকে মূলমন্ত্র করিয়া জনগণ স্ব স্ব রুচি ও শক্তি অনুযায়ী লৌকিক ও আধ্যাত্মিক সকল বিষয়েই উন্নতি লাভে যত্নপর হউক। দেশের উন্নতির জন্য আমাদের শাস্ত্রোক্ত অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সরূপ উভয় প্রকার পুরুষার্থেরই প্রয়োজনীয়তায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি জানিতেন কেবল মাত্র নিঃশ্রেয়সকামী সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর সংখ্যা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র মুষ্টিমেয়ই হইয়া থাকে। সেই মুষ্টিমেয় লোকের যাহা আদর্শ তাহা সর্ব্বসাধারণ কখনও গ্রহণ করিতে পারে না। সাধারণ লোক প্রথমত চায় ভাল অশন বসন, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য। এজন্য ধর্ম্মশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণের মধ্যে অন্যান্য লৌকিক শিক্ষার প্রসারেও তিনি বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। লৌকিক শিক্ষার জন্য তিনি ভারতকে পাশ্চাত্যের অভ্যুদয়শীল জাতি সকলের নিকট হইতে রাজনীতি, সমাজনীতি, যুদ্ধনীতি বিজ্ঞানাদির শিক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য অগ্রসর হইতে উৎসাহিত করিতেন। পরন্তু ধর্ম্মবিষয়ে সে সকলের গুরু হইবে ইহাই ছিল তাঁহার অভিমত। তিনি বিশ্বাস করিতেন পাশ্চাত্যদেশ তাহার আপাতরম্য জড়-সভ্যতার যতই বড়াই করুক না কেন সে সভ্যতার ভিত্তি ক্ষণভঙ্গুর। যে কোন মুহূর্ত্তে ঐ সভ্যতার গৌরবময় প্রাসাদ প্রবল যুদ্ধবিগ্রহে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইবার সম্ভাবনা। ভারতের আধ্যাত্মিকতা উহাকে রক্ষা না করিলে উহার আর দীর্ঘকাল বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই। তাই তিনি ভারতকে পাশ্চাত্যদেশের লৌকিক শিক্ষার বিনিময়ে সেই দেশে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে উপদেশ দিয়াছেন। দেশের বর্ত্তমানে যে সব সমস্যা দেশনেতৃবর্গের প্রধান লক্ষ্যের বিষয় হইয়াছে, যথা হিন্দুমুসলমানের একতা, অস্পৃশ্যতা

বর্জ্জন, নিম্নজাতি ও স্ত্রীজাতির উন্নয়ন, পল্লী-সংগঠন প্রভৃতি সকল বিষয়েই তিনি সম্যক অবহিত ছিলেন। কিন্তু এই সকল গুলিতেই তিনি ভাসা ভাসা জোর জবরদস্তি সংস্করণে বিশ্বাসী না হইয়া ধর্ম্ম ও জাতীয় ভাবে শিক্ষার ভিতর দিয়া আমূল সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। এইখানেই অধিকাংশ নেতৃবর্গ হইতে তাঁহার পার্থক্য।

এইভাবে দেশের ও দশের উন্নতি সাধনের জন্য তিনি চাহিয়াছিলেন একদল নিঃস্বার্থ কর্ম্মী যাঁহারা নিজের ও পরিবারের ঐহিক সুখের জন্য কিছুমাত্র না ভাবিয়া আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ, আত্মমুক্তি ও জগতের হিতের জন্য আত্মোৎসর্গ করিবেন।

যাঁহারা লোকের দ্বারে দ্বারে গিয়া তাহাদিগকে লৌকিক ও পারমার্থিক বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করিবেন—শিবজ্ঞানে জীব সেবা দ্বারা জনগণের দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক সর্ব্বপ্রকার অভাব-মোচনে বদ্ধপরিকর হইবেন।

প্রত্যেক জীবই যে শিবস্বরূপ একথা আমাদের শাস্ত্রে আছে। উপনিষৎ বলিতেছেন, 'সর্ব্বংখল্বিদং ব্রহ্ম', গীতা বলিতেছেন, 'বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি', শাস্ত্র আরও বলিতেছেন এই অনুভূতিই ধর্ম্মের চরম অনুভূতি। ঐ অনুভূতিলাভই সকল ধর্ম্মপথের চরম ও পরম উদ্দেশ্য। শিবজ্ঞানে জীব সেবাও ঐ উপলব্ধির একটী পথ এবং উহাই যুগধর্ম্ম। একথা স্বামিজীই প্রথম প্রচার করেন। এই নরনারায়ণ সেবারূপ কর্ম্ম-পদ্ধতির দ্বারাই তিনি জাতিকে উন্নীত করিতে চাহিয়াছিলেন।

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর,
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

ইত্যাদি কথার ভিতর দিয়া তাঁহার সেই ভাবই সুপরিস্ফুট। তিনি বুঝিয়াছিলেন ত্যাগ এবং সেবাই ভারতীয় জাতীয় জীবনের মূলমন্ত্র। ঐ দুইটিকে অবলম্বন করিয়া জাতীয় জীবন যত তীব্রভাবে প্রবাহিত হইবে ততই তাহার পক্ষে কল্যাণ। ত্যাগ ও সেবা অঙ্গাঙ্গিভাবে সংবদ্ধ। ত্যাগ ব্যতীত সেবা অসম্ভব। আবার সেবাহীন ত্যাগ ব্যর্থ। অপরের কল্যাণ করিতে হইলে নিজের স্বার্থ না ভুলিলে চলিবে না। চালাকি দ্বারা কোন মহৎ কার্য্য করাই সম্ভবপর নহে। দেশের ও দশের হিত করিতে হইলে চাই প্রেম, সত্যানুরাগ ও নিঃস্বার্থতা। এই সব গুণ অর্জ্জন না করিয়া শুধু অন্তঃসারহীন বক্তৃতা ও ধ্বনি উচ্চারণ দ্বারা সময় বিশেষে কোন কার্য্যোদ্ধার হইতে পারে বটে কিন্তু দেশের বা দশের কোন প্রকৃত কল্যাণ হইতে পারে না। পক্ষান্তরে যে ত্যাগ মানুষের কাপুরুষতাকে প্রশ্রয় দেয়, যাহা জীবন-সংগ্রামে ভীত দুর্ব্বল ব্যক্তির মর্কট-বৈরাগ্যপ্রসূত, এবং যাহা তাহাকে 'প্রাণাত্যয়েঽপি পরকল্যাণচিকীর্ষুঃ' প্রাণ বিনিময়েও পরকল্যাণ-কামী করিয়া না তোলে, সে ত্যাগ ত্যাগ-পদবাচ্যই নহে। ত্যাগ মহাশক্তির পরিচায়ক এবং মহাশক্তিমান পুরুষগণই প্রকৃত প্রস্তাবে ত্যাগী হইবার যোগ্য। নচেৎ কিছু করিবার ক্ষমতা নাই বলিয়া ত্যাগী সাজিয়া বসা মহাভণ্ডামীর পরিচায়ক। আর প্রকৃত যিনি ত্যাগী তিনি স্বভাবতঃই 'সর্ব্বভূতহিতে রতঃ' না হইয়া থাকিতে পারেন না। দেশবাসীকে এই ত্যাগ ও সেবার মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতে এবং তদ্দ্বারা দেশ ও দশের কল্যাণ সাধন করিতে একদল সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী সঙ্ঘের একান্ত আবশ্যকতা তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন। সেই উদ্দেশ্যেই তাঁহার রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন স্থাপন। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী যাবৎ স্বামী বিবেকানন্দ কর্ত্তৃক স্থাপিত এই মঠ ও মিশন তৎপ্রদর্শিত পথে চলিয়া ধীর স্থির অথচ অপ্রতিহত গতিতে কার্য্য করিয়া

চলিয়াছে। সম্মুখে আশীর্ব্বাণী ও পশ্চাতে শাস্তি লইয়া এই বিরাট সঙ্ঘ কেমন ধীরে ধীরে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে তাহা সর্ব্বজন-বিদিত।

ভারতের তথা জগতের কল্যাণের জন্য ইহাই ছিল স্বামী বিবেকানন্দের বিশিষ্ট কর্ম্ম-পদ্ধতি। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেন্ট, স্বামীজীর গুরুভ্রাতা শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজ মঠ-মিশনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলিতে গিয়া জনৈক জিজ্ঞাসু ভক্তকে কোন সময় বলিয়াছিলেন :

"আমি ত তোমাকে পূর্ব্বেই বলেছি যে আমরা নিজেদের আদর্শ অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছি। আর এই আদর্শ রেখে গেছেন সেই দূরদর্শী ঋষি স্বামিজী নিজে। খালি ভারত নয়, সমগ্র জগতের সহস্র সহস্র বৎসরের ভবিষ্যৎ ছবি ফুটে উঠেছিল তাঁর দিব্যদৃষ্টির সাম্‌নে, এবং সব স্পষ্ট দেখে জেনে শুনে তবে তিনি একটা ধারা নির্ণয় করে গেছেন। তাঁর ত আর অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া নয়। তিনি সুদূর ভবিষ্যতের দৃশ্য সব পরিষ্কার দেখ্‌তে পেতেন। আর এযুগে শ্রীরামকৃষ্ণরূপে যে ভগবৎশক্তির আবির্ভাব হয়েছে, তেমনটি শত শত বৎসরের মধ্যে আর হয় নি। এই আধ্যাত্মিক তরঙ্গ দীর্ঘকাল অবাধে সমগ্র জগতে চলবে। এই তো সবে সূচনা, সবে আরম্ভ। যে আধ্যাত্মিক সূর্য্য ভারত-গগনে উদিত হয়েছে তার বিমল কিরণে সমগ্র জগৎ উদ্ভাসিত হবে। তাইত স্বামিজী বলেছেন 'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ'। ভারতকে কেন্দ্র করিয়া সেই আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ হবে। এ ঐশীশক্তির গতিরোধ করে কার সাধ্য। ভারতের জাগরণ অতি নিশ্চিত। শিক্ষা, দীক্ষা, শক্তি, সামর্থ্য, বিদ্যা, বুদ্ধি সব বিষয়ে ভারতের এত উন্নতি হবে যে সমগ্র জগৎ দেখে অবাক হয়ে যাবে। ভারতের ভবিষ্যৎ এত মহিমান্বিত হবে যে তা অতীতের গৌরবকে ম্লান করে দেবে। তখন বুঝবে যে ঠাকুর-স্বামিজী কেন এসেছিলেন এবং ভারতের জন্য তাঁরা কি করে গেছেন। ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানব তাঁদের কার্য্যকলাপ কি বুঝবে ? তাঁরা যে ভারতের জাতীয় কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করে দিয়ে গেছেন, তাও কি দেখতে পাচ্ছ না ?"

কামারপুকুর

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম্-এ

শতাব্দীর যবনিকা পার হ'য়ে দেখি কল্পনায়
উঠেছে নবীন সূর্য, অন্তরের জ্যোতিতে ভাস্বর,
শতপথ এক হ'ল, পথভ্রষ্ট খুঁজে পেল ঘর,
অন্ধকার দূরে যায় তমোহর রবির জ্যোৎস্নায়।
বাল্মীকির মুক্তিলাভে জন্ম লভে কত রামায়ণ,
কত শত অহল্যারা পদস্পর্শে হয়েছে উদ্ধার !

গঙ্গোত্রীর হিমালয় হিমে ঢাকা আজো অন্ধকার,
কূলে কূলে জাগিয়াছে শতশীর্ষ শ্যামল কানন।
বনস্পতি জন্ম নিল যে মাটির ধূলিকণা হ'তে
আজিও তা' অচঞ্চল আপনার শাশ্বত গৌরবে,
প্রকৃতির লীলা চলে বসন্তের পল্লবে, সৌরভে ;
পাহাড় হ'য়েছে গুঁড়ো সর্বনাশা যে-কালের স্রোতে,

এ দীন কুটির সেই স্তব্ধ হ'য়ে করে নমস্কার।
মুক্তির কামনা বুকে দেবকী কাঁদিছে বার বার।

অজ্ঞানের আশ্রয় ও বিষয়

অধ্যাপক শ্রীদিনেশচন্দ্র গুহ, এম্‌-এ, কাব্য-ন্যায়-তর্ক-বেদান্ততীর্থ

যে অঘটনঘটনপটীয়সী মায়ার প্রভাবে শুদ্ধ-ব্রহ্মের উপর এই জগৎপ্রপঞ্চের আরোপ হইয়াছে বলিয়া অদ্বৈত বেদান্তিসম্প্রদায় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন সেই মায়ারই নামান্তর অজ্ঞান। এই অজ্ঞান কোথায় থাকিয়া জগতের আরোপের মত এত বড় কাজ করে এবং কাহাকেই বা এই অজ্ঞান আবৃত করে ইহা অদ্বৈত বেদান্তমত অনুসারে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে।

অদ্বৈত বেদান্তে বাচস্পতিমিশ্রের মত ও বিবরণ-মত কোন কোন বিষয়ে এক নহে। অজ্ঞানের আশ্রয়সম্বন্ধেও এই দুই মত ভিন্ন। বাচস্পতি মিশ্রের মতে অজ্ঞান জীবের উপর আশ্রিত এবং ব্রহ্মকে বিষয় করে অর্থাৎ আবৃত করে। তিনি বলেন যে আমরা অনুভব করিয়া থাকি যে আমি অজ্ঞ, আমি ব্রহ্মকে জানি না। সুতরাং এই অনুভব দ্বারা প্রমাণিত হয় যে অজ্ঞানের আশ্রয় হইতেছে জীব এবং বিষয় হইতেছে ব্রহ্ম। এই অনুভবের বিষয়ীভূত যে "আমি" পদার্থ তাহা হইতেছে জীব। "আমি অজ্ঞ" এই কথা বলায় আমি অর্থাৎ জীব যে অজ্ঞানের আশ্রয় তাহা বুঝা যায়। আর "আমি ব্রহ্মকে জানি না" এই কথায় আমার অজ্ঞানের বিষয় ব্রহ্ম, অর্থাৎ আমার অজ্ঞান ব্রহ্মকে আবৃত করিয়াছে ইহা জানা যায়। বাচস্পতিমতে এই অজ্ঞান এক নহে, কিন্তু বহু।

বিবরণমতানুযায়ী বেদান্তিগণ বাচস্পতিমিশ্রের এই সিদ্ধান্ত সমীচীন মনে করেন না। তাঁহারা বলেন যে অজ্ঞান বহু নহে, এক। আর সেই এক অজ্ঞান জীবের উপর আশ্রিত নহে, জীব ও ঈশ্বর-বিভাগরহিত শুদ্ধব্রহ্মেই আশ্রিত। তাঁহাদের যুক্তি সংক্ষেপে এইরূপ বলা যায়ঃ জীবভাব অর্থাৎ জীবত্ব অজ্ঞানের কার্য্য। সেই অজ্ঞান স্বতন্ত্রভাবে অর্থাৎ কোথাও আশ্রিত না হইয়া জীবভাব ঘটাইতে পারে না। অতএব অজ্ঞান কোথাও আশ্রিত হইলেই অজ্ঞানের কার্য্য জীবভাব হইতে পারে। এই অজ্ঞানের আশ্রয় জীব অথবা ঈশ্বর ইহা বলা যায় না। কারণ, বাচস্পতিমতে জীবত্ব ও ঈশ্বরত্ব জীবের অজ্ঞানবশতঃ কল্পিত। যে অজ্ঞান পূর্ব্ব হইতেই প্রমাণসিদ্ধ হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহার আশ্রয় ও বিষয় পরবর্ত্তী অজ্ঞান কল্পিত জীবত্ব বা ঈশ্বরত্ববিশিষ্ট জীব অথবা ঈশ্বর হইতে পারে না।

অতএব জীব ও ঈশ্বর এইরূপ বিভাগশূন্য শুদ্ধ ব্রহ্ম-চৈতন্যই অজ্ঞানের আশ্রয় এবং বিষয়। যেরূপ গৃহের মধ্যে অবস্থিত অন্ধকার গৃহকে আচ্ছাদিত করে সেইরূপ ব্রহ্মে আশ্রিত অজ্ঞান ব্রহ্মকেই আচ্ছাদিত করে, অর্থাৎ বিষয় করে। এই মতকে অজ্ঞানের স্বাশ্রয়স্ববিষয় পক্ষ বলা হয়। উভয় "স্ব" পদেই শুদ্ধব্রহ্মকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। যদিও "আমি অজ্ঞ" এই অনুভবের দ্বারা অজ্ঞানের আশ্রয় জীব—এইরূপ মনে হয়, তাহা হইলেও শুদ্ধব্রহ্মে আশ্রিত অজ্ঞানকেই জীব আপনাতে আশ্রিত বলিয়া অভিমান করে। কারণ, জীব অজ্ঞানের কার্য্য হওয়ায় অজ্ঞানের অধিষ্ঠানরূপ আশ্রয় হইতেই পারে না।

অবশ্য বাচস্পতিমত ও বিবরণমতে এইস্থলে যে ভেদ তাহা আপাতদৃষ্টিতেই বলা হইল। সূক্ষ্মবিচার করিলে এই স্থলে মতের কোন ভেদ নাই ইহা বুঝা যায়। কারণ "আমি" শব্দের দ্বারা যে অন্তঃকরণবিশিষ্ট চৈতন্যকে বুঝা যায় তাহাই জীবশব্দার্থ। ইহার বিশেষ্য অংশ যে চৈতন্য তাহা ব্রহ্মই এবং তাহাই অজ্ঞানের আশ্রয়। শুধুমাত্র বিশেষ্যের ধর্ম্ম যে অজ্ঞানের আশ্রয়ত্ব তাহা বিশিষ্টে আরোপ করিয়াই জীবকে অজ্ঞানের আশ্রয় বলা হইয়াছে ইহা সুধীগণ বিচার করিবেন।

ভারতীয় সঙ্গীতে গ্রাম

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

সঙ্গীতে গ্রাম সম্বন্ধে আলোচনার সার্থকতা অবশ্যই আছে। সঙ্গীতে স্বরসৃষ্টির ইতিহাস এখনো আবিষ্কৃত হয় নি, অথবা সঙ্গীতের সাহিত্যে লুকানো থাক্‌লেও তা মানুষের কাছে এখনো ধরা পড়ে নি একথাই আমাদের স্বীকার করতে হবে। সঙ্গীতে গ্রামের সার্থকতা এই যে, স্বরকে অবলম্বন ক'রেই গ্রামের উৎপত্তি। তাতে যতগুলি আদি স্বরের সন্ধান পাওয়া যাবে ততগুলি গ্রামের অস্তিত্বও প্রমাণিত হবে।

সঙ্গীতশাস্ত্রে গ্রামের উল্লেখ পাই আমরা সাধারণত তিনটী: ষড়্‌জ, মধ্যম ও গান্ধার। ভরত মুনি এদের পরিচয় দিয়েছেন যদিও নিজে তিনি স্বীকার করেছেন গ্রাম দুটী মাত্র ব'লে; কিন্তু তার আগেও[১] নারদ তাঁর নারদীশিক্ষায় উল্লেখ করেছেন: "ষড়্‌জমধ্যমগান্ধারাস্ত্রয়ো গ্রামাঃ।"

গ্রাম হল স্বরসমষ্টির সমাবেশ। ক্রমতান, অলঙ্কার ও মূর্চ্ছনাও থাকে তার অঙ্গরূপে। সঙ্গীত-রত্নাকরে শার্ঙ্গদেব উল্লেখ করেছেন: "গ্রামঃ স্বরসমূহঃ স্যান্মূর্চ্ছনাদেঃ সমাশ্রয়ঃ (বা মূর্চ্ছনাদিসমাশ্রয়ঃ)।" টীকাকার কল্লিনাথ তাকে আরো পরিষ্কার ক'রে বলেছেন: "গ্রামবদ্‌ গ্রামঃ। যথা লোকে জন-সমূহো গ্রাম ইত্যোতাবত্যুচ্যমানে * *।"

এই গ্রামের প্রচলন সম্বন্ধে সঙ্গীতশাস্ত্রকারদের সিদ্ধান্ত হল: "তৌ দ্বৌ ধরাতলে।" অথবা "দ্বৌ গ্রামৌ বিশ্রুতৌ লোকে ষড়্‌জমধ্যমসংজ্ঞকৌ।"

রত্নাকরের পরবর্তী সমস্ত গ্রন্থকারেরা এই এক কথাই উল্লেখ করেছেন। কেবল দেখা যায়, নারদী-শিক্ষাকারের বর্ণনা হল একটু ভিন্ন রকমের, যেমন: "ভূর্লোকাজ্জায়তে ষড়্‌জো ভুবর্লোকাচ্চ মধ্যমঃ।"[২] এখানে 'জায়তে' ক্রিয়া থেকে উৎপত্তি স্থান ও প্রচলনরীতিরও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তবে গান্ধার-গ্রাম সম্বন্ধে সকলেরই মত এক; আর নারদও এর পরিচয় দিয়েছেন এই ব'লে "স্বর্গান্নান্যত্র গান্ধারো * *।" শার্ঙ্গদেবও "প্রবর্ত্ততে স্বর্গলোকে গ্রামোঽসৌ ন মহীতলে" ব'লে নারদকেই সমর্থন করেছেন। তবে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সামবেদের শিক্ষা নারদী এই গ্রাম তিনটী সম্বন্ধে পরিচয় দিলেও অথর্ব্ববেদের শিক্ষা 'মাণ্ডুকী,' যজুঃশাখীয় শিক্ষা 'যাজ্ঞবল্ক্য' বা এমন কি সামবেদীয় 'গৌতমীশিক্ষা'ও এই গ্রাম সম্বন্ধে কোন আভাসই দেয় নি; অথচ মন্দ্র, মধ্য, তার ও সপ্তস্বর সম্বন্ধে পরিচয় তাঁরা দিয়েছেন।

আমরা আগেই কিন্তু আশঙ্কা করেছি যে, প্রকৃতপক্ষে গ্রাম ছিল তিনটী মাত্রই, কি তিনটীরও বেশী? অবশ্য এ আশঙ্কা শুধু আমাদেরি মধ্যে ওঠে নি, রত্নাকরটীকাকার চতুর কল্লিনাথ নিজেও তা তুলেছেন। তবে সিংহভূপাল কি জানি কেন এ প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাতে মোটেই চেষ্টা করেন নি। সঙ্গীতসময়কার পার্শ্বদেব এবং বৃহদ্দেশীকার মতঙ্গও তাই। আধুনিক সঙ্গীত-গ্রন্থকারদের কথাও সেই একই রকমের। দু'একজন ছাড়া এসব নিয়ে পরিশ্রম করতে তাঁরা অনেকেই নারাজ।

১ এখনও পণ্ডিতদের ভেতর মতদ্বৈধ আছে যে নারদীশিক্ষাকার নারদ নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের আগে—কি পরে। আমরা কিন্তু এসম্বন্ধে নিশ্চিত যে শিক্ষাকার নারদ ভরতের যথেষ্ট আগেকারই লোক।

২ পুরাণকারদের ভেতর অনেকেই কিন্তু তিন গ্রামের কথাই স্বীকার করেছেন।

কল্লিনাথ উল্লেখ করেছেন : "নতু সমূহিত্বা-বিশেষেণ সপ্তানামপি গ্রামব্যপদেশকত্বসংভবে কথং ধরাতলে দ্বাবিত্যবধারণমিতি চেত্তত্রোচ্যতে—শুদ্ধ-বিকৃতরূপেণ দ্বিবিধস্বররূপেণ দ্বিবিধস্বরপ্রয়োগবশাৎ * * শুদ্ধাশ্রয়ত্বাৎ ষড়্‌জগ্রাম আদিমো বিকৃতা-শ্রয়ত্বাদ্দ্বিতীয়ো মধ্যমগ্রাম ইত্যুপপন্নত ইতি।" এখানে কল্লিনাথ দু'টীমাত্র গ্রামেরই নামোল্লেখ করছেন কেবল তাদের শুদ্ধত্ব ও বিকৃতত্ব কারণ দেখিয়ে, দুয়ের বেশী কোন গ্রামের অস্তিত্বের কথা তিনি বলেন নি। কিন্তু তাঁর আশঙ্কা বা পূর্ব্বপক্ষের "সমূহিত্বাবিশেষেণ সপ্তানামপি গ্রামব্যপদেশকত্ব সংভবে" কথা কয়টীর ইঙ্গিতকে একেবারে বাদ দিলেও চল্‌বে না। কেননা আশঙ্কা সর্ব্বদাই সন্দিগ্ধ (doubt) ও সম্ভাবনাকে (probability)-কে অপেক্ষা ক'রেই ওঠে। সুতরাং এখানেও আশঙ্কার তাই 'may be' (হতে পারে) বা 'may not be' (না হতে পারে) এই উভয়কোটির ভেতর 'may be-'র ('হতে পারে'-এর) পর্য্যায়কেও বাদ দেওয়া সঙ্গত হবে না। তাছাড়া একথাও অতি সত্যি যে, আদি স্বরসংখ্যা নির্ণয়ের সঙ্গে সঙ্গে সপ্তস্বরসমন্বিত গ্রাম-মূর্ত্তিদের সাতটী রূপেরও তাহলে সন্ধান পাওয়া যাবে। স্বরসমষ্টিযুক্ত ষড়্‌জ, মধ্যম ও গান্ধার গ্রামের মতন ঋষভ, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদগ্রামের প্রচলনও যে সমাজে ছিল না—তা কে বল্‌তে পারে? কাজেই মিঃ হুলুগার কৃষ্ণচারিয়ারের মতন আমরাও নানান্ প্রমাণপঞ্জীর নজির থেকে বল্‌তে বাধ্য যে : "* but the selection of 7 scales (4 from *Sadaja-grāma*) to replace the 7 *Grāmas* of the prior period, which scales were now to be known as 7 *Jātis* bearing the same names as the initial notes of the scales. * * It was with a view to adopt the more satisfactory of these, to replace the old 7 *Grāmas*, that Bharata's *Grāmas* were mainly adopted and for not getting new modes."[৩]

বাস্তবিক সূক্ষ্মভাবে বিচার ক'রে দেখলে একথাই কিন্তু আমাদের বল্‌তে হয় যে, তিনটীর বেশীও গ্রামের প্রচলন প্রাচীন ভারতীয় সমাজে অবশ্যই ছিল। তারপর নানা কারণে সাতটী গ্রামের ভেতর তিনটী মাত্র গ্রামই প্রচলিত রইল, আর গান্ধারগ্রামও আবার দেবলোকের জন্যই নির্দ্দিষ্ট থেকে গেল।[৪] অবশিষ্ট রইল কেবল ষড়্‌জ ও মধ্যম গ্রাম। মধ্যম-গ্রামও আবার কালে লোপ পেয়ে গেল; থাক্‌ল একমাত্র ষড়্‌জগ্রাম— যা এখনও প্রচলিত রয়েছে।

নানান্ প্রমাণপঞ্জী দিয়ে বিশ্লেষণ ক'রে দেখ্‌লে আবার একথা একেবারে অস্বীকার করাও যাবে না যে, প্রাচীন সাতটী গ্রামকেই ভরতমুনি সুসংস্কৃত ক'রে পরে সাতটী 'শুদ্ধজাতি' নামে প্রচার করেছিলেন। অবশ্য বিকৃত জাতিও তাঁর সাতটী। শুদ্ধজাতি ষড়্‌জগ্রামেরই আর বিকৃত জাতি মধ্যম-গ্রামের। ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রের ২৮শ অধ্যায়ে[৫] "জাতয়ো দ্বিবিধা শুদ্ধা বিকৃতাশ্চ" বলেছেন। শার্ঙ্গদেবও তাঁর রত্নাকরে[৬] ভরতকেই অনুসরণ করেছেন এবং রত্নাকরের পরবর্ত্তী সমস্ত শাস্ত্রকাররাই প্রায় শার্ঙ্গদেবকে সমর্থন করেছেন। রত্নাকরের টীকাকার কল্লিনাথও আবার জাতি-সংজ্ঞা

৩ Vide *The Journal of Music Academy*, *Vol. I*, July, 1930, p. 164.

৪ শার্ঙ্গদেবও বলেছেন : "স্বর্গে প্রয়োক্তব্যা।" কিন্তু মহাভারতের হরিবংশপর্ব্বে আবার দেখা যায়, কোন এক রাজা তাঁর সভাগায়কের মুখে গান্ধারগ্রামের গান শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। Fox Strangways-ও একথা তাঁর বইয়ে উল্লেখ করেছেন।

৫ নাট্যশাস্ত্র (কাশী সংস্করণ), পৃঃ ৩২২

৬ Adyar Ed. Vol, 1, পৃঃ ১৬৯

নির্দ্দেশ করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন : "যথাযোগং গ্রামদ্বয়াজ্জায়ন্ত ইতি জাতয়ঃ।" অবশ্য 'জাতি' গ্রাম থেকেই উৎপন্ন হয়েছে, অথচ সাতটী স্বর ও সাতটী অলঙ্কার-যুক্ত গ্রামের পূর্ণরূপই হল আবার সাতটী জাতিকে ছেড়ে নয়। তবে ভরত বলেছেন : "* * গ্রামাশ্রয়া হ্যেতা বিজ্ঞেয়াঃ সপ্ত জাতয়ঃ।"

শুদ্ধ ও বিকৃত জাতিদের নাম করতে গিয়ে নাট্যশাস্ত্রকার ভরত ষড়্জগ্রামের জাতিদের পরিচয় দিয়েছেন ; যেমন, ষাড়জী, আর্ষভী, গান্ধারী, মধ্যমা, পঞ্চমী, ধৈবতী ও নৈষাদী। মোটকথা সাতটী স্বরের নামানুযায়ীই শুদ্ধ জাতিদের নাম রাখা হয়েছে, আর সংখ্যায়ও তারা সাতটীই।

আগে কিন্তু আমরা উল্লেখ করেছি যে অলঙ্কারও সাতগ্রামের সাতটী ক'রে। এজন্যে মিঃ কৃষ্ণ-চারিয়ারও মন্তব্য করেছেন : "The old term *Grāma* was adopted with a new sense and the old *Grāmas* were re-named the *Jātis*."[৭] অবশ্য জাতি হিসাবে ভরত ও তার পরবর্ত্তী শাস্ত্রকারেরা সম্পূর্ণ ওড়ব, ষাড়-বাদিকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যদিও সেখানে জাতির অর্থ স্বরসংখ্যার ভেতরই সীমাবদ্ধ। তাছাড়া আরো একটী বিষয় লক্ষ্য করবার আছে যে, তিনটী গ্রামের কথা সঙ্গীত শাস্ত্রে উল্লেখ থাকলেও ষড়্জগ্রামই যে তাদের মধ্যে আদি ও মুখ্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যেমন কল্লিনাথ বলেছেন : "শুদ্ধাশ্রয়ত্বাৎ ষড়্জগ্রাম আদিমঃ" এবং সিংহভূপাল মতঙ্গের মত তুলে দেখিয়েছেন : "ষড়্জস্যৈব হি মুখ্যত্বং।" শার্ঙ্গদেব নিজেও রত্নাকরে তার প্রধানত্বের কারণ দেখিয়ে বলেছেন : "ষড়্জঃ প্রধানমাস্তত্বাদমাত্যাধিক্যতঃ ;" অথবা কল্লিনাথের কথায় বলতে হয় : "ষড়্জঃ প্রধানমিতি। অমাত্যাধিক্যতঃ, সংবাদিস্বরবাহুল্যাদিত্যর্থঃ।" তবে আরো এক কথা যে, সাতটী স্বরের নামানুযায়ীই কিন্তু সাতটী জাতির নামকরণ করা হয়েছে ; আর এই সাতটী জাতি যে সাতটী গ্রামেরই নামান্তর, এদের নাম ও রূপের বিশুদ্ধতাই তার আর একটী প্রমাণ।

তাছাড়া আর একটি লক্ষ্য করবার বিষয়—ষড়্জ ও মধ্যম গ্রামের মূর্চ্ছনা সম্বন্ধে। সাতটী স্বরের যথাক্রমে আরোহণ ও অবরোহণকে মূর্চ্ছনা বলে : "সপ্তানাং স্বরাণামারোহশ্চাবরোণম্।" মতঙ্গ বৃহদ্দেশীতে আবার বারটী অর্থাৎ শুদ্ধ সাতটী ও বিকৃত পাঁচটী স্বরের মূর্চ্ছনা স্বীকার করেছেন। এই মূর্চ্ছনাগুলির প্রকৃতি ও গঠন লক্ষ্য করলে এদের ছদ্মবেশী সাতটী গ্রাম ব'লেই কিন্তু ধারণা হয়। তারপর ষড়্জগ্রামের প্রথম মূর্চ্ছনা 'উত্তরমন্দ্রা'-র আরোহণ ও অবরোহণ এবং মধ্যমগ্রামের 'শুদ্ধ-মধ্যা'-র রূপ ঠিক একই রকমের, মাত্র শ্রুতি সংখ্যায়ই যা কেবল পার্থক্য দেখা যায়। তারপর প্রত্যেকের প্রথম মূর্চ্ছনা 'উত্তরমন্দ্রা' ও সৌবীরী'-র গঠনও আবার গ্রামলক্ষণকে সম্পূর্ণ বজায় রেখেছে। ষড়্জ-গ্রামের উত্তরমন্দ্রার গঠন—স রি গ ম প ধ নি। রজনী, উত্তরায়তা প্রভৃতির রূপ ক্রমাগতই মন্দ্র বা খাদের দিক থেকে তারের দিকে, যেমন রজনী—নি্ স রি গ ম প ধ। উত্তরায়তা—ধ্ নি্ স রি গ ম প। শুদ্ধ ষড়্জা—প্ ধ্ নি্ স রি গ ম ইত্যাদি। তারপর মধ্যমগ্রামের সৌবীরীর গঠন—ম প ধ নি র্স র্রি র্গ-এর পর থেকে অপর ছ'টী মূর্চ্ছনার গতি আবার মধ্য থেকে তারের দিকে ; যেমন হারিণাশ্বা—গ ম ধ নি র্স র্রি। কলোপনতা—রি গ ম প ধ নি র্স ইত্যাদি।[৮] এদের

[৭] *Journal Music Academy*, Vol. 1. July 1930, p. 164

[৮] নারদীশিক্ষার মতে মূর্চ্ছনাদের নাম আবার ভিন্ন রকমের।

শ্রুতিসংখ্যাও সমান, যেমন প্রত্যেকের বাইশটী ক'রেই; পার্থক্য কেবল আরম্ভ বা প্রথম আরোহণ-শ্রুতি নিয়ে। যেমন, ষড়্জগ্রামের প্রথম আরোহণ-শ্রুতি 'ছন্দোবতী' মধ্যমগ্রামেরও 'ছন্দোবতী' এবং গান্ধারগ্রামের 'তীব্রা'। এদিক দিয়ে ষড়্জ ও মধ্যমগ্রামের শ্রুতি-সংস্থানের স্বর প্রায় সমান, পার্থক্য হ'ল কেবল পঞ্চম ও ধৈবতে। কিন্তু তাহলেও সকলের মূর্চ্ছনার গঠন কিন্তু সাতটী স্বর নিয়েই এবং এরা যে সাতটী গ্রামেরই প্রচ্ছন্ন মূর্ত্তি এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

শাস্ত্রকারেরা সবকিছুকেই বর্ণনা করতে গিয়ে দেখা যায় দর্শনের ভিত্তিতেই পরিশেষে সকলকে দাঁড় করাতে চেষ্টা করেছেন। সঙ্গীতের বেলায়ও তাই। স্বরের উৎপত্তি হল আর্চ্চিক, গাথিক, সামিক, স্বরান্তর, ঔড়ব, ষাড়ব ও সম্পূর্ণকে নিয়ে। ক্রমবিকাশের ধারা দেখাবার জন্যে প্রাকৃতিক বস্তুর সঙ্গে মিল রেখে তাকে অবশেষে সম্পর্ক-যুক্ত করলেন সকলেই নাদের সঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গে এল ষট্‌চক্র, প্রাণায়াম, ঋষি, দেবতা, রঙ, ঋতু প্রভৃতি। নাদের পরাকাষ্ঠাও দেখালেন অবশেষে শব্দব্রহ্মে। পাণিনীয় দর্শনের চরম সিদ্ধান্তমণি সঙ্গীতের ললাটেও সুশোভিত হ'ল তার চরম পরিণতিরূপ মুক্তিকে দেখাবার জন্যে। ভারতবর্ষের এটাই হ'ল আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য যে সে তার আধ্যাত্মিকতার চোখ দিয়েই সব-কিছুকে দেখ্‌বার ও দেখাবার চেষ্টা ক'রে থাকে।

ভারতীয় সঙ্গীতের তিনটী গ্রামের বেলায়ও তাই। যেমন শার্ঙ্গদেব দেখিয়েছেন:

> "ক্রমাদ্ গ্রামত্রয়ে দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
> হেমন্তগ্রীষ্মবর্ষাসু গাতব্যাস্তে যথাক্রমম্।
> পূর্বাহ্ণকালে মধ্যাহ্নেঽপরাহ্নেঽভ্যুদয়ার্থিভিঃ॥"

সমস্ত ইঙ্গিতই কোন না কোন একটি রহস্য ও সত্য বস্তুকে অপেক্ষা ক'রেই করা হয়। এখানে গ্রাম তিনটীর প্রথম তিনটী স্বর ষড়্জ, মধ্যম ও গান্ধার বা সা-মা-গা নিশ্চিতভাবে 'সামিক'-যুগেরই (Samic period) ইঙ্গিত দিচ্ছে। 'সামিক' হল তিন স্বরের গান। সাম-গানের মধ্যযুগেই হ'ল সামিক গানের পরিণতি। তবে কারো কারো মতে আবার সা-মা-গা-এর জায়গায় সা-মা-পা-ই হল সামিক স্বর। অবশ্য এটাও হ'ল সম্পূর্ণ বিস্তৃতভাবে আলোচনা ক'রে দেখার বিষয়। তবে এ তিনটীমাত্র স্বর থেকেই যে সঙ্গীতের জন্ম ও আদি কথার ইতিহাস পাওয়া যায় এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, আর সেজন্যেই এই গ্রাম তিনটী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা ও অনুশীলন করা সকলের পক্ষেই একান্ত দরকার।

হিরণ্যগর্ভ স্তব

(কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম)

শ্রীকালিদাস রায় বি-এ, কবিশেখর

নমি তোমা দেব হে আদিপুরুষ নমি হিরণ্যগর্ভ,
যাহা কিছু ভবে লভেছে জন্ম পালিছ তা' তুমি সর্ব্ব।
ধরি আছ তুমি দ্যুলোক ভূলোক ব্যোম বিধু গ্রহাদিত্য,
তোমা ছাড়া আর হবি দিয়া মোরা কাহারে পূজিব নিত্য ?

দিয়াছ আত্মা আত্মায় পুনঃ দিয়াছ বিপুল শক্তি,
অপ্রতিহত তোমার আজ্ঞা পালনে দিয়াছ ভক্তি।
মৃত্যু তোমার ভৃত্য হইয়া বিলায় অমৃত-বিত্ত,
তোমা ছাড়া আর হবি দিয়া মোরা কাহারে পূজিব নিত্য ?

জঙ্গম যারা প্রাণময় যারা যাহারা নিমেষমুক্ত,
মহিমার গুণে তাহারা তোমার প্রকৃতিবর্গ-ভুক্ত।
ঈশ্বর তুমি, তোমার দ্বিপদ চতুষ্পদেরা ভৃত্য।
তোমা ছাড়া আর হবি দিয়া মোরা কারে অর্চ্চিব নিত্য ?

জাগে গিরিবর-শিখর-নিকর লভিয়া মহিমা বিন্দু,
তব অধিকারে রসধারা বহি ছুটিছে সপ্তসিন্ধু।
দশ দিক তব দশভুজরূপে সাধিছে অখিল কৃত্য,
তোমা ছাড়া আর হবি দিয়া মোরা কারে অর্চ্চিব নিত্য ?

তব অঙ্গুলি-সঙ্কেতে অই ঘুরিছে নিয়ত পৃথ্বী,
শুধু স্বর্ নয় সর্ব্বলোকের তব মহিমাই ভিত্তি,
রচিয়াছ তুমি রজোলোক নীল ব্যোমে রসময় রাজ্যে,
তোমা ছাড়া আর কোন দেবতারে অর্চ্চিব মোরা আজ্যে ?

তব শির 'পরে উদয় লভিয়া উজ্জ্বল হয় সূর্য্য,
বাজে ছায়াপথে পরিবহ পথে তব মহিমার তূর্য্য।
চির সান্ত্বনা লভিল তোমার রোদসীর দীন চিত্ত,
তোমা ছাড়া আর হবি দিয়া মোরা কারে অর্চ্চিব নিত্য ?

যোগেশ্বর গুরু গোরক্ষ নাথ

শ্রীসুরেশচন্দ্র নাথ মজুমদার

সাহিত্যাচার্য্য দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় অনুমান করেন যে গুরু গোরক্ষ নাথ পাঞ্জাবের জলন্ধর নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। অন্য প্রবাদ অনুসারে গোরক্ষ নাথের জন্মস্থান গোদাবরী প্রদেশের অন্তর্গত চন্দ্রগিরি নগরে। তাঁহার পিতার নাম ছিল সুরথ, ইনি বশিষ্ঠ বংশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং তাঁহার মাতার নাম ছিল সরস্বতী দেবী। গোরক্ষ নাথের মাতা গুরু মৎস্যেন্দ্র নাথের কৃপাপাত্রী ছিলেন। গোরক্ষ নাথ যৌবনের প্রারম্ভে গুরু মৎস্যেন্দ্র নাথের নিকট যোগে দীক্ষিত হইয়া যোগিবেশ ধারণ করত মৎস্যেন্দ্র নাথের অনুগমন করিয়াছিলেন। ইহাই সেন মহাশয়ের বক্তব্যের মোটামুটি মর্ম।[১] নেপালী প্রবাদ অনুসারে গোরক্ষ নাথ সত্যযুগে পাঞ্জাবে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।[২] কণফট যোগীদের মতে গোরক্ষ নাথের জন্মস্থান পাঞ্জাবের ঝিলাম জিলার টিল্লা নামক প্রাচীন পীঠস্থানে।[৩] বাবা রতন নাথের শিষ্যদের মতে পেশোয়ারে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন।[৪] ডাঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, সি আর ষ্টুলসগ্যাল, স্যার জর্জ গ্রীয়ারসন্ এবং এল পি টেসিণ্টরি প্রভৃতি পণ্ডিত পাঞ্জাবের কোথাও গোরক্ষ নাথের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া বিশ্বাস করেন।[৫] পাঞ্জাবের রাওলপিণ্ডি জিলায় গোরক্ষপুর নামে একটি গ্রামও পীঠস্থান আছে, কাহারও কাহারও মতে উহাই গোরক্ষ নাথের জন্ম স্থান।[৬] আবার কাহারও কাহারও অভিমত এই যে পাঞ্জাবের অনেকগুলি পাহাড় গোরক্ষ নাথের জন্মস্থান বলিয়া দাবী করে, সেগুলি এই—কাঙ্গা পাহাড়, চম্বা রাজ্য, গুরুদাসপুর, হোসিয়ারপুর প্রভৃতি।[৭] জি ডব্লিউ ব্রিগস বলেন গোরক্ষনাথ "originally came from Eastern Bengal."[৮] চন্দ্রনাথ নামক একজন আধুনিক পণ্ডিত মনে করেন গোদাবরী তীরস্থ চন্দ্রগিরি নামক স্থানে গোরক্ষ নাথের জন্ম হয়, এবং তিনি ৩৯৩ খৃঃ অব্দে তিরোহিত হন।[৯] পাঞ্জাবে গোরক্ষ নাথের সমাধিস্থান আছে—"His tomb is in the Punjab."[১০] কিন্তু ডাঃ মোহন সিংহ বলেন, গোরক্ষ নাথের তিরোধান ও সমাধিস্থান দুইই অপরিজ্ঞাত। অধ্যাপক অক্ষয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—নেপালীরা বলিয়া থাকে গোরক্ষ নাথ নেপালে থাকিয়া দ্বাদশ বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। সে স্থান তাঁহারই নামে গোর্খা

১ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

২ E. R. E, Vol, 12.

৩ Gorokhnath and Mediaeval Hindu Mysticism, Page 22, 23.

৪ ঐ, পৃঃ ৩৭।

৫ History of the Bengali Language and Literature.

৬ Gorokhnath and Mediaeval Hindu Mysticism, page 22.

৭ Gorokhnath and Mediaeval Hindu Mysticism, page 73.

৮ Gorakhnath and Kanphata Yogis, page, 250.

৯ Gorokhnath and Mediaeval Hindu Mysticism, page 23 এবং যোগী সম্প্রদায়াবিষ্কৃতি।

১০ Gorakhnath and Mediaeval Hindu Mysticism এবং Mystics, Ascetics and Saints of India, page 184.

বলিয়া খ্যাত। সে স্থানের অধিবাসীরা গোরক্ষ নাথের নামানুসারে আপনাদিগকে গোর্খা বলিয়া পরিচয় দেয়। তাহা হইতেই গোর্খা জাতির উৎপত্তি[১১]।

এখন দেশ বিদেশের পণ্ডিত ও প্রত্নতাত্ত্বিকদের অভিব্যক্ত মতামতের সাহায্যে গোরক্ষ নাথের সময় সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক।

পাঞ্জাবে গোরক্ষ নাথকী টিল্লা বা যোগী টিল্লা বা বাল নাথকী টিল্লা নামক একটি পাহাড় আছে। ঐ পাহাড়ের শীর্ষদেশে বাল নাথের মন্দির আছে। সকল ঐতিহাসিকই একবাক্যে ইহাকে অতি প্রাচীন মন্দির বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রীযুক্ত কানিংহাম সাহেব বলেন, আলেকজেণ্ডারের ভারত আক্রমণ (৩২৭-৩২৫ খৃঃ পূর্ব) সময়েও এই মন্দির বিদ্যমান ছিল। খৃষ্টের জন্মের তিনশত বৎসর পূর্বে কখন ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা কেহ সঠিকভাবে বলিতে পারেন নাই।[১২] যাহা হউক খৃষ্টের জন্মের মোটামুটি তিনশত বৎসর পূর্বেও গোরক্ষ নাথ বিদ্যমান ছিলেন দেখা যায়।

রাজা ভর্তৃহরি গোরক্ষ নাথের শিষ্য ছিলেন। এবং নাথসম্প্রদায়ের একটি শাখাও ভর্তৃহরি-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভর্তৃহরি রাজা বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা বলিয়া প্রবাদ আছে। বিক্রমাদিত্য হইতে বিক্রম সংবৎ গণিত হয়। এতদনুসারে গোরক্ষ নাথকে খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর লোক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।[১৩] প্রসিদ্ধ বিদেশীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাইট সাহেব তাঁহার নেপালের ইতিহাসের ১৪০-১৫২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে নেপালের রাজা বলদেব বা বরদেবের সময় ৫ম বা ৬ষ্ঠ শতকে গুরু গোরক্ষ নাথ নেপালে ছিলেন। অনেকে বলেন বলদেব খৃঃ অঃ ৪২২ এ নেপালের রাজা হইয়াছিলেন। নেপালের দ্বাদশ বৎসরব্যাপী দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টি নিবারণের জন্য নেপালরাজ-কর্তৃক বিশেষভাবে আহূত হইয়া গুরু মৎস্যেন্দ্র নাথ ৫২২ খৃঃ অব্দে তথায় গিয়া এসব দূর করিয়া ছিলেন। নেপালে প্রবাদ আছে গুরু মৎস্যেন্দ্রের সন্ধানে শিষ্য গোরক্ষ নাথ সে সময় নেপালে গিয়াছিলেন।[১৪] এতদনুসারে গোরক্ষ নাথকে ৫ম বা ৬ষ্ঠ খৃঃ অব্দের লোক বলিতে হয়। রাজা ভর্তৃহরি ও গোরক্ষ নাথের সম্বন্ধের কথা পূর্বেই বলিয়াছি, কেহ কেহ ভর্তৃহরিকে ৭ম খৃঃ অব্দের লোক মনে করেন। তাহা যদি সত্য হয় তবে ৭ম খৃঃ অব্দে গোরক্ষ নাথ বিদ্যমান ছিলেন বলিতে হয়।[১৫] এসম্বন্ধে আরও প্রমাণ আছে যে ৭ম শতকে নরেন্দ্রদেব নেপালের রাজা ছিলেন, সে সময় গোরক্ষ নাথ নেপালে ছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে।[১৬] ৬ষ্ঠ কি ৭ম শতাব্দীতে শালিবাহন রাজা ছিলেন, সে সময় গোরক্ষ নাথ পাঞ্জাবে ছিলেন।[১৭] তিব্বতীয় গ্রন্থমালার প্রমাণে রুষদেশীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভাসিলীফ (Wasilief) স্থির করিয়াছেন যে গোরক্ষ নাথ খৃষ্ট জন্মের আট শত বৎসরের পরবর্তী ছিলেন।[১৮]

১১ পল্লীশ্রী, ২য় সংখ্যা—১৩৩১ বাং, যোগী গুরু গোরক্ষ নাথ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

১২ Archaeological Survey of India, Vol. I, page 178, By Cunningham.

১৩ অধ্যাপক অক্ষয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের "যোগী গুরু গোরক্ষ নাথ"—পল্লীশ্রী, ২য় সংখ্যা, ১৩৩১ বাং।

১৪ R. A. S. J. Series VII, part I, page 137.

১৫ অধ্যাপক অক্ষয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের যোগী গুরু গোরক্ষ নাথ, পল্লীশ্রী, ২য় সংখ্যা, ১৩৩১ বাং।

১৬ Sylvain Levi (Le Nepal, i 347.)

১৭ Romantic Tales from the Punjab, page 412-441—By Charles Swynnerton.

১৮ ১৩২৮ বাং প্রবাসীর ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত অধ্যাপক অমূল্য বিদ্যাভূষণের নাথপন্থ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

অবধূত গীতা গোরক্ষ নাথ ও দত্তাত্রেয়ের কথোপকথনচ্ছলে লিখিত। মনিয়ার উইলিয়ামস্ সাহেব দত্তাত্রেয়ের সময় দশম শতাব্দী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যদি উক্ত গীতা সে সময়কার লিখিত হইয়া থাকে তবে এ বিচারে দশম শতাব্দীতেও গোরক্ষ নাথ বিদ্যমান ছিলেন বলিতে হয়।

সাহিত্যাচার্য দীনেশচন্দ্র সেন বলেন—"গোরক্ষ নাথ মাণিকচন্দ্রের সমসাময়িক। কারণ তদীয়া মহিষী তাঁহার শিষ্যা। সুতরাং তিনি একাদশ শতাব্দীর লোক। ইনি মীন নাথের শিষ্য। * * * গোরক্ষ নাথ নাথসম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)।

গোরক্ষ নাথ ধর্ম নাথের সতীর্থ বলিয়া কচ্ছ প্রদেশের লোকের ধারণা (Indian Antiquary, Vol. VII, page 298-300)। এই ধর্ম নাথ বা ধরম নাথের শিষ্য গরীব নাথ জাঠদিগকে বিতাড়িত করিয়া বরাররাজ্যে রায়ধনকে (১১৭৫ খৃঃ হইতে ১২১৫ খৃঃ অব্দে মধ্যে কোনও সময়ে) সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন (Indian Antiquary, Vol. VII, Page 49)। মহারাষ্ট্রদেশে শ্রীমদ্‌-ভগবদ্গীতার মারাঠী ভাষার বিশদভাষ্যসমন্বিত জ্ঞানেশ্বরী নামক একখানি গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হয়। মহাপুরুষ জ্ঞানেশ্বর ইহার রচয়িতা। জ্ঞানেশ্বর জ্ঞানদেব নামেও পরিচিত। জ্ঞানেশ্বরী রচনা ১১৯০ খৃঃ অঃ শেষ হয়, এসম্বন্ধে মতভেদ নাই। ইহাতে লিখিত আছে যে জ্ঞানেশ্বর গোরক্ষ নাথ হইতে শিষ্যপরম্পরায় চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে ১১শ ও ১২শ খৃঃ অব্দে গোরক্ষ নাথ ছিলেন। মৎস্যেন্দ্র বা মীন নাথের প্রধান শিষ্য গোরক্ষ নাথ। গোরক্ষ নাথের পর ধর্ম নাথ। এই হিসাবে গোরক্ষ নাথ ধর্ম নাথের সতীর্থ। এই ধর্ম নাথ ১৪শ শতাব্দীতে কচ্ছদেশে যোগধর্ম প্রচার করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। গোরক্ষ নাথ যখন ধর্ম নাথের সতীর্থ তখন গোরক্ষ নাথকেও ঐ সময়ের ব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। পশ্চিম ভারতের মতেও গোরক্ষ নাথ ১৪শ শতাব্দীর লোক। কিন্তু এখানে একটি বিচার করিতে হইবে। ধর্ম নাথের প্রসঙ্গে গোরক্ষ নাথ ১১শ বা ১২শ খৃঃ অব্দের লোক, কিন্তু এখানে তিনি ১৪শ খৃঃ অব্দের লোক হইয়া পড়িতেছেন। ইহাই সংক্ষেপে লিওনার্ড সাহেবের মত (Indian Antiquary, Vol. VII, page 298-300)।

কবীরের জনৈক শিষ্য প্রণীত "গোরক্ষ নাথজীকী গোষ্ঠী নামক গ্রন্থে কবীরের সহিত গোরক্ষ নাথের কথোপকথনের বিবরণ আছে। কবীরকৃত বীজেক নামক গ্রন্থেও গোরক্ষ নাথের প্রসঙ্গ আছে। কবীর ১৫শ শতাব্দীর লোক। শিখগুরু নানক তাঁহার প্রাণসংগলী গ্রন্থে নয় নাথের বন্দনা করিয়াছেন। গোরক্ষ নাথ নয় নাথের একজন। এবং নানক-গোরক্ষসংবাদ গ্রন্থে গোরক্ষ নাথের সহিত নানকের ধর্মসম্বন্ধীয় তর্কবিতর্কাত্মক প্রসঙ্গ আছে। নানক ও ১৫শ শতাব্দীর লোক। এ হিসাবে গোরক্ষ নাথকেও ১৫শ শতাব্দীর লোক বলিতে হয়।

উপরোক্ত আলোচনায় দেখা গেল খৃষ্টের জন্মের মোটামুটি তিন বৎসর পূর্ব হইতে ১৫শ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত গোরক্ষ নাথ বিদ্যমান ছিলেন। এখন বিচার্য বিষয় হইতেছে ইঁহারা একই গোরক্ষ নাথ না বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন গোরক্ষ নাথ? যদি বলি ইঁহারা একই গোরক্ষ নাথ, তাহা হইলে প্রশ্ন হইবে মানুষ কি মোটামুটি আঠার শত বৎসর বাঁচিয়া থাকিতে পারে? এই বিজ্ঞানের জয়জয়কারের দিনে ইহাকে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া কেহ বিশ্বাস করিতে সম্মত হইবেন কি? অধ্যাপক অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—"হঠযোগসিদ্ধ মহাপুরুষগণ ইচ্ছা করিলে যোগশক্তিবলে কয়েক শত বৎসরও জীবিত থাকিতে পারেন, ইহা অনেকেই জানেন। বর্তমান যুগে শ্রীমৎ ত্রৈলিঙ্গ স্বামী ইহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।" * * * * (পল্লীশ্রী, ২য় সংখ্যা,

১৩৩১ বাং)। ইনি যোগশক্তিবলে প্রায় তিন শত বৎসর জীবিত ছিলেন। গোরক্ষ নাথ ছিলেন হঠযোগের প্রবর্তক। এমতাবস্থায় তিনি মোটামুটি আঠারশত বৎসর জীবিত ছিলেন তাহা নিছক গল্প বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। পাঞ্জাবে "গোরক্ষ নাথ চরিত" নামক একখানি গ্রন্থ প্রচলিত আছে। ইহাতে লিখিত আছে যে চারি যুগে চারিজন গোরক্ষ নাথ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সত্য যুগের গোরক্ষ নাথ পাঞ্জাবে, ত্রেতা যুগের গোরক্ষ নাথ গোরক্ষপুরে, দ্বাপরের গোরক্ষ নাথ হর্মজে ও কলির গোরক্ষ নাথ গুজরাটে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আরও দেখা যায়—"He (Gorakshanath) is said to have lived in the Punjab at Peshwar beyond Lahore in the Satya (Krita) Yuga, at Gorakshapur in the Treta Yuga, at Hurmuj beyond Dwaraka in the Dwapara Yuga and at Gorakshamari (Gorakshamandi) in Kathiawar in the Kaliyuga" (Gorakhnath and the Kanphata Yogis, Page 228—By Mr. G. W. Briggs).

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগে চারি জন গোরক্ষ নাথ আবির্ভূত হইয়া থাকিলেও উপরে আমরা যে গোরক্ষ নাথের সময় বিচার করিলাম তিনি কলির গোরক্ষ নাথ বলিয়াই অনুমিত হন।

জীবন-পাত্র

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষাল, এম্-এ, বি-এল্

তোমার কাছে যখন প্রভু আমায় তুলে ধরি
তখন আমি জগত হ'তে নিঃশেষে যাই মরি,
সাঙ্গ ক'রে কাজের ভীড়ে
যখন আমি ফিরি নীড়ে
তখন আমি শূন্যমনে তোমায় প্রভু স্মরি।
কী যে দিলেম কী যে পেলেম হিসাব দেখি খুলে,
জমার ঘরে নেইকো কিছু ভরা শুধুই ভুলে;
কাঙাল এই জীবন খানি
তোমার পায়ে দিলেম আনি,
শূন্য জীবন পূর্ণ ক'রো দিলাম তোমায় তুলে।
এলো মেলো জীবনেতে নেইকো কোন গান,
তাইতো ভাবি কী ক'রে হায় পাবে এটা স্থান!
নেইকো কোন জয়মালা,
পরাজয়ের হেলা ফেলা
নেইকো কোন বন্দনা মোর নেইকো কোন মান।
সাজিয়ে ছিলেম অনেক দিনে অনেক রাতের মাঝে,
বিজন দিনের নীরবতায় ভরা দিনের কাজে;
সে-সব বুঝি ছিল মিছে
তাইতো সে-সব রইলো পিছে,
মিলন সেতার ছিঁড়ে গিয়ে বেসুর বীণা বাজে।
শেষ হবে হায় যখন আমার দেওয়া নেওয়ার পালা,
কর্ম্ম-জগত শান্ত হবে আসবে যাওয়ার বেলা,
শূন্য জীবন-পাত্রখানি
তখন আমি দেব আনি
পূর্ণ করে তোমার প্রেমে দিও জয়ের মালা।

শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী

(১৯০৯।১৫ই আগষ্ট—১৯১০। ফেব্রুয়ারী)

(প্রথমাংশ)

"ধর্ম্ম" পত্রিকার প্রকাশ—ধর্ম্ম—Reg. No. C550. সম্পাদক—শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ, নগদ মূল্য দুই পয়সা মাত্র। সোমবার, ৭ই ভাদ্র, ১৩১৬ সাল (23rd August, 1909)।

অরবিন্দ ৩৮ বৎসরে পদার্পণ করিলেন। বাংলাদেশে এই তাঁহার শেষ বৎসর।

"ধর্ম্ম" পত্রিকার উদ্বোধনেই অরবিন্দ যাহা লিখিলেন তাহাতে তখনকার অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়, এবং তাঁহার মন কি ভাবিতেছে তাহাও জানা যায়। দুই সপ্তাহ পর হুগলী-কনফারেন্স্ আসিতেছে। শুধু নুন, চিনির বয়কট নয়, ব্রিটিশশাসনও বয়কটের প্রস্তাব করিতে হইবে। ব্রিটিশশাসন বয়কটের প্রস্তাব ১৯০৬ কলিকাতা নৌরজী-কংগ্রেসে বিপিন পাল সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ করেন। মেহতা, গোখ্‌লে, মালব্য প্রভৃতি তখন ইহার ঘোর প্রতিবাদ করেন। অরবিন্দ "ধর্ম্ম"-এর প্রথম সংখ্যাতেই লিখিলেন :—

"আমাদের বর্ত্তমান রাজনীতিক অবস্থা—মতির একতা নেই, গতির স্থিরতা নেই, ...অগ্রগামী, পশ্চাদ্‌গামী, বিপ্লববাদী, শান্তিপ্রিয়, তেজস্বী নিস্তেজ হয়।...তরঙ্গের গায়ে তরঙ্গ উঠে, যাঁহারা সর্ব্বোচ্চ তরঙ্গের চূড়ায় আরূঢ় তাঁহারা তরঙ্গের সঙ্গে ভাসিতেছেন, তরঙ্গ চালাইতেছেন না। সেই উদ্বেলিত শক্তিই বিপ্লবের একমাত্র নেতা ও কর্ত্তা।...কয়েকজন ভাসমান নেতাকে আকর্ষণ করিয়া সমুদ্রের অতলগর্ভে লুকাইয়া রাখিয়াছেন এবং উদ্ধত বায়ুকুলকে আইনকানুন নিগড়াবদ্ধ গুহাগহ্বরে নিগৃহীত করিয়াছেন,...কিন্তু যে পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত গোল থামিবার নয়। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম।...আমাদের দেশে এইরূপ নিয়ম পাঁচ বৎসর হইতে চলিতেছে। এই সময় অগ্রসর হইবার দিন নহে, আত্মরক্ষার দিন। যেন উদ্দাম আচরণে বিপক্ষকে সুযোগদান না করি, কিংবা ভীরুতা প্রকাশে নিগ্রহনীতিকে সফল না করি।"

তাহার পরেই আলিপুরে বোমার মোকদ্দমায় শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ ধৃত ও অভিযুক্ত হইলেন। মহামতি তিলক রাজদ্রোহের অভিযোগে ছয় বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। শ্রীযুত খাপার্দে ও শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র পাল বিলাতে প্রস্থান করিলেন, বঙ্গদেশের জাতীয়দলের প্রধান প্রধান নেতা নির্ব্বাসিত হইলেন। দেশময় প্রবল নিগ্রহ-নীতিরূপ ঝটিকা বহিতে লাগিল। মাদ্রাজে কন্‌ভেনশন্ সম্মিলিত হইয়া জাতীয় মহাসভা নামধারণ পূর্ব্বক বয়কট-বর্জ্জন দ্বারা বঙ্গদেশের মুখে চুনকালী মাখাইল, বঙ্গদেশের মধ্যপন্থী নেতাগণও নীরবে এই লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া সহন-শক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। এই বৎসরে লাহোরে এই কৃত্রিম মহাসভার অধিবেশনের আয়োজন চলিতেছে। লাহোরের সভা জাতীয় মহাসভাও নয়, মধ্যপন্থী দলের মহাসভাও নয়, বয়কটবিরোধী রাজপুরুষভক্তের মহাসভা।

নেতারা আন্দোলন সৃষ্টি করেন না, তাঁহারা আন্দোলনের তরঙ্গের উপর কখনও ভাসেন, এবং কখনও ডুবিয়া যান। জাতীয় জীবনের আন্দোলন মহাশক্তির খেলা। আন্দোলনের প্রতি

এই গভীর, mystic দৃষ্টি অরবিন্দের যেরূপ আছে, অন্য কোনও নেতার তাহা নাই।

মডারেটরা গোপনে ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন, যাহাতে অরবিন্দ কোনও জেলা-সমিতি দ্বারা হুগলীর অধিবেশনে প্রতিনিধি নিযুক্ত না হন। কিন্তু ডায়মণ্ড হারবার হইতে তিনি প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইলেন। এই গুপ্ত ষড়যন্ত্রের কথা অবগত হইয়া অরবিন্দ লিখিলেন—"চাণক্য-নীতি রাজতন্ত্রে পোষায়, প্রজাতন্ত্রে কেবল ভীরুতা ও স্বাধীনতা রক্ষণের অযোগ্যতা আনয়ন করে।"

১৯০৯, সেপ্টেম্বর, বিপিন পাল—গোখ্‌লের পুণা-বক্তৃতার আর এক দফা সমালোচনা বিপিন বাবু "ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান"-এ ছাপান। হুগলী-কনফারেন্সের মাত্র ২।৩ দিন পূর্ব্বে অরবিন্দ ইহা 'কর্ম্মযোগিন্'-এ পুনর্মুদ্রিত করেন। বিপিন বাবুর এই সমালোচনার গুরুত্ব খুব বেশী, কেন না, অরবিন্দ বিপিন বাবুর এই মতকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করেন। বিপিন বাবুর সমালোচনা তুলিয়া দিতেছি :—

"Moderation and madness in Indian politics"—by Bepin Pal, Reprint in Karmayogin, 4th September from the Manchester Guardian. The date of the letter is 31st July, 1909, London. Analysis of Gokhale's speech—

A. (i) Independence cannot be secured by peaceful means. (ii) The means that are capable of securing it are not at present at our disposal. (iii) Therefore, to talk and think of independence, which is unattainable, is mere madness.

Had Mr. Gokhale a powerful army at his command by which he could have driven out his masters in India he would have done it and secured independence.

The bombmakers think that they can organise the physical means necessary for securing independence.

The political philosophy of both is the same. They differ only in their estimates of the capacity of the people to put that philosophy into practice.

B. Three parties in Indian politics—(1) Moderate—Mr. Gokhlae, (2) Advocates of physical force—open or secret, (3) Advocates of passive resistance.

"The difference between (1) and (2) is that of prudence and recklessness. The (3) believes in the possibility of securing Independence by peaceful means. It advocates passive resistance in which alone lies the possibility of peace. Deny the passive resister his lawful rights, crush him out, and the country will be thrown into the vortex of a revolution.

"Repression may kill us. But it will not kill the desire of the people of India to be a free nation among the free nations of the world.

"It is not true that the talk or thought of of Independence and the pursuit of passive resistance have resulted in these acts of violence, which none more sincerely regrets than the Swarajist passive resister. They are the results of offical repression. They are the fruit of the attempt to deny to passive resistance its legitimate scope and play. Not lawful passive resistance but Executive lawlessness is the parent of the bomb in Bengal......Colonial is a racial relation which does not exist between England and India. Therefore, Independence is the logical ideal."

নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধবাদীদের তরফ হইতে মডারেট ও সন্ত্রাসবাদীদের আদর্শ ও কার্য্য-প্রণালী অতিশয় প্রাঞ্জল ভাষায় বিপিন বাবু

বিশ্লেষণ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়া দিলেন। ৪ঠা সেপ্টেম্বর অরবিন্দ হুগলী কনফারেন্সের প্রস্তাব-গুলিকে সংশোধন করিবার কথা লিখিলেন। গত বৎসর পাবনাতে বয়কট-প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু হুগলীতে তাহা দেখা যাইতেছে না। আবেদন-নিবেদন নীতির সুর সব প্রস্তাব-গুলির মধ্যেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। পরিশেষে সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে যে প্রস্তাবটি আছে অরবিন্দ তাহার ঘোর বিরোধিতা করিয়া লিখিলেন :—

"We totally reject the resolution on the Terrorist outrages, which no Bengal Conference ought to pass. The conference should dissociate from violence and remind the Government that it is their creation."

সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে কোন কথা সন্ত্রাস-বাদের প্রবর্ত্তক অরবিন্দের কলম হইতে নির্গত হইতে পারে না। এইখানে তিনি বিপিনচন্দ্র হইতে পৃথক।

হুগলী কন্‌ফারেন্স্‌—৬ই ও ৭ই সেপ্টেম্বর (২০শে ও ২১শে ভাদ্র)—

৭ই সেপ্টেম্বর, হুগলী কন্‌ফারেন্সের দ্বিতীয় দিনে "ধর্ম্ম" পত্রিকায় অরবিন্দ লিখিলেন :—

"প্রবল নিগ্রহনীতি আরম্ভ হওয়া প্রভৃতিতে দেশ নীরব হইয়া পড়িল। বঙ্গজাতির নবোত্থিত শক্তি ও সাহস যুবকদের প্রাণের মধ্যে লুক্কায়িত হইল এবং ভীরুগণের পরামর্শে দেশবাসীর স্মৃতিভ্রংশ ও বুদ্ধিলোপ হইতে চলিল। কোথায় নিগ্রহনীতির বৈধ অথবা সাহসপূর্ণ প্রতিরোধ করিয়া সেই নীতি বিফল করিবে, তাহা না হইয়া ভয়ে নিশ্চেষ্টতা ও নীরবতা শ্রেষ্ঠ পথ বলিয়া প্রচারিত হইল। তাহাতেই নিগ্রহনীতি সফল হইয়াছে।......গত পাঁচ বৎসরের কত চেষ্টা ও উদ্যম, শক্তিহীন ও বিফল হইয়া যাইতেছে।......যদি আমরা প্রাদেশিক সমিতিতে দেশের মূল রক্ষা ও ভারতের ভবিষ্যৎ আশা রক্ষা করিতে পারি...সেই পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেছি। নচেৎ নিজের পথ নিজে পরিষ্কার করিয়া ভয়ার্ত্ত ও নিগ্রহনীতিবিক্ষুব্ধ দেশের প্রাণ রক্ষা করিতে হইবে।"

কন্‌ফারেন্সের এক সপ্তাহ পরে (২৮শে ভাদ্র) "ধর্ম্ম" পত্রিকায় অরবিন্দ লিখিলেন—(বৈকুণ্ঠনাথ সেন সভাপতি হইয়াছিলেন) :—

"স্বয়ং সভাপতি মহাশয়ের বয়কট নাম তেমন পছন্দ নয়, তিনি লজ্জার মাথা খাইয়া তাঁহার বক্তৃতায় সে কথা বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু ১৯০৫।৭ই আগষ্ট টাউন হল সভায় ঠিক অনুরূপ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।"

সভাপতি বলিয়াছিলেন, "If you please I would omit the word, boycott, in connection with the movement." ১৯০৬ খৃঃ-এ কলিকাতায় নৌরজী-কংগ্রেসে বিপিন পালের বয়কট-প্রস্তাবের জন্য জেদ ও ব্যাখ্যা মনে পড়ে। এই তিন বৎসরের অল্প-কালের মধ্যেই গভর্ণমেণ্টের নিগ্রহনীতির ফলে, নেতারা ঘাবড়াইয়া গিয়াছেন। একা অরবিন্দ এই তুফানের মধ্যে হালে পানি পাইতেছেন না।

মডারেটরা হুগলীতে চারিটি বিষয়ে দৃঢ়সংকল্প হইয়া আসিয়াছিলেন :—(১) নিষ্ক্রিয় প্রতি-রোধের কথা তোলা হইবে না, (২) মর্লির শাসন-সংস্কার অস্বীকার করা হইবে না, (৩) জাতীয় দল যদি লাহোর-কংগ্রেসে না যায়, মডারেটরা যাইবে, (৪) সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে যে প্রস্তাব আছে, তাহা চরমপন্থীদের ইচ্ছানুযায়ী সংশোধন করা হইবে না। "কর্ম্মযোগিন্"-এ অরবিন্দ লিখিলেন :—

"If the Nationalists pressed their points, the Moderates would have seceded and the Conference broken. Therefore, the Nationalists gave way and adhered only to their main point of securing some definite step to hold a united Congress.

"In his speech on the Boycott resolution Sj. Arabinda Ghose purposely refrained from stating more than the bare fact;—in order that nothing he might say should lead to

excitement or anything which could be an excuse for friction."

অরবিন্দ বয়কট-প্রস্তাবটি শুধু উত্থাপন করিলেন মাত্র, কোনও বক্তৃতা করিলেন না। ভয়, পাছে মডারেটরা সভা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। আমরা দেখিয়াছি, মেদিনীপুরে তিনি মডারেটদের ছাড়িয়া আসিয়া জাতীয় দলের পৃথক সভা করিয়াছিলেন। সুরাটেও দেখিয়াছি, তিলকের পশ্চাতে থাকিয়াও তিনি তিলক অপেক্ষাও মডারেটদের ছাড়িয়া আসিবার পক্ষপাতী। "Without them (moderates) if it must be,"—এই ছিল তাঁহার সুস্পষ্ট মত। কিন্তু হুগলীতে সেই মতের অনুযায়ী কার্য্য তিনি করিলেন না, ইহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি। তবে কি বুঝিতে হইবে যে, তিনি তাঁহার মত পরিবর্ত্তন করিয়াছেন? অথবা বুঝিতে হইবে, তিনি তাঁহার মত পরিবর্ত্তন করেন নাই, রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্ত্তনে এবং গভর্ণমেণ্টের নিগ্রহনীতির চাপে পড়িয়া জাতীয় দলকে মডারেট দল হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া আনিতে একা ভরসা পাইলেন না? যদিও সভাপতি বৈকুণ্ঠনাথ সেন তাঁহাকে "impatient idealist"—মর্লির এই কথায়—সম্ভাষণ করিলেন, তথাপি আমরা বলিব যে হুগলীতে অরবিন্দ "impatient idealist" এর ভূমিকা গ্রহণ করেন নাই। ৩১শে জুলাই দেশবাসীর নিকট "খোলা-চিঠি"তে অরবিন্দ দুই দলে মিলিয়া United Congress করিবার কথাই বলিয়াছেন। নিজে এই কথা দেশবাসীকে চরম পত্রে বলিয়া আবার হুগলীতে নিজেই সেই নিজের কথার বিরুদ্ধাচরণ করেন কি করিয়া? যে মানুষ অবস্থার পরিবর্ত্তনে নিজের মত ও কার্য্যপ্রণালী পরিবর্ত্তন করে না, সে মানুষ নয়—যন্ত্রমাত্র। হুগলীতে অরবিন্দের পূর্ব্বেকার মডারেটবিরোধী মত ও কার্য্যপ্রণালী অবস্থাধীনে কিছুটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে স্বীকার করি, কিন্তু সেজন্য তাঁহাকে দোষ দিতে পারি না।

আমরা দেখিতেছি অরবিন্দ মর্লির ভেদনীতি-মূলক শাসনসংস্কার চাহেন না। তিনি ২১শে ভাদ্র "ধর্ম্ম" পত্রিকায় লিখিয়াছেন :—

"মর্লির সংস্কারে হিন্দু মুসলমানের দ্বন্দ্ব বাড়িবে। ফলে ইংরেজ মধ্যস্থ ও দেশের হর্ত্তাকর্ত্তা হইয়া বিরাজ করিবেন।"

অরবিন্দ গভর্ণমেণ্টের নিগ্রহনীতিকে "বৈধ অথচ সাহসপূর্ণ প্রতিরোধ" করিতে চাহেন। তিনি লাহোরে দুই দলে মিলিত কংগ্রেস চান। এবং কলিকাতা কংগ্রেসের জাতীয় দলের চারিটি প্রস্তাব লাহোর কংগ্রেসেও মঞ্জুর করাইতে চান। বিশেষতঃ, বয়কট-প্রস্তাবে শুধু নুন, চিনির বয়কট নয়—বিপিন পাল কথিত ব্রিটিশ শাসন বয়কটও কংগ্রেসকে গ্রহণ করিতে বলেন। জেল হইতে বাহির হইয়া, এই পাঁচ মাস তিনি তাঁহার সকল শক্তি রাজনীতিক্ষেত্রে যথাশক্তি প্রয়োগ করিতেছেন।

শ্রীহট্ট জেলা সমিতি—৪ঠা আশ্বিন "ধর্ম্ম" পত্রিকায় অরবিন্দ লিখিলেন যে, হুগলীর পর তিনি শ্রীহট্ট জেলা সমিতিতে জলপ্লাবিত জলসুকা গ্রামে গিয়াছিলেন। হুগলী কনফারেন্সে যাহা তিনি করিতে পারেন নাই, শ্রীহট্টে তাহা পারিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন :—

"স্বরাজের নাম করিতে ভয় করেন নাই। সর্ব্বাঙ্গীণ বয়কট সমর্থন করিতে সাহসী হইয়াছেন, আবেদন-নিবেদন নীতি বর্জ্জন পূর্ব্বক তদনুযায়ী প্রস্তাব সকল রচনা করিয়াছেন।"

শ্রীহট্টে ইহাও বলা হইয়াছে যে, স্বরাজ অর্থ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন নহে।

"ইংলণ্ডের সহিত ভারতের ঔপনিবেশিক সম্বন্ধ নাই। উপরন্তু ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন ভারতের পূর্ণ জাতীয় বিকাশের ও মহত্ত্বের উপযোগী শাসনতন্ত্র নহে।"

শ্রীহট্টবাসীরা এক্ষেত্রে তাঁহাদের দেশের লোক, বিপিন পালের মতকে পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া, বয়কটেরও আর এক রকম ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। বয়কট বঙ্গ-বিরোধের শুধু প্রতিবাদ নয়, ইহা—

"যে বৈধ উপায়ে স্বরাজ লাভের চেষ্টা সমিতির অনুমোদিত, বয়কট সেই বৈধ উপায়ের মধ্যে গণ্য ও প্রধান, ইহাই শ্রীহট্টবাসীদিগের মত।"

কতকগুলি সংবাদ—তারপরে, কতকগুলি সংবাদ আছে :—(১) Indian Sociologist এর মুদ্রাকর মিঃ আলফ্রেড্ এক বৎসরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। (২) গুজব যে, শ্যামজী কৃষ্ণবর্ম্মা নরেন গোঁসাই-এর হত্যাকারী কানাইলাল দত্তের একটি আবক্ষ প্রস্তরমূর্ত্তি তাঁহার চন্দননগরের পৈতৃক বাড়ীতে প্রতিষ্ঠার জন্য পাঠাইতেছেন। (৩) মিঃ তিলক মান্দালয় জেল হইতে মিক্‌টিনা জেলে স্থানান্তরিত হইয়াছেন। (৪) মিঃ গোখ্‌লে বোম্বাই-এ একটি বক্তৃতা দিয়া বলিয়াছেন যে, ট্র্যান্সভালবাসীরা তথাকার গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ অবলম্বন করিতে পারেন। ইহার উত্তরে অরবিন্দ লিখিতেছেন :—

"দেশে আস্থাহীন হইলে বিদেশে উন্নত হয় না।... গোখ্‌লের এই উক্তি কি তাঁর পূর্ব্ব বক্তৃতার দেশব্যাপী বিক্ষোভের ফলে ?"

জলশুকা কনফারেন্স্ হইতে অরবিন্দ বানিয়াচঙ্গে আসিয়া মঙ্গলবার, ২৩শে ভাদ্র, পৌঁছিলেন। বানিয়াচঙ্গে তিনি কোনও বক্তৃতা করিলেন না। তিনি বলিলেন,—"স্বদেশে বিদেশী ইংরেজী ভাষায় কিছু বলিব না।" এরূপ কথা ইতিপূর্ব্বেও তিনি অনেকবার বলিয়াছেন।

আয়র্ল্যাণ্ড ও ধিংড়া—আয়র্ল্যাণ্ডে বড় বড় প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল—'Ire ধিংড়াকে সম্মান করিতেছে।' Ireতে ইংরেজবিদ্বেষ চিরপ্রসিদ্ধ। স্বায়ত্তশাসন দাবী করিতেছে। এখানেই বয়কটের উৎপত্তি।"

লালমোহন ঘোষের মৃত্যু—১১ই আশ্বিন "ধর্ম্ম" পত্রিকা লিখিলেন :—

"প্রাদেশিক সমিতিতে বাংলায় বক্তৃতা করিবার প্রথা তিনিই (লালমোহন ঘোষ) প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন।... অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন। ইংরেজী ভাষায় তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। বিলাতে অনেকে তাঁহার বক্তৃতা বিদেশীর বলিয়া বুঝিতে পারিত না।...বাংলায় বয়কট প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব তাঁহার বিরাট কীর্ত্তি।"

কলিকাতা নৌরজী-কংগ্রেসের সময় অরবিন্দ "বন্দেমাতরম্" পত্রিকায় লালমোহন ঘোষকে তাঁহার মডারেটনীতির জন্য এবং জাতীয় দলের প্রতি বক্রোক্তি করার জন্য অতি তীব্র কশাঘাতপূর্ণ সমালোচনা করিয়াছেন। অরবিন্দের সমালোচনা কখনই মৃদু হইতে দেখি নাই। তথাপি বলিতে হইবে ভারতবর্ষে লালমোহন ঘোষ দুইজন ছিলেন না। দেশের একটা ইন্দ্রপাত হইয়া গেল, এ বিষয়ে আর কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু জাতীয়-দলের অগ্রগামী চিন্তা ও কার্য্যপ্রণালীর সহিত তিনি শেষ জীবনে সকল বিষয়ে যোগ রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন নাই।

বিপিন পাল ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ-বাদীর দল—বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে বিপিন পাল একটি প্রবন্ধ লিখিলেন। ২৫শে সেপ্টেম্বর উহা "কর্ম্মযোগিন্"-এ ছাপা হইল। সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি :—

"The Situation by Bepin Pal:—1. The passive resisters are to separate themselves from (a) Moderates, and (b) Terrorists.

2. They are not a party, but only a school of thought. There must be an **All India** Nationalist Association or the whole movement will split up into small and eccentric groups working frequently at cross purposes. Register of Nationalists—necessary.

3. By a strange irony of fate Mr. Gokhale

and Mr. Krishnavarma have found in each other exceedingly useful allies in helping forward the propaganda of political violence in India.

4. All Nationalists should pledge themselves to lawful activities laid down in Sreejut Aravindo Ghose's open letter (31st July, 1909)."

সেদিন (২২।২৩শে নভেম্বর, ১৯৪৫) কলিকাতার রাজপথে বাংলার তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদল দিবারাত্রি নিশ্চল ও নিষ্ক্রিয় অবস্থায় বসিয়া থাকিয়া, সম্পূর্ণ নিরস্ত্র অবস্থায়, পুলিশের গুলি মাথা ও বুক পাতিয়া গ্রহণ করিয়া —বুকের রক্তে মহানগরীর রাজপথকে লালে লাল করিয়া দিয়া চলিয়া গেল। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের এই নির্ভীক দৃষ্টান্ত বাংলা দেশ দেখাইতে পারিল,—নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের জন্মস্থানেই যে চল্লিশ বৎসর পরে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের এই ইতিহাস রচিত হইল, তাহা—বাংলাদেশে যাঁহারা স্বদেশী যুগে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই দেখিয়া যাইতে পারেন নাই—এক অরবিন্দ ছাড়া।

১৯০৯ অক্টোবর—পাঁচ মাস অতীত হয়, অরবিন্দ জেল হইতে বাহির হইয়াছেন। এই পাঁচ মাসের মধ্যেই তাঁহাকে আবার নির্বাসনের কথা উঠিয়াছে। তিনি ৩১শে জুলাই দেশবাসীকে এক চরম পত্রে খোলাখুলি সব লিখিয়া প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছেন। জাতীয় দলের তরণীখানি, কিরূপ ঝড়তুফানের মধ্যে, তিনি একা চালাইতেছেন তাহা গত পাঁচ মাসে আমরা দেখিয়াছি। সম্মুখে আর মাত্র পাঁচ মাস। ফেব্রুয়ারীর শেষ সপ্তাহেই তিনি চন্দননগর প্রস্থান করিবেন। বঙ্কিমবন্দিতা বঙ্গভূমির নিকট হইতে চিরতরে বিদায় লইবেন। কিরূপ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়িয়া তিনি প্রিয় জন্মভূমি চিরজীবনের মত পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হইবেন, আমরা আগামী পাঁচ মাসে তাহা দেখিতে পাইব।

কতকগুলি সংবাদ—(১) পুলিশ "হিতবাদী" অফিস নাহক খানাতল্লাসী করিল। কিছুই পাইল না। (২) হীরেন্দ্র দত্ত ঢাকায় বক্তৃতা দিলেন যে, রাজনীতির সহিত জাতীয় বিদ্যালয়গুলির কোনই সংশ্রব থাকিবে না। থাকিলে হয়তো গভর্ণমেণ্ট জাতীয় বিদ্যালয়গুলি উঠাইয়া দিবেন, এই ভয়। অরবিন্দ লিখিলেন :—

"A divorce of National Council of Education from national movement—a deliberate policy."

এই policy অরবিন্দ পছন্দ করেন নাই বলিয়াই জাতীয় বিদ্যালয় হইতে তিনি বিদায় লইয়াছেন। (৩) গভর্ণমেণ্ট অনুশীলন সমিতি বন্ধ করিয়া দিলেন। কেন না এই সমিতির কার্য্যকলাপ দ্বারা রাজ্যশাসনের ব্যাঘাত জন্মিতেছে। অরবিন্দ লিখিলেন :—

"কিরূপ প্রমাণের বলে যে গভর্ণমেণ্ট একটি সম্ভ্রান্ত সমিতির বিরুদ্ধে এই প্রকার গুরুতর অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন, তাহা আমরা জানি না। দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থান প্রভৃতিতে দেশসেবা ব্যতীত অন্য কি অভিযোগ তাহাদের বিরুদ্ধে আসিতে পারে, আমরা তাহা জানি না।"

"কর্ম্মযোগিন্"-এ আরও সুর চড়াইয়া লিখিলেন :—

"Government is determined to allow no organisation to exist among the Bengalees."

অরবিন্দের এ সমালোচনা ত "wanted more repression" এর মত শুনাইতেছে না। শান্তিপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলির উপরেও গভর্ণমেণ্ট পুরা দমে নিগ্রহ-নীতি চালাইতেছেন। ইহাই অরবিন্দের অভিমত। এবং এই নিগ্রহ-নীতি তিনি আর চাহেন না।

(৪) মিঃ সি আর দাশ আলিপুরের বোমার মামলায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আসামীদের

পক্ষে হাইকোর্টে যে আপীল করিয়াছিলেন, সেই আপীলের বক্তব্য শেষ করিয়া উপসংহারে বলিলেন :—

"দণ্ডপ্রদান কালে মাননীয় বিচারপতি মহোদয়গণ অভিযুক্তদিগের বালসুলভ উন্মত্ততা ও যৌবনের দৃক্‌পাত-শূন্যতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন এবং উৎকট স্বদেশপ্রেম, স্বাধীনতার প্রতি আকাঙ্ক্ষাই যে এই সকল যুবকদিগকে বিপথে চালিত করিয়াছে, তাহাও বুঝিয়া দেখিবেন। গুরুদণ্ড দ্বারা যেন ইহাদের সারা জীবনটাকে বিনষ্ট করিয়া না দেওয়া হয়।"

মিঃ দাশ আদালতে দাঁড়াইয়া ফাঁসিকাষ্ঠ হইতে বারীন্দ্র, উল্লাসকর প্রভৃতিকে বাঁচাইবার জন্য সন্ত্রাসবাদীদের পথকে "বিপথ" বলিতে বাধ্য হইলেন,—সুপথ আর বলেন কি করিয়া? (৫) মিঃ গোখ্‌লে আবার এক বক্তৃতা দিলেন। তিনি বলিলেন, ছাত্রেরা রাজনৈতিক সভায় দর্শক হিসাবে যাইতে পারিবেন, কিন্তু বক্তৃতা করিতে পারিবেন না। তারপর বলিলেন, —শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ চলিবে না, গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিয়া নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ-কারীদিগকে খোঁচাইয়া সক্রিয় এবং হিংস্র করিয়া তুলিবেন। "Government will not allow even peaceful agitation. *It will provoke it to be violent.*"

মিঃ গোখ্‌লে গভর্ণমেণ্টের মন জানেন, সুতরাং তিনি একথা বলিতে পারেন। অরবিন্দ ইহার সমালোচনায় লিখিলেন যে,—মিঃ গোখ্‌লে ট্রান্স-ভালবাসীদের জন্য বয়কট ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ সমর্থন করিয়া ভারতবর্ষের জন্য অনুরূপ কথা বলেন কিরূপে? "ধর্ম্ম" পত্রিকায় অরবিন্দ আরও কঠোর সমালোচনা করিলেন। তিনি লিখিলেন :—

"গোখ্‌লে মহাশয় কোন জন্মে মহৎ ছিলেন না। তবে তিনি মহত্তের ছায়া বটে। তাঁহার সকল মত, বুদ্ধি, বিদ্যা, চরিত্র, তাঁহার নিজস্ব নহে—কৈলাসবাসী রাণাডের দান। গোখ্‌লের মধ্যে মহাত্মা রাণাডের ছায়া বিনষ্ট হইতে চলিল দেখিয়া আমরা দুঃখিত।"

অরবিন্দ যাঁহাকে দেশদ্রোহী "বিভীষণ" বলিয়াছেন, তাঁহার প্রতি এ-টুকু সমালোচনা আর এমন বেশী কি?

(৬) অরবিন্দ একটি সুন্দর দুর্গাস্তোত্র "ধর্ম্ম" পত্রিকায় লিখিলেন (তাহার পুস্তকাকারে প্রকাশ দেখি নাই)।

(৭) ১৬ই অক্টোবর, রাখী সম্মিলন,— "অরবিন্দবাবু ও তাঁহার পত্নীর হাফ্‌টোন ফটো-যুক্ত অরবিন্দরাখী কার্ড ছাপা হইয়াছে। মূল্য এক আনা মাত্র।" ১৬ই অক্টোবর যে ঘোষণাপত্র দেওয়া হইত এবার তাহা মডারেটরা বন্ধ করিয়া দিলেন। অরবিন্দ নেতাদের ভীষণ আক্রমণ করিয়া লিখিলেন :—

"We will oppose this act of culpable weakness. Even a nation of strong men led by the weak, blind or selfish becomes easily infected with the vices of its leaders."

শুধু স্বদেশীযুগে নয়,—গান্ধীযুগেও,—নেতাদের বিরুদ্ধে অরবিন্দের এই তীব্র সমালোচনার সত্যতা ইতিহাস বহুবার প্রমাণ করিয়া দিয়াছে।

অরবিন্দ ও বিপিনচন্দ্র—মডারেট দল, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধবাদী জাতীয় দল, গভর্ণমেণ্টের নিগ্রহনীতি ও তাহার ফলে সন্ত্রাসবাদী দল সম্পর্কে অরবিন্দ বিপিনচন্দ্রের সহিত প্রায় একমত হইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু একটি বিষয়ে দুইজনের মধ্যে ঘোরতর মতপার্থক্য দেখা দিয়াছে। বিপিনচন্দ্র বলেন, ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে ইংলণ্ডে প্রচার-চেষ্টার প্রয়োজন। অরবিন্দ, ১৮ই আশ্বিন "ধর্ম্ম" পত্রিকায় খোলসা লিখিলেন :—

"আমরা সেইরূপ (বিপিনবাবু কথিত) চেষ্টায় আস্থাবান নই। আমরা বর্ত্তমান স্বেচ্ছাতন্ত্র বৈধ উপায়ে প্রজাতন্ত্রে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে রাজনীতিক্ষেত্রে

অবতীর্ণ। সেই হেতু আত্মশক্তি অবলম্বন ও বৈধ প্রতিরোধ সমর্থন করি।"

নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধকে অরবিন্দ, আলিপুর বোমার মামলায় মিঃ সি আর দাশকে অনুসরণ করিয়া বৈধ বলিলেন।

বিপিনচন্দ্র ইংলণ্ডে ভারতবর্ষের প্রচার সমর্থন করিয়া যাহা লিখিলেন তাহা সংক্ষেপে এইরূপ :—

1. "Work in England necessary. Lajpat's release is due to pressure of British public opinion. India Government was opposed to it.

2. Passive resistance depends upon the reduction of repression in India. That can only be done by pressure from British public opinion.

3. Repression will kill people's faith in passive resistance; and passive resistance will fail and die.

4. Repression drives capital away, causes collapses of industrial enterprises in India. So reform is granted to quiet India.

5. Estimate of British character (a) show of fight,—when defeated, (b) compromise, because of strong common sense."

অরবিন্দ বিপিনবাবুর এই মতবাদের প্রতিবাদ করিয়া যাহা লিখিলেন, তাহা সংক্ষেপে তুলিয়া দিতেছি :—

1. "Work in England at present is hopeless,—waste of money and energy.

2. Curzon Wyllie murder is no excuse to release the deportees. No ministerial pronouncement of imminent release, when that happened.

3. Bepin Babu relies on the enlightened (a) self interest of the British people and (b) on their civilised conscience.—"On which, frankly, we place no reliance whatsoever"; and on (a),—"here also we differ from Bepin Babu because correct representations of their interest will not avail. They are amazingly muddle-headed and can only learn by knocking their shins against hard and rough facts." Their "absolute Lordship" thus came in conflict with "Boycott and passive resistance" of Bengal. They want to do away with it by repression. And in return we must, show "a tenacity and courage and a power of efficiently rivalling the British"—and,—"not to appeal to the conscience and clear common sense of the British public."

4. The only way is for the Nationalist party to establish its separate existence, clear from the drag of Moderatism on the one side and disturbance of the ill-instructed out breaks of Terrorism on the other, and erect itself into a living, compact and working force in India."

ইহা ছাড়া অরবিন্দ বিপিনবাবুর আরও একটি প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিলেন। বিপিনবাবু বলিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের জাতীয়তাবাদীদের নাম ও ঠিকানা একটি খাতায় একত্র করিয়া লিখিয়া রাখিলে ভাল হয়, সঙ্ঘগঠনের অনুকূল হয়। অরবিন্দ প্রতিবাদ করিয়া লিখিলেন যে, এরূপ করিলে গভর্ণমেণ্টকে, গ্রেপ্তার করিবার সুযোগ ও সুবিধা করিয়া দেওয়া হইবে মাত্র। ২রা অক্টোবর "কর্ম্মযোগিন্"-এ অরবিন্দ লিখিতেছেন :—

"Sreejut Bepin Pal advocates a register of all India Nationalists as a basis for organisation; but it would be victims of police harassment, house searches; arrests, binding down under securities, prosecutions with no evidence."

অরবিন্দ—"man on the spot"; সুতরাং তাঁহার কথার মূল্যই বেশী।

স্বদেশী সভা—কলেজ স্কোয়ার, অরবিন্দের বক্তৃতা—

"শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ বলেন যে ১৬ই অক্টোবর ভারতবর্ষের ইতিহাসে কেন, জগতের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। এই মহোৎসবের তিনটি অঙ্গ আছে; ১ম, এই মহাজাতির একত্বজ্ঞাপন; ২য়, ইহার স্বাতন্ত্র্য, জগতের মধ্যে এই জাতির যে ভগবৎ নির্দ্দিষ্ট স্বকীয় স্থান আছে, তাহা বিঘোষণ। শুধু অতীতের মধ্যেই এই জাতি নিঃশেষিত হইয়া থাকিবে না। ইহার যে গৌরবমণ্ডিত এক মহা ভবিষ্যৎ আছে, তাহাও উপলব্ধি করিতে হইবে। ৩য়, এই জাতির জাতীয়ত্ব উদ্বোধন ও স্বদেশী মন্ত্রগ্রহণ। স্বদেশী বলিতে শুধু স্বদেশীয় পণ্যব্যবহার বুঝিব না, স্বদেশার মধ্যে আগে স্বদেশ এবং জাতীয়ত্বই সেই স্বদেশের প্রাণ। এই জাতীয়ত্ব সংস্থাপনই প্রকৃত স্বদেশী। এই স্বদেশীর প্রতিষ্ঠা আত্মশক্তির দ্বারাই সংসাধিত হইবে। আয়র্লণ্ড ইহার একটি দৃষ্টান্তস্থল। যতকঠিন বাধাবিঘ্ন আমাদিগকে অতিক্রম করিতে হইবে, আমাদের শক্তিও ততই বিকশিত হইবে। গৌতম মারের সকল প্রলোভন, সকল বিভীষিকা অতিক্রম করিয়াই বুদ্ধ হইয়াছিলেন। আমাদের বর্ত্তমান পরীক্ষার কঠোরতাই ভবিষ্যৎ মহামহিমার পরিমাপক।"
—(ধর্ম্ম, ১লা কার্ত্তিক, ১৩১৬। পৃঃ ১৩)

এখানে প্রলোভন,—মর্লির শাসনসংস্কার; আর বিভীষিকা,—গভর্ণমেণ্টের নিগ্রহনীতি। অরবিন্দ দুই-ই প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

শ্রীশ্রীমহারাজের কথা

শ্রী—

মহারাজ বলরাম মন্দিরে। এক শনিবার দেখা করতে গেলাম, সেবক বললেন, "মহারাজের চিঠি-পত্রের জবাব দেবার জন্য এক প্যাকেট ডাকের চৌকো খাম, ও দলিলপত্র রাখবার খানকতক মোটা কাগজের মজবুত খাম আনবেন।" পরের শনিবার খাম নিয়ে গেলাম, সেবককে দেখতে পাই নি, হলঘরে একেবারে মহারাজের কাছে উপস্থিত হলাম। মোটাবুদ্ধি, ভাবলুম, মহারাজ খুশী হবেন। প্রণাম করে খামগুলি সুমুখে রাখলুম। কিন্তু উল্টো ফল হল। জিজ্ঞাসা করলেন, "কে একে আনতে বলেছিল?" সেবকের নাম করলাম। ডাক পড়ল। সেবক উপস্থিত হলে মহারাজ বললেন, "তুমি একে এই সব আনতে বলেছিলে? এসবের জন্য তুমি এখান থেকে পয়সা পাও না? জান তুমি, ওর খরচ কত? তোমাদের জন্য আমি জ্বলে পুড়ে মলুম। এর পর তোমরা বড়লোকের মোসাহেবি করবে। যাও, গেরুয়া ছেড়ে ফেলে প্রায়শ্চিত্ত করে সংসার করগে যাও।"

আমি ত মহা অপ্রস্তুত, বললুম, "আমারই দোষে উনি বকুনি খেলেন।" মহারাজ তাতে বললেন, "তুমি ও ভাল কর নি, তোমার এরকম indulgence (আস্কারা) দেওয়া ভাল হয় নি। তুমি একজন পুরানো ভক্ত।"

কোন রকমে পাশ কাটিয়ে সিঁড়ির উত্তর দিকের ঘরে দুজনে উপস্থিত। আমি ত একেবারে ঘাড়-হেঁট, সেবকের মুখের দিকে চাইতে পারি না। সে ঘরে মহারাজের পূর্ব্বতন একজন সেবক উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে সব কথা বলায় তিনি হেসে বললেন, "আমাদের ওরকম কত হয়; ওর জন্যে আপনি কিছু মনে করবেন না।"

শান্তি হল না। শনিবার যাব কিন্তু তার আগেই পোষ্টকার্ডে লিখলুম, "তিনি আপনার

বেশী 'আপনার' লোক, তাই তাঁকে বকলেন। আমায় ত বকলেন না।"

পরের শনিবার উপস্থিত হতেই সেবক বললেন, "আমি শুয়ে ছিলুম; মহারাজ আপনার চিঠিখানা এনে ফেলে দিয়ে বললেন, 'ত্থাখ রে ত্থাখ, কি লিখেছে ত্থাখ'!"

দেহ রাখবার কিছু পূর্ব্বে ছেলেরা সব ঘিরে বসে কাঁদছে। তিনিও সাধারণ মানুষের মত কেঁদে বলে উঠলেন, "তোরা সব কাঁদছিস কেন রে? তোদের ভাবনা কি? ভয় কি? তোদের ঠাকুর রইলেন।" আমি আর সেখানে দাঁড়াতে পারলুম না।

একদিন জিজ্ঞেস করলুম, "মশা কামড়ায়, মশারির ভিতর কি ধ্যান করা যায়?"

উত্তর—"হাঁ। আমরা জপ করতাম, ঘুম পেলে দাঁড়িয়ে জপ করতাম, আসন ছাড়তাম না।"

একদিন বল্লুম, "ধ্যান করব কি? বাড়ীর কাছে একটা বাঁশঝাড় আছে ঐটে সুমুখে এসে হাজির হয়।"

উত্তর—"ঐটেই ধ্যান করবে।"

আর একদিন—"কিছু করবার আগে একটু ভাববে।" একজন লাল দীঘির জল খায় শুনে বললেন, "কলকাতার street dust এ (রাস্তার ধূলোয়)—এমন bacilli (রোগবীজাণু) নেই যা ওতে নেই। ও জল খেও না।"

একজন ঠাকুরঘরে গেলেন আর নেবে এলেন দেখে তাকে বললেন, "কি, গেলে আর চলে এলে! ঠাকুরের সঙ্গে 'শেকহ্যাণ্ড' করে এলে নাকি?"

একদিন বললেন, "শনিবার কালী দর্শন করতে হয়। তাই দক্ষিণেশ্বরে গেছলাম।"

আর একদিন—"তোমরা এখানে আসবে, কিছু খেয়ে এসো। তাতে কোন দোষ হবে না। নইলে ঐ খাওয়ার দিকে মনটা পড়ে থাকে।"

অন্য একদিন—"কেবল ডাল আর ভাত (দরকার), কি বল, ননিলাল, কি বল?"

"'মা জাগ, মা জাগ' বলে কুণ্ডলিনীকে জাগাতে হয়।" একদিন একজনকে, 'পেন্নাম ফেন্নামে কিছুই নেই' বলায় তিনি বললেন, 'কেন ত্রিসন্ধ্যা?" তাতে মহারাজ বলে উঠলেন, "আচ্ছা; 'ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী, পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়?' আচ্ছা।"

একদিন বললেন, "এই সব এখন চুপটি মেরে বসে আছেন, এর পর নিজ মূর্ত্তি ধারণ করবেন।"

একজনকে—"চোক চেয়ে ধ্যান করবে।"

"সাধন-ভজন করবার উদ্দেশ্য কি? —তাঁকে জানা, তাঁর কৃপালাভ করা। কাম-কাঞ্চনে মন মলিন হয়ে আছে, মনে ময়লা পড়ে আছে—তা ধুয়ে সাফ্ কর। * * চিত্তশুদ্ধ না হলে তাঁর কৃপা লাভ করা যায় না। ঠাকুর একটি বেশ উপমা দিতেন—"ছুঁচ কাদা মাটি ঢাকা থাকলে চুম্বকে টানে না, কাদা মাটি ধুয়ে ফেললে তখন চুম্বকে টানে।"

—স্বামী ব্রহ্মানন্দ

রাসায়নিক কর্ম্মধারা

অধ্যাপক শ্রীসুবর্ণকমল রায়, এম্‌-এস্‌সি

অনন্ত কাল হইতে রাসায়নিক কর্ম্মধারা পৃথিবীর বুকে অবিরাম গতিতে প্রবাহিত হইতেছে। নিশ্চয়ই এক বিশাল উদ্যোক্তা ইহার কর্ণধার। মানুষ ক্রমশঃ উক্ত রাসায়নিক কর্ম্মধারার একটু একটু আস্বাদ পাইতেছেন। জৈব অজৈব ও অন্যান্য রসায়নশাখা নিয়ত প্রকৃতির বুকে ক্রিয়মাণ। জল, বায়ু, পাহাড়, পর্ব্বত, মাটি ইত্যাদি শরীরগুলি প্রায়শঃ অজৈব রসায়নের লীলাভূমি। মানুষ যেদিন ইহাদের মর্ম্মগাথার একটু ইঙ্গিত পাইলেন সেই দিন হইতে মনুষ্যসমাজে রসায়নের মূল ভিত্তি স্থাপিত হইল। সে বহুদিনের কথা হিন্দুরা এই গুপ্তধনের প্রথম সন্ধান পাইয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই যে, তাহাদের সাফল্যের ধারাবাহিক কাহিনী আমাদের হস্তচ্যুত হইয়াছে। যাহা আছে তাহাও এক অন্ধ সংস্কারের ধূম্রজালে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক রস্কো (Roscoe) সাহেব লিখিয়াছেন গোল্ড (Gold) শব্দটা সংস্কৃত শব্দ হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। মহর্ষি কণাদের আণবিক সূত্রের কথা অনেকেই অবগত আছেন। বর্ত্তমানে যে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রটী প্রচলিত আছে তাহাতে গোটা শাস্ত্রটার পরিচয় পাওয়া যায় না। শুনা যায় আমাদের ঋষিগণ কতকগুলি মৌলিক নিয়া বহুবিধ প্রক্রিয়া সাধন করিয়াছেন—ইহা অজৈব শাস্ত্রের কথা। আবার তাঁহারা গাছপালা হইতে এমন সব সূক্ষ্ম ভৈষজ্যতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন যে আধুনিক বিজ্ঞানকেও সময় সময় বিস্ময়ে প্রশংসা করিতে হয়। এখানে আমাদের জৈব শাস্ত্রের পরিচয় পাই।

এ সমস্ত অতীতের কাহিনীতে গর্ব্বের বস্তু থাকিলেও সে প্রশংসা অতীতের পণ্ডিতদেরই প্রাপ্য। আমরা নানা কারণে সে সাধনার রূপ বা প্রেরণা হারাইয়া ফেলিয়াছি, এবং পাইতেছি আমাদের একমাত্র প্রাপ্য লাঞ্ছনা ও ধিক্কার।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে প্রকৃতপক্ষে বর্ত্তমান রসায়নের ভিত্তি স্থাপিত হয়। এইটী আরম্ভ হয় অজৈব রসায়নকে অবলম্বন করিয়া। জল, বায়ু, খনিজ পদার্থ ইত্যাদিকে সম্বল করিয়া এই রসায়ন প্রথম রূপ পরিগ্রহ করে, এবং ক্রমশঃ বিশাল রসায়নীয় পরদার আড়াল হইতে কতকগুলি চিরন্তন সত্য আবিষ্কার করিয়া শাস্ত্রের মূল কাঠামো দাঁড় করান হয়। ঐ সময় হইতে অজৈব রসায়ন ধীর পদবিক্ষেপে উন্নতির সোপান বাহিয়া চলিতে থাকে। উক্ত অজৈব পদার্থের রাসায়নিক তাৎপর্য্য হস্তগত হওয়ায় কিছুদিন পরে পণ্ডিতদের দৃষ্টি পতিত হয় ঐ গাছপালা, পশুপক্ষীর শরীরের উপর। যেমন জল, বায়ু, পাথর, লবণ ইত্যাদিকে অজৈব পদার্থের শ্রেণীভুক্ত করা হইল, তেমন জৈব পদার্থের শরীরনিঃসৃত পদার্থগুলিকে জৈব আখ্যা দিয়া উহার নূতন একটি শ্রেণী বিভাগ করিল। অজৈব পদার্থ প্রস্তুতিতে উহাদের কোন দিন বিশেষ ক্লেশ পাইতে হয় নাই, কাজেই শাস্ত্রটীর উন্নতির পথে প্রথম হইতেই কোন বাধা সৃষ্টি হয় নাই। পশুপক্ষীর শরীর জীব শরীর, গাছপালার যখন জীবন আছে উহাদেরও জীব শরীর বলিলে দোষ কি? এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া ঐ সমস্ত জীব ও উদ্ভিদ শরীর মিশ্রিত পদার্থ

জৈব পদার্থ বলিয়া আখ্যাত হয়। এবং সঙ্গে সঙ্গে উক্ত পদার্থগুলির প্রস্তুতির পেছনে একটি চেতনাশক্তির প্রেরণা আছে—এই ধারণা উহাদের বদ্ধমূল হয়। চেতনাশক্তি ব্যতীত অপর কেহ যে উহাদের প্রস্তুত করিতে পারিবে এ আশা উহাদের মনে একটুও স্থান পায় না। তদানীন্তন পণ্ডিতগণ সকলে একমত হইয়া প্রচার করিলেন যে জৈব পদার্থ প্রস্তুতিতে অবিনশ্বর চেতনাশক্তির প্রয়োজন—নশ্বর জীব দ্বারা ইহাদের তৈয়ার করা অসম্ভব। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, কিছুদিন যাইতে না যাইতেই এ ভীষণ বদ্ধমূল ধারণাকেই আবার সংশোধন করিতে হইল। একদিন হঠাৎ একটি জৈব পদার্থকে জার্ম্মানীর এক মহাপণ্ডিত উলার (Wohler) সত্যসত্যই তৈয়ার করিয়া ফেলিলেন। প্রকৃতির আড়াল হইতে আর একটি রাসায়নিক সত্য মনুষ্যের হস্তগত হইল। এই উদ্ঘাটনের ফলে আজ মানুষের ভাণ্ডার জৈব রসায়নশাস্ত্র সম্পদে ভরপুর।

আজ আমাদের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি প্রাকৃতিক রহস্যময় বিজ্ঞানের সঙ্গে রীতিমত বুঝাপড়া আরম্ভ করিয়াছে, এবং ক্রমশঃ উক্ত ভাণ্ডার হইতে নূতন পদার্থ আহরণ করিয়া স্বহস্তে রসাগারে প্রস্তুতির ব্যবস্থা করিতেছে। প্রাকৃতিক জৈব ভাণ্ড হইতে বিশুদ্ধ পদার্থ আহরণ করা দুরূহ ব্যাপার এবং তাহাদিগকে স্বহস্তে রূপায়িত করা ততোধিক কঠিন। কিন্তু মানুষ এদিকে দিন দিন অধিকতর সফলকাম হইতেছে, এমন কি প্রকৃতিজাত পদার্থ হইতে আরও সুন্দর মনোরম পদার্থ সৃষ্টি করিয়া মনুষ্যজাতির অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছে। এভাবে দেখা যায়, জৈব রসায়নীয় কৃপায় ২½ লক্ষ জৈবপদার্থ আজ আমাদের জন্য দাসত্ব করিতেছে। ইহারা সকলেই কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত।

অক্সেলিক এসিড (Oxalic acid) আছে টক পালং এ, টারটারিক এসিড (Tortoric acid) আছে আঙ্গুর ফলে, সাইট্রিক এসিড (Citric acid) আছে নেবুতে। ইহারা সকলেই ঝক্‌ঝকে দানাদার টক পদার্থ এবং স্বভাব রসাগারে প্রস্তুত। রাসায়নিকও উহাদিগকে স্বহস্তে তৈয়ার করিতে সফলকাম হইয়াছেন। আবার রসুন বা পিঁয়াজে এলাইল সালফাইড (Allyl sulphide) নামে একটি বিশুদ্ধ রাসায়নিক পদার্থ বর্ত্তমান, কালো সরিষার তৈলে এলাইল আইসোথাওযায়ানেট (Allyl isothougoant) নামে ঐরূপ একটি পদার্থ আছে। খয়েরের মধ্যে কেটিচল (Catichol) নামে অপর একটি অতি পরিচিত রাসায়নিক পদার্থ বর্ত্তমান। এবং চা এর মধ্যে বিখ্যাত কেফিন (Caffine) বস্তুটা বাস করে। উহারা সকলেই যাহার যাহার মূল উদ্ভিদ পদার্থের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্যকরী উপাদান (Active principle) এবং ইহাদিগকেও নিপুণ মানুষ রসায়নী গবেষণাগারে প্রচুর প্রস্তুতির ব্যবস্থা করিয়াছেন।

এই যে প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম প্রস্তুতির ব্যবস্থা ইহাদের মধ্যে আমরা দ্বিবিধ বিচক্ষণ রসায়নীয় পরিচয় পাইতেছি। প্রথমটীর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় নাই। তিনি কোন সংকেতে এরূপ গঠন ব্যাপার সম্পাদন করেন কেহই জানিতে পারি নাই। কিন্তু অজানিত ঐ ব্যবস্থা যে অতি চমৎকার তাহাতে আর ভুল নাই। অপক্ক আপেল ফলে যে ম্যালিক এসিড (Malic acid) আছে তাহা কিরূপে ঐ ফলের মধ্যে রূপ পাইল কেহই জানে না। ঐ ফলটী কিন্তু আমাদিগের মনোহরণ করে। সঙ্গে সঙ্গে গোপন হস্তের বাহাদুরীকে আমাদের স্বতই তারিফ করিতে হয়। তাঁহার প্রস্তুতির ব্যাপারে ফ্লাস্ক ইত্যাদি যন্ত্রপাতি লাগে না। তাপমান যন্ত্র বা চাপযন্ত্র (Barometer) তাহার কারখানায় দৃষ্ট হয় না। পরিস্রাবণ, উর্দ্ধপাতন, কলাঙ্গণ প্রভৃতি পদ্ধতির নিশ্চয়ই তাহার কোন ব্যবস্থা আছে। মানুষ তাহার সন্ধান

পায় নাই। অতি ধীর, অতি স্থির তাঁহার বিধি-ব্যবস্থা। মানুষ রসায়নী একবার যাহা প্রস্তুত করেন তাহার প্রস্তুতির পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া দ্বিতীয় মানুষের তাহা প্রস্তুত করিতে মোটেই বেগ পাইতে হয় না। একবার খোঁজ পাইলে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রসায়নী উহাকে প্রস্তুত করেন। উলার (Wohler), উইলিয়ামসন (Williamson), ফিটিগ (Fittig), ফ্রিডেল (Fridel), ক্রাফ্ট (Craft), কেকুলী (Kekule), ফিশার (Fischer) প্রমুখ মনীষিগণ এক একটি ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের আবিষ্কার বা প্রস্তুতির বিষয়বস্তু দুর্ব্বোধ্য বা অননুকরণীয় নয়। আজও তাঁহাদের পথ ধরিয়া যে কর্ম্মধারা চলিয়াছে তাহাতে সফলতারই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু স্বভাববিজ্ঞানীর কর্ম্মপদ্ধতিকে কি কেহ অনুকরণ করিতে পারিয়াছেন? গ্লিসারিণ (glycerine) যে উদ্ভিদ তৈলে বর্ত্তমান, পিরিডিন (Pyridine) যে হাড়তৈলে আছে, এলিজারিন (Alizarin) যে ম্যাডার শিকরে পাওয়া যায় এবং নীলবর্ণ যে নীল চারাগাছে প্রস্তুত হয়, এ সমস্ত তত্ত্বকথা আমরা বহুদিন যাবৎ অবগত হইয়াও ঐ সহজ সরল প্রাকৃতিক পদ্ধতিকে আয়ত্তাধীনে আনিতে পারি নাই। অবশ্য নিজস্ব পদ্ধতিতে উহাদের রসশালায় প্রস্তুতির ব্যবস্থা হইয়াছে। মনে হয় যেন এই দ্বিবিধ বিজ্ঞানীর মধ্যে একটা প্রকাণ্ড সীমাহীন অবকাশ পড়িয়া আছে। এই অবকাশকে পরিপূর্ণ করাই মানুষের একমাত্র সাধনা। অবি-শ্বাসীর কর্ম্মধারায় সে যোগসূত্র স্থাপিত হইবে না। একান্ত নির্ভর, একান্ত সাধনা, ও সত্য, প্রেম, পবিত্রতাই সে পথের আলো প্রজ্বালিত করিবে।

পরম করুণা

শ্রীপ্রীতিময়ী কর, ভারতী

কত না রকমে করুণা তোমার
মাগিয়াছি বারে বারে,
তপ্ত জীবনে লভিতে শান্তি,
আলোক অন্ধকারে।
বিরাম বিহীন আনন্দ কেবল
যাচিয়া যাচিয়া হ'য়েছি বিফল,
ঘোর দুর্দ্দিনে বৃথা সংশয়ে
মজায়েছি আপনারে।
অলক্ষ্যচারী বন্ধু হে মম,
দেখা হ'ল তব সনে,
জীবন শেষের আধো আঁধারের
শুভ সন্ধিক্ষণে।
চিনিয়াছি তব পরম ছলনা,
দহিয়া দহিয়া খাঁটি কর সোনা,
অশুভ পরশে প্রেম-ইঙ্গিত
আজি বুঝিয়াছি তায়,
তোমার শ্রেষ্ঠ করুণা ব্যথার
অনল-পরীক্ষায়।

ভারতীয় শাস্ত্র ও সনাতনধর্ম্ম *

অধ্যাপক শ্রীঅক্ষয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কোন জাতি দীর্ঘকাল পরাধীনতার লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিলে তাহার জীবনের সকল বিভাগেই দুর্গতির লক্ষণ প্রকাশ পায়। কিন্তু তাহার সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় দুর্গতি হয় এই যে, সে নিজস্ব কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে আস্থা হারাইয়া ফেলে, নিজের সাধনলব্ধ সমস্ত সম্পৎকে অবজ্ঞা ও উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিতে থাকে, আপনার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের গৌরববোধ তাহার অন্তর হইতে তিরোহিত হয়, সে তাহার স্বকীয় সত্তার প্রতি উদাসীন হইয়া পরকীয় সত্তায় সত্তাবান্ থাকিতে, পরানুগ্রহে জীবন ধারণ করিতে ও পরানুকরণে ভদ্র সাজিতে অধিকতর গৌরব অনুভব করে। এই দুর্গতি যখন চরমসীমায় উপনীত হয়, তখনই জাতির মৃত্যু। এইরূপে মানবজগতে বহু জাতির মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছে, বহু উন্নত কৃষ্টিসম্পন্ন সুসভ্য জাতি অতীত ইতিহাসের বিষয় হইয়া রহিয়াছে। সেই সকল জাতি যে সব দেশে বাস করিত, সে সব দেশে নূতন নূতন কৃষ্টি ও সংস্কৃতি লইয়া নূতন নূতন জাতির উদ্ভব হইয়াছে, নূতন নূতন ভাবধারা সে সব দেশে প্রবাহিত হইয়াছে। পুরাতন জাতিসমূহের বংশধরেরা হয় তো এই সকল নূতন জাতির মধ্যে এখনো বাঁচিয়া আছে। কিন্তু তাহারা তাহাদের বংশের মর্য্যাদা ধরিয়া রাখিতে পারে নাই, পূর্ব্বপুরুষদের বিশিষ্ট সাধনসম্পদের উত্তরাধিকারীরূপে আপনাদের মর্য্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিতে সমর্থ হয় নাই। তাহারা নিজেদের বৈশিষ্ট্য হারাইয়া নূতন জাতির মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে। যে জাতি কোন বিশিষ্ট আদর্শ ও সাধনধারার জীবন্ত বিগ্রহরূপে জগতে আবির্ভূত হয়,—সে জাতির এইরূপ মৃত্যু বিশ্বমানবসমাজের পক্ষেই একটা শোচনীয় ক্ষতি।

এই জগতে প্রত্যেক জাতির এক একটি বিশিষ্ট প্রাণ আছে, বিশিষ্ট জীবনীশক্তি আছে। জাতির প্রাণ তাহার কৃষ্টি ও সংস্কৃতির মধ্যে। জাতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতি যতদিন জীবন্ত, যতদিন জাতির নিজস্ব কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ধারা জাতির অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রত্যেক শ্রেণী, প্রত্যেক সমাজ ও সম্প্রদায়ের সাধনার ভিতর দিয়া স্ববেগে বিচিত্ররূপে তরঙ্গায়িত হইয়া প্রবহমাণ থাকে,—ততদিনই জাতি প্রাণবান্, ততদিনই জাতির জীবনীশক্তি অক্ষুন্ন বুঝিতে হইবে। একই জাতির মধ্যে অসংখ্য ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে এবং পরিমিত কাল জীবনধারণ করিয়া মানবলীলা সংবরণ করে। একই জাতির মধ্যে বহুসংখ্যক শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়। এই সব ব্যক্তি, শ্রেণী ও সম্প্রদায়কে একসূত্রে গ্রথিত করিয়া রাখে, এক আদর্শে অনুপ্রাণিত করে, এক মহাপ্রাণ দ্বারা সঞ্জীবিত করিয়া রাখে, সমগ্র জাতির জীবন্ত কৃষ্টি ও সংস্কৃতি, সমগ্র জাতির অন্তর্জ্জীবনে ও বহির্জ্জীবনে ক্রিয়াশীল এক সুমহান্ আদর্শ ও বেগবতী সাধনধারা। জাতি যদি নিজস্ব আদর্শ ও সাধনধারা হারাইয়া ফেলে, তবে জাতি প্রাণহীন হইয়া নামমাত্রে পর্য্যবসিত হয়, ব্যক্তি, শ্রেণী ও সম্প্রদায়সমূহের ঐক্যসূত্র ছিন্নভিন্ন হয়,—তাহার ফলে জাতির এই সব অবয়বের মধ্যে ভেদ, বিসম্বাদ,

* কিশোরগঞ্জ শাস্ত্রানুশীলন সভার বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ।

কলহ ও সংঘর্ষ বিকটভাবে আত্মপ্রকাশ করে এবং প্রত্যেকেই তেজোবীর্য্যহীন, ঔদার্য্যবিহীন, অবসাদ-গ্রস্ত, অসাড় হইয়া পড়ে। জাতি তখন আর এক জাতি থাকে না, কতকগুলি পরস্পরপ্রতিদ্বন্দ্বী শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের সমষ্টিমাত্র হইয়া দাঁড়ায়, এবং তাহাদিগকে সংযত ও ঐক্যবদ্ধ রাখিবার জন্য একটা প্রবলতর বিজাতীয় শক্তির কঠোর দণ্ড আবশ্যক হয়। কালক্রমে সেই প্রবলতর শাসকজাতির মধ্যে তাহাদের সত্তা বিলুপ্ত হইয়া যায়।

অতএব যাহারা জাতিকে একটি শক্তিশালী জীবন্ত অখণ্ড জাতিরূপে বাঁচাইয়া রাখিতে এবং বিশ্বমানব সমাজে সমুন্নত আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমুৎসুক, জাতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পুনর্জ্জাগরণের দিকে বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করা এবং জাতীয় জীবনের সকল বিভাগকে জাতীয় প্রাণের আদর্শানু-সারে সুনিয়ন্ত্রিত করিতে প্রয়াসী হওয়া তাহাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক। বিশেষতঃ আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বিশ্বমানবের স্রষ্টা, নিয়ন্তা ও ভাগ্যবিধাতা ভারতীয় জাতির প্রাণটিকে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছেন, যাহাতে মানব-সমাজের সকল জাতির কল্যাণের জন্যই ভারতের ভারতীয় রূপে চিরকাল বাঁচিয়া থাকা আবশ্যক,—ভারতের নিজস্ব সনাতনী কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ধারাটি বিশ্বের মধ্যে নিয়ত প্রবহমাণ রাখা আবশ্যক। ভগবান নিজেই সেরূপ বিধান করিয়া রাখিয়াছেন। সেই হেতু স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতের বুকের উপর বিজাতীয় আক্রমণ এবং অন্তর্ব্বিপ্লব বহুবার বহু-প্রকার ভীষণ ও বীভৎস অবস্থা সৃষ্টি করিলেও এবং ভারতের কৃষ্টির উপর বাহির হইতে ও ভিতর হইতে পুনঃ পুনঃ নানা প্রকার আঘাতের পর আঘাত পতিত হইলেও, ভারতের প্রাণশক্তি কখনো পরাজয় স্বীকার করে নাই, ভারতের সনাতন সাধনধারা কখনো প্রবাহহীন হয় নাই, ভারতের ভারতত্ব কখনো মিশর, বাবিলোন, গ্রীস, রোম প্রভৃতির ন্যায় অতীত ইতিহাসের কোঠায় কোণঠাসা হইয়া থাকিতে রাজি হয় নাই। বরং প্রত্যেক আক্রমণ ও প্রত্যেক বিপ্লবের শেষে ভারত-ভারতী সেই সব আক্রমণকারী ও বিপ্লবকারীদিগকেই বাহন করিয়া বিজয় যাত্রায় বাহির হইয়াছে, এবং আক্রমণকারী ও বিপ্লবকারীদের মধ্যে যাহা কিছু সুন্দর উজ্জ্বল মূল্যবান স্থায়ী সম্পদ্ পাওয়া গিয়াছে, তাহাও নিজের অঙ্গাভরণ করিয়া লইতে ও নিজের সম্পদের সহিত মিলাইয়া নিজস্ব করিয়া লইতে কুণ্ঠিত বা অসমর্থ হয় নাই। এইরূপে ভারতীয় কৃষ্টির অধিষ্ঠাত্রী দেবী মা সরস্বতী সনাতনী হইয়াও চিরনবীনা রহিয়াছেন, আঘাতের পর আঘাত পাইয়াও অক্ষতদেহা রহিয়াছেন, সর্ব্বপ্রকার বিপর্য্যয়ের মধ্যে যুগে যুগে আপনার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পুষ্টিসাধন ও শোভাবর্দ্ধন করিয়াছেন। দেবী সরস্বতী তাঁহার সনাতন বীণাযন্ত্রের সঙ্গীতধারার মধ্যে ভারতের প্রাণটিকে ধরিয়া রাখিয়াছেন। যুগে যুগে ইহার মধ্যে কত নূতন নূতন সুর, নূতন নূতন রাগরাগিণীর ঝঙ্কার উঠিয়াছে, উঠিতেছে ও উঠিবে। ইহার তার কখনো ছিন্ন হয় নাই ও হইবে না। ইহার পুরাতনত্ব ও নূতনত্ব চিরদিনই অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে ও রহিবে। ইহারই মধ্যে ভারতের জাতীয়তার অমরত্বের বীজ নিহিত। যে জাতির কৃষ্টি কোন একটি বিশেষ যুগের বিশেষ প্রাকৃতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও আর্থিক অবস্থার উপযোগী,—যুগপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে—প্রাকৃতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও আর্থিক অবস্থার বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে—সে জাতির আয়ু শেষ হইয়া আসে,—এবং তাহার শ্মশানের উপর নূতন জাতির অভ্যুদয় হয়। ভারতীয় কৃষ্টির বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা কোন যুগবিশেষের অবস্থাবিশেষের মধ্যে আত্মরক্ষার ও আত্মপ্রসারের উপযোগী নয়,—যুগান্তর বা কল্পান্তরের সঙ্গে ভারত-ভারতী বার্দ্ধক্য ও মুমূর্ষুত্ব প্রাপ্ত হয় না, প্রত্যেক যুগেই সে যুগপ্রয়োজনানুরূপ বাহ্যিক আকৃতি প্রকৃতি ধারণ

করিয়া, নূতন নূতন বেশভূষায় অলঙ্কৃত হইয়া নিজের অক্ষীণ জীবন ও অক্ষত যৌবনের পরিচয় প্রদান করে। কাজেই কোনকালেই একথা বলা চলে না যে, পুরাতন ভারতের মৃত্যু হইল এবং নবীন ভারতের জন্ম হইল। বহু বহু জাতির জন্ম ও মৃত্যুর সাক্ষী এই সনাতন ভারত আপনার অনন্যসাধারণ কৃষ্টির শক্তিতে চিরপুরাতন জাতি হইয়াও চিরনবীন জাতিরূপে বিশ্বমানবকে অমরত্বের সাধনা শিক্ষা দিবার জন্য উন্নতশির লইয়া বিরাজ করিতেছে।

ভারতীয় শাস্ত্রসমূহ এই অজর অমর সনাতন চিরনবীন ভারতীয় কৃষ্টির ভাষাময় বিগ্রহস্বরূপ। দেবী সরস্বতী শাস্ত্ররূপ দেহ পরিগ্রহ করিয়া ভারতসন্তানদের নিকট এবং বিশ্বমানবের নিকট যুগের পর যুগ আপনার মহিমা পরিব্যক্ত করিতেছেন, এবং বিশ্বের সকল জাতিকে অমর জীবন লাভের উপায় শিক্ষা দিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। শাস্ত্রানুশীলনের ভিতর দিয়াই দেবী সরস্বতীর স্বরূপ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, ভারতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির যথার্থ পরিচয় লাভ করা যায়, ভারতীয় প্রাণের—ভারতের অফুরন্ত জীবনীশক্তির অমৃতময় উৎসের—সন্ধান লাভ করা যায়, এবং মানবের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনকে অমৃতত্বে প্রতিষ্ঠিত করিবার সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি অবগত হওয়া যায়। ভারতের প্রাণ যেমন সনাতন,—সেই প্রাণ যে কৃষ্টি ও সংস্কৃতিরূপে আপনাকে অভিব্যক্ত করিয়াছে তাহাও তেমনি সনাতন, আবার সেই কৃষ্টি ও সংস্কৃতি যে সব শাস্ত্ররূপে আপনাকে রূপায়িত করিয়াছে, তাহাও তেমনি সনাতন। শাস্ত্রের ভিতর দিয়া অনাদি কাল হইতে ভারতীয় প্রাণের অভিব্যক্তি হইতেছে। ভারতের যিনি সনাতন প্রাণ-পুরুষ, তিনিই বিশ্বের অন্তর্যামী প্রাণপুরুষ; তিনিই মানবসভ্যতাবিকাশের উষাকালে ভারতীয় ঋষিদের প্রাণে আত্মপ্রকাশ করিয়া বেদরূপে,—শব্দব্রহ্মরূপে,—মানবীয় সাধনার চিরন্তন আদর্শরূপে বাঙ্ময় বিগ্রহ গ্রহণ পূর্ব্বক জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তদবধি ভারতীয় ঋষি মুনি তপস্বীদের সাধনা অবলম্বনে এই বেদ-কল্পতরুর কত শাখা-প্রশাখা-উপশাখা বিস্তারলাভ করিয়াছে, কত বিচিত্র পত্র-পুষ্প-ফলরাজি ইহাদের শোভাসম্পদ্ বৃদ্ধি করিয়াছে, কত বিচিত্র লতা-পল্লব ইহাদিগকে আশ্রয় করিয়া পুষ্টিলাভ করিয়াছে,—কত ব্যাখ্যান-অনুব্যাখ্যান এই সকলের রহস্যোদ্‌ঘাটনে নিয়োজিত হইয়াছে,—কত দার্শনিক যুক্তিবিচার মানবীয় লৌকিক বুদ্ধিকে এই সকলের অন্তর্নিহিত সত্যের সহিত যুক্ত করিতে প্রয়াসী হইয়াছে, যুগে যুগে বিচিত্র পরিবর্ত্তনের মধ্যে মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনকে সেই সনাতন আদর্শের সত্যে সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য কত উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। এই সকলই ভারতীয় সাধনার ক্ষেত্রে শাস্ত্র নামে অভিহিত হইয়াছে। এই সব শাস্ত্র সেই সনাতন বেদের অবয়বীভূত হইয়া শুধু যে তাহার শোভাসম্পদ্ই বৰ্দ্ধিত করিয়াছে তাহা নহে, সকল যুগে তাহার নবীনত্ব রক্ষা করিয়াছে, সনাতনকে চিরনবীনরূপে লোক-সমাজে পরিচিত করিয়াছে, এবং চিরকাল নবাগত নরনারীদের জীবনধারার উপর এই বেদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। বেদের প্রাণপুরুষ, ভারতীয় কৃষ্টির প্রাণপুরুষ,—দেবী সরস্বতীর আত্মাপুরুষ—মানবাত্মার চিরন্তন প্রয়োজন ও মানবের দেহ মন বুদ্ধি হৃদয়ের দেশকালাবস্থানুযায়ী নূতন নূতন প্রয়োজন অনুসারে এই সব বিচিত্রভাবসমন্বিত শাস্ত্ররাজির ভিতর দিয়া নব নব রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। এই সকল শাস্ত্রের বাহ্যিক আকৃতি-প্রকৃতির মধ্যে নানারূপ আপাতবিরোধ দৃষ্ট হইলেও তাহারা একই প্রাণ দ্বারা সঞ্জীবিত, তাহাদের মধ্যে একই প্রাণের অভিব্যক্তি, একই প্রাণের মহতী বাণী তাহারা বিচিত্র ভাষায়, বিচিত্র

প্রণালীতে, বিচিত্র ভাবাবলম্বনে, বিচিত্র প্রয়োজন সাধনের উপযোগী আকারে প্রকাশ করিয়াছে। এই সব শাস্ত্র যথাযথ ভাবে অনুশীলিত হইলে, বেদের প্রাণ, ভারতের প্রাণ, বিশ্বের প্রাণ ও নিজের প্রাণের যথার্থ পরিচয় লাভ হয়, ইহাদের বাহ্যাবয়বসমূহের মধ্যে নানাপ্রকার ভেদ বৈষম্য সত্ত্বেও আভ্যন্তরীণ ঐক্য অনুভূতিগোচর হয়।

শাস্ত্র কথাটি আমরা প্রায়শঃ একটি সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করি। শাস্ত্র বলিলেই আমরা বুঝি ধর্ম্মশাস্ত্র, এবং ধর্ম্মশাস্ত্র বলিলেই বুঝি একটি বিশেষ জাতীয় বিধিনিষেধাত্মক গ্রন্থ, যাহার সাহায্যে আমরা আমাদের ঐহিক জীবনকে সুশাসিত করিয়া পারত্রিক জীবনের কল্যাণসাধন করিতে পারি। মৃত্যুর পরে আমাদের কী গতি হইবে, সেই চিন্তাতেই যেন আমরা শাস্ত্রানুশীলন আবশ্যক মনে করি। মৃত্যুর পরে নরকে না পড়িয়া যাহাতে স্বর্গে উঠিতে পারি, পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর অধীন হইয়া সংসার-দুঃখ ভোগ করিতে না হয়, মোক্ষলাভ করিয়া কিংবা নিত্যবৈকুণ্ঠ বা নিত্যকৈলাসে গিয়া অনন্ত পরমানন্দ সম্ভোগ করিতে পারি, কেবলমাত্র তদুদ্দেশ্যেই যেন শাস্ত্রের অধীনতা স্বীকার ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের আবশ্যকতা। এক্ষেত্রে শাস্ত্র ও ধর্ম্ম দুইটি কথাই ঐকদেশিক অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। আমরা বর্ত্তমান যুগেই যে এরূপ অর্থে ব্যবহার করি,—এরূপ দৃষ্টিতে শাস্ত্র ও ধর্ম্মকে বিচার করি, তাহা নহে। অনেক প্রাচীন আচার্য্যও তাহাই করিয়াছেন। কিন্তু ইহা দৃষ্টিসংকোচনেরই নিদর্শন। মূলতঃ ধর্ম্মের অর্থ শুধু পারলৌকিক বা আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম নহে, শাস্ত্রের অর্থও শুধু স্বর্গনরক, পরকাল আত্মা, পরমেশ্বর প্রভৃতি বিষয়ক শাস্ত্র নহে। মানবজীবনের দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক, ঐহিক ও পারত্রিক, ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত, সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্য যত প্রকার সুনিয়ত সাধনা আবশ্যক, সবই ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত, এবং এই সকল সাধনার জন্য সার্ব্বদৈশিক, সার্ব্বকালিক ও বিশেষ বিশেষ দেশকালাবস্থানুযায়ী যত প্রকার বিধিনিষেধ, যত প্রকার বিচার-আচার আবশ্যক, সবই শাস্ত্রের বিষয়। বস্তুতঃ মানবীয় কৃষ্টির সকল বিভাগের সুনিয়ন্ত্রণের জন্যই অনুশাসন আবশ্যক, এবং সেই অনুশাসনের জন্যই শাস্ত্র। এই হেতু ভারতীয় কৃষ্টির ও সংস্কৃতির প্রত্যেক বিভাগের জন্যই শাস্ত্রের আবির্ভাব হইয়াছে। যে কোন বিষয়ের জ্ঞান ও কর্ম্ম সুনিয়ন্ত্রিত হইলেই শাস্ত্রীয় রূপ পরিগ্রহ করে।

ভারতের জাতীয় উদ্বোধনের যাহারা পরম শত্রু, ভারতের জাতীয় কৃষ্টিকে হেয় প্রতিপন্ন করিয়া ইহার বিনাশ সাধনই যাহাদের স্বার্থসিদ্ধির পক্ষে আবশ্যক,—তাহারাই ঘোষণা করিয়া থাকে যে, ভারতের সাধনা ও সভ্যতা শুধু পরকাল লইয়াই ব্যস্ত, ইহকাল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন, ভারতের শাস্ত্র ভারতের নরনারীকে মরিতেই শিক্ষা দেয়,—বাঁচিতে শিক্ষা দেয় না। ভারতের জ্ঞানবিজ্ঞান জগৎকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিয়া মহাশ্মশানকেই আদর্শরূপে উপস্থিত করে, জগতের যথাযথ পরিচয় লাভের জন্য এবং জাগতিক শক্তিসমূহকে আয়ত্ত করিয়া মানবীয় প্রয়োজন সাধনের জন্য ভারতবাসীকে শিক্ষা দান করে না, ইত্যাদি। ভারতের আত্মবিস্মৃত শাস্ত্রানভিজ্ঞ সন্তানসন্ততিগণ সেই সকল প্রবঞ্চনাবাক্যই সত্য বলিয়া গ্রহণপূর্ব্বক বাঁচিয়া থাকিবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া আধুনিক বিদেশীদের শিষ্যত্বলাভের জন্য ব্যাকুল হয়। তাহারা বিনা অনুসন্ধানেই মানিয়া লয় যে, ভারতে শুধু মরণের মন্ত্রই আছে, বাঁচিবার মন্ত্র নাই,—ত্যাগের মন্ত্রই আছে, শক্তির মন্ত্র নাই, জীবন-সংগ্রামে পরাজয়ের মন্ত্রই আছে,—বিজয়ের মন্ত্র নাই,—অতএব ইহলোকে বাঁচিতে হইলে,—শক্তিশালী হইতে

হইলে, বিজয়লাভ করিতে হইলে, পাশ্চাত্যকেই গুরুপদে বরণ করিতে হইবে। কিন্তু এ কথা তাহারা বোঝে না যে, নিজের জাতীয় প্রাণশক্তিকে জাগ্রত করিতে না পারিলে পরকীয়া বিদ্যা আয়ত্ত করাও সম্ভব হয় না, নিজের বংশগৌরব খ্যাপন করিতে না পারিলে গুরুর কাছেও সমাদর ও সুশিক্ষা লাভ করা যায় না,—নিজের জাতীয় যোগ্যতা প্রতিপাদন করিতে না পারিলে বিজাতীয় গুরুগণ তাহাদের স্বার্থসিদ্ধির মানসে আগন্তুক শিক্ষার্থীকে চিরকাল অযোগ্য নাবালক পদসেবারত রাখিবারই ব্যবস্থা করে। আধুনিক পুরুষকারসম্পন্ন বিভিন্ন জাতির কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হইয়া তাহাদের সাধনার প্রণালী ও কৌশল আয়ত্ত করিবার জন্য প্রযত্নশীল হওয়া আবশ্যক, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাতে সফলকাম হইতে হইলে নিজের ঘরের পূর্ব্বপুরুষসঞ্চিত সম্পদের সন্ধান তৎপূর্ব্বেই করিয়া লওয়া আবশ্যক। নিজের জাতিগত সাধনায় নিষ্ঠাবান থাকিয়া যে জাতি পরের সাধনা আয়ত্ত করিতে ব্রতী হয়, সেই যথোচিত সাফল্যলাভ করে। জাপান ইহার দৃষ্টান্ত।

স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতের শাস্ত্রসেবী ঋষিমুনিগণ কতপ্রকার বিদ্যার অনুশীলন করিতেন, তাহার একটি নিদর্শন ছান্দোগ্যোপনিষদ্ হইতে এখানে উপস্থিত করিতেছি। নারদ পরাবিদ্যা লাভের জন্য সনৎকুমারের নিকট উপনীত হইলেন। সনৎকুমার নারদকে বলিলেন, তুমি ইতঃপূর্ব্বে যে সব বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছ, তাহা আমাকে বল, তার পর তদতিরিক্ত যাহা কিছু তোমাকে শিখাইবার থাকে,—শিখাইব। 'স হোবাচ,—ঋগ্‌বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদম্ আথর্ব্বণং চতুর্থম্, ইতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং, পিত্র্যং, রাশিং, দৈবং, নিধিং, বাকোবাক্যম্, একায়নং দেববিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং নক্ষত্রবিদ্যাং সর্প-দেবজনবিদ্যাম্, এতদ্ ভগবঃ অধ্যেমি'—নারদ বলিলেন, হে ভগবন্, আমি ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব, এই চারি বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি, ইতিহাস ও পুরাণরূপ পঞ্চম বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি, পিতৃলোকসম্বন্ধীয় শাস্ত্র, গণিতশাস্ত্র, দৈবশক্তি-সমূহের প্রাতিকূল্য নিবারণ পূর্ব্বক আনুকূল্য সম্পাদনের শাস্ত্র, নিধিশাস্ত্র (অর্থাৎ ভূগর্ভনিহিত ধনরত্নাদি বিষয়ক ও তদুদ্ধার কৌশলবিজ্ঞাপক শাস্ত্র), বাকোবাক্য (অর্থাৎ দার্শনিক যুক্তিতর্কাদির নিয়ম সম্বন্ধীয় শাস্ত্র বা ন্যায়শাস্ত্র), একায়ন (অর্থাৎ লৌকিক ব্যবহার বিজ্ঞান বিষয়ক শাস্ত্র), দেবতত্ত্ব বিজ্ঞান, বেদবিদ্যার অঙ্গীভূত শিক্ষা-কল্প-ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গের বিজ্ঞান, ভূতবিদ্যা (অর্থাৎ পাঞ্চভৌতিক জড়জগৎসম্বন্ধীয় বিদ্যা), ক্ষত্রবিদ্যা (অর্থাৎ রাজনীতি, যুদ্ধবিদ্যাদিবিষয়ক শাস্ত্র), নক্ষত্রবিদ্যা (অর্থাৎ জ্যোতিষশাস্ত্র), সর্পবিদ্যা, দেবজনবিদ্যা (অর্থাৎ নৃত্যগীতাদিবিষয়ক গান্ধর্ব্ব শাস্ত্র),—এই সকলই আমি অধিগত করিয়াছি। এই প্রকার নানা শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াও নারদ তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই, মানবজীবনের চরম সমস্যার সমাধান করিতে সমর্থ হন নাই, আত্মবিৎ হইতে পারেন নাই, সুতরাং শোকমোহ অতিক্রম করিতে পারেন নাই। এই হেতু কাতরচিত্তে তিনি সনৎকুমারের ন্যায় শোকমুক্ত আত্মজ্ঞ ঋষির নিকট তত্ত্বজ্ঞানলাভের নিমিত্ত উপনীত হইয়াছেন। এই প্রসঙ্গটির মধ্যে ভারতীয় কৃষ্টির মর্ম্মকথাটির ইঙ্গিত রহিয়াছে; সে কথা পরে বলিব।

ভারতীয় মনীষিবৃন্দ ঐহিক অভ্যুদয় ও পারত্রিক কল্যাণের অনুকূল সকল বিষয়েই আপনাদের জ্ঞানশক্তি ও কর্ম্মশক্তি প্রয়োগ করিতেন, এবং প্রত্যেক বিষয় সম্বন্ধেই তাঁহারা শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন। যে কোন বিষয় বিধিবদ্ধ প্রণালীতে সম্যক্‌রূপে আলোচিত হইলেই, সেই আলোচনার

ফল শাস্ত্ররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, এবং পরবর্ত্তী শিক্ষার্থিগণ সেই শাস্ত্রের অনুশাসন অনুসারে আপনাদের বুদ্ধিবৃত্তির যথোচিত সদ্ব্যবহার করিয়া সেই বিষয়ে ব্যুৎপত্তিলাভ করে। আধুনিক পাশ্চাত্য জগতে science কথাটি যেরূপ ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত হয়, ভারতবর্ষে শাস্ত্র কথাটিও সেইরূপ ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক যাবতীয় তথ্যই শাস্ত্রের বা শাস্ত্রীয় অনুসন্ধানের বিষয়। ব্রহ্মবিজ্ঞান, আত্মবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, দেহ-বিজ্ঞান, শব্দবিজ্ঞান, রসবিজ্ঞান, রূপবিজ্ঞান, অর্থবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, কর্ম্মবিজ্ঞান, ভোগবিজ্ঞান, মোক্ষবিজ্ঞান,—যাহা কিছু সুশৃঙ্খল বিধিবদ্ধ প্রণালীতে কুসংস্কারবিহীন সুসংযতচিত্তে সম্যক্‌রূপে আলোচনা করা হয়, তাহাই শাস্ত্রানুশীলন। মোক্ষশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্রই শুধু শাস্ত্রপদবাচ্য নয়, অর্থশাস্ত্র, কামশাস্ত্র, রসায়নশাস্ত্র, ব্যবহারশাস্ত্র, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, জ্যোতিষ, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, কলাবিদ্যা, শিল্পবিদ্যা প্রভৃতি সবই ভারতীয় পরিভাষায় শাস্ত্রপদবাচ্য। ভারতে বিজাতীয় প্রভুত্ব ও বিজাতীয় সংস্কৃতির আমদানীর পূর্ব্বে ভারতীয় মনীষা কোন ক্ষেত্রেই পশ্চাৎপদ হয় নাই, মানবজীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত,—অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স সাধনের নিমিত্ত যত প্রকার জ্ঞান বিজ্ঞান আবশ্যক,—যত দিকে কর্ম্ম-শক্তির প্রসার আবশ্যক,—কোন দিকেই ভারতের চিন্তানায়ক ও কর্ম্মনায়কগণ উদাসীন থাকেন নাই। তাঁহারা শুধু পরকালের চিন্তাই করিয়াছেন,—ইহকাল সম্বন্ধে নিতান্ত উদাসীন ছিলেন,—এ কথা নিতান্তই ভ্রান্ত। আর, কোন সভ্য জাতির, কোন জীবন্ত জাতির পক্ষে ইহা সম্ভবও নয়। যে জাতির মধ্যে জীবনীশক্তি আছে,—নানাদিকেই তাহার সে শক্তির বিকাশ হয়। জীবনীশক্তির হ্রাস হইলেই সে কূপমণ্ডূক হইয়া পড়ে ও মরণের চিন্তায় আকুল হয়।

অনুশীলনের অভাবে ভারতের বহুবিধ বিদ্যা, বহুবিধ শাস্ত্র বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, অনেক শাস্ত্র এখনো কোন কোন প্রাচীন পুস্তকাগারে প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথির আকারে আত্মগোপন করিয়া আছে। বিশেষভাবে দেশের ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সম্প্রদায় যে সব শাস্ত্রের অনুশীলন করিত,—যে সব বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া দেশের শক্তি ও সম্পদ্ বৃদ্ধি করিত, নানা কারণে ক্ষাত্রশক্তি ও বৈশ্যশক্তি জীবন-সংগ্রামে পরাভূত হইয়া মৃতপ্রায় হওয়াতে, সেই সব শাস্ত্রও বিলুপ্ত হইয়াছে, সেই সব বিদ্যাও প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার বিষয় হইয়াছে। ভারতীয় অর্ণবপোতে ভারতীয় বৈশ্যগণ ভারতের কৃষিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রী লইয়া ভারতীয় সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জে ও অন্যান্য বহু দূরবর্ত্তী দেশে গমন করিত এবং বিনিময়ে বিদেশের সম্পদ্ আনিয়া স্বদেশের ঐশ্বর্য্য ও গৌরব বৃদ্ধি করিত। সেই সব শিল্প ও বাণিজ্যবিষয়ক শাস্ত্রের সাহিত্যিক নিদর্শন ব্যতীত অন্য কোনো নিদর্শনও এখন পাওয়া যায় না। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদিতে যে সব অস্ত্রবিদ্যার, সামরিক কৌশলের ও তৎসহযোগী অন্যান্য বিজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়, তদ্‌বিষয়ক সব শাস্ত্র বিলুপ্ত হওয়ায়, ঐ সব ইতিহাসকে এখন আমরা কাব্য ও উপন্যাসের কল্পনা ভিন্ন বাস্তব সত্য বলিয়াই ভাবিতে পারি না। এই সব ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের সামরিক ও বাণিজ্যিক অভিযান-সমূহকে বাহন করিয়া ভারতের ধর্ম্মশাস্ত্র, ভক্তিশাস্ত্র, মোক্ষশাস্ত্র ও ইতিহাস পুরাণাদি বহুদেশে বিজয়াভিযান করিয়াছে, বহু অসভ্য জাতিকে সভ্যতার স্তরে উন্নীত করিয়াছে। তাহাদের বংশধরদের নিকট এখন এসব কথা রূপকথা মাত্র। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের পুরাতন প্রস্তরমন্দিরসমূহের গঠন-

প্রণালীর মধ্যে এবং প্রস্তরনির্ম্মিত বিচিত্র মূর্ত্তির নির্ম্মাণকৌশলের মধ্যে যে সব শাস্ত্রীয় বিদ্যার সুস্পষ্ট লোকচমৎকারী নিদর্শন এখনো আমাদের চক্ষুর সম্মুখে বিদ্যমান, সে সব শাস্ত্রের উদ্ধার এখন ভরসার অতীত। চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যার শাস্ত্রসমূহ এখন কোথায়? আয়ুর্ব্বেদ ও জ্যোতিষ শাস্ত্রেরও সামান্য অংশমাত্রই পরম্পরাক্রমে অনুশীলনের ভিতর দিয়া আমাদের কাছে আসিয়াছে। মনুষ্যদেহের চিকিৎসা সম্বন্ধেও আরো কত শাস্ত্র ছিল, সাধু-সন্ন্যাসী, পাহাড়ী, জঙ্গলী প্রভৃতির মধ্যে কথঞ্চিৎ প্রচলিত, আপাত-অদ্ভুত নানাপ্রকার চিকিৎসা-প্রণালীর মধ্যে তাহার কিঞ্চিৎ নিদর্শন পাওয়া যায়। তদ্‌ব্যতীত, গো, অশ্ব, হস্তী, বৃষ প্রভৃতির চিকিৎসাও আয়ুর্ব্বেদের অন্তর্গত। কিন্তু সে সব শাস্ত্র এখন কোথায়? যে গণিত-জ্যোতিষ ও ফলিত-জ্যোতিষে ভারতীয় মনীষিগণ অলোকসামান্য প্রতিভা দেখাইয়াছিলেন, তাহার কতটুকু অংশ আমাদের পরিজ্ঞাত?

সর্ব্বপ্রকার দুর্য্যোগের মধ্যে, সর্ব্বপ্রকার বহিঃশত্রু ও অন্তঃশত্রুর পুনঃপুনঃ বিপ্লব-সৃষ্টির মধ্যে, দারিদ্র্যব্রতী স্বধর্ম্মনিষ্ঠ তপঃপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ এবং সংসারত্যাগী মোক্ষনিষ্ঠ জ্ঞানতাপস সাধু-সন্ন্যাসিগণ আচার্য্য-শিষ্য-পরম্পরা-ক্রমে স্মরণাতীত কাল হইতে যে সকল শাস্ত্র অনুশীলন করিয়া আসিতেছেন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়া আসিতেছেন, ভাষ্য, টীকা, বৃত্তি, বার্ত্তিক, কারিকা, সূত্র, ব্যাখ্যান, অনুব্যাখ্যান ও প্রকরণ-গ্রন্থ প্রভৃতি রচনা করিয়া যে সব শাস্ত্রের পুষ্টিসাধন করিয়া আসিতেছেন, সংঘ ও সম্প্রদায়ের ভিতর দিয়া রাজশক্তি-নিরপেক্ষভাবে সমাজের বিভিন্ন স্তরে যে সব শাস্ত্রের বহুল প্রচারের ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইয়াছেন, ভারতের অগণ্য শাস্ত্রের মধ্যে কেবল সেই সব শাস্ত্রই যুগযুগান্তর ধরিয়া কোনক্রমে আত্মরক্ষা ও জীবনধারণ করিয়া আছে এবং শুধু সেই সব শাস্ত্রই বর্ত্তমানে শাস্ত্রপদবী লাভ করিয়া সম্মানিত হইতেছে। সৌভাগ্যের কথা এই যে, ভারতের নিজস্ব কৃষ্টির প্রাণ এই সব শাস্ত্রের মধ্যেই রূপায়িত, এই সব শাস্ত্রই ভারতীয় কৃষ্টিকে অমরত্ব প্রদান করিয়াছে, এই সব শাস্ত্রের মহিমাতেই ভারতীয় কৃষ্টি ভারতের এই শোচনীয় পরাধীনতা ও দুর্গতির দিনেও বিজয়মদমত্ত, নিয়ত সংগ্রামরত, পশুবলদৃপ্ত, সভ্যতাভিমানী আধুনিক জাতিসমূহের সম্মুখে উন্নতশিরে ও প্রসারিতবক্ষে দণ্ডায়মান হইতে পারে এবং তাহাদের আন্তর্জ্জাতিক সর্ব্ববিধ জটিল ও কুটিল সমস্যার সরল ও সুন্দর সমাধান দিবার দাবী করিতে পারে। ভারতের ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রিক ও সামাজিক জীবনের কোলাহল হইতে দূরে থাকিয়া, অনশনে ও অর্দ্ধাশনে থাকিয়া, শীতাতপ-বাতবর্ষা সহ্য করিয়া, দেহের কঠোরতার মধ্যে হৃদয়ের কোমলতা, চিত্তের প্রসন্নতা, সঙ্কল্পের দৃঢ়তা ও বুদ্ধির নিরাবিলতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, ভারতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠতম অংশ নিরতিশয় নৈপুণ্যের সহিত সংরক্ষণ ও পরিপোষণ করিয়াছেন। এই হেতু ভারতীয় সমাজবিধানে ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসীর স্থান সকলের উপরে,—ধনকুবের ও রাজচক্রবর্ত্তী অপেক্ষাও তাঁহাদের সম্মান অধিক। সার্থকনামা ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসী ভারতীয় সাধনার জীবন্ত প্রতীক বলিয়া সকল শ্রেণীর প্রণম্য। ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসীর কর্দ্দমাক্ত চরণে মাথা লুটাইয়া ভারতের সর্ব্বশ্রেণীর নরনারী কার্য্যতঃ জগতের নিকটে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছে যে, ধনবল ও বাহুবল অপেক্ষা আত্মিক বল শ্রেষ্ঠ, বাহ্যসম্পদ্ অপেক্ষা আন্তর সম্পদ্ শ্রেষ্ঠ, ভোগ অপেক্ষা ত্যাগ শ্রেষ্ঠ, কর্ম্ম অপেক্ষাও জ্ঞান শ্রেষ্ঠ।

উপযুক্ত সাধকের অভাবে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিপর্য্যয়ে এই সব শাস্ত্রও যে মাঝে মাঝে মূর্চ্ছিত ও ম্রিয়মান না হইয়াছে, তাহা নহে। পুরাকালে

মুদ্রাযন্ত্র ছিল না,—একই গ্রন্থের হাজার হাজার প্রতিলিপি অল্পসময়ের মধ্যে প্রস্তুত হইবার কোন ব্যবস্থা ছিল না। শিক্ষা প্রধানতঃ মুখে মুখেই হইত। সুতরাং উপযুক্ত আচার্য্য ও উপযুক্ত শিষ্যের অভাব ঘটিলেই শাস্ত্র আত্মগোপন করিত, সমাজে তাহার প্রভাব বিস্তৃত হইত না। আবার, সমাজে যে সব শাস্ত্রের প্রভাব, সম্মান ও আদর না থাকে, সে সব শাস্ত্রের অনুশীলনের জন্যও লোকের আগ্রহ কম হয়, কাজেই ছাত্রেরও অভাব হয়, —শিক্ষকেরও অভাব হয়, সম্প্রদায়ের বিচ্ছেদ উপস্থিত হয়। ভারতের ভাগ্যক্রমে এরূপ অবস্থাও অনেকবার হইয়াছে। কিন্তু এইপ্রকার অবস্থার মধ্যেই আবার এমন সব অলোকসামান্য মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে,—যাঁহারা লুপ্তপ্রায় শাস্ত্রের উদ্ধার সাধন করিয়াছেন,—প্রতিভাবলে পুনরায় সমাজে তাহার প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন,—সম্প্রদায়ক্রমে তাহার অনুশীলনের ব্যবস্থা করিয়াছেন, জাতির কৃষ্টিগত বায়ুমণ্ডলের মধ্যে অভিনব আকারে সনাতন ভাবধারা প্রবাহিত করিয়াছেন। ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এই সব যুগপুরুষদের অবদান অনন্যসাধারণ। জনসাধারণ তাঁহাদের মধ্যে ঐশী শক্তির বিশেষ আবির্ভাব লক্ষ্য করিয়াছে, এবং তাঁহাদিগকে অবতার বলিয়া পূজা করিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে এ কথাটিও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসী এই সংসারে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য এবং নির্ব্বিঘ্নে স্বচ্ছন্দচিত্তে ধর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি ও মুক্তির সাধনা করিয়া দেশে মানবীয় কৃষ্টির উৎকর্ষ সম্পাদন করিবার জন্য ক্ষাত্রশক্তি ও বৈশ্যশক্তির আনুকূল্যের উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। ভারতীয় আদর্শের অনুগত ক্ষাত্রশক্তি ও বৈশ্যশক্তির অভাবে দেশের ধর্ম্মসাধনাও যে নিস্তেজ ও মলিন হইবে, ইহা নিতান্তই স্বাভাবিক। জাতীয় স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধি ব্যতীত ধর্ম্মের উৎকর্ষও সম্ভব নয়।

এই ভাবে যে সব শাস্ত্র ভারতে জীবন্ত আকারে সংরক্ষিত হইয়াছে,—শুধু সংরক্ষিত হয় নাই, অবতারপুরুষদের আবির্ভাবে যুগে যুগে নবজীবন লাভ করিয়াছে, এবং অসংখ্য জ্ঞানী ভক্ত ও কর্ম্মী সাধকদের তপস্যার ভিতর দিয়া নানাভাবে পরিপুষ্ট ও সংবর্দ্ধিত হইয়াছে,—সেই সকল শাস্ত্রই ভারতের ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া প্রখ্যাত। প্রাচীনতম কাল হইতে যত ধর্ম্মশাস্ত্র ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে আবির্ভূত হইয়াছে, সে সকলই যে বর্ত্তমান আছে, তাহা অবশ্যই নয়। প্রাচীন যুগের শাস্ত্রগ্রন্থে, এমন কি মধ্যযুগের ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের শাস্ত্রীয় গ্রন্থসমূহেও, এমন অনেক প্রামাণিক শাস্ত্রের উল্লেখ আছে ও তাহাদের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে,—সে সকল শাস্ত্রের অস্তিত্ব এখন লোকচক্ষুর অগোচর হইয়াছে। স্বয়ং মহারাজ মনুর স্বরচিত শাস্ত্র কবে অপ্রকট হইয়াছে, কে বলিবে? এখন ভৃগুকথিত মানব শাস্ত্রই মনু-প্রণীত শাস্ত্র বলিয়া গৃহীত। স্বয়ং ব্যাসদেব যে মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন, সেই মূলগ্রন্থ এখন কোথায়? তদীয় শিষ্য বৈশম্পায়ন সেই মহাভারতের অমৃতময়ী বাণী শুনাইয়াছিলেন পার্থ-পৌত্র জনমেজয়কে—তাহা শুনিয়াছিলেন মহামতি সূত। সেই সূতের পুত্র সৌতি জিজ্ঞাসু মুনিবৃন্দের নিকট সেই ভারত-কথার যে বর্ণনা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই আমাদের নিকটে ব্যাস-রচিত মহাভারত। আদি দার্শনিক সিদ্ধর্ষি কপিলের কিংবা তদীয় শিষ্য-প্রশিষ্য আসুরি পঞ্চশিখের মূল সাংখ্যসূত্র আবিষ্কার করা সুকঠিন ব্যাপার। বর্ত্তমানে অনেক পরবর্ত্তী কালের সূত্রসমূহই কপিলের সূত্র বলিয়া পরিচিত। দৃষ্টান্ত বাড়াইয়া লাভ নাই। ধর্ম্মজগতেরও বহু বহু প্রামাণিক গ্রন্থ যে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহাই শুধু এখানে উল্লেখযোগ্য। বৌদ্ধযুগের পরবর্ত্তী মধ্যযুগে আচার্য্য শঙ্কর, আচার্য্য রামানুজ, মধ্বাচার্য্য, মাধবাচার্য্য, সায়ণাচার্য্য, উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি শাস্ত্র-বিদ্‌গণও যে সব প্রামাণিক শাস্ত্রগ্রন্থ ও প্রকরণগ্রন্থ অবলম্বনে স্ব-স্ব গ্রন্থ রচনা করিয়া-

ছিলেন, সেই সকলের মধ্যেও অনেক এখন বিলুপ্ত। হেতু অন্বেষণ করিয়া কোনও লাভ নাই। অদৃষ্টবাদী নিজের অদৃষ্টকেই দোষ দেয়।

ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় অসংখ্য শাস্ত্রীয় গ্রন্থ কালচক্রের আবর্ত্তনে অপ্রকট হইলেও, ভারতে, সনাতন হিন্দু-সমাজে ধর্ম্মসাধনার ধারাও কখনো অবরুদ্ধ হয় নাই, শাস্ত্রানুশীলনের গতিও কখনো ব্যাহত হয় নাই, সনাতন শাস্ত্রের সংহিতাগ্রন্থ, প্রকরণগ্রন্থ, সূত্র-গ্রন্থ, ভাষ্য, টীকা, বৃত্তি, কারিকাপ্রভৃতির অভ্যুদয়ও কখনো সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয় নাই। যে সব গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহাদেরও ভাবধারা বিলুপ্ত হয় নাই। সচ্চিৎপ্রেমানন্দস্বরূপ ভগবানের শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ হৃদয় হইতে বিনিঃসৃত হইয়া ভারতীয় ঋষিমুনিতপস্বীদের সাধন-পূত, কুসংস্কার-বিনির্মুক্ত, নিত্যতত্ত্বানুসন্ধাননিরত, আবরণবিক্ষেপরহিত হৃদয়ে ঘনীভূত আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়া বিশ্বমানবের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণার্থে যে সব অমৃতময়ী ভাবধারা ভারতীয় সাধকসমাজে প্রবাহিত হইয়াছে, তাহাদের উপর মৃত্যুর ছায়াপাত অসম্ভব,—ভগবানেরই কল্যাণময় বিধানে মানবসমাজে তাহাদের বিলোপ অসম্ভব।

(আগামীবারে সমাপ্য)

গীতার ধর্ম

শ্রীহরিপদ ঘোষাল এম্-এ, বিদ্যাবিনোদ

মহাভারত একখানি সবজনপ্রিয় ধর্মকাব্য। উইলিয়ম্ হোমবোল্ট বলেছেন, শুধু সংস্কৃত সাহিত্যে নয়, পৃথিবীর যে কোন ভাষায় এর মত সুললিত ছন্দে সুলিখিত দার্শনিক কাব্য নাই। এই কাব্যের অন্তর্গত গীতা একাধারে দর্শন ধর্ম ও নীতিশাস্ত্র। হিন্দু মনের উপর এর প্রভাব অসীম। গীতার বাণী সহজ ও সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়ে বিশ্বজনের কাছে আদরণীয় হয়েছে। অর্থবান্ বেদোক্ত যাগযজ্ঞ ক্রিয়ার বিনিময়ে দেবতাদের কৃপা ক্রয় করে, দার্শনিকের সুসংস্কৃত মন জ্ঞানের ক্ষুরধার পথের যাত্রী কিন্তু গীতা রিক্ত ও নিঃস্ব মানুষের ভক্তির পথ উন্মুক্ত করে তার আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধনে সাহায্য করেছে।

যখন ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে কৌরব ও পাণ্ডবেরা যুদ্ধের জন্য সমবেত, যখন মহাবীর অর্জুন মহাহবে শত্রুরক্তপাতের জন্য প্রস্তুত, তখন এই জীবন-মরণের বেলাভূমিতে মনুষ্যদেহধারী ভগবান অমৃতনিস্যন্দী ভাষায় যে উচ্চ তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে কর্তব্যচ্যুত ও বিভ্রান্ত অর্জুনকে ক্ষত্রিয়োচিত কর্মে নিযুক্ত করেছিলেন তার ভাবগৌরবে ভারতীয় মন আলোকিত। অর্জুন ছিলেন পৃথিবীর ও পার্থিব বস্তুর চাপে অবদমিত সাধারণ মানুষ। যাঁর মন বায়ুর মত চঞ্চল অস্থির ও দোলায়মান, তাঁর চিত্তের স্থৈর্য ও একাগ্রতা থাকে না। যেমন ভাবে তাঁর নৈরাশ্যপূর্ণ হৃদয়ে ক্ষণস্থায়ী বিপদ, শূন্যতা, উদাসীনতা ও শ্মশান-বৈরাগ্য সৃষ্টি করে, যেমন ভাবে সাময়িক বিপদের হিমশীতল প্রলেপে বিশ্বপ্রপঞ্চের প্রকৃত নগ্নতা ও অসারতা ক্ষণকালের জন্য তাঁর চোখে ধরা দেয়, তেমন ভাবেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শোচনীয় হত্যাকাণ্ড জ্ঞানবৈরাগ্যহীন অর্জুনের মনে বিষাদের ছায়া বিস্তার করেছিল। অর্জুনের কাছে জীবনের

কোন মূল্য ছিল না। ন্যায় অন্যায় সত্যাসত্য বিচারে শক্তিহীন মূঢ় অর্জুন একটা বিরাট প্রলোভনের সম্মুখীন হয়েছিলেন, সন্দেহে দুঃখে তাঁর অন্তর্হৃদয় বিদীর্ণ জর্জরিত ও অস্থির। অমানিশার ঘন অন্ধকারে ভীত বালকের মত অর্জুন আলোকের জন্য রোরুদ্যমান।

শোকের তিক্ততা, দুঃখের তীব্রতা, সন্দেহের চাঞ্চল্য, বিষাদের উগ্রতা অপনীত হল, অজ্ঞানতার কৃষ্ণবর্ণ যবনিকা ধীরে ধীরে উত্তোলিত হল দার্শনিক বিশ্লেষণের কৌশলে। প্রভাতের অরুণালোকে রজনীর কুজ্ঝটিকা বিদূরিত হল। অর্জুন হলেন নূতন পথের যাত্রী। দেহ মন বা ইন্দ্রিয় মানুষের সার বস্তু নয়, মানুষের সাধনার শ্রেষ্ঠ ও পরম ধন আত্মা। কুরুক্ষেত্র মানবাত্মার নবজীবন লাভের ক্ষেত্র, কৌরবরা আত্মার অভিসারপথের কণ্টক। দুঃখদহন ও আত্মোৎসর্গের হোমানল অভিসারপথের আলো। নরদেহধারী ভগবানের বার্তা ধ্বনিত হল শোকসন্তপ্ত মোহাচ্ছন্ন আত্মবিস্মৃত অর্জুনের কর্ণকুহরে।

গীতার দার্শনিক কবি মনুষ্যচরিত্রে গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন। নানা ভাবের ঘাত প্রতিঘাতে দোলায়মান মানুষের হৃদয়, স্বার্থসংঘাতে বিচলিত মানুষের মন, মোহকালিমাগ্রস্ত মানুষের বিচারদৈন্য যে ভগবৎপ্রাপ্তির দুর্লঙ্ঘ্য অন্তরায়, এই সত্য গীতাকার সুনিপুণ নাট্যশিল্পীর তুলিকায় প্রথম অধ্যায়ে অঙ্কন করেছেন। সংসারের বিষয়বস্তু স্পষ্টতর হওয়ার সংগে নাটকীয় ভাব অন্তর্হিত হয়েছে। রণক্ষেত্রের অস্ত্র ঝন্ঝনার প্রতিধ্বনি অস্তমিত হল এবং আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠল নরনারায়ণের প্রতিচ্ছবি। যুদ্ধের রথ রূপান্তরিত হল গভীর চিন্তার নির্জন গুহায়, কোলাহলপূর্ণ রণক্ষেত্রের একটি কোণ পরিবর্তিত হল ভগবৎ উপাসনার পবিত্র মন্দিরে।

দ্বিতীয় দৃশ্যে গীতাকার দেখালেন যে মানুষ একটা বিরাট শক্তির আধার, কেবল সুখদুঃখ চেতনার দাস নয়। আমাদের হৃদয়ের মণিকোঠায় যে হিরণ্ময় জ্যোতিঃসম্পন্ন বিরাটের অধিষ্ঠান তাঁর বিকাশ ঘটে বাস্তব সাধনার ভিতর দিয়ে, ভাব সাধনার ভিতর দিয়ে নয়। বাস্তব সাধনা সমাজজীবনের, ভাব সাধনা ব্যক্তিজীবনের। জীবনকে জয় করতে হলে অশান্ত ও অশিবের দ্বৈতকে স্বীকার করে অদ্বৈতের উচ্চ চূড়ায় আরোহণ করতে হয়। কর্ম প্রেম ও জ্ঞানের স্পর্শে ক্ষুদ্র আমিত্বের অবসান হয়, বিরাট আমিত্বের, মহান আত্মার, স্পর্শ পেয়ে মানুষ অমৃতকে উপলব্ধি করে। শ্রীকৃষ্ণের অমৃত বাণী ভাব বিলাসী অর্জুনের মোহ দূর করে তাঁকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করেছিল, ভক্তি ও জ্ঞানের পথ উন্মুক্ত করে অর্জুনের ক্ষুদ্র আমিত্বের ভিতর বিরাটের, অদ্বৈতসাধনার পথ প্রদর্শন করেছিল।

গীতাকার শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন যে তিনি ব্রহ্ম। যে আত্মা মানুষের মধ্যে তিনিই পরমাত্মা। বামদেব বলেছিলেন, আমিই মনু—আমিই সূর্য। গীতা বলেছেন, বিষয়বাসনা হিংসা-দ্বেষ-ভয়যুক্ত মানুষ, জ্ঞানাগ্নিপরিশুদ্ধ মানুষ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়। এজন্য গীতায় কৃষ্ণ সসীমের ভিতর অসীম, রক্তমাংসের ও ইন্দ্রিয়ের আবরণে আবৃত ভগবান।

গীতার বাণী সার্বজনীন। গীতার শিক্ষা উদার ও অসাম্প্রদায়িক। গীতাকার উচ্চ ভাবের ভাবুক। তাঁর সুসংস্কৃত মনে ক্ষুদ্রতার লেশ নাই। কোন বিশেষ ধর্ম, কোন বিশেষ সম্প্রদায়, কোন বিশেষ দল তাঁর প্রিয় বা অপ্রিয় নয়। তিনি কোন ধর্মকে অবজ্ঞা করেননি, কোন মতকে অগ্রাহ্য করেননি। এইরূপ ব্যক্তিই হিন্দু ধর্মের মত উদার মতবাদ বিশ্লেষণের পক্ষে উপযুক্ত। চিন্তার গভীরতা, ভাবের গাম্ভীর্য, ভক্তির মাধুর্য, জ্ঞানের গৌরব গীতার সম্পদ। গীতায় উপনিষদের অসীম

ব্যঞ্জনাশক্তির অভাব কিন্তু ভক্তিরসাশ্রিত জ্ঞানের ঐশ্বর্য।

গীতাকার দেখলেন উপনিষদের নামরূপহীন অব্যক্ত নিরঙ্কুশ ব্রহ্ম সহজ মানুষের মর্মস্থল স্পর্শ করতে অসমর্থ, ন্যায় বিচার তর্কের কণ্টকাকীর্ণ অরণ্যে জনমন বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট। এজন্য তিনি ঔপনিষদিক ব্রহ্মজ্ঞানের ভিত্তির উপর কর্ম ও ভক্তির সৌধ রচনা করেছেন—উপনিষদের নীরস কঙ্কালে প্রাণ ও চেতনা সঞ্চার করে তাকে সরস মধুর হৃদ্য ও সাধারণ মানুষের উপভোগ্য করে তুলেছেন।

গীতা বৈদিক কর্মের প্রয়োজনীয়তা একেবারে অস্বীকার করেননি। বৈদিক ক্রিয়ানুষ্ঠান নিম্নস্তরের অধিকারীর পক্ষে বিহিত। তবে যারা বেদবাদরত তারা মূঢ়। বেদ ত্রৈগুণ্যবিষয়, এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নিস্ত্রৈগুণ্য হতে উপদেশ দিয়েছেন। ত্রিগুণাতীত হতে না পারলে মোক্ষ লাভ হয় না, কারণ মুক্তি একমাত্র জ্ঞানেই সম্ভব। উপনি গীতার দার্শনিক ভিত্তি। উপনিষদের উপাসনা গীতার ভক্তিবাদে পর্যবসিত। উপনিষদের মত গীতাও নিষ্কামকর্মের পক্ষপাতী। কর্মে বন্ধন সৃষ্টি করে, অথচ কর্ম অনুষ্ঠান না করে মানুষ এক মুহূর্তও জীবন ধারণ করতে সমর্থ নয়। যখন কর্ম করাই মানুষের স্বভাব, তখন এমন কর্ম করা চাই যাতে বন্ধন সৃষ্টি হয়ে জ্ঞানোদয়ের পথে বাধা সৃষ্টি না করে। এজন্য কর্মে নিষ্কামতা আনতে হবে। ভাগবতধর্ম গীতার প্রেরণা উৎস। মতসমন্বয়ের জন্যই গীতার সৃষ্টি। কোন বিষয়ে বৌদ্ধধর্মের অনুরূপ হলেও গীতায় বৌদ্ধধর্মের উল্লেখ নাই। 'নির্বাণ' শব্দটি একটিবার মাত্র ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু গীতা রচনার পূর্বেও এই শব্দটি পরিচিত ছিল। আদর্শ মানুষের বর্ণনায় গীতা ও বৌদ্ধধর্ম একমত। বুদ্ধ মধ্যপন্থী—জীবনে মধ্য পথ অবলম্বন করতে তিনি উপদেশ দিয়েছেন কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তিনি অতিমাত্র কঠোর-তার ব্যবস্থা করেছেন। গীতা কৃচ্ছ্রসাধনের নিন্দা করেছেন। কৃচ্ছ্রসাধন না করেও মোক্ষলাভ সম্ভব, একথা গীতা ঘোষণা করেছেন। কিন্তু এসকল সত্ত্বেও গীতা অতীতের সংগে সংশ্রব ছিন্ন করেননি। পৃথিবীর যে কোন আন্দোলন নূতন সৃষ্টির অবতারণা করলেও অতীতের সংগে তার যোগসূত্র ছিন্ন করতে চায়নি। লুথার চেয়েছিলেন অতীত কালের বাইবেল ধর্মে ফিরে যেতে—রেনেসাঁস চেয়েছিল প্রাচীনকালের গ্রীক ও লাটিন সাহিত্যে প্রেরণা লাভ করতে—ফ্রান্সের আদর্শবাদী বিপ্লবীরা চেয়েছিল অতীতের প্রাকৃত অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করতে। গীতা পূর্বসূরিদের অনুমোদিত পন্থা পরিত্যাগ করেননি। এজন্য ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের ভাগ্যে যে লাঞ্ছনা ঘটেছে গীতোক্ত ধর্মের ভাগ্যে তা ঘটেনি।

গার্বের মতে সাংখ্য-যোগের কাঠামোর উপর গীতার বেদান্তমত সংযোজিত হয়েছে। সুতরাং গীতায় বেদান্তমত দ্বিতীয় স্থান গ্রহণ করেছে। গার্বের এই মত ভ্রান্ত। সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি ও পুরুষের এবং গুণত্রয়ের বিশ্লেষণ, যোগশাস্ত্রোক্ত চিত্তবৃত্তি নিরোধের ব্যবস্থা, কর্মমীমাংসাপ্রতিপাদিত যাগযজ্ঞ এবং ঔপনিষদিক ব্রহ্মবিদ্যা ও জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্বস্বীকৃতি গীতোক্ত ধর্মের উদারতা বিশালতা ও সার্বজনীনতা প্রমাণিত করে, কোন একটি বিশেষ মতের প্রতি পক্ষপাতিতা প্রকাশ করে না। এই সকল মতবাদ দর্শনাকারে লিপিবদ্ধ না হলেও গুরুশিষ্যপরম্পরায় প্রাচীন কাল থেকেই চলে এসেছিল। নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিভিন্ন মতবাদের যতটুকু প্রয়োজন বিবেচনা করেছেন গীতাকার তা গ্রহণ করতে কার্পণ্য করেননি, ধর্মসম্প্রদায়নির্বিশেষে তার সদ্ব্যবহার করেছেন।

নানা রঙের সমবায়ে সূর্যালোক গঠিত, কোন একটি বিশেষ বর্ণ সূর্যের আলো নয়। উদারতার

মায়াকাঠিস্পর্শে গীতার কবি বিরুদ্ধ ধর্মের নানা উপাদানের ভিতর আত্মিক যোগসূত্রে স্থাপন করেছেন। এজন্য বিভিন্ন মতবাদ তর্ক বিচার বিতণ্ডার জালে শ্বাসরুদ্ধ মানুষ গীতোক্ত ধর্মের মুক্ত আকাশে সহজে বিচরণ করতে সমর্থ হয়, গীতারূপ প্রদীপ আধ্যাত্মিক পথের অন্ধকার দূর করে। একটি প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর মত গীতাকার তাঁহার গ্রন্থখানিকে একটি সম্পূর্ণ অখণ্ড দার্শনিক কাব্যে পরিণত করেছেন। জননীর মত স্নেহপরায়ণা গীতা কর্ম ভক্তি ও জ্ঞানের ত্রিবেণী সঙ্গম—সর্বধর্মসমন্বয়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। গীতা সুগীত হওয়া কর্তব্য, অধ্যাত্মকল্যাণের জন্য অন্য শাস্ত্রের প্রয়োজন নাই, এই একখানি গ্রন্থই যথেষ্ট। বস্তুতঃ গীতা একখানি নীতিগ্রন্থ। নীতিশাস্ত্রের যুগে গীতার জন্ম, সুতরাং যুগোচিত ধর্ম এর প্রধান উপাদান। গীতাকে যোগশাস্ত্রও বলা যায়। যোগের অর্থ সাধনা, সংযম—যে সাধনা বলে মানুষ নিজেকে এমনভাবে গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত করে যাতে সে কেন্দ্রচ্যুত না হয়ে অবিচলিতভাবে পৃথিবীর রূঢ়তা ও অবস্থাবিপর্যয়কে তুচ্ছ জ্ঞান করতে পারে। আবার যোগ উদ্দেশ্য, সাধন উপায়। উদ্দেশ্য ভগবৎপ্রাপ্তি। জীবনের সকল কর্ম, সকল চিন্তা ও ভাব এই এক উদ্দেশ্যে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হওয়া চাই। সমগ্র জীবন এক অখণ্ড ভগবৎসেবা। এজন্য গীতা যে যোগের কথা বলেছেন, তার ভিত্তি ব্রহ্মবিদ্যা, আত্মজ্ঞান। কারণ দার্শনিক ভিত্তিশূন্য নীতিশাস্ত্র বালুচরের উপর নির্মিত গৃহের মত অস্থায়ী অকেজো ও দুর্বল।

এই আত্মজ্ঞানে অর্জুনের চক্ষু থেকে অজ্ঞানতার যবনিকা উন্মোচিত হল। তিনি দেখলেন, এক আত্মা সমস্ত বিশ্বে—তিনিই বিশ্বপ্রকৃতির অধিষ্ঠান ও জীবন। এই এক মহান্ সত্য সকল বস্তুর প্রাণ। তিনিই গোলাপের নয়নভুলানো সুষমায় নিজের সুষমা, নীল নীরদমালার সৌন্দর্যে নিজের সৌন্দর্য, প্রবল বাত্যাক্ষুব্ধ ঊর্মিমালার শক্তিতে আপন শক্তি, সূর্য গ্রহ তারকার অপরূপ সমাবেশে আপন কৌশল বিস্তার করেছেন। এই মহান্ সত্যের সাক্ষাৎকার হলে আর্য ও অনার্যের, ইহুদী ও খৃষ্টানের, হিন্দু ও মুসলমানের, পৌত্তলিক ও জ্ঞানীর, জাতি ও ধর্মের সকল প্রভেদ ও বিভেদ দূর হয়ে যায়—ইনিই নানা রূপে ও নামে, নানা গন্ধে ও বর্ণে, নানা গানে ও ছন্দে প্রকাশিত হন। গীতার এই সমন্বয়বাদ গীতোক্ত ধর্মকে একটি সার্বজনীন ধর্মে পরিণত করেছে।

"এই দেহীর দেহে যেমন কৌমার, যৌবন, জরা আস্‌ছে, মরে গেলেও তেমনি একটি দেহ আসে অথবা পুনর্জ্জন্ম হয়। আমাদের শরীরের যেমন বৃদ্ধি, পূর্ণতা এবং হ্রাসরূপ নানা পরিবর্ত্তন আছে, দেহান্তর প্রাপ্ত হওয়াও তেমনি একটা। শাস্ত্র আরো বলে যে, এ কথা আমরা যোগের দ্বারা প্রত্যক্ষ জান্‌তে পারি।"

—গীতাতত্ত্ব

আদর্শ নারী
শ্রীশ্রীমা

শ্রীমতী বাণী দেবী

শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে কোন বিষয়ে আলোচনা করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম মনে পড়ে তাঁহার জগৎ-মনোহারিণী মাতৃরূপ। তাঁহার সম্বন্ধে অনেক দিকের অনেক আলোচনা করা যায়; বর্ত্তমান প্রবন্ধে শুধু তাঁহার মাতৃভাবেরই আলোচনা করিব। জগৎ আজ স্বার্থসংঘাতে জর্জ্জরিত। চতুর্দ্দিকে, অন্তরে বাহিরে মানবের দৈন্য, অভাব অনটনের হাহাকার ধ্বনি ভিন্ন আর কিছু শুনা যায় না, দুঃখদুর্গতির আর অন্ত নাই। এই সময় আমরা, দুঃখপ্রপীড়িত জগৎবাসী, তাঁহার শান্ত কল্যাণময়ী, সর্ব্বদুঃখহরা মাতৃভাব স্মরণ করিয়াই ধন্য হইব।

একবার তাঁহার এক ভক্ত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আচ্ছা মা, সব অবতারে দেখা যায় অবতারের শক্তি, তাঁহার দেহ থাকিতেই চলিয়া গিয়াছেন; আপনার ঠাকুরের প্রতি যে ভালবাসা, তাঁহার দেহ অবসানে আপনার শরীর এতদিন রহিল কিরূপে?" তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, 'হ্যাঁ মা, তা ত ঠিকই, ঠাকুরের দেহ অবসানে আমার থাকিবার কথা নহে, তবে কি জান মা, বোধ হয় ঠাকুরের মাতৃভাবটি এই শরীরের ভিতর দিয়া প্রকাশের ইচ্ছা, এই জন্যই এই দেহ এতদিন রহিয়াছে।" আমরাও একটু চিন্তা করিলে এই বিষয়টি খানিকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। বর্ত্তমানে জগতে এক মহাপ্রলয় ঘটিতেছে, এক শক্তির উত্থান অপর শক্তির পতন, নিত্য নব নব ভাব, নূতন আদর্শ, এক ভাবের সহিত অন্য বিপরীত ভাবের সংঘর্ষ ইত্যাদির একত্র সমাবেশ হইয়াছে; মানবপ্রাণ এত সংঘাতে বড়ই মুহ্যমান। এই অবস্থায় বাস্তবিক তাঁহার সদানন্দময়ী স্নেহমূর্ত্তি আমাদের প্রাণে বল সঞ্চার করিতেছে। ইহা ব্যতীত ভবিষ্যৎ জগতে এত হানাহানির মধ্যে নারীর স্থান কোথায়, ইহার সদুত্তরও আমরা তাঁহার জীবন-ধারার মধ্যেই পাই। নারীর শ্রেষ্ঠ বিকাশ তাঁহার মাতৃত্বে, সন্তানকল্যাণে সর্ব্বত্যাগী মাতৃরূপই নারী হৃদয়ের চরম অভিব্যক্তি। আমাদের সংসারে, মা আমাদের স্নেহ-পরায়ণা, সেবাপরায়ণা; নিজে শত দুঃখ বরণ করিয়া সন্তানকে রক্ষা করেন। ভাল মন্দ যাহাই ঘটুক সন্তানকে নিজের জীবনের সর্ব্বস্ব দিয়া রক্ষা করাই তাঁহার জীবনের চরম সার্থকতা। আমরা মা বলিতে ইহাই বুঝি এবং ইহাই দেখিয়া থাকি। আজকাল আবার নূতন কথা উঠিয়াছে, স্ত্রী জাতিকেও সংসারের বাহিরে আসিতে হইবে এবং অর্থকরী বিদ্যা অর্জ্জন করিতে হইবে, পুরুষের সমান অধিকারী হইতে হইবে—সতত পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলে চলিবে না। আমরাও, পরাধীনতার শতদুঃখে জর্জ্জরিত নারীকুল, ইহাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিতেছি এবং এই ভাবেই নিজ কন্যাগণকে শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিতেছি।

স্বাধীন দেশের নারী দেখি অতি তৎপরা—নিজেকে রক্ষা করিয়া, সন্তানকে দেশ কাল উপযোগী শিক্ষা দীক্ষা দিয়া, ঐহিক সুখ-সর্ব্বস্ব করিয়া সন্তানপালন বিষয়ে নিজেদের সার্থকম্মন্যা বোধ করিতেছেন, সুতরাং আমরা

মায়ের কোন রূপটি গ্রহণ করিব ইহাই প্রশ্ন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষে আমাদেরও দৃষ্টি আজ মলিন, বুদ্ধি বিব্রত, বুঝিতে পারি না আমাদের ঠিক আদর্শ কি? তাই আজ আমাদের শ্রীশ্রীমায়ের চরিত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। তিনি একদিকে শান্ত, সমাহিতা, নিজ গরিমায় সুপ্রতিষ্ঠিতা, সততমঙ্গলদায়িনী, বরাভয়রূপিণী, অপরদিকে গভীর আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্না, মহাতেজস্বিনী, কর্ত্তব্যে অবিচলিতা, নির্ভীক মহীয়সী নারীরূপে আমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মানা—ভারত ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে এই মাতৃরূপটি প্রসব করিয়াছে, জগতে এ যুগে ইহা তাহার শ্রেষ্ঠ দান, ইঁহাকে অনুসরণ করিলে সকলে ধন্য হইবে। ইনি সর্ব্বংসহা মঙ্গলবিধায়িনী জগদ্ধাত্রীরূপিণী আমাদের মা।

জগতে যত নারী যুগে যুগে পূজিতা হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে আদর্শ হিসাবে ভারতের নারীর আসনই সর্ব্বোচ্চে। বেদোক্ত ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণা গার্গী, মৈত্রেয়ীর তুলনা আজও মিলে নাই, সীতার মহিমা চির অম্লান। গোপা, বিষ্ণুপ্রিয়া স্বীয় মহিমায় আজও মহিমান্বিতা। বর্ত্তমান যুগের প্রয়োজনে অপর একটী মহীয়সী রমণীর উদয় হইয়াছে, যেখানে আমরা ঐ সব ভাবের একত্র সমাবেশ দেখিতে পাই—ইনি সতত লোকচক্ষুর অন্তরালে নিজেকে সামান্যা রমণীর মত প্রকাশ করিয়া অন্তরে মহাশক্তি ধারণ করিয়া গিয়াছেন। আবাল্য ব্রহ্মচারিণী, অতি কঠোর তপস্যাপরায়ণা মা নিজ কর্ত্তব্য অতি সুষ্ঠুরূপে, দৃঢ়তা সহাকারে, নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়া গিয়াছেন। তিনি বাহ্যতঃ সামান্য রমণী, অথচ এই বৃহৎ শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের নায়িকা। আমরা দেখিয়াছি মা ঘরের কাজে সামান্য রমণীর ন্যায় ব্যস্ত, নিজ আত্মীয় পরিজন লইয়া মহাবিব্রতা। 'রাধু রাধু'* করিয়া অস্থির, কিন্তু যদি আমরা একটু মনোনিবেশ সহকারে চিন্তা করিয়া দেখি তাহা হইলে দেখিতে পাইব তাঁহার মহৎ শক্তি, তীব্র তেজকে লোক চক্ষু হইতে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন এই সব উপলক্ষ দিয়া। নতুবা যে মা রাধুর সামান্য একটা খেয়াল পূরণ করিতে অতিমাত্র ব্যগ্র সেই তিনিই পরমুহূর্ত্তে কিরূপে আবার গভীর আধ্যাত্মিক সমস্যাসমূহের নিতান্ত সরল ভাষায় সমাধান করিয়া দিতেছেন।

আমরা যখনই শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণ দর্শন করিতে গিয়াছি, কি দেখিয়াছি? দেখিয়াছি তিনি সামান্য গৃহস্থকুলবধূ, নীরবে সংসার কর্ম্মে ব্যাপৃতা আছেন, দর্শনাকাঙ্ক্ষী সকলকে "এস মা, এস" এই বলিয়া সম্বোধন করিয়া ভক্তহৃদয়ে পরম পুলক সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন। দুই চারিটি কুশল প্রশ্ন করিয়া বাক্যালাপ করিয়াছেন। কখনও ঠাকুরের সংসারের কাজে তাঁহাকে একটু আধটু সাহায্য করিতে বলিয়াছেন, এই মাত্র তাঁহার সহিত সংযোগ হইয়াছে, আমরা তাহাতেই পরম তৃপ্ত হইয়া তাঁহার কাছে বসিয়াছি। তাঁহার মৃদুমধুর বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়াছি, সমস্ত সময়টি যে কি ভাবে কাটিয়াছে তাহা বুঝিতেও পারি নাই। বাড়ী ফিরিবার সময় হইয়াছে, যাইতেই হইবে অথচ এই প্রিয় সঙ্গ, মধুর আকর্ষণ ছাড়িয়া যাইতে মন সরিতেছে না, মনে হইতেছে এত শীঘ্র কেন যাইবার সময় আসিল? এমনই আকর্ষণ তাঁহার আমাদের প্রতি—এখন ভাবি আমাদের এ অদ্ভুত ভালবাসা তখন কিরূপে সৃষ্টি হইয়াছিল! তিনি ত বসিয়া আমাদের সঙ্গে ধর্ম্মবিষয়ক খানিক বক্তৃতা বা বড় বড় উপদেশাবলী দান করেন নাই, তবে এ টান, এ মমতা কোথা হইতে আসিল? জগতের

* রাধু (পরলোকগতা রাধারাণী দেবী), শ্রীশ্রীমায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী।

এত কিছু দেখিতেছি, কিন্তু সেই তৃপ্তি, বা সেই প্রীতির আস্বাদন আর কোথাও ত পাই নাই। তাই এখন বুঝি তাঁহার কি অপরূপ আকর্ষণ, কি গভীর ভালবাসা, যাহা আমাদের সমস্ত জীবনকে এক অভিনব ধারায় প্রবাহিত করিয়া দিয়াছে।

তাঁহার নেতৃত্বের বহু বিবরণই পাওয়া যায়। মা এদিকে ত শান্ত গৃহস্থঘরের কুলবধূ, কেহ তাঁহার গলার স্বরটী পর্য্যন্ত শুনিতে পায় না, পূজনীয়া যোগীন মা, গোলাপ মা বা পূজনীয় শরৎ মহারাজের মত না লইয়া কোন কার্য্য করেন না, অথচ মায়ের বাড়ীর সম্মুখের ডালগোলার এক হিন্দুস্থানী গৃহস্থ যেদিন তাহার স্ত্রীকে নির্ম্মম ভাবে প্রহার করিতেছিল সে দিন তাঁহার হুঙ্কার শুনা গিয়াছিল, সেই ক্রোধোন্মত্ত হিন্দুস্থানী ব্যক্তি তাঁহার একটিমাত্র ধমকেই একেবারে নীরব হইয়া যায়—সেদিন তাঁহার স্বরের দৃঢ়তা এবং দুষ্টকে দমন করিবার ক্ষমতা উপলব্ধি করা গিয়াছিল। এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত আছে যাহাতে দেখিয়াছি প্রয়োজনে তাঁহার দৃঢ়তা এত কঠিন আকার ধারণ করিয়াছে যে কাহারও সাধ্য হয় নাই তাহা রোধ করিতে।

আমরা এমন কথাও শুনিয়াছি—আচ্ছা ঠাকুরকে না হয় বুঝিলাম তিনি অবতার, কিন্তু শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যে কি আছে? তাঁহাকে কেন এত ভক্তি করিতে হইবে? তাঁহার কোনও পাণ্ডিত্য বা সাধন ভজন করিবার চমৎকারিণী কোনও কাহিনী শুনিতে পাই না। রান্না বান্না প্রভৃতি সামান্য রমণীসুলভ কাজেই অধিকাংশ সময় ব্যাপৃত দেখি। তাহাদের কথার প্রথম উত্তর এই—ঠাকুর যদি অবতার হন তবে তাঁহার সঙ্গিনী কখনও একজন সামান্যা নারী হইতে পারেন না। দ্বিতীয় কথা এই যে নারীর শ্রেষ্ঠত্ব কেবল পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করা বা আচার্য্যগিরিতেই নিবদ্ধ নহে। বিধাতা জগতের সর্ব্বপ্রকার কোমলতার সংমিশ্রণে নারী চরিত্র গঠন করিয়াছেন সুতরাং নারীত্বের বিকাশও হইবে তাহারই ভিতর দিয়া এবং তাহার স্থানও হইবে মানব হৃদয়ের অন্তরে—বাহিরে নহে। আমরা মায়ের মধ্যে সেইটীই খুব ভাল করিয়া দেখিতে পাই। দুরূহ আধ্যাত্মিক প্রশ্নসমূহ কত সহজ ভাষায় সহজ ভাবে ব্যক্ত করিয়া দিয়াছেন।

জনৈক ভক্ত মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ঠাকুরপূজা কি ভাবে করিতে হইবে। তাঁহার উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "মা, ঠাকুরকে আপনার জন ভেবে, ঘরের লোক মনে করে পূজা করিও। তাহা হইলে ঠাকুরপূজায় তৃপ্তি পাইবে।" সত্যই প্রাণ থেকে যখন বলি, 'ঠাকুর এসো, বসো, আমার পূজা গ্রহণ কর', তখন যে তৃপ্তি প্রাণে আসে সংস্কৃত মন্ত্রের ভিতর দিয়া তাহা হয় না। যতক্ষণ মন্ত্রদ্বারা তাঁহাকে ডাকি ততক্ষণ তিনি যেন নিমন্ত্রিত অতিথি, তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া ডাকিয়া আনিতেছি কিন্তু যখন বলি, 'ঠাকুর এসো, আমার বেদনা দূর করে দাও, তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ না?' তখন দেখি সত্যই ঠাকুর আমাদের অন্তরের অন্তস্তলে পরম আত্মীয়, নিকট হইতে নিকটতম হইয়া রহিয়াছেন; আমার প্রাণের আবেদনে সাড়া দিতেছেন। এমনই কত সামান্য সাধারণ কথা দিয়া মা দুরূহ শাস্ত্রীয় বিষয় সকলের সরল ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। সাধন বিষয়ে বহু উর্দ্ধে আরোহন না করিলে কি এমন অনায়াসে অপরের নিকট এ সব কঠিন বিষয়ের মীমাংসা করা যায়? আমরা এমন বিষয়ও জানি যাহা শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ প্রভৃতি ঠাকুরের প্রিয় পুত্রেরা মীমাংসা করিতে ইতস্ততঃ করিয়াছেন, কিন্তু মা তাহা অনায়াসে মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন।

এইবার শ্রীশ্রীমায়ের জীবন কত শিক্ষা ও কঠোরতার মধ্য দিয়া গিয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব, কারণ উহাই আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয়। শিশুকালে মা দরিদ্রগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পিতামাতার প্রথম সন্তান বলিয়া তাঁহাকে সাংসারিক বহু কাজ

করিতে হইয়াছে। তিনি প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নিজ গর্ভধারিণীকে সংসারের সকল কার্য্যে সাহায্য করিতেন। জলে নামিয়া গরুর জন্য দল ঘাস ও মাঠে গিয়া সূতা কাটার জন্য তূলা পর্য্যন্ত আহরণ করিয়াছেন। বিবাহান্তে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া তিনি স্বামী ও শাশুড়ীর সেবার ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। ঐ সময় তাঁহাকে কঠিন পরিশ্রম করিতে হইত। সেই সময় যে সকল ভক্ত ঠাকুরের নিকট আসিতেন তাঁহাদের জন্যও মাকে রান্না করিতে হইত। নিজ হস্তে ঐ ক্ষুদ্র কুঠরীতে বসিয়া ঐ সকল কার্য্য সমাধা করিয়া যাইতেন।

পরে তাঁহাকে দেখি সেবানিরতা অসুস্থ ঠাকুরের পাশে। দুরন্ত ব্যাধি তখন ঠাকুরের শরীরকে গ্রাস করিয়াছে, ডাক্তারগণ তাঁহার পথ্য বিশেষভাবে প্রস্তুত করিতে আদেশ করিতেছেন, সুতরাং মাতাঠকুরাণীও ঐ সময়ে ঠাকুরের নিকট থাকিয়া যখন যেরূপ প্রয়োজন সেইরূপ ভাবেই পরিচর্য্যা করিয়াছেন। ইহা ছাড়া দক্ষিণেশ্বরে তিনি কঠিন তপস্যাও করিয়াছিলেন যাহা সম্পূর্ণ লোকচক্ষুর অন্তরালে অতি সংগোপনে সংঘটিত হয়। সেজন্য আমরা উহা সম্যক্ ধারণা করিতে পারিনা। মা নিজমুখে বলিয়াছেন, "আমার কথা কি বলব মা, আমি তখন দক্ষিণেশ্বরে রাত তিনটার সময় উঠে জপে বসতুম, কোন হুঁশ থাকতনা। একদিন জোছনা রাতে নবতে সিঁড়ির কাছে বসে জপ করছি চারদিক নিস্তব্ধ। ঠাকুর সেদিন কখন ঝাউতলায় শৌচে গেছেন কিছুই জানতে পারিনি, খুব ধ্যান জমে গেছে। তখন আমার অন্য রকম চেহারা ছিল, গয়না পরা লাল পেড়ে শাড়ী। গা থেকে আঁচল খুলে উড়ে উড়ে পড়ছে, কোন হুঁশ নেই। ছেলে যোগীন সেদিন ঠাকুরের গাড়ু দিতে গিয়ে আমাকে ঐ অবস্থায় দেখেছিল। সে সব কি দিনই গিয়াছে মা! জোছনা রাতে চাঁদের পানে তাকিয়ে জোড়হাত করে বলেছি তোমার ঐ জোছনার মত আমার অন্তর নির্ম্মল করে দাও। জপ ধ্যান করতে করতে দেখবে উনি কথা ক'বেন, যে বাসনাটা হবে তখনই পূর্ণ করে দেবেন, কি শান্তি প্রাণে আসবে।"

এই উক্তিগুলি তিনি কত সরল ও স্বচ্ছন্দে করিয়া গিয়াছেন। আমরা, যাহারা তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে চাই তাহাদের ইহার পর আরও শাস্ত্র ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় কি? কি করিতে হইবে, কত অল্প কথায় পরম স্নেহে তিনি সন্তানকে বলিয়া দিতেছেন, যেন মুগ্ধ শিশু মায়ের ক্রোড়ে বসিয়া অক্ষর পরিচয় করিতেছে ও মায়ের মৃদু মধুর বাক্যে স্নেহরসে আপ্লুত হইতেছে। তাঁহার শিক্ষা দিবার রীতি এইরূপই ছিল, তাঁহার ভালবাসা ক্ষণে ক্ষণে তাঁহাকে নব নব ভাবে বিভাবিত করিত। একজনের একটি মাত্র সন্তান সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছেন, তিনি মায়ের নিকট আসিয়া নিজের মনের তাপ জানাইতে গিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন। শ্রীশ্রীমায়ের চোখেও জল—মা বলিতেছেন, "আহা, তাইত একটী মাত্র সন্তান প্রাণের ধন, এমন করে সন্ন্যাসী হয়ে গেলে মা কি করে প্রাণ ধরে বল দেখি?" আবার অপর একদিন একজন যখন তাঁহার দুইটী সন্তানই সাধু হইবার জন্য ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিয়াছে, ইহা মাকে জানাইয়া বলিতেছেন, "মা, সন্তানের যাতে কল্যাণ হয় সেইটীই মায়ের কামনা, কি আছে সংসারে, ছেলে যদি পরম কল্যাণের পথে যায় তার চেয়ে আনন্দের বিষয় কি আছে?" মা তখন সহর্ষে বলিতেছেন, "ঠিক বলেছ মা, পরম কল্যাণের পথে যদি ছেলে যায় তার চেয়ে মার আনন্দের আর কি থাকতে পারে?" এই দুই বিভিন্ন উক্তি হইতে আমরা দেখিতে পাই একটীতে পরদুঃখকাতরা মা, মায়ের দুঃখে পরম সহানুভূতিসম্পন্না, অপরটীতে মা মহাজ্ঞানী, অলর্কজননী মদালসার ন্যায় সন্তানের যথার্থ কল্যাণে পরমানন্দময়ী। এইরূপ কোমল কঠোর, মৃদু অথচ দৃঢ় কত ভাবের পরিচয়ই আমরা পাই তাঁহার চরিত্রে।

সর্ব্বোপরি তাঁহার নীরব আত্মগত ভাবে সমাহিতা ধ্যানমূর্ত্তি সতত লোকচক্ষুর অন্তরালে নিজেকে রক্ষা করিয়া সর্ব্বত্যাগিনী কল্যাণী মাতৃরূপই আমাদের দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, ইহাই মায়ের যথার্থরূপ। তিনি আমাদের নায়িকা, তিনিই আমাদের আদর্শ তাঁহাকেই অনুসরণ করিতে হইবে, তবেই বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় নারী জগতে শ্রেষ্ঠস্থান লাভ করিতে পারিবে।

হে তাপস, পুনঃ দাও সাড়া

শ্রীমাধুর্য্যময় মিত্র

তপঃক্লিষ্ট ধরণীর শীর্ণ শুষ্ক বেশ ;
ঘন কৃষ্ণ কেশ
রুক্ষ জটা রূপে রূপায়িত।
সুগভীর ধ্যানে সমাহিত
অপরূপ সন্ন্যাসিনী ছবি ;
বসুধা গরবী
বসন্তের ছন্দোময় আভরণ ত্যজি
গৈরিকের গরিমায় সাজিয়াছে আজি
যার আশে—
বৈশাখের পূর্ণিমার হাসে
দেখা দিল তার হাসিরাশি,
সুধাস্নিগ্ধ, চির-অবিনাশী।

*　　*　　*

স্বার্থগন্ধী অজ্ঞানসম্বল—
মোহগ্রস্ত মানবের দল,
ধ্বনিয়া তুলেছে দিক তীব্র হাহাকারে
ব্যর্থতার ভারে।
এ ক্রন্দন রোল,
নিষ্পেষিত করে দিল কুসুম কোমল
সুবিশাল একটী হিয়ায়
হীন তুচ্ছতায়—
ব্যর্থ করি যতো প্রলোভন,
ব্যর্থ করি ভোগৈশ্বর্য্য, রাজসিংহাসন,
চক্ষের পলকে
খুঁজে নিল সত্যপথ জ্ঞানের আলোকে।
তুচ্ছ করি জীবন-মরণ
"মন্ত্রের সাধন কিবা শরীর পতন"
এই দৃঢ় পণে
নিবোধিত হয়েছিল বিশ্বের কল্যাণে,
প্রেমময়—
একটী হৃদয়।

*　　*　　*

এ নব বৈশাখে
ভোগলিপ্সু জীবনের ব্যর্থতার ডাকে
হে তাপস, পুনঃ দাও সাড়া
সত্য ধ্রুবতারা
অজ্ঞানের তমিস্রায় গিয়াছে হারায়ে ;
প্রবুদ্ধ বুদ্ধত্ব তব পড়ুক ছড়ায়ে
দিকে দিগন্তরে।
নিখিলের অন্তরে অন্তরে,
ত্যাগের প্রলয় বহ্নিশিখা—
লিখে দিক স্বার্থকামনার শেষ লিখা।

সমালোচনা

প্রবন্ধাবলী—দ্বিতীয় খণ্ড। সম্পাদক ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, পি-এইচ্-ডি (লণ্ডন), এফ্-আর-এস্ (লণ্ডন)। ৩ নং ফেডারেশন ষ্ট্রীট, প্রাচ্য বাণী মন্দির হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েক জন অধ্যাপকের কতিপয় প্রবন্ধ নানা তথ্য ও গবেষণায় পরিপূর্ণ প্রাচ্য বাণী মন্দিরের এই খণ্ডটীতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্যেটের ইফিগেনিয়া আলোচনা করিয়াছেন কাজী আব্দুল ওদুদ, এম্-এ। প্রবন্ধটী বেশ প্রাঞ্জল ভাষায় সুলিখিত ও সুচিন্তিত। ডক্টর কুঞ্জেশ্বর মিশ্র "দুর্গাপূজার তাত্ত্বিকরূপ" প্রবন্ধটীতে শাস্ত্রীয় যুক্তির গবেষণার সমাবেশ আছে। "কণোজ ব্রাহ্মণের বঙ্গদেশে আগমন" ঐতিহাসিক সত্য কিনা তাহা লইয়া বিচার করিয়াছেন। বর্ত্তমান খ্যাতনামা ঐতিহাসিকেরা ইহা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পণ্ডিত শ্রীমহেন্দ্র চন্দ্র কাব্যতীর্থ, সাংখ্যার্ণব ইহা প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে উক্ত মত ভ্রান্ত। এই সম্বন্ধে এখনও সর্ব্ববাদি সম্মত সিদ্ধান্ত স্থির হয় নাই। অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু লিখিত "চর্য্যার সাহিত্যিক মূল্য" উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ। "সুকবি জীবেন্দ্র কুমারের আলোচনা" বেশ চিত্তাকর্ষক তবে প্রবন্ধটী অসম্পূর্ণ সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবসাহিত্যরসজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন "গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা" সম্বন্ধে আলেচনা করিয়াছেন। বৈষ্ণব সাধনার নিগূঢ় তত্ত্বরস যাহা তিনি পরিবেশ করিয়াছেন তাহা ভক্ত ভাবুক বৈষ্ণব সাধক মাত্রেরই আস্বাদ্য। "কবি যামিনীকুমার" প্রবন্ধটী উল্লেখ যোগ্য। "রবীন্দ্র স্মৃতিতর্পণে" অমরেশ বাবু লিখিয়াছেন 'রবীন্দ্রনাথের জীবনের মূলমন্ত্র—তাঁর সমস্ত কবিত্বের উৎস ছিল এই স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রেম।' দেখিতেছি শুধু কবিরা নিরঙ্কুশ নন—তাঁহাদের ভক্ত সমালোচকেরাও নিরঙ্কুশ। নানা মুনির নানামত। রবীন্দ্রনাথ মিষ্টিক কবি বলিয়া অনেকে মনে করিয়া থাকেন।

বৈষ্ণব সাহিত্য সম্মিলনীর সাহিত্যশাখার সভাপতির অভিভাষণ—"গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সংস্কৃত সাহিত্যে দান" এই খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। অভিভাষণটী সুরচিত, সুপাঠ্য এবং বহু গবেষণা পূর্ণ। উপসংহারে যে কয়েকটি প্রস্তাব উল্লিখিত হইয়াছে তাহা বাস্তবে পরিণত হইলে বঙ্গীয় সংস্কৃতির একটী অতীত যুগকে উদ্ভাসিত করিবে। সে যুগ বঙ্গের গৌরবময় ইতিহাস।

সায়াহ্নিকা—শ্রীপ্রভাময়ী মিত্র রচিত। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

কয়েকটী কবিতা লইয়া এই কাব্যগ্রন্থ রচিত। কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় ইহার পরিচিকায় লিখিয়াছেন, 'আলোচ্যমান কবিতাগুলির কবি-মানসের জন্ম হইয়াছে রবি পরিবেশ মণ্ডলে। রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের দ্বারাই প্রধানতঃ অনুপ্রাণিত এই কবিতাগুলি।" ইহা সত্য হইলেও রচয়িত্রীর নিজস্ব অনুভূতি, রসমাধুর্য্য, শব্দলালিত্য এবং প্রকাশের ভঙ্গী অপূর্ব্ব। কবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথের অক্ষম অনুকরণ নয় বরং তাঁহার দীপ্ত প্রতিভার ভাস্বর আলোকে বিদুষী কবির মানসপটে ফুটিয়া উঠিয়াছে মাধুরিমার স্নিগ্ধ জ্যোতি,

সায়াহ্নিকার ছায়ায় ঘেরা কোমল শ্যামলিমা, অতীন্দ্রিয়ের স্বপ্নে ও বাস্তবের স্মৃতিতে কবির হৃদয়ে যে এক অপূর্ব্ব রসানুভূতি প্রকাশ পায় তাহাই ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে ছন্দে গানে এবং কবিতায়। এই রসানুভূতির অমৃতনির্ঝর বহিয়াছে রবীন্দ্রনাথের কাব্যনিচয়ে। গ্রন্থকর্ত্রী তাঁহার অমৃতধারা রসপিপাসু পাঠক-পাঠিকাকে দান করিয়াছেন তাঁহার অনুভূতির স্ফটিকময় পাত্রে। তিনি "নিবেদনে" জানাইয়াছেন যে রসানুভূতি ছিল তাঁহার মনের নিভৃত কোণে—সংগোপনে। সুতরাং এই কবিতাগুলি তাঁহার সাধনার নিগূঢ় অনুভূতি। বাংলা কাব্যসাহিত্যে ইহা সমাদরে স্থান পাইবে। দুয়েকটী ছত্র পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল—

"স্রষ্টা তোমারে নাই যদি চিনি,
নাহি যদি দাও ধরা,
তব সৃষ্টির অগণিত রূপে আমার নিখিল ভরা!
মোর—মর্ম্মের লোহে আলোহিত ঐ
বেদনার শতদল
মোর—নিরাশার মোহে গহীন নিতলে
মেলিতেছে তারাদল।
তারই 'পরে তুমি ক্ষণেকের তরে ছোঁয়াও
চরণ দুটি
সার্থক হোক বিকাশের ব্যথা ছড়ায়ে
পড়ুক ছুটি!"

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

Mystic Tales of Lama Taranatha—A Religio-sociological History of Mahayana Buddhism. Translated into English by Bhupendra Nath Datta A. M., Dr. Phil.

কলিকাতা রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ (১৯ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, ১৫।৮।৪৪) মহাযুদ্ধের বিকট বাজারের মধ্যেই কতকগুলি অত্যুৎকৃষ্ট সৌষ্ঠবময় গ্রন্থমালা প্রকাশ করিয়া বিদ্যোৎসাহী অধ্যাত্মপিপাসু ব্যক্তিবর্গের বিশেষ হিতসাধন করিয়াছেন। মঠের কার্য্যকুশলতা প্রশংসার্হ। বইখানির টাইপ, বোর্ড বাঁধাই চমৎকার। উপরের সচিত্র প্রচ্ছদপট দৃষ্টির প্রসন্নতা স্বতঃই আকর্ষণ করিবে। ৮০পৃষ্ঠা—আর্ট পেপারে ছাপা, দুইখানি চিত্র যুক্ত। রয়েল আটপেজী আকার। মূল্য চারি টাকা।

লামা তারানাথ (খৃঃ ১৫৭৩) বৌদ্ধতন্ত্রবাদের নানা কৃষ্টি সংমিশ্রণে গঠিত—চক্র মুদ্রা ক্রিয়াকলাপ পূর্ণ তুকতাক্, মারণ উচাটন, ম্যাজিক সিদ্ধি, অলৌকিক সিদ্ধাই, ভোজবাজীর—"কমপ্লেক্স"ময় (তামাম উত্তর ভারত নেপাল তিব্বতে প্রকট) মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে তিব্বতীভাষায় যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা জর্ম্মণ পণ্ডিত গ্রুনভেডেল সাহেব স্বীয় মাতৃভাষায় অনুবাদ করেন (১৯১৪)। ডাক্তার দত্ত ইংরাজীতে ইহার অনেকাংশ প্রথম পুনরনুবাদ করিয়া ইংরাজী জানা লোকের ইহা গোচরে আনিয়াছেন। পুস্তকটি সপ্ত স্তবকে বিভক্ত। শেষের নির্ঘণ্ট ও বিষয় সূচী খুবই বিষয় বোধে সহায়তা করিবে। দত্তের মুখবন্ধের (পৃঃ ৫-৬) ষোলটি ভারত সমাজের তাৎকালিক লৌকিক অবস্থাজ্ঞাপক পয়েণ্ট বিশেষ অনুধাবন-যোগ্য। বদ্ধ কুসংস্কারের কুঠারস্বরূপ।

দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, আর্থিক ও আন্তর্জাতিক পরিবেশের মধ্যে গৌতম বুদ্ধের মূল জ্ঞানপ্রধান অধ্যাত্মধর্ম্ম কিরূপে স্থানে স্থানে কালে কালে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় ধর্ম্মেতিহাসের ধারা অনুসরণ করিলে পরিস্ফুট হয়। এক হিসাবে ডাক্তার দত্ত ঘরের ছেলেকে ঘরে ফিরাইয়া আনিয়াছেন। সাধারণ মানব মানবীর ধর্ম্ম, লৌকিক ধর্ম্ম—প্রাচীন যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত সেই তুকতাক্ ম্যাজিকের উপাদানে একই খাত বাহিয়া চলিয়াছে। শ্রেণী সংঘর্ষ, গোত্রে গোত্রে লাঠালাঠি ও ম্যাড়ার লড়াই,

সামন্তশাহী, হিটলারশাহী, সোভিয়েটশাহী—এক এক রাষ্ট্র পরিস্থিতিতে এই লৌকিক ধর্ম্মেরই এক এক নূতন ছাঁচের বা ছাঁদের জন্মদান মাত্র। হয় বুদ্ধ, নয় ক্রাইষ্ট, নয় লেলিন, নয় হিটলার, এক একজন এক এক মার্কার লৌকিক ধর্ম্মস্রষ্টা। এই দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখিলে বেদের কাল হইতে সোভিয়েট যুগ তক্, বীরপূজাই ওলটপালটভাবে চলিয়াছে। তবে সমাজরাষ্ট্রের পরিবর্ত্তন মুখে বীরপূজার রকমফের গোচরীভূত (বোধ করি বক্রবচনে কর্ত্তা-ভজামি)—রামা চাষী, শ্যামা কামার, পঞ্চাতেলি, খেন্তি তাঁতিনী, রামী তেলিনী, সুরেন্দ্র মাহাতো, মহেন্দ্র কুমোর প্রভৃতির ধর্ম্মের একই রূপ—যুগে যুগে। বে-কায়দায় পড়িলে বৈজ্ঞানিক কেহ কেহ লুকাইয়া কালী-পীঠে পাঠা মানত করেন,—হোরে মেদো খোলাখুলি তুক্‌তাকের শরণ নেন। প্রভেদ এই। পয়সাওয়ালা ট্যাক্‌ভারি লোকদের হৃদয়-মনের নীচতাও সম্ভবপর। একথা বলার মানে এ নয় যে "সর্ব্বহারা"দের আর্থিক উন্নতি সমর্থনযোগ্য নয়। দুর্গাসপ্তশতী বা চণ্ডীর কাহিনীর উঁচুজাত সুরথের লোকলস্কর জমীনজরু রোপেয়ার কামনাময় মন আর জাতের স্কেলে নীচু সমাধির নির্ব্বেদাকাঙ্ক্ষা স্মরণীয়। মনোন্নতি স্বতন্ত্র ব্যাপার, স্বতন্ত্র সাধন-সাপেক্ষ। অর্থের সঙ্গে কিছুটা সংস্রব থাকিলেও সবটাই অর্থ-মূল নয়।

বইখানি ভারতের সমাজ তত্ত্ব তথা ইতিহাস গবেষকদের বড়ই কাজে আসিবে। আদ্যোপান্ত পাঠে উপকৃত, আনন্দিত। বহুল প্রচার কামনা করি।

স্বামী নির্লেপানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

স্বামী অমৃতেশ্বরানন্দ মহারাজের দেহত্যাগ—গত ১২ই চৈত্র, মঙ্গলবার, রাত্রি ৮-৪৫ মিনিটের সময় বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অন্যতম ট্রাষ্টি এবং রামকৃষ্ণ মিশনের গভর্নিং বডির সভ্য স্বামী অমৃতেশ্বরানন্দ মহারাজ লাহোর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে ৫৩ বৎসর বয়সে হৃদ্‌রোগে অকস্মাৎ দেহত্যাগ করিয়াছেন। কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি বাতরোগে আক্রান্ত হইয়া কষ্ট পাইতেছিলেন। কয়েক মাস পূর্ব্বে মিশনসংক্রান্ত কোন কাজে তিনি বম্বে রামকৃষ্ণ আশ্রমে তিন মাস ছিলেন; তথা হইতে করাচী হইয়া গত ১১ই ফাল্গুন লাহোর গমন করেন।

স্বামী অমৃতেশ্বরানন্দ মহারাজ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯১৪ সনে তিনি বেলুড় মঠে যোগদান করিয়া ব্রহ্মচর্য ব্রতে দীক্ষিত হন এবং ১৯২১ সনে কাশী শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ব্রহ্মচারিরূপে তাঁহার নাম ছিল দেবচৈতন্য। শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘে তিনি পরেশ মহারাজ নামে পরিচিত ছিলেন।

তিনি প্রথমতঃ মান্দ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অন্যতম সেবক এবং পরে ইহার অধ্যক্ষরূপে কৃতিত্বের সহিত কার্য পরিচালন করেন। তাঁহার ঐকান্তিক আদর্শ-নিষ্ঠা, নিষ্কলুষ চরিত্র, অনন্য-সাধারণ সাধুত্ব, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা ও অসাধারণ কর্ম-শক্তির পরিচয় পাইয়া বেলুড় মঠের তৎকালীন কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে ১৯২২ সনে বেলুড় মঠের অন্যতম ট্রাষ্টি ও রামকৃষ্ণ মিশনের গভর্নিং বডির সভ্য এবং ১৯৩৩ সনে সহকারী সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত করেন।

পরেশ মহারাজ ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান তীর্থ পর্যটন করিয়াছেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘের প্রতি যথার্থই অনুরক্ত ছিলেন এবং অত্যন্ত নিষ্ঠা-সহকারে দীর্ঘকাল শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নানাবিধ দায়িত্বপূর্ণ কার্য বিশেষ কৃতিত্বসহকারে সম্পাদন করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘের উন্নতি-সাধন তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। এজন্য তিনি অক্লান্ত ভাবে কার্য করিতে কখনও দ্বিধাবোধ করেন নাই। তাঁহার দেহত্যাগে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের যে ক্ষতি হইল উহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে। এই ত্যাগী সন্ন্যাসিপ্রবরের পরলোক গত আত্মা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শ্রীপাদপদ্মে মিলিত হইয়া চিরশান্তি লাভ করিয়াছে।

ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ।

কামারপুকুরে (হুগলী) ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব—গত ২১শে ফাল্গুন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মভূমি কামারপুকুরে তিনটি স্থানে তাঁহার জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বেলুড় (হাওড়া) রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরের ষোড়শোপচারে পূজা ভোগ হোম চণ্ডীপাঠ আরাত্রিক ও ভজনাদির আয়োজন করা হইয়াছিল। এই উপলক্ষে বিদেশাগত বহুভক্ত নরনারী ও এতদঞ্চলের দরিদ্র-নারায়ণগণকে প্রসাদ দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাভূমি ভূতির খালের দুই পার্শ্বে গ্রামবাসীদের উদ্যোগে দুইটি সাধারণ উৎসব-মেলা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উভয় স্থানেই শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজাদি ও সাধারণের মধ্যে প্রসাদ বিতরণের বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। সেবক-সংঘের অনুষ্ঠিত উৎসব ক্ষেত্রে অপরাহ্ণে আরামবাগ মহকুমার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের সভাপতিত্বে একটি আলোচনা-সভায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রভাকর মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও স্বামী ঈশানানন্দজী শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও উপদেশ সম্বন্ধে অতি সুন্দর ভাবে আলোচনা করেন। এই দুইটি উৎসব-ক্ষেত্রে তিন দিনব্যাপী শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম-সংকীর্তন ও যাত্রাগান হইয়াছে

জয়রামবাটী (বাঁকুড়া) শ্রীশ্রীমাতৃ-মন্দিরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব—গত ২১শে ফাল্গুন জয়রামবাটী শ্রীশ্রীমাতৃমন্দিরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একাদশাধিকশততম জন্মতিথি উৎসব যথানিয়মে সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে প্রাতে ভজন, ষোড়শোপচারে পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ ও ভোগারতির পর ভক্ত ও দরিদ্র-নারায়ণগণকে প্রসাদ দানের বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। সন্ধ্যায় আরাত্রিক, স্তোত্র ও শ্রীশ্রীঠাকুরের পূত জীবনী পাঠ এবং পরদিন মধ্যাহ্নে উপস্থিত ভক্তগণের মধ্যে প্রসাদ বিতরিত হইলে উৎসব কার্য শেষ হয়।

বহরমপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব—এই প্রতিষ্ঠানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একাদশাধিকশততম জন্ম-বার্ষিকী সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে গত ১৬ই চৈত্র অপরাহ্ণে এই জেলার কালেক্টর মিঃ বি জি রাও, আই-সি-এস্-এর সভাপতিত্বে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। বেলুড় মঠের স্বামী অজয়ানন্দজী এবং দেওঘর বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ স্বামী আদিনাথানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। পরদিন পূজা হোমাদি হইলে দারুণ প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও প্রায় পাঁচ হাজার ভক্ত নরনারী প্রসাদ গ্রহণে পরিতৃপ্ত হন। এই উপলক্ষে শ্রীশ্রীচণ্ডীর গান ও রাম রসায়ন গানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

রহড়া (২৪ পরগনা) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব—গত ৯ই হইতে ১১ই চৈত্র এই প্রতিষ্ঠানে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রথম দিন প্রাতে কীর্তন পূজা

ও হোমাদি অনুষ্ঠিত হইলে বালকগণের ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা হয়। সন্ধ্যায় আসানসোলের শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দাস সদলবলে নানাপ্রকার ব্যায়াম প্রদর্শন করেন। রাত্রে খড়দহ রামকৃষ্ণ আশ্রমের ভক্তগণ কর্তৃক কালীকীর্তন গীত হয়।

পরদিন প্রাতে কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীতের পর ভবানীপুরস্থ চক্রবেড়িয়া হরিসভা কর্তৃক নিমাই সঙ্গীত গীত হয়। দ্বিপ্রহরে বহু ভক্ত ও সাধু আশ্রমে আগমন করেন। অপরাহ্নে কলিকাতা বহুবাজার জাতীয় সংস্কৃতি-সংঘ ঐকতান বাদন করিলে বালকদের বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী সভা হয়। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। বালকদের সঙ্গীত আবৃত্তি প্রভৃতি অনুষ্ঠানের পর পুরস্কার বিতরণ কার্য সম্পন্ন হয়। সভাপতি মহোদয় আশ্রমের কর্মাবলীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলেন যে, এ প্রতিষ্ঠানের বালকদের দেখিলেই মনে হয় যে, ইহার একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। সন্ধ্যায় বালকগণ কর্তৃক কৃতিত্বসহকারে 'কর্ণ' অভিনীত হয়।

সোমবার সকালে বালকদের একটি সভার অধিবেশন হয়। ইহাতে বেলুড় মঠের স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হন। শ্রীমান্ আনন্দমোহন চৌধুরী, শ্রীমান্ বরুণেশ্বর চন্দ, শ্রীমান বীরেশ্বর মুখোপাধ্যায় স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করিলে উদ্বোধনের স্বামী সুন্দরানন্দজী একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। সভাপতি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সুমার্জিত ভাষায় স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-বেদকে ভিত্তি করিয়া বর্তমান জাতীয় জীবনে ছাত্রদের দায়িত্ব সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। দ্বিপ্রহরে পাঁচ শতাধিক দরিদ্র-নারায়ণকে সাহায্য প্রদান করা হয়।

এই দিন অপরাহ্নে আশ্রমে একটি ধর্মসভার অধিবেশন হয়। ইহাতে স্বামী পবিত্রানন্দজী পৌরোহিত্য করেন। স্বামী সুন্দরানন্দজী, স্বামী বীতশোকানন্দজী ও স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী স্বামী বিবেকানন্দের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। রাত্রে কলিকাতার বিখ্যাত অপেরা পার্টি কর্তৃক 'শক্তি-পূজা' অভিনয়ান্তে উৎসবের দীর্ঘকর্মসূচী শেষ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মভূমি

বিশ্বতীর্থ কামারপুকুর

আবেদন

হুগলী জেলার অন্তর্গত কামারপুকুর গ্রাম যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবে পবিত্রীকৃত। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রচারের ফলে এই লোকোত্তর মহাপুরুষের জীবন ও শিক্ষা বিশ্ববাসীর হৃদয়ে যতই সান্ত্বনা ও শান্তির সঞ্চার করিতেছে, ততই এই গ্রামটি অধিকতর গৌরবান্বিত এবং এক আন্তর্জ্জাতিক মহাতীর্থে পরিণত হইতেছে।

বিশেষতঃ মহাসমরের অবসানে এখন প্রত্যেক জাতির চিন্তাশীল ব্যক্তিগণই উপলব্ধি করিতেছেন যে পাশ্চাত্য জীবনের দৃষ্টিভঙ্গীতে এমন কোন মারাত্মক ত্রুটি রহিয়াছে, যাহার জন্য গত ২৫ বৎসরের মধ্যে সমগ্র ধরণী দুইবার ভয়ঙ্কর রক্তস্রোতে প্লাবিত হইয়াছে। এইজন্য উপদেশ ও সাহায্যের আশায় সমগ্র বিশ্ব আজ ভারতের দিকে তাকাইয়া আছে। আমাদের বিদেশীয় কেন্দ্র-সমূহ হইতে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে যে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী বিভিন্ন দেশের লোকের মনে অপূর্ব প্রভাব বিস্তার করিতেছে। ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে তাঁহার সম্বন্ধে যথার্থ অনুসন্ধিৎসা দেখা যাইতেছে। এই সকল

কারণে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে অদূর ভবিষ্যতে কামারপুকুর অগণিত মানবকে তীর্থযাত্রায় আকর্ষণ করিবে।

অধিকন্তু যে মহাপুরুষের আবির্ভাব ভারতকে বিশ্বের দরবারে সম্মানিত করিয়াছে, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সময় আসিয়াছে। তাঁহার গ্রামের উন্নতি বিধান, তাঁহার জন্মস্থানটীর সংরক্ষণ এবং তথায় তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতিমন্দিরনির্ম্মাণ উপস্থিত কর্ত্তব্য। এই উদ্দেশ্যে আমরা কামারপুকুরে একটী আশ্রম স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে তথায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পৈত্রিক ভবনসহ ১৬ বিঘা জমি সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। উক্ত স্থানে উপযুক্ত ভাবে তাঁহার জন্মস্থানটী সংরক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে একটী চিকিৎসালয়, পাঠশালা, আন্তর্জ্জাতিক অতিথি-ভবন প্রভৃতি স্থাপন করা হইবে।

পরিকল্পনাটী সাফল্যমণ্ডিত করিতে লক্ষাধিক মুদ্রা আবশ্যক। মিশনের পৃষ্ঠপোষক ও সহৃদয় জনসাধারণের নিকট আমাদের প্রার্থনা, তাঁহারা যেন আমাদিগকে এই সদনুষ্ঠানে সহায়তা প্রদান করেন। সাহায্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় সাদরে গৃহীত হইবে এবং উহার প্রাপ্তিস্বীকার করা হইবে:— সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা হাওড়া।

স্বামী মাধবানন্দ
সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন

বিবিধ সংবাদ

কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভিক্ষামাতা ধনী কামারনীর মন্দির প্রতিষ্ঠা—যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মভূমি কামারপুকুর গ্রামে তাঁহার ভিক্ষামাতা স্বর্গীয়া ধনী কর্ম্মকারের পুণ্যস্মৃতি রক্ষার্থ তদীয় বসতবাটীতে একটি সুদৃশ্য মন্দির নির্মাণ করা হইয়াছে। গত ২১শে ফাল্গুন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি-পূজাদিবস উক্ত মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুর ও ধনী মাতার পূজা, হোম, অষ্টপ্রহর কীর্ত্তন ও সহস্রাধিক দরিদ্র-নারায়ণ সেবা সম্পন্ন হইয়াছে। আরামবাগ মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেট, স্বামী পরমেশ্বরানন্দজী ও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। এই মন্দিরের প্রায় সকল ব্যয়ই কলিকাতা ১০।২ মলঙ্গা লেন নিবাসী শ্রীযুক্ত রাধাচরণ দাস (কর্মকার) মহাশয় বহন করিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যামন্দির, কাশী—গত ২১শে ফাল্গুন এই প্রতিষ্ঠানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে গীতা, কথামৃত, শ্রীরামকৃষ্ণ-স্তব, কবিতা ও প্রবন্ধ পঠিত হয়। পূজান্তে প্রসাদ বিতরিত হইলে উৎসব কার্য শেষ হয়।

গয়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব—এই প্রতিষ্ঠানে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ একাদশাধিকশততম জন্মোৎসব যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে গত ২১শে ফাল্গুন শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথিপূজা, পাঠ ও প্রসাদবিতরণাদি এবং ২৬শে তারিখে প্রায় এক সহস্র দরিদ্র-নারায়ণের সেবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। গত ৩০শে ফাল্গুন স্থানীয় থিওসফিক্যাল্ সোসাইটী হলে এক জন-সভার অধিবেশন হয়। উদ্বোধন সঙ্গীত গীত হইলে আশ্রম-সম্পাদক শ্রীযুক্ত গোবর্ধন লাল, এম্-এ, বি-এল্ মহোদয় আশ্রমের বার্ষিক কার্যবিবরণী পাঠ করেন এবং স্বামী নির্লেপানন্দজী, অধ্যাপক শ্রীযুত অনুরুদ্ধ ঝাঁ এবং প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত

চঞ্চল ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও উপদেশ সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। শেষে সভাপতি মিঃ আই এইচ্ ম্যাক্‌ডোনাল্ড, আই-সি-এস্, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট্ তাঁহার ভাষণে রামকৃষ্ণ মিশনের জনহিতকর কার্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া হৃদয়-গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন।

আজমীর (রাজপুতানা) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জন্মোৎসব—গত ১৭ই চৈত্র ট্রেভর টাউন হলে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বার্ষিকোৎসব সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে আহূত এক জনসভায় রাজপুতানা বোর্ড অব এডুকেশনের সেক্রেটারী রায় বাহাদুর মদনমোহন বর্মা সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী সম্বিদানন্দজী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র পৌরাণিক, আজমীর মেয়ো কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অনন্ত পাণ্ডে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবকীনন্দন শর্মা ও মিঃ এন্ কে দাশগুপ্ত ইংরাজি ও হিন্দীতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। গত দুই বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও সভায় দুই সহস্রাধিক শ্রোতার সমাগম হয়। আজমীর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমটী গত দুই বৎসরের মধ্যেই জনপ্রিয় হইয়াছে। কিছুদিন হয় বম্বে রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী গৌরীশ্বরানন্দজী ও রাজকোট রামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী জপানন্দজী এখানে বক্তৃতাদি প্রদান করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামিজীর প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটি—গত ৩রা ফাল্গুন দোলপূর্ণিমা উপলক্ষে সোসাইটি-ভবনে শ্রীযুক্ত রমণীকুমার দত্তগুপ্ত মহাশয় "শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাব" সম্বন্ধে আলোচনা করেন। পরে শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর রায় সদলবলে "মাথুরলীলা কীর্তন" করিলে প্রসাদ বিতরণের পর উৎসব পরিসমাপ্ত হয়।

লালমণির হাট (রংপুর) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব—এই প্রতিষ্ঠানে গত ১২ই ফাল্গুন স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে দ্বিপ্রহরে পূজাদি অন্তে ছয় শতাধিক ভক্ত ও দরিদ্র-নারায়ণ প্রসাদ গ্রহণ করিয়া তৃপ্তি লাভ করেন। মধ্যাহ্নে কীর্তনাদির পর অপরাহ্ণে এক ধর্মসভার অধিবেশন হয়। ইহাতে যথাক্রমে শিলং, জলপাইগুড়ি ও দিনাজপুর আশ্রমের স্বামী সাধনানন্দজী, স্বামী বিমলানন্দজী ও স্বামী গদাধরা-নন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা করেন।

নবদ্বীপ রামকৃষ্ণ সেবা সমিতিতে যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব—গত ২০শে ফাল্গুন শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতিসহ একটি শোভাযাত্রা নগর প্রদক্ষিণ করে। পর দিন তিথিপূজা, হোম, পাঠ ও প্রসাদ বিতরণান্তে কীর্তনাদি হয়। ২৩শে ফাল্গুন ছাত্র ও ছাত্রীগণের প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা-সভায় স্থানীয় বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মাধবদাস সাংখ্যতীর্থ মহাশয় পুরস্কার বিতরণ করেন। এই উপলক্ষে আহূত এক ধর্মসভায় নবদ্বীপের পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত কেদারনাথ সাংখ্যতীর্থ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে কয়েকজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ও ভদ্রমহোদয় শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীসম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। ২৪শে ফাল্গুন আর্ট সেণ্টার কর্তৃক বিল্বমঙ্গল নাট্যাভিনয় এবং পরদিন স্থানীয় সঙ্গীতকৌশলিগণ-কর্তৃক একটি সঙ্গীত-জলসার অনুষ্ঠান হয়। শেষ-দিন প্রায় দেড় সহস্র দরিদ্র-নারায়ণ পরিতোষ সহকারে প্রসাদ গ্রহণ করেন।

বিজবাগে (নোয়াখালি) শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব—গত ২১শে ফাল্গুন এখানকার হাইস্কুলের হোষ্টেল-প্রাঙ্গণে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজাদি অন্তে সহস্রাধিক নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছেন। এতদঞ্চলে সর্বপ্রথম অনুষ্ঠিত এই উৎসবে স্থানীয় জনসাধারণ আশাতীত সাড়া দিয়াছেন।

প্রাচ্যবাণীর দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন—সম্প্রতি ষ্টার রঙ্গমঞ্চে প্রাচ্যবাণীর দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত কালীপ্রসাদ খৈতান মহাশয়ের সভাপতিত্বে সুসম্পাদিত হইয়াছে। প্রাচ্যবাণীর মূল সভাপতি ডক্টর শ্রীযুক্ত বিমলা চরণ লাহা মহাশয় "প্রাচীন ভারতে শিক্ষা ও শিক্ষাপদ্ধতি" বিষয়ে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা করিলে অধিবেশনের সভাপতি মহাশয় প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের যুক্তিনিষ্ঠতাসম্বন্ধে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। যুগ্মসম্পাদক ডক্টর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী তাঁহার বার্ষিক কার্য-বিবরণীতে বলেন যে সভ্যসংখ্যা ১৯৪৫সালে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ৬০৫ জনে দাঁড়াইয়াছে এবং আজীবন সভ্য ও পেট্রনও যথাক্রমে পাঁচ জন ও দুই জন বেশী হইয়াছেন। আলোচ্য বৎসরে ২২টি আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠান হইতে প্রকাশিত ইংরাজী ত্রৈমাসিক পত্রিকা চারি খণ্ড, প্রবন্ধাবলী তিন খণ্ড এবং Sufism and Vedanta নামক গ্রন্থ সুধীবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। সভান্তে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্ত-বাগীশ রচিত "মিবারপ্রতাপম্" নামক সংস্কৃত নাটক প্রাচ্যবাণীর সদস্যগণ কর্তৃক অভিনীত হয়।

ঈশ্বরগঞ্জ (ময়মনসিং) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব—গত ২১শে ফাল্গুন এই প্রতিষ্ঠানে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ পূজা, হোম ও ভোগাদি হয়। পরবর্তী ২৫শে ফাল্গুন অহোরাত্র কীর্তন, পরদিন প্রাতে এক বিরাট শোভাযাত্রা, এবং মধ্যাহ্নে কালীকীর্তন, প্রসাদ বিতরণ এবং অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় ধর্ম-সভার আয়োজন করা হইয়াছিল। স্থানীয় মুনসেফ শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসন্ন সেন বর্মা মহাশয়ের সময়োপযোগী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সকলে প্রীতি-লাভ করেন। প্রায় দুই সহস্র নর-নারায়ণ তৃপ্তির সহিত প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছেন।

গোপীনাথপুর (মেদিনীপুর) শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের জন্মোৎসব—এই উপলক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের ষোড়শোপচারে পূজা ও হোমাদি হইলে প্রায় ছয় শত নরনারী ও দরিদ্র-নারায়ণ প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্নে একটি সভায় আশ্রমস্থ বালিকা ও ব্রহ্ম-চারিণীগণ কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্গীত, স্তব ও প্রবন্ধ পঠিত হয়। শেষে স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী শ্রীশ্রীঠাকুরের অলৌকিক জীবন ও বাণী সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বক্তৃতা করেন। সন্ধ্যায় আরাত্রিকান্তে রামায়ণ গান হইলে উৎসবকার্য শেষ হয়।

ভ্রম-সংশোধন—উদ্বোধনের ১৪২ পৃষ্ঠায় তিনটি স্থানে লিখিত "ছক্‌সিদ্ধ" স্থলে "দৃক্‌সিদ্ধ" হইবে।

নব প্রকাশিত পুস্তক

Vedanta for the Western World. Edited with an introduction by Christopher Isherwood. Gerald Heard Aldous Huxley, John Van Druten, Swami Vivekananda, Swami Prabhavananda প্রমুখ কয়েক জন মনীষার লিখিত প্রবন্ধের সমাবেশ California, The Marcel Rodd Co. কর্তৃক প্রকাশিত। ৪৫২ পৃষ্ঠা, উত্তম বাঁধাই। মূল্য ৩ ডলার ৭৫ সেণ্ট।

উদ্বোধন

ভক্তিযোগের মূলতত্ত্ব

(ভক্তির রূপ)

সম্পাদক

(১)

"ভগবানের প্রতি পরম অনুরক্তিই ভক্তি।"[১] ঈশ্বর ভিন্ন সকল প্রাণী এবং বস্তুই জন্ম অস্তিত্ব বৃদ্ধি পরিণাম অপক্ষয় ও বিনাশ এই ছয় প্রকার বিকারশীল। এই জন্য তাহাদের প্রতি অনুরক্তি অস্থায়ী এবং পরিণামে দুঃখোৎপাদক বলিয়া উহাকে ভক্তি বলা যায় না। একমাত্র ভগবানে প্রেমই যথার্থ প্রেম। কারণ, "তিনি অনির্বচনীয় প্রেমস্বরূপ।"[২] এই হেতু কেবল ভগবানের প্রতি প্রেমই ভক্তিশব্দবাচ্য। অন্যান্য প্রেম এই ভগবৎপ্রেমের অস্ফুট আভাস মাত্র।

হিন্দুশাস্ত্রমতে "ঐশ্বর্য বীর্য যশ শ্রী জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ছয়টি ভগ পূর্ণমাত্রায় যাঁহাতে বিদ্যমান,"[৩] অথবা "ভূতসমূহের উৎপত্তি বিনাশ গতি আগতি বিদ্যা ও অবিদ্যা যিনি অবগত আছেন তিনিই ভগবান"[৪]। এই গুণগুলি তাঁহার মহিমা। "এইগুলি সম্যক বোধগম্য হওয়ার ফলে তাঁহার প্রতি আন্তরিক অনুরক্তি বা প্রেমের উদয় হয়।"[৫] ঈশ্বরের মহিমাবোধ জন্মে একমাত্র "তিনিই বস্তু এবং আর সকলই অনিত্য অবস্তু,"[৬] কেবল তিনিই সত্য এবং অন্যান্য সকলই মিথ্যা ; তিনি আমাদের "শ্রবণের শ্রবণ, মনের মন, বাক্যেরও বাক্য, প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষুস্বরূপ,"[৭] এই জ্ঞান বা বিশ্বাস হইতে। এইরূপ জ্ঞান হইতে প্রথমতঃ রতি, রতি হইতে শ্রদ্ধা এবং শ্রদ্ধা হইতে প্রেমভক্তির উদয় হইয়া থাকে। তখন ভক্তহৃদয় হইতে স্বতঃই উত্থিত হয়—"হে জগদীশ, আমি ধন জন স্ত্রী বা অন্য কিছুই কামনা করি না,"[৮] আমি কেবল তোমাকেই চাই। এইরূপে সকল প্রিয় ব্যক্তি ও বস্তু হইতে মনের আসক্তি তুলিয়া আনিয়া উহা একমাত্র

১ সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।—শাণ্ডিল্যসূত্র, ১।২

২ স ঈশ্বরোঽনির্বচনীয়প্রেমস্বরূপঃ।—শাণ্ডিল্যসূত্র

৩ ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীর্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্নাং ভগ ইতীঙ্গনা ॥

৪ উৎপত্তিং চ বিনাশঞ্চ ভূতানামাগতিং গতিম্।
বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানিতি ॥

৫ ভগবন্মহিমাদিজ্ঞানাদনু পশ্চাজ্জায়মানত্বাদনুরক্তিরিত্যুক্তম্।—শাণ্ডিল্যসূত্র, ১।২, স্বপ্নেশ্বর টীকা

৬ ব্রহ্ম এব নিত্যং বস্তু, ততঃ অন্যৎ অখিলম্ অনিত্যম্।—বেদান্তসার, ১৬

৭ শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্, বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ চক্ষুষশ্চক্ষুঃ…।—কেঃ উঃ, ১।২

৮ ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।—শিক্ষাষ্টক

ভগবানে প্রয়োগ করার নামই ভক্তি। "তাঁহার বিষয়, কেবল তাঁহার বিষয় চিন্তা কর, অন্য সকল বাক্য ত্যাগ কর"[৯], এই উপদেশ যিনি পালন করেন তিনিই প্রকৃত ভক্ত।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন; "যিনি সকল প্রাণীর প্রতি দ্বেষহীন, মিত্রভাবাপন্ন, দয়ালু, মমত্ব-বুদ্ধিশূন্য, নিরহংকার, সুখে-দুঃখে সমান, ক্ষমাশীল, সর্বদা সন্তুষ্ট, সমাহিতচিত্ত, সংযতস্বভাব, তত্ত্ববিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয়, যাঁহার মন ও বুদ্ধি আমাতে অর্পিত, যিনি কাহাকেও উদ্বিগ্ন করেন না, যিনি কাহারও দ্বারা উদ্বিগ্ন হন না, যিনি আনন্দ বিষাদ ভয় ও উদ্বেগ হইতে মুক্ত, যিনি নিঃস্পৃহ, বাহ্যাভ্যন্তর-শুচিসম্পন্ন, দক্ষ, পক্ষপাতশূন্য, ভয়হীন, সকল সকাম কর্মানুষ্ঠানত্যাগী, যিনি ইষ্টপ্রাপ্তিতে হৃষ্ট হন না, অনিষ্টপ্রাপ্তিতে দ্বেষ করেন না, প্রিয়বিয়োগে শোক করেন না, অপ্রাপ্ত ইষ্টবস্তু আকাঙ্ক্ষা করেন না, শুভাশুভ কর্ম ত্যাগ করিয়াছেন, যিনি শত্রুমিত্রে, সম্মানে ও অপমানে, শীতে ও উষ্ণে এবং সুখে দুঃখে সমজ্ঞান করেন, যিনি আসক্তিহীন, সংযতবাক্, স্থিরবুদ্ধি, নিন্দা ও প্রশংসায় অবিচলিত, নির্দিষ্ট বাসহীন এবং সর্বাবস্থায় যৎকিঞ্চিৎ লাভে সন্তুষ্ট তিনিই আমার প্রিয় ভক্ত।"[১০] ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সকল লক্ষণও ভক্তের মধ্যে আপনা আপনি প্রকাশিত হয়। পক্ষান্তরে এই গুণগুলি অনুশীলন করিলে ভগবানের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ স্বতঃই বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সোজা ভাষায় ইহার নাম আন্তরিক টান। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, "তিন টান হলে তবে তিনি দেখা দেন—বিষয়ীর বিষয়ের উপর, মায়ের সন্তানের উপর, আর সতীর পতির উপর টান! এই তিন টান যদি কারও একসঙ্গে হয় সেই জোরে ঈশ্বরকে লাভ করতে পারে।"[১১] আন্তরিক টানের মানে ভগবানকে লাভ করিবার জন্য ঐকান্তিক আগ্রহ।—জলে নিমগ্ন ব্যক্তি যেরূপ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ফেলিবার জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে, সেইরূপ উৎকণ্ঠা। ইহাই প্রেমাভক্তি নামে অভিহিত। এই ভক্তি হইলেই ভগবান লাভ হয় বলিয়া ইহা সাধ্য ও সাধন উভয়ই।

ভক্তের উপাস্য ঈশ্বর সগুণ ও সাকার। কিন্তু তিনি নির্গুণ ও নিরাকার ব্রহ্ম হইতে পৃথক নহেন। উভয়ই একমেবাদ্বিতীয়ম্ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। তাঁহার বিভিন্ন ভাব হইতে বিভিন্ন নামের উদ্ভব হইয়াছে। তাঁহার নিরাকার নির্গুণ অব্যক্ত স্বরূপ ভক্তের ভক্তি ও পূজার যোগ্য নহে। ব্রহ্মের বাক্য-মনাতীত নির্গুণরূপ জ্ঞানযোগীর "নেতি নেতি"-বিচারমূলক জ্ঞানযোগগম্য। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, "তিনি সাকার, তিনি নিরাকার। কি রকম জান? যেন সচ্চিদানন্দ সমুদ্র। কূল-কিনারা নেই। ভক্তিহিমে সেই সমুদ্রের স্থানে স্থানে জল বরফ আকারে জমাট বাঁধে; অর্থাৎ

৯ তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথা-মৃতস্যৈষ সেতুঃ।—মুঃ উঃ, ২।২।৫

১০ অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্মমো নিরহংকারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥
—গীতা, ১২।১৩-১৯

১১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, প্রথম খণ্ড, ২৭ পৃঃ।

ভক্তের কাছে তিনি সাক্ষাৎ হ'য়ে কখন কখন সাকার রূপ ধরে দেখা দেন। আবার জ্ঞান-সূর্য্য উঠলে সে বরফ গলে যায়।"[১২] যাঁহারা কেবল ভক্তিযোগে উপাসনা করেন তাঁহারা সগুণ সাকার ঈশ্বরকে চান, নির্গুণ নিরাকার ঈশ্বরলাভ তাঁহাদের কাম্য নহে। তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা এমন স্থানে থাকিতে যেথানে সচ্চিদানন্দ সমুদ্রের জমাটবদ্ধ বরফ আর গলে না। প্রেমময় ভগবানের সান্নিধ্যে থাকিয়া তাঁহার প্রেমের লীলা নিত্যকাল সম্ভোগ করাই তাঁহাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। 'তুমি পূর্ণ, আমি অংশ; তুমি সর্বশক্তিমান, আমি শক্তিহীন; তুমি স্রষ্টা, আমি সৃষ্ট; তুমি প্রভু, আমি দাস; তুমি মাতা-পিতা, আমি সন্তান; তুমি রথী, আমি রথ; তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র"—প্রধানতঃ এইরূপ দাস্য ভাবালম্বনে সালোক্য-মুক্তি বা ভগবানের সহিত এক লোকে বাস—তাঁহার কৃপার পাত্র হইয়া নিত্যকাল তাঁহার সেবাধিকার অর্জনই ভক্তদের কাম্য মুক্তি। তাঁহারা স্বর্গসুখ কামনা করেন না। তাঁহারা জানেন যে যজ্ঞ ও সৎকর্মাদির ফলে মানুষের স্বর্গভোগ এবং অসৎ কর্মাদির ফলে নরক ভোগ হইয়া থাকে; কিন্তু উভয় ভোগই অস্থায়ী। "পুণ্যক্ষয় হইলে মানুষ আবার মর্তে জন্মগ্রহণ করে"[১৩]। এই জন্য অস্থায়ী স্বর্গভোগ ভক্তের কাম্য নহে। ভক্ত চান ইহজন্মে ও পরজন্মে কেবল ভগবানকে সম্ভোগ করিতে। একমাত্র অবিচ্ছিন্ন ভগবৎসান্নিধ্য-সম্ভোগই ভক্তবাঞ্ছিত মুক্তি।

ভক্তিযোগে ঈশ্বরের উপাসনা এই দেবকাম্য অবস্থালাভের উপায়। কিন্তু সর্বব্যাপী সর্বশক্তিমান অসীম অনন্ত ঈশ্বরের উপাসনা করা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্রশক্তি মানুষের পক্ষে সহজসাধ্য নয়। অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষেও ভগবানের উল্লিখিত বিশেষণগুলি নির্বস্তুক শব্দমাত্র। উহাদের অর্থবোধ করিতে তাঁহারাও আকাশ বায়ু সমুদ্র পর্বত প্রভৃতি অনন্তভাবপ্রকাশক নাম-রূপবিশিষ্ট বস্তুবিশেষের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ঈশ্বরের নির্গুণ ভাব কোন নামরূপের সাহায্য ভিন্ন মানবীয় ভাষায় সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করা সম্ভব নহে। এই জন্য ভক্তিশাস্ত্র বলে যে, ভগবানকে উপাসনা করিতে হইলে সাধারণ প্রবর্তকের পক্ষে কোন না কোন প্রতীক বা প্রতিমা অর্থাৎ নাম-রূপবিশিষ্ট বস্তু কেবল আবশ্যক নয়, পরন্তু অপরিহার্য। প্রতীক বা প্রতিমা অর্থে অবয়ববিশিষ্ট যে বস্তু ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্তরূপে উপাসনার যোগ্য তাহাই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ নামরূপের অন্তর্গত প্রকৃত পক্ষে "ব্রহ্ম নয়, এরূপ বস্তুর সাহায্যে ব্রহ্মের অনুসন্ধানই প্রতীকোপসনা।"[১৪] হিন্দুশাস্ত্র দেবদেবী শালগ্রাম বাণলিঙ্গ ঘট পট অবতার ধর্মাচার্য প্রভৃতি প্রতীক বা প্রতিমায় ঈশ্বর উপাসনা করিতে উপদেশ দেয়। প্রতীক-উপাসকের বিশেষ ভাবে জানা দরকার যে, দেবদেবীগণের দেবদেবীত্ব, অবতারগণের অবতারত্ব এবং ধর্মাচার্য ও গুরুগণের ধর্মাচার্যত্ব ও গুরুত্ব ব্রহ্ম হইতে প্রাপ্ত। ব্রহ্ম দেবতাদেরও দেবতা, অবতারদেরও অবতার, ধর্মাচার্য ও গুরুদেরও আচার্য ও গুরু। কেনোপনিষদে বর্ণিত আছে যে, দেবাসুরসংগ্রামে ব্রহ্মই দেবতাদের জন্য বিজয় করিয়াছিলেন। ব্রহ্মের বিজয়েই দেবতাগণ বিজয়ী হইয়া মহিমান্বিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, এই বিজয়-গৌরব তাঁহাদেরই প্রাপ্য। দেবতাদের এই মিথ্যা অভিমান দূর করিবার জন্য ব্রহ্ম প্রথমতঃ

১২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, প্রথম খণ্ড, ২৫৩ পৃঃ।

১৩ ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।—গীতা ৯।২১

১৪ অব্রহ্মণি ব্রহ্মদৃষ্ট্যাহনুসন্ধানম্।

—ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।৫, রামানুজভা

যক্ষ ও পরে উমারূপ ধারণ করিয়া অগ্নিদেব বায়ুদেব ও ইন্দ্রদেবকে কার্যত বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, তাঁহার শক্তিবলেই তাঁহাদের বিজয় হইয়াছে, তাঁহাদের নিজস্ব কোন শক্তি নাই এবং তাঁহাদের সকল শক্তি তাঁহা হইতে প্রাপ্ত।[১৫] এই দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণিত যে, দেবদেবী প্রভৃতি প্রতীক বা প্রতিমা স্বয়ং ব্রহ্ম বা ঈশ্বর নহে। উহা প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বর হইতে পারে না। এ জন্য উহাকে ঈশ্বররূপে উপাসনা করা বিধেয় নয়। কিন্তু ঈশ্বর প্রতীক বা প্রতিমা হইতে পারেন এবং তাঁহাকে প্রতীক বা প্রতিমা-রূপে আরাধনা করা যায়। ঈশ্বরে প্রতীক বা প্রতিমা আরোপ করায় অর্থাৎ প্রতীক বা প্রতিমাকে ঈশ্বর মনে করায় খুব দোষ আছে, কিন্তু প্রতীক বা প্রতিমায় ঈশ্বর আরোপ করায় কোন দোষ নাই। কারণ, ঈশ্বরে অন্য বস্তু আরোপ করা চলে না, কিন্তু যে কোন বস্তুতে ঈশ্বরারোপ করা যাইতে পারে। প্রতীক বা প্রতিমা-উপাসকের মনে রাখা দরকার যে, উভয়বিধ উপাসনাই সাক্ষাৎভাবে ঈশ্বরের উপাসনা নয়, উহা পরোক্ষভাবে ঈশ্বরের সন্নিহিত বস্তুর উপাসনা। প্রতীক বা প্রতিমা ঈশ্বরের সন্নিহিত বস্তু, সাক্ষাৎ স্বয়ং ঈশ্বর নহে। এই জন্য এই উপাসনা ঈশ্বরের নিকট পৌঁছিবার একটি চেষ্টা মাত্র। ইহাদ্বারা ঈশ্বরের সন্নিহিত হইবার শক্তিলাভ হয়। কেবল ঈশ্বর—একমাত্র ঈশ্বরই ভক্তের উপাস্য এবং তাঁহার উপাসনায়ই ভক্তি-মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। প্রতীক বা প্রতিমা উপাস্য হইতে পারে না। উহা ঈশ্বরের উদ্দীপক কারণ মাত্র। তবে যে স্থলে প্রতীক বা প্রতিমার সহায়তায় সর্বব্যাপী ব্রহ্মের উপাসনা করা হয়, প্রতীক বা প্রতিমাকে প্রতীক বা প্রতিমারূপে না দেখিয়া জগৎকারণ ঈশ্বররূপে চিন্তা করা হয়, সেই ক্ষেত্রে এইরূপ উপাসনা বিশেষ ফলপ্রদ। যদি প্রতীক বা প্রতিমা কোন দেবদেবী বা মহাত্মার স্থলাভিষিক্ত হয়, তাহা হইলে তাঁহার উপাসনায় বিশেষ কোন শক্তি লাভ হইতে পারে, কিন্তু ঐ দেবদেবী বা মহাত্মা যদি ব্রহ্ম বা ঈশ্বররূপে দৃষ্ট ও উপাসিত হন, তাহা হইলে উহা ঈশ্বরোপাসনার তুল্য ফলপ্রসূ হয় এবং উহাদ্বারা ভক্তি-মুক্তি উভয়ই লাভ হইয়া থাকে। দেবদেবী বা মহাপুরুষদের দেবদেবীত্ব বা মহাপুরুষত্ব ভুলিয়া তাঁহাদিগকে ব্রহ্ম বা ঈশ্বররূপে উপাসনা করিলেও ঈশ্বরোপাসনার তুল্য হয় এবং উহাদ্বারা ভক্তি-মুক্তি উভয়ই লাভ হইতে পারে। কারণ, এইরূপ ক্ষেত্রে একমাত্র ঈশ্বরই দেবদেবী বা মহাপুরুষের স্থানে অধিষ্ঠিত হন। উপনিষৎ বলে যে, বস্তুমাত্রেরই নাম-রূপ ত্যাগ করিয়া উহাতে যথার্থ ব্রহ্মদৃষ্টি আরোপিত হইলে উহা ব্রহ্মই হইয়া দাঁড়ায়। উপাসক প্রতীক বা প্রতিমার সাহায্যে ঈশ্বরো-পাসনায় অগ্রসর হইলে—বৈধী ভক্তি অতিক্রম করিয়া রাগানুগা ভক্তিতে উপনীত হইলে, বিধিসঙ্গত ভাবে প্রতীক বা প্রতিমা পূজা করা তাঁহার পক্ষে আর সম্ভব হয় না।

ঈশ্বরের অবতারগণের মধ্যে ঈশ্বরীয় ভাব অত্যন্ত পরিস্ফুট বলিয়া ভক্তগণ তাঁহাদের উপাসনা করেন। প্রকৃতপক্ষেও অবতারগণ মানুষের মধ্যে ভগবানের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। এই নরদেবতাগণ ঈশ্বর সম্বন্ধে মানুষের ধারণা অপেক্ষাও অনেক উচ্চে অবস্থিত। এই জন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের প্রামাণিক গ্রন্থ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে:

"কৃষ্ণের যতেক লীলা, সর্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু যাহাতে প্রকাশ।"

—আদিলীলা

সাধারণ নরনারীর পক্ষে ভগবানের অবতার ব্যতীত ভগবানকে দেখিবার ও বুঝিবার অন্য

১৫ কেঃ উঃ, ৩।১-১২, ৪।১-৩

কোন সহজ উপায় নাই। এই নরদেবগণ মানুষরূপে আবির্ভূত হইয়া আপনাদের জীবন দিয়া দেখান যে, ভগবান কিরূপ এবং তাঁহাকে লাভ করিবার উপায় কি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "সাধুদিগের পরিত্রাণ, দুষ্টের বিনাশ এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।"[১৬] ইতিহাসও সাক্ষ্য দেয় যে, অবতারগণের আবির্ভাবে জগতে যথার্থই এক অভিনব ধর্মের স্রোত প্রবাহিত হয়। এই নরদেবগণ—এমন কি ইঁহাদের অন্তরঙ্গ শিষ্যগণ পর্যন্ত দর্শন স্পর্শ বা শুভ ইচ্ছা দ্বারা মানুষের ভিতর ভগবদ্ভাব সঞ্চার করিয়া দেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ এই অতি-মানবগণকে চিনিতে পারে না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "আমি মনুষ্যদেহ ধারণ করিলে আমার পরম স্বরূপ না জানিয়া মূঢ়গণ আমাকে অবজ্ঞা করে।"[১৭]

ভক্তগণ এই নরদেবতাগণের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিয়া তাঁহার উপাসনা করেন। প্রকৃতপক্ষে মানবপ্রকৃতির অতীত ভগবৎশক্তির বিকাশ অবতারগণের মধ্যে স্পষ্ট দেখা যায়। এই জন্য ইঁহারা নরদেহধারী হইয়াও ঈশ্বররূপে উপাসিত হন। গুণগ্রাহী ভক্তগণ ইঁহাদের জীবন দেখিয়া এবং উপদেশ শুনিয়া ইঁহাদিগকে ঈশ্বররূপে উপাসনা না করিয়া থাকিতে পারেন না। এই সকল অতিমানব অপেক্ষা অন্য কোন উন্নত জীবের ধারণা করিতে মানুষ প্রকৃতই অসমর্থ। নির্গুণ ও নিরাকার ঈশ্বরের যথার্থ ধারণা করা সাধারণ মানুষের সাধ্যাতীত। কেবল পরম জ্ঞানিগণই এই ঈশ্বরের ধারণা এবং উপাসনা করিতে সমর্থ। সগুণ ও সাকার ঈশ্বরকে মানুষ প্রধানতঃ মানুষরূপেই পূজা করে। দেবদেবীগণও মূলতঃ মানুষ আকারেই উপাসিত। শালগ্রাম ও বাণলিঙ্গ প্রতীকের পশ্চাতে কল্পিত হয় মানুষতুল্য দেহধারী নারায়ণ ও শিব। নরদেহধারী অবতারকে ভক্তগণ সগুণ ও সাকার ঈশ্বররূপেই পূজা করিয়া থাকেন।

হিন্দুশাস্ত্র গুরুকেও ঈশ্বররূপে পূজা করিতে শিক্ষা দেয়। গুরুপূজা ভক্তিসাধনার একটি অঙ্গ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্তরাজ উদ্ধবকে বলিয়াছেন, "আচার্যকে (গুরুকে) আমার (ঈশ্বরের) স্বরূপ জানিবে। মনুষ্যবুদ্ধিতে তাঁহাকে কখনও অবমাননা করিবে না। গুরুকে সর্বদেবময় বলিয়া চিন্তা করিবে।"[১৮] হিন্দুমাত্রেরই সুবিদিত "গুরুই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ও পরমব্রহ্ম"[১৯] এবং "ধ্যানের মূল গুরুমূর্তি, পূজার মূল গুরুপদ, মন্ত্রের মূল গুরুবাক্য ও মোক্ষলাভের মূল গুরুকৃপা"[২০] প্রভৃতি গুরুস্তবেও গুরুকে ঈশ্বররূপে উপাসনা করিবার মাহাত্ম্য বিশেষ পরিস্ফুট। তন্ত্রসারে লিখিত আছে, "যে ব্যক্তি গুরুকে মনুষ্য, মন্ত্রকে অক্ষর ও দেবমূর্তিকে শিলা মনে করে, সে নরকে গমন করিয়া থাকে।"[২১] গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্রও গুরুকে ঈশ্বররূপে উপাসনা করিতে শিক্ষা দেয়, যথা :

"গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে।"

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা

১৬ পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥
—গীতা, ৪।৮

১৭ অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥
—গীতা, ৯।১১

১৮ আচার্যং মাং বিজানীয়াৎ নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্বদেবময়ো গুরুঃ ॥
—শ্রীমদ্ভাগবত, ১১।২২

১৯ গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুঃ গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ !
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

২০ ধ্যানমূলং গুরুমূর্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদম্।
মন্ত্রমূলং গুরুবাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা ॥

২১ গুরৌ মানুষবুদ্ধিস্তু মন্ত্রে চাক্ষরবুদ্ধিকং।
প্রতিমাসু শিলাবুদ্ধিং কুর্বাণো নরকং ব্রজেৎ ॥

গুরুনির্বাচন ভক্তিযোগসাধনার একটি প্রধান অঙ্গ। হিন্দুশাস্ত্রে গুরু ও শিষ্যের লক্ষণ বর্ণিত আছে। উপনিষৎ বলে, "ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্য শাস্ত্রজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট গমন করিবে।"[২২] তন্ত্রসারে লিখিত আছে, "যিনি শান্ত, সংযতেন্দ্রিয়, সদ্বংশজাত, বিনীত, পবিত্রবেশধারী, শুদ্ধাচারী, সৎকার্যদ্বারা যশস্বী, শুচি, ধর্মকার্যে অভিজ্ঞ, বুদ্ধিমান, গার্হস্থ্য বা সন্ন্যাস আশ্রমধর্মপালনকারী, ধ্যানী, তন্ত্রমন্ত্রে বিশেষজ্ঞ, নিগ্রহ ও অনুগ্রহে সমর্থ তিনিই গুরু হইবার যোগ্য।"[২৩] আচার্য শংকর বলিয়াছেন, "যিনি বেদজ্ঞ, শুদ্ধচেতা, কামগন্ধহীন, ব্রহ্মবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ, তিনিই গুরু।"[২৪] বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে উপদিষ্ট হইয়াছে, "অগস্ত্য-সংহিতা মতে দেবোপাসক, শান্ত, বিষয়নিস্পৃহ, অধ্যাত্মবেত্তা, ব্রহ্মবাদী, বেদশাস্ত্রের অর্থবিশারদ, মন্ত্রোদ্ধারে ও মন্ত্রসংহারে সক্ষম, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, যন্ত্র-মন্ত্রতত্ত্ববিদ্‌, মর্মবেত্তা, রহস্যবিদ্‌, পুরশ্চরণশীল, হোমমন্ত্রসিদ্ধ, মন্ত্রাদির প্রয়োগবেত্তা, তপস্বী, সত্যভাষী ব্যক্তিই গুরু নামে অভিহিত।"[২৫]

"অনভিজ্ঞ গুরুকর্তৃক উপদিষ্ট হইলে আত্মাকে সম্যক্‌রূপে জানা যায় না।"[২৬] দেখা যায় যে, সর্ববিধ লৌকিক বিদ্যাও অভিজ্ঞ গুরুর নিকট শিক্ষা লাভ করিতে হয়। যিনি যে বিদ্যায় অনভিজ্ঞ তাঁহার নিকট সে বিদ্যা শিক্ষা করা সম্ভব নয়। অলৌকিক আধ্যাত্মিক বিদ্যার্জন করিতে অভিজ্ঞ গুরুর আবশ্যকতা আরও বেশী। লৌকিক বিদ্যা-শিক্ষকের চরিত্রে দোষ থাকিলেও শিক্ষার্থী উহা অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার নিকট শিক্ষালাভ করিতে পারেন, কিন্তু আধ্যাত্মিক বিদ্যাশিক্ষকের চরিত্র সম্পূর্ণ নির্দোষ হওয়া দরকার। কারণ, যিনি শিষ্যের নিকট ঈশ্বর-রূপে পূজিত তাঁহার চরিত্রে কোন দোষ থাকা বাঞ্ছনীয় নহে।

পক্ষান্তরে শিষ্যেরও উপযুক্ত গুণ থাকা দরকার। উপনিষৎ বলে, "যে ব্যক্তি বালক (বালকের ন্যায় বিবেকহীন), প্রমাদগ্রস্ত এবং ধনমোহে বিমূঢ়, তাহার নিকট ধর্মতত্ত্ব প্রতিভাত হয় না।"[২৭] এই কারণে "ধর্মের বক্তাও আশ্চর্য এবং লব্ধাও কুশলী হওয়া আবশ্যক।"[২৮] শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস মতে "শুদ্ধকুলজাত, শ্রীমান, বিনয়বান, প্রিয়দর্শন, সত্যভাষী, পবিত্রচরিত্র, মহামতি, দম্ভহীন, কাম-ক্রোধশূন্য, গুরুভক্ত, কায়মনোবাক্যে অহর্নিশ দেবপরায়ণ, নীরোগ, অশেষ পাতকজয়ী, শ্রদ্ধাবান, নিত্য দেবতা বিপ্র ও পিতৃপুরুষগণের পূজারত, যুবা, নিখিল ইন্দ্রিয়বিজয়ী ও করুণানিধান শিষ্যই দীক্ষালাভের যোগ্য।"[২৯] গুরু ও শিষ্য উভয়েই

২২ তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।—মুঃ উঃ, ১।২।১২

২৩ শান্তো দান্তঃ কুলীনশ্চ বিনীতঃ শুদ্ধবেশবান্।
শুদ্ধাচারঃ সুপ্রতিষ্ঠঃ শুচির্দক্ষঃ সুবুদ্ধিমান্॥
আশ্রমী ধ্যাননিষ্ঠশ্চ তন্ত্রমন্ত্রবিশারদঃ।
নিগ্রহানুগ্রহে শক্তো গুরুরিত্যভিধীয়তে॥
—তন্ত্রসার

২৪ শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতো যো ব্রহ্মবিত্তমঃ।
—বিবেকচূড়ামণি

২৫ দেবতোপাসকঃ শান্তো বিষয়েষ্বপি নিঃস্পৃহঃ।
অধ্যাত্মবিদ্ ব্রহ্মবাদী বেদশাস্ত্রার্থকোবিদঃ॥
উদ্ধর্তুং চৈব সংহর্তুং সমর্থো ব্রাহ্মণোত্তমঃ।
তত্ত্বজ্ঞো যন্ত্রমন্ত্রাণাং মর্মভেত্তা রহস্যবিৎ॥
পুরশ্চরণকৃদ্ধোমমন্ত্রসিদ্ধঃ প্রয়োগবিৎ।
তপস্বী সত্যবাদী চ গৃহস্থো গুরুরুচ্যতে॥
—শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস, ১।৩১

২৬ ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ।—কঃ উঃ, ১।২।৮

২৭ ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্।—কঃ উঃ, ১।২।৬

২৮ আশ্চর্যো বক্তা, কুশলোঽস্য লব্ধা।
—কঃ উঃ, ১।২।৭

২৯ শিষ্যঃ শুদ্ধান্বয়ঃ শ্রীমান্ বিনীতঃ প্রিয়দর্শনঃ।
সত্যবাক্ পুণ্যচরিতোঽদভ্রধীর্দম্ভবর্জিতঃ॥

উপযুক্ত হইলে তাঁহারা পরস্পরের প্রতি আপনা আপনি আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, "চুম্বক পাথর কি লোহাকে বলে, তুমি আমার কাছে এস? এস—বলতে হয় না, লোহা আপনি চুম্বক পাথরের টানে ছুটে আসে। প্রদীপ জ্বাললে বাদুড়ে পোকাগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে আপনি আসে—ডাকতে হয় না। তার নিজের এমনি টান যে লোক তার কাছে আপনি আসে।"[৩০] পক্ষান্তরে বিশেষ আবরণে আবৃত লোহা চুম্বক পাথরের টানেও আকৃষ্ট হয় না। প্রদীপ জ্বালিলেও অনেক বাদুড়ে পোকা উহা দেখিতে পায় না। এই জন্ম গুরু ও শিষ্য উভয়ের যোগ্যতার উপরই ভক্তি-পথে সাধনার সাফল্য নির্ভর করে। গুরু শিষ্য "অন্ধপরিচালিত অন্ধের স্থায় হইলে পথভ্রষ্ট হইয়া দুর্দশা ভোগ করিয়া থাকে।"[৩১] তাঁহারা উভয়ে উপযুক্ত হইলে সোনায় সোহাগা সংযোগের স্থায় ভক্তি সাধন ফলপ্রদ হয়।

সমগ্র ভক্তিশাস্ত্র সমস্বরে বলে যে, একমাত্র

> কামক্রোধপরিত্যাগী ভক্তশ্চ গুরুপাদয়োঃ।
> দেবতাপ্রবণঃ কায়মনোবাগ্‌ভির্দিবানিশং॥
> নীরুজো নির্জিতাশেষপাতকঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
> দ্বিজদেবপিতৃণাঞ্চ নিত্যমর্চাপরায়ণঃ॥
> যুবা বিনিয়তাশেষকরণঃ করুণালয়ঃ।
> ইত্যাদিলক্ষণৈর্যুক্তঃ শিষ্যো দীক্ষাধিকারবান্‌॥
>
> —শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস, ১।৪৩

অভিজ্ঞ গুরুই শিষ্যের উপযোগী উপাস্য ইষ্টনির্বাচন এবং তাঁহাকে লাভ করিবার কার্য-করী উপায় দেখাইতে পারেন। ধর্মগ্রন্থের নির্দেশ বা স্বেচ্ছায় ইষ্টনির্বাচন করিয়া যথেচ্ছা তাঁহার উপাসনা বিদ্বান ও বুদ্ধিমানের পক্ষেও ফলপ্রদ হয় না। কারণ, পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধি আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার পরিচায়ক নহে। পণ্ডিত ও মূর্খ-নির্বিশেষে অধিকাংশ নরনারীই আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে শিশুতুল্য। শিশুকে যেমন সকল বিষয়ে তাহার অভিভাবকের উপর নির্ভর করিতে হয়, ধর্মের প্রবর্তকগণকে সকল বিষয়ে তেমন গুরুর উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হয়। সাধারণ মানুষের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক শক্তি জাগ্রত করিতে হইলে অপেক্ষাকৃত অধিকতর আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন মানুষের সাহায্য গ্রহণ করা আবশ্যক। কারণ, কেবল এক আত্মাই অপর আত্মায়—এক মানুষই অপর মানুষে আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চার করিতে পারেন। ভক্তিশাস্ত্র বলে যে, গুরু শিষ্যকে তাঁহার উপাস্য ইষ্ট এবং তাঁহাকে লাভ করিবার উপায় দেখাইয়া তাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হন। শিষ্য ইষ্টকে সর্বস্ব মনে করিয়া তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য একান্ত নিষ্ঠাসহকারে সাধন-সমুদ্রে ডুবিয়া যান। ভক্তিযোগমতে সাধারণতঃ কোন দেব বা দেবী অথবা অবতার ভক্তের উপাস্য ইষ্ট নির্বাচিত এবং তাঁহাকে লাভ করিবার উপায়রূপে প্রথমতঃ বৈধী ভক্তি নির্দিষ্ট হইয়া থাকে।

৩০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, প্রথমভাগ, ১৬২ পৃঃ
৩১ অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ।—কঃ উঃ, ১।২।৫

মানিক রাজার আম বাগান

স্বামী প্রেমেশানন্দ

মানিক রাজার রম্য রসাল কাননে
তোমার খেলার সাথী হব,
কামারপুকুরে তব সখাগণ সনে
আমি তব সাথে সাথে রব।
কি তৃপ্তি, কি শান্তি হেথা জুড়াল জীবন,
গদাই, আমারে ফিরায়োনা,
অনাদি জীবন-পথ অযুত যোজন
আমি আর চলিতে পারি না।

বিশ্বজুড়ি উৎসবের নিত্য আয়োজন,
নিত্য নব তপন উদয়,
সৃষ্টিরঙ্গমঞ্চে নব দৃশ্য উদ্‌ঘাটন,
জীবনের নিত্য অভিনয়।
প্রতিজন্মে কত খেলি, 'হাসি-কান্না খেলা'
কেন খেলি কিছুই না বুঝি,
কি চাই, কেন যে চাই, কেন এত জ্বালা,
ততই হারাই যত খুঁজি।
তোমার মধুর গানে মুখর গগন
আজ পশিয়াছে কানে মোর,
শত জন্ম হেরিলাম কত দুঃস্বপন
তুমি ভেঙ্গে দিলে ঘুমঘোর।

নানারূপে ধরাতলে এলে বার বার,
আমারে করেছ অবহেলা,
চিরকাল তোমারে খুঁজেছি অনিবার,
শূন্য হিয়া খেলি, ধুলোখেলা।
বোঝ না কি, কত ব্যথা হলে তোমাহারা
বুকভরা কত হাহাকার,

কত কাল—কত কাল পরে দিলে ধরা
দূরে রাখিও না মোরে আর।
আজ হতে, গদাধর, রব তোমা সনে
চিদাকাশে আনন্দ সায়রে,
কামারপুকুরে, এই রসাল কাননে,
যেথা লীলা আমোদর তীরে।

তুমি নাকি অনাবৃত অগুণ চেতন
তুমি আমি মিশে একাকার!
দ্বিজ শিশুরূপে চেয়ে আছ প্রাণমন,
অবসর কোথা ভাবনার!
আমার নয়ন মনে কি দারুণ তৃষা
তোমার মানুষরূপ তরে,
বুকের ভিতরে মোর বাঁধিয়াছ বাসা
তবু কেন ছিলে দূরে দূরে।
হেথা নিত্য নব খেলা নিত্য নব গান
চেতন-কণিকা সখা সনে,
ঘুরে মরি আমি তার না পেয়ে সন্ধান
'নিত্যলীলা' রসাল কাননে।

যা কিছু চেয়েছি যবে অন্তরে বাহিরে
ছিল—আছে যত প্রয়োজন
বুঝিনি, আমি যে শুধু চেয়েছি তোমারে
শতকল্প সাধনার ধন।
আজ হল নিরন্তর নিবিড় মিলন
মনে মনে নয়নে নয়নে,
জীবন-মরণব্রত হ'ল উদ্‌যাপন।
আমারে নিঃশেষে বিতরণে।
আমি—রব তোমা সনে
আজ হতে চিরদিন রসাল কাননে।

চীনের ঋষি কন্‌ফুসিয়াস

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

প্রাগ্‌বৌদ্ধ যুগে যে সকল ধর্মগুরু জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন কন্‌ফুসিয়াস তাঁহাদের অন্যতম। চীনের ধর্মসমাজে ঋষি লাউৎজের পরেই তাঁহার স্থান। কন্‌ফুসিয়াস ছিলেন লাউৎজের কনিষ্ঠ সমসাময়িক। উভয় ঋষির মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহা চৈনিক সাহিত্যে অদ্যাপি বর্তমান। কন্‌ফুসিয়াস কোন ধর্মমত প্রচার করেন নাই; উপাসনা, পূজা, ঈশ্বরে বা আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক ধর্মবিষয়ে তিনি নীরব ছিলেন। নৈতিক জীবন গঠনই তাঁহার প্রধান বাণী। সেইজন্য কন্‌ফুসিয়ান শাস্ত্রে এই উপদেশটী ছয়বার উল্লিখিত আছে: "যাহা তোমার প্রতি কেহ করিলে তুমি অসন্তুষ্ট হও, তাহা অপরের প্রতি কখনও করিও না।"

খ্রীষ্টপূর্ব ৫৫২ অব্দে কন্‌ফুসিয়াস চীনের শাণ্টাং প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ছিলেন জনৈক বৃদ্ধ সৈনিক। সত্তর বৎসর বয়সেও তাঁহার কোন পুত্রলাভ না হওয়ায় তিনি স্বীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনের চিন্তায় উদ্বিগ্ন হন; কারণ ঔরস পুত্র ব্যতীত উক্ত ক্রিয়ার অন্য কেহ উপযুক্ত অধিকারী হইতে পারে না। অবশ্য তাঁহার প্রথমা পত্নীর গর্ভে নয়টী কন্যা ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল এবং একটী উপপত্নীর গর্ভে দুইটী পুত্রও ছিল। কিন্তু শাস্ত্রমতে ইহাদের কেহই পিতার শেষানুষ্ঠান বা পারিবারিক পূজার যোগ্য হইতে পারে না। বৃদ্ধ প্রথমা (বিবাহিতা) পত্নীকে ত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় বিবাহ করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি ছিলেন প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত কুং বংশের সন্তান। তিনি সমান ভাবে কোন উচ্চ বংশের কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়া ইয়েন বংশের কোন ব্যক্তির নিকট উপনীত হইলেন। এই ব্যক্তির তিনটী কন্যা ছিল। পিতা কন্যাত্রয়কে ডাকিয়া সমাগত বৃদ্ধ সৈনিকের মনোভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন। পিতার নিকট পরিণয়াকাঙ্ক্ষীর দোষগুণ শ্রবণান্তে প্রথম কন্যাদ্বয় মৌন রহিল। তৃতীয় কন্যা চিং-শে, অগ্রসর হইয়া পিতাকে প্রণামপূর্বক সম্মতিসূচকভাবে বলিলেন, "পিতা, আপনি আমাদের অনুমতি অপেক্ষা করিতেছেন কেন? আপনিই আমাদের একজনকে মনোনীত করুন।" পিতা উত্তর করিলেন, "তুমিই নির্বাচিতা হইলে।" বিবাহের এক বৎসর পরে অষ্টাদশবর্ষীয়া পত্নীর গর্ভে বৃদ্ধ সৈনিকের যে পুত্রলাভ হয় তিনিই জগৎবরেণ্য কন্‌ফুসিয়াস। কন্‌ফুসিয়াসের পঞ্চসপ্ততিতম ও ষষ্ঠসপ্ততিতম বংশধরগণ অদ্যাপি একই স্থানে সসম্মানে বাস করিতেছেন।

চিং-শে'র পুত্রের আদি নাম কন্‌ফুসিয়াস ছিল না। প্রকৃতপক্ষে কন্‌ফুসিয়াস জীবনেও তাঁহার এই নাম শোনেন নাই। তাঁহার আসল নাম ছিল কুং-ফুৎজে। ষোড়শ শতাব্দীতে চীনে যে জেসুট পাদ্রীগণ ছিলেন তাঁহারা কুংফুৎজে শব্দের লাটিন বানান ও উচ্চারণ করিলেন কন্‌ফুসিয়াস। এই নামেই চৈনিক ঋষি বিশ্ববিখ্যাত। উক্ত জেসুট পাদ্রীগণ রোমের পোপের নিকট কন্‌ফুসিয়াসের নাম ক্যাথলিক চার্চের সন্তুতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কুংফুৎজে নামের কুং শব্দের অর্থ আচার্য। কিন্তু এই নাম তাঁহাকে জন্মকালে দেওয়া হয় নাই। কিন্ (বা ছোট পাহাড়) নামেই

কন্‌ফুসিয়াস প্রথমে অভিহিত হন। তাঁহার মস্তকটী অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ছিল অথবা তাঁহার জন্মস্থানে একটী ক্ষুদ্র পাহাড় ছিল বলিয়াই হয়ত লোকে তাঁহাকে কিন্ বলিত। বাল্যকালেই তিনি দ্বিতীয় নাম চুং নি প্রাপ্ত হন। চুং নি শব্দের অর্থ দ্বিতীয় পর্বত 'নি'। তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতার নাম ছিল 'প্রথম পর্বত নি'। বৈমাত্রেয় ভ্রাতার জন্ম হয় পিতার উপপত্নীর গর্ভে। সুতরাং বাল্যকালে কন্‌ফুসিয়াসের প্রকৃত নাম ছিল চুং নি। পরবর্তী কালে শিষ্য প্রশিষ্যগণ যে সকল ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায়—বাল্যে তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার বিকাশ হয়। তিনি যখন মাতৃগর্ভে শায়িত, তখন চিং-শে'র নিকট দেবদূত আভির্ভূত হইয়া বলেন, "তোমার গর্ভে এমন এক সন্তান জন্মগ্রহণ করিবেন যাঁহার অলৌকিকী প্রজ্ঞা থাকিবে।" কিলিন নামক দেবপশু আসিয়া এক প্রস্তরখণ্ড চিং-শে'র সম্মুখে স্থাপন করিলেন; প্রস্তরে খোদিত আছে: "তোমার পুত্র সিংহাসনশূন্য সম্রাট হইবে।" চীনে প্রবাদ আছে যে, ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে এক পর্বতগুহায় তাঁহার জন্ম হয়।

কন্‌ফুসিয়াসের জন্মকালে চীনের সমাজ অতিশয় বিশৃঙ্খল ছিল। তখন চু রাজবংশ পতনোন্মুখ। দেশের বিভিন্ন রাজবংশের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ হইত। রাজকর আদায়কারী কর্মচারিগণের অত্যাচারে প্রজাগণ অতিষ্ঠ হইয়া পড়িল। শাসন-বিভ্রাটে এত অরাজকতা সৃষ্ট হইয়াছিল যে কন্‌ফুসিয়াসের জীবিতাবস্থায় দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ইহা নিম্নোক্ত ঘটনা হইতে প্রমাণিত হয়। একদা শিষ্য-সমভিব্যাহারে কন্‌ফুসিয়াস তাই (Tai) পর্বতের পার্শ্ব দিয়া অরণ্যপথে ধীরপদবিক্ষেপে যাইতেছিলেন। এমন সময় অদূরাগত ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। শব্দের সমীপবর্তী হইয়া দেখিলেন এক শোকাতুরা নারী চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে। কেন সে এই জনশূন্য স্থানে কাঁদিতেছে—এই প্রশ্নের উত্তরে রোরুদ্যমানা নারী কহিলেন, "আমার পতি, তাঁহার পিতা এবং আমার একমাত্র পুত্র ব্যাঘ্র কর্তৃক নিহত হইয়াছে। অত্যাচারী শাসকের ভয়ে এই বিপদসঙ্কুল স্থানে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছি।" ঋষি কন্‌ফুসিয়াস শিষ্যগণের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্বক বলিলেন, "দেখ ব্যাঘ্র অপেক্ষা অত্যাচারী শাসক অধিকতর ভীতিপ্রদ।" ইঁহার বাল্যকালের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। চৌদ্দ বৎসর বয়সে তিনি শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। তাঁহার শিক্ষক যখন দেখিলেন যে বালক তাঁহার সকল বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছে তখন তিনি ছাত্রকে স্বীয় বিদ্যালয়ে পড়াইতে অনুমতি দিলেন। কন্‌ফুসিয়াস নিজমুখেও বলিয়াছেন—"পনের বৎসর বয়সে আমার মন বিদ্যার্জনে নিরত ছিল।" কন্‌ফুসিয়াস যৌবনে সুদক্ষ শিকারী সুনিপুণ সারথি এবং সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। কেহ বলেন তাঁহার জন্মের পূর্বে, আবার কেহ বলেন জন্মের তিন বৎসর পরে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। সেইজন্য স্কুলের ছুটির পর পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জন করিতেন পরিবার প্রতিপালনের জন্য। ক্ষুদ্র পরিবারের আয়-বৃদ্ধির জন্য মাছ ধরা ও শিকার করা প্রভৃতি বৃত্তি তিনি অবলম্বন করিয়াছিলেন।

ঋষি কন্‌ফুসিয়াস লু রাজ্যে বাস করিতেন। সেই রাজ্যে সতের বৎসর বয়সে তিনি একটি সরকারী পদ প্রাপ্ত হন। পদটি উচ্চ না হইলেও সম্মানার্হ ছিল। তিনি রাজকীয় শস্যভাণ্ডারের তত্ত্বাবধায়ক হইয়াছিলেন এবং সরকারী ভূমির তদন্ত করিতেন। কর্তব্য কর্মের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় নিষ্ঠা ছিল। এই নিষ্ঠার দ্বারা তিনি কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করেন। একবার এক ভূমিখণ্ড লইয়া কয়েকটি প্রজার মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। সেই বিরোধ মীমাংসা উপলক্ষে তিনি যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন—তাহাই তাঁহার জীবনের প্রথম বক্তৃতা।

বিবাদকারিগণের নিকট বিবাদের অনাবশ্যকতা প্রদর্শনের ছলে তিনি জীবন-তত্ত্ব সম্বন্ধে অমূল্য উপদেশ প্রদান করেন। কন্‌ফুসিয়াস জীবনদর্শনের যে উদার নীতি প্রদান করিয়াছেন—তাহা জগতে অতুলনীয়। বিবদমান প্রজাদিগকে সময়ে সময়ে তিনি যে উপদেশ দিতেন—তাহাই জীবন-নীতির সার্বভৌমিক সূত্ররূপে চীনে পরিগৃহীত। তাঁহার সাত শতাব্দী পূর্বে ইহুদী ধর্মগুরু মুশা এবং ছয় শতাব্দী পরে যীশুখ্রীষ্ট যে নৈতিক উপদেশ প্রদান করিয়াছেন—তাহা কন্‌ফুসিয়ান নীতির ব্যাখ্যা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তখন তাঁহার বয়স সতের কি আঠার বৎসর মাত্র ছিল। সেই অল্প বয়সেই তিনি জীবনতত্ত্বের যে দিব্যালোক লাভ করিয়াছিলেন তাহাই সামাজিক জীবনের ভিত্তিরূপে এখনও চীন-দেশে বর্তমান। তাঁহার উপদেশ হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে যৌবনেই তিনি তাঁহার জীবনের মিশন অবগত হন। কর্তব্য-পরায়ণতার জন্য তাঁহার আয়-বৃদ্ধি হইল এবং সমাজের জনৈক অধিনায়করূপে তিনি পরিগণিত হইলেন।

উনিশ বৎসর বয়সে কন্‌ফুসিয়াস বিবাহিত হন। বিবাহের এক বৎসর পরে খৃষ্টপূর্ব ৫৩১ অব্দে তাঁহার এক সন্তান লাভ হয়। তাঁহার পত্নী সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। কন্‌ফুসিয়ান সাহিত্যের একটি মাত্র স্থানে উল্লিখিত আছে যে তৎপুত্র মাতার মৃত্যুতে যখন শোকসন্তপ্ত হন তখন পিতা তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতেছেন। লু ষ্টেটের সরকারী শাসক তাঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। তাঁহার জন্মোৎসবকালীন ভোজে উক্ত ডিউক তাঁহাকে দুইটি দুষ্প্রাপ্য শুভ মৎস্য উপহার-স্বরূপ প্রেরণ করেন। শিষ্টাচারে কন্‌ফুসিয়াস অতিশয় কুশলী ছিলেন। ডিউকের উপহার প্রাপ্তির স্মৃতিচিহ্নরূপে তিনি স্বীয় পুত্রের নামকরণ করেন লি। চীনা ভাষায় লি শব্দের অর্থ পবিত্র মৎস্য। যে সময়ে কন্‌ফুসিয়াস পুত্রলাভ করেন সেই সময় বুদ্ধদেবের পুত্র রাহুলের জন্ম হয়। প্রবাদ আছে যে তাঁহার দুইটি কন্যা হইয়াছিল কিন্তু বিবাহের প্রায় চারি বৎসর পরে পত্নীর সহিত তাঁহার স্থায়ী বিচ্ছেদ ঘটে। এই সময়েই তাঁহার মাতা পরলোক গমন করেন। চৈনিক প্রথা অনুসারে পুত্রকে মাতার বা পিতার মৃত্যুতে দীর্ঘকাল শোক প্রকাশ করিতে হয়। কন্‌ফুসিয়াস প্রায় সাতাইশ মাস মাতার কবরের পার্শ্বে শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন। মাতার মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়স হইয়াছিল মাত্র চব্বিশ বৎসর। তাঁহার মাতা চিং-শে কন্‌ফুসিয়াসের নিকট মাতা ও পিতা উভয়ের স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। অল্পবয়সে পিতার লোকান্তর হওয়ায় মাতা পুত্রের অবিচ্ছেদ্য অভিভাবিকা হইয়াছিলেন। মাতার মৃত্যুতে কন্‌ফুসিয়াস জীবন-পথে অন্ধকার দেখিলেন এবং তাহাতে দীর্ঘকাল শোক করার জন্যই সম্ভবতঃ পত্নীর সহিত তাঁহার চির-বিচ্ছেদ ঘটে।

মাতার মৃত্যুর পরেই তাঁহার জীবনের প্রকৃত মিশন আরম্ভ হয়। প্রচারকার্যের জন্য যৌবনেই তিনি পরিব্রাজকের জীবন আরম্ভ করেন। এই সময়ে কয়েকটি শিষ্য তাঁহার নিকট আগমন করেন। শিষ্যগণকে সঙ্গে লইয়াই তিনি প্রচারকার্যে মনোনিবেশ করেন। তাঁহার পরিব্রাজক জীবনের ভ্রমণকাহিনী একেবারে অজ্ঞাত। দেশের প্রাচীন সংস্কৃতিকে যুগোপযোগী করিয়া প্রচার করাই ছিল তাঁহার জীবন-ব্রত। স্বীয় জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে সহজ সরল ভাষায় এমন হৃদয়গ্রাহী করিয়া পুরাতন জ্ঞানরাশিকে তিনি ব্যাখ্যা করিতেন যে জনসাধারণ তাহা শুনিবার জন্য দলে দলে তাঁহার নিকট আসিতে লাগিল। চীন দেশের লক্ষ লক্ষ নরনারীর দৈনিক জীবনে কন্‌ফুসিয়াসের নীতিবাক্য বহু শতাব্দী যাবৎ যে প্রগাঢ় প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে বিশ্বাস হয় না। চীন দেশের অন্য দুই ধর্মগুরু লাউৎ-জে ও বুদ্ধদেব

অবশ্য দেশের সর্বত্র সমপূজিত হইয়াছেন; তথাপি চীনের আবালবৃদ্ধবনিতা কন্‌ফুসিয়াসের পদানুগ বলিলেই যথার্থ হয়। একুশ কিম্বা বাইশ বৎসর বয়সেই তিনি দেশে তাঁহার নীতির প্রচারকার্য আরম্ভ করেন। সরকারী পদত্যাগ ও পত্নী-বিসর্জন করিয়া কেন যে তিনি পরিব্রাজক আচার্যের অনিশ্চিত জীবন গ্রহণ করিলেন তাহা নিশ্চিতভাবে জানিবার কোন উপায় নাই। কোন দৈব আদেশ তাঁহাকে ঐ পথে আকৃষ্ট করিল কিনা কে বলিতে পারে? আচার্যের জীবন গ্রহণ করিবার পূর্বে যীশুখৃষ্ট প্রভৃতি জগৎগুরুগণ যে সাধক-জীবন যাপন করিয়াছিলেন তাহা কন্‌ফুসিয়াসের জীবনে মাতার মৃত্যুতে শোক প্রকাশের সময়ই ঘটিয়াছিল। কখনও পদব্রজে কখনও বা গরুর গাড়ীতে চড়িয়া তিনি বিশাল দেশের গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং জনসাধারণকে নৈতিক আদর্শে জীবন গঠন করিবার জন্য অনুপ্রাণিত করিতেন। প্রায় তিন সহস্র শিষ্য তাঁহার পশ্চাদ্‌গমন করিত। দুই শতাব্দী পরে গ্রীস দেশে এ্যারিষ্টটলও এই ভাবে তাঁহার বাণী প্রচার করিতেন। কন্‌ফুসিয়াস শুধু নৈতিক উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না; কবিতা, সঙ্গীত, ইতিহাস, সাহিত্য, সমাজ-বিজ্ঞান প্রভৃতি সকল বিষয়ে তিনি শিক্ষা দিতেন। ভ্রাম্যমাণ বিদ্যালয়ের মত কন্‌ফুসিয়াস চীন সমাজে, সম্ভবতঃ মানবসমাজেই, সর্বপ্রথম শিক্ষা প্রচার আরম্ভ করেন। প্রাচীন ধর্মপ্রথার বিরুদ্ধে তিনি কখনও কোন কথা বলেন নাই; বরং এই সকল প্রবর্তন পরিপালনের দিকেও তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন, বিদ্রোহ-সূচক আন্দোলন, অপ্রাকৃতিক ঘটনা ও সিদ্ধাই সম্বন্ধে তিনি কিছু বলিতেন না। এই চারিটী বিষয়ে প্রশ্ন করিলে তিনি মৌন থাকিতেন। তাঁহার শিষ্যসংখ্যা অধিক হইলেও প্রত্যেক শিষ্যের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সম্বন্ধ ছিল। তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে অনেকেই অবস্থাপন্ন ছিলেন। কিন্তু দরিদ্র শিক্ষার্থী গ্রহণে তিনি কখনও অনিচ্ছা প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার কাছে ধনী ও দরিদ্র শিক্ষার্থী সমান সুবিধা ভোগ করিত। শিক্ষার্থি-গণকে তিনি অধ্যয়নশীল ও ধর্মপ্রাণ করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতেন। যে সকল বিষয় তিনি শিক্ষা দিতেন তন্মধ্যে সমাজ-বিজ্ঞানই ছিল তাঁহার অধিকতম প্রিয়। কারণ দেশের শাসন ও সমাজের সংস্কারপদ্ধতির উন্নতিসাধনই ছিল তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। সেইজন্য যে শিক্ষার্থী শাসন বা সংস্কার-কার্যে এবং বাগ্মিতাসাধনে আগ্রহান্বিত হইত সেই তাঁহার প্রিয় হইত।

কন্‌ফুসিয়াসের ব্যক্তিগত উদাহরণই ছিল তাঁহার শিষ্য-শিক্ষার প্রধান অবলম্বন। তিনি রেশমী কাপড় পরিতেন না বা দুগ্ধ পান করিতেন না—এমন অনাড়ম্বর ও সরল জীবন তিনি যাপন করিতেন। জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি শিষ্যগণকে বলিয়াছিলেন, "তুলার কাপড়ই আমি পরিধান করি; তাহার কারণ রেশমী কাপড় মূল্যবান ও সাধারণের দুষ্প্রাপ্য এবং উহা গ্রহণে রেশমী পোকার প্রাণ নাশ হয়। বাছুরকে মাতৃ দুগ্ধ হইতে বঞ্চিত করিয়া উহা পান করিতে ইচ্ছা করি না। উভয় কার্যই নীতি-বিরুদ্ধ।" এইজন্য তিনি নিজে অতিশয় গর্ব অনুভব করিতেন। শিক্ষকরূপে তিনি কৃতকার্য হইলেও শিক্ষকতা যে তাঁহার জীবনব্রত তাহা তিনি সম্যক্ ভাবে বুঝিতেন না। তিনি স্বীয় ভাবগুলিকে কার্যে পরিণত করিবার জন্য কখনও কখনও উচ্চ সরকারী পদ অন্বেষণ করিতেন। উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইলে অধিকতর অর্থাগম হইবে এই চিন্তা তাঁহার মনে কখনও স্থান পায় নাই। নীতিমূলক শিক্ষা প্রচারোপলক্ষে একবার পার্শ্ববর্তী ষ্টেটে গমন করিয়া তিনি বৃদ্ধ ঋষি লাউৎজের দর্শনলাভ করেন। লাউৎজেও কোন উপদেবতায় বা অলৌকিক ধর্মে বিশ্বাস করিতেন না। উভয় ঋষি নৈতিক আদর্শ

প্রচারে একমত। এইজন্যই মনে হয়, কন্‌ফুসিয়াস লাউৎজে-কে দর্শন করিতে যান। উভয়ের যখন প্রথম সাক্ষাৎ ও আলাপ হয় তখন কন্‌ফুসিয়াসের বয়স চৌত্রিশ বৎসর এবং লাউৎজে-র চৌরাশি বৎসর। এই সময়টী ধর্মজগতের পক্ষে অতি শুভ ও দিব্য; কারণ লাউৎজে ছিলেন জোরোয়াস্তার, বুদ্ধ, মহাবীর, জেরেমিয়া ও এজাকিয়েলের সমসাময়িক। এতগুলি মহাপুরুষের যুগপৎ আবির্ভাবে মর্ত্যলোক তখন নিশ্চয়ই অমরধামে পরিণত হইয়াছিল। প্রথম সাক্ষাতে অগ্রজ ঋষি অনুজ ঋষিকে সৎপরামর্শ প্রদান করেন। ইহাতে কন্‌ফুসিয়াস স্বীয় দৈন্য অনুভব করিয়া লাউৎজে-র প্রতি সশ্রদ্ধ ভাব লইয়া প্রত্যাগমন করেন। উভয় আচার্যের মধ্যে খ্রীষ্টপূর্ব ৫১৭ অব্দে পুনরায় সাক্ষাৎ ও বিতর্ক হয়। বিতর্কের কারণ এই যে উভয়ের বাণীর মধ্যে তাত্ত্বিক পার্থক্য বিদ্যমান। লাউৎজে-র মতে ঘৃণা একমাত্র প্রেমের দ্বারা অভিভূত হয় এবং অসৎ সতের দ্বারা পরাস্ত হয়। কিন্তু কন্‌ফুসিয়াস বলেন, "অনিষ্টের প্রতিদান করিবে ন্যায়ের দ্বারা; ভদ্রতার প্রতিদানও ভদ্রতা।" লাউৎজে-র বাণীর সহিত যীশুখ্রীষ্টের এবং কন্‌ফুসিয়াসের উপদেশের সহিত মুশার উপদেশের সাদৃশ্য আছে। অবশ্য, কন্‌ফুসিয়াস কখনও অন্যায় আচরণের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহার মতে ব্যক্তিগত নীতি সামাজিক, জাতীয় ও রাষ্ট্রনীতির সহিত সমসুরে বদ্ধ না হইলে রাজকীয় শাসন অসম্ভব হয়। অনিষ্টের পরিবর্তে ইষ্ট করিলে অর্থাৎ সকল অনিষ্ট ক্ষমা করিলে রাষ্ট্র পরিচালনা করা যায় না। অসৎ ব্যক্তিগণই তখন সমাজের সকল সুবিধা উপভোগ করিবে। বিশৃঙ্খল সমাজে শৃঙ্খলা স্থাপনই ছিল কন্‌ফুসিয়াসের মুখ্য উদ্দেশ্য। সেইজন্য তিনি উক্ত আদর্শের অনুকূল নীতি প্রচার করেন। বুদ্ধ, লাউৎজে ও কন্‌ফুসিয়াস—চীনের এই ঋষিত্রয় তত ঈশ্বর-বিশ্বাস প্রচার করেন নাই; তথাপি তাঁহারা ঈশ্বরবৎ দেশের সর্বত্র পূজিত।

পুরাতন ধর্মপ্রথা ও সামাজিক নীতি প্রবর্তনের দ্বারা সমাজে শৃঙ্খলা স্থাপনের প্রয়াসী ছিলেন কন্‌ফুসিয়াস। কিন্তু লাউৎজে এই কার্যের সমর্থক ছিলেন না। সেইজন্য তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ সমসাময়িককে ভৎর্সনা করেন। যুবক সংস্কারক তাহাতে অপ্রতিভ ও অনুৎসাহিত হন। লাউৎজে কন্‌ফুসিয়াসকে তাও-তত্ত্বের উপদেশ দেন। তাহাতে কন্‌ফুসিয়াস প্রত্যুত্তর করেন যে, বিংশ বৎসর তিনি তাও অন্বেষণ করিয়া সফলকাম হন নাই। গৃহে ফিরিবার পথে কন্‌ফুসিয়াস তাঁহার শিষ্যগণকে বলেন, "পাখী কিরূপে আকাশে উড়ে, মাছ কিরূপে জলে সাঁতার দেয় এবং পশুরা কিরূপে বনে বিচরণ করে আমি জানি; কিন্তু ড্রাগন (Dragon) কিরূপে হাওয়ায় চড়িয়া মেঘের উপর উঠে এবং স্বর্গে যায় তাহা জানি না। আমি লাউৎজে-কে দেখিলাম। তাঁহাকে ড্রাগনের মত অদ্ভুত ও অবোধ্য মনে হইল।" চার্লস ফ্রান্সিস পটার (Potter) তাঁহার The Story of Religion গ্রন্থে কন্‌ফুসিয়াসকে মানব-ধর্মের আদি আচার্যরূপে নির্দেশ করেন। এইচ্‌ এ গাইল্‌স্‌ তাঁহার Confucianism and Its Rivals গ্রন্থে কন্‌ফুসিয়াসকে লাউৎজে অপেক্ষা উচ্চতর স্থান দিয়াছেন। গাইল্‌সের মতে কন্‌ফুসিয়াস লাউৎজের ন্যায় ধর্মকে কল্পনালোকে না রাখিয়া কর্মজীবনে টানিয়া আনিয়াছেন। সুটহিল (Soothill) তাঁহার Three Religions of China গ্রন্থে এবং ডাঃ আর ই হিউম্‌ তাঁহার The World's Living Religions গ্রন্থে উভয় ঋষির মতবাদের মূলগত পার্থক্য দেখাইয়াছেন। দৈনিক জীবনে ধর্মকে স্থাপন করাই ছিল কন্‌ফুসিয়াসের আদর্শ। আরও সতের বৎসর তিনি পর্যটক প্রচারকের জীবন অতিবাহিত করেন। সমগ্র জীবন ধরিয়া তিনি যে সুযোগের

অপেক্ষা করিতেছিলেন একান্ন বৎসর বয়সে তাহা অপ্রত্যাশিতভাবে উপস্থিত হয়। তিনি এই বৎসর লু ষ্টেটের ম্যাজিষ্ট্রেট পদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁহার শাসন-পদ্ধতি এত সুন্দর ও সফল হয় যে, অল্পকালের মধ্যে তিনি প্রথমে মিনিষ্টার অব্ ওয়ার্কস্ এবং পরে মিনিষ্টার অব্ জাষ্টিস্ পদে উন্নীত হন। উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইয়া তিনি প্রমাণিত করিলেন তাঁহার প্রণালী কত কার্যকরী। শুধু লু ষ্টেটে নহে, অন্যান্য ষ্টেটের সহিত আদান-প্রদানেও তাঁহার মত ও পদ্ধতি পরিগৃহীত ও সফল হইল। তাঁহার শাসনে লু ষ্টেটে এবং অন্যত্র অচিরে শৃঙ্খলা ও শান্তি স্থাপিত হয়। তৎপূর্বে সরকারী কর্মচারিগণের প্রধান কর্তব্য ছিল খাজনা আদায়। তিনি শাসন-পদ্ধতি পরিবর্তিত করিয়া দেখাইলেন প্রজার ও দেশের হিতসাধনে কর্মচারিগণ স্ব স্ব কর্তব্য পালন করিলেই শান্তিস্থাপন অবশ্যম্ভাবী; দমনের দ্বারা শৃঙ্খলা স্থাপন অসম্ভব। কনফুসিয়াস শাসন-কৌশলে তৎকালীন চীনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। লু ষ্টেটের পার্শ্ববর্তী চু ষ্টেটে এক সময় শাসন-শৃঙ্খলা ভগ্ন হয়। চু ষ্টেটের ডিউক স্বীয় মন্ত্রিগণের বশবর্তী হওয়ায় এই বিশৃঙ্খলা ঘটে। এই জন্য ডিউকের জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতার স্থান গ্রহণ করিতে পারিবে না ভাবিয়া ডিউকের দুশ্চিন্তা হয় এবং তিনি কনফুসিয়াসের নিকট যাইয়া প্রশ্ন করেন, 'রাজ্য-শাসনের কৌশল কি?' কনফুসিয়াস বলেন, "যখন রাজা রাজা থাকেন, প্রজা প্রজা থাকেন, মন্ত্রী মন্ত্রী থাকেন, পিতা পিতা থাকেন, এবং পুত্র পুত্র থাকেন তখন রাজ্য সুশাসিত হয়। ইহাই শ্রেষ্ঠ রাজনীতি।" অন্য সময়ে একই প্রশ্নের উত্তরে কনফুসিয়াস বলেন, "অদম্য উৎসাহ এবং কর্তব্য কর্মে একনিষ্ঠতাই রাজধর্ম।" কিন্তু তিনি মাত্র চারি বৎসর তাঁহার রাজনীতি কার্যে পরিণত করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। লু ষ্টেটের অভূতপূর্ব শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া চু ষ্টেটের প্রজাগণ ও কর্মচারিগণ ঈর্ষান্বিত হন। তাঁহারা ডিউক ও কনফুসিয়াসের মধ্যে বিবাদ বাঁধাইবার ষড়যন্ত্র করিলেন। তাঁহাদের দ্বারা আশি জন সুন্দরী সুগায়িকা ও নৃত্যকুশলা যুবতী লু ষ্টেটের ডিউকের নিকট প্রেরিত হইল। ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র ডিউক বারবনিতাগণকে লইয়া রাজকার্য অবহেলা করিলেন। শত্রুগণের ষড়যন্ত্র সিদ্ধ হইল। দীর্ঘ চারি বৎসর কঠোর পরিশ্রমে কনফুসিয়াস যে শাসন-সৌধ নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহার ভিত্তি স্থানচ্যুত হইল। তিন দিন চেষ্টা করিয়াও কনফুসিয়াস ডিউকের সাক্ষাৎ পাইলেন না। রাজকীয় ক্রিয়াদি তাঁহার অনুপস্থিতিতে সম্পন্ন হইল। তাঁহার পরিশ্রম পণ্ড হইতে দেখিয়া তাঁহার হৃদয় ভগ্ন হইল এবং তিনি পদত্যাগ করিলেন। অন্য কোন ষ্টেটে ধর্মভীরু শাসকের অধীনে কর্মগ্রহণের চেষ্টায় তিনি দীর্ঘ তের বৎসর বৃথা অপেক্ষা করিলেন। সুশাসনের দ্বারা সমাজ-সংস্কারের যে স্বপ্ন তিনি আজীবন দেখিয়াছিলেন তাহা চিরতরে ভগ্ন হইল। দেশ হইতে মৃত্যু-দণ্ড দূর করিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা তিনি হৃদয়ে পোষণ করিতেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে এক শতাব্দী সুশাসন চলিলে দেশে আদর্শ সমাজ নিশ্চিতই গড়িয়া উঠিবে। জীবন বিপন্ন করিয়াও তিনি শহর হইতে শহরান্তরে উপযুক্ত শাসকের সন্ধানে ঘুরিলেন কিন্তু কোন শাসকই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। অবশেষে নিরাশ অন্তঃকরণে তিনি স্বগৃহে আসিলেন। তখন তাঁহার বয়স ৬৮ বৎসর। এখন হইতে ৭২ বৎসর বয়সে মৃত্যু পর্যন্ত প্রায় পাঁচ বৎসর তিনি কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া গ্রন্থ-প্রণয়নে অতিবাহিত করেন। তৎপ্রণীত নীতি-শাস্ত্রে বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডার নিহিত।

চীনা সাহিত্যের নয়খানি বিখ্যাত গ্রন্থের সহিত কনফুসিয়াসের নাম বিজড়িত; তন্মধ্যে

পাঁচ খানির নাম 'কিং' এবং অন্য চারি খানির নাম 'শূ'। পঞ্চ কিং গ্রন্থের নাম শূ কিং-(ইতিহাস), শি কিং (কবিতা), আই কিং (বিকার-তত্ত্ব বা পরিবর্তন-রহস্য), লি কি কিং (স্বাধিকার-বিজ্ঞান), এবং চুন চিউ কিং (বসন্ত ও শরৎ ঋতুর কথা)। হিয়াও কিং-কে কখনও কখনও ষষ্ঠ কিং বলা হয়। পুত্রের কর্তব্যই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। এই গ্রন্থ ছয় খানির মধ্যে সম্ভবতঃ পঞ্চম খানিই তাঁহার রচিত। ইহাতে স্বীয় ষ্টেটের নীরস ইতিবৃত্ত বিবৃত। অন্য কিং-পঞ্চকের তিনি বোধ হয় সংগ্রাহক ও সম্পাদক মাত্র। কোন কোন পণ্ডিত এই গ্রন্থপঞ্চকের সঙ্গে তাঁহার এইটুকু সম্বন্ধও অস্বীকার করেন। শি-গ্রন্থ-চতুষ্টয় পরবর্তী কালে তাঁহার শিষ্যগণ কর্তৃক লিখিত। কিং-গ্রন্থাবলীকে চীনা শাস্ত্রের ওল্ড্ টেষ্টামেণ্ট এবং শূ গ্রন্থাবলীকে নিউ টেষ্টামেণ্ট বলা চলে। তাঁহার শিষ্য ও সমসাময়িকগণের সঙ্গে তাঁহার যে কথাবার্তা হইত সেইগুলি এবং অন্যান্য ধর্মনীতি ও রাজনীতি-মূলক বাক্যাবলী শূ গ্রন্থাবলীতে পাওয়া যায়। প্রথম শূ গ্রন্থের নাম তা সিও। ইহাতে অপরা বিদ্যা বা ধর্মনীতি ব্যাখ্যাত। দ্বিতীয় শূ গ্রন্থের নাম চুং য়ুং; ইহাতে মধ্যপন্থার সূক্ষ্ম তত্ত্ব আলোচিত। এই মতই ভগবান বুদ্ধ প্রচার করেন। লুন্ য়ু তৃতীয় গ্রন্থ; ইহাতে কন্‌ফুসিয়াসের নীতি-উপদেশগুলি সংগৃহীত। এই গ্রন্থখানিই সর্বাপেক্ষা পাঠক-প্রিয় এবং বিদেশে প্রসিদ্ধ। মেংট্জে নামক চতুর্থ গ্রন্থে মেনসিয়াসের রচনাবলী বিদ্যমান। মেনসিয়াস কন্‌ফুসিয়ান সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ টীকাকার। এই নয়খানি পুস্তক বহু শতাব্দী যাবৎ চৈনিক জীবনে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। উচ্চপদাকাঙ্ক্ষী পরীক্ষার্থিগণকে চীনের প্রসিদ্ধ পরীক্ষা-গৃহে বসিয়া যে পরীক্ষা দিতে হয় তাহার পাঠ্য পুস্তক এই সকল গ্রন্থ।

এই গ্রন্থাবলী রচনায় ও সংগ্রহে চৈনিক ঋষি যে প্রতিভা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অসাধারণ। প্রাচীন জ্ঞানরাশি মুষ্টিমেয় পণ্ডিতের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল; তিনি এই রত্নগুলি জনসাধারণের মধ্যে সহজবোধ্য ভাষায় প্রচার করিয়া চীনদেশে নবযুগ, নবচেতনা, নবজাগরণ আনয়ন করেন। চৈনিক শিক্ষার আদিগুরু ছিলেন কন্‌ফুসিয়াস। অদ্যাপিও চীনের সর্বত্র তাঁহার গ্রন্থাবলী সাদরে পঠিত, কণ্ঠস্থ ও উদ্ধৃত হয়। ঐহিক বুদ্ধির প্রখরতা তাঁহার উপদেশের বৈশিষ্ট্য। কয়েকটী উপদেশ এখানে দেওয়া হইল: "যাহা সমাপ্ত তাহার কথা আমি বলি না। যাহা মীমাংসিত, সেই বিষয় আমি আলোচনা করি না। যাহা অতীত, আমি তাহার দোষ দর্শন করি না।" "প্রাচুর্যহীন উচ্চপদ, শ্রদ্ধাশূন্য ক্রিয়া, ব্যথাবর্জিত শোক অর্থহীন।" "নিজের মধ্যে যাহা আছে, তাহার অবহেলা, বিদ্যার্জনে ঐকান্তিকতার অভাব, কর্তব্যপালনে অক্ষমতা এবং স্বদোষদূরীকরণে অসামর্থ্য—এই কয়েকটীতেই আমার দুঃখ হয়।" "অধিক শ্রবণান্তে সদুপদেশগুলি বাছিয়া লইয়া পালন এবং অধিক দর্শনান্তে উহার সার ভাবনা,—এই দুইটী জ্ঞানলাভের নিয়েই অবশ্য কর্তব্য।" "প্রাচীনদিগকে শান্তি দাও, মিত্রগণের বিশ্বাস রক্ষা কর এবং তরুণগণের প্রতি প্রীতিপরায়ণ হও।" "কবিতা জাগ্রত করে, সদাচার উন্নত করে এবং সঙ্গীত প্রফুল্ল করে।" "যিনি ভদ্র তিনি স্বীয় দোষ দেখেন, যিনি অভদ্র তিনি অপরের দোষ দেখেন।" "শঠবাক্যে মন দিশাহারা হয়; সামান্য বিষয়ে অধীর হইলে বিরাট সংকল্প নষ্ট হয়।" "অনেকের অবজ্ঞার বা বহুর বন্ধুত্বের কারণানুসন্ধান অবশ্য কর্তব্য।" "সতর্কিত হওয়া সত্ত্বেও দোষকে জড়াইয়া ধরাই সর্বাপেক্ষা দূষণীয়।" "বিদ্যায় উচ্চনীচ শ্রেণীভেদ নাই।" "সহজবোধ্য হওয়াই বক্তৃতার চরম লক্ষ্য।" "ভদ্র ব্যক্তি এই

নয়টী বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন: স্পষ্টভাবে দেখা, শ্রুত বিষয় নিঃসন্দেহে বোঝা, ব্যবহারে শিষ্টাচার, আচরণে আত্মসম্মান রক্ষা, বাক্যে প্রমাদহীনতা, কর্মে কুশলতা, সন্দেহ স্থলে জিজ্ঞাসা, ক্রোধের সময় বিপদের ভাবনা এবং লাভকালে সত্যনিষ্ঠা।"

নৈতিক উপদেশ ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তির আত্মবিকাশের উপযোগী অনেক বিষয় কনফুসিয়াস বলিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্যক্তিগত বিকাশের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করাই আদর্শ সমাজের উদ্দেশ্য। মানুষকে আত্মবিকাশে উদ্বুদ্ধ করাই শিক্ষার লক্ষ্য। ইহার জন্য তিনি সঙ্গীত, কবিতা, বাণবিদ্যা, অনুষ্ঠানাদির উপর যত জোর দিতেন—ধর্মের উপর তত নহে। তিনি কবিতার উদ্বোধনী শক্তিতে অসীম বিশ্বাস করিতেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্মানুষ্ঠানেরও তিনি পক্ষপাতী ছিলেন, কারণ ইহাতে মানুষের দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ হয়। তিনি বলিতেন—সঙ্গীতের দ্বারা উচ্চ চিন্তা জাগ্রত হয়। তাঁহার একটী বাঁশী ছিল। শিক্ষাদান বা গ্রন্থ রচনার পূর্বে তিনি সেই বাঁশীটী বাজাইতেন; তাহাতে তাঁহার মন কর্মে একাগ্র হইত। লি কি গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন: "যখন সঙ্গীত সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত হয়, সঙ্গীতের সুরে যখন হৃদয় ও মন নিয়ন্ত্রিত হয়, তখন সৎ, মহৎ ও ভদ্র হৃদয় সহজে বিকশিত হয় এবং আনন্দ স্ফুরিত হয়। এই আনন্দ হইতে প্রশান্ত ভাব প্রসূত হয়। এই প্রশান্ত ভাব-স্রোত নিরবচ্ছিন্ন হয়। তাহার ফলে মানবের অন্তর স্বর্গে পরিণত হয়।" পারলৌকিক জীবনের জন্য চিন্তিত না হইয়া ঐহিক জীবনের উন্নতি সাধনে তৎপর হইতে তিনি শিষ্যগণকে উৎসাহিত করিতেন। বজ্রধ্বনি শুনিলে বা শোকসূচক পরিচ্ছেদ দেখিলে তিনি বিরক্ত হইতেন। শোনা যায় তিনি খুব কর্মরত থাকিতেন এবং তাঁহার মুখে ভীতির ভাব লক্ষিত হইত। এত সাবধান ও সন্ত্রস্ত হইয়া তিনি পদবিক্ষেপ করিতেন যে, তাঁহাকে চলিতে দেখিলে, লোকে ভাবিত, তাঁহার পদযুগল যেন শৃঙ্খলাবদ্ধ। কথিত আছে তিনি বিচারালয়ে নিম্নপদস্থ ব্যক্তির সঙ্গে সরলভাবে মিশিতেন। উচ্চপদস্থ লোকের সহিত সম্মানভরে এবং রাজার সহিত শান্তভাবে তিনি আলাপ করিতেন। লুন্ শূ নামক চতুর্থ শূ গ্রন্থের ১০ম অধ্যায়ে তাঁহার আকৃতি এবং স্বভাব সম্বন্ধে এই-রূপ বর্ণনা আছে: "কনফুসিয়াস অতিশয় ভদ্র ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কখনও বেগুনী বা লাল রঙের কাপড় পরিতেন না, এমনকি স্বগৃহেও নহে। গ্রীষ্মকালে তিনি লিনেন-নির্মিত ওভার-কোট ব্যবহার করিতেন। ছাগলের চামড়ার সঙ্গে কাল কাপড়, হরিণের চামড়ার সহিত সাদা কাপড় এবং শৃগালচর্মের সহিত পীত বস্ত্র তিনি পছন্দ করিতেন। বাড়ীতে যখন থাকিতেন তখন পশু-লোমের একটী লম্বা কোট পরিতেন। তাঁহার নৈশ পোষাক শরীরের অর্দ্ধেক লম্বা ছিল। শীতকালে শরীরকে গরম রাখিবার জন্য শৃগাল-চর্মের জ্যাকেট ব্যবহার করিতেন। একমাত্র বিচারালয়ে গমনকালে তাঁহার হাতে যষ্টি থাকিত। শোকতপ্ত গৃহে গমনকালে কাল টুপী তাঁহার মাথায় শোভা পাইত না। প্রত্যেক প্রতিপদ তিথিতে সরকারী পোষাকে তিনি কোর্টে যাইতেন। উপবাস-দিবসে তিনি অনাহারী না থাকিয়া আহার পরিবর্তন করিতেন। বাসী মাছ, মাংস বা ভাত তিনি কখনও খাইতেন না। যে আহার্য তিনি ভালবাসিতেন না, তাহা যতই সুস্বাদু হউক, তিনি মুখে দিতেন না। মদ্যপানে তাঁহার কোন সংযম ছিল না; সংজ্ঞাহীন না হওয়া পর্যন্ত তিনি মদ্যপান করিতেন। তবে তিনি ক্রীত মদ্য বা বাজারে বিক্রীত মাংস খাইতেন না। কিন্তু আহারে তাঁহার অসামান্য সংযম ছিল। বিছানায় থাকিয়া এবং আহার কালে তিনি কথা বলিতেন না। মোটা ভাতও সামান্য তরকারী ছিল

তাঁহার নিত্য আহার। মাদুরটী সোজাভাবে না পাতা হইলে তিনি তাহাতে বসিতেন না।"

কন্‌ফুসিয়াসের উপরোক্ত বর্ণনা কোন শিষ্য-কর্তৃক প্রদত্ত। ইহা হইতে তাঁহার পূর্ণ প্রতিকৃতি পাওয়া অসম্ভব। কোন শিষ্য জীবিত কালে তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন নাই। সমগ্র চৈনিক জাতি এবং চৈনিক সাহিত্যে কন্‌ফুসিয়াসের প্রভাব আজও গভীর। চৈনিক মন কন্‌ফুসিয়াসের ভাবে অদ্যাপি ভরপুর। কন্‌ফুসিয়াসের প্রচারক ছিলেন মেন্‌সিয়াস। ইঁহার বিষয় চতুর্থ শূ গ্রন্থে পাওয়া যায়। কন্‌ফুসিয়াসের মৃত্যুর প্রায় এক শতাব্দী পরে মেন্‌সিয়াসের আবির্ভাব হয়। কন্‌ফুসিয়াসের বাণী বিশদভাবে ব্যাখ্যা ও দেশময় প্রচার করাই তাঁহার জীবনব্রত ছিল। মানুষ স্বভাবতঃই সৎ, অসৎ নহে—কন্‌ফুসিয়াসের এই প্রধান বাণীই মেন্‌সিয়াস দ্বারে দ্বারে প্রচার করেন। শিষ্য ছিলেন গুরু অপেক্ষা অধিকতর প্রজাতন্ত্রবাদী (democratic)। রাজার উপরেই প্রজার স্থান। প্রজা রাজা অপেক্ষা বড়, ছোট নহে। এই মত প্রচার করিয়া মেন্‌সিয়াস অতিশয় জনপ্রিয় হন। তাঁহার মুখ্য মত ছিল—"প্রজা তুষ্ট হইলে ঈশ্বরও তৃপ্ত হন।" মেন্‌সিয়াস গণতন্ত্রবাদ বা সমাজতন্ত্রবাদের মূলমন্ত্রের দ্রষ্টা। তিনি বলিতেন, "অনাহারী প্রজা কখনও সৎ ও শান্ত হইতে পারে না। দেশের ক্ষুধা নিবৃত্ত হইলে শিক্ষা-সমস্যার সমাধান সহজসাধ্য।"

মেন্‌সিয়াস অপেক্ষা অধিকতর জনপ্রিয় ছিলেন চুসিয়াস। চুসিয়াসের প্রকৃত নাম ছিল চু শি। চু শি খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হন এবং কন্‌ফুসিয়ান সাহিত্যের উপর বিস্তৃত টীকা রচনা করেন। কন্‌ফুসিয়াসের মতবাদের উপর তিনি এত আলোকসম্পাত করিয়াছেন যে, কন্‌ফুসিয়ানিজমকে কেহ কেহ চুসিয়ানিজম বলেন। পাপ-তত্ত্বের বিস্তৃত আলোচনা চুসিয়াস করিতেন। অসৎ বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ নির্দ্ধারণ বা অসৎ-সমস্যার সমাধান করিতে তিনি বদ্ধপরিকর ছিলেন। আধুনিক কন্‌ফুসিয়ানিজম্ প্রথম-প্রবর্তিত নৈতিক মতবাদের সীমা অতিক্রম করিয়া ক্রিয়াবহুল আনুষ্ঠানিক ধর্মে পরিণত হইয়াছে। এই ধর্মে এখন অসংখ্য দেবতা ও দানব স্থান পাইয়াছেন। উক্ত ধর্মে অতীতকে স্বর্ণ যুগ রূপে বিশ্বাস করা হয় এবং অতীতের সুখময় স্মৃতি দ্বারা বর্তমান জীবনকে উন্নত করিবার চেষ্টা করা হয়।

নুনের পুতুল

(শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ অবলম্বনে)

শ্রীরামকৃষ্ণ শরণ

নুনের পুতুল　　মাপতে গেল
সমুদ্দুরের জল।
মাপতে সে ত　　পারলো না কো
গলে হ'ল তল।
সাধক যদি　　মাপতে চান
ব্রহ্ম-সাগর জল,
তলিয়ে হবে　　অতল তলে
ব্রহ্ম অবিকল।

শ্রীশ্রীমার স্মৃতি

স্বামী পরমেশ্বরানন্দ

শ্রীশ্রীমা জয়রামবাটী নূতন বাড়ীতে বাস করছেন। মধ্যে মধ্যে ম্যালেরিয়া হচ্ছে। তাঁর আত্মীয় স্বজনদের ঝঞ্ঝাট ও আব্দারের অন্ত নাই। রাধারাণী প্রভৃতির দাবী পূরণ করতে তিনি সদাই বিব্রতা। সময় সময় বিরক্তি প্রকাশ করতেন বটে কিন্তু সব সয়ে যেতেন। সন ১৩২৩ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে তিনি নূতন বাড়ীতে প্রবেশ করেন। তদবধি যাঁরা শ্রীশ্রীমার নিকটে আসতেন তাঁরা এই বাড়ীতেই তাঁকে দর্শন ও পূজাদি করতেন। প্রসন্ন মামার বাড়ীতে অবস্থানকালে কি কারণে তাড়াতাড়ি নূতন গৃহ নির্ম্মিত হয়েছিল এবং তিনি ঐ ঘরে থাকতে প্রস্তুত হয়েছিলেন, সেই সম্বন্ধে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। শ্রীশ্রীমা অল্পবয়স হতেই এই ঘর-খানিতে বাস করতেন। ভাইদের বিষয় ও ঘর-বাড়ী ইত্যাদি বণ্টনের সময় প্রসন্ন মামার বাড়ীর অংশে এই ঘরখানি ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে যখন শ্রীশ্রীমাও ভক্ত-সন্তানদের নিকট প্রকাশিত হয়েছিলেন, এবং নানাস্থান হতে অনেক নরনারী তাঁর কাছে এসে শান্তিলাভ করছিলেন, তখন তাঁর কোন আত্মীয়া বিবাহের পর দ্বিরাগমনে এসে বলেন "আমার বাড়ীতে এসব ঝঞ্ঝাট কেন? এসব আমাকে ভাল লাগে না।" কিছুদিন পরে প্রসন্ন মামা শ্রীশ্রীমাকে বলেছিলেন, "দিদি, এ বাড়ীতে তোমার থাকা আর সুবিধা হবে না। তুমি অন্য ব্যবস্থা কর।" তখন শ্রীশ্রীমা এ বাড়ীর সাংসারিক খরচ প্রায় সমস্তই নির্ব্বাহ করেও অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে থাকতেন। প্রত্যহ দৈনন্দিন কাজগুলি কেউ না করলে ভোরে উঠে বাড়ী পরিষ্কার, নাতা দেওয়া, বাসন মাজা, রান্না, সকলকে পরিবেশন, ভক্তসন্তান এলে তাঁদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা ইত্যাদি বৃদ্ধ বয়সেও সর্ব্বদাই করতেন। একবার দেখি, মহাষ্টমীর দিন বিকেল ৫টায় নিজেই পাঁচ সের ময়দার লুচি ও তরকারী প্রস্তুত করবার চেষ্টা করছেন। বাড়ীতে আত্মীয়স্বজন মেয়েরা কয়েক জন রয়েছেন, কেউ সেদিকে লক্ষ্য করছেন না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "মা, আপনি এই বাতের শরীর নিয়ে এত ময়দায় জল দিচ্ছেন কেন? এতে আপনার কত কষ্ট হবে। অনেকেই ত রয়েছেন?" শ্রীশ্রীমা বল্লেন, "হ্যাঁ বাবা, তুমি যদি আজ এখানে থেকে এগুলি করে দাও, না হলে আমাকেই সব করতে হবে।" অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীমা সবদিকে দৃষ্টি রেখে ভক্ত-সন্তানদের এবং বাড়ীর সকলের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। এসব কাজ তিনি করে যেতেন নিজ শরীরের দিকে দৃষ্টি না রেখে অকাতরে। শ্রীশ্রীমা যখন শুনলেন তাঁর এ বাড়ীতে থাকা সুবিধা হবে না, তাঁর এবং ভক্ত-সন্তানদের ঝঞ্ঝাট ভোগ করতে কেউ প্রস্তুত নয়, তখন খুব দুঃখিত হয়ে বলেছিলেন, "আমার আজ ইচ্ছা হচ্ছে, আমার ছেলেদের (ভক্ত সন্তানদের) নিয়ে গাছতলায় আশ্রয় নেই!" শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ ও মাষ্টার মহাশয় (শ্রীম) এই সংবাদ পেয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ী তৈরি করে দেন। এখন এই বাড়ীতেই তিনি তাঁর সন্তানদের নিয়ে অবস্থান করছেন।

তখন জয়রামবাটী গ্রাম খুব অপরিষ্কার ছিল। পল্লীগ্রাম হলেও আর কোথাও এরূপ গ্রাম, এবং আচার ব্যবহার আছে কিনা সন্দেহ ছিল। চারদিক ঝোপ-জঙ্গলে সমাকীর্ণ। কেবল বাঁড়ুয্যে পুষ্করিণী—যাতে শ্রীশ্রীমা স্নান করতেন—কতক পরিষ্কার ছিল। অন্যান্য পুষ্করিণী দল, শেওলা,

পানা ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ হয়ে থাকত। শ্রীশ্রীমার নূতন বাড়ীর পাশে যে পুকুরটী পূজনীয় স্বামী সারদানন্দ মহারাজের নামে খরিদ ও বন্দোবস্ত করে নেওয়া হয়, তাতেও দল, শেওলা ও পানা ইত্যাদি এত জমাট বেঁধে ছিল যে, ঐ পুকুরের মধ্যে বসে মেয়েছেলেরা শুষনীশাক ও কলমীশাক সংগ্রহ করত। রাস্তাঘাট এত খারাপ যে, বর্ষারসময়ে নালার সঙ্গে রাস্তার পাশের সব পুকুরগুলি বৃষ্টির জলে এক হয়ে যেত। আর এঁটেলমাটী বলে এত কাদা হত যে বাড়ী ঘরে কাদার জন্য এ সময় বাস করা অশেষ কষ্টকর হত। এর উপর ম্যালেরিয়ারও অত্যন্ত প্রকোপ ছিল। তখন যে জল ব্যবহার করা হত তা স্পর্শ করতেও ঘৃণা বোধ হত। এক সময়ে এরূপ কাদা দেখে এবং শ্রীশ্রীমার অশেষ কষ্ট হচ্ছে বুঝতে পেরে স্বামী শ্রীবাসানন্দ (নারায়ণ আয়েঙ্গার) শ্রীশ্রীমার নিকট বাড়ী, উঠান ইত্যাদি ইট ও সিমেণ্ট দিয়ে বাঁধিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করায় তিনি বলেছিলেন, "না বাবা, ইট দিয়ে এ সব করবার দরকার নেই!— লোকে বল্‌বে এদের অনেক টাকা হয়েছে। যেমন আছে সেই রকমই ভালো।"

শ্রীশ্রীমার ঐরূপ কথা শুনে সেবার ঐ বিষয়ে নিশ্চেষ্ট হতে হ'য়েছিল। আমরা অনেক সময় লক্ষ করে দেখেছি শ্রীশ্রীমা নিজেকে এত গোপন করে রাখতেন যেন কেহ কোনও প্রকারে বুঝতে না পারে। পর বৎসর আবার শ্রীবাসানন্দ মায়ের নিকট অনুরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করলে মা বললেন, "হ্যাঁ বাবা, বর্ষার সময় বড় কষ্ট হয়, নারান যখন বলছে তখন বাঁধিয়ে দেওয়া ভাল।" ম্যালেরিয়ার অত্যন্ত প্রকোপ এবং বিশুদ্ধ পানীয় জলের একান্ত অভাব বলে একটী কূপ খনন করবার কথা শ্রীশ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করলে, মা বললেন, "এখানে একটী কূয়া হলে খুব ভাল হয়।" কলিকাতায় শরৎ মহারাজকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি আনন্দের সহিত অনুমোদন করলেন। পরে ভাল দিন দেখে ইট তৈরি করার আয়োজন হতে লাগল। শ্রীশ্রীমার মধ্যে মধ্যে ম্যালেরিয়া জ্বর হয়ে স্বাস্থ্য ক্রমেই খারাপ হচ্ছে। চিকিৎসাদি দ্বারা সাময়িক ভাবে আরোগ্য হলেও মধ্যে মধ্যে জ্বরে খুব কষ্ট পাচ্ছিলেন।

শ্রীশ্রীমার জন্মতিথিপূজা আগতপ্রায়। জিজ্ঞাসা করলাম, "মা, আপনার জন্মতিথি, আমরা কিছু আয়োজন করব মনে করেছি।" মা বললেন, "বেশ কর, তবে বেশী বাড়াবাড়ি কোরো না। ছেলে মেয়ে যারা আছে, আর যারা আসবে, প্রসন্নর বাড়ী, বরদার বাড়ী, আর কালীর বাড়ী এদের সব বলে দাও।" আরও দু'চার জনকে নিমন্ত্রণ করবার জন্য বলে দিলেন। দেখলাম, কোনরকম কিছু প্রকাশ হয় এই ইচ্ছা তাঁর মোটেই নয়। এই সময় কালী মামা সমস্ত অবগত হয়ে বললেন, "দিদি, বোষ্টম ভিখারীও আছে! এমন করে কি হয়?" মা বললেন, "থাম্, ঘরের বোষ্টম ভিখারী আগে সামালী, তারপর তোর বোষ্টম ভিখারী হবে।"

শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথিপূজার সময় একবার শ্রীশ্রীমা, কোয়ালপাড়ায় জগদম্বা আশ্রমে বাস করছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি পূজার বেশী বিলম্ব নেই জেনে আমি জয়রামবাটী হতে গিয়ে শ্রীশ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "মা, ঠাকুরের তিথিপূজা আসছে, আপনি যদি অনুমতি করেন, আমরা কিছু আয়োজন করব স্থির করেছি।" শ্রীশ্রীমা বললেন, "বেশত, ঠাকুরের তিথিপূজা কর না।" তিনি পাঁচটী টাকা আমার হাতে দিয়ে বললেন, "ঠাকুরের তিথিপূজা তোমরা চেষ্টা করে করছ, ঠাকুর তোমাদের কল্যাণ করুন!" সেবার ঠাকুরের উৎসবে অনেক লোক প্রসাদ পেয়েছিলেন, নহবত ইত্যাদি বাদ্য, রামনাম কীর্ত্তন

প্রভৃতিতে খুব জাঁকাল হয়ে উঠেছিল। শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন, "আমি থাকতে এখনই এত কেন? পরে এ সব করবে!" এতে আমি একটু দুঃখিত হওয়ায় শ্রীশ্রীমা বুঝতে পেরে বলেছিলেন, "বাড়াবাড়ি কিছু ভাল নয়।" তাই এবার খুব সন্তর্পণে আয়োজন করছি। পূজার পূর্ব্বদিনই প্রায় সব প্রস্তুত। পূজনীয় শরৎ মহারাজ কলিকাতা হইতে কাপড় ও ফল মিষ্টান্ন ইত্যাদি পাঠিয়েছেন। ঢাকা ও অন্যান্য স্থান থেকে কয়েক জন ভক্ত এসেছেন। শ্রীশ্রীমায়ের ছেলে ও মেয়ে অনেকেই এ বাড়ীতে আছেন, শ্রীশ্রীমা নির্দ্দিষ্ট সময়ে রাত্রি তিনটার সময় উঠে জপ ধ্যান সমাপনান্তে নিজেই সব ব্যবস্থা করতে লাগলেন। আমরা পূজার যোগাড় করে দিলাম। শ্রীশ্রীমা স্নান করে এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্য পূজাদি সমাপন করলেন। এইবার জনৈক মহিলা শিষ্যা শ্রীশ্রীমাকে কয়েকখানি নূতন কাপড় পরবার জন্য উপস্থিত করলেন। শ্রীশ্রীমা ২।৩ খানির মধ্যে শরৎ মহারাজের প্রদত্ত কাপড়খানি পরে তক্তাপোশের উপর শ্রীমতী রাধারাণীর খোকাকে কোলে নিয়ে পা দুটী ঝুলিয়ে পশ্চিমাস্য হয়ে বসলেন। তখন মাকে দেখে মনে হলো যেন সদানন্দময়ী আদ্যাশক্তি মহামায়া সৌম্যা মূর্ত্তিতে গোপালকে কোলে নিয়ে জগতের কল্যাণ এবং সন্তানদের মঙ্গল কামনায় উপবিষ্ট রয়েছেন। এই সময়ে উপস্থিত ভক্ত সন্তানগণ মায়ের এই ভাব নিরীক্ষণ করে আশ্চর্য্য বোধ করতে লাগলেন। আমি একটা বড় গাঁদা ফুলের মালা দিবার জন্য হাতে করে দাঁড়ালে শ্রীশ্রীমা বললেন, "মালা দাও না, দাও," আমি অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে মার জনৈকা মহিলা সেবিকাকে বলিলাম, "তুমি এই মালাটী মাকে দাও।" উক্ত মহিলা মালাটী মায়ের গলায় পরিয়ে দিলেন। মালাটী খুব বড় হয়েছিল। পায়ের উপর পর্য্যন্ত লম্বমান হওয়াতে খুব সুন্দর দেখাতে লাগল। এ সময় ফুল নিয়ে আমরা মায়ের পাদপদ্মে অঞ্জলি দিতে লাগলাম। মনে হল, শ্রীশ্রীমার ভক্ত সন্তানগণ যে যেখানে আছেন এ সময় সকলে পুষ্পাঞ্জলি দিলে খুব ভাল হত। আমি প্রচুর ফুল নিয়ে শ্রীশ্রীমার শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি দিতে দিতে বললাম, "মা, আজ আপনার অনেক সন্তানের ইচ্ছা আপনার শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে কৃতার্থ হয় এবং জীবন ধন্য করে। কিন্তু সুদূর রাস্তা অতিক্রম করে সাংসারিক নানা কারণে, ইচ্ছা থাকলেও আসা সম্ভব নয়। আমিই আজ সকলের হয়ে আপনার শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছি।" মা সহাস্য বদনে খুব আনন্দের সহিত বলতে লাগলেন, "বাবা, আমি ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি সকলের কল্যাণ করুন এবং যে যেখানে আছে সকলের মঙ্গল করুন!" শ্রীশ্রীমা কিছুক্ষণ এইরূপ ভাবাবিষ্ট ছিলেন। প্রকৃতিস্থ হলে আমি বললাম, "মা, আপনি এবার জল খান। শ্রীশ্রীমা জলযোগ করে সকলকে প্রসাদ দিলেন। এই দিন-উপস্থিত সন্তানগণের এক বিশেষ স্মরণীয় দিবস। অনেকেই মনে করতে লাগলেন, যেন সদানন্দময়ী প্রসন্না হয়ে অপার করুণায় স্নেহবিগলিত ধারায় জগতের সন্তানগণের কল্যাণ বিধান কচ্ছেন।

কয়েক দিন পরে একদিন কথাপ্রসঙ্গে এই নূতন বাড়ীতেই শ্রীশ্রীমা আমাকে বললেন, "শরৎকে লিখে আমার জন্মস্থানের জায়গাটী কিনে একটী বাড়ী কর। ছেলেরা সব এলে কোথা থাকবে? তোমরা সব কোথা থাকবে?" রাধারাণী তখন পশ্চিমদ্বারী রান্না ঘরটীতে থাকত। ঠিক এই সময় ঘরের কষ্টের কথা মাকে জানাতে শ্রীশ্রীমা বললেন, "থাম না রাধু, ওখানে বাড়ী হোক্, আমরা ওখানে গিয়ে থাক্‌বো।" রাধারাণী শুনে খুব আনন্দিত হল। আমি বললাম, "মা, আপনার জন্মস্থানের জায়গা মামারা দিবে কেন?

একবার রাঁচীর ভক্তরা জন্মস্থানটী পাথর দিয়ে বেঁধে চিহ্নিত করে রাখতে চেয়েছিলেন, কালী মামাকে বলায় তিনি বলেছিলেন, 'যতখানি জায়গা পাথর দিয়ে চিহ্নিত করে রাখবে ততখানি জায়গায় টাকা বিছিয়ে দিতে হবে!' এখন কি করবেন কে জানে? তখন এই সব কারণে জায়গাটী নেওয়া সম্ভব হয় নি। এখন মামারা জায়গা দিবেন কেন?" শ্রীশ্রীমা বললেন, "তুমি কালীকে আমার কাছে ডাক, আমি বলে দিচ্ছি।" কালী মামা আসলে শ্রীশ্রীমা বললেন, "দেখ কালী, আমার যেসব ছেলেরা আছে, কোন্ দিন আমার জন্মস্থানের জায়গা এমনিই কেড়ে নেবে, তার চেয়ে আমি থাকতে থাকতে তিন জনে (কালী মামা, প্রসন্ন মামা, বরদা মামা) তিনশ টাকা নিয়ে জায়গাটা ছেড়ে দিগে যা।" কালী মামা বললেন, "হ্যাঁ দিদি, তোমার ঘর হবে, এতে তো জায়গাটী এমনিই দিয়ে দিতে হয়। তবে আমাকে··· টাকা দিতে হবে।" তদুত্তরে মা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "শরৎকে লিখে কালীকে ···টাকা দিয়ে দাও। ওদের জানাবার দরকার নেই।" যা হ'ক, কালী মামার মত হওয়ায় মা বরদা মামাকেও ডেকে আনলে তিনশ টাকার পরিবর্ত্তে জায়গাটি ছেড়ে দিতে বললেন। তদুত্তরে বরদা মামা বললেন, "বেশ ত দিদি, তোমার ঘর হবে, জায়গা ত এমনি ছেড়ে দিতে হয়। যদি সকলেই দেয়, আমার কোনও আপত্তি নেই।" তখন প্রসন্ন মামা কলিকাতায় ছিলেন, এই বিষয় শরৎ মহারাজকে লিখলে, তিনি ললিত বাবুকে (ললিতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) জানিয়ে এর ব্যবস্থা করতে বললেন। ললিত বাবু প্রসন্ন মামাকে কলিকাতায় শ্রীশ্রীমার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে এনে কিছু প্রণামী দিলেন, এবং বরদা মামার নামে একটী আম্মোক্তারনামা সম্পাদন করলেন যাতে প্রসন্ন মামার অংশ বরদা মামার দ্বারা বিক্রয় করা সম্ভব হয়।

বিশ্বরূপ

(গীতা)

শ্রীকালিদাস রায়

হে দেব, তোমার দেহে দেখিতেছি
যত দেবর্ষি দেবতাগণে,
ভূতসঙ্ঘেরে যত ভুজঙ্গে
ব্রহ্মারে হেরি পদ্মাসনে।
হেরি বহু বাহু, উদর, নেত্র
বহু মুখ! রূপে অন্ত নাই,
হেরি চারিপাশে তোমার মধ্য,
আদি অবসান খুঁজে না পাই।

তুমি অব্যয় পরম বেদ্য
বিশ্বনিধান, হে অক্ষর,
নিত্যধর্ম্ম-রক্ষক তুমি
তুমি সনাতন পুরুষবর।
চন্দ্র সূর্য্য নেত্র তোমার
স্থিতি-লয়হীন অনাদি তুমি,
মুখমণ্ডলে হুতাশন জ্বলে,
সে তেজে তপ্ত বিশ্বভূমি।

তোমাতে পশিছে যত সুরগণ
ত্রাহি ত্রাহি ডাকে কৃতাঞ্জলি,
সিদ্ধ ঋষিরা স্বস্তি বচনে
গাহিছে পুণ্য স্তোত্রাবলী।
বহু মুখ, বহু নেত্র, চরণ
জঠর, দংষ্ট্রা-করাল রূপ,
দেখিয়া ত্রিলোক ক্ষুব্ধ ব্যাকুল,
আমিও ব্যাকুল, বিশ্বভূপ।
ব্যোম-ব্যাপ্ত বিবৃত বদন,
বিশাল নেত্র দীপ্ততম,
হেরিয়া বর্ণ-লীলা বিচিত্র
হারাই ধৈর্য্য, শান্তি, শম।
দংষ্ট্রা-করাল কালানলসম
হেরিয়া তোমার অযুত মুখ,
ভীত আমি দেব হও প্রসন্ন,
দিশাহারা হ'য়ে কাঁপে যে বুক।
ধৃতরাষ্ট্রের সন্তান যত
সহ বহু বীর নৃপতি রণে,
ভীষ্ম কর্ণ দ্রোণ ধাবমান
আমাদেরো বহু যোধের সনে।
ত্বরায় তোমার দংষ্ট্রা-করাল
মুখে পশে, হেরি অনেক বীরে,
দশনান্তরে পিষ্ট লগ্ন
লোল লম্বিত চূর্ণ শিরে।
নদনদীধারা ছুটে দিশি দিশি
হয় যথা হারা সিন্ধুজলে,
যত বীরগণ তেমনি পশিছে
তব জ্বলন্ত বদন তলে।
শলভ সকল যেমন সবেগে
অনলে ঝাঁপায়ে পুড়িয়া মরে,
এই দেহিগণ তেমনি সবেগে
পশে তব মুখে মরণ তরে।
জ্বালাময় মুখে কতবার তুমি
বিশ্বলোকেরে করিছ গ্রাস,
বিশ্ব ভরিয়া তাপ সঞ্চারি'
তব তেজ দহে, লাগিছে ত্রাস।

ব্যক্তাব্যক্ত প্রকৃতি-অতীত
ব্রহ্মারো তুমি জন্মমূল,
তুমি অনন্ত অক্ষর, তোমা
কেন না নমিবে এ জীবকুল ?
তুমি আদি দেব পুরাণ পুরুষ,
তুমি বিশ্বের নিধানভূমি।
তুমি জ্ঞাতা, জ্ঞেয় হে পরম ধাম
বিশ্ব ভরিয়া রাজিছ তুমি।
বায়ু, যম, শশী, অগ্নি, বরুণ,
প্রজাপতি, তুমি প্রপিতামহ,
বার বার নমি, নমি সহস্র
শত সহস্র প্রণতি লহ।
পশ্চাতে নমি সম্মুখে নমি
নমি হে সর্ব্ব, সকল দিকে,
অমিতশক্তি সর্ব্ব স্বরূপ
ব্যেপে আছ তুমি বিশ্বটিকে।
কৃষ্ণ, যাদব, সখা বলি' তোমা
ডেকেছি প্রণয়ে ইচ্ছামত,
তোমার মহিমা না জেনে প্রমাদে
মর্য্যাদাহানি করেছি কত।
আসনে শয়নে শয্যাবিহারে,
করেছি রঙ্গ হেলার ভরে,
একলা পেয়ে বা সখী-পরিষদে,
ক্ষমা চাই সেই ত্রুটির তরে।
তুমি চরাচর বিশ্বের পিতা
গুরু গরীয়ান্ পূজ্যতম,
অমিতপ্রভাব কে আছে ত্রিলোকে
মান্যতর বা তোমার সম ?
তব অপূর্ব রূপ হেরি দেহে
জাগে রোমাঞ্চ, কাঁপি যে ত্রাসে,
হও প্রসন্ন, তোমার সৌম্য
সে রূপ আবার দেখাও দাসে।
দেখা দাও মোরে কিরীট চক্র
গদা চারি হাতে ধরিয়া, হরি,
সহস্র বাহু বিরাট মূর্ত্তি !
সে রূপ হেরিতে বাসনা করি।

শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী

[১৯০৯।১৫ই আগষ্ট—১৯১০। ফেব্রুয়ারী]

(দ্বিতীয়াংশ)

১৯০৯। নভেম্বর—অরবিন্দ বার্ক ও ভল্‌টেয়ারের ভক্ত জন মরলী শাসন-সংস্কারে হিন্দু-সম্প্রদায়কে অসন্তুষ্ট করার দরুন মরলীকে সম্রাট আকবরের সহিত তুলনা করিয়া লিখিলেন :—

"আকবর ও মরলী—আকবরে ও মরলীতে অনেক সাদৃশ্য আছে। আকবর উদারনীতিক ছিলেন। লর্ড মরলীও উদারনীতিক, আকবর হিন্দুদের বশ করিলেন, মরলী মুসলমানদের বশ করিয়াছেন, আকবর শাসনসংস্কার করিয়াছিলেন, মরলীও শাসনসংস্কার করিয়াছেন ; কিন্তু ভগবানের সহিত মরলীর এই মাত্র মিল আছে যে ভগবান মায়াবী, রৌদ্র, সৌম্য এই বিবিধ মায়ার সমাবেশে জগৎ চালান, মরলীও মায়াবী, রৌদ্র, নিগ্রহ ও সৌম্য শাসনসংস্কার, এই দ্বিবিধ মায়ার সমাবেশে বৃটিশ সাম্রাজ্য চালান।"—["ধর্ম্ম", ৬ই অগ্রহায়ণ, পৃঃ ৬-৭]

অরবিন্দ আকবর ও মরলীতে সাদৃশ্য দেখিলেন। কিন্তু আকবর মুসলমান হইয়াও হিন্দুসম্প্রদায়কে যেরূপ সন্তুষ্ট রাখিতে পারিয়াছিলেন, মরলী মুসলমান না হইয়াও তাহা পারেন নাই। মরলীর মুসলমান-প্রীতি ভেদনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। আকবরে এই ভেদনীতি ছিল না।

বিপিন পালের "Aetiology of Bomb"—বিপিন পাল "স্বরাজ" পত্রিকায় বোমার উৎপত্তির কারণ বিশ্লেষণ করিয়া এক প্রবন্ধ লিখিলেন। এই প্রবন্ধে বোমার উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধেই লেখা হইয়াছে, পরন্তু বোমারুদের উৎসাহ দিবার জন্য কিছুই লেখা হয় নাই। মিঃ ষ্টেড (Stead) "রিভিউ অফ্ রিভিউস্" (Review of Reviews) পত্রিকায় যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল :

"Mr. Stead writes—'If Mr. Bepin Ch. Pal who has given proofs of his detestation of the whole evil system of terrorism had not written this article of his motion, Lord Morley could hardly have spent a thousand rupees more profitably for the Indian Government than by paying Mr. Bepin Chandra Pal a fee to make so careful, so judicious and so well-informed a study of causes which led to the apparition of the Bomb in India."

কতকগুলি সংবাদ :—(১) মিঃ হাসান ইমাম, মিঃ গোখলের "Students and Politics" বক্তৃতার প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, ছাত্রদের রাজনীতিতে যোগ দিবার অধিকার আছে এবং দেওয়া উচিত। অরবিন্দ মিঃ হাসান ইমামের এই মত সম্পূর্ণ সমর্থন করিলেন।

(২) জাপানে হিরোবুমি ইতোকে গুপ্তহত্যা করা হইল। অরবিন্দ জাপানের ইতিহাসে প্রিন্স ইতোর সর্ব্বোচ্চ স্থান নির্দ্দেশ করিয়া এবং

আমাদের ইতিহাসে অনেক স্মরণীয় মহাপুরুষের সহিত তুলনা করিয়া ইতোকে উচ্চ প্রশংসায় অভিনন্দিত করিলেন। তাঁহাকে যে গুপ্তহত্যা করা হইয়াছে, ইহাও ইতোর পক্ষে একটা আত্মোৎসর্গ, এইরূপ ব্যাখ্যা করিলেন। দুঃখের বিষয়, অরবিন্দ লিখিত "ধর্ম্ম"-এর প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে ছাপা হইবার পর গ্রন্থে এই প্রবন্ধটি স্থান পায় নাই।

(৩) অরবিন্দ আলীপুর জেলে থাকাকালীন একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন। ঐ কবিতাটি—"Invitation" ৬ই নভেম্বর "কর্ম্মযোগিন"-এ ছাপা হইল। আলীপুর জেলে বসিয়াও তিনি কবিতা লিখিয়াছেন! তিনি যে বলিয়াছেন, "আমি কবিতা ও দেশকে সমান ভালবাসি"—তাহা প্রমাণ হইয়া গেল। "Who?" বলিয়া আর একটি কবিতা ১৩ই নভেম্বর ছাপা হইল।

(৪) লাহোরে হিন্দু-সভার অধিবেশন হইল। লাজপত রায় বলিলেন, "আগে হিন্দু জাতীয়তা সংস্থাপিত হউক, তাহার পরে হিন্দু-মুসলমান এই দুই জাতি লইয়া ভারতীয় জাতীয়তা সংস্থাপিত হইবে।" লাজপত রায়ের এ কথায় অরবিন্দ লিখিলেন (২২শে কার্ত্তিক; "ধর্ম্ম")—"বড় সাংঘাতিক কথা। তবে যখন অনেক মুসলমানের স্বার্থপর আচরণে এই ভাব হিন্দুর হৃদয়ে প্রবল হইল, তখন একজন নির্ম্মলচরিত্র, নিঃস্বার্থ, প্রকৃত দেশহিতৈষী হিন্দু নেতার মুখে একথা যে স্পষ্ট ভাবে প্রচারিত হইয়াছে, তাহা ভালই হইয়াছে।"

"অনেক মুসলমানের স্বার্থপর আচরণে" ক্ষুব্ধ হইয়া অরবিন্দ হিন্দুসভার পক্ষপাতী হইলেন। আমরাও অরবিন্দের সঙ্গে বলিতেছি,—"বড় সাংঘাতিক কথা।" ঠিক চার বৎসর পূর্ব্বে, ঢাকার নবাব সলিমুল্লার প্রাসাদে মুসলিম লীগ ভূমিষ্ঠ হইয়াছে।

(৫) গোখলে ও "হিন্দু প্যাঞ্চ"—"হিন্দু প্যাঞ্চ"-এর সম্পাদক লিখিলেন যে, মিঃ গোখলে মিঃ মরলীকে কুমন্ত্রণা দিয়া মিঃ তিলককে ছয় বৎসরের জন্য জেলে পাঠাইয়াছেন। ইহাও একটি সাংঘাতিক কথা,—বিশেষতঃ আইনের চক্ষে মানহানিকর অপরাধ। সুতরাং সম্পাদকের শাস্তি হইয়া গেল। কথাটা বিশ্বাসযোগ্য নয়, তবে অরবিন্দ হয়তো বিশ্বাস করিতেন কিম্বা ভিতরের খবর জানিতেন।

(৬) **বড়লাট লর্ড মিণ্টোর প্রতি বোমা নিক্ষেপ**—বড়লাট আমেদাবাদে গাড়ীতে যাইতেছিলেন, গাড়ীর উপর বোমা নিক্ষিপ্ত হইল। ভাগ্যক্রমে কোন ক্ষতি হয় নাই।

বাঙ্গলার সন্ত্রাসবাদের ছোঁয়াচ লণ্ডনে গিয়াছে, —আমেদাবাদেও গেল। স্বয়ং বড়লাটের জীবন পর্য্যন্ত নিরাপদ নয়। সন্ত্রাসবাদীরা যে কাহার কথায় পরিচালিত হইতেছে,—তাহাদের নেতা যে কে,—তাহাও বুঝিবার উপায় নাই।

(৭) আলীপুর বোমার মকদ্দমায় হাইকোর্টে আপীলের রায় বাহির হইল (২৭শে নভেম্বর, "কর্ম্মযোগিন্"-এ প্রকাশ)। অরবিন্দ লিখিলেন:—

"We ourselves belong to a party of peaceful revolution. We have also always admitted that there is a terrorist party, for bombs are not thrown without hands and men are not shot for political reasons unless there is terrorism in the background."

অরবিন্দ খোলসা লিখিলেন যে, তিনি সন্ত্রাসবাদীদের দলভুক্ত নহেন, শান্তিপূর্ণ বিপ্লববাদীদের ("Peaceful revolution") দলভুক্ত। অর্থাৎ, তিনি নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধবাদী। মিঃ সি আর দাশ এই কথা বলিয়াই তাঁহাকে খালাস করিয়াছেন। যদি কেহ আশা করেন যে, অরবিন্দ নিজ মুখে স্বীকার করিবেন যে তিনি বাঙ্গলাদেশে সন্ত্রাসবাদের

প্রবর্ত্তক, তবে বুঝিতে হইবে যে তিনি সন্ত্রাসবাদের আদর্শ ও কার্য্যপ্রণালী সম্পর্কে একেবারেই অনভিজ্ঞ,—কিছুই জানেন না। আলীপুর জেলে হ্যালিডে সাহেবের নিকটও অরবিন্দ মজঃফরপুরের হত্যাকাণ্ডের সহিত সকল সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়াছিলেন।

"হ্যালিডে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, এই কাপুরুষোচিত দুষ্কর্ম্মে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া আপনার কি লজ্জা করে না?" "আমি লিপ্ত ছিলাম, ইহা ধরিয়া লইবার আপনার কি অধিকার?" উহার উত্তরে হ্যালিডে বলিলেন, "আমি ধরিয়া লই নাই, আমি সবই জানি।" আমি বলিলাম, "কি জানেন বা না জানেন আপনারাই অবগত, এই হত্যাকাণ্ডের সহিত সকল সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করি।" হ্যালিডে আর কোন কথা বলিলেন না।—["কারাকাহিনী,"—পৃঃ ১১]

সন্ত্রাসবাদীদের অপরাধ স্বীকার করিতে নাই। অরবিন্দ ও প্যারিসে শিক্ষাপ্রাপ্ত গুপ্তসমিতির কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হেমচন্দ্র, ইঁহারা দুইজনে আলীপুর বোমার মামলায় অপরাধ স্বীকার করেন নাই। বারীন্দ্র গুপ্তসমিতির কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে হেমচন্দ্রের মত অভিজ্ঞ নহেন, তাই তিনি গুপ্তসমিতির নিয়মপ্রণালী ভঙ্গ করিয়া—কতকটা হামবড়াই, কতকটা হঠকারিতার বশে—অরবিন্দের মতের বিরুদ্ধে—অপরাধ স্বীকার করিয়াছেন।

১৯০৯। ডিসেম্বর—বিপিন পাল ও তাঁহার ম্যাঞ্চেষ্টার বক্তৃতা—মরলীর শাসন সংস্কারের উপর ম্যাঞ্চেষ্টারে বিপিন পাল এক বক্তৃতা দিলেন। ১১ই ডিসেম্বর "কর্ম্মযোগিন্"-এ উহা ছাপা হইল। বক্তৃতার পরিশেষে তিনি বলিলেন যে, ভারতে বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তন না হইলে ভারতবর্ষ আয়র্ল্যাণ্ডকেও ছাড়াইয়া যাইবে,—নূতন রাশিয়া হইবে।

বাঙ্গলায় নিগ্রহ-নীতি ও সন্ত্রাসবাদের সংঘর্ষে বিলাতে বিপিন পাল, কলিকাতায় অরবিন্দ দুইজনেই অতিমাত্রায় উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছেন। কেহই কোনও কূল-কিনারা পাইতেছেন না। মরলীর শাসন-সংস্কারকে উল্লেখ করিয়া বিপিনবাবু বলিলেন,—"It is a bribery calculated to make a section of the people sell their souls for a mess of pottage.…If the present state of things continued,—India would be worse than a second Ireland, it would be a new Russia."

অরবিন্দ ও লাহোর কংগ্রেস—"মেহ্‌তার চাল" সম্পর্কে অরবিন্দ লিখিলেন,—"ফেরোজ শাহের ইচ্ছা, বঙ্গদেশের প্রতিনিধিগণকে লাহোরে হাজির করাইয়া তাঁহাদের দ্বারা নিজের কার্য্য হাসিল করিবেন, স্বয়ং বঙ্গদেশীয় শিখণ্ডীর পশ্চাৎ গুপ্তভাবে যুদ্ধ করিবেন। নচেৎ কুচক্রীর শিরোমণি উদ্দেশ্যহীন চাল চালিবেন কেন?"—[ধর্ম্ম, ২৭ অগ্রহায়ণ]

অরবিন্দ কি এখানে "বঙ্গদেশীয় শিখণ্ডী" বলিতে সুরেন্দ্রনাথকেই ইঙ্গিত করিলেন? কত বড় শোচনীয় ঘটনা! অবস্থার ও পরিস্থিতির কী পরিবর্ত্তনই না হইতে চলিয়াছে!

ইহার পরেই অরবিন্দ "ধর্ম্ম" পত্রিকায় লিখিলেন,—

"যুক্ত মহাসভা":—"ক্রীড্" (?)—মেহ্‌তা কিছুতেই কলিকাতা মহাসভার বয়কট প্রস্তাব গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না।…বঙ্গদেশের জাতীয় পক্ষ কখনও মেহ্‌তা মজলিসকে মহাসভা বলিয়া স্বীকার করিবে না। সেই মজলিসে ঢুকিবার জন্য লালায়িত নহে। ক্রীডে সহি করিতে কোনও কালে রাজী হইবে না।…ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন মহাসভার দাবী বলিয়া কলিকাতায় স্থির হইয়াছিল। যদিও ইহাতে আমাদের মত ছিল না, তথাপি অধিকাংশ

প্রতিনিধির মত বলিয়া আমরা ইহাই মানিয়া লইলাম।...ক্রীডে সহি করা এবং ইহাতে মত দেওয়া একই কথা।

"ক্রীডে সহি করা জাতীয় আদর্শের অপমান, জাতির অপমান, জাতীয়তার অপমান, মাতৃভক্ত নিগৃহীত ভারত-সন্তানদের অপমান করা হইবে। যদি আমরা যুদ্ধে পরাজিত, সন্ধিভিক্ষাপ্রার্থী হইতাম, তাহা হইলে মধ্য-পন্থীদের আবদার বুঝিতাম, আমরা পরাজিতও নহি, ভিক্ষাপ্রার্থীও নহি। দেশের হিতের জন্য, দেশবাসীর বাসনা বলিয়া যুক্ত মহাসভা করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম নচেৎ আমাদের বল আছে, তেজ আছে, সাহস আছে, ভবিষ্যত্ত আমাদের পক্ষে, দেশবাসী আমাদের পক্ষে, যুবকমণ্ডলী আমাদেরই, আমরা স্বতন্ত্রভাবে দাঁড়াইতে সর্ব্বদা প্রস্তুত।"

বোম্বাই মডারেটরা চরমপন্থীদের একেবারে ছাঁটিয়া ফেলিলেন। এক অরবিন্দ ভিন্ন জাতীয়দলের আর কোনও নেতাই এখন ভারতবর্ষে নাই। অর-বিন্দের মিলিত কংগ্রেসের স্বপ্ন হাওয়ায় মিলিয়া গেল। স্বীকার করিতেই হইবে, মডারেটদের নিকট জাতীয়দলের নেতা হিসাবে অরবিন্দের পরাজয় ঘটিল। এই পরাজয়ের ক্ষোভ তাঁহার মনে নিরাশার সঞ্চার করিবে, ইহা আমরা দেখিতে পাইব। ১২ই পৌষ "ধর্ম্ম" পত্রিকায় অরবিন্দ লিখিলেন,—

"আবার জাগো—বঙ্গবাসী অনেক দিন ঘুমাইয়া রহিয়াছ, যে নব জাগরণ হইয়াছিল, যে নব প্রাণসঞ্চারক আন্দোলন সমস্ত ভারতকে আন্দোলিত করিয়াছিল তাহা নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে।...যে মিলনের আশায় এতদিন অপেক্ষা করিয়াছিলাম সে আশা ব্যর্থ। মধ্যপন্থী দল জাতীয় পক্ষের সহিত মিলিত হতে চায় না, গ্রাস করিতে চায়।...কিন্তু আর উদ্দাম উত্তেজনার বশে যেন কোন কার্য্য না কর।"

উপরের এই কয়েক ছত্রে অরবিন্দের মনের ভাব সুস্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে। যে অবস্থার মধ্যে পড়িয়া তাঁহার মতি ও গতি পরিবর্ত্তিত হইতে চলিয়াছে, তাঁহার "আশা ব্যর্থ" হইয়াছে, আমরা তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি।

২১শে ডিসেম্বর নাসিকের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জ্যাক-সনকে গুপ্তহত্যা করা হইল। সন্ত্রাসবাদ মারাঠা হইতেই অরবিন্দ ১৯০২ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলায় আনিয়া-ছিলেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে পুণায় র‍্যাণ্ড ও আয়ষ্টকে গুপ্ত হত্যা করা হয়। সন্ত্রাসবাদীদের ইহাই প্রথম গুপ্তহত্যা। বাঙ্গলায় তখন ইহার নামগন্ধও ছিল না। কিন্তু নাসিকে মিঃ জ্যাক্‌সনের গুপ্তহত্যা সম্ভবত বাঙ্গলার সন্ত্রাসবাদের ছোঁয়াচ হইতেই হইয়া থাকিবে। বাঙ্গলা হইতেই সন্ত্রাসবাদ এখন বিলাতে যাইতেছে—আমেদাবাদে যাইতেছে—নাসিকেও গেল!

অরবিন্দ (১২ই পৌষ) "ধর্ম্ম" পত্রিকায় লিখিলেন:—

"নাসিকে খুন—নাসিকবাসী সবারকর কয়েকটি উদ্দাম কবিতা লিখিয়াছিলেন বলিয়া ইংরাজ বিচারালয়ে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে দণ্ডিত হইলেন। সবারকরের অল্পবয়স্ক বন্ধু নাসিকের কলেক্‌টার জ্যাকসনকে হত্যা করিয়া তাহার প্রতিশোধ লইলেন (২১শে ডিসেম্বর, ১৯০৯)।... অন্ধকারেই হত্যাকারীর সুবিধা, নীরবতার মধ্যে উন্মত্ত রাষ্ট্রবিপ্লবকারীর পিস্তল ও বোমার শব্দ ঘন ঘন শোনা যায়, নিরাশাই গুপ্তসমিতির আশা। যাহাতে এই রাজনীতিক হত্যা অবলম্বন করিবার প্রবৃত্তি দেশ হইতে উঠিয়া যায় আমরাও তাই চেষ্টা করিতে চাই।"

"উদ্দাম কবিতা" লিখিবার জন্য যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, ইহা লঘু পাপে গুরু দণ্ড। কিন্তু ইহাই আবার নিগ্রহ-নীতি। এবং নিগ্রহ-নীতির প্রতি-ক্রিয়াস্বরূপ গুপ্তহত্যা। অরবিন্দ এই রাজনৈতিক গুপ্তহত্যার প্রবৃত্তি যাহাতে "দেশ হইতে উঠিয়া যায়" তাহার চেষ্টা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। অবস্থাধীনে ও পরিস্থিতির পরিবর্ত্তনে ইহাই যদি এখন অরবিন্দের অকপট অভিমত হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে বিপিন পাল "বন্দেমাতরম্‌"

পত্রিকায় "Golden Bengal Scare" প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, অরবিন্দ তখন তাহার প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও, এখন আবার বিপিন পালের মতে ফিরিয়া আসিতেছেন। তিনি নাসিকে খুনের পর সন্ত্রাসবাদীদের উদ্দেশ্য করিয়া স্পষ্টই লিখিলেন, "আর উদ্দাম উত্তেজনার বশে যেন কোন কার্য্য না কর।"

সরোজিনী নাইডু ও নাসিক হত্যা—বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর ভ্রাতা। বিলাতে কার্জ্জন উইলির হত্যার পর, বিলাতের "টাইমস্" পত্রে, হত্যাকারী পাঞ্জাবী যুবক ধিঙ্‌ড়ার প্রশংসা করিয়া বীরেন্দ্রনাথ এক পত্র লিখিলেন। ইহাতে বীরেন্দ্রনাথের ভগিনী সরোজিনী টাইম্‌সে হায়দরাবাদ হইতে দুইখানি পত্র লিখিয়া বলিতেছেন, "বীরেন্দ্রনাথের সহিত আমাদের এক্ষণে আর কোনও সংস্রবই নাই। সুতরাং তাঁহার রাজনৈতিক মতামতের জন্য আমরা কোন অংশেই দায়ী নহি। আমি, আমার পিতা এবং আমাদের পরিবারবর্গের সকলে নিজামভক্ত ও ব্রিটিশভক্ত। বীরেন্দ্রনাথ বিগড়াইয়া গিয়াছে, ইত্যাদি ইত্যাদি।"—["ধর্ম্ম", ১২ই পৌষ]

অরবিন্দ ইহার উপর কোনও মন্তব্য করিলেন না, শুধু লিখিলেন—"মদনলালের জ্ঞাতিবর্গও মদনলালের কাণ্ডের পর এইরূপ প্রকাশ করিয়াছিল।"

অরবিন্দের নির্ব্বাসন-বিভীষিকার দ্বিতীয় দফা—আমরা দেখিয়াছি, যখনই একটা গুপ্তহত্যা হয় তার পরই অরবিন্দকে নির্ব্বাসনের গুজব রটে, এবং এই গুজবের উত্তরে অরবিন্দ তাঁহার দেশবাসীকে "খোলা-চিঠি" লিখিয়া তাঁহার মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া প্রস্তুত হইয়া বসিয়া থাকেন। কার্জ্জন উইলীর হত্যার পর তিনি এইরূপ করিয়াছিলেন। নাসিকে হত্যার পরেও তিনি দ্বিতীয়বার "কর্ম্মযোগিন্"-এ তাঁহার দেশবাসীকে (২৫শে ডিসেম্বর) এক "খোলা-চিঠি" ("To my Countrymen") লিখিলেন।

কতকগুলি সংবাদ—(১) বারীন, উল্লাসকর প্রভৃতির ফাঁসির হুকুম রদ হইয়া হাইকোর্টে আপিলের রায়ে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হইল। "মহারাজা" ষ্টিমার ১২ই ডিসেম্বর, রবিবার প্রাতে বারীন প্রভৃতিকে লইয়া আন্দামান রওনা হইল।

(২) রমেশচন্দ্র দত্তের মৃত্যু হইল। লালমোহন ঘোষের মৃত্যুর অল্প পরেই ভারতবর্ষ রমেশচন্দ্র দত্তকে হারাইল। অরবিন্দ রমেশচন্দ্রের উপর বিস্তৃত সমালোচনা করিয়াছেন। ভারতীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে রমেশচন্দ্রের পুস্তকাবলী বাঙ্গলার স্বদেশীকে বহু পরিমাণে সাহায্য করিয়াছে, উদ্দীপনা ও প্রেরণা দিয়াছে।

(৩) লাহোর কংগ্রেস :—"বঙ্গদেশ হইতে সুরেনবাবু ও ভূপেনবাবু প্রমুখ নয় জন ব্যক্তি লাহোরে পদার্পণ করিয়াছিলেন।...বঙ্গদেশের কলিকাতা ব্যতীত অন্যান্য কোন স্থান হইতে একজনও প্রতিনিধি প্রেরিত হয় নাই।...আমরা আশা করি, পুরাতনের আমূল ধ্বংস। তার চিতাভস্মের উপরই নূতন তাহার মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবে।" ["ধর্ম্ম," ১৯শে পৌষ]

(৪) অরবিন্দ লিখিলেন,—"মিঃ গান্ধীর নেতৃত্বে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ভারতবর্ষ অপেক্ষা ট্রান্সভালে অধিকতর কার্য্যকরী হইতেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, ট্রান্সভালের কুলীদের অপেক্ষাও কি আমরা হীন ?"

(৫) সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জীর লাহোরে ব্রাড্‌লো হলে বক্তৃতা—"ধর্ম্ম" পত্রিকায় ১৯শে পৌষ সংবাদ বাহির হইল—

"সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জী ব্রাড্‌লো হলে বক্তৃতা দিয়া বাহিরে আসিলে দেখা গেল দেওয়ালে নোটিশে লেখা আছে পাঞ্জাবীরা বোমা ব্যবহার কর, অলসের মত বসিয়া থাকিও না এবং ইংরেজ মার।"

মডারেটরা কংগ্রেস, কনফারেন্স ও সাধারণ সভাসমিতিতে অরবিন্দ-পরিচালিত জাতীয়দলের

বিরুদ্ধে পূর্ণ মাত্রায় বর্জ্জন-নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। ওদিকে, গভর্ণমেণ্টের নিগ্রহ-নীতি—এদিকে, সন্ত্রাসবাদীদের বিভীষিকাপূর্ণ গুপ্তহত্যা,—চতুর্দ্দিকে পরিস্থিতির এই উত্তাপ ক্রমশঃ অরবিন্দের পক্ষে সহ্য করা কঠিন হইয়া পড়িতেছে। দুই মাস পর, অরবিন্দের চন্দননগর প্রস্থানের কারণ হঠাৎ একদিন বা এক মুহূর্ত্তে উপস্থিত হয় নাই।

১৯১০। জানুয়ারী—ইংরেজী নূতন বৎসর আরম্ভ হইল। কলিকাতায় পৌষের শীত পড়িয়াছে।

অরবিন্দ ৩৮ বৎসর বয়সে কলিকাতায় এই শেষ শীতকাল কাটাইয়া যাইতেছেন। সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা বঙ্গভূমির শীত ও গ্রীষ্ম আর এ জীবনে তাঁহাকে স্পর্শ করিবে না। "কর্ম্মযোগিন্" ও "ধর্ম্ম" পত্রিকার অফিস ১৪নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট হইতে ৪নং শ্যামপুকুর লেনে উঠিয়া গেল।

"ধর্ম্ম" পত্রিকায় ১৯শে পৌষ, অরবিন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে লিখিলেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভবিষ্যৎ ভারত—"যিনি পূর্ণ, যিনি যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তক, যিনি অতীত অবতারগণের সমষ্টিস্বরূপ তিনি ভবিষ্যৎ ভারত দেখেন নাই বা তৎসম্বন্ধে কিছু বলেন নাই একথা আমরা বিশ্বাস করি না। আমাদের বিশ্বাস যাহা তিনি মুখে বলেন নাই, তাহা তিনি কার্য্যে করিয়া গিয়াছেন। তিনি ভবিষ্যৎ ভারতের প্রতিনিধিকে আপন সম্মুখে বসাইয়া গঠিত করিয়া গিয়াছেন। এই ভবিষ্যৎ ভারতের প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন্দ। অনেকে মনে করেন যে স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশ-প্রেমিকতা তাঁহার নিজের দান। কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে তাঁহার স্বদেশপ্রেমিকতা তাঁহার পরম পূজ্যপাদ গুরুদেবেরই দান।······তিনি (স্বামী বিবেকানন্দ) জন্ম হইতেই বীর, ইহা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ভাব। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে বলিতেন, 'তুই যে বীর রে।' তিনি জানিতেন যে তাঁহার ভিতর যে শক্তিসঞ্চার করিয়া যাইতেছেন, কালে সেই শক্তির উদ্ভিন্ন ছটায় দেশ প্রখর সূর্য্যকরজালে আবৃত হইবে। আমাদের যুবকগণকেও এই বীর ভাব সাধন করিতে হইবে। তাহাদিগকে বেপরওয়া হইয়া দেশের কার্য্য করিতে হইবে এবং অহরহ এই ভগবৎ বাণী স্মরণ পথে রাখিতে হইবে, 'তুই যে বীর রে'।" *

গ্রেপ্তারের পূর্ব্বে যাঁহার ঘরে দক্ষিণেশ্বরের মাটি সযত্নে রক্ষিত ছিল, সেই অরবিন্দের পক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে এরূপ লেখাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। বরং ইহা খুব স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়। দেশের যুবক-গণকে নির্ভীক হইয়া দেশের কার্য্যে প্রবৃত্ত করিবার জন্য অরবিন্দ স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টান্তকে উজ্জ্বল করিয়া ধরিতেছেন, এবং লিখিতেছেন, "আমাদের যুবকগণকেই এই বীর ভাব সাধন করিতে হইবে। তাহাদিগকে বেপরওয়া হইয়া দেশের কার্য্য সাধন করিতে হইবে।"

আবার,—তৃতীয়বার,—অরবিন্দকে নির্ব্বাসনের কথা উঠিল। অরবিন্দ "কর্ম্মযোগিন্" পত্রিকায় "Menace of Deportation" বলিয়া প্রবন্ধ লিখিলেন। "ধর্ম্ম" পত্রিকায় ২৬শে পৌষ, ৮ই জানুয়ারী অরবিন্দ লিখিলেন—

অরবিন্দের নির্ব্বাসনের বিভীষিকার ৩য় দফা:—"আমাদের পুলিশ বন্ধুগণ রটনা করিয়াছেন যে আবার নির্ব্বাসনরূপ ব্রহ্ম অস্ত্র

* মিঃ চারুচন্দ্র দত্ত লিখিয়াছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে "ধর্ম্ম" পত্রিকায় যে সমস্ত লেখা বাহির হইয়াছিল তাহা অরবিন্দ লেখেন নাই। ইহার প্রতিবাদ করিয়া শ্রীরামচন্দ্র মজুমদার লিখিয়াছেন,—"ধর্ম্ম" পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তিনি (অরবিন্দ) কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত "ভারতের প্রাণপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ" তাঁহারই লিখিত। ইহা আমি বিশেষভাবে জানি।" ("উদ্বোধন," ভাদ্র, ১৩৫২, পৃঃ ২৩০)। মিঃ চারুচন্দ্র দত্ত অরবিন্দ সম্পর্কে আরও অনেক কথা লিখিয়াছিলেন যাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে। মিঃ দত্ত এই প্রমাণের বিরুদ্ধে কোনও জবাব পর্য্যন্ত দিতে পারেন নাই। আমরা শ্রীরামচন্দ্র মজুমদারের কথাই অধিকতর নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে করিতেছি।

নিক্ষিপ্ত হইবে। এই বার নয় জন নহে, চব্বিশ জনকে। পুলিশের এই তালিকায় শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ নাকি প্রথম নম্বর পাইয়াছেন। আমরা কখন বুঝিতে পারি নাই, নির্ব্বাসন এমন কি ভয়ঙ্কর জিনিষ যে লোকে নির্ব্বাসন নাম শুনিয়া ভয়ে জড়সড় হইয়া দেশের কার্য্য, কর্ত্তব্য, মনুষ্যত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক কম্পিত কলেবরে ঘরের কোণে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়ে।............ বাহিরে পরিশ্রম করিতেছিলাম, নানা দুশ্চিন্তার মধ্যে দেশসেবা করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম, না হয় ভগবান লর্ড মিণ্টো বা মরলীকে যন্ত্র করিয়া বলিলেন, যাও, নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাক, নির্জ্জনে আমার চিন্তা কর, ধ্যান কর, পুস্তক পড়, পুস্তক লেখ, জ্ঞান সঞ্চয় কর, জ্ঞান বিস্তার কর। জনতায় থাকার রস আস্বাদন করিতেছিলে, নির্জ্জনতার রস আস্বাদন কর। এই এমন কি ভয়ানক কথা যে ভয়ে কাতর হইতে হয়? ....ভারতের স্বাধীনতা না হয় স্থাপন করিতে পারিলাম না, ভারতের স্বাধীনতা ভোগ করিতে আসিব, কেহ আমাকে বারণ করিতে পারিবে না। এত ভয় কিসের?.........ব্রাহ্মভালের কুলীদের মহৎভাব এবং ভারতের শিক্ষিত লোকের এই জঘন্য কাতরভাব দেখিয়া লজ্জিত হইতে হয়।......

"**নির্ব্বাসন অসম্ভব**—২৪ জনকে নির্ব্বাসন করুন, বা ১০০ জনকে নির্ব্বাসন করুন, অরবিন্দ ঘোষকে নির্ব্বাসন করুন, বা সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জীকে নির্ব্বাসন করুন,—কালচক্রের গতি থামিবার নয়।"

গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মৌলবী শামসুল আলমকে হত্যার দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে অরবিন্দকে নির্ব্বাসনের জন্য তৃতীয়বার গুজব রটিল। ইহার সাড়ে চার মাস পূর্ব্বে (১লা সেপ্টেম্বর) মিঃ রিজ্ নামে পার্লামেণ্টের এক সভ্য বলিয়াছিলেন—

"ঘোষ নামে একটা লোক (শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষই ইঁহার উদ্দিষ্ট) অতিকষ্টে কারাদণ্ড হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে; এখন সে যুবকদিগকে বলিতেছে, কারাক্লেশ যতটা ভয়াবহ মনে হয় ততটা ভয়াবহ নহে; সুতরাং তাহারা যেন কাপুরুষ হইয়া না যায়। ভারত গভর্ণমেণ্ট অচিরে ইহাকে নির্ব্বাসিত করুন।"—["ধর্ম্ম,"—"রিজের বিষো-দ্গার"]

বাঙ্গলার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছে। ঝড় উঠিবার সম্ভাবনা। কবির ভাষায় বলা যায়, —"তোমার মুক্তকেশের পুঞ্জমেঘে লুকায় অশনি।" —অরবিন্দের প্রস্থানের কারণ, একে একে পুঞ্জীভূত হইতেছে।

২৪শে জানুয়ারী হাইকোর্টে গোয়েন্দা শামসুল আলমকে সন্ত্রাসবাদীরা হত্যা করে। "কর্ম্মযোগিন্"-এ লেখা হইল—"The victim was the right-hand man of Mr. Norton in Alipore Bomb case."

গোয়েন্দা আলম খুন—"গত সোমবার ৫-১০ মিনিটের সময় কলিকাতা হাইকোর্টে, আন্দাজ বিশ বৎসর বয়স্ক একজন যুবক গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মৌলবী শামসুল খাঁ বাহাদুরকে গুলি করিয়া মারিয়াছে। মিঃ আলম গত ১৯০৮ অব্দের মে মাস হইতে আলি-পুরের বোমার মামলার তদ্বির করিতেছিল এবং আশুবিশ্বাসের হত্যার পূর্ব্বে আশুবাবুর ও পরে ঐ মামলায় আলিপুরের দায়রায় এবং হাইকোর্টে নর্টন সাহেবের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হইয়া কাজ করিতেছিল। হাইকোর্টে যে বোমার মামলা এখন চলিতেছে তাহার তদ্বিরও আলম করিতেছিল এবং গত সোমবার প্রায় সমস্ত দিনই সে আদালতে হাজির ছিল। পাঁচটা বাজিতে যখন দশ মিনিট বাকী তখন জজ উঠিলে আলম তাহার কাগজপত্র সমস্ত গুছাইয়া রাখিয়া কতকগুলি ভদ্রলোকের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে বাহিরে আসে। যে

ঘুরান পাথরের সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিলে ওল্ড পোষ্ট অফিস্ ষ্ট্রীটে আসা যায়, আলম যখন সেই সিঁড়ির কাছে আসিয়াছে, তখন প্রায় ১৯।২০ বৎসরের একজন যুবক পশ্চাৎ দিক হইতে তাহার নিকট আসিয়া আলোয়ানের ভিতর হইতে রিভলবার বাহির করিয়া তাহার পৃষ্ঠদেশে গুলি করে। যুবকটিকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য আলম তখন একবার খুব চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু পারে নাই। শাদা চাপরাসীকে পাক্ড়ো, পাক্ড়ো বলিয়া তৎক্ষণাৎ সটান্ চিৎ হইয়া পড়িয়া যায় এবং দু একবার গোঁ গোঁ শব্দ করিয়া মরিয়া যায়। গুলি খাওয়ার ৩।৪ মিনিট পরে আলম মরিয়া যায়।"—["ধর্ম্ম," ১৮ই মাঘ (১লা ফেব্রুয়ারী)]

বারীন্দ্র প্রভৃতি আন্দামানে রওনা হইবার প্রায় দেড়মাস পরে গোয়েন্দা আলমকে হত্যা করা হইল। সন্ত্রাসবাদ ফাঁসি বা দ্বীপান্তরেও মরিল না। ২৯শে জানুয়ারী, আলমকে হত্যার পাঁচদিন পর, অরবিন্দ "কর্ম্মযোগিন্"-এ লিখিলেন, "হাইকোর্টে আলমকে হত্যা, হত্যাকারীর পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সাহসের কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।—("Boldest of the many bold acts of violence.") They (the terrorists) prefer public places and crowded buildings,—Nasik—London—Calcutta — Goswami in jail—these are remarkble features."

অরবিন্দ "boldest of the bold" বলায় এক হিসাবে প্রশংসাই করিলেন। নিন্দার মত তো শুনাইল না।

গোয়েন্দা আলমের খুন অরবিন্দের প্রস্থানাভিমুখের গতিকে ত্রস্ত করিয়া তুলিবে, ইহা আমরা এক মাস পরেই দেখিতে পাইব।

আমরা স্বদেশী আন্দোলনের গতিমুখে তিনটি অবস্থার কথা উল্লেখ করিয়াছি,—ধূমায়িত, প্রজ্জ্বলিত, নির্ব্বাপিত। বরিশাল কন্ফারেন্স্ (১৯০৬ খৃঃ)-এর পূর্ব্বে ধূমায়িত, বরিশাল কন্ফারেন্সের পর হইতে চার বৎসর প্রজ্জ্বলিত, এবং অরবিন্দের চন্দননগরে প্রস্থানের কিছু পূর্ব্ব হইতে (১৯১০ খৃঃ) নির্ব্বাপিত অবস্থার সূচনা দেখা যায়। অরবিন্দ এই নির্ব্বাপিত অবস্থাকে পুনরায় প্রজ্জ্বলিত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন, কিন্তু তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সুতরাং ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া রাজনীতি ও স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া চন্দননগর প্রস্থান করেন। প্রস্থানের দুই মাস পূর্ব্বে এই নির্ব্বাপিত অবস্থা লক্ষ্য করিয়া অরবিন্দ লিখিতেছেন,—

"ভারতের নিদ্রা—৪ বৎসর গিয়াছে, ৫ম বৎসর চলিতেছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে কি সেই অপূর্ব্ব আবেশ ক্ষীণ হইয়া গেল, সেই আশাতীত জাগরণ আবার তামসিক নিশ্চেষ্টতায়, নীচ ক্ষুদ্রাশয়তায় নিদ্রিত হইয়া পড়িল?... এখনও আমরা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "আমার দেশ" গান করিয়া বলি, মানুষ আমরা, নহিত মেষ। আকারে মানুষ বটে, কিন্তু কার্য্য দেখিলে মেষ অপেক্ষা ভীরু ও নিরীহ বলিতে বাধ্য হইলাম।"—["ধর্ম্ম",—২৬শে পৌষ, ১৩১৬, পৃঃ ৪-৫]

একটি কথা লক্ষ্য করিবার বিষয়, অরবিন্দ ১২ই পৌষ, ১৩১৬ (১৯০৯। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে) "ধর্ম্ম" পত্রিকায় সন্ত্রাসবাদীদের লক্ষ্য করিয়া লিখিলেন,—"আর উদ্দাম উত্তেজনার বশে যেন কোন কার্য্য না কর" (ধর্ম্ম, পৃঃ ৩)। আবার দুই সপ্তাহ পর (২৬শে পৌষ ১৯১০ জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে) ঐ পত্রিকায় স্পষ্ট লিখিলেন,—"আমরা উদ্দাম আচরণ করিতে নিষেধ করি।" (ধর্ম্ম, পৃঃ ৪)। সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি এই দুই দুই বারের নিষেধ-বাণী শামসুল আলম্ হত্যার (১৯১০।২৪শে জানুয়ারী) মাত্র দুই তিন সপ্তাহ আগের ঘোষণা। যে সময় অরবিন্দ এই নিষেধ-আজ্ঞা প্রচার করিতেছেন, ঠিক সেই সময়ে শামসুল আলম্ হত্যার আয়োজন চলিতেছে। এবং অরবিন্দকে নির্ব্বাসন করিবার গুজব পুলিশ

তৃতীয়বার রটনা করিতেছে। খুব জোর গুজব চলিতেছে। অরবিন্দ এই নির্ব্বাসনের গুজবকে বিভীষিকা আখ্যা দিয়াও লিখিতেছেন,—"অরবিন্দ ঘোষকে নির্ব্বাসন করুন, কিন্তু কালচক্রের গতি থামিবার নয়।" আমাদের প্রশ্ন,—শামসুল আলম হত্যার আয়োজন-উদ্যোগের খবর কি অরবিন্দ পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন?—এবং এই আসন্ন হত্যাকাণ্ডে প্রকাশ্যে নিষেধাজ্ঞা ও গোপনে অনুমোদন জ্ঞাপন করিয়াছিলেন? আমরা অনেক রকম কথাই শুনিয়াছি।

৪ঠা মাঘ (১৮ই জানুয়ারী হইবে) অরবিন্দ লিখিতেছেন :—

"**আইন ও হত্যাকারী**—লাট সাহেব সমস্ত ভারতের উপর কেন এই অনুগ্রহ করিয়াছেন, তা বলা কঠিন। অনেকে বলে, হত্যা ও ডাকাতি হইতেছে বলিয়া এই সভা-নিষেধ ঘোষণা। গুপ্তহত্যাকারী ও রাজনীতিক ডাকাত যে এই ভয়ঙ্কর ব্রহ্মাস্ত্রে ভীত হইবে, তাহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। তাঁহারা যে কুড়ি জন মিলিয়া "প্রকাশ্য সভা" করিতে অভ্যস্ত, ইহা কখনও শুনি নাই। ৬মাস কারাদণ্ডের ভয়ে তাঁহারা যে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট বা পুলিশ কমিশনারের নিকট অনুমতি লইয়া গুপ্ত হত্যা বা ডাকাতির পরামর্শ করিতে বসিবেন, তাহার সম্ভাবনাও অত্যল্প।......এতদিন কি সভাসমিতি বন্ধ ছিল না? চরমপন্থী দলের সভাসমিতি অনেক দিন লোপ পাইয়াছে, মধ্যপন্থী নেতাগণ নির্ব্বাসনের পরে আর সভাসমিতিতে যোগদান করা বন্ধ করিয়াছেন। মাঝে মাঝে কলেজস্কোয়ারে যে স্বদেশী সভা হয় তাহাতে কোন বিখ্যাত বক্তাও উপস্থিত হন না, দর্শকমণ্ডলীও সংখ্যায় নগণ্য।... শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ জেল হইতে আসিবার পরে কয়েকদিন বক্তৃতা করিয়াছিলেন বটে, তিনিও হুগলী প্রাদেশিক সভার পরে, নীরব হইয়া পড়িয়াছেন।"

অরবিন্দ স্পষ্ট লিখিতেছেন যে, গভর্ণমেণ্টের সভা-নিষেধ আজ্ঞার পূর্ব্বেই মধ্যপন্থী ও চরমপন্থীরা সভাসমিতিতে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে। নিজের সম্বন্ধে লিখিতেছেন যে, তিনিও হুগলি কন্ফারেন্সের পর নীরব হইয়া পড়িয়াছেন। আমরাও দেখিয়াছি যে, তিনি লাহোর কংগ্রেসে যোগদান করিতে পারেন নাই। এবং তিনি স্থির ও দৃঢ় বিশ্বাসে লিখিতেছেন যে, গুপ্তহত্যাকারী ও রাজনৈতিক ডাকাত এই সভা-নিষেধ আজ্ঞায় ভীত হইবে না। তাহাদের কাজ তাহারা করিয়া যাইবে। সুতরাং, অরবিন্দের নিষেধ আজ্ঞাও তাহারা শুনিবে না। শামসুল আলম হত্যার মাত্র এক সপ্তাহ পূর্ব্বে অরবিন্দ তাঁহার এই মত প্রকাশ করিলেন।

নূতনের আহ্বান

শ্রীপ্রীতিময়ী কর, ভারতী

যা' গিয়াছে যা'ক্ পুরাতন সাথে
　　কালের প্রবাহ বাহি,
যা'ক্ ঝ'রে যা'ক্ জীর্ণ স্খলিত
　　যাহা প্রয়োজন নাহি।
বিগত ক্ষতিরে গণি বার বার
পুরানের গান রচিব না আর,
পূর্ব্ব অচলে উদিছে অরুণ
　　ঘোর অমানিশা শেষে,
যা চির সত্য যাহা সনাতন
জীবন মৃত্যু করিয়া বরণ
নিঃসংশয়ে হোক পরিচয়
　　তার সাথে নব বেশে।
নব জীবনের এলো আহ্বান
　　মৃত পুরাতন শেষে।

প্রথম প্রভাত হোক মুখরিত
　　নবীন প্রতিজ্ঞায়,
ন্যায়ের জ্যোতিতে যাহা উজ্জ্বল
　　আঁকড়িয়া ধরি' তায়।
হানিতে দণ্ড অন্যায় শিরে
নির্ভয় পদ বাড়াইয়া ধীরে
ছিনায়ে আনিতে শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য
　　সত্যের অধিকারে;
পুরানোর মাঝে যা' ছিল রোপণ
ফলে ফুলে তাহা হ'তে সুশোভন,
বিদায় আশিসে সার্থক করি
　　নূতনের সূচনারে,
পরম শুভের দিতে প্রতিষ্ঠা
　　বিশ্বের দরবারে।

মধুর স্মৃতি

শ্রী—

তখন ছেলে মানুষ, বারাসত গবর্ণমেণ্ট স্কুলে পড়ি, কেন জানিনে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব ভাল লাগতো। এই ভাল লাগাটা বেড়ে গেল স্কুল-হষ্টেলে শ্রীরামকৃষ্ণপদে নিবেদিতপ্রাণ মহাত্মা রামচন্দ্র দত্ত লিখিত তত্ত্বপ্রকাশিকা নামক পুস্তকের একটা পাতা পড়ে। এর আগে কেবল পাঁজিতে আঁকা শ্রীরামকৃষ্ণমূর্ত্তি মনটাকে আকর্ষণ করত। বারাসত পরমারাধ্য শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের জন্মস্থান। কিন্তু সেখানকার কাউকে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে আলোচনা করতে দেখি নি। প্রদীপের তলায়ই অন্ধকার। যাই হউক, ক্রমশঃ বেলুড় মঠ ও যোগোদ্যানের সহিত পরিচিত হওয়া গেল, কিন্তু শ্রীশ্রীমা যে আবার আছেন ও তাঁর দর্শন পাওয়া যায় ইত্যাদি কিছুই তখন জানতুম না। মেলা মেশা তখন কেবল সহপাঠীদের সঙ্গে। একদিন জানতে পারলুম যে বাগবাজারে শ্রীশ্রীমা থাকেন ও কেবল রবিবারে তাঁর দর্শন পাওয়া যায়। বোধ হয় ১৯১৩ সালের এক রবিবারে শ্রীশ্রীমা আমাকে আকর্ষণ করে তাঁর শ্রীচরণসমীপে হাজির করলেন। তিনি লম্বা ঘোমটা টেনে শ্রীপদ দুখানি ঝুলিয়ে তক্তাপোষের উপর বসে আছেন। মুখ দর্শনের উপায় নেই। আমি শ্রীচরণ স্পর্শ করে সাষ্টাঙ্গ হলুম। বুড়ী ত একবার ছুঁলেই খেলার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, কেবল প্রারব্ধটা কেটে গেলেই হয়। এই ভাবে শ্রীরামকৃষ্ণসংঘের সঙ্গে আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ার আগেই বুড়ী ছোঁয়া হয়ে গেল। শ্রীশ্রীমা ত চিন্ময়ী ব্রহ্মশক্তি, তিনিও যা শ্রীরামকৃষ্ণও তা, অভেদ। তাঁর দর্শনই শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন।

বেলুড় মঠ দেখবার ইচ্ছা হলো। একদিন জনৈক শিক্ষকের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর হয়ে বেলুড় মঠে পৌছলুম। তখন দুপুর বেলা, মঠের প্রসাদ পাওয়া হ'য়ে গেছে। আমরা ক্লান্ত হয়ে মঠের পূবের বারান্দায় বেঞ্চে বসে আছি, এমন সময় একজন সৌম্যদর্শন ব্রহ্মচারী এসে আমাদের পরিচয় ও খাওয়া হয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করলেন। আমায় দেখে তিনি বললেন, "আহা, ছেলেটীর মুখ লাল হ'য়ে গেছে, ঠিক খাওয়া হয় নি, আর যে রোদ্দুর!" যখন জানলেন যে আমাদের খাওয়া হয় নি, তখন তিনি আমাদিগকে গঙ্গার ঘাটে যেয়ে হাত মুখ ধুয়ে আসতে বললেন এবং প্রসাদ পাবার জন্য আহ্বান করলেন। রান্নাঘরের সামনে আমরা প্রসাদ পেতে বসলুম। সে দিন যে অড়হরের ডাল খেয়েছিলুম, তার সুস্বাদ আজও মনে আছে। বাস্তবিক মঠের রান্না সাধারণ জিনিষও বড় সুস্বাদু হয়, আজ পর্য্যন্ত তার ব্যতিক্রম হ'তে দেখলুম না। খাওয়া শেষ করে যখন গঙ্গায় আঁচাতে যাচ্ছি, তখন পশ্চিমে শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের ঘরের নীচের বারান্দায় শ্রীশ্রীরাজামহারাজ বসে তামাক খাচ্ছিলেন। তিনি আমাকে স্নেহমধুর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, "খোকা, তোমার পেট ভরেছে ত?" জনৈক ব্যক্তি শিক্ষক মহাশয়কে বললেন, "আপনাদের খুব ভাগ্য যে এসেই মহারাজের দর্শন পেলেন। আমরা এখানে থেকেই বড় পাইনে। যান, গিয়ে

প্রণাম করুন গে।” আমরা এসে শ্রীশ্রীরাজা-মহারাজের শ্রীচরণ স্পর্শ করে প্রণাম করলাম। এই ভাবে—শ্রীরামকৃষ্ণমানসপুত্রের দর্শন লাভ হয়।

বেলুড় মঠে যাতায়াত ক্রমশঃ বাড়ীতে জানা-জানি হ'য়ে গেল। আমি পাছে সন্ন্যাসী হ'য়ে যাই, এই ভয়ে বাবা ও অন্যান্য গুরুজন খুব বাধা দিতে লাগলেন। কিন্তু বাধাও যত বেশী হ'তে লাগলো, শ্রীরামকৃষ্ণে আকর্ষণও তত বাড়তে লাগলো। অবশ্যি বাবাও বেশ ভক্তিমান, সরল প্রকৃতির সাদাসিদে লোক ছিলেন। আর বোধ হয় এই বাড়াটার একটা পুরুষানুক্রমিক হেতুও ছিল। শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গে আমার পূর্ব্বপুরুষদের পরিচয় ছিল। পিতামহ ৺দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের পিতা ৺রামকানাই ঘোষাল মহাশয়ের বন্ধু এবং উভয়ে বারাসত কোর্টের আইনজীবী ছিলেন। কাজেই শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজ দীনবাবুকে খুবই চিনিতেন। তাঁর শ্রীমুখে দীনবাবুর চেহারার বর্ণনা পর্য্যন্ত শুনেছি। একদিন বৈকালে মঠে গেছি। পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ ঠাকুর ঘরের নীচের বারান্দায় বসে তরকারি কুটছিলেন ও নানা সৎপ্রসঙ্গ করছিলেন। আমাকে দেখেই বললেন, “কিরে এইচিস্? রাতে থাক্‌বি ত?” বাস্তবিক প্রেম দিয়ে তাঁর প্রাণটা গড়া ছিল, যেন ভালবাসা জমাট বাঁধা, Love personified. তিনি নিজ হাতে রাতে বর্ত্তমান পূজনীয় জ্ঞান মহারাজের ঘরের উত্তরের ছোট ঘরে আমার জন্য মশারি টানিয়ে দিলেন। বুকে পিঠে হাত দিয়ে আদর করেছিলেন। তাঁর অমোঘ স্পর্শ ফলপ্রসূ না হ'য়ে কি যায়? এর আগে একদিন মঠে গিয়ে ভাব্‌ছি কারও সঙ্গে ত আলাপ হ'ল না। এমন সময় বাবুরাম মহারাজ কোথা হতে এসে আলাপ করলেন। তাঁর স্নেহ পেয়ে মঠের নেশা লেগে গেল। হষ্টেল সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্টকে মিথ্যা বলে ছুটি নিয়ে মঠে পালিয়ে আসতুম। তিনি আবার কখন কখন বলতেন, 'আমাকে হিরণ্যকশিপু মনে করো না, তবে অত ঘন ঘন মঠে গেলে চলে কি? পড়াশুনা ত দরকার।' কখন কখন বাবুরাম মহারাজ বল্‌তেন, 'পয়সা আছে ত? ট্রেন ভাড়া? না থাকে ত বল্, ব্যবস্থা করে দি।' একদিন শ্রীম—মঠে উপস্থিত। তিনি আমাকে শ্রীম—র সহিত আলাপ করিয়ে বললেন, 'এই ছেলেটী বারাসত থেকে আসে, তারকদাকে যে ঝি ছেলে-বেলায় মানুষ করেছিল, সে বুড়ি ঝি এদের বোর্ডিংএ কাজ করে।' বুড়ী আমাদের বল্‌ত, 'আহা তারক আমার কত বড় সাধু হয়েছে গো।'

একবার উদ্বোধনে শ্রীশ্রীমার বাড়ীতে পূজনীয় শরৎ মহারাজের শুভ জন্মতিথিতে উপস্থিত হলুম। তাঁকে প্রণাম করতে উপরে তাঁর ঘরে গেলুম। প্রণাম করলুম, তিনি মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন। শ্রীশ্রীমায়ের তিনি অন্যতম অন্তরঙ্গ। মার ভারী, মার সেবক। তাঁকে দেখে বোধ হ'য়েছিল যেন গাম্ভীর্য্যের মূর্ত্তি, অথচ তাঁর শ্রীমুখে কোমলতার পরশ। মঠে একবার কি এক উৎসবের দিনে খুব ভীড়, পূজনীয় শরৎ মহারাজ উপস্থিত। অনেকে তাঁর পাদপদ্ম স্পর্শ করে প্রণাম করছেন। তিনি কপালে হাত ঠেকিয়ে বললেন, 'আজ এ রকম প্রণাম নয় হে, আজ কোদালে প্রণাম, কুড়ুলে প্রণাম,' বলে হাসতে লাগলেন।

মঠে পূজনীয় খোকা মহারাজ একদিন বল্‌লেন, 'ঠাকুরের পা কি রকম নরম ছিল জান? তিনি অমনি জুতা পায়ে দিতে পাত্তেন না। আমরা তুলার প্যাড করে তাঁর জুতার মধ্যে দিয়ে দিতুম, তার উপর তিনি পা দিতেন।'

পূজনীয় গঙ্গাধর মহারাজের নিকট মঠে শুনেছি, 'আমাদের ঠাকুরের উপর কি রকম ভক্তি ছিল জান? যদি তিনি বল্‌তেন, হাঁ কর, আমি হাগ্‌বো, ত আমরা মুখ হাঁ করে দিতে পাত্তুম।'

দাদার শিষ্য বলে তিনি কত স্নেহই না করতেন! একদিন তিনি এক গল্প বলেছিলেন—"সারগাছি আশ্রমে স্বামিজীর জন্মতিথি পূজা। ধারণা আছে বাক্সে নিশ্চয়ই আস্ত নতুন কাপড় আছে, তাই প'রে পূজা করবো। স্নান ক'রে বাক্স খুলে দেখি কাপড় নেই। আধখানা কাপড় পরে কি করে পূজা করি ভাবছি ও স্বামিজীকে বলছি—একখানা কাপড়ও নেই যে তাই প'রে তোমার পূজা করি। যাক্ কাপড়ের দরকার নেই, আমরা ত সাধু, উলঙ্গ হ'য়েই পূজা করবো। এই ভেবে যেমন উলঙ্গ হ'তে যাচ্ছি, অমনি একজন এসে বল্লে—একটা পার্শেল এসেছে। পার্শেল খুলে দেখি একখানা নতুন গেরুয়া কাপড় ও চাদর। গঙ্গাজল দিয়ে নিয়ে তাই পরে ত পূজা করলুম। এমন সময় স্বামিজীর বাণী শুনতে পেলুম, তিনি বল্‌ছেন—'দেখ, আমি এখন বিরাট, সর্ব্বব্যাপক ও সর্ব্বজ্ঞ, তোর এই অবস্থা হ'বে জেনে আমি আগে থাকতেই তোর কাপড়ের ব্যবস্থা করে রেখেছি। আজ যদি আমি বেলুড় মঠে থাক্‌তুম, ও তোর কাপড়ের দরকার হ'লে তুই আমাকে চিঠি লিখতিস্, তারপর যদি আমি খোসমেজাজে থাক্‌তুম ত তোকে কাপড় পাঠাতুম, আর না হয় ত পাঠাতুম না।" আর একবার স্বামিজীর এক vision দেখা সম্বন্ধে বলেছিলেন, "স্বামিজীকে মুসলমান দরবেশের বেশে দেখলুম ও সঙ্গে কয়েকজন মুসলমান চেলা। আমি জিজ্ঞেস কল্লুম—'এ কি রকম ব্যাপার?' তিনি বললেন, "মুসলমানদের দেশে কাজ করা হয় নি, আমি এখন সূক্ষ্মদেহে মুসলমানদের দেশে কাজ কচ্ছি। এদের ভক্তির তুলনা হয় না, এদের দৃঢ়তাও সকলের চেয়ে বেশী। এই দেখ, এত দূর থেকে এরা গঙ্গাস্নান করতে এসেছে। এদের গঙ্গাস্নানের ব্যবস্থা করে দিতে পারিস্? আমি ত ব্যবস্থা করে দিলুম। কিন্তু তাদের এত ভক্তি যে গঙ্গার ধারে গিয়ে সব সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে লাগল ও বল্‌তে লাগল—এ পবিত্র জলে কি করে পা দেব? তারপর স্বামিজীর আদেশে তাদিগকে প্রসাদ দেওয়ার ব্যবস্থা করলুম।"

ভগিনী নিবেদিতাস্মরণে*

শ্রীমতী তরুবালা সেনগুপ্ত, বি-এ

হে পুণ্যস্মৃতি, জাগো ধীরে
এ শুভ বোধনলগনে
উষসীর মত রঞ্জিত করি
উদয়াচল-গগনে।
এস, হৃদয় বীণার গোপন তন্ত্রে
ঝঙ্কারি নব সুর
সারা বরষের তন্দ্রামদির
সংশয় কর দূর।
ঘুচে যাক্ হৃদি অন্ধকার
খুলে যাক্ আজি বদ্ধ দ্বার
সুপ্ত শক্তি জাগায়ে সবার
জাগো, মহীয়সী নারী,
ঊষর ধরায় বরষার প্রায়
ঢালো অমৃত বারি।
সেবা, দান, দয়া করুণা কোমল
জীবনের ব্রত যাঁর

দিকে দিকে আজি মত্ত বাতাসে
পেয়েছি আভাস তাঁর;
ফুলদল রচে তাঁরি অর্চ্চনা
বেণু বনে বনে সুর মূর্চ্ছনা
সহকার শাখে তাঁরি আবাহনে
বিহগ উঠিল গাহি,
তপ্ত ধরণী—সুশীতল হ'ল
পুণ্য পীযুষে নাহি।
গগনে গগনে কি বারতা শুনি
"মরে নাই সে যে মরে নাই,
যেথানে মোদের সে পুণ্য স্মৃতি
মূর্ত্ত দেখিতে পাই;
সত্যের তরে ফিরি দ্বারে দ্বারে
নিগ্রহ স'য়ে করেনি ভয়
মরিলেও তাঁর অমর আত্মা
চিরদিন ভবে লভিবে জয়

---

* ভগিনী নিবেদিতার জন্মদিন উৎসবে কলিকাতা নিবেদিতা বিদ্যালয়ে পঠিত।

ভারতীয় শাস্ত্র ও সনাতনধর্ম্ম

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অধ্যাপক শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতীয় জীবন ধর্ম্মকেন্দ্রিক। ভারতীয় জীবনের প্রত্যেক বিভাগ ধর্ম্মবিধানদ্বারা অনুশাসিত। ধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া ধর্ম্মের বিধান মাথা পাতিয়া লইয়াই ভারতের পরিবার, রাষ্ট্র, সমাজগঠন, অর্থনীতি, কর্ম্মনীতি, ভোগনীতির নিয়ন্ত্রণ, বিভিন্ন শ্রেণীর নরনারীর অধিকারনির্ণয় ও শিক্ষা-কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য কলাবিদ্যাদির অনুশীলন, দর্শন-বিজ্ঞান-সাহিত্য-ইতিহাসাদির আলোচনা। ধর্ম্ম এই বিশাল মহাদেশের বিচিত্র প্রকৃতি-রুচি-বুদ্ধি-শক্তিবিশিষ্ট অসংখ্য নরনারীর বিচিত্র ভাবান্বিত জীবনের সকল বিভাগকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছে, এক আদেশে অনুপ্রাণিত করিয়া রাখিয়াছে। ধর্ম্মই ভারতের প্রাণ। ধর্ম্ম থাকিলেই ভারত থাকিল, ধর্ম্ম তাহার কেন্দ্রীয় সিংহাসন হইতে বিচ্যুত হইলেই ভারতের ভারতত্ব নষ্ট হইল। যতদিন মানব-সমাজে ধর্ম্মের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকিবে, ততদিন সর্ব্বপ্রকার দুর্দ্দশার মধ্যেও ভারত বিশ্ববাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে থাকিবে।

ভারতীয় জীবনে ধর্ম্ম চিরকাল মুখ্য স্থান অধিকার করিয়া আছে বলিয়াই ভারতীয় জাতি পৃথিবীতে অজর ও অমর। যে সব জাতি ধর্ম্মকে কেন্দ্রস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই,—ক্ষাত্রশক্তির উত্থান ও পতনের সঙ্গে সেই সব জাতির জন্ম ও মৃত্যু ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। কিন্তু ভারত নিঃক্ষত্রিয় ও নির্বৈশ্য হইলেও, রাষ্ট্রশক্তি ও অর্থশক্তিতে হীন হইলেও, ভারতীয় জাতির মৃত্যু ঘটিতে পারে না। ভারতীয় জাতির পূর্ব্বপুরুষগণ ধর্ম্মমূলক জীবনধারা প্রবর্ত্তিত করিয়া অমরত্বের সাধনা করিয়াছেন, ভারতকে অমরত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। ভারতীয় জাতি দুর্ব্বল হইতে পারে, দরিদ্র হইতে পারে, পরকীয় শাসন ও শোষণের ফলে তাহার বাহ্যিক চেহারা মলিন ও জীর্ণশীর্ণ দেখাইতে পারে; কিন্তু ধর্ম্মের আশ্রয় ত্যাগ না করিলে সে মরিতে পারে না,—সে আত্মহারা হইয়া অপরাপর জাতির মধ্যে বিলীন হইয়া যাইতে পারে না। পক্ষান্তরে, জগতের বিভিন্ন জাতির উত্থান-পতনের ইতিহাস আলোচনা করিয়া, যখনই কোন জাতি ক্ষাত্রবীর্য্য ও অর্থসাধনার উপর একান্ত নির্ভরশীলতার মূর্খতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া অমরত্ব লাভের মন্ত্র ও কৌশল জানিবার জন্য ব্যাকুল হইবে,—তখনই ভারতের নিকট তাহাকে সবিনয়ে ও সসম্ভ্রমে উপনীত হইতে হইবে,—ভারতের নিকট ধর্ম্মকেন্দ্রিক জীবনযাপনের মন্ত্রে তাহাকে দীক্ষাগ্রহণ করিতে হইবে। 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা'—এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বহু জাতি পরিমিতকালের জন্য পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, রাজ্যৈশ্বর্য্য সম্ভোগ করিয়াছে, দুর্ব্বল জাতিসমূহের উপর নানাপ্রকার অত্যাচার অবিচার করিয়াছে, কিন্তু পরিমিত-কালান্তে তাহাদের জীবন-লীলা শেষ হইয়াছে,—বীর্য্য সম্পদ্ হারাইয়া তাহারা অন্য জাতির মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছে। ভারতীয় পুরাণকারগণ প্রাচীন অসুর-রাক্ষস-দৈত্য-দানবদের উত্থান পতনের ইতিহাস সযত্নে রক্ষা করিয়া উক্ত মন্ত্রের সার্থকতা কতটুকু এবং ব্যর্থতা কতখানি, তাহাই স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। ভগবানের বিশ্ববিধানে,—"যতো ধর্ম্মস্ততো জয়:"—ইহাই জাতীয় অমরত্বলাভের সাধনার মন্ত্র। বিশ্ব-

বিধান ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। ধর্ম্মপরায়ণ জাতির জীবন ভাগবত বিশ্ববিধানের আনুকূল্য ও প্রসাদ লাভ করে বলিয়াই চিরকাল বাঁচিয়া থাকে, মাঝে মাঝে দুঃখদৈন্যগ্রস্ত হইলেও অন্তিমে জয়লাভ করে।

এই হেতু ভারতের জাতীয় জীবনের প্রবীণ নেতৃবর্গ অশেষ প্রকার বিঘ্নবিপত্তির মধ্যে ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য বিপুল প্রযত্ন করিয়াছেন। জাতীয় জীবনের সকল দিক্ যখন নিরাশার কুজ্ঝটিকায় সমাচ্ছন্ন, তখনো ভবিষ্যতের ভরসা পরিত্যাগ না করিয়া তাঁহারা জাতির ধর্ম্মসাধনার প্রবাহকে অবিচ্ছিন্ন রাখিবার নিমিত্ত কঠোর তপস্যা করিয়াছেন। তাঁহাদের সাধনা সিদ্ধিলাভ করিয়াছে,—অধর্ম্মের প্রভাব পরাভূত করিয়া ধর্ম্মের বিজয়-পতাকা পুনঃ পুনঃ ভারত গগনে উড্ডীন হইয়াছে।

ভারতের মূল ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ কোন সম্প্রদায়বিশেষের বা শ্রেণীবিশেষের শাস্ত্র নয়। সনাতন ধর্ম্ম বলিতে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম বুঝায় না। সনাতন ধর্ম্ম বহু সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের জনক; অনাদিকাল হইতে বহু বহু সম্প্রদায়ের ভিতর দিয়া সনাতন ধর্ম্মের চিরন্তন বিশ্বজনীন সত্যসমূহ বিশেষ বিশেষ আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু সনাতন ধর্ম্ম কোন বিশেষ সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের গণ্ডীর মধ্যে আপনাকে বদ্ধ করিয়া রাখে নাই। প্রত্যেকটি সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম বিশেষ এক একটি মতবাদ, বিশেষ এক একটি সাধন-পদ্ধতি এবং বিশেষ এক এক প্রকার সাধনানুকূল রীতিনীতি-আচার-ব্যবহার অবলম্বনে পুষ্টিলাভ করে। এক এক জাতীয় রুচি-বুদ্ধি-প্রকৃতি-বিশিষ্ট নরনারীর পক্ষে এক একটি সাধনধারা, এক একটি বিশেষ সাম্প্রদায়িক মতবাদ ও উপাসনাপদ্ধতি মানবজীবনের সম্যক সার্থকতা সম্পাদনের উদ্দেশ্যে বিশেষ অনুকূল। সেই হেতু সনাতন ধর্ম্ম সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মসমূহকে চিরকালই পোষণ করিয়াছে, আদর করিয়াছে, পরস্পরের সহিত কলহ না করিয়া নিজ নিজ আদর্শের অভিমুখে অগ্রসর হইবার পথে সহায়তা করিয়াছে। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মসমূহের সুষ্ঠু বিকাশের পথে সনাতন ধর্ম্ম কখনো অন্তরায় সৃষ্টি করে নাই, নিজ নিজ রুচি, প্রকৃতি ও বুদ্ধি অনুসারে নরনারীর বিশেষ বিশেষ সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম বাছিয়া লইবার স্বাধীনতার উপর সনাতন ধর্ম্ম কখনো হস্তক্ষেপ করে নাই। সনাতন ধর্ম্মে মতবাদ সম্বন্ধে,—সাধনপদ্ধতি সম্বন্ধে,—বিশেষ বিশেষ গুরুপরম্পরার অনুবর্ত্তন সম্বন্ধে,—নরনারী মাত্রেরই অবাধ স্বাধীনতা। সনাতনধর্ম্ম আপাতবিরোধী অসংখ্য মতবাদ, অসংখ্য সাধনপদ্ধতি, অসংখ্য রীতিনীতিকে আপনার স্নেহার্দ্র বিশাল অঙ্কে স্থানদান করিয়াছে, এবং তাহাদের প্রাণগত ঐক্য সংরক্ষণ করিয়াছে। অনাদিকাল হইতে কত সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম সনাতন ধর্ম্মের কোলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, পুষ্টিলাভ করিয়াছে, পরস্পরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করিয়াছে,—আবার কালক্রমে স্বতন্ত্র সত্তা হারাইয়াও ফেলিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু সনাতন ধর্ম্মের বিরাট্ সত্তা ও অমর জীবন তাহাতে ক্ষুণ্ণ হয় নাই,—তাহার মর্য্যাদার কখনও হ্রাস হয় নাই। কখন কখন কোন কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম সনাতন ধর্ম্মেরই ক্রোড়ে জন্মলাভ করিয়া,—সনাতন ধর্ম্মেরই স্তন্যামৃতে পুষ্টিলাভ করিয়া,—সনাতন ধর্ম্মেরই অঙ্গীভূত কোন কোন বিশেষ জীবনাদর্শ ও সাধনধারাকে উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিয়া,—স্নেহময়ী জননীসদৃশ সনাতন ধর্ম্মের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে,—তাহারই অঙ্কে বিপ্লব সৃষ্টি করিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা জলন্ত দৃষ্টান্ত। কিন্তু, বিপ্লবের বন্যা বহিয়া যাইবার পরে, সনাতন ধর্ম্ম আবার আপনার সমুজ্জ্বল মূর্ত্তিতে ভারতের আকাশ, বাতাস, জল, স্থল উদ্‌ভাসিত করিয়াছে, বিপ্লবী সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মও তাহার অঙ্গে অঙ্গ মিলাইয়া আবার সুশোভন

আকারে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। সনাতন ধর্ম্মের শাস্ত্রসমূহ এত উদার, এত মহান্ ও এত সার্ব্বজনীন যে, কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের সহিত ইহার বিরোধ নাই, সকল সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের মূলতত্ত্বসমূহ ইহার মধ্যে সৌসামঞ্জস্যের সহিত বিদ্যমান। সনাতন ধর্ম্ম বিশ্বমানবের ধর্ম্ম,—মানুষমাত্রেরই ইহাতে অধিকার। মানবাত্মার স্বরূপ, বিশ্বের মূলতত্ত্ব ও বিশ্বাত্মার সহিত মানবাত্মার চরম সম্বন্ধের উপর সনাতন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। বিশ্বাত্মার সহিত মানবাত্মার ঐক্যোপলব্ধির পথই সনাতন ধর্ম্মের শাস্ত্রসমূহে বিচিত্রভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

সনাতন ধর্ম্মের মূল শাস্ত্র বেদ। বেদ কোন একজন ঋষি, মনীষী বা অবতার পুরুষের রচিত একখানি গ্রন্থ নয়। ইহার মধ্যে কোন একটি বিশেষ দার্শনিক মতবাদ, বা সাধনার প্রণালী কিংবা ব্যবহারিক রীতিনীতি উপদিষ্ট হয় নাই। অথচ এই বেদকেই ভিত্তি করিয়া বহুসংখ্যক মতবাদ, সাধনপ্রণালী ও আচারনীতি বিভিন্ন মহাপুরুষ-কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়াছে। বেদের ভিতরে মানবাত্মা ও বিশ্বাত্মার মিলন। বিশ্বপ্রাণ মানবপ্রাণের নিকট আপনাকে স্তরে স্তরে ধরা দিয়াছে, প্রকাশ করিয়াছে, আপনার স্বরূপ ব্যক্ত করিয়াছে। ঋষিদের রাগদ্বেষবিযুক্ত বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা-বৃত্তিকে আবিষ্ট করিয়া নিখিল বিশ্বের প্রাণরূপী সচ্চিৎশিবানন্দঘন পরম পুরুষ আপনাকে আপনি বেদরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। ঋষিগণ দ্রষ্টামাত্র, সজ্ঞান যন্ত্রমাত্র, বিশ্বপ্রাণের চিরন্তনী বাণীর বাহক-মাত্র। অনাদিকাল হইতে বিশ্বের অন্তর্য্যামী সনাতন পুরুষ চিরপরিণামশীল বিশ্বজগতের অন্তর্নিহিত সনাতন সত্যসমূহ মানবচেতনার উপলব্ধিগোচর করিবার উদ্দেশ্যে বাণী প্রেরণ করিতেছেন, সূর্য্য চন্দ্র অগ্নি বায়ু বরুণ উষা সন্ধ্যা দিন রাত্রি পর্ব্বত নদী সমুদ্র সকলেই তাঁহার বাণী বহন করিয়া আনিতেছে। সাধারণ মানুষের চিত্তে সেই সব সনাতনী বাণী স্পষ্টরূপে ঝঙ্কৃত হয় না, তাহাদের আবরণ-বিক্ষেপ-মলিন বাসনাবাসিত প্রজ্ঞা সেই বাণীদ্বারা আবিষ্ট হয় না। ঋষিগণের শুদ্ধ চিত্তে বিশ্বাত্মার সেই সব বাণী রূপায়িত হয়, তাঁহাদের বাক্‌শক্তিকে আবিষ্ট করিয়া সেই সব বাণী স্থূলশব্দাকারে লোকসমাজের কল্যাণসাধনের জন্য আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। সেই সব বাণী অবলম্বনে মানুষ নিজের আত্মার পরিচয় পায়, অশেষবৈচিত্র্যময় বিশ্বের যথার্থ স্বরূপের পরিচয় পায়, জড়ের মধ্যে নিত্যক্রীড়াশীল চেতনের পরিচয় পায়, বহুর মধ্যে একের চিৎসত্তার পরিচয় পায়,—বিচিত্র জাগতিক ঘটনাপরম্পরার মধ্যে দেশকালাতীত এক পরম সুন্দর, পরম মধুর, অনন্ত-গুণাধার, অনন্তশক্তিনিলয় পরমদেবতার চিত্তাকর্ষক আহ্বানের পরিচয় পায়, সেই পরমদেবতার সহিত সর্ব্বতোভাবে মিলিত হইবার জন্য আবশ্যক জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তিসমন্বিত সাধনার সন্ধান পায়।

প্রত্যেক মানুষের অন্তর্হৃদয়ে স্বভাবতঃ একটি 'চোদনা' রহিয়াছে, একটি আদর্শের প্রেরণা রহিয়াছে, এবং সেই হেতু একটি উচিতানুচিতবোধ, ন্যায়ান্যায়বোধ, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বোধ রহিয়াছে। এই চোদনাই ধর্ম্মের লক্ষণ। মানুষের প্রাণের ভিতরে যে সনাতন ধর্ম্ম বিদ্যমান রহিয়াছে,—এই স্বভাবসিদ্ধ চোদনানুভূতি দ্বারাই তাহার পরিচয় হয়। মানুষ স্বভাবতই আদর্শ-পরায়ণ,—সেই হেতু কেবলমাত্র রাগদ্বেষের অনু-বর্ত্তী হইয়া, প্রবৃত্তির দাসত্ব করিয়া, দেহেন্দ্রিয়ের তর্পণে রত হইয়া কোন মানুষই তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। তাহার অন্তরে সর্ব্বদাই একটা অভাব-বোধ, একটা আর্ত্তনাদ, একটা তপ্ত দীর্ঘশ্বাস থাকিয়া যায়। তাহার অন্তর কি যেন চায়, যাহা দেহেন্দ্রিয়ের ভোগের মধ্যে সে খুঁজিয়া পাইতেছে না; কাহার আকর্ষণ যেন সে অনুভব করিতেছে, কাহার আহ্বান সে যেন শুনিতেছে,—যাহার সহিত স্বাভাবিক প্রবৃত্তির পথে ধাবিত হইয়া সে

মিলিত হইতে পারিতেছে না। ইহাই মানবপ্রাণে সনাতন আদর্শের অনুপ্রাণনা, ইহাই ধর্ম্মের বীজ, ইহাই মীমাংসাশাস্ত্রের চোদনালক্ষণ ধর্ম্মের আভ্যন্তরীণ রহস্য। মানুষ আদর্শের প্রেরণা অনুভব করে, কিন্তু রাগদ্বেষাদির প্রাবল্য হেতু, পুঞ্জীভূত বাসনার আবরণ হেতু, সেই আদর্শের ঠিকানা পায় না,—তাহার অন্তর্জ্জীবন কী চায়, তাহা সে বুঝিতে পারে না। এ যে ব্যষ্টিপ্রাণের প্রতি বিশ্বপ্রাণের আকর্ষণ, এ যে বিশ্বপ্রাণের সহিত সাক্ষাৎভাবে মিলিত হইবার জন্য ব্যষ্টিপ্রাণের আকুলতা, তাহা সে বুদ্ধিদ্বারা নির্ণয় করিতে পারে না। ঋষিদের অনুভূতি তাহার চোখ খুলিয়া দেয়। ঋষিদৃষ্ট বেদমন্ত্র তাহার অন্তরের চিরন্তন সমস্যার সমাধান করিয়া দেয়। বেদবাণী অনুসরণ করিয়া মানুষমাত্রই বুঝিতে পারে, তাহার অন্তরের অন্তরে কিসের অভাব, তাহার জীবনের আদর্শ কি,—কী পাইলে তাহার জীবন সম্যক সার্থক্যমণ্ডিত হইয়া উঠিবে, তাহা পাইবার জন্য কোন্ পথে তাহাকে অগ্রসর হইতে হইবে, তাহার জীবনাদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার জন্য তাহার কর্ম্মশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ভাবধারাকে কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। মানুষকে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বে সমুন্নীত করিবার সাধনাই বেদ শিক্ষা দেয়। ব্যষ্টি-আত্মা সমষ্টি-আত্মার সহিত মিলিত হইয়া জ্ঞানে পূর্ণ হইবে, কর্ম্মে মহান্ হইবে,—প্রেমে মধুর হইবে, শক্তিতে অপ্রতিহত হইবে, সকলের সহিত আপনার ঐক্য অনুভব করিয়া বিশ্বজনীন জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে,—ইহাই বেদের তাৎপর্য্য।

সনাতন বেদকে কাণ্ডত্রয়াত্মক বলা হইয়াছে। কর্ম্ম, জ্ঞান ও উপাসনা বা ভক্তি—এই তিনটি কাণ্ডের ভিতর দিয়া সনাতন ধর্ম্ম ও বেদ আপনাকে অভিব্যক্ত করিয়াছে। মানুষের অন্তঃপ্রকৃতি ও তাহার ত্রিবিধ চোদনার সহিত বেদের এই তিনটি কাণ্ড সংশ্লিষ্ট। মানবপ্রাণে স্বাভাবিক কর্ম্মপ্রবণতা, স্বাভাবিক জ্ঞানস্পৃহা, স্বাভাবিক ভক্তি-প্রেম-ভালবাসা ও ভাবোন্মাদনা নিত্যই রহিয়াছে। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভাব,—এই ত্রিবিধ ধারায়ই মানুষের জীবন প্রবাহিত হয়। কিন্তু স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া মানুষ যে সব কর্ম্ম সম্পাদন করে, ইন্দ্রিয় ও মনের সহিত বিষয়ের যোগে স্বভাবতঃ তাহার যে সব জ্ঞান উৎপন্ন হয়, দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত সংশ্লিষ্ট বিবিধ ব্যক্তি ও বস্তুর প্রতি স্বভাববশে তাহার যে ভালবাসা জন্মে, তাহাতে সে তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না, তাহার ভিতর দিয়া সে জীবনে সম্যক সার্থকতা অনুভব করিতে পারে না। তাহার অন্তঃপ্রকৃতিতে যে আদর্শের চোদনা রহিয়াছে, তাহাই তাহাকে অতৃপ্ত ও আকুল করিয়া তোলে। আদর্শের প্রেরণাহেতুই সে জ্ঞানের মধ্যে সত্য-জ্ঞান ও মিথ্যাজ্ঞানের ভেদ অনুভব করে, কর্ম্মের ভিতরে সৎকর্ম্ম ও অসৎকর্ম্মের পার্থক্য নির্দ্ধারণ করে, ভালবাসার মধ্যেও সুন্দর ভালবাসা ও কুৎসিত ভালবাসার বৈষম্য উপলব্ধি করে। জীবনের প্রত্যেক বিভাগেই তাহার হেয়োপাদেয়, শ্রেয়-অশ্রেয় বিচার আপনা আপনি আসিয়া থাকে। কর্ম্মের ভিতরে সে অমঙ্গলকে ত্যাগ করিয়া মঙ্গল লাভ করিতে চায়,—জ্ঞানের ভিতরে সে মিথ্যা জ্ঞান ও আপেক্ষিক জ্ঞান পরিহার করিয়া পরম ও চরম সত্যের সম্যক জ্ঞান লাভ করিতে চায়, ভাবের ক্ষেত্রে সে অনিত্য অসুন্দর অশুচি ও অকল্যাণের প্রতি ভালবাসা বা আসক্তি হইতে মুক্ত হইয়া সুন্দর বিশুদ্ধ কল্যাণময় নিত্য-রসাল বস্তুকে ভালবাসিয়া, ভক্তি করিয়া,—উপাসনা ও আস্বাদন করিয়া আনন্দে পূর্ণ হইতে চায়। প্রত্যেক মানুষের অন্তরে এই প্রেরণা রহিয়াছে,—এই ধর্ম্মচোদনা রহিয়াছে। কিন্তু সত্যের স্বরূপ কি, কল্যাণের স্বরূপ কি, কি ভাবে জ্ঞানবৃত্তি, কর্ম্মবৃত্তি ও ভাববৃত্তিসমূহকে সুনিয়ন্ত্রিত

করিয়া নিত্যপরমানন্দময় সত্যশিবসুন্দরকে জীবনে উপলব্ধি করিবার জন্য অগ্রসর হইতে হয়,—তাহা তো সাধারণ বুদ্ধিতে মানুষ বুঝিতে পারে না।

ঋষিচিত্তে বিভাসিত অপৌরুষেয় বেদ মানুষকে শিখাইয়া দেয়, কি প্রণালীতে কর্ম্মবৃত্তিসমূহকে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া সে পরম মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইতে পারে, কি ভাবে জ্ঞানবৃত্তি-সমূহকে সুমার্জ্জিত ও সুসংস্কৃত করিয়া সে সচ্চিদানন্দঘন পরম তত্ত্বের সাক্ষাৎ জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, কি উপায়ে ভাববৃত্তিসকলকে সুসংযত ও একনিষ্ঠ করিয়া সে নিখিলরসামৃতসিন্ধু অনন্ত-সৌন্দর্য্যনিলয় শ্রীভগবান্‌কে ভালবাসিতে এবং জীবনের সকল বিভাগকে আনন্দময়, সৌন্দর্য্যময়, রসময় করিয়া তুলিতে পারে। বেদের কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড ও উপাসনাকাণ্ড মানবজীবনের স্বাভাবিক তিনটি ধারাকে চরম আদর্শের পথে সুপরিচালিত করিয়া অবশেষে সত্যশিবপ্রেমরসময় মহাসমুদ্রের সহিত মিলিত করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছে।

বেদানুগত মুনিগণরচিত শাস্ত্রসমূহের মধ্যে বৈদিক কাণ্ডত্রয়েরই শাখাপ্রশাখা বিস্তারলাভ করিয়াছে,—বিচিত্র পত্রপুষ্পফলের বিকাশ হইয়াছে। বেদের কর্ম্মাদর্শকে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে, পারিবারিক জীবনে,—সামাজিক জীবনে, রাষ্ট্রিক জীবনে,—বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রকার অবস্থা ও আবেষ্টনীর মধ্যে রূপায়িত করিবার জন্যই স্মৃতিশাস্ত্রের উদ্ভব। স্মৃতিশাস্ত্র প্রধানতঃ বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডেরই বিস্তার। ব্যবহারিক জীবনের প্রত্যেক বিভাগে, দেশ কাল পাত্র পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রভৃতির দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যনিরূপণপূর্ব্বক, জীবনকে পরম কল্যাণের পথে পরিচালিত করিবার উদ্দেশ্যেই স্মৃতিশাস্ত্রসমূহের বিধিব্যবস্থা। পুরাণ ও তন্ত্রসমূহ প্রধানতঃ বৈদিক উপাসনা বা ভক্তি-কাণ্ডের উপরে প্রতিষ্ঠিত। এই সব শাস্ত্রে পরম উপাস্যকে, পরমপ্রেমাস্পদকে, অশেষ সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-বীর্য্যৈশ্বর্য্যনিলয় পরমাত্মাকে বিচিত্রভাবে সকলশ্রেণীর নরনারীর ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি-হৃদয়ের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়া, তাঁহার প্রতি সকলের রতি, ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রেম আকর্ষণ করা হইয়াছে, সকল জীবের সহিত তাঁহার নিবিড় নিত্যসম্বন্ধ সমুজ্জ্বলভাবে প্রদর্শন করা হইয়াছে, তাঁহাকে নিত্য প্রেমময় পিতা-মাতা-বন্ধু-প্রভু-পুত্র-কন্যা-কান্ত প্রভৃতি রূপে উপলব্ধি করিয়া সারা জীবন দিয়া তাঁহাকে ভালবাসিবার ও সেবা করিবার কৌশল শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। বেদের উপাস্যতত্ত্ব পুরাণে ও তন্ত্রে নিতান্ত আপনার জন হইয়াছেন।

বেদানুগত দর্শনশাস্ত্রসমূহ বেদের জ্ঞানকাণ্ড-কেই শাখাপ্রশাখাসমন্বিত ও পত্রপুষ্পফলসুশোভিত করিয়াছে। আপনাকে, বিশ্বজগৎকে, আপনার ও বিশ্বজগতের অন্তর্নিহিত পরম তত্ত্বকে, কি দৃষ্টিতে দেখিলে যথাযথভাবে দেখা হয়, জ্ঞানবৃত্তিকে কিভাবে নিয়ন্ত্রিত করিলে সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার ও মিথ্যাজ্ঞান অতিক্রমপূর্ব্বক পরম সত্যের সাক্ষাৎ-কার লাভ হয়, তাহাই দর্শনশাস্ত্রসমূহের প্রতিপাদ্য। এই সব শাস্ত্রের মধ্যে আপাতবিরোধ দৃষ্ট হইলেও বস্তুতঃ তাহারা একই তত্ত্বানুসন্ধানের ও তত্ত্ববিচারের অবয়বীভূত,—একই তত্ত্বকে তাহারা বিচিত্র বুদ্ধির ক্ষেত্রে বিচিত্র যুক্তিতর্কের সাহায্যে বিচিত্ররূপে উপস্থাপিত করিয়াছে। সুনিপুণ অনুসন্ধিৎসু সাধক তাহাদের আভ্যন্তরীণ ঐক্য উপলব্ধি করিতে পারেন।

এইরূপে সনাতন ধর্ম্মের যাবতীয় শাস্ত্রই এক সূত্রে গ্রথিত, এক প্রাণ দ্বারা সঞ্জীবিত, এক সুমহান্ আদর্শদ্বারা অনুপ্রাণিত। এই ধর্ম্ম শুধু আধ্যাত্মিক নয়,—শুধু পরকালনিষ্ঠ নয়, শুধু ব্যক্তি-পরিত্রাণসাধক নয়, শুধু কর্ম্মমূলক বা শুধু

ভাবমূলক বা শুধু জ্ঞানমূলক নয়। সনাতন ধর্ম্ম মানব-জীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণনিষ্ঠ। এই ধর্ম্ম আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক, এই ধর্ম্ম ঐহিক অভ্যুদয়-সাধক ও পারত্রিক স্বর্গ-সাধক ও মোক্ষসাধক। এই ধর্ম্মে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভাবের সম্যক সৌসামঞ্জস্য। এই ধর্ম্মে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক কল্যাণের দিকে সমান দৃষ্টি, এবং এ সকলকে অতিক্রম করিয়া মানবাত্মার যে একটি চরম ও পরম কল্যাণ আছে,—সেইদিকে সর্ব্বদা সজাগ দৃষ্টি। মানব-জীবনের সকল বিভাগের কল্যাণের দিকে, মানবাত্মার অশেষ বৈচিত্র্যসঙ্কুল সাংসারিক অভিব্যক্তির সম্যক সার্থকতার দিকে, সহানুভূতিসম্পন্ন দৃষ্টি রাখিয়া সনাতন ধর্ম্মের যাবতীয় বিধান। যে কোন মতবাদ, যে কোন সাধনপ্রণালী, যে কোন কর্ম-নীতি, যে কোন ভাবধারা অবলম্বনে মানবজীবন সম্যক্ পরিপূর্ণতার পথে বিশ্বজীবনের সহিত আনন্দময় ঐক্যানুভূতির পথে, সর্ব্বপ্রকার ক্ষুদ্রতা, নীচতা, সংকীর্ণতা, মলিনতা, রাগ, দ্বেষ, দুঃখ জ্বালা, বন্ধন ও পরাধীনতা হইতে মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে পারে, তাহাই সনাতন ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত, তাহাই সনাতন বেদের অনুমোদিত। বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্রসমূহ কখনও মানুষের জ্ঞানশক্তি, কর্ম্মশক্তি ও সদ্‌বৃত্তিসমূহের স্বাধীন বিকাশের পথে বাধা দেয় নাই,—পরামুক্তি বা সম্যক্ স্বাধীনতাই যে তাহার লক্ষ্য। সেই হেতু, বেদ অবলম্বনেই বহু প্রকার সাধনধারা ও দার্শনিক মতবাদের উদ্ভব ও প্রসার হইয়াছে, বহু রীতিনীতি প্রচলিত হইয়াছে।

বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড ও তদনুগত কর্ম্মশাস্ত্রসকলের প্রধান কথা যজ্ঞ। মানুষ স্বাভাবিক কামনা বাসনার তাড়নায় ভোগের জন্যই কর্ম্ম করে, কর্ম্মশক্তিকেই ভোগের দাসত্বে নিয়োজিত করে, ভোগমূলক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া অপরের ভোগ্য-সামগ্রী কাড়িয়া আনিয়া নিজের সমৃদ্ধি বাড়াইতে প্রযত্নশীল হয়। এইরূপ স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশে কর্ম্ম করিয়া মানুষ সর্ব্বত্রই কলহের সৃষ্টি করিয়া থাকে। জাতির সহিত জাতির সংগ্রাম, প্রত্যেক জাতির মধ্যে সম্প্রদায়ের সহিত সম্প্রদায়ের সংগ্রাম,—প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে গোষ্ঠীর সহিত গোষ্ঠীর সংগ্রাম,—প্রত্যেক পরি-বারের মধ্যে ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির সংগ্রাম,—এ সকলেরই মূলে ভোগাদর্শে কর্ম্মশক্তির নিয়োগ, নিজের ভোগকে অপরের ভোগ হইতে বড় করিয়া দেখা ও অপরের ভোগ লুণ্ঠন করিয়া নিজের ভোগ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা। বেদ শিক্ষা দেয়, জীবনকে যজ্ঞময় কর,—কর্ম্মশক্তিকে যজ্ঞে নিয়োজিত করিয়া সার্থক্যমণ্ডিত কর। যজ্ঞনীতিদ্বারা নিজের ভোগের সহিত অপর সকলের ভোগের সামঞ্জস্য সম্পাদিত হয়, ব্যষ্টির ভোগের সহিত সমষ্টির ভোগ একসূত্রে গ্রথিত হয়, বেদ শিক্ষা দিতেছে এ জগৎ শুধু আধিভৌতিক নয়,—ইহা আধি-দৈবিক ও আধ্যাত্মিক। এই জগতের সকল প্রাকৃতিক নিয়মশৃঙ্খলার নিয়ামকরূপে আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক বিধান রহিয়াছে। জীবন সেই সব আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক বিধানের অনুকূল ভাবে নিয়ন্ত্রিত না হইলে, ভোগের পূর্ণতাও সম্ভব নয়, কর্ম্মশক্তির সার্থকতা-সম্পাদনও সম্ভব নয়। ব্যষ্টির ভোগ যদি সমষ্টির ভোগের অনুগত হয়,—ব্যষ্টির কর্ম্মশক্তি যদি সমষ্টির কল্যাণে নিয়োজিত হয়, মানুষ যদি নিজের অধিগত ভোগ্যসামগ্রী জাতি, সমাজ ও বিশ্বের কল্যাণকল্পে উৎসর্গ করিয়া দিয়া অধি-দেবতার বা সমষ্টি-আত্মার সেবাবুদ্ধিতে সুনিয়ত-ভাবে আপনার কর্ম্মশক্তি প্রয়োগ করে, তবে বিশ্বের আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক বিধানে সে নিজেও উচ্চতর ব্যাপকতর গভীরতর ও স্থায়িতর সুখসমৃদ্ধির যোগ্যতা লাভ করে,—সংসারক্ষেত্রে কাড়াকাড়ি মারামারিও থাকে না, প্রত্যেকের

কর্ম্মসাধনাদ্বারা সকলেরই সুখ ও কল্যাণ সাধিত হয়। বিশ্বদেবতার উপাসনাবুদ্ধিতে সমষ্টির কল্যাণকল্পে ব্যষ্টির যে আত্মোৎসর্গ, ইহাই সর্ব্ববিধ যজ্ঞের মূলতত্ত্ব। মানুষের রুচি, বুদ্ধি, শক্তি ও প্রকৃতির তারতম্যানুসারে, অধিকারভেদে ও অবস্থাভেদে নানাবিধ শ্রৌতযজ্ঞ ও স্মার্ত্তযজ্ঞের উপদেশ করা হইয়াছে। 'সর্ব্বহুৎ' যজ্ঞ সকল যজ্ঞের আদর্শ। ইহার অপর নাম 'বিশ্বজিৎ' যজ্ঞ। পরমদেবতার আরাধনাবুদ্ধিতে বিশ্বের কল্যাণকল্পে নিজের সকল ভোগ, সকল সম্পদ্, সকল কাম্যবিষয় আহুতি প্রদান করিয়া মানুষ বিশ্বকে জয় করে, বিশ্বের সকল সম্পদের অধিকারী হয়। তাহার ফলে পার্থিব জীবন দিব্যজীবনে উন্নীত হয়, ব্যষ্টিজীবন সমষ্টিজীবনের সহিত একীভূত হয়।

কর্ম্মসাধনার মূলমন্ত্র "স্বর্গকামো যজেত।" তোমার যত কামনা, বাসনা আছে, সব এক স্বর্গকামনার মধ্যে ডুবাইয়া দাও, এক স্বর্গকামনাকে জীবনের সর্ব্ববিধ কর্ম্মের, সর্ব্ববিধ ভোগের, সর্ব্ববিধ কায়িক, বাচিক ও মানসিক প্রচেষ্টার নিয়ামক কর। স্বর্গলাভ কথাটির তাৎপর্য্য কোন ভোগপ্রাচুর্য্যময় স্থানবিশেষে গমন নয়। ইহার তাৎপর্য্য সর্ব্বভাবে পরিপূর্ণ একটি দিব্যজীবনলাভে—জ্ঞানে গুণে শক্তিতে প্রেমে ঐশ্বর্য্যে মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ একটি অখণ্ড অনন্ত অমর মহিমময় জীবন লাভ। আপনার সাধনাদ্বারা এরূপ একটি দিব্যজীবনলাভের অধিকার লইয়াই জীব মানবদেহে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। শ্রৌত ও স্মার্ত্ত যজ্ঞবিধির সম্যক্ অনুবর্ত্তন দ্বারা মানুষ এই পৃথিবীতেই এরূপ দিব্যজীবনের যোগ্যতা লাভ করিতে পারে এবং দেহান্তে অনন্তকাল এরূপ জীবন-সম্ভোগ করিতে পারে। মানুষ যেমন কামনা করে, তেমনি হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র, পরিমিত, অস্থায়ী ভোগের কামনা দ্বারা পরিচালিত হইলে, সে ছোট হয়, মলিন হয়, দুঃখতাপজ্বালাজর্জ্জরিত হয়। মহত্তম জীবনলাভের কামনাদ্বারা তাহার জীবনের সকল বিভাগ পরিচালিত হইলে, সে জন্মমৃত্যুর পাশ হইতে মুক্ত হইয়া অমৃতময় মহত্তম জীবন লাভ করে। এরূপ মহৎ জীবন লাভ করিবার উপায় যজ্ঞ, দেবারাধন বুদ্ধিতে 'বহুজনসুখায় বহুজনহিতায়' নিজের শক্তি সামর্থ্য অন্ন-অর্থ-বিদ্যা-বুদ্ধি প্রভৃতি সব বাহ্যসম্পদ্ ও আন্তরসম্পদের যথাবিধি বিনিয়োগ।

কর্ম্মসাধনার মূলমন্ত্র যেমন "স্বর্গকামো যজেত", জ্ঞানসাধনার মূলমন্ত্র তেমনি "আত্মানং বিদ্ধি"। স্বাভাবিক জ্ঞানপ্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হইয়া আমরা বাহ্যবিষয়সমূহ জানিবার জন্যই প্রযত্নশীল হই, আমাদের ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধময় যে জগৎ বিদ্যমান,—তাহার পরিচয়লাভের নিমিত্তই ব্যাকুল হই। এই নিয়তপরিবর্ত্তনশীল জাগতিক ব্যাপারসমূহের প্রকৃষ্ট পরিচয় লাভের জন্যই তথাকথিত বিজ্ঞান বা Science এর প্রসার। কিন্তু এ জগৎ যে আমাকেই কেন্দ্র করিয়া ঘুরিতেছে, আমার ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি হৃদয়ের বিষয়রূপেই যে তার সত্তা, সেদিকে আমার দৃষ্টি নাই। আত্মদৃষ্টিবিহীন বলিয়াই বাহ্যজগৎকে আমরা এত বিশাল, এত লোভনীয় মনে করি, এবং নিজে তার তুলনায় অত্যন্ত ক্ষুদ্র হইয়া পড়ি। নিজের দিকে গভীরভাবে দৃষ্টি সমাহিত করিলে অনুভব করিতে পারি যে, এই বিষয়-জগতের প্রাণকেন্দ্রে আমি নিত্য প্রতিষ্ঠিত; আমার আত্মা বিশ্বের আত্মা হইতে অভিন্ন, আমি স্বরূপতঃ নিত্য শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ সচ্চিদানন্দঘন আত্মা,—আমি দেশকালের উর্দ্ধে,—সকল বন্ধন দুঃখ জ্বালা যন্ত্রণার উর্দ্ধে, সকল জন্মমৃত্যু জরাব্যাধির উর্দ্ধে,—সকল জাতি সমাজ সম্প্রদায়ের উর্দ্ধে। আত্মার স্বরূপোপলব্ধি হইলে, বিশ্বাত্মার সহিত ব্যষ্টি-আত্মার স্বরূপগত অভিন্নতা জ্ঞানগোচর হইলে, — 'আত্মৈবেদমিদং সর্ব্বম্', — 'আত্মানং সর্ব্বভূতেষু, সর্ব্বভূতানি চাত্মনি' দর্শন হয়,—বিশ্বের

সহিত নিজের সব দ্বন্দ্ব মিটিয়া যায়, বহুর মধ্যে এক, জড়ের মধ্যে চিৎ,—সর্ব্বাবস্থার মধ্যে আনন্দ সমুজ্জ্বলভাবে আত্মপ্রকাশ করে। এই জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান,—এই জ্ঞানেই জ্ঞানশক্তির সম্যক্ সার্থকতা,—এই জ্ঞানেই পরামুক্তি, পরিপূর্ণ স্বাধীনতা, অনন্ত আনন্দ। সকল জ্ঞানবৃত্তি এই পরম জ্ঞান লাভের আনুকূল্যে সুষ্ঠুরূপে নিয়োজিত হইলেই যথার্থ জ্ঞানের সাধনা হয়। এই জ্ঞানের কাছে অপরাপর সব জ্ঞান অজ্ঞানরূপে প্রতিভাত হয়,—এবং সেই অজ্ঞানের দৃষ্টিতে এই বিশ্বজগৎ যে আকারে প্রতীয়মান হয়, তাহা মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। মানুষের বুদ্ধিকে এরূপ সম্যক্ জ্ঞানের পথে পরিচালিত করিবার জন্যই আপাতবিভিন্ন দর্শনশাস্ত্রসমূহের বিস্তার বৈদিক উপাসনাকাণ্ডের মূলমন্ত্র "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত।" সমগ্র জীবনকে উপাসনাময় করিতে হইবে। উপাসনা করা মানুষের স্বভাব। মানুষ যাহাকে শ্রদ্ধা করে, ভক্তি করে, ভালবাসে, যাহার দিকে তার চিত্ত আকৃষ্ট হয়, যাহার মহিমা দেখিয়া সে চমৎকৃত হয়, তাহাকেই সে উপাসনা করে। মানুষ অর্থের উপাসনা করে, কামের উপাসনা করে, যশের উপাসনা করে, রাজশক্তি ও সমাজশক্তির উপাসনা করে, পিতামাতা পুত্রকন্যাদির উপাসনা করে। অজ্ঞতাপ্রযুক্ত সে অনিত্য সসীম পরিচ্ছিন্ন বস্তুর উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু তার আত্মার ভিতরে যে অফুরন্ত প্রেমের ভাণ্ডার, যে অপরিসীম রসপিপাসা, অনিত্য সসীম পদার্থের উপাসনায় তার সার্থকতা কোথায়? কোন মানুষই তার ভক্তি-প্রেম-সেবা-বৃত্তিকে সসীমের মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া তৃপ্তিলাভ করে না, মানুষ অনন্তকে জানিয়া, অনন্তের সহিত মিলিত হইয়া, অনন্তকে ভালবাসিয়া, ভক্তি করিয়া, সেবা করিয়া, সমস্ত জীবনকে অনন্ত রসমাধুর্য্যময় করিতে অধিকারী, অল্পে তার তৃপ্তি কোথায়? বেদ শিক্ষা দিতেছে যে, যিনি ব্রহ্ম, যিনি ভূমা, বিশ্বের সমস্ত চেতনাচেতন পদার্থ যাহা হইতে উদ্ভূত, যাহাতে স্থিত, যাহার মধ্যে বিলীন হইয়া থাকে, বিশ্বের যাবতীয় পদার্থের অন্তর ও বাহির পরিব্যাপ্ত করিয়া যিনি স্বমহিমায় বিরাজমান, তিনি রসস্বরূপ, তিনি নিখিলরসামৃতসিন্ধু, তিনি অনন্ত বীর্য্য, অনন্ত ঐশ্বর্য্য, অনন্ত সৌন্দর্য্য, অনন্ত মাধুর্য্যের উৎস, মানুষের প্রাণ ভিতরে ভিতরে চিরকাল তাঁহাকেই চায়, তাঁহার সহিত সজ্ঞানে নিবিড় প্রেমে নিত্য যুক্ত হইতে চায়, তাঁহারই অনন্তরসমাধুরী আস্বাদন করিয়া নিজে রসমাধুর্য্যময় হইতে চায়, তাঁহাকেই ভালবাসিয়া, সেবা করিয়া, নিজের প্রেমবৃত্তিকে সম্যক্ সার্থক্যমণ্ডিত করিতে চায়। সকল ইন্দ্রিয়, সকল মনবুদ্ধিহৃদয় দিয়া, জ্ঞানে, প্রেমে, ভক্তিতে, সেবায়, তাঁহার সহিত মিলিত হইতে না পারিলে, নিজের সমস্ত সত্তা দ্বারা তাঁহার উপাসনা করিতে না পারিলে, তাহার অন্তরের অভাববোধের জ্বালা নির্ব্বাপিত হইবে না। সে যে নিত্যকাল তাঁহারই স্বজন, তাঁহারই অংশ, তাঁহার সহিত স্বরূপতঃ অভিন্ন। তাঁহার রসভাণ্ডার যে তাহারই জন্য উন্মুক্ত, সেই যে তাহা সম্ভোগ করিতে অধিকারী। তাহার নিজের অন্তরেও যে প্রেমের অফুরন্ত সম্পদ্, সেই অনন্ত রসময় বিশ্বাত্মার সম্ভোগে তাহা নিবেদিত না হইলে তাহার সার্থকতা কোথায়?

বেদের উপাসনাকাণ্ড আরও শিক্ষা দিতেছে যে, ব্রহ্মাকে, অনন্তকে, পরম পুরুষকে, পরমাত্মাকে, শুধু সর্ব্বাতীত, সর্ব্ববিলক্ষণ, সর্ব্বকারণকারণ, সচ্চিদানন্দস্বরূপ বলিয়া উপাসনা করিলে, ভক্তি করিলে, ভালবাসিলে, উপাসনা ও প্রেমবৃত্তির সম্যক্ সার্থকতা হয় না, তাঁহার সকল রসের আস্বাদন হয় না। এই ইন্দ্রিয়মনোগ্রাহ্য জগতের সর্ব্বের মধ্যে তাঁহাকে উপাসনা করিতে হইবে,—সর্ব্ব নামে, সর্ব্ব রূপে, সর্ব্ব উপাধিতে তাঁহাকে ভজন-সেবন-আস্বাদন করিতে হইবে। তিনি যে আমাদের অন্তরে বাহিরে সব হইয়া আপনার স্বরূপগত সৌন্দর্য্য-

মাধুর্য্য ঐশ্বর্য্যের অনন্ত বৈচিত্র্য প্রদর্শন করিতেছেন। তিনি যে এই বিশ্বে নানা রূপে, নানা রসে, নানা গন্ধে, নানা ছন্দে আপনাকে আপনি আস্বাদন করিতেছেন এবং আমাদের ইন্দ্রিয়-মনের আস্বাদন-যোগ্য হইয়া বিহার করিতেছেন। তিনি শুধু বিশ্বের কারণ নন, শুধু বিশ্বের আত্মা নন,—তিনি বিশ্বরূপ, তিনি বিশ্ব। শ্রদ্ধা কর, ভক্তি কর, ভালবাস,—এই বিশ্বকে, এই বিশ্বের সকল মানুষকে, সকল জীবকে,—সকল পদার্থকে, সকল ঘটনাকে। কিন্তু এই উপাসনা করিবে শান্ত ভাবে,—সমাহিত ভাবে,—ক্ষুদ্র কামনা-বাসনা বর্জ্জনপূর্ব্বক, সকলের ভিতরে এক অদ্বিতীয় নিখিলরূপরসবিলাসী সচ্চিৎ শিবানন্দ সুন্দর পরমাত্মা ব্রহ্মকে দর্শন করিয়া। যতদিন সকল বস্তুকে এই দৃষ্টিতে দেখিতে ও উপাসনা করিতে না পার,—ততদিন তাঁহার বিশেষ বিশেষ ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য-মণ্ডিত লীলাবিভূতির মধ্যে তাঁহাকে বিশেষভাবে দেখিয়া উপাসনা করিতে অভ্যাস কর। উপাসনা কর তাঁহাকে চন্দ্র-সূর্য্য-অগ্নি-বায়ু-বিদ্যুতের মধ্যে, উপাসনা কর তাঁহাকে অভ্রভেদী পর্ব্বতে, পবিত্রতোয়া স্রোতস্বিনী, বিশাল সমুদ্র, সুরম্য অরণ্যানীর মধ্যে। উপাসনা কর তাঁহাকে লোকপাল দেবগণের মধ্যে ও তাঁহাদের বিচিত্র শক্তির মধ্যে, উপাসনা কর তাঁহাকে আত্মজ্ঞ ব্রহ্মভাবভাবিত নিত্যসমাহিত-চিত্ত ঋষির মধ্যে, সর্ব্বভূতহিতেরত সমুজ্জ্বলচরিত্র মহাপুরুষের মধ্যে, লোকসেবাব্রতী অলোকসামান্য বীরনায়কের মধ্যে। ঐ দেখ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব রূপে তিনিই সৃষ্টি, পালন ও সংহার করিতেছেন, কালী দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী গণেশ কার্ত্তিক ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতি রূপে তিনিই বিচিত্র লীলা করিতেছেন, কৃষ্ণ রাম নৃসিংহ বামন প্রভৃতি রূপে তিনিই যুগে যুগে বিশ্বেরকর্ম্ম-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া সনাতন ধর্ম্মকে নব নব ভাবে সঞ্জীবিত করিতেছেন। এই প্রকারে বিশেষ বিশেষ বিভূতিসম্পন্ন লীলাবিগ্রহের মধ্যে সেই অনন্ত ভাব-বিলাসী অদ্বিতীয় বিশ্বাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা ব্রহ্মকে দর্শন ও উপাসনা করিয়া বিশ্বের সকলের মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে ও উপাসনা করিতে শিক্ষা কর,—ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল ব্যাপারের মধ্যে তাঁহার লীলা আস্বাদন করিতে অভ্যাস কর, মানবজীবনকে সর্ব্বতোভাবে ভাবগত জীবনে পরিণত করিতে চেষ্টা কর,—জীবনের প্রত্যেক বিভাগকে ভগবৎপ্রেমানন্দরসে অভিষিক্ত করিবার জন্য সাধনপরায়ণ হও। এই ভক্তিপ্রেম সাধনার সম্যক্ পারিপাকে সমস্ত বীর্য্যৈশ্বর্য্য সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যে পরিণত হয়—সমস্ত কর্ম্ম খেলায় পরিণত হয়, —সমস্ত জ্ঞান স্বাভাবিক প্রেমদৃষ্টিতে পরিণত হয়, বিশ্বের সমস্ত ব্যাপারের মধ্যেই তখন এক রসস্বরূপের রস-বিলাস আস্বাদনগোচর হয়। তখন "মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।"

বেদের এই ভাবধারা পুরাণ ও তন্ত্রে বিচিত্রভাবে ও বিচিত্র রসে তরঙ্গায়িত হইয়াছে। পুরাণ ও তন্ত্রের সাধনাই বর্ত্তমান যুগে হিন্দুসমাজের সকল স্তরে প্রাধান্যলাভ করিয়াছে। শৈব শাক্ত ও বৈষ্ণব প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মসকল বেদের উপাসনা-মার্গেরই এক একটি বিশেষ রূপ এবং পুরাণ ও তন্ত্রই তাহাদের পরিপুষ্টির উপকরণ যোগাইয়াছে। এই সব সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম সনাতন ধর্ম্মকে বিশেষ বিশেষ রূপ দিয়া হিন্দুসমাজের উচ্চ-নীচ শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল স্তরের নরনারীর নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছে এবং সকলেরই জীবনের উপর ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ধর্ম্মের তত্ত্ব যাহাদের চিত্তে এখনো সমুদ্ভাসিত হয় নাই—তাহাদের দৃষ্টি ধর্ম্মের এই সব সাম্প্রদায়িক রূপের বৈশিষ্ট্য ও ভেদের দিকেই বেশী আকৃষ্ট হয়। কিন্তু আধ্যাত্মিক দৃষ্টি উন্মোচিত হইলে রূপের বহুত্বের মধ্যে স্বরূপের একত্ব প্রতিভাত হয়,—সকল সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের মধ্যে এক সনাতন ধর্ম্মই উপলব্ধিগোচর হয়, উপাস্য দেবতাসকলের বিচিত্র নাম, রূপ, উপাধি ও বিচিত্র ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের খেলার মধ্যে এক অদ্বিতীয় পরম-

দেবতার স্বরূপটিই সমুজ্জ্বলভাবে অনুভূত ও আস্বাদিত হয়। তখন বেশ দেখা যায় যে,—
"একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি।"

হিন্দু-সমাজের বর্ণাশ্রমবিভাগ সনাতন ধর্ম্মেরই সামাজিক রূপ। আমাদের বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থা দেখিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্মের শাস্ত্রীয় স্বরূপটি বুঝিবার উপায় নাই। শাস্ত্রীয় বর্ণাশ্রম একটি সুমহান্ সার্ব্বজনীন আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। হিন্দুসমাজ যদি শাস্ত্রীয় বর্ণাশ্রমের স্বরূপটি পুনরুজ্জীবিত করিয়া জগতের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারিত, তবে মানবজাতির অনেক উৎকট সামাজিক সমস্যার সমাধান করিতে সমর্থ হইত, জগতে জাতির সহিত জাতির, জাতির সহিত ব্যক্তির স্বার্থের সংঘর্ষ নিরসন করিয়া প্রেম ও শান্তির পথ প্রদর্শন করিতে পারিত। কিন্তু এখন তাহা দুরাশা বলিয়াই গণ্য হইবে। যাঁহারা সানুরাগচিত্তে ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশীলন করেন, শাস্ত্রের তাৎপর্য্য অনুসন্ধান করিয়া ধর্ম্মের যথার্থ স্বরূপ কি, এবং বর্ণাশ্রমের শাস্ত্রসঙ্গত ব্যবস্থা কী হওয়া উচিত, তাহা আবিষ্কার করা ও লোকসমাজে প্রচার করা তাঁহাদের কর্ত্তব্যের অঙ্গীভূত।

(সমাপ্ত)

ধর্মের রূপ ও শ্রীরামকৃষ্ণধর্ম

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

ধর্মের রূপ ও শ্রীরামকৃষ্ণধর্মের আলোচনা করা মানেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আসার আগে ধর্মের রূপ ও প্রকৃতি কি রকম ছিল আর তার পরেই বা এ কি পরিণতি লাভ করেছে এসম্বন্ধেই আলোচনা ক'রে দেখা মাত্র। ধর্মের যে বিকাশ ও ক্রমোন্নতি আছে একথা আমরা বিশ্বাস করি, কেন না, ধর্ম এমন একটা জিনিস নয় যা অপরিবর্তনীয় বা আকস্মিক নতুন কিছু। তবে এটাও ঠিক যে, ধর্মের ভিত্তি আসলে একই, রূপেরই তার কেবল পরিবর্তন বা বিকাশ আছে।

'ধর্ম' বল্‌তে সাধারণত আমরা বুঝি যাগ-যজ্ঞ, পূজা-পার্বণ, দান-ধ্যান ও ব্রত-উৎসব—এই সব। 'ধর্ম' কথা বল্লে এ কথাই আমাদের মনে ওঠে যে, যেটা খুব ভাল, উন্নত, স্বচ্ছ ও পুণ্যময়—অর্থাৎ পাপ বা খারাপ-কিছুর বিপরীত। বাস্তবিক ধর্মের রূপ বা আকার আমরা চোখ দিয়ে প্রত্যক্ষ কখনো করিনি, তবে শুভ্রতা, শুচিতা, যা-কিছু ভাল, অথবা স্বর্গ, শান্তি, মন বা প্রাণের নির্মলতা এনে দেয়—এরকম কিছুর ধারণা বা ভাব দিয়েই ধর্মের একটা মানস-ছবি আমরা কল্পনা ক'রে থাকি। কিন্তু ধর্ম একটা জিনিস, যেটা করতে হয় বা সাধনসাপেক্ষ; করলেই তার ফল পাওয়া যায়, আর অনুষ্ঠানের ফলে ইহকাল ও পরকালের কিছু সান্ত্বনার উপায় বা আশা ভরসা আমরা পেয়ে থাকি।

এই ধর্মের ধারণা নানান জাতের ভেতর নানান রকমের ছিল। এর অভিব্যক্তির ইতিহাসও সব পণ্ডিতেরা মাথা ঘামিয়ে বার করতে কসুর করেন নি। কেমন ক'রে অসভ্য আদিম বুনো জাতের ধারণা থেকে আরম্ভ ক'রে বিকাশের স্তরে স্তরে বর্তমান সূক্ষ্ম চিন্তার ও দর্শনের পরিণতি হল; কেমন ক'রে গাছ ও পাথরের পুজোর

ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে স্তূপপুজো, যূপপুজো, গাছপুজো—এই ক'রে spirit—মানে ভূত, প্রেত ও তারপরে দেব-দেবী ও ঈশ্বরপুজোর চরম পরিণতিতে এসে দাঁড়াল—এসবের চমৎকার ও সুচিন্তিত কাহিনী পণ্ডিতেরা সব লিখে গেছেন। প্রাকৃতিক ঘটনাই ছিল তাঁদের কাহিনীগুলোর গোড়াকার মালমশলা। তারপর ধারণা, কল্পনা বা চিন্তার জগতে কত-কিছু আলোড়ন, ঘাত-প্রতিঘাত ও পরিবর্তন সময়ের গতির সঙ্গে ধীরে ধীরে এসেছে ও পরিপুষ্টি লাভ করেছে। ক্রমশঃ বাইরে থেকে অন্তরে অর্থাৎ শরীর থেকে মনে, মন থেকে বুদ্ধিতে এবং বুদ্ধি থেকে চৈতন্যে বিকশিত ক'রে তাঁরা ধর্মের ব্যাখ্যাকে আরো উন্নত করেছেন।

ধর্মের ইতিহাস, অভিব্যক্তি ও বিজ্ঞান কত কি রচনা করা হয়েছে; যেমন History of Religion, Evolution of Religion, Development of Religion, Philosophy of Religion, Psychology of Religion, Science of Religion. তাছাড়া Religion বা ধর্মের আবার সব রূপভেদ করা হয়েছে; যেমন Natural Religion, Physiological Religion, Psychological Religion, Anthropological Religion, Scientific Religion এই সব। এ ছাড়া বিজ্ঞানের সঙ্গে, দর্শনের সঙ্গে, প্রাকৃতিক ঘটনার সঙ্গে, জগতের বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে religion বা ধর্মের সব নানান আলোচনা করা হয়েছে।

কিন্তু এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে আমরা মোটেই এখানে চেষ্টা করব না। তবে ধর্মের আলোচনা করবার সময় এটাই কিন্তু মনে রাখব যে, যে মাটিতে আমরা বাস করি, যার পবিত্র জল-বায়ুর সংস্পর্শে এসে শরীর মন আমাদের পরিপুষ্ট হয়েছে তার নাম ভারতবর্ষ। আমরা বাস করি এমনই এক দেশে যেখানে বিশ্ব-সভ্যতার সত্যিকার ইতিহাস লুকানো রয়েছে! যেখানে যুগ যুগ ধ'রে কত গ্রাম, কত নগর, কত রাজ্য গড়েছে আবার ভেঙ্গেছে, স্বর্গে পরিণত হয়েছে আবার শ্মশান হয়ে গেছে! কত কৃষ্টি ও কত সভ্যতার উন্মেষ বিকাশের স্তরে স্তরে গড়ে উঠেছে, আবার ভেঙে চুরমার হ'য়ে গেছে! যাগ-যজ্ঞের ধূমে আকাশ ভরে গেছে, রাজা-রাজড়ার যুদ্ধে রক্তের স্রোত বয়ে গেছে; কিন্তু তাহলেও একথাই আমরা স্বীকার করব যে, এখানেই—এ ভারতবর্ষেই তপোবনেরও সৃষ্টি হয়েছিল; এই ভারতের পুণ্য তপোবনেই কত ঋষি মুনি যুগ-যুগ ধ'রে তপস্যা করেছেন ও সিদ্ধিলাভ করেছেন! ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব এই চার বেদ ভারতের আব-হাওয়ার ভেতরেই জন্মলাভ করেছিল; সামগানের ঝঙ্কার যজ্ঞবেদীর পাশে ঋষিকণ্ঠ থেকেই প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। সে গানে স্বর আর স্তোত্রই শুধু থাকৃত না, থাকৃত সুন্দরের উপাসনার ইঙ্গিত, সরল অন্তরের সাবলীল সঙ্গীতের মূর্ছনা, আর ধ্যানঘন আধ্যাত্মিকতার পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি ও সাধনা। সুতরাং ভারতের জল, ভারতের বাতাস, ভারতের গতি ও প্রকৃতিই হল আধ্যাত্মিকতার প্রেরণা দান করা। আধ্যাত্মিকতাই ভারতের নিজস্ব ও সর্বস্ব। আর এই আধ্যাত্মিকতার ইঙ্গিত ও প্রেরণার মাঝেই গড়ে উঠেছিল ভারতের কৃষ্টি, সভ্যতা, শিল্প, ভাস্কর্য, দর্শন, সাহিত্য, কাব্য ও ধর্মের সঞ্জীবতার রূপ ও ব্যঞ্জনা।

এখন ভারতের আধ্যাত্মিকতা ও ভারতের বাইরের আধ্যাত্মিকতা এরকম ভাগ করায় আমাদের কোন সার্থকতা নেই। তবে একথা ঠিক যে, ভারতের সব-কিছুর ভেতরেই আন্তর সাধনার ভাব ও পবিত্রতা লুকানো ও ওতঃপ্রোত হয়ে রয়েছে। এই লুকানো জিনিসকে বার ক'রে

বোঝ্‌বার আকুতিই হ'ল ভারতের প্রাণের আকুলতা। আর এটাই দিয়েছে ভারতীয় সাধনার সত্যিকার নিবিড়তম পরিচয়।

ভারতের ধর্ম ও সাধনা ঠিক আবার ভিন্ন দুটো জিনিস নয়—অপর দেশের লোক এসম্বন্ধে যা-ই বুঝুক বা বলুক না কেন? তবে মাঝে মাঝে ধর্মকে আবার সমাজের সঙ্গে, রাষ্ট্রের সঙ্গে, পারিবারিক, সামাজিক বা নিজ নিজ ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গেও আমরা মিশিয়ে ফেলি, আর বলি—ধর্ম সাধনা থেকে ভিন্ন, বা ধর্ম ও অনুভূতি এক জিনিস নয়। সমাজের যাঁরা সব সেরা ও বুদ্ধিমান লোক, মস্তিষ্কের চালনায় তাঁরা কত-কিছু জীবন-মরণের জটিল রহস্য আবিষ্কার ও তাদের সমাধান করতে লাগ্‌লেন, আর তা থেকে হল সব দর্শনের সৃষ্টি,—বুদ্ধি ও বোধি নিয়ে আলোচনা। অবশ্য বাগ্‌বিতণ্ডারও আর অন্ত রইল না। যুগে যুগে মনীষীরা আবার এলেন; জীবন-মরণ, জীব-ঈশ্বর, অদৃষ্ট-পুরুষকার, ইহলোক-পরলোক এসব নিয়ে কত কি চিন্তা ও গবেষণা কর্‌লেন; কত কিছু মতবাদ, সম্প্রদায়, বাদ-বিচার ও সাধনপদ্ধতিরও সব সৃষ্টি হল; মতভেদের বিতণ্ডা ও গণ্ড-গোলও অনেক হলো। ধর্মকেও ক্রমশঃ পণ্ডিতেরা দর্শনের সঙ্গে মিশিয়ে ফেল্‌তে লাগলেন, আর একেরই সিদ্ধান্ত নানান রকমের যুক্তি তর্ক দিয়ে সব সৃষ্টি হতে লাগল। কেউ বল্লেন ঈশ্বরের কথা,—ঈশ্বর এক নন, বহু; কেউ বল্লেন সাকার, আবার কেউ বল্লেন নিরাকার। কারো মতে ঈশ্বর সাকার নিরাকার দুইই বটে। কেউ বা বল্লেন—মুক্তি, স্বর্গ, শান্তি, নির্বাণ, অনুভূতি ও উপলব্ধি এসবই হল ধর্মের আসল রূপ। তবে মোট কথা হল, শেষ-বিশ্লেষণ বা সিদ্ধান্ত সকলের ভিন্ন ভিন্ন হলেও ধর্মের যোগসূত্র থেকে মোটেই কোনটাকেও পৃথক ক'রে দিলেন না।

সুতরাং ধর্ম—কথা, বস্তু বা কোন একটা চিন্তার পরিণতি যা-ই হোক না কেন, সৃষ্টির আদিম কালে ধারণা তার পরিপুষ্ট না থাকলেও অস্তিত্ব তার কোন-না-কোন আকারে অবশ্যই ছিল। কালে তার গতি ও বিস্তৃতি বাইরে থেকে ভিতরে, জড় থেকে চৈতন্যে, matter থেকে spirit-এর দিকে ঝুঁকে পড়েছিল তা আগেই বলেছি। এ ধর্মের নাম ক'রে ঋষিরা যাগ-যজ্ঞ করেছে; পর্জন্যদেবতার কাছ থেকে বৃষ্টি চেয়েছে; অগ্নি, সোম ও ইন্দ্রের কাছ থেকে ধন-ধান্য ও শ্রীবৃদ্ধির কামনা করেছে। এই ধর্মেরই অজুহাত দেখিয়ে রাজারা রাজ্য জয় করেছেন, পরস্বাপহরণ করেছেন, আবার রক্তের পরিবর্তে রক্তপ্রবাহিণী বইয়ে দিতেও একটু মাত্র কুণ্ঠা-বোধ করেন নি। এই ধর্মের ওজর দিয়েই কর্ণ তাঁর পুত্রকে বলিদান দিয়ে বজায় রেখেছেন অতিথির সম্মান, আর রাজা হরিশ্চন্দ্রও তাঁর পত্নী শৈব্যাকে বিক্রয় করেছেন ঋণ পরিশোধের জন্যে সামান্য একজন নাগরিক ব্রাহ্মণের কাছে!

সুতরাং ধর্মের রূপ নানান সময়ে নানান রকমের হয়েছিল। বেদের যুগে কেবলই উপাসনা ও প্রার্থনা ছিল ধর্মের রূপ। ঋকের দশম মণ্ডল লেখার সময় দেবতাদের বিচিত্র রূপের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে প্রকাশ পেল আবার এক ও অদ্বিতীয় সৎ-স্বরূপ ভগবান; সাকারের সংকীর্ণতা কাটিয়ে নিরাকারের রূপ কল্পনা করা হল তখনি। ব্রাহ্মণ ও সংহিতার যুগে যাগ-যজ্ঞের বিচিত্রতা মানুষের মনকে আবার উদ্বেলিত ক'রে তুল্‌ল। উপনিষদের যুগে ধর্মের রহস্য কিন্তু হৃদয়রূপ গুহাকেই শেষে কেন্দ্র ক'রে বসেছিল। ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখি সনৎকুমার ও নারদের উপাখ্যানে উপাসনার রূপ বহির্জগৎ থেকে অন্তর-রাজ্যে আসন পেতে বসেছে; বাইরের সূর্য তখন হৃদয়াকাশে স্বয়ংপ্রকাশ বুদ্ধি ও বোধির রূপ ধ'রেই ধর্মের আদর্শকে মহিমান্বিত ক'রে তুলেছে।

ধর্ম তখন আচার ও উপাসনার, কর্ম ও অনুষ্ঠানের ক্ষুদ্র গণ্ডীকে অতিক্রম ক'রে প্রজ্ঞা ও অনুভূতির আদর্শকেই বড় ব'লে দেখ্‌তে শিখেছে।

ব্রাহ্মণ ও সংহিতার যুগে সত্যিই যজ্ঞ-কুণ্ডের ধূমে আকাশ বাতাস ভরে উঠেছিল। তার অনেক পরে এলেন বুদ্ধদেব, ও প্রচার করেলন নির্বাণের কথা। তারো আগে সাংখ্য ও পাতঞ্জলের ধর্ম ভারতের মনকে বেশ অধিকার করেই বসেছিল।[১] সাংখ্যকার কপিল ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করতে রাজী হন নি, অথচ নির্বিকার পুরুষের সঙ্গে পঙ্গু প্রকৃতির মিলন করিয়ে দিয়ে জগৎকারণতার একটা নিষ্পত্তি সাধন তিনি করেছিলেন। ধর্মের রূপ হয়েছিল তখন তিনটি দুঃখের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক নিবৃত্তিতে কৈবল্যকে লাভ করা। বিশ্বনায়কের শূন্য সিংহাসনে পতঞ্জলি বসিয়েছিলেন আবার ঈশ্বরকেই জগৎস্রষ্টারূপে। ধর্মের সাধনও দেখিয়েছিলেন তিনি অষ্টাঙ্গযোগকে অবলম্বন ক'রে চিত্তনিরোধের জন্যে। বুদ্ধদেবও সাংখ্য পাতঞ্জলের সাধন-সৌন্দর্যকে এজন্যে জলাঞ্জলি দিতে পারলেন না। বোধিবৃক্ষের তলায় তিনি ধ্যানের পন্থাকেই গ্রহণ করেছিলেন। অবশেষে না কঠোরতা না মন্থরতা—এ দুয়ের মাঝখান থেকে বেছে নিলেন তিনি মধ্যমপন্থা, আর ধর্ম-সাধনার উদ্দেশ্য হল তাঁর কেবল তৃষ্ণার (তন্‌হা) উচ্ছেদসাধন করাতেই। তাঁর মতে হল তৃষ্ণাই প্রবৃত্তি তথা সংসারের মূল। তাই তৃষ্ণাকে জয় ও 'বোধি' লাভ ক'রে হলেন তিনি 'বুদ্ধ' আর নির্বাণ হল তাঁর ধর্ম। সারা ভারতের বৈদিক কর্ম-কোলাহলকে তিনি তাই নিঃসার ব'লেই প্রতিপন্ন করলেন। যাগ-যজ্ঞের অগ্নিকুণ্ড ক্রমশঃ নিভে যাবারই উপক্রম হল। বেদেরও কৌলীন্য হল ম্লান। বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের মর্যাদাকে রক্ষা করবার জন্যেই তখন হল সমগ্র নরনারীর একমাত্র আকুলতা।

ক্রমে কর্মহীনতার প্রতিক্রিয়ারূপে এলেন জৈমিনি। সাংখ্যের নিরীশ্বরতা, বুদ্ধের আচার ও ইহলোকের বিতৃষ্ণাকে গ্রহণ ক'রেও তিনি বেদের ক্রিয়াকাণ্ডকেই আবার পুনরুজ্জীবিত করতে লাগলেন। ধর্ম হল তখন যাগ-যজ্ঞ, অনুষ্ঠানের ফল হল 'অপূর্ব' আর অপূর্বের ফলে সকলে পাবার আকাঙ্ক্ষা করলেন স্বর্গ। কর্ম, কর্ম, কর্ম,—সারা ভারতের বুকে কর্ম-কোলাহল তথা যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান আবার চলতে লাগলো।

তারপরই এলেন আচার্য শঙ্কর। ত্যাগ ও বৈরাগ্যের আদর্শ দেখিয়ে প্রচার করলেন তিনি 'জ্ঞান'। এ জ্ঞানের রূপই হল 'বিচার' আর ফল 'নিজেকে জান'। অনুভূতিই হল তখন ধর্মের সত্যিকার রূপ। যাগযজ্ঞ, স্বর্গ, পুণ্য এসবই প্রতিপন্ন হল অবশ্য জাগতিক ব'লে, পারমার্থিক একমাত্র প্রতিপন্ন করলেন ব্রহ্মজ্ঞানকে। বিচার ও সূক্ষ্মবুদ্ধিকে শঙ্কর বল্লেন মোক্ষের উপায়মাত্র। বিচার ছাড়া ধর্ম তাঁর মতে একরকম অন্ধই। মানসিক সাধন যা-কিছু গ্রহণ করলেন তিনি যোগদর্শন থেকে, জগৎকে প্রাতিভাসিক ব'লে

১ বুদ্ধদেব ও তাঁর ধর্ম আগে—কি সাংখ্য ও পাতঞ্জল-দর্শনের তত্ত্ব ও বিষয়-বস্তু আগে এ নিয়ে পণ্ডিতদের ভেতর মতভেদ এখনও বড় কম নেই। বারনুফ্ (Burnouf), ওয়েবার, উইলসন্, গার্বে প্রভৃতি পণ্ডিতেরা কিন্তু বুদ্ধদেবের আগেই সাংখ্য-পাতঞ্জলের সাধন ও দর্শনের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। প্রোফেসর জেকবির অভিমতও তাই। আমরাও একথা স্বীকার করি। কেননা বুদ্ধদেব যে ব্রাহ্মণ ও সংহিতার যুগে ঈশ্বর বা যাগ-যজ্ঞ ও উপাসনার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন তা তিনি কপিলের পথকেই বেছে নিয়েছিলেন বলতে হবে। তাছাড়া আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তিতে নির্বাণের ধারণার জন্যেও তিনি কপিলের কাছে ঋণীই বলতে হবে। তারপর বুদ্ধদেব যে অষ্টাঙ্গমার্গ, ধ্যান ও চিত্তনিবৃত্তির সহায়তা নিয়েছিলেন এও তিনি পতঞ্জলির পন্থাকেই নিছক অনুসরণ করেছিলেন বলতে হবে।—Vide Radhakrishnan: *Indian Philosophy*, Vol. I, *pp.* 472-473.

প্রতিপন্ন কর্‌লেও আনুষ্ঠানিক সাধনার মালমশলা গ্রহণ কর্‌লেন তিনি তন্ত্র থেকেই।

এর অনেক পরে দাক্ষিণাত্যে জন্মগ্রহণ কর্‌লেন রামানুজ। ভক্তি ও জ্ঞানের সংমিশ্রণেই গঠিত হ'লো তাঁর ভাবের মন্দাকিনী। জীব, জগৎ ও ঈশ্বর এ তিনের সমবায়েই রচনা কর্‌লেন তিনি তাঁর ধর্ম ও সাধনার পরিপূর্ণ-মূর্তি। ঈশ্বরের শরণাগতিলাভই তাঁর মতে হল তখন মানুষের একমাত্র কাম্য।

এর পরই এলেন বাংলায় প্রেমের পরিপূর্ণ অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ। জ্ঞানের সিংহাসনকে তখন অধিকার ক'রে বসল প্রেম ও ভক্তি। বিচারের বালাই কম হলেও আচারের কিছু বাড়াবাড়ি হয়েছিল পরে। মাথার চেয়ে হৃদয়টাই হয়েছিল তখন বড়। জ্ঞানের শুষ্কতা প্রেমের বন্যায় সরস হয়ে উঠেছিল, আর প্রাণের প্রসারে উচ্চ-নীচের ব্যবধান সমাজ থেকে একরকম মুছে গেল। দারিদ্র্য রাজসম্মান, অর্থলালসা প্রভৃতি নানা ঘাত-প্রতিঘাতে হিন্দুর আদর্শ তখন ইস্‌লামের পতাকাতলে আত্মবিক্রীত হলেও জাতিনির্বিশেষের জন্যে প্রচার কর্‌লেন তিনি হরিনাম। হৃদয়ের প্রসার ও আচণ্ডালে ভালবাসার আকুলতা হিন্দুধর্মের মৃতদেহে আবার নবপ্রাণ ও প্রেরণার জাগরণ এনে দিয়েছিল। ধর্মের উদ্দেশ্য হল ক্রমে প্রেম, ভক্তি ও অনুরাগ। সাধনা হল একমাত্র নিষ্ঠা, হরিনাম, জপ, সর্বজীবে দয়া ও ভালবাসা। জাতাজাতির গোঁড়ামি সামান্য লোপ পেলেও ভাবের উচ্ছ্বলতাই হয়েছিল কিছু বেশী; আর বিচারের স্রোতও প্রায় অবরুদ্ধ হয়েছিল।

এরপর এলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। ব্রাহ্মণত্বের আভিজাত্য, শুচিতার বাড়াবাড়ি, সমাজে প্রতি-ক্রিয়ার আন্দোলন ও বিদেশী ধর্মের প্রবল আক্রমণ —এ সকল পরিবেষ্টনীর মাঝখানে এলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের কুলে তিনি নিলেন জন্ম। পিতা ছিলেন কুলীন, নৈষ্ঠিক আচারী, শূদ্রের দান-অপরিগ্রাহী ও আনুষ্ঠানিক সাধক। বড় ভাই পণ্ডিত, তবে মাতুলেরা অবশ্য গরীবই ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম জীবনে ব্রাহ্মণত্বের অভিমানকেও একেবারে বিসর্জন দিতে পারেন নি; গঙ্গাজল ও স্বপাক আতপ চাল ছিল তাঁর আহার। দীক্ষাও নিয়েছিলেন তিনি শুদ্ধাচারী একজন ব্রাহ্মণের কাছ থেকে গোড়াকার দিকে। আর এজন্যেই কৌলীন্য, আভিজাত্য, ব্রাহ্মণ্য এ সকলের সম্মানকেই তিনি ক্ষুণ্ণ কর্‌তে রাজী ছিলেন না।

কিন্তু সে সবেরও পরিবর্তন হয়েছিল আবার পরে। মাহিষ্যবংশীয়া রাণী রাসমণির কালীমন্দিরে পূজারীর কাজ নিলেন বড় ভাইয়ের আদর্শ ও উদারতাকেই অনুসরণ ক'রে। বনিয়াদী আভি-জাত্যের অভিমানকে তিনি ক্রমশঃ চূর্ণ-বিচূর্ণ কর্‌লেন। হবিষ্যের স্থান অধিকার ক'রে বস্‌ল পরিশেষে মা ভবতারিণীর প্রসাদমাত্র। সাধনায় গ্রহণ কর্‌লেন প্রথমে তন্ত্রমার্গ। গুরু হলেন একজন মহীয়সী নারী। চৌষট্টিখানি তন্ত্রকে তন্ন তন্ন ক'রে সাধন কর্‌লেন ব্রাহ্মণী যোগেশ্বরীর সহায়তাকেই বরণ ক'রে। তন্ত্রমতে সাধনার পর বেদান্তের মতে, বৈষ্ণব মতে, সুফীমতে—সকল রকম সাধনাতেই তিনি একই সত্যকে উপলব্ধি ক'রে বুঝ্‌লেন—ধর্মের সাধনই কেবল ভিন্ন, লক্ষ্য সবার এক। তাই সকল মতের সামঞ্জস্য বিধানের সঙ্গে সমস্ত ধর্মকেই তিনি প্রচার কর্‌লেন সত্য ব'লে; আর এই সার্বভৌমিক উপলব্ধির ধর্মই হল বর্তমানে বিশ্বের অখণ্ড ধর্ম, অর্থাৎ যাকে আমরা বল্‌তে চাচ্ছি 'শ্রীরামকৃষ্ণধর্ম'।

শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম কিন্তু একটা নূতন-কিছু আমদানী করা জিনিস নয়। সত্য একই, তবে তাকে জীবনে উপলব্ধি করার পথ ভিন্ন ভিন্ন। শ্রীরামকৃষ্ণ-ধর্মে এই ভিন্ন ভিন্ন পথ স্বীকৃত হয়েছে। বৈদিক যুগের উপাসনা, তন্ত্রের পূজানুষ্ঠান, বুদ্ধের

ত্যাগ ও তপস্যা, শঙ্করের জ্ঞান ও বিচার এবং গৌরাঙ্গের প্রেম ও প্রাণের অভিব্যক্তি—এসবই মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হল একটি মাত্র সাধনায়। কেবলই আচার্য শঙ্করকে নিয়ে জ্ঞানচর্চার আধিক্য এর অঙ্গভূষণ হল না, কেবলই তন্ত্রকে নিয়ে অনুষ্ঠান-সমুদ্রে পড়ে হাবুডুবু খাবার বালাই এতে থাকল না, কেবলই প্রেম প্রেম ক'রে নিছক ভাবোচ্ছ্বাসের অজুহাতে বাহ্যিক ভক্তি ও উদ্দাম নৃত্যই এতে স্থান পেল না, অথচ স্থান পেল সবই; —সবার সম্মানকে অক্ষুণ্ণ রেখেই শ্রীরামকৃষ্ণ মিলনের যোগসূত্র রচনা কর্‌লেন বাইরের জগতে, আর আধ্যাত্মিক জগতের নূতন কৌশল দিলেন বিচার ও ভক্তি—জ্ঞান ও প্রেমের পরস্পর মিলনে।

শ্রীরামকৃষ্ণধর্মের গোড়াকার কথাই হল সাম্প্রদায়িকতার দেওয়াল দিয়ে ধর্ম তথা সত্যকে ভাগ করা নয়। একমাত্র সর্বমতের ঐক্য সাধন ও একই অখণ্ড সত্যের পাদপীঠে সকল মত ও পথের মিলনসূত্র রচনা করাতেই হল শ্রীরামকৃষ্ণধর্মের সার্থকতা। এ সার্বজাতিক ধর্মে জাতাজাতির সংকীর্ণ মনোভাব নেই, ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের ভেদভাব নেই বা এদেশের ও ওদেশের পার্থক্যের বালাই নেই; কিন্তু আছে ভ্রাতৃভাব ও মিলনের মনোভাব; আছে অপর ধর্মাশ্রয়ী ও সম্প্রদায়কে অযথা আক্রমণ না করা, বরং সকলকেই নিজের ব'লে দেখার উদারতা; আর আছে সকল কিছু সাধনার ও ধর্মমতের ভেতর একই সত্যকে দেখার পরিপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি।

শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মে বাইরের জাঁকজমকের হাঙ্গামা নেই। এর সাধকের না থাকে গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, না থাকে গায়ে ছাই মাখা ও হাতে লোটা চিম্‌টে বা না থাকে কোন বাঁধাধরা বাঘছালের আসন ও আচার বিচার। এ ধর্মে যোগের উপযোগিতা আছে ততটুকু—যতটুকু সাধকের মনকে ধ্যানের পথে কেন্দ্রীভূত করতে সাহায্য করে; বিদ্যার প্রয়োজনীয়তা ততটুকু—যতটুকু সাধকের বুদ্ধি ও ধারণাকে স্বচ্ছ ক'রে যথার্থ সত্যের পথকে চিনিয়ে দিতে সহায়তা করে। সকল কিছুর বাড়াবাড়ি শ্রীরামকৃষ্ণধর্মের অন্তরায়ই। কিছু খাওয়া বা না-খাওয়া, কিছু পরা বা না-পরা, বিচার অবিচার, শুচি অশুচি এ সবের নির্ধারণ প্রবৃত্তির নজিরেই পরিস্ফুট হয়। বাঁধাধরা নিয়মের বা বিধি-নিষেধের গণ্ডীতে এ ধর্মের আদর্শ কোনদিনই পঙ্কিল হবার উপেক্ষা বরণ করে না।

শ্রীরামকৃষ্ণধর্মের বাণী ও শিক্ষা বিচিত্র ও অনন্তপ্রসারী। এ ধর্মে বিশ্বাসের আবার চোখ থাকে। অন্ধ বিশ্বাসকে বিশ্বাসের কোঠায় অন্তর্ভুক্ত করতে শ্রীরামকৃষ্ণ বরং গররাজীই ছিলেন। জো সো ক'রে লক্ষ্যে পৌঁছাবার আকুলতাই এ শ্রীরামকৃষ্ণধর্মের প্রাণ। আম বাগানে গিয়ে গাছের পাতা গণাকে তিনি নিষেধ করেছেন পণ্ডশ্রম ব'লেই, 'আম খাবে আগে, তারপর ইচ্ছে হয় পাতা গণে দেখ'—এটাই হল তাঁর কথা। শ্রীরামকৃষ্ণধর্ম এজন্যে দেখার বা দেখাবার জিনিস নয়, হাতে-নাতে করারই জিনিস। বাঁধা বুলি, প্রাণহীন উপদেশ ও বিদ্যার বড়াই এধর্মের সাম্‌নে আলুনি। একটি বইয়ের পাতায় হিমালয়-ভ্রমণ পড়া, আর পায়ে হেঁটে হিমালয় পরিভ্রমণ ক'রে আসার অভিজ্ঞতা অনেক বড়—একথাই তিনি বলেছেন। শুধু বলা বা ধর্মের বাহ্যিক আড়ম্বরে স্বর্গ তথা স্বপ্নলোকের কাল্পনিক ছবি আঁকা এ ধর্মের অঙ্গীভূত নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণধর্মে মিলনের কথাই হল আসল। এ ধর্মে বৈষ্ণব, তান্ত্রিক, শৈব, বেদান্তী ও যোগী সকল সাধকের পক্ষেই সমান আসন পাবার অধিকার আছে। এ ধর্মে বিষ্ণুমন্ত্র শক্তিমন্ত্রের সঙ্গে মিতালী করতে জানে। এধর্মে শৈবসাধকগণ শক্তিসাধকদের ওপর অযথা আক্রমণ করেন না; সাকার উপাসনাও নিরাকারের সঙ্গে বরং যোগসূত্র রচনা করতেই সহায়তা করে। এ ধর্মে সকল কিছু সম্প্রদায়ের

উপাসনা, বীজ, মন্ত্র ও অনুষ্ঠানরূপ অনন্ত প্রবাহ সর্বদেবদেবীস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ-সমুদ্রে এক হ'য়ে যেতে পারে। এ ধর্মের মূলমন্ত্রই হ'ল—সত্যে বা লক্ষ্যে দৃষ্টি স্থির থাকলে জীবনযাত্রার অভিযান পরিপূর্ণ হয় ভগবানের সাক্ষাৎলাভ ক'রে। মন ও মুখ এক ক'রে 'কাঁচা'-আমির অভিমানকে বিসর্জন দেওয়াতেই হ'ল এ ধর্মের বৈশিষ্ট্য। 'আমি'-র আভিজাত্যকে 'তুমি'-র আসনে বসাবার ইঙ্গিতই শ্রীরামকৃষ্ণধর্ম দিয়েছে—তা সে ভক্তিতেই হোক, জ্ঞানেতেই হোক, কর্মেতেই হোক বা যোগেতেই হোক। এধর্মে নিজের ভেতর নারায়ণকে প্রত্যক্ষ ক'রে দেশ ও দশের ভেতর,—দীন-দরিদ্র, মুচি মুদ্দফরাস থেকে আরম্ভ ক'রে ব্রাহ্মণ ও অভিজাত বংশীয়ের ভেতরও সেই একই নারায়ণকে প্রত্যক্ষ করতে হবে। ভগবানের সেবার সঙ্গে সঙ্গে গণ-নারায়ণের সেবার ভাবকেও অগ্রাহ্য করে চলতে এধর্ম শিক্ষা দেয় না। শিক্ষাহীন, অর্থহীন, সহায়-সম্বলহীন মানুষকে এবং দুঃস্থ ও পতিতকেও আমাদের নিজের ভাই বোন ব'লে জ্ঞান করতে হবে, আর তবেই হবে এ শ্রীরামকৃষ্ণধর্মের গৌরব ও সার্থকতা!

সমালোচনা

নিশ্চলদাসের বিচারসাগর (বঙ্গানুবাদ): শ্রীদেবশঙ্কর মিত্র কর্তৃক অনূদিত ও ৬৭নং দুর্গাকুণ্ড, কাশীধাম হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ২৯৮+২১, মূল্য চারি টাকা।

সাধু নিশ্চলদাসবিরচিত 'বিচারসাগর'কে হিন্দি ভাষায় শ্রেষ্ঠ বেদান্ত-গ্রন্থ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে হিন্দি ভাষাভাষী নরনারীগণের মধ্যে—বিশেষতঃ পাঞ্জাবে এই গ্রন্থখানি গৃহে গৃহে অদ্বৈত বেদান্তের প্রচার করিয়াছে। মহাত্মা নিশ্চলদাস ১৭৯২ খ্রীঃ পাঞ্জাব প্রদেশে জন্মগ্রহণ এবং ১৮৬৩ খ্রীঃ ৭১ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। তিনি দাদূপন্থী সাধু ছিলেন। দিল্লী হইতে ১৮ ক্রোশ পশ্চিমে কিহড়োলী নামক স্থানে এখনও তাঁহার আশ্রম বিদ্যমান।

বঙ্গদেশে কাশীদাসী মহাভারত ও কৃত্তিবাসী রামায়ণ যেমন গৃহে গৃহে পঠিত হয়, পাঞ্জাবাদি প্রদেশে 'বিচারসাগর' তেমনি আবালবৃদ্ধবনিতা পাঠ করেন। গুজরাটী, তেলেগু প্রভৃতি ভারতীয় ভাষায়, এমন কি ইংরাজিতেও—এই বিখ্যাত মৌলিক গ্রন্থখানির অনুবাদ হইয়াছে। অনুবাদক ইহার বঙ্গানুবাদ করিয়া বহুকালের অভাব দূর করিয়াছেন। নিশ্চলদাস মহাপণ্ডিত ছিলেন; সতের লক্ষ সংগ্রহশ্লোক তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। সেই জন্য তাঁহার 'বিচারসাগর' পাণ্ডিত্যপূর্ণ, অথচ প্রাঞ্জল বেদান্ত-গ্রন্থ। তিনি চল্লিশ বৎসর কাশীবাসী ছিলেন; সুতরাং তাঁহার গ্রন্থের বঙ্গানুবাদের কাশী হইতে প্রকাশই শোভনীয় হইয়াছে। নিশ্চলদাস নবদ্বীপে তিন বৎসর নব্য ন্যায় অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহার গ্রন্থখানি বাংলা দেশে প্রচারিত হওয়া আবশ্যক।

'বিচারসাগর' অদ্বৈত বেদান্তের অতুলনীয় গ্রন্থ। কোন আধুনিক ভারতীয় ভাষায় এইরূপ বেদান্ত গ্রন্থ আছে কিনা সন্দেহ। যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম জীবন-ব্রত ছিল বাংলায় বেদান্ত-প্রচার। কিন্তু উপযুক্ত গ্রন্থের অভাবে সেই কার্য অগ্রসর হইতেছে না। 'বিচারসাগরে'র

বঙ্গানুবাদ সেই অভাব অনেক পরিমাণে দূর করিবে। আলোচ্য বঙ্গানুবাদ এমন আক্ষরিক ও প্রাঞ্জল হইয়াছে যে, ইহা পাঠ করিলে মূল-গ্রন্থ পাঠের কাজ হইবে। ইহাতে মূল নাই, কেবলমাত্র অনুবাদ আছে। আমাদের বিশ্বাস অচিরে এই অনুবাদ বাংলা ধর্মগ্রন্থের মধ্যে উচ্চ আসন লাভ করিবে এবং বেদান্ত-পাঠক-পাঠিকাগণ কর্তৃক সমধিক সমাদৃত হইবে। অনুবাদক এই মহৎ কার্য সম্পন্ন করিয়া বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন। তাঁহার পরিশ্রম সার্থক, তাঁহার সাধনা সিদ্ধ হইয়াছে।

এই গ্রন্থের আদিতে মহাত্মা নিশ্চলদাসের সংক্ষিপ্ত জীবনী আছে। 'বিচারসাগর' সপ্ত তরঙ্গে বিভক্ত। বিস্তৃত সূচীতে তরঙ্গান্তর্গত বিষয়াবলী বিবৃত। উক্ত সূচী গ্রন্থাধ্যয়নে বিশেষ সহায়ক হইবে। নানা ছন্দে রচিত ৬০০ শত হিন্দি কবিতা 'বিচারসাগরে' আছে। প্রত্যেক কবিতার নিম্নে গদ্য হিন্দিতে ব্যাখ্যা আছে। ব্যাখ্যাতে সাংখ্য, যোগ, বৌদ্ধ, জৈনাদি দর্শন-সিদ্ধান্তসমূহ খণ্ডিত এবং বেদান্ত-সিদ্ধান্তের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। প্রতিপাদ্য বিষয়টীকে সুবোধ করিবার জন্য গ্রন্থকার আখ্যায়িকার সাহায্যও গ্রহণ করিয়াছেন। এই ব্যাখ্যার জন্যই 'বিচার-সাগরে'র এত প্রসিদ্ধি, এত জনপ্রিয়তা। আলোচ্য পুস্তকে মূল গ্রন্থের কবিতা ও ব্যাখ্যার সুন্দর অনুবাদ আছে। এই গ্রন্থখানি উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিলে অদ্বৈত বেদান্তের গভীর জ্ঞান লাভ হইবে।

সাধু নিশ্চলদাস সম্ভবতঃ অজাতবাদী ছিলেন। অজাতবাদ অদ্বৈতবাদেরই একটি মত এবং গৌড়পাদ কর্তৃক ব্যাখ্যাত। অজাতবাদ জগতের প্রাতি-ভাসিক সত্তাও স্বীকার করে না। পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানে জগৎ দৃশ্য হয় না। অজাতবাদ কর্তৃক উক্ত অবস্থাই গ্রাহ্য। 'বিচারসাগরে'র সমগ্র চতুর্থ তরঙ্গে (পরিচ্ছেদে) অজাতবাদ বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যাত। নিশ্চলদাস ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত ছিলেন। তিনি শ্রীরামচন্দ্রকে স্বীয় আত্মার সহিত অভেদ জ্ঞানে উপাসনা করিতেন। তাঁহার গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে এই শ্লোকটী আছে:

"বোধ চাহি যাকো সুকৃতি ভজত রাম নিষ্কাম।
সো মেরাহৈ আত্মা কাকুঁ করূঁ প্রণাম॥"

গ্রন্থখানি আগাগোড়া অতি উপাদেয় ও চিত্তা-কর্ষক। ইহা পাঠে সকল শ্রেণীর পাঠক অশেষ উপকৃত হইবেন। নিশ্চলদাসের 'বৃত্তিপ্রভাকর' গ্রন্থখানির এইরূপ বঙ্গানুবাদ হইলে ভাল হয়।

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

গীতিবীথি—বিজয় গোপাল। উদ্বোধন কার্য্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা। ৫৬ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৲ টাকা।

শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবে ভাবিত কবির রচিত কতকগুলি গান এই গীতিবীথি। কয়েকটি গানের কোন কোন চরণ কোন কোন বিখ্যাত গান স্মরণ করাইয়া দেয়। সকল গানে ভাষার সাবলীলত্ব না থাকিলেও গানগুলি ভক্তিভাবের উদ্দীপক। ভক্তজন পাঠে আনন্দ পাইবেন। ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর।

The Way to Peace, Power and Long Life—Swami Narayanananda, Pandit Bastiram Pathsala, P. O. Kankhal, Dist. Saharanpur. ১১৭, হ্যারিসন রোড হইতে নারায়ণ দাস বাজুরিয়া, বি-এ কর্তৃক প্রকাশিত। ১১৩ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৷৹ আনা।

কর্ম্মজীবনে ও ধর্ম্মজীবনে ব্রহ্মচর্য্যের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। গ্রন্থকার যুক্তিতর্ক সহায়ে এবং প্রাচীন ও নবীন আচার্য্যদের বচন উদ্ধৃত করিয়া ব্রহ্মচর্য্যের সার্থকতা প্রমাণ করিয়াছেন। যাঁহারা মনে করেন—গৃহস্থের পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য সম্ভব নহে, তাঁহাদের গৃহস্থের ব্রহ্মচর্য্য নামক অধ্যায়টি, এবং যাজ্ঞবল্ক্যের নিয়মাবলী পাঠ করিতে অনুরোধ করি। ছাপার ভুল বড় বেশী দৃষ্ট হইল।

ব্রহ্মচারী শাশ্বত চৈতন্য

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড় মঠ, হাওড়া—প্রতিষ্ঠানটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি আবাসিক কলেজ। ইহা প্রাচীন গুরুকুল-প্রথানুসারে পরিচালিত। এযাবৎ এই কলেজে আই-এ ও আই-কম্ অধ্যাপনা হইয়াছে। ১৯৪৬ সনের জুলাই হইতে ইহাতে আই-এস্‌সি ক্লাস খোলা হইবে। তাহাতে পদার্থবিদ্যা (Physics), রসায়নবিদ্যা (Chemistry) এবং প্রাণবিদ্যা (Biology) পড়ান হইবে। ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত, ইতিহাস, তর্কশাস্ত্র (Logic), অঙ্কশাস্ত্র (Mathematics), পৌরবিদ্যা ও অর্থনীতি (Civics and Economics), বাণিজ্যিক ভূগোল (Commercial Geography), বাণিজ্যিক অঙ্ক (Commercial Arithmetic) এবং বুককিপিং আই-এ ও আই-কমের পঠিতব্য বিষয়। বিজ্ঞান-বিভাগের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য একটি ত্রিতল পাকা বাড়ী নির্মিত হইয়াছে এবং ইহাতে আধুনিক উপকরণসমন্বিত একটি বিজ্ঞানাগার (laboratory) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিদ্যামন্দিরে ধর্ম ও নীতি শিক্ষা এবং শরীর চর্চার ব্যবস্থা আছে। কলেজের নিজস্ব একটি ভাল লাইব্রেরী আছে। মুষ্টিমেয় দরিদ্র অথচ মেধাবী ছাত্রগণকে ফ্রি স্টুডেন্টশিপ্ ও বৃত্তি দান করা হয়। বিভিন্ন বিষয়ে উৎকর্ষের জন্য ছাত্রগণকে পুরস্কার প্রদানও করা হয়। ছাত্রগণ ত্যাগী অধ্যাপকগণের সহিত বিদ্যামন্দিরের হোষ্টেলে বাস করে। আই-এ ও আই-কম্ এর প্রত্যেক ছাত্রকে মাসিক ৩৮৲ টাকা এবং আই-এস্‌সি বিভাগের প্রত্যেক ছাত্রকে ৪০৲ টাকা দিতে হয়।

বাঁকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা—গত ২৫শে চৈত্র বাসন্তী সপ্তমী তিথি হইতে ২৮শে চৈত্র পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে বহু সন্ন্যাসী, নানাস্থান হইতে গৃহী ভক্ত ও স্থানীয় বহু ভক্ত নরনারী উপস্থিত হইয়াছিলেন। মঠ-প্রাঙ্গণে আহূত এক ধর্মসভায় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ ও মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের স্বামী পবিত্রানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও উপদেশাবলী সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা দান করিয়া সকলের মনোরঞ্জন বিধান করেন। মূর্তি-প্রতিষ্ঠার দিন কাশীধামের প্রথিতযশা পণ্ডিত ও সন্ন্যাসী কর্তৃক শ্রীগণপতির পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, দশমহাবিদ্যার পূজা, সপ্তসতী হোম ও শ্রীবিগ্রহের বিশেষ পূজা হয়। আশ্রমস্থ ছাত্রগণের "গুরুদক্ষিণা" নাট্যাভিনয়, শ্রীদুর্গা ব্যায়াম সমিতি-কর্তৃক ব্যায়াম প্রদর্শনী ও শ্রীদুর্গা অপেরা পার্টি কর্তৃক "আত্মাহুতি" যাত্রাভিনয় সমাগত সকলের আনন্দ বিধান করিয়াছিল। এই উৎসবে ছয় সহস্রাধিক ভক্ত ও দরিদ্র-নারায়ণ প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছেন।

ফরিদপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব—গত ২১শে ফাল্গুন যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একাদশাধিকশততম জন্মতিথি উপলক্ষে এই আশ্রমে বিশেষ পূজাদি অন্তে প্রসাদ বিতরিত হয়। পরবর্তী দুই দিন যথাক্রমে জনসভা ও নর-নারায়ণ সেবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

ফরিদপুরের জেলাজজ শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় আই-সি-এস মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে বেলুড় মঠের স্বামী বীতশোকানন্দজী "বর্তমান যুগধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ" সম্বন্ধে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতা করেন। সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতাও চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। পরদিন প্রায় দুই হাজার ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করিলে উৎসব কার্য সমাপ্ত হয়।

জান্দী (ফরিদপুর) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব—গত ৬ই বৈশাখ হইতে ৮ই বৈশাখ এই প্রতিষ্ঠানে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস-দেবের একাদশাধিকশততম জন্মতিথি উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে অষ্টপ্রহর কীর্তন, পালা কীর্তন ও পূজাদি অন্তে প্রায় ত্রিসহস্রাধিক ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। শেষ দিন ফরিদপুর কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শ্রীপদ মুখোপাধ্যায় প্রধান বক্তা হিসাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনের কয়েকটি ঘটনা অবলম্বনে একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা দিয়াছেন।

মালদহ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব—এই উপলক্ষে গত ২১শে চৈত্র হইতে সপ্তাহব্যাপী আনন্দোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই উৎসবের বিশেষত্ব এই যে ইহাতে শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক ত্রিবিধ আনন্দ পরিবেশনেরই ব্যবস্থা ছিল। এই উপলক্ষে ময়মনসিংহ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী পূর্ণানন্দজী তিন দিন মনোজ্ঞ বক্তৃতা দিয়াছেন। প্রায় ১৫০০ দরিদ্র-নারায়ণ এবং ভক্ত নরনারী পরিতোষ সহকারে প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছেন।

বরিশাল শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব—গত ১০ই চৈত্র এই প্রতিষ্ঠানে পাঁচদিনব্যাপী আনন্দোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রথম দিন শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনালোকে কঠোপনিষৎ ব্যাখ্যা, কালীকীর্তন, মধ্যাহ্নে পূজা ও ভোগরাগাদি হইলে ৩৫০০ জন ভক্ত নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্নে জেলাজজ শ্রীযুক্ত সুধাংশু কুমার হালদার মহোদয়ের সভাপতিত্বে এক জনসভায় আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মাত্মানন্দজী বাৎসরিক কার্য-বিবরণী পাঠ করিলে মিঃ মহম্মদ ইস্‌লাম্ (সাবজজ) কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। পরে বেলুড় মঠের স্বামী অসঙ্গানন্দজী জগতের বর্তমান পরিস্থিতি ও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সাধনালোকে উহার সমাধান সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন।

পরদিন বরিশাল বালিকা শিক্ষালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী শ্রীযুক্তা স্নেহলতা দাস মহাশয়ার নেতৃত্বে এক মহিলা-সভার অধিবেশন হয়। ইহাতে ব্রজমোহন কলেজের অধ্যাপিকা শ্রীযুক্তা শান্তিসুধা ঘোষ, স্বামী ব্রহ্মাত্মানন্দজী ও অসঙ্গানন্দজী মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। মঙ্গলবার উক্ত স্বামীজীদ্বয় ছাত্রগণকে উপদেশ দান করেন।

ময়মনসিংহ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব—গত ৮ই চৈত্র হইতে ১৭ই চৈত্র পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে প্রদর্শনী, প্রবন্ধ, আবৃত্তি ও সংগীত প্রতিযোগিতা, ব্যায়াম, ভজন, কীর্তন, ম্যাজিক, ধর্মসভা ও প্রসাদ বিতরণ ইত্যাদির বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। ধর্মসভায় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ মনোজ্ঞ বক্তৃতা দান করিয়া সকলের মনোরঞ্জন বিধান করিয়াছেন।

সারগাছী (মুর্শিদাবাদ) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের স্মৃতিপূজা—গত ২৬শে চৈত্র এই উপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরের ষোড়শো-

পচারে পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ ও ভজনাদি আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রায় সাত শত নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন।

বাগেরহাট (খুলনা) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব—গত ২৮শে ফাল্গুন এই প্রতিষ্ঠানে শ্রীশ্রীঠাকুরের একাদশাধিকশততম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শোভাযাত্রা কীর্তন পূজা ও প্রায় ৩৫০০ হাজার ভক্ত নরনারীসেবা এই উৎসবের অঙ্গ ছিল। এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বিনয় ভূষণ সেন বি-এ মহোদয়ের সভাপতিত্বে এক জনসভার অধিবেশন হয়। ইহাতে স্বামী বীতশোকানন্দজী, শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র হালদার এম-এ, স্থানীয় কলেজের অধ্যক্ষ ডাক্তার ফণিভূষণ রায় এম-এ, পি এইচ-ডি শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

আসানসোল (বর্ধমান) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব—কিছু দিন হয় এই প্রতিষ্ঠানে দিবসত্রয়ব্যাপী উৎসব সমাপ্ত হইয়াছে। প্রথম দিন বৈকালে অবতারপুরুষগণের প্রতিকৃতি-সহ একটি শোভাযাত্রা শহরটি প্রদক্ষিণ করে। দ্বিতীয় দিন প্রভাতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ষোড়শোপচারে পূজা এবং বৈকালে স্বামী শর্বানন্দজীর সভাপতিত্বে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে ডাঃ অবিনাশ চন্দ্র বসু মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। সভান্তে আশ্রম পরিচালিত বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ব্যায়াম-কৌশল প্রদর্শন করে। পর দিন রামায়ণ গান হয় এবং অপরাহ্নে শ্রীঅমৃতলাল দে চন্‌চনির সভাপতিত্বে আশ্রম-প্রাঙ্গণে সভানুষ্ঠান হয়। পুরস্কার বিতরিত হইলে ব্রহ্মচারী সোমনাথ ও স্বামী শর্বানন্দজী মনোজ্ঞ বক্তৃতা দান করেন। সভান্তে বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ-কর্তৃক 'উৎসব' নাটক অভিনীত হয়।

কাঁথি (মেদিনীপুর) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব—গত ২৩শে চৈত্র হইতে এই প্রতিষ্ঠানে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব দিবসত্রয়ব্যাপী অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথম দিন পূর্বাহ্নে পূজা ও হোমাদির পর অপরাহ্নে স্কুল-কলেজের ছাত্র ও ছাত্রীগণের বক্তৃতা-প্রতিযোগিতা সভার অধিবেশন হয়। স্বামী প্রণবাত্মানন্দজী "বিশ্বসভ্যতায় শ্রীরামকৃষ্ণের দান" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

পরদিন প্রাতে সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত কুমুদ বন্ধু সেন মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাসহচরগণের প্রসঙ্গ করিলে রহড়া আশ্রমের বালকগণ ও সঙ্গীতবিদ্‌-গণ কর্তৃক সুমধুর-ভজন সঙ্গীত হয়। দ্বিপ্রহরে বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত সংকীর্তন দলের কীর্তন আশ্রম-প্রাঙ্গণকে মুখরিত করিয়া তোলে। প্রায় সার্ধ সহস্র দরিদ্র-নারায়ণ ও ভক্ত নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত কুমুদ বন্ধু সেন মহাশয়ের সভাপতিত্বে আহূত এক ধর্মসভায় কাঁথি আশ্রমের সম্পাদক স্বামী অন্নদানন্দজী কর্তৃক আশ্রমের বার্ষিক কার্য-বিবরণী পঠিত হইলে প্রবন্ধ ও বক্তৃতায় কৃতী প্রতিযোগিগণকে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পরে রহড়া বালক আশ্রমের স্বামী পুণ্যানন্দজী ও বেলুড় মঠ কলেজের অধ্যাপক স্বামী ধ্যানাত্মানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে সুললিত বক্তৃতা দান করেন।

২৫শে চৈত্র এগরা হাইস্কুল-প্রাঙ্গণে কাঁথি কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বনবিহারী ভট্টাচার্য মহাশয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় স্বামী অন্নদানন্দজী এবং স্বামী ধ্যানাত্মানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও তাঁহার বাণী সম্বন্ধে বক্তৃতা দান করেন। পরে স্বামী প্রণবাত্মানন্দজী ছায়াচিত্র-

যোগে একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দান করিলে সভা ভঙ্গ হয়।

রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম (রামচন্দ্র-প্রীতি মেমোরিয়্যাল) রহড়া (২৪ পরগনা) ১৯৪৪ সনের কার্য-বিবরণী—১৯৪২-৪৩ সনের ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় যখন লক্ষ লক্ষ নরনারী হা অন্ন হা অন্ন করিতে করিতে নিতান্ত অসহায় ভাবে মৃত্যুর কোলে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছিল, তখন রামকৃষ্ণ মিশন দেশবাসীর এবং বঙ্গীয় সরকারের আনুকূল্যে কয়েকটি পিতৃমাতৃহীন নিরাশ্রয় বালকের ভার গ্রহণ করেন। "বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের" স্বর্গীয় সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার পুত্র ও কন্যার (রামচন্দ্র ও প্রীতি) স্মৃতিরক্ষার্থ রহড়াস্থ তদীয় বাগানবাটিতে নির্দিষ্ট সংখ্যক অনাথ বালকগণকে প্রতিপালন ও শিক্ষাদানের সংকল্প করেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই উচ্চ আশা হৃদয়ে রাখিয়াই তিনি অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার ইচ্ছানুসারে তদীয় সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা ইন্দুপ্রভা দেবী ঐ বাগানবাড়ীসহ প্রায় তিন লক্ষ টাকা মূল্যের জি-পি-নোট, নগদ দশ হাজার টাকা ও অনেক আসবাব পত্র রামকৃষ্ণ মিশনকে দান করেন। রামকৃষ্ণ মিশন ঐ স্থানে আলোচ্য আশ্রমটি স্থাপন করিয়া ১৯৪৪ সনের সেপ্টেম্বর মাস হইতে উহার কার্য আরম্ভ করিয়াছেন। এই আশ্রমে ১৫৩টি ছেলেকে স্থান দান করিয়া লেখাপড়া শিখান হইতেছে। ইহাদের মধ্যে বঙ্গীয় সরকার ১২৫ জনের ব্যয় বহন করিতেছেন। বাকী ছেলেদের খরচ শ্রীযুক্তা ইন্দুপ্রভা দেবী প্রদত্ত অর্থ এবং সহৃদয় দেশবাসীর সাহায্যে নির্বাহিত হইতেছে।

আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শানুযায়ী যাহাতে বালকগণ স্কুলের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতি সাধনের সুযোগ পায় এবং শিল্পাদি শিক্ষা লাভ করিয়া স্বাবলম্বী হইতে পারে, সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া বালকদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। উচ্চশ্রেণীর ছেলেরা নিকটবর্তী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে এবং অন্যান্য বালকগণ আশ্রমস্থ মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন তাহাদিগকে সেলাই, বয়ন, টাইপ রাইটিং, অঙ্কন, কাগজ ও খেলনা তৈরী প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়।

আশ্রমে প্রতি বৎসর দুর্গাপূজা, সরস্বতীপূজা এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের উৎসব সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বালকদের পরিচালিত একটি হস্তলিখিত ত্রৈমাসিক পত্র বাহির হয়। এই পত্রিকাগুলি অবলম্বনে কয়েকখানি ছবিসম্বলিত "আশ্রম" নামক একটি পত্রিকা ছাপাইয়া ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে আশ্রমের মোট আয় ৪১,৫০৬৬৵৬ পাই এবং মোট ব্যয় ১৪,৬৮৭৸৵৯ পাই।

বিবিধ সংবাদ

কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটির উদ্যোগে আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকী—কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটির উদ্যোগে গত ২৩শে চৈত্র ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলে স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম-বার্ষিকী উপলক্ষে এক মহতী জনসভার অধিবেশন হয়। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস পৌরোহিত্য করেন। সভার প্রারম্ভে শ্রীযুক্ত বঙ্কিম চন্দ্র ঘোড়াই কর্তৃক বিবেকানন্দ-প্রশস্তি এবং ভারত-সঙ্গীত বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণ কর্তৃক উদ্বোধন সঙ্গীত গীত হয়। সমিতির যুগ্মসম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রকাশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন এবং বিবেকানন্দ স্মৃতি-মন্দির নির্মাণ-কল্পে মুক্তহস্তে সাহায্যের জন্য সহৃদয় দেশবাসীর নিকট আবেদন জানান। স্বামী পবিত্রানন্দজী, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুক্ত মাখন লাল সেন, মৌলবী রেজাউল করিম, শ্রীযুক্ত রমণী কুমার দত্তগুপ্ত, কুমারী রেণুকা বসু, মেজর পি বর্ধন ও শ্রীযুক্ত সুপ্রকাশ চক্রবর্তী বাঙ্গলা ও ভারতের নবজাগরণের মূলে স্বামী বিবেকানন্দের অসামান্য অবদানের উল্লেখ করিয়া বক্তৃতা করেন।

কোচবিহারে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব—গত ২৪শে ও ২৫শে চৈত্র কোচবিহার শহরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথম দিন পূর্বাহ্নে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূজা, হোম, গীতা ও চণ্ডীপাঠ হয় এবং দ্বিপ্রহরে ভক্তগণ প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় বেলুড় মঠের স্বামী অজয়ানন্দজী মানব-জীবনের উদ্দেশ্য এবং ধর্মজীবন লাভের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করিলে কুমারী গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ভজন গীত হয়। পরদিন সন্ধ্যায় স্থানীয় ল্যান্সডাউন হলে একটি জনসভায় উক্ত স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আদর্শ সম্বন্ধে একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেন।

যশোহর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব—গত ২৩শে ও ২৪শে চৈত্র এই আশ্রমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের জন্মোৎসব সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রথম দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা হোম ও ভজন কীর্তন হয়। পরদিন সকালে বিভিন্ন বাদ্য ও সঙ্গীত সহকারে একটি বিরাট শোভাযাত্রা নগর প্রদক্ষিণ করে। দ্বিপ্রহরে প্রায় তিন সহস্র নরনারী পরিতোষ সহকারে প্রসাদ গ্রহণ করেন। বৈকালে একটি সভায় শ্রীযুত ক্ষিতিনাথ ঘোষ বি-এ, বি-ই, শ্রীযুক্ত চন্দ্র কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল ও শ্রীযুক্ত মোহন লাল চট্টোপাধ্যায় বি-এল শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

ইটাচুনা (হুগলী) প্রবুদ্ধ-ভারত-সংঘে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব—গত ৩০শে চৈত্র ও ১লা বৈশাখ এই সংঘে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্ম-বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে প্রথম দিন পূর্বাহ্নে ভজন, রামনাম-সংকীর্তন, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত ও কঠোপনিষৎ পাঠ এবং অপরাহ্নে শিল্প-প্রদর্শনীর উদ্বোধন, আবৃত্তি-প্রতি-যোগিতা, প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা এবং কীর্তনাদি হয়। পর দিবস পূজা ও হোম হইলে একটি শোভাযাত্রা সমগ্র গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। দ্বিপ্রহরে প্রায় এক সহস্র নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত কুমুদ বন্ধু সেন মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি সভার অধিবেশন হয়। ইহাতে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী শান্তস্বরূপানন্দজী এবং সভাপতি মহাশয় শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর জীবনালোকে ভারতবাসীর কর্তব্য সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা প্রদান করেন।

বেলাড়ি (হাওড়া) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব—গত ১লা বৈশাখ হাওড়া জেলার অন্তর্গত বেলাড়ি গ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথিপূজা সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে প্রাতে বিশেষ পূজাদি হইলে মধ্যাহ্নে প্রায় সাত শতাধিক দরিদ্র-নারায়ণ ও ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্নে স্থানীয় সাব রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ গুহঠাকুরতা মহাশয়ের সভাপতিত্বে আশ্রম-প্রাঙ্গণে এক জনসভার অধিবেশন হয়। ইহাতে বেলুড় মঠের স্বামী বেদান্তানন্দজী, নাটশাল মঠের স্বামী সুবলানন্দজী, শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ মিশ্র, শশাটী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত তারাপদ মাইতি প্রমুখ বিশিষ্ট বক্তাগণ শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর জীবনী সম্বন্ধে প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতা দেন। সন্ধ্যায় কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটির কর্মিগণ ছায়া-চিত্রযোগে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী আলোচনা করেন।

উদ্বোধন

বৈধী ভক্তি

সম্পাদক

(২)

প্রকৃত ভক্তের দৃষ্টিতে ঈশ্বর যেমন অনন্ত, তাঁহার নাম রূপ ভাব এবং তাঁহাকে লাভ করিবার উপায়ও তেমন অনন্ত। ভক্ত কূপমণ্ডূকের ন্যায় অনন্ত ভাবময় ভগবানকে কোন বিষয়ে অন্ত করেন না। তাঁহার দৃষ্টিতে ইহা অভক্তের লক্ষণ। হিন্দুধর্মের মূলপ্রস্রবণ বেদ ঘোষণা করে, "ঈশ্বর এক হইয়াও বহু রূপে উপাসিত।"[৩২] এই বহুরূপী ঈশ্বরকে লাভ করিবার বহু উপায় আছে এবং সকল উপায়ই সত্য। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "যে, যে ভাবে আমার উপাসনা করে, আমি সেই ভাবেই তাহাকে কৃপা করি। হে পার্থ, মনুষ্যগণ সর্বপ্রকারে আমার পথেরই অনুসরণ করে। যাহারা ইন্দ্রাদি দেবতার উপাসক, তাহারাও আমারই ভজনমার্গ অনুবর্তন করে; কারণ, ইন্দ্রাদি রূপেও আমিই উপাস্য।"[৩৩] এই কারণে ভক্ত বিশ্বাস করেন যে, বিভিন্ন ধর্মরূপ নদীসমূহ একই ঈশ্বররূপ সমুদ্রগামী। ভক্ত ভগবানের কোন নাম রূপ বা ভাব এবং তাঁহাকে লাভ করিবার কোন উপায়ের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করেন না। তবে কোন মানুষের পক্ষেই অনন্ত ঈশ্বরকে অনন্ত নাম রূপ ভাবে অনন্ত পথে একই সময়ে উপাসনা করা সম্ভব নয়। কারণ, মানুষ তাহার একটি মনকে সমকালে বহু বিষয়ে নিয়োজিত করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। এই জন্য অভিজ্ঞ গুরু এক এক ভক্তের প্রকৃতি অনুযায়ী এক এক দেব দেবী বা অবতার এবং তাঁহাকে লাভ করিবার একটি মাত্র পথ নির্বাচন করেন। ভক্ত-সাধক গুরুর নির্দেশ অনুসারে তাঁহার সমগ্র শক্তি এক লক্ষ্যে নিয়োজিত করিয়া সাধন সমুদ্রে নিমজ্জিত হন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, "সমুদ্রে এক রকম ঝিনুক আছে, তারা সর্ব্বদা হাঁ করে জলের উপর ভাসে, কিন্তু স্বাতি নক্ষত্রের এক ফোঁটা জল মুখে পড়লে তারা মুখ বন্ধ করে একেবারে জলের নীচে চলে যায়, আর ওপরে আসে না। তত্ত্বপিপাসু বিশ্বাসী সাধকও সেই রকম গুরুমন্ত্ররূপ এক ফোঁটা জল পেয়ে সাধনার

৩২ একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি। ঋগ্বেদ, ১।১৬৪।৪৬

৩৩ যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥ গীতা, ৪।১১

অগাধ জলে একেবারে ডুবে যায়, আর অন্য দিকে চেয়ে দেখে না।" ভক্তিশাস্ত্রে ইহারই নাম একনিষ্ঠ বা অব্যভিচারিণী ভক্তি। ইহার অর্থ বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর ভক্তের বিভিন্ন উপাস্য ইষ্ট এবং তাঁহাদিগকে লাভ করিবার বিভিন্ন প্রণালীর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া কেবল আপন ইষ্ট ও আপন প্রণালীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন নয়। পরন্তু আপনার ইষ্ট ও আপনার প্রণালীর প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠাযুক্ত থাকিয়াও সকল ইষ্ট ও সকল প্রণালীর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন। ইহা কিরূপে সম্ভব তাহা বুঝাইতে যাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, "কি রকম জান? যেমন বাড়ীর বউ! দেওর, ভাসুর, শ্বশুর স্বামী, সকলের সেবা করে, পা ধোবার জল দেয়, গামছা দেয়, পিঁড়ে পেতে দেয়, কিন্তু এক স্বামীর সঙ্গেই তাঁর অন্য রকম সম্বন্ধ।"[৩৪] অন্যত্র —"যশোদাকে উদ্ধব বললেন, 'মা! তোমার কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবান, তিনি জগৎচিন্তামণি, তিনি সামান্য নন।' যশোদা বললেন, 'ওরে, তোদের চিন্তামণি নয়, আমার গোপাল কেমন আছে জিজ্ঞাসা করছি।—চিন্তামণি না, আমার গোপাল।"[৩৫]

ইহারই নাম ইষ্টনিষ্ঠা। ভক্তরাজ মহাবীরের বাক্যে ইহা বিশেষভাবে পরিস্ফুট। তিনি বলিয়াছেন, "লক্ষ্মীপতি ও সীতাপতি পরমাত্মা-রূপে অভেদ হইলেও কমললোচন রামই আমার সর্ব্বস্ব।"[৩৬] ভক্তিপথে সাধনায় এই ইষ্টনিষ্ঠা কেবল আবশ্যক নয় পরন্তু অপরিহার্য। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, এই ইষ্টনিষ্ঠার নামে তথাকথিত অনেক ভক্ত গোঁড়ামি সাম্প্রদায়িকতা ও পরধর্ম-অসহিষ্ণুতায় মত্ত হইয়া আজও ধর্মকে কলংকিত করিতেছেন। ইঁহারা অন্যান্য সম্প্রদায়ের উপাস্য ইষ্ট ও উপাসনা-প্রণালীর নিকৃষ্টতা এবং আপনাদের ইষ্ট ও সাধন-পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করাই ইষ্টনিষ্ঠা প্রদর্শনের উপায় বলিয়া মনে করেন। ইঁহারা হয় তো অপর ধর্ম—এমন কি আপনাদের ধর্ম সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু জানেন না, কিন্তু তথাপি ইষ্টনিষ্ঠার অজুহাতে অপর ধর্মকে আক্রমণ করিয়া থাকেন। এই ধর্মধ্বজি-গণ জানেন না যে, অপরের নিকৃষ্টতা প্রতিপাদন আপনার শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হইতে পারে না। পরধর্মবিদ্বেষ দ্বারা ইষ্টনিষ্ঠা বৃদ্ধি না হইয়া বরং সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতাই বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এইরূপ সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা এবং ইহার ফল-স্বরূপ ধর্মোন্মত্ততা উৎকট আকার ধারণ করার ফলে পৃথিবীতে যে কত যুদ্ধ-বিগ্রহ ও নররক্তপাত হইয়াছে উহার ইয়ত্তা নাই। প্রকৃত ভক্ত মহা-বীরের ন্যায় আপন ইষ্টের প্রতি নিষ্ঠা রাখিয়াও তাঁহার সহিত অভেদ মনে করিয়া সকলের ইষ্টের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা দেখান। এইরূপ উদার ভাব অবলম্বন করিয়া সাধন করায় তিনি সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার বহু ঊর্ধ্বে অবস্থান করিয়া সকল নরনারীকে সমদৃষ্টি ও প্রেমদৃষ্টিতে দেখেন এবং সাধনার চরম অবস্থায় উপনীত হইয়া তাঁহার ইষ্টকে সর্বভূতে দর্শন করেন।

ভক্ত ভগবানকে পরমপ্রিয় মনে করিয়া তাঁহাকে আত্মস্বরূপে উপাসনা করেন। হিন্দুশাস্ত্র একমাত্র আত্মাকেই প্রিয়বুদ্ধিতে উপাসনা করিতে উপদেশ দিয়াছে।[৩৭] হিন্দু বলে, "দেবদেবীগণ

৩৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, প্রথম ভাগ, ৫৩ পৃঃ।

৩৫ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, প্রথম ভাগ, ৫৩ পৃঃ।

৩৬ শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্বস্বো রামঃ কমললোচনঃ॥

৩৭ আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত।
—বৃঃ উঃ ১।৪।৮

আত্মারই স্বরূপ।"[৩৮] বিষ্ণু শিব রাম কৃষ্ণ দুর্গা কালী প্রভৃতি আত্মা বলিয়াই তাঁহারা ভক্তের সর্বাপেক্ষা নিকটতম—আপনার হইতেও আপনার। উপাস্য ইষ্ট উপাসকের আত্মা বলিয়াই তিনি তাঁহার একান্ত অন্তরতম। ভগবান ভক্তের আত্মা বলিয়াই তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রিয়। কারণ, "আত্মা ভিন্ন মানুষের সর্বাপেক্ষা প্রিয় আর কিছুই নাই।"[৩৯] "আত্মা প্রিয় বলিয়াই আত্মার প্রীতির জন্য পুত্র বিত্ত প্রভৃতি মানুষের প্রিয়।"[৪০] সাধারণ মানুষ ইহা জানিয়াও জানে না। এই জন্য সে অনাত্মবস্তুকে প্রিয় মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হয়। কিন্তু যথার্থ ভক্ত একমাত্র ইষ্টরূপী ভগবানকে আত্মস্বরূপে সর্বাপেক্ষা প্রিয় মনে করিয়া তাঁহার উপাসনা করেন।

ভগবানকে আত্মস্বরূপে উপাসনা করিতে হইলে উপাসক ভক্তের শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়াসমূহ এবং দৈনন্দিন কার্যাবলী তদনুকূল করিয়া পরিচালন করা আবশ্যক। তাঁহার জীবনের সকল কার্য একমাত্র ঈশ্বরলাভের উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রিত হওয়া দরকার। সাধারণ মানুষের ন্যায় নানাবিধ ইন্দ্রিয়ভোগ্য কামনা-বাসনা হইতে তাঁহার মনকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখিতেই হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, "বিষয় বুদ্ধির লেশমাত্র থাকলে তাঁকে দর্শন হয় না। দেশলায়ের কাঠি যদি ভিজে থাকে হাজার ঘসো, কোন রকমেই জ্বলবে না—কেবল একরাশ কাঠি লোকসান হয়। বিষয়াসক্ত মন ভিজে দেশলাই।"[৪১] এই জন্য যিনি ঈশ্বরলাভ করিতে আগ্রহান্বিত তাঁহাকে বিষয়াসক্তি সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতেই হইবে। সংসার বা জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য তাঁহাকে নানাবিধ কার্য করিতে হইলেও তাঁহার মনকে সর্বদা বিষয়াসক্তি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখা দরকার। ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়াসক্তি থাকিলে মন বিক্ষিপ্ত ও অশান্ত থাকিবেই এবং উহা কখনও একাগ্র করিয়া ভগবানের চিন্তায় নিযুক্ত করা সম্ভব হইবে না। একমাত্র কামনা-বাসনাশূন্য একাগ্র শান্ত মনই ঈশ্বর প্রত্যক্ষানুভব করিতে সমর্থ। এই কারণে 'মনই মানুষের বন্ধন ও মুক্তির হেতু'[৪২] এই শাস্ত্রবাণী অতি সত্য। সাধারণতঃ মানুষের মনের উপর তাহার শরীর ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব খুব বেশি। এই জন্য যিনি তাঁহার মনকে শান্ত করিয়া ঈশ্বরে অর্পণ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহার শারীরিক মানসিক ক্রিয়া আহার বেশভূষা সঙ্গ প্রভৃতি তদনুকূল হওয়া আবশ্যক। ভগবানের প্রতি ভক্তের আন্তরিক অনুরাগ যতই বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তিনি ততই ঐহিক ও পারত্রিক সকল সুখ ও লাভের কামনা ত্যাগ করিয়া তাঁহার দেহ ও মনকে তদনুকূল করিয়া গঠন করিতে চেষ্টা করেন। যিনি মনে-প্রাণে নিশ্চিত বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ঐহিক পারত্রিক সর্ববিধ সুখ ও লাভ, ধন-সম্পদের প্রতি আকর্ষণ ও স্ত্রী-পুত্রাদির প্রতি ভালবাসা ক্ষণস্থায়ী এবং এক-মাত্র ভগবদ্দর্শনজনিত সুখ ও লাভই চিরস্থায়ী এবং তাঁহার প্রতি ভালবাসাই অনন্ত সুখের উৎস, সেই মানুষের পক্ষে তাহার দেহ-মন তদনুকূল করিয়া গঠন করিবার চেষ্টাই স্বাভাবিক হইয়া থাকে। তাঁহাকে জোর করিয়া ঐরূপ

৩৮ আত্মা বৈ দেবতাঃ সর্বাঃ।

৩৯ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ যদন্তরতমঃ তদয়মাত্মা।

বৃঃ উঃ ১।৪।৮

৪০ ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি, ন বা অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি।

—বৃঃ উঃ, ২।৪।৫

৪১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, প্রথমভাগ, ৯৪ পৃঃ

৪২ মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।

—ব্রহ্মবিন্দূপনিষৎ

করিতে হয় না। এই জন্য ভক্তের বৈরাগ্য প্রেমপ্রসূত।

ভগবানের প্রতি ভক্তের আকর্ষণ জন্মিলে ভক্তির সাধন আরম্ভ হয়। ভক্ত তখন তাঁহার ইন্দ্রিয়গুলির বিষয়াভিমুখী গতি বন্ধ করিয়া ঈশ্বরাভিমুখী করিতে চেষ্টা করেন। ইহা কার্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি বহিঃশুদ্ধি ও অন্তঃশুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। বহিঃশুদ্ধির জন্য তিনি আচার নিয়ম এবং অন্তঃশুদ্ধির জন্য সত্য সরলতা নিঃস্বার্থপরতা দান অহিংসা প্রভৃতি অনুষ্ঠান করেন। আহার শুদ্ধ হইলে সত্ত্বশুদ্ধি হয়। এই কারণে তিনি শুদ্ধ আহার গ্রহণ করেন।

শুদ্ধ আহার বলিতে যাহাতে শরীরের পুষ্টি সাধন হয় এবং শারীরিক ও মানসিক উত্তেজনার সৃষ্টি না হয়, তাহাই বুঝিতে হইবে। ইহা দেশ-কাল-পাত্রভেদে বিভিন্ন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "আয়ু উত্তম বল আরোগ্য সুখ প্রীতিবৃদ্ধিকর সরস স্নিগ্ধ পুষ্টিকর মনোরম ভক্ষ্য-বস্তুসমূহ সাত্ত্বিকগণের প্রিয়।"[৪৩] এইরূপ সাত্ত্বিক আহার গ্রহণই আহারশুদ্ধির উপায়। ভক্তের পক্ষে অভক্ত ও চরিত্রহীন ব্যক্তির স্পৃষ্ট বা প্রদত্ত খাদ্য গ্রহণ করা উচিত নয়। কারণ উহাতে খাদ্যাশ্রয়ে অভক্তি ও মন্দভাব ভক্তের মধ্যে সংক্রমিত হইতে পারে। ইহারই নাম খাদ্যের আশ্রয়দোষ। ইহা জাতিগত নয়, পরন্তু সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য না রাখায় এই ব্যক্তিগত দোষ জাতিগত দোষে পরিণত হইয়া হিন্দুসমাজে জাতিতে জাতিতে বিরোধ-বিদ্বেষ সৃষ্টির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আচার্য রামানুজ মধ্ব নিম্বার্ক বল্লভাচার্য চৈতন্য প্রমুখ বৈষ্ণবাচার্যগণ ভক্তদের মধ্যে জাতিভেদ মানিতেন না। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের প্রামাণিক গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যভাগবতে আছে—

"যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতি বুদ্ধি করে।
জন্ম জন্ম অধম যোনিতে ডুবি মরে॥"

দশম অধ্যায়, মধ্যম খণ্ড

ভক্ত কেবল রসনেন্দ্রিয়ের আহারই শুদ্ধ করেন না, অধিকন্তু তিনি চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের আহারও শুদ্ধ করেন। শারীরিক ও মানসিক আহার শুদ্ধ হইলে উভয়বিধ বলসঞ্চয় হয়। বলসঞ্চয় ভক্তির আর একটি সাধন। "বলহীন ব্যক্তি কখনও ভগবানকে লাভ করিতে পারে না।"[৪৪] দুর্বলমনা ব্যক্তির পক্ষে ভক্তির সাধন সম্ভব নয়।

এই সকল ব্যতীত ভক্ত ভগবানকে দর্শন করিবার জন্য তাঁহার পূজা নামজপ ধ্যান স্মরণ মনন ভজন কীর্তন ভক্তিশাস্ত্রপাঠ প্রভৃতিতে মগ্ন হন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "যে আমাকে ভক্তিসহকারে পত্র পুষ্প ফল ও জল অর্পণ করে, আমি সেই শুদ্ধচিত্ত নিষ্কাম ভক্তের সেই ভক্তি উপহার প্রীতির সহিত গ্রহণ করি।"[৪৫] তিনি আরও বলিয়াছেন, "যাহারা আমাতে মনোনিবেশ করিয়া নিত্য সমাহিত হইয়া পরম শ্রদ্ধা সহকারে আমার উপাসনা করে তাহারা শ্রেষ্ঠ যোগী।"[৪৬] ভক্ত ভগবানের এই নির্দেশ অনুসারে তাঁহার উপাসনা করেন। "তিনি যাহা কিছু অনুষ্ঠান করেন, যাহা কিছু ভোজন করেন, যে যজ্ঞ করেন, যে দান করেন, যে তপস্যা করেন, তাহা ভগবানকে

৪৩ আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥
—গীতা, ১৭।৮

৪৪ নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। মুঃ উঃ ৩।২।৪

৪৫ পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥
—গীতা, ৯।২৬

৪৬ ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥
—গীতা, ১২।২

অর্পণ করেন।"[৪৭] তাঁহার শারীরিক ও মানসিক সকল কর্ম ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে কৃত হয়। এ জন্য তাঁহার আপনার কর্ম বলিতে আর কিছু থাকে না। তিনি ভগবানের উপাসনা এবং তাঁহার প্রতি মনের আকর্ষণ বৃদ্ধি করিবার জন্য কতকগুলি আনুষ্ঠানিক নিয়মের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

ধর্মরাজ্যে প্রবেশকামী সকল পথের পথিককেই প্রথমাবস্থায় কতকগুলি বিধি-নিষেধ মান্য করিয়া চলিতে হয়। চারা গাছকে যেমন প্রথম অবস্থায় বেড়া দিয়া রাখিয়া জল সিঞ্চন করিতে হয়, ভক্তি-পথের পথিককেও প্রথমতঃ তেমন কতকগুলি বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিতে হয়। সাধারণ মানুষের প্রথমেই ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক আন্তরিক অনুরাগ থাকে না। শাস্ত্র-শাসন, দুঃখমুক্তি, শাশ্বত শান্তি ও সুখলাভের প্রেরণায় মানুষের মনে ভগবান লাভ করিবার ইচ্ছার উদয় হয়। জল-সেচনের ফলে যেমন গাছ বড় হইতে থাকে, তেমন নিষ্ঠাসহকারে দীর্ঘকাল কতকগুলি বিধি-নিষেধ বা আনুষ্ঠানিক নিয়ম পালন করিবার ফলে উত্তরোত্তর মানুষের এই ইচ্ছা তীব্র আকার ধারণ করে। ভক্তিশাস্ত্রে এই বিধি-নিষেধ বা আনুষ্ঠানিক নিয়ম বৈধী বা আনুষ্ঠানিক ভক্তি নামে অভিহিত। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, "এতো জপ করতে হবে, উপোস করতে হবে, তীর্থে যেতে হবে, এতো উপচারে পূজা করতে হবে, এতো গুলি বলিদান দিতে হবে—এ সব বৈধী ভক্তি।"[৪৮]

বৈষ্ণবাচার্য শ্রীরূপ গোস্বামী বৈধী ভক্তি সাধনের ৬৪টি অঙ্গ নির্দেশ করিয়াছেন। এই গুলি নিম্নে লিখিত হইল:

(১) গুরুপদাশ্রয়, (২) দীক্ষা ও শিক্ষা গ্রহণ, (৩) শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস সহকারে গুরুসেবা, (৪) সাধুবর্ত্মানুবর্তন, (৫) সদ্ধর্মজিজ্ঞাসা, (৬) ইষ্ট-প্রীতির জন্য ভোগাদি ত্যাগ, (৭) তীর্থবাস, (৮) সকল বিষয়ে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুর অনুবর্তন, (৯) ব্রত পালন, (১০) গো ব্রাহ্মণ ও ভক্তসম্মান, (১১) ভগবদ্বিমুখের সঙ্গ ত্যাগ, (১২) বহু শিষ্য না করা, (১৩) বৃহদ্ব্যাপারে ব্যাপৃত না হওয়া, (১৪) বহু কলা অভ্যাস ও বহু ব্যাখ্যা ত্যাগ, (১৫) ব্যবহারে মুক্তহস্ততা, (১৬) শোকাদিতে অবশীভূততা, (১৭) অন্য দেবতার প্রতি অনবজ্ঞা, (১৮) প্রাণিগণকে উদ্বিগ্ন না করা, (১৯) সেবাপরাধ ও নামাপরাধ বর্জন; সেবাপরাধ— (ক) যানে ও পাদুকায় ভগবৎ-ধামে গমন, (খ) দেবোৎসব না করা, (গ) দেবমূর্তি প্রণাম না করা, (ঘ) উচ্ছিষ্ট দেহে ও অশৌচাবস্থায় ভগবদ্বন্দনা, (ঙ) একহস্তে প্রণাম, (চ) এক দেবতার সম্মুখে অন্য দেবতা প্রদক্ষিণ, (ছ) ভগবৎসম্মুখে পাদপ্রসারণ, (জ) বিগ্রহের নিকট হাঁটু বেষ্টন করিয়া বসা, (ঝ) ঐ শয়ন, (ঞ) ঐ ভক্ষণ, (ট) ঐ মিথ্যাভাষণ, (ঠ) ঐ উচ্চ ভাষণ, (ড) ঐ পরস্পর আলাপন, (ঢ) ঐ রোদন, (ণ) ঐ বিবাদ, (ত) ঐ কাহারও প্রতি নিগ্রহ, (থ) কাহারও প্রতি অনুগ্রহ, (দ) ঐ নিষ্ঠুর ও ক্রূর ভাষণ, (ধ) ঐ কম্বলদ্বারা গাত্রাবরণ, (ন) ঐ পরনিন্দা, (প) ঐ পরস্তুতি, (ফ) ঐ অশ্লীল ভাষণ, (ব) ঐ অধোবায়ু ত্যাগ, (ভ) সেবায় কৃপণতা, (ম) অনিবেদিত আহার্য ভক্ষণ, (য) কালের ফল ভগবানকে না দেওয়া, (র) অগ্রে অপরকে দিয়া পরে ভগবানকে অর্পণ, (ল) ভগবানের দিকে পশ্চাৎ করিয়া বসা, (ব) ভগবদগ্রে অপরকে প্রণাম, (শ) গুরুর নিকট মৌনতা, (ষ) আত্মপ্রশংসা, (স) দেবতা নিন্দা।

৪৭ যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥
—গীতা, ৯।২৭

৪৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, প্রথম ভাগ, ৯৩ পৃঃ।

নামাপরাধ—(ক) ধার্মিকের নিন্দা, (খ) শিব ও বিষ্ণুতে পৃথক ঈশ্বরবুদ্ধি, (গ) গুরুদেবে মনুষ্যবুদ্ধি (ঘ) শাস্ত্রনিন্দা, (ঙ) ঈশ্বরের নামে স্তুতিজ্ঞান, (চ) ভগবানের নামের অন্য অর্থ কল্পনা, (ছ) নামবলে পাপপ্রবৃত্তি, (জ) শুভকর্মের সহিত নামের তুলনা, (ঝ) শ্রদ্ধাহীনকে নামোপদেশ, (ঞ) নাম শুনিয়া অপ্রীতি: (২০) ভগবান ও ভক্তের প্রতি দ্বেষ, (২১) ভক্তির চিহ্ন ধারণ, (২২) অঙ্গে ভগবানের নাম লেখা, (২৩) নির্মাল্য ধারণ, (২৪) ভগবদগ্রে নৃত্য, (২৫) ভগবদগ্রে দণ্ডবৎ প্রণাম, (২৬) ভগবানের মূর্তিদর্শনে উত্থান, (২৭) ভগবানের মূর্তির অনুগমন, (২৮) ভগবৎস্থান পরিক্রমা, (২৯) ভগবানের মূর্তি দর্শনে গমন, (৩০) ভগবানের অর্চনা, (৩১) ঐ পরিচর্যা, (৩২) ঐ গীত, (৩৩) ঐ সংকীর্তন, (৩৪) ঐ জপ, (৩৫) ঐ প্রার্থনা, (৩৬) ঐ স্তব পাঠ, (৩৭) ঐ নৈবেদ্য গ্রহণ, (৩৮) পাদোদক গ্রহণ, (৩৯) ঐ ধূপ-মাল্যাদির ঘ্রাণ গ্রহণ, (৪০) শ্রীমূর্তি স্পর্শন, (৪১) ঐ নিরীক্ষণ, (৪২) আরাত্রিক দর্শন, (৪৩) ভগবানের উৎসব দর্শন, (৪৪) ঐ নাম চরিত্র গুণ শ্রবণ, (৪৫) ঐ কৃপার আশা, (৪৬) ঐ স্মৃতি, (৪৭) ঐ ধ্যান, (৪৮) ঐ দাস্যবৃত্তি, (৪৯) ভগবানে বিশ্বাস, (৫০) ঐ আত্মনিবেদন, (৫১) নিজ প্রিয় বস্তু ভগবানে অর্পণ, (৫২) সকল কর্ম ভগবৎ প্রীতির জন্য সম্পাদন, (৫৩) শরণাপত্তি, (৫৪) ভগবৎসম্বন্ধী ব্যক্তি ও বস্তুর সেবা, (৫৫) ভগবৎ-শাস্ত্রসেবা, (৫৬) ভক্তের সেবা, (৫৭) সামর্থ্য অনুসারে ভগবানের উৎসব করা, (৫৮) বিশেষ মাসে নিয়ম সেবা, (৫৯) ভগবানের জন্মতিথিতে যাত্রা-মহোৎসব, (৬০) ভগবান ও ভক্ত সেবায় শ্রদ্ধা ও প্রীতি, (৬১) ভক্তসহ ভাগবতাদি গ্রন্থের রসাস্বাদ, (৬২) সাধুসঙ্গ, (৬৩) নাম সংকীর্তন, (৬৪) তীর্থক্ষেত্রে স্থিতি।

এই চৌষট্টি প্রকার বৈধী ভজনাঙ্গের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রবণ কীর্তন স্মরণ পাদসেবন অর্চনা বন্দনা দাস্যসাধন সখ্যসাধন ও আত্মনিবেদন এই নয়টি[৪৯] এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ভক্তসঙ্গ নাম-কীর্তন ভাগবতশ্রবণ মথুরামণ্ডলে বাস ও শ্রীমূর্তি সেবা এই পাঁচটি প্রধান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলেন যে, এই পাঁচটি ভজনাঙ্গের মধ্যে একটি দ্বারাও বৈধী ভক্তি লাভ হইতে পারে। একাঙ্গ বা বহু ভজনাঙ্গ উভয়বিধ সাধনেই নিষ্ঠার আবশ্যকতা অপরিহার্য। নিষ্ঠা না থাকিলে কোন ভজনাঙ্গ সাধনেই ফল হয় না।

বৈধী ভক্তির প্রধান একাঙ্গ বা বহুঅঙ্গ নিষ্ঠা সহকারে দীর্ঘকাল সাধন করিলে ভগবানের প্রতি ভক্তের যে ক্রমেই অধিকতর আন্তরিক অনুরাগ জন্মিবে ইহাতে আর সন্দেহ নাই। ভক্তমাত্রেরই সর্বদা স্মরণ রাখা দরকার যে, এই অনুষ্ঠানগুলি ঈশ্বরের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ বৃদ্ধির যতটা সাহায্য করে ততটাই উহাদের উপযোগিতা। কতকগুলি আনুষ্ঠানিক নিয়মপালনই মুখ্য ধর্ম নহে। তবে উহাদের সাহায্যে ভগবানে ঐকান্তিক অনুরাগ বা ভগবানের প্রত্যক্ষানুভূতির জন্য ব্যাকুলতা জন্মে বলিয়াই গৌণ ভাবে উহাদিগকে ধর্ম বলা হয়। ঈশ্বর দর্শনই একমাত্র মুখ্য ধর্ম। এই মুখ্য ধর্ম সাধনের জন্য গৌণ ধর্ম পালনের আবশ্যকতা আছে। ভগবানকে প্রত্যক্ষ-ভাবে দর্শন না করা পর্যন্ত সকলের পক্ষেই 'ধর্ম' একটি কথার কথা বা অর্থহীন শব্দ মাত্র। যিনি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ ভাবে দর্শন করেন নাই, তিনি ধর্মরাজ্যে পদবিক্ষেপও করেন নাই। তাঁহাকে দর্শন বা তাঁহার কৃপালাভ করিবার একমাত্র উপায় তাঁহার প্রতি আন্তরিক অনুরাগ।

৪৯ শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
—শ্রীমদ্ভাগবত

ভক্তিশাস্ত্রের ভাষায় এই অনুরাগের নাম রাগানুগা অথবা প্রেমা ভক্তি। ঠিক ঠিক ভাবে বৈধী ভক্তি সাধন করার ফলে এই প্রেমাভক্তি জন্মে। প্রেমাভক্তির উদয় হইলে আর বৈধী ভক্তির আনুষ্ঠানিক নিয়মগুলি পালনের আবশ্যকতা থাকে না। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান বলিয়াছেন, "যত দিন মনে নির্বেদ না আসে এবং আমার কথা শ্রবণে শ্রদ্ধা না হয়, ততদিন কর্ম করিবে।"[৫০] শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, "রাগভক্তি, প্রেমাভক্তি, ঈশ্বরে আত্মীয়ের ন্যায় ভালবাসা এলে আর কোন বিধি-নিয়ম থাকে না। তখন ধানকাটা মাঠ যেমন পার হওয়া। আল দিয়ে যেতে হয় না। সোজা এক দিক দিয়ে গেলেই হলো।"[৫১] অন্যত্র—"হাওয়ার জন্য পাখার দরকার হয় না। ঈশ্বরের উপর ভালবাসা আসবে বলে জপ, তপ, উপবাস। কিন্তু যদি দক্ষিণে হাওয়া বয়, পাখা খানা ফেলে দেয়। ঈশ্বরের উপর অনুরাগ প্রেম আপনি এলে, জপাদি কর্ম ত্যাগ হয়ে যায়। হরি প্রেমে মাতোয়ারা হলে বৈধী কর্ম কে করবে?"[৫২] ভক্তিশাস্ত্র বলে যে, ভগবানের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ বা তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য ঐকান্তিক ব্যাকুলতাই তাঁহাকে লাভ করিবার শ্রেষ্ঠ উপায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ইহার সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন, "ব্যাকুলতা হলেই অরুণ উদয় হলো। তার পরই সূর্য দেখা দিবেন। ব্যাকুলতার পরই ঈশ্বর দর্শন।"[৫৩] ঈশ্বর লাভের জন্য আন্তরিক ব্যাকুলতাই রাগানুগা ভক্তির প্রধান লক্ষণ।

৫০ তাবৎ কর্মাণি কুর্বতে ন নির্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥
—শ্রীমদ্ভাগবত

৫১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, প্রথম ভাগ, ১০০ পৃঃ

৫২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, প্রথমভাগ, ৯৩পৃঃ

৫৩ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, প্রথমভাগ ২৭ পৃঃ।

চিরসখা

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

শতেক তুচ্ছতা মাঝে আমি যবে আপনা হারাই
কে তুমি পশ্চাতে নিশিদিন
আমার খেলার ঘোর ভেঙ্গে দিতে জাগিছ সদাই
সচকিত-আঁখি তন্দ্রাহীন?
অজস্র কলুষ-লেপে ক্লিষ্টমন ম্লান কলেবর
গুমরি গুমরি কাঁদে প্রাণ
আমার অন্তর-লোকে কে তখন ভাতিছ ভাস্বর
ক্ষণে আনো আলোর সন্ধান?

অসংখ্য মরণ স্পর্শে বিশ্বে যদা ফিরে ধ্বংসস্তূপ
আপন ক্ষুদ্রতা-ভয়ে মরি
কে আসি দাঁড়াও তুমি মৃত্যুহীন আমার স্বরূপ
সর্ব্বদিকে অভয় প্রসারি?
বহুল কুটিল মিথ্যা মোরে যবে আবেষ্টিয়া রয়
সে বন্ধ নিমিষে দাও ভাঙি
জাগ্রত জীবন-সত্য চিরন্তন শুভ্র জ্যোতির্ম্ময়
হে অনন্ত-সখা তোমা নমি

পঞ্জিকা-সংস্কার

স্বামী চিন্ময়ানন্দ

বঙ্গদেশীয় প্রচলিত পঞ্জিকা-সমূহের পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে অধিকাংশ পঞ্জিকাতেই যে তিথি, নক্ষত্র ও গ্রহাবস্থান (স্ফুট) প্রভৃতি প্রকাশিত হয়, তাহাদের সহিত ভ-চক্রে সূর্য্য, চন্দ্র আদির যথার্থ সংস্থানের কোনও সম্বন্ধ নাই। ফলতঃ পৃথিবীর নানা দেশীয় গগন-পর্য্যবেক্ষণ-শালায় প্রত্যক্ষিত সূর্য্য, চন্দ্র ও গ্রহাদির বাস্তব অবস্থানের সহিত বঙ্গের অনেক পঞ্জিকারই গ্রহাদি-স্থিতি মিলে না। কিন্তু সে দিকে জন-সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষিত হইতেছে না। প্রচলিত পঞ্জিকা-সমূহে এক তিথিকে অন্য তিথি—যেমন, দশমীকে কখনও নবমী, কখনও একাদশী বলিয়া ছাপা হইতেছে; পূজা পার্ব্বণ, শ্রাদ্ধ ও অন্যান্য শুভ কর্ম্মের বিধান হয়ত বিহিত তিথির পূর্ব্বে বা পরে, ভ্রমাত্মক গণিত তিথির[১] অনুরোধে দেওয়া হইতেছে। সূর্য্য, চন্দ্র ও গ্রহ, নক্ষত্রাদির উদয় ও অস্ত, গ্রহ-যুতি বা এতদনুরূপ অন্যান্য বিষয়ের পরীক্ষা দ্বারা পঞ্জিকা-সমূহের শুদ্ধতা-নির্ণয়ের অভিজ্ঞতা বা উৎসাহ সকলের নাই। একমাত্র গ্রহণ-দর্শন সকলের বোধ-গম্য; এই গ্রহণ-সন্দর্শন দ্বারাও পঞ্জিকার শুদ্ধাশুদ্ধির নির্ণয় হইতে পারে। কিন্তু অসংস্কৃত (সুতরাং ইদানীং অশুদ্ধ) কোনও প্রাচীন মতানুযায়ী গণিত তিথি-নক্ষত্রাদি-যুক্ত পঞ্জিকায়, বিলাতের 'নাবিক পঞ্জিকা' (Nautical Almanac) বা প্যারী শহরের 'কাল-জ্ঞান-পঞ্জিকা'র (Connaissance des Temps) উপাদানে গ্রহণ-সমূহের স্পর্শ, নিমীলন ও মোক্ষাদির গণনা গৃহীত হইলে, গ্রহণ-সন্দর্শনদ্বারাও অসংস্কৃত পঞ্জিকার গ্রহণাতিরিক্ত অন্যান্য অংশের শুদ্ধতার নিরূপণ হয় না। যখন বঙ্গীয় বা ভারতীয় সাধারণ পঞ্জিকা সমূহ বিদেশীয় দৃক্-সিদ্ধ পঞ্জিকার উপাদানে গ্রহণ-গণনা করিত না, তখন প্রাচীন মতে গণিত ও পঞ্জিকায় মুদ্রিত গ্রহণের স্পর্শ ও মোক্ষসময় আকাশে দৃষ্ট গ্রহণের স্পর্শ ও মোক্ষসময়ের সহিত মিলিত না; এমন কি প্রাচীন মতে গ্রহণ-গণনায় অর্দ্ধঘণ্টা বা তদধিক কালেরও ভ্রম হইয়া পড়িত।

১ সাধারণ পঞ্জিকায় লিখিত তিথির আরম্ভ বা অন্ত-কালের সহিত দৃক্-সিদ্ধ পঞ্জিকার তিথির আরম্ভ ও অন্তের মধ্যে ৩।৪ এমন কি ৫।৬ ঘণ্টার পর্য্যন্ত পার্থক্য দেখা যায়।

ইতিহাস

প্রায় ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতের কয়েক জন জ্যোতিষিক পণ্ডিত এতদ্দেশীয় পঞ্জিকার সূর্য্য ও চন্দ্র-গ্রহণ দৃক্-সিদ্ধ না হওয়ায় পঞ্জিকা-গণনা বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইয়া পাশ্চাত্য জ্যোতিষের চর্চ্চা করিলেন; এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে ভারতীয় জ্যোতিষ-শাস্ত্রের (Astronomy) ও ভারতীয় পঞ্জিকার সংস্কার করা প্রয়োজন। প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বে তেলিনীপাড়ার (হুগলী) জমিদার মনোমোহন বাবু নাবিক-পঞ্জিকা হইতে তিথি আদি গণনা করিয়া দেখিলেন যে, এতদ্দেশীয় পঞ্জিকা-সমূহে তিথ্যারম্ভ বা তিথ্যন্ত আদি সমস্তই কম-বেশী ভ্রমাত্মক। স্বীয় গবেষণা তিনি সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত করিয়া জন-সাধারণের সম্মুখীন

করিলেন। ইহার কিছু দিন পরেই কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন প্রিন্সিপ্যাল মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় পঞ্জিকা-সংস্কারে মনোযোগ দেন। তিনি বিবিধ জ্যোতিষ-শাস্ত্র আলোচনার পর পঞ্জিকা-সংস্কারে দৃঢ়-নিশ্চয় হইয়া এই উদ্দেশ্যে সংস্কৃত-কলেজভবনে বার বার সভা আহূত করেন ও আলোচনা চালাইতে থাকেন। সংস্কৃত কলেজের শেষ সভায় পঞ্জিকা-সংস্কারের জন্য একটী 'কার্য্যকরী সমিতি' সংগঠনের প্রস্তাব গৃহীত হইবার কিছু দিন পরে, বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত-পঞ্জিকার প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ১২৯৭ সালে 'বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা' প্রকাশ করিলেন।

চারিদিকে পঞ্জিকা-সংস্কারস্রোত প্রবল হইয়া উঠিল। বঙ্গে বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র[২] মহাশয়ও বিপুল শাস্ত্রালোচনার পর পঞ্জিকা-সংস্কারে বদ্ধ-পরিকর হইলেন। ক্রমে সমগ্র ভারতে পঞ্জিকা-সংস্কারের প্রচেষ্টা আরম্ভ হইল; এবং এই উদ্দেশ্যে ১৯০৪ সনের শেষ কয়েক দিন বম্বে শহরে জগদ্গুরু শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্যের সভাপতিত্বে ভারতের সকল প্রদেশ হইতে প্রতিনিধি লইয়া এক বিরাট্ সভার অধিবেশন হয়। তৎপরে, প্রচলিত পঞ্জিকা-সমূহের ভ্রান্তি বুঝিতে পারিয়া, 'বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভা' পঞ্জিকা-সংস্কারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে লইয়া "বঙ্গীয় পঞ্জিকা-সংস্কার সমিতি" নামক এক সমিতি স্থাপন করিলেন। ১৩২৫ সালের ১৮ই ভাদ্র ও ৫ই আশ্বিন তারিখে স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় গুরুচরণ তর্ক-দর্শন-তীর্থ মহাশয়ের উদ্যোগে উক্ত সমিতির দুই অধিবেশনে পঞ্জিকা-সংস্কারের মূল-সূত্রগুলির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়[৩]।

"বঙ্গীয় পঞ্জিকা-সংস্কার সমিতি"র প্রথম অধিবেশনে (১৮ই ভাদ্র, ১৩২৫) উপস্থিত সদস্যগণের মধ্যে ছিলেন—(১) স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (সভাপতি), (২) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গুরুচরণ তর্ক-দর্শন-তীর্থ (বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভা), (৩) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেন[৪] (ঢাকা সারস্বত-পঞ্জিকা), (৪) কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ স্মৃতি-ব্যাকরণ-জ্যোতিস্তীর্থ[৫] (পি. এম্. বাগ্চীর পঞ্জিকা) (৫) শ্রীযুক্ত জগদ্দুর্লভ স্মৃতিতীর্থ (বঙ্গবাসী পঞ্জিকার গণক ও ব্যবস্থাপক), (৬) শ্রীযুক্ত ধীরানন্দ কাব্যতীর্থ (গুপ্তপ্রেস ও বঙ্গবাসী পঞ্জিকা), (৭) শ্রীযুক্ত কুলচন্দ্র জ্যোতীরত্ন (ঢাকা সারস্বত-পঞ্জিকা), (৮) শ্রীযুক্ত উপাধ্যায় ঝা (৺কাশীর পঞ্জিকা), (৯) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ মিত্র (বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা)। অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্তে স্বাক্ষর—শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় (সভাপতি) ও শ্রীগুরুচরণ তর্ক-দর্শন-তীর্থ (সম্পাদক)।

বঙ্গীয় পঞ্জিকা-সংস্কার-সমিতি বা সারণী-সমিতির দ্বিতীয় অধিবেশনে (৫ই আশ্বিন, ১৩২৫) শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ জ্যোতিস্তীর্থ, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার মজুমদার ও শ্রীযুক্ত আশুতোষ

২ বিচারপতি স্বর্গগত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র মিত্র, এডভোকেট, হাইকোর্ট, ইদানীং বহু বৎসর হইল নানা অসুবিধার মধ্যেও কৃতিত্বের সহিত 'বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা' সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন।

৩ এই সকল মূল সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৩৩৬ সাল হইতে 'বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা' গণিত হইতেছে।

৪ ইনি সারণী-সমিতির নির্দ্দেশানুযায়ী "গ্রহ-গণিত" নামক একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার সহিত 'বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা'র গণনাও সম্পূর্ণ ভাবে মিলে।

৫ ইনি পি, এম্, বাগ্চীর সংস্রব ত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকায় যোগদান করিয়াছেন। ইনি সারণী সমিতির নির্দ্দেশানুযায়ী 'করণ-বল্লভ' নামক একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থানুসারে গণনা ও বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকার গণনা সম্পূর্ণ ভাবে সামঞ্জস্য রক্ষা করে।

মিত্র আদি উপস্থিত ছিলেন। এ অধিবেশনেও পঞ্জিকা-গণনা বিষয়ে অনেকগুলি বিশেষ আবশ্যকীয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইহার সভাপতি ছিলেন শ্রীযুক্ত (অধুনা স্বর্গগত) অধ্যাপক আশুতোষ মিত্র।

সারণী-সমিতির নির্দ্দেশানুসারে বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা গণনা করা হইতেছে কিন্তু উপরি-উক্ত অধিবেশনে উপস্থিত অন্যান্য পঞ্জিকার প্রতিনিধিগণ ঐ সিদ্ধান্ত মানিয়া লইয়াও, রক্ষণশীল পণ্ডিতগণের এবং সংস্কার-ভীরু অজ্ঞ জন-সাধারণে পঞ্জিকা-বিক্রয়ের ব্যবসায়ে হানি[৬] ঘটিবার ভয়ে এ পর্য্যন্ত নিজেদের পঞ্জিকার সংস্কার করিলেন না। কেহ কেহ আপত্তি উঠাইয়াছিলেন যে, যত দিন পঞ্জিকা-গণনার উপযোগী কোন করণ-গ্রন্থ রচিত না হইতেছে, তত দিন তাঁহারা পঞ্জিকা-সংস্কার করিতে পারিতেছেন না। ভারতের অন্য প্রদেশে মুদ্রিত গ্রন্থগুলি ছাড়িয়া দিলেও, একমাত্র বঙ্গদেশে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভা দ্বারা নিযুক্ত 'পঞ্জিকা-সংস্কার সমিতি'র নির্দ্দেশানুসারে দুই খানা করণ-গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহাদের গণনাফলও বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকার তুল্য।

বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা ব্যতীত বঙ্গদেশে প্রচলিত অন্যান্য সকল পঞ্জিকারই গণনা প্রায় সমরূপ হওয়ায় গুপ্তপ্রেস ও পি এম্ বাগ্‌চীর প্রকাশিত পঞ্জিকার মতই অসংস্কৃত ও ভ্রান্ত। ইহা গ্রহণ, সূর্য্যোদয় সূর্য্যাস্ত, গ্রহ-যুতি, দৃক্-সিদ্ধ সূর্য্য-চন্দ্র-স্ফুটানুযায়ী[৭] তিথি, নক্ষত্র, যোগ, করণাদি বিষয় এবং নিম্নোক্ত স্বীকারোক্তির প্রতি লক্ষ্য করিলেই বেশ বুঝিতে পারা যাইবে।

৬ নিম্নোদ্ধৃত পি, এম্, বাগ্‌চী পঞ্জিকার 'স্বীকারোক্তি' দ্রষ্টব্য।

৭ সূর্য্য-চন্দ্র-স্ফুটানুযায়ী তিথি, নক্ষত্র, যোগ ও করণ আদি কিরূপে সাধিত হয়, তাহার বিস্তৃত বিবরণের জন্য 'উদ্বোধন', চৈত্র-সংখ্যা, ১৩৫২, পৃঃ ১৩৫-এ লেখকের 'পঞ্জিকা' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার স্বীকারোক্তি

গুপ্তপ্রেস ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা, ১৩৪১ সাল, ভূমিকার পরে পৃষ্ঠা ৮/০তে উক্ত পঞ্জিকার প্রকাশক মহাশয় লিখিয়াছেন:—

"পঞ্জিকা-সংস্কার সম্বন্ধে আমরা এতদিন স্পষ্ট করিয়া কিছু বলি নাই। আমাদের মনোগত অভিপ্রায় এই যে, সন ১৩২২ সালে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভায় প্রচারিত 'অসতি ধর্ম্ম-শাস্ত্র-বিরোধে দৃগ্‌গণিতৈক্য-সাধনমস্মাকং সম্মতম্,' এই মূল প্রস্তাবের অনুযায়ী সুবিশুদ্ধ সারণী প্রকাশিত হইলে তদনুসারে পঞ্জিকা সুসংস্কৃত হইবে। যত দিন তাহা না হইতেছে, ততদিন প্রাচীন নিয়মের অনুবর্ত্তন করাই যুক্তি-যুক্ত ও শাস্ত্র-সম্মত। ইত্যাদি—" ১৩৪০ সাল; পৌষ।

পি এম্ বাগ্‌চী পঞ্জিকার স্বীকারোক্তি

পি এম্ বাগ্‌চীর ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা, ১৩৪১ সাল, ভূমিকার পরেই পঞ্জিকা-সংস্কার সম্বন্ধে প্রকাশকের নিবেদন:—

"আজ প্রায় অর্দ্ধ-শতাব্দী যাবৎ পঞ্জিকা-সংস্কার সম্বন্ধে বহু প্রকার সমালোচনা প্রভৃতি চলিয়া আসিতেছে। অধুনা আবার নূতন উদ্যমে পঞ্জিকার সংস্কার লইয়া বেশ একটা আন্দোলন চলিতে আরম্ভ হইয়াছে। বহুবার বহু সভায় পঞ্জিকা-সংস্কার যে অবশ্য কর্ত্তব্য ইহা পণ্ডিত-সমাজ কর্ত্তৃক সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। কিন্তু জন-সাধারণ ইহার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাদৃশ আগ্রহান্বিত না হওয়ায় এবং মাননীয় পণ্ডিত-সমাজ অদ্যাপি এ সম্বন্ধে কয়েকটী বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারায়, আমরা প্রাচীন মতানুযায়ী গণনার পরিবর্ত্তন করিতে পারিতেছি না। এ বিষয়ে

ঐকমত্য হইলেই শীঘ্র-মধ্যে আমরা নূতনরূপে সংস্কৃত পঞ্জিকা প্রকাশ করিতে পারিব এইরূপ আশা অন্তরে পোষণ করিতেছি, যেহেতু সর্ব্ববিষয়ে ঐকমত্য হইয়া প্রবৃত্ত হওয়াই যুক্তি-যুক্ত ও বাঞ্ছনীয়। ইতি—"

নিবেদক—শ্রীপঞ্চানন দেবশর্ম্মা (বাগচি)

সমালোচনা

গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার উপযুক্ত স্বীকারোক্তির সমালোচনা করিয়া, "বঙ্গের পঞ্জিকা-সমস্যা" নামক পুস্তিকার (মাঘ, ১৩৪২) শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র লাহিড়ী) এম্-এ লিখিয়াছেন ঃ—

"প্রকাশকের এই স্বীকারোক্তি হইতে পাঠকগণ স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছেন যে, গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার গণনাসকল ভ্রান্ত। ইহা জানিয়াও প্রকাশক মহাশয় অশুদ্ধ গণনার প্রকাশ ও প্রচার দ্বারা লোকের ধর্ম্ম নষ্ট করিতেছেন। স্বার্থ-রক্ষার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণ-সভার সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য-বিরোধী এক অর্থ অনুমান করিয়া আবার ধুয়া ধরিয়াছেন যে তাঁহার আনুমানিক অর্থ অনুযায়ী সারণী প্রকাশিত না হইলে পঞ্জিকা-সংস্কার তাঁহারা করিবেন না। অর্থাৎ তাঁহারা ভুল পঞ্জিকাই প্রকাশ করিতে থাকিবেন,—দশমীতে নবমী পূজার বিধান দিবেন, ত্র্যহস্পর্শে যাত্রা বিবাহাদির ব্যবস্থা দিবেন, পিতার মৃত্যু-তিথি উপেক্ষা করিয়া অন্য তিথির ভোগ আরম্ভ হইলে শ্রাদ্ধ করিতে সাধারণকে উপদেশ দিবেন! ধন্য প্রকাশক মহাশয়ের শাস্ত্র-বিশ্বাস এবং ধন্য তাঁহার সাহায্যকারী পণ্ডিতগণের শাস্ত্র-জ্ঞান ও ধর্ম্ম-ভীরুতা! * * * বলা বাহুল্য ব্রাহ্মণ-সভার সারণী-সমিতির সিদ্ধান্ত অনুসারে বাঙ্গালা দেশে দুইখানি বিশুদ্ধ সারণী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু তথাপি পঞ্জিকাকারগণ উদাসীন।"

"বঙ্গের পঞ্জিকা-সমস্যা"য় (মাঘ, ১৩৪২, পৃঃ ১৬) পি, এম্, বাগচী পঞ্জিকার স্বীকারোক্তির সমালোচনা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত নির্ম্মল বাবু লিখিয়াছেন ঃ—

"ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে বাগচী-পঞ্জিকা-পক্ষীয়গণ পঞ্জিকা-সংস্কারে ইচ্ছুক, অর্থাৎ তাঁহাদের পঞ্জিকা ভ্রান্ত, তিথি, নক্ষত্র সকলই ভুল; তাঁহারা সংস্কার করিয়া ভুল পরিত্যাগ করত সত্য গ্রহণ করিতে চান। ইহা হইতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিতেছেন যে প্রচলিত পঞ্জিকাকারগণ কি প্রকারে অসত্যের প্রকাশ ও প্রচার করিয়া ধর্ম্ম-প্রাণ হিন্দুর ধর্ম্ম নষ্ট করিতেছেন এবং জ্যোতিষিগণকে মিথ্যা কোষ্ঠী গণনা ও মিথ্যা ফলাদেশ করিতে সাহায্য করিতেছেন ও উপদেশ দিতেছেন।"

তিথি-নক্ষত্র

দৃক্-শোধিত বিশুদ্ধ পঞ্জিকার তিথি বা নক্ষত্রের সঙ্গে অন্যান্য প্রচলিত পঞ্জিকার তিথি নক্ষত্রের কখনও কখনও ২।৩ ঘণ্টা, এমন কি ৫।৬ ঘণ্টা পর্যন্ত পার্থক্য হইয়া থাকে। সুতরাং দৃক্-শোধিত পঞ্জিকায় যে তিথি বা নক্ষত্র সন্ধ্যা ৬টায় শেষ হইল, তাহা অন্য পঞ্জিকায় দিন ১২টা বা রাত্রি ১২টার সময় পর্য্যন্ত শেষ হইতে পারে। ফলে যে শিশু ঐ দিন ভূমিষ্ঠ হইল তাহার জন্ম-নক্ষত্র ভুল হইবে; এমন কি কখনও কখনও জন্ম-রাশিরও ভুল হইবে। গ্রহ-সংক্রমণেও উভয় পঞ্জিকায় অনেক ঘণ্টা, এমন কি কয়েক দিনেরও অন্তর হইয়া থাকে; ফলে কোষ্ঠীতে[৮] ঐ গ্রহ যথোচিত ঘর (রাশি) হইতে অন্য ঘরে লিখিত হইয়া থাকে। অসংস্কৃত পঞ্জিকার নক্ষত্র চন্দ্রস্ফুটাদি ভুল হওয়ায়

৮ ভবিষ্যতে "কোষ্ঠী-বিচারে গ্রহ ও ভাব-স্ফুট" শীর্ষক এক প্রবন্ধে ফলিত-জ্যোতিষের মূল ভিত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

পরাশর, তাজিক, কালামৃত আদি মতে কোনও দশা-গণনাও (Directional Calculations) যথা-সাময়িক হইবে না। তিথিতেও ৫।৬ ঘণ্টার পর্যান্ত ভুল থাকিলে হিন্দুর ক্রিয়াও পণ্ড হইবে। অশুদ্ধ পঞ্জিকার ব্যবহারে বিবাহ, উপনয়নাদিও অশুভ সময়ে সম্পন্ন হইবে। এক তিথি-বিহিত পূজা বা শ্রাদ্ধ বস্তুতঃ অন্য তিথিতে আরম্ভ হইলে বা পূর্ব্ব তিথি শেষ না হইতেই সম্পন্ন করা হইলে উহা দূষণীয় হইবে। এই জন্য জন-সাধারণকে দায়ী করা যায় না; কারণ তাঁহারা অনেকে হয়ত জানেনই না যে বিরাট উপাধি-যুক্ত[১] পণ্ডিত মহাশয়দের নামাঙ্কিত প্রচলিত ও বিখ্যাত পঞ্জিকাগুলি অশুদ্ধ হইতে পারে।

গ্রহণ

বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা ও অন্যান্য পঞ্জিকার গ্রহণ গণনা সম্বন্ধে "পঞ্চাঙ্গ প্রভাকর" (আষাঢ়, ১৩৫১) লিখিয়াছেন:—

"সাধারণ লোকের ধারণা এই যে, বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত নিজেকে অধিকতর বিশুদ্ধ বলিয়া দাবী করিলেও অন্যান্য পঞ্জিকার গ্রহণগুলিও যথাযথ সংঘটিত হইতেছে। সুতরাং ভ্রান্তি কোথায়? * * * ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকায় যে গ্রহণ-গণনা হইত, তাহার সহিত প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট গ্রহণের সময়ের প্রভেদ ন্যূনাধিক অর্দ্ধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত দেখা যাইত। লোকে মনে করিত ইহাই হয়ত নিয়ম। কিন্তু বিশুদ্ধ পঞ্জিকার অভ্যুদয়ের পরে লোকে দেখিতে পাইল, ঐ পঞ্জিকা-লিখিত গ্রহণ যথাযথ সংঘটিত হয়, কিন্তু গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার গ্রহণ যথাযথ মেলে না। ইহাতে সাধরণ লোকে বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্তের প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল। তখন পঞ্জিকা-প্রচলন বন্ধ হইবার ভয়ে গুপ্তপ্রেস ও অন্যান্য পঞ্জিকাকারগণ বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-গৃহীত পন্থায় মাত্র গ্রহণ-গণনা আরম্ভ করিলেন। তিথ্যাদি অন্যান্য অংশ পূর্ব্ববৎ অসংস্কৃতই রহিয়া গেল। লোকে মনে করিল গুপ্তপ্রেস সংস্কৃত হইয়াছে। বস্তুতঃ গ্রহণের সময় গোঁজামিল দেওয়া হইলেও গুপ্তপ্রেসাদির তিথ্যাদি সম্পূর্ণ-ভাবে অসামঞ্জস্যপূর্ণ রহিয়াছে। পূর্ণিমা ও চন্দ্রগ্রহণের মধ্যকালের পার্থক্য অতি সামান্য, ৮।১০ মিনিটের অধিক হইতে পারে না। কিন্তু গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকায় দেখা যাইবে যে এই পার্থক্য অতি বিপুল, অনেক সময় এক ঘণ্টারও অধিক এবং অনেক সময় পূর্ণিমা শেষ হওয়ার পরেও গ্রহণারম্ভ হইতে দেখা গিয়াছে। (১৩৪৮ সনের ১৯শে ভাদ্র তারিখে গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার গ্রহণ-মধ্য ও পূর্ণিমান্তের প্রভেদ লক্ষ্য করুন।) * * * গুপ্তপ্রেস বিলাতি নাবিক-পঞ্জিকা হইতে গ্রহণ চুরি করিয়া 'বাহবা' পাইতেছেন। অপর পক্ষে বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত কি করিতেছে? এই পঞ্জী সূর্য্য-সিদ্ধান্তাদি গ্রন্থের সংজ্ঞানুসারে গণিত হয় এবং বর্ত্তমান কালোচিত নূতন সংস্কারাদি প্রয়োগ দ্বারা দৃক্-সিদ্ধির সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করে।"

গ্রহ-যুতি ও গ্রহ-স্ফুট

বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকাতে মধ্যে মধ্যে সংঘটনীয় দুইটী গ্রহের সংযোগ-কাল প্রদত্ত হয়। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে ঐ সময়ে ঐ দুইটী গ্রহ বাস্তবিকই সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী হয়। Helio-centric (সূর্য্য-কেন্দ্রীয়) দৃষ্টিতে অথবা গ্রহ-দ্বয়ের Latitude (অক্ষাংশ বা Declination (ক্রান্তি-মার্গ) এ পার্থক্য থাকিলেও ভূ-কেন্দ্রীয় (Geocentric) দৃষ্টিতে উভয় গ্রহের Geocentric Longitudes (গ্রহস্ফুট) একই হইয়া থাকে। অন্য পঞ্জিকার গণনায় তাহা হয়

[১] ইহা কেন হয়, তাহা প্রবন্ধের "বৃদ্ধ-জনানুসরণ" অংশে দ্রষ্টব্য।

না। যেমন, ১৩৩১ সালের ২৫শে বৈশাখ প্রাতঃকালে বুধ-গ্রহ সূর্য্য-বিম্বের মধ্য দিয়া গমন করিয়াছিল এবং যন্ত্রদ্বারাও উহা পরীক্ষিত হইয়াছিল। বুধ ও রবি-গ্রহের যখন সংযোগ হইল, তখন তাহাদের স্ফুটও (Geocentric Longitudes) এক হওয়া উচিত ছিল। বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা মতে তৎকালে রবি ও বুধের স্ফুট মেষরাশির ২৪°-৩০′-২১″; কিন্তু পি, এম্, বাগচীর পঞ্জিকা-মতে তৎকালে রবি ও বুধের স্ফুটের প্রভেদ ৫° (পাঁচ) অংশেরও অধিক ছিল। সুতরাং, দেখা গিয়াছে যে বাগচীর পঞ্জিকার গ্রহ-স্ফুট দৃক্-সিদ্ধ নহে এবং উহা ভ্রান্ত। এইরূপ ১৭ই আষাঢ়, ১৩৩১ সাল, মঙ্গলবারে বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত পঞ্জিকায় ঔদয়িক রবিস্ফুট ২-১৬°-৩৯′-৪০″ ও শুক্র-স্ফুট ২-১৬°-৪০′-৫৮″ ছিল; উভয়ের প্রভেদ ০।০।১।১৮ অর্থাৎ এক কলা আঠারো বিকলা। অন্য পঞ্জিকায় ছিল রবি—২-১৫°-৫২′-৪০″ ও শুক্র—২-১০°-২৬′-৪০″; উভয় গ্রহের প্রভেদ ০।৫।২৫।৫৪ অর্থাৎ পাঁচ অংশ কলা চুয়ান্ন বিকলা। ঐ দিন সকাল প্রায় নয় ঘটিকার সময় কাল-বিন্দু-রূপ বক্রী শুক্র উজ্জ্বল সূর্য্যবিম্বের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিতে দেখা গিয়াছিল। এই ঘটনাও বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকার সহিতই মিলিয়াছিল; শুক্র বক্রী থাকিলেও কেবল পৌনে চার ঘণ্টায় (সূর্য্যোদয়ের পরে) তাহার পক্ষে প্রায় ৫½° (সাড়ে পাঁচ) অংশ ভ-চক্রে সংক্রমণ করা অসম্ভব; সুতরাং অন্য পঞ্জিকার শুক্র-স্ফুট অত্যন্ত অশুদ্ধ ছিল, ইহাতে সন্দেহ নাই। উপরি-উক্ত উভয় গ্রহের স্ফুটে বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত ও অন্য মতে প্রভেদ ছিল—রবি স্ফুটে ০।০।৪৭।৬ ও শুক্র স্ফুটে ০।৬।১৪।১৮। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, ঐ দিন কোনও শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে তাহার কোষ্ঠীতে বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত মতে গ্রহ স্ফুট না দিয়া অন্য পঞ্জিকা-মতে দিলে রবি-স্ফুটে ভুল হইবে ৪৭ কলা ৬ বিকলা এবং শুক্র স্ফুটে ভুল হইবে ৬ অংশ ১৪ কলা ১৮ বিকলা। সুতরাং এইরূপ অশুদ্ধ স্ফুটাদিযুক্ত কোষ্ঠী, অন্য প্রচলিত পঞ্জিকা মতে প্রস্তুত হইলে তাহাতে ষড়্‌বর্গাদি-জন্য সূক্ষ্ম ফলিত জ্যোতিষিক গণনা কি করিয়া শুদ্ধ হইতে পারে? নবাংশ, ত্রিংশাংশাদি রূপ বিবিধ বর্গ-জন্যে জাতক-বিচার ছাড়িয়া দিলেও, সূর্য্য-স্ফুটে সামান্য অশুদ্ধিও থাকিলে 'তাজিক' ও 'কালামৃত' আদি মতে (বঙ্গেতর প্রদেশে অত্যন্ত প্রচলিত) 'বর্ষ-ফল' গণনাও মিলিবে না।

সূর্য্য ও চন্দ্রের উদয় ও অস্ত কাল

কলিকাতার কোনও উচ্চ স্থান হইতে সূর্য্যের মধ্য-বিন্দুর উদয় লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত, বাগচী ও গুপ্তপ্রেস আদি পঞ্জিকার মধ্যে কোন পঞ্জিকার লিখিত কালেই প্রত্যহ ঠিক ঠিক সূর্য্যোদয় হইতেছে না! অমাবস্যার পর প্রথম চন্দ্র-দর্শনের দিন-গণনা বিশুদ্ধ না হইলে মুসলমানদিগের ঈদ, মহরম আদি বিশুদ্ধ ভাবে গণনা করা যায় না। অশুদ্ধ তিথি ও অশুদ্ধ চন্দ্র-স্ফুট অনুসারে গণনা করা হয় বলিয়া অনেক পঞ্জিকাতে চন্দ্র-দর্শন ঠিক ঠিক মেলে না; বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তে তিথি[১০] ও চন্দ্র-স্ফুট বিশুদ্ধ বলিয়া চিরদিনই চন্দ্রদর্শনের দিনগণনা প্রত্যক্ষের সহিত মিলিয়া থাকে। বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা দৈনিক চন্দ্রোদয় বা চন্দ্রাস্ত গণনা করিয়া ঐ সময় ঘণ্টা মিনিটে দিন-পঞ্জিকায় অথবা পরিশিষ্টে[১১] দিয়া থাকেন; কিন্তু অন্য পঞ্জিকা দৈনিক চন্দ্রোদয় বা চন্দ্রাস্ত পঞ্জিকার গণনাও প্রকাশ করিতে সাহস

১০ তিথি আদি পঞ্চাঙ্গের শুদ্ধতার বিবরণ 'উদ্বোধন' চৈত্র-সংখ্যায় "পঞ্জিকা" শীর্ষক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

১১ 'দৈনিক চন্দ্রোদয়াস্ত' ১৩৫৩ সালের বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা, পৃঃ ২৯৫ দ্রষ্টব্য।

করেন না। যদি তাঁহারা কথনও তাহা করেন, তবে গ্রহণ-গণনার মতই তাঁহাদিগকে উহা 'নাবিক-পঞ্জিকা'র অনুসরণে করিতে হইবে। পঞ্জিকা-সমূহে চন্দ্রোদয়ের পার্থক্য ও ভ্রান্তির দুইটী দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল :—(১) বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকায় ১৩৪১ সালে মহরমের দিন ১৪ই এপ্রিল, ৩১শে চৈত্র নির্দ্দিষ্ট ছিল; আর গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকাতে দিন ছিল ১৪ই ও ১৫ই উভয় দিনই। ফলতঃ বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্তের গণিত ও নির্দ্দিষ্ট দিনেই চন্দ্র দেখা গেল ও মহরম হইল। (২) ১৩৪০ সালে ঈদের দিন লইয়া মত-ভেদ হইয়াছিল; বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্তে ৩রা মাঘ, ও অন্যান্য পঞ্জিকা-মতে ৪ঠা মাঘ ছিল। এই দিনেও বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকার গণনাই ঠিক ও অন্যান্য সকল পঞ্জিকার গণনা ভুল হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও সন্ধি-পূজা

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত-মহলে অনেকে এরূপ মনে করিতে পারেন যে—"শ্রীশ্রীঠাকুরের তো সন্ধি-পূজার সময়ে—ঠিক অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিক্ষণে—ভাব-সমাধি হইয়াছিল; যদি প্রাচীন মতে গণিত পঞ্জিকা ভুল হইত, তবে যখন সন্ধি-পূজা হইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে তাঁহার ভাব-সমাধি না হইয়া সন্ধি-পূজার পূর্ব্বে বা পরে হইত। সুতরাং প্রাচীন মতে গণিত পঞ্জিকা ত্যাগ করিবার আমাদের প্রয়োজন নাই।"

এই যুক্ত্যাভাস বা তর্কাভাসের উত্তরে বক্তব্য ইহাই যে—

(১) প্রাচীন মতে গণিত পঞ্জিকার তিথ্যাদির ও সংস্কৃত—বিশুদ্ধ—পঞ্জিকার তিথ্যাদির অন্ত বা আরম্ভ সময়ের মধ্যে ন্যূন-পক্ষে ২।৪ মিনিট হইতে উর্দ্ধ-পক্ষে কখনও কখনও ৫।৬ ঘণ্টার পর্য্যন্ত পার্থক্য হইতে পারে।

(২) সন্ধি-পূজা অষ্টমীর শেষ ২৪ মিনিট ও নবমীর প্রারম্ভিক ২৪ মিনিট, মোট ৪৮ মিনিট ব্যাপী হইয়া থাকে।

(৩) শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব-সমাধি যে তৎ-কালীন পঞ্জিকায় লিখিত অষ্টমীরই অন্তে অর্থাৎ সন্ধি-পূজা আরম্ভের ঠিক ২৪ মিনিট পরেই হইয়াছিল, তাহা কেহ 'ঘড়ি ধরিয়া' দেখিয়াছেন বলিয়া জানা নাই। সুতরাং এমন হইতে পারে যে—

(৪) সন্ধি-পূজা আরম্ভের ১৫।২০ মিনিট পরেই বা ৪০ মিনিট পরেও, সন্ধি-পূজা-কাল মধ্যেই, তাঁহার ভাব-সমাধি হইয়াছিল এবং তাহাই ঠিক ঠিক অষ্টমীর অন্ত ও নবমীর প্রারম্ভ—সন্ধিক্ষণ। অতএব দেখা যাইতেছে যে—

(৫) ঐ সালের পঞ্জিকায় অষ্টমী ও নবমী তিথি গণনায় যদি ২।৪ মিনিট বা ১৫।২০ মিনিটেরও ভুল হইয়া থাকে, তবুও মহামায়ার প্রতিমা-সম্মুখে পূজক ব্রাহ্মণের সন্ধি-পূজা করিবার ব্যাপক কাল-মধ্যেই অষ্টম্যন্ত সময়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের সমাধি হইয়াছিল।

অতএব, (৬) ইহা (শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব-সমাধির দৃষ্টান্ত) দ্বারা প্রাচীন মতে গণিত ঐ বিশেষ বৎসরের পঞ্জিকারও শুদ্ধতার প্রমাণ হইতে পারে না।

উভয়বিধ পঞ্জিকার গণনায় প্রত্যহই যে তিথ্যন্তে ৫।৬ ঘণ্টার অন্তর হয় তাহা নহে; ন্যূন-পক্ষে ২।৪ মিনিট বা তাহারও কম ভুল হইতে পারে; এমন কি যদি কোনও বৎসরের, কোনও দিনে উভয় মতে গণিত কোনও তিথ্যন্ত একবার 'এক'ও হইয়া যায়, তাহাতেও ইহা প্রমাণিত হয় না যে, প্রাচীন মতে গণিত তিথ্যন্ত সর্ব্বদাই 'এক' হইবে। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তগণেরও এবংবিধ পঞ্জিকা-সংস্কার-বিরোধী 'ধুয়া' ধরা যুক্তি-সঙ্গত নহে।

বৃদ্ধ-জনানুসরণ

অনেকে 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ'—মহাজন (বৃদ্ধেরা) যে পথানুগমন করিয়াছেন

তাহারই অনুসরণ করা উচিত বলিয়া (শ্রাদ্ধ-দ্রব্য নষ্ট করিবার ভয়ে), বাপ-দাদা বিড়াল বাঁধিয়া শ্রাদ্ধ করিয়াছেন দেখিয়া, পুত্র-পৌত্রদেরও স্বগৃহে বিড়াল না থাকিলে গ্রামান্তর হইতে বিড়াল আনিয়া তাহাকে বাঁধিয়া শ্রাদ্ধ করিবার বিধিবৎ বৃদ্ধ-জনানুসরণ করা কতখানি সমীচীন তাহাও বিবেচ্য।

ব্রাহ্মণ-সভার মূল-নীতি যদি ইহাই হয় যে, 'অসতি ধর্ম্ম-শাস্ত্রবিরোধে'—ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত বিরোধ না হইলে—বর্ত্তমান কালোচিত সংস্কারে তাঁহাদের অমত নাই, তথাপি অনেক পঞ্জিকাকারগণ পঞ্জিকা-সংস্কারে উদাসীন বা বিরোধী। কিন্তু রাজ-আইন দ্বারা ধর্ম্মশাস্ত্র-বিরোধী সংস্কারও ধুরন্ধর পণ্ডিত-সমাজ অবনত-মস্তকে গ্রহণ করিতে পারেন. রক্ষণশীলতার প্রশ্ন সে স্থানে নাই। 'শারদা-আইন' (Sarda Act) ও 'দেশমুখ আইন' (Dr. Deshmukh Bill) ইত্যাদির দৃষ্টান্তই এ বিষয়ে যথেষ্ট। সে ক্ষেত্রে 'মানব'-ধর্ম্ম-শাস্ত্র-বিরোধী[১২] চতুর্দ্দশ-বর্ষ-বয়স্কা এমন কি বিংশতি-বর্ষ বয়স্কা স্বকীয় কন্যার বিবাহদানে তাঁহাদের ধর্ম্ম নষ্ট হয় না ; নিকট ভবিষ্যতে হিন্দুর বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনে বা বিচ্ছিন্ন হইয়া স্ত্রীকে জীবন-পরিপালনের ব্যয় দিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত হইবেন না। বৃদ্ধ ও শাস্ত্রানুযায়ী ৮, ৯ ও ১০ বৎসরে কন্যাদান ত্যাগ করিয়া শাস্ত্র-বিরোধী নব্য সংস্কার গ্রহণ করিলেও শাস্ত্র-অবিরোধী পঞ্জিকা-সংস্কার-গ্রহণে তাঁহাদের আগ্রহ নাই।

এতদ্বিষয়ে বাস্তবিক হেতু এই যে, যেমন ইংরেজী বা গণিত-শাস্ত্রের এম্-এ পাশ বিজ্ঞ ব্যক্তি রসায়ন-শাস্ত্রের হয়তো কিছুই না জানিতে পারেন, সেইরূপ স্মৃতি, ব্যাকরণ, মীমাংসা বা বেদান্ত শাস্ত্রে অসীম পাণ্ডিত্যপূর্ণ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতও দৃগ্‌গণিতৈক্য 'জ্যোতিষ'-শাস্ত্রের কিছুই হয়ত না জানিতে পারেন। সুতরাং এবংবিধ নব্য বা প্রাচীন বিশিষ্ট শিক্ষিত (কিন্তু দৃক্‌সিদ্ধ জ্যোতিষ-শাস্ত্রে অজ্ঞ) ব্যক্তিগণ যেখানে পঞ্জিকা-প্রকাশনে অথবা পঞ্জিকা-গ্রহণে কর্ত্তা ও স্ব স্ব সমাজে দিগ্‌দর্শক নেতৃ-স্থানীয়, তাঁহাদের বিশুদ্ধ পঞ্জিকা গ্রহণের বিরোধী অভিমত কতটুকু যুক্তি-সঙ্গত ও সর্ব্ব-সাধারণের গ্রহণীয় তাহা সুধীগণ বিচার করিবেন।

অভিমত

যখন লোকে কোনও বিশেষ বিষয়ের সিদ্ধান্ত লইয়া বিভ্রাটে পড়িয়া যায় ও কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে না, তখন ঐ বিষয়ে বিশিষ্ট বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের অভিমত (authority বা conclusive opinion) মানিয়া লয় ও তদনুসারে বাস্তব সিদ্ধান্তের অনুগমন করিয়া থাকে। এই জন্য পঞ্জিকা-বিভ্রাটেও এখানে জ্যোতিষ-শাস্ত্রজ্ঞ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কয়েকটী অভিমত সংগ্রহ করিয়া দেওয়া গেল :—

(১) কলিকাতা বাদুড়বাগান চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক, পি, এম্, বাগচীর পঞ্জিকার অন্যতম প্রধান ব্যবস্থাদির সংশোধক ও পরিচালক শ্রীযুক্ত রামদেব স্মৃতিতীর্থ মহাশয় তাঁহার 'পঞ্চাঙ্গ-চন্দ্রিকা' নামক গ্রন্থের ভূমিকায় বলিয়াছেন—

"···প্রচলিত পঞ্জিকা-সমূহে 'দিন-চন্দ্রিকা'[১৩] ও 'দিন-কৌমুদী' অনুসারে তিথ্যাদি গণনা করা হইয়া থাকে। ন্যূনাধিক তিন শত বৎসর পূর্ব্বে দিন-চন্দ্রিকাদি গ্রন্থ তৎকালিক অয়নাংশাদি অবলম্বনে রচিত হইয়াছে।··· চরাদির বিশেষ তারতম্য ঘটায় তিন শতাধিক বৎসর পূর্ব্বের রচিত খণ্ডাবলম্বনে তিথ্যাদি নিরূপণ নিতান্ত অসঙ্গত।"

১২ "অষ্টবর্ষে ভবেৎ গৌরী, নববর্ষে চ রোহিণী।
দশমে কন্যকা প্রোক্তা, অত উর্দ্ধং রজস্বলা॥"—মনু

১৩ 'দিন-চন্দ্রিকা' আদি গ্রন্থের আলোচনা 'উপসংহারে' দ্রষ্টব্য।

(২) কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের গণিত জ্যোতিষের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাস এম্-এস্‌সি মহাশয় (৬-১-১৯৩৬ তারিখে) লিখিয়াছেন :—

"* * * দেশের পঞ্জিকা-গণনা যাহাতে নির্ভুল হয় এবং গণিতের ফল যাহাতে দৃক্-সিদ্ধ হয়, তাহার জন্য মনীষিগণ চেষ্টা করিয়াও ঐ সমস্ত পঞ্জিকার[১৪] কর্তৃপক্ষকে একই সমভূমিতে আনিতে সমর্থ হন নাই। সকলেই আপন আপন গণনা-প্রণালীই অনুসরণ করিতেছেন। তাই দেশের জন-সাধারণও বিষম পঞ্জিকা-বিভ্রাটে পড়িয়াছেন।

"জ্যোতিষের গণনা যতক্ষণ না যন্ত্রাদির সাহায্যে গ্রহ-নক্ষত্রাদি দর্শন দ্বারা সমর্থিত হইবে, ততক্ষণ তাহা স্বীকার করা সমীচীন হইবে না। আমরাও—পাশ্চাত্য জ্যোতিষ—যাহা অঙ্ক কষিয়া ও নানা সারণী সাহায্যে গণনা করিয়া সিদ্ধ করি, তাহা দৃক্-শোধিত না হওয়া পর্য্যন্ত কোনই স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারি না। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য জ্যোতিষের সমস্ত গণনাই দৃক্‌সিদ্ধ। আমরা পাশ্চাত্য জ্যোতিষের দ্বারা গণনা করিয়া এবং দূরবীক্ষণ প্রভৃতি যন্ত্রের দ্বারা গ্রহাদি দর্শন করিয়া যে সকল গ্রহ-স্ফুট ও গ্রহাদির স্থিতি ও তিথি নক্ষত্রাদির পরিমাণ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিয়াছি তাহা একমাত্র বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার সহিতই হুবহু মিলিয়া যায় এবং অন্যান্য প্রচলিত পঞ্জিকার সহিত তাহার বহুৎ পার্থক্য দেখা যায়। কাল-সমীকরণ, সূর্য্য-চন্দ্রের উদয়াস্ত, রাশ্যন্তর বা সংক্রান্তি এবং গ্রহ-স্ফুটের উপর নির্ভর করিয়া যে যোগ, করণ, লগ্ন প্রভৃতির গণনা, যাহা বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকায় পাওয়া যায়, তাহার পাশ্চাত্য দৃক্-শোধিত জ্যোতিষের গণনার সহিত মিল আছে। এই হেতু আমাদের মনে হয় ধর্ম্ম-প্রাণ হিন্দুর পক্ষে পূজা-পার্ব্বণ, বিবাহ, ব্রত ও অন্যান্য জ্যোতিষের কার্য্যে বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্তকেই অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। উহাতে শাস্ত্র-সম্মত বৈধ-ভাবেই ধর্ম্ম-কার্য্য করা হইবে।

"আমরা ব্যক্তিগতভাবে এক বৎসর দুর্গা-পূজার তিথি-বিভ্রাট্ হওয়ায় দেবী-পক্ষের ও পিতৃ-পক্ষের সমস্ত তিথিগুলি পাশ্চাত্য মতে গণনা করিয়া বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্তের গণনার সহিত মিল পাইয়া যথেষ্ট প্রীত হইয়াছি। অন্য একবার ঐরূপ বুধ ও রবির সংক্রমণের কাল গণনা করিয়া ঐ পঞ্জিকার গণনার সহিতই মিল পাইয়াছি। বলা বাহুল্য যে অন্যান্য গণনাও উহার সহিত মিলিয়াছে।.... .."

(৩) কটক কলেজের অধ্যাপক বিশিষ্ট গণিত-শাস্ত্রবিৎ রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় এম্-এ লিখিয়াছেন :—

"........বিশুদ্ধ-পঞ্জিকা সম্বন্ধে আর কি বলিব! পঞ্জিকাই কালের চক্ষু-স্বরূপ। যে পঞ্জিকা দ্বারা সত্য দৃষ্ট হয়, সে পঞ্জিকাই স্থায়ী।"

(৪) কলিকাতা, সংস্কৃত কলেজের জ্যোতিষাদি-শাস্ত্রাধ্যাপক, 'করণ-বল্লভ', 'হোরা-বল্লভ' আদি বহু গ্রন্থ-প্রণেতা, জ্যোতির্ব্বিদ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ স্মৃতি-ব্যাকরণ-জ্যোতিস্তীর্থ মহাশয়ের স্পষ্ট অভিমত এই যে :—

"গুপ্তপ্রেসের পঞ্জিকা, পি এম্ বাগ্‌চি ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা, বটতলার পঞ্জিকা প্রভৃতিতে তিথ্যাদি ভুল থাকায় এই সকল পঞ্জিকা হিন্দুধর্ম্ম-রক্ষার উপযোগী নহে। যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাসী তাঁহাদের শুদ্ধপঞ্জিকানুসারে ধর্ম্ম-কার্য্য সম্পন্ন করা উচিত। আমি স্বয়ং পিতৃ-শ্রাদ্ধ ব্রতোপবাসাদি ধর্ম্ম-কার্য্যে 'বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা' ব্যবহার করি।" —৭ই পৌষ, ১৩৪২

১৪ পি, এম্, বাগ্‌চী, গুপ্তপ্রেস আদি ও বটতলার বাজার প্রচলিত পঞ্জিকাসমূহ।

উপসংহার

অতএব পঞ্জিকা-বিভ্রাট্ ও সংস্কার বিষয়ে পর্য্যবেক্ষণমূলক পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ-সমূহ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের উদ্ধৃত অভিমত হইতে ইহাই দেখা যাইতেছে যে, আমরা যে পঞ্জিকা-নির্দ্দেশিত কালে পূজা-পার্ব্বণ, জন্মতিথি, শ্রাদ্ধ, বিবাহ, উপনয়নাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছি, সেই পঞ্জিকায় প্রদত্ত তিথি, নক্ষত্র, যোগ আদি ও গ্রহসমুদয়ের অবস্থান সম্যক্‌রূপে অভ্রান্ত হওয়া যে অত্যাবশ্যক তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

"বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা" সূর্য্য-সিদ্ধান্তের মূল সূত্রানুযায়ী বর্ত্তমান কালোচিত সংস্কৃত। ইহা স্বর্গীয় মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 'সারণী' অনুসারে এবং বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভা-নির্দিষ্ট পঞ্জিকা-সংস্কার-সমিতির সিদ্ধান্তানুযায়ী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ স্মৃতি-ব্যাকরণ-জ্যোতিস্তীর্থ প্রণীত 'করণ-বল্লভ' গ্রন্থের সাহায্যে গণিত। অন্য পঞ্জিকাসকল সূর্য্য-সিদ্ধান্ত-আশ্রিত প্রাচীন করণ-গ্রন্থ অনুসারে গণিত হইয়া থাকে। সূর্য্য-সিদ্ধান্তের গণনার নিয়মগুলি সূত্রাকারে থাকায় তদনুসারে গণনা করা কষ্ট-সাধ্য। এজন্য পরবর্ত্তী পণ্ডিতগণ গণনার সুবিধার জন্য সূর্য্য-সিদ্ধান্তের অনুকূল অনেক 'সারণী' গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। প্রায় তিন শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে রাঘবানন্দ চক্রবর্ত্তী এই রূপ 'সিদ্ধান্ত-রহস্য' ও 'দিন-চন্দ্রিকা' নামক দুইখানি গ্রন্থ ও তৎপরে রামচন্দ্র শর্ম্মা 'দিন-কৌমুদী' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এই সকল গ্রন্থানুসারে বঙ্গদেশে পঞ্জিকা গণনা করা হয়।

শ্রীযুক্ত রামদেব স্মৃতিতীর্থ[১৫] মহাশয় তাঁহার 'পঞ্চাঙ্গ-চন্দ্রিকা' পুস্তকের ভূমিকায় বলিয়াছেন—"দিন-চন্দ্রিকাকার ও দিন-কৌমুদীকার প্রায় সপ্তদশায়নাংশানুসারে চরাদি সাধন করিয়া তিথ্যাদি-গণনার খণ্ড-সমূহ প্রস্তুত করিয়াছেন।" কিন্তু বর্ত্তমানে ত্রয়োবিংশাধিক-অয়নাংশে চরাদির বিশেষ তারতম্য ঘটায় তিন শতাধিক বৎসর পূর্ব্বের রচিত খণ্ডাবলম্বনে তিথ্যাদি গণনা কখনই দৃক্-সিদ্ধ ও বিশুদ্ধ হইতে পারে না।

অন্য পক্ষে, এই সকল প্রাচীন সারণী-গ্রন্থের উপজীব্য সূর্য্য-সিদ্ধান্ত; সূর্য্য-সিদ্ধান্তও এক হাজার বৎসরেরও অধিক পূর্ব্বেকার গ্রন্থ। গ্রহাদির গতি-ইত্যাদি এক কালে গগন-পর্য্যবেক্ষণাদি দ্বারা নির্ণয় করিলে যাহা পাওয়া যায়, তাহা চিরকাল এক-রূপ থাকে না। ২।১ শত বৎসর পরে, এমন কি প্রতি বৎসরেই, কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। এজন্য সূর্য্য-সিদ্ধান্তের নির্ম্মাণ-কালে সূর্য্য-সিদ্ধান্তের গণনা যতটা প্রত্যক্ষের সহিত মিলিত, আজ কাল আর তাহা সেরূপ মেলে না। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে মান-মন্দির-সমূহে যে সকল ঘড়ি ব্যবহৃত হয়, তাহা দ্বারা এক সেকেণ্ড সময়েরও শত ভাগের এক ভাগ সময়ের নির্দ্দেশ হইয়া থাকে। এক হাজার বৎসর পূর্ব্বে হয়ত সেরূপ কোনও সাধন এ দেশে ছিল না। সুতরাং সে সময়ে যদি গগন-পরিদর্শনে ও গণনায় বৎসরে মাত্র ৫০ সেকেণ্ডেরও ভুল হইয়া থাকে, তবে সেই ভুল আজ সহস্রাধিক বৎসরে প্রায় ১৪ ঘণ্টারও উপরে হইয়া যায়। বস্তুতঃ দেখাও গিয়াছে যে, সূর্য্য-সিদ্ধান্ত ও তদনুসারী সারণী গ্রন্থের অনুসারে যখন পূর্ণিমান্ত হইবার কথা, দৃক্‌শোধিত গণনায় তাহার হয়ত এক ঘণ্টা পরে পূর্ণিমান্ত হইল। আমাদের দেশে প্রাচীন সিদ্ধান্তকারগণেরও এ জ্ঞান বিশেষরূপে ছিল যে কিছু কাল পরে পূর্ব্ব-কালীন গণনা-রীতি অনুসারে গ্রহগণকে আকাশে যথাস্থানে পাওয়া যায় না। এজন্য তাঁহারা গগন-পরিদর্শন পূর্ব্বক গ্রহাদির গণনা কালানুযায়ী শোধন করিয়া লইবার উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। যথা—

১৫ 'অভিমত' (১) দ্রষ্টব্য।

"সংসাধ্য স্পষ্টতরং বীজং নলিকাদি-যন্ত্রেভ্যঃ।
তৎসংস্কৃত-গ্রহেভ্যঃ কর্ত্তব্যৌ নির্ণয়াদেশৌ॥"

—অর্থাৎ নলিকা (Telescope—দূরবীক্ষণ-যন্ত্র) আদি যন্ত্রের দ্বারা গগনে গ্রহাদির সন্দর্শন পূর্ব্বক বীজ (আদি-গ্রন্থ ও তদনুকূল সারণী আদি) স্পষ্টরূপে সংসাধিত (সংশোধন) করিয়া, তদনুসরণে সংস্কৃত গ্রহ-স্থিতি আদি হইতে জ্যোতিষিক নির্ণয় এবং তদনুসারে আদেশ (ধর্ম্ম-কর্ম্মের ব্যবস্থা) দিবে।

গত কয়েক শতাব্দী যাবৎ ভারতের ভাগ্যাকাশে যে অন্ধকারময় যুগ চলিয়া আসিতেছিল, তাহাতে জ্যোতিষ আদি সকল শাস্ত্রেরই পুঁথিগত আলোচনা ও কণ্ঠস্থ করা ভিন্ন কোনও প্রকার মৌলিক গবেষণা বা জ্যোতিষ-শাস্ত্রানুযায়ী স্বতন্ত্র গ্রহ-পর্য্যবেক্ষণাদি করিবার সুযোগ হয় নাই। তাই কয়েক শতাব্দীব্যাপী সংস্কার-হীনতায় ভারতীয় জ্যোতিষের গণনা-ফলে অনেক অশুদ্ধি জমিয়া গিয়াছে। ভারতেতর অন্যান্য দেশে, এমন কি এক্ষণে ভারতেও অনেক স্থানে উন্নত ধরণের মান-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সকল মান-মন্দির (Astronomical Observatory) হইতে চন্দ্র, সূর্য্য ও গ্রহগণের যে স্থিতি ও গতি আদি নির্ণীত হইতেছে, তদনুসারে গণনার ফল প্রত্যক্ষের সহিত মিলিয়া যায়। সুতরাং সূর্য্য-সিদ্ধান্তের মূল সূত্রগুলিকে ভিত্তি করিয়া, তিন শতাধিক বৎসর পূর্ব্বেকার 'সারণী' গ্রন্থসমুদায়ের বর্ত্তমান কালোচিত নূতন সংস্কারাদি প্রয়োগ পূর্ব্বক, দৃক্-সিদ্ধির সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যময় সংশোধন করিয়া, তদনুসারে দৃক্শোধিত পঞ্জিকা প্রকাশ করা উচিত।

বাঙ্গালা-দেশ সকল বিষয়েই অগ্রগামী বলিয়া তাঁহার বিশেষ গৌরব ও খ্যাতি আছে; পঞ্জিকা-সংস্কার বিষয়েও ভারতে সর্ব্বপ্রথম, বাঙ্গালী অগ্রদূত "বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকার" প্রকাশকগণ আজ ৫৭ বৎসর হইতে বিশুদ্ধ ও দৃক্শোধিত পঞ্জিকার প্রচার করিয়া বঙ্গের শিক্ষিত ও সমঝদার জনসাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

দৃষ্টির সহিত গণনার ঐক্যই পঞ্জিকার বিশুদ্ধতার এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই কথাই অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ দাস[১৬] বলিয়াছেন—"জ্যোতিষের গণনা যতক্ষণ না যন্ত্রাদির সাহায্যে গ্রহ নক্ষত্রাদি দর্শন দ্বারা সমর্থিত হইবে, ততক্ষণ তাহা স্বীকার করা সমীচীন নহে।" সুতরাং প্রাচীন বা নব্য যে কোনও 'সারণী' গ্রন্থ অনুসারে অঙ্ক কষিয়া যে গণনা পাওয়া যায়, তাহা দৃক্-শোধিত না হওয়া পর্য্যন্ত গ্রহণ করা উচিত নহে। কারণ এতৎপ্রকার দৃক্-সিদ্ধিরহিত অশুদ্ধ পঞ্জিকা অনুসারে চলিলে সকল প্রকার ধর্ম্ম-কর্ম্ম পণ্ড ও জাতকের কোষ্ঠী আদি প্রস্তুতের সকল শ্রম ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। সুতরাং বাঙ্গলার শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ও তাঁহাদের প্রামাণ্যের পথানুগামী জনসাধারণ যদি অশুদ্ধ পঞ্জিকার সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়া বঙ্গীয় বা বঙ্গেতর দেশীয় বিশুদ্ধ পঞ্জিকা গ্রহণ করেন, তবে অচিরেই বাঙ্গলাদেশের সকল পঞ্জিকাকারগণই স্ব স্ব পঞ্জিকার সংস্কার করিয়া বিশুদ্ধ গ্রহস্ফুট ও তিথি, নক্ষত্র, যোগাদিযুক্ত দৃক্-সিদ্ধ আদর্শ পঞ্জিকা প্রকাশ করিতে থাকিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

১৬ 'অভিমত' (২) দ্রষ্টব্য।

কৃষি ও কৃষক

শ্রীঅভীশ্বর সেন, এম্‌-এস্‌সি

ভারতবর্ষের শতকরা প্রায় আশীজন কৃষিজীবী, তবু সারা ভারতের চাষী মিলে দেশের প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্য উৎপন্ন ক'রতে পারে না। আমেরিকার লোকজনদের শতকরা মাত্র ত্রিশজন মিলে দেশের প্রয়োজনীয় সমস্ত খাদ্য শস্য তৈরী করে—এমন কি উদ্বৃত্ত শস্য বাইরেও চালান দেয়। আর আমাদের দেশের এতগুলি লোক, কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত থেকেও দেশের প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্য তৈরী করতে পারচে না—আশ্চর্য্য নয় কি?

আমাদের দেশে গম উৎপন্ন হয় বৎসরে প্রায় নব্বই লক্ষ টন—আমাদের খরচ হয় গড়পড়তা সাড়ে নব্বই লক্ষ টন—কোন রকমে চালিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু চালের বেলা ঘাটতি প্রায় কুড়ি লক্ষ টনের—১৯৪১ খৃষ্টাব্দে এর পরিমাণ প্রায় ষাট লক্ষ টন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রতি বৎসর ব্রহ্মদেশ থেকে বাড়তি চাল এনে ভারতবর্ষের ঘাটতি পূরণ করা হত। ১৯৪৩ সনের দুর্ভিক্ষের অনেকগুলি কারণের মধ্যে একটি হ'চ্চে ব্রহ্মদেশ থেকে এই চাল আসা বন্ধ হ'য়ে যাওয়া।

প্রত্যেক সভ্য দেশেই কৃষির উন্নতির জন্য কৃষি-বিভাগ আছে এবং তাদের কাজ হ'চ্চে দেশের মধ্যে কৃষির উন্নতি করা। এজন্য যে সকল গবেষণার প্রয়োজন, তাদের অধিকাংশ কৃষিবিভাগ থেকেই হ'য়ে থাকে। বিভিন্ন দেশের কৃষি-উন্নতির ইতিহাস প'ড়তে গেলে দেখা যায়, কৃষি উন্নতিতে জাতীয় গবেষণাগারগুলির দাম নিতান্ত কম নয়। আমাদের দেশেও কৃষি-গবেষণাগার প্রবর্ত্তন আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর আগে হ'য়েচে। কিন্তু দেখা গেচে, অনেক ফসলেরই একর পিছু ফসল বাড়েতো নাই-ই বরং অনেক ক্ষেত্রে ক'মে গেচে। ক্যাপিটাল পত্রিকায় (মে, ১৯৪১) প্রশ্ন করা হ'য়েছিল "ভারতবর্ষের প্রাদেশিক কৃষিবিভাগগুলি থেকে প্রতি বৎসর এত নিত্য নূতন ধান্যের উৎপাদন ঘোষণা করা সত্ত্বেও গত দশ বৎসর ধ'রে ধানের একর পিছু ফলন আগেকার চেয়েও কম হ'চ্চে কেন?" প্রশ্নের যে উত্তর দেওয়া হ'য়েছিল সেগুলি খুব সন্তোষজনক নয়।

লোকসংখ্যা শুধু ভারতবর্ষেই বাড়চে না—পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলিতেও বেড়েচে। শুধু ভারতবর্ষের সঙ্গে অন্য দেশগুলির তফাৎ হ'চ্চে যে তারা লোকসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশে খাদ্য সংস্থানের ব্যবস্থাও উন্নত কৃষিবিজ্ঞানের সাহায্যে ক'রেচে; আর আমাদের দেশের প্রয়োজন উপযোগী কৃষিব্যবস্থাগুলি হ'চ্চে না। সারাপৃথিবীর মধ্যে ডেনমার্কে গমের ও স্পেনে ধানের ফলন এত বেশী কেন? আমাদের দেশে যদি ডেনমার্কের মত গম আর স্পেনের মত ধানের ফলন হ'ত তা হ'লে চল্লিশ কোটি লোক কেন, আমাদের বর্ত্তমান জনসংখ্যার পাঁচ গুণ মানুষকে খাওয়াবার মত শস্য আমাদের দেশেই উৎপাদন করা যেত*।

আমাদের দেশের একজন কৃষিরাসায়নিকের

* ডেনমার্কে গমের একর পিছু ফলন হ'চ্চে, ৫০০০ পাউণ্ড। ভারতবর্ষে ৭৫০ পাউণ্ড। স্পেনে একর পিছু চাল উৎপন্ন হয় প্রায় ৪০০০ পাউণ্ড—ভারতবর্ষে মাত্র ৮০০ পাউণ্ড।

মতে ইয়োরোপের দেশগুলির এত বেশী ফলনের কারণ হ'চ্ছে,—

(ক) শিল্পের প্রসার, তার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর রাসায়নিক সারের উৎপাদন ও জমিতে ব্যবহার।

(খ) বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফলগুলি প্রকৃত ভাবে কাজে লাগানো, উন্নত ভূমিকর্ষণ-প্রণালী ও উন্নত বীজের প্রবর্ত্তন।

(গ) শস্যের অনিষ্টকারী পোকামাকড়ের কম প্রাদুর্ভাব।

(ঘ) একই জমিতে বিভিন্ন শস্যের উৎপাদন এবং চাষের সঙ্গে পশুপক্ষী পালনের ব্যবস্থা।

(ঙ) চাষে সরকারী সাহায্য এবং

(চ) চাষের অনুকূল জল হাওয়া।

১৯১৪ সনে লড়াইএর আগে ও পরে ইটালীতে খাদ্যের অবস্থা খুব সঙ্কটজনক ছিল। প্রচুর পরিমাণে গম বিদেশ থেকে আমদানী করা হ'ত; তার টাকা যোগাতে ইটালীর গভর্ণমেণ্টকে সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকতে হ'তো। ১৯২৫ সনে মুসোলিনীর গভর্ণমেণ্ট গম চাষের ব্যাপারটি নিজেদের হাতে নিলেন, ফলে ১৯৩৮ এর মধ্যে ইটালীতে এত প্রচুর গম্ হ'তে লাগল, যে তাকে তার বাইরে থেকে গম আমদানী ক'রতে হ'ল না। বিশেষ ক'রে ১৯৩৮ সনে ইটালীতে এত গম হ'য়েছিল যে ওখানের বৃদ্ধ চাষীরাও নাকি তাদের জীবনে এত গম হ'তে কখনও দেখেনি। সরকারী সাহায্য, দেশের আইন ও কৃষিগবেষণা না সাহায্য ক'রলে ইটালীতে কৃষির উন্নতি এত অল্পদিনে কখনও হ'তে পারতো না।

চাষের অনুকূল জল হাওয়া সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। অনেকে মনে ক'রবেন এর উপরে মানুষের হাত নেই কিন্তু মানুষ প্রকৃতির বাধা কি ক'রে জয় ক'রেচে তার দৃষ্টান্ত বিদেশের বৈজ্ঞানিক গবেষণাগুলিতে প্রচুর পাওয়া যাবে। জার্ম্মাণীর অধিকাংশ প্রদেশের মাটি ঠিক গম চাষের উপযোগী কখনও ছিল না। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের হিসাব নিলে দেখা যাবে ওখানের জমির ফলন অনেক দেশের গমের ফলনের চেয়ে বেড়ে গেচে। জার্ম্মাণী অনেক বড় বড় লড়াই জয় ক'রেচে, কিন্তু প্রকৃতির উপর তার এই জয়ও কম উল্লেখযোগ্য নয়। জার্ম্মাণী ও ইটালীর দৃষ্টান্ত থেকেই বোঝা যায় সমবেত চেষ্টার দ্বারা আপাত দৃষ্টিতে অসম্ভব বাধাগুলিও জয় করা যায়।

ভারতে কৃষকের অবস্থা সুস্থ নয়। যে সকল সাহায্য অন্যান্য দেশের কৃষক, দেশের লোকের কাচে বা কর্তৃপক্ষ থেকে পেয়ে থাকে আমাদের দেশে তারা তা পায় না। আমেরিকার একজন কৃষকের মাসিক আয় মাথা পিছু আশীটাকা, আমাদের দেশের অনেক শিক্ষিত কেরানীর আয়ের চেয়েও বেশী। আমাদের দেশের একজন চাষীর—খুব বেশী ক'রে ধরতে গেলে চাষের জমি থাকে প্রায় বারো বিঘা। এর থেকে যে পরিমাণ শস্য সে উৎপন্ন ক'রতে পারে তাতে সে সমস্ত খরচ ও ঋণ শোধ ক'রে রোজগার করে মাসে প্রায় দশ টাকা। এই দশ টাকা দিয়ে তার সংসারের গরু বাছুরের ও চাষের সমস্ত খরচ তাকে চালাতে হয়। আমাদের দেশে চাষবাসে কত লাভ, তা অনায়াসেই এই হিসাব থেকে বোঝা যায়। তার উপর আছে ঋণভার, সামাজিক খরচ—না খেয়েও যার সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা গরীব চাষীকে মেটাতে হয়। অথচ এই দরিদ্র চাষীর উপরেই জমির উন্নতি ক'রবার ভার দেওয়া থাকে। জমির যে সকল উন্নতি ক'রতে বিদেশে সরকার থেকে প্রচুর সাহায্য করা হয়, সেই বিরাট কার্য্যভার, আমরা আশা করি, আমাদের পরিশ্রান্ত, ঋণগ্রস্ত চাষীকে বইতে। তার ফলে চাষের উপর, চাষীর আশা ক্রমে ক'মে আসচে। চাষীরা

চাষ করার চেয়ে, ষ্টেসনে কুলীগিরি করা, অথবা রাস্তায় রিক্সাটানা বেশী লাভের কাজ ব'লে মনে ক'রচে। একজন লেখক ভারতবর্ষের কৃষক সম্প্রদায় সম্বন্ধে লিখেচেন গত শতাব্দীর শেষভাগ থেকে, কৃষিজীবী জনসাধারণের ⅙ থেকে ⅕ অংশ লোক ভূমিহীন মজুর শ্রেণীভুক্ত হচ্ছে অথবা সর্ব্বহারারূপে নূতন শ্রেণীতে পরিণত হ'চ্চে।

ভারতবর্ষের জমির মাটি নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা অনেকদিন থেকে সুরু হ'য়েচে। আমাদের খাদ্যশস্য গুলির ফলন যখন আমরা অন্যান্য দেশের ফলনের সঙ্গে তুলনা করে দেখি, তখন দেখি ভারতবর্ষের স্থান অনেকের নীচে—ভারতবর্ষের চাষীর মত ভারতের মাটিও তার শেষ অবস্থায় এসে পৌঁচেচে। নীচের তালিকায় আমাদের দেশের গমের ও ধানের ফলনের সঙ্গে ইয়োরোপ ও আমেরিকার ফলনের তুলনা করা হ'য়েচে :—

		গম (পাউণ্ড)	ধান (চাউল) (পাউণ্ড)
ভারতবর্ষ	···	৬৩৬	৮২৯
আমেরিকা	···	৮৪৬	১৪১৩
ইয়োরোপ	···	১১৪৬	৩৩৩৬

আমাদের দেশের কৃষির বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার জন্য দায়ী, জন সাধারণের ও কর্ত্তৃপক্ষের মাটি ও চাষীর উপর অবহেলা ও অমনোযোগ। পশ্চিমের অনুসরণে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য বহুল অর্থব্যয় না ক'রে, এই অর্থ আমাদের চাষীর সাধারণ অবস্থার উন্নতির জন্য খরচ করা হ'লে বোধ হয় অনেক বেশী উপকার হ'ত।

ফসল বাড়াবার জন্য দেশে আন্দোলন উপস্থিত হ'য়েচে। ফসল কারা কি ক'রে বাড়াবে? জল না হ'লে চাষ হয় না, ফসলও বাড়ে না—জলের জন্য চাষীর টাকা নেই। খাদ্যের অভাবে গরু-বলদের অবস্থা শোচনীয়।

ভারতে বর্ত্তমান খাদ্যাভাবের তাড়নায় ফসল বাড়াবার জন্য যে আন্দোলন করা হ'চ্চে তা যদি আন্তরিক হয়, তা হ'লে সকলকার আগে চাষীর সাধারণ অবস্থার উন্নতি, দ্বিতীয়তঃ চাষের জন্য জলের সুবন্দোবস্ত এবং তৃতীয়তঃ বৈজ্ঞানিক কৃষিসম্মত উন্নত যন্ত্রপাতিগুলির ব্যবস্থা ক'রতে হবে। আজ যে কৃষিগবেষণা ও কৃষিব্যবস্থা আমাদের দেশে আছে, তা আছে অতি প্রয়োজনীয় এই তিন প্রাথমিক ব্যবস্থাগুলি বাদ দিয়েই।

আমাদের দেশে অনেক জায়গায় জমির বিলি বন্দোবস্তও চাষীর পক্ষে সুবিধাজনক নয়। চাষের প্রায় সমস্ত খরচই তাকে বহন ক'রতে হয়, অথচ চাষী সারা বৎসর পরিশ্রম ক'রে ফসলের শুধু অর্দ্ধেক অংশই পায়। শুধু জমির মালিক ব'লেই, জমির উন্নতির জন্য কোন কিছু খরচ না ক'রেই ভূস্বামীরা ফসলের অর্দ্ধেক অংশ দাবী করেন। তার উপর চাষীর থাকে খাদ্যশস্যের ঋণ যা সুদশুদ্ধ শুধু শোধ করতে চাষীর নিজের অংশের ফসলেরও অর্দ্ধেক এক বৎসরেই বোধ হয় জমিমালিককে দিতে হয়। চাষীর সাধারণ অবস্থার উন্নতি ক'রতে হ'লে প্রথম কাজ হ'ল তাকে ঋণ থেকে মুক্তি দেওয়া। আমাদের দেশে এমন চাষী খুব কম আছে, যার ঋণ নাই। সারাজীবন ধ'রে এরা ঋণ ক'রে যায়, তার ফলে মাথাতুলে দাঁড়াবার সুযোগ তারা কোন দিনই পায় না। দ্বিতীয় কাজ তাদের মধ্যে শিক্ষার প্রচলন করা। শিক্ষার প্রচলন হ'লে তারা যে নিজেদের উন্নতির দিকে মন দেবে শুধু তাই নয়, বৈজ্ঞানিক কৃষিপ্রণালীগুলির বিস্তার তাদের কাছে সহন হ'য়ে যাবে।

ভারতবর্ষে জলসেচের বন্দোবস্ত মোটেই সন্তোষজনক নয়। দুই একটি প্রদেশ ব্যতীত জলসেচের খুব ভাল বন্দোবস্ত নাই। বিভিন্ন প্রদেশের চাষের জমির শতকরা যত ভাগ

জলসেচ দ্বারা চাষ করা হয় নীচে তার একটা মোটামুটি হিসাব দেওয়া হ'ল :—

প্রদেশ	চাষের জমির শতকরা যত খানিতে জলসেচের বন্দোবস্ত আছে
আজমীর	২৯
আসাম	১০
বাংলা	৮
বিহার	২৬
বোম্বাই	৩
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	৫
কুর্গ	৩
দিল্লী	৩৯
মাদ্রাজ	২৭
উত্তরপশ্চিম সীমান্ত	৪৯
উড়িষ্যা	২১
পাঞ্জাব	৫৯
সিন্ধু	৮০
যুক্তপ্রদেশ	৩৪

দেখা যাচ্চে বাংলা, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ ইত্যাদি প্রদেশগুলিতে চাষের জন্য জলের ভালো বন্দোবস্ত নাই। এ প্রদেশগুলিতে ফসলের ফলন বাড়াতে হ'লে জলের জন্য নূতন অনেক খাল কাটাবার প্রয়োজন খুব বেশী।

ভারতে অধিকাংশ চাষী বৃষ্টির উপরে চাষের জলের জন্য নির্ভর করে। একজন পণ্ডিত ব'লেচেন, ভারতবর্ষে দশ বৎসরের মধ্যে খালি এক বৎসর মাত্র চাষের উপযোগী বৃষ্টি ও আবহাওয়া পাওয়া যায়। হিসাব ক'রে দেখা গেচে ভারতবর্ষে গড়পড়তা শতকরা ২৫ ভাগ চাষের জমির জন্য জলসেচের বন্দোবস্ত আছে—তাও আবার সরকারী বেসরকারী মিলে। দেশে চাষ বাড়াতে হ'লে জলের বন্দোবস্ত পাকা ক'রে নিতে হবে—বৃষ্টির জল অনিশ্চিত। তার উপর নির্ভর করে দেশের এতগুলি লোকের অন্নসংস্থানের ভার নেওয়া যায় না।

আমাদের দেশের লাঙল ও অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতিগুলি পুরাণো ধরনের, কাজ তাদের থেকে ভালো পাওয়া যায় না। তাই এতগুলি লোককে কৃষিকার্য্য নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়। অষ্ট্রেলিয়াতেও আগেকার কৃষি ব্যবস্থার জন্য পাঁচজন লোকের একটি পরিবারে চারজন লোককে চাষ নিয়ে সারা বৎসর ব্যস্ত থাকতে হ'তো। সেই জায়গায় আজ উন্নত কৃষিযন্ত্রপাতির ব্যবহারের ফলে একজন লোকেই সেই সমস্ত কাজ ক'রতে পারে। সংসারের আর চারজন লোক ব্যবসাবাণিজ্যে বা অন্য কাজে মন দেয়। কলের লাঙল বোধ হয় আমাদের দেশে এখনও অচল, কেননা দু'দশ বিঘা টুকরা জমিগুলির উপর কলের লাঙল চালানো কখনই লাভজনক হবে না। কিন্তু হয়তো একদিন—যখন আমাদের চাষীরা দশজনে মিলেমিশে কাজ ক'রতে শিখবে, যখন টুকরা টুকরা ছোট জমিগুলি বড় বড় টুকরায় পরিণত হবে তখন কলের লাঙলের প্রয়োজন হবেই হবে। বর্ত্তমানে জলসেচের জন্য নূতন যন্ত্রগুলি, এমন কি লাঙলের উন্নত পরিবর্ত্তনগুলির প্রবর্ত্তন একান্ত দরকার।

দেশের কৃষির সঙ্গে কৃষকও আন্তরিকভাবে সংযুক্ত। ভারতবর্ষের কৃষিগবেষণা থেকে তাকে এতদিন বাদ রাখাই হ'য়েচে। তাই, অনেক বই লেখা হ'লেও, অনেক মূল্যবান তথ্য সংগৃহীত হ'লেও কোন ফসলই বাড়বে না। দেশের প্রয়োজনের কাছে এগুলির মূল্য কতটুকু?

ভারতবর্ষের কৃষিপরিকল্পনার মধ্যে কৃষকের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। কৃষির উন্নতি কোন দেশেই কৃষককে বাদ দিয়ে হয়নি। আমাদের দেশের কৃষিপরিকল্পকরা, কৃষিগবেষণার প্রবর্ত্তনকারীরা আজ সে কথা কি মনে রাখবেন?

উষসী

শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ

মেঘ-সিন্ধু-পারে আজি, হে মোর উষসী !
আলোর জোয়ার নব উঠুক্ উলসি'।
অকূল তমসা-মাঝে খোল খোল দ্বার,
প্রভাতের বার্তা ল'য়ে উরহ আবার।
অসম্বৃত কৃষ্ণ-বাস করো সম্বরণ,
রক্তপট্টবাসে রচি' নব আস্তরণ,
দিগন্ত-সি থিতে আঁকো সিন্দুরের লেখা,
কৃষ্ণ-মেঘ-ছিন্ন-ভিন্ন জলদর্চি-রেখা !
পুড়ে যাক্—উড়ে যাক্—পুঞ্জ পুঞ্জ ঘোর
ধরণীর মেঘায়িত শান্ত-আঁখি-লোর।
শৈল-শির-বেলাভূমে করো পদার্পণ,
শাল-বীথি আন্দোলিয়া বাজুক্ কঙ্কণ।
ছিন্ন-বাঁধা আকাশের অরুণ-বন্দীর,
শুষ্ক পত্রে পত্রে তা'র বাজুক্ মঞ্জীর !
শ্যামঘন পল্লবেতে গলিয়া গলিয়া
আলোক-অলকনন্দা পড়ুক্ ঝরিয়া।
জ্যৈষ্ঠ শেষে সিক্ত মাঠে নবাঙ্কুর-দলে,
চিরন্তন-আশীর্বাদে ঘিরে পলে পলে,
ধরণীর পূর্বদ্বারে লোকাতীতা অয়ি !
খোল খোল খোল দ্বার হে উৎসবময়ী !

নিঃশেষ ফলন আজি আম্র-শাখে শাখে
আসন্ন-আষাঢ় বাণী দিকে দিকে জাগে—
ঘনঘোর দুর্দিনের শুনি' আগমনী,
বজ্রে বজ্রে তারি' বার্তা ওঠে রণরণি' !

শ্যামায়িত বনচ্ছায়ে পুলকে শিহরি',
পিয়াল-কদম্ব-তরু ওঠে থরথরি'।
অকস্মাৎ সঞ্চারিয়া চামেলী-সুরভি,
প্রভাতে উঠিছে বাজি' করুণ পূরবী।
নেমে আসে আঁখিপুটে স্বপন-আবেশ,
নীলাঞ্জন-পুঞ্জ-ঘন কল্পনার রেশ !
খরতর খড়্গ হানো নির্দয় আঘাতে,
দুরান্তরে লুপ্ত হোক্ রক্ত-নেত্র-পাতে,
এ কল্পনা-ঘুমঘোর তন্দ্রাতুর প্রাণ,
কঠোর-কঠিন-স্পর্শে হোক খান্ খান্।
ব্যাপিয়া অনন্ত লোক গগন-অঙ্গন
সঞ্চারিত কর তব আলোক স্পন্দন।
মেঘের জড়তা দেবী চূর্ণ করো তুমি
আলোকের মন্দাকিনী বিশ্ব হৃদি চুমি'
জাগায়ে তুলুক্ নব—জীবন উচ্ছ্বাস
ভেঙে যাক্ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব মিথ্যা-মোহ-পাশ।

প্রণমি' তোমারে দেবী, জয় তব জয় !
ছিন্ন ভিন্ন করি' দিলে মেঘের সংশয় !
পূর্বাশার তীরে তব নব-অভ্যুদয়—
সহাস করুণা-মূর্তি মূর্ত বরাভয় !
প্রভাতের জয়-যাত্রা এই শুভ-ক্ষণে
শুরু হ'ল যুগান্তের পরম-লগনে !
দিগন্তরে পলাতকা তমসা-ক্রন্দসী,
নব সূর্যালোকে জাগো হে মোর উষসী !

জাতি

অধ্যাপক শ্রীদিনেশ চন্দ্র গুহ, এম্‌-এ, কাব্য-ন্যায়-তর্ক-বেদান্ততীর্থ

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের সহিত যাঁহাদের অল্প মাত্রও পরিচয় আছে তাঁহারা 'জাতি' জিনিষটা কি তাহা অবশ্যই জানেন। অবশ্য সমস্ত দার্শনিক সম্প্রদায়ই যে জাতিকে স্বীকার করিয়াছেন তাহা নহে। তাহা হইলেও অনেকেই জাতিসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায়বৈশেষিকসম্প্রদায়ই বিশেষরূপে জাতিকে স্বীকার করিয়াছেন। অদ্বৈতবেদান্তি-সম্প্রদায় স্বীকার করেন নাই। এইরূপে নানা মতভেদ জাতি সম্বন্ধে প্রচলিত আছে।

গৌতম মুনি ন্যায়দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকে ৬৯ সূত্রে জাতির পরিচয় দিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে যাহা সমান বুদ্ধি উৎপন্ন করে এমন পদার্থবিশেষ জাতি। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন তাহার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, যে বস্তুর সাহায্যে আমরা পরস্পর পৃথক পদার্থকে একরূপ বলিয়া বুঝিতে পারি, যাহার দ্বারা বহু পদার্থ পরস্পর হইতে ব্যাবৃত্ত হয় না অর্থাৎ তাহারা পরস্পর ভিন্ন এইরূপ বুঝা যায় না, যে পদার্থের সাহায্যে অনেক বস্তুর বিষয়ে একটী জ্ঞান হইতে পারে, তাহাই জাতি। যেমন বৃক্ষগুলি পরস্পর ভিন্ন হইলেও যাবতীয় বৃক্ষের মধ্যে এমন কোন ধর্ম্ম থাকে যাহা সমস্ত বৃক্ষেই একভাবে বর্ত্তমান। সেই সাধারণ ধর্ম্মকে জানিলেই সেই জ্ঞানের বিষয়ীভূত সাধারণ ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া সমস্ত বৃক্ষকে অভিন্ন বলিয়া বুঝা যায়। বৃক্ষের এই সাধারণ ধর্ম্মের নামই বৃক্ষগতজাতি অর্থাৎ বৃক্ষত্ব। এইরূপ অপরাপর পদার্থের মধ্যে যে সমস্ত জাতি স্বীকার করা হয় তাহাও সেই সমস্ত পদার্থের বাচক শব্দের সহিত ভাববাচ্যে বিহিত "ত্ব" প্রত্যয় লাগাইয়া সাধারণতঃ বুঝান হইয়া থাকে, যেমন ঘটত্ব, গোত্ব, অশ্বত্ব ইত্যাদি।

মহর্ষি গৌতম জাতির লক্ষণ যেরূপ বলিয়াছেন তাহাতে কাহারও কাহারও হয়তো ভ্রম হইতে পারে যে যাহা সমান বুদ্ধি উৎপন্ন করে তাহাই জাতি। বস্তুতঃ সূত্রকার গৌতম মুনির তাহা বক্তব্য নহে। তাঁহার অভিপ্রায় এই যে যাহা জাতিপদার্থ অবশ্যই তাহার বিভিন্ন বস্তুসমূহের মধ্যে সমান বুদ্ধি উৎপন্ন করিবার যোগ্যতা আছে।

পরবর্ত্তী ন্যায়বৈশেষিকসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ বলিয়াছেন যে যাহা নিত্য এবং অনেক বস্তুতে সমবায় নামক সম্বন্ধবিশেষকে অবলম্বন করিয়া থাকে তাহাই জাতি। সমবায় একটা সম্বন্ধ-বিশেষের নাম। এই সম্বন্ধকে অবলম্বন করিয়া অবয়বী পদার্থ তাহার অবয়বে থাকে, জাতি-পদার্থ তাহার আশ্রয় ব্যক্তিগুলির মধ্যে থাকে, গুণ এবং ক্রিয়া দ্রব্যপদার্থের মধ্যে থাকে। এই সম্বন্ধ ন্যায়মতে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। বৈশেষিকগণ সমবায়সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন না। যাহা হউক, এই জাতিপদার্থ বহু পদার্থের মধ্যেই থাকে, একটী বস্তুর মধ্যে থাকে না। দার্শনিকগণ ব্যক্তির অভেদ, তুল্যত্ব, সাঙ্কর্য্য, অনবস্থা, স্বরূপহানি এবং অসম্বন্ধ এই কয়েকটী জিনিষকে জাতির বাধক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এইগুলি একরূপ পারিভাষিক সংজ্ঞা। প্রবন্ধের বিস্তার এবং অনাবশ্যক কাঠিন্যের ভয়ে ইহার আলোচনা করিলাম না। অনুসন্ধিৎসু পাঠক দিনকরী এবং রামরুদ্রী নামক টীকাসহ ভাষাপরিচ্ছেদগ্রন্থ পাঠ করিলেই এসম্বন্ধে বহু কথা জানিতে পারিবেন।

এই জাতিপদার্থ প্রত্যক্ষতঃ জানিতে পারা যায় ইহাই দার্শনিকদের সিদ্ধান্ত। ইহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ এবং ত্বগিন্দ্রিয় জন্য প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। অবশ্য এই জাতি যদি প্রত্যক্ষ যোগ্য বস্তুর মধ্যে থাকে তবেই ইহার প্রত্যক্ষ হয়, অন্যথা নহে। যেমন গরুর মধ্যে যে গোত্ব আছে তাহা আমরা চক্ষুর দ্বারা দেখিতে পারি; আবার চক্ষু বন্ধ করিয়া হাত দিয়া স্পর্শ করিয়াও জানিতে পারি।

সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্র অনন্ত রত্নের আকর। দার্শনিকদিগের যে সমস্ত বিষয়ে চিন্তা হইয়া থাকে সে সমস্ত বিষয়ই সংস্কৃত দর্শনের কোন না কোন গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সেই সমস্ত বিস্তারিত আলোচনার অবতারণা করিলে এই জাতীয় প্রবন্ধ লেখার উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয় বলিয়া আমরা জাতি সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিলাম না। অনুসন্ধিৎসু পাঠক ন্যায়কন্দলী, প্রশস্তপাদভাষ্য প্রভৃতি পাঠ করিলে এবিষয়ে অনেক কথা জানিতে পারিবেন।

রাসায়নিক মৌলিকদের শ্রেণিবিভাগ

অধ্যাপক শ্রীসুবর্ণকমল রায়, এম্-এস্‌সি

প্রত্যেক মৌলিক পরমাণুর ওজন নির্দ্দিষ্ট আছে, ওজনের ক্রমানুপাতে (লঘুতম হইতে গুরুতম) উহাদের সাজাইলে হাইড্রোজেন হয় লঘুতম ও ইউরেনিয়াম হয় গুরুতম। ১৮৭১ খৃঃ ডোবেরেনার (Dobereiner) গবেষণাক্ষেত্রে দেখিলেন যে পরমাণুদের ওজনের তারতম্যে গুণাগুণের তারতম্য হয়। তিনি ওজন হিসাবে দাঁড় করাইয়া দেখিলেন মৌলিকদের মধ্যে সুন্দর শ্রেণী বিভাগ চলে। কতকগুলি মৌলিক যেন একই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। যেমন পটাসিয়াম (Potassium), সডিয়াম (Sodium), লিথিয়াম (Lithium) প্রভৃতি একই শ্রেণীতে ভুক্ত হইয়াছে। ক্লোরিন (Chlorine), ব্রোমিন (Bromine), আইডিন (Iodine) প্রভৃতি অপর একটা পরিবারের সভ্য। গুণাগুণের দিক দিয়া পারিবারিক সাদৃশ্য এত বেশী যে শ্রেণী বিভাগ না করিয়া উপায় নাই। এ ভাবে ওজনের সঙ্গে গুণ পর্য্যালোচনদ্বারা মৌলিকগুলিকে সুস্পষ্ট বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় কিনা সেদিকে বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ১৮৬৪ খৃঃ ইংরেজ বৈজ্ঞানিক নিউল্যাণ্ড (Newland) মৌলিকগুলিকে ওজন অনুসারে শ্রেণিবদ্ধ করিতে চেষ্টিত হন। তিনি নিম্নলিখিত ভাবে উহাদের সাজাইয়াছিলেন :

লিথিয়াম	বেরিলিয়াম	বোরণ	কার্ব্বন
সডিয়াম	ম্যাগনেসিয়াম	এলুমিনিয়াম	সিলিকন্

নাইট্রোজেন	অক্সিজেন	ফ্লোরিন
ফস্ফরস্	সল্‌ফার	ক্লোরিন

উক্ত পঙ্‌ক্তি দুইটীর মধ্যে লিথিয়াম ওজনে সর্ব্ব লঘিষ্ঠ, উহার পরে অপরগুলিকে, ওজন হিসাবে সাজান হইয়াছে। ক্লোরিনের পরবর্ত্তী মৌলিক সোডিয়াম কেন লিথিয়ামের শ্রেণী পাইল ইহাই জিজ্ঞাস্য। দেখা গিয়াছিল যে ক্লোরিন পর্য্যন্ত যে সাতটী মৌলিক সারি দিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাদের মধ্যে গুণে কোন সাদৃশ্য নাই, কিন্তু সডিয়ামের সঙ্গে লিথিয়ামের সাদৃশ্য খুব পরে দেখা গেল। ম্যাগনেসিয়ামের গুণ বেরিলিয়ামের মত ; এলুমিনিয়াম, সিলিকন, ফস্ফরস্ সল্‌ফার, ক্লোরিন প্রত্যেকে উক্ত নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিয়া ঊর্দ্ধতন মৌলিকের সঙ্গে সুন্দর চরিত্রগত সাদৃশ্য রক্ষা করিয়াছে। এই অদ্ভুত মিলন দেখিয়া অনেকেই অভিভূত হইলেন। ফ্লোরিনের নীচে ক্লোরিন ঠিক একটি সহোদর।

নিউল্যাণ্ড এই সুন্দর শ্রেণী বিভাগ কেমিক্যাল সোসাইটীকে জানাইয়াছিলেন কিন্তু তদানীন্তন পণ্ডিতগণ ইহাতে দৃষ্টিপাত করা যুক্তিযুক্ত মনে করেন নাই।

এ সময় বিখ্যাত রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক মেনডিলিফ (Mendeleef, ১৮৩৪—১৯০৭) ও জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক লোথার মায়ার (Lother Meyer, ১৮৩০—১৮৯৭) প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে ঐরূপ আর একটী শ্রেণী বিভাগ তালিকা প্রস্তুত করেন। মেনডিলিফের কাজ অনেক পরিস্কার, সহজবোধ্য ও শুদ্ধ হওয়ায় অনেকেই উহা গ্রহণ করেন। নিউল্যাণ্ডের দুইটী পঙ্‌ক্তি প্রায় নিখুঁত হইয়াছিল, কিন্তু তৃতীয় সারিতে পৌছিয়া তিনি গণ্ডগোলে পড়িয়াছিলেন। মেনডিলিফ বলিলেন, নিউল্যাণ্ড ঠিকই রাস্তা ধরিয়াছেন ; তৃতীয় পঙ্‌ক্তির মধ্যস্থলে দুই একটী মৌলিকের পরিচয় অজ্ঞাত থাকায় জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি ইহাও বলিলেন—ঐ স্থানগুলি নূতন মৌলিক আবিষ্কারদ্বারা শীঘ্রই পূর্ণ হইবে

কিন্তু তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম পঙ্‌ক্তিতে সতেরটী করিয়া মৌলিক থাকিবে, সাতটীতে চলিবে না। মেনডিলিফ মৌলিকদের গুণ পরীক্ষা করিলেন এবং ওজনের সঙ্গে অনুক্রম রক্ষা করিয়া সুন্দর একটি তালিকা প্রস্তুত করিলেন। ওজনবৃদ্ধির তালে তালে গুণের সমতা রক্ষা করিয়া সাজাইয়া দেখা গেল যাহার যে শ্রেণী বা পরিবার পড়িলে যে ভাবধারা রক্ষা হয় সে প্রায় সেখানে পড়িয়াছে। প্রথম দুইটী পঙ্‌ক্তিতে সাতটী করিয়া মৌলিক আছে। লিথিয়াম ক্ষারধাতু হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ধাতুত্ব কমিতে কমিতে এবং উপধাতুত্ব বাড়িতে বাড়িতে একেবারে উৎকৃষ্টতম উপধাতু ফ্লোরিনে পৌঁছিয়াছে। দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতেও তদ্রূপ। মাঝামাঝি স্থানের মৌলিকগুলি একদম ধাতুও নয় উপধাতুও নয়, দুয়েরই গুণসমন্বিত। প্রত্যেকটী অনুভূমিক (horizontal) পঙ্‌ক্তিকে পিরিয়ড (period) এবং খাড়া বা উল্লম্ব (vertical) পঙ্‌ক্তিকে গ্রুপ বা পরিবার বলা হয়। সাধারণতঃ প্রত্যেক পরিবারের মৌলিকগুলি সমধর্ম্মী; ঊর্দ্ধতমটী লঘুতম এবং নিম্নতমটী গুরুতম। নিম্নতম মৌলিকগুলি প্রায়শঃ ধাতুদের গুরু অবতার। এই শ্রেণী বিভাগের মধ্যে মিলনশক্তি বা ভ্যালেন্সির বিশেষ অভিব্যক্তি আছে। প্রথম পরিবারের হাইড্রোজেন—ভ্যালেন্সি ১, দ্বিতীয়টীর ২, তৃতীয়টীর ৩, চতুর্থটীর ৪, কিন্তু ইহার পরে পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম পরিবারের মিলনশক্তি যথাক্রমে ৫, ৬, ৭ না হইয়া ৩, ২, ১ হইয়াছে। কিন্তু বন্ধনশক্তির মানদণ্ড যদি অক্সিজেন হয় তবে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম পরিবারের ভ্যালেন্সি যথাক্রমে ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ হইবে।

হাইড্রোজেনের স্থান নিয়া নানাপ্রকার বিতর্ক আছে। পূর্ব্ববর্ণিত মৌলিক তালিকায় কোন পরিবারেই ইহা সুষ্ঠুভাবে বসিতে পারে না। প্রথম শ্রেণী ও সপ্তম শ্রেণীর সঙ্গে ইহার কতকগুলি মিল আছে। ইহার হাত একটি এবং নিম্নতম ওজন বহন করে বলিয়া ইহার জন্য একটী আলাদা অনুভূমিক পঙ্‌ক্তি করিয়া প্রথম শ্রেণীতে অথবা সপ্তম শ্রেণীতে বসাইবার ব্যবস্থা করা আছে। প্রকৃত পক্ষে একটা সম্পূর্ণ পঙ্‌ক্তির মধ্যে হাইড্রোজেন একা। হাইড্রোজেনের মধ্যে কতকগুলি গুণ আছে যাহা দ্বারা ইহাকে সমস্ত মৌলিক জগতের প্রতিনিধি বলা যায়।

মেনডিলিফের শ্রেণিবিভক্ত তালিকা বৈজ্ঞানিকদের অত্যন্ত সহায় হইয়াছে। ভুলচুক সকলেরই থাকে; এ ক্ষেত্রেও অনেক ত্রুটি ছিল, পণ্ডিতদের সাধনায় তাহা ক্রমেই দূরীভূত হইতেছে। রাশিয়ান সাধকের এই মহনীয় দান রসায়নের একটী ভিত্তিস্তম্ভ। তালিকাটী দেখিয়া আমরা অনায়াসে বলিতে পারি কোন্ কোন্ ঘর খালি আছে, এবং কোন্ কোন মৌলিক এখনও আবিষ্কৃত হওয়া উচিত। শূন্যস্থান পর্য্যালোচনা দ্বারা আজ পর্য্যন্ত অনেকগুলি মৌলিক আবিষ্কৃত হইয়া যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই তালিকা দ্বারা রসায়নের পাঠ অত্যন্ত সহজ হইয়া পড়িয়াছে। এক শ্রেণীর একটি মৌলিকের চরিত্র অবগত হইলে অপরগুলির চরিত্রও অপরিজ্ঞাত থাকে না। আর একটি সুবিধা এই যে যদি কোন মৌলিক পরমাণুর ওজন অনির্দ্দিষ্ট থাকে তাহা হইলে এই তালিকায় স্থান নির্দ্দেশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উহার ওজন স্থিরীকৃত হইয়া যায়।

মৌলিক পরমাণুদের যেমন সকলেরই কিছু না কিছু মিলন ক্ষমতা আছে তদ্রূপ কিছুদিন পরে কয়েকটী মৌলিক আবিষ্কৃত হয় যাহাদের মিলনেচ্ছা একেবারেই নাই। এজন্য মেনডিলিফের তালিকায় তাহাদিগকে শূন্যগ্রুপ নামে একটী ভিন্ন পরিবারে রাখা হইয়াছে। এই পরিবারের মৌলিকগুলির সকলেই গ্যাস এবং এক প্রকার গুণবিশিষ্ট। বিখ্যাত ইংরেজ বৈজ্ঞানিক র‍্যামজে (Ramsay, ১৮৫২—১৯১৬) এ সমস্ত মৌলিক আবিষ্কার করেন। ইহারা সকলেই বায়ুতে বর্ত্তমান, কিন্তু পরিমাণে অতি নগণ্য। আরগন্ (Argon), নিয়ন (Neon) ক্রিপটন (Krypton) ইত্যাদি উহাদের নাম। এ সমস্ত মৌলিকের আকাঙ্ক্ষা বা হাত নাই বলিয়া বন্ধন-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয় না। কিন্তু উহাদের অনেকেই কিছু না কিছু উপকার সাধন করে।

শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের কথা

স্বামী সিদ্ধানন্দ

লাটু মহারাজের ঘটনাবহুল জীবনের অধিকাংশ কথাই স্মরণযোগ্য। তন্মধ্যে কয়েকটি কথা আজ ধর্মপিপাসু পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি :

শ্রীশ্রীমার প্রতি লাটু মহারাজের ফল্গুধারার মত নিরবচ্ছিন্ন গভীর প্রেম-প্রবাহ অনেকেই অবগত নহেন। তিনি দক্ষিণেশ্বরে বাসকালে শ্রীশ্রীমায়ের কাজকর্মে সাহায্য করিয়া মাতৃভক্তির নিদর্শন দেখাইলেও শেষজীবনে বলরাম-মন্দিরে ও কাশীধামে অবস্থানকালে মায়ের বিশেষ কোন খবর নিতেন না বলিয়া অনেকেই শ্রীশ্রীমার প্রতি তাঁহার অন্তঃসলিলা ভক্তির কথা অনুভব করিতে পারেন না। কোন ভক্ত এবিষয়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, "আমার মা চিন্ময়ী; আমি সদাসর্বদা তাঁর দর্শন পাই। মা কৃপা করে অহরহঃ আমায় সূক্ষ্মভাবে দর্শন দিচ্ছেন; আমাকে আর তাঁর স্থূল শরীর দেখতে হয় না।"

শ্রীশ্রীমাকেও কোন ভক্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "লাটু মহারাজ আপনাকে দেখতে আসেন না কেন? আপনি বাগবাজারে, আর তিনি রামকান্ত বসু ষ্ট্রীটে বলরাম-মন্দিরে। এত নিকটে রয়েছেন অথচ দেখতে আসেন না কেন?" ইহা শুনিয়া মা ঈষৎ হাসিয়াছিলেন মাত্র। মা যে জগজ্জননী! তিনি সকলের মনের ভাব বোঝেন। লাটু মহারাজের সহিত তাঁহার নিত্য দর্শন হইত চিন্ময়ীরূপে—ইহা সাধারণ মানুষের বোধগম্য নহে। সাধন ভজনের দ্বারা মন সূক্ষ্মতত্ত্বের ধারণা করিতে সক্ষম হইলে এ সব বোঝা যায়।

লাটু মহারাজ শ্রীশ্রীমার প্রতি ' একটু অবহেলা বা কর্তব্যহীনতাও দেখিতে পারিতেন না। একবার জনৈক ভদ্রলোকের স্ত্রী কাশীধামে অদ্বৈতাশ্রমে দুর্গাপূজা করেন। সেবার তিনি শ্রীশ্রীমাকে রীতিমত আমন্ত্রণ করেন নাই বা পূজার বিষয়ে তাঁহার অনুমতি নেন নাই। শ্রীশ্রীমাকে বাদ দিয়া তাঁহারা শ্রীশ্রীমহারাজকে কাশীধামে আনিবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন। মহারাজকে লইয়া কাশীধামে দুর্গোৎসবে খুব আনন্দ করিবেন এইরূপই তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল। দৈবক্রমে শারীরিক অসুস্থতার জন্য কাশীধামে মহারাজের আগমন সম্ভব হইল না। পূজা অতীত হইয়া যাইবার কিছুদিন পরে মহিলাটি একদিন খোকা মহারাজকে সঙ্গে লইয়া লাটু মহারাজকে দর্শন করিতে আসিলেন। কিন্তু লাটু মহারাজ তাঁহাদের আসিবার পূর্ব হইতেই সমস্ত শরীর বস্ত্রদ্বারা আবৃত করিয়া শুইয়া রহিলেন। দুই তিন ঘণ্টা তাঁহারা অপেক্ষা করিয়া লাটু-মহারাজের কোন সাড়া না পাইয়া ফিরিয়া গেলেন। মহিলাটি মাতৃহীন পূজার আয়োজন করায় লাটু মহারাজ দুঃখিত হইয়াছিলেন। সেজন্য তাঁহার সহিত দেখা করিলেন না। পরে বলিয়াছিলেন, "মার অনুমতি না নিয়ে দুর্গাপূজার আয়োজন! একি অসম্ভব ব্যাপার! যাঁর পূজা তাঁকেই বাদ! কি মূর্খতা!······—র বুঝি খুব পয়সা হয়েছে! টাকা দিয়ে বুঝি গুরু কিনতে চায়! কই, গুরুকে আনতে পারলো? টাকা দিয়ে কখনো গুরু কেনা চলে না।"

ইংরাজি সন ১৯১২ সাল। তখন শ্রীশ্রীমা কাশীধামে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন। লাটু মহারাজ ও

আমরা কয়েকজন একত্রে সেদিন বাবা বিশ্বনাথ ও মা অন্নপূর্ণাকে দর্শন করিতে যাইতেছিলাম, পথিমধ্যে হঠাৎ লাটু মহারাজ বলিয়া উঠিলেন, "সাক্ষাৎ মা যে আছেন রে! চল তাঁকে আগে দেখে আসি।" এই বলিয়া তিনি দত্ত মহাশয়ের বাড়ীর দিকে চলিতে আরম্ভ করিলেন এবং যথাসময়ে আমরা তাঁহার সহিত শ্রীশ্রীমার দর্শন পাইলাম। শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিয়া তাঁহার হৃদয়ে ভক্তিসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। তাঁহার সমস্ত দেহ দিব্যভাবে পূর্ণ হইল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; ভাবাবেশে কাঁপিতে লাগিলেন। তখন তিনি যে শ্রীশ্রীমাকে সাক্ষাৎ জগন্মাতা বলিয়া জ্ঞান করিতেন সে বিষয়ে আমাদের আর কাহারও কোন সন্দেহ রহিল না। পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া তিনি শ্রীশ্রীমাকে বলিলেন, "তুমি কাশীতে কিছুদিন থাক, তুমি থাক।" তারপর তিনি নীচে নামিয়া আসিলেন এবং শ্রীশ্রীমার নিকট হইতে প্রসাদ আনিবার জন্য আদেশ করিলেন। প্রসাদ গ্রহণ করিয়া আমরা বিশ্বনাথ দর্শনে গিয়াছিলাম।

লাটু মহারাজ প্রায়ই বলিতেন, "মেয়ে, জগৎ দিলে খেয়ে।" এই কথাতে অনেকে বিশেষতঃ অনেক স্ত্রীলোক মনে করিতে পারেন যে তিনি স্ত্রীজাতিকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, কিন্তু তাহা নহে। কেন না, তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি "এক এক মেয়ে ঘরে আসে আর ঘর ধনধান্যে ভর্তি হয়ে যায়, আর এক একজন ঘরে এলে ঘর ভেঙ্গে যায়। কি জানিস্—বিদ্যা অবিদ্যা স্ত্রী আছে।" তাই 'মেয়ে' কথাটি তিনি অবিদ্যা শক্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন, বিদ্যাশক্তির অবমাননা তিনি কখনও করেন নাই।

লাটু মহারাজ স্ত্রীলোকদের চরিত্র গঠনের উপর বিশেষ জোর দিতেন। স্ত্রীভক্ত দেখিলেই তিনি বলিতেন, "তোমরা সীতা, সাবিত্রী, গার্গীকে আদর্শ কর। মাকে আদর্শ কর। মা আমার ভূত-ভবিষ্যৎ সব জানেন। দেখছ না, মাকে জানবার জন্য আমি কত তপস্যা করছি। মা কি আমার সোজা জিনিষ! তোমরা মাকে আদর্শ কর। তা হলে তোমাদের কল্যাণ হবে।······তোমরা ভগবৎ জ্ঞানে স্বামী-সেবা করো। 'পতি পরম গুরু' অর্থাৎ ঈশ্বর স্বয়ং—এই কথা মনে রেখো। কেবল স্বামিসেবার দ্বারাও ঈশ্বর লাভ হয় যদি ঠিক ঠিক করতে পার।" তিনি অবাধে স্ত্রী-পুরুষের মেলামেশা আদৌ পছন্দ করিতেন না। সাধনপথে সকলকে আত্মস্থ থাকিতে নির্দেশ করিতেন। স্ত্রীলোকদিগকেও তিনি পুরুষদের সহিত মেলামেশা করিতে নিষেধ করিতেন।

লাটু মহারাজ প্রায়ই বলিতেন, "আশ্রিতকে আশ্রয় দাও, অভয় দাও।" একবার বিমল নামে জনৈক বালক ভক্ত আট বৎসর বয়সে টাইফয়েড রোগে মারা যায়। লাটু মহারাজকে সে বলিত, "আপনি তো সাক্ষাৎ মহাবীর!" শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবি মাথায় রাখিয়া সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিল, ছেলেটির ঠাকুরমা শোকে বিহ্বলা হইয়া প্রাণের জ্বালায় কাশীধামে চলিয়া আসেন এবং লাটু মহারাজের নিকট অনেক কান্নাকাটি করিয়া শান্তি প্রার্থনা করেন। লাটু মহারাজ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "বিমল চলে গেছে; তোমার কি দুঃখ হয়েছে? তার চেয়ে অনেক বেশী দুঃখ আমার হয়েছে। যাও, গঙ্গায় স্নান করে এস।" তাঁহার আদেশানুযায়ী ভদ্রমহিলা গঙ্গায় স্নান করিতে গেলেন এবং স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিবার পর এক অভূতপূর্ব শান্তি অনুভব করিতে লাগিলেন। তিনি তাহা প্রকাশ করিয়া সকলকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু সে শান্তির বর্ণনা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিলেন না। এমনভাবে লাটু মহারাজ তাঁহার জীবন ভরিয়া কত যে শোকার্ত ত্রিতাপদগ্ধ নরনারীকে আশ্রয় দিয়া অজ্ঞাতে শান্তিদান করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। কেহ বিপদে পড়িয়া তাঁহার আশ্রিত হইলে তিনি

সর্বতোভাবে তাঁহাকে সাহায্য করিবার চেষ্টা করিতেন। আর আমাদের বলিতেন, "আশ্রিতকে আশ্রয় দাও, অভয় দাও।"

স্বর্গীয় গিরীশ ঘোষের সম্বন্ধে তাঁহার খুব উচ্চ ধারণা ছিল। তিনি প্রায়ই গিরীশ বাবুর খবর লইবার জন্য সাধু ও ভক্তদের পাঠাইতেন। গিরীশ বাবুও লাটু মহারাজের বলরাম মন্দিরে অবস্থান কালে প্রায়ই সেখানে আসিতেন এবং তাঁহার খোঁজ খবর লইতেন।

একবার কাশীধাম হইতে কলিকাতা যাইবার কথা হইলে লাটু মহারাজ বলিয়াছিলেন, "ও পাড়ায় লোকই নাই; কার কাছে যাবো," এখানে 'লোক' বলিতে তিনি গিরীশ বাবুকে উদ্দেশ্য করিয়াছিলেন। তবে গিরীশ বাবুর সম্বন্ধে আমরা জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, "ওঁকে বুঝতে তোরা পারবি না। গোলমেলে জীবন। তোরা স্বামিজীকে আদর্শ কর।" গিরীশ বাবুও লাটু মহারাজের সম্বন্ধে বলিতেন, "ও রকম বেদাগ সাধু আর দেখি নি, ওঁর হাওয়ায় তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে।"

শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবীর প্রতি লাটু মহারাজের একনিষ্ঠ ভক্তি মহাবীরের মতই ছিল। তিনি একবার বলিয়াছিলেন, "সীতাহরণ হয়েছিল বলে আমি আর দক্ষিণতীর্থে গেলাম না।" তাঁহার এই অপূর্ব ভাব লক্ষ্য করিবার বিষয়!

অন্য সম্প্রদায়ের মঠে যাতায়াত সম্বন্ধে তিনি খুব সাবধানে চলিতে বলিতেন। তিনি বলিতেন, "একটা ভাবই ভাল করে বুঝতে পারছো না, তো দশটা ভাব বুঝবে কি করে? ঠাকুরের যে অপূর্ব ভাব ভালবাসা তাই ভাল করে বুঝতে পারলে এ জন্মেই উদ্ধার হয়ে যাবে।"

লাটু মহারাজ সর্বসময় উপদেশ দিতেন: "পবিত্র হও; তবে তো তাঁকে বুঝতে পারবে।"

সুর-বাঁধা

শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্ত্তী

মোর সকল বাসনা-তারগুলি যবে
বাজিবে তোমার সুরে,
জানি, জানি প্রিয় রবে না সে দিন
আর তুমি দূরে দূরে।
সে দিন তোমার যতো অভিমান,
ভেসে যাবে, ছল হবে অবসান
মধুর হাসিয়া দাঁড়াবে আসিয়া
মম অন্তরপুরে;
মোর সকল বাসনা-তারগুলি যবে
বাঁধা হবে তব সুরে।
সেদিন হেরিয়া তোমার বদন,
ঘুচিবে নিশার ভ্রান্ত স্বপন,
দীপ্ত কিরণ প্রভাত-তপন
দশদিশ দিবে পূরে;
মোর সকল কামনা-তারগুলি যবে
বাঁধা হবে তব সুরে।

দেখিব তোমায় জলে-স্থলে নভে,
পশু-পাখী-কীট নর আদি সবে,
তুমি ছাড়া আর কিছু না রবে
সকলি তোমাতে স্ফুরে,
মোর সকল বাসনা-তারগুলি যবে
বাঁধা হবে তব সুরে।
সে দিন প্রেমের বিপুল ছন্দে,
সেদিন সে-মহা মিলনানন্দে
হাসিব কাঁদিব নাচিব গাহিব
এ-জীবন যাবে ঘুরে;
মোর প্রাণের সকল সুরগুলি যবে
বাঁধা হবে তব সুরে।

যোগেশ্বর শ্রীশ্রীমীন নাথ

শ্রীসুরেশচন্দ্র নাথ মজুমদার

ডাঃ শহীদুল্লাহ বলেন—"মীন নাথ বাঙালী। তাঁর নামান্তর—মীনপদ, মৎস্যেন্দ্র নাথ, মচ্ছিন্দ্র নাথ, মৎস্যেন্দ্রপাদ, মচ্ছেন্দ্রপাদ, মছন্দর নাথ, মকীন্দ্র নাথ, মছঘ্ন পাদ।" (শনিবারের চিঠি, ১৩৫১ আশ্বিন)। ভারতের বাহিরে তিনি মৎস্যেন্দ্র নাথ, লোকেশ্বর, লোকনাথ, অবলোকিতেশ্বর (Inscription from Nepal in Indian Antiquary, Vol. IX) এবং ক্কানসাইন নামে পূজিত হইতেছেন (J. R. A. S. 1883, Vol. XV, Page 333). উইলসন বলেন মৎস্যেন্দ্র নাথ মৎস্যদেশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এবং তথাকার একজন সাধুপুরুষ ছিলেন বলিয়া তিনি মৎস্যেন্দ্র নাথ নামে পরিচিত হইয়াছেন। বগুড়া জেলার উত্তরাংশ হইতে দিনাজপুর জিলার অধিকাংশ স্থানই পূর্ব্বে মৎস্য দেশনামে অভিহিত হইত। তিনি আরও বলেন মৎস্যেন্দ্র নাথ বাঙ্গালার উত্তর বা পূর্ব্ব অংশের লোক (বগুড়ার ইতিহাস ১ম খণ্ড)। গণ্ডযোগে জাত ব্রাহ্মণকুমারকে পিতামাতার কল্যাণের জন্য সমুদ্রে ফেলিয়া দেওয়া হয়। রাঘব মৎস্য সে শিশুকে গ্রাস করে। পরে ক্ষীরোদ সাগরে হরপার্ব্বতী সেই রাঘবের উদর হইতে শিশুকে উদ্ধার করিয়া যোগধর্ম্ম শিক্ষা দেন। পরিণত বয়সে সেই শিশুই মৎস্যেন্দ্র নাথ নামে ভুবনবিজয়ী সিদ্ধপুরুষ বলিয়া পরিচিত হন (স্কন্দ পুরাণ, নাগরকাণ্ড, মৎস্যেন্দ্র নাথোৎপত্তি কথন)। অন্যমতে মহাদেব গোপনে গৌরীকে মহাজ্ঞান উপদেশ দিবার সময় মীন নাথ মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া সেই মহাজ্ঞান শ্রবণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম মৎস্যেন্দ্র নাথ হইয়াছে (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গোরক্ষবিজয়)। 'নিত্যাহ্নিকতিলকে' (লিপিকাল—১৩৯৫ খৃঃ অঃ) লেখা আছে মৎস্যেন্দ্র নাথের "বরণা বঙ্গিদেশে" জন্ম। 'কৌলজ্ঞাননির্ণয়ে' মৎস্যেন্দ্র নাথকে চন্দ্রদ্বীপবিনির্গত বলিয়া লেখা হইয়াছে। চন্দ্রদ্বীপ বাখরগঞ্জ জেলার প্রাচীন নাম। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ত্রিপুরা শাখার পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণে একটি ছড়ার উল্লেখ করিয়া বলেন, "যদি ইহা সত্য হয় তবে মীন নাথও ময়নামতীর লোক।" ময়নামতীর পাহাড় কুমিল্লার নিকটে অবস্থিত। মীন নাথ বাখরগঞ্জের লোক সে সম্বন্ধে সন্দেহ করা উচিত হইবে না। তবে তাঁহার প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র ময়নামতীর পাহাড়েই ছিল বলিয়া মনে হয়। নাথযোগী জলন্ধর নাথের শিষ্য রাজা গোপীচাঁদ বা গোবিন্দচন্দ্রের রাজধানী এখানে ছিল বলিয়া ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের অনুমান (গোপী চাঁদের সন্ন্যাস)। অভিনবগুপ্ত তাঁহার তন্ত্রালোকে "মচ্ছন্দ বিভু" বলিয়া এক মৎস্যেন্দ্র নাথের উল্লেখ করিয়াছেন। অভিনবগুপ্তের সময় অনুমান ১০০০ খৃঃ অঃ। কৌলজ্ঞাননির্ণয় নামক যে বইএর উল্লেখ পূর্ব্বে করা হইয়াছে তাহা মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে ৯ম খৃঃ অব্দের মধ্যভাগের লেখা। অধ্যাপক ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচীর মতে অনুমান ১০৫০ খৃঃ অব্দের লেখা। মৎস্যেন্দ্র নাথ যে বহুদিন আগেকার লোক তাহা আমরা নিঃসন্দেহে

দেখাইতেছি। শ্রীগুণানন্দ ও শিবশঙ্কর সিংহ প্রণীত এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত নেপালের ইতিহাসে দেখা যায় যে এই মৎস্যেন্দ্র নাথ কলিযুগ ৩৬২৩ বৎসর গত হইলে অর্থাৎ ৫২২ খৃঃ অব্দে নেপালরাজ কর্ত্তৃক বিশেষ ভাবে আহূত হইয়া তথাকার দ্বাদশ বৎসর ব্যাপী দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টি নিবারণের জন্য সেখানে গিয়াছিলেন।[১] নেপালের "করন্ত ব্যূহ" ধর্ম্ম-গ্রন্থে মৎস্যেন্দ্র নাথের জীবনী আলোচিত ও এইমত সমর্থিত হইয়াছে। হড্সন অনুমান করেন যে মৎস্যেন্দ্র নাথ ৫ম খৃঃ অব্দে নেপালে গিয়াছিলেন[২]। প্রসিদ্ধ চৈনিক পর্যটক হুয়েনসাঙ্ তাঁহার প্রসিদ্ধ সিয়ূকী গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে কপিলের শিষ্য অর্থাৎ সাংখ্যমতাবলম্বী ভব-বিবেক মৎস্যেন্দ্র নাথের সহিত দেখা করেন। ভববিবেক ৫৫০ খৃঃ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত সিলভ্যাঁ লেভি তাঁহার Le Nepal গ্রন্থে বলিয়াছেন যে ৬৫৭ খৃঃ অব্দে রাজা নরেন্দ্রদেবের রাজত্বের আমলে মৎস্যেন্দ্র নাথ নেপালে ছিলেন। এই মত অন্যদিক দিয়াও সমর্থিত হয়। মীন নাথের শিষ্য গোরক্ষ নাথ এবং গোরক্ষনাথের শিষ্য পদ্মবজ্র সরোরুহ বা পদ্মসম্ভব। উড্ডানের রাজা ইন্দ্রভূতি এই পদ্ম-সম্ভবের পালকপিতা ছিলেন। জার্ম্মান পণ্ডিত Schlagintweit স্থির করিয়াছেন যে এই পদ্মসম্ভব ৭২১।২২ খৃঃ অব্দে জন্মিয়াছেন।

গোরক্ষনাথের কৃপায় পদ্মসম্ভব প্রসিদ্ধ সিদ্ধপুরুষ হইয়াছিলেন। ভুটিয়াদের মধ্যে প্রবাদ আছে যে পদ্মসম্ভব কামরূপের লোক ছিলেন। এই পদ্মসম্ভব তিব্বতে সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় হিন্দুধর্ম্মের প্রচার করেন (J. A. R. S., Vol. II, 1934, No. 2, p. 43)। যাহা হউক, নেপালের ইতিহাসে মীন নাথের সময় ৫২২ খৃঃ অঃ লেখা আছে। এবং ইহা নিঃসন্দেহভাবে গ্রহণ করা যায়।

এখনও মীন নাথ নেপালের মঙ্গলদেবতা। তথায় তাঁহার মন্দির ও স্মৃতিফলক আছে। ৭৯২ নেপালাব্দে (১৬৭২ খৃঃ অঃ) নেপালরাজ শ্রীনিবাস কর্ত্তৃক উক্ত মন্দিরের তোরণ সহিত স্বর্ণদ্বার স্থাপিত হয়। ইহার শিলা-লিপিতে তাঁহাকে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া রাজা শ্রীনিবাস বন্দনা করিয়াছেন :—

"শ্রীলোকেশ্বরায় নমঃ
মৎস্যেন্দ্রং যোগিনাং মুখ্যাঃ শাক্তাঃশক্তিং বদন্তি যৎ।
বৌদ্ধাঃ লোকেশ্বরং তস্মৈ নমো ব্রহ্মস্বরূপিণে॥
নেপালাব্দে লোচনাচ্ছিদ্রসপ্তে
শ্রীপঞ্চম্যাং শ্রীনিবাসেন রাজ্ঞা
স্বর্ণদ্বারং স্থাপিতং তোরণেন
সার্দ্ধং শ্রীলোকনাথস্য গেহে।"

(Inscription from Nepal in Indian Antiquary, Vol. IX)

হড্সন বলেন আসামের পুতলক পাহাড় হইতে মৎস্যেন্দ্র নাথকে নেপাল নেওয়া হয়। নরেন্দ্রদেব বাঘপত্তনের রাজা হন। তিনি বন্ধুদত্ত আচার্য্যের শিষ্য ছিলেন। দ্বাদশবর্ষ ব্যাপী অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য আর্য্য অবলোকিতেশ্বরকে তিনি বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করিয়া ললিতপত্তনে আনেন। এই অবলোকিতেশ্বরই কি মৎস্যেন্দ্র নাথ, খৃঃ অব্দ পঞ্চম শতাব্দীতে যাঁহার নেপাল আগমন বার্ত্তা বিখ্যাত স্মৃতিফলকের শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছিল ? (R. A. S. J. Series VII, part 1, Page 137). রাজা নরেন্দ্রদেব কর্ত্তৃক যিনি নেপালে আহূত হইয়াছিলেন তিনি যে মৎস্যেন্দ্র নাথ বা অবলোকিতেশ্বর তাহা চীন পর্য্যটক হুয়েনসাঙ্ পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন—"The Temple of Avalokiteswar called Matsyendra

১ ও ২ Language, Literature and Religion of Nepal and Tibet—By Hudson.

Nath by the common people is situated in the centre of village. The image which it contains is made of mud and covered with silver plates. It remains half of the year only in this temple, during the other six months it is kept at Lalitpattan." (Indian Antiquary, Vol IX, page 169) অর্থাৎ অবলোকিতেশ্বরের মন্দিরকে লোকে মৎস্যেন্দ্র নাথের মন্দিরও বলিয়া থাকে। ইহা গ্রামের মধ্যস্থলে অবস্থিত। মন্দিরস্থিত বিগ্রহ মৃন্ময়, কিন্তু ইহা রৌপ্যমণ্ডিত। বৎসরের অর্দ্ধেক সময় ইঁহাকে এই মন্দিরে রাখা হয়, এবং অবশিষ্ট ছয় মাস ললিতপত্তনে রাখা হয়। হুয়েনসাঙ্ আরও বলেন মৎস্যেন্দ্র নাথ নেপাল ও তিব্বতের জাতীয় দেবতা। লাসা নগরীর কথিত কাঞ্চন নির্ম্মিত মৎস্যেন্দ্র নাথের জীবন্ত মূর্ত্তি আজিও দর্শকের যুগপৎ ভক্তি ও বিস্ময় উৎপাদন করে। যদি কেহ মৎস্যেন্দ্র নাথকে দেখিবার মানসে যথারীতি উপবাস করিয়া একমনে তাঁহাকে আহ্বান করেন, তাহা হইলে মৎস্যেন্দ্র নাথ প্রতিমা হইতে জ্যোতির্ম্ময়রূপে ভক্তের সম্মুখে আবির্ভূত হন। তিনি আরও বলেন যে ধর্ম্মজগতে মৎস্যেন্দ্র নাথের স্থান অতি উচ্চে। তিনি যখন ভারত ভ্রমণে আসিয়াছিলেন সে সময় সমগ্র ভারতভূমিতে মৎস্যেন্দ্র নাথের বিগ্রহ পূজিত হইতে তিনি দেখিয়াছেন। সেগুলির মধ্যে কাশ্মীরের উদয়ানের ও মান্দ্রাজের তিলোদকের মন্দির প্রসিদ্ধ ছিল। মৎস্যেন্দ্র নাথ জাপানে ও চীনে "কানসাইন" নামে পূজিত হইতেছেন। "It is wellknown that Avalokiteswar is venerated in China and Japan as the God or Being who hears the cries of men (Kwan-Shai-Yin). I need not remark that the worship of any divinity on abstract grounds is foreign to the principles of Buddhism, nevertheless we find the worship of Amitabha and Kwan-Shai-Yin almost universally prevalent in the countries above named" (J. R. A. S. 1883, Vol. XV, Page 333). এসম্বন্ধীয় অনেক বিবরণ হুয়েনসাঙ্ প্রণীত ও রেভারেণ্ড বিল অনূদিত 'সিয়ূকী' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৩৯, ৪১, ৬০, ১২৮, ১৬০, ২১২ পৃষ্ঠা এবং দ্বিতীয় খণ্ডের ১০৩, ১১৬, ১২৯, ১৭২, ১৭৩, ২১৪, ২২৫ ও ২৩৩ পৃষ্ঠায় আছে। চীন সাম্রাজ্যের চুসান দ্বীপপুঞ্জের পুটোদ্বীপের মৎস্যেন্দ্র নাথের মন্দির প্রসিদ্ধ। এখানকার অপরাপর দেবমূর্ত্তিও ভারতীয় হিন্দুর (Edkin, Page 263)। এই বিগ্রহ বালি, যাভা, ভূটান, প্রভৃতি স্থানেও দৃষ্ট হয়। প্রাচ্যবিদ্যার্ণব নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষে লিখিয়াছেন, "নেপালের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মৎস্যেন্দ্র নাথ। পটোনোর অন্তর্গত ভোগমতী গ্রামে এই মন্দির ও লিঙ্গ স্থাপিত।" (বিশ্বকোষ)

ডাঃ শহীদুল্লাহ বলেন—"খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের আগে বাংলারূপের আবির্ভাব হয়নি, একথা সকলেই মেনে নিয়েছেন। কিন্তু বাংলা ভাষার উৎপত্তির সময় নিয়ে নানা মুনির নানা মত। যতদূর দলিল প্রমাণ আমরা পেয়েছি, তাতে আমাদের বলতে হয় যে, মীন নাথই বাংলা ভাষার আদিম লেখক * * * পূর্ব্বেই বলেছি মীন নাথ বাংলার আদি লেখক। তাঁর লেখা চার লাইনের একটি শ্লোক বৌদ্ধগানের টীকায় উদ্ধৃত করা হয়েছে। সে শ্লোকটি এই—

'কহন্তি গুরু পরমার্থের বাট
কর্ম্মকুরঙ্গ সমাধিক পাট।
কমল বিকসিল কহিহণ জমরা
কমলমধু পিবিবি ধোকেন ভমরা।'

এই শ্লোকে পরমার্থের, বিকশিত আধুনিক বাঙ্গালারূপের সমান। শব্দ ও ব্যাকরণ বিচারে আমরা একে প্রাচীন বাংলাই বলব।" (শনিবারের চিঠি, আশ্বিন, ১৩৫১ বাং, ৩৭৯-৩৮৬ পৃঃ)

আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি মীন নাথের সময় নিঃসন্দেহে ৫২২ খৃঃ অব্দ এবং তিনি যখন বাংলাভাষার আদি লেখক তখন সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য যে খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের আগেই বাংলারূপের আবির্ভাব হইয়াছিল। মীন নাথের উক্ত লেখা বাংলাভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন। ইহা পদ্য ছন্দে লেখা। তাহা হইলে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে মীন নাথ বাংলার আদি কবি। ডাঃ শহীদুল্লাহ আরও বলেন—"নাথপন্থার আদি প্রচারক এই মীন নাথ। বাঙালীর এটা একটা গৌরবের বিষয় যে, একজন বাঙালী গোটা ভারতবর্ষকে একটা ধর্মমত দিয়েছিলেন।" (শনিবারের চিঠি, আশ্বিন ১৩৫১, ৩৭৯-৩৮০ পৃঃ)। উপরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে দেখা যাইতেছে যে মীন নাথ শুধু গোটা ভারতবর্ষকে একটা ধর্ম্মমত দেন নাই—গোটা এশিয়াবাসীকেই দিয়াছিলেন।

কেহ কেহ নাথপন্থার আদি প্রচারক সিদ্ধ মীন নাথ বা মৎস্যেন্দ্র নাথ এবং সহজিয়া-পন্থার সিদ্ধাচার্য্য লুইপাদকে একই ব্যক্তি বলিয়া ভ্রম করেন। অধ্যাপক ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী তাঁহার "গোপীচাঁদের সন্ন্যাসে" এবং অধ্যাপক ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী তাঁহার "কৌলজ্ঞাননির্ণয়ে" ইহার পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক যুক্তি-তর্ক প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু ইঁহারা কেহই মীন নাথ ও মৎস্যেন্দ্র নাথের ধর্ম্মমত ও সময় সম্বন্ধে আলোচনা করেন নাই। বিচার করিয়া দেখা গিয়াছে, ইঁহাদের ধর্ম্মমতের মধ্যে আদৌ মিল নাই (কদলী রাজ্য)। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লুইপাদের সময় ১০ম—১১শ খৃঃ অব্দ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন (চর্য্যাপদ)। আর আমরা মীন নাথের সময় নিঃসন্দেহে ৫২২ খৃঃ অঃ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছি। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে মীন নাথ ও লুই-পাদ নিঃসন্দেহে বিভিন্ন ব্যক্তি।

ভারতবর্ষে বিভিন্ন যুগে যে সকল অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া সনাতন ভারতীয় ধর্ম্মকে মাধুর্য্যমণ্ডিত করিয়াছিলেন যোগেশ্বর মীন নাথ ইঁহাদের অন্যতম। এশিয়ার সর্ব্বত্র সকল শ্রেণীর মধ্যে মীন নাথের অলৌকিক প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। বুদ্ধদেবের পর সমগ্র এশিয়ায় এরূপ প্রভাব বিস্তার আর কেহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন কি না জানি না। ইনি বৌদ্ধধর্ম্মের পতনের সময় এবং ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরুত্থানের পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়া হিন্দুসমাজকে উদার, সার্ব্বজনীন, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করিয়া সফলকাম হইয়াছিলেন। ইনি যোগাচার্য্য ছিলেন। যোগের উপযুক্ত আসনের মধ্যে ৩২টী প্রধান বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। তাহার মধ্যে তিনটী আসনের নাম নাথগুরুর নামানুসারে রাখা হইয়াছে, যথা—(১৩) মৎস্যেম (১৪) মৎস্যেন্দ্র (১৫) গোরক্ষ (ঘেরণ্ড সংহিতা)। মৎস্যেন্দ্র নাথের গুরু হইলেন নাথগুরু আদি-নাথ। ঋষি দত্তাত্রেয় তাঁহার "দত্তাত্রেয়বোধ" যোগশাস্ত্রে বলিতেছেন—

"আদি নাথ যোগের সার্দ্ধকোটী সঙ্কেতের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। আদিনাথপ্রোক্ত শ্রেষ্ঠ পদ্মাসনের বিষয় শ্রবণ কর।"

বাঙ্গালীর কর্ম্মবিমুখতা

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

কর্ম্মবিমুখতা যে আমাদের জাতির মজ্জাগত, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কেহ কেহ এ দেশের জলবায়ু, ভৌগোলিক সংস্থান, ভূমির উর্ব্বরতা ইত্যাদিকে দায়ী করেন। এগুলি যে দায়ী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু আমাদের লৌকিক সভ্যতাও কম দায়ী নয়।

যে কর্ম্মবিভাগ-পদ্ধতির উপর প্রথম জাতি-ভাগ হইয়াছিল তাহাকে সনাতন করিয়া তুলিলে এবং কর্ম্মভার বণ্টনকে বংশানুক্রমিক করিয়া তুলিলে যে বিভ্রাট ঘটিবে সে বিষয়ে সন্দেহ কি? সাধারণ বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক সূত্র হিসাবে ঐ পদ্ধতিকে হয়ত সমর্থন করা যায়—কারণ, তাহাতে আনুষঙ্গিক অনেক ব্যাপারকে অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়া ধরা হয়। কিন্তু বস্তুতঃ জাতীয় জীবনধারা পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া ঐ পদ্ধতিতে আমাদের সামাজিক জীবনে বিপর্য্যয় ঘটিয়া গিয়াছে। প্রাচীন যুগে ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য যাহা নির্দ্দিষ্ট ছিল—পরবর্ত্তী যুগে তাহার মর্য্যাদা ঢের কমিয়া গিয়াছিল। তাহাতে ব্রাহ্মণের আশানুরূপ অন্নসংস্থানও হয় নাই। স্বতঃই সে কর্ত্তব্যের প্রতি ব্রাহ্মণের ঔদাসীন্য আসিয়াছিল। জাতি-কুলের মর্য্যাদা রক্ষার অজুহাতে নিম্নতর বর্ণের কর্ম্মভার গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই। তাহার ফলে, ব্রাহ্মণ জাতির কর্ম্মবিমুখতা আসিয়া পড়িয়াছিল। সকল যুগে ক্ষত্রিয়ের কর্ম্মের সমান মর্য্যাদা ছিল না—এমন সময় বহুবারই আসিয়াছে, যখন ক্ষত্রিয়গণের কর্ম্ম-ভার অত্যন্ত লঘু হইয়া পড়িয়াছে। ক্রমে ক্ষত্রিয়গণের মধ্যেও কর্ম্মবিমুখতা আসিয়াছিল। উচ্চতর বর্ণের মধ্যে কর্ম্মবিমুখতা আসায় সমগ্র সমাজেই অলস জীবন যাপন আদর্শের মধ্যেই গণ্য হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিদ্যাচর্চ্চা চিরদিনই ছিল। পরাবিদ্যা হউক, আর অপরাবিদ্যাই হউক বিদ্যা-চর্চ্চাকেই একটা কর্ম্ম মনে করা হইত। এ যুগে যেমন বিদ্যার প্রয়োগকেই কর্ম্ম বলে,—কেবল অনুশীলনকেই কর্ম্ম বলে না—প্রাচীন যুগে সে ধারণা ছিল না। যাঁহারা বিদ্যাচর্চ্চা করিতেন তাঁহারা ভাবিতেন—"এইত কর্ম্ম করিতেছি আমরা, অন্য কর্ম্ম কি করিব? আমরা দেশে বিদ্যার ধারাটিকে রক্ষা করিতেছি। আমরা সমাজের অথবা দেশের ধনীদের প্রতিপাল্য।" যাঁহারা চতুষ্পাঠী খুলিয়া বিদ্যাদান করিতেন—তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। বাকী সকল ব্রাহ্মণের কখনও কখনও ধর্ম্মাচরণে সহায়তা ছাড়া বিশিষ্ট কোন কর্ম্ম ছিল না। এ পদ্ধতিতে কর্ম্মবিমুখতা ক্রমে মজ্জাগত হইয়া যাইবারই সম্ভাবনা। একজনের জ্ঞানচর্চ্চার দোহাই দিয়া সমস্ত পরিবারই যে অলস জীবন যাপন করিবে অথবা পিতাপিতামহের জ্ঞানচর্চ্চার দোহাই দিয়া বংশধরগণ অপরের প্রদত্ত বৃত্তিদানাদি যে ভোগ করিবে—তাহাতে অস্বাভাবিকতা কিছুই নাই। যাঁহারা শাস্ত্রচর্চ্চা করিতেন তাঁহাদের অনেকের বংশধরগণ তাহাও ত্যাগ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ-সমাজে এই কর্ম্মবিমুখতাকে বাড়াইয়া দিয়াছিল স্বল্পে সন্তুষ্টি ও নিম্নতর জাতিসমূহের সভয় ভক্তি। তাহা ছাড়া, জাত্যভিমান কর্ম্মশীলতার একটা পরম বাধা। ইচ্ছা থাকিলেও বর্ত্তমান যুগের মত

নিম্নতর জাতির জন্য নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম গ্রহণ করার উপায় ছিল না। অধিকাংশ শ্রমসাপেক্ষ কর্ম্ম নিম্নতর জাতির জন্যই নিরূপিত ছিল—মানসিক শ্রমের কাজ অধিকাংশ অবশ্য উচ্চতর জাতির অধিকারেই ছিল। মানসিক শ্রমের কাজ কোন দিনই বিপুল নয়—সে কালে আরও সীমাবদ্ধ ছিল। সেজন্য খুব বেশী লোকের প্রয়োজন ছিল না। তাহাতে উচ্চতর বর্ণের সমস্ত লোকের কর্ম্মবিমুখতা দূর হইতে পারে না। Dignity of labour ইত্যাদি কথা হয় অতি প্রাচীন যুগ অথবা নয় বর্ত্তমান যুগের কথা। মধ্যযুগে শ্রমসাপেক্ষ কার্য্যকে এমনি অবহেলা করা হইত যে, বৈদ্যগণ অস্ত্রোপচারের জন্য এক-জন করিয়া নাপিত সঙ্গে লইতেন। অস্ত্র-চিকিৎসা লুপ্ত হইবার ইহাও একটি কারণ।

বোধ হয় এই ভাবে বহু শাস্ত্র বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। জীবিকার্জ্জন, ব্যবহারিক প্রয়োজন ও প্রয়োগের সহিত জড়িত না হইলে বহু বিদ্যাই বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই কর্ম্মবিমুখতা ধর্ম্মের সহিত জড়াইয়া পড়িয়াছিল। যাঁহারা ধর্ম্মানুশীলন করিয়াছেন তাঁহাদের অনেকে মনে করিতেন—"এই ত মস্ত বড় কর্ম্ম করিতেছি। অন্য কর্ম্ম আমরা কেন করিব ? আমরা জনসাধা-রণের প্রতিপাল্য।"

বুদ্ধদেবের সময় হইতে দেশ বিহার-সংঘারামে ভরিয়া গিয়াছিল। বিহার সংঘারাম চৈত্য মঠাদি স্থাপন ও তাহাদের ব্যয়নির্ব্বাহ রাজা শ্রেষ্ঠী ও আঢ্য গৃহিমাত্রেরই পুণ্যকর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইত। ঐ সকল বিহার সংঘারাম অসংখ্য শ্রমণ-ভিক্ষুতে ভরিয়া গিয়াছিল—গৃহী উপাসক বা শ্রাবকগণ তাঁহাদের প্রতিপালন করিতেন। কর্ম্মক্লেশ ও অর্থার্জ্জনের শ্রম এড়াইবার জন্য সহস্র সহস্র যুবক ও প্রৌঢ় ঐ সকল বিহারাদিতে আশ্রয় গ্রহণ করিত। অভিজ্ঞা, সমাপত্তি ও উপসম্পদা লাভের জন্য অনেকে সংঘের শরণ লইত স্বীকার করি—কিন্তু অধিকাংশই বিনা পরিশ্রমে সংঘবদ্ধভাবে আরামে থাকিবার জন্য সংঘারামে জুটিত। বুদ্ধের জীবদ্দশাতে তাঁহার জেতবনের বিহারেই ঐ শ্রেণীর কত লোক আসিয়া জুটিয়াছিল। বুদ্ধদেব অনেককে তাড়াইয়াছিলেন—কিন্তু কত তাড়াইবেন ? তাঁহার তিরোধানের পর এ বিষয়ে কড়াকড়ি কমিয়া গিয়াছিল।

বিবেকানন্দ স্বামী এ দেশের মতিগতি ও প্রকৃতি খুব ভাল করিয়াই জানিতেন—দেশের লোকের ধাতু-প্রকৃতি তাঁহার ভাল করিয়াই চেনা ছিল। তাই তিনি বৈরাগ্যহীন অলস সন্ন্যাসজীবনকে ধিক্কার দিয়াছেন—তিনি সন্ন্যাসের সহিত—দরিদ্র-নারায়ণের সেবার সংযোগ সাধন করিয়াছেন। বেদান্তকে কর্ম্মজীবনে পরিণত করিবার মহান্ আদর্শ তাঁহার মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে বেদান্ত হইতেই তিনি সেবাধর্ম্মের শিক্ষা এবং পরমহংসদেবের কাছ হইতেই এই দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। বেদান্তের নূতন যুগ-ধর্ম্মোপযোগী interpretation এর ফল ইহাই। যাহাই হউক, তিনি গেরুয়া পরিয়া চিরজীবন কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন এবং গেরুয়া ধারণের দায়িত্ব তিনি এদেশে ঢের বেশি বাড়াইয়া গিয়াছেন। তাই তিনি অলস সন্ন্যাসিসংঘের সৃষ্টি না করিয়া সাধন-ভজনের সঙ্গে সেবা-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। সন্ন্যাসী বা বৈরাগী যদি লোকালয়ে থাকেন, তবে তাঁহার জীবনের আদর্শ কি হওয়া উচিত, তাহা বিবেকানন্দ দেখাইয়া গিয়াছেন। বৈরাগ্যবশতঃ যে দেশ কর্ম্মের গাণ্ডীব ত্যাগ করিয়াছিল—বিবেকানন্দের নবগীতার বাণী শুনিয়া সে দেশ যেন আবার সে গাণ্ডীব তুলিয়া লইয়াছে।

আমাদের দেশে কর্ম্মবিমুখতার হীন আদর্শ কি ভাবে সৃষ্ট পুষ্ট ও বিস্তৃত হইয়াছে—তাহার কিছু পরিচয় দিই :

ভিক্ষা করিবার অধিকার সকলের নাই—সকলেই ভিক্ষালাভের যোগ্য নয়—শাস্ত্রে এ সম্বন্ধে বিধান আছে। কিন্তু শাস্ত্রের বিধান কেই বা মানিতেছে ? ভিক্ষাও এদেশে একটা বৃত্তি বলিয়া গণ্য হইয়াছে এবং নির্ব্বিচারে ভিক্ষাদানই এদেশে পুণ্য বলিয়া পরিগণিত। 'ভিক্ষায়াং নৈব চ নৈব চ' মুখে বলা হইয়া থাকে— কিন্তু একেবারে নৈব চ নৈব চ নয় —রাজসেবার অর্দ্ধেক অন্ততঃ এদেশে মিলিয়াছে। ভিক্ষায় কাহারও লজ্জা নাই—সক্ষম ব্যক্তি অনায়াসে অম্লানবদনে এদেশে চিরদিনই ভিক্ষায় বহির্গত হয়। অবশ্য ভিখের জন্য ভেখেরও প্রয়োজন হইয়াছে—ভিখারীরা ধর্ম্মের ভেখই সাধারণতঃ ধারণ করিয়া আসিতেছে। এখন কথা হইতে পারে, ভিক্ষাকে একেবারে কর্ম্মবিমুখতা কি করিয়া বলা যায়—ভিক্ষার জন্য পাঁচ দুয়ার ত ঘুরিতে হয়। যে ব্যক্তি দুয়ার দুয়ার ভিক্ষা করে—সে যদি ভিক্ষা না করিয়া কোন কাজ করিত, তবে সে কাজ নিশ্চয়ই কঠোর শ্রমসাপেক্ষ হইত। সে কঠোর শ্রমের তুলনায় ভিক্ষার জন্য পরিভ্রমণ কিছুই ক্লেশকর নয়। ইহাও শ্রমবিমুখতা। তাহা ছাড়া—ভিক্ষায় দায়িত্ব নাই, রাজস্বাদি নাই, কৈফিয়ৎ নাই—স্বাধীনতা আছে। অমর্য্যাদাও আছে—কিন্তু দাস্যের অমর্য্যাদাও ত কম নয়।

এ দেশের কুলীন ব্রাহ্মণগণ কোন শ্রেণীর জীবন যাপন করিত—তাহা কাহারও অবিদিত নাই। প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণ না করিয়া বিবাহের দ্বারা অর্থোপার্জ্জন শ্রমবিমুখতার চরম-জাত্যভিমান যে দেশের বহু লোককে কর্ম্মবিমুখ করিয়া তুলিয়াছিল সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অন্নসংস্থান নাই—অথচ বংশমর্য্যাদা নষ্ট হইবে বলিয়া কত লোকই অলস-অভাবগ্রস্তের জীবন যাপন করিয়াছে। বিনাশ্রমে বসিয়া বসিয়া অন্নধ্বংস করা যেন বংশমর্য্যাদার অঙ্গীভূত বলিয়া মনে করা হইত।

একান্নবর্ত্তিতা এদেশে কর্ম্মবিমুখতার একটি কারণ। একান্নবর্ত্তী পরিবারে যেখানে একটা পারিবারিক সাধারণ আয় হইতে অথবা অনেকের সমবেত চেষ্টায় সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের ব্যবস্থা, সেখানে একথা উঠে না। কিন্তু যেখানে একজন উপার্জ্জক, বাকী সকলে তাঁহার প্রতিপাল্য সেখানে স্বতঃই পরিজনগনের মধ্যে শ্রমবিমুখতা আসিয়া পড়ে। সক্ষম হউক আর অক্ষম হউক দশজনকে আপনার উপার্জ্জিত অর্থে প্রতিপালন করিলে সমাজে ও দেশে বড় সুনাম হইত, প্রতিপালককে পুণ্যাত্মা ও মহানুভব ব্যক্তি বলিয়া শ্রদ্ধা করা হইত। অনেক সময় ঐ যশোলাভের জন্যই উপার্জ্জক নির্ব্বিচারে বহু কর্ম্মকুণ্ঠ আত্মীয়-স্বজনকে প্রতিপালন করিতেন। ইহা তাঁহার পক্ষ হইতে যত মহৎ কার্য্যই হউক, দেশের বা সমাজের পক্ষ হইতে কখনও মঙ্গলজনক হইতে পারে না—প্রতিপাল্যগণের পক্ষ হইতেও মর্য্যাদাজনক ও পরিণামে শুভঙ্কর হইতে পারে না।

এদেশের উচ্চবর্ণের লোকদের মধ্যে পৈতৃক সম্পত্তি সম্ভোগই একটা বৃত্তির মধ্যে গণ্য হইত। পৈতৃক সম্পত্তির উপস্বত্ব আদায় করাকে একটা শ্রমসাধ্য কর্ম্ম বলা যায় না। বংশধরসংখ্যার' বৃদ্ধির ফলে যে অনিবার্য্য দারিদ্র্য তাহা বিনাশ্রমে বিদূরিত হইতে পারে না। চটকের মাংসে কতদিন উদর পূর্ত্তি হইবে ?

জমিদারদের জীবন ছিল অনেকটা অলস জীবন। অনেক জমিদার নিজেই নিজের জমিদারী পর্য্য-বেক্ষণ করিয়াছেন—তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু বহু জমিদার যে অমাত্যদের হস্তে বিষয়-সম্পত্তির পর্য্যবেক্ষণের ভার দিয়া অলসব্যসনে জীবন যাপন করিয়াছেন—তাহা অস্বীকার করা চলে না। স্বয়ং জমিদার যদি বা কিছু শ্রম করিয়াছেন—তাঁহার পরিবারের লোকদের ভোগ-বিলাস ছাড়া অন্য কাজ ছিল না। জমিদাররা

এমন সব লোক কেবল শোভার জন্য পোষণ করিয়া আসিয়াছেন—যাহাদের দেহ কখনও ঘামিত না—প্রায় বিনাশ্রমেই বা বিনাক্লেশেই তাহারা দেউড়ির দুই পাশে ডাল রুটির এবং অন্তঃপুরে পোলাও কালিয়ার শ্রাদ্ধ করিয়া আসিয়াছে। আজ-কাল জমিদারগণ নিজের সম্পত্তির জন্য না খাটিলেও District Board, Municipality, Council ইত্যাদির জন্য শ্রম করেন ও প্রতিপাল্যগণকেও খাটাইয়া নেন।

যাহাদের পূর্ব্বপুরুষ একসময়ে নবাবসরকারে চাকুরী করিয়া একটা পারশী খেতাবের সঙ্গে আয়মা জায়গির লাভ করিয়াছিল—তাহাদের বংশধরগণের অনেকেই অলস শ্রমবর্জ্জিত জীবন যাপন করিয়া উহাদের উপস্বত্ব ভোগ করিয়াছে।

অনেক কুলীন সন্তানের বিবাহ করাই যে ছিল পেশা—ইহার মধ্যে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি নাই। ঘর-জামায়ের নিশ্চিন্ত গ্লানিকর জীবনের কথা কে না শুনিয়াছে? আমাদের দেশের গত শতাব্দীর কথা-সাহিত্য ও নাট্য-সাহিত্যের মধ্যে এবং বর্ত্তমান শতাব্দীর কোন কোন সাহিত্যগ্রন্থে, আমি যে নিষ্কর্ম্মা জীবনগুলির উপরে পরিচয় দিলাম, তাহাদের সবগুলিরই অস্তিত্বের সাক্ষ্য মিলিবে।

ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বঙ্গদেশের শ্রমজীবিগণ অনেক বেশি কর্ম্মকুণ্ঠ—একথা এদেশের ধনবিজ্ঞানের পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন। এদেশের ভূমি যেরূপ উর্ব্বরা এবং প্রাকৃতিক অবস্থা এতই অনুকূল, যে এদেশে অন্নকষ্ট হইবার কথা নয়। কৃষকগণের শ্রমবিমুখতা ও আলস্যই দেশের অন্নকষ্টের জন্য প্রধানতঃ দায়ী। পশ্চিম বঙ্গে চাষের জন্য সাঁওতালদের সহায়তা লওয়া হয়—উত্তর বঙ্গে পাট কাটিবার জন্য পুর্ণিয়া জেলা হইতে কুলী আনাইতে হয়। কেবল—কলিকাতা শহরের নয়। প্রত্যেক শহরের শ্রমসাধ্য কার্য্যগুলি বাঙ্গালার বাহিরের লোকে অধিকার করিয়া যে লইয়াছে—তাহার প্রধান কারণ বাঙ্গালী শ্রমজীবীদের মজ্জাগত কর্ম্মবিমুখতা। বাঙ্গালার বাহিরে শিক্ষিত লোকদের কিছু কিছু অন্নসংস্থান আজিও হইতেছে—বাঙ্গালী শ্রমজীবী বাঙ্গালার বাহিরে নাই, এবং অন্যান্য সকল প্রদেশের শ্রমিকরাই বাঙ্গালার নৌকা, গোযান, লাঙ্গল পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া লইতেছে। বাঙ্গালার জলবায়ু শ্রমকুণ্ঠতার কতকটা কারণ বটে, কিন্তু প্রাকৃতিক বাধা জয় করিবার কোন চেষ্টাই বাঙ্গালীরা করে নাই।

এদেশে পুরুষদের তুলনায় নারী অনেক বেশি শ্রমশীলা ছিল। এদেশের উটজশিল্প অসংখ্য নিম্নশ্রেণীর লোকের উপজীবিকা ছিল, ঐ উটজশিল্প রচনায় পুরুষ ও নারীর শ্রমপ্রয়োগ ছিল সমান সমান। কিন্তু তথাকথিত উচ্চ জাতীয় পরিবারের পুরুষ হয়ত তাসপাশা খেলিয়া, সখের কীর্ত্তন-পাঁচালি গাহিয়া কাটাইয়াছে—নারী সারাদিনরাত খাটিয়া সকলের মুখে অন্ন যোগাইয়াছে—দ্বিগুণ শ্রমের দ্বারা পুরুষের শ্রমবিমুখতার অভাব পূরণ করিয়াছে। ঘরে ঘরে এই শ্রমলক্ষ্মীরা বিরাজ না করিলে দরিদ্রনারায়ণদের সেবার কি দুর্দ্দশা হইত, তাহাই ভাবি।

এই প্রসঙ্গে—রামপ্রসাদের সেই ছত্রটি মনে পড়ে—'এমন মানব জমিন রইল পতিত আবাদ করলে ফল্‌ত সোনা।' যে বংশে, যে জাতিতে যে কুলে আজ সোনা ফল্‌ছে—কর্ষণের অভাবে সে বংশ জাতি কুল পতিত জমির মতই নিষ্ফল হইয়া পড়িয়াছিল। কি শক্তিটারই না অপচয় হইয়া গিয়াছে! অন্নকে যে বহু করিতে হয়, শ্রমের মর্য্যাদা দিয়া যে সকল অন্ন ক্রয় করিয়া লইতে হয়—বিনা শ্রমের অন্নে যে অন্তরের ক্ষুধা নিবৃত্ত হয় না, অন্নের অভাব না থাকিলেও যে পরিশ্রম করিয়া, কর্ম্মযজ্ঞে ঘর্ম্মপাত করিয়া জীবনকে

সার্থক করিতে হয়—নিজের অভাব না থাকিলেও যে পরের অভাবের জন্য শ্রম করিতে হয়—প্রাচীন ভারতের এই বাণী আমাদের দেশ হারাইয়া ফেলিয়াছিল।

যে কাজ একটা বালক বা স্ত্রীলোকের দ্বারা অনায়াসে নিষ্পন্ন হইতে পারে—সে কাজে কত সবল সুস্থ বিচক্ষণ পুরুষ জীবন কাটাইয়া দিত! শক্তির কি অপপ্রয়োগ! যখন দেখি সবল সুস্থ যুবকের দল আজিও বসিয়া বসিয়া বিড়ি তৈরী করিতেছে, তখন তাহাদের কথা মনে পড়ে। কথা হইতে পারে—আজ কর্ম্মক্ষেত্র বিরাট ও বিচিত্র হইয়াছে, তাই সকল জাতির সকল পরিবারের লোক দলে দলে কর্ম্মক্ষেত্রে জুটিতেছে—কর্ম্মবিমুখতা গিয়াছে। উদরান্নের অভাব হইয়াছে—তাহারই তাড়নায় সকলে কর্ম্মক্ষেত্রে ধাবিত হইতেছে। যখন কর্ম্মক্ষেত্রই ছিল সংকীর্ণ এবং উদরান্নের অভাব ছিল না—তখন কর্ম্মঠতা আসিবে কি করিয়া?

তাহার উত্তর এই—মর্য্যাদাত্মক উদরান্নের অভাব তখনও ছিল—আর অন্নের অভাবই মানুষের একমাত্র অভাব নয়—মানুষ আজ শুধু উদরান্নের জন্যই খাটিতেছে না। আর কর্ম্মক্ষেত্রের কথা? কর্ম্মক্ষেত্র আগে—না—মানুষের স্বাভাবিক কর্ম্মশীলতা আগে? কর্ম্মশীলতাই কর্ম্মক্ষেত্র রচনা করিয়াছে—তাহাকে বিরাট ও বিচিত্র করিয়া তুলিয়াছে। কর্ম্মবিমুখতা যে দেশে ব্যবহারিক জীবনে মজ্জাগত, সে দেশে কর্ম্মক্ষেত্র কি করিয়া গড়িয়া উঠিবে?

বর্ত্তমান যুগে বিদেশী সভ্যতার প্রভাবে একদিকে যেমন দেশে কর্ম্মক্ষেত্র বিরাট ও বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে—তেমনি এদেশের লোকের দেহে মনে কর্ম্মপ্রচেষ্টা জাগিয়া উঠিয়াছে। স্বল্পে সন্তুষ্টির আদর্শ আজ লুপ্তপ্রায়। উদরান্নটাই আজ সব চেয়ে বড় কাঙ্ক্ষণীয় নয়—উদরান্ন ছাড়া দেহমনের অনেক অভাবই আজ আমাদিগকে তাড়না করিতেছে, জনসাধারণের আত্মমর্য্যাদা বোধটাও বাড়িয়া গিয়াছে। ইহার শেষ ফল ভাল কি মন্দ সে বিচার এখানে করিতে চাই না। কর্ম্মপিপাসা ও শ্রমস্পৃহা যে বর্ত্তমান সভ্যতার সংঘর্ষে জাগিয়া উঠিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যুগযুগ হইতে যে কর্ম্মবিমুখতা আমাদের মজ্জাগত, এখনও তাহা আমরা সম্পূর্ণ ঝাড়িয়া ফেলিতে পারি নাই—ইউরোপের আমেরিকার বা জাপানের তুলনায় এখনও আমরা অলস, আরামপ্রিয় ও শ্রমবিমুখ। সমগ্র ভারতবর্ষের কথা বলিতে পারি না—আমাদের বাঙ্গালাদেশ, বিশেষতঃ পশ্চিম বঙ্গ এখনও পূর্ব্বতন যুগের অলস জীবনের স্বপ্ন দেখিতেছে।

আহ্বান

শ্রীশিবশম্ভু সরকার, এম্‌-এ

আমারে করিয়া চূর্ণ যদি তুমি পূর্ণ হতে চাও
ধ্বংসের মরণ-রূপে হে অরূপ, রূপ ফিরে পাও
হেথা এ জীবন-নাটে! তাহে মোর নাহি কোন খেদ
কোন দ্বিধা, কোন লজ্জা, কোন মুগ্ধ স্বপনের ছেদ।
যে জীবন পায় নি তোমারে—যাহার অন্তর-মাঝে
বরষার ভারি মেঘ ফিরে নাই একান্ত অকাজে
দীর্ঘ ছায়া, স্বপ্ন পাখা মেলি!—মিছে তার গেল দিন
মিছে সে কুড়ায়ে তামা ঘরে আনে প্রাণান্তক ঋণ!

মুক্তির বাতাস মাগি' নিঃশ্বাস আকুল হ'ল যার
লঙ্ঘন করিছে নিতি প্রেম-প্রীতি-বন্ধনের তার
কঠিন নির্ম্মম বলে। চোখে যার নির্ব্বাক্ দৃঢ়তা
অস্বীকারি প্রিয়জনে দেখায়েছে পাষাণ-স্তব্ধতা
অটল অচল সম!—তারি নেত্রে কাঁদায়ে কেবল
হে নিষ্ঠুর! ফুটাইতে চাহ তব উৎস ছল ছল্!
ছিঁড়ে ফেল শতদল—চূর্ণ কর প্রেম, স্নেহ, মায়া!
তোমার স্বরূপে তুমি এনে দাও শ্মশানের ছায়া!

জগতের প্রতি রূপ, প্রতি ছন্দ মিশি একাকার—
তোমার প্রেমের বন্যা পূর্ণ হ'ক—ডুবুক আমার!

শ্রীঅরবিন্দ

(সমাপ্ত)

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী

[১৯০৯।১৫ই আগষ্ট—১৯১০।ফেব্রুয়ারী]

তৃতীয়াংশ

৪ঠা মাঘ (১৮ই জানুয়ারী হইবে) "ধর্ম্ম" পত্রিকায় অরবিন্দ লিখিলেন :—

"আমরা কি নিশ্চেষ্ট থাকিব ?—এখনও বিপ্লবকারিগণ লোকের মন গুপ্তহত্যা ও বলপ্রয়োগের পথে টানিতে পারে নাই কিন্তু কবে টানিতে পারিবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। একবার সেই অনর্থ ঘটিলে গভর্ণমেণ্টের বিপদ এবং দেশের দুর্দ্দশার আর সীমা থাকিবে না। আমরা এই আশঙ্কায় এবং দেশের নবজীবন রক্ষার আশায় জাতীয় পক্ষ সুশৃঙ্খলিত করিবার উদ্যোগ করিতেছিলাম। আমাদের ধারণা ছিল যে স্বাধীনতা লাভের নির্দ্দোষ পন্থা দেখাইতে পারিলে দেশ হইতে গুপ্তহত্যা উঠিয়া যাইবে। এখন বুঝিলাম ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট সেই পন্থা অবলম্বন করিতে দিবেন না। এই অবস্থায় স্বভাবতঃ এই চিন্তা মনে আসে, তাহাই হউক, তাঁহাদের যখন এই ধারণা যে আরও উগ্র-দণ্ডনীতি প্রয়োগ করিলে রোগের উপশম হইবে, তাঁহারা প্রাণ ভরিয়া দণ্ডনীতি প্রয়োগ করুন। আমরা চুপ করিয়া দেখি কিসেতে কি হয়, আমরা ভ্রান্ত, না তাঁহারা ভ্রান্ত। যখন ইংরেজ রাজনীতিবিদগণ নিজেদের ভুল বুঝিবেন, তখন আমাদের কর্ম্মের সময় আসিবে। এই পন্থাকে masterly inactivity, ফলবতী নিশ্চেষ্টতা বলা যায়।"

—['ধর্ম্ম',-৪ঠা মাঘ, ১৩১৬; পৃঃ ৩-৪]

"আমরা কি নিশ্চেষ্ট থাকিব ?"—এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া অরবিন্দ নিজেই উত্তর দিতেছেন, "আমরা চুপ করিয়া দেখি, কিসেতে কি হয়।" ইহার অর্থ,—গভর্ণমেণ্টের নিগ্রহনীতি ও গুপ্ত-হত্যাকারীর বোমা রিভল্‌ভারের গুলিবর্ষণ, এই উভয়ের সংঘর্ষে কি ফল দাঁড়ায়!—'masterly inactivity"র পন্থাই, দেশবাসীকে খোলসা বলিয়া, বাছিয়া লইতেছেন। তারপরে লিখিতেছেন :—

"চেষ্টার উপায়—যদি শেষে গভর্ণমেণ্ট জাতীয় শিক্ষাপরিষদকে বেআইনী জনতা বলিয়া জাতীয় বিদ্যালয় সকল বন্ধ করে, শিক্ষা দেওয়া, স্বদেশী কাপড় পরা, বিদেশী মাল না কেনা, শালিসীতে কলহ মিটানকে গুরুতর অপরাধ বলিয়া সশ্রম কারাবাস বা দ্বীপান্তরের ব্যবস্থা করেন,—আর যদি ট্রান্সভালবাসী কুলি ও দোকানদারদের সাহস, দেশহিতৈষিতা ও স্বার্থত্যাগ আমাদের গায়ে না থাকে, তাহা হইলে—না হয় পুলিশ ও গুপ্তবিপ্লবকারীর পন্থা আর রোধ করা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া সরিয়া পড়িব। সেই পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়া দেখা যাক।"

—["ধর্ম্ম", ৪ঠা মাঘ, ১৩১৬ ; পৃঃ ৪]

অরবিন্দ ট্রান্সভ্যালে মিঃ গান্ধীপরিচালিত নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের পন্থাও ভারতবাসীকে অবলম্বন করিতে বলিলেন।

পুলিশ ও বিপ্লবকারীর পন্থা আর রোধ করা, অরবিন্দ নিষ্প্রয়োজন মনে করিতেছেন। কেননা, ইহার একজন না থামিলে আর একজন থামিবে না। অথচ, ইহার দুইজনের কেহই থামিতে প্রস্তুত নয়। কাজেই অরবিন্দ খোলসা লিখিতেছেন যে, "সরিয়া পড়িব।" চন্দননগর প্রস্থানের দেড় মাস পূর্ব্বে অরবিন্দ স্থির করিলেন যে তিনি নিরুপায় হইয়া সরিয়া পড়িবেন। এবং একথা তিনি প্রকাশ্যে দেশবাসীকে লিখিয়া জানাইলেন।

আর একথাও লিখিলেন যে, আধ্যাত্মিক শক্তির (soul force) বলে, "সূক্ষ্ম ও স্থূল উপায়ে, স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে হইবে।" এই "সূক্ষ্ম উপায় নিশ্চয়ই যোগের পথ। তিনি ঐ সংখ্যাতেই লিখিতেছেন:—

"আমাদের আশা—আমাদের বাহুবল নাই, যুদ্ধের উপকরণ নাই, শিক্ষা নাই, রাজশক্তি নাই, আমাদের কিসেতে আশা; কোথায় সেই বল যাহার ভরসায় আমরা প্রবল শিক্ষিত যুরোপীয় জাতির অসাধ্য কাজ সাধিত করিতে প্রয়াসী হই? পণ্ডিত ও বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন,—ইহা বালকের উদ্দাম দুরাশা, উচ্চ আদর্শের মদে উন্মত্ত অবিবেকী লোকের শূন্য স্বপ্ন। যুদ্ধই স্বাধীনতা লাভের একমাত্র পন্থা, আমরা যুদ্ধ করিতে অসমর্থ, আমরাও যুদ্ধ করিতে পরামর্শ দিই নাই।

"কিন্তু ইহা কি সত্য কথা যে বাহুবলই শক্তির আধার, না শক্তি আরও গূঢ়, গভীর মূল হইতে নিঃসৃত হয়? ··· ··· কোন শক্তিতে দুর্ব্বল পক্ষের জিত হয়, প্রবল পক্ষের শক্তি পরাজিত বা বিনষ্ট হয়?—আমরা ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তসকল পরীক্ষা করিলে বুঝিতে পারিব, আধ্যাত্মিক শক্তির বলে এই অঘটন ঘটিয়াছে, আধ্যাত্মিক শক্তিই এই বাহুবলকে তুচ্ছ করিয়া মানবজাতিকে জানায় যে এই জগৎ ভগবানের রাজ্য, অন্ধ স্থূল প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র নহে। * * *

"যুরোপ আজকাল এই Soul Force বা আধ্যাত্মিক শক্তিকে আবিষ্কার করিতেছে, এখনও তাহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস নাই, তাহার ভরসায় কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয় না।

"কিন্তু ভারতের শিক্ষা, সভ্যতা, গৌরব, বল, মহত্ত্বের মূলে আধ্যাত্মিক শক্তি। যতবার ভারতজাতির বিনাশ কাল আসন্ন বলিয়া সকলের প্রতীতি হইবার কথা ছিল, আধ্যাত্মিক বল গুপ্ত-উৎস হইতে উগ্রস্রোতে প্রবাহিত হইয়া মুমূর্ষু ভারতকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছে। এখনও সেই উৎস শুকাইয়া যায় নাই, আজও সেই অদ্ভুত মৃত্যুঞ্জয় শক্তির ক্রীড়া হইতেছে। —(৫ পৃষ্ঠা)

"ভারতীয় সভ্যতার বলে, আধ্যাত্মিক শক্তিতে, আধ্যাত্মিক শক্তিতে স্বষ্ট, সূক্ষ্ম ও স্থূল উপায়ে স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে হইবে। সেইজন্য ভগবান আমাদের পাশ্চাত্য ভাবযুক্ত আন্দোলন ধ্বংস করিয়া বহির্মুখী শক্তিকে অন্তর্মুখী করিয়াছেন।

"ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় দিব্যচক্ষুতে যাহা দেখিয়াছিলেন, দেখিয়া বার বার বলিতেন,—"শক্তিকে অন্তর্মুখী কর"—কিন্তু সময়ের দোষে তখন কেহ তাহা করিতে পারে নাই, স্বয়ং করিতে পারেন নাই, কিন্তু ভগবান আজ তাহা ঘটাইয়াছেন।

"ভারতের শক্তি অন্তর্মুখী হইয়াছে,—যখন আবার বহির্মুখী হইবে আর সেই স্রোত ফিরিবে না। সেই ত্রিলোকপ্লাবনী গঙ্গা ভারত প্লাবিত করিয়া অমৃতস্পর্শে জগতের নূতন যৌবন আনয়ন করিবে।" (৬ পৃষ্ঠা)

—["ধর্ম্ম", ৪ঠা মাঘ, ১৩১৬]

অরবিন্দ বলিলেন, "আমাদের যুদ্ধের উপকরণ নাই।" এবং তিনিও রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে পরামর্শ দেন না। যুদ্ধের পরিবর্ত্তে, আধ্যাত্মিক শক্তির "সূক্ষ্ম ও স্থূল" উপায়ে, স্বাধীনতা লাভ করিতে হইবে। সূক্ষ্ম উপায়টি বোঝা যাইবে না, কিন্তু স্থূল উপায়টিও পরিষ্কার বলা হইল না।

অরবিন্দ ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের কথা উল্লেখ করিয়া "শক্তিকে অন্তর্মুখী"করিলেন। ভারতের শক্তি অরবিন্দের মধ্যে অন্তর্মুখী হইতে চলিল। অরবিন্দের পণ্ডিচারীর ভবিষ্যৎ জীবনের সূত্রপাত আমরা তাঁহার চন্দন নগর প্রস্থানের দেড় মাস পূর্ব্বেই দেখিতে পাইলাম।

গভর্ণমেণ্টের নিগ্রহ-নীতি ও সন্ত্রাসবাদের সংঘর্ষের ফলে চারিদিকে যে আগুন জ্বলিয়া উঠিল, এই সপ্তাহের "সংবাদ" গুলির মধ্যেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।—

"ভারতীয় সংবাদ—(১) লাহোরে বাঙ্গালী গ্রেপ্তার,—(২) লাহোরে রাজদ্রোহ,—(৩) দক্ষিণ মহারাষ্ট্র দেশে যুদ্ধ ঘোষণা "সার জর্জ বার্ডউড টাইমস্ পত্রিকায় লিখিয়াছেন দক্ষিণ মহারাষ্ট্র প্রদেশে ইংরেজের বিরুদ্ধে হিন্দুর মন্দিরে মন্দিরে নাকি যুদ্ধ-ঘোষণা-সূচক মন্ত্রাদি পাঠ এবং প্রতিজ্ঞাবন্ধন চলিতেছে,"—(৪) নাসিকের হত্যাকাণ্ড—"খানাতল্লাসী ও গ্রেপ্তার অবিরাম স্রোতে চলিয়াছে"—(৫) লাহোরে বিপ্লববাদীদের কাণ্ড,—(৬) আবার ট্রেনে গুলি—"গত বৃহস্পতিবার শিয়ালদহের

সন্নিকটে ৫৭নং আপ ট্রেনে কে বন্দুক ছুড়িয়াছিল"—(৭) কাশ্মীরে বিপ্লব ভয়—(৮) ময়মনসিংহে ডাকাতি—(৯) মিঃ জ্যাক্‌সনের হত্যাকাণ্ডে প্রতিবাদ সভা—(১০) বিপ্লবের প্রতিবাদ—(১১) ছোট লাটের প্রাণনাশ চেষ্টা—(১২) নেতরার ডাকাতি—(১৩) লাহোরে অধ্যাপক পরমানন্দ গ্রেপ্তার—(১৪) আম্বালায় খানাতল্লাসী—(১৫) পাতিয়ালায় রাজদ্রোহ—(১৬) বাহুর ডাকাতির জের—(১৭) লক্ষ্ণৌয়ে ৬ জন বাঙ্গালীর খানাতল্লাস।"

—["ধর্ম্ম", ৪ঠা মাঘ, ১৩১৬]

উপরের সংবাদগুলি "ধর্ম্ম" পত্রিকায় ছাপা হইয়াছে। উড়িষ্যা ও মাদ্রাজ ব্যতিরেকে বাঙ্গালার সন্ত্রাসবাদ মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবে আগুন জ্বালিয়া দিয়াছে। চারিদিকের পরিস্থিতির মধ্যে যেন স্বয়ং ছিন্নমস্তা আবির্ভূতা হইয়া এক নিদারুণ বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়াছেন। জাতীয় দল নেতাশূন্য। বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষে একা অরবিন্দ কোন দিক সামলাইতে পারিতেছেন না। এই সংবাদগুলি শামসুল্ আলম্ হত্যার মাত্র এক সপ্তাহ পূর্ব্বের খবর।

মিঃ গান্ধী ও মিঃ পোলক—মিঃ গান্ধী এই সময় ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। তিনি ও মিঃ পোলক ১৯১০।১৮ই জানুয়ারী আগ্রা টাউনহলে বক্তৃতা করিলেন। তিনি ট্রান্সভাল-বাসীর জন্য অর্থ সাহায্য চাহিলেন এবং নাসিকে মিঃ জ্যাকসনের হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করিলেন। অরবিন্দের মত এই হত্যাকাণ্ডকে "boldest of the many bold acts of violence" বলিয়া অভিহিত করিলেন না। ১৯০৬ খৃঃ হইতেই মিঃ গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় শান্তভাবে আইন অমান্য করিয়া, দলে দলে ভারতীয় কুলি-দের লইয়া, জেলে গমন আরম্ভ করিয়াছেন। বিপিন পাল যে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের তত্ত্ব ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালাদেশে এবং সমগ্র ভারতবর্ষে ব্যাখ্যা ও প্রচার করিয়াছেন, ঠিক সেই বৎসরেই মিঃ গান্ধী ইহা দক্ষিণ আফ্রিকায় হাতেকলমে দেখাইতে সুরু করিয়াছেন। কিন্তু ১৯০৯, অক্টোবর মাসে যদিও মিঃ গোখলে ট্রান্সভালবাসীদের গভর্ণমেণ্টকে ট্যাক্‌স দেওয়া পর্য্যন্ত বন্ধ করিতে বলিলেন, তথাপি তিনি আশঙ্কা করিলেন যে গভর্ণমেণ্ট এই উদ্যমকে শান্তভাবে থাকিতে দিবেন না। ("Government will provoke it to be violent.")

১৯১০, ফেব্রুয়ারী—অরবিন্দ রাজনৈতিক পরিস্থিতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া ফেব্রুয়ারীর প্রথমেই লিখিলেন,—

"আমাদের নিরাশা—আমরা আশা করিয়া-ছিলাম, বৈধ ও নির্দ্দোষ উপায় অবলম্বন করিয়া, সাহস, দৃঢ়তা, শান্ততার সহিত জাতীয় আন্দোলন আবার জাগাইয়া ও সুপথে চালাইয়া আমরা দুই অতি প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারিব। ১ম, লোকের মনে বৈধ উপায়ের শ্রেষ্ঠতায় ও ফলবত্তায় বিশ্বাস উৎ-পাদন করাইয়া এখন যে গুপ্ত হত্যা ও বলপ্রয়োগের দিকে যুবকদের মনের আকর্ষণ হইতেছে, তাহা বন্ধ করিতে পারিব। ২য়, রাজপুরুষগণকে বৈধ প্রতিরোধের ফলে সভ্য উপায়ে দুই জাতির হিতের সংঘর্ষজনিত যুদ্ধ চালাইবার আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেশের উন্নতি সাধন করিব এবং দেশের স্বাধীনতা ক্রমে ক্রমে আদায় করিব। আমাদের এখনো বিশ্বাস যে এই উপায় অবলম্বন করিতে পারিলে দুইটি উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইবে। কিন্তু সেই উপায় অবলম্বন করা এক প্রকার অসাধ্য হইয়া উঠিতেছে।

প্রথম অন্তরায়,—লোকের অনাস্থা ও উৎসাহের অভাব। বৈধ উপায় অবলম্বন করিতে পারিলে আমরা উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে পারিব। প্রৌঢ় লোকের মধ্যে এই বিশ্বাস আছে, মধ্যপন্থীর অনুমোদিত উপায়ের উপর হইতে সকলের আস্থা উঠিয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহা হইলেও কি হয়, গভর্ণমেণ্ট সেই বৈধ উপায় অবলম্বন করিতে দিবেন না। তাঁহাদের হাতে যখন আইন করিবার সম্পূর্ণ অধিকার, জজ ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিশ তাঁহাদেরই চাকর, দেশবাসীর প্রভু, তখন কোনও বৈধ আন্দোলন করা

অসম্ভব। আমরা দেখিয়াছি, এই মতের এত প্রাবল্য হইতেছে যে বৈধ আন্দোলন ও বৈধ প্রতিরোধ আর চলে না।

"লোকের আস্থা নাই, শ্রদ্ধা নাই, শ্রদ্ধারহিত কর্ম্ম বৃথা, তাহার ফল 'ন চৈবামুত্র ন ইহ'। বৈধ আন্দোলনের পক্ষে স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন মতের প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা আবশ্যক, নচেৎ আন্দোলন হইতে পারে না।...... মনে মনে স্বাধীন চিন্তা পোষণ করাও বিপজ্জনক, কেননা বিনা কারণে খানাতল্লাসী, অমূলক সন্দেহে গ্রেপ্তার এবং বিনা অভিযোগে নির্ব্বাসন, প্রত্যেক স্বাধীনতা-লিপ্সুর পথে এই তিন বিপদ সর্ব্বদা গ্রাস করিতে উদ্যত। এই অবস্থায় আন্দোলন করা এক প্রকার আইনে নিষিদ্ধ।—

{ —নির্জ্জীব আন্দোলন নিরর্থক।
{ —সজীব অন্দোলন অবৈধ।

কাজেই লোকে আর আন্দোলন করতে অনিচ্ছুক।

দ্বিতীয় অন্তরায়,—বিপ্লবকারীর অদমনীয় উদ্দাম চেষ্টা। যাহাতে আমরা দমিয়া যাই, তাহাতে বিপ্লবকারীর তেজ ও উৎসাহ জাগিয়া উঠে। যত নিপীড়ন কর সে তত হত্যা করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে ছুটিয়া আসে। আশু বিশ্বাসের হত্যার পরে সেই অশান্তি প্রায় নিবিয়া গিয়াছিল। নূতন চিফ্ জাষ্টিসের সুবিচারে, রিফর্ম্মের কোলাহলে, হুগলিতে জাতীয় পক্ষের পুনরুত্থানে, লোকের মনে আশা উৎপন্ন হইয়াছিল যে আবার বুঝি বৈধভাবে জাতীয় জাগরণকে উদ্দেশ্যের দিকে চালাইবার সুবিধা দেওয়া হইয়াছে। সেই আশার আলোক নিবিড়তর অন্ধকারে মিশিয়া গিয়াছে। এদিকে রাজনৈতিক ডাকাতির জন্য দেশময় ধরপাকড় ও খানাতল্লাসীতে বিপ্লবকারীদের তেজ ও আশা উদ্দীপিত হইয়াছে। নাসিকে খুন, পূর্ব্ব বাংলা রেলওয়েতে গুলি চালান, হাইকোর্টে সামসুল আলমের হত্যা, এইরূপে দিন দিন নূতন ঘটনা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহার শেষ কোথায়?

প্রথম ফল,— রাজপুরুষগণ সমস্ত দেশের উপর চটিয়াছেন, আন্দোলনের অবশিষ্ট ক্ষীণ বহ্নিটুকু নিবাইতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। নিগ্রহের বৃদ্ধিতে গুপ্তহত্যার বৃদ্ধি, গুপ্তহত্যার বৃদ্ধিতে নিগ্রহের বৃদ্ধি, এইরূপ ক্রোধের শেষ কোথায়? রাজপুরুষদের বিবেচনারহিত ক্রোধ, বিপ্লবকারীর বিবেচনারহিত উন্মত্ততা, এই দুই শক্তির সংঘর্ষে, নিষ্পেষণে পড়িয়া আমাদের আন্দোলন মরিয়া যাইতেছে।

এ অবস্থায় করিব কি? যখন গভর্ণমেণ্টের ইচ্ছা যে আমরা চুপ করিয়া থাকি, নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকি, যখন দেশবাসী আর রব করিতে চায় না, তখন নীরব ও নিশ্চেষ্ট থাকাই শ্রেয়ঃ। ইংরেজ বলে জাতীয় পক্ষের সংবাদ পত্র ও বক্তাই দায়ী, তাঁহাদিগকে যদি থামাইতে পারি, বিপ্লবকারীর চেষ্টা আপনি থামিয়া যাইবে।

—তবে তাহাই হউক।

—আমরা থামিয়া গেলাম। নীরব নিশ্চেষ্ট হইলাম। দেখি তোমাদের অভিযোগ সত্য না মিথ্যা।

রাজনীতিচর্চ্চা কয়েক দিন পরিত্যাগ করিয়া আমরা ভারতের আধ্যাত্মিক শক্তি, ভারতের চিন্তার গভীরতা, কর্ম্মক্ষেত্রে আনাইবার চেষ্টা করি।"

—["ধর্ম্ম" ১৮ই মাঘ, ১৩১৬ ; পৃঃ ৪-৫]

অরবিন্দের এই দীর্ঘ প্রবন্ধ এই জন্য তুলিয়া দিলাম যে, দুই তিন মাস পূর্ব্ব হইতেই, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, তিনি তাঁহার প্রস্থানের কারণগুলি একের পর আর—নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করিয়া—বিশদরূপে দেশবাসীকে বুঝাইয়া দিয়া যাইতেছেন,—পাছে কেহ তাঁহাকে ভুল না বোঝে।

পরিস্থিতির আর এক দফা—এই পরিস্থিতির গুরুত্ব খুব বেশী, কেননা ইহার বিভীষিকাই অরবিন্দের প্রস্থানের প্রধান কারণ। ১৯০২ খৃঃ হইতে সন্ত্রাসবাদ প্রবর্ত্তন করিয়া কালচক্রের গতিতে যে পরিস্থিতি বহু পরিমাণে তিনি নিজে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই নিজের সৃষ্টিই তাঁহাকে এখন গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে; এবং তাঁহার নিজের সৃষ্টিই তাঁহাকে চিরজীবনের মত প্রিয় জন্মভূমি হইতে নির্ব্বাসিত করিবে। স্বেচ্ছায় তিনি আজীবন নির্ব্বাসন বরণ করিবেন। অরবিন্দ তাঁহার মা কালীকে এই অবস্থায় বলিতে পারেন—"দোষ কারু নয় গো শ্যামা—আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি।"

কয়েকটি "ভারতীয় সংবাদ"—(১) পুণায় অস্ত্রশস্ত্র অধিকার—(২) "সিন্ধী"র সম্পাদকের দ্বীপান্তর—(৩) "খুলনাবাসী" রাজদ্রোহ— (৪) সরকারী ডাক লুট—(৫) হাইকোর্টে হত্যাকাণ্ড, গোয়েন্দা আলম খুন—(৬) আরও গ্রেপ্তার, "কৃষ্ণনগর হইতে উকিল ললিত কুমার চট্টোপাধ্যায়কে ও তাঁহার মুহুরীকে গ্রেপ্তার করিয়া কলিকাতায় আনা হইয়াছে।" —(৭) দিনাজপুরে থানাতল্লাসী—(৮) ভাই পরমানন্দের মামলা—(৯) ১০ম জাট সৈন্যদল।—"ইহাদের মধ্যে বিদ্রোহ চেষ্টার কথা আমরা পাঠকবর্গকে জানাইয়াছি। উক্ত সৈন্যদলকে আর আলিপুরে রাখা হইবে না।"—(১০) ডাকাতির অনুসন্ধানের ফল—(১১) ময়মনসিংহে গ্রেপ্তার—(১২) রাজসাহীতে ভীষণ ডাকাতি—(১৩) কিশোরগঞ্জে খানাতল্লাস—(১৪) পাবনায় বন্দুক চুরি—(১৫) পুণায় বিপ্লববাদী—(১৬) বেশান্ত ও কৃষ্ণবর্ম্মা,—মিসেস্ বেশান্ত লিখিয়াছেন—

"মিঃ শ্যামজী কৃষ্ণবর্ম্মা এদেশে প্রভূত পরিমাণে বৈপ্লবিক সাহিত্য প্রচার করিয়াছেন। 'ভীরু' এই বিশেষণটি দ্বারাও কৃষ্ণবর্ম্মার প্রকৃত চরিত্র বর্ণিত হয় না। তিনি নিজে বিদেশে সুখশান্তিতে সুরক্ষিত হইয়া ভারতবাসীদিগকে উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল কার্য্যে উত্তেজিত করিতেছেন। এরূপ লোকের প্রতি কোন প্রকার কটূক্তিই কঠোর বা অতিরঞ্জিত হইতে পারে না"—

—["ধর্ম্ম", ১৮ই মাঘ, ১৩১৬ ; পৃঃ ১৬]

হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াই মিসেস্ বেশান্ত ও ভগিনী নিবেদিতা আমাদের দেশে আসিয়াছিলেন। দেখা গেল, মিসেস্ বেশান্ত আমাদের দেশে সন্ত্রাসবাদের ঘোর বিরোধী। কিন্তু ভগিনী নিবেদিতা আয়র্ল্যাণ্ডের মেয়ে এবং আমাদের দেশে আয়র্ল্যাণ্ডের "সিন্ ফিন্" মতাবলম্বী সন্ত্রাসবাদ প্রচলনের পক্ষপাতী। মিসেস্ বেশান্তের সহিত অরবিন্দের কোন যোগ ছিল না। কিন্তু ভগিনী নিবেদিতার সহিত বরোদায় প্রথম সাক্ষাতের (১৯০৪ খৃঃ) পর হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত (১৯১১ খৃঃ) ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে

অরবিন্দ লিখিতেছেন :—

"গত রবিবার আমরা স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসবে যোগদান করিতে বেলুড় মঠে গিয়াছিলাম। আমি একজন কল্পনাপ্রিয় ভাবুক ব্যক্তি। আমার ভাব এই যে, হিন্দুজাতি সমগ্র জগতকে জয় করিবে।"

অরবিন্দ রাজনীতিক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া জগতে হিন্দুধর্ম্ম প্রচারের কথাই বলিতেছেন। এবং এই পথে অগ্রসর হইতে স্বামী বিবেকানন্দের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইতেছেন। ফেব্রুয়ারীর শেষভাগে অরবিন্দ চন্দন নগর প্রস্থান করেন। এবং মার্চ্চ মাস চন্দন নগর মতিলাল রায়ের বাড়ীতেই আত্মগোপন করিয়া থাকেন। কিন্তু মার্চ্চ মাসে "ধর্ম্ম" পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ, জন্মতিথি উৎসব, পুনরায় জন্মতিথি উৎসব—এই তিনটি প্রবন্ধ বাহির হয়। এখন প্রশ্ন, এই লেখাগুলি কাহার? আভ্যন্তরীণ প্রমাণে দেখিতেছি, এই লেখাগুলির মধ্যে অরবিন্দের এই সম্পর্কে আগের লেখার ভাব ও ভাষা জাজ্বল্যমান। ১৪ই মার্চ্চের (৩০শে ফাল্গুন) জন্মতিথি-উৎসব প্রবন্ধে লেখা আছে—

—"ভারত যে এবার জাতীয় জীবন ও সনাতন ধর্ম্ম স্থাপন করিবে তাহা নহে—সমস্ত পৃথিবীর জাতীয় জীবনের রক্ষাকর্ত্তা হইবে ও মহান ধর্ম্মদান করিবে। তাই তিনি (বিবেকানন্দ) অন্য দেশে জন্মগ্রহণ না করিয়া এই ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।"... "বিবেকানন্দই আমাদের জাতীয় জীবন গঠন কর্ত্তা, তিনি ইহার প্রধান নেতা।"

স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে এইরূপ উচ্চ প্রশংসা তিনি "কর্ম্মযোগিন্" পত্রিকার সূচনাতেই লিখিয়াছেন। মার্চ্চ মাসের উল্লিখিত প্রবন্ধগুলির ভাব ও ভাষা দুই-ই অরবিন্দের। পরিষ্কার বোঝা যায়। হয় তিনি ইহা আগে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, না হয় চন্দন নগর হইতে লিখিয়া পাঠাইয়া থাকিবেন। "কর্ম্মযোগিন্" পত্রিকাতেও

এই মার্চ্চ মাসে অরবিন্দের লেখা বাহির হইয়াছে। যেমন, "বাজী প্রভু"। এবং সেই সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস সম্বন্ধেও একটি লেখা বাহির হইয়াছে। "বাজী-প্রভু" অরবিন্দ ভিন্ন আর কেহ লিখিতে পারেন না।

১৩ই ফেব্রুয়ারী নয়জন নেতা, যাঁহারা ১৯০৮, ডিসেম্বরে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা মুক্তি পাইলেন।

"গত মঙ্গলবার (১১ই ফেব্রুয়ারী) শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী ও সতীশ চাটার্জ্জি রেঙ্গুন মেল ষ্টিমারে কলিকাতা আসিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ চাঁদপাল ঘাটে উপস্থিত ছিলেন।" —["ধর্ম্ম,"—৯ই ফাল্গুন, ১৩১৬]

১৬ই ফেব্রুয়ারী অরবিন্দকে আমরা কলিকাতায় চাঁদপাল ঘাটে উপস্থিত দেখিলাম।

নির্ব্বাসিতের মুক্তি—বড়লাট (লর্ড মিণ্টো) বক্তৃতায় বলেন—

"দেশে এখন রাজনীতিক অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। নির্ব্বাসিতেরা যে রাজনীতিক আন্দোলনের নেতা ছিলেন, তাহা রাজবিদ্রোহমূলক ছিল বটে, কিন্তু এখন তাহা বিপ্লববাদীদিগের ষড়যন্ত্রে পরিণত হইয়াছে। তাঁহারা যে রাজনীতিক আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাহা এই রাজনীতিক আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ন্যায়তঃ পরিগণিত হইতে পারে না।" —["ধর্ম্ম", ২রা ফাল্গুন, ১৩১৬]

১২ই ফেব্রুয়ারীর 'কর্ম্মযোগিন্'-এ বড়লাটের বক্তৃতা সম্বন্ধে এই কথা লেখা হইল—

"**Viceroy's Speech**—Release of deportees (1) the political movement of which they were leaders—seditious as it was—has degenerated into an anarchical plot, which can no longer be legitimately included as part of the political agitation in which they were so culpably implicated.—(2) We are now face to face with an anarchical conspiracy waging war against British and Indian communities alike."

রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে বড় লাট যে মন্তব্য করিলেন অরবিন্দের মন্তব্যের সহিত তাহার সম্পূর্ণ মিল রহিয়া গিয়াছে। এখন কেবল অরাজকতামূলক রাজার সহিত যুদ্ধপ্রয়াসী বৈপ্লবিক দলের মুখোমুখি সংঘর্ষ চলিতেছে। সভা-সমিতির আন্দোলনকারিগণ সম্পূর্ণ নীরব হইয়া গিয়াছেন। অরবিন্দ এই কথাই গত দুই মাস যাবৎ, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, বলিয়া ও লিখিয়া আসিতেছেন। তবে বড়লাট যে সন্ত্রাসবাদীদের anarchist, অরাজকতা-সৃষ্টিকারী, বলিয়াছেন অরবিন্দ ঐ সংখ্যাতেই ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। অরবিন্দ লিখিলেন যে, বাঙ্গলা তথা ভারতের সন্ত্রাসবাদীরা তো অরাজকতা চায় না,—সুশৃঙ্খলাপূর্ণ রাজ্যশাসনই চায়, এবং ইংরেজের অত্যাচারপূর্ণ শাসনে উহা সম্ভবপর নয় বলিয়াই এই বিদেশী শাসন উচ্ছেদ করিয়া স্বাধীন, স্বদেশী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে চায়।

"Anarchism—It is different from Terrorism. The Irish Fenians did the same thing as the Indian Terrorists are now practising, but nobody ever called them Anarchists." [Karma-yogin, 12th February]

চন্দন নগর প্রস্থানের মাত্র দুই সপ্তাহ পূর্ব্বেও স্বয়ং বড়লাটের কথার প্রতিবাদে অরবিন্দ আয়র্ল্যাণ্ডের "সিন ফিন"দের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া ভারতের সন্ত্রাসবাদীদিগকে সমর্থনই করিয়া গেলেন। পার্ণেলের প্রভাব শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার মধ্যে লক্ষ্য করা যাইতেছে।

বড়লাট যখন সভাসমিতির আন্দোলনকারী নেতাদিগকে মুক্তি দিতেছেন, ঠিক সেই সময়েই অরবিন্দকে নির্ব্বাসন ও গ্রেপ্তারের চেষ্টা করিতেছেন কেন? তবে কি গভর্ণমেণ্ট অরবিন্দকে শুধু সভাসমিতির আন্দোলনকারী নেতা বলিয়া মনে করেন না? পরন্তু, সন্ত্রাসবাদীদের নেতা বলিয়া বিশ্বাস করেন?

গীতায় বিশ্বরূপ-দর্শন, বিপিনচন্দ্র ও অরবিন্দ— সন্ত্রাসবাদ সম্বন্ধে বিপিনচন্দ্র ও অরবিন্দের মতপার্থক্য আমরা দেখিয়াছি। গীতা সম্পর্কেও একটা মতপার্থক্যের দৃষ্টান্ত দিতেছি। অরবিন্দ লিখিতেছেন—

"'বন্দেমাতরম্' শীর্ষক প্রবন্ধে আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু বিপিনচন্দ্র পাল অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ দর্শনের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে ইহা সম্পূর্ণ অসত্য, কবির কল্পনামাত্র। আমরা এই কথার প্রতিবাদ করিতে বাধ্য।......বিশ্বরূপ দর্শন কল্পনা নয়, উপমা নয়, সত্য; অতিপ্রাকৃত সত্য নহে—কেন না, বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্গত, বিশ্বরূপ অতিপ্রাকৃত হইতে পারে না। বিশ্বরূপ কারণজগতের সত্য, কারণ-জগতের রূপ দিব্যচক্ষুতে প্রকাশ হয়। দিব্যচক্ষু প্রাপ্ত অর্জ্জুন কারণজগতের বিশ্বরূপ দেখিলেন।" (পৃঃ ২)

"বিপিন বাবু উত্তরে লিখিতেছেন,—('বন্দেমাতরম্')

"অর্জ্জুন যাহা দিব্যচক্ষে আপনার অন্তরে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহা মিথ্যাও নহে, কল্পনাও নহে। তাহা সত্য। সে সত্য অ-প্রাকৃত। গীতায় সে সত্যের ছবি নাই। ভাষা অপ্রাকৃত অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করিতে পারে না।" (পৃঃ ৭)—("ধর্ম্ম," ২৫শে মাঘ, ১৩১৬)।

কারণজগতের রূপ ও দিব্য চক্ষু সম্পর্কে অরবিন্দ যতটা নিঃসংশয়, বিপিনচন্দ্র ততটা নয়। অরবিন্দের দৃষ্টি রহস্যে পূর্ণ (mystic), আর বিপিনচন্দ্রের দৃষ্টি যুক্তির প্রখর কিরণে সমুজ্জ্বল।

অরবিন্দ ভবিষ্যৎ জীবনে যে যোগপথ অবলম্বন করিবেন তাহার পূর্ব্বাভাস তিনি দিয়া যাইতেছেন।

"প্রকৃতি জয়—প্রবল ইচ্ছা, কঠোর তপস্যা দ্বারা প্রকৃতিকে জয় করা যাইতে পারে। কিন্তু এই নিগ্রহের পন্থার এক আশঙ্কা এই যে আপাততঃ ফলদায়ী হইলেও, অকস্মাৎ এক মুহূর্ত্তে বিদ্রোহী হইয়া আপন আপন রুদ্ধ ক্ষুধার পরিতৃপ্তি চাহে। আমাদের পুরাণে মহা মহা তপস্বী মুনিঋষিদের অকস্মাৎ পদস্খলনের দৃষ্টান্ত সকল এই মহা সত্যই ঘোষণা করিতেছে।

"প্রকৃতি জয়ের প্রকৃষ্ট পন্থা কেবলমাত্র বুদ্ধি নির্লিপ্ত করা, প্রকৃতির উপরই সকল ভার অর্পণ করা। আমার মধ্য দিয়া যে সকল চিন্তা, যে সকল ভাব, যে সকল কর্ম্মের স্রোত বহিয়া যাইতেছে তাহা আমি কোন প্রকারে বাধা দিব না। প্রকৃতি যাহা করে তাহা সর্ব্বতোভাবেই স্বীকার করিয়া লইব। এইরূপে প্রকৃতিকে তাহার নিজ মনোমত পথ অনুসরণ করিতে দিলে সে সর্ব্বাপেক্ষা সরল, শীঘ্রতম, ধ্রুব ও প্রকৃষ্ট পন্থাই লইবে। সে আপনা হইতেই ত্যাগ ভোগ সংযমের দ্বারা সকল ময়লা, সকল কালিমা বিদূরিত করিয়া পুরুষকে শাশ্বত আনন্দেই প্রতিষ্ঠা করিবে। যে জোর করিয়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য স্থাপন করে, সে মহৎ বটে; কিন্তু প্রকৃতি আপনা হইতেই যাহার দাসী হইয়া সেবা করে, সে মহত্তর।......

"ত্যাগ ও ভোগ—বিনা ভোগে ত্যাগ সম্ভব নয়।......আমাদের পুরা মাত্রায় ভোগ করা চাই। সর্ব্বোচ্চ ভোগ নহিলে সর্ব্বোচ্চ ত্যাগ সম্ভব নয়। পূর্ণ ত্যাগ পূর্ণ ভোগ নহিলে সম্ভবে না। ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন রাজগণ পূর্ণ ভোগ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতেন। আমাদের চাই পূর্ণ ভোগ ও পূর্ণ ত্যাগ।" ["ধর্ম্ম", ১৬ই ফাল্গুন, ১৩১৬]

সাংখ্যের পুরুষ যেমন প্রকৃতির উদ্দাম আচরণ ও গতিকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়া নিজে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, অরবিন্দের যোগপথও ঠিক তদনুরূপ। প্রকৃতির উদ্দাম আচরণকে বাধা দিবার পক্ষপাতী অরবিন্দ নহেন। পাতঞ্জল যে বলিয়াছিলেন, যোগ চিত্তবৃত্তির নিরোধ, অরবিন্দ তাহা মানেন না। স্বামী বিবেকানন্দের যোগ পাতঞ্জল-অনুমোদিত। আর অরবিন্দের যোগ সম্পূর্ণ পাতঞ্জল-বিরোধী। ভোগ সম্বন্ধেও সেই একই কথা। আগুনে ঘি ঢালিলে যেমন আগুন নেবে না, আরও বেশী জ্বলিয়া উঠে,—অবিরত ভোগবাসনা চরিতার্থ করিতে গেলে ভোগস্পৃহা বাড়িয়াই যাইবে। কোনদিন ত্যাগ আসিবে না। ইহাই প্রাচীন শাস্ত্রকারদিগের অভিমত। কিন্তু মনস্তত্ত্বে অরবিন্দের নূতন আবিষ্কার আমাদিগকে নূতন কথা শুনাইতেছে। অরবিন্দের ভবিষ্যৎ যোগপথের আভাস তিনি

প্রস্থানের প্রাক্‌কালে আমাদিগকে দিয়া যাইতেছেন। অরবিন্দের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা—

(১) অরবিন্দ ধর্ম্মজীবনে প্রথমে নাস্তিক ছিলেন, পরে অতিশয় ঈশ্বরভক্ত হইলেন। এ পরিবর্ত্তন অপেক্ষাও তাঁহার রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন কম গুরুত্বপূর্ণ নহে। অরবিন্দের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা বিশ বৎসরের (১৮৯০-১৯১০) ইতিহাস। তাহার মধ্যে বাঙ্গালাদেশে প্রকাশ্য রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি ১৯০৬, আগষ্ট হইতে ১৯১০, ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়াছেন। এই সময়ের মধ্যে এক বৎসর বাদ দিলে, মাত্র দুই বৎসর সাত মাস তাঁহার প্রকাশ্য রাজনীতিক্ষেত্রের কর্ম্মজীবন। আর অন্ধকারে গুপ্তসমিতির প্রবর্ত্তন ব্যাপারে প্রথমে তিন বৎসর (১৯০২-০৪), আর দ্বিতীয় পর্ব্বেও (১৯০৬-০৮) তিন বৎসর, এই মোট ছয় বৎসর।

(২) ১৪ বৎসর বিলাতে থাকিয়াই ইংরেজের রাজনীতির সহিত তিনি সুপরিচিত ছিলেন, একথা তিনি নিজেই বলিয়াছেন। কেম্‌ব্রিজ মজলিসে ভারতবর্ষের রাজনীতি সম্বন্ধে তিনি বক্তৃতা দিতেন। প্রথমে তিনি কংগ্রেসের পক্ষপাতী ছিলেন। পরে, পার্ণেলের প্রভাবে, কংগ্রেসের "আবেদন-নিবেদন" নীতির উপর আস্থা হারাইলেন। দেশে ফিরিয়া কংগ্রেসের "আবেদন-নিবেদন" নীতির বিরুদ্ধে (১৮৯৩-৯৪) তীব্র সমালোচনা করিলেন, ফরাসী বিদ্রোহের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিলেন। পরে, তিনি কলিকাতা ও সুরাট কংগ্রেসে যোগ-দান (১৯০৬-০৭) করিলেন। লাহোর (১৯০৯) কংগ্রেসে তিনি ইচ্ছা করিলেও, মডারেটেরা তাঁহাকে যোগদান করিতে দিলেন না।

(৩) তিনি বরিশাল (১৯০৬) কন্‌ফারেন্সে গিয়াছিলেন। মেদিনীপুর (১৯০৭) কন্‌ফারেন্সে মডারেটদের ছাড়িয়া জাতীয় দলে পৃথক কন্‌ফারেন্স করিয়াছিলেন। পরে, হুগলী (১৯০৯) কন্‌ফারেন্সে কিছুটা নত হইয়াই মডারেটদের সহিত আপোষ করিয়া ছিলেন। শ্রীহট্ট জেলা সমিতিতে হুগলী অপেক্ষা কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

(৪) দেশে ফিরিবার কয়েক মাস পরেই (১৮৯৩) তিনি কংগ্রেসের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আন্দোলনকে আক্রমণ করিয়া প্রলেটরিয়টবাদী হইয়াছিলেন। পরে, (১৯০৭) মর্লির শাসন-সংস্কারের প্রতিবাদ করিতে গিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন যে ইহা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রভাব খর্ব্ব করিবে, এবং এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীই প্রলেটরিয়টদের মস্তিষ্ক স্বরূপ। মধ্যবিত্ত শ্রেণী সম্পর্কে ১৮৯৩ হইতে ১৯০৭—অনেক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায়।

(৫) তিনি যখন গুজরাট গুপ্তচক্রের প্রেসিডেন্ট ছিলেন, সেই সময়ে (১৯০২-০৪) নিজে বাঙ্গালা দেশে আসিয়া গুপ্তসমিতির প্রথম পর্ব্বের উদ্বোধন করেন। কিন্তু লোকের আস্থা নাই (apathy) দেখিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়া বরোদায় ফিরিয়া যান। পরে স্বদেশী আন্দোলনের উত্তেজনার সময় যুগান্তরের দলের মধ্য দিয়া গুপ্তসমিতির দ্বিতীয় পর্ব্ব (১৯০৬-০৮) আরম্ভ করেন। গুপ্তসমিতির সম্মুখে আদর্শ ছিল, প্রথমে গুপ্তসমিতি, পরে 'গরিলা', সর্ব্বশেষ প্রকাশ্য বিদ্রোহ। এই দ্বিতীয় বারের গুপ্তসমিতিও 'গরিলা'র স্তরে আসিয়া পৌঁছিতে পারে নাই। আবার, চন্দন নগর প্রস্থানের দুই মাস পূর্ব্বে সন্ত্রাসবাদীদিগকে "উদ্দাম আচরণ" করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং "শক্তিকে অন্তর্মুখী" করিবার কথাও লিখিয়াছেন। "আমাদের যুদ্ধের উপকরণ" অস্ত্রশস্ত্র নাই বলিয়া যুদ্ধ করিবার পরামর্শ দেন নাই ; অথচ (১৮৯৩) আমাদের নিরস্ত্রদেশ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হইয়াই ফরাসী বিদ্রোহের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া-ছিলেন,—জাতিকে "অগ্নি ও রক্তস্নানে পবিত্র" হইয়া স্বাধীনতা লাভ করিতে বলিয়াছিলেন। তখন soul force (১৯১০) এর "সূক্ষ্ম"

উপায়ের কথা তাহার মনে আসে নাই। যখনি লৌকিক উপায় ব্যর্থ হইয়াছে, তখনি অলৌকিক উপায়ের দিকে তিনি আকৃষ্ট হইয়াছেন।

(৬) তিনি গভর্ণমেণ্টের নিকট "আরও বেশী অত্যাচার" চাহিয়াছেন (১৯০৭)। অত্যাচারে সন্ত্রাসবাদ বৃদ্ধি পায়, ইহা তিনি নিজেই কহিয়াছেন। সুতরাং সন্ত্রাসবাদ বৃদ্ধির জন্যই তিনি অত্যাচার চাহিয়াছেন। কিন্তু পরে (১৯১০) গভর্ণমেণ্টকে নিগ্রহ-নীতি সম্বরণ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াছেন। সে অনুরোধে কোনই ফল হয় নাই!

(৭) তিনি নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধও সমর্থন করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে সন্ত্রাসবাদও চালাইয়া গিয়াছেন। পরে (১৯১০) বুঝিয়াছিলেন যে, সন্ত্রাসবাদ না ছাড়িলে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ চলিতে পারে না।

(৮) গভর্ণমেণ্টের নিদারুণ নিগ্রহ-নীতি, ও দেশের লোকের "আস্থা নাই, উৎসাহ নাই, শ্রদ্ধা নাই" দেখিয়া এবং বৈধ উপায়ে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ চালান অসম্ভব বুঝিয়া,—আসন্ন গ্রেপ্তার ও নির্ব্বাসনের কথা শুনিয়া—সন্ত্রাসবাদ ও নিগ্রহ-নীতির প্রবল সংঘর্ষের মধ্যে তাঁহার দেশকে তাঁহার কৃতকার্য্যের ফলভোগ করিবার জন্য—ফেলিয়া রাখিয়া তিনি চন্দন নগর প্রস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ধিঙ্গড়া সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, সে তাঁহার নিজের কথাই তাঁহার সম্বন্ধেও বলা যায়—

"Here his country remains behind to bear the consequences of his act." [Karmayogin, July 31, 1903]

সন্ত্রাসবাদের যে বিষ বাঙ্গালার মাটিতে ঢালিয়া গেলেন তাহা তাঁহার প্রস্থানের পর শুকাইয়া যায় নাই,—যদি তিনি নিষেধ করিয়া থাকেন, সে নিষেধ মানে নাই—নদীতে স্রোতের মত প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে।

বীরেন্দ্রের ফাঁসী—

"বীরেনের পক্ষে কৌঁসুলী ছিল, কিন্তু বীরেন কাহারও সাহায্য লয় নাই, দোষ স্বীকার করিয়াছে।...গত সোমবার (৯ই ফাল্গুন,—২২শে ফেব্রুয়ারী হইবে) ভোর ৬টা-৩০ মিনিটের সময় কলিকাতা প্রেসিডেন্সি জেলের মধ্যে আলমের হত্যাকারী বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্তের ফাঁসী হইয়া গিয়াছে।...ভোর বেলা তাহাকে ফাঁসীমঞ্চের নিকট আনা হয় এবং সে দৃঢ়পদে নিজে হাঁটিয়া মঞ্চোপরি আরোহণ করে। ফাঁসীর হুকুম পড়িয়া শুনাইলে সে কিছু বলে নাই।"—["ধর্ম্ম", ১৬ই ফাল্গুন ১৩১৬]

ইহা অরবিন্দের চন্দন নগর প্রস্থানের মাত্র এক সপ্তাহ আগের ঘটনা।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস—অরবিন্দ "ভারতের প্রাণপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন:—

"বিগত পাঁচ শত বৎসরের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মত দ্বিতীয় একটি পুরুষ পৃথিবীতে আবির্ভূত হয় নাই।"—

একটি কবিতাও আছে—

"বিধির তূর্য্য উঠিল বাজিয়া
পলায়ন নহে পলায়ন।"

পলায়ন, পলায়ন নহে;—এই স্ববিরোধী কথার মধ্যে এক গূঢ় রহস্য নিহিত আছে। অরবিন্দের চন্দন নগর প্রস্থানের সম্ভবতঃ দুই একদিন পূর্ব্বে "ধর্ম্ম" পত্রিকায় লেখা হইল—

"ভগবৎদর্শন—শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন যদি কেবল তিন দিন মাত্র অনন্যকর্ম্মা হইয়া আকুল ও একাগ্রচিত্তে ভগবানকে ডাকা যায়, তাহা হইলেই তাঁহার দর্শনলাভ হয়।"—[ধর্ম্ম, ১৬ই ফাল্গুন]

জেলের মধ্যে ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিয়া অরবিন্দ পরহংসদেবের কথার সত্যতাই প্রমাণ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীসারদা দেবীর সহিত সাক্ষাৎ—অনেক বাদানুবাদের পর প্রমাণমূলে ইহা সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে যে, চন্দন নগর প্রস্থানের কিছু পূর্ব্বে অরবিন্দ সস্ত্রীক বাগবাজার "উদ্বোধন" অফিসে আসিয়া পরমহংসদেবের

পত্নী, শ্রীশ্রীসারদা দেবীকে উভয়ে প্রণাম করিলেন। শ্রীশ্রীমা অরবিন্দের মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং উপদেশ দিলেন। শ্রীশ্রীমা অরবিন্দকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "এইটুকু মানুষ—এঁকেই গভর্ণমেণ্টের এত ভয়?" তারপর অরবিন্দকে বলিয়াছিলেন,— "আমার বীর ছেলে।" গৌরী-মা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি অরবিন্দের চিবুক ধরিয়া স্বামীজীর কবিতা উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"যত উচ্চ তোমার হৃদয়, তত দুঃখ জানিহ নিশ্চয়।
হৃদিবান নিঃস্বার্থ প্রেমিক! এজগতে নাহি তব স্থান।"

অরবিন্দের চন্দন নগর প্রস্থান ও ভগিনী নিবেদিতা—শ্রীরামচন্দ্র মজুমদার লিখিয়াছেন,—

"ইহার কয়েক দিন পরে আমি জনৈক সি-আই-ডির নিকট হইতে সংবাদ পাই যে, শ্রীঅরবিন্দকে শীঘ্রই গ্রেপ্তার করা হইবে, এবং খুব সম্ভব সামসুল আলমের হত্যার মামলায় তাঁহার নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হইবে। এই সংবাদ আমরা পূর্ব্বেই আরও দুই স্থান হইতে পাই। সংবাদ পাইয়াই আমি কৃষ্ণকুমারবাবুর বাড়ী ছুটিলাম এবং শ্রীঅরবিন্দকে সংবাদ দিলাম। তিনি ধীর চিত্তে ইহা শুনিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া "কর্ম্মযোগিন্" অফিসে আসিলেন। প্রথমে জামিনদার ঠিক করিয়া রাখিবার পরামর্শ হইল। পরে বলিলেন, "নিবেদিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আইস।" আমি ভগিনী নিবেদিতার বাড়ী গেলাম। তাঁহার সঙ্গে পূর্ব্ব হইতেই পরিচয় ছিল। বরোদায় নিবেদিতার সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়। নিবেদিতা তাঁহাকে স্বামীজীর 'রাজযোগ" উপহার দেন। অরবিন্দ বাবু বলিতেন যে, এই পুস্তক পড়িয়াই তাঁহার হিন্দু-দর্শন পড়িবার আগ্রহ হয়। ভগিনী নিবেদিতা "কর্ম্মযোগিনে" প্রবন্ধ লিখিতেন। যে সময়ে অরবিন্দবাবু চন্দননগরে লুকাইয়াছিলেন সে সময় নিবেদিতাই কাগজখানি চালাইয়াছিলেন।......যাহা হউক, ভগিনী নিবেদিতাকে সকল ঘটনা বলিলাম। তিনি শুনিয়া বলিলেন, "Tell your chief to hide and the hidden chief through intermediary shall do many things." একদিন অরবিন্দবাবু আমাকে বলিয়াছিলেন, "Mother Kali through Sister Nivedita ordered me to hide."......এই সংবাদ লইয়া আমি আপিসে ফিরিলাম। অরবিন্দবাবু বলিলেন, "All right, arrange."

"গঙ্গার ঘাটে পৌঁছিবার পূর্ব্বে বোসপাড়া লেনে অরবিন্দবাবু ভগিনী নিবেদিতার বাসায় গিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন...বোধ হয়, নিবেদিতার সঙ্গে তিনি "কর্ম্মযোগিন্" পরিচালনার পরামর্শ করিয়াছিলেন। এই কথাবার্ত্তার সময় আমরা উপস্থিত ছিলাম না, নীচের রোয়াকে বসিয়াছিলাম। কাজেই কি কথা হইয়াছিল তাহা জানি না। নিবেদিতার বাসা হইতে আমরা বাগবাজার গঙ্গার ঘাটে যাই।......

"নৌকা ছাড়িয়া দিবার পূর্ব্বে অরবিন্দবাবু আমাকে বলিলেন—"Be rare in your acquaintances. Seal your lips to rigid secrecy. Don't breathe this to your nearest and dearest."—নৌকা ছাড়িয়া দিল।......" ["উদ্বোধন"; ভাদ্র, ১৩৫২; পৃঃ ২৩০-৩১]

ভারতবর্ষ যেদিন স্বাধীন হইবে সেদিনের ইতিহাস যিনি লিখিবেন, তিনি অরবিন্দের জীবন-কথা আরও গৌরব ও গর্ব্বের সহিত সবিস্তারে লিখিতে পারিবেন।*

* উদ্বোধনের এই সংখ্যায় শ্রীঅরবিন্দের চন্দন-নগর গমন পর্য্যন্ত তাঁহার জীবনীর প্রথম খণ্ড সমাপ্ত হইল। ইহা এখন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে। কেহ এই প্রবন্ধের কোন ভ্রম আমাকে জানাইলে আমি তাহা সানন্দে সংশোধন করিব। শ্রীঅরবিন্দ-জীবনীর দ্বিতীয় খণ্ড উদ্বোধনে আর বাহির হইবে না। ইহা একবারে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে।—লেখক

সমালোচনা

রায় রামানন্দের ভণিতাযুক্ত পদাবলী—অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন সম্পাদিত। প্রাপ্তিস্থান—সেন রায় এণ্ড কোং, ১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৬৬+২৬, মূল্য দুই টাকা মাত্র।

এই পুস্তকখানি রাধাকৃষ্ণলীলাত্মক ক্ষুদ্র কাব্য। ইহাতে পদগুলি পালা আকারে কিংবা দণ্ড দণ্ড ভাগে সুবিন্যস্ত। এইজন্য ইহাকে দণ্ডাত্মক লীলা কাব্যও বলা হয়। রামানন্দ উড়িষ্যাবাসী ছিলেন; এই কারণে তাঁহার এই পুঁথিখানি উড়িয়া লিপিতে লিখিত। ভাষার মধ্যে ব্রজবুলি, বাংলা ও উড়িয়া শব্দ মিশ্রিত। মহাপ্রভু দীর্ঘকাল নীলাচলে অবস্থান করায় তাঁহার অসংখ্য বাঙ্গালী ভক্ত উড়িষ্যায় গমন ও বাস করেন। তাহার ফলে তথায় ব্রজবুলি ও বাঙ্গলা কীর্তন পদাবলীর বহুল প্রচার হয়। প্রাচীন উড়িয়া ও প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে নিকট সাদৃশ্য বিদ্যমান সুতরাং রামানন্দপদাবলীতে ব্রজবুলি ও বাংলা শব্দের সংমিশ্রণ স্বাভাবিক।

আলোচ্য কাব্যে গোবিন্দলীলামৃত হইতে তুল্যভাববোধক ২২টী শ্লোক উদ্ধৃত। এই গোবিন্দলীলামৃত একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ। যদুনন্দন ইহার ভাবানুবাদে লিখিয়াছেন—'শ্রীগোবিন্দলীলামৃত নিগূঢ় ভাণ্ডার। তাহা উঘাড়িয়া দিলা কি কৃপা তোমার॥' উঘাড়িয়া=উদ্‌ঘাটিত করিয়া। ইহা হইতে আলোচ্য গ্রন্থের সুপণ্ডিত সম্পাদক মহাশয় অনুমান করেন—চৈতন্যচরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ ইহার টীকাকার, রচয়িতা নহেন; রামানন্দই ইহার রচয়িতা। কারণ, এই গ্রন্থখানি মহাপ্রভুর সময়েও ছিল, এবং কৃষ্ণদাস মহাপ্রভুর পরে আবির্ভূত। চৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলায় আছে—মহাপ্রভু স্বরূপ রামানন্দের গলা জড়াইয়া গোবিন্দলীলামৃতের তিনটী শ্লোক বলিয়াছিলেন; এবং তিনি গোপালবল্লভের প্রসাদ গ্রহণান্তে ভাববিহ্বল হইয়া উহার আর একটী শ্লোক আবৃত্তি করেন। রূপগোস্বামী যখন মহাপ্রভুকে প্রয়াগে দর্শন করেন তখন 'গোবিন্দলীলামৃত' হইতে একটী শ্লোক উদ্ধার করেন। রায় রামানন্দের 'জগন্নাথমঙ্গল' নাটকে গোবিন্দলীলামৃতের ন্যায় রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব বর্ণিত; কিন্তু মহাপ্রভুর কোন প্রসঙ্গ নাই। 'নাটকেও যেমন, পদেও তেমন'; রামানন্দ এই পদাবলী রচনায় মহাপ্রভুর কোন উল্লেখ করেন নাই।' এই অনুল্লেখে মনে হয় মহাপ্রভুর দর্শনের পূর্বেই রামানন্দ এই পদাবলী রচনা করেন। ইহাতে প্রমাণিত হয় অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয়ের অনুমান সত্য।

পণ্ডিত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণের মতে জগন্নাথবল্লভ নাটকের সঙ্গে আলোচ্য গ্রন্থের ভাবসাম্য আছে। রামানন্দপদাবলী উড়িয়া লিপিতে আছে—এই কিংবদন্তী অগ্রাহ্য করা যায় না। এই পুস্তিকায় প্রকাশিত পদাবলী রামানন্দরচিত বলিয়াই মনে হয়। পদাবলী মধুর ভাবোদ্দীপক; এবং রামানন্দ ছিলেন মধুরভাবের সিদ্ধ মহাপুরুষ। মহাপ্রভু বলেন, "রামানন্দ সহ মোর দেহ ভেদমাত্র।" এবং তাঁহার "অপ্রাকৃত দেহ"। বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে রামানন্দের স্থান অতি উচ্চে। জগতের মধ্যে যে 'সাড়ে তিন জন রাধিকার গণ' তাহার মধ্যে রামানন্দ

একজন। তাঁহার এই পদাবলীতে 'রাধার বর্ণনা যেমন সংযত, তেমন মধুরভাবদ্যোতক'। উক্ত পদাবলী এই পুস্তকে প্রথম প্রকাশিত হইল। ইহার প্রকাশন দ্বারা বাঙ্গালা বৈষ্ণব-সাহিত্যে আর একটী অমূল্য রত্ন সংযোজিত হইল। উড়িষ্যার সুপরিচিত কংগ্রেসকর্মী ও সাহিত্যিক শ্রীসূর্য নারায়ণ দাস সম্পাদককে পুঁথিখানি দিয়াছিলেন। সম্পাদক গ্রন্থখানি স্বীয় ব্যয়ে প্রকাশ করিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন। ২৬ পৃষ্ঠাব্যাপী দীর্ঘ ভূমিকায় তিনি সমালোচকগণের বিরুদ্ধ মতগুলি সুযুক্তি দ্বারা খণ্ডন করিয়া বহু প্রাসঙ্গিক বিষয় গভীর-ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। পুস্তিকার শেষে বিস্তৃত শব্দসূচী আছে। মূল পুঁথির প্রতিলিপির একটী চিত্র ইহাতে স্থান পাইয়াছে। মূল পুঁথির পরিমাপ ১$\frac{1}{2}$ × ১৩$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি এবং পত্র সংখ্যা ৪২ মাত্র। বৈষ্ণব সাহিত্যের পাঠকগণ এই পুস্তক পাঠে নিশ্চয়ই অপার আনন্দ পাইবেন।

—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

Pracyavani, Journal of the Pracyavani Mandir (Institute of Oriental Learning) Vol. 2., Nos. 3-4 ; July-October, 1945 number. Published by Joint Editors Roma Chaudhuri and Jatindra Bimal Chaudhuri from 3, Federation street, Calcutta. Price Rs 4/-.

প্রাচ্যবাণীর আলোচ্য সংখ্যাটিতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের পণ্ডিতগণ ভারতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকের আলোচনা করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন কয়েকখানা পুস্তকের পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমালোচনা ইহার শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে। ইহাতে ডাঃ সি কুন্হন্ রাজা, ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, পণ্ডিত ৺কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী, ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ মনীষিগণের প্রবন্ধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রাচ্যবাণীমন্দির প্রবন্ধাবলী—তৃতীয়খণ্ড, সম্পাদক ডক্টর যতীন্দ্র বিমল চৌধুরী, প্রাচ্যবাণী-মন্দির, ৩নং ফেডারেশন ষ্ট্রীট্ হইতে প্রকাশিত ; মূল্য এক টাকা।

আলোচ্য সংখ্যা কয়েকটি বাংলা প্রবন্ধের সমষ্টি। সংস্কৃত-ভারতী প্রাচ্যবাণী মন্দিরের উপাস্য। তাঁহার লুপ্ত মর্যাদার পুনরুদ্ধারের জন্য মন্দিরের পূজারিবৃন্দের উদ্যম যেমন অক্লান্ত, তেমনি অকৃত্রিম। সংস্কৃতাতঙ্ক আজ দেশের সর্বত্র। এই 'ফোবিয়া'র কারণবিশ্লেষিকা শ্রীযুক্তা রমা চৌধুরীর প্রবন্ধ প্রত্যেক সুধীজনের পাঠ করা উচিত। বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধেও কয়েকটি প্রবন্ধ ইহাতে স্থান পাইয়াছে।

—অধ্যাপক শ্রীজ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র দত্ত, এম্-এ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড়-মঠ, হাওড়া—আগামী জুলাই মাস হইতে বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন কলেজে পদার্থবিদ্যা (Physics), রসায়নবিদ্যা (Chemistry) ও প্রাণিবিদ্যা (Biology) সহ আই-এসসি ক্লাশ (I.Sc. Class) খোলা হইবে। বিজ্ঞান-বিভাগের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য আধুনিক উপকরণসমন্বিত বিজ্ঞানাগার প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত এই কলেজে পূর্ব হইতেই আই-এ ও আই-কম্ ক্লাশ নিয়মিত ভাবে চলিতেছে। এই আবাসিক (residential) কলেজে প্রাচীন গুরুকুল প্রথানুযায়ী শান্ত পবিত্র আবহাওয়া ও রমণীয় আবেষ্টনীর মধ্যে উপযুক্ত অধ্যাপকগণের তত্ত্বাবধানে বাস করিয়া ছাত্রদের শারীরিক, নৈতিক ও মানসিক উন্নতিলাভের সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা রহিয়াছে। যাহাতে বিদ্যার্থিগণের দৈনন্দিন জীবন সুনিয়ন্ত্রিত হয়, যাহাতে তাহারা দৃঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ, চরিত্রবান ও সেবাপরায়ণ হইতে পারে এবং ভারতের উদার সাংস্কৃতিক আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইতে পারে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াই যুবকগণকে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এই বিজ্ঞানের যুগে স্বামী বিবেকানন্দের প্রাণের ইচ্ছা ছিল যে ভারতের যুবকবৃন্দ বিজ্ঞানবলে বলীয়ান হইয়া ভারতের দৈন্য ও দুর্দশা মোচন করে ও জগতের সম্মুখে ভারতকে তাহার পূর্ব গৌরবাসন প্রদান করিয়া তাহার মুখোজ্জ্বল করে। আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের পরিকল্পনা বাস্তবে পরিণত করিবার জন্য রামকৃষ্ণ মিশনের কর্তৃপক্ষ এই দায়িত্বপূর্ণ কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। ইহা সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য সর্বসাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতি বাঞ্ছনীয়।

এই কলেজের আই-এ পরীক্ষার ফল প্রথম হইতেই খুব সন্তোষজনক হইতেছে। প্রতি বৎসরই ২।১ জন ছাত্র গভর্ণমেণ্ট বৃত্তি (scholarship) পাইয়া আসিতেছে। ১৯৪৩ সালে আই-এ পরীক্ষায় এই কলেজ হইতে একজন দশম স্থান অধিকার করিয়াছিল। বর্তমান বৎসরেও এই পরীক্ষায় একজন বিশ্ববিদ্যালয়ে সপ্তম স্থান অধিকার করিয়াছে। এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের হার ৪১·০৫ এবং এই কলেজের পাশের হার ৮০·৭। তন্মধ্যে শতকরা প্রায় ৫০ জন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

বিভিন্ন স্থানে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজীর বক্তৃতা—বোম্বাই রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী গত ১৫ই মার্চ হইতে ২রা জুন পর্যন্ত নিম্নলিখিত বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন:—বেলগাঁও লিঙ্গরাজ কলেজে "বর্তমানে আমাদের কিরূপ ধর্মের প্রয়োজন?" মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মিশন ষ্টুডেণ্টস্ হোমে "আত্ম-বিশ্লেষণ ও আত্ম-সংযম", কলম্বো রামকৃষ্ণ মিশন হলে "স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী", কলম্বো বিবেকানন্দ সোসাইটিতে "বর্তমানে জগতে কিরূপ ধর্মের প্রয়োজন?", ট্রিনকোমেলি হিন্দু-কলেজ ভবনে "হিন্দুধর্ম কাহাকে বলে?", অনুরাধাপুরম্ বিবেকানন্দ সোসাইটি ভবনে "জগতের নিকট বার্তাবহ বিবেকানন্দ", জাফনা রামকৃষ্ণ মিশন বৈদ্যেশ্বর বিদ্যালয়ে "রামকৃষ্ণদেবের বাণী", ভিজাগাপটম্ জগন্নাথ হলে "মায়া ও ব্রহ্ম",

চেরাপুঞ্জি (আসাম) রামকৃষ্ণ মিশন উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে "বর্তমানে আমাদের কিরূপ শিক্ষার প্রয়োজন ?" এবং "সার্বভৌম ধর্মের প্রবর্তক শ্রীরামকৃষ্ণদেব", শিলং অপেরা হলে "বিবেকানন্দের গঠনকর্ম", শিলং রামকৃষ্ণ আশ্রমে "শ্রীরামকৃষ্ণের অলোকসামান্যতা", চেরাপুঞ্জি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে "জাতি-সংগঠনের ভিত্তিভূমি", শেলাপুঞ্জি মধ্যইংরেজী বিদ্যালয়ে "ছাত্রজীবনের আদর্শ লাভের উপায়", শ্রীহট্ট রামকৃষ্ণ আশ্রম ও শেলাপুঞ্জি রামকৃষ্ণ আশ্রমে "ধর্মপ্রসঙ্গ", ঢাকা রামকৃষ্ণ মঠে "ভগবান্ বুদ্ধ ও তাঁহার বাণী" ঢাকা আনন্দ আশ্রমে "নারীশিক্ষার আদর্শ", সোনার গাঁ রামকৃষ্ণ আশ্রমে "শ্রীরামকৃষ্ণদেব", এবং "কর্মের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম", সোনার গাঁ জি আর ইন্‌ষ্টিটিউসনে "জাতীয় জীবনের ভিত্তি" এবং কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটীতে "স্বামী বিবেকানন্দ ও আমাদের কর্তব্য।"

জয়রামবাটী (বাঁকুড়া) শ্রীশ্রীমাতৃ-মন্দির প্রতিষ্ঠার চতুর্বিংশ বার্ষিক মহোৎসব—গত ২১শে বৈশাখ শুভ অক্ষয়তৃতীয়া তিথিতে এই প্রতিষ্ঠানের চতুর্বিংশ বার্ষিক মহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে শ্রীশ্রীজগজ্জননীর বিশেষ পূজা, ভোগ, হোম ও শাস্ত্রপাঠ হয়। রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে অনেক সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী এবং বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্ত নরনারী এই উৎসবে যোগদান করেন। ভোগ ও হোম অন্তে উপস্থিত ভক্তমণ্ডলী ও দরিদ্র-নারায়ণের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। বৈকালে মন্দির-প্রাঙ্গণে বাঁকুড়ার জেলা জজ শ্রীযুক্ত অনুকূল চন্দ্র সান্যাল মহাশয়ের সভাপতিত্বে আহূত এক সভায় কয়েকজন সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্ত বক্তৃতা দেন। স্বামী অচিন্ত্যানন্দজীর বক্তৃতা বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। এই পুণ্য তিথিতে আশ্রমের দীর্ঘকালের জলকষ্ট দূরীকরণার্থ বাঁকুড়ার প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু রায় এম্-বি মহাশয় মন্দিরপ্রাঙ্গণে একটী কূপ প্রতিষ্ঠা করিয়া সকলের বিশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। সন্ধ্যায় আরাত্রিক, স্তোত্রপাঠ, কীর্তন ও ঐক্যতান বাদনান্তে পার্শ্ববর্তী গ্রামের ছেলেরা মন্দির-প্রাঙ্গণে "স্বর্ণলঙ্কা" নাটক অভিনয় করিয়া উপস্থিত ভক্তগণের আনন্দ বর্ধন করে। পরে ২৩শে বৈশাখ রাত্রিতে মুকুন্দপুরের অপেরাপার্টির "মুক্তিতীর্থ" অভিনয়ান্তে বিপুল আনন্দের মধ্যে উৎসবের কার্য সমাপ্ত হয়।

কাঁকুড়গাছি শ্রীরামকৃষ্ণ-যোগোদ্যান—বিগত ১৫ই বৈশাখ অপরাহ্নে আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি-স্মরণে কাঁকুড়গাছি শ্রীরামকৃষ্ণ-যোগোদ্যান-প্রাঙ্গণে এক জনসভা আহূত হয়। বেলুড় মঠের স্বামী শর্বানন্দজী সভায় পৌরোহিত্য করেন। সভার প্রারম্ভে একটি বিবেকানন্দ প্রশস্তি গীত হইলে ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার এম্-এ, পিএইচ্-ডি, শ্রীযুক্ত রমণী কুমার দত্তগুপ্ত ও শ্রীযুক্ত সুপ্রকাশ চক্রবর্তী স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণীর বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। শেষে সভাপতি স্বামী শর্বানন্দজী তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় বেদান্তের মূলতত্ত্ব এবং কর্ম-জীবনে উহার প্রয়োগ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের বিশিষ্ট অবদান উল্লেখ করিয়া এক মনোজ্ঞ বক্তৃতা প্রদান করেন। সমবেত ভক্ত নরনারী-বৃন্দের মধ্যে প্রসাদ বিতরিত হইলে উৎসব কার্য সমাপ্ত হয়।

মেদিনীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব—গত ১৩ই বৈশাখ হইতে ১৫ই বৈশাখ এই প্রতিষ্ঠানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একাদশাধিকশত-তম জন্মোৎসব সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

এই উপলক্ষে ১৩ই বৈশাখ সেবাশ্রমের নবনির্মিত গৃহে রামকৃষ্ণ মিশন সারকুলেটিং লাইব্রেরীর দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়। ইহাতে দিনাজপুর আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী গদাধরানন্দজী এক মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। ১৪ই বৈশাখ খড়্গপুর শহরের দুর্গাবাড়ীতে স্বামী সুন্দরানন্দজীর সভাপতিত্বে একটি ধর্মসভা হয়। ইহাতে পাটনা আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী অচিন্ত্যানন্দজী ও মাদ্রাজ বেদান্ত-কেশরীর ভূতপূর্ব সম্পাদক স্বামী তপস্যানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী সম্বন্ধে সুন্দর বক্তৃতা দেন। সন্ধ্যায় সেবাশ্রম-প্রাঙ্গণে বিষ্ণুপুর হইতে আগত ভক্ত প্রেমেন মিত্র স্বরযন্ত্র সহযোগে সুললিত কণ্ঠে কীর্তন অভিনয় করেন। ১৫ই বৈশাখ প্রাতে ভজন, পূজা, হোম ইত্যাদি যথানিয়মে সম্পন্ন হইলে দ্বিপ্রহরে প্রায় তিন হাজার ভক্ত ও দরিদ্রনারায়ণ প্রসাদ গ্রহণে পরিতৃপ্ত হন। এইদিন রাত্রি ৮টায় স্বামী সুন্দরানন্দজীর সভাপতিত্বে স্বামী অচিন্ত্যানন্দজী ও স্বামী তপস্যানন্দজী মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। শেষে সভাপতি মহারাজ তাঁহার অভিভাষণে শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর দেবদুর্লভ ভাবের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরদিন মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের চেষ্টায় স্কুল-প্রাঙ্গণে একটী সভার অধিবেশন হয়। ইহাতে স্বামী অচিন্ত্যানন্দজী বর্তমান ও অতীত শিক্ষা সম্বন্ধে একটী সারগর্ভ বক্তৃতা দেন।

বালিয়াটী (ঢাকা) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব—গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ হইতে এই প্রতিষ্ঠানে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব দিবসত্রয়-ব্যাপী অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে বেলুড় মঠের স্বামী মৈথিল্যানন্দজী, স্বামী যোগীশ্বরানন্দজী ও স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দজী আশ্রমে আগমন করিয়াছিলেন। প্রথম দিন সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ভজন-সংগীত এবং পরদিন প্রাতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ ও অপরাহ্ণে শোভাযাত্রা সহকারে নগর কীর্তন হয়। ৫ই জ্যৈষ্ঠ প্রাতে উষাকীর্তন, পূজা, চণ্ডীপাঠ, গীতাপাঠ ও ভজন হইলে প্রায় বারশত ভক্ত নর-নারী ও দরিদ্রনারায়ণ পরিতোষসহকারে প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্ণে মিশনের পঞ্চত্রিংশৎ বার্ষিক সভার অধিবেশনে অবৈতনিক বালক ও বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রীদিগকে পারিতোষিক বিতরণ করা হয়। এই সভায় শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র সরকার বি-এ, বি-টি মহাশয় সভাপতিত্ব করেন। সম্পাদক শ্রীযুক্ত গুণেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী বি-এ মিশনের ১৯৪৫ সনের বাষিক রিপোর্ট পাঠ করিলে ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী মৈথিল্যানন্দজী "শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধন-জীবন" সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। ৬ই জ্যৈষ্ঠ কুমারী বীণা রায়ের সভাপতিত্বে এক মহিলাসভার অধিবেশন হয়। ইহাতে স্বামী মৈথিল্যানন্দজী মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। উৎসব উপলক্ষে স্থানীয় দুই দল য়্যামেচার যাত্রা-পার্টি 'সরমা', 'বৃত্রাসুর' 'উত্তরা' এবং 'বঙ্গবীর' অভিনয় করিয়া সকলের মনোরঞ্জন বিধান করেন।

সোনার গাঁ (ঢাকা) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব—এই উপলক্ষে গত ৩রা ও ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ প্রভুপাদ পণ্ডিত শ্রীপ্রেমানন্দ গোস্বামী ভাগবত পাঠ করেন। ৫ই জ্যৈষ্ঠ পূজা ভোগাদি অন্তে দুই হাজার ভক্ত ও দরিদ্র-নারায়ণকে পরিতোষসহকারে ভোজন করান হয়। অপরাহ্ণে ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিঃ পি বি জুম্মারকরের সভাপতিত্বে আহূত এক জনসভায় বোম্বাই শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, নারায়ণগঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী সুপর্ণানন্দ ও শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী শ্রীশ্রীঠাকুর সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন।

গত ৯ই জ্যৈষ্ঠ বেলুড় মঠের স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী,

স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দজী ও স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দজী আশ্রম পরিদর্শন করেন। এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত অতীন্দ্র কুমার দাসগুপ্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে আহূত এক সভায় উক্ত স্বামীজীত্রয়কে অভিনন্দিত করা হয়।

নব প্রকাশিত পুস্তক

Hanuman—The Heroic Ideal of Hindusthan—স্বামী মৈথিল্যানন্দ প্রণীত। আশুতোষ লাইব্রেরীর সত্ত্বাধিকারী বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স লিঃ কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, ওয়ারী, ঢাকা হইতে প্রকাশিত। ৮৩ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৷০ আনা।

Hinduism and Untouchability—স্বামী সুন্দরানন্দ প্রণীত। উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি মহাশয় লিখিত ভূমিকা। ১৩০ পৃষ্ঠা, মূল্য ২৲ টাকা।

বিবিধ সংবাদ

কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটি—এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে গত ২৪শে বৈশাখ শ্রীশঙ্করাচার্যের জন্মতিথি-স্মরণে সোসাইটি-ভবনে এক আলোচনা সভা হয়। ইহাতে শ্রীযুক্ত রমণী-কুমার দত্তগুপ্ত মহাশয় "আচার্য শঙ্কর ও তাঁহার দার্শনিক মত এবং ভারতীয় ধর্ম, দর্শন ও সংস্কৃতি ভাণ্ডারে তাঁহার অবদান" সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

গত ২রা জ্যৈষ্ঠ বৈশাখী পূর্ণিমা উপলক্ষে সোসাইটি ভবনে শ্রীযুক্ত রমণী কুমার দত্তগুপ্ত মহাশয় "ভগবান বুদ্ধ ও তাঁহার ধর্মমত" সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। পরে শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে প্রসাদ বিতরিত হইলে উৎসব কার্য শেষ হয়।

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব কর্তৃক ফলহারিণী শ্রীশ্রীকালীপূজার দিবস অনুষ্ঠিত ষোড়শীপূজা স্মরণে গত ১৮ই জ্যৈষ্ঠ সোসাইটি-ভবনে এক সভায় স্বামী নির্লেপানন্দজী "নারী জগতে শ্রীশ্রীসারদামণি দেবীর অবদান" সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত বক্তৃতা প্রদান করেন।

গত ১৯শে জ্যৈষ্ঠ সোসাইটি-ভবনে বোম্বাই রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী এবং শ্রীযুক্ত রমণী কুমার দত্তগুপ্ত "স্বামী বিবেকানন্দ ও আমাদের কর্তব্য" সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দিয়াছেন।

কলমা (ঢাকা) রামকৃষ্ণ সেবাসমিতি—গত ২রা জ্যৈষ্ঠ হইতে ৬ই জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত এই সেবা-সমিতির বার্ষিক শ্রীরামকৃষ্ণ-উৎসব সুচারু ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দজী, স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী, স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দজী ও স্বামী ভূধরানন্দজী এই উৎসবে যোগদান করায় ইহার গুরুত্ব বহুল পরিমাণে বর্ধিত হইয়াছে।

উৎসবের কয়দিন পূর্বাহ্নে ভজন ও ধর্ম-গ্রন্থাদি পাঠ এবং অপরাহ্নে বিবিধ সভার অনুষ্ঠান হয়। ২রা জ্যৈষ্ঠ অপরাহ্নে স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দ-জীর সভাপতিত্বে আহূত শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠশালার পুরস্কার-বিতরণী সভায় সভাপতি মহারাজ "প্রকৃত-শিক্ষা" সম্বন্ধে অতি সহজ ভাষায় একটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। ৩রা জ্যৈষ্ঠ অপরাহ্নে এক জনসভায় স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দজী "শ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের জীবনী ও বাণী" সম্বন্ধে একটি মনো-

মুগ্ধকর বক্তৃতা দেন। সাওগাঁ-বিদ্যাশ্রমের শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মহাশয় সভাপতিরূপে শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী সম্বন্ধে সুচিন্তিত অভিভাষণ প্রদান করেন। সন্ধ্যার পর রামায়ণ-গান আরম্ভ হয়। পরদিন অপরাহ্ণে একটি মহিলা-সম্মিলনে দেশ-সেবিকা শ্রীযুক্তা আশালতা সেন সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়া শ্রীকালী পাঠশালার ছাত্রীগণকে পুরস্কার দেন। গ্রামের বালিকাগণ এই সম্মিলনে আবৃত্তি এবং "পূজারিণী" নামক পুরুষ-চরিত্র-বর্জিত নাটিকা অভিনয় করেন।

পরদিন রবিবার সমগ্র দিনব্যাপী আনন্দ উৎসব হয়। পূজা, পাঠ, কীর্তন প্রভৃতিতে উৎসব-প্রাঙ্গণ মুখরিত হইয়া উঠে। দ্বিপ্রহরে দুই হাজারের উপর নরনারী পরিতোষ সহকারে প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্ণে সেবাসমিতির বাৎসরিক সভায় স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিলে কয়েক জন বিশিষ্ট ব্যক্তি সেবাসমিতির বিবিধ কার্যাবলীর উপকারিতা, সমিতিকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিবার আবশ্যকতা এবং শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর ভাব সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন।

শেষদিন অপরাহ্ণে "বিবেকানন্দ কিশোর সমিতির" উদ্যোগে একটি প্রীতিসম্মিলন আহূত হয়। ইহাতে স্বামী ভূধরানন্দজী সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সমিতির সদস্যগণ আবৃত্তি এবং "উৎসব" ও "জটিল" নামক দুইখানি ক্ষুদ্র নাটিকার অভিনয় করিয়া সকলের মনোরঞ্জন বিধান করিলে উৎসব কার্য শেষ হয়।

গয়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম—১৯৪৫ সনের কার্য-বিবরণী—আলোচ্য বর্ষে এই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক একটী দাতব্য চিকিৎসালয়, দুইটী হরিজন নৈশ বিদ্যালয়, একটী ছাত্রাবাস ও একটী পাঠাগার পরিচালিত হইয়াছে। দাতব্য চিকিৎসালয় হইতে ৩৪২৩ জন নূতন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছেন। নৈশ বিদ্যালয় দুইটীতে ৬৫ জন ছাত্র শিক্ষালাভ করিয়াছে। আশ্রম-ছাত্রাবাসের চারিজন দরিদ্র ছাত্রের মধ্যে একজন বিহারী ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। আশ্রম-পাঠাগারের পুস্তকসংখ্যা ৭২২ ছিল। তন্মধ্যে ১৯০ খানি পুস্তক পাঠার্থ দেওয়া হইয়াছিল। গত পিতৃপক্ষ মেলার সময় পৃথক ডাক্তারখানা খুলিয়া আর্ত ও রোগগ্রস্ত তীর্থযাত্রীদিগকে সেবা করা হইয়াছে। আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্যপূজা, প্রতি শনিবার শ্রীশ্রীরামনাম সংকীর্তন, প্রতিমায় শ্রীশ্রীকালীপূজা এবং অবতারপুরুষগণের জন্মতিথিপূজাদি অনুষ্ঠিত হয়। গত বৎসরের উদ্বৃত্ত ২৩৯৪৷৴০ সমেত এই বৎসরের মোট আয় ৬৪২২৸৵০ এবং মোট ব্যয় ১৯৮০৸৵৫।

বর্ধমান শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব—গত ১৪ই বৈশাখ হইতে এই আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী পূজা, পাঠ, দরিদ্র-নারায়ণ সেবা ও প্রসাদ বিতরণাদি সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে প্রথম দিন বাগবাজারের শ্রীরামকৃষ্ণ-কালীকীর্তন সমিতি কর্তৃক কালীকীর্তন হয়। পরদিন বর্ধমানাধিপতি মহারাজ বাহাদুরের সভাপতিত্বে এক ধর্মসভায় বেলুড় মঠের স্বামী অজয়ানন্দজী শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী সম্বন্ধে সরল ভাষায় বক্তৃতা করেন। শেষে বার্ণপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও সভাপতি মহারাজ সুন্দর বক্তৃতা দেন। ২২শে বৈশাখ রবিবার প্রায় দেড় হাজার দরিদ্রনারায়ণ পরিতোষ সহকারে প্রসাদ গ্রহণ করিলে উৎসব কার্য শেষ হয়।

খুলনা শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব—গত ২২শে হইতে ২৪শে বৈশাখ খুলনা শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব সমারোহে

সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে স্থানীয় এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে আহূত এক জনসভায় বেলুড় মঠের স্বামী অজয়ানন্দজী, দৌলতপুর কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুত বিনয়কুমার সেনগুপ্ত, অধ্যাপক শ্রীযুত গোপালচন্দ্র মজুমদার, বি কে স্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীযুত নলিনীকান্ত দাসগুপ্ত, আর কে গার্লস্ কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুত পৃথ্বীশচন্দ্র নিয়োগী পরমহংসদেব এবং স্বামী বিবেকানন্দের বিভিন্ন ভাব-ধারা অবলম্বন করিয়া অতি সুন্দর বক্তৃতা করেন। প্রাতে কীর্তনসহ নগরপরিক্রমা, পূজা, ভোগ, দ্বিপ্রহরে দরিদ্রনারায়ণসেবা এবং সন্ধ্যায় জনসভা ও প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী ২৩ জন ছাত্রছাত্রীকে পুরস্কার দান উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল।

লালমণিরহাট (রংপুর) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব—গত ১৫ই বৈশাখ এই প্রতিষ্ঠানে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মমহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে সমস্ত দিন কীর্তন, সমাগত জনসাধারণের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ ও দরিদ্র-নারায়ণসেবা হয়। অপরাহ্ণে এক ধর্মসভায় রাজকোট শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের স্বামী ভূতেশানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের যুগাবতারত্ব সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। শ্রীযুক্ত রাধিকামোহন গোস্বামী মহাশয় মাথুর কীর্তন গাহিয়া জনসাধারণকে বিশেষ আনন্দ দান করেন। আনুমানিক তিন হাজার লোক উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

ঘোষগাতি - বারাকপুর, (খুলনা) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব—গত ৭ই বৈশাখ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ৬ই বৈশাখ পূর্বাহ্ণে কথামৃত ও লীলাপ্রসঙ্গ পাঠ, অপরাহ্ণে শোভাযাত্রা এবং সন্ধ্যায় শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ হয়। পরদিন নামযজ্ঞ, কীর্তন, শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী ও শ্রীমৎ স্বামীজীর বিশেষ পূজা, হোম ও রাজভোগ হয়। অপরাহ্ণে ডাঃ নলিনীকান্ত ব্রহ্ম এম্-এ, পি-আর-এস্, পিএইচ্-ডি মহোদয়ের সভাপতিত্বে আহূত একটি ধর্মসভায় দৌলতপুর কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মজুমদার এম্-এ, শ্রীভুবনমোহন মজুমদার এম্-এ, শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সেন এম্-এ, খুলনা জেলার সিভিল সার্জন ডাঃ পি বি ভট্টাচার্য এম্-বি, ডি-টি-এম্, সদর সার্কেল অফিসার মিঃ হোসেন, রেডক্রস্ সোসাইটির সম্পাদক মিস্ ডেভিস্, শ্রীযুক্ত কমলেশচন্দ্র ঘোষ, ফুলতলা হাইস্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নাথ বসু বি-এ মহোদয় মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন।

ব্রাহ্মণপাড়া, মাজু (হাওড়া) বিবেকানন্দ সেবা-সংঘে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব—এই উৎসব উপলক্ষে গত ২২শে বৈশাখ বেলুড় মঠের স্বামী রামেশ্বরানন্দজীর সভাপতিত্বে আহূত এক সভায় হাওড়ার পাব্লিক প্রসিকিউটর শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র নাথ বসু প্রধান অতিথিরূপে সম্মানিত হন। সংঘের সম্পাদক ডাঃ কানাইচন্দ্র সর্বাধিকারী বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন। বেলুড় মঠের স্বামী বীতশোকানন্দজী, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত মৃগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও উপদেশাবলী সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। "মাজু কালীকীর্তন-সম্প্রদায়" কীর্তন এবং বাগবাজার গিরীশ নাট্যমন্দিরের সভ্যবৃন্দ 'বিল্ব-মঙ্গল' অভিনয় দ্বারা সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে আনন্দ দান করেন। এই উপলক্ষে প্রায় দুই সহস্রাধিক নরনারী প্রসাদ গ্রহণে পরিতৃপ্ত হন।

উদ্বোধন

দুর্ভিক্ষের কবলে বাঙলা

সম্পাদক

কয়েক মাস পূর্বে বড়লাট লর্ড ওয়াভেল, খাদ্য-সচিব স্যার্ জোয়ালাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব, খাদ্য-সেক্রেটারী স্যার্ রবার্ট হাচিংস্ প্রমুখ ভারত-গবর্ণমেণ্টের উচ্চপদস্থ দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণ ভারতে দুর্ভিক্ষ আসন্ন বলিয়া ঘোষণা করেন। লর্ড ওয়াভেল বলেন, ভারতে এবার ৩০ লক্ষ টন খাদ্য-শস্যের অভাব। ভারতে প্রতি বৎসর আনুমানিক ৬ কোটি ১০ লক্ষ টন খাদ্য-শস্যের প্রয়োজন হয়। এই হিসাবে ৩০ লক্ষ টন ঘাটতি পূরণের জন্য পরবর্তী একটি বিবৃতিতে তিনি রেশন-অঞ্চলে জনপ্রতি দৈনিক ১৬ আউন্স খাদ্যের স্থলে ১২ আউন্স দেওয়া হইবে বলিয়া ঘোষণা করেন। পরে খাদ্য-বিভাগের সেক্রেটারী জানান যে, এবার ঘাটতি মোট ৬০ লক্ষ টন। ভারতের আণ্ডার-সেক্রেটারী মিঃ আর্থার হেণ্ডারসন পার্লিমেণ্টে বলেন, ১৯৪৬ সনে ভারতে খাদ্য-শস্যের মোট ঘাটতি ৪০ লক্ষ টন। এই সকল সংবাদে প্রকৃত ঘাটতির পরিমাণ সঠিক ভাবে জানা না গেলেও উহা যে দুর্ভিক্ষ-সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট, ইহা দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ নিশ্চিত বুঝিতে পারেন। ইহার ফলে অনেক দিন হইতেই আসন্ন দুর্ভিক্ষের আশংকায় তাঁহাদের মধ্যে যথার্থই উদ্বেগের সৃষ্টি হয়।

গত দুর্ভিক্ষের পর গ্রেগরী কমিটী ভাবী দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য ভারত-গবর্ণমেণ্টকে ১৫ লক্ষ টন খাদ্য-শস্য মজুত রাখিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু ভারত-সরকার ১৯৪৫ সন পর্যন্ত মাত্র ১ লক্ষ টন খাদ্য মজুত রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন। দুর্ভিক্ষ-তদন্ত-কমিশন খাদ্য-শস্য নিয়মন সম্বন্ধে ভারত-গবর্ণমেণ্টকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন উহাও কার্যে পরিণত করা সম্ভব হয় নাই। পক্ষান্তরে ভারত-সরকারের জনৈক উচ্চপদস্থ প্রতিনিধি কিছুদিন হয় ঘোষণা করিয়াছেন যে, ভারতের বাহির হইতে খাদ্য-শস্য না পাইলে আগামী আগষ্ট মাসে রেশন অনুসারে খাদ্য দেওয়া সম্ভব হইবে না। এই সংবাদে শিক্ষিত ব্যক্তিদের উদ্বেগের মাত্রা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে।

ভারতে খাদ্য-পরিস্থিতির এই শোচনীয় অবস্থার প্রতিকারের জন্য বাহির হইতে খাদ্য-শস্য আনিবার উদ্দেশ্যে ভারত হইতে একটি খাদ্য-মিশন লণ্ডন ও ওয়াশিংটনে প্রেরিত হয়। এই মিশনের নেতা স্যার রামস্বামী মুদালিয়র যুক্তরাষ্ট্রস্থিত ভারতীয় এজেণ্ট জেনারেল স্যার্ গিরিজা শংকর বাজপেয়ীর সাহায্যে সম্মিলিত পক্ষের খাদ্য-বোর্ডের নিকট ভারতের দুরবস্থা জানাইয়া খাদ্য-শস্যের জন্য আবেদন করেন। তাঁহারা বোর্ডকে জানান যে, বর্তমান সনের প্রথম

ছয় মাসে ২০ লক্ষ টন খাদ্য-শস্য সাহায্য না পাইলে ভারতের এক কোটি লোক অনাহারে মারা যাইবে। মিশনের আবেদনে ওয়াশিংটনের সম্মিলিত খাদ্য-বোর্ড ভারতবর্ষে প্রথমতঃ ৬০ হাজার টন খাদ্য-শস্য দিতে স্বীকার করেন। এ সম্বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ও ব্রিটিশ-খাদ্য-সচিব স্যার বেন্ স্মিথ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সহানুভূতি দেখান। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, পরে নানাকারণে সম্মিলিত খাদ্য-বোর্ড হইতে ভারতের জন্য সাহায্য পাওয়া যাইবে না বলিয়া জানা গিয়াছে। পরবর্তী সংবাদে প্রকাশ—যুক্তরাষ্ট্র হইতে কিছু খাদ্য-শস্য শীঘ্রই পাওয়া যাইবে। নিখিল ভারত কিষাণ-কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক মিঃ এন্ জি রঙ্গ কিছুদিন হয় লণ্ডন হইতে জানাইয়াছেন যে, তিনি যুক্তরাষ্ট্র অষ্ট্রেলিয়া ক্যানাডা ও নিউজিল্যাণ্ড গবর্ণমেণ্টকে ভারতে খাদ্য-শস্য পাঠাইতে অনুরোধ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার ফল কি হইয়াছে তাহা জানা যায় নাই। ভারত-গবর্ণমেণ্ট ক্যানাডা অষ্ট্রেলিয়া নিউজিল্যাণ্ড শ্যাম প্রভৃতি দেশ হইতে খাদ্য আনিবার চেষ্টা করিয়াও এ পর্যন্ত কৃতকার্য হন নাই। ভারতে খাদ্যাভাবের সংবাদ পাইয়া ইন্দোনেশিয়ান্ রিপাব্লিকের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ শারীর ৫ লক্ষ টন চাল দিবেন বলিয়া পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে জানাইয়াছিলেন। পরে ডাচ-গবর্ণমেণ্ট নানা কারণ দেখাইয়া এই চাল দেওয়ার প্রতিবাদ করিয়াছেন। সুখের বিষয় যে, গত ৩রা জুন ভারতের আণ্ডার-সেক্রেটারী পার্লিমেণ্টে বলিয়াছেন, গত মে মাসে ভারতে ২ লক্ষ ৩৫ হাজার টন খাদ্য-শস্য পাঠান হইয়াছে এবং জুন মাসে ২ লক্ষ টন চাল পাঠান হইবে। এই খাদ্য-শস্য পাওয়া গেলেও সমগ্র ভারতের অভাবের তুলনায় ইহা নগণ্য।

সরকারী সংবাদে প্রকাশ—অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা এবার খাদ্য-শস্যের ঘাটতি বাঙলায়ই বেশি। বাঙলায় ১৯৪৬ সনে ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টন খাদ্য-শস্যের ঘাটতি। এই সংবাদ সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলেও ইহা বাঙলায় দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির পক্ষে নগণ্য নহে। বর্তমান বৎসরে অন্য কোন প্রদেশ হইতে চাল আনিয়া এই ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব হইবে না। কারণ, এবার সকল প্রদেশেই খাদ্যশস্যের অভাব আছে। বাহির হইতে ভারতে যে সামান্য চাল আমদানির সম্ভাবনা আছে, উহা পাওয়া গেলেও বণ্টন-নীতির অনুপাতে বাঙলা দেশের জন্য যাহা পাওয়া যাইবে তাহা সমুদ্রে শিশির বিন্দুতুল্য হইবে। পূর্বে ফলন কম হইলে বাহির হইতে আনিয়া বা পূর্ব পূর্ব বৎসরের উদ্বৃত্ত চাল দ্বারা অভাব পূরণ করা হইত। এবার বাহির হইতে আনিয়া অভাব পূরণের সম্ভাবনা নাই বলিলেই চলে। গত তিন বৎসর যাবৎ যুদ্ধের প্রয়োজন মিটাইতে যাইয়া গবর্ণমেণ্ট দেশবাসীকে ধান-চাল সঞ্চয় করিয়া রাখিবার কোন সুযোগ দেন নাই। কাজেই এ অবস্থায় বাঙলায় এবার দুর্ভিক্ষ অবশ্যম্ভাবী।

বাঙলার খাদ্যের দুরবস্থা পর্যালোচনা করিয়া শিক্ষিত ব্যক্তিগণ অনেক দিন পূর্ব হইতেই আতংকিত হইয়াছেন। বর্তমানে বাঙলা দেশের প্রায় সর্বত্র ধান-চালের মূল্য ক্রমেই অধিকতর অস্বাভাবিক আকার ধারণ করিতে দেখিয়া দুর্ভিক্ষের আশংকায় জনসাধারণের মধ্যেও যথার্থই আতংকের সঞ্চার হইয়াছে। এই আতংক অমূলক নহে। কারণ, এবার আবশ্যকীয় খাদ্য-শস্যের ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও গবর্ণমেণ্ট বা দেশের নেতৃবৃন্দের পক্ষ হইতে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের কোন কার্যকর উপায় উদ্ভাবন করা এপর্যন্ত সম্ভব হয় নাই। এজন্য গবর্ণমেণ্ট খাদ্য-শস্য ক্রয় করিয়া গোলাজাত করা, আমদানি-রপ্তানি ও মূল্যনিয়মন, রেশন-কণ্ট্রোল, হোর্ডিং ও চোরাবাজার দমন, খাদ্যোৎপাদনের নিষ্ফল প্রচার ভিন্ন আজ পর্যন্ত কার্যকর কিছু করিতে

পারেন নাই। দেশের নেতৃবৃন্দও সভায় বক্তৃতা এবং সংবাদ-পত্রে বিবৃতি দিয়া আসন্ন দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টকে সতর্কতা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিয়াই তাঁহাদের কর্তব্য শেষ করিয়াছেন। ওদিকে দিনের পর দিন বাঙলার প্রায় প্রত্যেক জেলায়ই ধান-চাল ক্রমেই অধিকতর অগ্নিমূল্য হইয়া উঠিতেছে। প্রয়োজনের তুলনায় অতি অল্পসংখ্যক স্থানে কণ্ট্রোলের দোকান হইতে বাজার-মূল্য অপেক্ষা অল্পমূল্যে চাল দেওয়া হইতেছে বটে কিন্তু অধিকাংশ স্থানেই বাজারে চাল ২৫৲ হইতে ৩৫৲—এমন কি স্থানে স্থানে ৪৫৲ মণ দরে বিক্রয় হইতেছে! গত ১৫ই জুনের দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশ—ঢাকা জেলার ভাওয়াল পরগনার অন্তর্গত রাজবাড়ীতে ৫০৲ মণ দরে চাল বিক্রয় হইয়াছে! উল্লেখ বাহুল্য যে, চালের এইরূপ অস্বাভাবিক মূল্য বাঙালী জনসাধারণের ক্রয়-শক্তির সম্পূর্ণ বাহিরে। ইহা সত্ত্বেও বাঙলার প্রায় সর্বত্রই চালের মূল্য বৃদ্ধির দিকেই অগ্রসর হইতেছে এবং ইহার কোন প্রতিকার সম্ভব হইতেছে না।

গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক ধান-চাল গোলাজাত ও আবশ্যকীয় ধান-চালের আমদানির অভাবই যে স্থানে স্থানে অত্যন্ত মূল্য বৃদ্ধির কারণ, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। আশ্চর্যের বিষয়—এক বাঙলা দেশেরই বিভিন্ন জেলায়—এমন কি পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন মহকুমা ও ইউনিয়ন সমূহে পর্যন্ত বাজারে চালের মূল্যের পার্থক্য সময়ে সময়ে মণপ্রতি ১০৲—১৫৲ দেখা যাইতেছে। সর্বত্রই ধান-চাল ক্রয়-বিক্রয় ও আমদানি-রপ্তানি সরকার কর্তৃক সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত। কাজেই পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহের কয়েক মাইলের মধ্যেই এই কল্পনাতীত মূল্য-পার্থক্যের জন্য সরকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রণনীতিই সম্পূর্ণ দায়ী। বাজারে আবশ্যকীয় চালের অভাবে স্থানে স্থানে উহার মূল্য নিতান্ত অস্বাভাবিক আকার ধারণ করিয়াছে, কোন কোন স্থানে প্রকাশ্য বাজার হইতে উহা একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে এবং অনেক স্থানে সময়ে সময়ে চাল একেবারেই পাওয়া যাইতেছে না। প্রয়োজনীয় চাল গবর্ণমেণ্ট ষ্টক্ অথবা বাহির হইতে পূরণ না করিয়া চালের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিলে স্থানে স্থানে এইরূপ গুরুতর অবস্থা সৃষ্টি স্বাভাবিক। কোন স্থানে চাল অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য হইলে বা উহার মূল্য জনসাধারণের ক্রয়শক্তির বাহিরে গেলে, সে স্থানে আতংক সৃষ্টি হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। গত দুর্ভিক্ষের সময়ে স্থানে স্থানে চালের মূল্য মণ প্রতি ১০০৲ টাকা পর্যন্ত হইয়াছিল, অনেক স্থানে চাল একান্ত দুষ্প্রাপ্য এবং স্থানে স্থানে চাল সময়ে সময়ে একেবারেই পাওয়া যায় নাই। ইহার ফলে বহু মধ্যবিত্ত পরিবারও কল্পনাতীত দুঃখ ভোগ করিয়াছেন এবং সরকারী হিসাব মতে ৩৫ লক্ষ দরিদ্র নরনারী দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে পতিত হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন অগণন লোক অনশনে ও অর্ধাশনে এবং অখাদ্য কুখাদ্য খাইয়া নানা রোগে ভুগিয়া মৃত্যুর কোলে আশ্রয় লইয়াছেন।

গত দুর্ভিক্ষের সময়ে বাঙালী জাতি যে অবর্ণনীয় দুর্দশায় পতিত হইয়াছিল, বর্তমানে পুনরায় তাহাদিগকে সেই দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষেও বাঙলায় দুর্ভিক্ষ এখন আর আসন্ন নয়, কোন কোন অঞ্চলে যথার্থই দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইয়াছে। বাঙলা দেশের স্থানে স্থানে দুঃস্থদের অনশনে মৃত্যু, ধান চাল লুট-তরাজ, বুভুক্ষু নরনারীর শোভাযাত্রা এবং খাদ্যাভাবে গণবিক্ষোভের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন, দুর্ভিক্ষ পূর্বেই আরম্ভ হইয়াছে; ভারতে এখন কোটি কোটি নরনারী অনশনে ও অর্ধাশনে কষ্ট

পাইতেছেন। বাঙলা দেশের কয়েকটি জেলা সম্বন্ধে ইহা প্রত্যক্ষদৃষ্ট সত্য। ঐ জেলা গুলিতে ২৫৲ হইতে ৪৫৲ টাকা মণ মূল্যে চাল বিক্রয় হইতেছে। এইরূপ অগ্নিমূল্যে চাল কিনিয়া খাইবার ক্ষমতা বাঙলার শতকরা ৯৯ জন লোকের একেবারেই নাই। চালের ন্যায় ডাল তরকারি মাছ কাপড় ঔষধ প্রভৃতি নিত্য আবশ্যকীয় জিনিসও এত অধিক দুর্মূল্য যে, দরিদ্র—এমন কি মধ্যবিত্ত পরিবারসমূহের পক্ষেও এই সকল দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া পরিজনবর্গ প্রতিপালন করা সম্ভব নহে।

১৩৫০ সনের মন্বন্তরের সময়ে মধ্যবিত্ত, পর্যাপ্ত জমিহীন শ্রমিক ও মজুর শ্রেণীর লক্ষ লক্ষ লোক যুদ্ধের কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া উপার্জন করিয়াছিলেন। তথাপি তাঁহাদের মধ্যে অনেকের পক্ষে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ সহ্য করা সম্ভব হয় নাই। এবার তাঁহাদের অধিকাংশই কাজের অভাবে বেকার। কণ্ট্রোলের দৌলতে হাজার হাজার ব্যবসায়ী ও দোকানদার এখন উপার্জনহীন। সূতার অভাবে লক্ষ লক্ষ তন্তুবায় জোলা ও জেলে কর্মহীন হইয়া বসিয়া আছেন। শিক্ষক কেরানী গোমস্তা চাকর পাচক প্রভৃতি শ্রেণী সামান্য উপার্জনে কোন রকমে পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণ করেন। ইঁহারা অগ্নি-মূল্যে চাল ও কাপড়াদি কিনিয়া বেশি দিন পরিবারবর্গের জীবন রক্ষা করিতে নিশ্চয়ই পারিবেন না।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রশান্ত কুমার মহলানবীস ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গঠিত গত দুর্ভিক্ষের তথ্যানুসন্ধান কমিটি হইতে বাঙলা দেশের দুর্ভিক্ষোত্তর অবস্থা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে:

"১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের ফলে পল্লীবাঙলার প্রায় ৭ লক্ষ পরিবারের অবস্থা খারাপ হইয়াছে। এবং ৩৮ লক্ষ (প্রতি পরিবারে ৫·৪ জন লোক ধরিয়া) লোক প্রায় নিঃস্বে পরিণত হইয়াছে।

"বাঙলায় যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের ফলে সম্পূর্ণ নিঃস্ব-সংখ্যা দাঁড়ায় ৪ লক্ষ ৮০ হাজার লোক—তন্মধ্যে দুর্ভিক্ষের দায়িত্বে ৩ লক্ষ ৩০ হাজার। দুর্ভিক্ষোত্তর বাঙলার মোট নিঃস্বসংখ্যা ১৯৪৫ সনের মে মাসে ১০ লক্ষ ৮০ হাজার। এই সকল নিঃস্বগণ অধিকাংশই তরুণবয়স্ক—১৫ হইতে ৫০ বৎসরের মধ্যবর্ত্তী এবং পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যাই ইহাদের মধ্যে বেশী। জীবিকা হিসাবে মৎস্যজীবী, কৃষক, ভূমিহীন শ্রমিক ও কারিগর—এই ভাবে নিঃস্বতার ক্রম দেখা যায়। সবচেয়ে বেশী সংখ্যক নিঃস্ব মৎস্যজীবীদের মধ্যেই হইয়াছে।

"কৃষিযোগ্য জমির মালিক ৬৫ লক্ষ পরিবারের মধ্যে ২ লক্ষ ৬০ হাজার পরিবার সম্পূর্ণ বিত্তহীন ও ভূমিহারা শ্রমিকে পরিণত হইয়াছে। ৭ লক্ষ একর ধানের জমি বিক্রীত হইয়া গিয়াছে—তন্মধ্যে ৩ লক্ষ একর পল্লীবাসীরাই কিনিয়াছে—বাকী ৪ লক্ষ বাহিরের লোকের হাতে গিয়াছে।"

এই বিবৃতি হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, গত দুর্ভিক্ষের সময়ে বাঙলার যে লক্ষ লক্ষ পরিবার সর্বস্বান্ত হইয়া কোন রকমে আত্মরক্ষা করিয়াছেন, এবার আর কিছুদিন চালের মূল্য অস্বাভাবিক থাকিলে সেই সকল পরিবার নিশ্চয়ই বাঁচিবেন না। গত মন্বন্তরের সময়ে ধান-চাল ক্রমেই অগ্নিমূল্য হইতে থাকিলে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত ব্যক্তি তৈজস-পত্রাদি এবং পরে জমি ও ঘরবাড়ী বিক্রয় করিয়া উদরান্নের সংস্থান করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন তাঁহারা সর্বস্ব বিক্রয় করিয়াও আহার্য সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়া-ছিলেন, তখন তাঁহারা দলে দলে ভিক্ষুকরূপে বাহির হইয়া শহর বন্দর ও গ্রামের রাস্তাগুলি ছাইয়া ফেলিয়াছিলেন। এবারও কিছুদিন চালের মূল্য নিতান্ত অস্বাভাবিক থাকিলে যে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত লোক ক্রমে সর্বহারা ভিক্ষুকে পরিণত হইয়া 'মা, দুটি খেতে দাও', 'বাবা, দুটি

খেতে দাও' রবে শহর বন্দর ও গ্রাম মুখরিত করিয়া তুলিবেন, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। ইতোমধ্যেই স্থানে স্থানে এইরূপ সর্বহারা বুভুক্ষু দেখা যাইতেছে।

বাঙলা দেশ বর্তমানে যথার্থই দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হইলেও কিছুদিন হয় বাঙলা গভর্ণমেণ্টের খাদ্য-বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল মিঃ এস্ কে চাটার্জি মহাশয় ঘোষণা করিয়াছেন যে, এ বৎসর বাঙলায় দুর্ভিক্ষ হইবে না! স্থানে স্থানে চালের মূল্য যে নিতান্ত অস্বাভাবিক হইয়াছে ইহার কারণ জনসাধারণ নাকি ভবিষ্যতে চাল পাইবে না ভয় করিয়া যথেষ্ট পরিমাণে চাল জমাইয়া রাখিতেছেন! বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দী সাহেব বলিয়াছেন, ধান-চালের মূল্য বৃদ্ধির সংবাদ কাল্পনিক (fictitious)! ইহা সর্বজনাবদিত সত্য যে, খুব ভয় পাইলেও চাল জমাইয়া রাখিবার শক্তি বাঙলার পনর আনা লোকের একেবারেই নাই। ইহা আইনতঃও নিষিদ্ধ। পুলিসের চক্ষে ধূলি দিয়া বহু লোকের পক্ষে চাল জমান বর্তমানে অসম্ভব। যে সকল অঞ্চলে চাল অগ্নিমূল্য হইয়াছে ঐ সকল স্থান হইতে উল্লেখযোগ্য কোন চাল হোর্ডিং-কেস পুলিশ এ পর্যন্ত কোর্টে উপস্থিত করিতে পারেন নাই। কাজেই চাল জমাইয়া রাখার অভিযোগ একবারে ভিত্তিহীন। চালের মূল্যবৃদ্ধির সংবাদ কাল্পনিক বলিয়া যে বাঙলার প্রধান মন্ত্রী সাহেব অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা সত্য নহে। ঢাকা-বিভাগের কমিশনার সাহেব প্রমুখ পদস্থ সরকারী কর্মচারিগণও চালের মূল্যবৃদ্ধির সংবাদ স্বীকার করিয়াছিলেন।

মিঃ চাটার্জি মহাশয় আরও বলিয়াছেন, এই সময়ে প্রতি বৎসরই চালের মূল্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইহা সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলেও বলা যায় যে, গত দুর্ভিক্ষের সময় ভিন্ন কোন বৎসরেই চালের মূল্য স্থানে স্থানে ২৫৲ হইতে ৪৫৲ হয় নাই। পরন্তু একটু সন্ধান করিলেই জানা যায়, যে বৎসরে বাঙলায় চালের মূল্য বৃদ্ধি হয়, সে বৎসরে পার্শ্ববর্তী প্রদেশসমূহেও মূল্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু এবার কেবল বাঙলায়—বিশেষ করিয়া শুধু পূর্ববঙ্গেই চাল অগ্নিমূল্য হইল কেন? বাঙলা দেশে চালের মূল্য নিতান্ত অস্বাভাবিক এবং চাল খুব দুষ্প্রাপ্য না হইলে স্থানে স্থানে গবর্ণমেণ্টের গোলা হইতে চাল দেওয়ার আদেশ দেওয়া হইয়াছে কেন? আশ্চর্যের বিষয়, গবর্ণমেণ্টের গোলা হইতেও কোন স্থানেই আবশ্যকীয় চাল দেওয়া হইতেছে না। এজন্য আমদানির অভাবে ঘাটতি অঞ্চলসমূহে চালের মূল্য নিতান্ত অস্বাভাবিক আকার ধারণ করিয়াছে।

বাঙলা দেশে খাদ্য-ঘাটতির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলেই গবর্ণমেণ্টের সাপ্লাই-বিভাগ কর্তৃক স্থানে স্থানে রক্ষিত লক্ষ লক্ষ মণ খাদ্য-শস্য নষ্ট হওয়ার কথা স্বতঃই সকলের মনে উদয় হয়। প্রকাশ যে, ভারতে প্রতি বৎসর প্রায় ৩০ লক্ষ টন খাদ্য-শস্য সরকারী রক্ষা-ব্যবস্থার ত্রুটিতে ইন্দুরের পেটে যায় এবং বহুল পরিমাণ খাদ্য-শস্য পচিয়া যাওয়ায় ফেলিয়া দেওয়া হয়! ১৯৪৪ সনের ১৭ই ডিসেম্বর হইতে ১৯৪৫ সনের শেষ পর্যন্ত মাত্র এক বৎসরে রক্ষা-ব্যবস্থার ত্রুটির জন্য গবর্ণমেণ্টের সাপ্লাই-বিভাগ ৬,৮০,৮১০ মণ চাল ও ৩,২১,৩৯৫ মণ আটা একেবারে পচাইয়া ফেলিয়া দিয়াছেন! ডিরেক্টর জেনারেল মিঃ চাটার্জি বলিয়াছেন, ১৯৪৩ ও ১৯৪৪ সনে বাহির হইতে যে খারাপ চাল ও আটা আসিয়াছিল উহাই ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। খারাপ চাল ও আটা জাহাজ হইতে বন্দরে নামাইবার সময়েই ফেলিয়া না দিয়া বহু খরচে স্থানে স্থানে গোলাজাত করিয়া দীর্ঘকাল পরে ফেলিয়া দেওয়া হইল কেন? পক্ষান্তরে বাঙলা

দেশের অনেক স্থানে অযত্নে রক্ষিত লক্ষ লক্ষ মণ ধান চাল ও আটা নষ্ট হইতে দেশবাসী প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন। কাজেই তাঁহারা কখনও এবিষয়ে ডিরেক্টর জেনারেলের কৈফিয়ৎ বিশ্বাস করিবেন না।

পরিশেষে প্রশ্ন এই—উপস্থিত দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের উপায় কি? গবর্ণমেন্টের খাদ্য-বিভাগের ত্রুটি প্রদর্শন দেশের জনসাধারণের স্বার্থরক্ষার দিক দিয়া একান্ত আবশ্যক হইলেও কেবল ইহা দ্বারা দুর্ভিক্ষ দমন করা সম্ভব হইবে না। ভারতে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ সম্বন্ধে ইম্পিরিয়াল কৃষি-গবেষণা-বিভাগের শ্রীযুক্ত অভীশ্বর সেন মহাশয় লিখিয়াছেন: "আমাদের দেশে গম উৎপন্ন হয় বৎসরে নব্বই লক্ষ টন—আমাদের খরচ হয় গড়পড়তা সাড়ে নব্বই লক্ষ টন—কোন রকমে চলিয়া যায়। কিন্তু চালের বেলা ঘাটতি প্রায় কুড়ি লক্ষ টনের—১৯৪১ খৃষ্টাব্দে এর পরিমাণ প্রায় ষাট লক্ষ টন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রতি বৎসর ব্রহ্মদেশ হতে বাড়তি চাল এনে ভারতবর্ষের ঘাটতি পূরণ করা হত।" কিন্তু যুদ্ধের জন্য গত কয়েক বৎসর যাবৎ ইহা সম্ভব হইতেছে না। অভীশ্বর বাবু বলেন যে, পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভারতে কৃষিকার্য চালাইলে খাদ্যের কোন অভাব থাকিবে না। তিনি লিখিয়াছেন: "আমাদের দেশে যদি ডেনমার্কের মত গম আর স্পেনের মত ধানের ফলন হ'ত তা হলে চল্লিশ কোটি লোক কেন, আমাদের বর্তমান জনসংখ্যার পাঁচগুণ মানুষকে খাওয়াইবার মত শস্য আমাদের দেশেই উৎপাদন করা যেত।"*

ইহা দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কৃষিকার্য পরিচালন করিলে ভারতে দুর্ভিক্ষ চিরতরে রোধ করা যাইতে পারে। এই বিষয়টি আমাদের দেশের সকলকে জানান বিশেষ আবশ্যক হইলেও এই প্রবন্ধে উপস্থিত দুর্ভিক্ষ নিবারণের উপায়ই আমাদের আলোচ্য। ব্যক্তিগত চেষ্টায় এই দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। এজন্য সর্বত্র জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলকে সংঘবদ্ধ হইয়া কার্য করিতে হইবে। মনে রাখা দরকার যে, বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিগণ নিশ্চেষ্ট থাকিলে তাহারা কখনও বিপদমুক্ত হইতে পারিবেন না। দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য জনসাধারণের নির্বাচিত কতিপয় ব্যক্তিকে লইয়া প্রত্যেক গ্রামে এবং শহরের প্রতি ওয়ার্ডে এক একটি খাদ্য-কমিটি গঠন করিতে হইবে। ইহার সভ্যগণ স্থানীয় খাদ্য-পরিস্থিতি পর্যালোচনা করিয়া খাদ্য-শস্য আমদানি ও ধনি-দরিদ্র নির্বিশেষে সকল নরনারীর মধ্যে সমভাবে বণ্টনের ব্যবস্থা করিবেন এবং একজন লোকও যাহাতে অনাহারে না থাকেন তৎপ্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিবেন। দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের অবলম্বিত যে সকল নীতি জনসাধারণের স্বার্থরক্ষার ও সুবিধার অনুকূল, উহাদের সহিত কমিটি সম্পূর্ণ সহযোগিতা করিবেন। পক্ষান্তরে গবর্ণমেন্টের কোন খাদ্য-নীতি এবং সরকারী কর্মচারীদের কোন কার্যপ্রণালী জনসাধারণের স্বার্থরক্ষার প্রতিকূল হইলে উহার প্রতিকারের জন্য কমিটির সভ্যগণকে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ও দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হইবে। বর্তমানে দেশের খাদ্য-শস্য সম্পূর্ণভাবে সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। কাজেই গবর্ণমেন্টের সম্মতি ব্যতীত কোন ব্যক্তিবিশেষ বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে খাদ্য-শস্য সংগ্রহ করা অসম্ভব। সরকারী সাহায্য ভিন্ন দুর্ভিক্ষ রিলিফের কার্য বা দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য কার্যকর কিছু করাও কোন ব্যক্তি বা

* ডেনমার্কে একর পিছু গমের ফলন ৫০০০ পাউণ্ড, ভারতে ৭৫০ পাউণ্ড। স্পেনে একর পিছু চাল উৎপন্ন হয় প্রায় ৪০০০ পাউণ্ড, ভারতবর্ষে মাত্র ৮০০ পাউণ্ড।

প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভব নয়। এরূপ অবস্থায় গবর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতামূলেই দুর্ভিক্ষ দমনের জন্য কার্য করা সঙ্গত।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিও নিম্ন-লিখিত কার্য-সূচী অবলম্বনে সর্বত্র জনসাধারণের প্রতিনিধিমূলক খাদ্য-কমিটি গঠন করিতে পরামর্শ দিয়াছেন: (১) স্থানীয় খাদ্য-সমস্যা সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন। (২) মুষ্টিভিক্ষা দ্বারা দুঃস্থ ব্যক্তিদের সাহায্য দানের ব্যবস্থা। (৩) গোপনে চাল রপ্তানিতে বাধা, সরকারী মজুত খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা, যেখানে রেশনিং নাই সেখানে স্বয়ং প্রবর্তিত রেশনিং ব্যবস্থা, খাদ্যের অপচয় নিবারণ এবং খাদ্য উৎপাদন। (৪) দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলসমূহ পরিদর্শন। (৫) মজুত অতিলাভ ও দুর্নীতি দমনের ব্যবস্থা। এই উপায়সমূহ অবলম্বন করিলে জনসাধারণের দুঃখ যে কতকটা লাঘব হইবে এবং দুঃস্থ ব্যক্তিগণকে বাঁচাইয়া রাখা সম্ভব হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ নাই।

মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন যে, দুর্ভিক্ষের এই সংকটকালে যদি ধনবান ব্যক্তিগণ সর্বাপেক্ষা পুষ্টিকর গব্যদ্রব্য ও ফলাদি মূল্যবান জিনিস খাইয়া জীবনধারণ করেন এবং খাদ্য-শস্য একেবারে বর্জন করিয়া উহা গরীবদের জন্য বাঁচান, তাহা হইলে খাদ্য-শস্যের ঘাটতি অনেকটা পূরণ হইতে পারে। মহাত্মাজীর এই উপদেশ ন্যায়সঙ্গত হইলেও ইহা ব্যাপকভাবে কার্যে পরিণত হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। এই জন্য আমরা এইরূপ প্রতিকারের উপর গুরুত্ব আরোপ না করিয়া দুর্ভিক্ষ-পীড়িত প্রত্যেক স্থানে প্রাগুক্ত কর্ম-প্রণালীসমূহ ঠিক ঠিক অনুসরণের উপরই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিতে দেশবাসীকে অনুরোধ করি। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক স্থানে ধনবান বদান্য ব্যক্তিগণের দানে রিলিফ-ফণ্ড প্রতিষ্ঠা করিয়া দুঃস্থ নরনারীগণকে সাহায্য দান এবং বেকার নরনারীকে কাজ দিয়া তাহাদের জীবিকার্জনের ব্যবস্থা করার উপর বিশেষ জোর দিতে বলি। এই ভাবে কার্য করিলে বহু দুঃস্থ নরনারীকে দুর্ভিক্ষের কবল হইতে রক্ষা করা অনেকটা সম্ভব হইবে। প্রকৃত-পক্ষেও সংঘবদ্ধভাবে এই সকল কার্য করা ভিন্ন দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ব্যক্তিগণের জীবন রক্ষা করিবার অন্য কোন উপায় আপাততঃ আমাদের আয়ত্তে নাই। এই সংকটকালে আমাদের অবহিত থাকা দরকার যে, আমাদের নিজেদের স্বার্থপরতা সাম্প্রদায়িকতা ঐক্যহীনতা দুর্বলতা অকর্মণ্যতা এবং সংঘবদ্ধভাবে কার্য করিবার অক্ষমতাও আমাদের দুর্গতির জন্য কম দায়ী নয়। এই সাংঘাতিক বিপদকালে সকলেরই বিশেষ ভাবে মনে রাখা আবশ্যক যে, কেবল ব্যক্তিগত বা পরিবারগত ভাবে বাঁচিয়া থাকিবার চেষ্টা করিলে শেষ পর্যন্ত ধনি-দরিদ্র কেহই বাঁচিতে পারিবেন না। দুর্ভিক্ষের আক্রমণে সমগ্র দেশ যদি শ্মশানে পরিণত হয়, সমগ্র জাতি যদি ধ্বংস হয়, তাহা হইলে ব্যক্তিগত বা পরিবারগত ভাবে বাঁচিয়া থাকাও নিশ্চয়ই মৃত্যুতুল্য হইবে।

ছান্দোগ্যে ধারণার ক্রমবিকাশ

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

ছান্দোগ্য উপনিষৎ অত্যন্ত প্রাচীন, তার বিস্তৃতি ও বিষয়-বস্তুও বেশ বড়। ছান্দোগ্যে ধারণার ক্রমবিকাশ বল্‌তে এটাই আমরা খুব সংক্ষেপে ও সহজ ভাষায় দেখাবার চেষ্টা করব যে, প্রকৃতি বা স্বভাবকে (Nature) অবলম্বন ক'রে মানুষের মন কিরকম ক'রে স্তরে স্তরে স্বভাবের নিয়ন্তা ভগবানের দিকে অগ্রসর হয়েছে। একই মনের বিকাশের এক একটি স্তরই মানুষের চিন্তার ভিন্ন ভিন্ন রূপ, আর তাকেই বল্‌তে চাচ্ছি আমার ধারণা।

সৃষ্টির গোড়াকার দিকে মানুষ প্রথমেই লক্ষ্য করলে সৃষ্টির বৈচিত্র্যকে। আরো দেখ্‌লে প্রকৃতির খেলা ও কলাকৌশল, মানুষের উপকার বা প্রয়োজনের জন্যে কি রকম ক'রে নিঃস্বার্থভাবে দৈনন্দিন অভাবকে সে পরিপূরণ ক'রে যাচ্ছে। তারা বিস্ময়ে অবাক্ হ'য়ে গেল, নিজেদের শক্তি-সামর্থ্যকেও যাচাই ক'রে দেখ্‌তে ছাড়লে না যে, তারাই বা প্রকৃতির তুলনায় কত বড় বা কত ছোট? পরিশেষে তারা মান্‌তে রাজী হল একটা বড় অর্থাৎ বিরাট শক্তিকে যা সমগ্র সৃষ্টির ওপর প্রভুত্ব করছে—সমস্ত সৃষ্টিটাকে নিয়ন্ত্রিত করছে। তারপর তারা খুঁজ্‌তে লাগ্‌ল সে বড় শক্তিটি কি? আর জগতের কারণই বা কি? এত বড় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা যে অচল না হ'য়ে দিনের পর দিন সুশৃঙ্খলভাবেই চলেছে তার আসলে কর্তাই বা কে? জ্ঞান ও বিচারের সুতরাং উন্মেষও হল ঠিক এখান থেকেই, কারণ অন্বেষণের ও জানার প্রবৃত্তিকে তারা তখন আর চেপে রাখ্‌তে পার্‌লে না, অনুসন্ধানের পথে ছুটে চল্‌ল তারা বিচার ও বুদ্ধিকে সম্পূর্ণ সহচারী ক'রে। তারপর তারা দেখ্‌তে পেলে এত বড় সৃষ্টিবৈচিত্র্যের কারণ এক আদিত্য বা সূর্যই, কেননা সূর্যের থাকা ও না-থাকার ওপরেই নির্ভর করছে সৃষ্টির সব-কিছুরই বাঁচা বা না-বাঁচা। সূর্য না থাক্‌লে হয় অন্ধকার ও প্রলয়, সব জিনিসই সূর্যের উত্তাপ ও আলোর অভাবে হয় হিমময় ও মৃত; সুতরাং দেদীপ্যমান সূর্যকেই তখন তারা মেনে নিতে বাধ্য হল জগতের একমাত্র কারণ ব'লে। সূর্যই সুতরাং হল সকলের তাদের উপাস্য দেবতা। এই সূর্যের উদয় ও অস্তের ভেতরেই তারা দেখ্‌লে জীবন ও মৃত্যুর খেলা। মানুষ যে মরে আবার নতুন জন্ম নেয় এর বিশ্বাস ও ধারণাও তারা পেলে ঐ সূর্যের দৈনন্দিন উদয়াস্ত থেকেই। মোটকথা একই সূর্য থেকেই একেবারে গোড়াকার মানুষের সব-কিছু ধারণার বা কল্পনার হল বিকাশ ও পরিণতি।

ছান্দোগ্যে উদ্‌গীথের উপাসনার কথা আছে প্রায় প্রথমেই, কিন্তু সেখানেও সূর্যের ধারণার ওপরই উদ্‌গীথ বিকাশ লাভ করেছে দেখা যায়। ছান্দোগ্যের ১।৩।১ শ্লোকে উদীয়মান প্রাতঃ সূর্যকেই বলা হয়েছে উদ্‌গীথ। ১।৫।১ শ্লোকে তারপর মুখ্যপ্রাণ ও ১।৩।২ শ্লোকে স্বরের কথা আছে; কিন্তু প্রাণ ও স্বর সেখানে সূর্যই। ঋক্ ও সামের পরিচয় পাই আমরা ১।৬।১ থেকে ১।৬।৫ শ্লোকগুলির ভেতর। কিন্তু ঋক্ ও সামকেও সেখানে করা হয়েছে প্রাকৃতিক সম্পদেরই

সমষ্টিস্বরূপ। যেমন ঋক্ হল পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, দ্যুলোক, নক্ষত্র ও শুক্লরঙের সমষ্টি, আর সাম হল অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, চন্দ্র ও নীলরঙের সমষ্টিমূর্তি। এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় যে, ঋক্ ও সামবেদকে অবলম্বন ক'রে এক সূর্যেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ কল্পনা করা হয়েছে; যেমন অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, নক্ষত্র এই সব। পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোক বা ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই তিন লোকের কল্পনাও এখানে করা হয়েছে, আর এক সূর্য থেকেই ঐ তিনের কল্পনা রূপায়িত হ'য়ে উঠেছে এখানে।

তারপর ছান্দ্যোগ্যের ১৷৬৷৬ শ্লোকে সূর্যকে বলা হয়েছে হিরণ্ময় পুরুষ, হিরণ্যশ্মশ্রু ও হিরণ্যকেশ। মোটকথা গোড়াকার জড় সূর্যই প্রাণবান হ'য়ে হয়েছে জগতের কারণ, শক্তি, উদ্‌গীথ, প্রাণ, স্বর, ঋক্ ও সাম, আর এখানে (১৷৬৷৬ শ্লোকে) সেই সূর্যই হল একেবারে আবার হিরণ্ময় পুরুষ। কিন্তু এই হিরণ্ময় পুরুষ কে? হিরণ্যগর্ভরূপী চতুর্মুখ ব্রহ্মা, পরব্রহ্ম না সূর্য? সূর্যকেই কিন্তু বলা হয়েছে এখানে হিরণ্ময় বা জ্যোতির্ময় পুরুষ। তবে ৩৷১১৷৪ শ্লোকে আমরা পিতামহ ব্রহ্মার পরিচয়ও পেয়ে থাকি।

ছান্দোগ্যের ১৷৭৷১ থেকে ১৷৭৷৩ শ্লোকগুলিতে তিনটি ক'রে ইন্দ্রিয়ের পরিচয় পাওয়া যায় যদিও সে ইন্দ্রিয় তিনটির বিকাশ হয়েছিল ঋক্ ও সাম থেকেই বা ঋক্ ও সামের সঙ্গে ওতঃপ্রোত হ'য়েই; যেমন বাক্, চক্ষু ও শ্রোত্র এরা হল ঋকের সমান, আর প্রাণ, আত্মা ও মন সামের সমান। বাক্, চক্ষু ও শ্রোত্র এরা সকলের আদি ইন্দ্রিয়। প্রাণ, আত্মা ও মন ঐ ইন্দ্রিয় তিনটির আবার কারণ ও অধিদেবতাও বটে। এই তিন ইন্দ্রিয়বিভাগ কিন্তু সূর্যের তিন অবস্থা বা প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যারই প্রতীক ছাড়া আর কিছু নয়; কারণ সূর্যকে ধরেই যে গোড়াকার সব-কিছু ধারণার উৎপত্তি হয়েছিল তা আগেই বলেছি। এর পর ১৷৫৷৭ শ্লোকে সর্বপ্রথম 'ব্রহ্ম' এই শব্দটার পরিচয় আমরা পাই, যদিও ব্রহ্মের অর্থ সেখানে করা হয়েছে 'তিন বেদ'। ১৷৭৷৫ শ্লোকের পরিচয়টা হল "অন্তরক্ষিণি পুরুষঃ" ও "তদ্‌ব্রহ্ম"। এরপর ১৷৯৷২ শ্লোকে বহিঃ ও অন্তরের দেখা যায় মিলন করা হয়েছে। সেখানে উদ্‌গীথের কথাও আছে, তবে সে উদ্‌গীথ ১৷৩৷১ শ্লোকের মত উদীয়মান সূর্য আর নয়, একেবারে হয়েছে "পরোবরীয়" কিনা সর্বশ্রেষ্ঠ বা পরমাত্মা, যদিও তার কারণকে আকাশই বলা হয়েছে। আকাশে সূর্য প্রকাশ পায়, আকাশ সূর্যের আধার সুতরাং আশ্রয়-স্থল। আকাশের সীমা অনন্ত, বিরাট সূর্যকেও সে প্রসব করতে ও আশ্রয় দিতে পারে সুতরাং কারণের ধারণা সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু ১৷১১৷৫ শ্লোকে এই কারণরূপী আকাশ আবার সমস্ত জীবের আশ্রয় অর্থাৎ 'প্রাণ'-রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই 'প্রাণ' কিন্তু সূর্যই আর সেকথা ১৷৩৷২ শ্লোকে স্পষ্ট ক'রেই দেখান হয়েছে। তারপর ১৷৭৷১ শ্লোকে প্রাণকে আবার 'সাম' আখ্যাও দেওয়া হয়েছে।

এরপর ছান্দোগ্যের ২৷১১৷১ শ্লোকে 'হিঙ্কার' অর্থে প্রণবের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। এই প্রণব এখানে শুধু আর উদ্‌গীথ বা একটি-মাত্র রূপ নয়, তিনটি অক্ষর বা লোকেরই সমষ্টিস্বরূপ হ'য়ে প্রকাশ পেয়েছে। এর আগে বাক্, চক্ষু ও শ্রোত্র বা প্রাণ, আত্মা ও মন এই তিনটী ভাগের পরিচয় আমরা পেয়েছি। সূর্য ও আকাশের পরিচয়ও বটে। এখানে (২৷১১৷১ শ্লোকে) এবার 'ত্র্যক্ষর' কিনা প্রণবের অ+উ+ম এই তিন অক্ষরের আসল রূপ ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই তিন লোকের পরিচয়ও পেলাম। অবশ্য এই তিন লোকের পরিচয় আমাদের কাছে

একেবারে নূতন নয়, কেননা ১।৬।১ থেকে ১।৬।৫ শ্লোকগুলিতে ঋক্ ও সামের পরিচয়স্বরূপ পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোকের এবং তাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অগ্নি, বায়ু ও আদিত্যের পরিচয় পেয়েছি। এরপর ৩।৫।১ শ্লোকে প্রণব আবার "ব্রহ্ম" এবং ৩।১১।২ শ্লোকে "সত্যেন" শব্দেও "ব্রহ্ম" কথারই উল্লেখ করা হয়েছে। ৩।১২।৫ শ্লোকে "চতুষ্পদা * * গায়ত্রী" আর ২।১৩।১ শ্লোকে "ত্রয়ো ধর্মস্কন্ধাঃ" কিনা গায়ত্রীর চারভাগ ও ধর্মের তিন ভাগ একথাও বলা হয়েছে। এখানেই সত্য কথা বল্‌তে গেলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য থেকে অতীন্দ্রিয়, স্থূল থেকে সূক্ষ্ম বা কারণের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। গায়ত্রীরূপী সূর্য এখানে প্রথম পাদে "সর্বভূত" এবং বাকি তিনটি পাদে "দিবি" বা "অমৃত"-স্বরূপ। তাছাড়া ৩।১২।৭ শ্লোকে গায়ত্রী যে ব্রহ্ম ও আকাশ একথা স্পষ্টই উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে আর একটী লক্ষ্য কর্‌বার বিষয় যে, ব্রহ্ম ও আকাশ যেন একই পর্যায়ভুক্ত; কেননা আকাশ যেমন বিশাল ও অনন্তবিস্তারী, ব্রহ্মের "বৃহৎ-"এর ধারণাও ঠিক সেই রকম। আকাশের বিরাটত্ব থেকেই ব্রহ্মের বিরাটের ধারণা এসেছে একথা কল্পনা করা অমূলক নয়। তারপর 'দিবি' কিনা দ্যুলোক; যে 'অমৃত'—তার মরণ নাই, ক্ষয় নাই, এভাবের কল্পনাও করা হয়েছে। এই দ্যুলোক, স্বর্গ বা আকাশ এতই পবিত্র ও বাঞ্ছনীয় যে, ২।১৩।২ শ্লোকে দেখা যায়, স্বয়ং বিশ্বস্রষ্টা প্রজাপতিও এই লোক পাবার জন্যে তপস্যায় নিরত হয়েছেন। প্রজাপতি বা লোকস্রষ্টা পিতামহ ব্রহ্মার পরিচয় এখানে একদিকে চাক্ষুষ হ'য়েই উঠেছে।

দর্শন ও আধ্যাত্মিকতার চরম আদর্শের ভাব ৩।১৪।১ শ্লোকে "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" কথাগুলিতে উল্লেখ করা হয়েছে। ব্রহ্ম এখানে আর স্থূল আকাশ, দ্যুলোক বা সাম নন, তিনি একেবারে সকল ভুবন ও ভুবনবাসী প্রজাদের অন্তরাত্মা-রূপে প্রকাশমান। তবে ছান্দোগ্যের ভাষ্যকারেরা ব্রহ্মকে এখানে ক্রতু বা যজ্ঞময় পুরুষের প্রতি-কৃতি ব'লেই ব্যাখ্যা কর্‌তে চেয়েছেন। মোটকথা ক্রতুময় পুরুষ হ'লেও আমাদের তাতে কোন আপত্তি নেই, কেননা সেই ক্রতুময় পুরুষই আবার সর্বসংকল্পের অধিষ্ঠাতা হিরণ্য-গর্ভরূপী কারণ-ঈশ্বররূপে প্রকাশ পেয়েছেন। অবশ্য এ ধারণা ও ব্যাখ্যাই ঠিক; কেননা তার পরেই ৩।১৪।২ শ্লোকে স্থূলকে ছেড়ে "মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ" অর্থে লিঙ্গশরীরের কথা বলা হয়েছে। এই লিঙ্গশরীর আবার "আত্মা", এবং আত্মার বাস-স্থান নির্দেশ করা হয়েছে "হৃদয়"-এ (৩।১৪।৩)। ৩।১৪।৪ শ্লোকে এই লিঙ্গদেহরূপী আত্মাকে "এতদ্ ব্রহ্ম" ব'লে এঁর স্থান "এতমিতঃ প্রেত্যাভিসম্ভবিতাস্মীতি" কথাগুলিতে পরলোকেই স্থান নির্ণয় করা হয়েছে। এখানে তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, হৃদয় ও পরলোক একই পর্যায়-ভুক্ত। কথাটা একেবারে মিথ্যাও নয়। 'পরলোক' শব্দে যে আমরা বুঝি যমলোক বা প্রেতলোক, তা আকাশের ওপরে বা পৃথিবীর কোন গহন স্থানে অবস্থিত নয়। প্রেত বা যমলোক হল হৃদয়, যেখানে মনের (অন্তঃকরণের) বাস। মন অর্থাৎ মানসলোকই প্রেতাত্মাদের আবাস-ভূমি, এজন্যে পরলোক, প্রেতলোক ও অন্তর্লোকের অর্থ একই। মানুষ মৃত্যুর পর যায় কোথা? আকাশে, মেঘে না পৃথিবীর নীচে? কোথাও নয়, মানুষ কিনা লিঙ্গ বা সূক্ষ্মশরীররূপী আত্মা মৃত্যুর পরে মনোরাজ্যেই বাস করে। এই মনোরাজ্যের স্থান নির্দেশ করেছেন শাস্ত্রকারেরা হৃদয়ে, আর সেজন্যেই ৩।১৪।৪ শ্লোকে আত্মা বা ব্রহ্মকে হৃদয়রূপ গুহাবাসীই বলা হয়েছে। তারপর একথার সমর্থন আরো স্পষ্ট হয়েছে ৩।১৮।১

শ্লোকে যেখানে মনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মন অর্থে সেখানে ব্রহ্ম বা আকাশ। সুতরাং মন অর্থে অন্তঃকরণরূপী ব্রহ্ম কিনা সূক্ষ্মদেহী জীবাত্মা এবং আকাশ কিনা অন্তরাকাশ একই শব্দবাচী। দর্শনে পরেকার যুগে এদেরই সূক্ষ্ম-জগৎ বা ব্যষ্টিকে 'তৈজস' ও সমষ্টিকে 'হিরণ্যগর্ভ' ব'লে ভাগ করা হয়েছে।

এর পর ৩।১৮।২ শ্লোক থেকে ব্রহ্মের (সগুণ) কথা স্পষ্ট উচ্চারণ ক'রে ৩।১২।৫ শ্লোকে "সৈষা চতুষ্পদা * * গায়ত্রী"-র মতন ব্রহ্মকে "চতুষ্পাদ" বলা হয়েছে ; তাও অধ্যাত্ম ও অধিদৈবত এই দু'ভাগে বিভক্ত ক'রে। যেমন অধ্যাত্ম হল বাক্, প্রাণ, চক্ষু, ও শ্রোত্র, আর অধিদৈবত হল অগ্নি, বায়ু, আদিত্য ও দিক্। ৪।৬।৩ শ্লোকে ব্রহ্মের 'চতুষ্কল' কিনা চারটী অংশের কথাও বলা হয়েছে : "চতুষ্কলঃ পাদো ব্রহ্মণঃ।" এই কলা বা অংশ কি কি? পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, দ্যৌঃ ও সমুদ্রই ঐ চার পাদ, অংশ বা কলা। ৪।৬।৪ এবং ৪।৭।৩ শ্লোকগুলিতে আবার ব্রহ্মের চার অংশের নাম করা হয়েছে, যেমন অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র ও বিদ্যুৎ। ৪।৭।৪ এবং ৪।৮।৩-৪ শ্লোকগুলিতে পুনরায় প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র ও মনের কথা বলা হয়েছে। মোট কথা অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র ও বিদ্যুৎ বাইরে স্থূলজগতের একই আদিত্য বা সূর্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। এরকম আন্তর জগতে প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র ও মন এই ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত। এদের ও বিশেষ ক'রে মনকে আবার বলা হয়েছে "আয়তন", অর্থাৎ স্থান বা আধার। এখানে বৈচিত্র্য থেকে কেন্দ্রে বা কারণে ফিরে আসার ইঙ্গিত বেশ স্পষ্টই দেখা যায়। শুধু তাই নয়, একই যে বহুর আধার বা আশ্রয় (substratum) একথারও এখানে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। এর পরেকার যুগে কিন্তু এই সূত্র ধ'রেই অদ্বৈতের আচার্যেরা ও বিশেষ ক'রে আচার্য শঙ্কর 'একই সত্য আর বহু মিথ্যা, একেরই বিকার বহু' এই সব সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করেছেন। কেননা ৪।১১।১ শ্লোকে পৃথিবী, অগ্নি, অন্ন ও আদিত্যের নাম করেও এঁদের অধিদেবতা ও বিশেষ ক'রে আদিত্যে যে পুরুষ রয়েছেন তাঁকেই "সোঽহমস্মি" ব'লে আত্মা বা ব্রহ্মের সঙ্গে সমান বলা হয়েছে। আসল কথা, বৈচিত্র্যের বা ব্যষ্টি সমস্ত জিনিসের কেন্দ্র বা আধারই যে আত্মা বা ব্রহ্ম এই তাৎপর্যই ছান্দোগ্য উপনিষৎ দেখাতে চেষ্টা করেছে।

ছান্দোগ্যের ৪।১৭।১ শ্লোক থেকে সৃষ্টির সম্বন্ধেই বলা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোক এই তিনটীমাত্র লোকই গোড়াকার দিকে অন্ততঃ ছিল। পৃথিবী থেকে উৎপন্ন অগ্নি, অন্তরীক্ষ থেকে বায়ু ও দ্যুলোক থেকে সূর্য। মোট কথা পৃথিবী ও দ্যুলোক "দ্যাবাপৃথিবী" বা "দ্যৌপৃথিবী"-ই আদি দেবতা। তবে সৃষ্টির ক্রমবিকাশের ইতিহাস অনুযায়ী দ্যাবাপৃথিবী-ও সৃষ্টি-ধারণার দ্বিতীয় স্তর মাত্র। প্রথম স্তরে বিকাশের ধারণা ছিল "মিত্র-বরুণকে" নিয়েই। কারণ ঋগ্বেদে প্রথমেই উল্লেখ পাই আমরা 'বরুণ' দেবতার, তারপর মিত্রের। 'বরুণ' হলেন আকাশ আর 'মিত্র' কি না সূর্য। "মিত্রাবরুণৌ"-এর ধারণা আকাশস্থ সূর্য বা আকাশ ও সূর্য। এর পরেকার স্তরেই হল দ্যৌঃ কিনা অন্তরীক্ষ আকাশ ও পৃথিবী। সৃষ্টির তৃতীয় স্তরে আবার দ্যুলোক ও পৃথিবীর অন্তর্বর্তী অন্তরীক্ষ-লোক এসেও উপস্থিত হল। ছান্দোগ্যে আমরা এই তৃতীয় স্তরের সৃষ্টি-বিকাশই দেখ্‌তে পাই। পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোক থেকে অগ্নি, বায়ু ও সূর্যের উৎপত্তি হ'লেও আসলে এরা এক সূর্যেরই ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি বা রূপ। বৈদিক যুগে অর্থাৎ ছান্দোগ্যেরও আগে সোমযাগের ভেতর

আমরা যে তিনটী স্তরের পরিচয় পাই তা-ও ঐ সৃষ্টির তৃতীয় স্তরেরই কথা। যেমন উপাস্য ইষ্টিযাগে তিনটি মাত্র দেবতার উল্লেখ আছে—অগ্নি, সোম ও বিষ্ণু। প্রাতরনুবাক্ ঋঙ্মন্ত্রের দেবতাদের নাম যেমন অগ্নি, উষা ও অশ্বিদ্বয়। তারপর তিনটী দেবতার আহুতির বেলায়ও তাই, তিনটী তিনটী ক'রে আহুতি দেবার রীতি ছিল। যেমন অভিষবের সময় অর্থাৎ সোমযাগের পঞ্চম দিনে যখন সোমলতার রস বার ক'রে আগুনে আহুতি দেওয়া হত তখন প্রাতঃসবন, মাধ্যন্দিন ও তৃতীয়সবনই মাত্র দেওয়া হত। এখানে আহুতি আবার যে দেবতার উদ্দেশ্যে দেওয়া হত তাও শুধু একটিমাত্র দেবতাকে উপলক্ষ্য ক'রেই দেওয়া হত না, ঐন্দ্রবায়ব, মৈত্রাবরুণ ও অশ্বিদ্বয় এই দুজন দুজন দেবতাদের মিথুন বা সমষ্টির উদ্দেশে দেওয়া হত। অবশ্য সোমযাগে অধ্বর্যু ও প্রতিপ্রস্থাতা ঋতুপাত্র পূর্ণ ক'রে সোমাহুতি দেবার সময়ে ছজন দেবতার উদ্দেশ্যেও আহুতি দান করতে দেখা যায়। তবে সাধারণতঃ আহুতি দান করা হত তিনটী ক'রে তিন জন দেবতাকেই লক্ষ্য ক'রে। যেমন প্রাতঃসবনের আহুতি ছিল ঐন্দ্রাগ্নি, বৈশ্বদেব ও উকথ্য; মাধ্যন্দিনসবনের আহুতি ছিল মরুত্বতীয়, মাহেন্দ্র ও উক্থ্য এবং তৃতীসবনের আহুতি ছিল আদিত্যগ্রহ, সাবিত্রগ্রহ ও পাত্নীবত-গ্রহ। শুধু তাই নয়, তিনজন দেবতার মতন উদ্গাতা, প্রস্তোতা ও প্রতিহর্তা এই তিনজন সামগায়ী ঋত্বিক্ও যজ্ঞাগ্নির সামনে সামগান করতেন।

সৃষ্টির তৃতীয় স্তরের সোমযাগ ছাড়াও সৌত্রামণীযজ্ঞে আবার দেখা যায় যে, যজ্ঞের দেবতাও সেখানে মাত্র তিনজন, যেমন অশ্বিদ্বয়, সরস্বতী ও ইন্দ্রসুমাত্রা। ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও ইড়া, সরস্বতী ও ইন্দ্রসুমাত্রা। ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও ইড়া, সরস্বতী ও মহী এই তিনজন মাত্র দেবতার কথাই প্রথমের দিকে উল্লেখ আছে। দেবতা, মনুষ্য ও পিতৃ এই তিনটী মাত্র বংশ বা কুলই মনুষ্যসমাজে তখন ছিল; আর স্বাহাকার, হন্তকার ও স্বধাকার এই তিন আহুতির মন্ত্রও ঐ তিন কুলের মধ্যে প্রচলিত ছিল। মোট কথা, সর্বত্রই তিনটী ক'রে বিভাগের সূত্র ও রীতি আমরা সেই তৃতীয় স্তরের যুগে লক্ষ্য ক'রে থাকি। এই তৃতীয় স্তরেই কিন্তু "ত্রিত্ববাদ" বা Trinity-র ও সর্বত্র উদ্ভব হয়েছিল। তার আগে দুয়েরই ছিল রাজত্ব।

ছান্দোগ্যের ৪।১৭।২-৩ শ্লোক দুটীতেও দেখি ঐ তিনের বিকাশরীতিকেই অক্ষুণ্ণ রেখে অগ্নি, বায়ু ও আদিত্য থেকে ঋক্, যজুঃ ও সাম এই তিন বেদের উৎপত্তির কথা বলা হয়েছে। অগ্নি, বায়ু ও আদিত্য আগেই বলেছি যে, এরা একই সূর্যের ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ বা রূপ ছাড়া আর কিছু নয়। তিন বেদও তাই। ঋক্ই প্রধান। ঋক্ছন্দে যখন সুর (স্বর) দিয়ে গান করা হল তখনই তাকে 'সাম' আর ঐ ঋক্-ছন্দকে যজ্ঞে মন্ত্ররূপে যখন ব্যবহার করা হল তখন 'যজুঃ' বলা হল। অথর্ববেদের উল্লেখ এখানে নেই, "ত্রয়ী"[১] একথাই মাত্র বলা হয়েছে। তাই এ কথাই অনুমান করা যায় যে, অথর্ববেদ বা বিভাগের সৃষ্টি হয়েছিল পরে, অন্ততঃ ছান্দোগ্যের সময়ে তো নয়ই। তারপর ছান্দোগ্যের এই যে তিন বেদের সঙ্গে অগ্নি প্রভৃতির সাদৃশ্য বা তুলনা এও সূর্যেরই তিন অবস্থার সঙ্গে তুলনা ক'রে বলা হয়েছে।

ছান্দোগ্যের ৫।১১।১ শ্লোকটী বিশেষ প্রয়োজনীয় বলেই আমরা মনে করি। কেননা

১ *Rigvedic Culture of the Pre-historic Culture* পুস্তকের সুযোগ্য লেখক স্বামী শঙ্করানন্দজী অনুমান করেন, 'ত্রয়ী' বলতে ঠিক ঋক্, যজুঃ ও সাম বুঝায় না। বরং বেদ (চারিবেদ), আবেস্তা ও তন্ত্রকেই বোঝায়। অবশ্য স্বামী শঙ্করানন্দজীর এই সিদ্ধান্ত এখনো পরীক্ষাসাপেক্ষ।

এতেই ঠিক ঠিক "কো ন আত্মা? কিং ব্রহ্মেতি?" শব্দ দুটী দিয়ে আত্মা কি ও ব্রহ্ম কি?—এই প্রশ্ন করা হয়েছে। এই প্রশ্ন দুটির ভেতর প্রচ্ছন্নভাবে কিন্তু আত্মা ও ব্রহ্মের একতা সম্বন্ধেও বেশ সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে, কেননা তা না হ'লে "আত্মা বৈ ব্রহ্ম" অর্থাৎ 'আত্মাই ব্রহ্ম' একথাই সরাসরি একেবারে উল্লেখ করা থাকত। শুধু তাই নয়, আত্মা বা ব্রহ্মবস্তুকে জানার ইতিকর্তব্যতারও নির্দেশ এখানে করা হয়েছে ব'লে আমরা মনে করি।

এর পর ছান্দোগ্যের ৫।১৮।১ শ্লোকে এক ও বহু বা ব্যষ্টি ও সমষ্টির ধারণা সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে।[১] কেবল তাই নয়, ব্যষ্টি যে স্থূল ও সংকীর্ণ এবং সমষ্টি যে সূক্ষ্ম এবং অনন্ত ও উন্নত একথারও আভাস দেওয়া হয়েছে। মোটকথা, স্থূলে যে শান্তি নাই, স্থূলকে অতিক্রম ক'রে সূক্ষ্ম তথা কারণের সন্ধানেই সকলকে শাশ্বত শান্তির অন্বেষণ করতে হবে—একথার ইঙ্গিতই করা হয়েছে। জ্ঞানী রাজা অশ্বপতি এখানে বক্তা, আর অশ্বপতির কাছে সমাগত ব্রাহ্মণেরা শ্রোতা। অশ্বপতি ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্য ক'রে বলেছেন: "তান্ হোবাচ, এতে বৈ খলু যূয়ং পৃথগিবেমমাত্মানং বৈশ্বানরং বিদ্বাংসোঽন্নমথ, যস্ত্বেতমেবং প্রাদেশমাত্রমভিবিমানমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে, স সর্বেষু লোকেষু সর্বেষু ভূতেষু সর্বেষ্বাত্মস্বন্নমত্তি।" আত্মা এখানে বৈশ্বানর ঈশ্বর। এই বৈশ্বানর ঈশ্বরকে ছান্দোগ্য ৫।১৮।২ শ্লোকে বিরাট বা সমষ্টিরূপে কল্পনা করতে উপদেশ দিয়েছে।

স্থূল থেকে আরম্ভ ক'রে ক্রমশঃ সূক্ষ্মের ভেতর দিয়ে ছান্দোগ্যের ৬ষ্ঠ প্রপাঠকেই পিতা আরুণি ও পুত্র শ্বেতকেতুর উপাখ্যানে ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনা করা হয়েছে। ৬।২।১ শ্লোকেই এই আলোচনার উৎকর্ষ আবার দেখান হয়েছে, কেননা এখানে এক-মাত্র 'সৎ' স্বরূপ ব্রহ্মই সর্বগত ও সত্য, আর সৃষ্টি ও বৈচিত্র্য অসৎ বা মিথ্যা একথা প্রতিপাদন করা হয়েছে। যেমন "সদেব সৌম্য! ইদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।" অবশ্য এসময়ে যে বিরুদ্ধ বা ভিন্ন মতাবলম্বী লোকেরাও ছিল একথা নয়। 'অসৎ' বা শূন্য থেকেই যে জগতের উৎপত্তি এই মতও এক সম্প্রদায় স্বীকার করত, কেননা "তদ্ধৈকে আহুঃ" কথা থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। অবশ্য ছান্দোগ্যের অভিপ্রায় অন্য। ছান্দোগ্য এক ও একমাত্র 'সৎ' থেকেই বিচিত্র জগৎ উৎপন্ন হয়েছে একথাই প্রতিপাদন করতে চায়, অসৎ বা শূন্য থেকে নয়। সৃষ্টির আগে একই ছিল, সেই বিরাট পুরুষ বা ঈশ্বর "বহু হব" কল্পনা করলেন, আর সেই কল্পনাতেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয়ে গেল। অবশ্য ছান্দোগ্যের ৬।২।৩-৪ শ্লোকদুটিতে সৃষ্টির এই রহস্য ও তত্ত্ব সাংখ্য ও আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গেও একেবারে অমিল নয়। "তত্তেজ", "তদপোঽসৃজত," তদধ্যাপো জায়ন্তে," "তা অন্নমসৃজন্ত" প্রভৃতি শব্দ বা কথাগুলি সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও স্তরকেই সমর্থন করে।[১]

এক আত্মাই যে নাম ও রূপে সকল সৃষ্টির ভেতর অনুস্যূত হ'য়ে রয়েছে একথা

১ ছান্দোগ্যের ৮।১।১ শ্লোক থেকেই ব্যষ্টি ও সমষ্টির রহস্য অবশ্য সুস্পষ্ট।

১ বৈজ্ঞানিক জিন্স্ প্রণীত *The Universe Around Us*, পৃষ্ঠা ৩৪৯, *The Stars in Their Courses*, পৃষ্ঠা ১৩৩ এবং স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত *Cosmic Evolution and Its Purpose* পুস্তক দ্রষ্টব্য। ডাঃ জিন্স্ স্পষ্টই বলেছেন: "The final state of the universe will, then, be attained when * * and its energy transformed into heat-energy wandernig * * this low-level heat-energy may in due course reform itself into new electrons and protons."

৬।৩।২ শ্লোকে বলা হয়েছে। ৬।৩।৩ শ্লোকে তেজ, জল ও পৃথিবী এই তিন ভূতের কথাও আছে। এটাই ত্রিবৃৎকরণ। সৃষ্টির গোড়াকার দিকে ক্ষিতি, অপ্‌ ও তেজই মাত্র ছিল, মরুৎ ও ব্যোম ছিল না। কিন্তু এই নিয়ে আচার্য শঙ্কর ও তাঁর পরবর্তী আচার্যেরা যথেষ্ট বিচার ক'রে গেছেন পাঁচটী ভূতের পক্ষকে সমর্থন ক'রে।

ছান্দোগ্যের ৬।৮।১ শ্লোক থেকে উদ্দালক ও শ্বেতকেতুর উপাখ্যানকে অবলম্বন ক'রে সুষুপ্তিতে জাগ্রৎ রয়েছেন বা সুষুপ্তির সাক্ষিস্বরূপ পরমাত্মভাবকে অনুভব করতে হবে একথাই বলা হয়েছে। এখানে "স্বপ্নান্তং" ও "স্বপতি নাম" অর্থাৎ সুষুপ্তির কথা থাকার জন্যে আবার স্বপ্ন ও জাগ্রতের কথা উপলক্ষিত রয়েছে বুঝ্‌তে হবে। এই তিনটী মনের অবস্থাই কি সাধন-জগতে, কি দর্শন জগতে উভয়েই বিশেষভাবে আলোচনার বিষয়। ছান্দোগ্যের এই ষষ্ঠ প্রপাঠকেই দেখা যায় সুষুপ্তি, স্বপ্ন ও জাগ্রৎ এই তিন অবস্থার বীজ নিহিত রয়েছে। মাণ্ডুক্য উপনিষদে ও তার কারিকায় গৌড়পাদ এদের চরম মীমাংসা করেছেন। তারও আগে বৌদ্ধ-দর্শনে অবশ্য এ নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ প্রপাঠকের ১৪শ খণ্ডের আলোচনায় মুক্তির পক্ষে গান্ধারদেশকে উদাহরণ ক'রে ব্রহ্মবিৎ আচার্যের আবশ্যকতা দেখান হয়েছে এবং একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানবিৎ গুরুই যে আত্মজ্ঞান লাভের পথ দেখিয়ে দিতে পারেন, অজ্ঞানী লোকেরা নয়, একথাই বিশেষ ক'রে বলা হয়েছে। ৬।১৪।২ শ্লোকে "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেঽথ সম্পৎস্যে ইতি" শব্দগুলি থাকার জন্যে জীবন্মুক্তি ও বিদেহ-মুক্তি, এই দুরকম মুক্তির কথাই বলা হয়েছে। অবশ্য জীবন্মুক্তি নিয়ে মতভেদের আর অন্ত নেই! মণ্ডনমিশ্র জীবন্মুক্তি মান্‌তেই রাজী হন নি, সংক্ষেপ-শারীরককারের কথাও তাই।[১] আচার্য শংকরের সিদ্ধান্ত এ বিষয়ে কিন্তু স্পষ্ট। তিনি বেদান্তদর্শনের চতুঃসূত্রীতে এ নিয়ে চরম সিদ্ধান্তই ব'লে দিয়েছেন যে: "অপি চ নৈবাত্র বিবদিতব্যং ব্রহ্মবিদঃ কঞ্চিৎ কালং ধ্রিয়তে ন ধ্রিয়ত ইতি।" তারপর "ভ্রান্তিপ্রযুক্তত্বাৎ সশরীরত্বম্‌", "অশরীরত্বম্‌"-ই ব্রহ্মজ্ঞের পক্ষে ঠিক, কেননা "তদেতদশরীরত্বং মোক্ষাখ্যম্‌।" শরীর ধারণ করা বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করার পর শরীর থাকা "পরেচ্ছাপূর্বকম্‌"-ই, কেননা, শরীর থাক্‌লেও তখন "সমদুঃখসুখঃ," "উদাসীনবদাসীনঃ," "সচক্ষুরচক্ষুরিব সকর্ণোঽকর্ণ ইব সবাগবাগিব সমনা অমনা ইব সপ্রাণোঽপ্রাণ ইব", এরূপ নির্লিপ্তভাবেই ব্রহ্মজ্ঞানী জগতে অবস্থান করতে পারেন, এতে ব্রহ্মজ্ঞানের পর শরীর থাকাতে ব্রহ্মজ্ঞানীর জ্ঞানের পক্ষে কোন বাধা বা ক্ষতি হয় না, আর প্রারব্ধভোগ পর্যন্ত পার্থিব শরীর

১ মণ্ডনমিশ্র তাঁর ব্রহ্মসিদ্ধিতে (পৃঃ ১৩২) স্পষ্টই বলেছেন: "পতিতেঽস্মিন্‌ শরীরে কৈবল্যমবশ্যম্ভাবি।" গীতার স্থিতপ্রজ্ঞের কথা তুলেও তিনি মন্তব্য করেছেন (পৃঃ ১৩০): "উচ্যতে—স্থিতপ্রজ্ঞস্তাবন্ন বিগলিতনিখিলা-বিদ্যঃ সিদ্ধঃ, কিং তু সাধক এবাবস্থাবিশেষং প্রাপ্তঃ স্যাৎ।"

সংক্ষেপশারীরককার সর্বজ্ঞাত্মমুনি জীবন্মুক্তি সম্বন্ধে অবশ্য আলোচনা করেছেন এই ব'লে যে, জীবন্মুক্তি নিজের অনুভূতিপ্রমাণের সাপেক্ষ ("স্বানুভূতিঃ প্রমাণম্‌"৪।৪৩) সে বিষয়ে কোন আপত্তি নেই, কিন্তু বেদান্তসিদ্ধান্ত-সূক্তিমঞ্জরীকার বলেছেন: "জীবন্মুক্তস্য ভোগোঽত্রাবিদ্যালেশেন যুজ্যতে" (৩।৩৬), কাজেই "ন জীবন্মুক্তিঃ সিধ্যেদিতি ভাবঃ।" কাজেই সর্বজ্ঞাত্মমুনির নিজের অভিমত হল মঞ্জরীকার বলেছেন: "বিরোধিন্যাদিতে শেষাসম্ভবাদর্থবাদতাম্‌। সর্বজ্ঞাত্মগুরুঃ প্রাহ জীবন্মুক্তিশ্রুতেঃ স্ফুটম্‌"(৪।৪)॥ অর্থাৎ শ্রুতিতে আত্মজ্ঞানের প্রশংসা কর্‌বার জন্যেই বলা হয়েছে, নচেৎ শ্রুতির তাৎপর্য এ নয়, এটা অর্থবাদমাত্রই: "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেঽথ সংপৎস্যে ইতি শ্রুতেরাত্মজ্ঞানপ্রশংসার্থত্বেন জীবন্মুক্তৌ তাৎপর্যা-ভাবাদর্থবাদমাত্রত্বমিতি সংক্ষেপশারীরককারমতমাহ—বিরোধিনীতি।"

থাকাতেও কোন বিরোধ থাকে না। গীতায় স্থিত-প্রজ্ঞ সম্বন্ধে যেখানে বলা হয়েছে, সেখানে স্থিতপ্রজ্ঞ অর্থে জীবন্মুক্ত, একথাই স্পষ্ট স্বীকার করা হয়েছে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের কথাও তাই। জ্ঞান ছোট আর বিজ্ঞান বড়; জ্ঞান মানে ব্রহ্মজ্ঞান, তারপর বিজ্ঞান হল তারো ওপরে ভিন্ন একটা জিনিষ—একথা ঠিক নয়। পঞ্চদশীর 'ব্রহ্মবিৎ' ও 'ব্রহ্মজ্ঞ' বিভাগের মতন আগে "অহং ব্রহ্মাস্মি"—'আমি নিজে ব্রহ্মস্বরূপ' এটা জেনে তারপর আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সবই ব্রহ্ম থেকে অভেদ এই প্রকার জ্ঞান হয়ঃ "আদৌ ব্রহ্মাস্মীতি অনুভব উদিতে পশ্চাৎ সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথায় আগে বাড়ীর ছাদে উঠলে তবে দেখা বা বোঝা যায় যে, যে চূণ-সুরকী দিয়ে সিঁড়ি তৈরী হয়েছে সেই চূণ-সুরকীতেই বাড়ীটা ও তার ছাদও তৈরী হয়েছে। ছাদের অভিজ্ঞতা আগে তারপর ছাদের সঙ্গে সমস্ত বাড়ীটার একত্ব প্রতিপাদন। অবশ্য এ দুটোই একসঙ্গে অর্থাৎ simultaneously হয়, আগে জ্ঞান তারপরে বিজ্ঞান কিনা বিশেষ অনুভূতি—এরকমের নয়; কারণ সময় বা স্থানের ব্যবধান সেখানে নেই; এক সঙ্গেই এই নিজের জ্ঞান ও অখণ্ড জ্ঞান হয়, আর তাও জীবদ্দশাতেই কিনা জীবন্মুক্তির অবস্থাতেই সম্ভব। স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী সারদানন্দ প্রভৃতি এঁরাও এ নিয়ে যথেষ্ট বিচার করেছেন। জীবন্মুক্তিই যে পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা আর তা জীবদ্দশাতেই লাভ করা যায় একথা তাঁরা স্পষ্টাক্ষরেই স্বীকার করেছেন; ব্রহ্মজ্ঞানের সিদ্ধির জন্য বিদেহমুক্তির অপেক্ষা মোটেই তাঁরা রাখেন নি।

ছান্দোগ্যের সপ্তম প্রপাঠকই হল সমস্ত আলোচনার ভেতর শ্রেষ্ঠ অংশ। এখানে নারদ ও সনৎকুমারের সংবাদকে অবলম্বন ক'রে ক্রমসাধনার সঙ্গে সঙ্গে অদ্বৈত বেদান্তের "নেতি নেতি" প্রণালীই উপদেশ করা হয়েছে। সাধনার গতিই হল এখানে বাইরে থেকে অন্তরে, স্থূল থেকে সূক্ষ্মে বা কারণে ও ব্যষ্টি থেকে সমষ্টির দিকে। সুপণ্ডিত নারদ এখানে সাধক। জগতের যাবতীয় বিদ্যা তিনি অধিগত করেছেন, কিন্তু দেখলেন সে-সব দিয়েও ব্রহ্মজ্ঞান পাওয়া যায় না, ব্রহ্মজ্ঞান সম্পূর্ণ সাধন ও অনুভূতিরই জিনিস।

যাহোক, গোড়া থেকে আরম্ভ ক'রে ছান্দোগ্য-কার এতক্ষণ ধ'রে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এবং মাঝে মাঝে মহাকারণের ইঙ্গিতও দিয়ে আস্‌ছিলেন উপদেশের ছলে, কিন্তু এখানে কিনা সপ্তম প্রপাঠকে তিনি একেবারে সমষ্টির সাধনাতে তদ্‌গত হবার জন্যেই উপদেশ দান করেছেন। যেমন, ক্রমসাধনার ইঙ্গিত দিতে গিয়ে ৭।১।৪ শ্লোকে তিনি দেখালেন নামই (name) ব্রহ্ম, আর নামই জগতের সর্বস্ব; সুতরাং বল্লেনঃ "নামোপাস্স্বেতি"—'নামকেই ব্রহ্ম জ্ঞান ক'রে উপাসনা কর'। উপাসনা অবশ্য মানস উপাসনাই—mental conception. তারপর নামও কিছু নয়, বাক্যই শ্রেষ্ঠ, এজন্যে ৭।২।১ শ্লোকে বল্লেনঃ "বাচমুপাস্স্বেতি"—'বাক্য অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয়কেই ব্রহ্ম ব'লে উপাসনা কর'। এরকম ক'রে ৭।৩।১।এ মন, ৭।৪।২-এ সংকল্প, ৭।৫।২-এ চিত্ত, ৭।৬।১-এ ধ্যান, ৭।৭।১-এ বিজ্ঞান (শাস্ত্রজ্ঞান), ৭।৮।১-এ বল কিনা প্রতিভা, ৭।৯।১-এ অন্ন, ৭।১০।১-এ জল, ৭।১১।-এ তেজ, ৭।১২।১-এ আকাশ, ৭।১৩।১-এ স্মৃতি, ৭।১৪।১-এ আশা, ৭।১৫।১-এ প্রাণ সম্বন্ধে উপাসনার উপদেশ দিয়ে বল্লেন প্রাণই পিতা, মাতা, ভাই বন্ধু সব। তারপর একেবারে ৭।২৫।১ শ্লোকে ভূমা ও আত্মার অভেদ উপদেশ দিয়ে দেখান হয়েছেঃ "অহমেবেদং সর্বমিতি"। এই আত্মা বা ভূমাকে জানলে "আত্মরতিঃ, আত্মক্রীড়ঃ, আত্মমিথুনঃ, আত্মানন্দঃ, স স্বরাড় ভবতি, তস্য সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি" এসব হওয়া যায় বলা হয়েছে।

এতক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বচরাচর বা বাইরের বৈবিত্র্য নিয়েই সর্বাত্মকভাবে উপদেশ করা হয়েছে। এখন অষ্টম প্রপাঠকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন বলেছিলেন: "যা আছে ভাণ্ডে তা আছে ব্রহ্মাণ্ডে" একথার সার্থকতার মতন বাইরের বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে এই মানুষের দেহরূপ ভাণ্ড থেকে মোটেই আলাদা নয় একথাই দেখান হয়েছে। বলা হয়েছে: "অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম, দহরং অস্মিন্নন্তরাকাশঃ, তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যং, তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি"। ব্রহ্মপুর এখানে হৃদয়পদ্ম। বাইরের আকাশে সূর্য যেমন দেদীপ্যমান, হৃদয়-আকাশে তেমন ব্রহ্ম। আকাশ এখানে সগুণব্রহ্ম। হৃদয়কে পদ্মের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, আর সেই পদ্মরূপ গৃহের ভেতর যে আকাশ বা শূন্যস্থান রয়েছে সেখানে সূক্ষ্ম কিন্তু সর্বব্যাপী আত্মা বা ব্রহ্ম বাস করছেন এই ধারণারই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আসলে ধারণা হল: প্রাতরাকাশে রক্তবর্ণ রশ্মিজালসমন্বিত সূর্যকে যেমন প্রস্ফুটিত পদ্মের মত দেখায় এবং সেই সূর্যমণ্ডলবর্তী নারায়ণ বা পুরুষই ব্রহ্মস্বরূপ। এখানে দেহের মধ্যেই হৃদয়কোরককে পদ্মের সঙ্গে তুলনা ক'রে তার ভেতর যে শূন্যস্থান বা আকাশ আছে তাকেই দহরাকাশ বলা হয়েছে, আর এই দহরাকাশে যে পুরুষ বা চৈতন্য রয়েছেন তাকেই সগুণ নয়, নির্গুণ ব্রহ্মরূপে কল্পনা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে—'তাঁকেই জান'। আসলে সমস্তই কল্পনা। এই কল্পনার চূড়ান্ত দেখান হয়েছে মাণ্ডুক্য উপনিষদে ও তার কারিকার ভাবগুলিতে। অপরাপর উপনিষদের বিষয়-বস্তুও কেবল ভাবনা, ধারণা বা ধ্যানেরই জিনিস। মোটকথা এই অষ্টম প্রপাঠকে বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও মানুষের ক্ষুদ্র দেহরূপ ভাণ্ডকে একই বলা হয়েছে। বাইরের আকাশে সূর্যই অন্তরাকাশে স্বপ্রকাশ চৈতন্য। এই চৈতন্যই জ্ঞানস্বরূপ আত্মা বা ব্রহ্ম। ভৌতিক আকাশ আর অন্তরাকাশ একই; "দ্যাবাপৃথিবী", "অগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ", "সূর্যচন্দ্রমসাবুভৌ" সমস্তই মানুষের শরীরে। এজন্যে নিজের জ্ঞান হ'লে অর্থাৎ নিজের শরীরে যে চৈতন্য পুরুষ রয়েছেন তাঁকে অনুভব করলেই বাইরের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় জিনিসের কারণকে জানা যায়, জানার আর কিছুই বাকী থাকে না। কারণের জ্ঞানেই কার্যের জ্ঞান হয়, আর কারণের জ্ঞানই আসল।

এরপর সমস্ত আলোচনাই মানুষের শরীরকে নিয়ে ও আধ্যাত্মিক ভাবকে ইঙ্গিত ক'রে; ৮ম প্রপাঠকের ৬ষ্ঠ খণ্ডে হৃদয়ের নাড়ীসমূহের কথা বলা হয়েছে। স্বর্গাদি লোকে গতি কর্ম ও জ্ঞানকে অপেক্ষা ক'রে নাড়ীরূপ সূর্যের রশ্মিজালকে অবলম্বন ক'রেই হয়। সূর্যের রশ্মিজালের সঙ্গে হৃদয়ে নাড়ীদের কল্পনা করা হয়েছে। দশম খণ্ডে আবার স্বপ্নের এবং একাদশ খণ্ডে সুষুপ্তির কথা বলা হয়েছে। মানুষের শরীরেই সব—একথা বলায় পাছে জড় দেহাত্মবুদ্ধি এসে যায় এজন্যে দেহের সমস্ত ইন্দ্রিয় থেকে পৃথক ক'রে এখানে নির্লিপ্ত আত্মাকেই শেষে দেখান হয়েছে। আত্মা বা ব্রহ্ম অবশ্য এখানেও সগুণই বটে। ৮।১৪।১ শ্লোকে "আকাশো বৈ নাম-রূপয়োর্নির্বহিতা, তে যদন্তরা তৎ ব্রহ্ম, তদমৃতং, স আত্মা" এসব কথা ব'লে ব্রহ্ম যে সগুণ একথাই স্বীকার করা হয়েছে, কেননা মানুষের মন নাম ও রূপ ছাড়া কল্পনাই কিছু করতে পারে না। ধ্যান, ধারণা বা উপাসনার আলম্বনই নাম ও রূপ, সুতরাং মানুষের মন এই পর্যন্তই কল্পনা বা ধারণা করতে পারে, তার বাইরের জিনিস বাক্য ও মনের অগোচর, সুতরাং কল্পনা বা ধারণাও সেখানে নেই। এর পর অতীন্দ্রিয় রাজ্য, নির্গুণ বা ব্রহ্মের স্বরূপের ইঙ্গিতই দেওয়া হয়েছে।

তাহলেই দেখা যাচ্ছে যে, স্থূল জড় থেকে

আরম্ভ ক'রে ছান্দোগ্য পরিশেষে দর্শন বা আধ্যাত্মিক জগতের আসল রহস্য জানাবার জন্যেই ধীরে ধীরে সূক্ষ্ম থেকে কারণে ও কারণ থেকে মহাকারণের দিকে কল্পনার অবতারণা করেছে। ছান্দোগ্যের যুগে মানুষের মন ও বুদ্ধি যথেষ্ট উন্নত ও প্রখর ছিল, বিচারশীলতার আসনে নিজেকে সে যথেষ্ট সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ ব'লেই পরিচয় দিতে পারত, একথা স্বীকার করতেই হবে। দর্শনের জগতে জড় সূর্য তখন শরীরে আত্মচৈতন্যরূপে প্রকাশ পেয়েছে এবং বুদ্ধি ও বোধির রাজ্যে খেলা করতে মানুষের মন তখন শিখেছে। জন্ম-মৃত্যুর প্রহেলিকায় সে বীতশ্রদ্ধ, সুতরাং জন্মমৃত্যু-চক্রের বাইরে যাবার প্রয়োজনীয়-তাকেও ছান্দোগ্যের যুগের মানুষ ভাল ক'রেই উপলব্ধি করতে পেরেছে। জগৎকে বৈচিত্র্য দিয়ে সে আগে জেনেছে, জগতে আমোদপ্রমোদ ও ভোগের জিনিস যে তাকে সত্যিকার শান্তি দিতে পারে না, তাও সে জেনেছে। মুক্তি বলতে স্থূল সূক্ষ্ম বা কারণরূপ কোন জিনিস নয়, কারণের অতীত এবং নিজেরই যে দিব্য স্বরূপ তাও সে ভাল ক'রে জানতে পেরেছে। সুতরাং ছান্দোগ্যের যুগকেই দর্শনের ঠিক উৎকর্ষের যুগ বলা যায়, আর এ থেকে ছান্দোগ্যের আগেও যে এ সব উচ্চ ধারণা আস্তে আস্তে জন্মলাভ ক'রে পরিপূর্ণতার দিকে আসছিল একথাও স্পষ্ট বোঝা যায়।

অভীপ্রশস্তি

কুমারী সংযুক্তা কর

জীবনের রণে বরিয়া মরণে কঠিনের কাছে
যে দেয় বক্ষ পাতি,
ভীতিপ্রদ অস্ত্র-রণনে ডঙ্কা-বাজানো শঙ্কার নামে
যার হৃদি ওঠে মাতি,
ভয়ের নিশানা আকাশেতে তোলা গভীর ঝঞ্ঝা মাঝে
যার হয় পরিচয়,
দেশের বেদীতে নির্ভয় চিতে প্রাণ করিবারে দান
নাই যার দ্বিধা ভয়,
দুঃসহ ব্যথা সহি পলে পলে সত্যের সাধনাতে
রহে যে ধেয়ানে মগ্ন,
অমৃত লোকের বার্তা বহিতে তীব্র বিষের বোঝা
কণ্ঠেতে যার লগ্ন,
ফাল্গুন দিনে প্রহেলিকা সম হাসির আড়ালে যার
বহ্নির শিখা জ্বলে,
নিখিল প্রীতির উৎস ধারায় ত্যাগের প্রবাহ বহে
যার জীবনের তলে,
অদূরে আগত বিজয় ঘোষিত সে ভাবী যুগের
যে জন অগ্রগামী,
তাঁহারে স্মরিয়া নম্র প্রাণের ভক্তি-কুসুম-অর্ঘ্যে
নমি আমি, পুনঃ নমি।

ইহুদী-নির্য্যাতন

শ্রীতামস রঞ্জন রায়, এম্‌-এস্‌সি, বি-টি

বিংশ শতাব্দীর কুহেলিকাসমাচ্ছন্ন সমস্যাসঙ্কুল বর্ত্তমান যুগে মানুষে মানুষে অনন্ত বিভেদ সৃষ্টি হইয়াছে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থাতেই আজ মানুষ পরস্পরকে দূরে ঠেলিয়া রাখিতে সচেষ্ট। বিজ্ঞানের আবিষ্কার-প্রভাবে স্থান ও কালের দূরত্ব অপসারিত হইয়া জগতের বিভিন্ন জাতি আজ যেমন একদিকে পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, জাতিগত ও বর্ণগত পার্থক্য এবং পরবিত্তলুণ্ঠনস্পৃহা তেমনি তাহাদিগকে দূরে ঠেলিয়া রক্তপিপাসু যুধ্যমান গোষ্ঠীতে পরিণত করিয়াছে। মাঠের চাষী আজ জমিদারের শত্রু, কারখানার শ্রমিক মালিকের শত্রু, গণতন্ত্রবাদী দেশ ফ্যাসিষ্ট কিংবা নাজীবাদী দেশের শত্রু এবং এক ধর্ম্মসম্প্রদায় অন্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের শত্রু। এক কথায়—হিংসা, দ্বেষ, অহঙ্কার প্রভৃতি নীচবৃত্তির দূষিতবাষ্পে এখন পৃথিবী সমাচ্ছন্ন, এই জন্য প্রতি মুহূর্ত্তে শত জটিল সমস্যার জন্ম হইতেছে। যে ইহুদী সম্প্রদায়ের বিষয় বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা আলোচনা করিতে অগ্রসর হইতেছি তাহাও উক্ত সমস্যাশতকের অন্যতমরূপে সভ্যজগতের সম্মুখে আজ মাথা তুলিয়াছে। ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক সূত্র ধরিয়া উহার আলোচনা করিলে এ সমস্যার গুরুত্ব স্পষ্টই প্রতিভাত হইবে। প্রতিভাত হইবে যে অতি প্রাচীন ও প্রতিভাসম্পন্ন এই সম্প্রদায় বহু কারণে আজ জগতের বুকে ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমাণ এক দারুণ বিভীষিকা! যুগে যুগে বিভিন্ন জাতির হস্তে বিভিন্ন ভাবে এই সম্প্রদায় নিগৃহীত হইয়াছে, প্রতি ৩।৪ শত বৎসর ব্যবধানে একদেশ হইতে কপর্দ্দকহীন ভাবে অন্যদেশে বিতাড়িত হইয়াছে, কঠোরতম ও নিষ্ঠুরতম নিগ্রহের বেদীমূলে হাজার হাজার স্ত্রীপুরুষ নীরবে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছে। মাতাপিতা, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সকলকে নদীর জলে ভাসাইয়া দিয়া ঊর্দ্ধপানে মুখ তুলিয়া শুধু প্রাণের অরুন্তুদ বেদনার গভীর দীর্ঘশ্বাস—দুঃখীর শেষ আশ্রয় ভগবানের উদ্দেশ্যে নিঃশব্দে পাঠাইয়া দিয়াছে, কিন্তু তথাপি নিজেদের ধর্ম্মবিশ্বাস ও গোষ্ঠীগণ্ডী পরিত্যাগ করে নাই—ইহুদীজাতি কিংবা ইহুদীধর্ম্ম জগতের বুক হইতে নিশ্চিহ্ন হয় নাই।

* * *

প্রায় ৩৫০০ বৎসর পূর্ব্বের কথা। নিকট প্রাচীর উষর প্রান্তে প্যালেষ্টাইনের বুকে বর্ত্তমান ইহুদীর পূর্ব্বপুরুষগণ নিতান্ত সাধারণ কৃষকের জীবন যাপন করিত। তখন তাহারা 'ইস্রেলাইট্‌' নামে অভিহিত হইত। খৃষ্টধর্ম্ম অভ্যুদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইহাদের অতি সাধারণ ও বৈচিত্র্যহীন জীবনে কোন দিক দিয়া কোন গুরুতর পরিবর্ত্তন আসিবে বলিয়া কেহ মনে করেন নাই। কিন্তু খৃষ্টধর্ম্ম অভ্যুদয়ের প্রথম শতকে প্যালেষ্টাইনের বুকে অবিশ্রাম সংগ্রামের সূত্রপাত হইল। দিনে দিনে বহিঃশত্রুর আক্রমণে প্যালেষ্টাইন বিধ্বস্ত হইতে লাগিল। পরে টাইটাসের নেতৃত্বে রোমকগণ যখন প্যালেষ্টাইন আক্রমণ করিল, সেই সময় হইতেই ইহুদীগণের ভাগ্যগগনে গাঢ় অমানিশা সমাগত হইল। টাইটাস্‌ যে শুধু প্যালেষ্টাইন জয় করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন তাহা নহে, পরন্তু প্রতিহিংসার প্রেরণায় সমগ্র ইহুদীসম্প্রদায়কে সে ভূখণ্ড হইতে উৎখাত করিতে তিনি বদ্ধপরিকর হইলেন।

দলে দলে ইহুদী প্যালেষ্টাইন হইতে বিতাড়িত হইতে লাগিল এবং নিজ দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে প্রথমতঃ ভূমধ্যসাগরের চতুষ্পার্শ্বস্থ দেশসমূহে এবং পরে ইউরোপের নানাস্থানে তাহারা হীন ভৃত্যের জীবন যাপন বরিতে সুরু করিল। কিন্তু ভৃত্য বা দাস হিসাবে কোনস্থানেই তাহারা মনিবের মনোমত হইতে পারিল না। তাহাদের সংহত জীবন, ধর্ম্ম-বিশ্বাস এবং পরাজিত হইয়াও অপরাজেয় থাকিবার অদম্য চেষ্টা সর্ব্বত্র তাহাদিগকে অপ্রিয় করিয়া তুলিল। এই সকল অতি প্রাচীন কালের কথা— ইহুদী-সম্প্রদায়ের নির্য্যাতন ইতিহাসের অতি শৈশবের অপরিস্ফুট কাহিনী। তখন ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ইহুদীকে দেখিবামাত্র খৃষ্টানগণ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিত না, ইহুদীর নাম শ্রবণমাত্র নির্য্যাতন লালসায় তাহারা তখনও মুহূর্ত্তে মাতিয়া উঠিত না, Anti-Semitism তখনও কোন রাজশক্তির কার্য্যতালিকার অন্তর্গত হয় নাই, "Pogrom" তখনও অনাবিষ্কৃত, ইহুদী ধর্ম্মও তখন পর্য্যন্ত আইনের চক্ষুতে গর্হিত বলিয়া প্রতীত হয় নাই, সুতরাং ইহুদীর প্রশ্নও তখন বর্ত্তমান সময়ের মত গুরুতর আকার ধারণ করে নাই।

কিন্তু কালক্রমে খৃষ্টধর্ম্ম যতই বিস্তৃত হইতে লাগিল, যতই উহার প্রভাব জনসমাজে ব্যাপকতর ও গভীরতর হইতে লাগিল, ইহুদীর বিরুদ্ধে অভিযানও ততই তীব্র হইতে তীব্রতর হইতে সুরু করিল, ধর্ম্ম-বিদ্বেষের বিষাক্তবায়ুতে ইহুদী-নির্য্যাতনের জীবাণুসমূহ জন্মলাভ করিতে লাগিল। খৃষ্টান শিশু জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে শুনিতে লাগিল যে তাহার ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক ঈশা ইহুদীগণের হস্তেই নিহত হইয়াছিলেন। পাঠশালা, গির্জ্জা, নাট্যগৃহ, বক্তৃতামঞ্চ সর্ব্বস্থান হইতে এই একই বাণী প্রচারিত হইতে লাগিল এবং প্রায় ১৫০০ বৎসর কাল সমভাবে প্রচারফলে Anti-Semitism এর ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। ৩১৩ খৃষ্টাব্দে সম্রাট কন্‌ষ্টানটাইন খৃষ্টধর্ম্মকে আইনের মর্য্যাদা দান করিয়া সমগ্র রোমক সাম্রাজ্যে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিবার সুব্যবস্থা করিলেন। খৃষ্টধর্ম্মের আনুগত্য ভিন্ন নাগরিকের কোন অধিকার কেহ ভোগ করিতে পারিবে না, এই নীতি সেই সময় চতুর্দ্দিকে বিঘোষিত হইল। কালপ্রবাহে যত সম্রাটের পর সম্রাট রাজত্ব করিতে লাগিলেন, ইহুদী নির্য্যাতনপর্ব্বও ততই ব্যাপক হইতে ব্যাপকতর হইয়া উঠিল এবং দ্বিতীয় থিয়োডসিয়াসের রাজত্বকালে (৪০৮-৪৫০ খৃঃ) উহা চরম পরিণতি লাভ করিল। আইনের সহায়তায় ইহুদী-নির্য্যাতন ইঁহারই রাজত্বকালে প্রথম সম্ভব হইল। বস্তুতঃ, উনবিংশ ও বিংশশতাব্দীর সভ্যতা ইউরোপ-খণ্ডে ধর্ম্মকে যেমন ব্যক্তিগত ব্যাপার বলিয়া রাজকীয় সংস্রব হইতে দূরে সরাইয়া দিয়াছে, মধ্যযুগে ধর্ম্মের অবস্থা ঠিক তদ্রূপ ছিল না। ধর্ম্ম তখন রাজকীয় ব্যবস্থা ও ব্যবহারের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য হইত এবং সমাজের রাষ্ট্রের ও ব্যক্তিগত জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই উহার প্রয়োগ অপরিহার্য্য ছিল। ফলে, ধর্ম্মানুগত্যের জন্য ইহুদীগণের দুর্দ্দশার আর অবধি ছিল না। কোন ইহুদী কোন খৃষ্টানের উপর কোন অবস্থায় কোন ভাবে যাহাতে প্রভুত্ব করিতে না পারে তজ্জন্য বিধি-নিষেধের প্রচলন হইয়াছিল। কোন ইহুদী কোন খৃষ্টানকে ভৃত্যরূপে নিয়োগ করিতে পারিত না, শাসন-সংক্রান্ত ছোট বড় কোন চাকুরীতেই ইহুদীর প্রবেশাধিকার ছিল না। ইহুদী এবং খৃষ্টান যাহাতে কোন অবস্থাতেই পরস্পরের সান্নিধ্যে না আসে তজ্জন্য শত নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করা হইয়াছিল। এক কথায়, ইহুদীগণ এই কালে অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের মত অন্যান্য সম্প্রদায় হইতে স্বতন্ত্র ভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাস করিতে বাধ্য হইত। পরবর্ত্তী কালে এই ইহুদী পল্লীগুলিই Ghetto (গেটো) নামে অভিহিত হইয়াছিল।

ধর্ম্মযাজক তৃতীয় ইনোসেণ্ট্ (Innocent) এর সময় আবার ইহুদীগণের জন্ত আর এক অভিনব ব্যবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল। যাহাতে খৃষ্টানগণকে ইহুদী হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া সহজে চিনিতে পারা যায় তজ্জন্ত তাহাদিগকে এক প্রকার চিহ্ন ধারণ করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। বিভিন্ন দেশে ঐ চিহ্নের আকৃতি ও বর্ণ বিভিন্ন প্রকারের ছিল। ইংলণ্ড, ফরাসী, জার্ম্মানী, ইটালী প্রভৃতি কোন দেশেই এ গ্লানিকর ব্যবস্থা হইতে ইহুদীদের অব্যাহতি ছিল না। হয়ত এই ব্যবস্থামূলে প্রথমতঃ কোন গূঢ় অসদুদ্দেশ্য ছিল না কিন্তু কালক্রমে উহার অবশ্যম্ভাবী ফল ইহুদীগণের জীবনে বিষক্রিয়া আনয়ন করিয়াছিল। রাজপথে বাহির হইবামাত্র বিশেষ রকমের চিহ্নধারী ইহুদীগণ সকলের বিদ্রূপ ও উপহাসের পাত্র বলিয়া বিবেচিত হইত। বয়স্কগণের শ্লেষ ও গালিগালাজ, শিশুদের উদ্দাম চীৎকার এবং প্রস্তর নিক্ষেপ ক্রমশঃ ইহুদীগণের পক্ষে ঘরের বাহির হওয়া বিপদসঙ্কুল করিয়া তুলিয়াছিল। গুড্ফ্রাইডের কয়েক দিন আবার এই উপহাস-বিদ্রূপ গুরুতর আকার ধারণ করিত। ঐ কালে রাজপথে একবার বাহির হইলে অক্ষত দেহে গৃহে ফিরিয়া আসা কোন ইহুদীর পক্ষেই সহজসাধ্য হইত না, পাথরবৃষ্টির দুর্জ্জয় আঘাতে অনেক সময়ই তাহাদের দুঃখময় ইহুদীজীবনের অবসান ঘটিত। এমন কি, ঘরের বাহির না হইলেও তাহারা সহজে নিষ্কৃতি পাইত না, উন্মত্ত জনতা অনেক সময় গৃহ ও পল্লী আক্রমণ করিয়া হতভাগ্য ইহুদীগণের জীবন ও সম্পত্তি বিধ্বস্ত করিত। আবার ক্বচিৎ কোন কোন স্থানে (যেমন Toulouse) গুড্ফ্রাইডের বিশেষ প্রার্থনার পর খৃষ্টান কাউণ্ট যখন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন, স্থানীয় ইহুদী-প্রধানকে তখন তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইত এবং কাউণ্টের আদেশানুসারে তাঁহার কোন বলশালী সহচর সেই বৃদ্ধ ইহুদীর মুখে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া তাহাকে অতীত যুগের পূর্ব্বপুরুষের দুষ্কার্য্যের শাস্তি দান করিত। কোন কোন সময়ে ঐরূপ মুষ্ট্যাঘাতের ফলে কোন কোন ইহুদী তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিয়াছে এমন বিবরণও জানিতে পারা যায়। বহুকাল পরে ঐ বর্ব্বর প্রথার উচ্ছেদ হইয়াছিল সত্য কিন্তু অপমানের গ্লানি অন্যপ্রকারে স্থায়ী করা হইয়াছিল। গুড্ফ্রাইডের সময় বৃহস্পতিবার হইতে শনিবার পর্য্যন্ত তিন দিন গৃহের বাহির হওয়া এবং কোন খৃষ্টানকে মুখ দেখান ইহুদীদের পক্ষে একান্তভাবে নিষিদ্ধ হইয়া গেল। কিন্তু তাহারা এ ব্যবস্থাকে অসম্মানজনক মনে না করিয়া বিশেষ সম্মানজনক বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিল। ঐ সময়কে তাহারা—"The day of shutting sin" বলিয়া অভিহিত করিয়া যে ছন্দ রচনা করিয়াছিল—Roth উহাকে ইংরাজীতে নিম্নলিখিত রূপে অনুবাদ করিয়াছেন :—

"Like a Princess set away
In her palace in this day;
Hidden like a lovely maid,
Thus her prayer 'fore God she laid
(Him whose spirit, wondrous wise,
Every being vivifies)
Rouse Thee, at this spring tide feast,
Till our servitude hath ceased."

ধর্ম্ম ও সামাজিক জীবনে এইভাবে বিড়ম্বিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই কালে ইহুদীগণের ভাগ্যে অর্থনৈতিক দুর্ভাগ্যের মেঘও সঞ্চিত হইতেছিল। আজ সভ্যজগতে—বিশেষতঃ যে সব দেশ হইতে ইহুদীগণ কারণে-অকারণে বিতাড়িত হইতেছে সেই সব দেশে—কুশীদজীবী বলিয়া ইহারা নিতান্ত ঘৃণার্হ। সেক্ষপীয়রের Merchant of Venice-এ যে অর্থগৃধ্নু ইহুদীচিত্র আমরা দেখিতে পাই—সে চিত্র আজ পর্য্যন্ত বিবিধ প্রকারে

সজীব ও জীবন্ত হইয়া রহিয়াছে। অথচ কী কী অবস্থার চাপে পড়িয়া এই দুর্ভাগা জাতি কুশীদজীবীর নীচ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিল তাহা সযত্নে গোপন রাখা হইয়াছিল। ইহুদী জাতির দুঃখের ইতিহাস আলোচনা করিলে একথা স্পষ্ট প্রতীত হয় যে feudal প্রথা প্রচলিত হইবার পূর্ব্ব হইতেই ধর্ম্মগত ও সমাজগত পার্থক্যের অজুহাতে ইহুদীগণের চিরাচরিত কৃষি-ব্যবসায়ে খৃষ্টানগণ নানা অসুবিধার সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু feudal প্রথা প্রচলিত হইবার পর হইতে ক্রমশঃ ঐ সকল অসুবিধা চরম আকার ধারণ করে। Feudal প্রথার ব্যবস্থানুসারে কোন যুদ্ধ-বিগ্রহের কালে প্রজাগণকে তাহাদের মনিবের পক্ষাবলম্বন করিয়া যুদ্ধে যাইতে হইত। জনবল অর্থবল দ্বারা মালিককে যুদ্ধকালে সাহায্য করা feudal প্রথার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। অস্পৃশ্য ইহুদী—খৃষ্টানগণের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া এক সঙ্গে, একই অস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করিবে—এ কল্পনাও ক্রমশঃ ধর্ম্মান্ধ খৃষ্টানগণের মনে বিসদৃশ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ফলে, অল্পকাল মধ্যে ইহুদীগণের পক্ষে অস্ত্রধারণ নিষিদ্ধ হইয়া গেল। সুতরাং যুদ্ধকালে জমিদারগণকে কোন প্রকার লোকবল দ্বারা সাহায্য করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িল এবং চরমে জমি চাষ করিবার অধিকার হইতেও ইহুদীগণ ধীরে ধীরে বঞ্চিত হইল। এইরূপ ব্যবস্থার ফলে ইহুদীগণ অস্ত্রধারণ ও জমিকর্ষণ এই দুই অধিকারই হারাইল। ইহার পর অনন্যোপায় হইয়া জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য নানা প্রকার খুচরা ব্যবসায়ে তাহারা হস্তক্ষেপ করে। কিন্তু যেই মাত্র অপূর্ব্ব বুদ্ধিকৌশলে ঐ সব ব্যবসায়ে উহারা সাফল্য অর্জ্জন করিয়া ধনাগম করিতে সুরু করিল, তখনই আবার খৃষ্টানগণ নানা কূটনীতির দ্বারা তাহাদিগকে ঐ সব ব্যবসায় হইতে বিতাড়িত করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেল। নানাদিক হইতে এই ভাবে পুনঃ পুনঃ নিতান্ত অন্যায়রূপে বিতাড়িত হইয়া ইহুদীগণ সর্ব্বশেষে নিরুপায় হইয়াই কুশীদজীবীর নীচ ব্যবসায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। ঐ সময়ের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাও এই ব্যবসায়ের দিকে ইহুদী-সম্প্রদায়কে কতকটা আকৃষ্ট করিয়াছিল। মধ্যযুগের প্রথমাংশে ইউরোপের সমাজ-ব্যবস্থাদির আমূল পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক অবস্থাও ব্যাহত হইয়া পড়ে। ফলে, শুধু কৃষক ও বণিক সম্প্রদায়ই নহে, পরন্তু অভিজাত সম্প্রদায়ের বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিগণের পক্ষেও ঋণগ্রহণ অপরিহার্য্য হইয়া উঠে, এমন কি রাজা মহারাজাগণও সে প্রয়োজনের তাগিদ হইতে রেহাই পান নাই। কাজেই, একদিকে অর্থোপার্জ্জনের সমস্ত পথ ইহুদীদিগের পক্ষে রুদ্ধ করিয়া খৃষ্টানগণ যেমন তাহাদের জীবিকার্জ্জনসমস্যা জটিল করিয়া তুলিয়াছিল, অন্যদিকে তেমনি ঐ বিশেষ সময়ে কুশীদজীবীর ব্যবসায় বিশেষ লাভজনক হওয়ার সম্ভাবনা জানিয়া ঐ ব্যবসায় গ্রহণ করিতেও তাহারা আকৃষ্ট হইয়াছিল। অবশ্য তদানীন্তন খৃষ্টানগণও যে ঐ ব্যবসায় অবলম্বন না করিয়াছিল এমন নহে, বরঞ্চ স্থানে স্থানে তাহারা অধিকতর অর্থগৃধ্নুতার পরিচয় দিয়াছিল। ইতিহাস এমন সাক্ষ্যও প্রদান করে যে ইটালীতে অনেক পাদ্রীও ঐ সময়ে কুশীদজীবীর ব্যবসায় গ্রহণ করিয়াছিল এবং ইহুদীগণকেও অনেক সময় উহাদের নিকট হইতে বিপরীত সুদে ঋণ গ্রহণ করিতে হইত! এ সকল ঘটনা পর্য্যালোচনায় ইহাই প্রতীত হয় যে—মানুষ মাত্রেই অবস্থার দাস এবং ইহুদীগণও তাহার ব্যতিক্রম নহে। কিন্তু যে জটিল অবস্থার চাপে পড়িয়া দুর্ভাগা ইহুদীসম্প্রদায় নীচ কুশীদজীবীর ব্যবসায়

অবলম্বন করিতে এক সময়ে বাধ্য হইয়াছিল, সে অবস্থা সৃষ্টির জন্য মূলতঃ কে বা কাহার দায়ী তাহার বিচার না করিয়া সরাসরি ইহুদীগণকে বিদ্রূপ করা যুক্তিসঙ্গতও নহে, ন্যায়সঙ্গতও নহে। দেখিতেও পাওয়া যায় যে পরবর্ত্তী কালে সুযোগ পাওয়া মাত্রই ইহুদীগণ অন্যান্য সম্মানজনক ব্যবসায় গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র পরাঙ্মুখ হয় নাই।

* * *

ইহুদীগণের উপর নৃশংস অত্যাচার ও অবিচারের অভিযান সুরু হয় পুনর্ব্বার ১১৪৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে। পরে ১১৬৮ খৃষ্টাব্দে Gloucester শহরে এবং তিন বৎসর পরে Blois শহরে। ঐ সব স্থানে অগণিত ইহুদী বিনা বিচারে শুধু ইহুদীর ঘরে জন্ম গ্রহণ করিবার অপরাধেই নিহত হয়। অতি অল্পকাল পরে ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে ইহুদী-নিগ্রহের রুদ্রলীলার সূত্রপাত নূতন করিয়া সুরু হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে পোল্যাণ্ডের সরসভূমি ইহুদীর রক্তে প্লাবিত হয় এবং যদিও ঊনবিংশ শতাব্দীতে অত্যাচারের ব্যাপকতা কতকটা কম ছিল, তথাপি মধ্যে মধ্যে ঐরূপ অত্যাচার সহসা সংঘটিত হইয়া এই হতভাগ্য সম্প্রদায়কে বিপর্য্যস্ত করিত।

বস্তুতঃ মধ্যযুগের প্রারম্ভ হইতে সুরু করিয়া প্রায় সহস্রাধিক বৎসর কাল ইউরোপের ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠা কারণে-অকারণে ইহুদী-অত্যাচার ও নিপীড়ন কাহিনীতে কলঙ্কিত হইয়া আছে। বিশাল ভূখণ্ডের অন্য কোন অংশে কোন যুগে এইরূপ নির্লজ্জ নৃশংসতার নজির খুঁজিয়া পাওয়া সুকঠিন। প্রথম ক্রুশেড্ অভিযানের সময় বিধর্ম্মী নিধনে পরামুক্তি-লাভরূপ ঘোষণার ফলে রাইন-উপত্যকায় অসংখ্য ইহুদী প্রাণ বিসর্জ্জন করে। ১৩৯১ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় ক্রুশেড্ অভিযানে পাইরেনিজ্ পর্ব্বত-উপত্যকা হইতে জিব্রাল্টার পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূমিখণ্ডে প্রায় ৭০,০০০ ইহুদী নিহত হইয়াছিল। ১২৯৮ খৃষ্টাব্দে ইহুদী-নির্য্যাতনের প্রধান কেন্দ্র জার্ম্মানীতে একটিমাত্র হত্যার অভিযোগে ১৪৬টি সমৃদ্ধিসম্পন্ন ইহুদী পরিবার ধ্বংস হইয়াছিল। ইহার পরবর্ত্তী কালে ১৬৩৮-৪৯ খৃষ্টাব্দে যখন পূর্ব্ব-ইউরোপের Ukrain অঞ্চলে রোমকগণ পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, সেই সময় আত্মরক্ষার আশায় পোলগণ ইহুদীদিগকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিয়াছিল। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে ১৬৪৮ হইতে ১৬৫৮ সাল মধ্যে ঐ অঞ্চলে প্রায় ১ লক্ষ ইহুদী অমানুষিক অত্যাচারের ফলে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিল। এইরূপ আরও অনেক নৃশংস বর্ব্বরতার করুণ এবং মর্ম্মস্পর্শী কাহিনী এই প্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারে।

এই সকল হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে ইহুদীগণকে যুগে যুগে আরও একপ্রকার দুর্গতির সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। সে দুর্গতির ইতিহাসও কিছু কম মর্ম্মস্পর্শী নহে। ১২৯০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড হইতে ইহুদীগণ ব্যাপকভাবে বিতাড়িত হইয়াছিল। ১৩০০ ও ১৩৯৪ খৃষ্টাব্দে পর পর দুইবার ফরাসীদেশ উহাদিগকে নির্ব্বাসিত করে। ১৪৯২ খৃঃ স্পেনে, ১৪৯৭ খৃঃ পর্ত্তুগালে, ১৫৪০ খৃঃ নেপলসে, ১৬৭০ খৃঃ ভিয়েনাতে, ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে বোহেমিয়া এবং তৎপর আরও অনেক স্থানে ইহুদী-বিতাড়ন-যজ্ঞ অতি ব্যাপক ও নিখুঁত ভাবে উদ্‌যাপিত হইয়াছিল। পুনঃ পুনঃ এইরূপে একদেশ হইতে অন্যদেশে বিতাড়িত হইয়া, নিজের আত্মীয়স্বজন, বন্ধু, পরিবার নৃশংস বর্ব্বরতার বেদীমূলে বিসর্জ্জন দিয়া নিরাশ্রয়, নিরন্ন ও কপর্দ্দকহীন ভাবে ইহুদীগণ চিরদিনের অনিশ্চিত যাযাবর জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। এককালে যে দেশে নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে ঘরবাড়ী নির্ম্মাণ গাছপালা রোপণ করিয়াও বিবিধ ব্যবসায় দ্বারা জীবিকার্জ্জনের ব্যবস্থা করিয়া তাহারা একভাবে ঘর সংসার পাতিয়া বসিত, যে দেশের সুখ-দুঃখের সহিত

একান্তভাবে জড়িত হইয়া তাহার জলমাটিকে নিজের বলিয়া গ্রহণ করিতে তাহারা উদ্বুদ্ধ হইত, কিছুকাল পরেই সে দেশের রাজশক্তি ও জনশক্তি ধর্ম্মান্ধতার খামখেয়ালীবশে তাহাদিগকে একেকালে উৎখাত করিয়া ক্ষান্ত হইল। এইরূপে একটানা দুঃখ ও নির্য্যাতনের মধ্য দিয়া বৎসরের পর বৎসর, শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিক্রম করিতে করিতে বিংশ শতাব্দীর নাজি-শাসিত জার্ম্মানীতে ইহুদীগণ যে অত্যাচার ও অবিচারের সম্মুখীন হয়, পৃথিবীর কোন দেশের কোন ইতিবৃত্তে তাহার তুলনা নাই। বিংশ শতাব্দীর বর্ত্তমান যুগ যখন জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, শিল্পে, সাহিত্যে পৃথিবীর পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগ হইতে বহুদূর অধিক অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া মানুষ দাবী করে, যে যুগের সভ্যতা— শক্তি, সংস্কৃতি ও স্বাধীন-চিন্তা পূর্ব্বাপর সমস্ত সভ্যতাকে একেকালে ম্লান করিয়াছে বলিয়া মানুষের গর্ব্বের আর অবধি নাই, সেই যুগেরই প্রথমার্দ্ধে পৃথিবীর সমুদয় স্বাধীন ও শক্তিমান জাতির চক্ষুর সম্মুখে নাজি-শাসিত জার্ম্মানীতে মানুষের উপর মানুষের অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতা অকারণে অথবা সামান্যমাত্র কারণে যে কতদূর নির্ম্মম ও পাশবিক হইতে পারে তাহারই যেন প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইয়াছিল! সেই অধ্যায়ের মর্ম্মন্তুদ কাহিনী মানব-সভ্যতাকে কলঙ্কিত করিয়াছে।

মিলন-প্রহর

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষাল, এম্-এ, বি-এল্

নীল আকাশের অসীম হ'তে
আমার মনের কোণে
তোমার রঙের পরশ প্রিয়
লাগলো অকারণে।
গন্ধ-বিধুর সন্ধ্যারাতে
কি জানি আজ কোন্ মায়াতে
সবুজ রঙের লাগল কাজল
আমার বাতায়নে।
কোন সুদূরের গহন হ'তে
কে আজ আকাশ পারে
শুভ্র মেঘের ঘোম্টা হ'তে
হাতছানি দেয় কারে,

আলোয় আলোয় ভুবন ভরা
সুরে সুরে ভরলো ধরা
দূরের মানুষ টেনে নিয়ে
আপন করে তারে।
সাগর পারের দখিন বায়ু
আজকে দিল আনি
সব-হারানো আকুল-করা
তোমার বাঁশীর ধ্বনি,
তোমার নিবিড় রঙের সাথে
আমার আঁখি মিলাব রাতে
তাইতো আমি চাঁদের চলায়
মিলনপ্রহর গণি।

এক

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া ঢেউএর খেলা দেখিতেছিলাম। দুর হইতে ফেনিল জলস্রোত দশ হাত উঁচু হইয়া তীব্রবেগে ছুটিয়া আসিতেছে—এই বুঝি ঘাড়ে আসিয়া পড়ে—ভাসাইয়া লইয়া গিয়া ঘূর্ণায়মান আবর্ত্তে শরীরটাকে চুরমার করিয়া ফেলে। বেলাভূমির সীমা বাধা না দিলে মুহূর্ত্তে ঐ উদ্দাম তরঙ্গগুলো কী সর্ব্বনাশই বুঝি সংসাধন করিতে পারে। ভয় হইতেছিল। মনে হইল এই অসীম প্রমত্ত জলরাশির কাছে ক্ষুদ্র মানুষ আমি—আমার শক্তি কত অকিঞ্চিৎকর।

হঠাৎ দার্শনিক নেশা পাইল। ভাবিলাম কোনক্রমে নিজের দেহের অস্তিত্বটা যদি ভুলিয়া যাইতে পারিতাম—অমুক দেহ-গেহ-নাম-রূপ-গুণ-কর্ম্ম-বিশিষ্ট নিজের ব্যক্তিত্বটা সেরেফ মুছিয়া দিয়া নিজেকে ঐ মহাসমুদ্রের একটী ঢেউ রূপে চিন্তা করিতে পারিতাম, তাহা হইলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াইত। তখন সমুদ্রেরই অঙ্গ হইয়া গিয়াছি, অতএব সমুদ্র হইতে ভয় পাইবার কিছু থাকিত না—নাচিয়া নাচিয়া, খেলিয়া খেলিয়া অপরকে ভয় দেখাইয়া তরঙ্গগুলোর যে আনন্দ সে আনন্দ তখন আমিও অনুভব করিতাম। মহাজলধির পারাবারহীন অসীমতা আমাতে বর্ত্তিয়া আমার সাড়ে তিন হাত রক্তমাংসের পিণ্ডের ক্ষুদ্রত্ব কী অচিন্তনীয় বিরাটত্বে রূপান্তরিত হইয়া যাইত।

তুমি আমি যখন এক তখন তোমা হইতে আমার কিছু ভয় নাই। তুমি যতক্ষণ আমা হইতে আলাদা তখনই তুমি আমাকে ভয় দেখাইতে পার, আমার অনিষ্ট করিতে পার। অতএব তোমার সঙ্গে মিত্রতা করাই আমার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ। এই অখিল বিশ্বপ্রকৃতি স্থাবর-জঙ্গম জীবজন্তু সকলের সঙ্গে যদি সখ্য স্থাপন করিতে পারি, নিজেকে মিশাইয়া ফেলিতে পারি, তাহা হইলে বোধ করি কোনও ভয় আমাকে কখনো অভিভূত করিবে না।

সমাধানটী শুনিতে সহজ হইলেও কার্য্যতঃ জীবনে ইহা পরিণত করা কঠিন কথা। কবিরা শিল্পীরা বাহিরের সঙ্গে নিজেদের এই তাদাত্ম্য অনুভূতি কিছু কিছু সাধিয়া থাকেন। কাব্যের নেশা, শিল্পের নেশা মানেই সেই নেশার সময়ে নিজের ব্যক্তিত্বটীকে কবিতার বা চিত্রের বা ভাস্কর্য্যের বস্তুর মধ্যে সম্প্রসারিত করিয়া দেওয়া। কবি বা শিল্পী তখন সেই বস্তু বা ভাবের সহিত যেন এক হইয়া যান। যিনি যতটা নিজেকে ভুলিয়া সাধ্যবস্তুর সহিত একত্ব অনুভব করিতে পারেন, তাঁহার সাধনা ততটা সুন্দর ও সফল হয়, তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে আদর্শ বস্তুটি তত স্পষ্ট ও জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া ওঠে। কবিরা, শিল্পীরা অন্তরের যে ক্ষমতা দ্বারা বাহ্য-প্রকৃতির সঙ্গে এই যোগ স্থাপন করেন, ইংরাজীতে আমরা তাহাকে বলি intuition—আধুনিক বাংলা পরিভাষায় 'স্বজ্ঞা'। বুদ্ধিবৃত্তির (intellect) সঙ্গে ইহার সম্পর্ক খুবই কম। ইহা একটি অতীন্দ্রিয় শক্তিবিশেষ। কেহ হয়তো জন্ম হইতেই এই ক্ষমতার অধিকারী—কেহ বা অনুশীলনদ্বারা পরে লাভ করেন। মানুষের মধ্যে কবিতা, সঙ্গীত, শিল্পকলার রসানুভব করিবার যে একটা দিক আছে সেই দিকই এই ইনট্যুসনের এলাকা। আমরা

যাহাকে পাণ্ডিত্য বলি তাহা হয়তো কাহারো একেবারেই নাই, অথচ এই ইনট্যুসান বা স্বজ্ঞা প্রচুর পরিমাণে আছে—এমন হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। ইনট্যুসনকে বুদ্ধিবৃত্তির অপেক্ষা বেশী দাম দেওয়া উচিত—কেননা ইহা দ্বারা মানুষ এই শাক-আলু-মাছের দুনিয়াকে অতিক্রম করিয়া জগৎ ও জীবনের এক মহত্তর, পূর্ণতর, কল্যাণতর পরিচয় লাভ করে।

মনীষী বার্গসঁ খুব সহজ কথায় ইনট্যুসনের স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন—Intuition is sympathy (স্বজ্ঞা অর্থে সহানুভূতি)। চেতন বা অচেতন যাহা কিছু বস্তু আমার সম্মুখে উপস্থিত হয় আমার মনকে যদি কঠোর না করিয়া খুব দরদ লইয়া সেই বস্তুকে ধরিতে বুঝিতে চেষ্টা করি তাহা হইলে আমার অন্তর্নিহিত স্বজ্ঞা সঙ্গে সঙ্গে ক্রিয়া করিতে আরম্ভ করিবে।

উহার বলে ঐ বস্তুর সত্তার সহিত আমার সত্তার একটী যোগাযোগ স্থাপিত হইবে। বুদ্ধি-বিচার দ্বারা উহার যে সত্য হৃদয়ঙ্গম হয় নাই চকিতে তাহা উপলব্ধি করিতে পারিব। মোট কথা এই—যাহাকে যত ভালবাসিতে পারিব সে তত নিকটতর হইয়া ধরা দিবে। ঐ গাছটীকে, ঐ নদীটীকে, ঐ ফুল ফল, লতাটীকে—ঐ মানুষ, গরু পতঙ্গটীকে দরদ দিয়া যদি দেখিতে পারি, উহারা অন্তবেশ লইয়া আমার কাছে হাজির হইবে। বাহিরের আবরণের পশ্চাতে উহাদের সত্যকার পরিচয় লাভ করিতে পারিব। ইহাই ইনট্যুসনের কথা, রসানুভূতির কথা অতীন্দ্রিয় সত্যের কথা, দরদ বা সহানুভূতি অল্পবিস্তর আমরা প্রত্যেকেই দৈনন্দিন জীবনে কোন না কোন ক্ষেত্রে কম বেশী অনুভব করি। এমন পাষাণ কে আছে যে কাহারও জন্য, কিছুরই জন্য টান বোধ করে না? সমস্যা শুধু দরদের পরিধি বিস্তার করিয়া দেওয়া, দরদের গভীরতাকে বাড়াইয়া দেওয়া। বস্তু হইতে বস্বন্তরে, জীব হইতে জীবান্তরে একটী মানুষ হইতে বহু মানুষে সহানুভূতি অভ্যাস করা। যেখানে, যাহা যেখানে দাঁড়াইয়া আছে সেই স্থান হইতেই তাহাকে হৃদয়ে টানিয়া লও—দেখিবে তাহার ক্ষুদ্রতা, মলিনতা, বিরূপতা নিমেষে তিরোহিত হইয়া সে এক অমর ভাস্বর সৌন্দর্য্যে ঝলমল করিবে। এমনি করিয়া সহানুভূতি অভ্যাস কর—সহানুভূতি হইতে স্বজ্ঞার দরজা দিয়া অসীম বিশ্বের নিগূঢ় সত্যকে দেখ। অনন্ত খণ্ডিত সৃষ্টিকে আপনার ভিতর এক করিয়া লইয়া সকল ভয় মোহ সন্তাপকে অতিক্রম কর।

*   *   *

সহানুভূতি বা স্বজ্ঞা দ্বারা পৃথককে যে অপৃথক করি, দূরকে নিকট করি, বহুকে এক করি তাহা সম্ভবপর হয় কিসে? ইহার বৈজ্ঞানিক তথ্য কি? উপনিষদের কথা মনে হয় 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' এই যাহা কিছু বিচিত্র সৃষ্টি সবই ব্রহ্ম আর মানুষের মধ্যে যে চৈতন্য সেই চৈতন্যই ব্রহ্ম। অর্থাৎ মূলতঃ আমি যাহা এই বিশ্ব চরাচরও তাহা। এক ছাড়া অন্য কিছু বস্তু নাই। আকাশ বাতাস, পাহাড়, সমুদ্র, গাছ পালা জীব জন্তু পুরুষ স্ত্রী সকলই চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্ম—সকলই আমি। আমার যাহা সত্য জগতের তাহাই সত্য। আমার সহিত অন্য কিছুর যে পার্থক্য দেখি, তাহা আমার দেখা, আমারই বুদ্ধির দোষ।

যখন আমি আমার দেহকে লইয়া ক্ষুদ্র মানসিক সঙ্কল্প লইয়া অহঙ্কারে মত্ত হই তখন এই গহন সত্য আমা হইতে অনেক দূরে রহিয়া যায়। তখন আমি সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া নিজের খণ্ডিত সত্তার জন্ম-মরণ ভাবিয়া মোহিত হই। আমি ঠকিয়া যাই।

চল ঘরে ফিরিয়া চলি। আপনাতে আপনি দাঁড়াই নিজের। সত্যেকে, বিশ্বের সত্যকে, এক সত্যকে চিনিয়া মানুষজন্ম সার্থক করি।

রবীন্দ্রনাথে মিষ্টিসিজম্ ও রোমান্স

শ্রীমনোজ রায়

মিষ্টিক কবি বা লেখক বলতে আমরা বুঝি সেই সব লেখক বা কবিদের যাঁহাদের সহজ কথায় বলা হয় মরমী কবি বা লেখক। মিষ্টিক কথার অর্থ, "One who seeks for direct intercourse with God in elevated religious feeling or ecstasy." যাঁহাদের কল্পনা পাথিব জগৎ হইতে উচ্চস্তরে অবস্থিত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়লব্ধ সত্যকে যাঁহারা গ্রাহ্য করেন না তাঁহারাই মিষ্টিক বা মরমী কবি। আপনাদের সত্তাকে যাঁহারা পার্থিব জগৎ যইতে ছিন্ন করিয়া ঊর্দ্ধে ঐশ্বরিক সংস্পর্শে আনয়ন করিয়া মনশ্চক্ষে পরিদর্শন করেন, ধরিতে গেলে "চোখ দিয়ে যাঁহারা শোনেন ও কান দিয়ে যাঁহারা দেখেন" তাঁহারাই আসিয়া পড়েন এই পর্য্যায়ে। তাঁহারা "ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপদ্বারা আকৃষ্ট হন না। তাঁহারা ইন্দ্রিয়কে মনে করেন সত্যোপলব্ধির বাধা, ইন্দ্রিয়কে অতিক্রম করিয়া তাঁহারা প্রবেশ করেন ইন্দ্রিয়ের অতীত চরম সত্যের রাজ্যে।"

এই কবিরা মানব-মনের অনুভূতিকে সযত্নে ঊর্দ্ধে ধরিয়া রূপ রস ও কাব্যের সাহায্যে মানব-মনের স্বাভাবিক অনুভূতিগুলিকে আপনার প্রতিভার দ্বারা বিকশিত করিয়া সংযোগ স্থাপন করিয়া তোলেন মহান ঈশ্বরের সঙ্গে। তাঁহারা এমনি ভাবে সংযোগস্থাপন করিয়া তোলেন মানব প্রাণের সঙ্গে এক মহান প্রাণের একমাত্র কাব্যের প্রকাশের ভিতর দিয়া প্রাণদান করিয়া। শুধু তাহাই নহে। এই সব মরমী কবিদের লেখনীর সংস্পর্শে আসিয়া মানব হইয়া উঠে মহামানব, আর তারি সঙ্গে সংযোগের সৃষ্টি হয় অপার্থিব জগতের।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ঠিক এমনি ধরনের কবি। তাঁহার কাব্যের ছন্দে ঝঙ্কারিত হইয়া উঠিয়াছিল ঠিক এমনি সুর। বাঙ্গলার প্রকৃতির সম্পদ এক একটি ঋতু। আর সেই ঋতুগুলি আসে বছরের বিভিন্ন সময় এক একটি বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করিয়া। মানব-মনকে সচকিত করিয়া তোলে সেই ঋতুর নবীন ছন্দে। রবীন্দ্রনাথ এমনি এক ঋতুর আগমনী ছন্দের অন্তরালে শুনিয়াছেন শুধু প্রণয়ের অভিসারের আহ্বান নহে, সুদূর দেবতার আগমনীর বাঁশীর ধ্বনি ঃ—

"কে সে বাঁশী বাজাইয়াছিল কবে প্রথম সুরের তালে
প্রাণের ডাক দিয়াছিল সুদূর আঁধার আদিকালে।
তার বাঁশীর ধ্বনিখানি
আজ আষাঢ় দিগ আনি,
সেই অগোচরের তরে আমার হৃদয় নিল হ'রে।"

এমনি ভাবে তিনি চাহিয়াছিলেন দেবতার বাঁশীর সুরের সাথে আপনার কাব্যের ছন্দের লয় করিতে। তিনি তাতেই ক্ষান্ত হ'ন নাই—এর পরেও তিনি চাহিয়াছিলেন দেবতার সঙ্গে মানবের সত্তার বিশেষ যোগসাধন—

"আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরাণসখা বন্ধু হে আমার।"

এমনি ভাবে তিনি চাহিয়াছিলেন সেই অজানিত দেবতার সঙ্গে সখ্য স্থাপন করিতে। তাঁহার এই মিষ্টিসিজিমের আরও বৃহৎ নিদর্শন 'জীবন-দেবতা'। তিনি এই জীবন-দেবতার ভিতর

দিয়াই দেবতাকে আপন করিয়া লইয়াছিলেন। "জীবন-দেবতার স্বরূপই হইতেছে বিশ্ববোধ। তিনি কিনা জীবনের সমস্ত ভাল-মন্দ, সমস্ত ভাঙ্গা-গড়ার ভেতর দিয়া জীবনকে একটি অখণ্ড তাৎপর্য্যের মধ্যে উদ্ভিন্ন করিয়া তুলিতেছেন এবং তিনিই আবার কবির কাব্যে উপস্থিতকে চিরন্তনের সঙ্গে, ব্যক্তিগত জিনিষকে বিশ্বের সঙ্গে, খণ্ডকে সম্পূর্ণের সঙ্গে মিলিত করিয়া কাব্যকেও তাহার ভাবী পরিণামের দিকে অগ্রসর করিয়া দিতেছেন।" 'বিশ্বদেবতা'ও ঠিক এমনি ধরনের। 'বলাকা' 'পূরবী' 'পরিশেষ' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থেও এমনি সুর আছে।

পরিশেষের 'আমি' কবিতায় তাঁহার এমনি ভাব বেশ পরিস্ফুট :

"আজি ভাবি মনে মনে তাহারে কি জানি
যাহার বলায় মোর বাণী
যাহার চলায় মোর চলা
আমার ছবিতে যার কলা,
*   *   *
আমার অতীত সে-আমিরে।"

'চিত্রা' কবিতায় "কবি যাহাকে অন্তরব্যাপিনী বলিয়া উপলব্ধি করিতেছেন তিনিই বিশ্বে বিচিত্র-রূপিণী।"

"জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী।
*   *   *
অন্তর মাঝে শুধু তুমি একা একাকী
তুমি অন্তরব্যাপিনী।"

শুধু 'চিত্রা' বলিয়াই নয়, রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্যেরও ইহাই একটি প্রধান সুর। হয়তো এই কাব্যের প্রেরণা তিনি পাইয়াছেন তাঁহার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা হইতে! যে আকাঙ্ক্ষা তাঁহার কাব্যের ছন্দে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। সে আকাঙ্ক্ষা হইতেছে দেবতার সঙ্গে আপনার সত্তার মিলন।

'বসুন্ধরা', 'উর্ব্বশী', 'সমুদ্রের প্রতি', 'মানস-সুন্দরী', 'জ্যোৎস্নারাত্রে', 'যেতে নাহি দিব', 'সন্ধ্যা' প্রভৃতি কাব্যের সুরও ঠিক এমনি। রবীন্দ্রনাথের আরও একটু বৈশিষ্ট্য তিনি সুন্দরকে সুন্দর বলিয়াই অনুভব করেন নাই, তাহার সঙ্গে দেবত্বের সুন্দরত্বের মিশ্রণে ইহলোকের সঙ্গে দেবলোকের এক বিশেষ সংযোগ স্থাপন করিয়াছেন। "যাহাদের মধ্যে কবি দেবতার সঙ্গে তাঁহার সম্পর্কের কথা প্রকাশ করিতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন—এই দেবতা প্রধানতঃ তাঁহার স্বীয় দেবতাই হউন অথবা তিনি বিশ্বের দেবতাই হউন। আসল কথা তিনি হইবেন দেবতা।"

এমনি ভাবে কাব্যজগতে মিষ্টিসিজমের ভিতর দিয়া দেবতার সঙ্গে মানবের সংযোগ সাধিত হইতেছে। মানব-জগতের অর্থকরী ভাষা কাব্য-জগতের ভিতর দিয়া মহান ঈশ্বরের সত্তার সঙ্গে বিলীন হইতেছে। জীবন দেবতাকে উপলক্ষ্য করিয়া Dr. Thompson রবীন্দ্রনাথের এই ব্যবধান দূরীকরণকে বলেছেন, "It is the Jivandevata crossing the world stream of the poet's song."

মানুষ দেবতারই সৃষ্টি, এবং সেই মানবত্বের মাঝেই আছে দেবত্ব। যুগে যুগে দেবতা রূপ পরিগ্রহ করিয়া আসেন মানবের মাঝে। এরি আভাস পাই 'আমি' কবিতাতে :

"এই আমি যুগে যুগান্তরে
কত মূর্ত্তি ধরে
কত নামে, কত জন্ম করে পারাপার
কত বারম্বার।
নিভৃতে দেখিব আজি এ-আমিরে
সর্ব্বত্রগামীরে।"

এম্‌নি ভাবে মানবের মাঝে দেবতা বিকাশ

লাভ করেন। সে সত্যের রূপ গীতাতেও আমরা পাই, শ্রীকৃষ্ণের কথায়—উপদেশে।

Alfred Noyes তাঁহার বিখ্যাত The Mystic কবিতায় লিখিয়াছেন :—

"Never was mine that easy faithless hope
Which makes all life one flowery slope
To heaven ! Mine be the vast assaults of doom.
Trumpets, defeats, red anguish, age-long strife,
Ten million deaths, ten million gates to life,
The insurgent heart that bursts the tomb."

এইসব আলোচনাতেই আমরা উপলব্ধি করিতে পারি 'মিষ্টিসিজম্' কি এবং রবীন্দ্রনাথে তাহার প্রভাব কতখানি।

রোমান্স শব্দের অর্থ আমরা কি বুঝি ?

Pope, Dryden এর আগে থেকে কাব্যের একটা বিশেষ বাঁধাধরা গতিপথ ছিল। ছন্দ ছিল সীমাবদ্ধ, ভাষা ছিল গণ্ডীবদ্ধ। কবিতার ভাবও চলিত একটা বাঁধাধরা পথ ধরিয়া। কিন্তু হঠাৎ মানব-প্রাণের চিন্তাধারার পরিবর্ত্তন হইয়া কাব্যের ধরন গেল বদলাইয়া। সকলেই উপভোগ করিলেন বাঁধাধরা গতিপথে কাব্যের ছন্দকে বা বিষয়বস্তুকে পরিচালিত করা চলে না। ভাষা, ছন্দ, বিষয়বস্তু দাবী করিল অবাধ স্বাধীনতার। মনের ঈপ্সাকে কাব্যে প্রাণদান করিতে যাইয়া কাব্যের ধরন গেল বদলাইয়া। তখন সকলের লক্ষ্য পড়িল আর্টের সুন্দরতম সৃষ্টির দিকে। আর তাহারি ভিতর দিয়া কবিপ্রাণের অব্যক্ত বাণী বর্ণনাচাতুর্য্যে মুখরিত হইয়া উঠিল নবীন মাধুর্য্যে। ভাষার, কাব্যের, ছন্দের, ভাবের যেন প্রাণ পাইয়া নবজাগরণ হইল।

সেই classical যুগের পরিবর্ত্তনের পটভূমিকায় একজন আধুনিক লেখক বলেছেন "Liberalism in literature" না হইলে সাহিত্যের বা কাব্যের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইবে না বা তাহার পরিপূর্ণতা আসিবে না।

রোমান্স কথার আমদানী পশ্চিম জগৎ হইতে। কিন্তু লক্ষণ মিলাইয়া দেখিতে গেলে দেখা যাইবে রবীন্দ্রনাথও একজন রোমান্স-রচয়িতা। রোমান্স কথার অর্থ রহস্য। কল্পনাই হইতেছে ইহার মূল বস্তু। গভীরভাবে আলোচনা করিলে দেখা যাইবে মিষ্টিসিজমেও এই কল্পনার আভাস বর্ত্তমান। এইখানেই রোমান্সের সঙ্গে মিষ্টিসিজমের যোগসূত্র স্থাপিত।

"যে সকল কাব্য ও উপন্যাসে কল্পনা অতিশয় সমৃদ্ধিমান, যেখানে আখ্যায়িকা বা চরিত্র আমাদের মনে বিস্ময়ের সঞ্চার করে তাহাই রোমান্সের লক্ষণাক্রান্ত।"

অলৌকিক, অর্থাৎ অভাবনীয়, অসম্ভব একটা কিছুর আভাসই হইতেছে রোমান্স। যে বিবরণ বা প্রকাশ আমাদের চিন্তাশীল, জিজ্ঞাসু মনকে অবিশ্বাসী বুদ্ধিকে দমন করিয়া অবাস্তবের কাল্পনিকতা রচয়িতার সৌন্দর্য্যের আতিশয্যে আমাদের প্রতীতি জাগাইয়া তোলে তাহাই রোমান্স। বাস্তব চিত্রের সঙ্গে এমনি একটু রহস্যের অলৌকিকতাই রোমান্সের প্রধান লক্ষণ। এই রোমান্স যেন একটু অসাধারণত্ব কল্পনার ছাপ, স্বপ্নের ছবি ও অবাস্তবের চিত্র বর্ত্তমান। বঙ্কিমের বহু উপন্যাসে এমনি রোমান্সের আভাস পরিলক্ষিত হয়। যেমন 'কপালকুণ্ডলা', 'আনন্দমঠ', দেবীচৌধুরাণী প্রভৃতিতে।

রবীন্দ্রনাথের রোমান্স একটু বিশিষ্ট ধরনের। "দূরত্বের সঙ্গে নৈকট্যের সংমিশ্রণে যে অপূর্ব্ব রোমান্সের সৃষ্টি হয় তাহাই রবীন্দ্রনাথের কাব্যের উপজীব্য।" দূরের আভাস আর তাহারি সঙ্গে

নিকটের এমনি সংযোগ রবীন্দ্রনাথ চিত্রিত করিয়াছেন তাঁহার বহু কবিতায় ছন্দে। এই রসই তাঁহার কাব্যের এক প্রধান রস। তিনি বাঙ্গলার সঙ্গে যোগ করিয়াছেন ভারতের, আর ভারতের সঙ্গে যোগ করিয়াছেন সারা পৃথিবীর। এমনি ভাবে গড়িয়া তুলিয়াছেন অখণ্ড পৃথিবীকে। তাঁহার ছন্দে এমনি বহুর মধ্যে রহিয়াছে একের অনুভূতি।

রবীন্দ্রনাথ শুধু দেশের সঙ্গে দেশের বা মানবের সঙ্গে মানবের নৈকট্য স্থাপন করিয়াই সন্তুষ্ট হন নাই। তিনি সংস্থাপন করিয়াছেন 'যুগ হতে যুগের' সঙ্গে সম্বন্ধ। শুধু তাই নয়, আপন সত্তাকে তিনি 'শত বর্ষ' পরে আবার জাগাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন নূতন আবেষ্টনীর মধ্যে।

"আজ থেকে শত বর্ষ পরে,

* * *

আমার বসন্তগান তোমার বসন্তদিনে
ধ্বনিত হউক ক্ষণতরে।"

'পুনশ্চ'। অত্যন্ত সাধারণ তুচ্ছ পদার্থ লইয়া রূপ পাইয়াছে এই কবিতা। তবুও ভাষার ছন্দে তাহা অপরূপ। তিনি এই সামান্য পদার্থগুলিকে দেখিয়াছিলেন দূরের থেকে, তাই তাঁহার এই দূরত্ব রহস্যের সৃষ্টি করিয়া সামান্যকেও অসামান্য করিয়া তুলিয়াছে। 'স্মৃতি' কবিতাও ঠিক এমনি অপরূপ, অসাধারণ, অনবদ্য। সুধু দূরের আলোকসম্পাতই তাহাদের রূপ বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছে।

"রোমান্টিক কবিরা অদ্বৈত সত্যের উপাসক। সমস্ত বিভিন্নতার অন্তরালে তাঁহারা একক, সমগ্র, পরিপূর্ণ সত্যকে খুঁজিতে চান। এই জন্য ধর্ম্মের মধ্যে রোমান্টিক লক্ষণ থাকে বেশী। যেখানে যাহা ঘটিতেছে তাহার অন্তরালে, ঈশ্বরবিশ্বাসী ভগবানের ইঙ্গিত দেখিতে পান।"

এই পশ্চিম হইতে সমাগত 'রোমান্স' বস্তুটিকে রবীন্দ্রনাথ হয়তো সঠিক ভাবে আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। তাই তাঁহার বেশীর ভাগ 'রোমান্টিক কবিতা' উল্লেখযোগ্য নয়।

অলঙ্কারের সৌন্দর্য্য সর্ব্বজনসমাদৃত এবং রবীন্দ্রনাথেও তাহার অভাব নাই। কিন্তু এই অলঙ্কার সাহায্যে অতিরঞ্জিত করিতে যাইয়া ঐশ্বর্য্য অনেক যায়গাতেই বাহুল্যে পরিণত হইয়াছে।

"ভাবের উচ্ছ্বাস কাব্যের প্রধান গুণ, কিন্তু উচ্ছ্বাসের আতিশয্য কাব্যের দোষ।" অন্যান্য বৈদেশিক কবিদের সঙ্গে তুলনায় দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ এই দোষে দুষ্ট নন।

তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যুতে তিনি লিখিয়াছিলেন অতি সাধারণ গুটিকয় ছত্রে, যে ছন্দে ছিল না কোন অসংযত উচ্ছ্বাস।

"মৃত্যুমাঝে আপনারে করিয়া হরণ
আমার জীবনে তুমি ধরেছ জীবন
আমার নয়নে তুমি পেতেছ আলোক—
এই কথা মনে জানি নাই মোর শোক!"

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার স্ত্রীকে 'স্মরণ' করিয়া যে কয়েকটি কবিতা লিখিয়াছেন তাহার অধিকাংশই অলঙ্কারবিবর্জিত। কিন্তু ভাষার চাতুর্য্য ও সংযমের পরিচয় পাই Wordsworth এ—

"A slumber did my spirit seal
I had no human fears
She seemed a thing that could not feel
The touch of earthly years,"

তাহা রবীন্দ্রনাথের এই 'স্মরণ' কবিতাগুচ্ছের কোথাও পাই না। শুধু পুরাতন চিঠিতে এর একটু আভাস পাই। এই সংযমের অভাবই রবীন্দ্রনাথে খুব বেশী।

রোমান্টিক কবিতার আর একটি বিশেষ লক্ষ্য অল্পকথায় একটি বিশেষ গভীরভাব পরিস্ফুট করা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভিতর এইরূপ রোমান্সের অভাব বিশেষভাবে চোখে পড়ে। তবুও রোমান্সরচনায় তাঁহার দান বড় কম নয়, যেমন—'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ', 'শরৎ', 'পতিতা', 'মদনভস্মের পর', 'শিশুতীর্থ', 'মানসসুন্দরী', 'বর্ষশেষ', 'শাজাহান', 'আহ্বান', 'তপোভঙ্গ', 'লীলাসঙ্গিনী', 'সাবিত্রী' ইত্যাদি। ত্রুটি-বিচ্যুতির মাঝেও রবীন্দ্রনাথ রোমান্সরচনায় একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছেন।

আজও রবীন্দ্রনাথকে বলা হয় মিষ্টিক্ ও রোমান্টিক কবি।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের কথা

স্বামী অপূর্বানন্দ

৯ই মার্চ, বৃহস্পতিবার, ১৯৩৩। এলাহাবাদ মুঠিগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ। ন—বাবুর মা পশুপতিনাথ দর্শনে যাবার সময় পূজ্যপাদ বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ তাঁকে পশুপতিনাথ হতে মাঝারি রুদ্রাক্ষের মালা, পশুপতিনাথের ছবি ও সেখানকার একখানি ছোট রকমের ইতিহাস আনতে বলেছিলেন। সে সব জিনিষ এবং আর এক ছড়া নূতন মালা নিয়ে ন—বাবু পূজ্যপাদ মহারাজজীর নিকট গিয়ে তাঁকে মালা ছড়াটী শোধন করে দেবার প্রার্থনা জানান। মহারাজজী মালা শোধন করে নিজের মাথায় ঠেকিয়ে ন—বাবুর হাতে দিয়ে বললেন, "আমি তো ঠাকুরের ও মায়ের নাম জপ করে মালা শোধন করে থাকি। ঠাকুরের ও মায়ের নাম করলে তাতে স্বামীজী, রাখাল মহারাজ প্রভৃতি সকলেই আছেন।" কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "নবগোপাল ঘোষ মহাশয় 'রামকৃষ্ণ' খুব জোরের সহিত ও ঐকান্তিকতার সহিত বলতেন, আমার খুবই ভাল লাগত। নীরদ মহারাজের মাও ঠাকুরগত প্রাণ ছিলেন।" পরে বললেন "* * মায়ের নিজের একটী বিশেষ বড় গুণ ছিল, সেটী এই যে তিনি স্ত্রীলোক থেকে এবং তাঁহাদিগকে কুভাবে দেখার হাত থেকে রক্ষা করতে পারতেন—এটী আমি নিজের জীবনে বেশ অনুভব করেছি। তাঁর নামেতে ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, বুদ্ধি, ধনদৌলত সব আসে। চণ্ডীতে আছে—তিনি স্বর্গ-মুক্তিপ্রদায়িনী, সব দিতে পারেন। তিনি প্রসন্না হলেই সব হল—'সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে' তিনিই প্রসন্না হয়ে মনুষ্যদিগকে মুক্তির জন্য বর প্রদান করেন। ঠাকুরের নামের চাইতে আমি মায়ের নামে বেশী জোর পাই। একবার বলরাম বাবুর বাড়ীতে স্বামীজী মহারাজ আছেন, শ্রীশ্রীমাও আছেন। সকলে মাকে প্রণাম করতে যাচ্ছে, আমি স্বামীজী মহারাজের কাছে বসে আছি। তিনি মাকে প্রণাম করতে যেতে বললেন। আমি তো গিয়ে মাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে হাঁটু গেড়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলাম। স্বামীজী মহারাজও আমার পেছনে পেছনে এসেছিলেন, আমি তা টের পাই নি। আমাকে হাঁটু গেড়ে প্রণাম করতে দেখে তিনি বললেন—'মাকে কি এই ভাবে প্রণাম করতে হয়?' বলেই নিজে সাষ্টাঙ্গ হয়ে মাকে প্রণাম করলেন। আমিও তৎক্ষণাৎ তাই করলুম। মা তো আমার। মায়ের কাছে আমি তো সদাই নত। মাকে আমরা কতটুকুই বুঝেছি! যা বুঝেছিলেন একমাত্র স্বামীজী মহারাজ।

"তুমি যখন বেশ free (স্বচ্ছন্দ) বোধ করবে রাত্রে একলা ঘরে মায়ের ও ঠাকুরের নাম জপ করবে। তারপর মালা উঁচুতে ঝুলিয়ে রাখবে—বেশী নাড়াচাড়া যেন কেউ না করতে পারে। যখন ইচ্ছা জপ করতে পার, বেড়াবার সময়ও জপ করতে পার, তবে গভীর রাত্রে একলা ঘরে নিশ্চিন্ত মনে জপ করলে ভাল হয়। বেলুড় মঠে তিন চার দিন নিরিবিলিতে বাস করলে আর একান্ত মনে জপ করলে supernatural (অতীন্দ্রিয়) অনুভূতি হয়। ও বড় জাগ্রত স্থান। বর্ষার সময় স্বাস্থ্য একটু খারাপ

হয় এই যা। মহাপুরুষ মহারাজ খুব সাবধানে থাকেন। তাঁর শরীর পাঁচ মাস খারাপ হয় —জুন থেকে নবেম্বরের পূর্ব পর্যন্ত। তাঁর এখন প্রেমভাব বেশ—ভালবাসা খুব। সর্বদাই সকলের ভাল হোক্, মঙ্গল হোক্ এই চিন্তা করেন।"

*　　*　　*

২৩শে, এপ্রিল, ১৯৩৫। এলাহাবাদ মুঠিগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ।

আজ কাশী হতে স্বামী গ—ব্রহ্মচারী শ—র সঙ্গে এলাহাবাদ মঠে এসে পৌঁছেছেন। স্বামী গ—এলাহাবাদ মঠে প্রথম এসেছিলেন ১৯১৭ সালে। তখন পূজ্যপাদ বিজ্ঞানানন্দ মহারাজজী তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন—"বিবেকানন্দ স্বামী ও রাখাল মহারাজ এ দুজনের মধ্যে কে বড় ?" এ প্রশ্নের জবাব কি দেবেন তা ভেবে গ— খুবই ফাঁপরে পড়েছিলেন। সে প্রসঙ্গে মহারাজজী বললেন—"কেন ওঁরা পরস্পরে complementary (পরিপূরক)। Each is great in his own sphere. প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে বড়। স্বামীজীর ideas consolidate (ভাব সুপ্রতিষ্ঠিত) করতেন রাখাল মহারাজ। স্বামীজী যে সকল উচ্চ আদর্শ প্রচার করেছেন সে সব রাখাল মহারাজ কাজে পরিণত করে গেছেন। আমি রাখাল মহারাজের protectionএ (আগলানিতে) থাকতাম বলে মহারাজের বকুনি খেতে হয়নি। একদিন প্রসঙ্গক্রমে স্বামীজী বলেছিলেন যে আমাদের downfall (অবনতি)এর জন্য ঋষিমুনিরাই দায়ী, ইত্যাদি। আমি মনে করেছিলাম যে স্বামীজী ঋষিমুনিদের নিন্দা করছেন। তাই মনে করে তার প্রতিবাদে বললাম—'আপনি ঋষিমুনিদের নিন্দা করছেন। আপনি কি তাঁদের চাইতে বড় ? আপনি তাঁদের তুলনায় নগণ্য।' এই বলতেই দেখলাম স্বামীজী মহারাজের মুখ লাল হ'য়ে উঠল। তিনি অমনি গম্ভীর হয়ে গেলেন। আমি তাঁর ভাব দেখে ভয়ে অস্থির। রাখাল মহারাজ সেইখানেই বেড়াচ্ছিলেন। স্বামীজী তাঁকে বললেন—'পেসন্ বলে যে আমি কিছুই বুঝি না, আমি নগণ্য।' রাখাল মহারাজ তাতে উত্তর করলেন—'পেসনের কথা ধর্তব্যের মধ্যে ? ও তো ছেলে মানুষ, ও কি বোঝে ? ও কি বলতে কি বলেছে।' রাখাল মহারাজ ঐ বলাতেই স্বামীজী অমনি ঠাণ্ডা হ'য়ে গেলেন একেবারে বালকের মতন।

"রাখাল মহারাজ ও বাবুরাম মহারাজকেই স্বামীজীর ঝক্কি বেশী সামলাতে হত, বেশী বকুনি খেতে হত। কিন্তু তাঁদের পরস্পরের মধ্যে কী গভীর ভালবাসাই না ছিল ! এখন তো সে রকম বকুনি মঠে আর নেই।

"স্বামীজী মহারাজ একদিন বেড়াতে বেড়াতে আমায় বললেন—'এই জায়গায় ঠাকুরের মন্দির হবে।' যেখানে এখন ঠাকুরের মন্দির হয়েছে, ঠিক সেই জায়গাতেই দেখিয়েছিলেন। তারপর আমায় জিজ্ঞাসা করলেন—'হাঁরে, আমি দেখব ত ?' তখন আমি বললাম—'হাঁ, মহারাজ. আপনি দেখে যাবেন।' তাতে তিনি একটু চুপ করে থেকে বললেন—'হাঁ, আমি উপর থেকে দেখব।'

"স্বামীজীকে একবার আমেরিকায় মিশনারীরা মেরে ফেলবার ষড়যন্ত্র করে নিমন্ত্রণ করে সরবৎ খেতে দিয়েছিল। তারা জেনেছিল স্বামীজী সরবৎ খেতে ভালবাসেন। স্বামীজী তাদের কুঅভিসন্ধির কথা কিছুই জানতেন না। সরবতের গেলাস হাতে নিয়ে সরবৎ খেতে যাবেন—আর অমনি দেখলেন যে ঠাকুর সামনে দাঁড়িয়ে তাঁকে সরবৎ খেতে বারণ করছেন। তিনি সরবৎ আর খেলেন না। অমনি করে সেবার রক্ষা পান।"

স্বামী গ—বললেন "শুনেছি কে—বন্দোপাধ্যায়—যিনি বাংলার একজন প্রসিদ্ধ

লেখক, পূর্ণিমায় থাকেন—যখন পূর্বে কমিসারিয়েটে কাজ করতেন, তখন একবার চীনে Boxer risingএ (বক্সার বিদ্রোহে) তাঁকে যেতে হয়েছিল। সেখানে একবার রাত্রে একলা ঘোড়ায় চড়ে বিশেষ জরুরি কাজে বেরিয়েছেন। যেতে যেতে পথ হারিয়ে গিয়ে মহাবিপন্ন হয়ে পড়েন। এদিকে ভীষণ ভয় যে পাছে শত্রুপক্ষের হাতে পড়ে প্রাণ যায়। এরূপ অবস্থায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে খুব কাতর ভাবে ঠাকুরকে ডাকতে থাকেন তাঁর জীবন রক্ষা করবার জন্য। তখন সেই রাত্রেই হঠাৎ দেখেন যে একজন ব্রাহ্মণ দাড়ি ও পৈতা আছে, আদুড় গা—তাঁর কাছে এসে বাংলাতে কথা কইলেন। তাঁর বিপদের কথা সব শুনে তাঁকে অভয় দিয়ে পথ দেখিয়ে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিলেন। খানিক পরে নিজেকে বিপদমুক্ত দেখে কে—বাবুর মনে হল, এ স্থানে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ কোথা থেকে এলেন। তখন তিনি বুঝলেন যে ঠাকুরই তাঁর প্রার্থনা শুনে তাঁকে রক্ষা করে গেছেন।'

মহারাজজী ধীরভাবে সব শুনে বললেন, "মহাপুরুষদের সব ব্যাপারই অলৌকিক। স্বামীজী মহারাজও অনেক সময় অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাপার করতেন। একবার আমি বেলুড় মঠে গঙ্গার পাকা ঘাট তৈয়ার করছি, আর স্বামীজী মহারাজ মঠে উপরের বারাণ্ডায় বসে সরবৎ খাচ্ছেন। খুব রোদ, আমার ভীষণ তেষ্টা পেয়েছিল। এমন সময় স্বামীজীর একজন সেবক এসে একটা গেলাস দিয়ে বললে—'স্বামীজী মহারাজ আপনার জন্য সরবৎ পাঠিয়েছেন।' সেই শুনে আমি তো ভারী খুসী, কিন্তু চেয়ে দেখি যে গেলাসের তলায় দুচার ফোঁটা মাত্র সরবৎ পড়ে আছে। তাই দেখে মনে মনে খুব কষ্ট হল যে এমন সময় স্বামীজী আমার সঙ্গে তামাসা কচ্ছেন! যাই হোক, তিনি যখন পাঠিয়েছেন তখন তাঁর প্রসাদ জ্ঞানে ঐ দুচার ফোঁটা সরবৎই মুখে ঢেলে দিলাম। কিন্তু আশ্চর্য! ঐ দুচার ফোঁটা সরবতেই আমার সব শরীর স্নিগ্ধ হয়ে গেল এবং মনে একটা অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভব করলাম।

"ঘাটের কাজ বন্ধ করে যখন ফিরেছি, তখন স্বামীজী মহারাজ আমায় জিজ্ঞাসা করলেন—'কি পেলন্, সরবৎ খেয়েছিলে?' আমি বললাম—'সরবৎ তো নামমাত্র ছিল, কিন্তু তাতেই আমার বেশ তৃপ্তি হয়েছিল। স্বামীজী শুনে খুব খুসী হয়েছিলেন।"

অন্য একদিন কথাপ্রসঙ্গে জনৈক ভক্ত মহারাজজীকে worldএর evolution (জগতের ক্রমবিকাশ) সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রে কি বলছে তা বুঝিয়ে দিতে বলায় তিনি বলেছিলেন, "আমাদের শাস্ত্রে সবই আছে। প্রাচীন আর্য্য ঋষিরা ধ্যানবলে সব উপলব্ধি করে গেছেন। গায়ত্রী-মন্ত্রেও evolutionএর বিষয় জানা যায়। ঠাকুরের কিন্তু ভাব এই যে অত সব জেনে কি হবে? আগে মা'কে জান। সব ছেড়ে ছুড়ে তাঁকে ডাক, আন্তরিক ভাবে ডাক, দরকার হলে তিনিই সব জানিয়ে দেবেন। আর মাকে জানলেই তো সব জানা হয়ে গেল। কেশব বাবুকে বলেছিলেন—'এত দেশ-বিদেশ ঘুরে এলে, জাহাজে উঠলে, সমুদ্র দেখলে, আর মাকে—যিনি এই সব ধারণ করে রয়েছেন—তাঁকে দেখতে পেলে না?' এ বিরাট বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সবই মা ধারণ করে আছেন। তিনি তোমাদেরও রক্ষা করছেন, তাঁকে ডাক আর নাই ডাক। তবে ডাকলে আরও আনন্দ পাবে, সেই আনন্দময়ীর আনন্দে বিভোর হবে। দেখ, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহনক্ষত্র পর্বত, নদ-নদী, বৃক্ষলতা সকলেই কেমন contemplative moodএ (ধ্যানস্থ ভাবে) আছে, সকলেই যেন মাকে ডাকছে, তাঁর ধ্যান করছে। কেবল মানুষ যে ভগবানের সৃষ্ট সকল প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সে-ই বিষয়েতে মত্ত, মা'কে ডাকে না। মাকে কায়মনোবাক্যে ডাকতে পারলে যে কি আনন্দ তার খোঁজ রাখে না। সেই আনন্দজ্যোতি তো চারদিকে রয়েছে—সর্বত্র রয়েছে কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় মানুষ তা উপলব্ধি করতে পারে না।

"তোমরা তো বুড়িকে অর্থাৎ ঠাকুরকে ধরে রয়েছই, কিন্তু আরও এগিয়ে যেতে হবে, সেই জ্যোতিঃসমুদ্রে ডুবে যেতে হবে।"

ব্রহ্মজিজ্ঞাসা

শ্রীনিখিলচন্দ্র রায় এম্-এস্‌সি

ব্রহ্মজিজ্ঞাসা বেদান্তশাস্ত্রের প্রধান বিষয় এবং এই শাস্ত্রে সূত্রের পর সূত্রে পরব্রহ্মের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। ইহার প্রথম সূত্রেই লিখিত হইয়াছে "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" আর ইহাই এই শাস্ত্রের মূল। এই সূত্রে তিনটি পদ আছে, যথা "অথ, অতঃ, ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"। ইহাদের আক্ষরিক অর্থ হইতেছে "অনন্তর, এই হেতু, ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"। "অনন্তর"—কিসের অনন্তর? যে বিষয় অধিগত হইলে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা মনে স্বতঃই উপস্থিত হয়, তাহার অনন্তর। সেই বিষয়টি চিত্তশুদ্ধি। চিত্তশুদ্ধি না হইলে প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছাই হয় না। এই চিত্তশুদ্ধির উপায়—(১) এই জন্মে বা জন্মান্তরে কাম্যনিষিদ্ধ বর্জ্জন, (২) নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া, প্রায়শ্চিত্ত ও উপাসনা দ্বারা নিখিল কল্মষনির্গমন অর্থাৎ সমস্ত পুঞ্জীভূত পাপ দূরীকরণ, এবং (৩) সাধন-চতুষ্টয় অনুসরণ। প্রথম উপায়—কাম্য অর্থাৎ ইহলোকে বাঞ্ছিত ধন, প্রতিপত্তি ইত্যাদি ও পরলোকে স্বর্গাদি ইষ্টলাভের জন্য পুণ্যকর্ম্ম ও যাগ-যজ্ঞক্রিয়া এবং নিষিদ্ধ অর্থাৎ শাস্ত্রনিষিদ্ধ নরকাদি গমনের সহায়ক ব্রহ্মহত্যা ইতাদি পাপকর্ম্ম—এই উভয়ই বর্জ্জন। ইহাই প্রথম উপাদান এবং ইহা এই জন্মে বা পূর্ব্বজন্মে সাধিত হইলে পরবর্ত্তী উপাদান আরম্ভ করা যায়। দ্বিতীয় উপাদান—নিত্যক্রিয়া (সন্ধ্যা বন্দনাদি), নৈমিত্তিক ক্রিয়া (পূজাপার্ব্বণ ইত্যাদি), প্রায়শ্চিত্ত (পাপক্ষয়-সাধন জন্য চান্দ্রায়ণ ব্রত ধারণ বা দান ধ্যান ইত্যাদি) এবং উপাসনা (সগুণ ব্রহ্ম বা ঐশ্বর্য্যশালী ভগবানের আরাধনা)—এই সকল অনুষ্ঠানের দ্বারা সমস্ত পাপক্ষয়করণ। তৃতীয় উপাদান হইতেছে—সাধনচতুষ্টয়, ইহারা যথাক্রমে—(১) নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, অর্থাৎ ব্রহ্মই নিত্য বস্তু, অপর সকলই অনিত্য এই জ্ঞান। (২) ইহা-মুত্রফলভোগবিরাগ, কি পার্থিব স্রক্‌চন্দনাদি বিষয়ভোগ, কি পারত্রিক অমৃতাদি বিষয়ভোগ এই উভয়েরই অনিত্যতা বিবেচনা করিয়া তাহা হইতে আত্যন্তিক বিরতি। (৩) শমদমাদি সাধন; ইহা হইতেছে—শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা সমাধান এবং শ্রদ্ধা। তত্ত্বজ্ঞান সাধনে শ্রবণ-মননাদির যখন অতিশয় অভিরুচি উপস্থিত হয় সেই সময়ে মন পূর্ব্ববাসনা-বলে উড়িয়া গিয়া স্রক্‌চন্দনাদি বিষয়ে যুক্ত হইলে অন্তঃকরণের যে বৃত্তিবিশেষ দ্বারা তাহাকে নিগ্রহ করা হয়, তাহাকে শম বলে। যে বৃত্তিবিশেষের বলে শব্দাদি বিষয়ে প্রবর্ত্তমান শ্রোত্রাদি বাহ্যেন্দ্রিয় সকলকে নিবৃত্ত করা যায়, তাহাকে দম বলে। বিহিত নিত্যাদি কর্ম্ম-সকলকে 'আমি কর্ত্তা নহি' এইরূপ বিবেচনা দ্বারা চতুর্থাশ্রম অর্থাৎ সন্ন্যাস স্বীকার পূর্ব্বক পরিত্যাগ—ইহাই উপরতি। শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব সাহিষ্ণুতাই তিতিক্ষা। উপরি উক্ত প্রকারে নিগৃহীত মনকে নিরন্তর ভগবচ্চিন্তায় নিয়োগকে সমাধান বলে। আর শ্রদ্ধা হইতেছে গুরু এবং বেদান্তবাক্যে বিশ্বাস। (৪) চতুর্থ সাধন মুমুক্ষুত্ব অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্তির ইচ্ছা; ইহা হইলে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা স্বতঃই মনে উদিত হয়। তখন ঐরূপ প্রশান্তচিত্ত, জিতেন্দ্রিয়, প্রক্ষীণদোষ, যথোক্তকারী, গুণান্বিত এবং অনুগত শিষ্যকে গুরু ব্রহ্মের বিষয় উপদেশ করিবেন।

সূত্রের প্রথম পদ অথ অনন্তর শব্দের বেদান্তের বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার আচার্য্যগণ উপরি উক্ত ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এক্ষণে ঐ সূত্রের দ্বিতীয় পদ "অতঃ" "এই হেতু" এই শব্দটি বিবেচনা করা যাউক। ঐ হেতুটি কি? কি কারণে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়। অনিত্য বস্তুকে সত্যই অনিত্য বলিয়া জ্ঞান হইলে নিত্যস্বরূপ ও নিত্য সুখের উৎস যে অন্য কিছু আছে মনে তখন তাহার প্রতীতি জন্মে। তখনই সেই নিত্যবস্তু ব্রহ্ম কি, কিরূপে তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় এই প্রশ্ন মনে উদিত হয়। উপনিষদের ভাষায় "রসো বৈ সঃ" অর্থাৎ তিনি রসস্বরূপ, "আনন্দং নন্দনাতীতম্" অর্থাৎ তিনি নন্দনাতীত আনন্দ, এই সকল বাক্য ক্রমশঃ উপলব্ধি হইতে থাকে।

সূত্রের তৃতীয় পদ "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"র অর্থ ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা। তৈত্তিরীয় উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্ ব্রহ্মেতি" (৩।১)। যাঁহা হইতে এই ভূতসকল উৎপন্ন হইয়া যাঁহা দ্বারা জীবিত রহিয়াছে এবং প্রলয় কালে যাঁহাতে বিলীন হইবে তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা কর—তিনিই ব্রহ্ম। এই জানিবার ইচ্ছাই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।

অতএব দেখা গেল যে শ্রুতিবাক্যে আছে, "ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর"। কিন্তু প্রতিকূল পক্ষ যখন যুক্তি দেখাইয়া বলেন যে ব্রহ্মবিচার নিষ্প্রয়োজন তখনই সন্দেহের উৎপত্তি হয়, সত্যই কি ব্রহ্মবিচার আবশ্যক? এই সন্দেহ নিরাকরণের নিমিত্ত ঐ যুক্তির বিচারও করা হইয়াছে। নিম্নলিখিত বিচার দ্বারা পূর্ব্বপক্ষের যুক্তি উত্তরপক্ষ খণ্ডন করিয়াছেন:

শ্রুতিতে দুই প্রকারে ব্রহ্মের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, যথা—(১) "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান এবং অনন্তস্বরূপ—ইহা দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে; এবং (২) "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" এই আত্মাই ব্রহ্ম, ইহার দ্বারা ব্রহ্মকে আত্মরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। শ্রুতি উভয় পক্ষেরই অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকৃত। এক্ষণে পূর্ব্বপক্ষ এই দুই শ্রুতিবাক্যের উপর নির্ভর করিয়া বলেন যে—(১) প্রথম সূত্রে ব্রহ্মের স্বরূপ অতি সুস্পষ্টভাবে নির্ণীত হইয়াছে এবং (২) দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে আত্মস্বরূপ অবলম্বনে বিচার করিলেও প্রত্যেকেই নিজ নিজ আত্মাকে বিশেষভাবেই জানিতেছেন, কারণ অহং প্রত্যয়ের দ্বারা আত্মাকে আমরা সকলেই ভালরূপে জানি। এই উভয় কারণে ব্রহ্মবিষয়ে কোন সন্দেহই আসিতে পারে না; এবং যেহেতু সন্দেহের বস্তুই কেবল বিচারের বিষয় হয়, তখন বৃথা ব্রহ্ম-বিচার একান্তই নিষ্প্রয়োজন। পূর্ব্বপক্ষ আরও বলেন যে উত্তরপক্ষ হয়ত বলিবেন, আমি যে অহং প্রত্যয়কে সত্যজ্ঞান বলিয়া মনে করিতেছি, তাহা প্রকৃত সত্যজ্ঞান নহে, তাহা অধ্যস্ত বা আরোপিত আত্মজ্ঞান। এখন কথা হইতেছে যে কিসে কি আরোপিত? উত্তর পক্ষ ইহার উত্তর দেন যে দেহে বা অনাত্ম কোন বস্তুতে আত্মা আরোপিত হয়। সাধারণতঃ যখন মানুষ বলে যে আমি করিতেছি, আমি খাইতেছি, তখন সে প্রকৃত কর্ত্তা "আমি" বা আত্মাকে দেহাদি হইতে পৃথক করিয়া দেখিবার অবসরই পায় না, দেহাদিকে কর্ত্তা মনে করিয়া বলিয়া থাকে "আমি করিতেছি" ইত্যাদি, এবং সেই কারণে সাধারণতঃ মনুষ্যের অহংপ্রত্যয় হইতে আত্মবিষয়ক ভ্রান্ত জ্ঞানেরই উৎপত্তি হয়। তদুত্তরে পূর্ব্বপক্ষ বলেন যে এই প্রকার জ্ঞানকে মিথ্যাজ্ঞান বলিয়া স্বীকার করিতেই পারি না। শুক্তিতে যেরূপ রজতভ্রম হয় অনাত্মবস্তুতে সেইরূপ আত্মার ভ্রম কখনই হইতে পারে না। শুক্তি ও রজতে উভয়েরই চাকচিক্য

বিষয়ে সাদৃশ্য থাকায় ভ্রম হওয়া সম্ভব, কিন্তু অনাত্মবস্তু ও আত্মার মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। একটি হইল জড় অপরটি অজড় বা চেতন। এরূপ বিরুদ্ধ স্বভাব বিশিষ্ট দুইটি বস্তুর একটিতে অপরটির জ্ঞান আরোপ করা অথবা একটিকে অপরটি বলিয়া ভ্রম করা একেবারেই অসম্ভব। কাজেই বলিতে হয় যে আমাদের অহংপ্রত্যয় যাহাকে নির্দ্দেশ করিতেছে তাহা আত্মা এবং তাহাকে আমরা সকলেই বিশেষরূপে জানিতেছি। শ্রুতি-বাক্য অনুসারে যদি সেই আত্মাই ব্রহ্ম হন, তবে আত্মাকারেও আমরা ব্রহ্মকে সুষ্ঠুরূপেই জানিতেছি। অতএব হয় স্বরূপাকারে অথবা অহংপ্রত্যয় অবলম্বনে আত্মাকারে যখন ব্রহ্মের স্বরূপ বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না, তখন ব্রহ্মবিচারের প্রয়োজনীয়তা সেই সঙ্গে থাকে না। পূর্ব্বপক্ষ এখনও বলেন যে ব্রহ্মবিষয়ক বিচার করিয়া কোন লাভও নাই; কারণ বিচারের ফলে এই আত্মাকে বুদ্ধির দ্বারা ব্রহ্ম বলিয়া নিশ্চিত করিলেও তাহার ফলে যে মুক্তিলাভ হইয়াছে এমন ত কোথাও দেখা যায় না।

পূর্ব্বোক্ত যুক্তিসমূহ উত্তরপক্ষ এই প্রকারে খণ্ডন করিতেছেন: উত্তরপক্ষ বলিতেছেন যে ব্রহ্মবস্তুতে সন্দেহের অভাব নাই—একদিকে শ্রুতি "সত্যং জ্ঞানমনন্তম্" বলিয়া যে অসঙ্গ বা সম্বন্ধরহিত ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন সেই অসঙ্গ ব্রহ্মকেই আবার শ্রুতি "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" এই বাক্যের দ্বারা আত্মরূপে নির্দ্দিষ্ট করিতেছেন। অতএব পূর্ব্বপক্ষ "আমিই মনুষ্য" এই অহং বুদ্ধি দ্বারা যে আত্মাকে নির্দ্দেশ করিতেছেন তাহা শ্রুতির উক্ত অসঙ্গ ব্রহ্মরূপ আত্মা নহেন। পূর্ব্বপক্ষ অহংবুদ্ধি অবলম্বনে দেহেই আত্মার অধ্যাস করিতেছেন এবং স্বীকার করুন আর নাই করুন তাঁহার ভ্রান্তজ্ঞান হইতেছে। এইখানেই শ্রুতিবাক্য ও অহংপ্রত্যয় এই উভয়ের মধ্যে অসামঞ্জস্য থাকার নিমিত্ত ব্রহ্মই আত্মা কিনা তদ্বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। কাজেই এই সন্দেহ দূরীকরণের জন্য ব্রহ্মবিচারের প্রয়োজনীয়তাও অবশ্যম্ভাবী। পূর্ব্বপক্ষ অনাত্মবস্তুতে আত্মার অধ্যাস সম্ভব মনেই করেন না, কিন্তু তাঁহার যে ঠিকই অধ্যাস বা ভ্রান্তজ্ঞান হইতেছে, অধ্যাস সম্ভব মনে না করাই তাহার প্রমাণ। ভ্রমকে যদি ভ্রম বলিয়াই জ্ঞান হইল তবে ত সেই ভ্রম দূর হইয়া সত্যজ্ঞান উপস্থিত হইল। রজ্জুকে যতক্ষণ সর্প বলিয়া মনে করিব ততক্ষণই তাহার অধ্যাস বা ভ্রান্তজ্ঞান। কিন্তু যখনই সেই ভ্রমকে ভ্রম বলিয়া বুঝিতে পারিলাম তখনই ত যাহা সত্য অর্থাৎ রজ্জুকে রজ্জু বলিয়াই উপলব্ধি করিলাম। পূর্ব্বপক্ষের স্বীয় ভ্রম বুঝিতে না পারাই তাঁহার ভ্রমের অস্তিত্বের পরিচয় দিতেছে। আবার পূর্ব্বপক্ষ যে বলিয়াছেন ব্রহ্মকে আত্মরূপে জানিলে মুক্তিলাভ হয় এমন কোন প্রমাণ দেখা যায় না। কিন্তু শ্রুতিতে দেখা যায় যে ব্রহ্মকে আত্মরূপে জানিলে মুক্তি হয় বলিয়া উল্লেখ আছে এবং আত্মজ্ঞানী মহাপুরুষেরাও উক্তপ্রকার জ্ঞানের ফলে মুক্তিলাভ করিয়াছেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। অতএব উত্তরপক্ষ পূর্ব্বপক্ষের সকল যুক্তি খণ্ডন করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছেন যে বেদান্ত বা উপনিষদ্‌বাক্য অনুসারে ব্রহ্মবিষয়ে জিজ্ঞাসা ও বিচার করা কর্ত্তব্য। কিন্তু ব্রহ্মনির্দ্দেশ অতিশয় দুরূহ, কারণ—

উচ্ছিষ্টং সর্ব্বশাস্ত্রাণি সর্ব্ববিদ্যা মুখে মুখে।
নোচ্ছিষ্টং ব্রহ্মণো জ্ঞানমব্যক্তং চেতনাময়ম্॥

অর্থাৎ-সর্ব্বশাস্ত্র ও সকল বিদ্যা মুখে মুখে আবৃত্ত ও অধ্যাপিত হইয়া উচ্ছিষ্টস্বরূপ হইয়াছে। কিন্তু অব্যক্ত ও চেতনাময় ব্রহ্মের জ্ঞান কখনও উচ্ছিষ্ট হয় নাই। ইহা স্বয়ং চেষ্টালভ্য, জ্ঞানী মহাত্মাগণ ইহা লাভের পথনির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারেন মাত্র। ব্রহ্ম কি? এই জিজ্ঞাসার উত্তরে কেনোপনিষদ্

বলিতেছেন, "যন্মনসা ন মনুতে" অর্থাৎ যাঁহাকে মনের দ্বারা মনন করা যায় না। ব্রহ্ম চিরদিনই বিষয়ী, তিনি কোন দিনই বিষয় হইতে পারেন না। "যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ, বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদিতি" (বৃহদারণ্যক ২।৪।১৪)। অর্থাৎ যাঁহা দ্বারা এই সমস্ত জ্ঞাত হয় তাঁহাকে কিরূপে জানিবে! যিনি জ্ঞাতা তাঁহাকে কিরূপে জানিবে! তাঁহাকে জানিবার একমাত্র উপায় উপদিষ্ট হইয়াছে--"স এষ নেতি নেতি আত্মা" অর্থাৎ এই আত্মা বা ব্রহ্ম ইহা নন, ইহা নন। এই সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর কিছুই তিনি নহেন, তিনি অতীন্দ্রিয়। এই 'নেতি নেতি' বিচারের দ্বারা অবশেষে ব্রহ্মের স্বরূপ পরিচয় হয়। নিম্নে এই ব্রহ্মবিচার অন্যরূপে দেখান হইতেছে :

বৃহদারণ্যক উপনিষদে দ্বিরূপ ব্রহ্ম উপদিষ্ট হইয়াছে—দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তঞ্চৈবামূর্ত্তঞ্চ মর্ত্তঞ্চামৃতঞ্চ স্থিতঞ্চ যচ্চ সচ্চ ত্যচ্চ" (২।৩।১)। অর্থাৎ ব্রহ্ম দ্বিবিধ—মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত, মর্ত্ত ও অমৃত, অস্থির ও স্থির, সৎ ও ত্যৎ। এই দ্বিবিধ ব্রহ্ম হইতেছেন—সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম। এই যে জীবজগৎ ইহা সগুণ ব্রহ্মের অভিব্যক্তি। এই বিষয় ছান্দোগ্য উপনিষদে—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্"—সমস্তই ব্রহ্ম, তাঁহা হইতে জগৎ জাত, তাঁহা দ্বারা জগৎ স্থিত এবং তাঁহাতেই জগৎ লীন—এই বাক্য দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু আবার "ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্" এক ব্রহ্মই আছেন, দ্বিতীয় কোন কিছুই নাই—এই উপনিষদ্-বাক্যে যে পূর্ব্বোক্ত দ্বিরূপ ব্রহ্মের বিরুদ্ধবাদ হইতেছে তাহা নহে, কারণ—"প্রতীতিমাত্রমেবৈতদ্ভাতি বিশ্বং চরাচরম্"—এই চরাচর বিশ্ব বাস্তবিক নাই, ইহা প্রতীতিমাত্র, "মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ" অর্থাৎ জগতকে মায়ামাত্র জানিবে, ইত্যাদি। কিন্তু চেতন জীবে ব্রহ্ম ওতপ্রোত হইয়া আছেন। ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে সম্বন্ধ এইরূপে বৃহদারণ্যকে উক্ত হইয়াছে—

"যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি।" (২।১।২০) অর্থাৎ যেমন অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গ সকল নির্গত হয়, সেইরূপ পরমাত্মা হইতে সমস্ত প্রাণ, সমস্ত লোক, সমস্ত দেবতা, সমস্ত ভূত (পঞ্চভূত নির্ম্মিত বিষয়) নির্গত হয়। অতএব সকল জীবই ব্রহ্মাংশ। যখন সেই জীবের ব্রহ্মজ্ঞান হয় তখন সে আর জীব থাকে না, ব্রহ্মে মিলিত হইয়া মায়ামুক্ত হয়। এই তত্ত্ব মুণ্ডকোপনিষদে রূপকের ভাষায় উপদিষ্ট হইয়াছে—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥

অর্থাৎ—জীবাত্মা ও পরমাত্মা দুইটি পক্ষিরূপে সর্ব্বদা সম্মিলিত, পরস্পর সখাভাবে দেহরূপ একই বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া আছেন। এই উভয়ের মধ্যে একজন অর্থাৎ জীব স্বাদু (কর্ম্ম) ফল ভোগ করেন, অপর-জন অর্থাৎ পরমাত্মা তাহা ভোগ করেন না, শুধুই দেখেন। একই বৃক্ষে পুরুষটি পরমাত্মভাবের অভাবে মোহে নিমগ্ন হইয়া শোক করেন, কিন্তু যখন তিনি অন্যজন অর্থাৎ পরমাত্মাকে দেখিতে পান তখন তাঁহার মহিমা অনুভব করিয়া শোকের অতীত হন।

উল্লিখিত আলোচনার পর স্বতঃই পরিদৃশ্যমান জগতের বিষয় আসিয়া পড়ে। ব্রহ্মের সিসৃক্ষা অর্থাৎ সৃষ্টির কামনা হইতে এই জগতের আবির্ভাব হইয়াছে, যথা—

"তৎ ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়"—ছান্দোগ্য।

"স অকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়"—তৈত্তিরীয়।

ব্রহ্মের এই ঈক্ষা বা কামনা তাঁহার সিসৃক্ষা। তখন—

"স্বস্মিন্ বিলীনং সকলং জগদাবির্ভাবয়তি।" অর্থাৎ, তিনি (ব্রহ্ম) আপনার মধ্যে বিলীন জগত আবির্ভাব করাইলেন।

"স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত, যদিদং কিঞ্চ তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ।"—তৈত্তিরীয়। তিনি তপ করিয়া এই সমস্ত সৃষ্টি করিলেন; জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন। অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাতে হারাইয়া গেলেন না। কিরূপ হইলেন ?—

"যস্তূর্ণনাভ ইব তন্তুভিঃ প্রধানজৈঃ স্বভাবতো দেব একঃ স্বমাবৃণোৎ।"—শ্বেতাশ্বতর। উর্ণনাভ যেমন জাল রচনা করিয়া নিজেকে আবৃত করে, সেই এক দেবতা স্বভাবহেতু, প্রকৃতিজাত জগজ্জালে নিজেকে আবৃত করিলেন। এইরূপে তিনি জড় ও জীবাত্মক সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করিলেন। এই কারণেই জীবসকল প্রকৃতিকবলিত হইয়া কর্ম্মবন্ধনে ঘুরিতে থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া কি তিনি নিজেকে প্রকৃতির মধ্যে হারাইয়া ফেলিলেন ? তাহা নহে।—

"তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ।"—ঈশ। তিনি সকলের অন্তরে থাকিয়াও সকলের বাহিরে আছেন। অতএব তিনি বিশ্বানুগ, অথচ বিশ্বাতিগ। গীতায়ও ভগবান এইরূপ উক্তি করিয়াছেন—

"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।" অর্থাৎ আমি একাংশ দ্বারা সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছি। কিন্তু নিরংশ ব্রহ্মের অংশকল্পনা কেবল বোধের সুবিধার জন্য। এরূপ বলার তাৎপর্য্য এই যে মায়া-উপহিত হইলেও প্রপঞ্চের সসীমতায় তাঁহার অসীমতা নিমজ্জিত হয় না। বিশ্বানুগ হইলেও তিনি বিশ্বাতিগ থাকেন।

বেদান্তের ব্রহ্ম আলোচনায় এই প্রবন্ধ আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু বেদান্তের সারমর্ম্ম হইতেছে—

"ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।" ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, এবং জীব ব্রহ্মই, অন্য কিছু নহে। ব্রহ্ম সত্য হইতে পারে কিন্তু জগৎ মিথ্যা কিরূপে! ইহা এই দৃষ্টান্তে বুঝান হইয়াছে, যথা—

"সৌম্যৈকেন লোহমণিনা সর্ব্বং লোহময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্
বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং লোহমিত্যেব সত্যম্।"
—ছান্দোগ্য।

অর্থাৎ হে সৌম্য! যেমন একখণ্ড স্বর্ণকে জানিলে সমস্ত স্বর্ণময় বস্তু জানা যায়, কারণ তাহারা স্বর্ণেরই বিকার এবং বাক্যের যোজনা সেই বিকারের নামকরণ মাত্র, স্বর্ণ ইহাই সত্য। বিবেচনা করিয়া দেখিলে সত্যই প্রতীতি হয় যে সুবর্ণ নানাভাবে কুণ্ডল, বলয়, প্রভৃতিতে প্রতিভাত হইতেছে। কাহারও রূপ কুণ্ডলাকৃতি, কাহারও রূপ বলয়াকৃতি; কাহারও নাম কুণ্ডল, কাহারও নাম বলয়। কিন্তু রাসায়নিকের চক্ষে ইহা কেবল নামরূপের ভ্রান্তি। বস্তুতঃ কুণ্ডলও নাই, বলয়ও নাই, আছে কেবল সুবর্ণ। সেইরূপ জগদাকারে বিবর্ত্তিত হইলেও এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুই আছেন। জগতের এই বিচিত্র বিষয়ভেদ—নদী, পর্ব্বত, বৃক্ষ লতা, পশু, মনুষ্য—ইহাদের কেবল পরস্পরের নাম-রূপের প্রভেদ; বস্তুতঃ কোন প্রভেদ নাই; কাহারও নাম নদী, কাহারও নাম পর্ব্বত; কাহারও রূপ এক প্রকার, কাহারও রূপ অন্য প্রকার। কিন্তু তাহা হইলেও তাহারা সব সেই ব্রহ্ম। যেমন হারে ও বলয়ে রূপের ভেদ থাকিলেও উভয়ই সুবর্ণ, সেইরূপ জাগতিক পদার্থসমূহের মধ্যে নামরূপের প্রভেদ সত্ত্বেও সকলেই ব্রহ্ম।

তাহাই যদি হয়, জগৎ যদি ব্রহ্মের বিবর্ত্ত হয় অর্থাৎ ব্রহ্মই যদি জগৎরূপে ভাত হইতেছেন ইহা হয় এবং সকল জীবই ব্রহ্মের রূপান্তরমাত্র, তাহা হইলে জগৎ যাঁহার ভান তাঁহাকে একবার জানিলে

আর জগতের ভান হইবে না, তখন জগৎ ভ্রান্তি তিরোহিত হইবে এবং সকল জীবই ব্রহ্মরূপে প্রতিভাত হইবে। যখন ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির ব্রহ্মদর্শন হয়, তখন তিনি আর কোন কিছু দর্শন করেন না; জগদ্ভ্রান্তি বিদূরিত হইয়া তত্ত্বদর্শী সমস্ত ব্রহ্মময় দেখেন—ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই দেখেন না। তখন তাঁহার মনের ও প্রাণের ভাব কবিগুরু ঋষি বাল্মীকির ভাষায় এইরূপ বর্ণনা করা যায়—

"জগতামাদিভূতস্ত্বং জগত্ত্বং জগদাশ্রয়ঃ।
সর্ব্বভূতেষ্বসংযুক্ত একো ভাতি ভবান্ পরঃ॥
দৃশ্যসে সর্ব্বভূতেষু মানুষেষু জীবেষু চ।
দিক্ষু সর্ব্বাসু গগনে পর্ব্বতেষু নদীষু চ॥
সহস্রচরণঃ শ্রীমান্ শতশীর্ষঃ সহস্রদৃক্।
ত্বং ধারয়সি ভূতানি পৃথিবীং সর্ব্বপর্ব্বতান্॥
আকাশবৎ ত্বং সর্ব্বত্র বহিরন্তর্গতোঽমলঃ।
অসঙ্গো হ্যচলো নিত্যঃ শুদ্ধো বুদ্ধঃ সদব্যয়ঃ॥"

—রামায়ণ (যুদ্ধকাণ্ড ১১৯-অধ্যায়)। "আপনি সকল জগতের আদি, আপনিই জগৎ এবং জগতের আশ্রয়স্বরূপ। পঞ্চভূতে আপনি সংযুক্ত না থাকিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে একাকী দীপ্তিমান হইতেছেন।

আপনাকে সকল ভূতে, মানুষে ও জীবে দেখা যাইতেছে এবং সকল দিকে, আকাশে, পর্ব্বতসকলে এমন কি প্রবহমাণ নদীসমূহেও আপনি দৃষ্ট হইতেছেন।

আপনার সহস্র চরণ, শত মস্তক, সহস্র চক্ষু কিন্তু তাহা হইলেও আপনি অপরূপ শ্রীমান। আপনি সকল ভূত, পৃথিবী ও পর্ব্বতসমূহকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

আপনি অনন্ত আকাশবৎ সুদূরবিস্তৃতরূপে অন্তরে ও বাহিরে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। আপনি নির্ম্মল, আসক্তিবিহীন, স্থির, নিত্য অর্থাৎ চিরকাল স্থায়ী, শুদ্ধ, জ্ঞানী, সৎ, বর্ত্তমান এবং ক্ষয়বিহীন!"

তখন মহর্ষি ব্যাসের শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্লোকানুসারে ভগবানের নিকট নিম্নলিখিতরূপে শরণাপন্ন হই—

"যস্মিন্নিদং যতশ্চেদং যেনেদং য ইদং স্বয়ম্।
যোঽস্মাৎ পরস্মাচ্চ পরস্তং প্রপদ্যে স্বয়ম্ভুবম্॥"

(৮।৩।৩)

"যাঁহাতে এই সমগ্র জগৎ সন্নিবেশিত রহিয়াছে, যাঁহা হইতে ইহার উৎপত্তি, যাঁহা দ্বারা ইহা বিধৃত, যিনি স্বয়ংই এই জগৎরূপে প্রতিভাত হইতেছেন, যিনি এই জগৎ এবং অপর সকল শ্রেষ্ঠ বস্তু হইতে শ্রেষ্ঠ সেই স্বয়ম্ভু শ্রীভগবানের প্রপন্ন হইতেছি।"

"যোঽন্তঃ প্রবিশ্য মম বাচমিমাং প্রসুপ্তাং
সংজীবয়ত্যখিলশক্তিধরঃ স্বধাম্না।
অন্যাংশ্চ হস্তচরণশ্রবণত্বগাদীন্
প্রাণান্নমো ভগবতে পুরুষায় তুভ্যম্॥"

—শ্রীমদ্ভাগবত (৪।৯।৬)

"যিনি আমার অন্তরে প্রবেশ করিয়া এই বাক্‌শক্তিকে জাগরিত করিয়াছেন, যিনি অখিল শক্তিধর এবং নিজশক্তি দ্বারা আমাকে সঞ্জীবিত রাখিয়া আমার অন্যান্য হস্ত, চরণ, শ্রবণেন্দ্রিয়, ত্বক্ ইত্যাদি ও প্রাণকে কার্য্যক্ষম করিয়াছেন সেই পরম পুরুষ ভগবানকে হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে প্রণাম করিতেছি।"

তখন তিনি এইরূপে সেই অক্ষর অদ্বয় ব্রহ্মকে স্মরণ করিতে থাকেন—

পরেশ প্রভো সর্ব্বরূপাবিনাশিন্
অনির্দ্দেশ্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্য সত্য।
অচিন্ত্যাক্ষর ব্যাপকাব্যক্ততত্ত্ব
জগদ্ভাসকাধীশ পায়াদপায়াৎ।

—(মহানির্ব্বাণতন্ত্র)

হে শ্রেষ্ঠ দেবতা, প্রভু! তুমি সর্ব্ব জগতের রূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছ, আর তোমার কখনও বিনাশ নাই। তোমাকে কোন রকমে নির্দ্দেশ করা যায় না ও তুমি সকল ইন্দ্রিয়ের অগম্য, অথচ তুমি সত্য। তুমি চিন্তার অগোচর এবং তোমার কোন ক্ষয় বা পরিবর্ত্তন নাই, তুমি সকল বস্তুতে অপ্রকাশিত মূলতত্ত্বরূপে সর্ব্বত্র ব্যাপকভাবে রহিয়াছ। হে জগতের অধীশ্বর! তুমি উহাকে উদ্ভাসিত করিয়া আছ। তুমি আমাদিগকে অনিষ্ট হইতে রক্ষা কর এই প্রার্থনা।

দেহস্তিষ্ঠতু কল্পান্তং গচ্ছত্বদ্যৈব বা পুনঃ।
ক্ব বৃদ্ধিঃ ক্ব চ বা হানিস্তব চিন্মাত্ররূপিণঃ॥

(অষ্টাবক্র সংহিতা)

হে দেহাভ্যন্তরবাসী আত্মন্! এই দেহ কল্পান্ত পর্য্যন্ত থাকুক অথবা অদ্যই চলিয়া যাউক, তাহাতে চিন্মাত্ররূপী তোমার কোথায়ই বা বৃদ্ধি আর কোথায়ই বা হানি হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ধর্মের আদর্শ ও অনুভূতি

শ্রীরমণীকুমার দত্ত গুপ্ত, বি-এল্

দক্ষিণেশ্বরের দেবমানব জগদ্গুরু ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নাম জয়যুক্ত হউক! তিনি জগতের নরনারীর সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধনের জন্য, উদ্‌ভ্রান্ত জীবকে সত্য, প্রেম, ধর্ম ও ন্যায়ের পথে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার অপার মহিমা কীর্তন করিতে যাইয়া বিশ্ববিশ্রুত স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "ভারতে এমন এক লোকোত্তর মহাপুরুষের আবির্ভাবের সময় উপস্থিত হইয়াছিল, যিনি একাধারে শঙ্করের অদ্ভুত প্রতিভা ও চৈতন্যের অদৃষ্টপূর্ব্ব বিশাল হৃদয়বত্তার অধিকারী হইবেন—যাঁহার মধ্যে এই উভয়ের মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের অমূল্য সম্পদরাজি একাধারে বিরাজমান থাকিবে; যিনি দেখিবেন সকল সম্প্রদায় সেই একই আত্মা—সেই একই ঈশ্বরের শক্তিতে অনুপ্রাণিত,—ব্রহ্ম হইতে কীট পরমাণু সর্ব্বভূতে সেই একই আত্মা নিত্য বিদ্যমান,—যাঁহার বিশাল হৃদয় ভারত তথা ভারতেতর সকল দেশের দরিদ্র ও দুর্ব্বল, ঘৃণিত ও পতিতের দুঃখে বিগলিত হইয়া উঠিবে; অথচ যাঁহার সুতীক্ষ্ণ বিশাল বুদ্ধি এমন মহৎ তত্ত্বসমূহের উদ্ভাবন করিবে, যাহা ভারতীয় তথা ভারত-বহির্ভূত সকল বিরোধী সম্প্রদায়ের মধ্যে অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধন করিয়া হৃদয় ও মস্তিষ্কের পূর্ণ পরিণতিসূচক এক সার্ব্বভৌম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করিবে। ভারতে এরূপ এক মহাপুরুষের আবির্ভাবের শুভ সন্ধিক্ষণ হইয়াছিল—বলা বাহুল্য, ভারত-কৃষ্টির মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণদেবই সেই লোকোত্তর মহাপুরুষ।"

পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেব আজ সর্বত্র পূজিত হইতেছেন—কেবল ভারতবর্ষে নহে, ভারতের বাহিরে ইউরোপ, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা ও এসিয়ার সর্বত্র তাঁহার গুণানুকীর্তন হইতেছে, তাঁহার জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হইতেছে এবং তাঁহার কথামৃত পানে ভবরোগগ্রস্ত শান্তিকামী তৃষ্ণার্ত নরনারী পরিতৃপ্ত হইতেছেন। ঈদৃশ অলোকসামান্য মহাপুরুষের একাদশাধিকশততম শুভজন্মতিথি উপলক্ষে আমরা তাঁহার পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে আমাদের ভক্তি-বিনম্র প্রণতি নিবেদন করিতেছি এবং প্রার্থনা করি তাঁহার অপূর্ব সরলতা, গভীর প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস, বিবেক ও বৈরাগ্য, ভগবদ্দর্শনের নিমিত্ত তীব্র ব্যাকুলতা ও কঠোর তপশ্চর্যা, অপ্রমেয় লোক-হিতৈষণা, নারীজাতির প্রতি অনন্যসুলভ ভক্তি-শ্রদ্ধান্বিত মাতৃ-ভাব, সকল ধর্ম, সকল মত ও সকল পথের প্রতি অদৃষ্টপূর্ব শ্রদ্ধা, উদারতা ও সহিষ্ণুতা আমাদের সকলের হৃদয় গভীরভাবে স্পর্শ করুক।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ধর্ম ও দর্শন ঈশ্বরের প্রত্যক্ষানুভূতির সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভই তাঁহার ধর্মের আদর্শ ও উদ্দেশ্য; এজন্যই তাঁহার ধর্ম অতীব কার্যকর, বাস্তব ও সার্বভৌম। শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট ধর্ম কেবলমাত্র কতকগুলি সুন্দর উপদেশ, উপাদেয় বাণী, মতবাদ, আচার, অনুষ্ঠান, পূজাপদ্ধতি নহে—এগুলি ধর্মের বহিরঙ্গ, গৌণবস্তু মাত্র। তাঁহার নিকট ঈশ্বরের অপরোক্ষানুভূতিই প্রকৃত ধর্ম। শাস্ত্র-পাঠ ও শ্রবণ, বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা কোন

তত্ত্বের স্বীকৃতিকেই তিনি ধর্ম মনে করিতেন না; স্বীয় জীবনে আচরণ করিয়া, সাধন করিয়া সত্য-স্বরূপ ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভকেই তিনি প্রকৃত ধর্ম মনে করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের এই অলৌকিক ধর্মাচরণ ও সাধনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে গিয়া মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন, "আচরণের মধ্য দিয়া ধর্মের অভিব্যক্তি আমরা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াছি শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের দিব্য জীবনে। তাঁহার জীবনের পূত-সংস্পর্শে আসিলেই আমরা ভগবানকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিবার শক্তি খুঁজিয়া পাই। তাঁহার জীবন-বেদ পাঠ করিলে নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারা যায় যে ভগবানই একমাত্র সত্যবস্তু। আর সবই অনিত্য মায়া। দেবত্বেরই মূর্ত ও জীবন্ত পরিপ্রকাশ শ্রীরামকৃষ্ণদেব। তাঁহার উপাদেয় বাণীগুলি তাঁহার জীবন-বেদের একখানা পাতা, শুষ্ক পাণ্ডিত্যের উচ্ছ্বাস মাত্র নহে। তিনি জীবনে যাহা উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন তাঁহার বাণীর ভিতর দিয়া। কাজেই তাঁহার বাণী পাঠক-পাঠিকার মনের উপর স্থায়ী রেখাপাত করে। এই সন্দেহ ও অবিশ্বাসের যুগে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভগবদ্বিশ্বাসের এক অত্যুজ্জ্বল ও জীবন্ত আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ইহা কোটি কোটি নরনারীর জীবনে শান্তির বারি সিঞ্চন করিয়া দিয়াছে। তাহা না হইলে আধ্যাত্মিক জীবনের আস্বাদ লাভ করিবার সুযোগ তাহারা পাইত না। অসীম ছিল তাঁহার ভালবাসা—ভৌগোলিক বা অন্য কোন সীমার বন্ধনে তাহা আবদ্ধ ছিল না।"

প্রাচীন বৈদিক ঋষির মতো শ্রীরামকৃষ্ণদেব আধুনিক যুগের সংশয়বাদী বৈজ্ঞানিক মনোভাবাপন্ন ইহসর্বস্ব লোকগণকে তাঁহার অনুভূতিলব্ধ বাণী অনুসরণ করিতে আহ্বান করিয়াছেন। তাঁহার অভয় বাণী এই :—"আমি ভগবানকে দর্শন করেছি, সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করেছি। হে অমৃতের সন্তানগণ, তোমরাও ভগবানকে উপলব্ধি কর, সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ কর। কেবলমাত্র ভগবানকে জেনেই তোমরা অমৃতত্ব লাভ করবে। ইহা ব্যতীত জন্ম-মৃত্যুর হাত হ'তে মুক্ত হ'বার অন্য কোনো উপায় নেই। ভগবানের স্মরণ-মনন-নিদিধ্যাসন করতে হ'বে, তাঁকে দর্শন করতে হ'বে, জানতে হ'বে, তাঁর প্রত্যক্ষানুভূতি লাভ করতে হ'বে। ভগবানকে জানলে, দর্শন করলে, উপলব্ধি করলে জগতের সমস্ত বস্তুকেই জানতে ও দেখতে পারা যায়। কতকগুলি মত বা শ্লোক মুখস্থ করার নাম ধর্ম নহে। শাস্ত্র কত পড়বে? শুধু বিচার করলে কি হ'বে? আগে তাঁকে লাভ করবার চেষ্টা কর। বই পড়ে ঠিক অনুভব হয় না। অনেক তফাৎ। তাঁকে দর্শনের পর শাস্ত্র, সায়েন্স সব খড়কুটো বোধ হয়। বড় বাবুর সঙ্গে আলাপ দরকার। যো সো ক'রে বড় বাবুর সঙ্গে একবার আলাপ কর। সাধন চাই। ঈশ্বর আছেন ব'লে ব'সে থাকলে হ'বে না। তাঁর কাছে যেতে হ'বে। নির্জনে তাঁকে ডাকো, প্রার্থনা করো। ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদো। কাঁদার মত কাঁদলে তাঁকে দেখতে পাবে।"

আধুনিক মানুষ ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই অতিশয় সন্দিহান্। ভগবানের অস্তিত্ব কেবল যুক্তি-তর্কদ্বারা প্রমাণিত হইতে পারে না। প্রত্যক্ষানুভূতির দ্বারাই ভগবানের অস্তিত্ব সংশয়াতীতরূপে প্রমাণিত হয়। এজন্যই শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "তুমি যতই ভগবানের নিকটবর্তী হ'বে, ততই তোমার জিজ্ঞাসা ও যুক্তি-তর্কের নিবৃত্তি হ'বে। যখন তুমি ভগবান্‌কে লাভ করবে, বাস্তবসত্তারূপে তাঁকে দর্শন করবে, তখনই তোমার সমস্ত কোলাহল ও বাগ্‌বিতণ্ডার পরিসমাপ্তি হ'বে, তখনই পরমানন্দ উপভোগ করবে। এই পরমানন্দ ভগবানের সহিত সাক্ষাৎসংযোগজনিত সমাধি হ'তেই লাভ হয়।

আমি সেই সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরকে বাস্তবসত্তারূপে আমার চোখের সাম্‌নেই দর্শন করি। আমি তবে বিচার, যুক্তি ও তর্কের আশ্রয় গ্রহণ করব কেন? ভগবানকে জড় চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না। সাধনার ফলে প্রেমের চক্ষু ও কর্ণযুক্ত প্রেম-দেহ গঠিত হয়। এই প্রেমের চক্ষু ও কর্ণদ্বারাই আমরা ভগবানকে দেখি ও তাঁহার কথা শুনি। এই প্রেমের দেহদ্বারাই আত্মা ভগবানের সহিত রমণ করেন। ভগবানের প্রতি প্রগাঢ় প্রেম ব্যতীত ইহা সম্ভবপর হয় না। আমরা যদি রাত্রিদিন তাঁর স্মরণ-মনন করি, নিশ্চয়ই তাঁকে সর্বত্র দেখতে পাব।"

সুগভীর সাধনা ও তপস্যার দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বয়ং যে অমৃতের সাগরে অবগাহন করিয়াছেন, সেই অমৃতের সাগরের পথ তিনি জগদ্‌বাসিগণকে সুস্পষ্টরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। এই অমৃতের সাগরে ডুব দিবার জন্য তিনি সকলকে আহ্বান করিয়াছেন। এই সাগরের জলে ডুব দিলে মৃত্যু হয় না। ইহা অনন্তজীবনের জল। এই অমৃতের সাগর হইতে সচ্চিদানন্দ অমৃত পান করিবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব আমাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "মানব-জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর দর্শন, ঈশ্বর উপলব্ধি। প্রথমতঃ তাঁকে দর্শন কর, উপলব্ধি কর, তার-পর তাঁর বাণী শুনতে পাবে। তিনি তোমার নিকট কথা বলবেন এবং ইচ্ছা করলে তোমাকে আদেশ দিবেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই বলিয়া সংশয়বাদিগণকে সাবধান করিয়াছেন, "যেহেতু তোমরা অজ্ঞান-বশতঃ ভগবানকে দেখতে পাচ্ছ না, তাই বলে ভগবান্ নেই একথা বলো না।"

ধর্মের ইতিহাসে জগদ্‌গুরু ধর্মাচার্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত নরেন্দ্রনাথ দত্তের (পরে স্বামী বিবেকানন্দ) সাক্ষাৎকার একটি যুগপ্রবর্তনকারী প্রসিদ্ধ ঘটনা। ইহা প্রকৃত পক্ষেই সচ্চিদানন্দ-সাগরে সতত নিমগ্ন সত্যদ্রষ্টা দেবমানব পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত সংশয়বাদী ও অজ্ঞেয়বাদী নরেন্দ্রের ইতিহাস-প্রখ্যাত মিলন। সংশয়বাদী, যুক্তিবাদী ও বুদ্ধিজীবী নরেন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি ভগবান্‌কে বিশ্বাস কর? সত্যসত্যই তাঁকে দেখেছ? তাঁর অস্তিত্ব সংশয়াতীতরূপে প্রমাণ করতে পার?" শ্রীরামকৃষ্ণদেব সুস্পষ্টরূপে, দ্ব্যর্থহীনভাবে ও ক্ষিপ্রতার সহিত উত্তর করিলেন, "হাঁ, আমি ভগবান্‌কে দেখেছি। তোকে যেম্‌নি স্পষ্টরূপে চোখের সাম্‌নে দেখছি, তদপেক্ষা আরও স্পষ্টতররূপে ভগবান্‌কে দেখতে পাই। শুধু তাই নয় আমি তোকে দেখাতে পারি এবং প্রত্যক্ষানুভূতিলাভে সাহায্য করতে পারি।" শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নির্ভীক ও সুস্পষ্ট ঘোষণা বিদ্যুৎপ্রবাহের মতো প্রত্যক্ষ শক্তি ও উদ্দীপনা সঞ্চারক হইয়াছিল। গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য-স্পর্শে শিষ্য নরেন্দ্রের ভিতর আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চারিত হইল। ফলে মুহূর্তমধ্যে নরেন্দ্রের সমস্ত সন্দেহ, জিজ্ঞাসা ও অবিশ্বাসের আত্যন্তিক নিরসন হইল এবং শিষ্য উপলব্ধি করিলেন যে মত-পথ, আচার-অনুষ্ঠান, পূজা-অর্চনা, যাগ-যজ্ঞ, পুঁথি-দেবালয় ধর্মের গৌণ বহিরঙ্গ মাত্র; ঈশ্বর-দর্শন, ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ, ঈশ্বরের প্রত্যক্ষানুভূতিই ধর্মের যথার্থ উদ্দেশ্য; ভগবানের অপরোক্ষ উপলব্ধি দ্বারাই কেবল তাঁহার অস্তিত্ব নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নির্ভীক উক্তি ও দিব্য শক্তি সঞ্চার দ্বারা প্রকৃতপক্ষেই চৈতন্যের নিকট জড়ের, প্রত্যাদেশ-বাণীর নিকট বুদ্ধিমত্তার, প্রত্যক্ষানুভূতির নিকট যুক্তি-তর্ক-বিচারের, সত্যদ্রষ্টা ঋষির নিকট সংশয়বাদীর আত্মসমর্পণ সূচিত হইয়াছিল। ইহা প্রকৃতপক্ষেই একজন নিরক্ষর হিন্দু মহাযোগী ও তাপস, আত্মজ্ঞানসম্পন্ন সমাধিবান্ মহাপুরুষ,

বিদেশীভাব ও শিক্ষার লেশ মাত্রহীন ব্রহ্মজ্ঞ ঋষির পদতলে অজ্ঞেয়বাদ, সংশয়বাদ, যুক্তিবাদ, নাস্তিক্যবাদ, জড়বাদ, ভোগবাদ, ও অন্যান্য অনিষ্টকর ইহসর্বস্ববাদসমূহের দুর্গস্বরূপ কলিকাতা নগরীর এক সুশিক্ষিত মেধাবী উদীয়মান শ্রেষ্ঠ যুবকের আত্মবিক্রয় ও প্রণতিস্বীকার সূচিত হইয়াছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্যস্পর্শ, দিব্যদৃষ্টি, দিব্য-ইচ্ছা, দিব্য চিন্তা বা দিব্য শক্তি সঞ্চারের অমিত প্রভাবে স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় তাঁহার অন্যান্য মহান্ শিষ্যগণও নিজ নিজ সামর্থ্যানুসারে উচ্চ আধ্যাত্মিক অনুভূতি (সমাধি) লাভে ধন্য হইয়াছিলেন। পরমহংসদেবের অন্যতম শিষ্য মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দজী তাঁহার সমাধিলব্ধ উচ্চ আধ্যাত্মিক অনুভূতির কথা ফরাসীদেশীয় মনীষী রোমাঁ রোলাঁকে বলিতে গিয়া লিখিয়াছিলেন, "প্রথম দিন শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিতে গিয়া দেখিলাম তিনি গভীর সমাধিমগ্ন হইয়াছেন। আমি আমার হৃদয়ের অন্তস্তলে অনুভব করিলাম যে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সত্যসত্যই ঈশ্বরকে দর্শন করিয়াছেন, ঈশ্বরের প্রত্যক্ষানুভূতি লাভ করিয়াছেন। আমি চিরদিনের জন্য তাঁহার শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিলাম। প্রভুর জীবদ্দশায় দুইবার তাঁহার দিব্যস্পর্শ ও ইচ্ছায় আমি সমাধিযোগে সেই উচ্চ আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভের অধিকারী হইয়াছিলাম।"

মহান্ শিষ্য বিবেকানন্দ মহান্ শ্রীগুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বর্তমান্ যুগের উপযোগী এক বিজ্ঞান-সম্মত, যুক্তিমূলক ও মানবকল্যাণবিধায়ক ধর্ম প্রচার করিয়াছেন। ফলে বিবেকানন্দ-প্রচারিত ধর্ম যে কেবল মাত্র প্রাচ্যদেশেই সর্বজনগ্রাহ্য হইয়াছে তাহা নহে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, যুক্তিবাদ, মানব-কল্যাণ ও বস্তুতন্ত্রের উপাসক পাশ্চাত্যবাসিগণের নিকটও উহা সমধিক আদরণীয় ও গ্রহণীয় হইয়াছে। ধর্মের নামে সর্বপ্রকার কুহেলিকা, রহস্য, মিথ্যাভয়, প্রলোভন, প্ররোচনা, দুর্বোধ্য গূঢ় ও গুপ্ত ভাব-সকল সর্বথা পরিবর্জন করিয়া শিষ্য বিবেকানন্দ আত্মানুভূতি, মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ সত্যের সাক্ষাৎকারকেই ধর্মের সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য ও আদর্শ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন।

বিজ্ঞান প্রত্যক্ষদর্শন ও পরীক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত —বিজ্ঞানের এই অপরিহার্য দাবী সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন। মহাজনবাক্য, ঋষিগণ-প্রদর্শিত অনুশাসন ও সাধনপ্রণালীসকল জীবনে আচরণ, অনুসরণ ও পরীক্ষা করিয়া সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও তদীয় শিষ্য বিবেকানন্দ সকলকে আহ্বান করিয়াছেন। প্রত্যেক মানুষই স্বরূপতঃ ঈশ্বর; জীবনের উদ্দেশ্য অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতি দমন করিয়া অন্তর্নিহিত ব্রহ্মত্বের বিকাশসাধন। এই আত্ম-বিকাশের কাজ সম্পন্ন করিতে হইবে নিষ্কাম কর্ম, ভক্তি, যোগ ও জ্ঞানের দ্বারা। এই আত্মবিকাশলাভ বা আত্মসাক্ষাৎকারই মুক্তি। ধর্ম বলিতে ইহাই সব। বেদান্তপ্রতিপাদ্য এই ধর্মই শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচার করিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব মুহুর্মুহুঃ সমাধিমগ্ন থাকিলেও ত্রিতাপদগ্ধ জীবের অশেষ দুঃখ, দুর্গতি, ক্লেশ যাতনার প্রতি উদাসীন ছিলেন না। জীবের দুঃখ, দুর্গতি দেখিয়া তাঁহার বিশাল করুণ হৃদয় ব্যথিত হইত। তিনি ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে জনগণের দুঃখ দূর করিতে সচেষ্ট হইতেন। তিনিই তাঁহার বিবেকানন্দপ্রমুখ শিষ্যগণকে 'শিবজ্ঞানে জীব সেবা'র আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন।

দরিদ্র, পদদলিত, আর্ত, নিপীড়িতজনগণই ছিল তাঁহার ঈশ্বর। দেহের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান ও বিষয় সম্ভোগের প্রকৃষ্ট সুযোগ প্রদান করিয়াই আমরা মানুষের প্রতি শ্রেষ্ঠ কর্তব্য সম্পাদন করি না। মানুষকে তাহার অন্তর্নিহিত দেবত্বের সন্ধান দিতে

হইবে। মানুষ যে অমৃতের সন্তান এ বিষয়ে তাহার চেতনা জাগ্রত করিতে হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেবাধর্মের মূলমন্ত্র এই—"প্রথমে নিজে ঈশ্বর হও, তৎপর অপরকে ঈশ্বর করিও। নিজের ভিতর ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া জীবনের সর্ব ক্লেশ, দুঃখ, দ্বন্দ্ব ও বন্ধন হইতে বিমুক্ত হও এবং অপরকেও তদ্রূপ হইতে সাহায্য কর।" এই নর-নারায়ণবাদ বা শিবজ্ঞানে জীবসেবার আদর্শ প্রচার করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার ধর্মে মানবকল্যাণ বা সেবার যথোপযুক্ত স্থান ও মর্যাদা দিয়াছেন।

সর্বধর্মসাধন ও সর্বধর্মসমন্বয় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ধর্মের আর একটি অদৃষ্টপূর্ব ও বিশিষ্ট দিক। সকল ধর্মের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল—তিনি জীবনে কখনও কোন ধর্মের নিন্দা করেন নাই। আমার ধর্ম সত্য, অপরের ধর্ম মিথ্যা—এই মতুয়ার বুদ্ধি, গোঁড়ামি, ধর্মান্ধতা ও একদেশী ভাবের লেশ মাত্র শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মে নাই। সকল ধর্মই সত্য, প্রত্যেক ধর্মের মধ্য দিয়াই সত্যস্বরূপ ভগবানের নিকট পৌছান যায়, 'যত মত তত পথ'—ইহাই শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মসমন্বয়-বাণী। তাঁহার এই সার্বভৌম উদার দৃষ্টি সাধনা-লব্ধ প্রত্যক্ষানুভূতির উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি সব ধর্ম—হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, শাক্ত, বেদান্ত, বৈষ্ণব, শৈব একবার করিয়া সাধন করিয়াছিলেন এবং প্রত্যেক পথেই সেই চরম উদ্দেশ্য ঈশ্বরের নিকট পৌছিয়াছিলেন। ঈশ্বর এক; তাঁহার অনন্ত নাম, ও অনন্ত ভাব, তাঁহাকে জানিবার অনন্ত পথ। আন্তরিক হইলে সকল পথ দিয়াই তাঁহাকে জানা যায়—ইহাই তাঁহার অনুভূতি-লব্ধ ঘোষণা। শ্রীরামকৃষ্ণের এই বিভিন্ন ধর্মমত ও আদর্শের অন্তর্নিহিত সত্যের প্রত্যক্ষানুভূতি এবং আপাতবিরুদ্ধ ধর্মমত ও ধর্মাদর্শের মধ্যে কোনও প্রকার অসামঞ্জস্য না দেখিয়া সর্বমত সর্বপথ ও সর্ব আদর্শকে সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া গ্রহণই তাঁহার ধর্মসমন্বয়কে একাধারে অভূতপূর্ব, বিশিষ্ট ও মানবজাতির ভাবী কল্যাণের হেতুভূত করিয়া তুলিয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের এই ধর্মসমন্বয় সাধনের অনন্যসাধারণত্ব ও মৌলিকত্বের মহিমা কীর্তন করিতে গিয়া শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন, "শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবনে আমরা এক বিরাট আধ্যাত্মিক শক্তির খেলা দেখিতে পাই। এই শক্তির প্রভাবে তিনি সোজাসোজি প্রথমেই শ্রীভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিলেন, মনে হয় যেন জোর করিয়া স্বর্গরাজ্য অধিকার করিলেন। তৎপর একে একে সমস্ত যোগমার্গ অনুসরণ করিয়া এবং অতি ক্ষিপ্রতার সহিত প্রত্যেক যোগসাধনের অন্তর্নিহিত সত্য উপলব্ধি করিয়া প্রেম, স্বতঃস্ফূর্ত আধ্যাত্মিকতা, জ্ঞান ও প্রত্যক্ষানুভূতির সাহায্যে সর্বদাই সেই চরম উদ্দেশ্য ভগবানের শ্রীচরণে পৌছিয়াছিলেন। এরূপ সমন্বয়সাধন অনন্যসাধারণ। পাশ্চাত্য মনীষী রোমাঁ রোলাঁও শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক অনুভূতির বিশালতা, গভীরতা, ও ব্যাপকত্বে মুগ্ধ হইয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়াছেন, "যুগাচার্য মহাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ ভারতীয় সকল মহাপুরুষের পূর্ণ প্রকাশরূপ। তিনি শত কোটি লোকের দুই সহস্র বৎসরের আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্ণ পরিণতিরূপে প্রকট হইয়াছিলেন। পরমহংসদেবের মহাপ্রেম এবং বিবেকানন্দের বলবান্ বাহুতে মানবজাতির মধ্যে প্রচলিত সকল দেবতার, সত্যের, সকল প্রকার অভিব্যক্তির এবং সকল মানবীয় স্বপ্নের যেরূপ মধুর সমাবেশ ও গ্রহণ দৃষ্ট হয় এরূপ কোন যুগের ধর্মভাবে আর কোথাও দেখি নাই। যাঁহারা ঈশ্বরবিশ্বাসী, যাঁহারা স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করেন কিন্তু অকপটচিত্তে তত্ত্বান্বেষী, যাঁহারা সাকারবাদী, যাঁহারা অজ্ঞেয়বাদী, যাঁহারা বুদ্ধিজীবী এবং যাঁহারা নিরক্ষর—সকলের নিকটই শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ বিশ্বভ্রাতৃত্বের মহতী বাণী বহন করিয়া আনিয়াছেন।"

মহাকবি নবীনচন্দ্র স্মরণে

শ্রীনকুলেশ্বর পাল, বি-এল্

আজি হ'তে শতবর্ষ আগে
যে দীপ জ্বালিয়া গেছ দুর্ভাগা দেশের পুরোভাগে
আজো তার জ্যোতিচ্ছটা দিকে দিকে হয় বিকিরণ,
মরণ তাহারে হায় পারেনি কো করিতে হরণ
মৃত্যুর সমাধিবক্ষে কীর্ত্তি সে অক্ষয়
তেজদৃপ্ত সমুজ্জ্বল বহ্নিসম চির জ্যোতির্ম্ময়।
স্বাধীনতা মুক্তিমন্ত্র লিখে গেছ স্বদেশের ভালে,
পরাধীনতার জ্বালা মর্ম্মে মর্ম্মে সবারে বুঝালে।
রক্তে রাঙ্গা পলাসীর বক্ষ আজি করে হাহাকার,
স্বাধীনতা সূর্য্য বুঝি এ ভারতে উদিবে না আর!
কোথায় মোহনলাল কোথা সেই বীরেন্দ্রকেশরী
শেষ রক্তকণা যেই নিঃশেষিয়া বিসর্জ্জন করি
লাল করি দিয়েছিল পলাসীর এ আম্র-কানন;
তারি সাথে দিল প্রাণ বাঙ্গালী সেনানী অগণন।
মুক্তিকামী ছিল তারা—স্বাধীনতা ছিল শুধু পণ,
স্বদেশের মুক্তি লাগি করেছিল দুর্জ্জয় সে রণ।
বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের কলঙ্কের কালি,
বাংলার শুভ্রভালে নিজ স্বার্থ লাগি দিল ঢালি।
ভারতের ভাগ্যলক্ষ্মী চির তরে হ'ল অস্তমিত,
অদৃষ্টের পরিহাসে এ ভারত হল শৃঙ্খলিত।
তোমার লেখনি মুখে আজো হায় সে কলঙ্করাশি,
চিতার অনল সম পলাসীতে উঠিছে উদ্ভাসি।
বাংলার সিংহাসন বহে নাই পরাজয়-গ্লানি,
ভূলুণ্ঠিত করিয়াছে ঘাতকেরা তীক্ষ্ণ খড়্গ হানি।
বাংলার ঘরে ঘরে উমিচাঁদ আজো মীরজাফর,
বান্ধবের ছদ্মবেশে বক্ষে হানে অস্ত্র-খরতর।
ভুলি নাই পলাসীরে—তোমারেও ভুলিব না কবি!
প্রতিবিন্দু রক্তমাঝে রাখিয়াছি আঁকি তব ছবি।

দক্ষিণ-ভারতের শৈবতীর্থ

স্বামী দিব্যাত্মানন্দ

ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চভূতে পৃথিবীর সৃষ্টি। পঞ্চভূতের নামে পাঁচটী মন্দিরসহ দক্ষিণ-ভারতে সর্ব্বসমেত ১০৮টী শিবমন্দির আছে। ইহাদের মধ্যে পাঁচটী মন্দির প্রধান এবং তন্মধ্যে চিদাম্বরম্ সর্ব্বপ্রধান। এই পাঁচটী মন্দির তামিলনাদের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত। যে সকল জেলায় তামিল ভাষার প্রচলন আছে, সে সকল জেলার সমষ্টিকে তামিলনাদ বলে। তামিল ভাষায় দেশ নাদ শব্দে অভিহিত। উক্ত পাঁচটী মন্দির নিম্নলিখিত স্থানে অবস্থিত: কাঞ্চী, ত্রিচিনাপল্লী তিরুভেন্নামালাই, কালহস্তী ও চিদাম্বরম্। তামিল ভাষায় মন্দিরকে কোবিল বা কোয়িল বলে। সাধারণত: শৈব সম্প্রদায়ের লোকেরা কোবিল বলিলে চিদাম্বরম্‌কেই বুঝিয়া থাকে। প্রত্যেক জায়গায় শিব ও পার্ব্বতীর নাম আলাদা এবং পঞ্চভূতের নামের বিশেষত্ব দেখা যায়। সকল জায়গায়ই একটী করিয়া স্থলবৃক্ষ আছে।

কাঞ্চী

কাঞ্চীর বর্ত্তমান নাম কাঞ্চীভরম্। ইহা শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চী নামে দুই ভাগে বিভক্ত। শিবকাঞ্চীতে শিব পৃথীলিঙ্গরূপে বিরাজিত। এই মূর্ত্তিটী বালুকাদ্বারা নির্ম্মিত। এখানকার শিবের নাম একাম্বরেশ্বর। বিষ্ণুকাঞ্চীতে চতুর্ভুজ বিষ্ণু-মূর্ত্তি আছে। এখানকার স্থলবৃক্ষের নাম আম্রবৃক্ষ।

ত্রিচিনাপল্লী

ত্রিচিনাপল্লী শহরের উত্তরাঞ্চলে কাবেরী নদীতীরে শ্রীরঙ্গম্ অবস্থিত। এই স্থানের শিবলিঙ্গের নাম অপলিঙ্গ। এই লিঙ্গমূর্ত্তি হইতে অবিরত জল নির্গত হইতেছে। শিবের নাম জম্বুকেশ্বর। দেবীর নাম অখিলাণ্ডেশ্বরী। স্থলবৃক্ষের নাম জম্বুবৃক্ষ। এই স্থলবৃক্ষের নামানুসারেই শিবের নাম জম্বুকেশ্বর। এই মন্দিরের অপর নাম তিরুভালাই কোবিল। তিরু = শ্রী, ভালাই = হস্তী, কোবিল = মন্দির অর্থাৎ শ্রীহস্তী মন্দির। ইহার সম্বন্ধে একটী ঘটনা আছে: জনৈক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ একটী জম্বুবৃক্ষ-তলে বসিয়া নিত্য শিবের আরাধনা করিতেন। একদিন তিনি গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হন। পাছে কেহ তাঁহার ধ্যানের ব্যাঘাত ঘটায়, সেই নিমিত্ত একটী বন্য হস্তী আসিয়া সেই বৃক্ষের নীচে থাকিয়া পাহারা দিত। ঐ বৃক্ষই স্থলবৃক্ষ নামে অভিহিত। এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া মন্দিরের অপর নাম হয় তিরুভালাই কোয়িল। ইহা হইতেই দক্ষিণ-ভারতের প্রায় সকল বড় বড় মন্দিরে হাতী রাখিবার প্রচলন হইয়াছে। এই ঘটনার নিদর্শন-স্বরূপ এখনও উক্ত মন্দিরের গোপুরমের প্রধান ফটকের উপরে প্রস্তরে অঙ্কিত একটী বৃক্ষের নীচে জনৈক ব্রাহ্মণ ধ্যানরত, এবং উহার পার্শ্বে একটী হস্তী দণ্ডায়মান দেখিতে পাওয়া যায়।

তিরুভেন্নামালাই

এই স্থানের শিবলিঙ্গের নাম তেজলিঙ্গ। মন্দিরের নিকটবর্ত্তী পাহাড়ের উপরে শ্যামাপূজা বা দীপালীর সময় তিন দিন অহর্নিশি একটী মশাল জ্বলিতে থাকে। ইহাই এই শিবের

তেজরূপের প্রতীক। শিবের নাম অরুণাচলেশ্বর। দেবীর নাম অপিতাকুচাম্বিকা।

কালহস্তী

এই স্থানের শিবলিঙ্গের নাম মরুৎ বা বায়ুলিঙ্গ। বায়ুরূপের কোন বিশেষত্ব নাই। শিবের নাম কালহস্তীশ্বর। দেবীর নাম জ্ঞানপুঙ্গোধাই। ইহা তামিল নাম। জ্ঞান=তত্ত্বজ্ঞান, পুং=পুষ্প, গোধাই=বালিকা। যে বালিকা জ্ঞানপুষ্পস্বরূপা। এই স্থানের স্থলবৃক্ষের নাম বিল্ববৃক্ষ। শিবের নামানুসারেই এই জায়গার নাম কালহস্তী। দক্ষিণ-ভারতের শৈব সম্প্রদায়ের কতিপয় সিদ্ধ-মহাপুরুষ এই স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ বিল্ববৃক্ষ-মূলে অনেকে শিবের দর্শন পাইয়াছিলেন।

এই মন্দির সম্বন্ধে একটি উপাখ্যান আছে: পুরাকালে কালহস্তীর পাহাড়টী গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। এই জঙ্গলের মধ্যে একটী বিল্ব-বৃক্ষের নীচে এই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল। নিকট-বর্ত্তী গ্রামের জনৈক পূজারী ব্রাহ্মণ নিত্য সেই শিবের পূজা করিতেন। তিন্নাশার নামে জনৈক ব্যাধও ঐ গ্রামে বাস করিতেন। তিনি ছেলেবেলা হইতেই শিবের ভক্ত ছিলেন। তিনি রোজই শিকারের পর সেই থানে কতকটা মাংস পোড়াইয়া খাইতেন এবং অবশিষ্ট মাংস নিশাবসানে বাড়ীতে আনিয়া রান্না করিয়া খাইতেন। একদিন তিনি জঙ্গলে শিকারের উদ্দেশ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে ঐ বিল্ববৃক্ষের তলদেশে এই শিবলিঙ্গ দেখিতে পান এবং নিত্য যে তাঁহার পূজা হইতেছে তাহাও বেশ বুঝিতে পারেন। এই সকল দেখিয়া তাঁহার সুপ্ত শিবভক্তি জাগিয়া উঠিল এবং তিনি প্রণাম করিলেন। তিনি সংকল্প করিলেন যে, নিত্য শিবের দর্শন করিবেন এবং সকলই শিবকে নিবেদন করিয়া খাইবেন। পরদিন হইতে রোজই শিকারের পর ব্যাধ এই স্থানে আসিয়া বনের পুষ্প ও পাত্রের অভাবে মুখে করিয়া নিকটবর্ত্তী হ্রদ হইতে জল আনিয়া শিবের মাথায় দেন ও মাংস পোড়াইয়া নিবেদন করেন। পরে প্রসাদ পরম তৃপ্তি-সহকারে গ্রহণ করিয়া আনন্দ চিত্তে নিজের পর্ণ কুটিরে ফিরিয়া যান। কিছু-দিন এই ভাবে চলিতে লাগিল। পূজারী রোজই আসিয়া চারিদিক অপরিষ্কার ও রক্তমাংসের চিহ্ন দেখিতে পান কিন্তু কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া নিজেই পরিষ্কার করিয়া নিত্য পূজা করিয়া যান। একদিন পূজান্তে পূজারী দূরে ঝোপের আড়ালে দাঁড়াইয়া দেখিলেন যে এক ব্যাধ আসিয়া শিবের মাথায় পুষ্পবারি দিলেন ও শিকারের মাংস পোড়াইয়া নিবেদন করিলেন। পরদিন পূজারী ব্যাধকে এই কার্য্য করিতে নিষেধ করেন। কিন্তু ব্যাধ খুবই বলিষ্ঠ ছিলেন। কাজেই তিনি পূজারীর নিকট পরাজয় স্বীকার করিলেন না। পূজারী নিতান্তই মর্ম্মাহত হইয়া বাড়ী ফিরিয়া যান এবং সবিনয়ে শিবের নিকট প্রার্থনা জানান—"ব্যাধ নিত্য তোমার উপর অত্যাচার করিতেছে, ইহা আমি সহ্য করিতে পারি না। সে আমা হইতে শক্তি-শালী, তুমিই দয়া করিয়া তাহাকে এই কার্য্য হইতে বিরত কর।" সেই দিন রাত্রেই শিব তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া বলিলেন, "ব্যাধ আমার বিশেষ ভক্ত। খুব নিষ্ঠা ও ভক্তি সহকারে সে ঐ সব আমাকে নিবেদন করিয়া থাকে। আমি তাহার ভক্তিতে মুগ্ধ হইয়া ঐসব গ্রহণ করিয়া থাকি। আগামী কল্য দূর হইতে তাহার ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে সে কত বড় ভক্ত।" পর দিন পূজারী নিত্যপূজা সমাপনান্তে ঝোপের আড়ালে দাঁড়াইয়া ব্যাধের অপেক্ষা করিলেন। পরে দেখিতে পাইলেন ব্যাধ মুখে জল, হাতে তীর-ধনুক, শিকারের মাংস ও বন্য পুষ্প সহ উপস্থিত হইলেন। তখন শিবের দুই চোখ দিয়া অনবরত জল পড়িতেছিল। আর অন্ধের ন্যায়

দুইটী চোখই বন্ধ। এই দৃশ্য দেখিয়া ব্যাধের মনে খুবই দুঃখের সঞ্চার হইল। তখন তিনি শিবকে অতি কাতর ভাবে জানাইলেন যে, ইহার জন্য তিনি কি করিতে পারেন? ব্যাধ আকুল ভাবে কাঁদিতে লাগিলেন। সেই মুহূর্ত্তে এক দৈববাণী হইল, "যদি তাহার নিজের চক্ষু দুইটী উৎপাটিত করিয়া বসাইয়া দেয় তাহা হইলে শিবের চক্ষু ভাল হইবে।" তখনই ব্যাধ তীর-ধনুকের সাহায্যে তাঁহার বাম চক্ষু উৎপাটিত করিয়া শিবের বাম চক্ষুতে চাপিয়া দিবা মাত্র চক্ষুটি ভাল হইয়া গেল। ইহা দেখিয়া ব্যাধের খুবই আনন্দ হইল। দক্ষিণ চক্ষুটিও ঐরকম করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু একটী মাত্র চক্ষু আছে। এইটী উৎপাটিত করিলে কিছুই দেখিতে পাইবেন না জানিয়াও তীরধনুকের সাহায্যে চক্ষুটি উৎপাটন করিবার উদ্যোগ করিলেন। শিব ব্যাধের ভক্তিতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার হাত ধরিলেন এবং স্ব স্বরূপে দর্শন দিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। ইহার ফলে উভয়েরই পূর্ব্বেকার ন্যায় চক্ষু ভাল হইল। ব্রাহ্মণ গাছের আড়ালে থাকিয়া সবই দেখিতে পাইলেন। এই ঘটনার পর হইতেই ব্যাধ একজন নায়নার বলিয়া পরিগণিত হন। সিদ্ধ শৈবভক্তকে তামিল ভাষায় নায়নাই বা নায়নার বলে। সেই হইতে ব্যাধের নাম হয় কন্নাপ্প্‌র। ইহা তামিল নাম। কন্ন্‌=চক্ষু, অপ্পু=বসান, অর্‌=জী। চক্ষু বসানজী অর্থাৎ যিনি চক্ষু বসাইয়াছেন। তিনি ৬৩ জন সিদ্ধপুরুষের মধ্যে একজন। শিবের সম্বন্ধে তাঁহার লিখিত অনেক থেবারম্‌ আছে। শিবের স্তোত্রকে তামিলে থেবারম্‌ বলে। অনেক কাল পরে এই মন্দির নির্ম্মিত হয়। এখানকার বিল্ববৃক্ষ স্থলবৃক্ষ নামে অভিহিত।

চিদাম্বরম্‌

এই স্থানের শিবলিঙ্গের নাম আকাশলিঙ্গ। অন্যান্য মন্দিরের বেদীতে যেমন লিঙ্গমূর্ত্তি থাকে এ স্থানের বেদীতে সেরূপ কোনই মূর্ত্তি নাই। আকাশের কোনই রূপ নাই বলিয়া বেদীতে বিগ্রহেরও কোন রূপ নাই। ঐ স্থলে একটী কাল পাথরের টালী বসান আছে। ইহাই আকাশ-লিঙ্গরূপে পূজিত। ইহাকে পূজারীরা চন্দনের সাহায্যে শিবের মুখের আকৃতি দান করিয়া নানা রকমের পুষ্পমাল্য দ্বারা পূজা ও আরতি করিয়া থাকেন। ভোর পাঁচটায় শিবের নটরাজ মূর্ত্তির অভিষেক হইয়া থাকে। চিৎ=জ্ঞান, অম্বর=আকাশ। এ স্থানে ভগবান জ্ঞানময় আকাশরূপে বিরাজ করিতেছেন। এই নাম হইতেই এই স্থানের নাম হয় চিদাম্বরম্‌। দেবীর নাম শিবকামী। স্থলবৃক্ষের নাম ডিল্লাই বৃক্ষ। পুরাকালে এই অঞ্চলে ডিল্লাই বৃক্ষের জঙ্গল ছিল। ইহার নামানুসারেই এই জায়গার অপর নাম ডিল্লাইবনম্‌।

মন্দির

মানুষ যেমন সাধনার দ্বারা ইন্দ্রিয়সমষ্টিকে অতিক্রম করিয়া দেহের ভিতর সেই পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া থাকে, সেইরূপ দক্ষিণ-ভারতে মন্দিরেরও নানারূপ স্তর অতিক্রম করিলে বিগ্রহের বা ভগবানের দর্শন লাভ হইয়া থাকে। সাধারণতঃ দক্ষিণ-দেশের মন্দির সাত ভাগে বিভক্ত। যথা:— গোপুরম্‌, দ্বারম্‌, বলীপীঠম্‌, ধ্বজাস্তম্ভ, নাটমন্দির, নন্দী ও গর্ভমন্দির, এই গুলি মনের এক একটি দ্বার বলিয়া কথিত। যেমন— গোপুরম্‌কে পায়ু, দ্বারকে উপস্থ, বলীপীঠম্‌কে নাভি, ধ্বজাস্তম্ভকে হৃদয়, নাটমন্দিরকে কাঠ, নন্দীকে ভ্রূ, ও গর্ভমন্দিরকে ব্রহ্মতালু বা সহস্রার বলিয়া থাকে। গর্ভমন্দিরে যেমন ভগবানের দর্শন হয়, তেমন সহস্রারে ভগবানের দর্শন হয়।

গোপুরম্‌

গোপুরম্‌ অর্থাৎ প্রধান প্রবেশ দ্বার। কোন কোন মন্দিরের চারিদিকে চারিটি গোপুরম্‌ আছে।

গোপুরম্‌কে রাজগোপুরম্‌ ও জগৎ বলা হয়। কেহ কেহ নরদেহের রূপও বলিয়া থাকে। কারণ নরদেহ যেমন ইন্দ্রিয়সমূহের সাহায্যে জগতের ভাল মন্দ সবই উপভোগ করিয়া থাকে, তেমন দেহরূপ গোপুরমেও ইন্দ্রিয়স্বরূপ ভিত্তি হইতে চূড়া পর্য্যন্ত কয়েকটী গবাক্ষ আছে। আর ইহার গায়ে চারিদিকে নানা রকমের ভাল-মন্দ মূর্ত্তিও আছে। দেখাইতেছে যে, বাহ্য জগৎ সব ভাল-মন্দে মিশ্রিত। যদি পরমাত্মাকে লাভ করিতে চাও, ঐ ইন্দ্রিয়সমষ্টির দেহের ভিতর প্রবেশ করিলে তবে পরমাত্মার দর্শন লাভ হইবে। অর্থাৎ পরমাত্মার দর্শন লাভ করিতে হইলে যেমন বাহ্য জগৎ হইতে মনকে টানিয়া আনিয়া হৃদয় অভ্যন্তরে প্রবেশ করাইতে হয়, সেইরূপ বিগ্রহদর্শন করিতে হইলে বাহ্য জগৎরূপ গোপুরম্‌ অতিক্রম করিয়া হৃদয়রূপ মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হইবে। সাধারণতঃ দক্ষিণ-দেশের মন্দিরের গোপুরম্‌গুলি গর্ভ মন্দির হইতে বড়। ইহার কারণ সম্ভবতঃ এই স্থূলদেহের অভ্যন্তরেই ভগবান বা পরমাত্মা সূক্ষ্মরূপে বিরাজ করিতেছেন। গোপুরম্‌ সাধারণতঃ ৩, ৫, ৭, ৯, ১১, ১৩ এই সব বেজোড় স্তরে হইয়া থাকে। প্রত্যেক স্তরে একটী করিয়া গবাক্ষ আছে। ঐ গবাক্ষগুলিই ইন্দ্রিয়-সদৃশ; এক এক মন্দিরে এক এক রকমের নাম আছে, যথা :—পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়=চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্‌। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় = বাক্‌ পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ। চারি অন্তরিন্দ্রিয়=মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত। পঞ্চ-প্রাণ=প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদান। গোপুরমের জানালার ব্যাখ্যা অনুসারে তাহাদের নামও থাকে। চিদাম্বরমের গোপুরমে সাতটী জানালা আছে; উহাদের নাম চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্‌, মন ও বুদ্ধি স্থূলদেহেও এই কয়টী ইন্দ্রিয় আছে। কাজেই দেহের সহিত গোপুরমের সাদৃশ্য।

দ্বারম্‌

গোপুরম্‌ অতিক্রম করিয়া তিনটী প্রাকার-বেষ্টিত দ্বার অতিক্রম করিতে হয়। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-সমন্বিত দেহে পরমাত্মার দর্শন করিতে হইলে তিন গুণ, কাল ও অবস্থার ভিতর দিয়া যাইতে হয়। কেহ কেহ এই তিনটী দ্বারের বিভিন্ন নাম দিয়া থাকেন। যথা :—গুণ=সত্ত্ব, রজ, ও তম। কাল=ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান। ত্রিমূর্ত্তি=ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র (সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়)। অবস্থা=জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। শরীর=স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ। কার্য্য=সঞ্চিত আগামী ও প্রারব্ধ। এ স্থানে তিনটী দ্বার তিন গুণের প্রতীক।

বলীপীঠম্‌

দ্বারম্‌ অতিক্রম করিলে বলীপীঠম্‌ দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণ ভূমির উপর যন্ত্র অর্থাৎ শ্রীচক্র, তাহার উপর চতুষ্কোণবিশিষ্ট একটী স্তম্ভ। ইহা প্রায় ৫ফুট উঁচু, ২ ফুট চওড়া ও ২ ফুট দীর্ঘ। উপরে একটী অষ্টভুজ। তাহার উপরে আটটী পাপড়িসহ একটী অধঃমুখী পদ্ম। পদ্মের বৃন্তে একটি বৃত্ত। ইহাকে বলীপীঠম্‌ বলে। ঐ তিন গুণ, কাল ও অবস্থা অতিক্রম করিয়া বলীপীঠমে মনের কুপ্রবৃত্তি, কুকর্ম্ম ও কুবাসনা সব বলিদান করিয়া চিত্তশুদ্ধি করিতে হয়। কেহ কেহ ইহাকে কুলকুণ্ডলিনীর প্রতীক বলিয়া থাকে। বলীপীঠমের নীচে যে চক্র আছে, ইহাই সহস্রার। সহস্রারের পদ্ম অধঃমুখী। সাধনার দ্বারা তাহাকে উর্দ্ধমুখী করিতে হয়। অর্থাৎ বাসনা সব ত্যাগ করিয়া সাধনার দ্বারা কুলকুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করত একে একে ষট্‌চক্র অতিক্রম

করিলে সহস্রারে আসিয়া পরমাত্মার দর্শন লাভ হইয়া থাকে।

ধ্বজাস্তম্ভ

বলীপীঠম্ অতিক্রম করিয়া ধ্বজাস্তম্ভে আসিতে হয়। প্রায় ৩০ ফুট উঁচু ও ২৪ ইঞ্চি পরিধির একটী স্তম্ভ। ইহার উপর নীচ সর্ব্বাঙ্গ পিতলের পাতে মোড়া। মাথায় আড়াই ফুট দীর্ঘ একটী ধাতুনির্ম্মিত পতাকা আছে। পতাকাটী গর্ভমন্দিরের দিকে অবস্থিত। ইহাকে প্রাণায়ামের প্রতীক বলা হয়। অর্থাৎ প্রাণায়ামের দ্বারা মনকে বাহ্য জগৎ হইতে টানিয়া আনিয়া স্তম্ভের ন্যায় স্থির, অচল ও অটল করিয়া পতাকার ন্যায় ভগবানের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কেহ কেহ বলে, ভগবান স্তম্ভরূপে পৃথিবী ধারণ করিয়াছিলেন, উহারই প্রতীক এই স্তম্ভ।

নন্দী

স্তম্ভ অতিক্রম করিলে নাটমন্দির, পরে জীবের প্রতীক নন্দী বা বৃষ। এই পর্য্যন্ত জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ আছে। ইহা অতিক্রম করিলে জীবাত্মা পরমাত্মাতে লীন হইয়া যায়—ভেদ আর থাকে না। অর্থাৎ সাধনার ষষ্ঠভূমি পর্য্যন্ত জীবাত্মা ও পরমাত্মায় ভেদ থাকে, কিন্তু সপ্তমভূমিতে উভয়ের মিলন হয়। সেইরূপ এস্থলেও সপ্তম স্তরে বা গর্ভমন্দিরে ভগবানের দর্শন হয়। এখানে ভেদ থাকে না, এই জন্য এখানে প্রণাম করিবার নিয়ম নাই। এ অবস্থায় দেহের কোনই বন্ধন থাকে না। সেইজন্য অনাবৃত গাত্রে ভগবানের দর্শন করিবার বিধি। নন্দীর পশ্চাতে যে কোন স্থান হইতেই প্রণাম করিতে পারা যায়, ইহাই বিধি। কারণ ষষ্ঠস্তর বা নন্দী পর্য্যন্ত জীবাত্মা ও পরমাত্মাতে ভেদ থাকে। নন্দীর দৃষ্টি ভগবানের দিকে অর্থাৎ জীবের দৃষ্টি নন্দীর ন্যায় ভগবানের দিকে থাকিবে। যাহাতে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়, সেইজন্য কেহ নন্দীর সম্মুখ দিয়া পাশ কাটিয়া যায় না বা অবরোধ করে না অর্থাৎ ভগবানের দিকে সর্ব্বদাই জীবের এক দৃষ্টি থাকা বিধেয়।

প্রথমে মন্দির পরিক্রমা করিয়া বিগ্রহকে দর্শন করিবার বিধি। পরিক্রমা করিবার কালে শিবমন্দিরের দক্ষিণ দিকে "দক্ষিণামূর্ত্তি" দর্শন করিতে হয়। তাহার সম্মুখেই ৬৩ জন নায়েনারের মূর্ত্তি আছে। মন্দিরের পশ্চাৎ ভাগ পরিক্রমা করিয়া মন্দিরের বাম দিকে চণ্ডিকেশ্বর মূর্ত্তি দর্শন করিতে হয়। তিনি শিবের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। এই বিগ্রহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তিনবার হাততালি দিতে হয়। প্রথম হাততালিতে বলিতে হয়, "আমার অপকর্ম্ম সব দূর করিয়া দাও" অর্থাৎ আমার মন পবিত্র করিয়া দাও। দ্বিতীয় তালিতে বলিতে হয়, "তোমার মত আমাকে ভক্তি দাও।" তৃতীয় তালিতে বলিতে হয়, "আমাকে ভগবানের দর্শনে যাইতে অনুমতি দাও।" ইহার পর গর্ভমন্দিরে আসিতে হয়।

নাটমন্দির

গর্ভমন্দিরে আসিতে হইলে নাটমন্দির হইয়া আসিতে হয়। ইহাকে এ অঞ্চলে "মহামণ্ডপম্" বলে। আঠারটী স্তম্ভের উপর এই নাটমন্দিরটী অবস্থিত। এই আঠারটী স্তম্ভকে অষ্টাদশ পুরাণ শাস্ত্রের প্রতীক বলা হয়।

গর্ভমন্দির

নাটমন্দিরের পরেই গর্ভমন্দিরের পথ। ইহাকে এই অঞ্চলে "অর্দ্ধমণ্ডপম্" বলে। ইহাও ছয়টী স্তম্ভের উপর অবস্থিত। এই ছয়টী স্তম্ভকে ষড়্দর্শনের প্রতীক বলা হয়। গর্ভমন্দিরের

ছাঁদটী হাজার সোণার পাতের টালীতে ছাওয়া। ইহাকে হাজার নাড়ীযুক্ত দেহের রূপ বলিয়া থাকে। ইহার মধ্যে ভগবানের রত্নবেদী। চারিটী থামের সাহায্যে এই রত্নবেদীটী তৈরী। উক্ত চারিটি থামকে চারিটী বেদের প্রতীক বলিয়া থাকে। অর্থাৎ হাজার নাড়ী-যুক্ত দেহের ভিতর পরমাত্মাকে দর্শন করিতে হইলে অষ্টাদশ পুরাণ, ষড়্দর্শন ও চারি-বেদের ভিতর দিয়া আসিতে হইবে। ইহার অর্থ এই যে, পরমাত্মাকে লাভ করিতে হইলে ঐসব শাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। এস্থানে ভগবান জ্ঞানময় আকাশরূপে সর্ব্বব্যাপী বিরাজ-মান। তাই তাঁহার কোন রূপ নাই।

ভোগ

নৈবেদ্য প্রথমে শিবের নিকট নিবেদন করা হয়। পরে উহা মায়ের নিকট, নন্দীর নিকট ও বলীপীঠমের নিকট পর পর নিবেদন করা হইয়া থাকে।

প্রসাদ

যাঁহারা শিবের গোঁড়া ভক্ত, তাঁহারা সাধারণতঃ শিবের সন্নিধি হইতে প্রসাদ গ্রহণ করেন না, তাঁহারা শিবের দর্শনান্তে মায়ের সন্নিধি হইতে প্রসাদ গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে শিবের কৃপায় কিছুই হয় না, একমাত্র মায়ের কৃপাতেই সব হইয়া থাকে। ইহার অন্য কারণও আছে। নায়েনারদের অর্থাৎ সিদ্ধপুরুষদের মধ্যে যিনি প্রথম ও প্রধান, তিনি তিন বৎসর বয়সে হরপার্ব্বতীর দর্শন লাভ করেন। সেই সময় পার্ব্বতী তাঁহাকে নিজের স্তন্য দান করিয়াছিলেন। সেই স্তন্য পানে তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান বা শিবজ্ঞান হয়। এই কারণে, তত্ত্বজ্ঞান বা শিবজ্ঞান লাভ হইবে বলিয়া ভক্তেরা মায়ের সন্নিধি হইতে প্রসাদ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

দীপারতি

বিগ্রহের সম্মুখে সব সময়েই একটী কাল রংয়ের পরদা ঝুলান থাকে। কর্পূর আরতির সময় ঐ পরদাটী সরাইয়া দেওয়া হয়। ঐ আলোতে ভগবানকে দর্শন করিতে পারা যায়। সাধারণতঃ দক্ষিণ-ভারতে গর্ভমন্দিরের একটী দ্বার ব্যতীত দ্বিতীয় দ্বার বা গবাক্ষ নাই। কাজেই আলো ব্যতিরেকে ভগবানকে দর্শন করা এক দুরূহ ব্যাপার। ঐ পরদাসম্বন্ধে বলা হয়, জ্ঞানরূপ দীপদ্বারা অবিদ্যা মায়ার পরদাকে দূর করিলে ভগবানের দর্শন লাভ হয়। কর্পূর আরতির অর্থ এই যে, কর্পূর জ্বালিলে যেমন শেষে কিছুই থাকে না, সেইরূপ জ্ঞানরূপ অগ্নিদ্বারা কর্পূররূপ অবিদ্যাকে জ্বালাইলে নিত্যবস্তু ছাড়া আর কিছুই থাকে না।

শয়নঘর

রাত্রের ভোগ নিবেদনের পরে শয়নঘরে পার্ব্বতীর সঙ্গে শিবের নটরাজ মূর্ত্তিকে শয়ন দেওয়া হয়। এই সময় নটরাজকে দোলায় করিয়া নানারকমের বাদ্য-বাজনা ও বড় বড় মশালসহ শোভাযাত্রা করিয়া আনা হয়। শয়ন দিবার পূর্ব্বে দীপারতি ও দুগ্ধ নিবেদন করা হয়। এই শিবশক্তির মিলনকে "মহাপ্রলয়" বলিয়া থাকে, তখন আর জগতের অস্তিত্ব থাকে না। আবার যখন ভোর বেলা শোভাযাত্রাসহ শিব মন্দিরে আসেন, তখন সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ করিয়া থাকেন। ইহাই সাধকদের মত।

নায়েনার বা সিদ্ধপুরুষ

শৈব সম্প্রদায়ে সর্ব্বসমেত ৬৩ জন নায়েনার। ইঁহাদের মধ্যে চারিজন ব্রাহ্মণ। যথা:—তিরু-জ্ঞানসম্বন্ধর, বাগীশ্বর বা তিরু (নাবুকার্য্য) (তামিলনাম), সুন্দরর্, মাণিক্য বাচাহার বা তিরুবাচকম্ (তামিল নাম)। তিরু=শ্রী, জ্ঞান=

তত্ত্বজ্ঞান, সম্বন্ধর=যোগাযোগ, যাঁহার তত্ত্বজ্ঞানে যোগাযোগ হইয়াছে অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানী। তিরু=শ্রী, নাবুক=জিহ্বা, আর্য্যু=রাজা, যিনি জিহ্বার রাজা বা বাক্‌শক্তির রাজা, যাঁহার জিহ্বা শিবসম্বন্ধীয় ছাড়া অন্য বিষয় বলিত না, অন্য বিষয় বলিবার সময় জিহ্বা অবরোধ হইয়া যাইত। এইরূপ তাঁহার ক্ষমতা ছিল। তাই তাঁহাকে বাগীশ্বর বা তিরু (নাবুকার্য্যু) বলে। সুন্দর=সুশ্রী, অর্=জী, সুন্দরর্। তামিলে সম্মানার্থে জীর পরিবর্ত্তে অর্ ব্যবহার করিয়া থাকে। মাণিক্য=মণি, অমূল্যধন; বাচাহার=কথা। যাঁহার অমূল্য কথা। এবং তিরু=শ্রী, বাচকম্=গান। তিনি সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তাই তাঁহার নাম মাণিক্য বাচাহার বা তিরুবাচকম্। ইঁহারা সকলেই শিবের সম্বন্ধে অনেক স্তব ও স্তোত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন। তিরুজ্ঞানসম্বন্ধর বাৎসল্য, তিরু নাবুকার্য্যু দাস্য, সুন্দরর্ সখ্য ও মাণিক্যবাচকম্ মধুর ভাবে সাধন করিয়া শিবের দর্শন লাভ করেন।

তিরুজ্ঞানসম্বন্ধর সিদ্ধপুরুষদের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম ও প্রধান। তিনি তিন বৎসর বয়সে হরপার্ব্বতীর দর্শন লাভ করিয়া পার্ব্বতীর স্তন্য পানে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন। ঘটনাটি এইরূপ :— তাঞ্জোর জেলায় ব্রহ্মপুরম্ নামে একটি গণ্ডগ্রাম ছিল। বর্ত্তমানে ঐ গ্রামের নাম শিরহাড়ী। উক্ত গ্রামে একটী শিবমন্দির এবং মন্দিরসংলগ্ন একটী পুষ্করিণী আছে। এদেশের প্রত্যেক মন্দিরের সংলগ্ন একটী পুষ্করিণী থাকে। গ্রামের জনৈক ব্রাহ্মণ ঐ পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া নিত্য মন্দিরে গিয়া নিষ্ঠার সহিত শিবের পূজা করিতেন। তাঁহার তিন বৎসর বয়সের একটী ছেলে ছিল। তাহাকে "পিল্লাই" বলিয়া ডাকিতেন। খোকাকে তামিল ভাষায় পিল্লাই বলে। একদিন ব্রাহ্মণ ছেলেকে সঙ্গে করিয়া শিবের পূজার্থে পুষ্করিণীতে স্নান করিতে আসেন। ছেলেকে পুষ্করিণীতীরে রাখিয়া ব্রাহ্মণ স্নান করিবার উদ্দেশ্যে জলে নামিলেন। তিনি যেই জলে ডুব দিয়াছেন, অমনি ছেলেটি তাঁহার পিতাকে দেখিতে না পাইয়া ভাবিল যে তিনি জলে ডুবিয়া মরিয়া গিয়াছেন. এই সময়ে হরপার্ব্বতী আসিয়া তাহাকে দর্শন দেন, এবং পার্ব্বতী নিজের স্তন্য একটী বাটিতে খাইতে দেন। ঐ স্তন্য পান করাতেই ছেলের শিবজ্ঞান হয়। পরে হরপার্ব্বতী অদৃশ্য হইয়া যান। ব্রাহ্মণ স্নানান্তে ছেলের নিকট আসিয়া দেখিতে পান যে তাহার হাতে দুধের বাটি ও মুখে দুধ লাগিয়া আছে। আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় দুধ পাইয়াছ এবং কেই বা তোমাকে দুধ দিয়াছে, সত্য করিয়া বল।" তখন ছেলে সব বলিল। ঐ উত্তরই প্রথম থেবারম্ রূপে তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হয়। স্তোত্রটী এই :—

"তডু উডায়া সেবিয়ান বিডাই এড়ি অড়ুতুবোন
মাদি সুডি।
কাডু উডায়া সুডালই পোডি পুসিয়ন্ এন্ উল্লাম্
কাডর কাল্বোন।
এডু উডায়া মালারণ মুনাইণাল পাণিন্দু এতা
আড়ল পুরিন্দা।
পিড়ু উডায়া ব্রহ্মপুরম্ মেবিয়ান পেম্মান
ইভন আণ্ড্রে॥"

তড়ু=কুণ্ডলম্, উডায়া=ধারণ করা, সেবি=কর্ণ, য়ান=যে ব্যক্তি, বিডাই=বৃষভ, এডি=বাহন, অড়ু=এক, তু=নির্ম্মল, ব্যোন=শ্বেত, মাদি=চন্দ্র, সুডি=শেখর। কাডু=শ্মশান, উডায়া=এর, সুডালই=চিতাভস্ম, পোডি=চূর্ণ, পুসিয়ন্=আবরিত, এন্=আমার, উল্লাম=হৃদয়েতে, কাডর=লুক্কায়িত, কাল্বোন=চোর। এডু=বহু-পাপড়ি, উডায়া=এর, মালারণ=পদ্মফুলদ্বারা, মুনাইণাল=প্রাচীনকালে, পাণিন্দু=সবিনয়ে, এতা=পূজা করা, আড়ল=কৃপা, পুরিন্দা=করিয়া। পিড়ু=মহত্ত্ব, উডায়া=স্বরূপ, ব্রহ্মপুরম্=ব্রহ্মপুরের, মেবিয়ান্=অধিষ্ঠিত দেবতা, পেম্মান=

মহাত্মা, ইভন=সে (তিনি), আণ্ডে=ই (নির্দ্দিষ্ট পুরুষ)।

"যিনি কর্ণে কুণ্ডল ধারণ করিয়াছেন, যিনি বৃষভবাহন, যিনি নির্ম্মল শ্বেত চন্দ্রশেখর ধারণ করিয়াছেন, যিনি শ্মশানের চিতাভস্মে আবরিত, যিনি আমার হৃদয়ে চোরের মত লুক্কায়িত আছেন, যিনি পুরাকালে মুনিগণ দ্বারা শতদল পদ্মসহ সবিনয়ে-পূজিত, যিনি তাহাদের কৃপা করিয়াছেন, যিনি মহত্ত্বস্বরূপ ব্রহ্মপুরের অধিষ্ঠিত দেবতা, সেই মহাত্মাই অর্থাৎ তিনিই আমাকে দুগ্ধদান করিয়াছেন।"

এই উত্তর শুনিয়া ব্রাহ্মণ ভাবিল, যে ছেলেকে আমি রাখিয়া গিয়াছিলাম, সে এ ছেলে নয়। ছেলের এরূপ তত্ত্বজ্ঞান হইয়াছে বলিয়া, তাহার নাম হয় তিরুজ্ঞানসম্বন্ধর।

উক্ত থেবারমে শিবের পাঁচটী রূপের বর্ণনা আছে। যথা:—সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, তিরোধান ও কৃপা। তিনি কানে কুণ্ডল ধারণ করিয়াছেন, ইহাকে সৃষ্টির রূপ বলে। তিনি বৃষবাহন ও চন্দ্রশেখর ধারণ করিয়াছেন অর্থাৎ তাহাদের আশ্রয় দিয়াছেন, কাজেই পালন করিতেছেন, ইহাকে স্থিতির রূপ বলে। তিনি শ্মশানের ভস্মে আবৃত, ইহাকে সংহার রূপ বলে। তিনি হৃদয়ের মধ্যে লুক্কায়িত আছেন, ইহাকে তিরোধান রূপ বলে। পূজা দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া মুনিগণকে কৃপা করিয়াছেন, ইহাকে কৃপার রূপ বলে। ৬৩জন সাধকের মধ্যে একজন মহিলা সাধকও আছেন। তাঁহার নাম "কারিক্কল আম্মায়ার।" কারিক্কল=কারিকল, আম্মা=মা, অর্=জী, কারিকলের মাতাজী। কারিকলে তাঁহার জন্ম হয় বলিয়া ঐ স্থানের নামানুসারে নাম হয় কারিক্কল আম্মায়ার। তিনি মধুরভাবে সাধন করিয়া শিবের দর্শনলাভ করেন। তাঁহার অপূর্ব্ব রূপ ছিল। ঐজন্য তিনি শিবের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, যেন শিব তাঁহার রূপ হরণ করেন।

উৎসব ও শোভাযাত্রা

প্রত্যেক মন্দিরে সাধারণতঃ এক সময়ে উৎসব হয় না। এক এক মন্দিরে এক এক সময়ে হইয়া থাকে। তিন রকমের উৎসব হয়। যথা:—রথোৎসব, নৌকাবিহার ও নগরভ্রমণ। নির্দ্দিষ্টসময়ে রথ সুসজ্জিত করিয়া উৎসব বিগ্রহ স্থাপন করত টানিয়া থাকে। বাঁশদ্বারা নৌকা নির্ম্মাণ করিয়া সুসজ্জিত বিগ্রহসহ নৌকাবিহার করে। পুকুরের মধ্যে দ্বীপের ন্যায় ফল ও ফুলের বাগানসহ একটী মন্দির আছে। তাহাতে ভগবান কিছুদিন বাস করেন। নগরভ্রমণ-উৎসব চিদাম্বরমে মার্গশীর্ষ পূর্ণিমাতে অর্থাৎ অগ্রহায়ণ পূর্ণিমাতে হইয়া থাকে। এই সময়ে বিরাট শোভাযাত্রাসহ ভগবান নগরভ্রমণে বাহির হন। ভক্তেরা প্রত্যহ তাঁহার দর্শনে মন্দিরে আসেন। সেই হেতু তিনি কৃপা করিয়া বৎসরে একবার ভক্তদের বাড়ীতে দর্শন দিতে আসেন। সেইদিন নগরবাসীরা সকলেই বাড়ীঘর দ্বার পরিষ্কার করে এবং নানা রকম ফুল ও আলপনাতে সাজাইয়া থাকে; নিজেরাও নানা রকম সাজে সজ্জিত হয়। উদ্দেশ্য ভগবান আজ তাহাদের বাড়ীতে আসিবেন। কেহ কেহ শোভাযাত্রায় যোগদান করে, যাহারা অক্ষম, তাহারা রাস্তায় দাঁড়াইয়া ভগবানকে দর্শন করে। কাহারও কাহারও মত এই যে, যাহারা মন্দিরে ভগবানের দর্শনে অক্ষম, তাহাদের দর্শন দিবার জন্য তিনি নগরভ্রমণে বাহির হন। প্রত্যেক মন্দিরেই দুইটী বিগ্রহ আছে। মূল-বিগ্রহ ও উৎসব-বিগ্রহ। গর্ভমন্দিরে মূলবিগ্রহের নিত্য পূজা হয়। ইহা আকারে বড়, উৎসব-বিগ্রহ আকারে ছোট; তাহারই উৎসবাদিতে শোভাযাত্রা হইয়া থাকে। এই শোভাযাত্রার প্রথমে কয়েক জন এদেশীয় পণ্ডিত পরায়ণম্ অর্থাৎ তামিল স্তোত্র পাঠ করে। তাঁহাদের পশ্চাতে নানা রকমের বাদ্য বাজনা ও হিন্দুধর্ম্মের প্রতীক থাকে। পরে থাকেন স্থানীয় ভক্তগণ ও সিদ্ধপুরুষদের উৎসববিগ্রহ। উৎসবাদির জন্য সিদ্ধপুরুষদের ছোট ছোট মূর্ত্তি আছে। এই মূর্ত্তিগুলিকে সুসজ্জিত করিয়া শোভাযাত্রায় বাহির করা হয়। ইহার পশ্চাতে মন্দিরের পূজারিগণসহ উৎসব বিগ্রহ থাকেন। রৌপ্যদোলায় ভগবান নটরাজের মূর্ত্তিকে নানা রকম ফুলমালা ও কাপড়ে সজ্জিত করা হয়। কখন কখন শিব ও পার্ব্বতী এক সঙ্গে থাকেন। আবার কখন বা পৃথক থাকেন। সর্ব্বশেষে কয়েক জন পণ্ডিত বেদ পাঠ করেন। এই উৎসবে দেশ-দেশান্তর হইতে সহস্র সহস্র যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে।

সমালোচনা

দেবসন্নিধানে—১ম ভাগ। শ্রীব্রহ্মনাথ সুর লিখিত। প্রকাশক—হরিহর লাইব্রেরী, ২৯ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৮৭ পৃষ্ঠা। মূল্য দুই টাকা।

চট্টগ্রামের সাধু তারাচরণের দৈনন্দিন জীবন ও কয়েকটী বাণী নিয়া এই বইখানি লেখা হইয়াছে। লেখক সাধু বাবার শিষ্য। তিনি নিতান্ত লৌকিক ভাবে তাঁহার গুরুকে দিনের পর দিন যে ভাবে দেখিয়াছেন এবং সাময়িক আবেষ্টনীর ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁহার যে সকল কথোপকথন শুনিয়াছেন, তাহার যৎকিঞ্চিৎ সাধারণের সমক্ষে ইহাতে উপস্থিত করিয়াছেন। লেখকের ব্যক্তিগত ডাইরী হইতেই এই পুস্তকের মালমশলা সংগৃহীত। সাধু তারাচরণ এক সময়ে কঠোর তপশ্চরণ ও দীর্ঘ তীর্থভ্রমণ করিয়াছেন। তিনি এখনও আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান। তাঁহাকে আমি দর্শন করিয়াছি। তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী, সাধনার ইতিহাস এবং উপদেশাবলী পুস্তকে থাকিলে ইহা সাধারণের উপাদেয় হইত। এই বিষয়ে একটী পৃথক বই লিখিতে আমরা লেখককে অনুরোধ করি। সমালোচ্য গ্রন্থখানিতে সাধারণের শিক্ষাপ্রদ তেমন কিছু নাই। তবে সাধুবাবার শিষ্যগণের নিকট ইহা নিশ্চয়ই আদরণীয় হইবে। নাটক-নভেল-সঙ্কুল আধুনিক সমাজে এইপ্রকার পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। পুস্তকে সাধুবাবার একটী সুন্দর চিত্র আছে।

দক্ষিণভারতে বঙ্গবালিকা—কুমারী হৈমন্তী দাশগুপ্ত রচিত। প্রকাশক—কমলাবুক ষ্টোর, মুরাদপুর, পাটনা। ১৪৫ পৃষ্ঠা। মূল্য ১৸৵০ আনা।

লেখিকা দ্বাদশ বা ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকা মাত্র, এখনও স্কুলের ছাত্রী। সুদূর পাঞ্জাবে তাঁহার জন্ম। পিতামাতার সঙ্গে তিনি দক্ষিণ ভারতের বহু ঐতিহাসিক শহর ও তীর্থস্থান দর্শন করিয়াছেন। মাদুরা, রামেশ্বর, কন্যাকুমারিকা, শ্রীরঙ্গম্, তাঞ্জোর, চিদাম্বরম্, কাঞ্চী, তিরুপতি প্রভৃতি দক্ষিণ ভারতের যে সকল প্রসিদ্ধ তীর্থ ও শহর তিনি দেখিয়াছিলেন সেইগুলির বিষয় যাহাতে মনে থাকে সেইজন্য পিতামাতার নির্দেশে তিনি এইগুলি লিখিয়াছিলেন। আত্মীয়গণ তাঁহার ভ্রমণ কাহিনী পাঠে সন্তুষ্ট হওয়ায় তাঁহাদের আগ্রহেই এই বইখানি প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাগ্বাণীতে শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র সমাদ্দার সত্যই বলিয়াছেন, "এই বইটীতে অনেক কিছু নূতন খবর পাওয়া যায়। বইখানা সহজ সরল ভাষায় ছোটদের জন্যই লেখা। ইহাতে ষোল খানি চিত্র আছে।" মণীন্দ্র বাবুর সহিত আমরা একমত যে, লেখিকার বয়স অল্প হইলেও তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গীর স্বাতন্ত্র্য ও তীক্ষ্ণতা আছে। ভূমিকাতে লেখিকা বলিয়াছেন তিনি সমগ্র উত্তর ভারত ভ্রমণ করিয়াছেন এবং সেই বিষয়ে লিখিবেন। আশাকরি তাঁহার সেই সদিচ্ছা অচিরে পূর্ণ হইবে। লেখিকা দীর্ঘজীবী হইয়া সাহিত্যসাধনার দ্বারা মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধি করুন ভগবচ্চরণে এই প্রার্থনা।

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ—শ্রীযামিনী কান্ত সোম প্রণীত। প্রকাশক মিত্র ও ঘোষ, ১০নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রচ্ছদপট ফ্রাঙ্ক ডোরাক অঙ্কিত শ্রীরামকৃষ্ণের চিত্র সম্বলিত। ১৬৯ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৸০ আনা।

গ্রন্থকার সুসাহিত্যিক। বাংলা ভাষায় তিনি বহু পুস্তক প্রণয়ন করিয়া বাংলার পাঠক-

সমাজে সুপরিচিত হইয়াছেন। রচনাবলীর মধ্য দিয়া তাঁহার কিশোর মনের সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে। সুনিপুণ রচনার দ্বারা বালকমনকে নিজেদের জাতীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিবার মহান্ দায়িত্ব যে সাহিত্যসেবীরা গ্রহণ করিয়াছেন, শ্রীযুক্ত সোম তাঁহাদের অন্যতম। শ্রীরামকৃষ্ণ গল্প ও উপদেশচ্ছলে ধর্ম্মের যে গভীর ও জটিল তত্ত্বগুলি সহজ ও সরল ভাষায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন তাহাই গ্রন্থকার এই গ্রন্থে উপস্থিত করিয়াছেন।

ইহাতে ১৫টী পরিচ্ছেদ আছে। প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণেশ্বর গমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্য-কৈশোরের যে আলেখ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে—তাহা সরলতায়, পবিত্রতায় এবং দীন দরিদ্র ও অত্যাচারিতের প্রতি সহানুভূতিতে সমুজ্জ্বল। জাতির নিগড়বন্ধনে ক্ষুব্ধ মানব ফুকারিয়া ডাকিতেছে। বালক গদাধর ধনী কামারিনীর তরকারী কাড়িয়া খাইয়া ও তাহাকে ভিক্ষামাতারূপে গ্রহণ করিয়া তাহা শ্লথ করিয়া দিয়াছেন।

শান্ত পল্লীপ্রাঙ্গণ ছাড়িয়া কলকল্লোলিত কলিকাতা শহরে আসিয়াও শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার পল্লীজীবনের সাবলীল গতি ছাড়েন নাই। তাঁহার সংস্পর্শে যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহারাই তাহা অনুভব করিয়াছেন। বইখানিতে শ্রীরামকৃষ্ণের বিভিন্ন ধর্ম্মসাধনা এবং ধর্ম্মসমন্বয়ের বাণী, তাঁহার সন্ন্যাসী ও গৃহী শিষ্যগণের আগমন ও তাঁহাদের ধর্ম্মজীবনের বিকাশ সুন্দর ভাবে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। বিশেষতঃ 'আমারে কিনিয়া লহ' এই পরিচ্ছেদে তাঁহার সহিত নরেন্দ্রনাথের (স্বামী বিবেকানন্দ) সম্পর্কটী খুবই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। এই অল্পপরিসর বইখানির ভিতরে গ্রন্থকার শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের বহুমুখী ঘটনা সুনিপুণ ভাবে সুবিন্যস্ত করিয়াছেন। বইখানি সুখ-পাঠ্য হইয়াছে। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

ব্রহ্মচারী ভবানীশঙ্কর

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মিশন, নিউ দিল্লী—এই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক একটি দাতব্য যক্ষ্মা ক্লিনিক্ পরিচালিত হইতেছে। ইহাতে আধুনিক বহু সাজ-সরঞ্জাম এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। ক্লিনিকে প্রতি বৎসর প্রায় ২০,০০০ আউট্‌ডোর রোগী চিকিৎসিত হইতেছেন। বর্তমানে ইহা ভাড়াটিয়া বাটীতে অবস্থিত। উহা সন্তোষজনক-ভাবে কার্য পরিচালনার সম্পূর্ণ অনুপযোগী। এজন্য গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত জমিতে বদান্য ব্যক্তিগণের দানের উপর নির্ভর করিয়া প্রায় দেড় লক্ষ টাকা ব্যয়ে গৃহাদি নির্মাণ ও এক লক্ষ টাকার একটি স্থায়ী ফণ্ডের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। ১৯৪১ সনের ২৯শে নভেম্বর দিল্লীর চিফ্ কমিশনার মিঃ এ ভি য়্যাস্কুইথ ইহার ভিত্তিস্থাপন করিয়াছেন।

আশ্রম-বিভাগের কার্যাবলী সর্বাঙ্গসুন্দর-ভাবে পরিচালনের জন্য নাটমন্দিরযুক্ত একটি মন্দির, একটি লেকচার হল, একটি লাইব্রেরী ও রিডিং রুম এবং একটি দাতব্য ঔষধালয় বিশেষ আবশ্যক। এই চারিটি কার্যের জন্য ১,৫০,০০০৲ টাকা এবং এইগুলি পরিচালনের জন্য ১,০০,০০০৲

টাকার একটি স্থায়ী ফণ্ড প্রয়োজন। আমরা বদান্য ব্যক্তিগণকে এই সকল জনকল্যাণকর কার্যে সাহায্য করিতে অনুরোধ করি।

রামকৃষ্ণ মিশন ছাত্রাবাস, কলিকাতা —১৯৪৫ সনের কার্যবিবরণী—এই প্রতিষ্ঠানটী ১৯১৬ সনে স্থাপিত হইয়া ১৯১৯ সনে বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম শাখারূপে পরিগণিত হয়। ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত। দরিদ্র ও মেধাবী কলেজের ছাত্রগণকে প্রাচীন ব্রহ্মচর্য আশ্রম অনুযায়ী উচ্চ শিক্ষা দান ইহার আদর্শ।

১৯৩২ সনে এই ছাত্রাবাসটি দমদমে ইহার নিজস্ব কিঞ্চিদধিক ৩০ একর জমির উপর স্থানান্তরিত হয়। ১৯৪১ সনে গবর্ণমেণ্ট এই জমি ও গৃহাদি দখল করায় বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানটি কলিকাতা ২০নং হরিনাথ দে রোড-এ একটি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে পরিচালিত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত কলিকাতা নিবাসী মিঃ আর সি সুর মহাশয় তাঁহার সোদপুরস্থিত নবনির্মিত বাড়ীখানি সাময়িকভাবে এই ছাত্রাবাসের জন্য দিয়াছেন।

আলোচ্য বৎসরের শেষদিকে ছাত্রাবাসে মোট ৪৩ জন ছাত্র ছিল। তাহাদের মধ্যে ১৮ জনের সম্পূর্ণ খরচ ও ১৪ জনের আংশিক খরচ বহন করা হইয়াছে। এই বৎসর ১ জন এম-এ (ইংরাজীতে প্রথম বিভাগে প্রথম), ৪জন বি-এস্‌সি, ১ জন বি-এ, ১ জন বি-কম্, ৭ জন আই-এস্‌সি ও ২ জন আই-এ (একজন যোগ্যতানুসারে অষ্টম ও বৃত্তিতালিকায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে) কৃতিত্বের সহিত পাশ করিয়াছে।

ছাত্রাবাসের লাইব্রেরীতে প্রায় ১৪০০ পুস্তক আছে। আলোচ্য বর্ষে ১০২৬ খানা পুস্তক বিদ্যার্থিগণকে পাঠ করিতে দেওয়া হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত পাঠ্যপুস্তক-বিভাগে ১১৬৬ খানা বই আছে। এই বইগুলি বিদ্যার্থী ও প্রাক্তন বিদ্যার্থিগণকে পড়িতে দেওয়া হয়। বিদ্যার্থিগণ কর্তৃক 'বিদ্যার্থী' নামে একটি হস্তলিখিত মাসিকপত্র পরিচালিত হইতেছে।

১৯৪৪ সনের আগষ্ট হইতে ১৯৪৫ সনের শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন কলেজের ১০জন দরিদ্র ছাত্রকে ৮১০৲ ও ১৯৪৪-৪৬ সনে বিভিন্ন কলেজের মোট ৮৪ জন ছাত্রকে পরীক্ষার ফি বাবদ ১১৮৫৲ সাহায্য করা হইয়াছে।

গত বৎসরের উদ্বৃত্ত সমেত এ বৎসরের সাধারণ ফণ্ডে মোট আয় ৬৭,৯৪৪৲২ পাই এবং মোট ব্যয় ২৩,৯৩৩৷৴৬পাই।

নবপ্রকাশিত পুস্তক

Self-knowledge (Atmabodha) —শঙ্করাচার্য প্রণীত আত্মবোধ গ্রন্থের টীকা টিপ্পনীসহ স্বামী নিখিলানন্দ কর্তৃক ইংরাজী অনুবাদ। ইহাতে একটী জ্ঞানগর্ভ ভূমিকাও আছে ; পরিশিষ্টে আচার্য শঙ্কর কৃত কয়েকটী স্তবের ইংরাজী অনুবাদ এবং গ্রন্থশেষে দুরূহ সংস্কৃত শব্দ সমূহের অর্থসংযুক্ত একটী নির্ঘণ্ট সংযোজিত হইয়াছে। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ২২৮। কাপড়ে বাঁধাই।

সাধক রামপ্রসাদ—স্বামী বামদেবানন্দ প্রণীত। ডক্টর শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত ভূমিকা। উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত। ২০৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ২৲ টাকা।

বিবিধ সংবাদ

রাড়ীখাল শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব—গত ১১ই জ্যৈষ্ঠ হইতে চারিদিবসব্যাপী—এই আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একাদশাধিকশততম জন্মমহোৎসব সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রথম দিন বৈকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত করিয়া একটী শোভাযাত্রা বাদ্য-ভাণ্ড সহকারে গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। রাত্রে প্রায় দুই শত নরনারীর সমক্ষে এবং দ্বিতীয় দিন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ পূজা ও হোমাদি হইলে প্রায় এক হাজার নরনারীর সমক্ষে বেলুড় মঠের স্বামী অজয়ানন্দজী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের বিশেষ

বিশেষ অংশ ব্যাখ্যা করেন। পরে ভজন ও কীর্তনান্তে প্রায় ২৫০০ হাজার ভক্ত ও নরনারায়ণ প্রসাদ গ্রহণে পরিতৃপ্ত হন।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ উক্ত স্বামীজীর সভাপতিত্বে একটী মহতী জনসভার অধিবেশন হয়। উদ্বোধন সঙ্গীত গীত হইলে স্থানীয় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ব্যায়াম প্রদর্শন করে। পুরস্কার বিতরণের পর শ্রীযুক্তা জীবনতোষিণী দত্ত মহাশয়া "নারী ও তাহার কর্তব্য" সম্বন্ধে একটী নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। পরে আশ্রমের বার্ষিক কার্যবিবরণী পঠিত হইলে নারায়ণগঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী সুপর্ণানন্দজী ওজস্বিনী ভাষায় শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর ভাবধারা সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। শেষে সভাপতি স্বামী অজয়ানন্দজী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন। পরদিন প্রাতে ৮টায় পুনঃ সভার কার্য আরম্ভ হয়। ইহাতে স্বামী অজয়ানন্দজী মানবজীবনের উদ্দেশ্য এবং ধর্মজীবন লাভের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করেন। শেষে স্বামী সুপর্ণানন্দজী কর্তৃক একটি কীর্তন গীত হইলে উৎসবের কার্য সমাপ্ত হয়।

এই উৎসবের কিছুদিন পূর্বে বেলুড় মঠ হইতে স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী, স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দজী, স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দজী ও স্বামী ভূধরানন্দজী এই আশ্রমে শুভাগমন করেন। তাঁহাদের উপদেশে শত শত নরনারী শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়াছেন।

গত ১৯শে জ্যৈষ্ঠ ভাগ্যকুল স্কুল-প্রাঙ্গণে একটী সভার অধিবেশন হয়। ইহাতে স্বামী অজয়ানন্দজী শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজির জীবনী বিশদভাবে আলোচনা করিয়া সকলের মনোরঞ্জন বিধান করিয়াছেন।

হলদিয়া (ঢাকা) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা-সমিতিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব—গত ১৫ই জ্যৈষ্ঠ এই প্রতিষ্ঠানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে পূর্বদিন বেলুড় মঠের স্বামী অজয়ানন্দজী ও স্বামী ভূধরানন্দজী এবং নারায়ণগঞ্জ রামকৃষ্ণ-মিশনের স্বামী সুপর্ণানন্দজীর শুভাগমনে স্থানীয় কর্মীদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার হয়। উৎসবদিবস স্বামী সুপর্ণানন্দজী পূজা ও উচ্চাঙ্গের ভজন গান করেন। বৈকালে প্রায় ৩৫০ জন দরিদ্র-নারায়ণকে পরিতোষসহকারে ভোজন করান হয়। এইদিন সন্ধ্যায় এক সভায় স্বামী অজয়ানন্দজীর সভাপতিত্বে স্বামী সুপর্ণানন্দজী শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর জীবনী ও ভাবধারা সম্বন্ধে একটী সুন্দর বক্তৃতা দেন। স্থানীয় দুইজন সেবকও বক্তৃতা করেন। শেষে সভাপতি মহারাজের হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতান্তে সমাপ্তিসঙ্গীত ও ঐক্যতান বাদিত হইলে উৎসবকার্য শেষ হয়।

ডিগবয় (আসাম) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এই প্রতিষ্ঠানে ১১ই জ্যৈষ্ঠ হইতে চারিদিন ব্যাপী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে বেলুড় মঠ হইতে স্বামী বীতশোকানন্দজী, শ্রীহট্ট রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী সৌম্যানন্দজী, ব্রহ্মচারী ঈশ্বর চৈতন্য, শ্রীযুক্ত গুণমণি রায় ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য এখানে আগমন করেন। প্রথম দিন শ্রীযুক্ত জষ্টিন পালের পৌরোহিত্যে একটি জনসভার অধিবেশন হয়। ইহাতে উক্ত স্বামিজীদ্বয় ও অন্যান্য বক্তাগণ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। দ্বিতীয় দিন পূর্বাহ্নে উষাকীর্তন পূজা গীতাপাঠ কীর্তন এবং মধ্যাহ্নে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। জাতিধর্মনির্বিশেষে প্রায় চারিহাজার নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। তৃতীয় দিন মহিলা-সম্মিলনে এবং চতুর্থ দিন ছাত্র-ছাত্রী-সম্মিলনে উক্ত স্বামিজীদ্বয় শ্রীশ্রীমা এবং স্বামী বিবেকানন্দের জীবন সম্বন্ধে মনোমুগ্ধকর বক্তৃতা দেন। এইদিন সন্ধ্যায় তাঁহারা স্থানীয় ক্লাবে এক বিরাট জনসভায় বর্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারার প্রয়োজনীয়তা ও প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করেন।
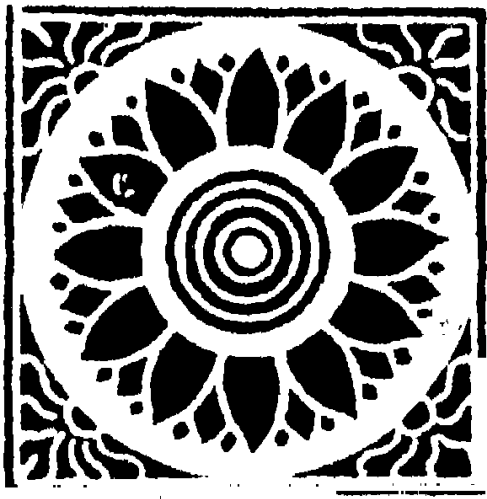
উদ্বোধন

রাগানুগা ভক্তি

সম্পাদক

(৩)

রাগানুগা ভক্তি জন্মিলে ভক্ত ভগবান ভিন্ন আর কিছু চান না। তিনি 'সর্ববিধ আশ্রম-ধর্ম ত্যাগ করিয়া'[৫৪] এবং 'সর্বোপাধিবিমুক্ত হইয়া একমাত্র ভগবানের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।'[৫৫] স্ত্রী পুত্র বিত্ত সংসার প্রভৃতি জাগতিক বিষয়ের প্রতি ভালবাসা তাঁহার নিকট সাময়িক আদান-প্রদানসম্ভূত দোকানদারী বা কেনাবেচার নামান্তর বলিয়া বোধ হয়। প্রকৃত পক্ষেও বিশ্লেষণ করিলে স্পষ্ট জানা যায় যে, সাধারণতঃ সন্তানের প্রতি মাতার বা মাতার প্রতি সন্তানের এবং স্ত্রীর প্রতি স্বামীর বা স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ভালবাসাও ঐ পর্যায়ভুক্ত। ইহা প্রেম নামে অভিহিত হইলেও ইহাতে আদান-প্রদান সুপ্ত আছে বলিয়া ইহাকে প্রকৃত প্রেম বলা যায় না। প্রত্যক্ষ দেখা যায়, অনেক ক্ষেত্রে মাতা-পুত্র ও স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের নিকট যাহা আশা করে, তাহা না পাইলে তাহাদের মধ্যে ভালবাসার সম্বন্ধ থাকে না। ঈশ্বরে রাগানুগা প্রেমে কোন প্রকার আদান-প্রদান নাই। ইহা প্রেমের জন্যই প্রেম, ভালবাসার জন্যই ভালবাসা। ইহাই সর্বোচ্চ নিঃস্বার্থ প্রেম বা ভালবাসা। ইহারই নাম অহেতুক প্রেম। ইহাই শুদ্ধাভক্তি। এই ভক্তি বা প্রেম জন্মিলে প্রেমাস্পদকে প্রেমিক কেবল দানই করেন, বিনিময়ে তাঁহার নিকট কোন প্রতিদান চান না। তাঁহার চাইবার বা পাইবারও কিছু থাকে না। তিনি কখনও 'ইহা দাও', 'উহা দাও' বলিয়া প্রেমাস্পদের নিকট প্রার্থনা করেন না। যথার্থ প্রেমিকের দৃষ্টিতে এইরূপ প্রার্থনা দোকানদারী মাত্র। রাগানুগা প্রেমের উদয় হইলে প্রেমিকের দণ্ডের ভয় এবং পুরস্কারের প্রলোভন থাকে না। দণ্ডের ভয়ে ভালবাসা ক্রীতদাসের ভালবাসার ন্যায় ভালবাসার ভানমাত্র। পুরস্কারের প্রলোভনে ভালবাসা স্বার্থপূর্ণ। রাগাত্মিকা প্রেমে ঈশ্বর দণ্ডদাতা বা বরদাতা নন, তিনি পরম প্রেমাস্পদ; তাঁহাকে ভালবাসিতে ভাল লাগে বলিয়াই প্রেমিক ভালবাসে। প্রেমাঞ্জনমণ্ডিত প্রেমিকের চক্ষে ভগবানের তুল্য সুন্দর আর কিছু নাই। ভক্ত সেই চিরসুন্দরের অস্তিত্বে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন; তাঁহার অস্তিত্বের কোন প্রমাণ চান না। প্রেমিকের নিকট প্রেমের ভগবানের প্রমাণ ভগবানই। তিনি সর্বশক্তিমান কি না প্রেমিক তাহা

৫৪ সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

—গীতা, ১৮।৬৬

৫৫ সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলং।

হৃষীকেণ হৃষীকেশ সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥

—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

বিচার করিবার আবশ্যকতা বোধ করেন না। তাঁহার নিকট ঈশ্বর প্রেমময়—পরম প্রেমস্বরূপ। প্রেমিক শত দুঃখ বরণ করিয়াও প্রেমাস্পদের সুখবিধান করিতে সদা প্রস্তুত। প্রেমাস্পদের সুখেই প্রেমিকের সুখ এবং প্রেমাস্পদের অপ্রাপ্তি-জনিত দুঃখেই প্রেমিকের দুঃখ। প্রেমিক অন্য সুখের কামনা করেন না। ইহাই পরাপ্রেম—ইহাই পরাভক্তি।

এই পরাভক্তির স্বরূপ নির্ণয়-প্রসঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ ভক্তিকে উত্তমা মধ্যমা কনিষ্ঠা ভেদে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকটির অধিকারী নির্ণয় করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ভক্তিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন ভক্ত উত্তমা ভক্তি, শাস্ত্রজ্ঞানবর্জিত অথচ ভগবানে শ্রদ্ধান্বিত ভক্ত মধ্যমা ভক্তি এবং শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য ও ভগবানে দৃঢ় শ্রদ্ধাহীন ভক্ত কনিষ্ঠা ভক্তির অধিকারী। এই শেষোক্ত ভক্তও বৈধী ভক্তির কোন একটি প্রধান অঙ্গ বা বহু ভজনাঙ্গ দীর্ঘকাল সম্যক্‌রূপে পালন করিলে উত্তমা ভক্তির অধিকার অর্জন করিতে পারেন। উত্তমা ভক্তি ত্রিবিধ, যথা—সাধন-ভক্তি ভাব-ভক্তি ও প্রেমা-ভক্তি। সাধন-ভক্তি আবার বৈধী সাধন ও রাগানুগা সাধন ভেদে দ্বিবিধ। ভগবানের প্রতি যাঁহাদের আকর্ষণ জন্মে নাই, অথচ শাস্ত্রশাসন দুঃখবিমুক্তি ও শান্তি-সুখের জন্য যাঁহারা ভগবানকে ভক্তি করেন, তাঁহাদের পক্ষে বৈধী সাধন উপযোগী। ইহা দীর্ঘকাল নিষ্ঠা-সহকারে অনুষ্ঠানের ফলে ভগবানের প্রতি আকর্ষণ জন্মিলে রাগানুগা সাধনের অধিকার হয়। স্মরণ মনন ও ধ্যান এই সাধনের অঙ্গ। ভাব-ভক্তি কল্পনা ও আবেগমূলক। কিন্তু ইহাতে ভগবানের প্রতি কতকটা আকর্ষণ আছে। 'ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু'মতে ইহার অপর নাম রতি। ভাব-ভক্তি বা রতি সাধন-ভক্তির ফলস্বরূপ হইলেও ইহাকে প্রেমের অঙ্কুরমাত্র বলা হয়। ভাব-ভক্তি আবার বৈধী ভাব-ভক্তি ও রাগানুগা ভাব-ভক্তি ভেদে দ্বিবিধ। সাধুসঙ্গ কীর্তন শ্রবণ প্রভৃতির মধ্যে এক বা একাধিক ভজনাঙ্গ-সাধনকে বৈধী ভাব-ভক্তি এবং ইহার পরিপক্ক অবস্থায় ইষ্টলাভের জন্য প্রগাঢ় তৃষ্ণার ফলে তাঁহার প্রতি আবিষ্টতা জন্মিলে উহাকে রাগানুগা ভাব-ভক্তি বলা হয়। এই আবিষ্টতাই রাগাত্মিকা ভক্তির প্রধান লক্ষণ। এই রাগাত্মিকা ভক্তি ক্রমে স্নেহ মান প্রণয় রাগ অনুরাগ ও ভাব অতিক্রম করিয়া মহাভাবে পরিণত হইয়া থাকে।

রাগাত্মিকা ভক্তি সম্বন্ধাত্মিকা ও কামাত্মিকা নামক দুই ভাগে এবং সম্বন্ধাত্মিকা ভক্তি শান্ত দাস্য সখ্য ও বাৎসল্য এই চারি ভাগে বিভক্ত। কামাত্মিকা ভক্তিতে এই চতুর্বিধ সম্বন্ধাত্মিকা ভক্তির চরম পরিণতি ভিন্ন ইহার নিজস্ব মধুর রস বা মহাভাব আছে। টীকাকার শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাভাবের লক্ষণ-বর্ণনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—"শ্রীকৃষ্ণের সুখেও ক্ষণকালের জন্য পীড়ার আশংকায় যে অসহিষ্ণুতা তাহাই রূঢ় মহাভাব। কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সকল সুখ যে সুখের লেশমাত্র নয় এবং বিশ্বের সকল বৃশ্চিক ও সর্পাদি দংশনজনিত দুঃখ যে দুঃখের লেশমাত্র নয়, এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণমিলনজনিত সুখ এবং শ্রীকৃষ্ণবিরহ-জনিত দুঃখ যে অবস্থা হইতে সঞ্জাত হয়, উহাই অধিরূঢ় মহাভাব। ইহার মোদন ও মাদন নামক দুইটি রূপ আছে।"[৫৬] এইজন্য বৈষ্ণবাচার্যগণ ইহাকে সর্বোত্তম ভক্তিরস বা মধুররস বলিয়া প্রচার করিয়াছেন।

৫৬ কৃষ্ণস্য সুখে পীড়াশঙ্কয়া নিমিষস্যাপি অসহিষ্ণু-তাদিকং যত্র স রূঢ়ো মহাভাবঃ। কোটিব্রহ্মাণ্ডগতং সমস্তসুখং যস্য সুখস্য লেশোঽপি ন ভবতি, সমস্তবৃশ্চিক-সর্পাদিদংশকৃতদুঃখমপি যস্য দুঃখস্য লেশো ন ভবতি, এবম্ভূতে কৃষ্ণসংযোগবিয়োগয়োঃ সুখদুঃখে যতো ভবতঃ সঃ অধিরূঢ়ঃ মহাভাবঃ। অধিরূঢ়স্যৈব মোদন মাদন ইতি দ্বৌ রূপৌ ভবতঃ।

সংসারে এক ব্যক্তি অন্যান্য ব্যক্তির সঙ্গে যে সকল ভাবাশ্রয়ে সম্বন্ধ স্থাপন করে, শান্ত দাস্যাদি পঞ্চবিধ সম্বন্ধাত্মিকা ভাব সেই পার্থিব ভাবসমূহেরই আধ্যাত্মিক রূপ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণে এই ভাবগুলি আরোপ করিয়া সাধন করিতে উপদেশ দেন। তাঁহারা বলেন, শান্তাদি পঞ্চবিধ রসের নিজস্ব পঞ্চবিধ স্থায়ী ভাব আছে। এতদ্ভিন্ন দাস্যে শান্তের ভাব, সখ্যে দাস্যের ভাব, বাৎসল্যে সখ্যের ভাব এবং মধুর রসে এই ভাবচতুষ্টয় পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন ঃ

"পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।
দুই তিন গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত বাঢ়য় ॥
গুণাধিক্যে রসাধিক্য বাঢ়ে প্রতি রসে।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে ॥"

—মধ্যলীলা

ইহা হইতে স্পষ্ট যে, শান্তাদি পঞ্চবিধ রস-সাধনার প্রত্যেকটি ভগবান লাভের পথ হইলেও এবং পর্যায়ক্রমে ইহাদের গুণাধিক্যে রসাধিক্য থাকিলেও প্রথমতঃ শান্তভাব সাধনায় সিদ্ধিলাভ না করিলে ক্রমে অন্যান্য ভাবসাধনের অধিকার জন্মে না। কাজেই সম্বন্ধাত্মিকা ভক্তিপথের সকল সাধককেই প্রথমে শান্তভাব সাধন করিতে হয়। ইহাতে সাফল্য লাভ করিলে ক্রমে তাঁহার দাস্যাদি ভাব-সাধনার যোগ্যতা জন্মে।

ভগবানে রতি বা অনুরাগ অতিক্রম করিয়া প্রগাঢ় প্রেম জন্মিলে শান্তভক্তির উদয় হয়। ইহাতে ঈশ্বরলাভভিন্ন অন্য কোন বাসনা থাকে না। এজন্য শান্তভক্তের মন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়দ্বারা বিক্ষিপ্ত হইবার সুযোগ না পাইয়া শান্ত আকার ধারণ করে। সম্পূর্ণ ভাবে বাসনাবিজয় এবং ভগবানে অনন্য অনুরক্তি শান্তভক্তির প্রধান লক্ষণ। এই দুইটি মহৎ গুণ অর্জনের ফলে শান্তভক্ত সুখ দুঃখ দ্বেষ মাৎসর্য হইতে মুক্ত হইয়া ধীর স্থির হন। হ্রদের স্বচ্ছ জল তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ না হইলে যেমন উহার তলদেশ দেখা যায়, তেমন বাসনা-তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ না হওয়ায় ভক্ত তাঁহার মন-হ্রদের তলদেশ দেখিতে পাইয়া শান্ত হন। এজন্য তাঁহার মনকে আয়ত্তাধীনে রাখাও তাঁহার পক্ষে সহজ হইয়া থাকে। তিনি সুখ ও দুঃখে বিচলিত হন না, এবং উভয় অবস্থাকেই প্রেমময় ভগবানের দান বলিয়া সমভাবে গ্রহণ করেন; জগতের সকল নরনারীকে সেই প্রিয়তমের সন্তান ভাবিয়া তিনি তাহাদিগকে প্রেমের দৃষ্টিতে দেখেন এবং পরম প্রিয় মনে করেন। তাঁহার নিকট মানুষ আর সাধারণ মানুষ থাকে না, পরন্তু প্রিয়তমের সন্তানবোধে প্রিয়তম হইয়া দাঁড়ায়। শুধু মানুষ নয়, অধিকন্তু সকল প্রাণীই প্রিয়তমের সৃষ্ট বলিয়া তাহাদের প্রতি তাঁহার প্রেমদৃষ্টি তথা সমদৃষ্টি ফুটিয়া উঠে। তিনি প্রিয়তমকে সর্বভূতে অধিষ্ঠিত দেখিয়া তাহাদের প্রতি প্রেমযুক্ত হন। এইজন্য সর্বভূতে সমভাব শান্তভক্তের অন্যতম প্রধান লক্ষণ।

শান্তভক্তি পরোক্ষ ও সাক্ষাৎ দুই ভাগে বিভক্ত। ভগবান দর্শনের পূর্বপর্যন্ত পরোক্ষ এবং দর্শন লাভ হইলে সাক্ষাৎকার। শান্তরস পরিপক্ক হইলে স্তম্ভ স্বেদ রোমাঞ্চ স্বরভেদ বেপথু বৈবর্ণ্য অশ্রু প্রলয় এই অষ্টসাত্ত্বিক বিকার উপস্থিত হয়। এইগুলির প্রত্যেকটি আবার ধূমায়িতা জ্বলিতা দীপ্তা উদ্দীপ্তা সুদীপ্তাভেদে পঞ্চবিধ। অধিকারী অনুসারে এই পাঁচটি আবার স্নিগ্ধ দিগ্ধ রুক্ষ প্রভৃতি বহুবিধ। নির্বেদ বিষাদ ঔৎসুক্য আবেগ বিতর্ক শান্তরসের ব্যভিচারী ভাব এবং শান্তি ইহার অব্যভিচারী স্থায়ী ভাব। ইহার ফল সমা (সম্প্রজ্ঞাত সমাধি) এবং পরে সান্দ্রা (অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি)। সনকাদি ঋষিগণ শান্তভক্তির দৃষ্টান্ত। ভক্তরাজ রায় রামানন্দের সহিত রসতত্ত্ব আলোচনায় প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেব শান্তরসকে রাগানুগা ভক্তির প্রথমাবস্থা বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, যথা :—

"প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।
রায় কহে দাস্য প্রেম সর্ব্বসাধ্য সার॥"

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা

দাস বা ভৃত্যভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করার নাম দাস্যরস বা দাস্যভক্তি। অনুরক্ত ভৃত্যের প্রভুভক্তিই দাস্যভক্তিসাধনার আদর্শ। ইহাতে শান্তরসের সকল গুণভিন্ন ইহার নিজস্ব দাস্যরস আছে। দাস্যরসের অপর নাম প্রীতি-ভক্তি-রস। ইহা সম্ভ্রমপ্রীতি ও গৌরবপ্রীতি নামক দুই ভাগে বিভক্ত। প্রভুর উপর ভৃত্যের প্রীতির নাম সম্ভ্রমপ্রীতি এবং পিতা-মাতার উপর সন্তানের প্রীতির নাম গৌরবপ্রীতি। ভগবানে এই প্রীতি উত্তরোত্তর বর্ধিত হইয়া স্নেহ মান প্রণয় অতিক্রম করিয়া রাগ জন্মিলে দাস্যভক্তি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় প্রীতি বা প্রেম দ্রবীভূত হইলে উহা স্নেহে পরিণত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় প্রিয়তম-বিচ্ছেদ ক্ষণকালও সহ্য হয় না। স্নেহ বর্ধিত হইয়া প্রেমাস্পদের সঙ্গসুখ ও বিচ্ছেদ বিশেষভাবে অনুভূত হইলে উহা হইতে মান, মান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে প্রণয় জন্মে এবং প্রণয় গাঢ় আকার ধারণ করিলে রাগ-ভক্তির উদয় হয়। রাগ-ভক্তি ভগবান-দর্শনের পূর্বাবস্থা। এই অবস্থার পূর্বক্ষণের তীব্র বিরহকে অযোগ বা সঙ্গাভাব এবং ভগবান দর্শনের পরের অবস্থাকে যোগ বা সঙ্গ বলে। অযোগ আবার উৎকণ্ঠিত ও বিয়োগ নামক দুই ভাগে বিভক্ত। উৎকণ্ঠিত মানে—ভগবান দর্শনের জন্য তীব্র ব্যাকুলতা এবং বিয়োগ মানে—ভগবদ্‌বিচ্ছেদ অসহ্য মনে করা। এই দুইটি ভাবের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিরূপে ভগবান লাভ হইলে উহাকে যোগ বলা হয়। ইহার ফল—সিদ্ধি তুষ্টি ও স্থিতি। প্রেমাস্পদ-প্রাপ্তিকে সিদ্ধি, অযোগ বা বিচ্ছেদের পর প্রেমাস্পদপ্রাপ্তিজনিত অপার আনন্দের নাম তুষ্টি এবং প্রেমাস্পদের সহিত এক সঙ্গে বাস স্থিতি নামে অভিহিত। উদ্ধবাদি দাস্যভক্তির দৃষ্টান্ত। শ্রীচৈতন্যদেব এই দাস্যরসকে রাগভক্তির দ্বিতীয় অবস্থা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, যথা :—

"প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।
রায় কহে সখ্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্য সার॥"

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা

ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধুভাবে উপাসনা করার নাম সখ্য-রস বা সখ্য-ভক্তি। শ্রীদামাদি শ্রীকৃষ্ণ-সখাগণ এই ভক্তির দৃষ্টান্ত। ইহাতে দাস্যরসের সকল গুণভিন্ন ইহার নিজস্ব রস আছে। এই রসের রসিক ভক্ত মনে মনে সর্বদা প্রেমাস্পদ শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্যে থাকিয়া তাঁহার সহিত আহার বিহার উপবেশন শয়ন ক্রীড়া সঙ্গীত পরিহাস প্রভৃতি করেন। ইহাতে এই রস ক্রমে অধিকতর ঘনীভূত হইয়া স্নেহ মান প্রণয় ও রাগ অতিক্রম করিয়া অনুরাগে পরিণত হয়। এই রস-সাধনা চতুর্বিধ, যথা :—(১) যে সকল সাধক শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা অধিক বয়স্ক তাঁহাদের পক্ষে তাঁহাকে সুহৃদ্‌রূপে, (২) যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা কম বয়স্ক তাঁহাদের পক্ষে তাঁহাকে সখারূপে, (৩) যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সমবয়স্ক তাঁহাদের পক্ষে তাঁহাকে প্রিয় সখারূপে এবং (৪) যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের কর্মসহায়ক তাঁহাদের পক্ষে তাঁহাকে প্রিয়নর্ম-সখা রূপে উপাসনা করা বিধেয়। বলভদ্র বিশাল সুদাম অর্জুন যথাক্রমে এই চতুর্বিধ রস-সাধনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শ্রীচৈতন্যদেব এই সখ্যরসকে রাগভক্তিরসের তৃতীয় পর্যায় বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন, যথা :—

"প্রভু কহে এহো উত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে বাৎসল্য প্রেম সর্ব্বসাধ্য সার॥"

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা

প্রিয় সন্তানভাবে বালগোপালরূপী শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করার নাম বাৎসল্য রস। ইহাতে শান্ত ও দাস্য রসের সকল গুণ ব্যতীত ইহার

নিজস্ব রস আছে। এই রসের রসিক ভক্তগণ বালগোপাল শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের লালনীয় পালনীয় রক্ষণাবেক্ষণীয় অনুগ্রহপাত্র শিক্ষা ও উপদেশ দানযোগ্য স্নেহাস্পদ সন্তান মনে করিয়া তাঁহার সাধনা করেন। শ্রীকৃষ্ণের শৈশবের কার্যাবলী পাঠ শ্রবণ মনন অনুধ্যান প্রভৃতি এই রস উদ্দীপনের সহায়ক। এই উপাসনায় ক্রমে স্নেহ মান প্রণয় রাগ উত্তরোত্তর বর্ধিত হইয়া অনুরাগে পরিণত হয়। এই সাধনা সাধারণতঃ নারী ভক্তগণের পক্ষেই সমধিক উপযোগী। বাৎসল্য ভাবসাধনে সাধিকার অষ্টসাত্ত্বিক লক্ষণ ব্যতীত সময়ে সময়ে স্তনদুগ্ধ ক্ষরিত হইয়া থাকে। যশোদা এই ভক্তিরসের দৃষ্টান্ত। শ্রীচৈতন্যদেব এই রস-সাধনকে রাগানুগা ভক্তির চতুর্থ স্তর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, যথা :—

"প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে কান্তাপ্রেম সর্ব্বসাধ্য সার॥"

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা

গোড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্রে এই কান্তাপ্রেম বা মধুর রসসাধন সর্বোচ্চ সাধন বলিয়া বর্ণিত। এই রস কেবলা শুদ্ধা ও মাধুর্যময়ী। এই রসের রসিক ভক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পতি এবং আপনাকে তাঁহার পত্নী মনে করিয়া সাধন করেন। বৈষ্ণবাচার্যগণ প্রচার করেন যে, প্রেমাস্পদ শ্রীকৃষ্ণই জগতে একমাত্র পুরুষ, অন্যান্য সকলেই প্রকৃতি। বিবাহিত দম্পতির বৈধ প্রেম অপেক্ষা অবিবাহিত নায়ক-নায়িকার অবৈধ প্রেমে মধুর রস অত্যন্ত প্রবল। এইজন্য এই রস-সাধনায় অবৈধ প্রেমের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। কিন্তু এই অবৈধতা এই রস-সাধক ভক্ত গ্রহণ করেন না, তিনি ইহার ঐকান্তিক মধুর আকর্ষণ মাত্র গ্রহণ করেন। এই রস-সাধনা লৌকিক দৃষ্টিতে অবৈধ হইলেও সাধনার দিক দিয়া ইহা অবৈধ নয়। কারণ, ইহা সম্পূর্ণ কামগন্ধবিবর্জিত। সর্ববিধ কামনা-বাসনা-লেশশূন্য না হইলে কাহারও এই রসসাধনের যোগ্যতা জন্মে না। এই সাধনে আত্মসুখ বা আত্মকামনার কোন স্থান নাই। সর্বপ্রযত্নে পরম প্রেমাস্পদ শ্রীকৃষ্ণের সুখ এবং তাঁহার কামনা চরিতার্থ করাই ইহার একমাত্র আদর্শ। এইজন্য এই রস-সাধনা অপার্থিব ও অপ্রাকৃত। ইহাতে পুরুষ-স্ত্রী লিঙ্গভেদ নাই। অবিচ্ছেদ শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গ, দশটি ইন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহার সেবা এবং তাঁহার সর্বকাম পরিপূরণ এই রস-সাধনার বৈশিষ্ট্য। বৃন্দাবনের ললিতাদি সখীগণ—বিশেষ করিয়া মহাভাবরূপিণী শ্রীরাধা এই ভাবসাধনার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

বৈষ্ণবাচার্যগণ বলেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তির মধ্যে চিচ্ছক্তি মায়াশক্তি ও জীবশক্তি প্রধান। এই তিন শক্তি অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা ও তটস্থা নামে অভিহিত। ইহাদের মধ্যে অন্তরঙ্গা-স্বরূপ-শক্তি প্রথম স্থানে অধিষ্ঠিত। সৎ চিৎ আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণের এই স্বরূপ শক্তির সৎ-অংশ সন্ধিনী চিৎ-অংশ সংবিৎ ও আনন্দ-অংশ হ্লাদিনী নামে আখ্যাত। আনন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ এই হ্লাদিনী-স্বরূপে আপনিই আপনার সুখ আস্বাদ করেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলেন :

"সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।"

—মধ্যলীলা

এই হ্লাদিনীর সারাংশই মধুর প্রেম। এই প্রেমের পরিণতি মহাভাব। শ্রীমতী রাধারাণী মহাভাবস্বরূপা। তিনি প্রেমে বিভাবিত শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের স্বরূপ-বিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণ-লীলারূপ মনোবৃত্তিসমূহ ললিতাদি সখীস্বরূপা। শ্রীরাধা প্রাকৃত শরীরবিশিষ্টা নহেন। তিনি ঘনীভূতা শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম। ইহাই তাঁহার দেহের তপ্ত-কাঞ্চনবৎ উজ্জ্বল বর্ণের কারণ। তিনি মহা-ভাবাবস্থায় শ্রীকৃষ্ণময়ী হইয়া সর্বভূতে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছিলেন। রায় রামানন্দ, মীরাবাঈ,

নরসিং মেহতা ও শ্রীরামকৃষ্ণদেব মধুররস-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

বৈষ্ণবাচার্যগণ বলেন, প্রেমাবতার শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকার করিয়া মধুর রস আস্বাদন করিবার জন্য নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন :—

"শ্রীরাধার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার।
নিজরস আস্বাদিতে কৈল অবতার॥"

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা

তিনিও নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ-মনন করিতে তাঁহার স্বরূপ হইয়া সর্বভূতে তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলেন :

"স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্তি।
সর্বত্র হয় তাঁর ইষ্টদেব স্ফূর্তি॥"

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা

গৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্রে শান্তাদি পঞ্চ ভাব সাধনার মাহাত্ম্য যেমন ভাবে কীর্তিত, আগমশাস্ত্রে জগৎকারণ শিবকে দাস্যভাবে বা পিতৃভাবে এবং তন্ত্রশাস্ত্রে জগজ্জননী শক্তিকে মাতৃভাবে ভক্তিযোগে উপাসনা করিবার মহত্ত্বও তেমন ভাবে বর্ণিত। শৈবশাস্ত্র বলে, ব্রহ্মরূপী শিব চিৎস্বরূপে নির্গুণ নিষ্কল ও নিষ্ক্রিয় এবং ক্রিয়াস্বরূপে সগুণ সকল ও সক্রিয় উভয়রূপী। প্রথমোক্তাবস্থায় শিবের মধ্যে শক্তি সুপ্ত বলিয়া তিনি অব্যক্ত। তাঁহার এই বাক্যমনাতীত অব্যক্তস্বরূপ জ্ঞানযোগগম্য। শেষোক্তাবস্থায় শিবের মধ্যে শক্তি সক্রিয় বলিয়া তিনি ব্যক্ত। তাঁহার এই ব্যক্ত সগুণস্বরূপ ভক্তিযোগে ভক্তের উপাস্য। শৈব ভক্তগণ এই সগুণ শিবকে পিতৃ বা দাস্যভাবে ভক্তিযোগে উপাসনা করেন। এই উপাসনার চরমাবস্থায় রাগানুগা ভক্তির আধিক্যে শৈব ভক্ত আপনার শিবস্বরূপ প্রত্যক্ষানুভব করেন এবং সর্বভূতে শিবকে প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়া থাকেন।

তান্ত্রিক ভক্তগণ শিবরূপী ব্রহ্মের সক্রিয় শক্তিকে প্রধানতঃ কালী তারা দুর্গা প্রভৃতি দেবীরূপে উপাসনা করেন। তাঁহাদের দৃষ্টিতে অগ্নি ও উহার দাহিকা শক্তির ন্যায় ব্রহ্ম ও শক্তিতে কোন ভেদ নাই। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, "ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী। একই বস্তু। যখন তিনি নিষ্ক্রিয়—সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কোন কাজ করছেন না, এই কথা যখন ভাবি, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই। যখন তিনি এই সব কাজ করেন, তখন তাঁকে কালী বলি। একই ব্যক্তি নামরূপ ভেদ।"[৫৭] শাক্ত ভক্তগণ বৈদান্তিকদের ন্যায় নামরূপাত্মক জগৎকে মিথ্যা মায়া বলিয়া উড়াইয়া দেন না। পরন্তু নাম-রূপের জগতের সকল ভূতকে শক্তির প্রকাশমূর্তি জ্ঞানে সত্য বলিয়া মনে করেন। তন্ত্রশাস্ত্র বলে, 'শক্তি নিত্যস্বরূপা, এই জগৎ তাঁহার মূর্তি, তিনি অখিল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া অবস্থিত।'[৫৮] তান্ত্রিক ভক্তের দৃষ্টিতে শক্তি অচিৎ নহেন। 'তিনি প্রকৃতিরূপা হইয়াও চিদানন্দপরায়ণা।'[৫৯] শক্তি মাতার ন্যায় এই বিশ্ব প্রসব করিয়া ইহাকে ধারণ ও পালন করিতেছেন। এইজন্য শাক্ত ভক্ত তাঁহাকে জগন্মাতারূপে ভক্তিযোগে উপাসনা করেন। এই সাধনায় মায়ের প্রতি সন্তানের ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও ভালবাসা-মিশ্রিত দাস্যভাব আরোপিত হইয়া থাকে। সর্ববাসনাবিমুক্ত হইয়া সর্বস্বরূপিণী জগন্মাতার নিরন্তর স্মরণ মনন করার ফলে শাক্ত ভক্ত বৈধী ভক্তি অতিক্রম করিয়া রাগানুগা ভক্তির স্তরে উপনীত হন। এই অবস্থায় তিনি প্রত্যক্ষ দেখেন যে বিশ্বেশ্বরীর ইচ্ছায়ই বিশ্বের সকল কার্য

৫৭ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, প্রথম ভাগ, ৪৯ পৃঃ

৫৮ নিত্যৈব সা জগন্মূর্তিস্তয়া সর্বমিদং ততম্—চণ্ডী

৫৯ অহং প্রকৃতিরূপা চেৎ চিদানন্দপরায়ণা।

—কুলচূড়ামণি

—এমন কি তাঁহার নিজ দেহ-মনের কার্যও পরিচালিত হইতেছে। তিনি রাগভক্তির প্রাবল্যে স্পষ্ট দেখিতে পান যে, 'দেবীই সর্বভূতে শক্তিরূপে বিরাজ করিতেছেন।'[৬০]

লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর পিতৃভাব মাতৃভাব সম্বন্ধাশ্রয়ে রাগানুগা ভক্তির প্রত্যেক সাধনার চরমাবস্থায় প্রেমিকভক্তগণ আপন আপন ইষ্টকে আত্মস্বরূপে এবং সর্বভূতে সন্দর্শন করেন। রাগানুগা বা পরা ভক্তির ইহাই পরিণতি। এই অপার্থিব প্রেমের রাজ্যে এক এক মিলিয়া দুই না হইয়া এক হয়। প্রেমিক ভক্তের স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকে আপনাকে প্রেমাস্পদের মধ্যে বিলাইয়া দিতে—তাঁহার মধ্যে নিমজ্জিত হইতে—তাঁহার সত্তার সঙ্গে আপনার সত্তাকে এক করিতে। এইজন্য প্রেমিক রাগানুগা প্রেমের সর্বোচ্চ অবস্থায় প্রেমাস্পদের সঙ্গে একত্ব অনুভব করেন। কিন্তু দ্বৈতভাব না থাকিলে প্রেমাস্পদের সঙ্গে প্রেমিকের সম্বন্ধাশ্রিত রসানুভব সম্ভব হয় না। অদ্বৈতরাজ্যে জ্ঞাতা জ্ঞেয় ও জ্ঞান এক হয়। তখন কে রসানুভব করিবে? এইজন্য অনুরাগী প্রেমিক ভক্ত জোর করিয়া তাঁহার মনকে দ্বৈত-রাজ্যে নামাইয়া প্রেমাস্পদের সঙ্গে সম্বন্ধাশ্রিত রস-সম্ভোগ করেন। এই অবস্থায় ভক্তের সার্বজনীন প্রেম বা সর্বভূতে প্রেম স্বাভাবিকভাবে উপস্থিত হইয়া থাকে। প্রেমাস্পদ ভগবান সমষ্টি এবং এই ব্যষ্টিজগৎ তাঁহারই অভিব্যক্তি। 'তিনি অবিভক্ত হইয়াও ভূতে ভূতে বিভক্তের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন।'[৬১] 'তিনি এক হইয়াও বহু দেহে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন।'[৬২] এইজন্য প্রেমিক ভক্ত সর্বভূতে প্রেমাস্পদকে দর্শন করিয়া সকল রূপে তাঁহাকেই অভিব্যক্ত দেখিয়া সকলকে আন্তরিক ভালবাসেন। তখন কোন জীব আর তাঁহার দৃষ্টিতে সাধারণ জীব থাকে না, সকলকেই তিনি প্রেমাস্পদরূপে দর্শন করেন। এইজন্য সার্বজনীন প্রেম বা বিশ্বপ্রেম রাগানুগা প্রেমের অমৃতপ্রসূ ফল।

৬০ যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা। —চণ্ডী

৬১ অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্। —গীতা, ১৩।১৬

৬২ ত্বমেকোঽসি বহূননুপ্রবিষ্টঃ। —তৈঃ আঃ, ৩।১৪।৩

"প্রথমে সমষ্টিকে ভালবাসিতে না শিখিলে ব্যষ্টিকে ভালবাসা যায় না। ঈশ্বরই সমষ্টি। সমগ্র জগৎটাকে যদি এক অখণ্ডস্বরূপে চিন্তা করা যায়, তাহাই ঈশ্বর, আর জগৎটাকে যখন পৃথক্ পৃথক্ রূপে দেখা যায়, তখনই উহা জগৎ—ব্যষ্টি। সমষ্টিকে—সেই সর্বব্যাপীকে—যে এক অখণ্ড বস্তুর মধ্যে ক্ষুদ্রতর অখণ্ড বস্তুসমূহ অবস্থিত, তাঁহাকে ভালবাসিলেই সমগ্র জগৎকে ভালবাসা সম্ভব।" —স্বামী বিবেকানন্দ

ভাগীরথী

ভাস্কর

ওগো ভাগীরথী দেবী স্নেহ-নির্ঝরিণী,
চিরপ্রসন্ন স্মিত হাসি বিলাইছ তুমি
যুগ যুগান্ত ধরি'। তোমার পুণ্য বারি
ধুয়ে নিয়ে যায় যত ঘৃণ্য-আবর্জনা,
হরে নেয় নিমেষেতে মনের কালিমা,
তাপদগ্ধ চিত্তে দেয় শান্তির পরশ
যাদুমন্ত্র সম। স্নিগ্ধ, শান্ত হৃদয়ের
কোমল আহ্বান
তোমার তরঙ্গধ্বনির মাঝে।
মৃদুমন্দ বায়ে হিমশীকররাশি
বহি' আনে তোমার অঞ্চল হ'তে
অযুত অমৃতকণা,
ভরে দেয় মন প্রাণ শান্তির আবেশে।
কুলু কুলু কলতান দিবসযামিনী
জাগায় হৃদয়মাঝে সুরের স্বপন।
আঁখি আসে মুদি', চেতনা হারাই
কল্পনার সুরলোকে।

ওই যে তোমারি বুকে পরম নির্ভয়ে
পণ্যের তরণীখানি চলেছে বাহিয়া
সপ্ সপ্ বাহি' দাঁড়, কিংবা স্ফীত পাল
বিস্তারি' আকাশে, তোমারি পুণ্যের
গাথা স্মরি' অবিরত পুলকিত তনুমন ;
ওই যে যন্ত্রের টানে আলোড়ি' সলিল
চলেছে দুর্বারগতি বিরাট তরণী
উদ্‌গারি' ধূমের শিখা—
তোমারি আশ্রয়ে, তোমারি মহিমা
গাহি' পলে পলে, চলে নাচি' নাচি'।
ওই যে আরোহী বহু লয়ে সযতনে
পারে যায় তরীখানি বিচিত্রবরণী
কুসুমের ঝাঁপি যেন, দেবতার পায়ে
নৈবেদ্য সাজানো ডালি—
পরম আনন্দে গাহি' গান,
আকাশের সাথে পাতায়ে মিতালি,
চলে যায় তোমারি স্নেহের আঁচলখানি
ধরি, পার হতে পারে। রেখে যায়
মনের নিভৃত পাতে সোনালি স্মৃতির রেখা।
ওই দেখ, যায় বেয়ে জেলের ডিঙাখানি
ছড়ায়ে ত্রিকোণ জাল, তুলে লয় মুঠি মুঠি
তোমারি বারির তলে মৎস্য রাশি রাশি,
ভরিয়া বিপণি-ডালা লোলুপ শোভায়।

গৈরিক বসনপ্রান্তে নীলপাড় যেন
দুই পারে বৃক্ষরাজি শোভিছে সতত,
তোমারি অমৃত-বারি-পূরিত-পরাণে
চঞ্চল পাতার রাশি ছড়ায়ে আকাশে
হাসিয়া ঢলিয়া যেন পড়িছে মাটিতে।
ছোট বড় সাদা কাল লাল নীল কত
বিচিত্র বর্ণের জাল বুনি' দেহ পরে,
একা একা, ঝাঁকে ঝাঁকে বিহগের কুল
ভুঞ্জি' তব বুকে স্নিগ্ধ শীতল সমীর,
বসে আসি' কুতূহলে বৃক্ষের শাখায়—
পাতাঘেরা মায়াপুরী মাঝে। সুস্বন কূজনে
ভরি' তোলে দিবানিশি
শ্রবণকুহর অপূর্ব মধুর রাগে।

ওই যে ওপারে হেরি দূরে সারি সারি
বিচিত্র সৌধের শ্রেণী—কত যন্ত্র ঢাকি বুকে
শোভিছে তোমারি তটে, তোমারি করুণা
করি পান মিটাইছে চিরাতৃপ্ত তৃষা।
তোমারি সলিল বাহি আসে আর যায়
যন্ত্রদানবের ক্ষুধাতৃষ্ণা মিটাবার
লক্ষ ভোগরাশি। তোমারি বিশাল বক্ষে
বহু দিবানিশি কোটি কোটি পরাণের
একান্ত সম্বল। ধীরে, সযতনে, আকুল হৃদয়ে

পরিবেষ দেশে দেশে বিবিধ পণ্যের ডালি,
বাঁচাও মরণ হ'তে কত বিশুষ্ক পরাণ,
পরাও প্রাণের মালা কত মরণের গলে।

মাঝে মাঝে এপারে ওপারে,
ছোট বড় নদী খাল বাহি'
প্রসারি স্নেহের কর দূরে, বহু দূরে,
বিতরি' করুণা-বারি পরম আদরে,
তুলিয়াছ ভরি জীবন-সম্পদে
কত শত জনপদ। তোমারি মধুর
পীযুষধারা আকণ্ঠ করিয়া পান,
কত শুষ্ক ক্ষেত্র কত বিশুষ্ক বিটপী
হয়েছে ধন্য প্রাণের পরশে,
ফুলে ফলে ভরি' পরম হরষে,
আপনারে বিলায়েছ কল্যাণের দ্বারে।

কত মরু, কত নির্জন ভূভাগ,
কত নীরস তড়াগ, কত উষর প্রান্তর
তোমার করুণাবিন্দু—মধুর অমৃত,
বিধাতার আশীর্বাদ ভরিয়া অঞ্জলি,
পান করি প্রাণ লভি' উঠেছে হাসিয়া,
জীবনস্পন্দন তায় উঠেছে জাগিয়া।
কত নর কত নারী বেঁধেছে সংসার,
কত গৃহে জ্বালিয়াছে সন্ধ্যার প্রদীপ,
কত পথ দীর্ঘ হ্রস্ব ঋজু ও কুটিল
উঠেছে গড়িয়া গ্রামে গ্রামান্তরে।
কত উদ্যানে উঠিয়াছে ফুট' সুগন্ধি কুসুম,
কত সরোবরে উঠিয়াছে হাসি পঙ্কজ মনোরম
ভূমিতল হ'তে লভি তোমার পুণ্যধারা।
কত কুটীর, কত হর্ম্ম্য, কত যন্ত্রের আগার
ক্রমশ উঠেছে গড়ি' তোমারি আশ্রয়ে
তোমারি প্রশ্রয় লভি'। বিচিত্র নগরী কত
পণ্যের পসরা লয়ে প্রতি রাজপথে,
আকাশ উজল করি আলোর ছটায়,
জ্ঞানে, কর্ম্মে, ধর্ম্মে, যত মানুষের মন
ভরিয়া দিবসরাত্রি, তোমারি ছায়ায়
যাপিছে অনন্তকাল।

প্রশান্ত তটে বসি তোমার পবিত্র নীরে
পূজার অঞ্জলি ভরি' ভাসায়ে কুসুমচয়,
স্নিগ্ধ শান্ত সমীরণে জুড়ায়ে তপ্ত হিয়া
তর্পণরত কত নরনারী ভুলিছে সকল জ্বালা।
ওই যে সদলে আসে বৃদ্ধ যুবা শিশু
ক্রন্দনরত যুবতী কিশোরী, সঙ্গে প্রিয়জন,
আত্মীয়ের স্কন্ধে লীন নিশ্চল শীতল,
নিঃশ্বাস নাহি বয়, বক্ষের স্পন্দন
থামিয়াছে চিরদিন তরে।
সব সুখ দুখ, আশা ও নিরাশা,
বন্ধুত্ব, কলহ, প্রীতি, হিংসা, দ্বেষ,
হাসি, কান্না, রোষ, মান, অভিমান,
কত অস্ফুট বেদনা, কত নিভৃত বিলাপ,
কত অশ্রু, কত দীর্ঘশ্বাস,
সকলি গিয়াছে থামি।
কত স্নেহ, কত ব্যথা, কত কল্পনার জাল,
কত চেষ্টা, কত শ্রম, কত মহৎ প্রয়াস—
শুব্ধ সব, সব শেষ কালের ফুৎকারে
নির্ম্মম অশনি-কঠিন।
এখনি উঠিবে জ্বলি' হুতভুক্‌শিখা
গ্রাসিবে নিঃশেষ করি শেষ কণাটুকু
ওই কম তনুখানির। বল, দীপ্তি
শৌর্য, বীর্য, কান্তি মনোরম,
সকলি যাইবে নিভি' অনলের সাথে,
বিলুপ্ত, নিশ্চিহ্ন হবে।
তোমারি শান্তির বারি ধুয়ে নেবে শেষে
ভস্মের ধূসর রাশি, এনে দেবে মনে
ক্লান্ত বৈরাগ্য-ছায়া; ম্লান মধুরিমা
তোমার শীকর-কণা বুলাবে
দেহে ও মনে শোকতপ্ত স্বজনের।

মরি, মরি, ও কি শোভা বিচিত্র বরণে
ঢেকেছে তটিনীতট উজলি' আকাশ
সন্ধ্যার করুণ রাগে। জুড়ি' পাশাপাশি
দু'খানি তরণী পরে বসায়ে যতনে
মাতৃমূর্তি অনুপম—উজ্জ্বল প্রতিমাখানি,
ঘেরি তায় নৃত্যে, বাদ্যে, গাহি' বিদায়ের
করুণ মাধুরী ভরা বিজয়ার তান।
স্নেহভরে লবে অঙ্কে হিমাদ্রি-দুহিতা—
বর্ষ-অন্তে ফিরি' যাবে আপন আলয়ে
আঁধারে ডুবায়ে যত পূজার মণ্ডপ,

ধূপ, দীপ, কুসুম, চন্দন
সব রবে পড়ি'।
তোমার শান্তিবারি ছড়ায়ে নম্র শিরে
শিশু, বৃদ্ধ, যুবা, স্বজন বান্ধব,
লভিবে পরম শান্তি। ভুলি' আত্মপর,
ভুলি' কলহ, সংশয়,
ভুলি' অভিমান, মরমের যত খেদ,
ভুলি' উচ্চনীচ, ধনী ও নির্ধন,
ভুলি' শোক তাপ, অন্তরের জ্বালা,
আলিঙ্গিবে পরস্পরে স্নেহে ও সম্ভ্রমে,
প্রণতি আশিসবাণী ছেয়ে যাবে
অঙ্গনে, উদ্যানে, পথে, দেশে ও বিদেশে।

পুণ্যতোয়া ভাগীরথি!
তোমার নির্মল তটে, হিমাদ্রি-পাদমূলে
যাপিছে দিবসযামী
কত তাপসের দল। তেয়াগি' সংসার,
তেয়াগি' বৈভব, সুখ, ছিঁড়ি করমের
সুবর্ণ শৃঙ্খল, আপনারে ডুবায়ে
আপন মাঝে, স্মরি' বিধাতার
নীরব অভয়বাণী, ভুলিছে আপনা
গভীর ধেয়ান মাঝে।
কুলু কুলু কলতানে বহি' যায় সুশীতল নীর,
নীলকণ্ঠ জটাজাল হ'তে নামিয়া ধরায়
হিমালয় বক্ষ ভেদি',
ক্ষীরসম পিয়াইছ অশান্ত আত্মায়
দেবতা-প্রসাদ।
উঠিয়াছে গড়ি' তোমার উভয় তটে
শান্তিকুঞ্জ শত শত ধরম-আশ্রয়
তাপসবাঞ্ছিত তপোবন।
সিদ্ধজনপদরেণু বহিয়া মাথায়
হাসিয়া উঠিছে কত তীর্থজনপদ
পান করি পুণ্য বারি। দেশ দেশান্তর হ'তে
দলে দলে আসি' লক্ষ নর নারী
অবগাহি' পুণ্য নীরে, পাসরি সকল ভয়,
সব পাপ, সব কর্ম, সব চিন্তাভার
নিঃশেষে অর্পণ করি তোমার চরণ প্রান্তে,
নিয়ে যায় পরম শান্তি।

কত দেবালয়, কত মন্দির উঠিয়াছে গড়ি'
তটপ্রান্তপরে। আরতির দীপশিখা,
ধূপের সুরভি ধূম, শঙ্খের স্বনন,
মন্ত্রের উদাত্ত সুর, কুসুম-সুবাস,
প্রণতি, ভকতি, কত নীরব নিবেদন,
ভেসে যায়, মিশে যায়, ডুবে যায়
তোমার দিব্য কলতানে।
কাচসম স্বচ্ছ নীরে পড়ে ছায়া মন্দির-চূড়ার,
লতাগুল্মবিশোভিত তোরণ উলটি'
পড়ে যেন ভয়ে ভয়ে তোমার বক্ষ 'পরে,
কায়া ও ছায়ায় মিলি রচে যেন
অপূর্ব স্বপন,
জাগায় মনের মাঝে বিস্মৃতির মোহ।

জীবনের যত কিছু সম্পদ, জঞ্জাল,
যত মোহ, যত আশা, যত ভাগ্যবিড়ম্বনা,
যত স্নেহ, যত প্রীতি, কলহ, বিদ্বেষ
শান্তির সুষুপ্তি-সুখ, অশান্তির জ্বালা,
যত রঙিন স্বপন আর ব্যর্থ ব্যাকুলতা,
যত হর্ষ, যত হাসি, যত শোক তাপ,
যত মান যশ, যত নিন্দাবিষ,
বল, স্বাস্থ্য আর যত ব্যাধিকীট,
শৈশব, কৈশোর, যৌবনের পারে
বার্ধক্যের শেষ সীমা ডিঙায়ে
এনেছে তোমারি তীরে অন্তিম নিঃশ্বাস
ফেলিতে পরম ক্ষণে,
ভুলিতে সকল মোহ। আয়ু হবে শেষ,
শুনি তব কুলু কুলু পরম আশ্বাস বাণী,
স্মরি' তব পুণ্যগাথা জন্মজন্মান্তর বাহি'
কোটি কোটি মানবের অদেহী আত্মার
ঐহিক স্বরগতটে। নিভে যাবে চিতানল,
কোলে তুলে লবে তুমি অশান্ত আত্মার
নিশ্চিহ্ন তনুখানি পরম করুণাভরে।

রজনী হয়েছে শেষ। মুক্ত বাতায়ন—
পথে হেরি নভোনীলে
ধূসর আলোর আভা,
ভেঙে যায় নিশীথের স্বপন-জড়িমা,
সরে যায় ধীরে ধীরে আঁধারের

স্বচ্ছ সূক্ষ্ম উত্তরীয়
প্রকৃতির বক্ষ হ'তে।
শান্ত তব তট, শান্ত নীররেখা ;
উঠিছে জাগিয়া আপন কুলায় মাঝে
বিবিধ বিহগকুল, মধুর কাকলী
ধ্বনিয়া উঠিছে চারিভিতে
বরষি অমৃতধারা শ্রবণবিবরে।
ছোট ছোট পাখা মেলি' ডাল হ'তে ডালে,
গাছ হ'তে গাছে করে বিচরণ
পরম আনন্দে নাচি'।
তোমার তটের পাশে কুট কুট করি'
ছোট ছোট ঠোঁট দিয়ে খুটি' অবিরত
আহার সন্ধান করে কত ছোট পাখী
অবোধ শিশুর মত।
ওই বুঝি এক ঝাঁক টিয়া
বিল্ববিটপিশিরে বসিল উড়িয়া
সুস্বনে ভরিয়া আকাশ। মিশে গেছে তার
সবুজ পালক গাছের পাতার সাথে
একেবারে একাকার। ছোট ছোট টুকটুকে
লাল ঠোঁটগুলি শোভিছে সম্মুখে
ফুলের কুঁড়ির মত। ঠোঁটে ঠোঁট স্পর্শ করি
দিতেছে আহার বুঝি
মাতা তার সন্তানেরে আদর করিয়া।
তোমার শীতল তটে প্রভাতের বায়ে
মেলিতেছে ধীরে ধীরে কুসুমের আঁখি,
ছড়ায়ে রূপের ছটা, সুরভি বিলায়ে—
তোমার অঞ্চলপ্রান্তে।
বাতায়নপথে চাহি' চাহি'
নয়ন ফিরিতে নাহি চায়।
অপলক দৃষ্টি হানি শুদ্ধ হয় মন
তোমার প্রশান্ত মায়া মাখে চোখে
আপনভোলান অঞ্জনের রেখা।

তোমার পূরব তটে তরুরাজি পিছে
উজলি' উঠিছে ওই নীলাভ আকাশ,
দিগন্তবলয় উঠিতেছে হাসি
আঁধারের গর্ভ হ'তে। ওই যে রক্তিম রেখা
উঠিছে বিকশি', ছড়ায়ে অপূর্ব ছটা
কৈশোরের কল্পনার মত
আকাশ মনের মাঝে, তাল নাই, নাই ছন্দ,
নাই তর্কের জঞ্জাল, আছে শুধু
বিচিত্র বর্ণের লীলা, মোহ, স্বপ্ন, মায়া।
ওই যে উঠিছে ক্রমে সোনার প্রতিমা
গৃহচূড়া তরুশির ছাড়ি',
ব্রহ্মাণ্ডের হৃৎপিণ্ড যেন খণ্ড খণ্ড করি'
তিমিরের পাশ ধরিত্রীর গাত্র হ'তে,
আলোর শোণিত ধারা
সঞ্চারিছে ধীরে ধীরে পৃথিবীর ধমনীতে।
ওকি! আগুন লাগিল বুঝি
জাহ্নবীর জলে।
না, না, আগুন তো নয়,
ও যে অলক্তকলেখা
লিখিছে তরুণ অরুণ-কর
নিপুণ শিল্পীর মত
বুলায়ে রক্তিম তুলি লক্ষ ঊর্মি পরে।
জ্বলে ওঠে ঝকমকি মণিমুক্তাসম
দূর্বাদলশীর্ষপরে শিশিরের মালা,
জ্বলে ওঠে গৃহশির,
নবকিশলয় হাসি ওঠে তরুশিরে
প্রভাত-অরুণ-রাগে।
রক্ত টিপ পরি ভালে প্রকৃতি সুন্দরী
হাসি ওঠে রজনীর মায়া পরিহরি'
নীল আকাশ, লাল জল,
হরিৎ পত্রের মেলা,
বিচিত্র কুসুমরাশি—
প্রকৃতির গায়ে যেন করে ঝলমল
স্বর্ণরৌপ্য-বিশোভিত চঞ্চল অঞ্চল।
ভুলায় আমারে,
ভুলায় আমার মন, কেড়ে নেয়
তর্ক, যুক্তি, কাজের হিসাব।
বসি' বসি' শুধু দেখি, দেখি আর দেখি
অপরূপ রূপছটা। মনে হয়,
কে তোমারে গড়িল এমন ক'রে
রূপরসগন্ধভরা মোহিনী মায়ায়
করিতে হরণ ভুবনের মন,
কোন শিল্পী আঁকিল এ স্বরগের ছবি
মরতে, তোমারি উভয় তটে!

নিদাঘ মধ্যাহ্ন। তপ্ত বায়ু,
তপ্ত ভূমিতল। খুঁজি' মরে জীবকুল
একটুখানি শীতল আশ্রয়।
মধ্যাহ্নের রবি প্রচণ্ড রবিকর
তোমার স্নেহের কাছে হ'ল পরাজিত
কত নর নারী জুড়ায় তপ্ত হিয়া
তোমারি সলিল মাঝে। কত কিশোর,
কত যুবক করে জলকেলি
তোমার স্নিগ্ধ নীরে।
তরণীর দাঁড়ী মাঝি শ্রান্ত কলেবরে,
ভিড়ায়ে আপন তরী শান্ত বালুতটে
সারি স্নানাহার লভিছে বিরাম,
গুন্ গুন্ গাহি গান' পড়িছে ঢলিয়া
নিদ্রার আবেশে।
কিংবা অনুকূল বাতাসের গায়ে
প্রসারি' প্রকাণ্ড পাল,
ধরি' রজ্জু সুকঠিন হাতে,
স্থির হয়ে বসি সযতনে,
দ্রুত তরী বাহি' যায় তর্ তর্ বেগে,
ঊর্মিমালা গাহে গান কল কল তানে।
তপ্ত দীপ্ত খর রবিকর
তোমার স্নেহের স্পর্শে
মরমে মরিয়া যায়,
ভুলে যায় তাপ, নিদাঘের বহ্নিরোষ,
গলে যায়, মিশে যায়
শীকরকণার সাথে
মৃদুমন্দ সমীরণে তরঙ্গদোলায়।
সাধ হয়, যাই গৃহ ছাড়ি'
ধরি ওই ক্ষুদ্র তরীখানি,
পাটাতনপরে এলায়ে ক্লান্ত দেহ,
রাখি শির বাম বাহু পরে,
মুদি' নেত্র গভীর আরামে
দেখি স্বপ্ন মর্ত্যে স্বরগের।

অস্তাচলে যায় রবি
ছড়ায়ে পশ্চিমাকাশে রক্তবর্ণচ্ছটা।
মুঠি মুঠি সিন্দুরের রাশি
কে যেন ফেলিয়া দেছে দিগন্তের গায়ে।
নেমে আসে সন্ধ্যার মলিন ছায়া,
ফিরে আসে নীড় পানে
শ্রান্ত পক্ষ মেলি কোন মতে
যত বিহগের দল,
ভরে ওঠে শাখা পত্রে যত বিটপীর
ক্লান্ত মৌন চঞ্চলতা।
আঁধার নামিয়া আসে যেন কোন
মোহ আবরণ মেলিয়া, ঢালিয়া
ফেলে তোমার ওই ধরণীর তনু।
মরি, মরি, ওই যে উঠিছে ফুটি'
আঁধার সলিল ভেদি সুবর্ণ পঙ্কজ
বিতরি কোমল কান্তি,
পরায়ে তোমার বক্ষে সুবর্ণের হার।
ঝকমকি ওঠে জল, অশ্বথের শাখা ভেদি'
নারিকেল বৃক্ষমাঝে ভেসে ওঠে
সোনার প্রতিমাখানি, ছায়া তার পড়ে
তব বুকে। ঝলমল ক'রে ওঠে যেন
সোনালি জরিতে মোড়া সাড়ীর অঞ্চল।
কুহকিনী প্রকৃতির অপূর্ব মাধুরী
নৃত্যে ছন্দে লীলায়িত
তোমার মোহন রূপে।
অপূর্ব এ রূপ! নাই সাধ্য কোন
মর্ত্য মানবের শিল্পসাধনায়
ফুটাতে এমন আঁধার আলোর
মোহিনী চিত্র-লেখা।

ক্রমশ উঠিছে চাঁদ নীলাকাশ বাহি',
রজতের থালা যেন ছড়ায় অমৃত কর
মরতের শির পরে।
তোমার কোমল বক্ষ আবরে যতনে
শুভ্র জ্যোৎস্নারাশি।
পত্র, পুষ্প, লতা, গুল্ম, দূর্বাদল
আবেশে ঘুমায়ে পড়ে শ্বেত-আস্তরণে
ঢাকি সর্বদেহ।
আকাশ হাসিয়া ওঠে, ক্ষুদ্র তারকার দল
লজ্জায় লুকায় মুখ,
কুমুদ কহ্লার ফুটি' ওঠে,
কমনীয় মুখখানি তুলি' ধরে
ঊর্ধ্বে দয়িতের পানে, সার্থক করিয়া তোলে
আপনার রূপ সলিল শয়ন পরে।

জোছ্‌নামধু করি পান আবেশে বিহ্বল
তনুখানি তব এলাইয়া বুঝি
মৃদু কলতানে ভরিয়া শ্রবণ মন
বহি' যাও ধীরে ধীরে। মৃদু পদক্ষেপে
যথা যায় অভিসারে যৌবনভার বহি'
তরুণী অলসছন্দা।

যামিনী দ্বিপ্রহর। ভাসে অসীম আকাশে,
নীলাম্বুধি পরে শ্বেত পদ্মসম
ভুবনভুলানো রূপ।
নিদ্ যায় টুটি। খুলি বাতায়ন
চাহি আকাশের পানে।
শুভ্র স্নিগ্ধ রূপে ঝলসি ওঠে চোখ,
নেচে ওঠে মন অজানা পুলকে।
প্রসারিত দেখি ওই স্তব্ধ তড়াগ যেন
স্রোতস্বিনী লুপ্তগতি।
শ্বেতমর্ম্মর কাটি বুঝি রচেছে শুভ্র থালি,
অথবা কাচের দর্পণ বুঝি বিছায়েছে
যত্ন করি, ধরিবারে বুকে নিশীথশয়নে
চাঁদের বিম্বখানি।
নিস্তব্ধ নিঝুম, নাহি শব্দলেশ।
বালুতটপরে ক্ষুদ্র বীচিমালা
ক্বচিৎ গাহিয়া ওঠে অস্ফুট কাকলী।

কখনো সহসা মর্ম্মরি' ওঠে
মৃদু বায়ুভরে তরুশির শাখা।
ওই অশ্বত্থের শাখে নিভৃত কুলায়ে
ডাকি' ওঠে কলকলি হয়তো সহসা
রাত্রিরে দিবস ভাবি' নিদ্রালস পাখী।
বরষে জোছনা অঝোর ধারে
রৌপ্যকলসী হ'তে দিব্যাঙ্গনা যত
পরিয়া তারার মালা।
মন নাহি মনে মোর,
রুদ্ধ যেন কল্পনার দ্বার,
জোছনায় ভেজা শয়নের পানে চাহি'
চাহি' দেখি, পুন তোমারি অরূপ রূপ
ভাসে নয়নের পরে,
পশে মরমের কোণে,
ভরে মন প্রাণ কোন অজানা পুলকে ;
স্বপন নামিয়া এল বুঝি
মোর বাতায়নপথে !
ওগো জাহ্নবি, তোমার বিচিত্র মায়া
বিহ্বল করে দিবসযামিনী
আমার চিত্তকায়া।

বিজ্ঞানে অজ্ঞান

অধ্যাপক শ্রীযোগেশচন্দ্র সিংহ

পাশ্চাত্য জগৎ বিজ্ঞানের মোহকর আবিষ্কারে সমৃদ্ধ হইয়াও অজ্ঞানতায় সমাচ্ছন্ন। সে আজ বিজ্ঞানে বিভ্রান্ত ; মূঢ়তার স্থূলহস্তাবলেপে আত্মঘাতী। কেননা, এই বিজ্ঞান জ্ঞান-বিবর্জ্জিত। ভারতের ঋষিগণ বিজ্ঞানকে অন্যভাবে দেখিয়াছেন। তাঁহারা জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সমন্বয়ের মধ্যে সত্যের সন্ধান করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এই পূর্ণতম তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন—"জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ—আমি তোমার নিকট বিস্তারিত ব্যাপক জ্ঞানের সহিত মূল তত্ত্বজ্ঞান অশেষে বর্ণনা করিতেছি।" এখন আমরা দেখিব এই বিজ্ঞান এবং জ্ঞানের পার্থক্য কোথায় ?

ভগবান নিজেই বলিয়াছেন, তাঁহার দ্বিবিধ প্রকৃতি—পরা ও অপরা। ত্রিগুণময়ী জড় প্রকৃতি এই চরাচর বিশ্ব তাঁহার অপরা প্রকৃতি ;

আর এই অপরা প্রকৃতিকে বিধৃত করিয়া, এই বিচিত্র বিশ্বপ্রপঞ্চকে ব্যাপ্ত করিয়া, ভগবানের দেশকালাতীত যে অপরিবর্ত্তনীয় চৈতন্যশক্তি—'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে'—তাহাই তাঁহার পরা প্রকৃতি। এই পরা প্রকৃতি ও ভগবান একই। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে সদাশিব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন, "মমরূপাসি দেবি ত্বং ন ভেদোঽস্তি ত্বয়া মম—হে দেবি, তুমি আমারই রূপ, তোমার সহিত আমার ভেদ নাই।" প্রকৃতি পরম পুরুষের কার্য্যসাধিকা শক্তি, তাহার কোন স্বতন্ত্র পৃথক অস্তিত্ব নাই। এই বিশ্বের রূপে আবির্ভূত সমস্ত ভূত, সমস্ত পদার্থ এই একই পরা প্রকৃতিরই আত্মপ্রকটন। এই অনির্ব্বচনীয় অধ্যাত্মসত্তা হইতেই জগৎ উদ্ভূত। গীতায় ভগবান বলিতেছেন—

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥
এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।

পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সহ মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার, এই আমার অষ্টধাবিভক্ত প্রকৃতি। ইহা অপরা প্রকৃতি, কিন্তু ইহা হইতে ভিন্ন যাহা, তাহা আমার পরা প্রকৃতি। এই পরা প্রকৃতিই জীব হইয়াছে এবং তাহার দ্বারাই এই জগৎ বিধৃত রহিয়াছে। সর্ব্বভূত এই প্রকৃতি হইতে জাত, ইহা তুমি জানিও।" ত্রিগুণময়ী স্থূল অপরা প্রকৃতির প্রত্যেক অণুতেও সেই চৈতন্যেরই লীলা চলিতেছে।

কোন কোন ভাবসাধক বলিয়াছেন, এই নশ্বর সৃষ্টিপ্রপঞ্চের মধ্যে যে অবিনশ্বর পরতত্ত্ব অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়াছে, তাহা জানাই জ্ঞান, আর সেই এক নিত্য পরতত্ত্ব হইতে এই বিবিধ নশ্বর পদার্থের কিরূপে উৎপত্তি হয়, তাহা বুঝাই বিজ্ঞান। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন:

"নবৈকাদশ পঞ্চ ত্রীন্ ভাবান্ ভূতেষু যেন বৈ।
ঈক্ষেতাথৈকমপ্যেষু তজ্‌জ্ঞানং মম নিশ্চিতম্॥
এতদেব হি বিজ্ঞানং ন তথৈকেন যেন যৎ।
স্থিত্যুৎপত্ত্যপ্যয়ান্ পশ্যেদ্ভাবানাং ত্রিগুণাত্মনাম্॥

যাহার দ্বারা ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত সমস্ত ভূতে ঐ সকলের কারণরূপে প্রকৃতি, পুরুষ, মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই নয়টি, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ মহাভূত ও গুণত্রয় এই অষ্টবিংশতি তত্ত্বকে দর্শন করা যায় এবং যাহার দ্বারা এই অষ্টবিংশতি তত্ত্বসমূহে সর্ব্বাত্মা সর্ব্বকারণ এক আমাকে দর্শন করা যায়, তাহাই মদ্বিষয়ক নিশ্চিত জ্ঞান। আর যে জ্ঞানের দ্বারা এক পরমকারণ পরমাত্মার সহিত তত্ত্বসমূহের ঐরূপ ঐক্য দর্শন করা যায় না, কিন্তু তত্ত্বসমূহের স্বরূপ গুণাদি জানিবার ইচ্ছায় যে জ্ঞানের দ্বারা তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া দর্শন করা যায়, তাহাই বিজ্ঞান নামে কথিত হয়।" সুতরাং দেখা যাইতেছে জ্ঞান ও বিজ্ঞান একই পরমেশ্বর-তত্ত্বের দুইটি দিক্। জ্ঞান সমষ্টিরূপ, বিজ্ঞান ব্যষ্টিরূপ। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এই সমষ্টি ও ব্যষ্টি জ্ঞানের যে দিব্য সমন্বয়মূলক পরমতত্ত্ব, তাহাই শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাহা হইলে ইহা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে শুধু বিজ্ঞান অপূর্ণ, বিজ্ঞান জ্ঞানের মধ্যেই সার্থক।

বিশ্বপ্রকৃতির অনন্তবিধ বস্তুনিচয়কে খণ্ড খণ্ড ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞান তাহার মর্ম্ম-রহস্য উদ্‌ঘাটনে তৎপর। সুদূর নক্ষত্রলোক হইতে নিঃসৃত আলোকতরঙ্গ পর্য্যবেক্ষণ করত তাহার গতিবেগ, তাহার কম্পন-বৈচিত্র্য সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম যন্ত্রবলে নির্দ্ধারণ করিতেছে। এইভাবে যে-জ্ঞান সঞ্চিত হইতেছে তাহা ব্যষ্টিজ্ঞান—তাহা একদেশদর্শী বিজ্ঞান, সমগ্র জ্ঞান নহে। কেননা এই

ব্যষ্টি বিজ্ঞানের উপজীব্য যে অপরাপ্রকৃতি, তাহা স্বকীয় বাহ্যরূপের মধ্যে নিজেকে প্রকটিত করিয়া—'জীবভূতা'—; তাহাকে ধারণ করে, স্বীয় সুনিগূঢ় কর্ম্মশক্তিতে প্রকাশিত করে যে অনির্ব্বচনীয়া পরমা পরাপ্রকৃতি—সে সম্বন্ধে এই ব্যষ্টি-বিজ্ঞান উদাসীন, অজ্ঞ। ফলে এই বিজ্ঞান যতই অভাবনীয় আবিষ্কারে সমৃদ্ধ হউক, এবং সেই সমুদয় আবিষ্কারসহায়ে যতই অঘটন-ঘটন-চাতুর্য্য প্রকটিত করুক, তথাপি তাহা কখনও শ্রেয়ঃপ্রসূ হইতে পারিবে না, পারেও নাই। অপরা প্রকৃতিকে পরিব্যাপ্ত করিয়া, তাহার স্থিতি গতি কর্ম্মনীতিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া, অথচ তাহারও ঊর্দ্ধে ও অতীতে অচিন্তনীয় শুদ্ধ চৈতন্যময় আত্মসত্তায় যে পরাপ্রকৃতি— আদ্যা সৃজনীশক্তি, ভাগবতী চিৎশক্তি, অথবা তন্ত্র-প্রোক্তা দুর্গা কালী বা দশমহাবিদ্যা—তাহার সম্বন্ধে যে পরম জ্ঞান তাহা বিজ্ঞানের দৃষ্টির বহির্ভূত। সেই নিত্য মঙ্গলময় পরাপ্রকৃতির জ্ঞানবর্জ্জিত আধুনিক বিজ্ঞান আজ ভগবানের সুন্দর জগতে, নিত্য সুন্দরের শিল্পরঙ্গশালায় এত বিভীষিকা সৃষ্টি করিয়াছে। পরমাণুকে ভাঙিয়া, তাহার অভ্যন্তরস্থ শক্তিকে যন্ত্রকৌশলে নিঃসারিত করিয়া বিজ্ঞান মানুষের পাশবিকতাকে উৎকট করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু অণু-শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া যে অজড় মহান চৈতন্য নিত্য শান্তিতে বিরাজিত সেই চিৎশক্তির জ্ঞান-প্রসাদ-বর্জ্জিত বলিয়া মানুষের ব্যষ্টি বিজ্ঞান পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করিতে পারিল না। যে শক্তি চির শান্তিতে আপন আনন্দময় অধ্যাত্মসত্তায় স্থাবর-জঙ্গম, স্থূল-সূক্ষ্ম, জড়-অজড় সমস্ত কিছুকে পরিব্যাপ্ত করিয়া শাশ্বত অখণ্ডিত মাধুর্য্যে আপন লীলায় বিভোর, সেই নিত্য শান্তিময়ী, অনন্ত করুণারূপিণী পরাপ্রকৃতির দিব্য রহস্যমূলক জ্ঞানের সহিত এই বিজ্ঞানের 'জ্ঞান-বিজ্ঞান-সহিতং'—সমন্বয় সাধন করিতে না পারিলে বিজ্ঞান ক্রমশঃ মানুষকে অধিকতর অজ্ঞান করিয়া নিঃশেষ ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করিবে। ভাগবতে "জ্ঞানবিজ্ঞান-সংসিদ্ধাঃ" জনগণই পরম জ্ঞানী বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে স্পষ্টতম বাক্যে বলিতেছেন :—

"তস্মাজ্‌জ্ঞানেন সহিতং জ্ঞাত্বা স্বাত্মানমুদ্ধব।
জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নো ভজ মাং ভক্তিভাবিতঃ॥
জ্ঞানবিজ্ঞানযজ্ঞেন মামিষ্ট্বাত্মানমাত্মনি।
সর্ব্বযজ্ঞপতিং মাং বৈ সংসিদ্ধিং মুনয়োঽগমন্॥

হে উদ্ধব, তুমি জীবাত্মা ও প্রকৃত্যাদি তত্ত্ব-সমূহের সহিত সর্ব্বাত্মা আমাকে জানিয়া জ্ঞানবিজ্ঞান-সম্পন্ন ও ভক্তিভাবে ভাবিত হইয়া আমার ভজনা কর। মুনিগণ জ্ঞানবিজ্ঞানরূপ যজ্ঞের দ্বারা আত্মাতে সর্ব্ব যজ্ঞপতি সর্ব্বাত্মা আমার ভজনা করিয়া সম্যক্ সিদ্ধিস্বরূপ আমাকেই প্রাপ্ত হইয়াছেন।"

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে জ্ঞানের সহিত বিজ্ঞানের রহস্য জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার মধ্যে যে দিব্য দৃষ্টি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহারই প্রভাবে অর্জ্জুন বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এই সৃষ্টিমঞ্চে তিনি শুধু যন্ত্র, ভগবানের অনন্ত দিকে অনন্ত ভাবে প্রসারিত দিব্য অভিপ্রায় সাধনের নিমিত্ত মাত্র। এই জ্ঞানের স্ফুরণ হইলে মানুষ তখন অহংভাবে বিভ্রান্ত হয় না; তাহার বুদ্ধি তখন আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তখন হত্যা করা বা হত হওয়া এই উভয়েরই মধ্যে ভগবানের পরম ইচ্ছা শক্তিরই ক্রিয়া বলিয়া প্রতীত হয়। ভগবান বলিতেছেন :

"যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥

যাঁহার আত্মকর্তৃত্বভাব বিলুপ্ত হইয়াছে, কাজেই যাঁহার বুদ্ধিও অনাসক্ত, তিনি হত্যা করিয়াও হত্যা করেন না এবং তাহার ফলে আবদ্ধ হন না।" এই অহঙ্কার দুরীভূত হইলে, বুদ্ধি স্থির প্রশান্ত অধ্যাত্মচৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে, যুদ্ধে নিরত থাকিয়াও আপন ভাগবত সত্তাকে কলুষমুক্ত

রাখা যায়। হত্যা-ব্যাপারও তখন ভগবানের মঙ্গলকর উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায়ে পরিণত হয়। কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে অর্জ্জুনের এই জ্ঞান জাগরিত হইয়াছিল। সমরকুশলী সেনানায়কের পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া রক্তপাতের মধ্যেও ভগবানের অভিপ্রায় সাধনের ইঙ্গিতমাত্র উপলব্ধি করিয়াছিলেন। জয়-পরাজয়ের দ্বন্দ্বের ঊর্দ্ধে, লাভালাভের সঙ্ঘাতে অবিচলিত থাকিয়া তিনি পরমা শান্তির জ্যোতির্ম্ময় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন; তখনই তাঁহার মোহ বিনষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার ভাগবতী বুদ্ধির লুপ্ত স্মৃতি জাগরিত হওয়ায়, তিনি এমনই আত্মসংস্থ হইয়াছিলেন যে সেই অপূর্ব্ব আত্মজাগরণক্ষণে অকুণ্ঠিত চিত্তে বলিতে পারিয়াছিলেন—"করিষ্যে বচনং তব।" তিনি যুদ্ধ করিবেন শুধু ভগবানের নিগূঢ় উদ্দেশ্য সাধনের যন্ত্ররূপে, কোন ব্যক্তিগত, সমাজগত বা জাতিগত স্বার্থের প্রেরণায় নহে। পক্ষান্তরে, জগতের আসুরিক শক্তিকে, অন্ধকারের শক্তিকে সমূলে বিনাশ করিয়া সর্ব্বত্র, সর্ব্ব মানবে এক পরিপূর্ণ সমত্ব-বুদ্ধির দ্বারা পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রকে অনুপ্রাণিত করিয়া ভগবানের অখণ্ড আনন্দলীলার সহচররূপে নব ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবেন। এই নব সৃষ্টির সহায়করূপে অর্জ্জুনকে প্রবুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণকে জ্ঞানের সহিত বিজ্ঞানের রহস্য উদ্ঘাটন করিতে হইয়াছিল। জ্ঞান-বর্জ্জিত বিজ্ঞান মানুষকে লইয়া যাইবে অন্ধকার হইতে গভীরতর অন্ধকারে। বিজ্ঞান জ্ঞানের পরিপন্থী নহে, জ্ঞানের সহায়ক। কিন্তু পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞান জ্ঞানের অপহারক। কার্লাইল ইহাকে বলিয়াছেন—mechanical manipulation falsely named science. আবার তাঁহার মতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানী "carrying the epitome of all laboratories and observatories with their results in his head is but a pair of spectacles behind which their is no Eye." কিন্তু ভারতীয় ঋষিদের উপলব্ধ জ্ঞান বিজ্ঞান-বিরোধী নহে; বিজ্ঞান যখন জ্ঞানের স্পর্শে শুভ্রতর ও সুন্দরতর মহিমায় জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠে, তখনই অন্ধকারের পরপারে যে স্থির অবিনশ্বর সত্য জ্যোতিঃ, তাহার সামগান মন্ত্রিত হইতে থাকে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এই জ্যোতিকে আচ্ছন্ন করিয়াছে অহঙ্কার ও ক্ষমতামদমত্ততার গাঢ় কৃষ্ণ ছায়ায়।

আবার উপনিষদ্ এই বিজ্ঞানকেই পরমজ্ঞান রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছে; সেখানে জ্ঞান কোন পৃথক বস্তু নহে, উহা বিজ্ঞানের মধ্যেই সুনিহিত। গীতায় যাহা 'জ্ঞানবিজ্ঞানসহিতং', উপনিষদে তাহাই বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানই মানুষের অবিদ্যার ধ্বংস করিয়া তাহাকে সর্ব্বপ্রকার বিক্ষোভ ও দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত করিয়া স্থির শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। এমন বিজ্ঞান মানুষের মধ্যে আনে শুচিতা। আজ যে যন্ত্রশকুনি আকাশকেও বিভীষিকাময় করিয়া মানুষকে মানুষের নিকট বন্য হিংস্র জন্তু অপেক্ষাও অধিকতর ভীতিকর করিয়া তুলিয়াছে, সেই বিভীষিকার নিরাকরণ করিয়া এই ঔপনিষদিক বিজ্ঞান আবার মানুষকে ফিরাইতে পারে তাহার আপন নিবিড় আনন্দ-সত্তার গহনে।

উপনিষদ্ বলিতেছে :

"যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ ॥
যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ ॥

"যাহার বুদ্ধি অসংযত মনের সহিত সংযুক্ত থাকায় সর্ব্বদা বিজ্ঞানবিহীন, বিবেকশূন্য বা অনাত্মদর্শী, তাহার ইন্দ্রিয়গণ সারথির দুষ্ট অশ্বের ন্যায় দুর্দ্দমনীয় হয়; পক্ষান্তরে, যাহার বুদ্ধি সর্ব্বদা সংযত মনের সহিত সংযুক্ত থাকায় বিবেকবান্ হয়, তাহার ইন্দ্রিয়গণ সারথির সুসংযত অশ্বের মত আজ্ঞাবহ হইয়া থাকে।"

"যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদাহশুচিঃ।
ন স তৎপদমাপ্নোতি সংসারং চাধিগচ্ছতি॥
যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ।
স তু তৎ পদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে॥

কিন্তু যাহার বুদ্ধি সর্ব্বদা অসংযত মনের সহিত সংযুক্ত, অশুচি ও বিবেকশূন্য বা আত্ম-জ্ঞানহীন, সেই বুদ্ধি কখনও মুক্তিহেতু হয় না; পক্ষান্তরে, যে বুদ্ধি সর্ব্বদা পবিত্র, আত্মজ্ঞানে সমৃদ্ধ ও সংযত; সেই বুদ্ধির সাহায্যেই মানুষের দুঃখমুক্তি সুগম হয়।"

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান খণ্ডজ্ঞান; এই কারণেই তাহা অপূর্ণ। সুতরাং দোষদুষ্ট ও অমঙ্গলকর। তাই 'লোকসংগ্রহায়' প্রযুক্ত না হইয়া লোক-বিনাশের বিভীষিকার মধ্যে নিজের অকৃতার্থতা সপ্রমাণ করিয়াছে। প্রতি পরমাণুর অভ্যন্তরে নিউট্রন্-ভারযুক্ত, প্রোটন-কেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে অবিশ্রাম নৃত্য-পরায়ণ ইলেক্ট্রন্‌গুলি প্রোটনের সহিত যেই সাম্য, সংহতি ও সঙ্গতি সংরক্ষণে সর্ব্ববিশ্বে শান্তির প্রহরিরূপে নিত্য নিরত, অপূর্ণ বিজ্ঞানের আধুনিক দূতগণ দানবীয় অহং-স্ফীতির উদ্ধত ক্রূরতায় পরমাণু-প্রাণের সেই সমতা ভাঙিয়া প্রলয়ের হুতাশন প্রজ্জ্বালিত করিয়াছে। তাহাতে নরনারী, পশুপক্ষী, কীট-পতঙ্গ, লতাগুল্ম, বহুমুখী সাধনায় বহুশ্রমে রচিত মানুষের শিল্পবিভব, বহুযুগ-সঞ্চিত ঐশ্বর্য্য-ভরা ভাণ্ডার, পলকে শূন্যে বিলীন হইতেছে। বিজ্ঞান এখানে জ্ঞানবিযুক্ত বলিয়া সমাজে ও রাষ্ট্রে প্রকটিত করিয়াছে কদর্য্যতা ও বিকৃতি; প্রোটনকে খণ্ডিত করিয়া তাহারা যেন স্বয়ং ভগবানকেও খণ্ডিত করিয়াছে। ঋষি তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন পরমাণুমধ্যে:

"সর্ব্বাণুভূস্ত্বং পরমাণুভূতঃ।
অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়াং-
স্ত্বামেব সর্ব্বং প্রবদন্তি সন্তঃ॥

তুমিই পরমাণুরূপে সকলের অনুভবস্থান; তুমিই অণু হইতে অণীয়ান্, মহৎ হইতে মহীয়ান্ এবং সাধুগণ তোমাকেই সর্ব্ব বলিয়া থাকেন।"

আজ সমগ্র পৃথিবী অণুবোমায় স্তম্ভিত, ভীত, সঙ্কুচিত। কিন্তু ভারতীয় ধর্ম্ম ও কৃষ্টিতে বিশ্বাসযুক্ত মন ইহাতে বিচলিত নয়। ভারতের ধর্ম্মই শিখাইয়াছে 'অণোরণীয়ান্'। যিনি পরম পুরুষ, বিশ্বাতীত চৈতন্য—তিনি অণু হইতেও অণু। জড় বিজ্ঞানের আবিষ্কার-সমূহ পাশ্চাত্যমনের নিকট যতই বিস্ময়াবহ হউক, ভারতীয় দার্শনিক তত্ত্বাভিজ্ঞের নিকট উহা অতি সহজ সরল সত্য। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান তাহার সূক্ষ্মতম আবিষ্কারের মধ্য দিয়া ভারতীয় ঋষিগণের সাধনা ও দিব্যদৃষ্টিলব্ধ সত্যসমূহের নির্ভুলতা প্রমাণ করিতেছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এখনও অণুকারে পরিভ্রান্ত হইয়া ঘুরিতেছে। "তমসঃ পরস্তাৎ", জড়বুদ্ধিগ্রাহ্য অণুকারের পরপারে যে মহান পরম অনির্ব্বচনীয় নিখিলজ্যোতির জ্যোতি, ভারতীয় অধ্যাত্মবিজ্ঞান তাহার রহস্য উদ্ঘাটিত করিয়াছে। অণুর অভ্যন্তরস্থ সুনিহিত তেজ-শক্তির বিপুল বিক্রম উৎসারিত করিয়া পাশ্চাত্য জগৎ অহঙ্কারে বিমূঢ়। কিন্তু এই তেজ জড়ত্বমুক্ত নহে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এত শ্রমে প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছে যে যাহাকে মানুষ এতদিন নিরেট জড় বলিয়াই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিল তাহাও পুঞ্জীভূত শক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই শক্তির অপ-প্রয়োগে মানুষ আজ যে বিজয়বিমূঢ়, সেই শক্তিই একদিন তাহাকে ব্যাপক বিনষ্টির অন্ধকূপে নিক্ষেপ করিবে। কারণ, মানুষ আজ 'অমনস্ক'—তাহার মন অসমাহিত, অনিয়ন্ত্রিত। গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে British Association of Science-এর সভাপতি Sir Alfred Ewing এই সত্য উপলব্ধি করিয়া বলিয়াছিলেন:—"The Command of Nature has been put into his hands before he knows how to command himself."

উপনিষদের ভাষায় এই সকল বিজ্ঞানিগণের মন এখনও সারথির দুষ্টাশ্বের ন্যায়। কাজেই তাহারা 'মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ', আসুরিক ভাবকে আশ্রয় করিয়া তাহারা নিম্ন প্রকৃতির বিক্ষোভের মধ্যে দিশাহারা, মায়ার কূটচক্রে নিত্য ভ্রাম্যমাণ। এই মায়া তাহাদের নিকট বস্তুর স্বরূপকে বিকৃত করিয়া দেখাইতেছে, তাহার সত্য শাশ্বত দিব্য স্বরূপকে জানিতে দেয় না। তাহারা জীবনের উচ্চতর নীতি ও ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত, হীন বাসনা ও দুরিতপূর্ণ সঙ্কল্পে তাহাদের মন কলুষিত। সুতরাং বাহ্য প্রকৃতিকে শাসনে আনিয়া ও আপন আপন প্রাকৃত জীবনের মধ্যে দিব্য রূপান্তর সাধিত হইতেছে না বলিয়া, এই বিজ্ঞান আনিয়াছে সমগ্র জগতে হাহাকার, ক্রন্দন ও মৃত্যু। এই আত্ম-সংযম-বিচ্যুতি, এই লোভ, পররাজ্য-লোলুপতা, এই নিম্ন প্রকৃতির অভ্যুত্থান, অন্তরের অবিনাশী দেব-সত্তার বিস্মৃতি—ইহাই আসুরিকতা। জ্ঞান-বিরোধী পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এই আসুরিকতাকে উগ্র করিয়া তুলিয়াছে—'রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ'। বুদ্ধিভ্রংশকারী, রাক্ষসসুলভ প্রচণ্ড লোভে উপহত, অত্যধিক রাজসিক অহঙ্কারযুক্ত বলিয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সেবকবর্গ এবং তাঁহাদের পৃষ্ঠ-পোষকবর্গ বা সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদী রাষ্ট্র-নায়কগণ আজ এতই ভয়াবহরূপে আত্ম-চেতনাশূন্য 'মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ'—তাহারা বিফলকর্ম্মা, বিফলকাম ও বিফলজ্ঞান। মানুষের রাজসিক বুদ্ধিই বিজ্ঞানকে আজ এত ভীষণ করিয়া তুলিয়াছে। Ratcliff বলিয়াছেন—"Science is not to be feared. It is the dark thoughts in the minds of men that are a danger." উপনিষদুক্ত 'অমনস্ক' মানুষের রাক্ষসভাবদুষ্ট মনের আসুরিক বাসনাই বর্ত্তমান সভ্যতার করাল কালকূট।

আণবিক শক্তির আবিষ্কারে ও তাহার হিংস্র ব্যবহারে পশ্চিমজগৎ যেন উন্মত্ত। কিন্তু বিশ্ব-ব্যাপী যে চিৎ শক্তি সেই অণুর অভ্যন্তরেও ক্রীড়াশীল, তাহার স্বরূপ অনুধ্যান ও উপলব্ধি পশ্চিমের নিকট দুরারোহ। আত্মসম্বেদনক্ষম কোন মনীষী বলিয়াছেন—"It has been said that the universe is compressed in the atom. But there is not one law for the atom and another for the universe." —অণুর মধ্যেই সমগ্র বিশ্ব সঙ্কুচিত হইয়াছে; যে নীতি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের বিনাশক, সেই নীতিই পরমাণুকে নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। কাজেই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য পরমাণুবক্ষে সুনিহিত। অণু-জীবনে ও ব্রহ্মাণ্ড-জীবনে একই নীতির নিত্য লীলা চলিতেছে। সেই নীতিই প্রমূর্ত্ত করিতে হইবে মানবসমাজে। শক্তিমান বা দুর্ব্বল মানব একই বৃহত্তর মানবসমাজেরই অন্তর্ভুক্ত। তেমনি ক্ষুদ্রতম জাতিও একই বৃহত্তর মানব জাতির সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে সংযুক্ত। কোন একটি অংশকে পঙ্গু শীর্ণ করিয়া বৃহত্তর মানবসমাজ সুস্থ বলিষ্ঠ থাকিতে পারে না। সর্ব্বমানবের নিরবচ্ছিন্ন মঙ্গল-বিধানের সুরটি নিত্য ধ্বনিত হইতেছে বিশ্ব-জীবনের অন্তঃস্থলে ঐ পরমাণুর অপরিমেয় কার্য্য-সাধিকা শক্তির ভিতর দিয়া। ব্রহ্মাণ্ডের অঙ্গে অঙ্গে যে অচ্ছেদ্য ঐক্যের সন্ধান আনিয়াছে আজ জড় বিজ্ঞান আণবিক শক্তির আবিষ্কারের দ্বারা, সেই আবিষ্কার পরিপূর্ণরূপে সার্থক হইবে সেইদিন—যেদিন সর্ব্বমানবের মহান ঐক্যের মধ্য দিয়া মানবসভ্যতা পৃথিবীতে স্থির অবিরোধ শান্তি স্থাপন করিবে। তখনই সত্যভাবে বিজ্ঞান-সৃষ্ট 'অজ্ঞানসম্মোহ' বিনষ্ট করিয়া ক্ষিতিবক্ষে প্রবাহিত হইবে দ্বন্দ্বহীন মানবমিলনের উদাত্ত মন্ত্ররাগিণী।

কোষ্ঠী-বিচারে গ্রহ ও ভাব-স্ফুট

স্বামী চিন্ময়ানন্দ

গণিত ও ফলিত জ্যোতিষ

জ্যোতিষ-শাস্ত্র গণিত-জ্যোতিষ ও ফলিত-জ্যোতিষ নামে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। যাহা দ্বারা সূর্য্য ও চন্দ্র-গ্রহণ, ভ-চক্রে গ্রহগণের গতি ও স্থিতি, সূর্য্যের মাসিক রাশ্যন্তর গমন (সংক্রান্তি), যজ্ঞ[১] ও অধ্যয়ন[২] (দীক্ষা) আদি কর্ম্ম, ব্রত ও বিবাহাদি সংস্কার এবং অন্যান্য নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়াসমূহের কাল[৩] নিরূপিত হয়, তাহার নাম গণিত-জ্যোতিষ।[৪] যাহা দ্বারা প্রশ্ন-কালীন বা জন্ম-কালীন গ্রহগণের, গণিত জ্যোতিষের সাহায্যে গণিত অবস্থান হইতে জগতের প্রাকৃতিক ঘটনা, নানা দেশীয় অবস্থা ও মনুষ্যগণের চরিত্র, শারীরিক চিহ্ন ও রোগ এবং ভাগ্যাদির শুভাশুভ নিরূপিত হয়, তাহার নাম ফলিত-জ্যোতিষ[৫]।

ষড়ঙ্গ বেদের এক অঙ্গ জ্যোতিষ

এই উভয়বিধ জ্যোতিষ-শাস্ত্রই সনাতন বেদের অঙ্গ। শিক্ষা-গ্রন্থে বেদের ষড়ঙ্গ নিরূপণ করিতে গিয়া জ্যোতিষশাস্ত্রকে বেদের চক্ষু-স্বরূপ[৬] বলা হইয়াছে। সুতরাং ষড়ঙ্গ[৭] বেদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিগণের নিকট ছন্দঃ, কল্প, নিরুক্ত, শিক্ষা ও ব্যাকরণের মতই ষষ্ঠ অঙ্গ জ্যোতিষ-শাস্ত্রও কটাক্ষ বা অবজ্ঞার বস্তু নহে। তাই গণিত-জ্যোতিষ ও ফলিত-জ্যোতিষের মূল-ভিত্তি ও শুদ্ধতাসম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

কুণ্ডলীতে গ্রহ-সংস্থান ও ভাব-স্ফুট

ভারতীয় পঞ্জিকা ও পাশ্চাত্য 'এষ্ট্রোনমিক্যাল এফীমেরিস্' (বিলাতী পঞ্জিকা) এর সাহায্যে একই ব্যক্তির জন্ম-কুণ্ডলী প্রস্তুত করিলে দেখা যায় যে ঐ জাতকের দুই খানি কোষ্ঠী পরস্পর আদৌ মেলে না। (ক) ভারতীয় ও পাশ্চাত্য পঞ্জিকা-মতে, এমন কি এক বঙ্গদেশীয়ই গুপ্তপ্রেস, পি এম্ বাগ্‌চি, বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত পঞ্জিকাদি-মতে গণিত একই জাতকের কুণ্ডলী-সমূহে এক কুণ্ডলীতে যে ঘরে একটী গ্রহ আছে, অন্য কুণ্ডলীতে ঐ গ্রহই হয়ত তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী ঘরে (House—ভাবে) বা রাশিতে (sign এ) সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকে। (খ) এতদ্ব্যতীত, Cusps of the Twelve Houses (কোষ্ঠীর দ্বাদশ ভাবের 'আরম্ভিক বিন্দু' বা 'ভাব-সন্ধি'[৮])-ও ভারতীয় ও পাশ্চাত্য গণিত-জ্যোতিষ

১ যেমন, "কৃত্তিকাস্বগ্নিমাদধীত"—(তৈঃ ব্রাঃ ১-১-২-১)।

২ যেমন, "ফল্গুনী-পূর্ণমাসে দীক্ষেরন্"—(তাণ্ড্য-মহাব্রাহ্মণ ৫-৯-১, ৭)।

৩ "যজ্ঞকালার্থ-সিদ্ধয়ে"—(জ্যোতিষালোচনা-প্রসঙ্গে সায়ণাচার্য্য)।

৪ "গ্রহণ-গ্রহ-সংক্রান্তি-যজ্ঞাধ্যয়ন-কর্ম্মণাম্।
প্রয়োজনং ব্রতোদ্বাহ-ক্রিয়াণাং কাল-নির্ণয়ঃ ॥"
—কশ্যপ।

৫ "প্রয়োজনন্তু জগতঃ শুভাশুভ-নিরূপণম্।"—নারদ।

৬ "জ্যোতিষাময়নং চক্ষুঃ"—শিক্ষা, ৪১।

৭ "ছন্দঃ পাদৌ তু বেদস্য, হস্তৌ কল্পোঽথ পঠ্যতে।
জ্যোতিষাময়নং চক্ষুর্নিরুক্তং শ্রোত্রমুচ্যতে ॥
শিক্ষা প্রাণং তু বেদস্য, মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্।
তস্মাৎ সাঙ্গমধীত্যৈব ব্রহ্ম-লোকে মহীয়তে ॥"
—শিক্ষা, ৪১, ৪২।

৮ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতে ভাব-সন্ধি আদির বিস্তৃত আলোচনা আগামী সংখ্যায় 'কোষ্ঠী-বিচারে ভাব-স্ফুট' অংশে দ্রষ্টব্য।

মতে, এমন কি এক বাঙ্গলা-দেশেরই বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-গুপ্তপ্রেস আদি পঞ্জিকা-মতে গণিত হইলেও, একই জাতকের ভিন্ন ভিন্ন পঞ্জিকা-সাহায্যে প্রস্তুত কোষ্ঠীতে ভাব ও ভাব-সন্ধি-স্ফুটও[৯] এক-রূপ হয় না। একই গ্রহাদি দৃষ্ট বস্তু-বিষয়ের সিদ্ধান্তে কখনও বিকল্প বা সন্দেহ থাকিলে উহার স্বরূপ-জ্ঞাপক বিকল্পযুক্ত বিভিন্ন সকল মতই সত্য, ইহা সুধী-সমাজে গৃহীত হইতে পারে না।

কোষ্ঠী-প্রণয়নে মূল ভিত্তি দৃক্-শোধিত শুদ্ধ পঞ্জিকা

কোষ্ঠী আদি বিচাররূপ ফলিত-জ্যোতিষের মূল ভিত্তি বা আধার গণিত-জ্যোতিষ। গণিত-জ্যোতিষের মূল বিকাশ পঞ্জিকা-গণনায়। এই পঞ্জিকা-সমূহে ধৃত ঔদয়িক বা মাধ্যাহ্নিক গ্রহাবস্থান বা স্পষ্ট-গ্রহ হইতে দৈনিক বা সাময়িক অনুপাত দ্বারা জন্ম-সময়ের গ্রহগণের অবস্থান বা গ্রহস্ফুট (Geocentric Longitudes of the planets) জাতকের জন্ম-স্থানের দেশান্তর (দ্রাঘিমা) অনুসারে (for the particular geographical longitude of the birth-place of a native) তাহার কোষ্ঠীতে গণিত ও গৃহীত হইয়া থাকে। যে পঞ্জিকা-সাহায্যে কোনও জাতকের কোষ্ঠী প্রস্তুত করা হইল, উহা যদি দৃক্-সিদ্ধ (আকাশে—ভ-চক্রে—যথার্থ গ্রহাবস্থান-জ্ঞাপক) না হইয়া কেবল অঙ্ক কষিয়া প্রাপ্ত ভ্রান্ত পঞ্জিকা[১০] মতে হয়, তবে ঐ কোষ্ঠীর ফলও জাতকের জীবনের ঘটনা-সমূহের সহিত মেলে না; এবং ঐ অশুদ্ধ পঞ্জিকায় ধৃত অশুদ্ধ নক্ষত্র বা গ্রহ-স্ফুট হইতে গণিত বিংশোত্তরীয় বা অষ্টোত্তরীয় আদি দশা-গণনা হইতে প্রাপ্ত ফলও যথা-সাময়িক হয় না। এজন্য বঙ্গদেশীয় বা ভারতীয় প্রাচীন মতে গণিত, অসংস্কৃত ও অশুদ্ধ পঞ্জিকা-দৃষ্টে জাতকের কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়া তাহা হইতে ফলিত-জ্যোতিষের ফল মিলাইতে না পারিয়া অনেকে হিন্দু জ্যোতিষ-শাস্ত্রের উপর শ্রদ্ধাহীন হইয়া নানা রূপ কটাক্ষ ও অবজ্ঞা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের দৃষ্টি ফলিত-জ্যোতিষের ও কোষ্ঠী-প্রণয়নের মূল ভিত্তি বা আধার গণিত-জ্যোতিষের অসংস্কৃত ও অশুদ্ধ পঞ্জিকা-সমূহের উপর পড়িতেছে না। পঞ্জিকা-গণনা[১১] যদি শুদ্ধ না হয়, তবে তাহাতে লিখিত গ্রহগণও দৃক্-সিদ্ধ

৯ সায়ন ও নিরয়ন মতে লিখিত একই জাতকের কোষ্ঠীদ্বয়ে গ্রহ ও ভাব-স্ফুটে আক্ষরিক ভেদ-মাত্র প্রতীত হয়; কিন্তু তাহাদের মধ্যে ভ-চক্রে গ্রহাবস্থানের মূলতঃ কোনও পার্থক্য নাই। পার্থক্য তো কেবল লিখিবার ভঙ্গী মাত্রতে দৃষ্ট হয়, এবং উভয় কোষ্ঠীতেই গ্রহদ্বয়ের প্রেক্ষা (Mutual aspect বা গ্রহদ্বয়ের Geocentric angle) একই হইয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বঙ্গদেশীয় একই নিরয়ণ মতে লিখিত বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকার ও পি এম্ বাগ্‌চি, গুপ্তপ্রেস আদি সকল পঞ্জিকার গ্রহাবস্থানই এক-রূপ ও দৃক্-সিদ্ধ হইতেছে না; এবং তাহার ফলে উভয়বিধ পঞ্জিকা-মতে প্রস্তুত একই জাতকের কোষ্ঠীদ্বয়ে গ্রহ ও ভাব-স্ফুটও 'এক'-রূপ হয় না।

১০ গণিত-জ্যোতিষ ও পঞ্জিকার শুদ্ধতা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা 'উদ্বোধনে' বর্ত্তমান বর্ষের 'চৈত্র' সংখ্যায় পৃঃ ১৩৫-এ লেখকের "পঞ্জিকা" ও 'আষাঢ়' সংখ্যায় পৃঃ ২৮৮-তে তাঁহার "পঞ্জিকা-সংস্কার" শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয়ে দ্রষ্টব্য।

১১ বঙ্গদেশে পঞ্জিকা-গণনা যাহাতে অভ্রান্ত ও দৃক্-সিদ্ধ হয়, তাহার জন্য প্রচেষ্টা স্যার আশুতোষ মুখার্জ্জীর সময় হইতে, এমন কি তাহারও পূর্ব্ব হইতে, চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশীয় সকল পঞ্জিকাকার প্রাচীন মতানুযায়ী গণনার বর্ত্তমান কালোচিত সংস্কার করিয়া যথাসাময়িক দৃক্-সিদ্ধ গ্রহাদি-যুক্ত পঞ্জিকার প্রণয়ন করিতেছেন না। বর্ত্তমানে আবার (১১ই মে ১৯৪৬) সর্ব্বমান্য বিচারপতি শ্রীযুক্ত সি সি বিশ্বাস মহাশয়ের সভাপতিত্বে বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত, পি এম্ বাগ্‌চি ও গুপ্তপ্রেস আদি পঞ্জিকা-সমূহের প্রতিনিধিগণ এবং বাঙ্গলা ও আসামের প্রসিদ্ধ জ্যোতিষিক পণ্ডিতবর্গকে লইয়া এক ক্রিয়াশীল 'পঞ্জিকা-সংস্কারসমিতি' গঠিত হইয়াছে। আমরা আশা করি এই উপযুক্ত বিদ্বন্মণ্ডলীদ্বারা গঠিত

বা ভ-চক্রে যথা-স্থানীয় হয় না। ইহার ফলে ঐ গ্রহগণের অশুদ্ধ অবস্থিতি বা স্ফুট হইতে লিখিত কোষ্ঠীও অশুদ্ধ হয় ও তাহার ফল-সমূহও যথাযথ মিলিতে পারে না। ঐ অশুদ্ধ কোষ্ঠীতে 'ভৃগু' ও 'জৈমিনি' আদি মতে যাহা কিছু মিলিয়া থাকে, তাহা ত্রিশ অংশ ব্যাপক রাশি বা ভাবস্থ গ্রহগণের স্থূল ফল মাত্র; কিন্তু উহা হইতে 'পরাশর' ও 'তাজিক' আদি মতে তাৎকালিক স্পষ্ট-গ্রহ ও ভাব-স্ফুট আদি জনিত সূক্ষ্ম ফল মেলে না ও Directional Calculations (গোচর ও দশা গণনা আদি) হইতে ফল ও ঘটনা এবং ঘটনা-কালও যথা-সাময়িক হয় না।

গ্রহ-স্ফুট ও কোষ্ঠী-বিচার

কোষ্ঠী-বিচার করিয়া কোনও স্ত্রী বা পুরুষের স্বভাব, চরিত্র, ভাগ্য, অর্থ, ধর্ম্ম ও অনুকূল বা প্রতিকূল সময় এবং জীবনের ঘটনা-সমূহের শুভাশুভ নির্ণয় করিতে হইলে ঐ জাতকের কোষ্ঠীখানি অত্যন্ত নির্ভুল হওয়া উচিত। নির্ভুল কোষ্ঠী প্রস্তুত করিতে হইলে নির্ভুল দৃক্-সিদ্ধ গ্রহ-স্ফুট-আদিযুক্ত পঞ্জিকার এবং অঙ্ক ও ত্রিকোণমিতি (Trigonometry) আদি উপজীব্য দৃক্-শোধিত গণিত-জ্যোতিষে বিজ্ঞ কোষ্ঠী-প্রস্তুতকারক ব্যক্তির

'সমিতি' পঞ্জিকা-সংস্কারে চিরাচরিত আলস্য, বিরোধ ও উদাসীনতার পরিপন্থিতা পরিত্যাগ করিয়া এক স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন; এবং দুর্ভাগা বাঙ্গলার সাম্প্রদায়িক বিবদমান ধর্ম্ম-সমাজে সকল পঞ্জিকাকারগণ একই প্রকারের বিশুদ্ধ ও দৃক্-সিদ্ধ গণনা-যুক্ত পঞ্জিকা প্রস্তুত ও প্রকাশিত করিতে থাকিবেন। উক্ত মাননীয় 'পঞ্জিকা-সংস্কার-সমিতি'র নিরলস প্রচেষ্টা ও অদম্য ক্রিয়াশীলতার ফল-স্বরূপ বঙ্গের সকল পঞ্জিকাই ১৩৫৪ সাল হইতে একই প্রকারের বিশুদ্ধ তিথি, নক্ষত্র, যোগ, করণ ও দৃক-শোধিত গ্রহ-স্ফুটাদিসমন্বিত হইয়া প্রকাশিত হইতে দেখিবার আশায় বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখক ও পাঠকগণ সমধিক উদগ্রীব থাকিবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।

শরণ লওয়া আবশ্যক। নচেৎ বাজার-প্রচলিত বিরাটকায় সাধারণ পঞ্জিকা-সমূহের বর্ত্তমান-কালোচিত সংস্কারবিহীন অশুদ্ধ গ্রহ-স্ফুটাদি অবলম্বনে জাতকের কোষ্ঠী রচনা করিলে তাহার সূক্ষ্ম ফল-সমূহ নির্ভুল ও জীবনের ঘটনার সহিত যথা-সাময়িক হইবার আশা করা দুরাশা মাত্র। এ বিষয়ে হিন্দু-জ্যোতিষ-প্রেমী পাঠকগণ বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত বা বিদেশীয় কোনও দৃক্-শোধিত পঞ্জিকা ও গুপ্তপ্রেস, পি এম্ বাগ্‌চি আদির পঞ্জিকা হইতে যে কোনও দিনের নক্ষত্রান্ত-সময়ে বা প্রতি ২½ দিন পরে চন্দ্রের রাশ্যন্তর গমন সময়কালে বা সূর্য্যের মাসিক সংক্রান্তি-কালে জাতকের জন্ম কল্পনা করিয়া কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে উভয়বিধ পঞ্জিকার গণনা-ফল কিরূপ উদ্বেগকারী অসামঞ্জস্য-পূর্ণ। পৃথিবীর যে কোনও দেশে একই স্থানে একই সময়ে চন্দ্রাদি একই গ্রহের অবস্থিতি-জ্ঞাপক স্ফুট (Geocentric longitude of a particular planet, luminary node or star) বিভিন্ন পঞ্জিকানুসারে দেখিতে গেলেও একই প্রকারেরই হওয়া উচিত। কিন্তু তাহা হয় না; ইহাই দেখাইবার জন্য এখানে বাঙ্গলার দুইখানা প্রসিদ্ধ পঞ্জিকার এক দিনের দৃষ্টান্ত লইয়া তিথি-নক্ষত্রাদির অন্ত্য-সময় ও চন্দ্রাদির স্ফুট-গণনার বিভিন্নতা দেখান যাইতেছে।

(১) আগামী ১লা আশ্বিন (নির্দ্দিষ্টীকৃত বাঙ্গলা তারিখ) ১৩৫৩ সাল, ১৭ই সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার, যদি অপরাহ্ণ ৪টা ৫২ মিনিট[১২] হইতে সন্ধ্যা ৭টা ১৮ মিনিট[১৩] মধ্যে কলিকাতায় কোনও

১২ ইহা এবং এই প্রবন্ধে গৃহীত সকল সময়ই বঙ্গীয় পঞ্জিকা-সমূহে ধৃত কলিকাতার স্থানীয় সময় বুঝিতে হইবে।

১৩ ইহা ঘঃ ৭-১৭-৪৭·৬ সেঃ এর সেকেণ্ড-সমূহ পরিত্যাগ করিয়া নিকটবর্ত্তী মিনিটে প্রদত্ত সময়।

কন্যা-সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তবে তাহার কোষ্ঠীতে 'বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা'-মতে চন্দ্র-স্ফুট গৃহীত হইলে চন্দ্র বৃষ-রাশিতে শুক্রের ক্ষেত্রে 'শনি'র ত্রিংশাংশে থাকিবে; এবং পি এম্ বাগচি পঞ্জিকা-মতে ঐ সময়ের চন্দ্রস্ফুট গৃহীত হইলে ঐ চন্দ্র 'বৃহস্পতি'র ত্রিংশাংশে থাকিবে। কারণ বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকামতে বৃহস্পতির ত্রিংশাংশের অন্ত ও শনির ত্রিংশাংশের আরম্ভকাল (চন্দ্রের বৃষ-রাশির ২০ অংশে পৌঁছিবার সময়) অপরাহ্ণ ৪টা ৫২ মিনিট; এবং পি এম্ বাগ্চির পঞ্জিকা-মতে চন্দ্র বৃষ-রাশির ২০ অংশে পৌঁছিবে সন্ধ্যা ৭টা ১৮ মিনিট সময়ে। এই চন্দ্র বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা-মতে শুক্রের ক্ষেত্রে 'শনি'র ত্রিংশাংশ-গত হইবার ফলে কোষ্ঠী-বিচারে উপরি-উক্ত সময়-মধ্যে জাত-কন্যা দ্বিতীয়-পতি-গ্রহিত্রী[১৪] হইবে। কিন্তু পি এম্ বাগচি পঞ্জিকা-মতে গৃহীত চন্দ্র-স্ফুটানুযায়ী, ঐ সময়ে চন্দ্র 'বৃহস্পতি'র ত্রিংশাংশ-গত[১৪] হওয়াতে জাত-কন্যা 'সর্ব্বগুণান্বিতা', 'গুণাঢ্যা' 'স্বকীয় গুণে খ্যাতি-সম্পন্না' ও 'সাধ্বী' হইবে। সাধ্বী[১৫] হওয়া বশতঃ এ কন্যা সধবা বা বিধবা কোনও অবস্থাতেই[১৬] পুনর্ভূ হইতে পারে না।

১৪ 'বৃহজ্জাতক'—অধ্যায় ২৪, শ্লোক ৪; 'জাতক-পারিজাত'—অধ্যায় ১৬, শ্লোক ১৩, ১৪; 'জাতক-বল্লভ' —পৃঃ ৫০০, শ্লোক ৬, দ্রষ্টব্য। 'সারাবলী'—"জৈবে গুণান্বিতা, মন্দে পুনর্ভূঃ।" 'গুণাকর'—"খ্যাতা গুণৈ-র্ভৃগু-গৃহে বনিতা পুনর্ভূঃ।"

১৫ যেহেতু 'পুনর্ভূঃ'কে 'সাধ্বী' বলা যায় না। "সাধ্বী পুত্রবতী পুরন্দর-গুরোরংশে পুনর্ভূঃ শনেঃ।"—'জাতক-পারিজাত', অধ্যায় ১৬, শ্লোক ১৩, দ্রষ্টব্য।

১৬ আধুনিক হিন্দু-ধর্ম্মে এ মন্তব্য বিরুদ্ধবৎ মনে হইলেও, প্রাচীন ভারতের সামাজিক প্রথা ও এখনও ভারতেতর দেশের বা ভারতেও অহিন্দু সমাজে সধবা বা বিধবার পুনর্ব্বিবাহাদি প্রথা, পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, কুলটার খাতায় নাম না লিখাইয়াও, দ্বিতীয় পতি গ্রহণ অবশ্য অসম্ভব ও সমাজ-বিরুদ্ধ নহে।

এইরূপ বুধ, শুক্র আদি অন্যান্য গ্রহেরও স্ফুট-অংশাদি প্রণয়নে দেখা যায় যে বঙ্গদেশীয় এই সকল পঞ্জিকা, গণনা-ফলে, পরস্পর সামঞ্জস্য-রহিত।

(২) প্রসঙ্গ-ক্রমে কোষ্ঠী-বিচারে পঞ্জিকা-দ্বয়ের তিথি ও নক্ষত্রাদির প্রতিও পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষিত করা যাইতেছে। ঐ দিন (নির্দ্দিষ্টীকৃত তাং ১লা আশ্বিন, ১৩৫৩, মঙ্গলবার) বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা-মতে রাত্রি ঘঃ ১০।৩০ মিঃ এর পরেই যে জাতকের জন্ম হইবে, তাহার জন্মে মৃগশিরা নক্ষত্র, দেব-গণ ও পরাশরীয় বিংশোত্তরী মতে মঙ্গলের দশা হইবে। কিন্তু পি এম্ বাগচি আদির পঞ্জিকা-মতে রাত্রি ঘঃ ১২।৫৪।৩৭ পর্য্যন্ত যাহার জন্ম হইবে, তাহার রোহিণী নক্ষত্র, নর-গণ ও বিংশোত্তরীয় চন্দ্রের দশাই থাকিবে। পরাশরীয় নাক্ষত্রিক দশা-সমূহের মত 'কালামৃত'-দশাও বিভিন্ন পঞ্জিকা অনুসারে গণনায় বৈষম্য-পরিপূর্ণ হইয়া পড়িবে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ—পূর্ব্ব-জাত যে ব্যক্তির কৃত্তিকা নক্ষত্রে জন্ম তাহার বার্ষিক কোষ্ঠী-ফল-বিচারে বর্ষ-লগ্ন যদি ঐ দিন রাত্রি ঘঃ ১০।৩০মিঃ এর পরে হয়, তবে বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা-মতে 'কালামৃত'-ধৃত বার্ষিক দশা-গণনায় মঙ্গলের[১৭] দশা হইবে ও পি এম্ বাগ্চির পঞ্জিকা-মতে চন্দ্রের[১৭] দশা হইবে।

(৩) এবম্প্রকার ঐ দিন রাত্রি ঘঃ ১।৪০ মিঃ পর হইতেই জাতকের জন্ম-তিথি ও মৃতকের মৃত্যু-তিথি অষ্টমী হইবে; কিন্তু পি এম্ বাগ্চি পঞ্জিকাদির মতে রাত্রি ঘঃ ৩।২৪।২৪ পর্য্যন্ত ও জন্ম বা মৃত্যু-তিথি[১৮] সপ্তমীই থাকিবে।

১৭ কালিদাস-কৃত 'উত্তর-কালামৃত' খণ্ড ৬, শ্লোক ৩৫ দ্রষ্টব্য।

১৮ রাত্রি ঘঃ ১।৪০ মিঃ হইতে ঘঃ ৩।২৪।২৪ মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-মতে মৃতে এক পাদ দোষ ও পি এম্ বাগ্চি পঞ্জিকাদির মতে দ্বিপাদ দোষ

(৪) এইরূপ দিবা ঘঃ ৩।৩১ মিঃ হইতে সন্ধ্যা ঘঃ ৬।৩৪।৩৮ মধ্যে জাত-ব্যক্তির বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা-মতে অসৃক্-যোগ ও পি এম্ বাগ্‌চি পঞ্জিকাদির মতে বজ্র-যোগ হইবে।

কোষ্ঠী-বিচারে গ্রহ-স্ফুটাদি সম্বন্ধে মন্তব্য

সুতরাং উপরি-উক্ত এক দিনের দৃষ্টান্ত হইতেই দেখা যাইতেছে যে বঙ্গীয় পঞ্জিকা-সমূহে গ্রহ-সংস্থান, তিথি, নক্ষত্র, যোগ ও করণাদির গণনা ও তাহাদের মুদ্রিত সময়গুলি পরস্পর বিভিন্ন ও সামঞ্জস্য-রহিত। একই স্থানে একই সময়ে এই গ্রহ-নক্ষত্রাদির সংস্থান-জ্ঞাপক অংশাদি ও সময় সকল পঞ্জিকাতেই 'একই' হওয়া উচিত। পূর্ব্ববর্ত্তী দৃষ্টান্ত-সমূহের পর্য্যালোচনায় বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা ও পি এম্ বাগ্‌চি, গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকাদির মধ্যে কোনখানি শুদ্ধ ও কোনখানি দৃক্-শোধিত না হওয়াতে তাহার অভিমত[১৯] জ্ঞাপনের এখানে প্রয়োজন নাই। তাহার নির্ণয় শিক্ষিত পাঠক-বৃন্দই করিবেন। আমাদের উদ্দেশ্য উভয়-বিধ পঞ্জিকা-ব্যবহারে গণিত-জ্যোতিষের গণনার মূল-সূত্রানভিজ্ঞ ও পঞ্জিকা-দৃষ্টে কোষ্ঠী আদি প্রস্তুত-কারক ফলিত-জ্যোতিষের চর্চ্চাকারী ব্যক্তিগণ ও জন-সাধারণ কিরূপ দুর্ভোগ ভোগ করিতে পারেন তাহাই দেখান।

(১) পূর্ব্ববর্ত্তী 'গ্রহ-স্ফুট ও কোষ্ঠী-বিচার' উপশীর্ষক অংশে চন্দ্রের বৃষ-রাশিতে গতি ও ভুক্তি-জ্ঞাপক অংশাত্মক অবস্থান লইয়া উভয় পঞ্জিকার গণিত সময়ের বিভিন্নতা দেখানো হইয়াছে। পঞ্জিকা-গণনায় অজ্ঞ ও পঞ্জিকা দেখিয়া কোষ্ঠী-প্রস্তুতকারী জ্যোতিষের পণ্ডিতদ্বারা যদি কেহ স্বীয় পুত্রের বিবাহার্থ এইরূপ বিভিন্ন প্রকারের গণনা-ফল-যুক্ত পঞ্জিকা অবলম্বনে কন্যার প্রস্তুত কোষ্ঠীর ফল বিচার করেন, তবে এক মতে গণিত ফল অতি উত্তম (সাধ্বী, সর্ব্ব-গুণান্বিতা আদি) দেখিয়া স্বগৃহে কন্যা আনিয়া, যদি ঐ পঞ্জিকার গণনা অসংস্কৃত ও ভ্রান্ত হয় তাহা হইলে তাঁহার কুল-গৌরব কিরূপ ক্ষুণ্ণ হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। অন্য পক্ষে বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকার গ্রহ-সংস্থান যদি ভুল[২০] হয়, তবে ঐ ব্যক্তি ঐ মতে কোষ্ঠী-বিচারে

হইবে। কারণ বারদোষের (মঙ্গলবার) অতিরিক্ত পুষ্কর-দোষ-কারক সপ্তমী তিথি বিশুদ্ধ-মতে নাই, বাগ্‌চি-মতে ঐ সময়ে সপ্তমী থাকিবে।

এইরূপ নিঃ তাং ৩রা আশ্বিন, (১৯ সেপ্টেম্বর) বৃহস্পতিবার, বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-মতে রাত্রি ঘঃ ৮।১ মিঃ পরেই মৃতে দ্বিপাদ-দোষ (ঐ সময় হইতে পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের আরম্ভ হওয়ায়), কিন্তু বাগ্‌চি পঞ্জিকামতে ঐ দিন রাত্রি ঘঃ ৯।৩৭।৫৫ পর্য্যন্তও 'মৃতে দোষ—নাস্তি' লিখিত। এই ১ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট ব্যাপক সময়-মধ্যে মৃত ব্যক্তির জন্য গৃহস্থকে পুষ্কর-দোষ-শান্তি-কৃত্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে অথবা নহে ? ইহার 'পাতি' (ব্যবস্থা) জ্যোতিষ-শাস্ত্রানভিজ্ঞ স্মৃতির পণ্ডিত মহাশয় কোন্ পঞ্জিকা-মতে দিবেন ? (জনৈক মহামহোপাধ্যায় স্মৃতির পণ্ডিত মহাশয় এইরূপ ক্ষেত্রে ও যাত্রা-বিবাহাদির ব্যবস্থা গোঁড়ামী-যুক্ত জন-সমাজে পি এম্ বাগ্‌চি ও গুপ্তপ্রেস মতে এবং নবীন শিক্ষিত সমাজে বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা-মতে দিতেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯২৫ সনে এক দিন লেখকের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে রক্ষণশীল পণ্ডিত-সমাজে থাকিতে হইবে বলিয়া, অপরকে অন্য পঞ্জিকা-মতে ব্যবস্থাদি দিলেও তিনি নিজে 'বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা'-মতেই স্বকীয় যাত্রাদি, স্বগৃহে ব্রত, উপবাস ও কোষ্ঠী-প্রণয়নাদি করাইতেন।)

১৯ বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা ও পি এম্ বাগ্‌চি, গুপ্তপ্রেসাদি পঞ্জিকাসমূহের শুদ্ধাশুদ্ধিনির্ণয়ের জন্য বিজ্ঞ জ্যোতিষী-দিগের 'অভিমত' 'উদ্বোধন' আষাঢ়-সংখ্যায় লেখকের "পঞ্জিকা-সংস্কার" প্রবন্ধে পৃঃ ২৯৫—২৯৬ দ্রষ্টব্য।

২০ বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা দৃক্-শোধিত পাশ্চাত্য পঞ্জিকা-সমূহের মতই দৃক্-সিদ্ধ ও নির্ভুল বলিয়া নিজকে ঘোষণা করিয়া থাকেন ; এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্যোতিষে বিজ্ঞ অনেক ব্যক্তিই ইহার পূর্ণতঃ অনুমোদনও করেন।

কন্যার অসাধ্বী ও পুনর্ভূ আদি হইবার যোগ দেখিয়া ঐ কন্যাকে গ্রহণ না করিয়া, পরে হয়ত তাহাকে সাধ্বী ও সর্ব্ব-গুণান্বিতা হইতে দেখিয়া পশ্চাত্তাপ-গ্রস্ত হইবেন যে কেন তিনি ঐ কন্যা-রত্নকে পুত্র-বধূরূপে স্বগৃহে আনয়ন করেন নাই!

উভয়-বিধ পঞ্জিকার প্রত্যহই সূর্য্যাদি গ্রহ-সমূহের স্ফুটে (রাশি-ভুক্তিতে) ভিন্নতা দেখা যায়। তাহার ফলে জন্ম-কুণ্ডলী ও 'তাজিক-নীলকণ্ঠি', 'কালামৃত' আদি মতে বর্ষ-ফল-গণনায়ও বিরাট্ ফল-বৈষম্য হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কল্পনা করা যাউক, এক ব্যক্তির জন্ম-সময়ে তাহার কোষ্ঠীতে সূর্য্য-স্ফুট রাশ্যাদি ৫—০°—৩৮′—৪২″। এই ব্যক্তির ১৩৫৩, ১লা আশ্বিন হইতে ১৩৫৪, ৩১শে ভাদ্র পর্য্যন্ত বর্ষ-ফল-গণনায় বর্ষ-কুণ্ডলীতে জন্ম-কালীন সূর্য্য-স্ফুট রাশ্যাদি ৫।০।৩৮।৪২ বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা-মতে নির্দ্দিষ্টীকৃত তারিখ ১লা আশ্বিন, ১৭ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার কলিকাতা-সময়ে ঠিক দিন ১২টার সময় হইবে। কিন্তু পি এম্ বাগ্‌চি পঞ্জিকা-মতে ঐ দিন, দিবা ১২টায় সূর্য্য-স্ফুট হইবে রাশ্যাদি[২১] ৫—০°—১১′—২৩″; এবং জন্ম-কালীন সূর্য্য-স্ফুট রাশ্যাদি ৫—০°—৩৮′—৪২″ পাওয়া যাইবে ঐ দিন রাত্রি ১১টা ১০ মিনিট ৫৩ সেকেণ্ড[২১] সময়ে। সুতরাং তাজিকাদি মতে গণনাশীল জ্যোতিষিগণ এবং সাধারণ পাঠকগণ ও অনায়াসে দেখিতে পাইতেছেন যে দিন ঠিক ১২টায় লগ্ন ধরিয়া এবং রাত্রি ১১টা ১০ মিঃ ৫৩ সেঃ এ লগ্ন ধরিয়া একই ব্যক্তির (জন্ম-কুণ্ডলীর সূর্য্যের রাশ্যাংশাদি ৫—০°—৩৮′—৪২″ অনু-সারে) দুইখানি পৃথক্-পৃথক বর্ষ-কুণ্ডলী প্রস্তুত করিলে কুণ্ডলীদ্বয়ের গ্রহ-সংস্থানে (গ্রহগণের স্ফুটে) বর্ষ-কুণ্ডলীর লগ্ন, লগ্ন-ফল এবং লগ্নানুযায়ী ভাব-সমূহে ও ভাবস্থ গ্রহ-সমূহের অবস্থানে এবং পাত্যাংশাদি-জনিত তাজিকোক্ত বর্ষ-দশা মুদ্দা-দশা ও কালামৃত-দশাদি ও তাহাদের ফল-বিচারে কিরূপ বিরাট্ অসামঞ্জস্যপূর্ণ ভিন্নতা ও তদনুরূপ অশুদ্ধি হইয়া পড়িবে। বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত ও পি এম্ বাগ্‌চি পঞ্জিকাদির ঐ দিন দিবা ১২ ঘটিকার সময় পঞ্জিকা-দ্বয়ে নির্দ্দিষ্ট সূর্য্য-স্ফুটের পার্থক্য ২৭′ কলা ১৯″ বিকলা। পি এম বাগ্‌চি পঞ্জিকা মতে ঐ দিন সূর্য্যের দৈনিক গতি ৫৮′ কলা ৩৮″ বিকলা; সুতরাং সূর্য্যকে ২৭′ কলা ১৯″ বিকলা ভ-চক্রে অতিক্রমণ করিতে সময় লাগিবে ১১ ঘণ্টা ১০ মিনিট ৫৩ সেকেণ্ড। বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত ও পি এম্ বাগ্‌চি পঞ্জিকার মধ্যে সূর্য্য-গ্রহের অবস্থিতির গণনায় ঐ দিনের পার্থক্যও ইহাই। সুতরাং উভয়ের মধ্যে একখানি পঞ্জিকার গণনা যদি শুদ্ধ ও দৃক্-শোধিত হয়, তবে অপরখানির গণনায় ভুল হইবে ১১ ঘণ্টা ১০ মিনিট ৫৩ সেকেণ্ড। অতএব এই ১১ ঘণ্টা ১০ মিঃ ৫৩ সেঃ এর ভুল যদি জন্ম-কুণ্ডলী বা বর্ষ-কুণ্ডলী প্রস্তুতে লগ্ন ও গ্রহ-সংস্থানে (গ্রহ-স্ফুটাদিতে) থাকিয়া যায়, তবে ঐ কুণ্ডলী হইতে কাহারও কোষ্ঠীর ফলিত-জ্যোতিষের বিচার কতখানি মিলিবে, তাহা গণিত বা ফলিত জ্যোতিষে অজ্ঞ জনসাধারণও অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন।

(২) উভয়-বিধ পঞ্জিকাদ্বয়ে তিথি ও নক্ষত্রাদির পার্থক্য থাকায় এক পঞ্জিকার চন্দ্র-স্থিত রাশি ও নক্ষত্রাদি অনুসারে নির্দ্ধারিত গণ, বর্ণ ও রাশি আদি যুক্ত কন্যার অন্য পঞ্জিকা অনুসারে গণিত গণ, বর্ণ ও রাশি* আদি যুক্ত বরের সঙ্গে বিবাহার্থ যৌটক-মিলনও কিরূপ ভ্রম-সঙ্কুল হইয়া পড়িবে, তাহাও পাঠকগণ বুঝিতে পারিতেছেন।

২১ এই সময় ও অংশাদি Proportional Logarithms সাহায্যে দেওয়া হইল; সুতরাং Rule of Proportion এ 'Interpolation' জনিত সংস্কার-পূর্ব্বক অঙ্ক কষিলে ইহাতে কয়েক সেকেণ্ডের তারতম্য হইতে পারে।

* 'গ্রহ-স্ফুট ও কোষ্ঠী-বিচার' এ (২) অংশ দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্ব-দর্শিত 'কালামৃত'-ধৃত বার্ষিক-দশা-গণনায় মঙ্গলের দশার ভোগ-কাল ৩২ দিন ও চন্দ্রের দশার ভোগ-কাল ৬০ দিন[২২]। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বার্ষিক ফল-গণনাদি ও পঞ্জিকার নক্ষত্রান্ত সময়ের ভুল থাকিলে জন্ম-কুণ্ডলী মহাদশাদির ফলের মতই কোনও প্রকারে যথা-সাময়িক ও শুদ্ধ হইতে পারে না।

(৩) এইরূপ চন্দ্র ও সূর্য্যের স্ফুটাংশে বিভিন্ন পঞ্জিকায় ভিন্নতা থাকায়, নক্ষত্র ও তিথিও[২৩] ভিন্ন-ভিন্ন সময়ব্যাপী হইয়া থাকে। সুতরাং পূর্ব্ব-দর্শিত সময়ে কাহারও জন্ম বা মৃত্যু হইলে এক পঞ্জিকা-মতে সপ্তমীতে ও অন্য পঞ্জিকা-মতে অষ্টমীতে বার্ষিক জন্ম-তিথির কৃত্যাদি করিবার ফলে কিরূপ অনর্থ হইয়া পড়িয়াছে, তাহাও পাঠকগণ বুঝিতে পারিতেছেন। এই প্রকারে পঞ্জিকা-গণনা ও তিথি অশুদ্ধ হইলে দশমীতেও একাদশীর উপবাস ও ব্রত-পালনের ও সত্যকার একাদশী-দিবসে পারণ ও অন্ন-ভোজনের ব্যবস্থা দেওয়া হইবে। কোষ্ঠী-বিচারেও জাতকের জন্ম-তিথি-জনিত ফল অনুরূপ ও তাহার স্বভাব-বিরুদ্ধ হইয়া পড়িবে।

(৪) চন্দ্র ও সূর্য্যের স্ফুট-গণনা শুদ্ধ ও দৃক্-শোধিত না হইলে উভয় স্ফুটের যোগ[২৩] হইতে প্রাপ্ত জন্ম-কালীন অস্থক্ বা বজ্র আদি নামক 'যোগ'-ফলও জাতকের কোষ্ঠীতে একরূপ হইতে পারে না। কারণ পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত-দিবসীয় সময়ে এক পঞ্জিকা-মতে অস্থক্-যোগ ও অন্য মতে বজ্র-যোগ হইতেছে।

উপসংহার

অতএব দেখা যাইতেছে যে গণিত-জ্যোতিষের পঞ্জিকা-গণনা যদি বিশুদ্ধ ও দৃক্-সিদ্ধ না হয় তবে ঐ অসংস্কৃত ভ্রান্ত পঞ্জিকার অশুদ্ধ তিথি-নক্ষত্রাদি অনুসারে যাত্রা, বিবাহ, ব্রতোপবাস ও পূজা-পার্ব্বণাদি সম্পন্ন করা যেরূপ অনর্থকর, সেইরূপ জাত-ব্যক্তির অশুদ্ধ-পঞ্জিকা হইতে কোষ্ঠী-প্রণয়ন করিলেও কোষ্ঠীর গ্রহ-স্ফুটাদি নির্ভুল হইবে না। অশুদ্ধ চন্দ্র-স্ফুট বা জাত-নক্ষত্র হইতে জাতক-মহাদশা, বর্ষ-দশা ও গোচরাদি গণনার ফল যথা-সাময়িক না হওয়ায় অশুদ্ধ কোষ্ঠী হইতে বিচার-জন্য অশুদ্ধ সময়-নির্ণয়ে জাতকের পক্ষে নানা প্রকার ভীতি-জনক অনর্থ সংঘটিত হইতে পারে।

বঙ্গীয় পঞ্জিকা-সমূহে গ্রহ-নক্ষত্রাদির অবস্থিতি-জ্ঞাপক সময়ের বিভিন্নতা ও অসামঞ্জস্য দেখিয়া অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি পাশ্চাত্য জ্যোতিষিগণের দৃক্-সিদ্ধ পঞ্জিকা হইতে গ্রহগণের সায়ন-স্ফুট অনুসারে কোষ্ঠীতে জন্ম-কালীন গ্রহ-স্থিতি নির্ণয় করিয়া থাকেন। কেহ কেহ ঐ সায়ন-স্ফুট[২৪] হইতেই ফলিত বিচার করেন, আবার কেহ কেহ ঐ স্ফুট হইতে জন্ম-কালীন অয়নাংশ (The total precessions of the Equinoxes) বাদ দিয়া গ্রহ ও ভাব-সমূহের নিরয়ন-স্ফুট হইতে কোষ্ঠীর ফল বিচার করিয়া থাকেন। বিষুব-বৃত্তের নিকটবর্ত্তী স্থান-সমূহের—অক্ষাংশ ৬° হইতে ৩৪° মধ্যবর্ত্তী ভারতবর্ষের—তো কথাই নাই, এমন কি পৃথিবীর সকল স্থানের জন্যই নিরয়ন গ্রহ ও ভাব-স্ফুট অনুযায়ী কোষ্ঠী-বিচারে দশ-বর্গাদি ও অন্যান্য সূক্ষ্ম ফল (গ্রহগণের ফল-বিচার সমেত) সায়ন-স্ফুট-জনিত বিচার-ফল

২২ 'উত্তর-কালামৃত'—খণ্ড ৬, শ্লোক ৩৬ দ্রষ্টব্য।

২৩ বঙ্গীয় পঞ্জিকা-সমূহের তিথি, নক্ষত্রাদি পঞ্চাঙ্গের শুদ্ধতার বিবরণ 'উদ্বোধন', চৈত্র সংখ্যায়, ১৩৫২, পৃঃ ১৩৫-এ লেখকের পঞ্জিকা 'শীর্ষক' প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

২৪ পাশ্চাত্য জ্যোতিষিগণই প্রধানতঃ, দশটী গ্রহের ও দ্বাদশ ভাবের, এই সায়ন-স্ফুট হইতে কোষ্ঠী-বিচার করিয়া থাকেন।

হইতেও অধিক মিলিয়া থাকে, ইহাই লেখকের নিঃসন্দিগ্ধ অভিমত। কিন্তু এই নিরয়ন গ্রহ-স্ফুটসমূহ বঙ্গীয় পঞ্জিকাসকল হইতে গ্রহণ করিলে একই ব্যক্তির এক জন্ম-সময়েরই পৃথক্ পৃথক্ স্ফুট-অংশাদি হইয়া পড়ে। যেমন, বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকাদৃষ্টে প্রস্তুত কোষ্ঠীর গ্রহ-স্ফুটাদি পি এম্ বাগ্‌চি বা গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা হইতে নির্ম্মিত কোষ্ঠীর গ্রহ-স্ফুটাদির সঙ্গে মেলে না। এজন্য পঞ্জিকা-গণনায় স্বয়ং অক্ষম, পঞ্জিকা দেখিয়া কোষ্ঠী-প্রণেতা কোষ্ঠী-প্রণয়নে ও তাহার ফল-বিচারে বিপন্ন হইয়া পড়েন।

সুতরাং বর্ত্তমান-কালোচিত সংস্কারপূর্ব্বক দৃক্-সিদ্ধ স্পষ্ট-গ্রহাদিযুক্ত পঞ্জিকা-প্রণয়নে ঐকমত্য-হীন শ্রদ্ধেয় বঙ্গীয় পণ্ডিত-সমাজ যদি সকলে একমত হইয়া একইরূপ বিশুদ্ধ ও দৃক্-শোধিত নিরয়ন গ্রহ-স্ফুট ও তিথি, নক্ষত্রাদিযুক্ত পঞ্জিকার প্রণয়ন ও প্রকাশন করেন, তবে সকল পঞ্জিকা-দৃষ্টেই বিশুদ্ধ কোষ্ঠী-প্রণয়নে এবং অজ্ঞ হিন্দু জন-সাধারণের নানারূপ শুভ ক্রিয়া-কাণ্ডের যথা-কালীন সম্পাদনে সহায়ক হইয়া তাঁহারা সকলের ধন্যবাদার্হ ও কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।

দশ-ভাব

ডাঃ শচীন সেনগুপ্ত

পাপ কিবা পুণ্য কিবা
নাহি জানি প্রভু,
মুহূর্ত্তও তোমা যেন
ভুলি নাহি কভু।

অর্থের লালসাপ্রিয়,
তাতে ক্ষতি নাই,
বিভুপদে দিয়ে যদি
পরার্থে বিলাই।

পরদুঃখে প্রাণ যদি
ব্যাকুলিত হয়,
জানি তা বিভুর কৃপা
নাহিক সংশয়।

পাপ পুণ্য ভেদাভেদ
তর্কে নাহি মিলে,
সব দ্বিধা চলে যায়
চিত্তে জিজ্ঞাসিলে।

কোন কাজ করণীয়
কোন কাজ নয়,
অন্তরে জিজ্ঞাসা করি
ঘুচাই সংশয়।

লোকে ভাল—ভাল কথা
সুখী হই শুনে,
নিজে ভাল হওয়াই
সার জানি মনে।

সব কাজ করি আমি
বিবেক-নির্দ্দেশে,
মন ভাল থাকে তাতে
দুঃখ নাহি পশে।

অপরের কাচখণ্ড
নিজ হীরা সম
করি জ্ঞান, তাতে পাই
সুখ অনুপম।

কম বুঝি, নাহি বুঝি
ক্ষতি তাহে নাই,
ভুল বুঝে যেন বৃথা
দুঃখ নাহি পাই।

বিশ্ব ব্রহ্ম জীব ব্রহ্ম
সর্ব ব্রহ্মময়,
ভিতরে বাহিরে ব্রহ্ম
বিশ্বাস নিশ্চয়।

বাবুরাম মহারাজের কথা

ব্রহ্মচারী—

মহাপুরুষগণ যখনই আসেন তখনই তাঁদের চারদিকে এক অদ্ভুত অত্যুজ্জ্বল আলোকের প্লাবন বয়ে যায়—তখন তাঁদের দর্শনে, তাঁদের স্পর্শনে মানবমনে তাঁদের বাণী মূর্ত্ত হয়ে উঠে। কিন্তু সেই সব মহাত্মাদের দেহরক্ষার পরও তাঁরা প্রাণবন্ত হয়ে থাকেন তাঁদের দেওয়া বাণীর মধ্যে। এই বাণীতে এমন একটা সাবলীল প্রেরণা থাকে যে মানবনয়ন তার দর্শনে বা মানবকর্ণ তার শ্রবণে নূতন এক ভাবালোকে আলোকিত হয়ে উঠে এবং ঐ আলোকে তারা তাদের তমসাচ্ছন্ন ধর্ম্মপথ তথা কর্ম্মপথকে সুস্পষ্টরূপে দেখ্‌তে পায়।

বাবুরাম মহারাজ তখন মঠেই রয়েছেন। পূর্ব্ববঙ্গের ভক্তদের আকুল আহ্বানে তাঁদের মাঝে যাত্রা করবেন। সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে। পশ্চিম দিকের বারাণ্ডায় অনেক সাধু সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও আগন্তুক তাঁকে ঘিরে রয়েছেন। যাবার প্রাক্কালে তিনি সমবেত জনমণ্ডলীকে উদ্দেশ করে বলছেন নানা কথা। সাধুদের উদ্দেশ করে বললেন—"দেখ, এঁরা সব আসবেন, এঁদের যত্ন টত্ন করবি।" আগন্তুকদের এখানে 'এঁরা' বলছেন। আবার তাঁদের উদ্দেশ করে বলছেন—"আর তোমরাও আসা যাওয়া বন্ধ কোরো না। আমরা চলে যাচ্ছি বলে, এরা (সাধুরা) কম নয়, এরা সব এক এক জন ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ।"

আর একদিনের কথা—জনৈক সাধু রাস দেখতে গেছেন, আসতে রাত হচ্ছে, সকলে তাঁর জন্য অপেক্ষা করে আছেন—আহারে বসতে পাচ্ছেন না। এমন সময় বাবুরাম মহারাজ বললেন,—"ভাত ঢাকা দিয়ে রাখ, কাল খাবে।" জনৈক সাধু—"আমাদের না খেতে হয়!" বাবুরাম মহারাজ—"না, ও ব্যাটাই খাবে।"

আর একদিন, একজন মঠে মনে মনে গান গাইতে গাইতে যাচ্ছেন। গানটার প্রথমাংশ হ'চ্ছে—"সেথায় আছেন জননী, দিবস রজনী, পথপানে চেয়ে কেবল।" ঐ ব্যক্তি খানিক অগ্রসর হয়ে দেখেন—মঠের ফটকের কাছে বাবুরাম মহারাজ পথ পানে চেয়ে একাকী স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন!

একজন গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্নে মঠের পুরানো পূর্ব্বদিকের বারাণ্ডায় বসে আছেন। খানিক পরে সেখানে বাবুরাম মহারাজ এসে ঐ ব্যক্তিকে নানান কথার মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। এমন সময় হঠাৎ জানতে পারলেন যে উক্ত ব্যক্তি জল খাবেন। নিকটস্থ এক ব্রহ্মচারীকে বল্লেন—"এই—, ইনি জল খাবেন কিনা জিজ্ঞাসা করেছিলি?" ব্রহ্মচারী বললে—"জল ত ওখানেই রয়েছে।" বাবুরাম মহারাজ তাই বললেন—"উনি জেনে রেখেছেন তোমাদের কোথায় জল আছে?" আগন্তুকদের প্রতি তাঁর কি গভীর সমবেদনা!

আর একদিন মঠে অনেক ভক্ত সমাগম হয়েছে। হঠাৎ একখানা কালো মেঘের আবির্ভাব। বর্ষণ আরম্ভ হ'য়ে গেল—একজন ব্রহ্মচারী সত্বর ভক্তদের জুতোগুলি পায়ে করে মঠের পুরানো বাড়ীর পশ্চিমদিকের বারাণ্ডায়

তুলছেন। হঠাৎ বাবুরাম মহারাজের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হ'ল—তিনি বলে উঠলেন—"ভক্তের জুতা মাথায় করে তুলবি।" ব্রহ্মচারীদের নিরভিমান কোরে তুলবার এ এক অদ্ভুত আগ্রহ।

জনৈক ভদ্রলোক একদিন কিছু ছানা এনেছেন ঠাকুরকে নিবেদন করে দেবার জন্য। বাবুরাম মহারাজ তখন এক ব্রহ্মচারীকে তা রাখতে বললেন এবং জানালেন, "ভক্তের জিনিষ রোজ একটু একটু করে ঠাকুরকে দিবি, একদিনে দিসনে, জলে ডুবিয়ে রাখ।" ভক্তকে তিনি সত্য সত্যই মহাসম্মানের আসন দিতেন। ভগবানের চেয়ে ভক্ত কোন অংশে কম নয় এটা তিনি কত গভীর ভাবেই না উপলব্ধি করেছিলেন।

একব্যক্তি স্নানের পর পুরানো মঠবাড়ীর পশ্চিমদিকের বারাণ্ডায় এসে দাঁড়ালেন। উক্ত বারাণ্ডার পাশেই উত্তরদিকের ঘরে কয়েকজন ব্রহ্মচারী মুড়ি খাচ্ছেন ও কথাবার্ত্তা বলছেন—ভদ্রলোক সেদিকে তাকিয়ে আছেন। এমন সময় বাবুরাম মহারাজ সেখানে এসে ব্রহ্মচারীদের বললেন—"এই ব্যাটা, নিজেরা খাচ্ছিস্ এঁকে দিয়েছিস্?" তখন একজন তাড়াতাড়ি মুড়ি দিতে গেলে মহারাজ বললেন—"তুই খেতে এয়েছিস, তুই খা, তুই দিতে পারবিনি, আমি দিচ্ছি।" এই প্রকার কতরকম উপদেশাত্মক কথাই না বলতেন।

মহাপূজায় একদিন বাবুরাম মহারাজ প্রসাদ বিতরণ করতে করতে একজনকে বল্লেন—"মা খালি খাওয়াতে ভালবাসেন, নয়?" আবার কখন কখন বলতেন—"যখন দেখি অনেক জিনিষপত্তর আসছে, তখনই বুঝতে পারি, ঠাকুর এর পেছনে লোক পাঠাচ্ছেন।"

একজনের পানদোষ আছে; তিনি অনেক জিনিষপত্তর নিয়ে মঠে এসেছেন। তাঁর স্বভাব সংশোধনের জন্য বল্লেন, "ব্যাটা, তুমি কি এখানে ঠাকুরকে ঘুষ দিতে এয়েছ নাকি?" আবার অন্তিম শয্যায়ও এঁর কথা জিজ্ঞাসা করছেন—মাতৃ-ভাবের এ এক অদ্ভুত অভিব্যক্তি! আর একদিন এক ব্যক্তিকে ডাব দিতে বললেন। উক্ত ভদ্রলোক তখন বললেন, "আমাকে কেন, আপনি খান।" বাবুরাম মহারাজ বললেন—"তুমি খাও, তাহ'লেই আমার খাওয়া হ'বে।"

বাবুরাম মহারাজ তখন কাশীধামে রয়েছেন—কথা প্রসঙ্গে হঠাৎ বললেন—"দেখ চন্দুরে, সাধুর গলে ডুমুখো হবে। তুমি ব্যাটা, যে দেবে খোবে তাকে যত্ন করবে, আর যে দেবে না, তাকে দেখবে না— তা হবে না।" কাশীতে তখন তিনি কাশিতে ভুগছেন। রাতে দুধ মাত্র খান। তখনও দুই ব্যক্তিকে তার থেকে খেতে দেন। নিজে সামান্য একটু পান করেন।

এমন অনেকদিন হয়েছে—কেহ ঠাকুরের জন্য দ্রব্যাদি নিয়ে ভারাক্রান্ত হয়ে আসছেন দেখে মহারাজ নিকটস্থ মজুরদের বললেন, "ওরে নে নে, হাত থেকে ও গুলো নে।"

বাবুরাম মহারাজের পূজা এক দেখবার বিষয়—কত যত্নে একটী ফুল বেছে নিয়ে, বক্ষে ধারণ করে, ধ্যান করে, কত যত্নে সেটী নিবেদন করতেন। পূজাশেষে যখন নেবে আসতেন, মুখের সে কি গম্ভীর ভাব!

আর একদিন বাবুরাম মহারাজ বললেন—"জপের সময় আঙ্গুল সব জোড়া থাকবে, ফাঁক না থাকে, তা নইলে ফাঁক দিয়ে জপের ফল বেরিয়ে যাবে।" আবার বললেন—"শুমুখে যে সময় আসচে, যারা ঠাকুরকে ধরে থাকবে, যারা ভগবানকে ধরে থাকবে, তারাই রক্ষা পাবে, বাকি সব নাশ হয়ে যাবে। ঠাকুর যে কুটির উপর থেকে ডেকেছিলেন 'ওরে ভক্তেরা কে কোথায় আছিস আয়'—সে কেবল আমাদের

কয়েক জনকে নয়, তোমাদেরও, আরও অনেককে ডেকেছিলেন। এখনও সব আসেনি। ঠাকুরের অনেক ভক্ত রয়েছে, এখনও সব আসেনি।”

এক সময় বলেছিলেন, এখন যাঁরা সাধু হতে আসছে এরা আমাদের চেয়েও বড়। আমরা তাঁকে (ঠাকুরকে) দেখে এসেছি, আর এরা তাঁর নাম শুনেই আসছে! অবশ্য এ যে শুধু নবাগতদিগকে উৎসাহিত করার জন্যই বলতেন তা বলাই বাহুল্য।

বাবুরাম মহারাজ খুব সাদাসিদে ভাবে থাকতেন; একখানা কাপড়, একখানা চাদর ও একটি ফতুয়া ছিল তাঁর বহিরাভরণ। অন্তরের অলঙ্কার যাঁর যত বেশী, বোধ হয় বাহিরের সাজসজ্জায় তাঁর ততবেশী তাচ্ছিল্য। স্বামীজীকে তিনি অত্যন্ত আপনার জ্ঞান করতেন; বলতেন—“আমি স্বামীজীর চেলা।”

তাঁর অন্তরের রূপমাধুর্য্য বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হত, তবে লোকের সুখদুঃখের অদ্ভুত দ্বন্দ্ব দূরীকরণ করবার ইচ্ছাই ছিল বেশী। এমন কতদিন হয়েছে বাবুরাম মহারাজ পথের দিকে চেয়ে বসে আছেন—এবং মাঝে মাঝে ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছেন। ভক্তরা আসছেন, কি জানি যদি দেরী হয়ে গেলে প্রসাদ না পায়। সময়মত ভক্তরা এলেন ত ভালই—অসময়ে এসে পড়লেও তিনি নিজে তাঁদের জন্য রাঁধবার আয়োজন করতে যেতেন। বাবুরাম মহারাজের প্রেম-ভালবাসা-টান কখন কি ভাবে কোথা দিয়ে ফুটে উঠত তা বোঝা শক্ত ছিল। তিনি মঠের আশে পাশে বহু স্থানেই ঘরে ঘরে গিয়ে লোকের অভাব অভিযোগ শুনতেন এবং মঠ থেকে তাদের চাল তরকারি প্রভৃতি নিয়ে যেতে বলতেন। এই সময় তিনি প্রায়ই ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে নিতেন। তারা আশ্চর্য্য হয়ে যেত তাঁর অসম্ভব অন্তর্দৃষ্টি দেখে—বলতেন, “ভদ্রলোকরা কি তাদের অভাব অভিযোগ জানতে দেয়রে, এঁরা ত আবার ভদ্র-মহিলা।”

তাঁর গালিগালাজও একটা আস্বাদন করবার জিনিস ছিল—মঠের এক সাধু তখন হিমালয়ে রয়েছেন—বাবুরাম মহারাজকে লিখেছেন, “এখানে সব ভাল যা দেখছি ও শুনছি; কিন্তু এখানে আপনার গালি গালাজ নেই।” বাবুরাম মহারাজ সে চিঠি পেয়ে, একে ওকে দেখিয়ে বেড়াচ্ছেন। কয়েকদিন পরেই সেই সাধু এসে উপস্থিত—বাবুরাম মহারাজের প্রেমময় গালিগালাজের লোভে, একেবারে হিমালয় থেকে বেলুড়ে। এখনও সেই সাধুটী গদগদ কণ্ঠে তা ব্যক্ত করেন। কোন এক সময় বাবুরাম মহারাজ মঠের এক ব্রহ্মচারীকে মঠ থেকে তাড়িয়ে দেবেন ঠিক করেছিলেন, কিন্তু কোন সময়ই তাঁর দরদী মন তাঁর সঙ্কল্পকে কার্য্যে পরিণত করতে দেয়নি। বাবুরাম মহারাজ খুব জোরের সঙ্গে কথা বলতেন—“খা, খা, শঙ্কর, খুব খা!” এক সাধু হিমালয়ে যাচ্ছেন। বাবুরাম মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন—“কি উদ্দেশ্যে?” সাধু উত্তর দিলেন, “চাপরাস্ আনতে।” কিছুদিন পরে তিনি ফিরলে বাবুরাম মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন, “চাপরাস এনেছ?” সাধু উত্তর দিলেন—“ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়”—সেদিন তাঁর অন্তরে বাহিরে যে রূপচ্ছটা প্রতিভাত হয়েছিল তা অপূর্ব্ব—অত্যন্ত অভিনব—সেদিন বোধ হয় ঐ দরদী-প্রধানও ভেবেছিলেন—এরা আমাকে দেখেই মুগ্ধ হয়, গুরুমহারাজকে দেখলে ত সমস্বরে বলে উঠত—

“লাখ লাখ যুগ হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ান না গেল।”

ঐ লাখ লাখ যুগের অতৃপ্ত প্রেমের অনেকাংশই বাবুরাম মহারাজের প্রেমানন্দের মধ্যে সঞ্চিত ছিল।

নাগপূজা

ভক্তিতীর্থ শ্রীউমেশ চক্রবর্ত্তী

বহির্ভারতে নাগপূজা

পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণের গ্রন্থে—যথা কানিংহামের 'ইণ্ডিয়া,' টেলরের 'হিন্দুমিথ', ফারগুসনের 'ট্রি এণ্ড সার্পেন্ট ওয়ারশিপ', জেব্র্যাণ্টের 'এনসিয়েণ্ট মিথোলজি' প্রভৃতিতে অতীতযুগে বিশ্বময় সর্প উপাসনার বিবরণ স্পষ্টরূপে বর্ণিত রহিয়াছে। পৃথিবীর ইতিহাস-মন্থনকারী মনীষিগণ স্পষ্ট ঘোষণা করেন যে, প্রায় সকল প্রাচীন জাতির ভিতরই সর্প বা নাগপূজা প্রচলিত ছিল। খ্রীষ্টানদের বাইবেলে বর্ণিত সর্পরূপী শয়তানের কাহিনীতে নূতন করিয়া জীহোবার পূজা প্রচলন দ্বারা নাগপূজার বিলোপ সাধনের চেষ্টা সুস্পষ্ট। এশিয়ার প্যালেষ্টাইন, ব্যাবিলন, পারস্য, তিব্বত, ভারতবর্ষ, সিংহল, চীন, জাপান প্রভৃতি; আফ্রিকার মিশর; য়ুরোপের গ্রীস, ইটালী, প্রুশিয়া প্রভৃতি; আমেরিকার মধ্য, দক্ষিণ ও উত্তরাংশ এবং মেক্সিকো প্রভৃতি; এবং এমন কি অষ্ট্রেলিয়াতেও নাগপূজার বহুল অভ্রান্ত নিদর্শন বিদ্যমান।

ইহুদিদের মধ্যে ইস্রায়েলের বংশধরগণ পিত্তল-নির্মিত সর্পের সম্মুখে ধূপদীপ দান করিতেন। প্রাচীন প্রুশিয়গণ প্রত্যহ সর্পকুলকে নৈবেদ্যাদি দিতেন। রোমনগরীর সন্নিকটে জুনো দেবীর কুঞ্জপার্শ্বে এক বৃহদাকার সর্প পূজিত হইত। রোমনগরী প্রতিষ্ঠার প্রায় অর্ধ শতাব্দী পরে তথায় ভীষণ মহামারি উপস্থিত হয়, তখন রোমীয়গণ মহাসমারোহে একটি সর্পকে নগরীতে নিয়া পূজা করেন, এবং তাঁহাদের বিশ্বাস—এই পূজার ফলেই মারিভয় নিবারিত হয়। গ্রীসের এপিডাউসের কুঞ্জে বিশেষ ভাবে নাগপূজা অনুষ্ঠিত হইত। মহাবীর আলেকজাণ্ডার এবং থীবিসের অধিবাসিগণ নাগবংশজাত বলিয়া উল্লেখ আছে। প্রাচীন মিশরবাসিগণ এপোফিস্ নামক নাগরাজের পূজা করিতেন। জরাথুষ্ট্রের ধর্ম্মগ্রন্থে 'আঝীদাহক' নামে এক ভীষণ সর্পদেবতার উল্লেখ আছে। টায়ার নগরীতে নাগপূজক বলিয়া খ্যাত এক খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায় যীশুপূজা অপেক্ষাও নাগপূজায় সমধিক উৎসাহী ছিলেন। রোমসম্রাট্ অগাষ্টাসের জননী এত্তিয়া নাগপূজার ফলেই অগাষ্টাসকে পুত্ররূপে পাইয়াছিলেন, এইরূপ প্রবাদ আছে। তুরাণ দেশের বুদ্ধমূর্তি তিন বা ততোধিক ফণিফণাতলে সমাসীন। এতদ্ভিন্ন পৃথিবীর নানাদেশে সর্প পূজার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। সর্পবংশোদ্ভব বিভিন্ন মানব-জাতির উল্লেখও প্রায় সব দেশেই পাওয়া যায়। এতসব দৃষ্টান্ত হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ভারতীয় নাগ বা নাগমাতৃকা পূজা জগতের ভাবধারার সহিত সমসূত্রে গ্রথিত, তাই প্রাচীন-কাল হইতেই নাগপূজা বিশেষভাবে প্রচলিত।

ভারতীয় নাগপূজা

ভারতে—আসাম প্রদেশের কামরূপ, গোয়াল-পাড়া, কাছাড়, তেজপুর, শ্রীহট্ট প্রভৃতি জেলায়, বাংলার ময়মনসিংহ হইতে মেদিনীপুর পর্যন্ত প্রায় সব জেলায়, বিহারের দ্বারবঙ্গ, সাঁওতাল-পরগণা, হাজারিবাগ প্রভৃতিতে; উড়িষ্যার পুরী,

বালেশ্বর, কটক প্রভৃতিতে; সংযুক্ত প্রদেশের কাশী, এলাহাবাদ, অযোধ্যা প্রভৃতিতে; বোম্বাইয়ের মহারাষ্ট্র খণ্ডাদিতে; মান্দ্রাজের তিরুভেতুর, ওয়াশারম্যানপেটা, পেরাম্বুর প্রভৃতিতে; অন্ধ্রপ্রদেশে, মহীশূরে, মালাবারে, সিংহলে অদ্যাবধি নাগ বা নাগমাতৃকার স্থায়ী মন্দিরাদিতে নিত্য পূজা এবং বিশেষ বিশেষ দিনে সাময়িক উৎসবাদির অন্ত নাই।

স্মার্ত্ত রঘুনন্দন তিথিতত্ত্বের ভিতর উল্লেখ করিয়াছেন, আষাঢ়ী পূর্ণিমার পর যে পঞ্চমী অর্থাৎ গৌণ শ্রাবণের কৃষ্ণা পঞ্চমীই নাগপঞ্চমী। দেবীপুরাণে বর্ণনা আছে, শ্রীশ্রীভগবানের শয়ন হইলে অর্থাৎ শয়নৈকাদশীর পর কৃষ্ণাপঞ্চমীতে গৃহাঙ্গনে সীজবৃক্ষ স্থাপন করিয়া শ্রীশ্রীমনসা দেবীর পূজা করা কর্তব্য। এই কৃষ্ণাপঞ্চমী হইতে ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাপঞ্চমী পর্যন্ত প্রতি পঞ্চমীতে অষ্টনাগের সহিত নাগমাতৃকা মনসার পূজা করিলে সর্পজনিত কোন ভয় থাকে না।

এই নাগপূজা বা মনসাপূজার ইতিহাস আলোচনা করিলে আর্য ধর্মজগতে ইহার প্রাচীনত্ব আবিষ্কৃত হয়। বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে সর্প নামক এক ঋষির উল্লেখ আছে। তিনি ঋগ্বেদের কতিপয় সূক্তের রচয়িতা। ঐ সূক্ত সমূহ 'সর্পরাজ্ঞী' নামে প্রসিদ্ধ। এছাড়া আর্যজাতির প্রাত্যহিক আসনশুদ্ধি ও ভোজ্যদ্রব্য নিবেদনের সময় 'নাগায় নমঃ' 'অনন্তায় নমঃ' মন্ত্রের অপরিহার্য ব্যবহার আছে। পৌরাণিক সৃষ্টিতত্ত্বে দেখা যায়, মহাপ্রলয়ের সময়ে ভগবান শেষশায়ী বা অনন্তশয্যাশায়ী হইয়া আছেন। আবার মেদিনী সৃষ্টি হইলে তাঁহাকে অনন্তদেবই সহস্র শীর্ষে ধারণ করেন। প্রজাপতি কশ্যপ তৎপত্নী কদ্রুদেবীর গর্ভে নাগ জাতির জন্ম দেন। খল ও আশীবিষ বলিয়া পাতাল প্রদেশই নাগলোক নামে নির্দিষ্ট হয়। বাসুকি নাগ নাগলোকের রাজা, ইনি দেবাসুরের সমুদ্র মন্থন সময়ে মন্থন-রজ্জুরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিলেন। গীতায় ভগবদুক্তি আছে 'অনন্তশ্চাস্মি নাগানাম্' এবং 'সর্পানামস্মি বাসুকিঃ।' মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে আছে, সর্বদেবদেহ-জ্যোতিরূপা দেবীকে যখন সকল দেবতা নিজ নিজ অস্ত্র ও উপহার প্রদান করিতেছিলেন, তখন সর্বনাগেশ অনন্তদেব অন্যান্য দেবতার ন্যায় মহামণিবিভূষিত নাগহার প্রদান করিয়াছিলেন। মহাভারতে বর্ণনা আছে, দুর্যোধন হিংসার বশে ভীমকে বিষ খাওয়াইয়া জলমগ্ন করিয়া দেওয়ার পর ভীমের মৃতপ্রায় দেহ পাতালে নাগলোকে গিয়া উপস্থিত হয়। তথায় বাসুকির অনুগ্রহে যত ইচ্ছা অমৃত পানে সঞ্জীবিত ও সুপুষ্ট হইয়া ভীম হস্তিনায় ফিরিয়াছিলেন। অর্জুন তাঁহার দ্বাদশবর্ষ বনবাসকালে নাগদুহিতা উলুপীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বহুপরে অর্জুন যজ্ঞাশ্বসহ মণিপুরে উপস্থিত হইলে চিত্রাঙ্গদাজাত তদাত্মজ বভ্রুবাহনকর্তৃক পরাভূত ও হৃতচেতন হন। তখন এই উলুপী তাঁহাকে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন। অর্জুনের প্রপৌত্র মহারাজ জনমেজয় পিতৃশত্রুকুল ধ্বংস মানসে সর্পযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিলে বাসুকিভগিনী নাগদেবী মনসার পুত্র মহামুনি আস্তিক জনমেজয়ের নিকট ভিক্ষার্থী হইয়া সর্পকুল রক্ষা করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণনা আছে, শ্রীকৃষ্ণ কালীয়নাগকে দমন করিলে বহু নাগবালা তাঁহাকে স্তুতি ও সেবা পূজা দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। যোগশাস্ত্রে ষট্চক্র ভেদের কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে সর্পরূপে ধারণা করা হয়। নিদ্রিত ও কুণ্ডলিত সর্প জাগ্রত হইয়া ক্রমশঃ ঊর্ধ্ব হইতে ঊর্ধ্বতর চক্র ভেদ করত সহস্রারে সংরক্ষিত অমৃতপানে পরিতৃপ্ত হয় এবং তাহাতেই সাধকের মহামোক্ষ লাভ হয়।

ভবিষ্যৎপুরাণান্তর্গত প্রসিদ্ধ অনন্তব্রতের মাহাত্ম্যে অনন্তনাগ অসীম ও অনন্ত বিশ্বনিয়ন্তার

প্রতীক বলিয়া নির্ণীত। এই পুরাণেই বর্ণনা আছে যে, পঞ্চমীদিনে দুগ্ধ দিয়া নাগগণকে তর্পণ করিলে তর্পণকারিগণের বংশস্থ সকলেই ভীতি-শূন্য জীবনের অধিকারী হইবেন। দেবীপুরাণে বর্ণনা আছে,—অনন্ত, বাসুকি, পদ্ম, মহাপদ্ম, তক্ষক, কুলীর, কর্কট, শঙ্খ এই অষ্টমহানাগকে পঞ্চমীতে দধি-দুগ্ধ-যুক্ত নৈবেদ্য দ্বারা পূজা করিলে বিষ-জ্বালা-মুক্ত নিরাপদ জীবন লাভ হয়। শিব, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, তারা ইত্যাদি নানা দেবদেবীর সঙ্গে নাগ পূজা প্রচলিত থাকিলেও নাগপঞ্চমীতে অর্থাৎ শয়নৈকাদশীর পর আষাঢ় ও শ্রাবণের প্রত্যেক পঞ্চমীতে সীজবৃক্ষমূলে নাগ-মাতৃকার পূজা বিশেষভাবে প্রচলিত।

হরিবংশ, মহাভারত, বিভিন্নপুরাণ নাগরাজ বাসুকি বা অনন্তকেই শেষশায়ী ভগবানের শয্যা বলিয়া নির্দেশ করেন। কল্পান্তে যিনি ভাগবতী শয্যা, সৃষ্টিলীলায় তিনিই বলরাম বা সঙ্কর্ষণ বলিয়া কীর্তিত। সপ্ততলবিশিষ্ট সৌর-জগৎ ইঁহারই সহস্র মস্তকোপরি রক্ষিত হইয়া বিঘূর্ণিত। জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রাচীনতম ঋষি গর্গাচার্য এই শেষদেবের আরাধনা করিয়াই অন্তরীক্ষ, নক্ষত্র ও স্বর্লোকের যাবতীয় রহস্য হৃদয়ঙ্গমকরত জ্যোতির্বিজ্ঞানের অমরগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই অনন্তদেবের মুখ হইতেই প্রতি কল্পান্তে বিষাগ্নি নির্গত হইয়া মহাকালরূপী রুদ্রের আবির্ভাব হয়, তিনি ত্রিজগতকে গ্রাস করিয়া থাকেন। শেষদেবের পূজা ও সম্মান যেমন দেব, দানব ও মানবগণকর্তৃক সাদরে আচরিত, তেমনই তদীয় ভগিনী নাগরক্ষয়িত্রী মনসা দেবীর পূজাও সবিশেষ প্রচলিত।

জরৎকারী মা মনসা

নাগজননী এবং নাগরাজ ভগিনী মনসাদেবী বিষ্ণুরূপী মহর্ষি জরৎকারুকে স্বামিত্বে বরণ করিয়া-ছিলেন। এই বিবাহ দেবাদিদেব মহাদেব এবং নাগরাজ বাসুকির চেষ্টায় সংঘটিত হয়। বিবাহে জরৎকারুর সর্ত ছিল যে, তিনি ভরণ পোষণের কোন দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন না, আর পত্নী যেদিন তাঁহার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিবেন, সেই দিনই তিনি সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া বিচ্ছিন্ন হইবেন। স্বামিসোহাগিনী একদা মহর্ষিকে সূর্যাস্ত যাইবার কালীন সন্ধ্যা বন্দনার সময়ে নিদ্রিত থাকিতে দেখিয়া স্বামীর ধর্মকৃত্য ব্যাহত হইবার ভয়ে পরিণাম না ভাবিয়া যথার্থ সহধর্মিণীর কর্তব্য সম্পাদনার্থ স্বামীকে জাগ্রত করিলেন। জরৎকারু জাগিয়া মহা রোষাবিষ্ট হইলেন এবং শান্তিলাভের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার জন্য তৎক্ষণাৎ পত্নীকে ত্যাগ করিলেন। যাইবার সময় পত্নীকে শুধু এই বলিয়া গেলেন—তুমি আসন্নপ্রসবা, তোমা হইতে আস্তিক নামে এক উগ্রতপা জাতিস্মর জন্মিবেন। তিনি জনমেজয় মহারাজের সর্পবিনাশী যজ্ঞে সর্পকুলকে রক্ষা করিয়া অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করিবেন। আস্তিকজননী নাগাধিষ্ঠাত্রী পদ্মাবতী বা মনসা দেবীই ভারতের নানাস্থানে পূজিতা। এই দেবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের প্রকৃতিখণ্ডে বর্ণনা আছে যে, কশ্যপ প্রজাপতির মানসী কন্যা বলিয়াই ভগবতী মনসা নামে ত্রিলোক-প্রসিদ্ধা। পুরাণান্তরে কৈলাসপতি মহাদেবের আত্মজা এবং নাগলোকে প্রতিপালিতা বলিয়া বর্ণনাও আছে। মনসা নাম ছাড়া পদ্মবনে জন্ম হেতু পদ্মাবতী, বিষহরণ করেন বলিয়া বিষহরী এবং ভগবান জরৎকারুর পত্নী বলিয়া জরৎকারী ইত্যাদি বহুনামে বিঘোষিতা। জরৎকারুর প্রসাদে তাঁহার গর্ভে অষ্টনাগ এবং জন্মসিদ্ধ আস্তিকমুনির জন্ম হয়। আস্তিক মায়ের আদেশক্রমে ধ্বংসোন্মুখ সর্পজাতিকে রক্ষা করিয়া চিরপূজ্য হইয়াছেন।

বিভিন্ন প্রদেশে নাগপূজা

যুক্তপ্রদেশের প্রয়াগে দারাগঞ্জের উত্তর সীমান্তে নাগরাজ বাসুকির মন্দির প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরটি

খুবই প্রাচীন কালের পাষাণবিনির্মিত। মন্দিরের বহির্ভাগে একটি সুগঠিত কূপ আছে। প্রয়াগের এই অঞ্চলটিকে পাতালপুরী বলা হয়। মন্দিরের পাদদেশে প্রবাহিতা স্রোতস্বিনীর নাম ভোগবতী। ভোগবতী পশ্চিমদিক হইতে আসিয়া মন্দিরের পাদমূলে বাঁকিয়া দক্ষিণাভিমুখী হইয়া দশাশ্বমেধ ঘাটের দিকে গঙ্গার সহিত মিলিত হইবার জন্য ধাবিতা। মন্দিরদ্বার হইতে পূর্বদিকে ভোগবতীর জলধারা পর্যন্ত স্নানের ঘাটটি বেশ সুদৃঢ় পাষাণে নির্মিত ছিল। পুনঃ পুনঃ ভূমিকম্পের নিষ্ঠুর আঘাতে তাহা ভাঙ্গিয়া ইতস্ততঃ বিনিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। মন্দিরাভ্যন্তরে নানা নাগ-পরিবারসহ নাগরাজের সমুত্থিত বৃহৎ ফণাযুক্ত সরীসৃপবিগ্রহের নিত্য পূজার ব্যবস্থা আছে।

বোম্বাইয়ের মহারাষ্ট্রখণ্ডে এই নাগমাতার বাৎসরিক বিশেষ পূজার দিনে ব্রাহ্মণকে মিষ্টকুষ্মাণ্ড দানের অদ্ভুত পদ্ধতি প্রচলিত। ধর্মনিষ্ঠ নরনারীদের দৃঢ়ধারণা যে, ঐ শুভদিনে ব্রাহ্মণকে যত কুষ্মাণ্ড দান করা যায়, পরজন্মে সেই পরিমাণে সুবর্ণরাশি লাভ ঘটে। এই দান এত প্রভূত পরিমাণে অনুষ্ঠিত হয় যে, ব্রাহ্মণেরা কুষ্মাণ্ডের ভার বহনে ক্লান্ত ও অসমর্থ হইয়া পড়েন।

শ্রাবণী সংক্রান্তিতে বিশেষ ঘটা করিয়া পূজা বাংলাদেশেরই বিশেষত্ব। এই দিনে বাঙ্গালী হিন্দুগণের ঘরে ঘরে ঘটে বা মূর্তিতে দেবী পূজিতা হন। পত্র, পুষ্প, ফল, জল, পশুবলি ও যজ্ঞে আহুতি প্রদান, স্তব-স্তুতি পাঠ, পদ্মাপুরাণ, মনসামঙ্গল বা মনসার ভাসান পাঠ বা কীর্তন, শান্তিঅভিষেক, নৌকাদৌড়ের প্রতিযোগিতা, সারিগান, সাপুড়েদের অসাধারণ সাপখেলা ইত্যাদি বহু আনন্দানুষ্ঠানে বাংলার আকাশ বাতাস মুখরিত হইয়া উঠে। ধনি-দরিদ্র সকলেই এই আনন্দের ভাগ গ্রহণ করেন। পদ্মাপুরাণাদি গ্রন্থের বিষয়বস্তু যেমন একদিকে মনসাদেবীর অপার মহিমা কীর্তন করিয়া তাঁহার প্রতি নরনারী মাত্রেরই প্রাণে ভক্তি সঞ্চার করে, তেমনই অন্যদিকে ধর্মবীর চাঁদসওদাগরের সুদৃঢ় ইষ্টনিষ্ঠা এবং নারীজাতির পরম গৌরব পাতিব্রত্যধর্মের একনিষ্ঠ সাধিকা বেহুলা দেবীর সতীত্বমহিমা কীর্তন করে। এই পরমা সতীর পিতা সয় সওদাগরের বাসস্থান উজানী বা নিছনীনগর এবং শ্বশুর চাঁদ-বেনের বাসস্থান চম্পকনগরের ভগ্নাবশেষ মেদিনীপুর জেলায় অদ্যাপি বর্তমান। কবি রায়গুণাকর 'মানসিংহের জগন্নাথদর্শন' বর্ণনায় উল্লেখ করিয়াছেন—

'জগন্নাথ দেখিতে করিয়া মনোরথ।
ধরিলেন মানসিংহ দক্ষিণের পথ॥
এড়ায়ে মঙ্গলকোট উজানী নগর।
বেহুলার জন্মস্থান অতি মনোহর॥
রহে চম্পকনগর ডাহিনে কত দূর।
চাঁদ বেনে ছিল যেথা ধনের ঠাকুর॥'

অন্য এক চম্পাইনগরের সন্ধান পাওয়া যায় ভাগলপুরে। চম্পাইনগর রাজবাটীর নিকটেই গঙ্গাতীরে একটি সুবৃহৎ বাগান, তাহাতে নানাজাতীয় বৃক্ষাদি আছে। মধ্যস্থানে একটি গোলাকার লৌহগৃহের প্রায় সর্বাংশই ভূপ্রবিষ্ট। সামান্য যতটুকু মাটির উপর ভাসমান, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, খুব মজবুত ও পুরুলোহার পাতে উহা তৈরী। উহা যে কতকালের পুরাতন তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। স্থানীয় লোকেরা উহাকেই লখিন্দরবেহুলার বাসর-ঘর বা মাঙ্গলগৃহ বলেন। ঐ বাগানের অনতিদূরে ধন্বন্তরিকুণ্ড নামে একটি জলাশয় আছে। উহার জলের এমনই গুণ ছিল যে, সর্পদষ্ট লোকের ক্ষতস্থান কুণ্ডের জলে ডুবান মাত্র বিষের জ্বালা দূর হইয়া পরিত্রাণ ঘটিত। এখন জলাশয়টি জল-শূন্য অবস্থায় অতীতের সাক্ষ্য মাত্র। এই

চম্পাই নগরের একদিকে গঙ্গা এবং অপর দিকে যমুনা প্রবাহিতা, কুণ্ডটি যমুনারই নিকটবর্তী। যমুনা একটু ঘুরিয়া গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। এই চম্পাইনগর কি মেদিনীপুরের চম্পকনগর, কি হুগলীর চাঁদের নগর (চন্দননগর), কোন্‌টি চাঁদবেনের যথার্থ বসতি বা কর্মস্থান তাহা প্রত্ন-তত্ত্বজ্ঞদের বিচার্য।

বাঁকুড়া শহরের প্রান্তদেশে এবং ঐ জেলাস্থ অযোধ্যা গ্রামে মনসার স্থান ও মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রাবণের সংক্রান্তিতে খুব সমারোহে এই স্থানে পূজাদি সম্পন্ন হয়।

চব্বিশপরগণার পাইকপাড়ায় ভট্টশালীভবনে এক মনসামন্দির বর্তমান। ঐ মন্দিরে সর্পা-ভরণা ও সর্পায়ুধা দশভুজা উপবিষ্টা দেবী-প্রতিমা পূজিতা হইয়া থাকেন। কলিকাতা, ভবানীপুর, কালীঘাটের বহুস্থানে বিষহরী বা মনসাদেবীর মন্দির দৃষ্ট হয়। মাণিকতলা অঞ্চলে বাহির মির্জাপুর ষ্ট্রীট এবং ওয়ার্ড ইনষ্টিটিউশন রোডের মোড়ে ছোট মন্দিরে হংসবাহনা, সর্পায়ুধা এবং অহিচ্ছত্র-শোভিনী একাক্ষী দেবী নিত্য পূজিতা হইয়া থাকেন। দেবী মৃন্ময়ী হইলেও ভক্তচিত্ত-আকর্ষণকারিণী বেশ দিব্যভাবদ্যোতিনী।

বরিশাল জেলার গৈলা-ফুল্লশ্রী গ্রামে মনসা-মঙ্গলের কবি বিজয়গুপ্তের জন্মস্থানে এক প্রসিদ্ধ মনসামন্দির বর্তমান। মন্দিরে দিব্য ঘট ও পিত্তল-নির্মিত মূর্তির নিত্য পূজাদি হয়। এই দেবীর মাহাত্ম্য অবর্ণনীয়। বহু দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধিগ্রস্ত নরনারী এই দেবীর প্রসাদে রোগমুক্ত ও সুস্থ হইয়াছেন বলিয়া জানা যায়।

কবিপরিচয়

ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ বুড়গাঁ নিবাসী কবি নারায়ণ দেব কবিবল্লভ মহাশয় দেবীভাগবতে ও পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে বর্ণিত পৌরাণিক স্তবাদির সূত্র অবলম্বনে দেবী মনসা পদ্মাবতী বা পদ্মার মহিমা কীর্তনার্থ সহজ গীতিকাব্য-ছন্দে পদ্মাপুরাণ রচনা করেন, প্রায় চারিশত বৎসরেরও পূর্বে। তাঁহার রচনাই সর্বাধিক প্রাচীন বলিয়া সর্বপ্রকার বিচারে প্রমাণিত হইয়াছে। এই পদ্মাপুরাণের ভণিতাদি অবলম্বনেই দ্বিজ বংশীদাস, বিজয়গুপ্ত, দ্বিজ জানকীনাথ, বিপ্র জগন্নাথ, বৈদ্য জগন্নাথ, কৃষ্ণচরণ, শিবানন্দ, হরিদত্ত, ক্ষমানন্দ, কেতকাদাস প্রভৃতি বহু শিক্ষিত বা গ্রাম্য স্বভাবকবি বিভিন্ন সময়ে পদ্মাপুরাণ, মনসা-মঙ্গল, মনসা-ভাসান, মনসার পাঁচালি প্রভৃতি রচনা করিয়া দেবীমহিমা প্রচার করিয়াছেন। ময়মনসিংহ-কিশোরগঞ্জের পত্রবাড়ীনিবাসী দ্বিজ বংশীদাস বংশীবদন বা বংশীপণ্ডিত বলিয়াও খ্যাত। তাঁহার রচিত পদ্মাপুরাণই ছন্দের মধুরতায়, ভাষার সরলতায় ও ভাবের সরসতায় সমধিক সৌষ্ঠবময়। হস্তলিখিত বা মুদ্রিত এই পদ্মাপুরাণ ময়মনসিংহের প্রায় সর্বত্র পঠিত ও গীত হয়।

আদর্শানুধ্যান

চাঁদ সওদাগরের চরিত্র প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে পুরুষকারের এক অতুলনীয় আদর্শ। দেবী মনসার কোপে ছয় পুত্র, দিব্যজ্ঞান, অমূল্য ধন-পরিপূর্ণ চৌদ্দ ডিঙ্গাসহ মধুকর—সব বিনষ্ট হইল। দুরন্ত অসহনীয় বিপদেও ভ্রূক্ষেপ নাই, জীবনসঙ্গিনী সোনেকার মর্মভেদী ক্রন্দনেও সে চরিত্র টলে নাই। এই দুরন্ত ভবসাগরের ঝড়ে সবাই পড়ে, কিন্তু চাঁদ সওদাগরের মত সর্বগ্রাসী তুফানকে উপেক্ষা করিয়া অচল অটল হিমাদ্রিবৎ দণ্ডায়মান থাকিতে কে সমর্থ? তাঁহার সুদৃঢ় মজ্জাগত সাহস ও নির্ভীকতার নিকট জগতের অতি বড় বীরত্বও তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়।

পাতিব্রত্যের জ্বলন্ত আদর্শ বেহুলার চরিত্রে

সুপরিস্ফুট। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'-বিষয়ক সুচিন্তিত নিবন্ধে লিখিয়াছেন, "স্ফীত, গলিত, পূতিগন্ধ মৃতপতিকে ক্রোড়ে লইয়া নির্ব্বিকার চিত্তে ও নির্ভয় মনে বেহুলার মান্দসে যাত্রা ভাবিতে গেলে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সতীগণের পতি-নিমিত্ত সেই সেই ক্লেশভোগও সামান্য বলিয়া বোধ হয়; এবং বেহুলাকে পতিব্রতার পতাকা বলিয়া গণ্য করিতে ইচ্ছা হয়।" বেহুলাচরিত পাঠ করিলে সতীর পতিভক্তি এবং ঐকান্তিকী ভগবদ্ভক্তির আদর্শানুধ্যানে অনুপ্রাণিত হইতে হয়। সাবিত্রী, দময়ন্তী হইতেও বেহুলার চরিত্র দৃঢ় এবং অধ্যবসায়সম্পন্ন। বেহুলার সতীত্ব জগতে অতুলনীয়!

ক্রোধ, হিংসা, খলতা, ক্রূরতার স্বরূপ কল্পনা করিয়া যদি একটি মূর্তি গড়িতে হয়, তবে সেই মূর্তি সর্পাকারেই পরিণত হয়। সর্পই মূর্তিমান হিংসা। এই হিংসানাগপাশে জীবমাত্রই অল্পাধিক পরিমাণে আবদ্ধ। যেখানে যাহাদের ভিতর হিংসার মাত্রা সমধিক বিকসিত, সেখানেই অশান্তির সৃষ্টি অনিবার্য। হিংসা হইতেই সকল অশান্তি উপদ্রবের উৎপত্তি। জগৎকে হিংসা-সর্পের ভীষণ দংশন হইতে বিনির্মুক্ত হইবার জন্যই ধ্যান-নিবিষ্ট আর্যঋষিগণ হিংসাবিষবিনাশিনী বিবেকবুদ্ধি-স্বরূপিণী শান্তিময়ী দেবীর পুণ্য আবির্ভাব কল্পনা করিয়াছেন। অপরাধী ও অবিশ্বাসীকে সুশিক্ষা দিবার জন্যই তিনি অপরিহার্যরূপে ক্রোধ প্রকাশ করিয়া থাকেন, নতুবা তিনি সর্বহিংসাবিনাশিনী বিষহরী। দেশ ও সমাজের অঙ্গ হিংসাবিষের অসহনীয় জ্বালায় জর্জরিত হইয়া উঠিয়াছে। পরাধীনতা, স্বার্থপরতা, আত্মদ্রোহিতা, ধর্মদ্রোহিতা, অহরহ অমানুষিক নারীনির্যাতন, দুর্বলপীড়ন, দুর্ভিক্ষ, মহামারি, যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদি সবই এক একটি ভীষণতর কালকূটের দংশন। এসব দংশনের ফলে দেশ ও সমাজের অঙ্গ লখিন্দরের মৃতদেহ অপেক্ষাও অধিকতর অসার এবং পূতিগন্ধময় হইয়া উঠিয়াছে। যদি এ দেহকে বাঁচাইতে হয়, যদি এ অঙ্গকে বিশ্বের চক্ষে জীবন্ত ও গৌরবোজ্জ্বল করিয়া তুলিতে হয়, তবে সমাজ ও দেশের প্রত্যেককে বেহুলা অপেক্ষাও কঠোরতর সাধনায় বিনিযুক্ত হইতে হইবে।

গান

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

গাহিতেছি তব গান কত যুগ ধরে
মাতিল না তবু প্রাণ সচেতন সুরে।
ঘুমায়ে ঘুমায়ে গাহি তাই তো অন্তর
এখনো রহিল শূন্য জড়তা-কাতর।
গভীর গহন চিতে হে গীত-দেবতা
বারেক জাগিয়া ওঠ মন্ত্র-ছন্দ-দাতা।

সকল ইন্দ্রিয় মম মন অহঙ্কার
একতানে তুলি দিক সুদীপ্ত ঝঙ্কার।
বিশ্বের অশেষ রূপ অরূপে মিলায়
সকল বাণীর মর্ম নির্বাকে হারায়।
নিখিল গানের ছন্দ শ্রদ্ধাবেগ লয়ে
বাজিছে অশ্রুত সুরে নিগূঢ় হৃদয়ে।

পরম আনন্দ শান্তি ছায় চারিভিত
উদার জীবন-সত্যে সার্থক সঙ্গীত।

ঈশ্বরানুভূতির স্বরূপ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, এম্‌-এ

শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘের পরম ভাগবত বেদান্তবিৎ জনৈক প্রাচীন সন্ন্যাসীর সহিত ঈশ্বরানুভূতির স্বরূপ সম্বন্ধে আমার পত্রালাপ হয়। তাঁহার মন্তব্যগুলি এত সুন্দর যে, আমার মনে হয়, উহা জানিতে পারিলে আমার মত অনেক জিজ্ঞাসুরই বুভুৎসা কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইবে। এই আশায় উহা লিখিত হইল।

অনেক গ্রন্থ আলোচনা করিয়া এবং সৎসঙ্গ করিয়াও চিত্তের মালিন্য দূর হয় না, সেই প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন, "চিত্তশুদ্ধি আর কি? তাঁহার চিন্তাই চিত্তশুদ্ধি। চিত্ত কি একটা স্থায়ী জিনিস? ঠাকুর তো বলিয়াছেন তাঁহাতে মন লাগাইয়া রাখা। যদি তাঁহার কৃপায় ইহা হয় তবেই সব হইল। মুক্ত আমরা, ইহা তো অতি সত্য। তাঁহার সন্তান কি বদ্ধ হয়? ব্রহ্মময়ী আমার রাজা, আমি খাস তালুকের প্রজা।" ঈশ্বরানুভূতির স্বরূপ কি বিশ্বাস? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি লিখিয়াছেন, "অনুভূতির অর্থ আমার কাছে বিশ্বাস বলিয়াই মনে হয়। বিশ্বাস দৃঢ় হইলেই উহাকে অনুভূতি বলে। নূতন কোন জিনিস আসিয়া বিশ্বাসকে অনুভূতিতে পরিণত করে না। ইহাই পূজনীয় হরি মহারাজের মত।"

এই উত্তরে আমি সম্পূর্ণ তৃপ্ত হইতে না পারিয়া লিখিয়াছিলাম যে এরূপ অনুভূতি পর্য্যাপ্ত নহে। সাকার দর্শনও দরকার। উহা ঈশ্বর-দর্শনের একটা positive, concrete, crucial fact. এই মতের সমর্থনে শ্রীশ্রীঠাকুরের এই উক্তির উল্লেখ করি—"আগে ঈশ্বর দর্শন কর। নিরাকার সাকার দুই-ই দর্শন।" ইহার উত্তরে তিনি লেখেন, "অনুভূতি শব্দের অর্থ বিশ্বাস, অর্থাৎ ব্রহ্মানুভূতি শব্দের অর্থ বিশ্বাস। কারণ, ব্রহ্মাত্মৈক্য বিশ্বাস হইলে, মাত্র বিশ্বাসই দৃঢ় হয় না, উহাকে সাক্ষাৎকার বলে। বিশ্বাস plus অন্য কোনও elementকে সাক্ষাৎকার বলে না, কেবল দৃঢ় বিশ্বাসকেই সাক্ষাৎকার বলে। সব ধর্ম্ম সত্য ইহা যিনি অনুষ্ঠান না করিয়া দেখিবেন, তাঁহার বিশ্বাস হইলেও ইহা সাক্ষাৎকার নহে, এই আমার মনে হয়। অন্যেরা অন্য রকম হয়তো মনে করেন। সব ধর্ম্ম সত্য অর্থাৎ সব ধর্ম্মের positive side সত্য, ইহা পূজনীয় শরৎ মহারাজের মত। নেতি নেতি দ্বারা স্বরূপ দর্শনের পর তিনিই সব হইয়াছেন (বিজ্ঞানীর অবস্থা), ইহাই নিরাকার সাকার দর্শন। নিরাকার সাকার উভয়ই positive, concrete, crucial fact. অনুভূতির confirmation এর জন্য কিছুই দরকার নাই। অনুভূতি স্বয়ংপ্রকাশ। সূর্য্যকে অন্য আলোর দ্বারা দেখিতে হয় না। 'নিরালম্ব ভাবনা' অর্থে যদি subject, object ভেদশূন্য 'সচ্চিদানন্দ আত্মা ব্রহ্ম' বলা হয়, তবে উহাকে ঈশ্বরানুভূতিই মনে হয়।"

সাকার দর্শনের এই ব্যাখ্যায় আমি সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া লিখিয়াছিলাম, তিনিই সব হইয়াছেন এরূপ দর্শন অনেকটা ব্রাহ্মগণের মতের ন্যায়। অতঃপর যশোদার কৃষ্ণদর্শন-লালসার কথা যাহা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে আছে উহার উল্লেখ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের এই কথাটিও উল্লেখ করিয়াছিলাম, "বাক্য-মনের অতীত যিনি, তিনিই আবার ভক্তের জন্য রূপ ধারণ করে দর্শন দেন

আর কথা কন।" আমি সাকার দর্শন মানে বুঝি—শিব, দুর্গা, কালী, কৃষ্ণ ইত্যাদি রূপে দর্শন, ইহা intellectual দর্শন নহে। ইহার উত্তরে তিনি লিখেন, "তিনি সব হইয়াছেন, ইহা সাকার দর্শন নহে। আপনি যাহা বলিয়াছেন তাহা এক অর্থে সত্য। অর্থাৎ কালী, দুর্গা, শিব, রাম, সীতা প্রভৃতি রূপে তাঁহাকে দর্শনই তো তাঁহার সাকার দর্শন। এইরূপ দর্শন ব্রহ্মতত্ত্ব সাক্ষাৎ-কারের পূর্ব্বেও হইতে পারে এবং বিজ্ঞানীর অবস্থায় যখন 'তিনি সব হইয়াছেন' জ্ঞান হয় তখনও তাঁহার এই রূপসমূহ দর্শন হইতে পারে; এবং ভক্ত কোনরূপে নিষ্ঠা লইয়া থাকিতে পারেন। এই অবস্থায় যাহা দর্শন হইবে তাহাই যে তাঁহার রূপ, তাহাতে দৃঢ় জ্ঞান থাকিবে। এই অর্থে হয়তো ইহাকেও সাকার দর্শন বলা যাইতে পারে। এই অবস্থায় কালী, দুর্গা, শিব, সীতা, রাম দর্শনও সাকার দর্শন, এইরূপ আমার মনে হয়। তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ব্বে বা পরে কোন আকার বিশেষ ধ্যানেতেই তাঁহাকে তদ্রূপ আকারে দর্শন হয়। ধ্যানকালেই উক্ত দর্শনাদি হয়, অন্য কালে হয় না। কিন্তু মূল অজ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা একবার বিনাশ হইলে আর অজ্ঞান আসে না। এই সব দর্শনে বিরহ আছে, ঠাকুর বলিয়াছেন, স্বরূপের সহিত বিরহ নাই।"

সাকার দর্শন সম্বন্ধে আমার ধারণা সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে আমি 'কল্যাণ' পত্রিকায় লিখিত স্বামী করপাত্রীজী মহারাজ লিখিত এক প্রবন্ধের অংশ বিশেষের অনুবাদ পাঠাইয়াছিলাম। উহা এই—'এইরূপে বেদান্ত সিদ্ধান্তানুসারে সত্যা-নৃতরূপ নীর ও ক্ষীরের পৃথককরণ ঘটে, আর নীর-স্থানীয় দৃশ্যকে মিটাইয়া দিয়া পরমতত্ত্ব ভগবানে স্থিত হন যিনি তাঁহাকে পরমহংস বলা যাইতে পারে। পরন্তু ভগবানের মধুর মঙ্গলময় স্বরূপে পূর্ণানুরাগ না হইলে জ্ঞানও সুশোভিত হয় না। ভক্তিযোগ দ্বারা জ্ঞানকে সুশোভিত করিয়া পরমহংস তৈয়ারী করিয়া দেওয়াই প্রভুর মধুর মঙ্গলময় স্বরূপ ধারণ করিবার মুখ্য প্রয়োজন।' এতৎসম্বন্ধে সন্ন্যাসিপ্রবর লিখিয়াছেন, "কল্যাণের quotation এর অর্থ জ্ঞানের পরে ভক্তি, অর্থাৎ বিজ্ঞান। ঠাকুর তো পুনঃ পুনঃ বিজ্ঞানীর অবস্থা বলিয়া ইহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যিনি ভক্ত, জ্ঞানের পরও তাহার ভক্তি থাকে, ইহা ঠাকুরের মতই মনে হয়। তাঁহার জীবনে ও তাঁহার শিষ্যদের জীবনেও ঐরূপই দেখা যায়।"

"যোগীদিগের মূল ভাব এই যে, যেমন ইন্দ্রিয়-বিষয়ের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধঘটনা হয়, ধর্ম্মও তদ্রূপ প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে; বরং উহা আরও উজ্জ্বলতররূপে অনুভূত হইতে পারে।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

সন্ন্যাসে হিন্দুনারীর অধিকার

শ্রীমতী আশা দেবী, বি-এ

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, ঈশ্বরলাভই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। ঈশ্বরদর্শন অথবা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার উপায়স্বরূপ শাস্ত্রে ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ন্যাস আশ্রমের বিধান আছে। বৈদিক কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত বহু নরনারী ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া সাধনা করিতেছেন। পুরুষের ন্যায় নারীরও সন্ন্যাস গ্রহণে সমান অধিকার আছে, ইহা শাস্ত্রবাক্যদ্বারা সন্তোষজনকভাবে প্রমাণ করা যায়। হিন্দুনারীর ধর্ম্মজীবন পুরুষের ধর্ম্মজীবন হইতে পৃথক্ নহে। আধ্যাত্মিক জগতে হিন্দুনারী পুরুষের ন্যায় সমভাবেই উচ্চস্থান লাভ করিয়াছেন। হিন্দুধর্ম্মের মূল বেদে কেবল মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি অথবা ব্রহ্মজ্ঞগণের নামই উল্লিখিত নাই, পরন্তু ব্রহ্মজ্ঞা মন্ত্রদ্রষ্ট্রী নারীগণের নামও দৃষ্ট হয়।

হিন্দুর প্রাচীনতম ধর্ম্মগ্রন্থ ঋগ্বেদে সাতাইশ জন ব্রহ্মবাদিনীর নাম পাওয়া যায়। শৌনকাচার্য্য তাঁহার 'বৃহদ্দেবতা' গ্রন্থে (২।২৮-৮৭) ঋগ্বেদোক্ত নিম্নলিখিত ব্রহ্মবাদিনীগণের নাম দিয়াছেন :—গোধা, কক্ষিবান ঋষির কন্যা ঘোষা, বিশ্ববারা, অত্রিদুহিতা অপালা, বৃহস্পতির পত্নী জুহূ (বা ব্রহ্মজায়া), অগস্ত্যের ভগিনী সরমা, রোমশা, উর্ব্বশী, লোপামুদ্রা, বিবস্বানের কন্যা যমী, শাশ্বতী, শ্রী, লাক্ষা, সার্পরাজ্ঞী, অদিতি, ইন্দ্রাণী, ইন্দ্রমাতা, ঋষি-অম্ভৃণের কন্যা বাক্, শ্রদ্ধা, মেধা, দক্ষিণা, রাত্রি, সূর্য্যা, সাবিত্রী, ইত্যাদি।[১] ইঁহারা সকলেই নারী ঋষি, স্ব স্ব সূক্তের দ্রষ্ট্রী ও দেবতা উভয়ই। বিশ্ববারা মন্ত্রদ্রষ্ট্রী ছিলেন না, কিন্তু যজ্ঞে ঋত্বিকের (পুরোহিতের) কার্য্য করিতেন। অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্ ঋগ্বেদসংহিতার দশম মণ্ডলের ১২৫ সূক্তের আটটী মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। এই মন্ত্রগুলি 'দেবীসূক্ত' নামে প্রচলিত এবং এই সূক্তেই চণ্ডীর মূল সূত্র অভিব্যক্ত। ব্রহ্মবিদুষী বাক্ ব্রহ্মশক্তির সহিত স্বাত্মৈক্য উপলব্ধি করিয়া বলিয়াছেন—আমি রাষ্ট্রী, জগদীশ্বরী। দেবীসূক্তে শঙ্কর বেদান্তের অদ্বৈতভাব স্পষ্টভাবে ধ্বনিত। বৃহদারণ্যকোপনিষদে বাচক্নু নামক ব্রাহ্মণের দুহিতা ব্রহ্মবাদিনী গার্গীর কথা উল্লেখ আছে। গার্গী প্রকাশ্য সভায় ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য ও অন্যান্য ব্রহ্মজ্ঞগণের সহিত ব্রহ্মবিচার করিয়াছিলেন। যোগবাশিষ্ঠে চূড়ালা, লীলা প্রভৃতি ব্রহ্মবিদুষীদের কথা পাওয়া যায়। মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে সন্ন্যাসিনী সুলভার কথা আছে। মিথিলার রাজসভায় সুলভা দণ্ডধারিণী সন্ন্যাসিনী বলিয়া আত্মপরিচয় দিতেছেন। তিনি নারীগণের সন্ন্যাস বিষয়ে জনকরাজাকেও যুক্তিতে পরাস্ত করিয়াছিলেন।

প্রাচীনকাল হইতে অদ্যাবধি হিন্দুশাস্ত্রে সকল বিধিতে পুরুষের ন্যায় নারীর সমান অধিকার

[১] গোধা ঘোষা বিশ্ববারাপালোপনিষৎ নিষৎ।
ব্রহ্মজায়া জুহূর্নামাগস্ত্যস্য স্বসাদিতিঃ॥
ইন্দ্রাণী চেন্দ্রমাতা চ সরমা রোমশোর্ব্বশী।
লোপামুদ্রা চ নদ্যশ্চ যমী নারী চ শাশ্বতী॥
শ্রীর্লাক্ষা সার্পরাজ্ঞী বাক্ শ্রদ্ধা মেধা চ দক্ষিণা।
রাত্রিঃ সূর্য্যা চ সাবিত্রী ব্রহ্মবাদিন্য ঈরিতাঃ॥
শৌনকাচার্য্য-প্রণীত 'বৃহদ্দেবতা' ২।৮২-৮৭

স্বীকৃত। নারীগণ যখন বেদের সূক্ত রচনা করিতেন, তখন অবশ্যই তাঁহারা বেদপাঠের অধিকারিণী ছিলেন। উপনয়নেও তাঁহাদের অধিকার ছিল। ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কঠশাখা বেদপাঠীদিগকে কঠী বলা হইত। অন্যান্য শাখাপাঠিগণের অন্যান্য নাম ছিল। স্মৃতিকার যম বলিয়াছেন :—

"পুরাকল্পেষু নারীণাং মৌঞ্জীবন্ধনমিষ্যতে।
অধ্যাপনং চ বেদানাং সাবিত্রীবাচনং তথা॥"

পুরাকালে কুমারীগণের মৌঞ্জীবন্ধন অর্থাৎ উপনয়ন হইত। তাঁহারা যে শুধু বেদপাঠ করিতেন তাহা নহে, পরন্তু বেদ পড়াইতেন এবং গায়ত্রী জপ করিতেন। প্রাচীন যুগে পুরুষগণের ন্যায় হিন্দুনারীগণের যজ্ঞানুষ্ঠানে অধিকার ছিল। রামায়ণের দ্বিতীয় কাণ্ডে আছে—কৌশল্যা একাকিনীই যষ্ঠীযাগের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। বাদরায়ণের বাক্য উদ্ধার করিয়া জৈমিনি প্রমাণ করিয়াছেন, বৈদিক যুগে নারীগণ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেন। ইহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, উপনয়ন সংস্কারান্তেই নারীগণ যজ্ঞানুষ্ঠানের অধিকারিণী হইতেন। কারণ, কেবল যজ্ঞোপবীতধারী ব্যক্তিই বৈদিক শাস্ত্র এবং বৈদিক কর্ম্মে অধিকারী হইতেন। কাশী হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর এ এস আলটেকর তাঁহার ইংরাজী গ্রন্থে লিখিয়াছেন, খ্রীষ্টীয় শতকের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত হিন্দুনারীগণ ধর্ম্মানুষ্ঠানের সকল অধিকার লাভ করিতেন।[২] তৎপরে সামাজিক বিপর্য্যয়ের জন্য তাহার পরিবর্ত্তন ঘটে। পরাশর গৃহ্যসূত্রের (৬।২) টীকাকার হরিহর বলেন, "পুরুষাণাং স্ত্রীণাং সর্বেষাং মন্ত্রপাঠঃ।" স্ত্রী-পুরুষ সকলেই বেদপাঠ করিতেন। গোভিল গৃহ্যসূত্রে (২-১-১৯) কুমারীগণকে যজ্ঞোপবীতিনী বলা হইয়াছে। অথর্ব্ববেদে (১১-৫-১৮) আছে, "ব্রহ্মচর্য্যেণ কন্যা যুবানং বিন্দতে পতিম্—কন্যা কিছুকাল ব্রহ্মচারিণী থাকিবার পর যুবাপতি লাভ করিবে।" ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় চতুরাশ্রমে পুরুষের ন্যায় নারীরও প্রবেশাধিকার ছিল।

হারীত ধর্ম্মসূত্রে বীরমিত্রোদয়ের সংস্কার প্রকাশে উদ্ধৃত আছে, "দ্বিবিধাঃ স্ত্রিয়ো ব্রহ্মবাদিন্যঃ সদ্যোদ্-বাহাশ্চ। তত্র ব্রহ্মবাদিনীনাং অগ্নীন্ধনং বেদাধ্যয়নং স্বগৃহে চ ভিক্ষাচর্য্যেতি। সদ্যোবধূনাং তূপস্থিতে বিবাহে কথঞ্চিৎ উপনয়নমাত্রং কৃত্বা বিবাহঃ কার্য্যঃ—পুরাকালে দুইপ্রকার স্ত্রীলোক ছিলেন, ব্রহ্মবাদিনী এবং বিবাহিতা, ব্রহ্মবাদিনীগণ বেদপাঠ, যজ্ঞানুষ্ঠান এবং স্বগৃহে ভিক্ষাচর্য্য করিতেন। কুমারীগণের বিবাহকাল উপস্থিত হইলে উপনয়নান্তে বিবাহিতা হইয়া তাঁহারা বধূ হইতেন।" ভিক্ষাচর্য্যের অর্থ সন্ন্যাস। বৃহদারণ্যকোপনিষদে 'ভিক্ষাচর্য্য'[৩] শব্দটি উল্লিখিত আছে। সেইযুগে কোন কোন সন্ন্যাসিনী স্বগৃহে ভিক্ষা করিতেন। যে সকল গৃহস্থ সন্ন্যাসী হইতেন, তাঁহাদিগেরও স্বগৃহে ভিক্ষার বিধি ছিল। উপনিষদে আছে, "স্বপুত্রগৃহেষু ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তঃ।" বৃহদারণ্যকোপনিষদে সন্ন্যাসের কথা সর্ব্বপ্রথম দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ সেই সময় হইতেই হিন্দুনারীগণ সন্ন্যাসের অধিকার লাভ করিয়াছেন। উপনিষদে আছে, "যখন বৈরাগ্য হইবে তখনই প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) গ্রহণ করিবে।"[৪] "আমাদের যাহাদের নিকট এই আত্মাই একমাত্র অভিপ্রেত সেই আমরা সন্তান প্রভৃতির দ্বারা কি করিব?"[৫] "যাঁহারা সন্ততিকামনা করেন নাই

২ Position of Hindu Women in Ancient India by Dr. A. S. Altekar.

৩ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি। ৩।৫।১

৪ যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ। জাঃ উঃ ৪

৫ কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মেতি। বৃঃ উঃ, ৪।৪।২২

তাঁহারা অমৃতত্ব লাভ করিয়াছিলেন।"৬ এই সকল উপনিষদ্বাক্যে নারীগণের প্রব্রজ্যাগ্রহণের সমর্থন আছে। পুরুষগণই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবেন, নারীগণ করিবেন না, এরূপ কোন বিধি দেখা যায় না। "যাহার দ্বারা অমৃতত্ব লাভ হয় না, তাহা লইয়া কি করিব?"৭ এই কথা বলিয়া মৈত্রেয়ী যখন যাজ্ঞবল্ক্যপ্রদত্ত বিত্ত গ্রহণে অস্বীকার করিলেন তখন তিনি ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য প্রব্রজ্যার অভিলাষই প্রকাশ করিয়াছিলেন। বৈদিক ব্রহ্মবাদিনীগণ সন্ন্যাসিনী ছিলেন। বৈদিক-যুগে হিন্দুনারীগণের কেহ কেহ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণী থাকিতেন। কেহ কেহ বানপ্রস্থ বা ভৈক্ষাশ্রম গ্রহণ করিতেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় "জীবন্মুক্তি বিবেক" গ্রন্থের ৮ পৃষ্ঠায় উপনিষদের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন, "মহাত্মাগণ ত্যাগের দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করিয়াছেন—কর্ম্মের দ্বারা বা পুত্রাদি দ্বারা বা ধন দ্বারা নহে।"৮

"এই প্রকার ত্যাগ করিবার অধিকার স্ত্রীলোকদিগেরও আছে। (মহাভারতের শান্তি-পর্ব্বের অন্তর্গত) মোক্ষধর্ম্মের যে (নীলকণ্ঠের) চতুর্ধরী টীকা আছে, তাহাতে সুলভা-জনক সংবাদে লিখিত আছে—মোক্ষধর্ম্ম (৩২০।৭টীকা) —"ভিক্ষুকীত্যনেন স্ত্রীণামপি প্রাগ্বিবাহাদ্বা বৈধব্যাদূর্দ্ধং সন্ন্যাসেঽধিকারোঽস্তি।" "ভিক্ষুকী" এই শব্দের প্রয়োগের দ্বারা দেখান হইয়াছে যে স্ত্রীলোকদিগেরও বিবাহের পূর্ব্বে এবং বৈধব্যের পরে সন্ন্যাসে অধিকার আছে। সেই সন্ন্যাসানুসারে ভিক্ষাচর্য্যা, মোক্ষশাস্ত্রশ্রবণ, এবং একান্তে আত্মধ্যান করা তাহাদের কর্ত্তব্য, এবং ত্রিদণ্ডাদি ধারণও কর্ত্তব্য। শারীরকভাষ্যের তৃতীয়াধ্যায়ের চতুর্থপাদে (৩।৪।৩৬ হইতে পরবর্ত্তী কয়েক সূত্র পর্য্যন্ত) দেবারাধনায় অধিকার থাকা হেতু বিধুরের (বিবাহ করিয়া গৃহী হয় নাই এরূপ ব্যক্তি) ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার প্রতিপাদন প্রসঙ্গে বাচক্নবী ইত্যাদির নাম শুনা যায়।"

কয়েক শতাব্দী পরে স্মৃতিকার মনু নারীগণকে বেদপাঠবিহীন উপনয়নের অধিকার মাত্র প্রদান করেন। তৎপরে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে স্মৃতিকার যাজ্ঞবল্ক্য নারীকে বেদপাঠ ও উপনয়ন উভয় হইতে বঞ্চিত করেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বৈদিক আর্য্যগণের এক শাখা এখনও বালিকাগণকে উপনয়ন সংস্কার দান করেন। পার্শী-মহিলাগণ আজীবন যজ্ঞসূত্র ধারণ করিয়া থাকেন। ইহা দুঃখের বিষয় যে, বর্ত্তমানে হিন্দুবালিকাগণ এই শুভ সংস্কার হইতে বঞ্চিতা। অথচ প্রাচীন হিন্দুসমাজ এবং প্রাচীন স্মৃতিতেও ইহা স্বীকৃত যে, বালিকারাও বালকগণের ন্যায় উপযুক্ত বয়সে পবিত্র যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া গুরুগৃহে বাস করিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করিত। শাস্ত্রে আছে— "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষাণীয়াতিযত্নতঃ—পুত্রের ন্যায় কন্যাকেও অতিযত্নে পালন ও শিক্ষাদান করা উচিত।"

এই সকল প্রমাণ দ্বারা জানা যায় যে, ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতভূমিতে প্রাচীনকাল হইতেই হিন্দুনারীগণ সন্ন্যাসিনী হইয়াছেন। পূর্ব্বযুগেও বেদপন্থী সন্ন্যাসিনী পরিব্রাজিকা ছিলেন। জৈন-শাস্ত্রেও সন্ন্যাসিনীগণের কথা আছে। তাঁহারা অজ্জা অর্থাৎ আর্য্যা বা আর্য্যিকা নামে প্রসিদ্ধা। এখনও কাথিয়াবাড়, গুজরাট প্রভৃতি প্রদেশে জৈন সন্ন্যাসিনী দেখা যায়। বৌদ্ধযুগে সন্ন্যাসিনী-গণের বিশেষরূপে অভ্যুদয় হইয়াছিল। তান্ত্রিক-যুগে এবং তৎপরবর্ত্তী কালেও হিন্দুনারীগণ

৬ যে প্রজাং নেষিরে তে অমৃতত্বং হি ভেজিরে। ছা: উ: ভাষ্য ৫।১০।১।

৭ যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্। বৃ: উ: ২।৪।৩

৮ ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ।" কৈ: উ: ১।২

সন্ন্যাসিনী হইয়াছেন। আধুনিক কালেও নারীগণ তান্ত্রিক সন্ন্যাস 'পূর্ণাভিষেক' লাভ করিয়া থাকেন। শঙ্করপ্রবর্ত্তিত দশনামী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত জুনা আখড়া (হরিদ্বার) হিন্দুনারীগণকে সন্ন্যাসপ্রদান করিয়া অদ্যাপি প্রাচীন রীতি রক্ষা করিতেছেন।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবের পর যে নূতন যুগ আরম্ভ হইয়াছে, এ যুগেও পুরুষের ন্যায় নারীগণের ধর্ম্মে সমান অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিদুষী সন্ন্যাসিনী যোগেশ্বরী ভৈরবী ব্রাহ্মণীকে গুরুপদে বরণ করিয়া তাঁহার নিকট ধর্ম্মসাধনা শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা সন্তোষজনকভাবে প্রমাণিত হয় যে, পুরুষের ন্যায় নারীর যে ধর্ম্মে কেবল সমান অধিকার আছে তাহা নহে, পরন্তু নারী শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় সর্ব্বধর্ম্ম-সাধকের গুরুও হইতে পারেন। প্রাচীন শাস্ত্রকারগণের যে মতই থাকুক না কেন, বর্ত্তমান যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেব পুরুষের ন্যায়ই নারীর ধর্ম্মে সর্ব্ববিধ অধিকার কার্য্যতঃ স্বীকার করিয়াছেন। এই মহীয়সী সন্ন্যাসিনী তাঁহার নিকট বহু বৎসর বাস করিয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, তিনি কেবল বিদুষী ছিলেন না, পরন্তু বিদ্যার প্রতি-মূর্ত্তিস্বরূপা ছিলেন। মনুষ্যদেহে তিনি স্বয়ং বিদ্যাই ছিলেন।

গৌরীমাকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত সারদেশ্বরী আশ্রমের বর্ত্তমান অধ্যক্ষা দুর্গাপুরী রামকৃষ্ণসংঘজননী শ্রীশ্রীসারদা দেবীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম সম্পাদক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ শিষ্য স্বামী সারদানন্দ এই অনুষ্ঠানের যাবতীয় বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন।[১] শ্রীশ্রীসারদামণিদেবী শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের কয়েক জন ব্রহ্মচারীকে সন্ন্যাস গ্রহণে অনুমতি এবং কয়েক জনকে গেরুয়া বস্ত্র দিয়াছিলেন। স্বামী সারদানন্দ যোগীনমাকে পুরীতে স্বামী প্রেমানন্দের সমক্ষে সন্ন্যাস-ব্রতে দীক্ষিতা করেন। যোগীনমা পূজাকালে ও অন্যান্য বিশেষ পূজা উপলক্ষে গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করিতেন। রামকৃষ্ণ মিশনের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ মহারাজ কলমার ভক্ত শ্রীযুক্ত ভূপতি দাশগুপ্তের কন্যা গীতা-দেবীকে বেলুড়মঠে এবং কাশীর ভক্ত শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ওরফে বালক বাবুর কন্যা ও কাশী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের কয়েক জন সেবিকাকে কাশীতে ব্রহ্মচর্য্যব্রতে দীক্ষিতা করেন। ব্রহ্মচারিণী গীতাদেবীর নিকট শুনিয়াছি, মহাপুরুষ মহারাজ তাঁহাকে ব্রহ্মচর্য্য প্রদানান্তে দিব্যভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া "তোরা কে কোথায় আছিস আয়" বলিয়া ব্রহ্মচর্য্যদানের নিমিত্ত মেয়েদের আহ্বান করিয়াছিলেন। স্বামী অভেদানন্দও ননীবালা দেবী ও অন্যান্য শিষ্যাকে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত দান করিয়া আজীবন ব্রহ্মচারিণীরূপে থাকিতে আদেশ দিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরঙ্গ শিষ্যগণ নারীগণকে এইরূপ ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ন্যাস প্রদানের দ্বারা ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ন্যাসে নারীর অধিকার সমর্থন করিয়া বর্ত্তমান যুগে ইহা পুনঃ প্রচলন করিয়াছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" এই অভিনব মন্ত্রে সন্ন্যাসিগণকে দীক্ষিত করিয়া সমাজের কল্যাণার্থে এক সন্ন্যাসী সংঘ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এই সংঘ ভারতের আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক জীবনের উন্নতি ও জনহিতকর কার্য্যে রত। কিন্তু যতদিন সমাজের অর্দ্ধাঙ্গ ভারতের নারীজাতির আধ্যাত্মিক ও সামাজিক জীবন উন্নত না হইতেছে, ততদিন জাতির মুক্তি সম্ভব হইবে না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। কাশী গোবিন্দমঠের স্বামী দুর্গাচৈতন্য ভারতী তাঁহার 'ব্রহ্মবাদিনী' নামক গ্রন্থে সত্যই লিখিয়াছেন,

[১] ১৯৪২ সালের জুলাই মাসের প্রবুদ্ধ ভারতে যোগীনমা প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

"হিন্দুনারীগণকে বর্ত্তমান যুগে ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ন্যাসের অধিকার দিলেই নারীশক্তির প্রকৃত উদ্বোধন সম্ভব।" মনুসংহিতা নারীগণের উপনয়ন ও বেদপাঠের বিরোধী হইলেও নারীপূজা সম্বন্ধে বলিয়াছেন :

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।

যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥

যে গৃহে বা স্থানে নারীগণ পূজিতা হন, তথায় দেবতাগণ প্রীত হন। যেখানে তাঁহারা পূজিতা হন না, তথায় সকল ধর্ম্মানুষ্ঠান নিষ্ফল হয়।" শ্রীশ্রীচণ্ডীতে নারীকে জগদম্বার অংশ বলা হইয়াছে। দেবীপ্রতিমা নারীগণকে সন্ন্যাসের অধিকার না দিলে তাঁহাদের যথোচিত সম্মান হইবে না। হিন্দুধর্ম্মে সন্ন্যাসই মানবের সর্ব্বোচ্চ সংস্কার। সেই সংস্কার হইতে নারীগণকে বঞ্চিতা রাখিলে তাঁহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয় না। আচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দ মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, নারীগণের উন্নতি ব্যতীত জাতির কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না। এইজন্য তিনি একটী স্ত্রীমঠ স্থাপন করিতে একান্ত আগ্রহশীল ছিলেন। কিন্তু অকালে দেহত্যাগ করায় তাঁহার এই শুভসংকল্প পূর্ণ হয় নাই। বেলুড়মঠ স্থাপনের পূর্ব্বে তিনি আমেরিকা হইতে তাঁহার গুরু ভ্রাতাগণকে লিখিয়াছিলেন, "শ্রীশ্রীমায়ের জন্য প্রথমে একটি স্থান নির্ম্মাণ করিবার সংকল্প করিয়াছি। কারণ, নারীগণেরই ইহা প্রথম আবশ্যক। শ্রীশ্রীমায়ের একটী স্থানের জন্য আমি প্রায় সাত হাজার টাকা পাঠাইতে পারি। যদি স্থানটি পাওয়া যায় তবে আমি আর কিছুরই জন্য চিন্তা করি না। এই দেশ হইতে প্রত্যেক বৎসর আমি ষোল শত টাকা পাইবার আশা করি। এ দেশ থেকে চলে যাবার পরও সেই টাকা আমি পাবো। সেই অর্থ আমি নারীমঠের পরিচালনার জন্য দিতে চাই। তাহা হইলে উহা চলিতে থাকিবে।"[১০] স্বামীজি আর একস্থানে লিখিয়াছেন, "প্রথমেই আমি শ্রীশ্রীমায়ের জন্য একটি মঠ করিতে চাই। প্রথমে মা এবং তাঁহার কন্যাগণ; পরে পিতা ও তাঁহার পুত্রগণ। বুঝতে পারলে? এই তীব্র শীতে আমি নানা অসুবিধা সত্ত্বেও নারীমঠের জন্য অর্থ সংগ্রহার্থ স্থানে স্থানে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতেছি।"[১১] নানা কারণে স্বামীজির পরিকল্পিত স্ত্রীমঠ স্থাপিত হয় নাই। পুরুষদের জন্য বেলুড় মঠই সর্ব্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু স্ত্রীমঠ স্থাপনের সংকল্প বরাবর স্বামীজির হৃদয়ে জাগ্রত ছিল। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে বেলুড় মঠে স্বামীজি তাঁহার শিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর নিকট এই সংকল্প প্রকাশ করেন। সন্ন্যাসে হিন্দুনারীর অধিকার শাস্ত্রসম্মত কিনা শরৎবাবু এই প্রশ্ন করায় স্বামীজি বলিয়াছিলেন, "কোন্ শাস্ত্রে এমন কথা আছে যে, মেয়েরা জ্ঞান-ভক্তির অধিকারিণী হবে না? ভারতের অধঃপতন হলে ভট্‌চায্ বামুনেরা ব্রাহ্মণেতর জাতকে যখন বেদ পাঠের অনধিকারী বলে নির্দ্দেশ করলে, সেই সময়ে মেয়েদেরও সকল অধিকার কেড়ে নিলে। নতুবা বৈদিক যুগে, উপনিষদের যুগে, দেখতে পাবি মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়া স্ত্রীলোকেরা ব্রহ্মবিচারে ঋষিস্থানীয়া হয়ে রয়েছেন। হাজার বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের সভায় গার্গী সগর্ব্বে যাজ্ঞবল্ক্যকে ব্রহ্মবিচারে আহ্বান করেছিলেন। এসব আদর্শ-স্থানীয়া মেয়েদের যখন অধ্যাত্মজ্ঞানে অধিকার ছিল তখন এখনই বা মেয়েদের সে অধিকার থাকবে না কেন? একবার যা ঘটেছে তা আবার অবশ্য ঘটতে পারে। মেয়েদের পূজা করেই সব জাত বড় হয়েছে। যে দেশে, যে জাতে মেয়েদের পূজা নাই, সে দেশ, সে জাত কখনো বড় হতে

১০ Letters of Swami Vivekananda, p. 173.

১১ Do. p. 175.

পারে না, কস্মিন্‌কালে পারবেও না! তোদের জাতের যে এত অধঃপতন ঘটেছে তার প্রধান কারণ, এই সব শক্তিমূর্ত্তির অবমাননা করা। মহামায়ার সাক্ষাৎ প্রতিমা এই মেয়েদের আগে তুলতে হবে। এদের জন্য আদর্শ মঠ স্থাপন করতে হবে। মাতৃরূপিণী স্ফুরৎ বিগ্রহরূপিণী মেয়েদের মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যা বিকাশকল্পে আমি স্ত্রীমঠ করে যাবো।"[১২]

স্ত্রীমঠের পরিচালনা কে করিবেন শরৎবাবু প্রশ্ন করায় স্বামীজি বলিয়াছিলেন, "কেনরে? এখনও ঠাকুরের কত ভক্তিমতী মেয়েরা রয়েছেন। তাঁদের দিয়ে স্ত্রীমঠ আরম্ভ করে দিয়ে যাব। শ্রীশ্রীমাতা ঠাকুরাণী তাঁদের কেন্দ্রস্বরূপা হয়ে বসবেন। আর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্তদের স্ত্রীকন্যারা তাতে প্রথমে বাস করবে। কারণ, তারা ঐরূপ স্ত্রীমঠের উপকারিতা সহজেই বুঝতে পারবে। তারপর তাদের দেখাদেখি কত গৃহস্থ এই মহাকার্য্যের সহায়ক হবে। এখন ত এইরূপে স্ত্রীমঠ স্থাপন করবো, পরে দেখবি এক আধপুরুষ বাদে ঐ স্ত্রীমঠের কদর দেশের লোকে বুঝতে পারবে। এই যে বিদেশী মেয়েরা আমার চেলী হয়েছে এরাই এই কার্য্যে জীবনপাত করে যাবে। তোরা ভয়, কাপুরুষতা ছেড়ে এই মহৎ কাজের সহায়ক হ।"[১৩]

আমরা সাধুগণের নিকট শুনিয়াছি, বেলুড়-মঠের নিয়মাবলীতে স্বামীজি ভাবী স্ত্রীমঠের কথা যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ: "মেয়েদের জন্যও এইরূপ আর একটি মঠ হইবে। বেলুড়মঠের নিয়মানুসারে স্ত্রীমঠ পরিচালিত হইবে। এই বিশেষ নিয়ম থাকিবে যে, স্ত্রীমঠে পুরুষের সংস্রব এবং পুরুষমঠে স্ত্রীলোকের সংস্রব আদৌ থাকিবে না। প্রাচীন সন্ন্যাসিগণই দূর হইতে স্ত্রীমঠ পরিচালনা করিবেন, যতদিন না যোগ্যা নারী এই কার্য্যের জন্য পাওয়া যায়। তাহারা যোগ্যা হইলে নিজেরাই নিজেদের সব কাজ চালাইবে।" হিমালয়ের কোন নিভৃতস্থানে একটী স্ত্রীমঠ প্রতিষ্ঠা করিবার সংকল্পও স্বামীজির ছিল।

শরৎবাবু ভাবী স্ত্রীমঠের সবিশেষ বিবরণ জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে স্বামীজি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "গঙ্গার ওপারে একটা প্রকাণ্ড জমি নেওয়া হবে, তাতেই অবিবাহিতা কুমারীরা থাকবে, আর বিধবা ব্রহ্মচারিণীরা থাকবে। ভক্তিমতী গেরস্থের মেয়েরা মধ্যে মধ্যে এখানে এসে অবস্থান করতে পারবে। স্ত্রীমঠে পুরুষদের কোনরূপ সংস্রব থাকবে না। পুরুষমঠের বয়োবৃদ্ধ সাধুরা দূর থেকে স্ত্রীমঠের কার্য্যভার চালাবেন। স্ত্রীমঠে মেয়েদের একটি স্কুল থাকবে; তাতে ধর্ম্মশাস্ত্র, সাহিত্য, ব্যাকরণ, চাই কি, অল্প বিস্তর ইংরাজীও শিক্ষা দেওয়া হবে। সেলায়ের কাজ, রান্না, গৃহকর্ম্মের যাবতীয় বিধান এবং শিশুপালনের স্থূল বিষয়গুলি শেখান হবে। আর জপ ধ্যান পূজা এসব ত' শিক্ষার প্রধান অঙ্গ থাকবেই। যারা বাড়ী ছেড়ে একেবারে এখানে থাকতে পারবে, তাদের অন্নবস্ত্র এই মঠ থেকে দেওয়া হবে। যারা তা পারবে না, তারা এই মঠে দৈনিক ছাত্রীরূপে এসে পড়াশোনা করতে পারবে। চাই কি, তারা মঠাধ্যক্ষের অভিমতে মধ্যে মধ্যে এখানে থাকতে ও যতদিন থাকবে খেতেও পাবে। মেয়েদের ব্রহ্মচর্য্যকল্পে এই মঠে বয়োবৃদ্ধা ব্রহ্মচারিণীরা ছাত্রীদের শিক্ষার ভার নেবে। এই মঠে পাঁচ সাত বছর শিক্ষার পর মেয়েদের অভিভাবকেরা তাদের বিয়ে দিতে পারবে। যোগ্যাধিকারিণী বলে বিবেচিতা হলে অভিভাবকদের মত নিয়ে ছাত্রীরা এখানে চিরকুমারী ব্রতাবলম্বনে অবস্থান করতে পারবে। যারা চিরকুমারীব্রত অবলম্বন করবে, তারাই কালে এই মঠের শিক্ষয়িত্রী ও প্রচারিকা হয়ে দাঁড়াবে; এবং গ্রামে

১২ স্বামি-শিষ্য-সংবাদ, উত্তর কাণ্ড, ত্রয়োদশবল্লী, ১০১পৃঃ

১৩ স্বামি-শিষ্য-সংবাদ, উত্তর কাণ্ড, ত্রয়োদশবল্লী ১০৪পৃঃ

গ্রামে নগরে নগরে শিক্ষাকেন্দ্র খুলে মেয়েদের শিক্ষাবিস্তারে যত্ন করবে। চরিত্রবতী ধর্ম্মভাবাপন্না ঐ প্রচারিকাদের দ্বারা যথার্থ স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার হবে। স্ত্রীমঠের সংস্রবে যতদিন থাকবে ততদিন ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করা এ মঠের ভিত্তিস্বরূপ হবে। ধর্ম্ম, নিষ্ঠা, ত্যাগ ও সংযম এখানকার ছাত্রীদের অলঙ্কার হবে; আর সেবাধর্ম্ম তাদের জীবনব্রত হবে। নারীদের এরূপ আদর্শ জীবন দেখলে কে না তাদের সম্মান করবে, কেই বা তাদের অবিশ্বাস করবে? দেশের স্ত্রীলোকদের জীবন এইরূপে গঠিত হলে তবে ত' তোদের দেশে সীতা, সাবিত্রী, গার্গীর আবার অভ্যুত্থান হবে।"[১৪]

স্বামীজি আর একস্থানে লিখিয়াছেন, "মাতৃজাতির মুক্তির জন্যই রামকৃষ্ণ অবতারে নারীগুরুগ্রহণ, নারীবেশে সাধন এবং ভগবানের মাতৃরূপের আরাধনা। সেইজন্যে একটি স্ত্রীমঠ স্থাপন করাই আমার প্রথম প্রচেষ্টা, এই স্ত্রীমঠ হতেই বহু গার্গী ও মৈত্রেয়ীর আবির্ভাব হবে এবং তদপেক্ষা উন্নতচরিত্রা নারীর উদ্ভব হইবে।" দেশের দুর্ভাগ্য যে, অর্দ্ধ শতাব্দী অতীত হইতে চলিল এখনও স্বামীজির স্বপ্ন সফল হয় নাই কিন্তু যুগাচার্য্যের পরিকল্পনা অবশ্যই পূর্ণ হবে।

স্ত্রীমঠ ভারতবর্ষে নূতন নহে। বৌদ্ধযুগে বহু স্ত্রীমঠ স্থাপিত হইয়াছিল এবং তথায় বহু সন্ন্যাসিনী জগতের কল্যাণসাধনে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। এখনও কাশী হরিদ্বার প্রভৃতি তীর্থস্থানে বহু হিন্দুসন্ন্যাসিনী এবং তাঁহাদের মঠ দেখা যায়। খ্রীষ্টান সন্ন্যাসিনীগণও স্ত্রীমঠ ও বালিকা বিদ্যালয়াদি নারীপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন।

স্বামীজি দিব্যদৃষ্টি সহায়ে বুঝিয়াছিলেন যে, কেবল সন্ন্যাসিবর্গের দ্বারা ভারতের তথা জগতের কল্যাণ সাধন সম্ভব নহে। বস্তুতঃ বেলুড় মঠের সন্ন্যাসিগণ শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে রামকৃষ্ণ মিশনের ভাবধারা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা ও সেবা দ্বারা পুরুষজাতির মধ্যে নূতন জীবনের সঞ্চার করিয়াছেন। কিন্তু যদি দেশের অপর অর্দ্ধাঙ্গ নারীজাতি উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবনের প্রেরণালাভ হইতে বঞ্চিতা থাকিয়া শিক্ষাহীন অবস্থায় ঘোর অন্ধকারে নিমগ্ন থাকে, তাহা হইলে জাতির উন্নতি কি প্রকারে সম্ভব? সন্ন্যাসিগণ নারীজাতির মধ্যে অবাধে এই সকল ভাব প্রচার করিতে পারেন না, কারণ, নারীজাতির সংস্রবে আসা তাঁহাদের অনুচিত। বর্ত্তমানে নারীর জীবনযাত্রা এক সংকটজনক অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। নিজেদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য এবং শ্রদ্ধা হারাইয়া পুরুষজাতির অন্ধ অনুকরণকেই শ্রেষ্ঠ আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া এক কৃত্রিম জীবন যাপনের চেষ্টা তাঁহারা করিতেছেন! আধুনিক কালে নারীগণ বহু জটিল সমস্যায় বিজড়িতা। তাঁহাদের সেই সকল সমস্যার সমাধান কেবল তাঁহারাই করিতে পারেন। যাহাতে শিক্ষালাভের সহিত উচ্চজীবনের আদর্শ ও প্রেরণালাভ করিয়া নারীগণ নিজেরাই স্বতন্ত্রভাবে নিজেদের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া নিজেদের সমস্যাসকল সমাধানপূর্ব্বক দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সমর্থ হন, তজ্জন্য উচ্চভাবসম্পন্না সন্ন্যাসিনী প্রচারিকার আবশ্যক। গেরুয়াবস্ত্রপরিহিতা, ব্রতধারিণী চিরকুমারী, ব্রহ্মচারিণী সন্ন্যাসিনীগণ যখন নারীগণের মধ্যে শিক্ষা ও সেবাকার্য্যে নিযুক্তা হইবেন, তখন দেশে অভূতপূর্ব্ব শ্রী আবির্ভূতা হইবে। ভিক্ষু আনন্দের অনুরোধে ভগবান বুদ্ধ নারীগণকে ভিক্ষুণী করিতে প্রথমে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু ভিক্ষুণীগণ ভারত ও বৌদ্ধদেশসমূহে যে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন তাহা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। খ্রীষ্টান সন্ন্যাসিনীগণ পাশ্চাত্য নারীজাতির মধ্যে যে যুগান্তর আনিয়াছেন, তাহা আমাদের অবিদিত নাই। হিন্দুসন্ন্যাসিনীগণ তদপেক্ষা অধিকতর

১৪ স্বামি-শিষ্য-সংবাদ, উত্তর কাণ্ড, ত্রয়োদশবল্লী, পৃষ্ঠা ১০৫

গৌরবময় কার্য্য করিয়া দেশসেবা করিতে পারেন। আচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দ ভগ্নী নিবেদিতা, ভগ্নী ক্রিশ্চিয়ানা প্রভৃতিকে এই সেবাব্রতেই দীক্ষিতা করিয়াছিলেন। নিবেদিতা-বিদ্যালয়সংলগ্ন সারদা-মন্দিরের উদ্দেশ্য ইহাই ছিল।

আমরা যতদুর জানি, রামকৃষ্ণ মিশনের নারী-প্রতিষ্ঠানসমূহে যে সকল ত্যাগী নারীকর্ম্মী আছেন, তাঁহাদের সংঘে এযাবৎ কোন স্থান ও ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা নাই। কর্ম্মজীবনের অবসানে ত্যাগী নারীকর্ম্মীর জন্য সামান্য অর্থের ব্যবস্থা থাকিলেও উহার দ্বারা তাঁহাদের জীবন-সমস্যার সমাধান হইবে না এবং উহা আদৌ সম্মানজনকও নহে। যদি সামাজিক জীবনে পুরুষ অপেক্ষা নারীর সম্মানজনক পদের প্রয়োজন অধিক হয়, তাহা হইলে যখন তাঁহারা গৃহ ও পরিবারবর্গের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া পরার্থে জীবন উৎসর্গ করেন, তখন তাঁহাদের অনুরূপ পদের প্রয়োজন যে আরও অধিক তাহা বলাই বাহুল্য। অতএব যখনই তাঁহারা সামাজিক জীবন পরিত্যাগ করেন, তখন যতশীঘ্র সম্ভব আধ্যাত্মিক জীবনে তাঁহা-দিগকে যথাযোগ্য স্থান দেওয়া অত্যাবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ সন্ন্যাসিগণের ন্যায় নিজদিগকে সংঘের অঙ্গরূপে ভাবিতে পারেন না বলিয়া নারীগণ পূর্ণোদ্যমে ঐকান্তিক ভাবে সংঘ-সেবায় তাঁহাদিগের সমগ্রশক্তি নিযুক্ত করিতে পারেন না। যাঁহারা মোক্ষার্থী হইয়া সংসার ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের সন্ন্যাস ব্যতীত কর্ম্মজীবন পীড়াদায়কই হইয়া থাকে। প্রথমে সন্ন্যাস, তারপরে সেবা। ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ন্যাসব্রত পাইলে নারীগণ যে সাহস, শক্তি ও কর্ম্মকুশলতা দেখাইবেন তাহাতে সংঘশক্তি সমৃদ্ধ হইবে। এইরূপে নারীগণ ব্রতাধিকার লাভ করিয়া উপযুক্ত কর্ম্মশক্তি প্রয়োগ করিলে স্ত্রী-মঠ পরিচালনে সন্ন্যাসিগণের সাহায্যের প্রয়োজন হইবে না। তখন নারীগণই পুরুষগণ অপেক্ষা নারীপ্রতিষ্ঠানগুলি অধিকতর যোগ্যতার সহিত পরিচালনা করিতে পারিবেন। পুরুষগণ নারীপ্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রিত করিলে ঐ প্রতি-ষ্ঠানের স্বাভাবিক উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হইবে এবং ঐ প্রতিষ্ঠানের নারীকর্ম্মিগণ স্বাবলম্বী ও কর্ম্মকুশলী হইয়া আত্মবিকাশে সমর্থা হইবেন না। এই বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের অভিমত পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তবে নারীগণকে যোগ্যা করিয়া তুলিবার জন্য তাঁহাদিগকে পুরুষগণের ন্যায় শিক্ষাদান, এবং ব্রহ্মচর্য্য, সন্ন্যাস প্রভৃতি ব্রতে দীক্ষিতা করিয়া তাঁহাদের সুপ্তশক্তি জাগ্রত করার প্রয়োজনীয়তা আছে।

সন্ন্যাস হিন্দুমাত্রেরই সর্ব্বোচ্চ অধিকার। নারীগণই এই শ্রেষ্ঠ অধিকার হইতে বঞ্চিতা হইবেন কেন? স্বামীজি বলিয়াছেন, "সন্ন্যাস না হলে কেহ কদাচ ব্রহ্মজ্ঞ হতে পারে না। একথা বেদ-বেদান্ত ঘোষণা কচ্ছে। যারা বলে এ সংসারও করব, ব্রহ্মজ্ঞও হব, তাদের কথা আদপেই শুন্‌বিনি। ও পাগলের কথা, উন্মত্তের প্রলাপ, অশাস্ত্রীয় অবৈদিক মত। ত্যাগ ভিন্ন মুক্তি নাই। ত্যাগ ভিন্ন পরাভক্তি লাভ হয় না। আমি নিশ্চিতরূপে ইহা বুঝেছি যে এসব ছেড়ে ছুড়ে না দিলে, সন্ন্যাস গ্রহণ না করলে কিছুতেই জীবের পরিত্রাণ নাই—কিছুতেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সম্ভাবনা নাই।"[১৫] এই সকল বাক্য সুস্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করে যে, স্ত্রীলোক-গণ কোনমতেই সন্ন্যাস হইতে বঞ্চিতা হইতে পারেন না।

শিষ্য শরৎবাবুর প্রশ্নের উত্তরে স্বামী বিবেকানন্দ আর এক জায়গায় বলিয়াছেন, "সন্ন্যাস-ধর্ম্মের সাধনের কালাকাল নাই। শ্রুতি বলছেন 'যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ,' যখনি বৈরাগ্যের উদয় হবে, তখনি প্রব্রজ্যা করবে। মোট কথা, সন্ন্যাস না নিলে কিন্তু আত্মজ্ঞান লাভের আর উপায়ান্তর নাই। সন্ন্যাসের উৎপত্তি যেথানেই হোক না কেন, মানবজন্মের উদ্দেশ্য

১৫ স্বামি-শিষ্য-সংবাদ, পূর্বকাণ্ড, ১০১ পৃঃ

হচ্ছে, এই ত্যাগব্রতাবলম্বনে ব্রহ্মজ্ঞ হওয়া। সন্ন্যাস গ্রহণই হচ্ছে পরম পুরুষার্থ। যাদের বৈরাগ্য উপস্থিত হয়ে সংসারে বীতরাগ হয়েছে তারাই ধন্য।"[১৬] সন্ন্যাস ব্যতীত আত্মজ্ঞান-লাভের যদি আর উপায় না থাকে তাহা হইলে স্ত্রীলোকগণ কেন আত্মজ্ঞান লাভ হইতে বঞ্চিতা হইবেন? আমরা প্রায়ই শুনিয়া থাকি নারীগণ ইচ্ছা করিলে সন্ন্যাস-জীবন যাপন করিতে পারেন। উহার জন্য বাহ্যিক অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই। কিন্তু যদি অনুষ্ঠান ব্যতীত সন্ন্যাসধর্ম্ম পালন করিতে পারা যায়, তাহা হইলে স্বামীজি এবং তাঁহার গুরুভ্রাতাগণ শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট গেরুয়া পাইলেও তাঁহার দেহত্যাগের পর যথারীতি শাস্ত্রবিধানানুযায়ী সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন কেন? মঠেই বা পুরুষদের জন্য ঐ সকল ব্যবস্থা করিলেন কেন? নারীগণ যদি আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাস ব্যতীত সন্ন্যাসিনী হইতে পারেন, তবে পুরুষগণের পক্ষেও কেননা উহা সমভাবে প্রযোজ্য হইবে? দেখা যায়, যুবকগণও ব্রহ্মচর্য্য বা সন্ন্যাসলাভের আশা না পাইলে সংঘে জীবন্মৃত অবস্থায় থাকেন। সন্ন্যাস যেমন যুবকগণকে চিরতরে সঞ্জীবিত করে, নারীগণকেও নিশ্চয় তদ্রূপ করিবে। নারীগণকে বঞ্চিতা রাখিয়া পুরুষগণকে ঐ সকল সুবিধা দেওয়া কোনপ্রকারেই যুক্তিসঙ্গত নহে।

প্রায়ই বলা হইয়া থাকে যে, শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণী স্বয়ং যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই, তখন তাঁহার পদানুগা নারীগণের সন্ন্যাসে কি প্রয়োজন? কিন্তু ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ, শ্রীশ্রীমা ছিলেন সাক্ষাৎ জগদম্বা। শ্রীশ্রীঠাকুর যাঁহার চরণে জপের মালাদি সমর্পণ করিয়া সাধন সমাপ্ত করিয়াছিলেন, তাঁহাকে সন্ন্যাস দানের কল্পনা তিনি নিশ্চয়ই করিতে পারেন নাই। ঠাকুরের অদর্শনের পরে তাঁহাকে আর কে সন্ন্যাস দিবেন? কিন্তু এই অসাধারণ ব্যতিক্রম অন্যান্য সাধারণ নারীর পক্ষে নিরাপদ বা শ্রেয়স্কর নহে।

আরও বলা হয় যে, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার যুবক-শিষ্যগণকে গেরুয়া প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার কোন শিষ্যাকে গেরুয়াবস্ত্র দেন নাই। কিন্তু ইহা সত্য নহে। গৌরীমার জীবনীতে আছে যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব গৌরী-মাকে গেরুয়া প্রদান করিয়াছিলেন।[১৭] মাতাঠাকুরাণীও দুর্গাপুরীদেবীকে সন্ন্যাস দিয়াছিলেন। যোগীনমা গেরুয়া পরিধান করিতেন, ইহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব নারীগণকে সন্ন্যাস ও ব্রহ্মচর্য্য হইতে বঞ্চিতা রাখা কোন প্রকারেই সমর্থন করা যায় না।

আমাদের মনে হয়, পুরুষগণ যদি ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রত ব্যতীত সংঘজীবনে কর্ম্মঠ ও শক্তিমান হইতে না পারেন, নারীগণই বা কিরূপে পারিবেন? আমরা কেবল হাসপাতালের নার্স বা স্কুলের শিক্ষয়িত্রী হইতে চাহি না। আমরা চাই, প্রত্যক্ষানুভূতি। এরূপ কোন নিয়ম নাই যে, প্রত্যেক স্ত্রীলোককে কেবল শিক্ষয়িত্রী অথবা নার্স‌ই হইতে হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্যগণ আচার্য্য হইয়াছিলেন ধ্যান, তপস্যা, স্বাধ্যায়াদিদ্বারা। নারীগণও তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলুন ইহাই বাঞ্ছনীয়।

এই আলোচনায় স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে নারীগণকে জাগ্রত উদ্বুদ্ধ এবং সংঘবদ্ধ করিবার জন্য সন্ন্যাসিনী সংঘ বা স্ত্রীমঠের একান্ত প্রয়োজন। এখন স্ত্রীভক্তগণ দলে দলে মঠে যাইয়া সন্ন্যাসিগণকে বিব্রত করেন বটে, কিন্তু তাঁহারা নিসংকোচে মঠে বিচরণ করিতে ও প্রাণ খুলিয়া কাহারও সহিত ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিতে পারেন না। নারীগণ পুরুষের নিকট তাঁহাদের জীবন-সংগ্রামের সকল বিষয় অথবা সকল সমস্যার কথা বলিতে পারেন না। একটি স্ত্রীমঠ স্থাপিত হইলে স্ত্রীভক্তগণ তথায় নিঃসংকোচে যাইয়া যথার্থ ধর্ম্মজীবন যাপন করিতে এবং যে সকল নারী আজীবন শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমার আদর্শ অবলম্বন করিয়া সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে উৎসুক তাঁহারা উহাতে যোগদান করিতে পারিবেন।

১৬ স্বামি-শিষ্য-সংবাদ, পূর্ব্বকাণ্ড, ১০১ ও ১০৫ পৃঃ

১৭ গৌরীমা, ১০৩ পৃঃ

পূর্ববঙ্গে বর্ষার রূপ

স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দ

ভরা বর্ষা—জলে জলাকার—চারদিকে সর্বত্রই জল কানায় কানায় ভরেছে। নিত্যই ঘরের দুয়ারে বসে বসে সকাল হতে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে দেখি জলের অপূর্ব নূতন রূপ—কি সুন্দর! যে দিকে চাই—যতদূর দৃষ্টি চলে শুধু জল—অথৈ জল বিপুল পুলকে আপন মনে দিগন্ত বিস্তার করে আছে। তার শান্ত শ্যামল রূপশ্রীতে ভাসিয়ে দিয়েছে পল্লী, পথ, ঘাট, মাঠ, পুকুর, ডোবা, বাজার, বন—যা কিছু সব জলে জলময়।

আমি চেয়ে চেয়ে দেখছি আমার ঘরের পাশে জল কতকটা এগিয়ে এল—ধীরে, অতি ধীরে—শান্ত অথচ মৃদু তরঙ্গ তুলে জোয়ারের জল তর্ তর্ করে এগিয়ে আস্‌ছে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে, ঐ যে একটু—তারপর আরো—আরো এগিয়ে আস্‌ছে। কাল যেখানে—একটু দূরে জলের গতি সীমাবদ্ধ ছিল, আজ যেন জলপ্রবাহ কল্ কল্ খল্ খল্ রবে—নাচতে নাচতে প্রথমে এসেই সেই সীমানা ডিঙ্গিয়ে ছুটে এল কাছে, অতি কাছে,—আশ্চর্য্য! খানিকক্ষণের মধ্যেই একেবারে আমার ঘরের দুয়ারে এসে হাজির। জলে ভেসে গেল আমাদের চারদিক—এতদিন যদিও বা একটু সামান্য ব্যবধান ছিল—ঘরের সামনে মাটীর উপর দু পা চলতে পারতুম কিন্তু আজ বর্ষার জলে অতি আপন জনের মত—সকল ব্যবধান—সকল দূরত্ব দূর করে দিয়ে একেবারে আনন্দে হেলে দুলে এসে আমার ঘরে ঢুকবার চেষ্টা করছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই গৃহাঙ্গনের সবদিকটা ভাসিয়ে দিল শান্ত শীতল জল-প্রবাহ।

দেখলুম ভাবলুম হঠাৎ আজ জলের এত উচ্ছল আনন্দপ্রবাহ কেন? পাঁজিখানা খুলেই দেখলুম—শ্রাবণী পূর্ণিমা, আজই তার বিশেষ বৃদ্ধির দিন, তাই এ নব রূপের আবির্ভাব।

অবাক হয়ে বসে বসে দেখছি—বর্ষার জলের প্রবল গতি—একটুও কমেনি সমান ভাবেই এগিয়ে চল্‌ছে—খানিকক্ষণ ত হয়ে গেল। ভাবছি শেষ পর্য্যন্ত কি জলপ্রবাহ ঘরেই প্রবেশ করবে! অসম্ভব কি? আসতেও পারে; যা অবস্থা দেখছি তাতে অবাক বা আশ্চর্য হবার কিছুই নেই,—এলেই হল।

আমার ঘরখানাও আজ একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে পরিণত হল, স্থলের সঙ্গে আর কোনই সম্বন্ধ নেই, চারদিকেই জল। দূরে—কাছে গ্রামের পর গ্রাম—সকল বাড়ীগুলিই জলের উপর এক একটী ছোট ছোট দ্বীপের মত ভাসছে। অতি কাছের বাড়ীটিও আজ যেন দূরে সরে দাঁড়িয়েছে। অতি নিকট আত্মীয় যেন দূর, পর হয়ে গেছে। এখন ইচ্ছা হলেই যে দৌড়ে গিয়ে অপরের সঙ্গে দেখা করে কথা বলে আসা—সে উপায় আর নেই। বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা উদাসীর মত চেয়ে থাকে অপর বাড়ীর পানে। পায়ে চলার পথ বন্ধ হয়ে—এই জলে ভাসা দেশে একমাত্র নৌকা বেয়ে হাতে চলা আরম্ভ হয়েছে।

এ সময় গরীব ধনী সকলের বাড়ীতেই চলাচলের জন্য ছোট বা বড় যে কোন রকমেরই হ'ক একখানা নৌকা ঘাটে বাঁধা থাকে। এ না হলে চলবেই না—একমাত্র পথের সম্বল বা বাহন এই

নৌকা। এ ছাড়া ঘরের বাইরে যাবার উপায় নেই। এমন কি নৌকার অভাবে অনেক সময় বিশেষ দরকারেও অসহায়ের মত দ্বীপান্তর বাসী হয়ে থাকতে হয়। নৌকা এলে তবে খোঁজ খবর। এ দেশবাসী গরীব ধনী প্রায় সবাই নৌকা বাইতে, সাঁতার কাটতে জানে। দরকার বোধে নিজেদের নৌকা নিজেরাই বেয়ে চলে।

ঘরের সামনে বসে বসে দেখতুম নিত্যই অগণিত ছোট বড় নৌকা সারি দিয়ে উজান ও ভাটি পথে, বেয়ে অথবা পাল তুলে দিকে দিকে চলেছে। নানা কাজে হাটে, বাজারে, মাঠে, স্কুলে, ডাকঘরে, এবাড়ী ওবাড়ী অথবা দুর গাঁয়ে আত্মীয় বাড়ী। আবার চলার পথেই চলতে থাকে এসব যাত্রীদের যত দরকারী অদরকারী কথা, হাসি, তামাসা এ যেন হাঁটা পথের পথচারীদের আলোচনার মতই। এমনি পথে পথে দিন রাত চলে নৌকার অভিযান। পথিকরা এসময় সোজা সহজ পথের সন্ধান নিয়ে এগিয়ে যেতে চায়—তাই এ বাড়ীর পাশ দিয়ে, ও বাড়ীর সামনা দিয়ে, বাঁশবনটীর পাশ দিয়ে, ঐ গ্রামের ধার দিয়ে, মাঠটার মাঝ দিয়ে, আবার খাল বা বিলের সোজা পথে। যাদের নৌকা নেই মাটীর গামলায় ভেসে ভেসে এবাড়ী হতে ওবাড়ী যেতে দেখেছি। ছোট ছেলেরা গামলা বেয়ে স্কুলে যায় অবাক হয়ে চেয়ে দেখেছি তাদের গামলা চালাবার কৌশল।

আমার ঘরের সামনে সর্বদাই একখানা নৌকা বাঁধা থাকত। আমি দিনের ভিতর কতবার যে দরকারে অথবা অমনিই আহার-বিহার বা যে কোন কাজে নৌকায় উঠে বেরিয়ে পড়তুম্। ঘরে দ্বীপান্তর বাসী হয়ে থাকার চাইতে, নৌকায় বেশ আনন্দে চলে বেড়িয়ে আসতুম—ভালই লাগত।

এ সময় পথ ঘাটের আর কোন বিভিন্নতা নেই, সর্বত্র জলে জলময়—যে কোন পথে এগিয়ে গেলেই হল। এ সময় জলেভাসা গ্রামগুলির কি ভয়ানক অবস্থা। কিন্তু আশ্চর্য, গ্রামবাসীরা এই দুরন্ত জলের অত্যাচার ও প্রীতি দুইই উপভোগ করতে সমান অভ্যস্ত। এত জলেও তাদের সাংসারিক কাজ কর্ম সব কিছু নিত্য নিয়মিত চল্‌ছে—কোনই যেন অসুবিধা নেই। গৃহপালিত গরু, ভেড়া, ছাগল, কুকুর, বেড়াল, মুরগীগুলিও এ সময় আনাচে-কানাচে আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে। হাঁস-গুলি ত নূতন জলে আনন্দে পানকৌড়ির মত ডুবে ভেসে বেড়াচ্ছে।

জল বাড়বার সঙ্গে কোন কোন বাড়ীর শাক-সব্জি ও ফুলের গাছগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু পল্লীর শোভা, আম, জাম, তাল, বকুল, তেঁতুল, খেজুর, হিজল, বাঁশ, বেত আরো কত যে নাম না জানা গাছ ও লতা বুক জলে দাঁড়িয়ে থেকে বনশ্রীর অপরূপ সৌন্দর্যে গ্রামগুলিকে রূপান্বিত করে রেখেছে; দুর হতে চাইলে মন প্রাণ এক স্নিগ্ধ তৃপ্তির নিবিড় আনন্দে ডুবে যায়—মনে হয় যেন জলের বুকে সৃষ্টির এক বিচিত্র মায়া-কানন।

এ সময় এই অবধি গতিপথের প্রধান ও প্রবল বাধা হচ্ছে কচুরিপানা। অনেক সময় স্থানে স্থানে কচুরিতে পথ এমনভাবে বন্ধ করে দেয়—অতি সুদক্ষ মাঝিও উহা ভেদ করে যেতে পারে না। কখন কখন সামান্য কচুরিবদ্ধ পথ পার হতে গিয়ে দেখেছি—কি ভয়ানক বাধা। দু একটী জল ঢোঁড়া সাপও দেখা যেত—জলে ডুবে ভেসে আঁকা-বাঁকা হয়ে এগিয়ে চলেছে।

এ দেশের চাষী মজুররা এ সময়ে যেভাবে অগাধ জলে ডুবে ডুবে পাট ও ধান কেটে নিয়ে যায়, মাঝখানে শুধু শ্রান্তি অপনোদনের জন্য সঙ্গের ছোট নৌকাটীতে উঠে একটু তামাক টেনে নেয়। এ বোধ হয় অন্য-দেশের চাষীমজুররা ভাবতেই পারে না।

আবার একদল লোককে দেখতুম সকাল

সন্ধ্যায় মহা উৎসাহে কত যে ফাতনা-বর্শি, চাই, টেটা, জুতি, কোচ, বইচনা, পাড়ান, পলো, ওচা, কত রকমের জাল—ধর্মজাল, ভেসালজাল, ভৈরবীজাল, টানাজাল, ঝাঁকিজাল, বেড়জাল, কৈয়াজাল, ইলশাজাল, আরো (কত জাল আছে নাম জানি না) বিভিন্ন উপায়ে ও নানাকৌশলে খালে বিলে নদীতে পুকুরে ডোবায় জঙ্গলে ধানক্ষেতে নানা স্থানে মাছ ধরার কাজে ব্যস্ত। এরা কিন্তু কেউ জেলে নয়, জেলেদের জাতীয় ব্যবসা মাছধরা, তারা বারমাস মাছধরার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে—এ সময় ত বিশেষ ভাবেই আয়োজন করে।

ছোট ছোট দোকানীরা—পিতল-কাঁসার বাসনের ব্যবসায়ীরা—যারা অন্য সময় মাথায় মোট বয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে ব্যবসা করত, এ সময় তারা ছোট নৌকায় জিনিসপত্র নিয়ে জলপথে ভেসে ভেসে বাড়ী বাড়ী গিয়ে বিক্রী করে, এতে এসব ব্যবসায়ীদের পরিশ্রম অনেকটা কম হয়। একদল ব্যবসায়ী বর্ষাকালে গ্রাম হতে আলু, কলা, কুমড়ো, ধান, পাট, ইত্যাদি সস্তা দামে কিনে, দূর দূর বাজারে গিয়ে অধিকমূল্যে বিক্রী ক'রে লাভবান হয়। গ্রামবাসীরা নৌকা এবং অন্যান্য অসুবিধার জন্য বাজারে যেতে পারে না বলেই এই দালালদের নিকট সস্তাদরে অধিকাংশ জিনিস বিক্রী করে থাকে। এ সময় লোকের অবর্ণনীয় দুর্দশাও হয়, অবশ্য এরা এতে অভ্যস্ত।

সমস্ত বর্ষায় এদেশের পল্লীপথে দিনরাত চলে নৌকায় অভিযান, লগ্গি বা বৈঠা বেয়ে, পাল তুলে, নৌকাগুলি দিকে দিকে চলে যায় যেন বিজয় অভিযানে। কতকগুলি বড় নৌকা এসময় বহুযাত্রী নিয়ে নিত্যই ফেরী ষ্টীমারের মত একস্থান হতে দূরে অন্যত্র নির্দিষ্টস্থানে নিয়ে যায় এবং ঠিক সময়ে ফিরেও আসে, এতে প্রত্যেক যাত্রীর ভাড়া নির্ধারিত, একে "গয়নার নৌকা" বলা হয়। বর্ষাকালে গ্রামাঞ্চলে এর খুব প্রচলন, আবার বড় বড় নৌকা ভাড়া করে সপরিবারে দু'চারদিনের পথ আত্মীয়স্বজনের বাড়ীও বেড়িয়ে আসা যায়, নৌকাতেই রান্নাবান্না ও বিশ্রামের সব ব্যবস্থা রয়েছে, জলে ভাসা ঘর বাড়ীর মত। অনেকে নিজেদের আহার্য ইত্যাদি সঙ্গে নিয়ে পদ্মা প্রভৃতিতে এই সময় নদীর সৌন্দর্য ও রুদ্রমূর্তি দেখতেও যান।

প্রায়ই ভোরে বা বিকেলে বালকবন্ধুদের সঙ্গে নৌকায় বেড়াতে যেতুম। নৌকায় বেড়ান ব্যতীত এসময় তাদের আর অন্য কোন খেলাধূলা ছিল না, পল্লীপথ ছেড়ে নৌকা এগিয়ে চলত কুল্ কুল্ রবে জলের বুকে মৃদু তরঙ্গ তুলে মুক্ত দিগন্তের পানে। অথৈ জলরাশি চারদিকে বাতাসের সঙ্গে ঢেউ খেলে বেড়াচ্ছে। আমাদের নৌকাগুলি ধানখেতের বুকচেরা পথে সন্ সন্ রবে এগিয়ে চল্‌ছে। দু'পাশ থেকে ফড়িং-পোকা উড়ে পড়ছে গায়। কখনও হয়ত নৌকাগুলি মাঠের বুকে ছেড়ে দিয়ে বসে থাক্‌তুম, উদাসী বাতাস দেহ মন জুড়িয়ে দিত, বাতাসের গতিভঙ্গিতেই নৌকা আপনি হেলে দুলে এগিয়ে চলত। স্নিগ্ধ বাতাসের শিহরণে—ঐ কালো জলের বুকে ধানের খেতে-খেতে সবুজের ঢেউ খেলে যাচ্ছে। দেখে শুধু কবির বাণীটাই বার বার মনে জেগে উঠতো—"এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে"। দূরে ঐ আকাশখানা সবুজ মাঠের বুকে এসে নেমে পড়েছে, মনে হয় যেন অসীম জলসায়রে নীল সবুজের লুকোচুরি খেলা। কি সুন্দর—প্রাণ মন মুগ্ধ করে দেয়। এই দিগন্তপ্রসারী মাঠের বুকে—ভাস্‌তে ভাস্‌তে মনে হয় যেন অসীম অনন্ত ঐ সবুজ তরঙ্গ—আনন্দে দোল দিয়ে যাচ্ছে দিগন্তজুড়ে। অবাক হয়ে চেয়ে থাকি। আবার দূরে দেখা যায় বর্ষাপ্লাবিত গ্রামগুলির—কি অপূর্ব শোভা।

সূর্যকিরণ দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে, সবুজ ধানের খেতগুলি সোনার রঙে রঙিয়ে গেছে—মুগ্ধ অন্তরে করজোড়ে দিনের দেবতাকে আমার প্রভাতের প্রথম প্রণাম নিবেদন করতুম, পল্লীর আকাশ পাখীর প্রভাত কাকলীতে ভরে উঠত।

আবার কোনদিন—আমাদের দু-তিনখানা নৌকা উদ্দেশ্যবিহীনভাবে একে অপরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হু হু শব্দে দূর দূরান্তের পথে চলত, প্রত্যেক নৌকায়ই তিন চার জন মাঝি থাকত, সবার হাতেই নৌকা চালাবার বৈঠা। নৌকাগুলি জলের বুকে ঢেউ খেলিয়ে তর্ তর্ করে যেত। সকলেরই কি আনন্দ স্ফূর্তি! যে নৌকাখানা সবার আগে এগিয়ে চলত—তার গৌরবদীপ্ত কলরবে মাঠের আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠত, যারা পেছনে থাক্‌ত, তারা উচ্চরবে সোরগোল করে পরাজয় স্বীকার করতে চাইত না। আবার একে অপরকে জল ছড়িয়ে ভিজিয়ে দিয়ে আনন্দ উপভোগ করত।

এই চলতি পথে কোন বন্ধু হয়ত সাপলা-ফুল তুলে সুন্দর মালা তৈরী করত, আবার কেউ বা ধান খেতের আড়ালে জল ডাহুক ও দাহুর পাখীর ডাক শুনে আনমনা হয়ে চেয়ে দেখ্‌ত—কোথা হতে ঐ উদাসী স্বরটী ভেসে আসছে। গ্রামের পথে যেতে যেতে দেখেছি, বনের ধারে মাঠের বুকে, পুকুরে অনেক রকম পাখীর আনন্দে স্বচ্ছন্দ বিচরণ। আবার বক, চিল, মাছরাঙ্গার মাছ ধরার অব্যর্থ সন্ধানও চোখে পড়েছে।

এই জলেভাসা পল্লীগুলির পাশ দিয়ে চির-চঞ্চল বর্ষার দুরন্ত পদ্মা, তার কূল ভাসিয়ে বিশাল বক্ষে উচ্ছ্বসিত তরঙ্গভঙ্গে উন্মাদিনীর মত সোঁ সোঁ রবে একদিক হতে অন্যদিকে এগিয়ে চলেছে। তার মুহূর্ত তরঙ্গাঘাতের গভীর আবর্তে কত যে গ্রাম, নগর, পল্লী নিশ্চিহ্ন করে নিজ বিরাট বক্ষে বিলীন করে নিচ্ছে! পদ্মার ভীষণ ভয়ালরূপ আজ ধ্বংসের উগ্র মূর্তি নিয়ে এগিয়ে ছুটেছে, চাইলে প্রাণ আতঙ্কে শিউরে উঠে। কেবল সীমাহীন এই জল পারাবার—যার কূল-কিনারা দেখা যায় না, শুধু জলে জলময়।

এই সময়ই আবার ইলিশমাছ ধরবার মরসুম, তাই জেলে ছাড়া অনেক গ্রাম্য চাষী মজুরও অবসর সময়ে নৌকা ও জাল নিয়ে দলে দলে পদ্মা মেঘনার বুকে যায় মাছ ধরতে। বিচিত্র রঙের পাল তুলে শত শত ইলিশমাছ ধরবার নৌকা-গুলি যখন সার দিয়ে বাতাসের টানে সোঁ সোঁ শব্দে উজিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলে—সে এক অপরূপ সৌন্দর্য সৃষ্টি করে দিয়ে যায়। উপরে মেঘ ছাওয়া কাজলপরা অনন্ত আকাশ, নীচুতে নদী বক্ষে এই শোভাযাত্রী নৌকাগুলি জাল ফেলে নিশ্চিন্তে আবার বিপরীত দিকে ভাটির পথে ভরা জলের বাঁকে বাঁকে দাগ কেটে স্রোতের টানে যায়।

দূরে দূরে ব্যবসায়ীদের বিরাট বিরাট নৌকা-গুলি পালতুলে অনুকূল বাতাসে পাড়ি জমিয়েছে। আবার খাল বিলের পথেও দিকে দিকে চলেছে নৌকার সারি; এ সময় নদীতীর বা খালবিলের কোন ব্যবধানই জানা যায় না। সবই জলে জলময়। কোন নৌকার মাঝি হয়ত বেলা-শেষের দিকে নিশ্চিন্তে হালের গোড়ায় বসে প্রাণের আনন্দে উদাসী আকাশ বাতাস ও জলের বুক কাঁপিয়ে ভাটিয়ালী সুরে এমন গান ধরেছে,—তার দরদী সুরের রেশ দূরে পথিকের প্রাণেও সাড়া দিচ্ছে। পল্লীমাঠের এই বেলা-শেষে গানের সুরে সত্যি মানুষকে আনমনা করে দেয়; কতদিন সে সুর মুগ্ধ হয়ে শুনেছি।

আবার নৌকায় ভাস্‌তে ভাস্‌তে দেখেছি, সান্ধ্যাকাশের গা ঘেঁষে বলাকার সারি পাখা

ঝাপ্‌টে সাঁই সাঁই রবে উদাসীর মত স্বাধীন আনন্দে কোন অজানার পথে চলেছে, অবাকে বিভোর হয়ে চেয়ে থাকতুম।

ওদিকে বিশাল পদ্মার পশ্চিমদিকে আকাশ ও জলের গা হঠাৎ কে যেন অলক্ষ্যে বিচিত্র রঙে রাঙিয়ে দিল; দেখ্‌তে দেখ্‌তে তার মাঝখানে দিনান্তের ক্লান্ত রবি ডুবে গেলেন। সাঁঝের পাখী ডেকে চলেছে, সূর্য ডুবে যাওয়ার পরেও ঐ দিকটা খানিকক্ষণ রঙের ছটায় উজ্জ্বল হয়ে রইল, কি সুন্দর মনোহর চিত্র! ধীরে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছে, আমরাও নৌকা ফিরিয়ে পল্লীর দিকে এগিয়ে চলতুম। দেব দেউলে সন্ধ্যারতির শাঁক ঘণ্টা বেজে উঠবার সঙ্গেই, মসজিদে মোয়াজ্জিমের আছর নামাজের আজান শোনা যেত। দূর গাঁ হতে সন্ধ্যা প্রদীপের ক্ষীণ আলোশিখা অন্ধকারের জলের বুকে কেঁপে কেঁপে যেন শত দীপশিখায় প্রতিফলিত হয়ে উঠছে দেখা যায়। এই নিবিড় সন্ধ্যার অন্ধকারেই আমরা ঘাটে ফিরে আসতুম।

একটু রাতেই গ্রামের পথ নিবিড় নির্জন হয়ে যায়, যেন গভীর রাত। তখনও দূর গাঁ হতে দু চার খানা ফিরতি নৌকা বাড়ীর পাশ দিয়ে বৈঠা ছপ্‌ ছপ্‌ করে এগিয়ে যায়, আর সবই নিবিড় নিঝুম।

এমনি ভাবে বন্ধুদের সঙ্গে কত যে আনন্দে আমোদে ঐ জলে ভাসা দেশটীর পথে পথে ঘাটে মাঠে গাঁয়ে বাজারে দিনের পর দিন ঘুরে বেড়িয়েছি। কি শান্ত স্নিগ্ধ সুন্দররূপ—চাইলেই চোখ জুড়িয়ে যায়। বর্ষায় এ দেশের অপরূপ রূপের তুলনা বোধ হয় অন্য কোথাও নেই। মনপ্রাণ আপনিই তৃপ্তির নিবিড় আনন্দে ডুবে যায়। কোন রূপ দক্ষ শিল্পীও বোধহয় তার তুলিতে এরূপ মাধুর্য ফুটিয়ে তুলতে পারেন না।

সমর্পণ

শ্রীশিবশম্ভু সরকার, এম্‌-এ

পরিত্রাণ কর জগদীশ সাংঘাতিক অহমিকা
নাগ-পাশ হ'তে! ওগো মোর অন্তর-দেবতা—
না-মানার মূঢ় স্বপ্নে বিদ্রোহীর মত্ত বিহ্বলতা
খেলিয়াছে—খেলায়েছ—ভেঙে দেছ অশান্ত মত্ততা
আপনার ঘায়ে ঘায়ে করি' জর্জ্জরিত। যেই সর্প
কামনার ফণাটী বাঁকায়ে, দীপ্যমান মহাদর্প
বাহিরিল ফুঁসিতে ধরায়—তুমি মহীয়ান্
তাহার ছোবল-মুখে রেখে গেলে কঠিন পাষাণ!
যত দেয় ঘায়—তত অসহায়! ছিন্ন ভিন্ন ফণা
তেজহীন দন্তহারা মাগে শেষে করুণার কণা।

এ' সংসারে ছোটাছুটী শত কাজে, শত বাসনায়
পল্লবিত মন চাহে তৃপ্ত হ'তে কাণায় কাণায়—
প্রেমের আসব পিয়ে, ক্ষমতার উত্তুঙ্গ চূড়ায়—
উঠিতে নামিতে ফিরে—কল্পতরু আনন্দ-ছড়ায়!
তুমি বুঝি হেসে নাও, মুখ টিপে এক পাশে রহি'!
তাই তার প্রেমে বিষ, ফুলে কীট, সুরে জ্বালা দহি'
আলো হয় অন্ধকার! স্তম্ভিত সে! কেঁদে উঠে ডরে
—'অহমিকা চূর্ণ কর—তবাধীন করে নাও মোরে।'

সমালোচনা

কঠ উপনিষদ্ তথা আত্মদর্শন (হিন্দী)—স্বামী চিন্ময়ানন্দ পুরী সম্পাদিত। প্রকাশক—শ্রীমদনমোহন অগ্রবাল, ইন্দ্র প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, আলমোড়া। প্রাপ্তিস্থান—লালা রামলাল করমচন্দ—মল্লীবাজার, আলমোড়া। ২৬৪ পৃষ্ঠা, বোর্ডে বাঁধাই, মূল্য ২৷৷০ টাকা।

মূল সংস্কৃত, প্রত্যেক শ্লোকের অন্বয় ও অর্থ, টানা ব্যাখ্যা এবং টিপ্পনী সহ প্রাঞ্জল হিন্দী-ভাষায় লিখিত কঠ উপনিষদের এই যত্নকৃত সংস্করণটী দেখিয়া আমরা আনন্দ ও তৃপ্তিলাভ করিলাম। শাস্ত্রাদি যাঁহারা বেশী পড়েন নাই তাঁহারা অন্বয় এবং ব্যাখ্যার সাহায্যে মন্ত্রগুলির অর্থ-তাৎপর্য্য মোটামুটী সুন্দর ধারণা করিতে পারিবেন। টিপ্পনীটী অপেক্ষাকৃত অভিজ্ঞ এবং চিন্তাশীল পাঠকবর্গের জন্য, ইহাতে কঠিন শব্দ-সমূহের ব্যাকরণগত সঙ্গতি নির্ণয়ের সহিত সমগ্র বেদান্তশাস্ত্রের বিশদ তুলনামূলক আলোচনা এবং ব্যক্তিগত সাধনার বহু সঙ্কেত সম্পাদক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তথ্যপূর্ণ ভূমিকাটি এবং মন্ত্রের বিষয়সূচী ও টিপ্পনীতে আলোচিত বিষয়সমূহের তালিকা গ্রন্থ-খানির অলঙ্কার বৃদ্ধি করিয়াছে। ছাপা এবং বাঁধাই ভাল। এই পুস্তক হিন্দী জানা পাঠক পাঠিকার নিকট প্রভূত সমাদর লাভ করিবে সন্দেহ নাই। বাংলা ভাষায় কঠ উপনিষদের এই ধরনের একটী সংস্করণ বাহির হওয়া বাঞ্ছনীয়।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

(১) **ব্রহ্মবাদিনী**—১৯৬ পৃষ্ঠা, মূল্য দুই টাকা।

(২) **সমাধান**—১৮৭ পৃষ্ঠা, মূল্য দুই টাকা।

এই বই দুইখানি স্বামী দুর্গাচৈতন্য ভারতী প্রণীত এবং তৎকর্তৃক কাশী, গোবিন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। গ্রন্থকার ইংরাজী ও বাংলায় কয়েক-খানি সরল ধর্মগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। প্রথম আলোচ্য গ্রন্থে মদালসা, কর্কটী রাক্ষসী, সুলভা, গার্গী, লীলা এবং চূড়ালা—এই ছয় জন ব্রহ্মবাদিনীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে। গার্গীর সম্বন্ধে প্রবন্ধটী 'উদ্বোধন' পত্রিকায় এবং অন্যান্যগুলি অন্যান্য মাসিকে প্রকাশিত হইয়াছিল। ছয়টী প্রবন্ধই এত সরল ও সহজভাবে লিখিত যে, স্কুলের ছাত্রীগণ পর্যন্ত পড়িলে বুঝিতে পারিবে। বালিকাবিদ্যালয়ে এই বইখানি পাঠ্য পুস্তকরূপে পঠিত হওয়া উচিত। অতীত যুগে নারীশক্তি কিরূপে ব্রহ্মবিদ্যামণ্ডিতা ছিল ইহা পাঠ করিলে বর্তমান যুগের বঙ্গবালিকা-গণের ব্রহ্মবিদুষী হইবার আকাঙ্ক্ষা জাগিবে। ঋগ্বেদে সাতাইশ জন ব্রহ্মবাদিনীর নাম উল্লিখিত আছে। বৈদিক যুগে নারীরও উপনয়ন-সংস্কার হইত এবং বেদপাঠে অধিকার ছিল; মধ্যযুগে নারীগণ এই অধিকার হইতে বঞ্চিতা হয়। আলোচ্য গ্রন্থে বর্ণিত ব্রহ্মবিদুষীগণের অপূর্ব চরিত্র-কথা নিশ্চয়ই আধুনিক বঙ্গবালা ও বঙ্গনারী-গণের আলোচনীয় ও শিক্ষাপ্রদ হইবে। ব্রহ্মবাদিনী মদালসা তাঁহার পুত্রগণকে এইরূপে বেদান্ত শিক্ষা দিতেন :—

শুদ্ধোঽসি বুদ্ধোঽসি নিরঞ্জনোঽসি
সংসার-মায়া-পরিবর্জিতোঽসি।
সংসার-স্বপ্নং ত্যজ মোহনিদ্রাং
মদালসোল্লাপমুবাচ পুত্রম্॥

"হে পুত্র, তুমি শুদ্ধ, বুদ্ধ, নিরঞ্জন ব্রহ্মস্বরূপ। তুমি সংসার-মায়া-শূন্য। সংসাররূপ স্বপ্নজনক মোহ-নিদ্রা তুমি ত্যাগ কর।" বর্তমান ভারতে কয়জন

নারী স্বীয় সন্তানকে মদালসার মত বলিতে পারেন? গার্গীর আধ্যাত্মিকাটী বৃহদারণ্যক উপনিষদে বর্ণিত। তিনি যে ভাবে ঋষিগণের সহিত ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনা করিতেন তাহা পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। সুলভার বিবরণ মহাভারতে এবং লীলা ও চূড়ালার আখ্যান যোগবাশিষ্ঠে আছে। স্বামী বিবেকানন্দ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, বর্তমান কালে এই দেশে আবার ব্রহ্মবাদিনীগণের আবির্ভাব হইবে। যুগাচার্যের ভবিষ্যদ্বাণী যে সত্য হইবে তাহা এই বই পড়িলে বিশ্বাস হয়।

দ্বিতীয় আলোচ্য গ্রন্থে কয়েকটী মূল্যবান শাস্ত্রীয় সমস্যার সরল সমাধান আছে। দৈব ও পুরুষকার, কাশীপ্রাপ্তের মুক্তি, প্রেতাত্মার দর্শন, গুরুর প্রয়োজনীয়তা, অবতার-তত্ত্ব, মধুসূদন সরস্বতীর ভক্তিবাদ প্রভৃতি বিষয় এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। ধর্মজিজ্ঞাসুর এই সকল বিষয়ে সাধারণতঃ সন্দেহ উপস্থিত হয়। সুতরাং এই সকল বিষয়ের সরল মীমাংসা প্রকাশ করিয়া গ্রন্থকার ধর্মজিজ্ঞাসুর মহোপকার করিয়াছেন। মধুসূদন সরস্বতী ছিলেন বাংলার শ্রেষ্ঠ বৈদান্তিক। এত বড় জ্ঞানী হইয়াও তিনি ভক্তিতত্ত্বের যে মধুর ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা অপূর্ব। অদ্বৈতবাদের সহিত ভক্তিবাদের যে কোন বিরোধ নাই—এই ভাবটী মধুসূদনের "ভক্তিরসায়ন" গ্রন্থে বিশদভাবে ব্যাখ্যাত। জ্ঞান ও ভক্তির যে অপূর্ব সমন্বয় রামপ্রসাদ ও রামকৃষ্ণে দেখা যায়, মধুসূদন বহু পূর্বেই তাহার সুস্পষ্ট আভাস দিয়াছেন। বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, ভারতপ্রসিদ্ধ বাঙ্গালী দার্শনিক মধুসূদনের সম্বন্ধে এ পর্যন্ত বাংলায় কোন পৃথক গ্রন্থ রচিত হয় নাই। তাঁহার জীবনী ও দর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় সাধারণের উপযোগী করিয়া লেখা প্রয়োজন।

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

স্বামী কেদারেশ্বরানন্দজীর দেহত্যাগ—গত ৯ই শ্রাবণ প্রাতে নেত্রামপল্লী (জলারপেট, মাদ্রাজ) রামকৃষ্ণ আশ্রমে স্বামী কেদারেশ্বরানন্দজী কিঞ্চিদধিক ৬০ বৎসর বয়সে রক্তের চাপজনিত রোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন। গত ছয় বৎসর যাবৎ তিনি এই আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন।

স্বামী কেদারেশ্বরানন্দজী দক্ষিণ-ভারতের অধিবাসী ছিলেন। তামিল সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। পূর্বাশ্রমে কর্মব্যপদেশে মালয়ে অবস্থান কালে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের স্বামী শর্বানন্দজীর সম্পর্কে আসেন এবং ১৯২৩ সনে বেলুড় মঠে যোগদান করিয়া শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের নিকট প্রথমতঃ দীক্ষা এবং পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণকালে স্বামী কেদারেশ্বরানন্দজী তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। তিনি সিংহল, উত্তর-ভারত ও হিমালয়ের অনেক তীর্থ পর্যটন করেন।

স্বামী কেদারেশ্বরানন্দজী অত্যন্ত অমায়িক এবং জনপ্রিয় ছিলেন। নেত্রামপল্লীর অধিবাসিগণ তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি তাঁহাদিগকে ধর্মোপদেশ দিতেন। তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টায় গ্রামের চামুণ্ডেশ্বরী দেবীর মন্দির সংস্কৃত হয়।

এই সাধন-ভজনশীল বৈরাগ্যবান্ সন্ন্যাসীর

পরলোকগত আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পাদপদ্মে চির-শান্তি লাভ করুক, ইহাই প্রার্থনা।

দি রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট অব্ কাল্চার (The Ramakrishna Mission Institute of Culture)—১৯৪১-৪৩ সনের কার্য-বিবরণী—ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রীবৃদ্ধিসাধন সম্প্রসারণ ও প্রচার, পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে সাংস্কৃতিক সংযোগ এবং ভাবের আদান-প্রদানমূলে আন্তর্জাতিক মৈত্রী স্থাপন এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। ১৯৩৮ সনে ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং সম্প্রতি ৪নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারে একটি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে ইহার বহুমুখী কার্য পরিচালিত হইতেছে।

আলোচ্য বর্ষে এই প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বিশিষ্ট বক্তাগণ ৪৭টি বক্তৃতা দিয়াছেন। ইহাতে গড়ে ১০২ জন শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানপরিচালিত ছাত্রাবাসে এই কয়বৎসর গড়ে ৯ জন ছাত্র ছিল। ইহাদের মধ্যে ৪ জন এম্-এ, ১ জন এম্-এস্ সি, ৩ জন বি-এ, ৩ জন বি-এস্ সি, ১ জন বি-কম্, ১ জন আই-এস্ সি ও ১ জন ওয়্যারলেস্ টেলিগ্রাফি (wireless telegraphy) পাশ করিয়াছে।

১৯৪১ সনে ডাঃ বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়-প্রদত্ত প্রায় এক লক্ষ টাকা মূল্যের ২৪,৩৭৩ খানা পুস্তকসহ লাইব্রেরীতে মোট ২৫,৭১৯ খানা পুস্তক এবং ১৭টি দৈনিক ও সাময়িক পত্র আছে। দৈনিক গড়ে ২৫ জন পুস্তক ইত্যাদি পাঠ করিয়াছেন।

আলোচ্য বর্ষত্রয়ে বিভিন্ন দেশাগত বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করিয়াছেন। কতিপয় পাশ্চাত্য অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির নিকট বেদান্তসার, সাংখ্যদর্শন, যোগসূত্র প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

এই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত অন্যান্য পুস্তকের মধ্যে 'দি কালচারেল হেরিটেজ্ অব্ ইণ্ডিয়া' (The Cultural Heritage of India) পুস্তকখানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সর্বজনসমাদৃত গ্রন্থখানি ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে অনেকের ভ্রান্ত ধারণা দূর করিতে সাহায্য করিয়াছে।

রামকৃষ্ণ মিশনের এই কেন্দ্রটির বিরাট পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিতে প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা প্রয়োজন। আমরা সহৃদয় বদান্য ব্যক্তিগণকে এই জনহিতকর কার্যে সাহায্য করিতে অনুরোধ করি।

মায়াবতী (আলমোড়া) দাতব্য হাসপাতাল ও ডিসপেন্সারী—১৯৪৫ সনের কার্য-বিবরণী—এই হাসপাতালে ১৩টি স্থায়ী বেড্ আছে। আলোচ্য বর্ষে সময়ে সময়ে বেড্‌সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইয়াছে। এবার ইনডোর বিভাগে ২৬৪ জন রোগীকে চিকিৎসা করা হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে ২৩৫ জন সম্পূর্ণ এবং ১২ জন আংশিক আরোগ্য হইয়াছেন, ১৪ জন চিকিৎসা ত্যাগ করিয়াছেন ও ৩ জন মারা গিয়াছেন। আউট ডোর বিভাগে মোট ১১৩২৮ জন ঔষধ গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে ৮৮৪১ জন নূতন ও ২৪৮৭ জন পুরাতন রোগী ছিলেন।

গত বৎসরের উদ্বৃত্ত সমেত এ বৎসরে এই প্রতিষ্ঠান দুইটির মোট আয় ১৭,২২৭৮৫ পাই এবং মোট ব্যয় ৫২৪৮৶৩পাই।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন, করাচী—১৯৪৪ ও ১৯৪৫ সনের কার্য-বিবরণী—১৯৩৪ সনে করাচীতে রামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মিশনের জনসেবা ও শিক্ষামূলক কর্মপ্রচেষ্টা ১৯৩৯ সন হইতে আরম্ভ হয়। ১৯৩৬ সনে গার্ডেন কোয়ার্টারে স্থায়ী ভূমি ক্রয় করিয়া ১৯৩৭ সনে একটি মন্দির নির্মাণ করা হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানে

নিয়মিতভাবে সাপ্তাহিক গীতা ব্যাখ্যা ও সাময়িক ধর্মালোচনা করা হইতেছে। এতদ্ভিন্ন কৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য, যীশুখৃষ্ট, রামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি উৎসব আশ্রমে উদ্‌যাপিত হয়। আশ্রমাধ্যক্ষ হায়দরাবাদ (সিন্ধু প্রদেশস্থ) রামকৃষ্ণ-সোসাইটিতে প্রতিমাসে দুইবার কঠ উপনিষদের ব্যাখ্যা এবং সিন্ধু প্রদেশের বিভিন্ন স্থানেও প্রচার-কার্য পরিচালনা করেন। অধ্যাপক স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ ও শ্রীমতী কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায় মঠ-প্রাঙ্গণে যথাক্রমে গীতা ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষদ্বয়ের মধ্যে স্বামী রঙ্গনাথানন্দ প্রণীত 'The Message of the Bhagavad Gita' এবং স্বামী বিবেকানন্দের 'Our Women' এই মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

মিশন বিভাগে একটি হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় এবং একটি চক্ষু চিকিৎসাকেন্দ্র পরিচালিত হইতেছে। হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়ে জাতিবর্ণনির্বিশেষে সর্বসমেত ১৯৪৪ সনে ২৭৫৬৭ জন এবং ১৯৪৫ সনে ৩৩৬৩৪ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছেন। এই ঔষধালয়ের জন্য করাচী কর্পোরেশন হইতে প্রথমতঃ বাৎসরিক ৪৫০৲ টাকা, ১৯৪৪ সনে ৫০০৲ টাকা এবং ১৯৪৫ সনে ১০০০৲ টাকা সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। জনৈক অভিজ্ঞ হোমিওপ্যাথ দাতব্য চিকিৎসালয়টি পরিচালন করিতেছেন। চক্ষু চিকিৎসাকেন্দ্র করাচীর কয়েক জন চক্ষুরোগবিশেষজ্ঞ দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। ৫০টি বেড্-সমন্বিত একটি চক্ষু রোগীদের হাসপাতাল নির্মাণের পরিকল্পনা চলিতেছে। উক্ত কেন্দ্রে ১৯৪৪ সনে ১১৭৫২ জন এবং ১৯৪৫ সনে ১১২১০ চক্ষুরোগী চিকিৎসিত হইয়াছেন।

মিশন কর্তৃপক্ষ ভিলদের জন্য দুইটি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালন করিতেছেন। তন্মধ্যে একটি করাচী কর্পোরেশন কর্তৃক প্রথম শ্রেণীর প্রাথমিক বিদ্যালয়রূপে পরিগণিত হইয়াছে। ১৯৪৫ সনের শেষভাগে এই বিদ্যালয়ে ৫০ জন ছাত্র ছিল; তন্মধ্যে ৩৪ জন বালক এবং ১৬ জন বালিকা। ১৯৪৫ সনে অপরটিতে ২৫ জন ছাত্র ছিল। শেষোক্তটি নৈশ বিদ্যালয়।

আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে সপ্তাহে একবার অভিজ্ঞ অধ্যাপক দ্বারা সংস্কৃত শিক্ষাদান করা হইয়াছে। বিবেকানন্দ ফ্রী লাইব্রেরীতে ১৯৪৫ সনে ২৬৭৬ খানা পুস্তক ছিল। ১৯৪৪ ও ১৯৪৫ সনে যথাক্রমে ২৯৯৬ ও ৩৩৬১ খানা বই পাঠার্থ প্রদত্ত হইয়াছিল। রিডিং রুম প্রায় ৫০ খানা দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা দ্বারা সমৃদ্ধ।

আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে বঙ্গদেশ, মালাবার ও অন্যান্য স্থানের দুর্ভিক্ষপীড়িত এবং সিন্ধু প্রদেশের নিম্নভাগের ভূকম্পক্লিষ্ট ও বন্যাপীড়িতদিগকেও নানাভাবে সাহায্য করা হইয়াছে।

মিশনের জনহিতকর কর্মের ব্যাপকতর প্রসারের জন্য পরিকল্পনা চলিতেছে।

১৯৪৪ ও ১৯৪৫ সনে মিশনের মোট আয় যথাক্রমে ১২২৭৬৫॥১০ পাই ও ৩০৫৮২১৺২ পাই এবং মোট ব্যয় ৮০৯১৬/৯ ও ২৩৬৪৬১৺১০ পাই।

কাঁকুড়গাছি শ্রীরামকৃষ্ণ-যোগোদ্যানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের রথযাত্রা—গত ১৫ই আষাঢ় এই প্রতিষ্ঠানে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের রথযাত্রা উৎসব সাড়ম্বরে ও সুষ্ঠুরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পত্রপুষ্পসুসজ্জিত রথোপরি ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতিকৃতি স্থাপন করিয়া নারিকেলডাঙ্গা ষষ্ঠীতলা হইতে রথখানি শোভাযাত্রা ও বাদ্যভাণ্ডসহ যোগোদ্যানে উপস্থিত হয়। ভজন-কীর্তনাদির পর সমবেত ভক্তগণ প্রসাদ গ্রহণ করেন। সাতদিন রথ যোগোদ্যানে অবস্থান করে।

২৩শে আষাঢ় পুনর্যাত্রা উৎসব উপলক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতিকৃতিসহ সুসজ্জিত রথখানিকে নারিকেলডাঙ্গা ষষ্ঠীতলায় আনা হয়। ইহা উল্লেখযোগ্য যে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই রথযাত্রা তাঁহার গৃহী শিষ্য ভক্তপ্রবর মনোমোহন মিত্র মহাশয় ১৯০১ সনে প্রবর্তন করেন; তদবধি সুদীর্ঘ ৪৬ বৎসর বিশেষ আড়ম্বরের সহিত যোগোদ্যানে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে।

নব প্রকাশিত পুস্তক

Thus Spake Vivekananda—মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ হইতে প্রকাশিত। পকেট সাইজ, বাঁধান, ৫৬ পৃষ্ঠা, মূল্য ॥০ আনা।

Thoughts of Power—স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত। স্বামী পবিত্রানন্দ কর্তৃক অদ্বৈত আশ্রম, মায়াবতী (আলমোড়া) হইতে প্রকাশিত। পকেট সাইজ, বাঁধান, ৭৬ পৃষ্ঠা, মূল্য ॥০ আনা।

বিবিধ সংবাদ

বিবেকানন্দ সোসাইটি, কলিকাতা—গত ২১শে, ২৮শে আষাঢ় ও ৪ঠা, ১১ই, ১৮ই ও ২৫শে শ্রাবণ এই প্রতিষ্ঠানে স্বামী সুন্দরানন্দজী 'স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশ-প্রেম ও মুক্তির আদর্শ', 'স্বামী বিবেকানন্দের নর-নারায়ণবাদ', 'বৌদ্ধধর্মের প্রগতি', 'স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজের জীবনী', 'ভারতের সাংস্কৃতিক ঐক্য' ও 'ধর্মের আবশ্যকতা' সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। গত ২৯শে আষাঢ় ও ৫ই শ্রাবণ শ্রীযুক্ত রমণীকুমার দত্ত গুপ্ত মহাশয় 'গুরুবাদ' এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত-সঙ্কলয়িতা 'ভক্ত মহেন্দ্র গুপ্ত' (শ্রীম) সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দিয়াছেন।

বন্যাসেবাকার্যে রামকৃষ্ণ মিশনের আবেদন

রামকৃষ্ণ মিশন আসামের কাছাড় জেলায় ভাঙ্গারপার অঞ্চলে বন্যা-সেবাকার্য আরম্ভ করিবার জন্য সেবকগণকে প্রেরণ করিয়াছেন এবং চট্টগ্রামে রাওজান থানার অন্তর্গত বাগোয়ান ইউনিয়নে গৃহনির্মাণ কার্য আরম্ভ করিয়াছেন। এই অঞ্চলদ্বয় বন্যায় বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। অর্থসঙ্কুলান হইলে মিশন চট্টগ্রামের অন্যান্য থানার ইউনিয়নসমূহেও কার্য আরম্ভ করিবেন। বহুসংখ্যক গৃহ বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে এবং অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এই জন্য খরচ খুব বেশী পড়িবে। উভয় জেলার সেবাকার্য সফলতার সহিত পরিচালন করিবার জন্য সহৃদয় জনসাধারণের সাহায্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় সাদরে গৃহীত হইবে:—(১) সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা—হাওড়া; (২) কার্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১নং উদ্বোধন লেন, বাগবাজার কলিকাতা; (৩) কার্যাধ্যক্ষ, অদ্বৈতআশ্রম, ৪নং ওয়েলিংটন লেন, কলিকাতা।

স্বাঃ স্বামী মাধবানন্দ
সম্পাদক

উদ্বোধন

শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্ব

শ্রীযতীন চাঁদ মিত্র

যিনি গুরু ও শাস্ত্রের উপদেশে মন্ত্র, তপস্যা, সমাধি প্রভৃতি উপায় অবগত হইয়া শ্রদ্ধা সহকারে যথাবিধি সাধন করেন, তিনি দেবতাকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। সকল দুঃখের নিবৃত্তি বা নিত্য সুখরূপ পরম পুরুষার্থ লাভের জন্যই দেবতা সাক্ষাৎকার আবশ্যক। দুঃখনিবৃত্তি বা সুখপ্রাপ্তির ইচ্ছা প্রাণিমাত্রেরই বাঞ্ছিত হইলেও সকল দুঃখের নিবৃত্তি বা নিত্য সুখের জন্য নিশ্চিত উপায় অবলম্বনের ইচ্ছা সংসার-বিরক্ত মোক্ষাধিকারী ভাগ্যবানের চিত্তেই উদিত হইয়া থাকে। মুক্তিকাম শিষ্য দুঃখনাশের জন্য গুরুর উপদেশ অনুসারে সাধন করেন। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে মেধসের সহিত রাজ্যভ্রষ্ট সুরথের ধর্ম্মালোচনায় শক্তিসাধনার পরাকাষ্ঠা দেখা যায়। এই গ্রন্থে চণ্ডিকাদেবীর স্বরূপ এবং তাঁহার সাধন-পদ্ধতি লিপিবদ্ধ আছে। ইহাতে সুরথ ও সমাধিকে অবলম্বন করিয়া মহর্ষি মেধস দেবী-উপাসনার যে প্রণালী বর্ণনা করিয়াছেন উহাই জীবের সর্ব্ব দুঃখ নিবৃত্তির সর্ব্বোত্তম উপায়। ভাগ্যবান সুরথ ও সমাধি মাত্র তিনটী বৎসর সংযত চিত্তে শক্তিস্বরূপা শ্রীশ্রীচণ্ডিকার আরাধনা করিয়া কেবল তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করেন নাই, পরন্তু তাঁহার সহিত মাতাপুত্রের ন্যায় সম্বন্ধ স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়া সুদুর্লভ বরও লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা মহর্ষি মেধসকে গুরুপদে বরণ করিয়া তাঁহার নির্দ্ধারিত পথে কঠোর তপস্যায় ব্রতী হইয়াছিলেন। বর্ষত্রয় আরাধনার ফলে অপ্রত্যক্ষা মহাদেবী তাঁহাদের প্রত্যক্ষা হইয়াছিলেন। মহর্ষি মেধসের শাস্ত্রসম্মত উপদেশে বিশ্বাস—যাহা শ্রদ্ধা নামে প্রসিদ্ধ উহাই অভীষ্ট সিদ্ধির উপায় হইয়াছিল। সুরথ ও সমাধি এই দুইটী শ্রেষ্ঠ উপায় অবলম্বন করিয়াই অতি দ্রুত সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

এই নশ্বর বিশ্বের অসারতা প্রত্যক্ষ করিয়াই সুরথ মহর্ষির নিকট প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়াছিলেন। শক্তিরূপা মায়া ব্রহ্মাণ্ডের সকল প্রাণীকেই মহামোহগর্ত্তে নিক্ষেপ করিয়াছেন। পুত্র-পশু-বিত্ত প্রভৃতির প্রতি মমত্ব মায়ার কার্য্য। মায়ানাশের জন্য বৈরাগ্য আবশ্যক। পূর্ব্বকর্ম্মসঞ্চিত সকল পাপ নিঃশেষ হইলে বৈরাগ্যের আবির্ভাব হয়। জন্মান্তরীয় পাপক্ষয়ই বৈরাগ্যের হেতু। বিগত যে রাগ তাহা বিরাগ—তাহাই বৈরাগ্য। আকাঙ্ক্ষা, আসক্তি, ইচ্ছা, কাম প্রভৃতি রাগের পর্য্যায়। "সুখানুশয়ী রাগঃ" (পাতঞ্জল দর্শন) —সুখাভিজ্ঞ জনের সুখে ও সুখের উপায়ে যে আকাঙ্ক্ষা তাহাই রাগ। সুখের প্রত্যক্ষ হইলে 'ইহা সুখের উপায়' এইরূপ জ্ঞান জন্মিলে ঐ সুখ ও সুখের উপায় আমার হউক এইরূপ

আকাঙ্ক্ষা অবশ্যই হইয়া থাকে। ঐরূপ আকাঙ্ক্ষার একান্ত সমাপ্তিকে বৈরাগ্য বলা হয়। মহর্ষি পতঞ্জলি বলিতেছেন—"দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্", "তৎ পরং পুরুষখ্যাতে-র্গুণবৈতৃষ্ণ্যম্" দৃষ্ট এই সংসারে উপলভ্য শব্দ-স্পর্শরূপরসগন্ধাদি ও বেদপ্রাপ্ত স্বর্গাদি বিষয়ে যাঁহার তৃষ্ণা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছে, সেই ভাগ্যবান পুরুষের যে বশীকার সংজ্ঞা অর্থাৎ লৌকিক ও অলৌকিক সমস্ত বিষয়ই 'আমার অধীন, আমি কিন্তু উহাদের অধীন নহি', এইরূপ যে জ্ঞান, তাহাই বৈরাগ্য। একেন্দ্রিয় সংজ্ঞা, যতমান সংজ্ঞা, ব্যতিরেক সংজ্ঞা ও বশীকার সংজ্ঞা এই চতুর্ব্বিধ সংজ্ঞামধ্যে চতুর্থ সংজ্ঞাই বৈরাগ্য। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংজ্ঞাগুলি বৈরাগ্যের পূর্ব্বরূপ, উহাতে একৈকশঃ কতকগুলি বিশেষ বিষয় হইতে আকাঙ্ক্ষার সমাপ্তি ঘটিয়াছে, ঘটিতেছে ও ঘটিবে। বিশুদ্ধচিত্ত যোগী ঐরূপ বিচারদ্বারা ক্রমে প্রকৃত বৈরাগ্যলাভ করিয়া থাকেন। সেইজন্য বিচাররত যোগীকেও বিরক্ত বলিয়া উল্লেখ করা হয়। গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপ প্রকৃতি ও তৎকার্য্য-ভূত ভৌতিক বিষয়সমূহ পুরুষাখ্য জ্ঞানরূপ নিত্য আত্মা হইতে ভিন্ন, এইরূপ তত্ত্বসাক্ষাৎকার সাংখ্য-পাতঞ্জল মতে মুক্তির উপায়। উহা যিনি লাভ করিয়াছেন তাঁহার যে গুণত্রয়ের প্রতি তৃষ্ণার একান্ত অবসান তাহাই পরবৈরাগ্য, তাহাই মুক্তির সাক্ষাৎ উপায়। পরবৈরাগ্য অর্থাৎ প্রকৃতিতেও বিতৃষ্ণা—বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা—সর্ব্ববিধ সাধনার শেষ ফল। উহা যিনি লাভ করিয়াছেন তিনি জ্ঞানরূপ নিত্য আত্মার স্বরূপে অবস্থিত, দুঃখাত্মক সর্ব্ববিধ জড়সম্পর্কশূন্য মুক্ত।

মুক্তিলাভের জন্য বৈরাগ্যের ন্যায় শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা ও সমাধি লাভ করা একান্ত আবশ্যক। অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ শম, বহিরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ দম, বিষয় হইতে নিবর্ত্তিত ইন্দ্রিয়সমূহের বিধিপূর্ব্বক কর্ম্মত্যাগ উপরতি, শীত উষ্ণাদি দ্বন্দ্বসহন তিতিক্ষা, চিত্তের একাগ্রতা সমাধি। শমদমাদি ষট্‌সম্পত্তি পর্য্যন্ত সকল সামগ্রী যে সমাধি নামক বৈশ্য লাভ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার সিদ্ধি হইতেই নিশ্চিত হইতেছে। পরন্তু সাম্রাজ্যের আশায় চালিত সুরথ মোক্ষা-ধিকার লাভে অসমর্থ বলিয়াই সমাধির সহিত একরূপ সাধনায় নিযুক্ত হইয়াও অপহৃত নিজ রাজ্য দেহেন্দ্রিয় প্রভৃতি যে কোন জড়বস্তুই আমি, এইরূপ ভ্রম তাঁহার উৎপন্ন হইলে আমার স্বর্গ, আমার বিত্ত, আমার পুত্র, আমার দেহ ও গৃহ প্রভৃতি অতি বিচিত্র অগণিত মোহ আবির্ভূত হইয়া ছিল। তত্ত্ববোধরূপ প্রখর ভাস্কর ঐ মহামোহ তিমিরে একান্ত ভাবে আবৃত বলিয়াই হতভাগ্য জীব আপনাকে চিনিতে পারে না। বসুধা হইতেও মহীয়ান ভাস্কর অতি ক্ষুদ্র মেঘখণ্ডে আবৃত বলিয়া মনে করা যেমন ভ্রান্তি, গুণক্রিয়াদি সকল জড়সম্পর্কবর্জ্জিত নিত্যমুক্ত আত্মাকে কর্ত্তা ভোক্তা সুখী দুঃখী কিম্বা আত্মার সুখ, দুঃখ, দেহ, গৃহ, পুত্র ও বিত্তাদি যে কোন ধর্ম্ম-স্বীকার করা অর্থাৎ আমি ধর্ম্মী বা আমার ধর্ম্ম এইরূপ মনে করাও ভ্রান্তি। অজ্ঞান, মায়া, মোহ প্রভৃতি ভ্রান্তিরই নামান্তর।

মোহের দুইটী শক্তি—"আবরণ" ও "বিক্ষেপ"। আবরণশক্তির দ্বারা আত্মার স্বরূপ আবৃত হইলে বিক্ষেপশক্তি মোহাবৃত আত্মাতে দুঃখরূপ এই সংসার রচনা করিয়া থাকে। এইরূপে জীব দুরন্ত সংসার মোহগর্ত্তে নিপতিত হইয়া মমত্বরূপ নিদারুণ আবর্ত্তে চক্রের মত নিরন্তর আবর্ত্তিত হইয়া অলীক কল্পিত কত শত সহস্র যন্ত্রণাই না ভোগ করিতেছে! আমি কর্ত্তা, আমার কর্ম্ম ইত্যাদিরূপ মোহকার্য্যে আবদ্ধ হইয়া নিজকৃত কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য ক্রিমিকীট হইতে ব্রহ্মান্ত সকলই সংসারগতি

অনুসরণ করিতেছে। এইরূপে সংসারে ভাসমান তৃণখণ্ডের মত কর্ম্মতন্ত্র জীব কোথায় কেন চলিয়াছে তাহাও জানিতে পারে না। সে বিধি-নিষেধ পালনে অসমর্থ হইয়া সতত পাপ অর্জ্জন করিতেছে এবং পাপফল দুঃখ ভোগ করিতেছে। তামস, রাজস ও রজস্তমঃপ্রধান বিভিন্ন প্রকার জীব সুখদুঃখাদির বাস্তবরূপ বুঝিতে অসমর্থ হইয়া দুঃখকেই সুখ এবং সুখকেই দুঃখ বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকে। সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ না হইলে জ্ঞান লাভের কোনই সম্ভাবনা নাই। রজোগুণ বা তমোগুণের প্রাচুর্য্যদশায় অজ্ঞানের আধিক্য সুনিশ্চিত। অনিত্য, অশুচি, অনাত্মা, অপুণ্য, অনর্থ ও দুঃখকে যথাক্রমে নিত্য, শুচি, আত্মা, পুণ্য, অর্থ ও সুখ বলিয়া মনে করা—অজ্ঞান। ফলতঃ ঐগুলি অজ্ঞানের উপলক্ষণ; পরন্তু যে যাহা নহে কিম্বা যাহাতে যাহা নাই তাহাকেই তাহা কিম্বা তাহাতেই তাহার বোধ অজ্ঞান—ইহা মিথ্যা জ্ঞান, মায়া, অবিদ্যা নামে পরিচিত। অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ অজ্ঞানের কার্য্য। অজ্ঞান ও তৎকার্য্যের পরিপূর্ণ নির্দ্দেশ অসম্ভব। অদ্বৈত বেদান্তন্যায়ে—অজ্ঞান ও তৎ-কার্য্যরূপ এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড—দৃশ্যাদৃশ্য সমস্ত জড়ভাগ সত্য বা মিথ্যারূপে নির্ব্বচনের অযোগ্য অলীক মাত্র। অজ্ঞানের অগণিত কার্য্য-মধ্যে দেহেন্দ্রিয়াদি যে কোন জড়ভাগকে আত্মা অর্থাৎ আমি, এইরূপ যে ভ্রম এবং ঐ ভ্রম বশতঃ আমার পুত্র, বিত্ত, লোক ইত্যাদি যে ভ্রম, সেই ভ্রম হইতেই জন্মমরণঘটিত দুঃখাত্মক সংসার আবির্ভূত হয়। মায়াকার্য্য এই সংসাররূপ মহাবন্ধনে আবদ্ধ জীব ত্রিগুণাত্মক অজ্ঞানের রজস্তমোভাগ দূর করিয়া সত্ত্বগুণাংশে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য বৈধকর্ম্মের অনুষ্ঠানে ও নিষিদ্ধ কর্ম্মের বর্জ্জনে অধিকারী হইয়া থাকে। পাপক্ষয়সাধন প্রায়শ্চিত্তাদি কর্ম্মে নিযুক্ত ভাগ্যবান পুরুষ পাপক্ষয় ও পুণ্যার্জ্জন দ্বারা চিত্তকে একান্ত পরিশুদ্ধ করিয়া জ্ঞান লাভে সমর্থ। 'জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্ম্মণঃ' —পাপক্ষয় হইলে জীবের জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রচুর পাপ থাকিতে বৈরাগ্যের কোনই সম্ভাবনা নাই। জন্মজন্মান্তরীয় পাপের ক্ষয় হইতে বা শোক হইতে বৈরাগ্যের উদয় হয়। জন্মান্তরে সূর্য্য হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়া সাবর্ণি মনু বররূপে বিশ্বের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন।

ন্যূনাধিক ভোগরূপ ফল হইতে মুক্তিরূপ চরম ফল পাইবার জন্য যাঁহারা একান্ত আগ্রহ-বান এবং সেই সেই ফল লাভে অধিকারী, সেই সকল বিভিন্ন অধিকারীর জন্য শ্রুতি-স্মৃতি-সম্মত যে বিভিন্ন উপায় তাহা একান্ত কঠোর ও অতি দীর্ঘকালসাধ্য। জন্ম, কর্ম্ম, সংস্কার ও বিদ্যাশক্তি প্রভৃতি অতীত যুগ হইতে ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাওয়ায় আধুনিক জনগণ পূর্ব্বের মত অধিকার ও তপস্যাফলাদি সংগ্রহে সম্পূর্ণ অসমর্থ। এই পাপপ্রধান কালে অল্প সময়ে অত্যল্প তপস্যা দ্বারা অনায়াসে সংসার-দুঃখ-সাগর পার হইবার জন্য যে সুনিশ্চিত উপায় তাহারা তাহাই কেবল আশ্রয় করিতে পারে। মহর্ষি মেধা সুরথ ও সমাধির সর্ব্বা-ভীষ্ট লাভের জন্য শ্রীশ্রীচণ্ডিকার আরাধনারূপ একান্ত সুলভ, অত্যল্প কালসাধ্য মাতৃভাব-মধুর যে সর্ব্বোত্তম উপায় কল্পাধিক কাল পূর্ব্বে উপদেশ করিয়াছিলেন, মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত শ্রীশ্রীদেবীমাহাত্ম্য হইতে উহা জানিতে পারা যায়। জ্ঞান, কর্ম্ম ও উপাসনা রূপ ত্রিকাণ্ড বেদপ্রধান ভাবে দুঃখনিবৃত্তি ও সুখ লাভের জন্য অধিকারী ভেদে যে বিভিন্ন উপায় উপদেশ করিয়াছেন, পুরাণাদিবর্ণিত উপায়সমূহ তাহার বিরোধী নহে, কিম্বা তাহা হইতে অত্যন্ত ভিন্নও নহে।

মহর্ষি প্রণীত পুরাণ সংহিতাদি শাস্ত্রসমূহ বেদের যে যে অংশ বিলুপ্ত হইয়াছে ঐ সকল অংশের প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহ উপদেশ করিতেছে। সর্ব্বজ্ঞ মহর্ষিগণ প্রণীত শাস্ত্ররাশি সর্ব্বতোভাবে বেদার্থকেই নির্দ্দেশ করে। "পুরাপি অনিতীতি পুরাণম্'—পূর্ব্বেও ছিল ইহাই পুরাণ পদের অর্থ। পূর্ব্ব হইতে অর্থাৎ অনাদি কাল হইতে পুরাণ নামে যে শাস্ত্র প্রচলিত ছিল, মহর্ষি বেদব্যাস তাহাই অবলম্বন করিয়া অষ্টাদশ মহাপুরাণ বিস্তৃত ভাবে রচনা করিয়াছেন। মহর্ষি বেদব্যাসের অবলম্বন সেই প্রাচীন পুরাণ অধুনা লুপ্ত। বেদে বহু স্থলে পুরাণশাস্ত্রের উল্লেখ আছে। ছান্দোগ্য শ্রুতিতে দেবর্ষি নারদ ব্রহ্মবিদ্‌বরিষ্ঠ সনৎকুমারের নিকট নিজ শাস্ত্রজ্ঞান বর্ণনাপ্রসঙ্গে পুরাণশাস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। যে যুক্তিরাশি বেদের নিত্যতা প্রতিষ্ঠা করিতেছে তাহা হইতে পুরাণাদি শাস্ত্রের নিত্যতাও সিদ্ধ হইতেছে। অধুনা প্রচলিত অষ্টাদশ মহাপুরাণ শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত। "অষ্টাদশ পুরাণানাং কর্ত্তা সত্যবতীসুতঃ" ইত্যাদি বচন ঐ বিষয়ে প্রমাণ। প্রচলিত উপপুরাণসমূহও তাঁহার কৃত। বিধিপ্রাপ্ত কর্ম্ম ও ঐ কর্ম্মজনিত পুণ্য প্রধানতঃ ধর্ম্ম নামে প্রসিদ্ধ। "ধারণাদ্ধর্ম্মমিত্যাহুর্ধর্ম্মো ধারয়তে প্রজাঃ"—ইত্যাদি লক্ষণানুসারে যাহা এই ধরাকে ধারণ করিতেছে, রক্ষা করিতেছে ও পোষণ করিতেছে তাহাই ধর্ম্ম ; এইরূপ অনুগত অর্থ অবলম্বন করিলে জীবের সকল ফল, সমস্ত সিদ্ধিকেই ধর্ম্ম নামে নির্দ্দেশ করা যায়। ঐরূপ নির্দ্দেশও শাস্ত্রে আছে। ধর্ম্মের অবিরোধী অর্থ ও কাম ধর্ম্মের মতই জীবের প্রয়োজন অর্থাৎ ফল ; পরম প্রয়োজনের নাম মোক্ষ। প্রাক্তন কর্ম্ম ও জ্ঞান যে জীবের যেমন, সেই জীব তদনুসারে এই জন্ম, তদুচিত আয়ু ও ভোগ লাভ করিয়া উক্ত চতুর্ব্বিধ প্রয়োজন মধ্যে একটী, দুইটী বা ততোধিক পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে বা অংশতঃ পাইবার জন্য যথা সম্ভব কায়িক, বাচিক ও মানসিক চেষ্টারূপ ক্রিয়া করিয়া থাকে। জীবের ঐ প্রয়োজন পুরুষার্থ নামে প্রসিদ্ধ। যে জীব যেরূপ ফললাভে অধিকারী, সে তাহাই পাইয়া থাকে। যে ফলে যাহার অধিকার নাই, সে তাহা পাইতে পারে না, ইহাই সিদ্ধান্ত।

শক্তির বোধন

শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ

সর্বভূতে শক্তিরূপা নমো বিশ্বমাতা,
মৃত্যুরূপা মহাকালী, অনল-বারতা
সঞ্চারিত কর আজি শক্তিহীন মনে,
বিপ্লবের মহামন্ত্র সুপ্তিলীন প্রাণে
স্পন্দিত ধ্বনিত কর ভৈরব ঝংকার
দূর করে দাও সব ভয় আশংকার।

কামাখ্যা

সম্পাদক

কামাখ্যা হিন্দুদের একটি প্রধান তীর্থক্ষেত্র। ইহা প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত। এই জন্য ইহার অপর নাম কামরূপ-কামাখ্যা। এই তীর্থস্থানটি গৌহাটি শহরের তিন মাইল পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে নীলাচল পাহাড়ে অবস্থিত। এই পাহাড়টি ঋজু এবং ৭৫০ ফুট উচ্চ। ইহার শীর্ষদেশে কামাখ্যা দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত। ইহা একান্ন পীঠের অন্যতম মহাপীঠ। এখানে সতীর স্ত্রী-অঙ্গ পতিত হইয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। এই মন্দিরে প্রস্তররূপী দেবী কামাখ্যা বিশেষ আড়ম্বর সহকারে নিত্য পূজিতা। মন্দিরটি আয়তনে বৃহৎ না হইলেও সুদৃশ্য। ইহার শীর্ষে ডিম্বাকৃতি একটি বড় গম্বুজের চারিদিকে ছোট ছোট বুরুজ আছে। মন্দিরের দেয়ালে উৎকীর্ণ নানারূপ অংগভংগীযুক্ত কয়েকটি সুদৃশ্য মূর্তি এবং বাস্-রিলিফ্ (bas-relief) বিদ্যমান। নীলাচল পাহাড়ের শীর্ষস্থান হইতে ব্রহ্মপুত্র নদ ও চারিদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম। এই পাহাড়ে কামাখ্যা দেবীর মন্দির ভিন্ন আরও চৌদ্দটি মন্দির আছে। ইহাদের মধ্যে ভুবনেশ্বরী দেবী ও সিদ্ধেশ্বর মহাদেবের মন্দির দুইটি উল্লেখ-যোগ্য। এতদ্ব্যতীত অদূরে ব্রহ্মপুত্র নদের মাঝখানে অবস্থিত উমানন্দ দ্বীপে উমানন্দ মহাদেবের মন্দির এবং কামাখ্যা হইতে দশ মাইল দূরে বশিষ্ঠাশ্রমের অনুপম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দর্শনীয়।

কামাখ্যা দেবীর মন্দির প্রথম নির্মিত হয় মহাভারতোক্ত বিখ্যাত বীর রাজা ভগদত্তের পিতা রাজা নরকাসুরের আদেশে। এই অসুররাজ প্রথম জীবনে অতিশয় ধার্মিক ছিলেন; পরে তিনি ঐশ্বর্য ও ক্ষমতা মদমত্ত হইয়া অত্যন্ত অধার্মিক ও উচ্ছৃঙ্খল হন। কথিত আছে যে, তিনি দেবী কামাখ্যাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করেন। দেবী বলেন যে যদি নরকাসুর এক রাত্রির মধ্যে নীলাচল পাহাড়ের উপর পীঠস্থানে তাঁহার জন্য একটি মন্দির, একটি পুষ্করিণী ও পাহাড়ে আরোহণ করিবার একটি প্রশস্ত রাস্তা তৈরি করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহার সঙ্গে বিবাহ হইতে পারে। রাজা নরকাসুর এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বহু লোক নিযুক্ত করিয়া এক রাত্রির মধ্যেই এই তিনটি কার্য প্রায় সম্পন্ন করেন। কিন্তু প্রভাতের কিছু পূর্বে দেবীর চেষ্টায় একটি কুক্কুট ডাকে এবং তিনি উহাকেই প্রভাতের নিদর্শন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া অঙ্গীকারভঙ্গের অজুহাতে নরকাসুরকে বিবাহ করিতে অসম্মত হন। ইহাতে নরকাসুর ক্রোধান্বিত হইয়া কুক্কুটটিকে মারিয়া ফেলেন। যে স্থানে এই ঘটনা হইয়াছিল সেই স্থানটি অদ্যাবধি 'কুকুটকটা' নামে অভিহিত, এইরূপ প্রবাদ আছে। কালের আক্রমণে নরকাসুরস্থাপিত কামাখ্যা মন্দির ধ্বংসমুখে পতিত হয় এবং এই স্থানটি অরণ্যাবৃত হইয়া দীর্ঘকাল লোকচক্ষুর অন্তরালে অবস্থান করে। রাজা নরক যে পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন উহা ইদানীং শুকাইয়া গিয়াছে কিন্তু তিনি যে প্রশস্ত রাস্তাটি তৈরি করাইয়াছিলেন উহা বর্তমানেও বিদ্যমান।

অতঃপর খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে আসামের কোচ রাজ্যের রাজা বিশ্বসিংহ কামাখ্যা মহাপীঠের মাহাত্ম্য অবগত হইয়া এই স্থানে একটি মন্দির

নির্মাণ করান। ইহার অল্পকাল পরেই বাংলার সুলতান করবানীর সৈন্যাধ্যক্ষ কালাপাহাড় এই মন্দিরটিকে ধ্বংস করেন। পরে রাজা বিশ্বসিংহের পুত্র কামরূপ রাজ্যের রাজা নরনারায়ণের চেষ্টায় এই মন্দিরটি পুনর্নির্মিত হয়। ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, বর্তমান কোচবিহার তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি দেশ-বিদেশ হইতে বহু অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া কামাখ্যা মন্দিরে বিশেষ জাঁকজমক সহকারে নানাবিধ তান্ত্রিক ক্রিয়া ও উৎসবাদি নির্বাহ করিয়াছিলেন। এই পীঠস্থানে প্রতিবৎসর দুর্গাপূজা ও অম্বুবাচির সময়ে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে অনেক তীর্থযাত্রী সমবেত হইয়া থাকেন।

প্রাচীন কাল হইতে তান্ত্রিক সাধন ও ক্রিয়া-কর্মের প্রধান ক্ষেত্ররূপে কামরূপ-কামাখ্যার খ্যাতি ভারতের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। মারণ উচাটন বশীকরণ মন্ত্রশক্তি যাদুবিদ্যা রাহস্যিকসাধন প্রভৃতির জন্যও এই তীর্থক্ষেত্রের যথেষ্ট সুনাম ছিল। বর্তমানে এই সকল বিষয়ে কামাখ্যার পূর্বগৌরব ম্লান হইলেও তান্ত্রিক সাধনার প্রধান ক্ষেত্ররূপে অদ্যাবধি সাধারণে ইহার যথেষ্ট প্রভাব আছে। বাংলায় মুসলমান প্রভাব-প্লাবনের প্রথম যুগে কামরূপ রাজ্যে তান্ত্রিকতার প্রাধান্য ছিল। এই সময়ে বিশুদ্ধ হিন্দুতান্ত্রিকতার সহিত বামাচার পাশাপাশি বিস্তার লাভ করে। তখন বামাচারীদের মধ্যে অনেক উন্নতশ্রেণীর সাধক ছিলেন। তাঁহাদের শিব-শক্তি-যোগানন্দ সাধন-পদ্ধতি বাহ্য দৃষ্টিতে অসংযম ও প্রবৃত্তিমূলক হইলেও উহা প্রকৃত পক্ষে সংযম ও নিবৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁহারা বলিতেন, "যেনৈব নরকং যাতি তেনৈব স্বর্গমাপ্নুয়াৎ।" —'যে কার্য (প্রবৃত্তি পথে) করিলে লোকে নরকে যায়, সেই কার্য (নিবৃত্তি-পথে) করিলে স্বর্গে গমন করে।' অবশ্য নিবৃত্তি-পথে বামাচার সাধন করা খুব কঠিন। কারণ, ইহা অতি সহজেই সাধককে প্রবৃত্তি-পথে চালিত করিয়া তাঁহার অধঃপতন ঘটাইতে পারে। এইজন্য উচ্চশ্রেণীর অধিকারী ভিন্ন কাহারও পক্ষে বামাচার সাধন করা সঙ্গত নয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, বাংলা ও কামরূপ রাজ্যে মুসলমান প্রভাব বিস্তারের প্রথম দিকে সাধারণের মধ্যে নিবৃত্তির আবরণে প্রবৃত্তি-পথে বামাচার সাধন প্রচলিত থাকায় তৎকালীন সমাজে অসংযম উচ্ছৃঙ্খলতা ও দুর্নীতি অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, মুসলমানদের প্রাধান্য বিস্তারের পূর্ব হইতেই উড়িষ্যা বাংলা ও আসামে হিন্দুতান্ত্রিকতার অনুকরণে মন্ত্রযান বজ্রযান কাল-চক্রযান সহযান প্রমুখ বামাচারী বৌদ্ধতান্ত্রিক সম্প্রদায় প্রভাব বিস্তার করে। ইহাদের দ্বারা হিন্দুতান্ত্রিক সম্প্রদায়ও বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে হিন্দুতন্ত্র ও বৌদ্ধতন্ত্র এবং হিন্দুবামাচার ও বৌদ্ধবামাচারের পার্থক্য নির্ণয় করা খুব কঠিন হইয়া পড়ে। মন্ত্রযানিগণ হিন্দু-তন্ত্রোক্ত আদ্যাশক্তি কালী ও শিবের স্থলে যথাক্রমে মহাযান বৌদ্ধ মতোক্ত মহাশূন্যরূপিণী আদিমাতা ও আদিবুদ্ধকে অধিষ্ঠিত করিয়া এক অভিনব তান্ত্রিক মতে উপাসনা করিতেন। এই আদিমাতা—বৌদ্ধমাতা প্রজ্ঞাপারমিতা এবং আদিবুদ্ধ লোকোত্তর-বুদ্ধ ধ্যানিবুদ্ধ অবলোকিতেশ্বর শূন্যব্রহ্ম শূন্যমহাপ্রভু ধর্মকায়বুদ্ধ প্রভৃতি নামে অভিহিত। মন্ত্রযানিগণ রাহস্যিক মন্ত্রজপের উপর খুব জোর দিতেন। বজ্রযানিগণ হিন্দুতন্ত্রোক্ত শিব ও শক্তির স্থলে যথাক্রমে মহাযানোক্ত নিরাত্মাদেবী ও অপ্রাকৃত বুদ্ধকে অধিষ্ঠিত করিয়া এক নূতন তান্ত্রিক মতে উপা-সনা করিতেন। ইঁহাদের মতে অরূপ লোকের ঊর্ধ্ব-স্থিত নিরাত্মাদেবী ও অপ্রাকৃত বুদ্ধের সহযোগে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। বামাচারীদের ন্যায় শক্তি গ্রহণ করিয়া সাধন মন্ত্রযানী এবং বজ্রযানীদের বিশেষত্ব ছিল।

সাধনসহায়ে দেবীর কৃপায় মহাশূন্য বা অসীম শূন্যত্বে লয়প্রাপ্তিই উভয় শ্রেণীর সাধকদের লক্ষ্য। পরবর্তী কালে মন্ত্রযান ও বজ্রযানের উৎকট বামাচার কালচক্রযানে পরিণত হয়। কালচক্রের অপর নাম বিনাশচক্র। শক্তি গ্রহণ করিয়া মদ্য মাংস সহযোগে সাধন এই সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য। এই সাধনকে পিশাচ উপাসনাও (demon worship) বলা হইত। ডাক-ডাকিনী ও পিশাচের কৃপায় মহাশূন্যে লয়প্রাপ্তি ইঁহাদের আদর্শ। কালচক্রযানীদের মতে বুদ্ধ একজন পিশাচ! বৌদ্ধ সহযানিগণও বামাচারীদের ন্যায় শক্তি গ্রহণ করিয়া তান্ত্রিক মতে সাধন করিতেন। পরে এই সম্প্রদায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব সহজিয়া, বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী বা নেড়ানেড়ী নামে রাধাকৃষ্ণের মধুর ভাবে উপাসনা করিতে আরম্ভ করেন। তান্ত্রিকতার প্রধান ক্ষেত্র কামরূপ-কামাখ্যায় হিন্দুতান্ত্রিকতার সহিত বৌদ্ধতান্ত্রিকতা—বিশেষ করিয়া হিন্দুবামাচারের সহিত বৌদ্ধবামাচারের সংমিশ্রণ যে খুব বেশী হইয়াছিল ইহাতে আর সন্দেহ নাই। কামরূপ-কামাখ্যার এই তান্ত্রিকতার প্রভাব সমগ্র আসামে—এমন কি নাগা কুকি খাসিয়া জয়ন্তিয়া গাড়ো প্রভৃতি পার্বত্য জাতির মধ্যেও কতকটা বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

বাংলায় প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের কিছু কাল পূর্বে কামরূপ রাজ্যে শ্রীশংকরদেব আবির্ভূত হইয়া বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন। ইহার ফলে কামরূপে তান্ত্রিক বামাচারের প্রভাব অনেকটা কমিয়া যায়। পরবর্তী কালে বাংলার গৌড়ীয় বৈষ্ণব প্রচারকগণের প্রচারপ্রভাবে কামরূপ রাজ্যের অধিকাংশ নরনারীই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেন। এই সময়ে এই রাজ্যের পরিধি পশ্চিমে পূর্ণিয়া পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল। আসামে বৈষ্ণব ধর্মের ব্যাপক প্রচার-প্রভাবে মণিপুর রাজ্যের হিন্দুগণ ও কতিপয় পার্বত্য জাতি ইহার দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত হয়। বর্তমানে আসামে অসমীয়া হিন্দুদের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্মের প্রাধান্য থাকিলেও হিন্দুতান্ত্রিকতার প্রভাবও নগণ্য নহে।

শ্রীম-স্মৃতি

অধ্যাপক শ্রীগোকুলদাস দে

গৃহস্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যে যে কয়জন অদ্ভুত পুরুষ দেখিয়াছি পূজ্যপাদ শ্রীম তাঁহাদের অন্যতম। অদ্ভুত অর্থে বুঝিতে হইবে—ইঁহাদের চরিত্রে পরস্পরবিরুদ্ধ ভাবের অপূর্ব্ব এবং আশ্চর্য্য সমাবেশ। কাঁহারও জীবনের বহির্দ্দিক কঠোরতায় পরিপূর্ণ কিন্তু অন্তঃকরণ অতি কোমল মাতৃহৃদয়ে গঠিত। কেহ অগাধ সম্পত্তি ধন মান যশে ভূষিত এবং সর্ব্বদাই অনুরূপ ব্যক্তিবর্গে বেষ্টিত থাকিয়াও সরল নির্ধন সংসারানভিজ্ঞের সাহচর্য্যপ্রিয়। কাহাকেও দেখিয়াছি প্রচুর বিষয়-বুদ্ধি বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও কার্য্যক্ষেত্রে তিনি বিষয়-বুদ্ধিহীন সরল শিশুর মত। মাষ্টার মহাশয় শেষোক্ত পুরুষের দৃষ্টান্তস্থল।

১৯১০ সালের মার্চ্চ মাসে তাঁহার সহিত প্রথম পরিচয় ঘটে এবং তাহা তাঁহার অহৈতুকী ভালবাসায় পরিপূর্ণ থাকিয়া নশ্বর দেহ

অবসানের দিন পর্য্যন্ত সমভাবে বর্ত্তমান ছিল। এখনও আছে কি না কে বলিবে? যাঁহার লেখনী হইতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত নির্গত হইয়াছে তাঁহার বাক্য ও ব্যবহার যে স্বভাবতঃই মধুর হইবে ইহা বলাই বাহুল্য। শিক্ষকতাকার্য্যে রীতিমত অভিজ্ঞতা থাকায় তাঁহার কথা বলিবার এমন একটি অদ্ভুত ভঙ্গিমা ছিল যে উহা বলিবামাত্র শ্রোতার হৃদয়-মনে চিরকালের মত অঙ্কিত থাকিত। সেই মধুর কথা ও ব্যবহারের যৎ-সামান্য পরিচয় দিবার ইচ্ছা পোষণ করিতে-ছিলাম। উপস্থিত তাহা পূর্ণ করিবার কিছু সুবিধা পাইয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতেছি। দিন তারিখ মনে নাই কিন্তু কথাগুলি যাহা চির কালের জন্য মনে দাগ কাটিয়াছে, পর পর করিয়া বলিবার চেষ্টা করিব।

তখন মর্টনস্কুল আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে একটি গলির ভিতর ছিল এবং তিনি উহার ত্রিতলে বারান্দাযুক্ত একটী কক্ষে থাকিতেন। নীচে প্রবেশদ্বার সর্ব্বদা ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ থাকিত এবং কেহ আসিলে বহুক্ষণ আঘাত করিবার পর হয় আপনি বা কোন ভক্ত দ্বার খুলিয়া দিতেন। মাষ্টার মহাশয় জনসমাগম ভাল-বাসিতেন না।

প্রথম দিন বৈকালে গিয়াছি, একজন ভক্ত দরজা খুলিয়া ত্রিতলে লইয়া গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করাইয়া দিলেন। একখানি সামান্য বস্ত্র পরিয়া ও তাঁহার কোঁচার খুঁটটী গায়ে জড়াইয়া তিনি বিনীত ভাবে বসিয়া ছিলেন কিন্তু দীর্ঘবপু, গৌরবর্ণ কান্তি, বিশাল বক্ষস্থল, বিস্ফারিত নেত্র ও তৎসহিত ঋষির ন্যায় আবক্ষ লম্বমান শ্মশ্রু এবং ভাবাবস্থা তাঁহার হৃদয় ও মনের ধর্ম্মভাবের গভীরতার পরিচয় প্রদান করিতেছিল। তিনি কাহাকেও ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে দিতেন না। সেই জন্য তাঁহাকে এম্‌নি নমস্কার করিবার পর তিনি প্রতি নমস্কার করিলেন এবং বলিলেন "বসুন, বসুন"।

অন্য দুই এক কথার পর বলিলেন, "তিনি (ঠাকুর) আমাদের কি দিয়েছেন? আমরা তাঁর কাছে কি পেয়েছি?—জ্বলন্ত বিশ্বাস!" এই বলিয়া হস্তের বিশেষ ভঙ্গি সহকারে তাহা দেখাইয়া দিলেন। এখনও যেন তাহা স্পষ্ট দেখিতেছি! পর মুহূর্ত্তেই গুন গুন করিয়া গান করিতে লাগিলেন; ঊর্দ্ধদৃষ্টি এবং একটী হাত মস্তকে রক্ষিত। 'ওহে রাজ-রাজেশ্বর দেখা দাও, চরণে উৎসর্গ দান করিতেছি এই প্রাণ সংসার অনলকুণ্ডে ঝলসি গিয়াছে তাও' ইত্যাদি (কথামৃত, ৪র্থ ভাগ, ৩য় খণ্ড)। গীত সমাপ্ত হইলে বলিলেন, "স্বামিজী এই গানটী ঠাকুরের সামনে গাইতেন আর ঠাকুর সমাধিস্থ হতেন।—তুমি গান কর? গান করবে। লজ্জা ঘৃণা ভয় তিন থাক্‌তে নয়। আমরা প্রথমে ঠাকুরের কাছে মুখ খুল্‌তুম না। শেষে তিনি তাঁর সঙ্গে গান করিয়ে নিতেন। বল্‌তেন, লজ্জা ঘৃণা ভয় এসব বন্ধন, এসব থাক্‌লে ঈশ্বর লাভ হয় না।"

তিনি একটী সুর ভাঁজিতে লাগিলেন, মাঝে মাঝে আমি কোথা থাকি, কি করি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আমার মধ্যমাগ্রজ পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার পরিচিত এবং আমি আই-এ পরীক্ষা দিয়াছি জানিয়া তিনি আনন্দ প্রকাশ করিলেন। পরে কিছু মিষ্টান্ন আনাইয়া এবং তাহা ঠাকুরকে নিবেদন করিয়া আমাকে খাওয়াইলেন—তাঁহার সে যত্ন ভুলিবার নয়। আমি বিদায় লইলাম। তিনি উপনিষদের একটী শ্লোক বলিলেন। সেটি ঠিক বুঝিতে পারি নাই, তবে উহা নিরাকার পরব্রহ্মের স্তব ও ধ্যান—যেন আমায় বলিলেন—তুমি এইরূপ করিবে।

অল্পদিন পরে সকালের দিকে গিয়া একদিন দেখি তিনি অতি শুদ্ধাচারে বসিয়া ও একটী

যুবক ভক্তকে কাছে বসাইয়া চতুর্থভাগ কথামৃতের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করাইতেছেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরে লেখা কতকগুলি পুরাতন কাগজ সামনে ধরিয়াছেন এবং তাহা দেখিয়া বলিয়া যাইতেছেন ও লেখক লিখিতেছেন, গানগুলি গাহিয়া শুনাইতেছেন। ঐ সময় বলিতেছিলেন, "কেদারকে দেখিয়া ঠাকুরের একেবারে শ্রীবৃন্দাবন-লীলা উদ্দীপন হইয়া গেল। প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন ও কেদারকে সম্বোধন করিয়া গান গাইতেছেন—"সখি, সে বন কতদুর, যথা আমার শ্যামসুন্দর, আর চলিতে যে নারি', ইত্যাদি।" কীর্ত্তনের সুরে মাষ্টার মহাশয়ের এই গীত আমার অতি মধুর লাগিয়াছিল।

লেখান শেষ হইলে তিনি বলিতে লাগিলেন, "দেখ, স্বামীজির কণ্ঠস্বরের মত মিষ্ট সুর আমি আর কোথাও শুনি নাই। কেবল ঠাকুরের গান তাঁর চেয়েও মিষ্টি ছিল।" আর কতভাগ কথামৃত হইতে পারে জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, "তাঁর ইচ্ছায় এখনও ৮।১০ ভাগ হতে পারে।" আবার বলিলেন, "তুমি ধ্যান কর? উদ্বোধনে যাও?—বেলুড় মঠে যাবে—বেলুড় মঠ ঠাকুরের ফৌজের আড্ডা! যেখানে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বন্যা, এরা আছে তার সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য—এদের উদ্দেশ্য মানুষকে বিপদে রক্ষা করা। মনে কোরো না এরা কেবল বসে বসে খায়! কিন্তু আগে নির্জ্জনে ধ্যান-ধারণা জপ-তপ করে ঈশ্বর দর্শন করতে হয়, তারপর পরহিতে আত্মোৎসর্গ। কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ না করলে হয় না, তাই স্বামীজি ত্যাগের আদর্শ ধরেছিলেন এবং ছেলেদের ধ্যান-জপ করবার জন্য হিমালয়ে নির্জ্জনে পাঠিয়ে দিতেন। বেলুড় মঠের সাধুরা নির্জ্জনে অনেক ধ্যান-জপ করে এসেছেন। তুমি এঁদের সঙ্গ করবে।" আমি চুপ করিয়া শুনিলাম কিন্তু হইতেছিল সেই হেতু বলিলাম, "আমার ইচ্ছা হচ্ছে কিছু কথামৃত লিখি।" তিনি অনুমতি দিয়া বলিলেন, "আচ্ছা আর একদিন আসবে।" সে দিন বিদায় লইলাম। তাঁহার কথামত ২।১ দিন মধ্যে আসিলাম এবং কথামৃতের এক পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপি লিখিয়াছিলাম। কথা ও অর্থ এক করিয়া গম্ভীর ভাবে তিনি ধীরে ধীরে বলিয়াছিলেন এবং ঐ এক পৃষ্ঠা লিখিতে অন্ততঃ অর্দ্ধ ঘণ্টা ব্যয়িত হইয়াছিল। আমি সাধারণ ভাবেই কাপড়-জামা পরিয়া আসিয়াছিলাম। তিনি আমায় শুদ্ধাচারী করিবার জন্য বিব্রত করেন নাই। তাঁহার মুখে অনেকগুলি স্বামিজীর গান শুনিলাম এবং পরে বিদায় লইলাম।

তখন হেলির ধূমকেতু আকাশে উঠিয়াছে এবং জ্যোতির্বিবদ্ বিদ্বন্মণ্ডলী সকলে অনুমান করিতেছেন যে পৃথিবীর সহিত সংঘর্ষ ঘটিয়া একটা প্রলয় উপস্থিত হইবে। বেলা ৯।১০ টা হইবে, মাষ্টার মহাশয় আমাকে সঙ্গে করিয়া স্কুলবাড়ী হইতে তাঁহার পুরাতন বাড়ীর দিকে আসিতেছেন। হঠাৎ দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "দেখ মানুষের calculation সব ভুল হয়, কিন্তু তাঁর সব fixed হয়ে রয়েচে।" আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। আবার একটু পরেই বলিতেছেন, "বাজীকর ভেল্কি দেখাচ্ছে, তোমাকে সহস্র গাঁট দেওয়া একটী দড়ি ফেলে দিলে গাঁট খোলবার জন্য, তুমি একটীও খুলতে পাল্লে না। তখন সে বল্লে, আমাকে দাও তারপর দড়ির দুই ধার ধরে একবার নাড়া দিলে, অমনি সব গেরো খুলে গেল। তাঁর ইচ্ছায় এক মুহূর্ত্তে সব বন্ধন খুলে যায়। সহস্র জীবনেও মানুষ যা খুলতে পারে না।"

ইহার পর প্রায় বৎসরাধিক কাল তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। আমি বি-এ পড়িবার জন্য রেঙ্গুনে চলিয়া আসি। পর বৎসর ১৯১০ সালে

তখন মর্টন স্কুল আমহার্ষ্ট স্ট্রীটে বৃহৎ চারিতলায় উঠিয়া আসিয়াছে এবং উহারই একটী তলায় তাঁহার পরিবারবর্গ বাস করিতেছেন। পুরাতন বাটীটি ঠাকুর বাটী হইয়াছে। তিনি স্কুলে আমায় একখানি ৪র্থ ভাগ কথামৃত উপহার দিলেন। এই স্কুলবাটীর ছাত উচ্চ ছিল, এজন্য তথা হইতে বহু দূর দেখা যাইত। তাঁহার মতে এই দৃশ্য অনন্তের ভাব আনিত এবং এই বৃহৎ ছাতের উপর বসিয়া মাষ্টার মহাশয় সন্ধ্যার পর ভক্তদের সহিত ভজনে সময় অতিবাহিত করিতেন। বৈকালে তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিলে তিনি রাত্রি ৯।১০ টা পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত ভজন গান করাইয়া বিদায় দিতেন। যে গানগুলি যে আকারে গাহিতেন ও গাওয়াইতেন উহাদের দুই চারিটী দিতেছি :—

"মন একবার হরি বল হরি বল হরি বল,
হরি হরি হরি বোলে ভবসিন্ধু পারে চল।
স্থলে হরি জলে হরি চন্দ্রে হরি সূর্য্যে হরি,
অনিলে অনন্তে হরি হরিময় ত্রিভুবন।"

"হরি তোমা বিনে কেমনে এ ভবে জীবন ধরি
সংসার জলধি মাঝে তুমি হে তরি।
যখনই তোমারে পাই আঁধারে আলোক পাই,
নিমেষে হৃদয়-তাপ সব পাশরি।"

"সুন্দর যোগিজন চেতন মোহন,
প্রাণের প্রাণ তুমি প্রাণবিমোহন।
হৃদয়বল্লভ তুমি শঙ্করশোভন,
প্রাণের প্রাণ তুমি প্রাণ রমণ।"

"শ্যামাধনে কি সবাই পায়
অবোধ মন বোঝে না একি দায়।
শিবের অসাধ্য সাধন মন মজান রাঙ্গা পায়।
ইন্দ্রাদি সম্পদ-সুখ তুচ্ছ হয় যে ভাবে মায়,
সদানন্দ সুখে ভাসে শ্যামা যদি ফিরে চায়।
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র ইন্দ্র যে চরণ না ধ্যানে পায়,
নির্গুণে কমলাকান্ত তবু সে চরণ চায়।"

অন্যান্য বহু সঙ্গীত গাহিতেন। ইহাদের অধিকাংশই কথামৃতে লিখিত আছে।

মাষ্টার মহাশয় গাহিতেন খুব আস্তে, কিন্তু তাঁহার সঙ্গীতের অপূর্ব্ব মাধুর্য্য এবং আকর্ষণী শক্তি ছিল। গাহিবার সময় নয়ন নিমীলিত করিতেন এবং মস্তকের ব্রহ্ম তালুতে একটী হস্ত রাখিতেন যেন ভিতরে কাহাকে দেখিতেছেন। শেষ কালে হয়ত দুই একটী কথা বলিতেন, যেমন :—"ঠাকুর বল্‌তেন, ঈশ্বরের কিছু বোঝা যায়? তাঁর ভালটাও বোঝা যায় না, মন্দটাও বোঝা যায় না। এক সের ঘটিতে কি দশ সের জল ধরে? তবে কি কর্‌বে? তাঁর চিন্তা নাম গুণ গান এই সব ভক্তিই সার।"

শুনিয়াছি, ঠাকুর স্কুলের ছাত্রদিগকে তাঁহার নিকটে আসা যাওয়া করিবার জন্য কিছু কিছু পয়সা দেওয়াইতেন। মাষ্টার মহাশয় সেটি চিরকাল বাহাল রাখিয়াছিলেন। কীর্ত্তনাদি অবসানের পর উঠিয়া ফকির বাবুকে আহ্বান করিয়া বলিতেন, "তা হ'লে ফকির বাবু সেটা দেবেন ত?" ফকির বাবু উহা আনিলে তিনি ছয়টী পয়সা আমার হস্তের মুঠার মধ্যে গুঁজিয়া দিয়া বলিতেন, "তুমি ট্রামে করে বাড়ী যাবে। মনে কোরো না এটা luxury. যে energy পথ চলে খরচ করবে সেটা বাঁচিয়ে পড়াতে দেবে, ধ্যান করবে। একদিন এইরূপ ট্রামে যাইবার জন্য পয়সা হাতের মধ্যে গুঁজিয়া দিয়া (বোধ হয় আমার কুণ্ঠিত দেখিয়া) বলিলেন "দেখ, যখন তুমি ডিপুটী হবে এই সব পয়সা ফিরিয়ে দিও।" আবার একটু পরেই ডাকিয়া বলিতেন, কিন্তু দেখো ডিপুটী

হয়ো না!" শুনিয়াছি এইরূপে বহু পয়সা তিনি ছাত্রদিগকে দিতেন।

১৯১১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রেঙ্গুনে ফিরিয়া আসিয়া বি-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছি এমন সময় ডেঙ্গুজ্বরের পর পর আক্রমণে দেহ রীতিমত ভাঙ্গিয়া গেল। আর সুস্থ হইবার উপায় নাই দেখিয়া অক্টোবর মাসে কলিকাতায় আসিলাম। কলিকাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক যক্ষ্মার ঔষধ প্রয়োগ করিলেন। কিছু দিন শয্যায় শায়িত থাকিয়া একটু উঠিবার শক্তি পাইবা মাত্র শ্রী-মর নিকট ভরসা পাইব বলিয়া গেলাম তাঁহার পুরাতন ঠাকুরবাড়ীতে। বেলা ২টা কি ৩টা হইতে দেহ অসুস্থ থাকায় সমস্ত গাত্র শীতবস্ত্রে আবৃত ছিল। নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি একটু শীত ও পড়িয়াছিল। তিনি আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিলেন এবং ঠাকুরের নানাবিধ প্রসাদ ফল-মূলাদি দিয়া এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী স্নেহ করিয়া বসিতে বলিলেন। গুন্ গুন্ করিয়া গান ধরিলেন যেন আমার অন্তরের বেদনার সুরটী বুঝিয়া তাহা নিজের কণ্ঠে মিলাইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা করিতেছেন আমার ব্যাধির মুক্তির জন্য! বাস্তবিক তিনি যে আমার জন্য কি রূপ ভাবিত হইলেন তাহা অন্য কেহ বুঝিতে পারিবেন না, কারণ উহা সম্পূর্ণ অহৈতুকী ছিল। আমার দেহ ও মন সতেজ ও প্রফুল্ল করিবার জন্য তিনি অপূর্ব্ব ব্যবস্থা করিলেন: প্রতিদিন প্রাতে আমি আসিতে লাগিলাম এবং তিনি তাঁহার ঠাকুরঘরের পার্শ্বে আমাকে বসাইয়া ও আপনি বসিয়া গীতা এবং চণ্ডীর কতকগুলি বিশিষ্ট শ্লোক তাঁহার সেই অতুলনীয় স্বর্গীয় কণ্ঠে পাঠ করিয়া শুনাইতে লাগিলেন। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের "কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্" হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ অধ্যায়ের "অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ" শ্লোক পর্য্যন্ত বলিয়া শেষ করিলেন। অবশ্য ইহার মধ্যে যে গুলি বিশেষ করিয়া জ্ঞাতব্য সেই গুলি বলিলেন। পরে শ্রীশ্রীচণ্ডীর অন্তর্গত দেবতা ও ঋষির স্তবগুলি সুর করিয়া পাঠ করিলেন। ইহাতে প্রায় এক ঘণ্টা অতিবাহিত হইল। তাঁহার বিশাল নয়নদ্বয় আরক্তিম হইয়া উঠিল এবং মাঝে মাঝে অশ্রুপূর্ণ হইল। নৈরাশ্যপূর্ণ ভগ্ন দেহ মনে উহা আশ্চর্য্য রূপে কার্য্যকরী হইয়া শীঘ্রই আমাকে সুস্থ ও সবল করিতে লাগিল এবং অল্প কাল মধ্যে তাঁহার ভাব আমার মধ্যে সংক্রামিত হইয়া এক অদ্ভুত দর্শন আনয়ন করিল। ইহার ফলে কিছুকালের জন্য লোকালয় হইতে আমাকে অবসর লইতে হইয়াছিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাব না পাইলে আমার সেই কঠিন ব্যাধি হইতে মুক্তি সম্ভবপর হইত না। তাঁহার ঠাকুরের পূজা, গীতা পাঠ, শ্রীশ্রীচণ্ডীস্তব শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমার উপর একান্ত বিশ্বাস স্থাপন করিতে যে আমাকে সাহায্য করিয়া ছিল তাহা নহে, পরন্তু তাঁহাদের মঙ্গলবাণী ও প্রসন্নতাকে আমার সম্মুখে এরূপভাবে মূর্ত্ত করিয়াছিল যে তাহা চিরকালের জন্য জাগ্রত থাকিবে!

বিদ্যাসাগর-স্মৃতি

শ্রীউদয় নারায়ণ ভট্টাচার্য্য

বঙ্গের সাহিত্যাকাশে নেমে ছিল যবে হায় ঘোর
অমানিশা
আলোকের রশ্মিজাল বিস্তারিয়া এলে তুমি সৃজি নব
ভাষা,
চালাইয়া নিজ রথ পরাইয়া জয়টীকা ভারতীর ভালে
চলে গেলে কীর্ত্তি রাখি বিজয় নিশান তুলি বঙ্গাকাশ-
তলে।

ঈশ্বর তোমার নাম দীনদুঃখী আর্ত্তত্রাণ হে
মহাপ্রবীণ,
জনম তোমার শুধু পরের মঙ্গল হেতু বন্ধু তব দীন!

বিশ্বজনে দিয়া দান যাহা ছিল আপনার সামগ্রী সম্ভার
তুষিয়া সবার মন চলে গেলে মহীয়ান্ গন্তব্যে
তোমার,
প্রতিভার দীপ্তসূর্য্য তেজবলে স্থাপিয়াছ আদর্শ মহান্
ত্যাগের গভীর মন্ত্রে দীক্ষা নিলে দিলে ঢালি আপন
পরাণ।

বঙ্গভাষা জন্মদাতা শুভক্ষণে এসেছিলে বাঙ্গালীর ঘরে
স্মিতহাস্যে উজলিলে বঙ্গবাসীমুখ, সাহিত্যমন্দিরে।

যুগযুগান্তর ধরি বাখানিবে বিশ্বময় গৌরব তোমার
যতদিন বিশ্বমাঝে রচিত সাহিত্যচয় করিবে বিহার।

বঙ্কিম, শরৎ, রবি ভাষার দুয়ারে তব অতিথি সবাই
নবনব চিত্রলেখা বঙ্গভাষা পটপরে আঁকিয়াছে তাই।
জাগাইল বিশ্বভূমি জানাইল জনে জনে ভাষার
গৌরব,
বিকশিল শতদল জ্ঞানের অমৃত নীরে ছুটিল সৌরভ।

রাখিয়া ন্যায়ের মান চলে গেছ হে মহান সম্মান
লভিয়া
সংসার সমরাঙ্গনে যুদ্ধ করি প্রাণপণে রিপুরে জিনিয়া।
গ্লানিভরা সংস্কারের সমাজের বদ্ধচক্ষু উন্মীলন তরে
দাঁড়ায়েছ সিংহতেজে ভেঙ্গেছ অর্গলদ্বার শাস্ত্র-
যুক্তি করে।

সর্ব্বগুণে বিভূষিত হে ভাস্বর, হে বরেণ্য মহামহীয়ান,
পরহিত ব্রতযজ্ঞে আর্ত্তদীন ত্রাণ তরে সমর্পিত প্রাণ।

বিদ্যাপীঠ ভাষাসৌধ সুমহান কীর্ত্তি শুধু করেনি ধারণ
দয়ার সাগর রূপে দেশ লক্ষ্মী হৃদিতলে পেতেছ
আসন।

মাতৃভক্ত সুসন্তান মাতৃপিতৃ পূজাবলে লভি আশীর্ব্বাদ
অক্ষয় কবচ অঙ্গে জীবনের লক্ষ্য পথে চলেছ অবাধ।
গৌরব উন্নতশির শতঝঞ্ঝা মাঝে হয়নি কো নত,
তাই তব পদতলে নতশির ভক্তিভরে সমগ্র জগৎ।

বায়ুপুরাণে সঙ্গীত

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

পুরাণে সঙ্গীত সম্বন্ধে আমরা আগেও অনেকবার আলোচনা করেছি। এবার দেখ্‌তে চেষ্টা করব বায়ুপুরাণ গান্ধর্বশাস্ত্র বা সঙ্গীত সম্বন্ধে কতটুকু পরিচয় দিয়েছে।

বায়ুপুরাণে ষড়শীতিতম ও সপ্তাশীতিতম (৮৬তম ও ৮৭তম) অধ্যায় ছুটীতেই কেবল সঙ্গীতের আলোচনা করা হয়েছে। এখানে সঙ্গীতকে বলা হয়েছে 'গান্ধর্ব'। আলোচনার সূত্রপাত করা হয়েছে এই ভাবে :

> কিয়ন্তো বা স্বরগণা গন্ধর্বাস্তত্র কীদৃশাঃ।
> যচ্ছ্রুত্বা রৈবতঃ কালান্ মুহূর্তমিব মন্যতে ॥[১]

ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করলেন : হে সূতনন্দন, যে গান শুনে রৈবত রাজা দীর্ঘকালকে মুহূর্তের মতন অতিবাহিত করেছিলেন সে গান কি রকম? ব্রহ্মার সভায় কোন্ কোন্ দেবতাই বা উপস্থিত ছিলেন? এসব বিষয় শুনতে আমাদের ইচ্ছা হয়।

এখানে সঙ্গীতের প্রশংসাই করা হয়েছে। যে গান শুন্‌লে দীর্ঘকাল মুহূর্তের মতন মনে হয় সে গানে মানুষের মন কতটুকু মুগ্ধ হ'তে পারে এখানে সেকথারই উল্লেখ করা হয়েছে। বায়ুপুরাণের সময় সঙ্গীতের বিকাশ তার সাহিত্য, দর্শন ও সাধনাকে নিয়ে বেশ পরিপূর্ণ ভাবেই ফুটে উঠেছিল; কেননা তিন গ্রাম, একুশটী মূর্ছনা, উনপঞ্চাশ রকমের তাল, সাত স্বরের আরোহণ ও অবরোহণ এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শ্রুতিবিচার এসব কোনটীরই অনুশীলন হ'তে তখন বাকী ছিল না। যাহোক্ ঋষিদের এই প্রশ্ন শুনে সূত বল্লেন :

> সপ্ত স্বরাস্ত্রয়ো গ্রামা মূর্চ্ছনাস্ত্বেকবিংশতিঃ।
> তালাঃ[২]শ্চৈকোনপঞ্চাশদিত্যেতৎ স্বরমণ্ডলম্ ॥[৩]

সাতটি স্বর, তিন গ্রাম, একুশটি মূর্ছ´না ও উনপঞ্চাশ প্রকার তাল, আর এদের সমষ্টিই স্বর-মণ্ডল। প্রথমেই "সপ্তস্বরাঃ" অর্থাৎ সাতস্বরের নাম করা হয়েছে যেমন,

> ষড়্জর্ষভৌ চ গান্ধারো মধ্যমঃ পঞ্চমস্তথা।
> ধৈবতশ্চাপি বিজ্ঞেয়স্তথা চাপি নিষাদবান্ ॥

ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ এই সাত স্বরকে নিয়ে রাগ-রাগিনীদের রূপ সঙ্গীতে প্রকাশ করা হোত। বিকৃত, তীব্র ও কোমল কোন স্বরের নাম এখানে করা হয় নি। কিন্তু তাহোলেও তীব্র ও কোমল স্বরের প্রচলন যে তখন ছিল একথা মেনে নিতে হবে।

এরপর শ্রুতি-বিভাগ করা হয়েছে গ্রাম-বিভাগ অনুসারে। 'গ্রাম' বায়ুপুরাণের সময় ঠিক ক'টী সমাজে প্রচলিত ছিল তা বলা কঠিন, তবে "ত্রয়ো গ্রামাঃ" ব'লে তিনটী গ্রামের নাম ও তাদের শ্রুতিদের উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন,

> "বিংশতির্মধ্যমগ্রামঃ ষড়্জগ্রামশ্চতুর্দশ।
> তথা পঞ্চদশেচ্ছন্তি গান্ধারগ্রামসংস্থিতান্ ॥

এখানে আলোচনার বিষয়, গ্রাম যে তিনটীই ছিল[৪] সে বিষয়ে কারো কোনও মতভেদ

১ বায়ুপুরাণ ৮৬।৩৩

২ আনন্দাশ্রম সংস্করণে "তানাশ্চৈক-" এই পাঠভেদ আছে।

৩ বায়ুপুরাণ ৮৬।৩৬

৪ কিন্তু গ্রাম যে সাতটীই প্রকৃত ছিল এসম্বন্ধে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। উদ্বোধন, বৈশাখ, ১৩৫৩, পৃষ্ঠা ১৭৮ দ্রষ্টব্য।

নাই; কিন্তু এক নারদীশিক্ষাকার ও মকরন্দকার এই দুই নারদ ছাড়া আর কেউই গান্ধারগ্রাম নিয়ে বিশেষ আলোচনা করেন নি। গান্ধারগ্রাম সম্বন্ধে নারদীশিক্ষা ও মকরন্দকার দুজনেই বলেছেন: "প্রবর্তকঃ স্বর্গলোকে গ্রামোঽসৌ ন মহীতলে।"[৫] এমন কি নাট্যশাস্ত্রকার ভরতও গান্ধারগ্রামের কোন উল্লেখ করেন নি; তিনি বলেছেন: "অথ দ্বৌ গ্রামৌ ষড়জো মধ্যমশ্চেতি।"[৬] তবে একথা ঠিক যে নাট্যশাস্ত্রকারের বহু পরবর্ত্তী গ্রন্থকার শার্ঙ্গদেবও গান্ধারগ্রাম (তাঁর সময়ে সমাজে প্রচলিত না থাক্‌লেও) সম্বন্ধে বলেছেন ও তার মূর্ছনার নির্দেশ করেছেন। কাজেই বায়ুপুরাণে গান্ধারগ্রামের মূর্ছনার বিভাগ ও নামের উল্লেখ থাক্‌লেও একথাই মান্‌তে হবে যে, বায়ুপুরাণের সময় গন্ধারগ্রামের কোন প্রচলন ছিল না। কেননা গান্ধারগ্রামের প্রচলন বায়ুপুরাণের সময় থাক্‌লে তারও অনেক আগেকার গ্রন্থকার নারদীশিক্ষাকার নারদ কখনো "স্বর্গাম্নাস্তত্র গান্ধারো নারদস্য মতং যথা"[৭] ব'লে গান্ধারগ্রামের অপ্রচলনের কথার উল্লেখ কর্‌তেন না। কাজেই বুঝ্‌তে হবে যে, শিক্ষাসমুচ্চয়ের যুগেই গান্ধারগ্রামের আলোচনা যখন সমাজ থেকে একরকম লোপ পেয়েছিল তখন অর্থাৎ বায়ুপুরাণের সময়ে তার প্রচলন থাকা কোনমতেই সমীচীন নয়; সুতরাং বায়ুপুরাণকার সাঙ্গীতিক পরিচয় দেবার জন্যেই গান্ধারগ্রামের নামোল্লেখ করছেন মাত্র।

আরো একটি বেশ লক্ষ্য কর্‌বার বিষয় যে, বায়ুপুরাণে ষড়্‌জ, মধ্যম ও গান্ধারগ্রামের মূর্ছনার বিভাগ ও নামোল্লেখ করা হয়েছে সম্পূর্ণ নাট্যশাস্ত্র, সঙ্গীতরত্নাকর ও মকরন্দেরই মতন। রত্নাকরের গ্রন্থকর্তা শার্ঙ্গদেবের সময় ১২১০-১২৪৭ খৃষ্টাব্দ; মকরন্দকার নারদ ছিলেন ৭ম থেকে ১১শ শতাব্দীর ভেতর এবং ভরতের সময় ২য়-৩য় শতাব্দী। কাজেই এসব দেখে মনে হয়, বায়ুপুরাণের আলোচনা সম্পূর্ণ ভরত, নারদ বা শার্ঙ্গদেবকেই অনুসরণ করেছে। অথবা বল্‌তে হয় যে, সকল গ্রন্থকারই বায়ুপুরাণের ধারাকে অনুসরণ করেছে। যাই হোক, বায়ুপুরাণকার প্রথমেই মধ্যমগ্রামের মূর্ছনা বিভাগ করেছেন এই ব'লে—

সৌবীরির্মধ্যমগ্রামো[৮] হরিণাস্যা তথৈব চ।
স্যাৎ কলোপবলোপেতা[৯] চতুর্থী শুদ্ধমধ্যমা॥
শার্ঙ্গী চ পাবনী চৈব দৃষ্টকা চ যথাক্রমম্‌॥[১০]

অর্থাৎ সৌবীরি, কলোপবলা, শুদ্ধমধ্যমা শার্ঙ্গী, পাবনী ও দৃষ্টকা এই সাতটি মূর্ছনা মধ্যমগ্রামের। নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের মতে দেখা যায়,

সৌবীরী হরিণাশ্বা[১১] চ স্যাৎ কলোপনতা তথা।
চতুর্থী শুদ্ধমধ্যমা তু মার্গবী পৌরবী তথা॥
হৃষ্যকা চৈব বিজ্ঞেয়া সপ্তমী দ্বিজসত্তমাঃ॥[১২]

এখানে শিক্ষাকার নারদ, ভরত, মকরন্দকার নারদ ও শার্ঙ্গদেব[১৩] সকলেই বায়ুপুরাণের অনুযায়ী মধ্যমগ্রামের মূর্ছনাদের নাম ও বিভেদ উল্লেখ করেছেন; সুতরাং দেখা যায় যে, নারদীশিক্ষাকে বাদ দিলে দু'একটি নামের বিকৃতি ছাড়া আর

৫ সঙ্গীতমকরন্দ ১।৫৬; সঙ্গীতরত্নাকর ১।৪।৫

৬ নাট্যশাস্ত্র (কাশীসংস্করণ) ২৮।২২

৭ নারদীশিক্ষা, পৃ ৩৯৯

৮ আনন্দাশ্রম সংস্করণে "মধ্যমগ্রামে" পাঠভেদ

৯ ঐ "কলোপনতোপে" „

১০ বায়ুপুরাণ ৮৬।৩৮-৩৯

১১ অনেকে 'হারিণাশ্বা' শব্দ ব্যবহার করেন। কিন্তু এক রত্নাকর (১।৪।১১) ছাড়া আর সকল স্থানেই আমরা প্রায় 'হরিণাশ্বা' শব্দ পেয়ে থাকি।

১২ নাট্যশাস্ত্র (কাশী সং), ২৮।২৯-৩০

১৩ শার্ঙ্গদেবের পরেকার সোমনাথের রাগবিবোধ, দামোদরমিশ্রের দর্পণ প্রভৃতি সকল গ্রন্থই শার্ঙ্গদেবকে অনুসরণ করেছে ব'লে আমরা আর তাদের এখানে নাম কর্‌লাম না।

সকলের মধ্যেই বেশ একটা সাদৃশ্য রয়েছে ; যেমন, মধ্যমগ্রাম :

শিক্ষাকার নারদ	ভরত	মকরন্দকার নারদ	শার্ঙ্গদেব	বায়ুপুরাণ
আপ্যায়নী	সৌবীরি	সংবীরা(রী) (সৌবীরি ?)	সৌবীরী	সৌবীরি
বিশ্বকৃতা	হরিণাশ্বা	হরিণাশ্বা	হরিণাশ্বা	হরিণাস্থা (হরিণাশ্বা ?)
চন্দ্রা	কলোপনতা	কনোপণতা	কলোপনতা	কলোপদলা (কলোপনতা?)
হেমা	শুদ্ধমধ্যমা	শুদ্ধমধ্যা (বা শুদ্ধমধ্যা)	শুদ্ধমধ্যা	শুদ্ধমধ্যমা
কপর্দিনী	মার্গবী (বা মার্গী)	মার্দলী	মার্গী	শার্ঙ্গী
মৈত্রী	পৌরবী	পৌরকী(?)	পৌরবী	পাবনী
চান্দ্রমসী	হৃষ্যকা	হৃষ্যকা	হৃষ্যকা	দৃষ্টকা(?)

এই রকম অপরাপর গ্রামের মূর্ছনারও নামের পার্থক্য আছে। তবে গান্ধারগ্রামের পার্থক্য কেবল নারদী ও মকরন্দের সঙ্গে। বায়ুপুরাণকার গান্ধারগ্রামের মূর্ছনা সম্বন্ধে বলেছেন,

"গান্ধারগ্রামিকাংশ্চান্যান্ কীর্ত্যমানান্নিবোধত।
অগ্নিষ্টোমিকমাদ্যন্তু দ্বিতীয়ং বাজপেয়িকম্ ॥
তৃতীয়ং পৌণ্ড্রকং প্রোক্তং চতুর্থং চাশ্বমেধিকম্।
পঞ্চমং রাজসূয়ঞ্চ ষষ্ঠংচক্র[১৪]-সুবর্ণকম্ ॥
সপ্তমং গোসবং[১৫] নাম মহাবৃষ্টিকমষ্টমম্।
ব্রহ্মদানঞ্চ নবমং প্রাজাপত্যমনন্তরম্ ॥
নাগপক্ষাশ্রয়ং বিদ্যাদ্গোতরকঞ্চ তথৈব চ।
হয়ক্রান্তং মৃগক্রান্তং বিষ্ণুক্রান্তং মনোহরম্ ॥
সূর্যক্রান্তং বরেণ্যঞ্চ মত্তকোকিলবাদিনম্।[১৬]
সাবিত্রমর্ধসাবিত্রং সর্বতোভদ্রমেব চ ॥
* * * *
অভিরম্যশ্চ শুক্রশ্চ পুণ্যঃ পুণ্যারকঃ স্মৃতঃ ॥[১৭]

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, বায়ুপুরাণের এই "পঞ্চ দশেচ্ছন্তি গান্ধারগ্রামসংস্থিতান্"[১৮] অর্থাৎ এই ১৫টী মূর্ছনার সঙ্গে নারদী বা মকরন্দে গান্ধারগ্রামের—মূর্ছনার কিছুই মিল নাই। যেমন,

(১) নারদীর মতে গান্ধারগ্রামের 'মূর্ছনা'[১৯] : নন্দা, বিশালা, সুমুখী, চিত্রা, চিত্রবতী, সুখা ও আলাপা।

(২) মকরন্দের মতে[২০] : সংরা, বিশালা, সুমুখী, চিত্রা, চিত্রাবতী, শুভা ও আলাপা।

(৩) বায়ুপুরাণের মতে : অগ্নিষ্টোমিক(?), বাজপেয়িক, পৌণ্ড্রক, আশ্বমেধিক, রাজসূয়, চক্রসুবর্ণক, গোসব, মহাবৃষ্টিক, ব্রহ্মদান, প্রাজাপত্য, নাগ পক্ষাশ্রয়, গোতর, হয়ক্রান্ত, মৃগক্রান্ত, বিষ্ণুক্রান্ত (মত্ত কোকিলের স্বরের মতন মনোরম), সূর্যক্রান্ত, সাবিত্র, অর্ধসাবিত্র, সর্বতোভদ্র, সুবর্ণ, সুতন্দ্র, বিষ্ণু, বিষ্ণুবর, সাগর (সকলের মনোরম), বিজয় (তুম্বুরু ঋষির প্রিয়), হংস (অলম্বুজ ও নারদাদি গন্ধর্বগণের প্রিয় ও ভীমসেন কর্তৃক প্রশংসিত), অধাত্র্য, বিকল, উপনীত, বিনত (ভার্গবপ্রিয়), শ্রী, অভিরম্য, পুণ্যারক।

বায়ুপুরাণের এই পনরটী মূর্ছনার নাম একটু অভিনব। এর কতকগুলি নাম যেমন, অগ্নিষ্টোমিক(?), বাজপেয়িক প্রভৃতি বৈদিক ব'লে মনে হয়, কতকগুলি আবার পৌরাণিক। বায়ুপুরাণের এই মূর্ছনার নামের অন্য কারো সঙ্গে বিশেষ মিল নাই।[২১] বায়ুপুরাণকার এগুলি কোথা থেকে পেয়েছেন আর সত্যই সেই সময়ে এইগুলির প্রচলন ছিল কিনা এসব কিছুরই উল্লেখ করেন নি, অথচ অন্যান্য গ্রাম দুটীর

১৪ আনন্দাশ্রম সংস্করণে "ষষ্ঠ বহুসুপর্ণকম্" পাঠভেদ।

১৫ ,, "গোসবং" ,,

১৬ ,, পাঠান্তর আছে।

১৭ এই লাইনটী কোন কোন সংস্করণে নাই। এই শ্লোকগুলি বায়ুপুরাণ ৮৬।৪১-৪৯ দ্রষ্টব্য।

১৮ বায়ুপুরাণ ৮৬।৫০

১৯ নারদীশিক্ষা, পৃঃ ৪০০

২০ মকরন্দ ১।৬২ ; রত্নাকর, পৃঃ ৫০

২১ তবে মকরন্দকার নারদও "অগ্নিষ্টোমাদিনামানি তৈরুক্তা নারদাদিভিঃ" (১।৯৮) ব'লে অগ্নিষ্টোমাদি মূর্ছনাদের নামোল্লেখ করেছেন।

মূর্ছনার সংখ্যা সাতটী হিসাবে অপরাপর আচার্যদের বর্ণিত মূর্ছনার সংখ্যার সঙ্গে সমানই আছে, আর নামের সাদৃশ্যও অনেক পরিমাণে পাওয়া যায়।

এর পরই দেখা যায় যে, বায়ুপুরাণকার মূর্ছনাগুলির নামের উৎপত্তি কেন হোল এরও একটা সদুত্তর দেবার এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের অধিদেবতার নির্দেশ করতেও চেষ্টা করেছেন। নারদীশিক্ষাকার দেব, পিতৃ ও ঋষি এই তিন বিভাগ অনুসারে মূর্ছনাদের বিভক্ত করেছেন।[২২] রত্নাকরেও ঠিক এ রকমেরি ভাগ ক'রে দেখান হয়েছে।[২৩] তবে বায়ুপুরাণের বর্ণনা যেমন,

(১) ভগবান ব্রহ্মা সৌবীরার (সৌবীরী) সঙ্গে 'গান্ধারী' গান করেন; এর অধিদেবতা ব্রহ্মা।

(২) হরিদেশে উৎপন্ন ব'লে 'হরিণাস্যা' (শ্বা ?) ; এর অধিদেবতা 'ইন্দ্র'।

(৩) মরুদ্গণ স্বরমণ্ডলের মধ্যে হস্ত প্রসারণ ক'রে গ্রহণ করেছিলেন ব'লে 'কলোপনতা' ;[২৪] অধিদেবতা মরুদ্গণ।

(৪) মরুদেশ থেকে উৎপন্ন ব'লে 'শুদ্ধমধ্যমা' এবং এর অধিদেবতা 'গন্ধর্ব'।

(৫) সিদ্ধগণের পথ প্রদর্শনের সময়ে মৃগগণের সঙ্গে বিচরণ করে ব'লে 'মার্গী' ; অধিদেবতা 'মৃগেন্দ্র'।

(৬) রজোগুণদ্বারা মূর্ছনা যোজনা করা হয় ব'লে 'রজনী' ; এর অধিদেবতা 'ষড়্‌জ'

(৭) উত্তর তাল প্রথম তালের অনুযায়ী ব'লে 'উত্তরমন্দ্র', আর অধিদেবতা 'ধ্রুব'।

(৮) বিস্তার ও উত্তরত্বের জন্যে ধৈবতের মূর্ছনার নাম 'উত্তরায়ণ' ; অধিদেবতা শ্রাদ্ধীয় পিতৃগণ।

(৯) মহর্ষিগণ শুদ্ধষড়্‌জ স্বরে অগ্নি উপাসনা করেন ব'লে 'শুদ্ধষড়্‌জিক'।

(১০) যক্ষিগণ পঞ্চম স্বরের মূর্ছনার দ্বারা সাধুগণকে মোহিত করেছিলেন ব'লে 'যাক্ষিকা'।

এইরূপে বায়ুপুরাণকার ৮৬।৫০-৬৮ শ্লোক পর্যন্ত অধিকাংশ মূর্ছনাদের নামের সার্থকতা ও অধিদেবতাদের দেখাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এই নামের সার্থকতা কতটুকু সত্য ও যুক্তিসঙ্গত তা নির্ণয় করা আমাদের পক্ষে কঠিন। এদের অনেকগুলি আবার কিংবদন্তীকে অনুসরণ ক'রে হেয়ালী রচনারই নামান্তর ব'লে মনে হয়। তবে সার্থকতা অবশ্য থাকতে পারে ; ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের অভাবে ঐগুলি হয়তো নষ্ট হ'য়ে গেছে এটাই স্বাভাবিক।

এর পরই ৮৭-তম অধ্যায়ে সুত আবার ৪৬ শ্লোকের অবতারণা ক'রে সঙ্গীতের গীতালঙ্কার, স্থান, বর্ণ, বর্ণালঙ্কার, স্বরের মন্দ্র, মধ্য ও তার অনুসারে বিভাগ ও তাল প্রভৃতির পরিচয় দিয়েছেন। যেমন ঋষিগণকে উদ্দেশ ক'রে তিনি বলেছেন :

"ত্রিশতং বৈ অলঙ্কারাস্তান্মে নিগদতঃ শৃণু।"[২৫]

অর্থাৎ বায়ুপুরাণে তিনশত গীতালঙ্কারের কথা

২২ "পিতৃণাং মূর্ছনাঃ সপ্ত তথা যক্ষা ন সংশয়ঃ।
ঋষীণাং মূর্ছনাঃ সপ্ত যাস্থিমা লৌকিকাঃ স্মৃতাঃ ॥"
—নারদী, পৃঃ ৪০০

২৩ "অশ্বক্রান্তা * * ঋষীণাং সপ্ত মূর্ছনাঃ।
আপ্যায়নী বিশ্বকৃতা * * পিত্র্যা মূর্ছনা ইমাঃ।
নন্দা বিশালা * * তাশ্চ স্বর্গে প্রযোক্তব্যা* * ॥"
—সঙ্গীতরত্নাকর (Adyar ed.) ১ম ভাগ, পৃঃ ১১২, ২৩-২৬ শ্লোক

২৪ এখানে "সা কলোপনতা" (৮৬।৫২) বলা হয়েছে, হয়েছে বঙ্গবাসী সংস্করণে। কিন্তু আনন্দাশ্রম সংস্করণে "কলোপনতো"-ই বলা হয়েছে। কাজেই মনে হয় বঙ্গবাসী সংস্করণের ৮৭।৩৮ শ্লোকের "কলোপবলো *" শব্দটি ভ্রমবশতঃই হয়েছে বলতে হবে।

উল্লেখ আছে। কিন্তু ভরতের নাট্যশাস্ত্রে আমরা পাই ৩৩টী মাত্র ; যেমন ভরত উল্লেখ করেছেন: "অলঙ্কারাস্ত্রয়স্ত্রিংশদেবমেতে ময়োদিতাঃ।"[২৬] এসম্বন্ধে ভরত ২১শ অধ্যায়ের ২৫-৭৫ শ্লোক পর্যন্ত "প্রসন্নাদিঃ প্রসন্নান্তঃ প্রসন্নাদ্যন্ত এব চ" ক'রে অলঙ্কার বর্ণনা করেছেন। শার্ঙ্গদেব তাঁর সঙ্গীতরত্নাকরের ১ম অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ বর্ণালঙ্কার-প্রকরণেও ৫-৬৪ শ্লোক পর্যন্ত "প্রসন্নাদিঃ প্রসন্নান্তঃ প্রসন্নাদ্যন্তসংজ্ঞকঃ" এই ভাবে আরম্ভ ক'রে শেষে "ইতি প্রসিদ্ধালংকারাস্ত্রিষষ্টিরুদিতা ময়া"[২৭] ব'লে ৬৩ রকম অলঙ্কারের উল্লেখ করেছেন। শার্ঙ্গদেব স্থায়িগত অলঙ্কার, আরোহী, অবরোহী, সঞ্চারী প্রভৃতি সমস্ত অলঙ্কারেরই পরিচয় দিয়েছেন। রত্নাকরের টীকাকার দুজনের ভেতর সিংহভূপালই আবার কল্লিনাথের চেয়ে এসব নিয়ে টীকায় বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

যাহোক, বায়ুপুরাণকার কিন্তু গীতালঙ্কারের সংখ্যা দিয়েছেন "ত্রিশতং" আর অলঙ্কার বল্‌তে তিনি বলেছেন: "স্বৈঃ স্বৈর্বর্ণৈঃ প্রহেতবঃ। সংস্থানযোগৈশ্চ ;" অর্থাৎ স্ব স্ব অনুগুণ বর্ণ ও পদসমূহের যোগ বিশেষকেই 'অলঙ্কার' বলে। পদ এবং বাক্য সংযুক্ত হ'লে তবে অলঙ্কার অভিব্যক্ত হয়: "বাক্যার্থপদযোগার্থৈরলঙ্কারস্তু পূরণম্।" এর পর বক্ষ, কণ্ঠ ও মস্তক এই তিন স্থান মন্দ্র, মধ্য ও তার স্বরের উৎপত্তি-স্থান বলেছেন। বর্ণ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে পুরাণকার বলেছেন যে, প্রকৃতিগত বর্ণ বারটী মাত্রই এবং বিচারও তার চার রকমের ; কিন্তু দেবতাদের মতে আবার ১৬ (ষোড়শ) রকমের বর্ণও পাওয়া যায়। তবে বর্ণবিষয়ে যাঁরা অভিজ্ঞ তাঁদের মতে স্থায়ী, সঞ্চারী, আরোহণ ও অবরোহণ এই চার রকমেরই মাত্র বর্ণের কথা আছে।[২৮] যেমন বায়ুপুরাণকার বলেছেন:

> "চত্বারঃ প্রকৃতৌ বর্ণাঃ প্রবিচারশ্চতুর্বিধঃ।
> বিকল্পমষ্টধা চৈব দেবাঃ ষোড়শধা বিদুঃ॥
> স্থায়ী বর্ণঃ প্রসঞ্চারী তৃতীয়মবরোহণম্।
> আরোহণং চতুর্থং তু বর্ণং বর্ণবিদো বিদুঃ॥"[২৯]

এখন 'স্থায়ী' প্রভৃতি চার রকমের বর্ণ কাকে বলে?—এর পরিচয় দিতে গিয়ে বায়ুপুরাণকার বলেছেন যে, (১) একই ভাবে যার সঞ্চরণ হয় তাকে 'স্থায়ী', (২) নানা প্রকারে যার সঞ্চরণ হয় তাকে 'সঞ্চারী', (৩) যার গতি নিম্ন দিকে তাকে 'অবরোহণ' এবং (৪) যার গতি উচ্চ দিকে তাকে 'আরোহণ' বর্ণ বলে।[৩০] তাছাড়া স্থাপনী, ক্রমরেজিনী, প্রমাদ ও অপ্রমাদ এই চারটি অলঙ্কারের উল্লেখও করা হয়েছে। এর পর নাট্যশাস্ত্র[৩১] ও রত্নাকরের রীতি[৩২] অনুযায়ী অলঙ্কারগুলির ভিন্ন ভিন্ন নাম ও অর্থ নিয়ে বায়ুপুরাণকার আলোচনা করেছেন যদিও নাট্যশাস্ত্র ও রত্নাকরের সঙ্গে নামের বিচিত্রতা ও ভিন্নতা যথেষ্ট পরিমাণে আছে।[৩৩]

এর পর স্ববিন্দুস্বর কলাপ্রমাণে যে উৎপন্ন

২৬ নাট্যশাস্ত্র (কাশীসং) ২৯।৭৬ ; মকরন্দ ২।১৫

২৭ রত্নাকর ১।৬।৬৩

২৮ এখানে ভরত বা শার্ঙ্গদেবের সঙ্গেও মিল আছে। যেমন ভরত বলেছেন: "আরোহী চাবরোহী চ স্থায়িসঞ্চারিণৌ তথা" (২৯।১৯); এবং শার্ঙ্গদেব বলেছেন: "গানক্রিয়োচ্যতে বর্ণঃ স চতুর্ধা নিরূপিতঃ। স্থায্যারোহ্যবরোহী চ সঞ্চারীত্যথ লক্ষণম্॥"

—রত্নাকর ১।৬১

২৯ বায়ুপুরাণ ৮৭।৫-৬

৩০ "তত্রৈকসঞ্চরস্থায়ী সচরস্তু চরীভবন্।
অথারোহণবর্ণানামবরোহং বিনির্দিশেৎ॥
আরোহণেন চারোহবর্ণং বর্ণবিদো বিদুঃ।"

৩১ নাট্যশাস্ত্র ২৯।২৫-৭২

৩২ রত্নাকর ১।৬।১৪-৬২

৩৩ যেমন উৎক্রকলাখ্য, আবর্ত, কুমার, শ্যেন, সন্তার সঞ্চারীদ্বয় ও.ত্রাসিত প্রভৃতি।

হয়, কলাস্থান যে একান্তর ভাবে ১২ রকমের, ত্রাসিত স্বর দ্বিকলাত্মক, মক্ষিপ্রচ্ছেদন চতুষ্কলাত্মক, বর্ণ, স্থান ও প্রয়োগ অনুসারে কলামাত্রার প্রমাণ, অলঙ্কার সাঙ্গীতিক বর্ণের উৎকর্ষ সাধন করে, ষড়্জ স্বর তার, মধ্য ও মন্দ্র এই তিন ভাগে বিভক্ত, গান্ধার স্বরের অনুযায়ী চারটী মদ্রক গীত হয়, পঞ্চম মধ্যম ধৈবত, নিষাদ ও ষড়্জ স্বরগুলিতেও ঐ মদ্রক গান করা হয়, মদ্রকে স্বরান্তর গীত গাওয়া হয় না ইত্যাদি অনেক বিষয়ই তদানীন্তন সঙ্গীত-পদ্ধতির অনুসারে বায়ুপুরাণকার আলোচনা করেছেন। বায়ুপুরাণে এই অংশের অবতারণা সম্পূর্ণ নাট্যশাস্ত্র ও রত্নাকরেরই অনুরূপ, কাজেই অনুমান করা দুরূহ যে, বায়ুপুরাণকারই প্রকৃত ভরত ও শার্ঙ্গদেবকে সাবধানতার সঙ্গে অনুসরণ করেছেন—কি ভরত ও শার্ঙ্গদেবই বায়ুপুরাণের বিষয়-বস্তুকে অনুকরণ করেছেন? মোটকথা বায়ুপুরাণে সঙ্গীতের আলোচনা অনেকটা উন্নত ধরণের ও সুশৃঙ্খলও বটে। তবে রাগ-রাগিণীদের নাম বা রূপ সম্বন্ধে বায়ুপুরাণকার কোন কথাই স্পষ্ট ক'রে বলেন নি। এদিক দিয়ে বৃহদ্ধর্ম-পুরাণের সাঙ্গীতিক পরিচয় বরং আরো উন্নত রকমের ও সুস্পষ্ট। বায়ুপুরাণ স্বর, গ্রাম, অলঙ্কার, মূর্ছনা ও তাদের নামের সার্থকতা এবং অধিদেবতা নিয়েই আলোচনার অবতারণা করেছেন, কিন্তু রাগ ও রাগিণী কতগুলি ছিল, রাগ বা রাগিণীদের উৎপত্তি বায়ুপুরাণের সময় আদৌ হয়েছিল কি-না এবং রাগ-রাগিণীদের গঠন, সময় বা রূপের কোন ইঙ্গিত—এসবই বায়ু-পুরাণকার কিছু দেন নি। অথচ নারদীশিক্ষাকার রাগ-রাগিণীদের বিভাগ বা পরিচয় না দিলেও রাগের নাম দুটী জায়গায় উল্লেখ করেছিলেন। নাট্য-শাস্ত্রকার ভরতও তাই। ভরতের পর মতঙ্গও তাঁর বৃহদ্দেশীতে রাগের কথা আলোচনা করেছেন।[৩৪] কাজেই এসব দিক থেকে মনে হয় যে, বায়ুপুরাণ রত্নাকর, মকরন্দ ও এমন কি বৃহদ্দেশী ও ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের চেয়েও প্রাচীন। আর বায়ুপুরাণে সঙ্গীতের বিষয়-বস্তুর আলোচনাও ঠিক সেই অনুমানকেই অনেকটা দৃঢ় ক'রে দেয়। তবে সঙ্গীতের ঐতিহাসিক প্রমাণপঞ্জী আলোচনার অভাবে সঠিকভাবে সিদ্ধান্ত নির্ণয় করা সত্যই বর্তমানে দুরূহ হ'য়ে পড়েছে, অথচ সঙ্গীতের রূপ ও অখণ্ডতার দিক থেকে এগুলির আলোচনা একান্ত আবশ্যক।

৩৪ মতঙ্গের বৃহদ্দেশীতেই ঠিক ঠিক রাগ-রূপের উৎপত্তি হয়েছে। তার আগে রাগ ও রাগিণী—এরকম বিভাগ বা পরিচয় কোনটারই উল্লেখ পাওয়া যায় না।

মতং যস্য ন বেদ সঃ

ডাঃ শচীন সেনগুপ্ত

কঠোর সাধনাপথে করিয়া ভ্রমণ
লভিয়াছি তাঁরে যদি করহ প্রত্যয়,
মহাভ্রম হ'বে তাহা জেনে রাখো মন
যদি তিনি কৃপা ক'রে না হন উদয়।

ধর্মাচার্য কুলশেখর

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী, বি-এ

ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, সকল সম্প্রদায় হইতেই ধর্মাচার্য মহাপুরুষগণ আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহাদের অনন্যসাধারণ সাধনা ও মুক্তিমন্ত্র হিন্দুজাতির ধর্মেতিহাসে এক অপূর্ব অবদান। সত্যের পূজারী এই আচার্যগণ এক একটি ধর্মসম্প্রদায় প্রবর্তন করিয়া অগণন নরনারীর মুক্তির পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন।

সাধক কুলশেখর দাক্ষিণাত্যের কেরল অথবা চের রাজবংশসম্ভূত। তাঁহার পিতার নাম ধৃতব্রত। কুলশেখরের প্রথম জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে তিনি যে সকল উপাধি ধারণ করেন, তাহাতে বুঝা যায় যে তিনি প্রথম জীবনে যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন। পরে তাঁহার জীবনে পরিবর্তন আসে। যুদ্ধের বীভৎসতা এই সাহসী যোদ্ধাকে বিরাগী করিয়া তোলে। পরবর্তী জীবনে তিনি আধ্যাত্মিক সাধনায় নিজকে নিয়োজিত করেন। তিনি বিষ্ণুর আরাধনায় এবং বৈষ্ণবগণের সেবায় প্রচুর আনন্দ পাইতেন। ক্রমে তিনি রাজকার্যে বীতরাগ হইয়া পড়েন। ইহাতে প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত বিচলিত হন। যাহাতে রাজা পুনরায় রাজধর্ম পালনে অনুরাগী হন সেজন্য তিনি চেষ্টা করেন। কথিত আছে, রাজার বহুমূল্য হার রাজবাটী হইতে চুরি যায়। বিচারকগণ কতিপয় বৈষ্ণবকে দোষী সাব্যস্ত করেন। কারণ, রাজঅন্তঃপুরে সর্বত্র তাঁহাদের অবাধ গতি ছিল। রাজ-কর্মচারিগণের বিশ্বাস ছিল যে, বৈষ্ণবগণকে চৌর্যাপরাধে দোষী প্রমাণ করিতে পারিলে রাজা উক্ত সম্প্রদায়ের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইবেন এবং পুনরায় রাজকার্যে মনোনিবেশ করিবেন। কিন্তু তাঁহাদের এই ধারণা অমূলক হইল। কারণ, এই বিষ্ণুভক্ত রাজার বৈষ্ণবদিগের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাভক্তি ছিল। তিনি কর্মচারিগণের কথার উপর নির্ভর করিয়া বৈষ্ণবগণের প্রতি অবিচার করিতে পারিলেন না। রাজা একটি অদ্ভুত পরীক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। তিনি সভামধ্যে একটি পাত্র আনিতে বলিলেন। উহার মধ্যে একটি জীবন্ত গোখুরা সাপ ছিল। রাজা পাত্রের মধ্যে স্বীয় হস্ত প্রবেশ করাইয়া দিলেন এবং সভাস্থ সকলকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—'বৈষ্ণবদের প্রতি আপনাদের আরোপিত দোষ যদি সত্য হয় তবে এই সর্প আমাকে নিশ্চয় দংশন করিবে।' সভাস্থ সকলে ভয়ে বিস্ময়ে স্তম্ভিত—নির্বাক! তাঁহারা মনে করিলেন রাজা নিশ্চয় প্রকৃতিস্থ নহেন। কিন্তু কি আশ্চর্য! উন্নতশীর্ষ ভুজঙ্গ রাজার হস্তস্পর্শে সংকুচিত এবং নিষ্প্রভ হইয়া রহিল! এই দৃশ্য দেখিয়া সকলের মস্তক শ্রদ্ধায় নত হইয়া আসিল।

এই ঘটনায় কুলশেখর পার্থিব ভোগৈশ্বর্যের প্রতি ক্রমশঃ বীতস্পৃহ হইয়া পড়েন। তিনি আধ্যাত্মিক চিন্তায় এবং ভগবৎ আরাধনায় জীবন যাপনে কৃতসংকল্প হন। এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি শ্রীরঙ্গমে যাওয়ার আয়োজন করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন অনিবার্য কারণ বশতঃ তাঁহার এই সদিচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। কুলশেখর পরম রামভক্তও ছিলেন। তিনি মনে করিতেন—যেই রাম সেই কৃষ্ণ। প্রত্যহ সভাকবির মুখে রামগুণগান তিনি পরম আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিতেন। একদিন সভাকবি রামায়ণের যে অংশে রামচন্দ্র একাকী

দণ্ডকারণ্যে চৌদ্দহাজার রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন সেই স্থানটি ব্যাখ্যা করিয়া রাজাকে শুনাইতেছিলেন। সভাকবির মুখে যুদ্ধের বর্ণনা শুনিতে শুনিতে অকস্মাৎ রাজা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি যেন মনে করিলেন তাঁহার আরাধ্য দেবতা শ্রীরামচন্দ্র ভয়ানক বিপদে পড়িয়াছেন। সুতরাং তাঁহার সাহায্য করা ভক্তের একান্ত কর্তব্য। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া সসৈন্য দণ্ডকারণ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সভাস্থ সকলেই রাজার এই মনোবিকারের রহস্য বুঝিতে না পারিয়া কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। প্রধানমন্ত্রী রাজার এই মানসিক অবস্থা বুঝিতে পারিয়া একটি কৌশল অবলম্বন করিলেন। তিনি একজন গুপ্তচরকে দণ্ডকারণ্যে পাঠাইলেন। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ মত সে তথা হইতে দ্রুত গতিতে প্রত্যাবর্তন করিয়া পথিমধ্যে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া করজোড়ে নিবেদন করিল—'রাজাধিরাজ, প্রভু রামচন্দ্র সমুদয় রাক্ষসকুলকে বিনষ্ট করিয়া নিরাপদে আশ্রমে গমন করিয়াছেন। সুতরাং মহারাজের সেখানে যাওয়ার আর কোন প্রয়োজন দেখি না।' দূতমুখে এই সংবাদ শ্রবণে বিজয়োল্লাসে রাজা রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

কিংবদন্তী আছে, রাজসভাকবি কোন কার্য-বশতঃ অন্যত্র গমন করেন। রামায়ণ পাঠের ভার নিজ পুত্রের উপর দিয়া যান। কবি-পুত্র রাজার ধর্মপ্রবণতা বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। একদিন তিনি সভামধ্যে রাজসমীপে সীতাহরণ ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইতেছিলেন। রাবণহস্তে সীতার লাঞ্ছনা ভক্তের হৃদয়ে গভীর ভাবে বাজিল। তিনি পাপিষ্ঠ রাবণকে সমুচিত দণ্ড দিয়া সীতা উদ্ধারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। রণসাজে সজ্জিত এবং সৈন্যপরিবেষ্টিত হইয়া তিনি লঙ্কাভিমুখে চলিলেন। সমুদ্রতীরে আসিয়া রাজা বসিয়া পড়িলেন এবং কি ভাবে অসীম সমুদ্র পার হইবেন সেই চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু এই ব্যাকুলতা ক্ষণিকের জন্য। ভক্তহৃদয় এ বিপদে কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত হইল না। সকল বিপদ তুচ্ছ করিয়া রাজা সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। শোনা যায় ভক্ত-বৎসল রামচন্দ্র স্বয়ং সেখানে আবির্ভূত হইয়া রাজাকে তাঁহার বিজয়বার্তা জ্ঞাপন করেন এবং রাজার সহিত রাজধানী পর্যন্ত গমন করেন। পরে তিনি তথা হইতে অন্তর্হিত হন। সত্য হ'ক মিথ্যা হ'ক—এই সমস্ত আখ্যানে ভগবানের প্রতি ভক্তহৃদয়ের অসীম অনুরাগের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

প্রাগুক্ত ঘটনার কিছুকাল পরে কুলশেখর সিংহাসন ত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তিনি সংসারত্যাগ করিলে তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় ধৃতব্রত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। দক্ষিণ-ভারতের তামিল আলোয়ারগণের মধ্যে তিনি মানকুল নম্বী নামে পরিচিত। প্রসিদ্ধ নাথমুনির নিকট ইনি দীক্ষিত হন। বৈষ্ণব আলো-য়ারদের পবিত্র তীর্থ শ্রীরঙ্গমে স্বীয় দুহিতা সহ তিনি বহুকাল অতিবাহিত করেন। দক্ষিণ-ভারতের সিদ্ধপুরুষ তিরুমঙ্গই আলোয়ার কর্তৃক খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে এই মন্দিরটি নির্মিত হয়। বৈষ্ণবাচার্যগণের উপাস্য দেবতা রঙ্গনাথ এই মন্দিরে অধিষ্ঠিত। এই মন্দিরটি আচার্য রামানুজের ধর্মপ্রচার এবং সাধনক্ষেত্র। পাণ্ড্যরাজগণ প্রতিষ্ঠিত মাদুরার মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া যেমন শৈব-ধর্ম প্রসার লাভ করে, শ্রীরঙ্গমের মন্দিরকে আশ্রয় করিয়া বৈষ্ণব-দর্শন তেমন বিস্তার লাভ করিয়াছে।

বৈষ্ণবগণ সখ্য, বাৎসল্য, মধুর ও দাস্য প্রভৃতি ভাবের মধ্য দিয়া ভগবানের উপাসনা করিয়া থাকেন। কিন্তু আলোয়ার কুলশেখর নিজেকে ভগবানের দাস বলিয়াই সর্বদা মনে

করিতেন। দাস্য ভাবই তাঁহার জীবনে একান্ত কাম্য ছিল। সাধারণ লোকে তাঁহাকে উন্মাদ বলিয়া উপহাস করিত। ইহাতে তিনি কিঞ্চিন্মাত্র দুঃখিত হইতেন না। তিনি স্বরচিত একটি গানে লিখিয়াছেন,—'জগতে সবাই পাগল। সুতরাং এক পাগলের মুখে অন্য পাগল সম্বন্ধে আলোচনা শোভা পায় না।' শ্রীরাধা যেমন শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার জন্যই পাগলিনী হইয়াছিলেন, তেমনি তিনিও ভগবানের জন্য ভাবের পাগল হন। তিনি বৈষ্ণবদের পদরেণু ভক্তিভরে সর্বাঙ্গে লেপন করিতেন। কারণ তিনি মনে করিতেন গঙ্গাস্নানের চেয়েও কৃষ্ণভক্তদের পদরেণু অধিকতর পবিত্র। তিনি তিরুপতি মন্দিরের প্রবেশদ্বার স্বরূপ হইবার জন্য সর্বদা কামনা করিতেন। এই কামনার পশ্চাতে রহিয়াছে ভক্ত-মনের তীব্র সেবাপরায়ণতা। কারণ, তিনি মনে করিতেন, প্রত্যেক বৈষ্ণব তাঁহার রূপান্তরিত দেহের উপর দাঁড়াইয়া শ্রীভগবানের অর্চনা করিবেন। ভক্তের আকুল প্রার্থনা ব্যর্থ হয় নাই। দক্ষিণ দেশে বৈষ্ণব-মন্দিরের গর্ভগৃহের প্রবেশ দ্বার 'কুলশেখর প্রবেশ দ্বার' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ভেলি বিভাগের অন্তর্গত ব্রহ্মদেশম্ নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রামে সাতষট্টি বৎসর বয়ক্রমকালে কুলশেখর দেহত্যাগ করেন।

কুলশেখর যে শুধু পরম বৈষ্ণব ছিলেন তাহা নহে, তিনি কবিও ছিলেন। তাঁহার পেরুমাল তিরোমজুহি (Perumal Tirumozhi) তামিল ভাষায় লিখিত একটি পদ্যগ্রন্থ। মুকুন্দমাল নামে সংস্কৃতে তৎপ্রণীত আর একটি পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার রচয়িতা কুলশেখর এরূপ অনেকে মনে করেন। তবে ইহার সত্যতা সম্বন্ধে কোন প্রামাণিক নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। ফলে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে পরস্পরবিরোধী মতের সৃষ্টি হইয়াছে। সে যাহাই হ'ক—কুলশেখরের ন্যায় বৈষ্ণব আলোয়ারগণের ধর্মপ্রভাব আর্যাবর্তের বিভিন্ন প্রদেশে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে আজও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। হিন্দু-ভারতের নিজস্ব সংস্কৃতি সংরক্ষণে এই মনীষিগণের দান কম নহে।

রাজগির

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

অতীত গৌরব স্মৃতি-সমুজ্জ্বল
　উন্নত করি শির,
নির্জন প্রান্তরে বনানীমণ্ডিত
　দাঁড়ায়েছ রাজগির।
কত যে আঘাত সহেছ শিখরে
　ফেলোনি চোখের জল,
নিয়তির অতি কঠোর শাসনে
　নির্ব্বিকার নিরচল।
তুমি ভাগ্যবান, অন্তরে তোমার
　বিরাজিতা অষ্টভুজা,
শ্রীকৃষ্ণ-চরণ পরশে মহিম
　সকলের পাও পূজা।
ঋষি-পদে তুমি দিয়াছ অঞ্জলি
　সপত ধারার নীরে,
ত্যাগী বুদ্ধদেব করেছে সাধন
　তোমার উন্নত শিরে।

মর্ম্মাহত হয়ে জীবের জ্বালায়
　মহাত্যাগী মহাবীর
অহিংসাই ধর্ম্ম করেছে প্রচার
　তব অঙ্গে রাজগির।
সলিলরূপিণী দেবী সরস্বতী
　বহিছে চরণতলে
কঠিন পাষাণ বিগলিত করি
　প্রেমের অশ্রুজলে।
সত্যের মহিমা শুনায়েছ হেথা
　কত গানে কত ছন্দে
চিদানন্দ স্রোত বহিয়েছ তুমি
　দিবানিশি মহানন্দে।
তোমার ছায়ায় যে এসেছে তায়
　দূর করি মোহ-ভ্রান্তি
দিয়েছ তাহারে তুমি অকাতরে
　তাপিত হৃদয়ে শান্তি।

বাঙ্গলা রূপের উদ্ভব কাল

শ্রীসুরেশচন্দ্র নাথ মজুমদার

মাতৃভাষা পরম শ্রদ্ধার বস্তু। আমরা বাঙ্গালী, আমাদের ভাষা বাঙ্গলা। এই ভাষায় প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটী লোক কথা বলে। এই ভাষাভাষীর সংখ্যা সমগ্র পৃথিবীতে সপ্তম। এই ভাষার আদিম লেখকদের কথা আলোচনা করিতে গেলে সর্বপ্রথম স্বতঃই মনে আসে ইহার রূপের আবির্ভাব হইল কবে? এসম্বন্ধে ডাঃ শহীদুল্লাহ বলেন—"খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের আগে বাঙ্গালা রূপের আবির্ভাব হয়নি, একথা সকলেই মেনে নিয়েছেন। কিন্তু বাঙ্গলা ভাষার উৎপত্তির সময় নিয়ে নানা মুনির নানা মত। যতদুর দলিল-প্রমাণ আমরা পেয়েছি তাতে আমাদের বলতে হয় যে মীননাথই বাঙ্গালাভাষার আদিম লেখক। তাঁর লেখা চার লাইনের একটি শ্লোক বৌদ্ধ গানের টীকায় উদ্ধৃত করা হয়েছে। সে শ্লোকটী এই—

কহন্তি গুরু পরমার্থের বাট—
কর্ম্ম কুরঙ্গ সমধিক পাট।
কমল বিকশিল কহিহণ পমরা
কমল মধু পিবিবি ধোকেন ভমরা।

এই শ্লোকে 'পরমার্থের' 'বিকশিল' আধুনিক বাঙ্গালা রূপের সমান। শব্দ ও ব্যাকরণবিচারে আমরা একে প্রাচীন বাঙ্গালা বলব" (শনিবারের চিঠি—১৩৩৫ বাং, আশ্বিন, মীননাথ ও কামুপা' প্রবন্ধ)। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী উক্ত শ্লোক সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন— "* * * শৈবযোগীদের দু একটি বোল এই পুঁথিতে তোলা আছে। একটী নাথদের আদিগুরু মীননাথের লেখা খাস বাঙ্গালা, এখনও বুঝিতে কষ্ট হয় না" (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ত্রিপুরা শাখার পঞ্চমবার্ষিক অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ)। মীননাথ বাঙ্গালা ভাষার আদি লেখক। এখন বাঙ্গালা রূপের উদ্ভবকাল ঠিক করিতে হইলে মীননাথের সময় নির্ণয় করা আবশ্যক। শ্রীগুণানন্দ এবং শিবশঙ্কর সিংহ প্রণীত ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত নেপালের ইতিহাসে আছে যে স্বীয় দেশের দ্বাদশবর্ষ ব্যাপী অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য নেপালরাজ ৫২২ খৃষ্টাব্দে মীননাথকে বিশেষভাবে আহ্বান করিয়া নেপালের ললিতপত্তন নিয়াছিলেন। নেপালের শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ করন্ডব্যূহে মীননাথের জীবনী আলোচিত ও এই মত সমর্থিত হইয়াছে।

বিদেশী পণ্ডিত হডসন সাহেব বলেন, আসামের পুতলক পর্বত হইতে মীননাথকে নেপাল নেওয়া হইয়াছিল। তিনি অনুমান করেন, ৫ম খৃষ্টাব্দে মীননাথ নেপাল গিয়াছিলেন[১]। বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন সঙ্ বলেন, কপিলের শিষ্য অর্থাৎ সাংখ্য মতাবলম্বী ভববিবেক মীননাথের সহিত দেখা করেন। ভববিবেক ৫৫০ খৃষ্টাব্দে বর্তমান ছিলেন[২]। বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত সিলভ্যাঁ লেভী তাঁহার Le Nepal গ্রন্থে লিখিয়াছেন, ৬৫৭ অব্দে রাজা নরেন্দ্রদেবের সময় মীননাথ নেপালে ছিলেন। মীননাথের শিষ্য গোরক্ষনাথ

১ R. A. S. J Series VII Part I, Page 137 and Language Literature and Religion of Nepal and Tibet.

২ রেভারেণ্ড বিল সাহেব অনূদিত সিয়ুকী গ্রন্থ।

এবং গোরক্ষনাথের শিষ্য পদ্মবজ্র সরোরুহ বা পদ্মসম্ভব। প্রসিদ্ধ জার্মাণ পণ্ডিত Schlaginlweil সাহেব স্থির করিয়াছেন এই পদ্মসম্ভব ৭২১—২২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।[৩] এই সকল মতামতের মধ্যে প্রথমোক্ত মতকে নিঃসন্দেহে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা যায়। তাহা হইলে মীননাথের সময় ৫২২ খৃষ্টাব্দ। মীননাথই যখন বাঙ্গালা ভাষার আদিম লেখক তখন বাঙ্গালা রূপের আবির্ভাব ৫ম খৃষ্টাব্দে হইয়াছে বলা যায়। ডাঃ শহীদুল্লাহ বলিয়াছেন, ৭ম খৃষ্টাব্দের পূর্বে বাঙ্গালা রূপের আবির্ভাব হয় নাই। এ সম্বন্ধে আমাদের সাহিত্যরথীরা একমত হইয়াছেন, এবং শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন, মীননাথের উক্ত লেখা ৮ম খৃষ্টাব্দের। সবিনয়ে বলিতে চাই—তাঁহাদের উক্তি সত্য নহে। বাঙ্গালাদেশে প্রসিদ্ধি আছে যে মহাত্মা কৃত্তিবাসই বাংলার আদিকবি, এবং বৈষ্ণব মহাজনগণই কীর্তন-পদাবলী সাহিত্যের জন্মদাতা। এই সকল অভিমত সত্য নহে। তবে বৈষ্ণব মহাজনগণের কণ্ঠেই যে পদাবলী কীর্তনের চরম উন্নতি সাধিত হইয়াছিল তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই।

কবি কৃত্তিবাসের আনুমানিক সময় ১৩শ বা ১৪শ খৃষ্টাব্দ। কীর্তন-পদাবলী সাহিত্যে বাংলার চণ্ডীদাস ও মিথিলার বিদ্যাপতির খুব সুনাম আছে। ইঁহারা গৌরাঙ্গদেবের পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের সময় ১৪শ শতাব্দীর শেষ ভাগ বা ১৫শ শতাব্দীর মধ্য ভাগ, আর বৈষ্ণব মহাজনগণের আচার্য গৌরাঙ্গ দেবের সময়—১৪৮৫ খৃষ্টাব্দ। কেহ কেহ বলেন, চণ্ডীদাস জয়দেবের নিকট হইতে কীর্তন পদাবলী শিক্ষা করেন। চণ্ডীদাস জয়দেবের পর দুই শত বৎসরের মধ্যে বর্তমান ছিলেন। ইঁহাদের কীর্তন পদাবলীর বিষয়ে সকলেই বেশ অবগত আছেন। কিন্তু ইঁহারা কেহই কীর্তন-পদাবলী সাহিত্যের প্রবর্তক নহেন। তাঁহাদের মোটামুটী হাজার বৎসর পূর্বে কীর্তন-পদাবলীর উদ্ভব হইয়াছিল। উপরে উদ্ধৃত মীন নাথের বাক্যটি কবিতাকারে লেখা এবং ইহা পদাবলী সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন। পূর্বেই দেখাইয়াছি ইঁহার সময়—৫২২ খৃষ্টাব্দ। তাহা হইলে নিঃসন্দেহে বলা যায় মীননাথ বাঙ্গালার আদি লেখক, আদি কবি ও কীর্তন পদাবলী-সাহিত্যের প্রবর্তক বা জন্মদাতা। অধ্যাপক ডাঃ সুকুমার সেন বলেন—"তান্ত্রিক বজ্রাচার্য্য ও শৈব নাথাচার্য্যদের হস্তে বাঙ্গালা সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপিত হইল। * * * চর্য্যাপদগুলি বাঙ্গালা ভাষাও সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন। * * * চর্য্যাপদগুলি বাঙ্গালা পদাবলীর পূর্বরূপ" (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস)। শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র নন্দী পাল রাজবংশের (৮ম খৃঃ অঃ) বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন—"বৌদ্ধ ও যোগী সম্প্রদায়ের রচনাসম্ভারে এই যুগের বঙ্গসাহিত্য সমৃদ্ধ হয়। শৈব যোগীরা সিদ্ধ আর বৌদ্ধ যোগীরা সিদ্ধাচার্য্য নামে পরিচিত ছিলেন। সিদ্ধ ও সিদ্ধাচার্য্য সম্প্রদায় পদ, গীত, গাঁথাও দোঁহা রচনা করিয়া বিরাট বঙ্গ সাহিত্যের সৃষ্টি করেন" (বসুমতী, পৌষ—১৩৩৯ বাং)। 'গোরক্ষবিজয়' (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত) সম্বন্ধে সাহিত্যাচার্য রায় দীনেশ চন্দ্র সেন বাহাদুর বলেন—"গোরক্ষ বিজয়ের মত এরূপ অপূর্ব্ব গ্রন্থ যে বাঙ্গালা সাহিত্যের আদি যুগে রচিত হইয়াছিল, ইহা আমাদের গৌরবের কথা। * * * এই অপূর্ব্ব পুঁথির গ্রাম্য ভাষা ও রুচি যে পাঠককে ভ্রান্ত ও ভগ্নোৎসাহ করিবে তিনি সাহিত্যের এক মহাখনির পরিচয় লাভে বঞ্চিত হইবেন"

৩ শনিবারের চিঠি ১৩৫১, আশ্বিন, মীননাথ ও কানুপা ডাঃ শহীদুল্লাহ লিখিত।

(বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)। নাথাচার্য কানুপা নাথের তেরটি গান নেপাল হইতে সংগৃহীত "আশ্চর্য চর্যাচয়" নামক গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছিল। এই বইখানা খণ্ডিত আকারে শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালায় বৌদ্ধগান ও দোঁহা নামে প্রকাশিত হইয়াছে। মূল বইখানির নাম ছিল আশ্চর্যচর্যাচয়। শাস্ত্রী মহাশয় ইহার নাম দিয়াছেন বৌদ্ধগান ও দোঁহা। ইহাতে কিন্তু নাথপন্থের কানুপা নাথের গানগুলিও প্রকাশিত হইয়াছে। ডাঃ শহীদুল্লাহ বলেন—"নাথ সাহিত্যে সিদ্ধ কানুপার নাম সুপরিচিত" (সিদ্ধাকানুপার গীত ও দোঁহা)। অধ্যাপক ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী বলেন—"নাথসাহিত্যে চারিজন সিদ্ধ পুরুষ বিখ্যাত,—মীন নাথ, তদীয় শিষ্য গোরক্ষ নাথ, হাড়িফা এবং তদীয় শিষ্য কানুপা। * * * নাথ সিদ্ধাগণের সময় নির্ণয় করা বাঙ্গালা দেশের সাহিত্যের এবং ইতিহাসের জন্য অত্যন্ত আবশ্যক" (গোপীচাঁদের সন্ন্যাস—৫৯, ৬০ পৃঃ)। কানুপা নাথের একটী গান নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল—

> "সুণ বাহ তথতা পহারী
> মোহ ভণ্ডার লই স অল অহারী।
> ঘুমই ণ চেবই সপর বিভাগা
> সহজ নিদালু কাহ্নিলা লাঙ্গা।
> চে অণ ণ বে অণ ভরনিদ গেলা
> স অল সুফল করি সুহে সুতেলা।
> স্বপনে মই দেখিল তিহুবন সুন
> ঘোরি অ অবণা গমন বিহুন।
> শাখি করিব জালন্ধরি পাত্র
> পাখিণ রাহু অ মোরি পাণ্ডি আচা এ।"

ডাঃ শহীদুল্লাহ কানুপা নাথের রচিত উক্ত গান গুলি "হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালায় সিদ্ধ কানুপার গীত ও দোঁহা" নামক গ্রন্থে আপন মন্তব্য সহ প্রকাশ করিয়াছেন।

তিনি বলেন—"এই গানে 'দেখিল' 'করিব' আধুনিক বাঙ্গালার সহিত এক। ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে বিচার করলে একে প্রাচীন বাঙ্গালা বলতেই হবে" (শনিবারের চিঠি, আশ্বিন—১৩৫১ বাং)। কানুপা নাথের তেরটী গান সম্বন্ধে ডাঃ শহীদুল্লাহ বলেন—"* * * এই সমস্ত দিক বিবেচনা করিয়া আমরা কানুপার গানকে প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার গান ছাড়া আর কিছু বলিতে পারি না। * * * অন্যান্য সমস্ত দিক বিবেচনা করিয়া ইহাকে বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনতম রূপ না বলিয়া গতি নাই" (হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালায় সিদ্ধা কানুপার গীত ও দোঁহা)। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে নাথাচার্যদের লেখাই বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতের শব্দার্থ

স্বামী প্রেমেশানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে এমন কতকগুলি শব্দ আছে যাহা বাংলা দেশে সর্বত্র প্রচলিত নহে। অন্যান্য কারণেও বহু শব্দের অর্থ অনেক পাঠক-পাঠিকা সহজে বুঝিতে পারেন না। আমরা এইরূপ যতগুলি শব্দের অর্থ জানিতে পারিয়াছি, তাহা প্রকাশ করিলাম ঃ

কথামৃত, ১ম ভাগ

১ম খণ্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, ২১ পৃষ্ঠা, Mole-skin—Mole ছুঁচোর ন্যায় এক প্রকার ক্ষুদ্র জীব। উহার অতি কোমল চর্মের ন্যায় এক প্রকার স্তার কাপড়। র‍্যাপার—wrapper, চাদর।

২-৪-৫০, নীলবড়ী—নীলের বড়ী। সমুদ্রফেনা—সমুদ্রতীরে এক প্রকার জলজন্তুর হাড় পাওয়া যায়; তাহা দেখিতে ফেনার মত, টোট্‌কা ঔষধে ব্যবহৃত হয়।

২-৫-৫২, সারে মাতে—গুড়ের শক্ত ভাগকে 'সার' এবং যে অংশ গলিয়া তরল হইয়া যায় উহাকে 'মাত' বলে; শক্ত গুড় ও জলো গুড়।

২-৮-৫৮, কোম্পানী—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী; পূর্বে গবর্ণমেণ্টকে কোম্পানী বলিত।

২-৯-৬০, ডি গুপ্ত—জ্বরের একটী প্রসিদ্ধ পেটেণ্ট ঔষধ।

২-৮-৫৭, ছাঁই—ঠাকুরের দেশে নারিকেল কুরিয়া গুড়ে পাক করিলে বলে ছাঁই, চিনিতে পাক করিলে বলে সন্দেশ।

৩-৩-৬৭, মদনের যাগ-যজ্ঞ—মদন এখানে কামদেব নহেন, গানের রচয়িতার নাম।

৩-৬-৭৫, বাহাদুরী কাঠ—শাল প্রভৃতি শক্ত ও ভারী কাঠ।

৪-৭-৯১, বেল্লো বালতো, বালদো—তাল ও নারিকেলের সপত্র শাখা।

৯-১-১৩১, বিল করে—গর্ত করিয়া। ঘুণী—মাছ ধরিবার খাঁচা। মুক্তকেশী—এক রকম গাছ, তাহাতে শক্ত বেড়া হয়। এক তারে—এখ্‌তিয়ারে, নিজ আয়ত্তে। ছুটিয়ে—শক্তি প্রয়োগ করিয়া।

৯-৭-১৫২, বে হেড—বে-head, মাথা খারাপ।

১১-২-১৬০, তুম্বা—লাউ। এক প্রকার লাউ অত্যন্ত তেঁতো, উহার খোল সাধুরা কমণ্ডলুর ন্যায় ব্যবহার করেন।

১-৩-২৬৩, হনুমান পুরী—হিন্দুস্থানী পালোয়ানের নাম। পাঠ্‌ঠা—কুস্তির আখড়ায় যাহারা সবেমাত্র কুস্তি শিখিতে আসিয়াছে।

১২-২-১৯৪, নাচ দুয়ার—বাড়ীর সামনের দরজা।

১৩-৪-২০৪, খ্যাঁট—খোরাক।

১৬-৩-২৬৮, আউটে গেছে—দুধ বেশী জ্বাল দিলে যখন শুকাইয়া ঘনীভূত হয়।

১৮-৫-২৮৮, বীড়বার—পরীক্ষা করিবার।

১৮-৫-২৮৯, নিখাদ—খাদহীন, নির্মল।

পরিশিষ্ট, ৩০৬, কালাপেড়ে (sic)—ঠাকুর সাধারণতঃ লালপেড়ে কাপড় পরিতেন। কিন্তু এইস্থলে কালাপেড়ে লেখায় সংশয় হইতে পারে। অশ্বিনী বাবু 'কালপেড়ে'ই লিখিয়াছিলেন, ইহা বুঝাইবার জন্য, ছাপাখানার সঙ্কেত sic শব্দটী দেওয়া হইয়াছে।

কথামৃত, ২য় ভাগ

২-৪-১৯, চৌদ্দ পোয়া—সাড়ে তিন হাত মানবদেহ।

২-৪-২০, গোড়ে মালা—মোটা করিয়া গাঁথা ফুলের মালা।

২-৫-২১, ডাকুর—এক প্রকার বিষাক্ত মাকড়সা। ভাবরা—ভাপরা, ভাপ, বাষ্প, ধুঁয়া।

২-৫-২৩, বরফের চাঁই—চাঙ্গড়, বড় ডেলা।

২-৮-২৮, খুঁটিয়ে—সূক্ষ্মভাবে, নির্দোষ ভাবে।

৩-৪-৩৮, ধুলো হাঁড়ির খোলা—প্রসূতির নোংরা কাপড়-চোপড় ও ফুল একটি হাঁড়িতে করিয়া মাঠে দূরে ফেলিয়া দেওয়া হয়। যাহারা অভিচারাদি করে তাহারা হাঁড়ি লইয়া যায়।

৩-৪-৩৯, ন্যাবা—কামলা রোগ, Jaundice.

৫-০-৫২, বাধা, জুতা।

৭-২-৬৯, হাজা শুকা—হাজা—জলে ভিজিয়া নষ্ট হওয়া, অতিবৃষ্টি; শুকা—অনাবৃষ্টি।

৮-১-৭০, ঘুস্‌কী—পর পুরুষে আসক্ত নারী।

১৩-৪-১২৪, ঢ্যাম্‌না—নির্বিষ সাপ, অকর্মণ্য।

১৫-২-১৪৭, কামারশালের 'নাই'—নেহাই, anvil.

১৭-৫-১৬৯, মুণ্ডি—ছোট মণ্ডা।

১৯-৫-১৯২, আটাশে ছেলে—যে ছেলের আটমাসে জন্ম, দুর্বল।

১৯-৫-১৯৩, সোঁধো গন্ধ—শুষ্ক মাটীতে জল পড়িলে যে গন্ধ হয়।

২০-৩-২০১, আপ্তভাবে—অন্তরঙ্গদের নিয়ে।

২০-৩-২০৪, ঘুপটি মেরে থাকা—লুকাইয়া অপেক্ষা করা, ওতপেতে থাকা।

২১-৩-২১৩, তেলধুতি—স্নানের সময় পরিবার জন্য ছোট ধুতি।

২৭-৪-২৭৫, বাঁখারি—বাঁশের ফালি।

কথামৃত, ৩য় ভাগ

১-২-৭, দরকোচা—দরকাঁচা, দড়কাঁচা, পাকিলেও ভিতরে শক্ত বা অপক্ক।

১-৫-১৬, আখের—পরিণাম।

১-৬-১৬, শশী বশীভূত—কামজয়, ব্রহ্মচর্য। কোটা—কোঠা, দেহ। চোর কুটারী—চোর কুঠরি, হৃদয়।

২-২-২৮, যাঁতি—জাঁতি, সুপারিকাটার যন্ত্র।

৩-৩-৩৫, কুঁকড়ো—মোরগ।

৪-২-৪১, কাকীমুখআচ্ছাদিনী—জীবের জ্ঞান-মুখ আচ্ছাদনকারিণী অবিদ্যা। ক=সুখ। অক=দুঃখ। ক+অক=কাক। সুখ-দুঃখযুক্ত জীব—কাকী।

৪-৩-৪৪, কুপো—গলা সরু পেট মোটা জালা।

৬-২-৫৬, কারণ করত—মদ খেত। তান্ত্রিক সাধকগণ মদকে "কারণ বারি" বলেন।

৬-২-৫৭, একটোষা—এক বিন্দু। স্যাকরা—সেকরা, স্বর্ণকার।

৬-৪-৬২, কালাপানি—সমুদ্র। মনুমেণ্ট—কলিকাতার গড়ের মাঠে উচ্চ স্তম্ভ।

৯-৪-৯১, গুচ্ছির—গুচ্ছের, অনেকগুলি (তুচ্ছার্থে ব্যবহার)।

১০-২-১০৯, গোট—কোমরের গহনা।

১২-২-১৩৩, নেওটো—স্নেহে বশীভূত।

১৪-১-১৫৬, কাঁড়ি—রাশি, স্তূপ। কাঁদি—বৃহৎ।

কথামৃত, ৪র্থ ভাগ

১-৪-৮, মানোয়ারী গোরা—যুদ্ধ জাহাজের নাবিক। মানোযারী—man-of-war.

১-৪-৯, মটকা—চালের মাথা বা সর্বোচ্চ স্থান।

২-১-১৪, খেই ধরা—সূতার প্রান্ত বাহির করা। তাঁতে কাপড় বুনিবার সময় সূতা ছিঁড়িয়া গেলে উহার প্রান্ত বাহির করিয়া জুড়িয়া দিতে হয়।

১৭-২-১৫০, বটকা—তন্দ্রা, অন্যমনস্কতা।

২৪-১-২৭৫, আটপিটে—আটপিঠে, কষ্টসহিষ্ণু।

কথামৃত, ৫ম ভাগ

১-২-৪, সেঁকুল কাঁটা—শেয়াকুল কাঁটা, কুল-জাতীয় ছোট ছোট বন্য গাছের কাঁটা।

কৌষীতকি উপনিষদের ভূমিকা

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

ঐতরেয় উপনিষদের ন্যায় কৌষীতকি উপনিষৎ ঋগ্বেদের অন্তর্গত। বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয় এবং কেন উপনিষদের ন্যায় কৌষীতকি অতি প্রাচীন। অটো ওয়েকার সাহেবের মতে ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক ও কৌষীতকি উপনিষৎ প্রাক্‌পাণিনীয় ও প্রাচীনতম। আচার্য শঙ্কর ইহার কোন ভাষ্য না লিখিলেও তাঁহার ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যের বহুস্থানে এই উপনিষদের বাক্যোদ্ধার করিয়াছেন। ঋষি শ্বেতাশ্বতরের নামানুসারে যেমন শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ, ঋষি কৌষীতকির নামানুসারেও এই উপনিষৎ; কারণ, এই উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ঋষি কৌষীতকির কথা আছে। সমগ্র উপনিষদটী গদ্যে রচিত।

এই উপনিষদের প্রকৃত নাম কৌষীতকি ব্রাহ্মণ উপনিষৎ। কিন্তু কৌষীতকি ব্রাহ্মণের যে ত্রিশটী অধ্যায় এখন পাওয়া যায়, উহাদের মধ্যে এই উপনিষৎটী নাই। প্রকৃতপক্ষে ইহা ঋগ্বেদের ঐতরেয় আরণ্যকের অন্তর্গত। উহা যখন আরণ্যকের অন্তর্গত তখন উহার নাম আরণ্যকোপনিষৎ না হইয়া ব্রাহ্মণোপনিষৎ হইল কেন? ইহার উত্তরে মোক্ষমুলার বলেন যে, ঐতরেয় আরণ্যকে আরণ্যকাংশকে ব্রাহ্মণাংশ হইতে তফাৎ করা অসম্ভব; আরণ্যক ব্রাহ্মণের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বেদভাষ্যকার সায়ণাচার্যও এই মত সমর্থনপূর্বক বলেন, "ঐতরেয়ব্রাহ্মণে অস্তি কাণ্ডম্ আরণ্যকাভিধম্।" ঐতরেয়ব্রাহ্মণে আরণ্যক নামক অংশ আছে। তিনি আরও বলেন, "আরণ্যকং ব্রতরূপং ব্রাহ্মণম্।" কারণ, প্রথম আরণ্যক ব্রাহ্মণের মতই লিখিত এবং উহাতে মহাব্রতের বর্ণনা আছে।

অন্যান্য প্রধান উপনিষদাবলীর ন্যায় কৌষীতকিও মোগল রাজপুত্র দারাশিকোর প্রচেষ্টায় ১৬৫৬-৫৭ খৃষ্টাব্দে ফার্সীতে অনূদিত হয়। এই অনুবাদ হইতে আংকোয়েটিল ডুপেরণ কর্তৃক ১৮০১-২ খৃষ্টাব্দে লাটিনে অনূদিত হয়। লাটিন অনুবাদ হইতে প্রথম জার্মান অনুবাদ হয় ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে। অধ্যাপক পল ডয়সন ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে উহার দ্বিতীয় জার্মান তর্জমা করেন। এই বৎসর সি ডি হারলেজের ফরাসী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। আর্ণষ্ট উইণ্ডিশ নামক জার্মান সংস্কৃতবিৎ কৌষীতকি উপনিষদের কিয়দংশ ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে টোকিও হইতে উহার একটী জাপানী অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

কৌষীতকি উপনিষদের উপর শঙ্করানন্দের এক দীপিকা আছে। শঙ্করানন্দ গীতা, মৈত্রায়ণী ও শ্বেতাশ্বতরাদি উপনিষদের টীকাকার আনন্দাত্মমুনির শিষ্য এবং বিদ্যারণ্যের গুরু। বিদ্যারণ্য তাঁহার 'পঞ্চদশী'র প্রথম শ্লোকে শঙ্করানন্দকে নমস্কার করিয়াছেন। কৌষীতকি উপনিষদের উপর শঙ্করানন্দের যে দীপিকা আছে তাহা অধ্যাপক ই বি কাওয়েল কর্তৃক আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হয়। এই কাওয়েল সাহেবই কৌষীতকি উপনিষদের প্রথম ইংরাজি অনুবাদ করেন। উহার দ্বিতীয় ইংরাজি অনুবাদ করেন মোক্ষমুলার। এই অনুবাদ সেক্রেড্

বুক্‌স্ অব্‌ দি ইষ্ট সিরিজের প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত। এই দুইটী অনুবাদ উনবিংশ শতাব্দীতে সম্পাদিত। ইহার তৃতীয় ইংরাজী অনুবাদ করেন আর ই হিউম্ ১৯২১ খৃষ্টাব্দে। এই অনুবাদ অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটী প্রেস হইতে প্রকাশিত। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের ডক্টর এ বেরিডেল কীথ সাংখ্যায়ন আরণ্যকের যে ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করেন তাহাতে কৌষীতকি উপনিষদের একটী ইংরাজী অনুবাদ আছে। ইহাই চতুর্থ ইংরাজি অনুবাদ। কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সীতানাথ তত্ত্বভূষণ এই উপনিষদের একটী ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাকে পঞ্চম ইংরাজি অনুবাদ বলা যাইতে পারে। হিউমের অনুবাদই এখন সমধিক প্রচলিত। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে শ্যামলাল গোস্বামী কৌষীতকির একটী বঙ্গানুবাদ করেন এবং রমেশ চন্দ্র কবিভূষণ করেন দ্বিতীয় বঙ্গানুবাদ ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে। তৃতীয় বঙ্গানুবাদ করেন উপরোক্ত পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ। এই সকল অনুবাদের দ্বারা কৌষীতকির প্রাধান্য প্রমাণিত হয়।

কৌষীতকি ব্রাহ্মণের সাংখ্যায়ন, কৌথুম প্রভৃতি কয়েকটী শাখা আছে। তদনুযায়ী কৌষীতকি উপনিষদের অন্ততঃ দুই প্রকার পাঠ এখন পাওয়া যায়। সাংখ্যায়ন আরণ্যকের একটী হস্তলিখিত কপি বার্লিনের রয়্যাল লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে। শঙ্করানন্দের দীপিকা হইতে যে মূল পাওয়া যায় তাহাই কাওয়েল, মোক্ষমুলর ও হিউম গ্রহণ করিয়াছেন।

বিদ্যারণ্যের 'সর্বোপনিষদর্থানুভূতিপ্রকাশে'ও এই মূল গৃহীত। আচার্য শঙ্কর তাঁহার ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে কৌষীতকির যে সকল বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন তাহা হইতে অনুমিত হয় যে, তিনি অপর মূলটী অনুসরণ করিয়াছেন। ইংরাজি অনুবাদকগণের মধ্যে কাওয়েলই শঙ্করানন্দের দীপিকা হইতে অপেক্ষাকৃত অধিক টীকা দিয়াছেন স্বীয় অনুবাদের সঙ্গে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে কৌষীতকি উপনিষদের দীপিকা আচার্য শঙ্করকৃত। কিন্তু এই অনুমান সত্য নহে। মোক্ষমুলার এই অনুমানের বিপক্ষে বলেন: "শঙ্করানন্দের দীপিকা এবং শঙ্করাচার্যের ভাষ্যের মধ্যে ভাষাগত এত পার্থক্য যে, এইরূপ অনুমান স্বীকার করা সুকঠিন।" বিখ্যাত সংস্কৃতবিৎ অটো বহটলিংক বিগত শতাব্দীর শেষ দশকে কৌষীতকি উপনিষদের বিভিন্ন পাঠের বিশদ আলোচনা পূর্বক একটী মূল খাড়া করিয়া উহার জার্মান অনুবাদ করেন। তিনি বলেন "এই উপনিষদের প্রথমাধ্যায়ের প্রথম কণ্ডিকায় যে দুইটী 'ধাস্যসি' আছে তাহার মধ্যে একটীকে তুলিয়া দিলে পাঠ সুগম হয়।" আর ই হিউম পরিবর্তনে আপত্তি করিয়া বলেন: "এই পরিবর্তন দ্বারা মূল সহজবোধ্য হইবে সন্দেহ নাই; কিন্তু এই প্রকার পরিবর্তন অনাবশ্যক। কারণ, পাঠের সুগমতার দিকে উপনিষদ্-ঋষিদের আদৌ দৃষ্টি ছিল না।"

যদিও আচার্য শঙ্কর কৌষীতকি উপনিষদের কোন ভাষ্য রচনা করেন নাই, তথাপি তাঁহার ভাষ্যাবলীতে তিনি কৌষীতকির বহু বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন। এই উপনিষদে যে ইন্দ্র-প্রতর্দন-সংবাদ আছে তাহা তাঁহার ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে (১-১-২৮) বিশেষভাবে আলোচিত। ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের শেষ অধিকরণের নাম তদনুযায়ী প্রতর্দনাধিকরণ। ইন্দ্র-প্রতর্দন-সংবাদ তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লিখিত। পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ সত্যই বলিয়াছেন যে, এই সংবাদ উপনিষদুক্ত ব্রহ্মাত্মবাদের প্রসিদ্ধতম শাস্ত্রীয় প্রমাণ। এই সংবাদের বক্তা দেবর্ষি ইন্দ্র এবং শ্রোতা ঋগ্বেদোক্ত রাজা দিবোদাসের পুত্র

প্রতর্দন। প্রতর্দন ইন্দ্রকে প্রার্থনা করিলেন, "মানুষের হিততম বর আমাকে দিন", তদুত্তরে ইন্দ্র বলিলেন: "আমি প্রাণ, আমি প্রজ্ঞানাত্মা। আমাকে অমৃতরূপে উপাসনা কর। প্রাণই অমৃত। এই প্রাণই আনন্দময় অজর, অমর প্রজ্ঞাত্মা। ইনি সৎকর্মদ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন না, অসৎকর্ম দ্বারা হ্রাস প্রাপ্ত হন না। যে আমাকে এইরূপে জানে তাহার পুণ্যকর্মের ফল মাতৃবধ, পিতৃবধ, চুরি, ভ্রূণহত্যাদি কোন দুষ্কর্ম দ্বারা বিনষ্ট হয় না।" শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে সুদীর্ঘ বিচারান্তে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, প্রাণই ব্রহ্ম।

কৌষীতকি উপনিষৎ চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং ইহাতে মোট ৪৪টি কণ্ডিকা আছে: ১ম অধ্যায়ে ছয়টী, ২য় অধ্যায়ে দশটী, ৩য় অধ্যায়ে আটটী এবং ৪র্থ অধ্যায়ে বিশটী কণ্ডিকা। প্রথমাধ্যায়ে চিত্র-আরুণি-সংবাদ আছে। চিত্র গার্গ্যায়নি একটী যজ্ঞ করিবার উদ্দেশ্যে আরুণিকে তাঁহার পৌরোহিত্যে বরণ করিলেন। আরুণি স্বীয় পুত্র শ্বেতকেতুকে সেই উদ্দেশে চিত্রের গৃহে প্রেরণ করেন। গার্গ্যায়নি শব্দটী গাঙ্গ্যায়নি কি না এই বিষয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতদ্বৈধ আছে। টীকাকার শঙ্করানন্দ গাঙ্গ্যায়নি গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে গাঙ্গ্যায়নির অর্থ গাঙ্গ্যের যুবাপত্য। আর ই হিউম টীকাকারের মতাবলম্বী। জার্মান পণ্ডিত আলব্রেকৃত ওয়েবার গাঙ্গ্যায়নি ও গার্গ্যায়নি উভয় পদই গ্রহণ করিয়াছেন। অধ্যাপক কাওয়েল গাঙ্গ্যায়নি গ্রহণ করিলেও বলেন যে, তেলেগু পাণ্ডুলিপিতে গার্গ্যায়নিই সর্বত্র ব্যবহৃত। মোক্ষমূলরের মতে গার্গ্যায়নি গ্রহণই সমীচীন, কারণ গাঙ্গ্য এবং গাঙ্গ্যায়নি বৈদিক সাহিত্যে কদাচিৎ দৃষ্ট হয়; অধিকাংশ স্থলে গার্গ্যায়নি এবং গার্গ্যই ব্যবহৃত। গার্গ্যায়নি হইতে গাঙ্গ্যায়নি হওয়া সম্ভব, গাঙ্গ্যায়নি গার্গ্যায়নি হওয়া কষ্টকল্পনা। কৌষীতকির অন্যান্য অধ্যায়ে গার্গ্যায়নি শব্দই ব্যবহৃত।

প্রথম অধ্যায়ে সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে, কি ভাবে জ্ঞানী দেবযান মার্গ দ্বারা ব্রহ্মলোকে গমন করেন: "সেই ব্রহ্মবিদ্বান ব্রহ্মালঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া ব্রহ্মাভিমুখে অগ্রসর হন।" তিনি মন দ্বারাই বিজরা নদী অতিক্রম করেন। বিজরা নদী উত্তীর্ণ হওয়ায় তিনি আর জরাগ্রস্ত হন না। তথায় তিনি তাঁহার সকল পাপপুণ্য বিসর্জন। করেন। মিত্রগণ তাঁহার পুণ্য এবং শত্রুগণ তাঁহার পাপ গ্রহণ করে। যেমন রথের গমনকারী ব্যক্তি রথচক্রগুলিকে পর্যবেক্ষণ করেন, তদ্রূপ ব্রহ্মবিৎ পাপপুণ্য, সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ব উপেক্ষা করেন। তিনি যতই ব্রহ্মের সমীপবর্তী হন, ততই ব্রহ্মগন্ধ, ব্রহ্মরস ও ব্রহ্মতেজ তাঁহাতে প্রবেশ করে। তৎপরে তিনি অমিতৌজা পর্যঙ্কে ও রথে আরোহণ করেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণোক্ত সিংহাসনের এবং অথর্ববেদোক্ত ব্রাত্যের আসনের বর্ণনার সঙ্গে এই পর্যঙ্কাদির নিকট সাদৃশ্য আছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়টী ব্রাহ্মণসদৃশ। ইহাতে ঋষি কৌষীতকির কথা আছে। কৌষীতকি বলিয়াছেন—প্রাণই ব্রহ্ম। প্রতর্দনের অনুষ্ঠিত আন্তর অগ্নিহোত্রের কথাও এই অধ্যায়ে উল্লিখিত। অন্য কোন উপনিষদে আন্তর অগ্নিহোত্রের কথা নাই। ইন্দ্রিয়-সংযমরূপ অনন্ত আহুতি যিনি প্রাণে অর্পণ করেন তিনি অমৃতত্ব লাভ করেন। এইজন্যই পূর্বতন জ্ঞানিগণ বাহ্য অগ্নিহোত্র করিতেন না। অতঃপর সর্বজিৎ কৌষীতকির প্রবর্তিত উপাসনাত্রয় কথিত। যজ্ঞোপবীত গ্রহণান্তে কী ভাবে উদীয়মান, মধ্যাহ্নকালীন ও অস্তগমনোন্মুখ সূর্যের উপাসনা করিতে হয় তাহাই ঋষি বলিয়াছেন, মোক্ষমুলারের মতে ইহাই যজ্ঞোপবীত গ্রহণ ও গায়ত্রী উপাসনার প্রাচীনতম উল্লেখ। বাগাদি ইন্দ্রিয়গণের পরস্পর শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপনের আখ্যায়িকাও এই অধ্যায়ে আছে। তৃতীয় অধ্যায়ে উক্ত আখ্যায়িকার পুনরাবৃত্তি দৃষ্ট হয়। বৃহদারণ্যক

(৬।১১-১৪) এবং ছান্দোগ্য উপনিষদে (৫।১) এই আখ্যায়িকা দেখা যায়, তৃতীয় অধ্যায়োক্ত ইন্দ্র-প্রতর্দনসংবাদে ইন্দ্র প্রতর্দনকে বলিতেছেন যে, তিনি ত্রিশীর্ষ ত্বষ্টৃপুত্র বিশ্বরূপকে বধ করিয়াছেন। ইন্দ্রের এই বধ কাহিনী ঋগ্বেদে দুইবার (১০।৮।৮-৯ এবং ১০।৯৯।৬) এবং শতপথ ব্রাহ্মণে দুইবার (১।২।৩।২ এবং ১২।৭।১।১) উল্লিখিত আছে। ইন্দ্র ও বিশ্বরূপের বিষাদের বিস্তৃত বিবরণ তৈত্তিরীয় সংহিতা ও শতপথব্রাহ্মণে দেখা যায়। কৌষীতকি উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ে বালাকি-অজাতশত্রুসংবাদ আছে। গার্গ্য বালাকি কাশীরাজ অজাতশত্রুর নিকট ষোল প্রকার ব্রহ্মের বর্ণনা দিতেছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদেও এই আখ্যায়িকা বর্ণিত; কিন্তু তথায় মাত্র দ্বাদশ প্রকার ব্রহ্মের বর্ণনা আছে।

শঙ্করানন্দ তাঁহার কৌষীতকি উপনিষদ্দীপিকার যে উপক্রমণিকা লিখিয়াছেন তাহার সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল: "দর্পণাদি যে সকল বস্তুতে আলোক প্রতিফলিত হয় সেইগুলি ঘর্ষণাদি দ্বারা নির্মল হয়। ইহা লোকপ্রসিদ্ধ, অগ্নিহোত্র ইহতে অশ্বমেধ পর্যন্ত ক্রিয়াদি চিত্তশুদ্ধি সম্পাদনে সমর্থ। চিত্ত শুদ্ধ হইলে তাহাতে ব্রহ্মজ্যোতি প্রতিবিম্বিত হয়। শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, যজ্ঞ, দান ও তপাদি কর্ম জ্ঞানলাভের উপায় মাত্র। স্বর্গাদি কর্মফল একপ্রকার সুখ এবং জ্ঞানসুখের ছায়াতুল্য। চিত্তশুদ্ধির উদ্দেশ্যেই লোকে আনুষ্ঠানিক কর্মে প্রবৃত্ত হয়। শ্রুতি এতাবৎ যজ্ঞাদি কর্মের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়া পরে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা বলিতেছেন। ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ প্রদানের জন্যই চতুরধ্যায়াত্মক কৌষীতকি উপনিষদের আরম্ভ। বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিও ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ না জানিয়া নির্বিশেষ ব্রহ্মের চিন্তায় ভীত হয়। কিন্তু এই ভয় অমূলক; কারণ ব্রহ্ম অভীস্বভাব। ব্রহ্ম হইতে কোনও প্রকার ভয়ের সম্ভাবনা নাই। ব্রহ্মজ্ঞ অভয়প্রাপ্ত হন ইহা বৃহদারণ্যকে বিশদভাবে ব্যাখ্যাত। পুত্র জন্মিবার পূর্বে পিতা প্রবাসে গমন করিলে, পিতার অবর্তমানে গৃহে জাত পুত্র প্রবাসাগত পিতাকে যখন প্রথম দর্শন করে তখন কিঞ্চিৎ ভীত হইলেও পরক্ষণেই সম্প্রীত হয়, শুদ্ধচিত্তের ব্রহ্মভীতিও তদ্রূপ অমূলক। এই নির্গুণ ব্রহ্মভীতি দূরীকরণার্থ শ্রুতি প্রথমে ব্রহ্মলোকে সমাসীন সগুণ ব্রহ্মের বর্ণনা দিতেছেন উপনিষদের প্রারম্ভেই। সগুণ ব্রহ্ম ব্রহ্মলোকে পার্থিব রাজার ন্যায় সগৌরবে উপবিষ্ট। প্রথম অধ্যায়ে এইজন্য অমিতৌজা পর্যঙ্কের কথা আছে। প্রাণই ব্রহ্মের পর্যঙ্ক। এই প্রাণ বায়ুমাত্র বা ইহার অলৌকিক স্বরূপ ও শক্তি আছে জিজ্ঞাসুর মনে এই প্রশ্ন উঠিতে পারে। এই শঙ্কা অপনোদনার্থ দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রাণোপাসনা বিবৃত। এই সুযোগে শ্রুতি ব্রহ্মজ্ঞানের মহিমা বর্ণনায় ব্যাপৃত। গৌতম, শ্বেতকেতু প্রমুখ বিনয়ালঙ্কৃত তপস্বিগণ জ্ঞানী গুরুর মুখনিঃসৃত মহাবাক্য শ্রবণেই সগুণ ব্রহ্মের জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। আধুনিক জিজ্ঞাসুগণ বিনয়ভূষিত হইলেই সগুণ বা নির্গুণ ব্রহ্মের জ্ঞানলাভে সমর্থ হইবেন। এই উদ্দেশ্যেই প্রথমাধ্যায়ে চিত্র শ্বেতকেতুর সংবাদ বর্ণিত।"

কৌষীতকি ও অন্যান্য প্রধান উপনিষদে যে সকল বাক্য পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন নিউইয়র্কের জর্জ হায়াস সাহেব। তালিকাটী প্রথমে আমেরিকান ওরিয়েন্টল সোসাইটীর জার্ণ্যালে (৪২ খণ্ড) প্রকাশিত হয়। ডাঃ হিউম তেরখানি প্রধান উপনিষদের যে প্রাঞ্জল ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন উক্ত তালিকা তৎপরে তাহার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। কর্ণেল জর্জ জ্যাকবের উপনিষৎকোষের পুনরুক্ত বাক্যের বিস্তৃত তালিকা পাওয়া যায়। জার্মান সংস্কৃতজ্ঞ এ ওয়েবারই সর্বপ্রথমে উপনিষদুক্ত পুনরুক্ত বাক্যের আংশিক তালিকা প্রস্তুত করেন। এই সকল তালিকার সাহায্যে উপনিষদের বিশ্লেষণ ও তুলনামূলক অধ্যয়ন সম্ভব হয়।

গ্রীকদর্শনে জগতের মূল

শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত, এম-এ

জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন রকম অভিমত পোষণ করেন। কারণ, প্রত্যেকের এক একটি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী আছে। জগৎসৃষ্টি এবং জগতে প্রাণীর আবির্ভাব বহু যুগ ধরে বিস্ময়ের কারণ হয়ে রয়েছে। মানুষ প্রশ্ন করে—কি ভাবে পৃথিবী সৃষ্ট হল, কোত্থেকে সে নিজে এল, এবং কোথায় সবকিছুর শেষ। মানুষের মনের এই সব প্রশ্ন চিরন্তন এবং এই সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর মানুষ খুঁজে পেয়েছে কিনা বা অদূর ভবিষ্যতে পাবে কিনা জোর দিয়ে বলা যায় না। তবে তার সন্ধানী এবং জিজ্ঞাসু মন সৃষ্টির রহস্য সম্বন্ধে কুতূহলী প্রশ্ন চিরদিন করে যাবে। এই প্রশ্নেরই একটি ধারা গ্রীকদর্শনেও ফুটে উঠেছে।

জগৎ সৃষ্টির পেছনে যে শক্তি রয়েছে, চমৎকৃত মানুষ তার নাম দিল দেবতা। হোমার একে বল্লেন ওশেনাস, তিনি বিশ্বাস করতেন ওশেনাসই হলেন সমস্ত সৃষ্টির জন্মদাতা। গ্রীক দার্শনিক থালেস হোমারের মতবাদ মেনে নিলেন না। তাঁর মতে জগতের আদিম উপাদান হলো অপ, অর্থাৎ তরল পদার্থ। তরল পদার্থকে প্রাথমিক উপাদান হিসাবে মেনে নেবার পিছনে হয়ত দুটো যুক্তি আছে। প্রথমতঃ বেঁচে থাকবার শক্তি তরল পদার্থের উপর বিশেষ ভাবে নির্ভর করে। দ্বিতীয়তঃ একটী অসীম এবং অপরিচ্ছিন্ন চলনশক্তি ও অভিনব অঙ্গ-সংস্থান পরিগ্রহণ করবার অসাধারণ সামর্থ্য তরল পদার্থের আছে।

আনেকজিম্যাণ্ডার কিন্তু থালেসের মত মেনে নিতে পারলেন না। তিনি বিশ্বাস করেন এবং প্রমাণ করতে চেয়েছেন সসীম কোন জিনিষ জগৎ সৃষ্টির আদিম উপাদান হ'তে পারে না। যে হেতু তরল পদার্থ সসীম সেহেতু তরল পদার্থকে জগতের আদিম উপাদান বলে মেনে নেওয়া ঠিক হবে না। অর্থাৎ যদি নির্দ্দিষ্ট তরল পদার্থকে সৃষ্টির প্রাথমিক মূল বলে মেনে নেওয়া হয়, তা হ'লে দেখা যাবে সৃষ্টি-কার্য্যে নিযুক্ত এই মূল ধীরে ধীরে সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে। ফলে তরল পদার্থের সসীমত্ব ও ক্রমে ক্রমে ফুটে উঠছে। আনেক-জিম্যাণ্ডার মনে করেন জগতের প্রাথমিক উপাদান হল "অসীম", এর আদি কিম্বা অন্ত কিছুই নেই। "অসীম" থেকে জাত উচ্চতা ও শীতলত্ব এই দুটি বিপরীত ধর্ম্মের পারস্পরিক সংঘাতের ফলে সৃষ্ট হল তরল পদার্থ, যাহা এই বিশাল এবং দৃশ্যমান জগতের কারণ এবং আদিম উপাদান। কালের বিবর্ত্তন এবং অগ্র-গতির সাথে সাথে যখন তরল পদার্থ পরিশেষে কঠিন হল, তখন দেখা গেল প্রাণী। এই প্রাণীরও একটি বিরাট বিবর্ত্তন হয়েছিল। যে মানুষ আজ জগৎ ও জীবের সৃষ্টি সম্বন্ধে গবেষণা কচ্ছে সে মানুষের বর্দ্ধিত আকার পৃথিবীতে প্রাণীর আবির্ভাবের অনেক দিন পরে দেখা গিয়াছে, কারণ প্রথমে প্রাণী বল্লে বুঝাত মৎস্য। তারপর এল নানা রকম জন্তু। সর্ব্বশেষে এল মানুষ। আনেকজিম্যাণ্ডারের মতবাদ আনেকজিমেন্স্ অনেকখানি মেনে নিলেন, কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন "অসীম"ই হল জগতের কারণ এবং আদিম উপাদান তাঁর মতে মরুৎ হল সেই "অসীম" সুতরাং জগতের মূল হিসাবে মরুতের সৃষ্টিশক্তি অপরিমেয়। আনেকজিমেন্সের মতবাদে আনেকজিম্যাণ্ডার

ও থালেসের সিদ্ধান্তের মাঝে একটি মিলনের সেতু তৈরী করবার চেষ্টা আছে। তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন বিরলীকরণের ভিতর দিয়ে মরুৎ তেজ বা তাপ এবং ঘনীকরণের ভেতর দিয়ে ক্রমশঃ বায়ু, বৃষ্টি জল ইত্যাদিতে রূপান্তরিত হয়।

অন্যদিকে দার্শনিক পিথাগোরাসের মতে সংখ্যা হল জগৎসৃষ্টির মূল এবং সমস্ত বস্তুর মাঝে অঙ্গসুষ্ঠুতা (proportion) ও আনুগুণ্য আশা করা যেতে পারে। অবশ্য সংখ্যাকে বাদ দিয়ে অঙ্গসুষ্ঠুতার কোন মূল্য বা প্রয়োজন আছে বলে তিনি স্বীকার করেন না। তাঁর মতানুসারে জগতের প্রত্যেক জিনিষেরই এমন একটি বিন্যাস, ধারা, ও অনুক্রম আছে যেটা ছাড়া স্থিরতা এবং সুসংগতি একেবারে অসম্ভব। পিথাগোরাসের এই মতবাদের ফলে বহু বাদানুবাদ এবং সমালোচনাত্মক আলোচনা গ্রীক দর্শনে হয়েছে। স্কুল প্রভৃতি কয়েকজন দার্শনিক মনে করেন পিথাগোরাস সমস্ত জগৎসৃষ্টির মূলে 'অসীম' ও 'সসীম' এই দুইটি উপাদানের সম্পূর্ণ সার্থকতা স্বীকার করেছেন এবং জগতের সত্তা যে এই দুইটি উপাদানের মিশ্রনেই হয়েছে একথাও তিনি মেনে নিয়েছেন।

অক্ষয় এবং অপরিবর্ত্তনশীল সত্তাকে জেনোফন বলেছেন ঈশ্বর। অবশ্য পারমেনাইডিসের মতানুসারে এর নাম হল সৎ। জেনোর অভিমতে সঞ্চালন, বহুত্ব, গতি এই ধারণাগুলির কোন প্রয়োজন বা সার্থকতা নেই। কিন্তু হেরাক্লিটাস মনে করেন চির অচল বলে কোন জিনিষ থাকা অসম্ভব এবং গতিই হল সৃষ্টির আদিম পদার্থ। গতি আছে বলেই আজ পৃথিবী সৃষ্ট হয়েছে।

এম্পিডক্লিস, ডিমক্রিটাস্ ও আনেক্‌জাগোরাসের মতে পৃথিবীর আদিম পদার্থ হল অনাদি এবং অবিনশ্বর। এই পদার্থটি আবার কতকগুলো মূল পদার্থের সমষ্টি এবং মূল পদার্থগুলির সুসংগতি ও সম্মিলনের মধ্যে সৃজনী শক্তি অথবা সৃষ্টি এবং বিচ্ছেদের মধ্যে নিশ্চিত ধ্বংস। এম্পিডক্লিস মনে করেন 'ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুৎ' এই চারটি হল মূল পদার্থ যাদের সমষ্টিকে আদিম পদার্থ বলা হয়েছে।

পরমাণুবাদের আগমনের সাথে সাথে গ্রীক্‌-দর্শনে বিজ্ঞানের ভিত্তি যেন বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠল। বিখ্যাত পরমাণুবাদী ল্যুসিপাস এবং ডিমক্রিটাস প্রমাণ করতে চাইলেন এম্পিডক্লিসের মূল পদার্থ একেবারে এমন এক সূক্ষ্মতম পদার্থে পরিণত হতে পারে যার নাম দেওয়া যায় পারে পরমাণু (atom)। সুতরাং পরমাণুবাদী দার্শনিক-দের মতে অসংখ্য পরমাণুই হল জগতের আদিম পদার্থ।

অন্যদিকে বিখ্যাত দার্শনিক আনেক্‌জাগোরাস্ মনে করলেন সেই উপাদানই হল জগতের মূল যে উপাদানের ফলে এই বৈচিত্র্যময় জগতে বিচিত্রতা সৃষ্ট হয়েছে। তাঁর মতানুসারে এক একটি নির্দ্দিষ্ট মূল থেকে এক একটি নির্দ্দিষ্ট জিনিষের উদ্ভব হয়েছে যেহেতু প্রত্যেক জিনিষেরই এক একটি নিজস্ব মূল আছে। সমস্ত মূলগুলির একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল বৈষম্য এবং এই মূলগুলির সংমিশ্রণে যে দ্রব্য সৃষ্ট হয় সে দ্রব্যের গতিশক্তি বাইরের একটি শক্তি থেকে আসে যার নাম দেওয়া হয়েছে মন (Mind)। এই মনের কল্পনাই জড় এবং অজড় পদার্থগুলির মাঝে একটি ব্যবধান সূচনা করে দিল।

গ্রীকদর্শনে জগতের মূল সম্বন্ধে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, সে সমস্ত সিদ্ধান্তের এই হল সংক্ষিপ্ত বিবরণী। সে যে প্রশ্ন চিরন্তন এবং মানুষকে চমৎকৃত করে রেখেছে প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে গ্রীকদর্শন চেষ্টা করেছে যদিও বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এই প্রশ্নকে দেখেছেন এবং উত্তর দিতে চেষ্টা করেছেন।

তদ্দূরে তদ্বন্তিকে

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

তিনি দূরে, তিনিই আবার নিকটে। যুগপৎ এই পরস্পরবিরুদ্ধ ভাব দুটী তাঁহাতে রহিয়াছে স্বীকার করিতে গেলে স্বভাবতঃই আকাশের কথা মনে হয়। অনন্ত যে মহাগগন—তাহার তো কোন বিভাগ নাই, সীমা নাই। আমার এই সাড়ে তিনহাত শরীরটীকে বেড়িয়া আমার অতি কাছে তাহাকে পাইয়াছি—আবার আমা হইতে দূর দূর যত দূর তাকাই তাহাকে অবিচ্ছিন্ন ভাবে দেখিতে পাইতেছি। যে আকাশ যে মুহূর্ত্তে কাছে, সেই আকাশই সেই মুহূর্ত্তেই দূরে। অসীম অন্তরীক্ষের দৃষ্টিতে দূর-নিকটের তারতম্য নাই। উহা একটা কথার কথা। যাহারা আকাশে চরিয়া ফিরিয়া বেড়ায় তাহাদেরই কাছে দূর-নিকটের ব্যবহার।

কিন্তু, তিনি—অর্থাৎ ঈশোপনিষৎ যাঁহাকে ঈশ বা পরমাত্মা বলিতেছেন এবং ভাষ্যকার বুঝাইয়া দিতেছেন যে যিনি মানুষের আত্মা হইতে পৃথক অপর কেহ নন—তাঁহার ক্ষেত্রে দূর-নিকটের সমত্ব ঘটে কি করিয়া? আকাশ তাঁহার উপমা হইতে পারে, কিন্তু তিনি তো আকাশের মত একটী দৈশিক অনন্ত (Spatial Infinite) নন। আকাশ তো জড় ঔপনিষদ সত্য অর্থাৎ মানুষের সত্য অর্থাৎ আমি নিজে তাহা—আকাশের ন্যায় নিশ্চিত জড় নয় কিন্তু তবুও তাহার মত কোন একটী কৌশলে দূরে ও নিকটে। এই রহস্যটীকেই আবিষ্কার করিতে হইবে।

শ্বেতাশ্বতরের ব্রহ্মবাদিগণ "ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্"—ধ্যানের দ্বারা প্রত্যক্ষ করিলেন। ধ্যান অন্তরের গূঢ় ব্যাপার—বোঝে প্রাণ বোঝে যার—অপর লোকের তথায় প্রবেশাধিকার নাই', প্রশ্নকারীদেরও নিরুত্তর করা সহজ। তুমি কি জান মূর্খ? আমি ধ্যানে উপলব্ধি করিয়া দেখিলাম যে! তুমিও ধ্যান লাগাও, দেখিতে পাইবে। যতক্ষণ উহা না করিতেছ তর্ক করিতে আসিও না। ইহার উপর আর কথা চলে না। কিন্তু সংশয়-সয়তানও তো রেহাই দেয় না। মুখরা গার্গী তাই হাটের মাঝখানে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন—বল যাজ্ঞবল্ক্য, অন্তরিক্ষলোকের চেয়ে বড়—গন্ধর্বলোক, চন্দ্রলোক, ব্রহ্মলোকেরও অশ্রয়স্থল সে সর্বব্যাপী কি? দ্যুলোক-ভূলোককে বিধৃত করিয়া রাখিয়াছেন, ভূত-বর্ত্তমান-ভবিষ্যতের মধ্যে ওতপ্রোত—আকাশেরও আশ্রয়স্থল সে বৃহত্তম কি?* প্রথমে গার্গী ধমক খাইয়াছিলেন, এই সকল "অতিপ্রশ্ন" জিজ্ঞাসার জন্য মুণ্ডপাত হইবার অভিশাপ শুনিয়াছিলেন—অবশেষে অবশ্য উত্তর শুনিতে পাইয়াছিলেন। বিরাট নাট্যাভিনয়ের মধ্য দিয়া গার্গী এবং জনক-পরিষদের সভ্যগণ মানুষের সত্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন।

কিন্তু সহজিয়াপন্থী ব্রহ্মবাদীও ছিলেন। আমি আমার কাছে সর্ব্বাপেক্ষা সহজ—সর্ব্বাপেক্ষা নিকট—সর্ব্বাপেক্ষা পরিচিত। তবে, আমার সত্যকে বুঝাইতে ঘোর পেঁচের প্রয়োজন কি? সেই বৃহত্তম বস্তু যদি আমার সত্তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত রহিয়াছেন তবে তাঁহাকে খুঁজিতে গিয়া এত নাট্যাভিনয় কেন? আমার এত আপনার হইয়াও যদি তিনি এত প্রচ্ছন্ন

* বৃহদারণ্যক ৩।৮।৮

তাহা হইলে তিনি থাকিয়াও বা আমার সার্থকতা কি? ঠিক কথা। তাই কেনোপনিষদের ঋষি বলিলেন, শুন, তবে সহজভাবেই বলি। কিন্তু এত সহজ যে শুনিয়া হয়'তো হাসিয়া উঠিবে—বিশ্বাস করিতে পারিবে না। বলিবে ধেৎ তাহাও কখনো হয়?

* * * * * *

সেই বস্তুকে তুমি সর্ব্বদাই জানিয়া দেখিয়া চলিয়াছ। "প্রতিবোধবিদিতম্"†। প্রত্যেকটি বোধের—প্রত্যেকটি জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে তাহা উঁকি মারিতেছে। এমন কোন মুহূর্ত্ত আছে কি যখন কোন না কোন জানা তোমার চিত্তে হাজির না হইতেছে? জল, মাটী, গাছ, পালা, মানুষ, গরু, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভাল, মন্দ, তুমি, আমি—কোন না কোন জ্ঞান সর্ব্বদাই উপস্থিত। যদি জাগিয়া না থাকিলে তো স্বপ্নলোকের গরু-ঘোড়া জানিতে হইবে। স্বপ্নও যদি না দেখিলে তো সুষুপ্তির অব্যক্ত নিজ অস্তিত্বের জ্ঞান হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না। জানার বিরাম নাই—এবং জানার সঙ্গে সঙ্গে যাহা হইতে জানা সেই বস্তুটিরও বিরাম নাই—তিরোধান নাই। অনন্ত মহাসাগরের বুকে যেমন অসংখ্য তরঙ্গ উঠে, ভাঙ্গে—অমিত তেজোদীপ্ত সূর্য্য হইতে যেমন দিকে দিকে কত না কিরণ-ছটা ছুটিয়া বাহির হয়, তেমনি পুঞ্জীভূত জ্ঞান-ঘন বস্তু মানবচিত্তের পশ্চাতে অনুক্ষণ বর্ত্তমান থাকিয়া প্রত্যেকটি চিন্তাকে, প্রত্যেকটী জানাকে আলোকিত করিয়া দেন। সেই জ্ঞান-ঘন বস্তু মানুষ নিজে—তাহার অভ্যন্তরে, প্রাণের অভ্যন্তরে মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারের অভ্যন্তরে বিরাজমান তাহার নিজের সত্য। মানুষ নিজে জ্ঞানস্বরূপ। ইহার অপেক্ষা মানুষের সহজতর পরিচয় নাই।

* * * *

তদ্দূরে তদ্বন্তিকে। যে মুহূর্ত্তে আমার মিথ্যা পরিচয়গুলিকে প্রত্যাখ্যান করিয়া নিজের এই সহজ সত্যে দাঁড়াই সেই মুহূর্ত্তে প্রহেলিকার সমাধান হইয়া যায়। এই নিখিল বিশ্বপ্রপঞ্চ আমারই জ্ঞানে প্রকাশিত দেখিয়া স্তম্ভিত হই। যাহা দূর তাহাকে আমিই প্রকাশ করি—আমারই জ্ঞানে জানি যে তাহা দূর। যাহা কাছে তাহাকেও আমিই আলোকিত করিয়া বলি—তুমি কাছে। যাহা ক্ষুদ্র তাহা আমাতে—যাহা বৃহৎ তাহাও আমাতে। আকাশের দৃষ্টির ন্যায় আমার জ্ঞান-স্বরূপের দৃষ্টিতেও দূর-নিকটের বিভাগ অর্থহীন। আমার যে কোন একটি নির্দ্দিষ্ট কালে উৎপত্তি হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না—কোন একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ে যে আমার বিলয় হইবে তাহাও ভাবিতে পারি না। আমি জন্মহীন, মৃত্যুহীন। এইখানে আমি আছি, ওইখানে নাই—তাহাও বলিতে পারি না। আমি সীমাহীন। দেশ এবং কালকে আমি আলোকিত করি কিন্তু আমি দেশ এবং কাল হইতে পৃথক।

স্বপ্নে যে জগৎ আমি দেখি সে জগতের প্রত্যেকটি অংশ কি আমার জ্ঞানের দ্বারা রচিত নয়? আমার মন না থাকিলে স্বপ্নবিশ্ব দাঁড়ায় কোথা? আমার আপন সত্যে যদি বিশ্বাস হয় তাহা হইলে দেখিতে পাইব জাগরণের বিশ্বেরও প্রত্যেকটি বিভাগ আমারই মনের বিলাস, আমারই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। দূরেও আমি, নিকটেও আমি। দূর-নিকট ছাড়া অন্য যদি কিছু থাকে তাহাও আমি। আমি ব্যতীত অপর কিছুই নাই, থাকিতে পারে না।

† কেন উঃ ২।৪

বিশ্বসভ্যতায় সোভিয়েট রাশিয়ার দান

শ্রীহরিপদ ঘোষাল, এম্‌-এ, বি-এল্‌

সংস্কৃতি শব্দটি নানা ভাবে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। অনেক সময় ইহার কদর্থ বা অপব্যাখ্যা হইয়া ইহা শ্রেণী বিশেষের একচেটিয়া সম্পত্তিরূপে গৃহীত হইয়াছে। পৃথিবীর বুর্জোয়া-সমাজে শিক্ষা বা সংস্কৃতি অভিজাতশ্রেণীর জন্মগত অধিকার ও দাবী বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছিল। জাতীয়তা ইহার প্রকৃতি ও ধর্ম হইতে পারে কিন্তু সাধারণ মানুষের হাসিকান্না সুখদুঃখের সংগে ইহার সম্পর্ক ছিল না। পৃথিবীর ধূলাকাদা হইতে দূরে নির্মল আকাশে তারকার ন্যায় সংস্কৃতিবান্ পুরুষ গজমোতি মিনারে বাস করেন, ইহাই আমাদের ধারণা ছিল। অভিজাত বংশে জন্ম এবং ভব্যতার সহিত শিক্ষাসংযুক্ত না হইলে সংস্কৃতির প্রকৃত অধিকারী হওয়া চলিত না। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়া সংস্কৃতিসম্বন্ধে একটি নূতন দৃষ্টিভংগী সৃষ্টি করিয়াছে। মানুষই ইহার উদ্দেশ্য—ইহার প্রাণ ও আত্মা। এখানে ইহা ব্যক্তি সম্প্রদায় বা দলবিশেষের সম্পত্তি নয়। লেনিন বলিয়াছেন, কেহ জানে না প্রোলিটেরিয়েট সংস্কৃতির উৎপত্তি কোথায়। ইহা বিশেষজ্ঞদের সৃষ্টি নয়। পুঁজিবাদী সমাজ, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ও আমলাতান্ত্রিক সমাজের অধীনে মানবজাতি যে জ্ঞানসম্ভার সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে তাহা যখন জাতিসাধারণের সম্পত্তি হইয়া পরিমূর্ত হইয়া উঠে, তাহাই তখন প্রোলিটেরিয়েট সংস্কৃতি আখ্যা গ্রহণ করে। ইহার প্রকৃতি বর্জন নয়, গ্রহণ। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন প্রয়োজন ও কামনা ইহার সহিত অনুস্যূত গ্রথিত ও অংগাংগিভাবে জড়িত।

রাশিয়ায় সাহিত্য ও শিল্প, সংগীত ও নাট্যকলা যুগে যুগে বিশ্বসভ্যতার পুষ্টি সাধনে সাহায্য করিয়াছে। বিশ্বসভ্যতায় রাশিয়ার দান অল্প নয়। যুগযুগান্তের সাধনায় মানবজাতি যে সভ্যতা ও কৃষ্টির অধিকারী হইয়াছে, সোভিয়েট রাশিয়া তাহাকে বর্জন করে নাই, মহামানবের তপস্যা ও সাধনাকে উপেক্ষা না করিয়া বরং তাহাকে আদরে গ্রহণ করিয়াছে। পুরাতন দৃষ্টিভংগী অনুসারে একমাত্র অভিজাত ও অবসরভোগী সম্প্রদায়ই শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধিকারী। সোভিয়েট রাশিয়া এই মতের প্রতিবাদ করিয়াছে এবং পূর্বসঞ্চিত জ্ঞানরাশির উচ্ছেদ সাধন না করিয়া কেবলমাত্র আমাদের দৃষ্টিকোণের প্রসার সম্পাদন করিয়াছে।

জারতন্ত্রের কঠোর বন্ধন হইতে অব্যাহতি পাইবার এক শত বৎসর পূর্ব হইতে রাশিয়া মুক্তি-পথের অভিযাত্রী হইয়াছে। ১৮২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ডিসেম্ব্রিষ্টগণ অথবা বিপ্লবী অভিজাতগণ সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট হইয়া যে বিদ্রোহ-বহ্নি প্রজ্জ্বালিত করে, তাহার উদ্গাতা ছিলেন দার্শনিক হারজেন। চিন্তায় গভীরতায় ও ব্যাপকতায় তিনি কার্ল মার্কসের নিকটবর্তী। রিনিভিভ্ এবং ওডোয়েভিস্কি ঐ যুগের শ্রেষ্ঠ লেখক ছিলেন। তাঁহারা রাশিয়ার প্রধান কবি ও রুশসাহিত্যের জনক পুস্কিনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। লেরমোনটোভের উপর ডিসেম্ব্রিষ্ট-দের ছায়া পড়িয়াছিল।

সামন্ততন্ত্র উচ্ছেদের পর রাজতন্ত্র ও আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রজাতন্ত্র স্থাপনের জন্য যে

আন্দোলন হয় তাহার পুরোহিত ছিলেন বেলিন্‌স্কি, ডোব্রোলিওলোভ্‌ এবং বেরনিশেভিস্কি। ইঁহাদের পর সাহিত্যে বিজ্ঞানে ও শিল্পে বহু মহারথীর আবির্ভাব ঘটে এবং উনবিংশ শতকের শেষভাগে টলষ্টয় নেক্রাসোভ্‌ টেকাইকোস্কি শেলটিকোভ্‌ প্রভৃতি সাহিত্যিকদের নাম সুবিদিত। টুর্গেনিভ্‌ টলষ্টয় এবং ডষ্টোভিস্কির দরদী হৃদয় পৃথিবীর অত্যাচারিত ও অবহেলিত নরনারীদের জন্য ব্যথিত হইয়াছিল। তাঁহারা দরিদ্র মানুষের "মূঢ় ম্লান মূক মুখে" ভাষা দিয়াছিলেন, তাহাদের অবদমিত মনে আশা ও উদ্যম সঞ্চার করিয়াছিলেন। তাঁহারা ও তাঁহাদের সহকর্মী বুদ্ধিজীবিগণ সাহিত্যের মায়াকাঠি স্পর্শে উপদ্রুত রাশিয়ার গণমনের রুদ্ধ ভাবের দ্বার উন্মোচন করিয়া ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিদ্রোহের পথ পরিষ্কার করিয়াছিলেন। প্রাক্‌-বিদ্রোহের যুগে স্বাধীনতার যে সকল একনিষ্ঠ পূজারী তাঁহার রত্নমন্দিরের অর্গলবদ্ধ দরজার সমক্ষে দাঁড়াইয়া শঙ্খঘণ্টা বাজাইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে লেনিন গোর্কি প্লেখানোভ্‌ ষ্ট্যালিন প্রভৃতি মনীষীর নাম সুপরিচিত। তাঁহারা যে কেবলমাত্র জন-আন্দোলনে শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন তাহা নহে, তাঁহারা বিরাট সোভিয়েট শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া বিশ্বসভ্যতার নবযুগের অবতারণা করিয়াছিলেন। রাশিয়ার রাজনৈতিক জীবনের প্রতি অংশ সাংস্কৃতিক উন্নতির সহিত সংযুক্ত হইয়াছে এবং পঁচিশ বৎসরের অল্পপরিসর সময়ের মধ্যে যে অসংখ্য বৈজ্ঞানিক সাহিত্যিক সাংগীতিক শিল্পী চিত্রকর ও ভাস্করের অভ্যুত্থান ঘটিয়াছে তাহাতে সমগ্র জাতির অভাবনীয় উন্নয়ন সম্ভব হইয়াছে।

জাতির অন্তর্হৃদয়ে যে ভাবস্রোত জার আমলাতন্ত্রের শৈবালে আচ্ছাদিত ও অবলুপ্ত হইতে বসিয়াছিল, তাহা অক্টোবর বিপ্লবের প্রবল স্রোতে ভাসিয়া গেল। রাশিয়ায় শ্রমিক ও কৃষকদের বহুকালের নিদ্রা ও জড়তা দূর হইয়া গেল, স্বাধীনতার অমৃত আস্বাদন করিয়া তাহারা আলস্য ও দীর্ঘসূত্রতা ত্যাগ করিয়া সোভিয়েট রিপাব্লিক স্থাপন করিল—মানুষের পরিবেশে মানুষকে স্থাপন করিবার প্রথম সোপান সৃষ্টি হইল। এই নূতন কৃষ্টি প্রাচীনের গর্ভ হইতে উদ্ভূত হইল—পুরাতনকে কাটিয়া ছাঁটিয়া নয়, পুরাতনের সহিত সম্বন্ধ কাটাইয়া নয়, পুরাতনের সহিত যোগসূত্র রক্ষা করিয়া। মাতৃগর্ভে সন্তান যেমন মাতার নাড়ীর রক্ত টানিয়া বলশালী হয়, গাছের শিকড় যেমন মাটির ভিতর হইতে রস টানিয়া লইয়া বাড়িয়া উঠে, তেমনি সহজ স্বাভাবিক ভাবে রাশিয়ায় নূতন কৃষ্টি ও সভ্যতা পারিপার্শ্বিক সমস্ত বাধা-বিপত্তি ঠেলিয়া দিয়া বিজ্ঞান-দৃষ্টির সাহায্যে অতীন্দ্রিয়তা ভাবালুতা কুসংস্কার ধর্মান্ধতা ও নীলরক্তের পাণ্ডিত্যপূর্ণ নজির উপেক্ষা করিয়া রাশিয়ার নরনারীনির্বিশেষে জনশিক্ষার যে ব্যবস্থা হইল তাহাতে অন্য জাতির সভ্যতা ও কৃষ্টিও অবজ্ঞাত হয় নাই। এইভাবে আন্তর্জাতিকতার বীজ বপন করা হইল।

মানুষের প্রয়োজনে উৎপাদনী শক্তির বৃদ্ধি ও প্রসারে যাহা সহায়তা করে, মার্কসের মতে তাহাই প্রগতি এবং এইরূপ চিন্তাধারার পোষকতার জন্য সংস্কৃতিকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। বিজ্ঞানের উন্নতি প্রসার ও সংস্কৃতির উন্নতি ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সমান্তরাল রেখার মত পৃথক নয়, ইহারা অর্থনীতির ক্ষেত্রে মিলিত হয়। সোভিয়েট-রিপাব্লিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অন্য কোন জাতির দাগ উপেক্ষা করে না—সেখানে টলষ্টয় ও টুর্গেনিভের সহিত শেকস্‌পীয়র ও রবীন্দ্রনাথ সম্মানের অর্ঘ্য পাইয়া থাকেন।

রামধনু নানাবর্ণের সমন্বয়ে অপরূপ সৌন্দর্য সৃষ্টি করে, মানুষের মনে আনন্দ শিহরণ জাগাইয়া তোলে। নানা জাতি ও উপজাতির দানে সমৃদ্ধ সোভিয়েট সভ্যতা পৃথিবীর সকল দলের

নিপীড়িত জন-মনে মুক্তির আশা সঞ্চার করিয়াছে। এই সভ্যতা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার মূল কথা—সাংস্কৃতিক উন্নয়ন অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সহগামী। সোভিয়েট রাষ্ট্র তাহার অধিবাসীদিগকে বিশ্বসংস্কৃতি অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, তাহাদের উচ্চতর জ্ঞানার্জ্জনস্পৃহা জাগ্রত করিয়াছে, বিদ্যা-বুদ্ধির আলোকে ও বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে নিজেদের জীবনাদর্শ গঠন করিতে শিক্ষা দিয়াছে। ইহাতে জাতিগত বা সম্প্রদায়গত সংকীর্ণতা আন্তর্জাতিক কৃষ্টিসম্পদ গ্রহণের পরিপন্থী হয় নাই। রাশিয়ার সাধারণ শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নতি অন্য দেশের সাধারণ মানুষের শিক্ষা ও সংস্কৃতি অপেক্ষা উচ্চতর, যেহেতু যে সাধারণ মজুর লইয়া সোভিয়েট সমাজ গঠিত সেই সমাজগঠনপ্রণালীর জটিলতা সম্বন্ধে সকলে অভিজ্ঞ। ইহারই ভিতর হইতে এমন একটি বুদ্ধিজীবিসম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে, যাহার প্রধান ও ঐকান্তিক কার্য জনসেবা। জনসাধারণের ভিতর হইতে ইহাদের উদ্ভব বলিয়া ইহারা জনসাধারণের হৃদয়ে আত্মীয়ের মত প্রবেশ করিতে পারিয়াছে। তাহাদের ধৈর্য ও অবিচল সমাজতন্ত্রী আদর্শনিষ্ঠা সাধারণ মানুষের অন্তরে কল্যাণকুসুম ফুটাইয়া তুলিয়াছে, শুভবুদ্ধি জাগ্রত করিয়াছে। সুতরাং যে নূতন সভ্যতার সুফল সমাজতন্ত্রী মানুষ, তাহার ক্রমবিকাশে সোভিয়েট সাংস্কৃতিক আদর্শ যাদুমন্ত্রের মত কার্যকরী হইয়াছে।

বিশ্বসভ্যতায় রাশিয়ার দান অবজ্ঞার বস্তু নয়। এপর্যন্ত একদল চতুর স্বার্থপর লোক কেবলমাত্র তাহার 'শোণিত-স্নান' ও 'শুদ্ধিকরণের' কথা প্রয়োগ করিয়া আসিয়াছে। এই পুঁজিবাদিগণ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে মানবসমাজের কল্যাণকর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলিকে হস্তগত করিয়া লইয়া পেষণ ও শোষণ চালাইতেছে। যে প্রকৃতিকে আমরা এতকাল নিয়তির মত ভয় করিতাম, বিজ্ঞানের প্রসাদে আমরা তাহাকে আজ দাসীর মতো খাটাইতেছি। যে এরোপ্লেন দূরত্ব ও সময় জয় করিয়াছে সেই এরোপ্লেন হইতে বিস্ফোরক বোমা পড়িতেছে, যে রেডিও সংবাদ ও শিক্ষাবিস্তারের প্রধান সহায় হইতে পারিত, সেই রেডিও দ্বারা মিথ্যা প্রচার চলিতেছে, যে কারখানায় সুষ্ঠুভাবে জীবনধারণের উপযোগী বস্তুসম্ভার উৎপাদন হইতে পারিত, তাহাতে যুদ্ধের মালমসলা ও মানুষকে মারিবার ভয়াবহ যন্ত্র প্রস্তুত হইতেছে, এবং যাহারা বস্তু উৎপাদনের জন্য প্রাণপাত করিতেছে, তাহারাই অনাহারে মৃত্যু বরণ করিতেছে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে মানবসমাজের যে দুর্গতি হইয়াছে তাহার হাত হইতে মানুষকে বাঁচাইতে হইবে—সোভিয়েট রাশিয়ার ইহাই লক্ষ্য। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সকল সুবিধা, মানুষের অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তি জাগ্রত করিবার সকল সুযোগ সকল মানুষ সমানভাবে ভোগ করিবে, এই দৃষ্টিভংগী বিশ্বসভ্যতাক্ষেত্রে রাশিয়ার সর্বপ্রধান দান। কি করিয়া বিজ্ঞানকে দৈনন্দিন জীবনের সহিত যুক্ত করিয়া মানুষের জীবনকে সুখময় মধুময় ও কল্যাণময় করিয়া তুলিতে পারা যায়, কি করিয়া ভাবালুতা উৎসাদন করিয়া আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত করিতে পারা যায়, তাহা রাশিয়া পৃথিবীকে প্রথম দেখাইয়াছে। এজন্য তুহিনাবৃত সাইবেরিয়ার ঊষরক্ষেত্র নয়নজুড়ানো শ্যামলিমায় ভরপুর হইয়া উঠিয়াছে, চলন্ত সমাধির অন্ধকার গহ্বর হইতে বহির্গত হইয়া নারীগণ সূর্যলোকে প্রস্ফুটিত শতদলের মত শোভা পাইতেছে, পরিশ্রম শ্রদ্ধার বস্তু বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, লাল-ফৌজ পৃথিবীর মুক্তিবার্তার প্রচারক হইয়াছে। কলহ লোভ ঈর্ষা-দীর্ণ পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে সোভিয়েট সাম্য ও উদারতার বাণী ও আদর্শ একমাত্র উপায়। ইহাই সোভিয়েট রাশিয়ার গৌরব এবং ইহাই বিশ্বসভ্যতায় তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ দান।

আগমনী

শ্রীনকুলেশ্বর পাল, বি-এল

ফিরে যা পাষাণী, বাংলা শ্মশানে আর কেন আসা সর্ব্বনাশী
ত্রিনয়নে তোর জ্বালানো আগুন অধরে অট্ট অট্ট হাসি।
দেখ্ চেয়ে দেখ্ কোটী সন্তান শবের বক্ষে আগুন জ্বালা
সারা বাংলায় উঠে হাহাকার চিতার বুকেতে বহ্নি ঢালা।
ভাতের অভাবে রোগে ও শোকে লক্ষ লক্ষ দিতেছে প্রাণ
মৃত জননীর বক্ষে দেখেছি শিশুরে করিতে স্তন্য পান!
মানুষে কুকুরে যুদ্ধ করছে আঁস্তাকুড়ের ভাতের লাগি
প্রাণের প্রদীপ বাঁচাতে পারেনি দ্বারে দ্বারে দুটী ভিক্ষা মাগি!
কোথা ছিলি তুই পাষাণতনয়া পাষাণে গঠিত পাষাণ-হিয়া
সন্তান তোরে করে আবাহন রুধিরযজ্ঞে আহুতি দিয়া।
মেনকা মায়ের আঁখিজলে আজ সারাটী ভুবন ভাসিয়া যায়
বিবসনা আজি দেশকল্যাণী ঢাকিতে পারে না লজ্জা হায়।
কোটী কঙ্কাল বস্ত্রের লাগি ডাকিছে 'লজ্জা নিবার মাগো'
উমা বেশে নয় ভীমা ভয়ঙ্করা শবাসনা শিবে জাগো মা জাগো।
রুধির পিয়াসী খড়্গ উঠাও গলায় পর মা মুণ্ডমালা
থর থর থর কাঁপুক মেদিনী ত্রিনয়নে তোর বহ্নি জ্বালা।
কোটী সন্তান জাগিয়া উঠুক অমর দৃপ্ত লভিয়া প্রাণ
প্রাণের প্রদীপ উঠুক জ্বলিয়া ঘরে ঘরে আগমনীর গান।
মরার মতন বাঁচিতে চাহি না বাঁচার মতই বাঁচিতে চাই
আর কারে ডরি ওমা শঙ্করী যদি গো মা তোর অভয় পাই।

গীতার বাণী

শ্রীতারাপদ চৌধুরী, বি-এ

হিন্দুধর্ম্মরূপ অনন্ত শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট মহান মহীরুহের মূল অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাই—উহা প্রধানতঃ তিনটি শাস্ত্রগ্রন্থের উপর প্রতিষ্ঠিত—উপনিষৎ, ব্রহ্মসূত্র এবং শ্রীভগবদ্‌গীতা। এই গ্রন্থত্রয় প্রস্থানত্রয় বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাদের মধ্যে উপনিষদের প্রসিদ্ধিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কারণ উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য সত্যসকল অপৌরুষেয়। উহাতে সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরের অলৌকিক জ্ঞানরাশি সন্নিবেশিত। ঋষিনামধেয় মহাপুরুষগণ ঐ জ্ঞানরাশি অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম যোগদৃষ্টিসহায়ে প্রত্যক্ষ করিয়া সেই সত্যসকল উপনিষৎ আকারে মানবসমাজে প্রচার করিয়াছেন। ঋষিগণ ঐ সত্যসমূহের আবিষ্কর্ত্তা মাত্র—রচয়িতা নহেন। উপনিষদের পরই বেদান্তসূত্র বা ব্রহ্মসূত্র এবং গীতার প্রামাণ্য। ব্রহ্মসূত্রে উপনিষদুক্ত সত্যসকলকে প্রণালীবদ্ধ সূত্রাকারে গ্রথিত ও পরমতখণ্ডন করিয়া বেদান্তমত স্থাপনের চেষ্টা করা হইয়াছে; এই জন্য ইহার অপর নাম ন্যায়-প্রস্থান। উপনিষদের নাম শ্রুতি-প্রস্থান। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদের এক মহাভাষ্যস্বরূপ। সমগ্র উপনিষৎ হইতে সার সংগ্রহ করিয়া সাধারণের বোধ্য ভাষায় এবং সর্ব্বসাধারণের উপযোগী করিয়া বৈদান্তিক জ্ঞান প্রচারই গীতার উদ্দেশ্য।

> সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
> পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥

উপনিষৎ যেন গাভীস্বরূপ, আর গীতাকার শ্রীকৃষ্ণ যেন সেই গাভীসকলের দোহনকর্ত্তা, তিনি পার্থরূপ বৎসকে অবলম্বন করিয়া উপনিষদের সার গীতারূপ দুগ্ধ সুধীব্যক্তিগণকে পরিবেশন করিয়াছেন। শ্রুতিপ্রতিপাদ্য সত্যসকল সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য করিয়া তাহাদের দৈনন্দিন জীবন ঐ জ্ঞানদ্বারা পরিচালন করিতে শিক্ষা দিয়া গীতা স্মৃতি-পদ-বাচ্য হইয়াছেন। এইজন্য ইহার অপর নাম স্মৃতিপ্রস্থান। হিন্দুদের মধ্যে বহু সম্প্রদায় বিদ্যমান এবং এই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সাধ্য ও সাধনতত্ত্বের প্রভূত বৈসাদৃশ্য থাকাসত্ত্বেও প্রস্থানত্রয়ের প্রামাণ্য স্বীকারে সকলগুলিই একমত। যে সম্প্রদায় প্রস্থানত্রয়ের প্রামাণ্য স্বীকার না করে তাহা কখনই হিন্দুশব্দবাচ্য হইতে পারে না। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম প্রকৃতপক্ষে হিন্দুধর্ম্মের শাখা হইলেও প্রস্থানত্রয়ের প্রামাণ্য অস্বীকার করায় হিন্দুধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

প্রস্থানত্রয়ের মধ্যে শ্রুতিপ্রস্থান সাধারণের দুর্ব্বোধ্য। ব্রহ্মসূত্রে সূত্রাকারে বেদান্তমত প্রচারের চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু সূত্রসকলের সংক্ষিপ্ততা এবং দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃত ভাষার প্রয়োগ বশতঃ উহা হইতে কোন একটি প্রণালীবদ্ধ দার্শনিক মত আবিষ্কৃত না হইয়া দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত, অদ্বৈত প্রভৃতি নানা মত সৃষ্ট হইয়াছে। গীতায় কিন্তু এরূপ জটিলতা কিছু মাত্র নাই। উহা অতি সুন্দর সুললিত ভাষায় লিখিত। এবং উহাতে সকল মতেরই এক অপূর্ব্ব সুসামঞ্জস্য বিদ্যমান। যাঁহারা কোন মতবিশেষের প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ না

করিয়া সরল অসাম্প্রদায়িক ভাবে ইহা পাঠ করিবেন তাঁহারা সহজেই ইহার অপূর্ব্ব সমন্বয় ভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন। শ্রদ্ধাবান্ উদার পাঠক মাত্রেই আপন যোগ্যতা ও রুচি অনুযায়ী ভাব গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মজীবন গঠনের প্রভূত উপাদান ইহাতে সন্নিবেশিত দেখিতে পাইবেন। এই জন্যই সর্ব্বসাধারণে গীতাশাস্ত্রের এত সমাদর। সহস্র বৎসর ধরিয়া হিন্দুগণ গায়ত্রী ও গঙ্গার ন্যায় গীতাকেও ঘরে ঘরে পূজা করিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমানে কালচক্রের পরিবর্ত্তনে হিন্দুসমাজের অনেক পরিবর্ত্তন আসিলেও গীতা-শাস্ত্রের সমাদর বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হইবার কোন আশঙ্কাই উপস্থিত হয় নাই। যতকাল ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুজাতির মধ্যে ধর্ম্মের সমাদর থাকিবে ততদিন গীতাশাস্ত্রেরও সমাদর অক্ষুণ্ণই থাকিবে। শুধু হিন্দুগণ কেন যে কোন ধর্ম্মের যে কোন জাতির যে কোন কালের প্রকৃত ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিই গীতাশাস্ত্র পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন ও হইবেন। অদ্যাপিও বৈদেশিক বুধমণ্ডলীর ইহা এক পরম আদরণীয় গ্রন্থ। গীতার এই সার্ব্বজনীনত্বের কারণ উহার অদ্ভুত সমন্বয়ভাব। গীতাতে দ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত এই তিনটি দার্শনিক মতই সমভাবে আদৃত হইয়াছে। গীতোক্ত ঈশ্বর নির্গুণ সগুণ উভয়ই—"নির্গুণ গুণময়"।

সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ॥

"সর্ব্বত্র চক্ষু, শির ও মুখবিশিষ্ট, সর্ব্বত্র কর্ণযুক্ত, তিনি লোকে সমস্ত পদার্থ ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন। তিনি সকল ইন্দ্রিয় ও তাহাদের গুণ দ্বারা প্রকাশিত ; তিনি সমস্তইন্দ্রিয়বর্জ্জিত, অসক্ত, সকলের পোষণকারী। আবার তিনি নির্গুণ এবং গুণসকলের পালক।" এই শ্লোক দ্বারা শ্রীভগবানের নিত্য ও লীলা এই দুইটিই স্বীকৃত হইয়াছে। নিত্য অবস্থায় ভগবান নির্গুণ, নিরাকার, সর্ব্বোপাধিবর্জ্জিত, সচ্চিদানন্দস্বরূপ, আবার লীলা-অবস্থায় তিনি অনন্ত কল্যাণের আকর, সর্ব্বভূতান্তর্য্যামী, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান্, পরমেশ্বর। প্রথমোক্তটি অদ্বৈত-বাদীর উপাস্য সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম এবং দ্বিতীয়টি বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদীর আরাধ্য অনন্ত কল্যাণগুণময় পরমেশ্বর। এতাদৃশ তিনিই আবার দ্বৈতবাদী ভক্তের জন্য লীলায় সাকার বিগ্রহবান। যেমন তিনি 'তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য' বলিয়া অর্জ্জুনকে শঙ্খ চক্র গদাধারী নারায়ণ মূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন। নরলীলায় তিনি মানুষের নিকট মানব আকারে আসিয়া তাহাকে জ্ঞান ভক্তি শিক্ষা দেন এবং তাহার হৃদয়ের শ্রদ্ধাপ্রীতি গ্রহণ করেন, একথাও গীতায় স্বীকৃত হইয়াছে।

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥

"আমি জন্মশূন্য অবিনশ্বর ভূতসকলের ঈশ্বর হইয়াও নিজ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া নিজ মায়ার দ্বারা জন্মগ্রহণ করি অর্থাৎ অবতীর্ণ হই।" ইহাও গীতায় ভগবানের স্বমুখোক্তি। সুতরাং সগুণ উপাসক দ্বৈতবাদিগণ সগুণ নিরাকার ও সর্ব্বব্যাপী সকল জীবের সমষ্টি ও সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বরের উপাসক বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ এবং নির্গুণ ব্রহ্মোপাসক অদ্বৈতবাদিগণ সকলেই গীতা হইতে আপন আপন উপাস্য দেবতার সন্ধান পাইয়া থাকেন। বস্তুতঃ এই তিনটি যে পরস্পরবিরোধী নহে, একটী অপরটির সোপানমাত্র, জীবাত্মা দ্বৈত হইতে বিশিষ্টাদ্বৈতে এবং বিশিষ্টাদ্বৈত হইতে অদ্বৈত সাধনায় ক্রমানুসারে স্বাভাবিক ভাবে উপস্থিত হয়, একথা গীতায় স্বীকৃত হইয়াছে। আর জগতের বিভিন্ন প্রকৃতি এবং সাধনার বিভিন্ন স্তরে বর্ত্তমান নরনারীগণ স্বভাবতঃ এই সকল কোন না কোন

বাদের প্রতি অনুরক্ত। গীতাশাস্ত্র তাহাদের সকলের নিকটেই সমভাবে আদরণীয়। এইত গেল সাধ্যতত্ত্বের সমন্বয়। সাধনতত্ত্ব সম্বন্ধেও গীতার অদ্ভুত সমন্বয় বিশ্বের বিস্ময়াবহ। সাধনার বিষয়েও গীতাকার সকলের জন্যই এক বিশিষ্ট সাধনার ব্যবস্থা করেন নাই। কিন্তু বিভিন্ন রুচি প্রকৃতি ও শক্তিবিশিষ্ট মানুষের জন্য বিভিন্ন প্রকারের সাধনার ব্যবস্থা করিয়াছেন। গীতার মহান শিক্ষা—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।

"যাহারা যেরূপে আমাকে উপাসনা করে আমি সেই প্রকারেই তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া থাকি।" সুতরাং জ্ঞান, যোগ, কর্ম্ম ও ভক্তি এই চতুর্ব্বিধ সাধনমার্গই গীতায় সমভাবে সমাদৃত হইয়াছে। গীতাকার বলিতেছেন—

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে॥
অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বাঽন্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ॥

"কেহ ধ্যানদ্বারা, কেহ জ্ঞানযোগদ্বারা, কেহ অষ্টাঙ্গ যোগদ্বারা এই আত্মাকে দর্শন করেন, কেহ কিন্তু আচার্য্যের নিকট উপদেশ শুনিয়া উপাসনা করেন, তাঁহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক উপদেশ শ্রবণ করায় মৃত্যুকে অতিক্রম করেন।" আবার বলিতেছেন—

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥

"যিনিই একান্ত ভক্তিযোগে আমাকে সেবা করেন তিনি সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই গুণত্রয় সম্যক্ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভাবের যোগ্য হন অর্থাৎ মোক্ষলাভে সমর্থ হন।" সুতরাং সকল সাধনার শেষ যে আত্মদর্শন তাহা জ্ঞান, ধ্যান, যোগ, ভক্তি, কর্ম্ম যে কোন উপায়েই লাভ করা যে সম্ভব ইহা গীতায় স্বীকৃত হইয়াছে। আবশ্যক শুধু শ্রদ্ধা ও ত্যাগ; এতদ্ব্যতীত কোন সাধনাই কার্য্যকরী হয় না। গীতা বলিতেছেন—"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।" গুরু ও শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসবান উপাসনাদিতে তৎপর এবং জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই জ্ঞান লাভ করেন। সকল সাধনার উহাই মূলভিত্তি, এতদ্ভিন্ন কোন সাধনায়ই সিদ্ধিলাভ সম্ভবপর নহে।

গীতার এক প্রধান অবদান নিষ্কাম কর্ম্ম। উপনিষদাদিতেও কর্ম্মযোগের অস্ফুট নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। ঈশোপনিষদে ঋষি বলিতেছেন—

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে॥

"যে ব্যক্তি জগতে শত বৎসর বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছুক তিনি নিষ্কাম কর্ম্ম করিয়াই বাঁচিতে ইচ্ছা করিবেন। এতদ্ব্যতীত কোনও উপায় নাই যাহাতে তোমাকে কর্ম্মে লিপ্ত না করিতে পারে।" এই শ্লোকে আমরা গীতোক্ত কর্ম্মযোগের মূলসূত্র উল্লিখিত দেখিতে পাই। কিন্তু উহা তত পরিস্ফুট নহে। ফলে পরবর্ত্তী যুগে জ্ঞানমার্গী সাংখ্যগণ ও কর্ম্মমার্গী যোগিগণের আবির্ভাব হইয়াছিল, ইহার আভাস আমরা গীতায় পাইয়া থাকি। জ্ঞানমার্গী সাংখ্যগণ সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আত্মানাত্মবিচারদ্বারা আত্মোপলব্ধিই পরম পুরুষার্থ বলিয়া প্রচার করিতেন এবং কর্ম্মমার্গী যোগিগণ যাগযজ্ঞাদি সকাম কর্ম্মের অনুষ্ঠানদ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক সুখভোগকেই পরম পুরুষার্থ বলিয়া প্রচার করিতেন। গীতাকার এই উভয় মতের সামঞ্জস্য করিয়া ধর্ম্মপথে অপূর্ব্ব আলোক বিকিরণ করিয়াছেন। গীতাকার বলেন—সাংখ্যবাদিসম্মত আত্মদর্শন বা ব্রহ্মদর্শনই মানবজীবনের পরম পুরুষার্থ—ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ দেহমন ও ইন্দ্রিয়জনিত কোন সুখ যতই সূক্ষ্ম হউক, কখনও চিরস্থায়ী হইতে পারে না, আর দুঃখভিন্ন সুখলাভ কখনই সম্ভব নহে। এজন্য শাশ্বত শান্তি লাভের একমাত্র উপায়—সুখদুঃখের অতীত অবস্থায়

পৌঁছিয়া আপনার সচ্চিদানন্দ স্বরূপের উপলব্ধি। তবে ঐ অবস্থা যে কেবল মাত্র জ্ঞান-বিচার দ্বারাই লাভ করা সম্ভব তাহা নহে। কর্ম্ম দ্বারাও সম্ভব যদি সেই কর্ম্ম নিষ্কাম ভাবে কৃত হয়। সুতরাং সাংখ্যবাদিগণ তাঁহাদের জ্ঞান-বিচার দ্বারা যে অবস্থায় পৌঁছিবেন যোগিগণও নিষ্কাম ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া সেই অবস্থায় পৌঁছিতে পারেন। "যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্ যোগৈরপি গম্যতে।" জ্ঞান দ্বারা যে অবস্থা লাভ করা যায়, কর্ম্মযোগ দ্বারাও তাহা লাভ করা সম্ভব। তবে জ্ঞানপথের অধিকারী বিরল—একমাত্র বিবেক-বৈরাগ্যবান শমদমাদিসম্পন্ন মুমুক্ষু যোগীরাই উহার অধিকারী।

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে ॥

"যে মানব আত্মাতেই রত, আত্মাতেই তৃপ্ত, আত্মাতেই সন্তুষ্ট তিনিই কেবল মাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচিন্তায় ব্যাপৃত থাকিতে পারেন, অপর সকলের কর্ত্তব্য কর্ম্ম অবশ্যই করণীয়।" সাধারণ ব্যক্তি ইচ্ছা করিলেও কর্ত্তব্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অবস্থান করিতে পারেন না। "নহি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।—দেহধারী জ্ঞানী ব্যক্তিগণ অশেষরূপে কর্ম্ম সকল কখনও ত্যাগ করিতে পারে না।" যদি সে জোর করিয়া দেহ-ইন্দ্রিয়াদিকে কর্ম্ম হইতে বিরতও রাখে, তবুও সে মনে মনে সর্ব্বদা কর্ত্তব্য চিন্তা করিবে এবং নানা বিষয়ে তাহার চিন্তা ধাবিত হইয়া তাহাকে দিন দিন আরও ঘোর বিষয়াসক্ত করিয়া তুলিবে। ইহাতে সে কপটাচারী হইতে থাকিবে এবং যোগ ও ভোগ উভয় মার্গ হইতেই ভ্রষ্ট হইয়া পড়িবে। সুতরাং পূর্ণ শুদ্ধ সাত্ত্বিক ভাব আসিয়া মন ব্রহ্মাবগাহী হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কর্ম্ম অবশ্য করণীয়। তবে অজ্ঞ ব্যক্তি যে ভাবে কর্ম্ম করে সে ভাবে কর্ম্ম করিলে মোক্ষ লাভের কোনই সহায়তা হইবে না। সাধারণ অজ্ঞ ব্যক্তি বাসনাপরবশ ও ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া কর্ম্ম করে। উহাতে মুক্তির কোন সহায়তা না হইয়া বন্ধনের পর বন্ধন বৃদ্ধি পায়। মুক্তিকামীর কিন্তু এইভাবে কর্ম্ম করিলে চলিবে না। তাহাকে প্রথমতঃ স্বধর্ম্মানুযায়ী অর্থাৎ জন্ম, স্বভাব, সামর্থ্য ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাসঞ্জাত কর্ত্তব্য কর্ম্ম বাছিয়া লইতে হইবে; অতঃপর সম্পূর্ণ ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত ও অভিমানশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিতে হইবে। এই কর্ম্মযোগ গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়েই ভগবান্ অর্জ্জুনকে উপদেশ করিয়াছেন:

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥

"তোমার কর্ম্মেই অধিকার, কর্ম্মফলে যেন তোমার কামনা না থাকে। তুমি কর্ম্মফলের প্রতি লক্ষ্য করিও না। কর্ম্মফলে তোমার আসক্তি যেন না হয়।" ইহাই গীতোক্ত কর্ম্মযোগ। আর গীতাকারের মতে "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ" স্বল্পমাত্রও নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান সংসার-ভয় হইতে পরিত্রাণ করে। গীতোক্ত এই কর্ম্মযোগ শুধু যে কর্ম্ম-যোগীদের জন্যই বিহিত হইয়াছে এমন নহে। শুধু কর্ম্মযোগদ্বারাই মুক্তিসম্ভাবনা গীতায় স্পষ্টতঃ স্বীকৃত হইয়াছে। নচেৎ "যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তৎ যোগৈরপি গম্যতে" "কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ" "একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্" ইত্যাদি গীতোক্ত বাক্য নিরর্থক হইয়া পড়ে। গীতায় স্পষ্টতঃ কর্ম্মযোগের মুক্তিদানের সামর্থ্য স্বীকৃত হইলেও অন্যান্য মোক্ষাকাঙ্ক্ষী যোগিগণ, জ্ঞানপন্থী, যোগপন্থী বা ভক্তিপন্থী যিনিই হউন না কেন—তাঁহাদেরও আপন আপন ভাবানুযায়ী নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধির বিধান গীতাকারের অভিপ্রেত। জ্ঞানপন্থীদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ—"ন

কর্ম্মণামনারম্ভাৎ নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে। ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥" কর্ম্ম না করিয়া নৈষ্কর্ম্ম্য বা সন্ন্যাস লাভ সম্ভব নহে। অতএব যদি সর্ব্ব কর্ম্ম সন্ন্যাস পূর্ব্বক জ্ঞানানুশীলন তোমাদের অভিপ্রেত হয়—তবে প্রথমতঃ নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা চিত্তের শোধন কর। আপনাকে অকর্ত্তা জানিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মে রত থাক। ভক্তিপন্থীর প্রতি গীতার উপদেশ—"যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ"—বিষ্ণুর আরাধনার্থ কর্ম্ম ভিন্ন অন্য কর্ম্ম করিয়াই মনুষ্যগণ বন্ধন প্রাপ্ত হয়। অতএব সকল কর্ম্ম শ্রীভগবানের প্রীত্যর্থ অনুষ্ঠান করিতে চেষ্টিত হও। অথবা "নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্" ভগবানকে যন্ত্রী ও আপনাকে যন্ত্র ভাবিয়া ভগবৎপ্রেরিত কর্ম্মে রত থাক। যোগীদের প্রতি গীতাকারের উপদেশ—

> আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
> যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥

যোগমার্গ-প্রাপ্তেচ্ছু ব্যক্তির পক্ষে কর্ম্মসাধন, আবার সেই ব্যক্তি যখন যোগারূঢ় হন তখন তাঁহার পক্ষে কর্ম্মত্যাগই বিহিত। সুতরাং আমরা দেখিতে পাই গীতার কর্ম্মযোগ কতদূর ব্যাপক। নিম্নাধিকারী ব্যক্তি মাত্রেরই (তিনি যে কোন যোগ মার্গেরই পথিক হউন) ইহা অবশ্য অবলম্বনীয়। যোগাধিকারিগণ কেবল ইহার দ্বারাই মোক্ষলাভে সমর্থ। যাঁহারা কথামৃতাদি পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের "নারকেলের বেল্লো শুকিয়ে গেলে আপনা হ'তে ঝরে পড়ে, জোর করে ফেল্‌তে হয় না।" "সংসারে থাকবে বড় লোকের বাড়ীর দাসীর মত।" "এক হাতে তাঁহার পাদপদ্ম ধ'রে, অপর হাতে সংসারের কাজ ক'রে যাও। সময় হ'লে দুই হাতেই তাঁহার পাদপদ্ম ধরতে পারবে।" "গৃহস্থের বউ অন্তঃসত্ত্বা হলে শাশুড়ী আপন হ'তে তার কাজ কমিয়ে দেন।" প্রভৃতি সরল উক্তির মধ্যে গীতোক্ত নিষ্কাম কর্ম্মেরই উপদেশ দেখা যায়। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার শ্রীগুরুপ্রদর্শিত পথে 'নর-নারায়ণ' সেবার প্রবর্ত্তন করিয়া নিষ্কাম কর্ম্মের এক অপূর্ব্ব পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বীর সন্ন্যাসী

শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু

মুহূর্ত্তের ইন্দ্রজালে ছিন্ন করি জীবনের শাশ্বত স্মরণে
তিমিরের পরপারে আলোকের উদাত্ত-আহ্বানে
কে তুমি আসিলে নিত্য অমৃতের পারাবারে ভাসি
　　বীরবেশে তুমি হে সন্ন্যাসি!
কোন দূর দিগন্তের অন্তহীন জ্যোতির্লেখা পরে
নিবারিতে বীর্য্যশূন্য অক্ষমের মুগ্ধ ক্লীবত্বেরে
অনন্ত যাত্রার পথে তব ক্ষণিক স্থিতির দান
　　রেখে গেলে সন্ন্যাসী মহান!
তুচ্ছতার আবর্জ্জনা অনৃতের আস্ফালন হতে
তন্দ্রাহত এ জাতির মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চারিতে
ঊর্দ্ধে তুলি ভৈরবের ভয়াল বিষাণে
　　ডাক দিলে সংহারী ঈশানে।
জীর্ণ জীবের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সে দিনের সে আবাহন
উদ্বোধনী লগ্নমাঝে জন্ম নিতে মৃত্যু করি পণ
সপ্তসূর্য্যরশ্মিভালে দুর্দ্দমের দুর্ব্বার বিক্রমে
　　জাগাইলে প্রচণ্ড আক্রমে।
শতাব্দীর নির্ব্বিরোধ সহনের সেই ইতিহাস
বজ্রাগ্নিতে নহে—তুষানলে আহুতির পরিহাস
বরণ করেছে যারা, তাদের সে গ্লানি
　　কণ্ঠে তব লইলে যে টানি।
বেদান্তের দুন্দুভিনিনাদে ভ্রষ্ট আত্মা পশ্চিম আবার
ফিরিয়া দেখিল চাহি রাগরক্ত দূর পূর্ব্বাশার
নূতন তোরণদ্বারে আগমনী অগ্র পদধ্বনি
　　শুনিল সে সন্ন্যাসীর বাণী।
মরণের দ্বারদেশে বিজয়ীর করাঘাত হানি
অমৃতেরে কণ্ঠে ঢালে যারা—বাধারে না মানি
তাদের রক্তের বাণী বাণীতে তোমার মিশে
　　কল্লোলিয়া উঠিল সে দেশে।
রক্তমেঘ ছিন্ন করি ছিন্ন করি বাধার বলয়ে
উল্কাসম আসে যারা যুগান্তের অশান্ত প্রলয়ে
দুর্জ্জয়ের সেই মর্ম্মে আসন পাতিয়া নিত্য
　　উল্লসিত করি সব চিত্ত।
পুরাতনে প্রাণ দেয় যেবা নূতনের নব অঙ্গীকারে
এ ধূলির টিকা লয়ে এ ধূলিরই মিথ্যা খেলাঘরে
সত্যের প্রতিষ্ঠা করে অপরূপ মহিমার শিরে
　　মর্ত্ত্য তারে প্রণমিয়া বরে।

কোষ্ঠী-বিচারে ভাব-স্ফুট ও ভাব-সন্ধি এবং স্পষ্ট-গ্রহের দৃষ্টি-বিচার

স্বামী চিন্ময়ানন্দ

রাশি ও ভ-চক্র

রাশি-চক্র (Zodiac) ও ভ-চক্র (Ecliptic) উভয়েই বার সমভাগে বিভক্ত। এই চক্র বা গোল-বৃত্ত ৩৬০° অংশ পরিমিত। সুতরাং এক-এক ভাগ ৩০° অংশ পরিমিত হইতেছে। এই ৩০° অংশ পরিমিত এক-এক ভাগকে রাশি (sign), ভাব[১], ঘর বা house বলা হইয়া থাকে। সাধারণতঃ সূর্য্যের সংক্রমণমার্গের উভয়-পার্শ্ববর্ত্তী ৮° অংশ পরিমিত গোলবৃত্তকে রাশি-চক্র (Zodiac) বলা হয়। কিন্তু ব্যবহারে সূর্য্যের সংক্রমণ-মার্গ অথবা ভ-চক্র বা ক্রান্তি-বৃত্ত (Ecliptic)-কেও রাশি-চক্রই (Zodiac) বলা হইয়া থাকে। এইরূপ বলিবার হেতু ইহাই যে রাশি-চক্রের বা ভ-চক্রের, এমন কি বিষুব-বৃত্তেরও, ৩৬০° অংশ পরিমিত গোল-বৃত্ত মেষাদি দ্বাদশ রাশির[২] নামেই বিভক্ত করা হয়।

স্থূল ভাবে কথিত এই রাশি-চক্রে সূর্য্যকে একবার সংক্রমণ সম্পূর্ণ করিতে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা ৯ মিনিট কাল সময় লাগে। সুতরাং মেষাদি বারটি রাশির প্রতি রাশিতে সূর্য্যের স্থিতিকাল কিঞ্চিদধিক ৩০ দিন।

এইরূপ মেষাদি এক-এক রাশিতে সূর্য্য ১ মাস, চন্দ্র ২ দিন ১৫ দণ্ড, মঙ্গল ৪৫ দিন, বুধ ১৮ দিন, বৃহস্পতি প্রায় ১ বৎসর, শুক্র ২৮ দিন, শনি ২ বৎসর ৬ মাস, রাহু ও কেতু ১ বৎসর ৬ মাস কাল অবস্থান করে। কখনও কখনও গতির ন্যূনাধিক্যে ইহাদের কিঞ্চিৎ হ্রাস-বৃদ্ধি হইতে পারে।

ভাব ও ভাব-স্ফুট

ভূ-কেন্দ্রীয় দৃষ্টিতে সূর্য্যের দুই প্রকারের গতি প্রতীত হয়:—(১) বার্ষিক বা অয়ন-গতি ও (২) দৈনিক গতি। (১) বার্ষিক গতিতে ভ-চক্রে মেষাদি এক-এক রাশির বৈশাখাদি এক-এক মাসে[৩] ভোগ হইয়া থাকে। (২) দৈনিক গতিতে ১২টি রাশিতেই প্রত্যহ সূর্য্যের সঞ্চার হয়। যে দিন যে রাশিতে উদয় হয়, দিবা-রাত্রিতে তাহা হইতে পর পর ১২টী রাশির

১ ০° অংশ হইতে ৩০° অংশ পর্য্যন্ত মেষ রাশি, ৩০° অংশের পর হইতে ৬০° অংশ পর্য্যন্ত বৃষ রাশি; এইরূপে প্রতি রাশি (sign) সমান ৩০° অংশ পরিমিত। কিন্তু পৃথিবীর বিষুব-বৃত্ত (Equator) হইতে যত বেশী উত্তর বা দক্ষিণ অক্ষাংশে জাতকের জন্ম হয়, তাহার কুণ্ডলীর ভাব-সমূহ তত বেশী ছোট বড় হইয়া থাকে। ফলে ভাব বা ঘরসমূহের কোনওটি ৩০° অংশের উপরেও হয়, আবার কোনটি তাহার নীচেও হইতে পারে।

২ মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন এই দ্বাদশ রাশি।

৩ এক রাশির অংশ-সংখ্যা ৩০ ও মাসের দিন-সংখ্যাও কিঞ্চিৎ ন্যূনধিক ৩০; সুতরাং সূর্য্যের এক এক দিনে প্রায় ১° অংশ সংক্রমণ করিয়া ন্যূনাধিক ৩০ দিনে ৩০° অংশ সংক্রমণের পরে (সূর্য্যের) রাশ্যন্তর বা মাসান্তরে গতি হয়।

ভোগান্তে পুনরায় পর দিন, এক মাস যাবৎ, সূর্য্য ঐ রাশিতেই উদিত হয়। এইরূপ জাতকের জন্ম-সময়ে উদিত রাশিকে অর্থাৎ কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক প্রায় দুই ঘণ্টা পর পর এক-এক রাশি পূর্ব্ব ক্ষিতিজে উদিত হইতে থাকিলে জাতকের দিবা বা রাত্রিতে জন্মসময়ে যে রাশি পূর্ব্ব-ক্ষিতিজে উদিত হইল, তাহাকে "লগ্ন" বা তনু-ভাব বলে।

রাশিও বারটী এবং 'ভাব'ও বারটী। সুতরাং যাহার জন্ম-সময়ে মেষ-রাশি পূর্ব্ব-ক্ষিতিজে উদিত হইল, তাহার প্রথম রাশি মেষই লগ্ন বা প্রথম ভাব। কিন্তু যাহার জন্মসময়ে অন্য রাশি উদিত হয়, তাহার সেইটীই লগ্ন বা তনু বা প্রথম ভাব। সুতরাং যাহার জন্মে কর্কট রাশি উদিত, তাহার চতুর্থ রাশি কর্কট প্রথম ভাব। আবার জন্ম-কালে ঠিক পূর্ব্ব-ক্ষিতিজে এক রাশিতে ৩০° অংশই উদিত হয় না; ০° অংশ হইতে ৩০° অংশের যে কোনও উদিত অংশে জাতকের জন্ম হইতে পারে। এ জন্য ভাবের পরিমাণ এবং ভাবের প্রারম্ভ ও অন্ত্য বিন্দু লইয়া নানারূপ মতবিরোধ দেখা যায়।

হিন্দুজ্যোতিষে এক মত এইরূপ পাওয়া যায় যে, যে গ্রহ যে রাশিতে আছে, ঐ রাশি লগ্ন হইতে যত ঘর বা রাশি দূরে অবস্থিত, তত সংখ্যক ভাবও তাহাই। অর্থাৎ অখণ্ডিত মেষ, বৃষ আদি রাশিই প্রতি ভাবরূপে লওয়া হয়। 'ভৃগু-সংহিতা', 'গৌরী-জাতক' আদিতে এইরূপ লগ্ন-রাশি হইতে অখণ্ডিত রাশি রূপ ভাবই স্থূলভাবে গ্রহণ করা হইয়া থাকে।

অন্যমতে, লগ্ন-রাশি জন্ম-কালে যত সংখ্যক অংশে উদিত হয়, তাহার ১৫° অংশ পূর্ব্বে ও ১৫° অংশ পরে লইয়া তনু-ভাব; এইরূপ পরবর্ত্তী ত্রিশ-ত্রিশ অংশে ধন-ভাব আদি এক-এক করিয়া দ্বাদশটী ভাব[৪] ধরা হয়।

যে জাতকের বিষুব-বৃত্তের (Equator) উপরবর্ত্তী কোনও স্থানে জন্ম, তাহার কোষ্ঠীতে প্রতি ভাবের পরিমাণ সমান ৩০° অংশ হইতে পারে। কিন্তু যতই বেশী উত্তর অক্ষাংশস্থ স্থানে জাতকের জন্ম হইবে, ভাবগুলি তত বেশী অসমান হইবে; এমন কি কখনও কখনও একটী রাশিতে দুইটী ভাব-মধ্য-স্ফুট হইতে পারে এবং কখনও একই ভাব তিনটী রাশিকেও স্পর্শ করিতে পারে। এইজন্য প্রামাণিক গ্রন্থ "বৃহৎপরাশর" ও "শ্রীপতি-পদ্ধতি" আদিতে ভাব-স্ফুটের উপর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। ভাব-স্ফুট এবং ভাব-সন্ধির গণনা ও শুদ্ধতার জন্য নানারূপ বিধিও আছে।

উপরোক্ত গ্রন্থানুযায়ী অক্ষাংশ, পলভা ও লঙ্কোদয় আদি অনুসারে লগ্নাদি সকল ভাব শুদ্ধভাবে গণনা করা সাধারণ কোষ্ঠী প্রস্তুত-কারকের পক্ষে খুবই কঠিন মনে হয়। এজন্য জাতকের জন্ম-কালীন স্থানীয় সময়কেই 'নাক্ষত্রিক সময়' বা 'বিষুব-কালে'[৫] (Sidereal Time) পরিবর্ত্তিত করিয়া তদনুসারে জাতকের স্থানীয় অক্ষাংশাদির জন্য ত্রিকোণমিতি (Trigonometry) সাহায্যে বা লগ্নাদি ভাব-নির্ণয়ের 'সারণী'[৬]

৪ তনু (লগ্ন), ধন, সহজ (ভ্রাতা), বন্ধু, পুত্র (বিদ্যা), শত্রু (রোগ), পত্নী, মৃত্যু, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আয় ও ব্যয় নামক দ্বাদশ ভাব।

৫ এই নাক্ষত্রিক সময় বা 'বিষুব-কাল' "বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকাতে" প্রাত্যহিক দিন-পঞ্জিকার বামদিকে শুম্ভে (margin) পঞ্চম পংক্তিতে প্রত্যহ কলিকাতার ১২ ঘটিকা সময়ের দেওয়া থাকে। জাতকের স্থানীয় জন্ম-সময় ও বিগত ১২ ঘটিকার অন্তর এই মাধ্যাহ্নিক বিষুব-কালে যোগ করিয়া (এবং 'অন্তর'-কালে ঘণ্টা প্রতি ১০ সেকেণ্ডের ধন-সংস্কার পূর্ব্বক) জন্ম-সময়ের 'বিষুব-কাল' পাওয়া যায়।

৬ "বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার" প্রতি বৎসরে পঞ্জিকা-প্রারম্ভে "সরল-লগ্ন-নির্ণয়সারণী" শীর্ষকে কয়টী অক্ষাংশের

(Table of Houses[৭]) অনুসারে অতি সহজেই তনু আদি বারটী ভাব ও ভাব-স্ফুট বাহির করা যায়। যাঁহারা অতি অল্প পরিশ্রমে নির্ভুল লগ্নাদি গণনা করিতে চান, তাঁহাদের জন্য জন্ম-কালীন সময়কে 'নাক্ষত্রিক সময়ে' পরিবর্ত্তিত করিয়া জন্ম-স্থানীয় ভৌগোলিক অক্ষাংশ (Geographic—Terrestrial—Latitude)-কে ভূকেন্দ্রীয় অক্ষাংশ (Corresponding Geocentric Latitude)-রূপে সংস্কার[৮] করিয়া তদনুসারে লগ্নাদি ভাব-নির্ণয়ের 'সারণী' (Table of Houses) দেখিয়া দ্বাদশ ভাবের নির্ণয় করাই অতি সুগম ও সহজ।

জন্য প্রতি দশ দশ অংশের ব্যবধানে লগ্ন (তনুভাব) ও দশমভাবে সারণী দেওয়া থাকে।

৭ Mr. M. Vijaya Raghavulu B. A., M. B. & C. M. প্রণীত "The Century Table of Houses" নামক সারণী-গ্রন্থখানিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহাতে ০° অক্ষাংশ হইতে ৬০° অক্ষাংশস্থ স্থান-সমূহের জন্য প্রতি অখণ্ড অক্ষাংশীয় দ্বাদশ ভাব ত্রিকোণমিতির সূত্রানুযায়ী গণিত থাকায়, কোষ্ঠী-প্রস্তুতকারকের পক্ষে নির্ভুল দ্বাদশ ভাব নির্ণয়ে অতি সহায়ক ও সহজবোধ্য হইবে। স্থূলভাবে "Raphael's Tables of Houses for Northern Latitudes" দ্বারাও দ্বাদশ ভাবের নির্ণয় করা যাইতে পারে।

৮ জন্ম-স্থানীয় Geographic Latitude (ভৌগোলিক অক্ষাংশ)-কে তাহার Corresponding Geocentric Latitude এ (ভূকেন্দ্রীয় স্থানীয় অক্ষাংশে) পরিবর্ত্তিত করিতে 'সংস্কার' এর জন্য এই সূত্র (Formula) ব্যবহার করা হইয়া থাকে ; যথা—

$$L.\ tan\ A = L.\ tan\ B \pm 9{\cdot}997071$$

এই সূত্রে 'A' Geocentric Latitude এবং 'B' Geographic Latitude বুঝিতে হইবে ; এবং উত্তর অক্ষাংশের জন্য '+' যোগ) ও দক্ষিণ অক্ষাংশের জন্য '−' (বিয়োগ) সংস্কার ধরিতে হইবে।

(পূর্ব্বোক্ত M. Vijaya Raghavulu প্রণীত 'Mathematical Astrology'-র পরিশিষ্ট সারণী-সংখ্যা ৪, অথবা 'Hindu Astrological calculations'-র পরিশিষ্টে সারণী-সংখ্যা ৭ হইতে জাতকের জন্ম-স্থানীয় ভৌগোলিক অক্ষাংশের গৃহীত 'সংস্কার-ফল' যোগ বা বিয়োগ করিয়া লইলেই corresponding geocentric latitude, উক্ত সূত্রানুযায়ী অঙ্ক না কষিয়াও, সোজাসুজি ভাবে সহজেই পাওয়া যাইবে।)

অয়নাংশ ও আদি-বিন্দু

হিন্দু জ্যোতিষ অনুসারে কোষ্ঠী-গণনায় ও বিচারে সায়ন গ্রহ-স্ফুট ও ভাবস্ফুটে জন্ম-কালীন অয়নাংশ (Total precessions of the equinoxes) বাদ দিয়া তদনুসারে ফল-কথন করা হয়। Plane of Equator (বিষুব-বৃত্ত) ও Plane of the Ecliptic (ক্রান্তি-বৃত্ত)-র মধ্যবর্ত্তী কোণ (Angle) বা ক্ষেত্র সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল। এই পরিবর্ত্তন প্রতি বৎসরে ৫০".২৬৬ সেকেণ্ড। কোষ্ঠী-বিচারে গ্রহ-স্ফুট ও ভাব-স্ফুটে সংস্কার্য্য এই অয়নাংশ অতি নির্ভুল হওয়া দরকার।

কিন্তু বর্ত্তমান বিজ্ঞ জ্যোতিষিগণের মধ্যেও এই আদি-বিন্দু ও অয়নাংশ[৯] লইয়া নানারূপ মত-ভেদ দেখা যায়। কেবল বাঙ্গলা ও ভারতবর্ষে নহে, ইউরোপ ও আমেরিকার জ্যোতিষিক গবেষক পণ্ডিতগণের মধ্যেও এ বিষয়ে নানারূপ অস্থির সিদ্ধান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দু-জ্যোতিষেও বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন মতে বিভিন্ন প্রকারে নির্ণীত বিভিন্ন অয়নাংশ পাওয়া যায়। এজন্য ভারতীয় প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী কেতকার আদি মতানুযায়ী হিন্দু-জ্যোতিষানুসারে বর্ত্তমানে ২৩°

৯ 'আদি-বিন্দু' ও 'অয়নাংশ' সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা লেখকের "পঞ্জিকা" শীর্ষক প্রবন্ধে, 'উদ্বোধন' চৈত্র-সংখ্যা, ১৩৫৩, পৃঃ ১৩৯ ও ১৪০ দ্রষ্টব্য। 'আদি-বিন্দু' (Both fixed and movable first point of Aries) সম্বন্ধে ঐ প্রবন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে ; সুতরাং আর এখানে আদি-বিন্দু ও অয়নাংশ সম্বন্ধে পুনরুক্তি করা হইল না।

অংশ[10] পরিমিত অয়নাংশই গ্রহণ করিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্যোতিষ-শাস্ত্রে বিজ্ঞ ও বঙ্গীয় ও ভারতীয় জ্যোতিষিগণ কোষ্ঠীতে ভাব ও গ্রহগণের নিরয়ন স্ফুটের নির্ণয় করত কোষ্ঠীর ফল-বিচার করিয়া থাকেন।

স্পষ্ট-গ্রহের দৃষ্টি-বিচার

কোষ্ঠী-বিচারে গ্রহগণের স্ফুট বা জাতকের জন্ম-সাময়িক গ্রহ-সংস্থান অত্যন্ত নির্ভুল হওয়া দরকার। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা "কোষ্ঠী-বিচারে গণিত-জ্যোতিষ ও গ্রহ-স্ফুট" প্রবন্ধে[11] করা হইয়াছে। ত্রিশ অংশ-ব্যাপী রাশির যে কোনও অংশাদিতে অবস্থিত গ্রহগণের মধ্যে স্ফুট-নিরপেক্ষ পারস্পরিক দৃষ্টি ধরিয়া কোষ্ঠীর ফল-বিচারে বিশেষ সন্তোষ-জনক বিচার-ফল পাওয়া যায় না। এ জন্য জাতকের জন্ম-স্থানীয় অক্ষাংশ (Latitude) ও স্থানীও সময় (Local time at birth of birth-place) অনুসারে, দৃক্-গণিত-শোধিত বিশুদ্ধ পঞ্জিকা হইতে, কোষ্ঠীতে গ্রহগণের ও ভাব-সমুদায়ের যথাযথ অবস্থিতি নির্ণয় করিয়া লওয়া উচিত।

হিন্দু-জ্যোতিষ-শাস্ত্রে গ্রহগণের দৃষ্টি সাধারণতঃ তিন প্রকার পাওয়া যায়। যথা :—

(১-ক) রাশির যে কোনও অংশেই (০° হইতে ৩০° অংশ মধ্যে) গ্রহের অবস্থিতি কেন না হউক, ঐ গ্রহাবস্থিত রাশিকেই এক ভাব বা ঘর ধরিয়া লইয়া, বিশিষ্ট গ্রহানুযায়ী অন্য রাশিস্থ গ্রহের প্রতি দৃষ্টি[12] গ্রহণ করা। যেমন, লগ্ন বা প্রথম ভাবে মঙ্গল গ্রহ থাকিলে তাহার চতুর্থ রাশিকেই চতুর্থ ভাব বা ঘর ধরিয়া তথায় মঙ্গলের পূর্ণ-দৃষ্টি মানিয়া লওয়া।

সকল গ্রহেরই সপ্তমে পূর্ণ-দৃষ্টি ; শনির তৃতীয় ও দশমে, মঙ্গলের চতুর্থ ও অষ্টমে, বৃহস্পতির

১০ দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ১লা কার্ত্তিক, ১৩৫৩, ১৮ই অক্টোবর ১৯৪৬, শুক্রবারের বিভিন্ন মতে গণিত অয়নাংশের বিভিন্নতা দেখান যাইতেছে। যথা—M. Vijaya Raghavulu (মাদ্রাজ) এর মতে ঐ দিনের অয়নাংশ ১৯° – ১৮′ – ২৫.″৮ ; পি এম্ বাগচির পঞ্জিকা মতে ২১° – ৪২′ – ৪৫″ ; গুপ্তপ্রেস মতেও ২১° – ৪২′ – ৪৫″ ; Raphael ২২½° (approx.) ; Dr Ketkar মতে ২৩° – ৯′ – ১৪″ ; Mr. N. C. Lahiri (Indian Ephemeris) মতে Mean অয়নাংশ ২৩° – ৬′ – ৬″ ; Truc অয়নাংশ ২৩° – ৫′ – ৪৮″ ; 'পঞ্চাঙ্গ-দর্পণ'-মতে ২৩° – ৫′ – ৪০″ ; 'করণ-বল্লভ'-মতে ২৩° – ৬′ – ১″.৪৫ ; Mr. F. C. Dutta's Formula (Perpetual Ephemerides) অনুসারে ২৩° – ৫′ – ৫৯″.৫৭৭ ; "বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা"-মতে ২৩° – ৬′ – ০″ ; (F. C. Dutta's Formula অনুসারে ৫৯″.৫৭৭ = ৬০″ ই হইতেছে। সুতরাং উহা ২৩° – ৬′ – ০″ ই ধরিতে হইবে। 'বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা'-ধৃত অয়নাংশও ইহাই—'বিঃ সিঃ পঞ্জিকা', ১৩৫৩, পৃঃ ১৪৭ দ্রষ্টব্য)।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে এক ১লা কার্ত্তিক, ১৩৫৩ সনের অয়নাংশই বিভিন্ন পঞ্জিকাকারগণের মতে বিভিন্ন এবং উহা ১৯° – ১৮′ হইতে ২৩° – ৯′ পর্য্যন্ত হইতেছে। তবে অধিকাংশ মতেই ২৩° অংশের নিকটবর্ত্তী। এখনও ভারতবর্ষের এবং ইউরোপ-আমেরিকার প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদগণ অয়নাংশ-সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করিতেছেন। আশা করি শীঘ্রই তাঁহাদের নির্ণীত গবেষণা-ফল আমরা জানিতে পারিব। তবে এ পর্য্যন্ত যত মৌলিক গবেষণা হইয়াছে, তাহাতে অধিকাংশ গবেষক বিজ্ঞদিগের মতেই আমরা অয়নাংশ বর্ত্তমানে ২৩° অংশেরই নিকটবর্ত্তী পাইতেছি ; এবং আমরাও ইহাই কোষ্ঠী-বিচারে গ্রহণ করিয়া থাকি। (অয়নাংশ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা লেখকের "পঞ্জিকা" শীর্ষক প্রবন্ধে 'উদ্বোধন'- চৈত্র-সংখ্যা, ১৩৫৩, পৃঃ ১৪০ ও ১৪১ দ্রষ্টব্য)।

১১ "উদ্বোধন", ভাদ্র-সংখ্যা, ১৩৫৩, দ্রষ্টব্য।

১২ 'ভৃগু', 'গৌরীজাতক', 'পরাশর' আদি মতে স্থূল ভাবে বিচার ও গোচর-ফল আদির বিচার এইরূপে করা হয়।

পঞ্চম ও নবমে, রাহুর পঞ্চম, নবম ও দ্বাদশ স্থানে অধিকন্তু পূর্ণ-দৃষ্টি হইয়া থাকে।

(১-খ) জাতকের কোষ্ঠীতে লগ্ন যত অংশে আছে, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ১৫° অংশ ও পরবর্ত্তী ১৫° অংশ লগ্ন-ভাব ধরিয়া এইরূপ প্রতি ত্রিশ-ত্রিশ অংশ পরিমিত ভাব-সমুদায় কল্পনা করিয়া উপরোক্ত (১-ক) অনুসারে গ্রহগণের দৃষ্টি[১৩] লওয়া।

(১-গ) 'পরাশর' বা 'শ্রীপতি-পদ্ধতি' আদি অথবা জন্ম-স্থানীয় অক্ষাংশানুযায়ী ত্রিকোণমিতি-সাহায্যে কিংবা 'সারণী' (Tables of Houses) দেখিয়া জাতকের কোষ্ঠীতে লগ্নাদি দ্বাদশ ভাবের স্ফুট কষিয়া, পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী দুইটি ভাব-স্ফুট যোগ দিয়া তাহাকে দুই দিয়া ভাগ করিয়া যে রাশি-অংশাদি ফল হয়, ঐ রাশি-অংশ-কলাদিই এই দুইটি ভাবের বা ঘরের 'সন্ধি' অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী ভাবের শেষ ও পরবর্ত্তী ভাবের আরম্ভিক বিন্দু ধরা হয়। এই 'সন্ধি'-বিন্দুর পূর্ব্বের অংশাদিতে গ্রহ-স্ফুট হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী ভাবে বা ঘরে এবং এই বিন্দুর পরে নির্ণীত গ্রহ-স্ফুট হইলে পরবর্ত্তী ভাবে বা ঘরে ঐ গ্রহকে মানা হয়। ফলতঃ একই রাশিতে অবস্থিত দুইটি গ্রহ ঐ রাশিস্থ ভাব-সন্ধি-বিন্দুর পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী অংশস্থ হওয়ায় এক রাশিস্থ হইয়াও ভাব-কুণ্ডলীতে পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী দুইটী ভাবে বা ঘরে চলিয়া যায়। বিভিন্ন রাশিস্থ গ্রহ-সমুদায়কে এই প্রকারে বিভিন্ন ভাবস্থ মানিয়া লইয়া, (১-ক)-উক্ত রাশি অনুসারে দৃষ্টি কল্পনা না করিয়া এবং-বিধ ভাবানুযায়ী ও (১-ক)-কথিত গ্রহগণের দৃষ্টি অনুসারে দৃষ্টি[১৪] লওয়া।

(২) গ্রহগণের রাশি অনুসারে দৃষ্টি[১৫]। চর রাশি তাহার দ্বিতীয় রাশি ভিন্ন অবশিষ্ট তিনটী 'স্থির' (৫, ৮, ১১) রাশিকে, 'স্থির' রাশি দ্বাদশস্থ চর রাশি ভিন্ন অপর তিনটী চর (৩, ৬, ৯) রাশিকে এবং 'দ্ব্যাত্মক' রাশি নিজ রাশি ব্যতীত অবশিষ্ট তিনটী 'দ্ব্যাত্মক' (৪, ৭, ১০) রাশিকে[১৫ক] দর্শন করে। এই সকল রাশিস্থ গ্রহগণও এই সকল রাশির ন্যায়ই সেই-সেই রাশিস্থ গ্রহগণের প্রতি দৃষ্টি[১৬] করিয়া থাকে।

(৩) গ্রহগণ যে কোনও রাশি বা ভাবে অবস্থিত থাকুক না কেন, গ্রহগণের ভূকেন্দ্রীয় স্ফুটসমূহের (Geocentric Longitudes) পরস্পরের দূরত্বের মধ্যে যে ভূকেন্দ্রীয় কোণ (Geocentric angle) সৃষ্ট হয় অর্থাৎ জাতকের জন্ম-সময়ে জন্ম-স্থানকে কোণস্থ বিন্দু কল্পনা করিয়া সেই স্থান হইতে আকাশে দৃষ্ট দুইটি গ্রহের অবস্থিতির দূরত্বের অন্তরবর্ত্তী কোণ যাহা অংশ কলাদিতে হইয়া থাকে, তদনুসারে গ্রহগণের পারস্পরিক দৃষ্টি[১৭] বা প্রেক্ষা

১৩ তাজিক-নীলকণ্ঠী'র ব্যাখ্যা-কর্ত্তা 'মহীধর শর্ম্মা'র দেশবাসী পণ্ডিতগণের অনেকেই এইরূপ 'ভাব' কল্পনা করিয়া বর্ষ-ফলাদি বিচার এখনও করেন।

১৪ 'বৃহৎ-পরাশর', 'বৃহজ্জাতক' আদি সকল জাতক গ্রন্থ-মতেই এইরূপ ভাব, ভাব-সন্ধি ও গ্রহগণের দৃষ্টি পাওয়া যায়।

১৫ ইহা 'জৈমিনি'-মুনির মত। 'জৈমিনীয়-সূত্রম্' দ্রষ্টব্য।

১৫,ক মেষ, কর্কট, তুলা ও মকর—চর রাশি।
বৃষ, সিংহ, বৃশ্চিক ও কুম্ভ—স্থির রাশি।
মিথুন, কন্যা, ধনু ও মীন—দ্ব্যাত্মক রাশি।

১৬ চরস্থং স্থিরগঃ পশ্যেৎ স্থিরগং চররাশিগঃ।
উভয়স্থং তুভয়গো নিকটস্থং বিনা গ্রহম্।
—'বৃদ্ধ-কারিকা'।

১৭ 'তাজিকে নীলকণ্ঠী' ও 'আজিকে-ভূষণ' আদি তাজিক গ্রন্থ-মতে এইরূপ দৃষ্টি গ্রহণ করা হয়। যেমন,

(aspects) লওয়া। যেমন, উভয় গ্রহের মধ্যবর্ত্তী কোণ ১২০° বা ৬০° শুভ ও ৯০° বা ১৮০° অংশ পরিমিত হইলে অশুভ প্রেক্ষা হইয়া থাকে।

হিন্দু জ্যোতিষের বিভিন্ন আচার্য্যলিখিত বিভিন্ন জ্যোতিষিক প্রামাণ্যযুক্ত প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহে প্রধানতঃ উপরি উক্ত তিন প্রকার গ্রহগণের দৃষ্টিই পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য জ্যোতিষিক পণ্ডিতগণ কেবল উপরোক্ত তৃতীয় প্রকারের দৃষ্টি বা প্রেক্ষা (Aspects) মাত্র ফল-বিচারে লইয়া থাকেন। সূক্ষ্ম বিচারে তাঁহারা এই প্রেক্ষা-ফলের সঙ্গে ঐ গ্রহগণ কোষ্ঠীতে যে যে ভাবে অবস্থিত সেই সেই ভাবানুযায়ী (with regard to 'mundane aspects') শুভ বা অশুভ প্রেক্ষা-জন্য ফলের তারতম্যাদিরও বিচার করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত পাশ্চাত্য জ্যোতিষে হিন্দু-জ্যোতিষোক্ত অপর দুই প্রকারের দৃষ্টির[১৮] উল্লেখ কোথাও ও দেখা যায় না।

অনেকের ধারণা যে গ্রহগণের প্রেক্ষা-(Aspects) জনিত দৃষ্টি-ফল-বিচার সংস্কৃত ভাষায় লিখিত জ্যোতিষ-শাস্ত্রে নাই বা করাও হয় না, উহা কেবল পাশ্চাত্য জ্যোতিষেরই নিজস্ব মৌলিক গবেষণা-জাত অপূর্ব্ব সিদ্ধান্ত। কিন্তু তাঁহাদের এই ধারণা যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত তাহা কেবল 'তাজিক-নীলকণ্ঠী'য় দৃষ্টি-বিচার ও "কীরো" সাহেবের নিম্নোক্ত অভিমত পড়িলেই দেখা যাইবে। 'তাজিক নীলকণ্ঠী'তে স্পষ্টই বলা হইয়াছে[১৯] যে গ্রহগণের ১২০° ও ২৪০° অংশ দূরে (Trine Aspects) 'প্রত্যক্ষ-স্নেহা' নামক অতি শুভ দৃষ্টি হইয়া থাকে। এইরূপ ৬০° ও ৩০০° অংশ দূরে (Sextile Aspects) 'গুপ্তস্নেহা' দৃষ্টি (শুভ), ৯০° ও ২৭০° অংশ দূরে (Square Aspects) 'গুপ্ত বৈরী' দৃষ্টি (অশুভ), ১৮০° অংশ দূরে (Opposition) 'প্রত্যক্ষ বৈরী' দৃষ্টি (অশুভ) এবং ১২° অংশের[২০] মধ্যবর্ত্তী এক রাশিস্থিত গ্রহদ্বয়ের মধ্যে 'অত্যন্ত-বৈরী' দৃষ্টি (অশুভ গ্রহ হইলে) হইয়া থাকে।

ভারতীয় জ্যোতিষের মৌলিকত্ব

প্রাচীন ভারতীয় হিন্দু সভ্যতা ও ইতিহাসের আলোচনা দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হইয়াছে যে ভারতবর্ষ হইতে আরব, মিশর, রোমক আদি দেশ হইয়া এই জ্যোতিষ-বিদ্যা ক্রমশঃ সমগ্র ইউরোপ ও

৬০° ও ৩০০° অংশ দূরবর্ত্তী দুইটি গ্রহের দৃষ্টি বা সম্বন্ধের (Sextile Aspects) শুভ ফল "সুখ-লাভদাত্রী স্নেহপ্রদা বুদ্ধিবিবৃদ্ধিকর্ত্রী"—'তাজিক-ভূষণ'। ৯০° ও ২৭° অংশ ব্যবধানস্থ গ্রহদ্বয়ের দৃষ্টি বা সম্বন্ধের (Square Aspects)—"স্বজনৈর্বিরোধং গুপ্তারিভেদং কুরুতে বিবাদম্" রূপ অশুভ ফল। 'বৃহৎ পরাশর' ও 'বৃহজ্জাতক' আদি জাতক-গ্রন্থ-সমুদয় মতে এই কেন্দ্র-দৃষ্টি শুভ কিন্তু 'তাজিক' গ্রন্থ-মতে ও পাশ্চাত্য জ্যোতিষ-মতে এই চতুর্থ ও দশমস্থ দৃষ্টি অশুভ ফলদায়ক মানা হয়। ১২০° ও ২৪০° অংশ দূরবর্ত্তী গ্রহদ্বয়ের দৃষ্টি বা প্রেক্ষার (Trine Aspects) ফল—"ধনলাভঃ সৌখ্যং মিত্রোন্নতিং চাপি করোতি নিত্যম্"—'তাজিক-ভূষণ'। এই ত্রিকোণ (পঞ্চম ও নবম) দৃষ্টি 'জাতক' ও 'তাজিক' গ্রন্থ সমুদয় এবং পাশ্চাত্য জ্যোতিষ, সকল মতেই শুভ ফলদায়ক মানা হয়।

১৮ হিন্দু জ্যোতিষে 'জৈমিনিসূত্রম্' 'তাজিক-নীলকণ্ঠী' ও কালিদাসকৃত 'উত্তরকালামৃত' আদি গ্রন্থে উপরি উক্ত ২ ও ৩ সংখ্যক দৃষ্টি-বিচার দেখিতে পাওয়া যায়।

১৯ তাজিক নীলকণ্ঠী'র প্রথম 'সংজ্ঞাতন্ত্রে' 'গ্রহ-স্বরূপ দৃষ্টি ষোড়শযোগ হর্ষস্থানবিবরণ' নামক অধ্যায়ের শ্লোক ১০ দ্রষ্টব্য।

২০ এ দৃষ্টি তাজিকে উক্ত বলিয়া এই ১২° অংশ ব্যাপী ত্রিজ্যা-কৃত প্রেক্ষা-বৃত্ত (Curb) সূর্য্য হইতে অপর গ্রহের 'যোগ' বা সপ্তম সম্বন্ধের (Conjunction or Opposition Aspects) জন্যই কেবল বুঝিতে হইবে। সূর্য্য ব্যতীত অপর গ্রহের জন্য ঐ গ্রহের স্থিতি-বিন্দুর পূর্ব্বে ও পরে ৮° অংশ ব্যাপী প্রেক্ষাস্থান (Curb) লইতে হইবে।

গ্রেট-ব্রিটেন আদিতে ধীরে ধীরে প্রচারিত হইয়াছে। ইউরোপ, আমেরিকা এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতবর্ষেরও অনেক আধুনিক গবেষক এ কথা পূর্ণতর মানিতে চান না। কিন্তু Count Louis Harmon (প্রসিদ্ধ "Cheiro") সাহেব স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন যে জ্যোতিষ শাস্ত্র ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের মতই সংখ্যানুসারে মানুষের চরিত্র ও ভাগ্যাদির ফল-বিচার[২১] প্রাগৈতিহাসিক যুগেও ভারতবর্ষে ছিল। তিনি লিখিয়াছেন—

"...Brahmins who had kept in their hands from almost prehistoric times, studies and practices of an occult nature..."

"The ancient Hindu searchers after Nature's laws, it must be remembered, were in former years masters of all such studies..."

হিন্দুজ্যোতিষের মৌলিক আবিষ্কারক আদি-বিন্দু ও অয়নাংশ সম্বন্ধে "কীরো" সাহেব লিখিয়াছেন—

"...We must not forget that it was the Hindus who discovered what is known as the precession of the Equinoxes, and in their calculations such an occurrence takes place every 25,827 years, our modern science after labours of hundreds of years has simply proved them to be correct."

Raphael সাহেবও গ্রহগণের যথার্থ রাশি-সঞ্চার প্রসঙ্গে অয়নাংশ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"When the sun crosses the Equator on or about the 21st March,[২২] and is said to enter the sign of Aries, its position is in reality[২৩] about 22° from[২৪] the commencement of Aries, i. e., in 8° of the constellation Pisces..."

এইজন্য Raphael সাহেব মন্তব্য করিয়াছেন—

"It follows, therefore, that while the sun $\frac{\text{and}}{\text{or}}$ some of the planets may be in a particular Constellation, they are not necessarily in the Zodiacal sign of the same name, inasmuch as the original relationship no longer exists as to position, but only in sympathy."

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সূর্য্যাদি গ্রহ সায়ন রাশি-চক্রে পরবর্ত্তী রাশিতে গমন করিলেও তাহাদের যথার্থ অবস্থান ও প্রভাব-জন্য ফল-বিচার নিরয়ন অংশস্থ রাশির স্থানানুযায়ীই সর্ব্বদা মিলিবে। Raphael সায়ন রাশি-চক্র বা ভাবস্থ গ্রহগণের ফল-বিচারে দৃষ্ট অসঙ্গতির কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

২১ Numerology.

২২ বাসন্ত-ক্রান্তিপাত দিবস। 'উদ্বোধন' চৈত্র-সংখ্যা, ১৩৫২, পৃঃ ১৪১ দ্রষ্টব্য।

২৩ ইহাই (আদি-বিন্দু হইতে অয়নাংশ-শোধিত গ্রহ-নক্ষত্রাদির যথার্থ অবস্থান-বিচার) হিন্দু-জ্যোতিষের নিরয়ন-পদ্ধতির মৌলিক গবেষণার বিশেষত্ব, যাহা Raphael এর মত Sephareal, Vivian Robson আদি জ্যোতিষিক পণ্ডিত সাহেবেরাও মানিয়াছেন।

২৪ Raphael এর পুরাণো পঞ্জিকার 'Raphael's Astro-Picture Gallery'-তে ইহা গৃহীত বলিয়া এখানে ২২° অংশক অয়নাংশ বলা হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানে (1946) ইহা ২৩° অংশ পরিমিত লওয়া হয়।

"The apparent discrepancy is caused by the precession of the Equinoxes—or retrocession of the constellations—the first point of the sign Aries having a retrograde motion among the Stars of about 50 seconds a year…"

মেষরাশির সচল আদি-বিন্দুর[২৫] অনুরোধে যে কোনও রাশির সায়ন-বিন্দু হইতে বর্ত্তমানে এই নিরয়ন-বিন্দু ২৩° অংশ পশ্চিমে লইতে হইবে। এইজন্য যথাসাময়িক ফলার্থ সূক্ষ্ম বিচারের জন্য হিন্দু-জ্যোতিষে প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতেই এই সকল সায়ন-বিন্দুর আবিষ্কার করিয়া সাময়িক (সায়ন) গ্রহ ও Mundane Houses (জাতকের ভাব-সমূহ)-র সায়ন স্পষ্ট হইতে জাতকের জন্ম-সময়ের অয়নাংশ বাদ দিয়া নিরয়ন ভাব অনুসারে কোষ্ঠী আদির গ্রহবিচার করা হইয়া থাকে।

কোষ্ঠী-বিচারে ভাব-স্ফুট ও ভাব-সন্ধি

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্যোতিষের কোষ্ঠী-প্রণয়ন ও ফল-বিচারে পার্থক্য এই যে পাশ্চাত্য জ্যোতিষ মেষ-রাশির সচল আদি-বিন্দু (The movable first point of Aries) হইতে রাশি-সমুদয় ও তাহাতে গ্রহগণের অবস্থান গণনা করে; এই গণনা-ফলকে 'সায়ন' গ্রহ-স্ফুট ও সায়ন ভাব-স্ফুট বলা হয়। কিন্তু প্রাচ্য জ্যোতিষে মেষের স্থির আদি-বিন্দু হইতে রাশি বা ভাব-সমুদায় ও তাহাতে গ্রহগণের অবস্থান গণনা করা হয়; এই জন্য জাতকের জন্ম-কালীয় অয়নাংশ অর্থাৎ সচল আদি-বিন্দু ও স্থির আদি-বিন্দুর মধ্যে তৎ-সাময়িক পার্থক্য-রূপ অংশ-কলাদি ঐ 'সায়ন' স্পষ্ট হইতে 'নির্গত' করিয়া (বাদ দিয়া) গ্রহ-গণের ও ভাব-সমুদায়ের যে স্ফুট পাওয়া যায়, তাহাকে 'নিরয়ন' বলে।

সায়ন গ্রহ ও সায়ন ভাবস্ফুট-যুক্ত জন্ম কুণ্ডলীতে গ্রহগণের দৃষ্টি-বিচার পূর্ব্বোক্ত ৩ সংখ্যক পদ্ধতিতেই কেবল করা হয়। ইহাতে গ্রহগণের পারস্পরিক দূরত্ব লইয়া যে প্রেক্ষা হইয়া থাকে, এই কুণ্ডলীর সায়ন গ্রহস্ফুটে জন্ম সাময়িক অয়নাংশ বাদ দিলে নিরয়ন কুণ্ডলীতেও, গ্রহগণের (নিরয়ন গ্রহ-স্পষ্ট-দ্বয়েও) দূরত্ব-জ্ঞাপক প্রেক্ষাসমূহ একই রূপ থাকিবে। সুতরাং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় জ্যোতিষগ্রন্থ মতেই ভাবনিরপেক্ষ গ্রহগণের দৃষ্টি বা প্রেক্ষা-জনিত ফল-বিচার একই প্রকারের হইবে। কিন্তু সায়ন কুণ্ডলীতে হিন্দুজ্যোতিষোক্ত অন্যান্য ফলবিচার সাধারণতঃ মিলিবে না; কারণ হিন্দুগণের ফল-বিচারাদি সবই নিরয়ন পদ্ধতির উপর নির্ভর করিয়াই প্রাচ্য জ্যোতিষ-শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে। এই ফলবিচার পাশ্চাত্য জ্যোতিষ বা সায়ন মতে প্রস্তুত ও প্রাচ্য জ্যোতিষ বা নিরয়ন মতে প্রস্তুত একই জাতকের কোষ্ঠীদ্বয়ে না মিলিবার কারণ উভয় মতে ভাবসমুদায়ের আরম্ভিক বিন্দু (Cusps of the Houses) ও মধ্যবিন্দু (Mid points of the Houses) মধ্যে পরস্পরের অসামঞ্জস্য। যদি চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জাত ব্যক্তির কোষ্ঠীর ফল বিচার করা যাইত, তবে উভয় মতেই ভাব-সমুদায়ের মধ্যবিন্দু ও আদি বা অন্ত বিন্দু প্রায় একই হইত[২৬]। কিন্তু বর্ত্তমানে তাহা হয় না।

২৫ 'আদি-বিন্দু' সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা 'উদ্বোধন', চৈত্র-সংখ্যা, ১৩৫২, পৃঃ ১৩৯ দ্রষ্টব্য।

২৬ ইহাতেও ভাবের মধ্য ও আদি বা অন্ত বিন্দু-সমূহের ঐক্য হইলেও উভয় মতে ভাব-সংখ্যায় সর্ব্বতঃ ঐক্য হয় না। পার্থক্যাংশ অগ্রে দ্রষ্টব্য।

হিন্দু জ্যোতিষানুযায়ী কোষ্ঠীতে ভাবস্ফুটগুলি ভাবের মধ্যভাগ বা মধ্যবিন্দুর দেওয়া হয় ও পাশ্চাত্য জ্যোতিষানুযায়ী রচিত কোষ্ঠীতে ঐ ভাবাস্ফুটগুলি ভাবের আদি বা পূর্ব্ব ভাবের অন্ত্যবিন্দু রূপে দেওয়া হয়। মোটা হিসাবে একটী ভাব ৩০° অংশ পরিমিত। সুতরাং হিন্দুমতে গৃহীত ভাবস্ফুট হইতে ভাবসন্ধি অর্থাৎ এক ভাবের অন্ত ও অন্য ভাবের আরম্ভ ঐ ভাবস্ফুট হইতে ১৫° অংশ পূর্ব্বে ও পরে লইতে হইবে। এইরূপ পাশ্চাত্য মতে ভাবমধ্য তাহাদের গৃহীত ভাবস্ফুট হইতেও ১৫° অংশ পূর্ব্বে বা পরে হইবে। এই হিসাবে দেখিতে গেলে দেখা যায় যে, যে জাতকের চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জন্ম, তাহার কোষ্ঠীতে উভয় মতে গণিত ভাবস্ফুট মধ্যে অদ্ভুত সামঞ্জস্য পাওয়া যাইবে। কারণ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (১৩৬৫ খৃঃ) অয়নাংশ ১৫° অংশ পরিমিত ছিল। সুতরাং ঐ জাতকের যদি পাশ্চাত্য মতে গণিত সায়ন ভাবস্ফুটে, যাহা তাঁহাদের ভাবের আরম্ভস্ফুট বা ভাবসন্ধি, ১৫° অংশ পরিমিত অয়নাংশ বাদ দেওয়া যায়, তবে হিন্দুমতে নিরয়ন ভাবস্ফুট বা ভাবের মধ্যবিন্দু পাওয়া গেল। সায়ন কোষ্ঠীতে (পাশ্চাত্য মতে রচিত কোষ্ঠীতে) ১৫° অংশ পরে ভাবমধ্য হয়। সুতরাং ঐ সময়ে (১৩৬৫ খৃঃ) জাত ব্যক্তির উভয় মতের কোষ্ঠীতেই ভাবস্ফুট (মধ্যবিন্দু) ও ভাবসন্ধি (Cusps of the Houses বা ভাবারম্ভবিন্দু) একই হইতেছে। পার্থক্য এই যে ঐ কোষ্ঠীদ্বয়ে পাশ্চাত্য মতে যেটী যে ভাবের আরম্ভিক বিন্দু, হিন্দুমতে ঐটী ঐ ভাবের অন্ত্যবিন্দু হইয়া পড়িবে।

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে অয়নাংশ ২২° হওয়ায় উভয় মতের যে কোনও ভাবের মধ্য বা আরম্ভ বিন্দুর পার্থক্য হইবে ২২°—১৫° =৭° (মোটা হিসাবে)। ইহার ফলে সায়ন রাশি-চক্রে সূর্য্যাদি গ্রহ যখন মেষরাশিতে প্রবেশ করিবে, তখন নিরয়ন রাশি মীনের ৮° অংশগত[২৭] থাকিবে। বর্ত্তমানে (১৯৪৬ খৃঃ) অয়নাংশ ২৩° অংশ পরিমিত বলিয়া সূর্য্য এখন মীনের ৭° অংশগত হইবে। সুতরাং সায়ন মেষরাশিতে সূর্য্যের গতি ২১এ মার্চ্চ হইলে নিরয়ন সূর্য্য মীনরাশির ৭° অংশে থাকায় সাধারণতঃ ৭ই চৈত্র[২৮] এই Vernal Equinox (বাসন্ত ক্রান্তিপাত) সংঘটিত হইবে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সূর্য্যাদি গ্রহের সায়ন মেষে ভোগ-কালের ফল দিতে গেলে মীনরাশিস্থ সূর্য্যাদি গ্রহের ফলই দিতে হইবে; এবং পাশ্চাত্য জ্যোতিষের সায়ন মেষস্থ ফল হিন্দুমতে নিরয়ন মীনরাশিরই বুঝিতে হইবে। এইরূপে উভয় মতে লিখিত জ্যোতিষ গ্রন্থ-দৃষ্টে কোষ্ঠীর ফল-বিচার করিলে কোনও রূপ অসামঞ্জস্য থাকিবে না; এবং জাতকের কোষ্ঠী-বিচারে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সকল জ্যোতিষ-গ্রন্থ-মতেই যথাযথ ফল মিলিবে।

এইরূপে মেষ-রাশিস্থ সূর্য্যাদির ফল মীন-রাশিস্থ বলিয়া কল্পনা করিলে উহাতে ভ্রান্তি বা অসামঞ্জস্য[২৯]

২৭ ইহাই পূর্ব্বে Raphael এর অয়নাংশ সম্বন্ধে উক্তিতে উল্লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে অয়নাংশ ২৩° অংশ পরিমিত বলিয়া সূর্য্য এখন মীনের ৭° অংশগত হইবে। সুতরাং সায়ন মেষে সূর্য্যের গতি ২১শে মার্চ্চ হইলে নিরয়ন সূর্য্য ঐ দিন মীনের ৭° অংশে থাকায় সাধারণতঃ ৭ই চৈত্র এই Vernal Equinox (বাসন্ত ক্রান্তিপাত) হইবে।

২৮ ১৩৫৩ সালে বাসন্ত ক্রান্তিপাত ৭ই চৈত্রই হইবে। ১৩৫২ সালেও তাহাই হইয়াছে। এই দুই বৎসরই ২১শে মার্চ্চ বঙ্গীয় নির্দ্দেশিত তারিখ বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত ও অন্যান্য পঞ্জিকাদি সকল মতেই ৭ই চৈত্রই হইয়াছে।

২৯ প্রাচ্য জ্যোতিষে মেষরাশির স্থির আদি-বিন্দু হিসাবে Sidereal year ও পাশ্চাত্য মতে মেষের

হইবে প্রতি রাশির প্রারম্ভীয় ৭° অংশ পর্যন্ত। যেমন সূর্য্যের প্রায় ১০ অংশ সংক্রমণের সময়ও ১ দিন, সুতরাং ৭° অংশে ৭ দিন পরিমিত সময় প্রতি রাশিতে বা মাসে সূর্য্যের ভোগ-কালে এই অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইবে।

আমাদের মনে হয় বিখ্যাত জ্যোতিষী 'কীরো' (Count Louis Harmon—"Cheiro") সাহেবের মনে এইটি খেয়াল আসিয়া থাকিবে। তাই তিনি 'সূর্য্য'-গতি দ্বারা ফলিত-ফল লিখিতে গিয়া সাত দিনের ফলে অসামঞ্জস্য পাইয়াছেন। তিনি এই জন্য এই সাত দিনের ফল মিলাইতে অসুবিধা দেখিয়া এক রাশি হইতে অপর রাশিতে সূর্য্য-গতিকে overlapping আদি বলিয়াছেন। তিনি তাঁহার লিখিত একখানা পুস্তকে বলিয়াছেন—

"The 'cusp'·· lasts for seven days, consequently the full influence of (one) sign comes into power (after seven days) and lasts until another seven days 'cusp' begins under the influence of the next incoming sign···"

এই কথাটিই তাঁহার অন্য এক খানা পুস্তকে লিখিত নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে ভালভাবে বোঝা যাইবে। যথা—

"The Zodiacal sign·· commences···, but for seven days, being overlapped by the 'cusp' of the previous sign, it does not come into its full power···. From this out (i. e. after these seven days ৩০) it is in full strength ···and is then for seven days gradually losing its strength on account of becoming overlapped by the 'cusp' of the incoming sign."

সায়ন মেষ-রাশি নিরয়ন মেষ-রাশির ৭° অংশ হইতে নিরয়ন মেষ-রাশির ৭° অংশ পরিমিত; এবং সায়ন মীন-রাশির নিরয়ন কুম্ভের ৭° অংশ হইতে নিরয়ন মীনের ৭° অংশ পরিমিত হইয়া থাকে[৩১]। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে মেষ-রাশিস্থ সূর্য্যের প্রথম সাত দিনে মীনের প্রভাব ও মীন-রাশিস্থ সূর্য্যের প্রথম দিনে কুম্ভ-রাশির প্রভাব বা জ্যোতিঃ অনেকটা পড়িয়া থাকে। এই জন্যই আমাদের মনে হয়, 'কীরো' সাহেব সূর্য্য-সংক্রমণের উপর নির্ভর করিয়া 'মাস-ফল' ও Numerology (সংখ্যা-জ্যোতিষ) এর গ্রন্থ লিখিতে গিয়া উপরি-উক্ত মন্তব্য দুইটি প্রকাশ করিয়া থাকিবেন।

উপসংহার

এই প্রকার সূর্যের অবস্থানের মতই অন্যান্য সকল গ্রহেরও সায়ন ও নিরয়ন ভাব-কুণ্ডলীতে অবস্থান বুঝিতে হইবে। যদি গ্রহগণের অবস্থান জাতকের জন্ম-স্থান ও জন্ম-সময়ের যথা-সাময়িক না হয় অর্থাৎ দৃগ্‌গণিতৈক্য বিশুদ্ধ পঞ্জিকা দেখিয়া জাতকের কোষ্ঠী প্রণয়ন না করা হয়, তবে গ্রহগণের নিরয়ন স্ফুটানুযায়ী দশবর্গাদি জন্য ফল-বিচার এবং ভাব-সন্ধি-গত গ্রহসমূহের ভাব-স্থিতি জন্য বিভিন্ন ফল-বিচারও মিলিতে পারে না। কারণ, বাজার-প্রচলিত অশুদ্ধ পঞ্জিকা দেখিয়া কোষ্ঠীতে গ্রহস্ফুট প্রণয়ন করিলে যদি তাহাতে এক অংশের বা তাহারও কম ভ্রান্তি থাকিয়া যায়, তবে ঐ গ্রহ ঐ কোষ্ঠীতে ভাব-সন্ধিগত হওয়ায় হয়ত অন্য ভাবগত

সচল আদি-বিন্দু হিসাবে Tropical year এর মাস বা দিন-সংখ্যার অনুরোধে অর্থাৎ নিরয়ন ও সায়ন সূর্য্যের ভেদ নিমিত্ত, এই অসামঞ্জস্য হইয়া থাকে।

৩০ উদ্ধরণগুলিতে সর্ব্বত্রই বন্ধনীর মধ্যবর্ত্তী অংশ-গুলি আমাদের সংযোগ; মূল লেখকের নহে।

৩১ যেহেতু আজকাল অধিকাংশ বিজ্ঞ জ্যোতিষীর মতেই অয়নাংশ ২৩° অংশ পরিমিত লওয়া হয়।

হইয়া পড়িবে; এবং তাহার বর্গ-ফল ও ভাবগত ফলও কোনও রূপ মিলিবে না। বঙ্গীয় পঞ্জিকা-গণনায় গ্রহস্ফুটে এই প্রকার ভ্রান্তি ও দৃগ্-গণিতের (Astronomical Ephemeris) সঙ্গে বিরাট অসামঞ্জস্য দেখিয়া অনেক বিজ্ঞ জ্যোতিষী বঙ্গীয় পঞ্জিকা-সংস্কারে মনোনিবেশ করিয়াছেন। কিন্তু প্রায় ৬০ বৎসরের প্রচেষ্টায় ও সঙ্ঘ-শক্তি বা ঐকমত্যহীন বাঙ্গালীর ধর্ম্ম-সমাজে আজ পর্য্যন্ত শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত-সমাজ এ বিষয়ে একমত হইয়া পঞ্জিকা-সংস্কার সম্বন্ধে কোনও স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারিলেন না।

গ্রহস্ফুট শুদ্ধ না হইলে চন্দ্রস্ফুট ও সূর্য্য-স্ফুটের মধ্যবর্ত্তী প্রতি দ্বাদশ অংশ পরিমিত যে এক এক তিথির কথা সূর্য্য-সিদ্ধান্তে[৩২] উল্লেখ আছে, তাহাও শুদ্ধ হয় না; এবং অশুদ্ধ তিথির উপর নির্ভরযোগ্য 'যোগ' ও 'নক্ষত্র' আদি গণনাও বিশুদ্ধ হয় না। ফলে নক্ষত্রানুসারে গণিত বিংশোত্তরীয় ও অষ্টোত্তরীয় দশাদিও জাতকের কোষ্ঠীতে বিশুদ্ধভাবে গণিত হয় না এবং উহাদের ফলও, দেখা যায়, যথাসাময়িক হয় না।

বঙ্গীয় পঞ্জিকা-সমূহের সংস্কারবিরোধী কোনও কোনও রক্ষণশীল শ্রদ্ধেয় পণ্ডিতগণের অভিমত এই যে হিন্দুদিগের 'তিথি'টি কিম্বদন্তী (tradition) এর উপর নির্ভর করে; এবং উহা পর্য্যবেক্ষণ-শালার চন্দ্র ও সূর্য্যের গতি বা স্ফুটের উপর নির্ভর করে না। এ উক্তি আমাদের সূর্য্য-সিদ্ধান্তেরও বিরোধী[৩৩] বলিয়া মনে হয়। যদি ইহা অভ্যুপগম পূর্ব্বক মানিয়াও লওয়া হয় যে হিন্দুদিগের[৩৪] তিথি কোনও রূপ অপ্রসিদ্ধ পদ্ধতি অথবা কিম্বদন্তী বা tradition এর উপরই নির্ভর করে, তথাপি হিন্দুদিগের চন্দ্র ও সূর্য্যাদি গ্রহগণের ভ-চক্রে স্থিতি বা গ্রহ-স্ফুট-গণনা কোনও রূপ অপ্রসিদ্ধ বা অজ্ঞাত পদ্ধতি অথবা কিম্বদন্তীর উপর নির্ভর করে না। উহা গণিত-জ্যোতিষের মূল সূত্র-সমূহের সহায়তায় অঙ্ক কষিয়া ও আকাশে দূরবীক্ষণ-যন্ত্রাদির সহায়তায় পর্য্যবেক্ষণ করিয়াই পাওয়া যায়। তিথিরই না হয় আকাশে কোনও রূপ উদয় দেখা যায় না, এবং তাহা যেমন খুশী লওয়া যায়, কিন্তু চন্দ্র-সূর্য্যাদির অবস্থানজ্ঞাপক স্ফুট যাহা অশুদ্ধ পঞ্জিকা-সমূহে মুদ্রিত করা হয়, এবং যে অশুদ্ধ গ্রহস্ফুট দেখিয়া কোষ্ঠীপ্রণয়নে কোষ্ঠীর ভাব ও গ্রহবলাদি অনুযায়ী সূক্ষ্ম ফল-বিচার মিলে না, তাহার সংস্কার ও শুদ্ধ করিয়া পঞ্জিকা-প্রকাশনের বিরোধী কি যুক্তি ও প্রমাণ হিন্দু জ্যোতিষ-শাস্ত্রে উক্ত রক্ষণশীল শ্রদ্ধেয় পণ্ডিতবর্গ পাইতেছেন তাহা লেখকের জানা নাই। এ বিষয়ে আজ পর্য্যন্ত নানা বিদ্বান্ গবেষক বিবিধ প্রবন্ধাদি দ্বারা যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন; এবং বঙ্গীয় প্রধান-প্রধান সকল পঞ্জিকাকারই নিজেদের পঞ্জিকার যে অনতি-বিলম্বে সংস্কার হওয়া দরকার তাহাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার[৩৫] করিয়াছেন।

৩২ অর্কাৎ বিনিঃসৃতঃ প্রাচীং যদ্ যাত্যহরহঃ শশী।
তচ্চান্দ্র-মানম্ অংশৈস্তু জ্ঞেয়া দ্বাদশভিঃ তিথিঃ॥
সূর্য্যসিদ্ধান্ত।

৩৩ তিথি-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা 'উদ্বোধন', চৈত্র-সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩৪ এখানে 'হিন্দুদিগের' এই বিশেষণ দিবার উদ্দেশ্য ইহাই যে 'যবন' ও 'রমল' আদি মধ্য-প্রাচ্য-দেশীয় জ্যোতিষ-শাস্ত্রোক্ত তিথি সম্পূর্ণরূপে চন্দ্র-গতির উপরেই নির্ভর করে। তাঁহাদের ঐ তিথি ও তিথ্যনুরূপ পর্ব্বাদি আকাশে দৃষ্ট চন্দ্র-স্থিতি অনুযায়ীই মানা হয়; এবং তাঁহাদের তিথ্যনুসারী পর্ব্বাদির অনুষ্ঠানও 'হিন্দুদিগের' কিম্বদন্তী বা 'tradition—আনুমানিক বা ব্যবহারিক —অস্থির সিদ্ধান্ত জাত তিথি-গণনার উপর নির্ভর করে না।

৩৫ 'উদ্বোধন', আষাঢ়-সংখ্যা পৃঃ ২৯০ 'স্বীকারোক্তি' দ্রষ্টব্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

বেদান্ত সোসাইটি, স্যানফ্র্যান্‌সিস্‌কো—এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দজী গত জুলাই মাসে প্রতি রবিবার ও বুধবার সোসাইটি-হলে নিম্নলিখিত বক্তৃতা দিয়াছেন :

(১) "আত্মজ্ঞানের স্তর", (২) "কেন, কোথা হইতে, কোথায়?" (৩) "যে মন্দ পরিণামে ভাল", (৪) "মর্তে স্বর্গ", (৫) "মনের সন্ধান", (৬) "মানুষের পুত্র ও ঈশ্বরের পুত্র", (৭) "জন্ম-মৃত্যুর প্রশ্ন"।

এতদ্ভিন্ন তিনি প্রতি শুক্রবার সোসাইটির সভ্য ও ছাত্রগণের নিকট বেদান্তদর্শন ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে ধ্যানাদি শিক্ষা দিয়াছেন।

রামকৃষ্ণ মিশন হোম অব সার্ভিস্, কাশী—১৯৪৫ সনের কার্য-বিবরণী :—এই প্রতিষ্ঠানের সেবাকার্য ইনডোর এবং আউট্‌ডোর এই দুই বিভাগে পরিচালিত। আলোচ্য বর্ষে ইনডোর বিভাগে সর্বসমেত ২১২৯ জন রোগী ভর্তি হন। তাঁহাদের মধ্যে ১৭৯২ জন রোগী আরোগ্য লাভ করেন। দৈনিক গড়ে ৯১·৫ জন রোগী এই হাসপাতালে চিকিৎসিত হইয়াছেন। ৩২৮ জন রোগীকে অস্ত্রোপচার করা হইয়াছে। এ বৎসর বৃদ্ধ ও অক্ষম পুরুষ ও নারীদের আশ্রয়াবাসে ১৯ জনকে আশ্রয়, লছমীনারায়ণ ট্রাষ্টফণ্ড পক্ষাঘাত বিভাগে ১১ জনকে চিকিৎসা এবং চন্দ্রীবিবি ধর্মশালা ফণ্ড বিভাগ হইতে ৪৫৩ জনকে খাদ্যাদি দেওয়া হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে আউটডোর বিভাগের দাতব্য চিকিৎসালয়ে সর্বসমেত ৯০৮৬৯ জন নূতন রোগী চিকিৎসিত হন। ইঁহাদের মধ্যে শিবালয় কেন্দ্রে ৩৮৭৭১ জন নূতন রোগী ছিলেন। এই বৎসর আউটডোর বিভাগে ১৩২৪ জন রোগীকে অস্ত্রোপচার করা হয়। এতদ্ভিন্ন ১৬৭ জন নিরাশ্রয় ভদ্রপরিবারের স্ত্রীলোককে নগদ ২৮৯৭॥০ টাকা, ১৬/২॥ চাল ও আটা এবং কম্বল ও বস্ত্রাদি দান করা হইয়াছে। দুঃস্থ ছাত্রগণকে পুস্তকদান, নিঃসম্বল যাত্রিগণকে সাহায্য প্রদান প্রভৃতি সাময়িক সেবায় ২৬৮/৯ পাই ব্যয়িত এবং দুর্ভিক্ষপীড়িত ১৩০ জনকে ১৮৮৯ সের চাল এবং ঔষধ ও কম্বলাদি দেওয়া হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে সেবাশ্রমের মোট আয় ৬৪৩৫৫॥/৩ পাই এবং মোট ব্যয় ৫৭২১৫।৵১০ পাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ দাতব্য চিকিৎসালয়, মাইলাপুর, মান্দ্রাজ—১৯৪৫ সনের কার্য-বিবরণী :—মান্দ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ পরিচালিত এই কেন্দ্রটি ২১ বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। কয়েক জন চিকিৎসকের ঐকান্তিক আগ্রহে ও অক্লান্ত চেষ্টায় এবং মঠের কর্মিবৃন্দের সহায়তায় এই প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে একটি আদর্শ সেবাকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। প্রথম বৎসর ইহাতে ৯৭০ জন রোগী চিকিৎসিত হন; আলোচ্য বর্ষে ৭৬৯৭৫ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছেন। প্রথমতঃ ইহাতে এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা হইত। আট বৎসর পূর্বে একটি হোমিওপ্যাথিক বিভাগও খোলা হয়। এই বৎসর এ্যালোপ্যাথিক বিভাগে জাতিবর্ণনির্বিশেষে ৫৩৭৬৬ জন এবং হোমিওপ্যাথিক বিভাগে ২৩২০৯ জন রোগীর চিকিৎসা করা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে প্রতিষ্ঠানটির মোট আয় ৯২০২।৵২ পাই এবং ব্যয় ৬২৭৫/৪ পাই।

কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিত্যাবির্ভাব উৎসব—গত ২রা ভাদ্র শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী দিবসে কাঁকুড়গাছি শ্রীরামকৃষ্ণ-যোগোদ্যানে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিত্যাবির্ভাব উৎসব উপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ও ভোগরাগ, গীতা চণ্ডী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ প্রভৃতি পাঠ, ভজন কীর্তন এবং প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

ইহা স্মরণযোগ্য যে ১৮৮৬ সনের শুভ-জন্মাষ্টমী দিবসে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য দেহাস্থির কিয়দংশ ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত প্রতিষ্ঠিত এই যোগোদ্যানে সমাহিত করা হয়। স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্ন্যাসী শিষ্যবর্গ এবং রামচন্দ্র, গিরিশ প্রভৃতি গৃহী ভক্তগণ পুণ্যাস্থিপূর্ণ কলস স্থাপন করেন। ১৮৮৩ সনের ২৬শে জানুয়ারী বুধবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব একবার যোগোদ্যানে শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন। এখানকার সাধনভজনোপযোগী নির্জন পবিত্র মনোরম পরিবেশ দর্শনে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছিলেন, "ইহা বেশ সাধন-ভজনের স্থান; আমি যেন এখানে আছি।" পরবর্তী কালে শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরঙ্গ শিষ্য শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ, শ্রীমৎ স্বামী অদ্ভুতানন্দ, দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার, অক্ষয় কুমার সেন প্রভৃতি যোগোদ্যানে তপস্যা ও সাধন-ভজন করিয়াছিলেন।

বিবিধ সংবাদ

বিবেকানন্দ সোসাইটি, কলম্বো—৪২শ বার্ষিক (১৯৪৪ এপ্রিল হইতে ১৯৪৫ এপ্রিল) কার্য-বিবরণী :—আলোচ্য বর্ষে এই প্রতিষ্ঠানের সভ্যসংখ্যা ১৪১৫ জন ছিলেন। ইহার লাইব্রেরীতে অনেক মূল্যবান গ্রন্থ এবং রিডিংরুমে ৫টি দৈনিক, ৩টি অর্ধ-সাপ্তাহিক, ২টি সাপ্তাহিক এবং ১১টি মাসিক পত্রিকা আছে। বহু পাঠক-পাঠিকা এই সকল পাঠ করিয়াছেন। এই সোসাইটিতে ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ কয়েকটি বক্তৃতা দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন 'পেরাপুরাণম্' সম্বন্ধে নিয়মিত ভাবে ক্লাস পরিচালন করা হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের কয়েক জন প্রচারক দুইটি জেলের কয়েদী ও কুষ্ঠনিবাসের রোগিগণকে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে নিয়মিত ভাবে উপদেশ দিয়াছেন। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও সোসাইটিতে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি, নবরাত্রি, শিবরাত্রি, দীপালী প্রভৃতি উৎসব যথানিয়মে প্রতিপালিত হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে সিংহলের স্কুল-কলেজের হিন্দুছাত্রগণের হিন্দুধর্মজ্ঞান সম্বন্ধে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে সার্টিফিকেট ও পারিতোষিক দেওয়া হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠান-পরিচালিত সিনিয়র তামিল সেকেণ্ডারী স্কুলে এবার ৩০২ জন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করিয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে সোসাইটির মোট আয় ২৭,০৯৫৲ টাকা ৮০ সেণ্ট এবং মোট ব্যয় ২৩,৪৫৭৲ টাকা ৩৪ সেণ্ট।

শ্রীরামকৃষ্ণ মণ্ডপ সমিতি, চেতলা (কলিকাতা)—৩০শ বার্ষিক (১৯৪৪-৪৫) কার্য-বিবরণী :—আলোচ্য বর্ষে এই প্রতিষ্ঠানে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্যপূজা ব্যতীত তাঁহার অন্তরঙ্গ শিষ্যগণ এবং কৃষ্ণ বুদ্ধ খৃষ্ট মহম্মদ প্রভৃতির জন্মোৎসব, দুর্গাপূজা ও কালীপূজা প্রভৃতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। মণ্ডপে নিয়মিত শাস্ত্রপাঠ ও মাঝে মাঝে ধর্মসভা হইয়া থাকে। এই প্রতিষ্ঠান-পরিচালিত দাতব্য ঔষধালয় হইতে এ বৎসর মোট ৫৬৯১ জন দুঃস্থ রোগীকে ঔষধ দেওয়া হইয়াছে। পুস্তকাগারে ৪৭৬ খানি পুস্তক ও কয়েকটি পত্রিকা আছে।

আলোচ্য বর্ষে মণ্ডপের মোট আয় ৩১৯৩৺৶৩ পাই এবং মোট ব্যয় ২৬৬৮৷৴৩ পাই।

উদ্বোধন

জ্ঞানযোগের মূলতত্ত্ব

সম্পাদক

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "সকল জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ পরমাত্মবিষয়ক জ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া মুনিগণ দেহাদি বন্ধন হইতে মুক্তিরূপ পরম সিদ্ধিলাভ করেন।"[১] ব্রহ্ম বলিতে বুঝায় "যাঁহা হইতে সকল ভূত উৎপন্ন হয়, যাঁহার দ্বারা জীবিত থাকে এবং যাঁহাতে প্রলয়কালে প্রবেশ করে।"[২] "ব্রহ্ম বিজ্ঞাত হইলে সকলই বিজ্ঞাত হয়"[৩], "অশ্রুত শ্রুত হয়, অমত মত হয় ও অজ্ঞাত জ্ঞাত হয়,"[৪] "হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয় ও সকল সংশয় বিনষ্ট হয়"[৫] এবং "সকল শোক ও পাপ হইতে মুক্ত হইয়া মানুষ অমৃতত্ব লাভ করে।"[৬] এই ব্রহ্মে মনের (নিদ্রাদিহীন) লয় ও (বিষয়াদিতে বিক্ষেপশূন্য) স্থিতিই জ্ঞানযোগের আদর্শ।

জ্ঞানযোগ সাধন করিতে হইলে সর্বাগ্রে ইহাতে অধিকার অর্জন করা আবশ্যক। নিষ্কাম নিঃস্বার্থ কর্মদ্বারা ভোগ-বাসনারূপ অন্তঃকরণের মলনাশ, সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা দ্বারা চিত্ত-চাঞ্চল্যরূপ অন্তঃকরণের বিক্ষেপ দূরীকরণ, বেদান্ত-শাস্ত্রাদি পাঠ ও গুরু উপদেশ শ্রবণ দ্বারা অন্তঃকরণের আবরণ বা অজ্ঞান অপসারিত করিয়া সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন হওয়াই এই অধিকার অর্জনের উপায়। স্বর্গাদি সুখভোগাত্মক কাম্যকর্ম এবং নরকাদি দুঃখভোগের কারণ-রূপ নিষিদ্ধ কর্ম উভয়ই পরিত্যাগ করিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম অনুষ্ঠান দ্বারা শুদ্ধচিত্ত হওয়া জ্ঞানযোগীর পক্ষে একান্ত আবশ্যক। জ্ঞানযোগের লক্ষ্য নির্গুণ ব্রহ্মসাধন হইলেও ইহাতে চিত্তশুদ্ধি বিধানের উপায়রূপে সগুণব্রহ্ম উপাসনার উপযোগিতা স্বীকৃত। জ্ঞানযোগী বৈদান্তিকগণ বলেন, "সাধকের সুবিধার জন্য নাম-রূপরহিত ব্রহ্মের নানা প্রকার নাম রূপ কল্পনা করা হয়।"[৭] এইজন্য তাঁহারা সকল দেবদেবীর উপাসনা সমর্থন করেন। জ্ঞানযোগের সাধনচতুষ্টয় বলিতে বুঝায়—বিবেক বৈরাগ্য শমদমাদি ও মুমুক্ষুত্ব। "একমাত্র ব্রহ্মই

১ পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।
যজ্জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ॥
—গীতা, ১৪।১

২ যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি।
—তৈঃ উঃ, ৩।১।১

৩ সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি।
—মুঃ উঃ, ১।১।৩

৪ অশ্রুতং শ্রুতম্, অমতং মতম্, অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতং ভবতি। —ছাঃ উঃ, ৬।১।৩

৫ ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
—মুঃ উঃ, ২।২।৮

৬ তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি। —মুঃ উঃ, ৩।২।৯

৭ সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।

নিত্য, জগৎ ও দেহাদি অন্যান্য সকলই অনিত্য —এই প্রকার বিচারের নাম নিত্যানিত্যবস্তু-বিবেক।"[৮] এই বিবেক হইতে বৈরাগ্য উৎপন্ন হইলে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ভোগসুখে বিতৃষ্ণা জন্মে। ইহার ফলে ব্রহ্মলাভের উপায়-রূপে শম দম উপরতি তিতিক্ষা সমাধান ও শ্রদ্ধা সাধনে প্রবৃত্তি হয়। দীর্ঘকাল নিরন্তর এই সাধনের ফলে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা বা মুমুক্ষুত্ব উদয় হইয়া থাকে। কাহারও মাথায় আগুন লাগিলে সে যেমন জলের দিকে ছুটিয়া যায়, মুমুক্ষু ব্যক্তিও তেমন আকুল আগ্রহে ব্রহ্মবিৎ পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করেন। বেদান্তশাস্ত্র-মতে এইরূপ ব্যক্তিই জ্ঞানযোগের প্রকৃত অধিকারী।

ব্রহ্মজ্ঞ গুরু এইরূপ শিষ্যকে প্রথমতঃ জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যরূপ বেদান্তসিদ্ধান্ত উপদেশ দেন। নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকাদি সাধন-চতুষ্টয়, শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন এবং তত্ত্বমসি মহাবাক্যের বিচার জীব-ব্রহ্ম-ঐক্যজ্ঞানের অন্তরঙ্গ সাধন। বেদান্তবিদের নিকট বেদান্তশাস্ত্রের যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা শুনার নাম শ্রবণ, জীব ও ব্রহ্মের অভেদসাধক ও ভেদবাধক যুক্তিদ্বারা ব্রহ্মচিন্তা করার নাম মনন, ব্রহ্মাকারা বৃত্তিতে অবস্থানের নাম নিদিধ্যাসন এবং নিদিধ্যাসনের পরিপক্ক অবস্থা সমাধি নামে অভিহিত। এই সকলের প্রয়োজন—অজ্ঞানাদি অনর্থ এবং রোগ ও ক্ষুধাদি সঞ্জাত আধ্যাত্মিক দুঃখ, শীতাতপ-জনিত আধিদৈবিক দুঃখ, চৌর-ব্যাঘ্রাদিজাত আধিভৌতিক দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ও স্বরূপানন্দ-প্রাপ্তি।

অজ্ঞানের বিষয় মিথ্যাবস্তু ও ভ্রমজ্ঞান। এতদুভয়কে বেদান্তের ভাষায় অধ্যাস বলে। ইহা কার্য-অধ্যাস ও কারণ-অধ্যাস ভেদে দ্বিবিধ। রজ্জুতে সর্পের অধ্যাসের ন্যায় দেহাদিতে ব্রহ্ম বা আত্মার অধ্যাসই কার্য-অধ্যাস এবং ব্রহ্ম বা আত্মার স্বরূপের অজ্ঞান-জনিত অধ্যাসই কারণ-অধ্যাস। এই দুই প্রকার অধ্যাস সত্যবস্তুবিষয়ক জ্ঞানদ্বারা নিবৃত্ত হয়। যেমন রজ্জুতে মিথ্যাসর্পজ্ঞান রজ্জুর যথার্থ জ্ঞান-দ্বারা দূরীভূত হয়, ঠিক সেইরূপ ব্রহ্মস্বরূপ আত্মাতে অহংকারাদি বন্ধের প্রতীতিরূপ অজ্ঞান আত্মার প্রকৃত জ্ঞানদ্বারা তিরোহিত হইয়া থাকে। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে, "একমাত্র ভূমাই (আত্মারূপী ব্রহ্ম) সুখস্বরূপ।"[৯] এই জন্য তাঁহাকে লাভ করিবার ইচ্ছা মানুষের মনে স্বতঃই উপস্থিত হয়। তিনি ভিন্ন অন্য বস্তুমাত্রই অনিত্য এবং দুঃখমূলক অজ্ঞানের কার্য। এইজন্য ভূমার প্রকৃত জ্ঞানই অজ্ঞানজ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি এবং অনন্ত সুখের উৎস-রূপ মোক্ষপ্রাপ্তির উপায়। জীব ও ব্রহ্মের ভেদজ্ঞান হইতেই সকল দুঃখের মূল অজ্ঞানের উদ্ভব। আত্মানুভূতির ফলে জীব-ব্রহ্মের অভেদজ্ঞান জন্মিলে, এই ভেদ-দৃষ্টিরূপ অজ্ঞান নষ্ট হয় এবং সকল দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ও পরমানন্দ লাভ হইয়া থাকে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, "যেমন অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গসকল নির্গত হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে সকল প্রাণ, সকল লোক, সকল দেবতা ও সকল ভূত উৎপন্ন হইয়াছে।"[১০] "জীব ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু নয়।"[১১] জীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। উভয়ে চিৎস্বরূপে এক ও অভেদ। ব্যষ্টিরূপে জীবে জীবে যিনি আত্মা, সমষ্টিরূপে

৮ ব্রহ্ম এব নিত্যং বস্তু ততঃ অন্যৎ অখিলম্ অনিত্যম্।
—বেদান্তসার, ১৬

৯ যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি।
—ছাঃ উঃ, ৭।২৩।১

১০ যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্বে প্রাণাঃ সর্বে লোকাঃ সর্বে দেবাঃ সর্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি।—বৃঃ উঃ, ২।১।২০

১১ জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।

তিনিই এক অদ্বিতীয় পরমাত্মা বা ব্রহ্ম। "আত্মা অজর অমর শাশ্বত। দেহনাশেও আত্মার নাশ হয় না।"[১২] তিনি "শরীরে থাকিয়াও অশরীরী।"[১৩] বালকেরা যেরূপ অজ্ঞানবশতঃ মেঘ ধূলি ও ধূমাদি দ্বারা আকাশকে মলিন মনে করে, বদ্ধমানুষ সেইরূপ অজ্ঞাননিমিত্ত দেহের জন্মমরণাদি দ্বারা আত্মাকে নশ্বর মনে করিয়া থাকে। বস্তুতঃ আত্মা নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব সচ্চিদানন্দস্বরূপ এবং সকল জ্ঞান, সকল শক্তি, সকল মহত্ত্ব ও পবিত্রতার আকর। এই গুণগুলি আত্মার আগন্তুক ধর্ম নয়, পরন্তু তাঁহার সনাতন স্বরূপ। "আত্মা সকল ভূতের অন্তরে বাহিরে অবস্থিত।"[১৪] "সেই একই দেব বহুভাবে বিরাজিত।"[১৫] "যেমন একই বায়ু পৃথিবীতে প্রাণরূপে প্রবেশ করিয়া দেহানুসারে বিভিন্ন আকার ধারণ করে, সেইরূপ অদ্বিতীয় অন্তর্যামী আত্মাও জীবদেহসমূহের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের সদৃশ হইয়াছেন, অথচ তদতিরিক্ত স্বীয় অবিকৃত স্বরূপে বিদ্যমান আছেন।"[১৬] এক আকাশই যেমন ঘটাকাশ জলাকাশ মেঘাকাশ ও মহাকাশরূপে কল্পিত হয়, সেইরূপ এক চৈতন্যই কূটস্থ জীব ঈশ্বর ও ব্রহ্মরূপে কল্পিত হইয়া থাকে।

১২ অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো, ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।—গীতা, ২।২০

১৩ অশরীরং শরীরেষু।—কঠ উঃ ২।২

১৪ বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
—গীতা, ১৩।১৫

১৫ একো দেবো বহুধা সন্নিবিষ্টঃ।
—তৈঃ আঃ, ৩।১৪।১

১৫ বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।

১৬ একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ।
— কঠ উঃ ২।২।১০

এই ভেদ-কল্পনা উপাধিভেদে ব্যবহারিক ভাবে স্বীকৃত হইলেও বস্তুতঃ অলীক। আত্মা যখন শরীরে জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে ক্রীড়া করেন, তখন তিনি সগুণ। আবার যখন আত্মা দেশ কাল ও নিমিত্তাতীত তুরীয় অবস্থায় বিরাজ করেন, তখন তিনি নির্গুণ। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে উভয়ে অভেদ। জীবে জীবে যে ভেদ ও জীবে ব্রহ্মে যে পার্থক্য দৃষ্ট হয়, তাহা আত্মার ব্রহ্মশক্তি প্রকাশের তারতম্যপ্রসূত। প্রকৃতপক্ষে সকল জীবই একই আত্মার বহুরূপ। জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম। বেদান্তমতে অজ্ঞানই জীবে জীবে ভেদ ও জীবে ব্রহ্মে ভেদবুদ্ধি এবং তৎপ্রসূত সকল দুঃখের কারণ। অদ্বৈতজ্ঞান দ্বারা এই অজ্ঞান দূর করাই জ্ঞানযোগের সার কথা।

বেদান্তসিদ্ধান্তে একমাত্র সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই বস্তু এবং অন্যান্য সকলই অবস্তু। অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতে যাঁহার সত্তা বাধিত হয় না, তিনিই বস্তু। অবস্তু মানে—মিথ্যা বা অসৎ বস্তু। একমাত্র ব্রহ্মই তিনকালে বিদ্যমান সৎ বস্তু, অন্যান্য বস্তু অনিত্য বলিয়া মিথ্যা বা অসৎ বস্তু। বেদান্তশাস্ত্রে রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায়, ব্রহ্মবস্তুতে অব্রহ্ম-বস্তুদর্শন বা আত্মায় অনাত্মা আরোপ, অধ্যারোপ নামে অভিহিত। ইহা মায়ার কার্য। মায়া অজ্ঞান ও অবিদ্যা এই তিনটি মূলতঃ এক হইলেও কার্যভেদে ভিন্ন। শুদ্ধ চৈতন্য আশ্রিত ভেদোৎপাদক এক অনাদি সান্ত বস্তুই মায়া নামে অভিহিত। ইহা সৎও নয় এবং অসৎও নয়, ইহা অনির্বচনীয়। কিন্তু জ্ঞান দ্বারা ইহার নাশ হয়। ইহা অচিন্ত্য হইলেও ইহার অস্তিত্ব অস্বীকার করাও যায় না। মায়া স্বরূপকে আচ্ছন্ন করে বলিয়া ইহাকে অজ্ঞান এবং মায়া বিদ্যাদ্বারা নাশ হয় বলিয়া ইহাকে অবিদ্যা বলা হয়। একমাত্র ব্রহ্ম ব্যতীত সকলই মিথ্যা

—সকলই মায়ার কার্য। শুদ্ধ ব্রহ্মকর্তৃক জগৎ সৃষ্ট হইতে পারে না। কারণ, তিনি নিষ্ক্রিয় নির্গুণ ও নির্বিকার। তিনি মায়াকে আশ্রয় করিয়া ঈশ্বররূপে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। সর্পের মুখে বিষ থাকিলেও উহা দ্বারা সর্পের যেমন কোন অনিষ্ট হয় না, তদ্রূপ ব্রহ্ম মায়াকে আশ্রয় করিলেও তিনি উহা দ্বারা বিন্দুমাত্রও প্রভাবিত হন না। শুদ্ধসত্ত্বগুণের প্রাধান্যবশতঃ যাহা মায়া, মলিনসত্ত্বগুণের আধিক্যবশতঃ তাহাই অজ্ঞান ও অবিদ্যা। রজোগুণ বা তমোগুণদ্বারা অভিভূত সত্ত্বগুণকে মলিনসত্ত্বগুণ বলে। মলিনসত্ত্বগুণ আবরণ সৃষ্টি করে; শুদ্ধসত্ত্বগুণ আবরণ সৃষ্টি করে না, উহা প্রকাশস্বভাব। মলিনসত্ত্বগুণবশতঃ আবরণ থাকায় জীব বদ্ধ ও অল্পজ্ঞ এবং শুদ্ধসত্ত্বগুণবশতঃ আবরণ না থাকায় ঈশ্বর নিত্যমুক্ত ও সর্বজ্ঞ।

'বেদান্তসার' ও 'পঞ্চদশী'-মতে অজ্ঞান সমষ্টিরূপে এক এবং ব্যষ্টিরূপে বহু। যেমন অনেক বৃক্ষের সমবায়ে একটি বন অথবা অনেক জলের সমবায়ে একটি জলাশয় হয়, সেইরূপ বহুরূপে প্রতিভাসমান বহুজীবগত অজ্ঞানসমূহ ব্যষ্টিভাবে অনেক এবং সমষ্টিভাবে এক। উপনিষৎকার বলেন, "এক ব্রহ্মই বহু হইয়াছেন।"[১৭] কাজেই বহু একেরই অনিত্য অভিব্যক্তি। অজ্ঞান এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের আশ্রিত বলিয়া উহা এক, বহু নহে। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, অজ্ঞান শুদ্ধব্রহ্মের আশ্রিত হইলেও ব্রহ্ম শুদ্ধই থাকেন। পক্ষান্তরে মিথ্যা অজ্ঞানের আশ্রয় শুদ্ধব্রহ্ম বলিলে ব্রহ্মের শুদ্ধস্বভাবের হানিও মিথ্যাই হয়। পরমার্থ দৃষ্টিতে অজ্ঞান নাই। কাজেই অজ্ঞানজন্য ব্রহ্মের অশুদ্ধির শংকাও নাই। অজ্ঞান-কল্পিত ঈশ্বর জীব ও প্রপঞ্চ অজ্ঞানের অধিষ্ঠানরূপ আশ্রয় হইতে পারে না। আশ্রয়শূন্য অজ্ঞানের অস্তিত্বও সম্ভব নহে। অজ্ঞানের আশ্রয় ও বিষয় জড় নহে, চৈতন্য, অর্থাৎ অজ্ঞান চৈতন্য-আশ্রিত ও চৈতন্যবিষয়ক। অনুভবই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অমুক ব্যক্তি বা বস্তুকে জানি না বলিয়া বোধ, অথবা কোন ব্যক্তি বা বিষয় সম্বন্ধে অজ্ঞানবোধ মানুষের জ্ঞানের নিমিত্তই হইয়া থাকে। এই জন্য জ্ঞানই অজ্ঞানের আশ্রয়। চৈতন্যকেই অজ্ঞান বিষয় করিয়া থাকে, জড়বস্তুকে অজ্ঞান বিষয় করিতে পারে না। কারণ, জড়বস্তু স্বরূপতঃই আবৃত। উহাতে অজ্ঞানজ আবরণের উপযোগ নাই। ঘটাদিবিষয়ক অজ্ঞান ঘটের আবরণ নয়, উহা ঘটসম্বন্ধীয় অজ্ঞানেরই আবরণ। এইজন্য চৈতন্যই অজ্ঞানের আশ্রয় ও বিষয়। কোন জড়বস্তু অজ্ঞানের আশ্রয় ও বিষয় হইতে পারে না। অজ্ঞান এক হইলেও বহু জীবের বহু অন্তঃকরণ-অবচ্ছিন্ন চৈতন্যে বিদ্যমান। যে অন্তঃকরণে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই অন্তঃকরণ দ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্য মুক্ত হইয়া থাকে। যে অন্তঃকরণে জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, সেই অন্তঃকরণ দ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্য অজ্ঞান দ্বারা বদ্ধই থাকে। এই হেতু অজ্ঞান এক হইলেও একের মুক্তিতে সকলে মুক্ত হয় না।

সমষ্টি-অজ্ঞান উৎকৃষ্ট উপাধিযুক্ত বলিয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বপ্রধান। এই অজ্ঞান উপাধিযুক্ত চৈতন্য সকল জ্ঞানের অবভাসক সর্বজ্ঞ সর্বকর্তা ও সর্বনিয়ন্তা বলিয়া অন্তর্যামী জগৎকারণ ঈশ্বর। বেদান্তমতে অজ্ঞানসমষ্টি জগতের কারণ; এই জন্য ইহাকে জগৎকর্তা ঈশ্বরের কারণশরীর বলা হয়। ইহা আনন্দপ্রচুর ও কোশের ন্যায় আচ্ছাদক বলিয়া আনন্দময় কোশ, অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়-সমূহের লয়স্থান বলিয়া সুষুপ্তি এবং এই হেতু স্থূল-সূক্ষ্ম

১৭ তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। ছাঃ উঃ, ৬।২।৩

প্রপঞ্চেরও লয়স্থান। পক্ষান্তরে ব্যষ্টি-অজ্ঞান নিকৃষ্ট উপাধি বলিয়া মলিনসত্ত্বপ্রধান। এই অজ্ঞান-উপাধিযুক্ত চৈতন্য এক জ্ঞানের অবভাসক অল্পজ্ঞ বলিয়া প্রাজ্ঞ জীব নামে অভিহিত। ব্যষ্টি-অজ্ঞান জীবের উপাধি ও অহংকারাদির কারণ, এই জন্য ইহাকে জীবের কারণ-শরীর বলা হয়। ইহাও আনন্দপ্রচুর ও কোশবৎ আচ্ছাদক বলিয়া আনন্দময় কোশ, সকল ইন্দ্রিয়ের লয়স্থান বলিয়া সুষুপ্তি এবং এই কারণে স্থূল-সূক্ষ্ম প্রপঞ্চেরও লয়-স্থান। জ্ঞানযোগীর জানা আবশ্যক যে, উল্লিখিত সমষ্টি ও ব্যষ্টি অজ্ঞান-উপাধিযুক্ত ঈশ্বর ও জীব বন ও বৃক্ষ দ্বারা অবচ্ছিন্ন আকাশের ন্যায় অভিন্ন। ঈশ্বর ও জীবের উপাধিই উভয়ের ভিন্নতার কারণ। উপাধি নষ্ট হইলে উভয়ে স্বরূপচৈতন্যে এক। "কার্য-উপাধি জীব এবং কারণ-উপাধি ঈশ্বর। এই কার্য-কারণ মিথ্যা, এইরূপ জ্ঞান হইলে জীব ও ঈশ্বরে ভেদজ্ঞান নষ্ট হয়।"[১৮]

অজ্ঞানের আবরণ ও বিক্ষেপ নামক দুইটি শক্তি আছে। আবরণ-শক্তি সত্যবস্তুকে আবৃত করে এবং বিক্ষেপ-শক্তি সত্যবস্তুকে অসত্য বা মিথ্যা বস্তুরূপে দেখায়। যেমন নিজ অজ্ঞান দ্বারা আবৃত রজ্জু কেবলমাত্র রজ্জুবিষয়ক ভ্রম উৎপন্ন করে না, পরন্তু রজ্জুতে সর্পরূপ সৃষ্টি করে, সেইরূপ অজ্ঞান-শক্তি দ্বারা আবৃত আত্মায় কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব সুখিত্ব দুঃখিত্বাদি দৃষ্ট হয় এবং ইহার ফলে অজ্ঞান ব্যক্তি নিত্যমুক্ত আত্মাকে বদ্ধ বলিয়া মনে করে। একই ঈশ্বর জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ উভয়ই। মাকড়সা যেমন শরীররূপে উহার জালের উপাদান-কারণ এবং চৈতন্য (প্রাণশক্তি) রূপে জালের নিমিত্তকারণ, সেইরূপ একই ঈশ্বর তাঁহার মায়া-শরীররূপে জগতের উপাদানকারণ এবং চৈতন্যরূপে নিমিত্তকারণ। এইরূপে ব্যষ্টিজীবও তাহার উপাধি অজ্ঞানরূপে স্বকীয় স্থূল-সূক্ষ্ম শরীরের উপাদানকারণ এবং চৈতন্যরূপে নিমিত্তকারণ। জীবের পূর্ব পূর্ব জন্মের কর্মানুসারে ফলদানের জন্য ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টির ইচ্ছা করায় জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। জীব-কর্মানুরোধে জীবের ভোগসম্পাদনের জন্য ঈশ্বরের এরূপ ইচ্ছা হয়। সৃষ্টির মূলে ঈশ্বরের নিজের কোন প্রয়োজন নাই। তিনি সকল বিষয়ে সদাপূর্ণ; তাঁহার অপ্রাপ্ত কিছু থাকিতে পারে না। "তিনি সর্ব-ভূতে সম বলিয়া তাঁহার দ্বেষ্য ও প্রিয় কোন জীব বা বস্তু নাই।"[১৯] জীবের কর্মফল প্রদানে জীবকর্মানু-রোধে ঈশ্বর যখন উদাসীন থাকেন তখন প্রলয় উপস্থিত হইয়া থাকে। প্রলয়ে কার্যবস্তুসমূহ উহাদের নিজ নিজ কারণে বিলীন হয় এবং জীবের কর্ম ও সংস্কাররূপ মায়াতে সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করে। পুনরায় জীব-কর্মানুরোধে ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেন। সৃষ্টির সত্তাংশ চৈতন্যের এবং মিথ্যাংশ মায়ার কার্য। চৈতন্য সকল ভূতেরই সত্তা। প্রশ্ন উঠে—সর্বপ্রথম সৃষ্টিতে জীবের কর্মানুসারে জন্ম এবং ফলভোগ কিরূপে হইয়াছিল? উত্তরে বৈদান্তিকগণ বলেন, ঈশ্বর জীব ও সৃষ্টি এই তিনই অনাদি বলিয়া এই প্রশ্ন উঠিতে পারে না। এই হেতু জীবের উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট ভোগের জন্য ঈশ্বরে পক্ষপাতিত্ব-দোষ আরোপ করা অযৌক্তিক। পক্ষান্তরে ঈশ্বর জীব ও সৃষ্টি ব্যবহারিক দৃষ্টিতে সত্য হইলেও পারমার্থিক দৃষ্টিতে মায়ার খেলামাত্র। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে জীবত্ব ঈশ্বরত্ব ও বিশ্বপ্রপঞ্চ অজ্ঞান-কল্পিত, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য। বেদান্তমতে অজ্ঞানের বিক্ষেপ-শক্তি প্রভাবেই সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম ব্রহ্মরূপে প্রতীত না হইয়া মিথ্যা নামরূপময় জগৎরূপে প্রতীত হইতেছেন।

১৮ কার্যোপাধিরয়ং জীবঃ কারণোপাধিরীশ্বরঃ।
কার্যকারণতাং হিত্বা পূর্ণবোধোঽবশিষ্যতে॥
—অনুভূতিপ্রকাশঃ, ১০।৬১

১৯ সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
—গীতা, ৯।২৯

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র স্মরণে

শ্রীচিত্তদেব (শান্তিনিকেতন)

মন্দাকিনী ধারা বাহি পুণ্যময় জীবন তরণী
অমৃতের ভাণ্ড নিয়ে হেরিল এ মরত ধরণী।
প্রতিভার শুভ্র শিখা দেবতার শুভাশিস্ মাখি
মর্তে বুঝি নেমে এলো উজ্জ্বলিতে মানবের আঁখি !
সত্য জ্ঞান ধর্ম বিদ্যা জীবনের যা অমূল্য ধন
বিতরিতে এলো আজ কোন্ ঋষি কোন্ মহাজন !

এই কি বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গভাগ্যে সুদুর্লভ ধন !
এই কি উজ্জ্বল রত্ন নিত্যকালে জ্যোতিঃ বিকিরণ !
এই কি প্রভাত সূর্য পৃথিবীর তমোনাশকারী !
এই কি পূর্ণিমা রাতে শশাঙ্কের সুধার ভাণ্ডারী !
এই কি মানবসত্তা লোকচিত্তে ইন্দ্রজাল ঘেরা !
এই কি সংসার মাঝে নররূপে দেবতারও সেরা !

সুখ-দুঃখ সত্যাসত্য সব নিয়ে কাহার বিচার !
চিন্তা মাঝে আনে নাই এতটুকু স্বার্থের বিকার।
'ব্যষ্টির আনন্দে শুধু আনন্দিত হবে না জগৎ'
'সমষ্টির শান্তি চাই, সুখ চাই' এই যাঁর মত
'মানুষে মানুষে ভাই' রক্তস্রোতে এই বাণী যাঁর
ইনিই বঙ্কিমচন্দ্র পুণ্যাদর্শ মানবসভার।

ভারতের ভগ্নতরী যাত্রী নিয়ে কাল পারাবারে
যাত্রা যবে করেছিল অনন্ত জীবন পারাপারে
কর্ণধার হীন হয়ে গতিবেগ হলে মন্দীভূত
দেবসভা হতে বুঝি শ্রীবঙ্কিম হল আবির্ভূত !

বন্দেমাতরম্ গানে হাল ধরি মগ্নতরী মাঝে
দিব্যতরী ভাসালেন মন্ত্রগুরু কাণ্ডারীর সাজে।
মন্ত্রদাতা গুরু তুমি কোটি কোটি ভারতবাসীর
এক আত্মা এক প্রাণ স্বজাতির স্রষ্টা বাঙালীর।

ভাষার মোহনরবে তুলিলে যে ছন্দের ঝংকার
ভাবের অন্তরলোকে প্রেরণার জাগায় টংকার !
মুক্তির সাধনা তুমি যেই মন্ত্রে করেছ ঘোষণা
শতাব্দীর সমাপ্তিতে আজও তাহা রুদ্র কলস্বনা !

তোমার মুক্তির গানে মাতে শিশু মাতে নরনারী
অন্তঃপুরে বীরাঙ্গনা তব মন্ত্র বারেক উচ্চারি'
শংখের ফুৎকারে তোলে অন্তরের মুক্তির নিনাদ,
হুলুধ্বনি জয়ধ্বনি দূর করে দুঃখ ও বিষাদ।
মুক্তির আস্বাদ-লাভ বন্দী জীবনের ভূমিকায়
বারেক তোমার মন্ত্রে লভিয়াছি প্রণাম তোমায় !

তোমার আনন্দমঠে দশভুজা দেবী আরাধনা
ভক্তি, বল, শক্তি, জ্ঞান, মূর্তি রূপে আত্মপ্রকাশনা।
দেশের দুর্দিনে তুমি জাতিরে করিলে সচেতন
ভাষার আড়ালে উড়ে মানসের স্বাধীন কেতন।
কত বীর্য কত শৌর্য ধৈর্য সহ আদর্শ পালন
সকলেরই মূলমন্ত্র স্বদেশের মুক্তির সাধন।

কোনোদিন ভুলো নাই হে বঙ্কিম স্বদেশে তোমার
সাম্যবাদ মর্ম দিয়ে করেছিলে তুমিই প্রচার।
আর্যের আদর্শ নীতি ধর্ম কর্ম তোমার চিন্তায়
শীর্ষেতে লভেছে ঠাঁই তব পূত চরিত্রে শিক্ষায়!
জ্ঞানের তুলনা নাই সর্বদর্শী হে মহামানব
ভারতের ধর্মযুদ্ধে বীর্যে তুমি তৃতীয় পাণ্ডব !

সাহিত্যের রাজ্যে তব সম্রাটের নিত্য সিংহাসন
চিরকাল বাধামুক্ত বসিবে না অন্য কোনজন।
অধমের শ্রবণেতে উত্তমের শুদ্ধমন্ত্র দান—
'নীচাশয় তুমি, তাই আমি কেন হবো না মহান'-

অন্তরের এ আকুতি কোন্ ঋষি করেছে প্রকাশ
জগতে আদর্শ নীতি প্রচারের এই ইতিহাস ;
অখণ্ড মানবপ্রেমে স্বর্ণাক্ষরে হইয়া লিখিত
একদিন করিবেই জগতের কল্যাণ বিহিত !

মানবচিত্তের মাঝে মানসের মায়ার দর্পণ
তোমার মুরতি স্মরি শ্রদ্ধাভরে করিছে তর্পণ।
পাপ গ্লানি অশান্তির অন্ধকার করিবারে দূর
তোমার জীবনতত্ত্ব তথ্যময় সপ্তস্বরা সুর ;
সে সুর ধ্বনিত হোক্ মানবের জীবন প্রভাতে
জগতের জীবনের সত্যময় কর্মের সভাতে।

অন্তরের কালো যত হিংসা-দ্বেষ-স্বার্থ-দ্বন্দ্ব আঁকা
মানুষের সমাজেতে মুক্ত হোক্—মন মৈত্রী মাখা।
ধনের মানের গর্ব লুপ্ত হোক্ দুঃখীর সেবায়
আত্মার প্রসাদলাভ হোক্ শুধু মহত্বলেখায়।

মানুষে মানুষে হোক্ পূর্ণতর অন্তর্মিলন
'সকলে সমান' এই গানে হোক্ শাস্ত্রের লিখন।

কালবিবর্তন বশে তোমার প্রতিভাদীপখানি
অনির্বাণ রবে—শুধু এ কথাই মনে মনে জানি।
মননে মানসে নিত্য যা করেছ জীবন সৃজন
অনন্ত মানবলোকে রবে তার অমৃত কীর্তন !

দুঃখময় সংসারেতে প্রাণদীক্ষা সত্যের বিজ্ঞানে
'ভাষারে ভাবের স্বর্গে মানবের দেবপীঠস্থানে'
প্রেরণ করিলে তুমি নবযুগ করিলে সৃজন
রবীন্দ্রের কাব্য যথা মুখরিল পৃথ্বি ও গগন !
প্রবীণ-নবীন-প্রাণ-সম্মিলন তোমা হতে সুরু
জাগৃহি অনন্তপ্রাণ হে অমর মুক্তিমন্ত্র গুরু ! *

* গত ৩রা শ্রাবণ শান্তিনিকেতনে বঙ্কিম শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে রচিত।

মুক্তি-আন্দোলন ও বিবেকানন্দ

শ্রীকালিদাস মুখোপাধ্যায়

জাতীয় উন্নতির জন্য প্রয়োজন বৈপ্লবিক মনোবৃত্তি ; জাতীয় জীবনে বৈপ্লবিক মনোবৃত্তি আসতে পারে না, যদি না জাতীয় জীবনে গড়ে উঠে সাংস্কৃতিক ঐক্য। সাংস্কৃতিক ঐক্যবোধ ছাড়া, একটা জাতি জাতিহিসাবে মাথা তুলে দাঁড়াতেই পারে না। বৈদিক আর্য ভারতীয় অনার্যদের সহিত মিলিত হয়ে সমগ্র ভারতে যে প্রবল হিন্দুজাতীয়ত্বের ভিত্তি স্থাপন করে, তার মূলে ছিল তাদের গভীর সাংস্কৃতিক ঐক্যবোধ। বর্তমান ভারতে নানা বিভিন্নতা, নানা প্রভেদ, পার্থক্য সত্ত্বেও ভারতবাসী যে এক অখণ্ড জাতি, তার কারণ—সমস্ত বিরোধ-বৈচিত্র্যের মধ্যে রয়েছে সম-সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঐক্য। এই ঐক্য-বোধকে আশ্রয় করেই হিন্দু আজও পৃথিবীর বুকে সগৌরবে বেঁচে আছে। আমাদের এই ঐক্যবোধ যে কত বড় সম্পদ, ভারতের ইতিহাসই তার সাক্ষী। ভারতবর্ষের বুকের উপর দিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে একের পর এক বৈদেশিক আক্রমণের ঝড় বয়ে গেছে। গ্রীক, শক, হূণ, গুর্জর প্রভৃতির আক্রমণকে হিন্দুর জাতীয় ঐক্য-সাধনা প্রবল ভাবেই বাধা দিয়েছে—বৈদেশিক আক্রমণ হতে আত্মরক্ষার চেষ্টাতেই

সেই ঐক্যবোধ হয়েছে আরও দৃঢ়, আরও সংঘবদ্ধ। তাই আক্রমণকারী বৈদেশিকগণ শেষ পর্যন্ত স্বকীয় অস্তিত্ব পর্যন্ত বজায় রাখতে পারে নি। হিন্দুসমাজের মধ্যেই আত্মগোপন করে হিন্দু হয়ে তাদের আত্মরক্ষা করতে হয়েছে। বস্তুনিষ্ঠ ঐতিহাসিকের দৃষ্টি দিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, হূণদের শেষ পরাজয়ের পর মুসলিম আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত দেশের মধ্যে ছিল নির্বাধ শান্তির পরিবেশ। এই শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ার সময় সবিশেষ প্রচেষ্টার ফলে ভারতীয় সমাজে ধর্ম সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক চেতনা এমন প্রবল-ভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়ে উঠে যে, মুসলমানরা যখন এদেশে এলো তখন তারা দেখতে পেলো বিরাট হিন্দুজাতি সম-ধর্ম ও সম-সাংস্কৃতিক ঐক্যে আবদ্ধ।

পাঞ্জাব প্রদেশের সিন্ধু উপত্যকায় অধ্যুষিত বৈদিক আর্যগণ (খৃষ্টপূর্ব ২০০০ হ'তে ১৪০০ খৃষ্টপূর্ব) বৈদিক যুগের অবসানে এবং এপিক্ বা মহাভারতীয় যুগের আরম্ভে (মহাভারতীয় যুগ খৃঃ পূঃ ১৪০০ হ'তে ১০০০ খৃঃ পূঃ) পাঞ্জাবের সীমা অতিক্রম করে ধীরে ধীরে সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। সাংস্কৃতিক ঐক্যবোধ থাকার জন্য স্থান ও কালের দূরত্ব সত্ত্বেও তারা জাতি হিসাবে অখণ্ডই রয়ে গেল। ক্রমশঃ 'সিন্ধু' শব্দের বিকারজাত হিন্দু নামে ভারতবাসী পরিচিত হলো। সম্ভবতঃ পৃথ্বীরাজের সময়ই হিন্দু শব্দের বহুল প্রচলন সুরু হয়।

হিন্দু-জাতীয় ঐক্য একান্ত দৃঢ়প্রতিষ্ঠ ছিল বলেই মুসলমানদের নির্মম আক্রমণের মধ্যে, ঝড় ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করে হিন্দু তার জাতীয় গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয় এবং ঐক্য-বোধের শক্তিতেই শক্তিমান হয়ে পরিশেষে সমস্ত মুসলিমশক্তি চূর্ণ করে হিন্দুশাসনাধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়। ১৮১৮ সালে মারাঠা সাম্রাজ্যের পতনে কি ভাবে ভারতবর্ষে ইংরেজ প্রভুত্ব স্থাপিত হয়, সে-কথা আজ আর কারো অজানা নেই। ইংরেজ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বেই যে হিন্দু-কর্তৃক মুসলিমশক্তি চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, তা ঐতিহাসিক সত্য। তাই ইংরেজকে ভারতবর্ষ অধিকার করবার জন্য রাজশক্তি হিসাবে কোথাও মুসলমানদের সহিত লড়াই করতে হয় নি—হিন্দুর সহিত যুদ্ধ করেই ইংরেজকে ভারতবর্ষ দখল করতে হয়েছিল।

মুসলমানগণ ভারতবর্ষ অধিকার করেছিল সত্য, কিন্তু দেশের উপর পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব তারা স্থাপন করতে পারে নি, বিরোধ-বিপ্লব এড়িয়ে কোন সময়ই রাজ্য পরিচালনা করতে পারে নি। এই যুগে মুসলিম-রাজগণকে অবিরত হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিরামবিহীন প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছে। মুসলিম-রাজগণের সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ করে দিয়ে হিন্দুরাষ্ট্র গড়ে উঠেছে দিকে দিকে—হিন্দু মুসলিমশক্তিকে হীনবল করে একের পর অন্যস্থানে স্বাধীন হয়েছে এবং পরিশেষে মুসলিম-রাষ্ট্রশক্তিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে সমগ্র ভারতে হিন্দু স্বাধীন হয়ে উঠে। ১৭৯৩ সালে মহারাষ্ট্রের বৈদেশিক দূত গোবিন্দরাও কালে নানাফাড়নবিশ্‌কে এক পত্রে লেখেন :—

"আটক নদী হইতে ভারতসাগর পর্যন্ত যে ভূভাগ তাহা হিন্দুদের বাসস্থান; উহা হিন্দুস্থান—তুর্কিস্থান নয়। পাণ্ডবদের সময় হইতে বিক্রমাদিত্য পর্যন্ত এই ভূভাগকেই আমরা রক্ষা করিয়াছি, আমরা ভোগ করিয়াছি—শাসন করিয়াছি। তারপর আসিল মুসলমান বিজয়িগণ, তাহারা আমাদের রাজ্য দখল করিল, কিন্তু এই ভূভাগ বেশীদিন তাহাদের অধিকারে থাকিল না। মহাদজী সিন্ধের তরবারি ও বুদ্ধির প্রভাবে এবং পেশোয়াদের দ্বারা ও তাঁহাদের বিক্রমে এই ভূভাগ আবার আমাদের হাতে আসিল—হিন্দু-

রাজত্ব পুনঃ স্থাপিত হইল এবং ইহার খ্যাতি জগৎময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।"

মুসলমানগণ ভারতবর্ষের কোথাও যে তেমন ভাবে দীর্ঘকাল প্রভুত্ব করতে পারে নি, ইংরেজ-শাসন এদেশে আরম্ভ হবার পূর্বেই যে হিন্দুকর্তৃক মুসলিম-প্রাধান্য বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং হিন্দুশক্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়, তার মূলকারণ হিন্দুর জাতীয় ঐক্যবোধ। এই ঐক্যবোধ হিন্দু-জাতির প্রাণস্বরূপ। ভারতবর্ষ অধিকার করবার পরে ইংরেজ বুঝতে পারলো, ভারতবর্ষে যদি স্থায়ী ভাবে রাজত্ব করতে হয় তো এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে যাতে হিন্দু আর কোন দিন ইংরেজের বিরুদ্ধে অভিযান না করতে পারে। ইংরেজ বুঝলো হিন্দুর জাতীয় ঐক্য, তার বৈপ্লবিক চেতনাকে নষ্ট করতে হবে। এমন অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে যাতে হিন্দু ভুলে যাবে তার জাতীয়তা, ধর্ম ও সংস্কৃতির মহিমা, গ্রহণ করতে বাধ্য হবে বিজাতীয় ধর্ম, চিন্তা ও কর্মের আদর্শ। কাজেও তাই হলো। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ খৃষ্টানমিশনারী-দের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দিয়ে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সুরু করলো। কিন্তু ১৮৫৭ সালের পর ইংরেজ বুঝলো হিন্দু বা মুসলমানদের ধর্মে আঘাত দিয়ে তাদের আয়ত্তাধীনে আনবার প্রয়াস মারাত্মক। এরপর ইংরেজ তাই প্রকাশ্যভাবে মিশনারীদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা ছেড়ে দিতে সাহস করল না। কিন্তু রাজনৈতিক চাতুর্যের সহিত তারা এমন একটি ব্যবস্থার প্রবর্তন করলো যাতে হিন্দুর জাতীয় ঐক্যে ভাঙন ধরে, যাতে জাতীয় মনোভাব নষ্ট হয়ে যায় এবং হিন্দুরা ইংরেজশাসনের পক্ষপাতী হয়ে উঠে। ভারতবর্ষে সুকৌশলে বিকৃত পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলনই হলো সেই সর্বনাশা ব্যবস্থা। লর্ড বেণ্টিঙ্কের শাসনকালে মেকলের পরিচালনায় ইংরেজী শিক্ষার যে প্রবর্তন হয় (১৮৩৫), তার উদ্দেশ্য যে হিন্দুর জাতীয় চেতনা বিনষ্ট করা, তা মেকলের এক পত্রেই জানা যায়। লর্ড মেকলে এক পত্রে তাঁর জামাতাকে লিখেছিলেন, "আমার সংকল্পিত শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত হলে হিন্দু-যুবকদের যে পথে চালিয়ে নিয়ে যাবে, সেখানে তারা স্বেচ্ছায় সাদরে খৃষ্টধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করবে। পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের অর্থই হলো বৃটিশের সহিত সৌহার্দস্থাপন।"

জাতীয়তাবিরোধী এই শিক্ষাবিধি-প্রবর্তনের ফলে অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্য ইংরেজশাসকদের আশা সফল হয়েছিল স্বীকার করতেই হবে। দলে দলে হিন্দুছাত্র ভুলে গেল তাদের গৌরবময় জাতীয় সংস্কৃতির কথা, অন্ধ আবেগে গ্রহণ করলো পাশ্চাত্য দীক্ষা, বহু ছাত্র হলো খৃষ্টধর্মে অনুপ্রাণিত। ফলে তারা হয়ে উঠলো ইংরেজভক্ত। ইংরেজী আদর্শকেই তারা বরণ করে নিয়ে ভাবলো ইংরেজশাসনই জাতির পক্ষে মঙ্গলকর—ইংরেজী ভাবধারার অনুকরণ ব্যতীত জাতির উন্নতি অসম্ভব। এমনি করেই হিন্দু সেদিন জাতীয় চেতনা হারিয়ে হিন্দু-সংহতির মধ্যে বিরোধ বাধিয়ে বিপ্লবী মনোভাব নিঃশেষে শেষ করে হীনবল হয়ে পড়লো—দুর্বলের তামসিকতা জাতীয় কবর খননের কাজে তাকে করে তুললো অসীম উৎসাহী।

ইংরেজী শিক্ষা যতই বিকৃতভাবে দেবার ব্যবস্থা হোক না কেন, ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে গণতন্ত্রের যে সুর, স্বাধীনতার জন্য যে তীব্র উন্মাদনা রয়েছে, তার প্রভাবও সহজে ইংরেজী শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে প্রসারিত হয়ে পড়লো। ফলে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের অল্প সময়ের মধ্যেই শাসকসম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দিয়ে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য হিন্দুভারত জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সুরু করে দেয়।[১] তা ছাড়া ঠিক এই সময়েই হিন্দুসমাজের মধ্যে এমন একদল

১ এই সময় মুসলমানগণ ইংরাজী শিক্ষাগ্রহণে অস্বীকৃত হয় এবং সযত্নে তা বর্জন করে দূরে থাকে।

চিন্তাবীর আবির্ভূত হন, যাঁরা বিজাতীয় মনোভাবের বিরুদ্ধে হিন্দুসভ্যতা সংস্কৃতি ধর্ম ও রীতিনীতির প্রবর্তনে দেশব্যাপী ব্যাপক আন্দোলন আরম্ভ করেন। এর ফলে হিন্দুসমাজ একদিকে ইয়োরোপীয় সাম্য স্বাধীনতার মন্ত্র পেলো এবং অপরদিকে তারা বিজাতীয় মনোভাব পরিত্যাগ করে জাতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির পথে প্রত্যাবর্তন করতে সুরু করে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, আমরা যে বিজাতীয় বিকৃত শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছি তা শিক্ষাব্যবস্থার গুণে নয়—নিজের কৃতিত্বের জন্য। ইতিহাস এ কথারই স্বীকৃতি জানায়।

ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আন্দোলন প্রকৃত প্রস্তাবে ইংরেজী শিক্ষারই ফল। ইংরেজী শিক্ষার ফলেই পরাধীন আমেরিকার হৃদয়ে স্বাধীনতার বাসনা জাগ্রত হয়ে উঠে এবং সেই দুর্বার আকাঙ্ক্ষার পরিণতি আমেরিকার স্বাধীনতা লাভ। ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের দ্বারাই ইংরেজ আমেরিকা হারাতে বাধ্য হয়। এই কারণেই ইংরেজশাসক প্রথমতঃ ভারতবর্ষে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তার করতে চায় নি—তাদের ভয় ছিল এই যে, ভারতবর্ষেও আমেরিকার পুনরভিনয় হতে পারে। ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের বিরোধিতা করে একজন ইংরেজ খোলাখুলি বলেছিলেন, "We have just lost America from our folly in having allowed the establishments of schools and colleges and it would not do for us to repeat the same act of folly in regard to India."

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইংরেজ যখন এ দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তন করলো, তখন তার উদ্দেশ্য ছিল: এ দেশে রাজ্যশাসনের জন্য কর্মচারী তৈরি করা, হিন্দুযুবকদের খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করা এবং হিন্দুসমাজের মধ্যে বিজাতীয় মনোভাব সৃষ্টি দ্বারা হিন্দুর জাতীয় চেতনা ধ্বংস করা। তবুও ইংরেজ শাসকদের সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ করে কি ভাবে হিন্দুসমাজে রাষ্ট্রীয় মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠে তা পূর্বেই বলেছি। এই জাগ্রত চেতনা হিন্দুসমাজকে আবার উনবিংশ শতকের মধ্যেই বিপ্লবমুখর করে তোলে। উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় ভাগে বাংলাদেশ তিনটি বিপ্লবের স্রোতে কলমুখর হয়ে উঠে। রাজা রামমোহনকর্তৃক প্রবর্তিত হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে এলো প্রথম বিপ্লব, বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা বাঙলা সাহিত্যে এলো দ্বিতীয় বিপ্লব, রাষ্ট্রীয় মুক্তি সাধনার মধ্যে এলো তৃতীয় বিপ্লব। ধর্ম সাহিত্য ও রাজনীতিতে এই তিনটি বিপ্লব যথাসময়ে আবির্ভূত না হলে হিন্দুজাতি ও হিন্দুসংস্কৃতির অবস্থা যে কি হতো, তা কল্পনা করাও ভীতিপ্রদ। বাংলাদেশের এই তিনটি বৈপ্লবিক আন্দোলনই বস্তুতঃ নব্য ভারতের ভিত্তিমূল। এই তিনটি বিপ্লবধারাই প্রকৃতপক্ষে বাংলা তথা ভারতবর্ষকে অনিবার্য পতনের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছে। হিন্দুজাতিকে বাঁচাবার জন্য, বিজাতীয় মনোভাবাপন্ন হিন্দুকে জাতীয় চেতনায় বিপ্লবী করে তোলবার জন্য প্রয়োজন হলো হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির আন্দোলন, প্রয়োজন হলো জাতীয় সাহিত্য ও শিক্ষার প্রচার, প্রয়োজন হলো পাশ্চাত্যভাবে গড়া মুক্তির স্বপ্নকে জাতীয় মুক্তির মধ্যে রূপান্তরিত করা। জাতির বেদনাময় এই অসহ্য প্রেরণার ফলে তাই ধর্মে এলো বিপ্লব, সাহিত্যে এলো বিপ্লব, রাজনীতিতে এলো বিপ্লব। এই তিনটি বিপ্লবধারা জাতিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে একটা বিরাট জাতীয় বিপ্লবের অভিমুখে।

বিপ্লবের জন্য যেমন কর্মের প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন নীরব সাধনার। জাতীয় জীবনে কর্মকোলাহলের ঊর্ধ্বে যদি না নীরব সাধনার মুক্তি-রস থাকে তবে জাতীয় জীবনে আসে অবসাদ, আসে মালিন্য—জাতীয় উদ্যম হয় ব্যর্থ। তাই বঙ্কিমচন্দ্র

জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টি করতে গিয়ে দেশপ্রীতিকেই চরম ধর্ম বলে প্রচার করলেন, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর জীবন রচনা করলেন—যাঁর নীরব সাধনার মধ্যে দেশধর্মের জাতীয় কর্মের অগ্নিমন্ত্র ধ্বনিত হলো। বঙ্কিমচন্দ্রের সন্ন্যাসী সম্প্রদায় বিশেষতঃ সত্যানন্দ সেই আদর্শেরই প্রতীক। শ্রেষ্ঠ কবির রচনার মধ্যে জাতির আশা আকাঙ্ক্ষা ও ভাবী যুগের চিত্র প্রতিভাত হয়। যুগে যুগে দেশে দেশে কবির তাই এতো সম্মান—শিল্পীর তাই এতো গৌরব। চণ্ডীদাস যেমন তার পদাবলীর মধ্যে ভাবী যুগের চৈতন্যদেবের আবির্ভাবকে চিত্রিত করেছিলেন, তেমনি দেখি বঙ্কিমচন্দ্রের সন্ন্যাসীর মধ্যে নবযুগের ছায়া। বঙ্কিমের স্বপ্ন বাস্তবরূপ নিলো রামকৃষ্ণদেবের মধ্যে—তাঁর নীরব সাধনার মধ্যে জাতির আশা আকাঙ্ক্ষা, তার স্বদেশপ্রীতি, তার ধর্ম ও সংস্কৃতির মহিমা সত্য হয়ে উঠে। রামকৃষ্ণদেব নবযুগের ধ্যানময় প্রতীক। মাঝে মাঝে জাতীয় জীবনে এমন এক একজন আবির্ভূত হন, যাঁর মধ্যে সমগ্র জাতির সংস্কৃতি এবং সাধনা প্রতিফলিত হয়, তাঁকেই বলা চলে সমগ্র জাতির প্রতিনিধি। আমাদের দেশে জাতির এমনি প্রতিনিধিকেই বলা হয় অবতার। রামকৃষ্ণদেব নব্যভারতের অবতার। গৌতম বুদ্ধের নীরব সাধনায় গড়ে উঠেছিল বৌদ্ধযুগ ও বিশাল বৌদ্ধ সংস্কৃতি, চৈতন্যদেবের নীরব সাধনায় যেমন করে গড়ে উঠেছিল চৈতন্যযুগ, তেমনি বর্তমান যুগে রামকৃষ্ণদেবের নীরব সাধনার মধ্যে মুক্তিকামী ভারতবর্ষ তার আকাঙ্ক্ষিত পথের সন্ধান পেয়েছে। বিশেষ একজনের নীরব সাধনার মধ্যে কেমন করে সমগ্র জাতির সভ্যতা সংস্কৃতি তার আশা আকাঙ্ক্ষা রূপ পেতে পারে, তা সহসা বিস্ময়কর মনে হতে পারে। বিস্ময়কর বটে কিন্তু তা ঐতিহাসিক সত্য—ইতিহাসই তার প্রমাণ। সকলেই সমস্ত জাতির প্রাণস্পন্দন অনুভব করতে পারে না, অতি দুর্লভ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন দু'একজন পুরুষই তা অন্তরের মধ্যে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম। যাঁরা একাজে সমর্থ আমরা তাদের বলি মহাপুরুষ—বলি অবতার।

জাতীয় সাধনাই জাতীয় কর্মের মধ্যে হয় রূপায়িত। জাতিগঠনে কর্মবিহীন নীরব সাধনা প্রয়োজন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র এক জায়গায় লিখেছেন, "নীরব ভাবনা, কর্মবিহীন বিজন সাধনা সময়ে সময়ে দরকার হয়, এমন কি দীর্ঘকালের জন্যও।"[২]

ঊনবিংশ শতকের তৃতীয়ার্ধে ধর্ম সাহিত্য ও রাজনীতিতে যে তিনটি বিপ্লব এলো সেই তিনটি বিপ্লবধারার ধ্যানগম্ভীর সমন্বয়রূপ রামকৃষ্ণদেব। উল্লিখিত তিনটি বিপ্লবই দেশকে জাতীয় বিপ্লবের পথে নিয়ে চলেছে। তাই রামকৃষ্ণকে বলতে হয় অনাগত ভারত-বিপ্লবের প্রথম ও সর্বপ্রধান অধিনায়ক। রামকৃষ্ণদেবের সাধনা আত্মমুক্তির সাধনা ছিল না—এই সাধনা ছিল জাতীয় মুক্তির সাধনা। রামকৃষ্ণদেবের নীরব সাধনার কর্মরূপ স্বামী বিবেকানন্দ। রামকৃষ্ণদেব বিবেকানন্দকে যে মন্ত্রে দীক্ষা দেন, তা স্বীয় মুক্তির মন্ত্র নয়—তা হলো জাতীয় মুক্তির মন্ত্র। স্বামিজী বারবার সেই কথা জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "ভাইরা, আমার গুরুদেব আসিয়াছিলেন মানব-কল্যাণব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়া দিতে। আমিও তাঁহারই কার্যে তিল তিল করিয়া রক্তদান করিলাম—তোমাদিগকেও তাহাই করিতে হইবে।" স্বামিজী যে ইয়োরো-আমেরিকায় গিয়াছিলেন, তার উদ্দেশ্য ছিল—জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন প্রচার দ্বারা ভারতবর্ষের যথার্থ উপায় সন্ধান করা। স্বামীজী বলেছেন, "I came here to seek aid for my impoverished people"—আমি আমেরিকায় এসেছি আমার হৃতসর্বস্ব দেশবাসীর মুক্তির প্রয়াসে।[৩] প্রশ্ন হতে পারে,

২ সবুজপত্র—মাঘ, ১৩৩২

৩ The Chicago Address, p. 27

ভারতের মুক্তিসন্ধানে ইয়োরো-আমেরিকায় যাবার সার্থকতা কি? সেখানে গিয়ে তিনি জাতীয় মুক্তির জন্য কি কাজ করতে পেরেছেন? ইয়োরো-আমেরিকাবাসীদের বেদান্তবাণী শুনিয়ে ভারতের জাতীয় মুক্তি কি সম্ভব?

ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সহিত বিবেকানন্দের ইয়োরো-আমেরিকার কার্যকলাপের যোগাযোগটা কি এবং তার সার্থকতাই বা কি তা জানতে হলে প্রথমতঃ বুঝতে হবে দুটি কথা। ইংরেজ ভারতবর্ষ শাসন করতে আরম্ভ করে একদিকে হিন্দুর জাতীয় ঐক্য ধ্বংস করবার জন্য নানা কৌশল বিস্তার করে, অপর দিকে ইংরেজ জগতের কাছে প্রচার করতে থাকে—ভারতবর্ষ অতি অসভ্য, তার উল্লেখযোগ্য কোন সাহিত্য নেই, সংস্কৃতি নেই—রাজ্যশাসনে ভারতবাসী অক্ষম, সমাজব্যবস্থা তাদের অতি জঘন্য। ভারতে ইংরেজশাসনের ফলে ভারতবাসী দ্রুতবেগে জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী হচ্ছে, সভ্যতার পথে এগিয়ে চলেছে, সমাজব্যবস্থার নানাবিধ উন্নতি সাধিত হচ্ছে। অর্থাৎ এক কথায় ইংরেজ বিশ্ববাসীর কাছে যে প্রচারকার্য চালিয়েছিল, তার মোটকথা ইংরেজশাসন ব্যতীত ভারতবর্ষের গতি নেই—ভারতবর্ষের সৌভাগ্য যে ভারতবাসী ইংরেজকে সভ্য হবার সহায়-রূপে পেয়েছে।

একটা জাতিকে পরাধীন করে তার সর্বস্ব লুট করতে হলে প্রথম প্রয়োজন জাতীয় ঐক্য ধ্বংস করা এবং দ্বিতীয় প্রয়োজন জগতের কাছে তাকে অতি হীন, অতি ঘৃণ্য বলে প্রমাণ করা। বিশ্ববাসীর কাছে মিথ্যা প্রচারের উদ্দেশ্য—ভারতবাসী যাতে তাদের কোন শ্রদ্ধা, কোন সহানুভূতি না পায়। দুনিয়াব্যাপী যদি জানে, ইংরেজ শুধু ভারতবর্ষের মঙ্গলের জন্যই দেশ শাসন করছে, তা' হলে ভারতবর্ষ যখন ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনবে—স্বাধীনতার দাবী জানাবে, তখন বিশ্বের জনমত স্বভাবতঃই ভারতের প্রতি তেমন সহানুভূতি দেখাবে না অর্থাৎ তা' হলেই শুধু ইংরেজ নির্ভয়ে পরাধীন ভারতবর্ষের উপর অবাধ শোষণ চালাতে পারবে। ইংরেজ আজও বহির্জগতে ভারতবর্ষকে হীন, স্বাধীনতার অযোগ্য প্রতিপন্ন করবার জন্য কম চেষ্টা করছে না। তাই তো ভারতের জাতীয় কংগ্রেস বহির্জগতে ভারত-প্রচারের ঐকান্তিক প্রয়োজন অনুভব করছে। ভারতবর্ষ কি, তার সভ্যতা সংস্কৃতির স্বরূপ কি, তার দাবী কি, সে কি চায় তা যদি বহির্জগতের কাছে প্রচার করা যায় তবেই শুধু ভারতবর্ষ বিশ্বের শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারবে। ব্যক্তিগত সংস্পর্শ ছাড়া অন্যান্য দেশে ভারতবর্ষকে জনপ্রিয় করা কঠিন। বৈদেশিক প্রচার জাতীয় আন্দোলনের পক্ষে অতি গুরুত্বপূর্ণ। নেতাজী হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতির অভি-ভাষণে সেই কথাই খুব স্পষ্ট করে বলেছেন (১৯৩৮), "সমস্ত পৃথিবীতে ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে যে প্রচারকার্য চলে তার মর্ম হচ্ছে এই যে, ভারতবর্ষ একটি অসভ্য দেশ এবং উহা হতে সিদ্ধান্ত হয় এই যে, আমাদের সভ্য করবার জন্য ইংরেজের প্রয়োজন। ইহার প্রত্যুত্তর স্বরূপ আমাদের শুধু জগৎকে জানাতে হবে, আমরা কি এবং আমাদের সংস্কৃতি কিরূপ। ইহা যদি আমরা জানাতে পারি, তা হলে আমাদের প্রতি এমন বিপুল আন্তর্জাতিক সহানুভূতি সৃষ্টি হবে যে, বিশ্ব-জনমতের দরবারে ভারতের দাবীকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না।"

সশস্ত্র উপায়েই শুধু স্বাধীনতালাভ সম্ভব, এ'কথা সত্য নয়। শান্তিপূর্ণ উপায়েও স্বাধীনতা অর্জন করা যেতে পারে—যদি পরাধীন জাতি যোগ্যতার সহিত বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহার করতে পারে, যদি বিশ্বের জনমত স্বপক্ষে গড়ে তুলতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন বৈদেশিক প্রচার-

কার্য। আয়র্ল্যাণ্ডের সিন্ ফিন্ দল ডি ভ্যালেরার নেতৃত্বে ইয়োরোপ ও আমেরিকায় ব্যাপক প্রচারকার্য চালিয়ে কি ভাবে উপকৃত হয়েছে (১৯২০-২১) তা আজ আর কারো অজানা নেই। ডাঃ ম্যাসারিক, ডাঃ বেনেস প্রমুখ চেকনেতৃবৃন্দ ইয়োরোপ ও আমেরিকায় প্রায় ২০ বৎসর প্রচারকার্য চালান। তারই ফলে চেকোস্লোভাকিয়া ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং আমেরিকার সাহায্যে স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে আবির্ভূত হতে সক্ষম হয় (১৯১৮)। বর্তমান চীন যে সমগ্র পৃথিবীর সহানুভূতি লাভে সমর্থ হয়েছে, তার মূল কারণ চীনের সংঘবদ্ধ বৈদেশিক প্রচারকার্য।

কার্যকরী বৈদেশিক প্রচারকার্য জাতীয় আন্দোলনের নামান্তর মাত্র। বর্তমানে ভারতবর্ষের পক্ষে বৈদেশিক প্রচার যত প্রয়োজন, তার চেয়ে সহস্রগুণ বেশী প্রয়োজন ছিল স্বামী বিবেকানন্দের যুগে। বিবেকানন্দের সময় জাতীয় মুক্তির জন্য যার প্রয়োজন ছিল অত্যন্ত বেশী, তার মধ্যে প্রথমটি হলো ধর্ম সাহিত্য ও রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের দ্বারা জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলা এবং দ্বিতীয়টি হলো বহির্ভারতে ভারতবর্ষের বাণীপ্রচার দ্বারা বৈদেশিক জনমত গঠন করা। উনবিংশ শতকের শেষভাগে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলবার আন্দোলন দেশের মধ্যে আরম্ভ হয়েছিল সত্য, কিন্তু তার সহিত একযোগে বৈদেশিক প্রচারকার্য চালাবার চিন্তা তখনো দেশ করেনি। বিবেকানন্দই সর্বপ্রথম বহির্ভারতে আন্দোলন চালাবার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন—যে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনের কথা কংগ্রেসের সভাপতি নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁর অভিভাষণে বলেছেন (১৯৩৮)।[৪]

বিবেকানন্দ সমস্ত অন্তর দিয়ে অনুভব করেছিলেন জাতীয় দাবীর গুরুত্ব। এই প্রয়োজনের তাগিদেই স্বামিজী সম্পূর্ণ সহায়সম্বলহীন অবস্থায় আমেরিকায় যান এবং ১৮৯৩ সালে সিকাগোর বিশ্বধর্ম মহাসভায় ভারতবর্ষের অন্তরবেদনার দাবী ঘোষণা করেন। মুহূর্তে ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ ভারত বিশ্বের ভারত হয়ে উঠলো। বিবেকানন্দ দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে ইয়োরোপ ও আমেরিকায় ভারতসংস্কৃতি প্রচার করলেন। এই প্রচারকার্য চালাবার ফলে ভারতবর্ষ পেলো বিশ্বের দরবারে স্বীয় স্থান, ইয়োরোপ ও আমেরিকায় গড়ে উঠলো ভারতের প্রতি সহানুভূতিশীল অসংখ্য নরনারী—বিবেকানন্দের কাছেই বিশ্ববাসী শুনলো ভারতবর্ষের অত্যুচ্চ সভ্যতা ও সংস্কৃতির বাণী। বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক আন্দোলনের ফলেই ভারতবর্ষ পেলো আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা।

বিকৃত পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে যে সব হিন্দু যুবক স্বদেশীয় ধর্ম সাহিত্য ও সভ্যতার উপর আস্থা হারিয়ে বসেছিল এবং ইয়োরোপীয় সভ্যতাকেই একমাত্র সত্য বলে গ্রহণ করে জাতীয় ঐক্য হারিয়ে সর্বনাশের পথে চলেছিল, তারা যখন শুনলো স্বদেশীয় সভ্যতা সংস্কৃতিকে ইয়োরোপ আমেরিকা শ্রদ্ধা করছে, তখন তাদের পাশ্চাত্য মোহের আবেশে আঘাত লাগলো, ধীরে ধীরে দেশ ও জাতির প্রতি শ্রদ্ধাবান হতে সুরু করলো। দেশের মধ্যে জাতীয় ঐক্য গড়ার জন্য যারা হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রচার করছিলেন, তাদের সাফল্যলাভে বিবেকানন্দের বৈদেশিক আন্দোলনের প্রভাব অসীম। এই ভাবে স্বামিজী একদিকে দেশের আভ্যন্তরিক ঐক্য গড়ার কাজে যুগান্তর আনলেন এবং অপরদিকে ভারতবর্ষের প্রতি সহানুভূতিশীল জনমত গঠন করে জাতীয় আন্দোলন তীব্রতর করে তুললেন।

স্বামী বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত আন্দোলন হলো

[৪] Speeches and Writings of Subhas Bose, Lahore, 1946, p. 42

জাতীয় আন্দোলন। বিবেকানন্দের পর তাঁর আরব্ধ আন্দোলন যিনি ২৫ বৎসর ধরে (১৮৯৬-১৯২১) ইয়োরো-আমেরিকায় চালান, সেই স্বামী অভেদানন্দের ভাষায়, "Vivekananda's is a national movement. Every one of you must feel it a part of your national life."[৫] তাই তো বর্তমান ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মহাত্মা গান্ধী আফ্রিকায় প্রচার করেছেন স্বামিজীর বাণী, ইয়োরোপে অবস্থানকালে নেতাজী সুভাষচন্দ্র (১৯৩৩-৩৬) পাশ্চাত্যবাসীদের কাছে উপস্থিত করেছেন স্বামিজীর অগ্নিমন্ত্র। The Indian Struggle গ্রন্থে স্বামিজীকে বলেছেন, Father of Indian Nationalism.

বিবেকানন্দ ছিলেন ভারতের জাতীয়তার জীবন্ত মূর্তবিগ্রহ। বিবেকানন্দপ্রবর্তিত আন্দোলন ঘরে বাইরে সৃষ্টি করে তোলে তীব্র অনুভূতিময় জাতীয়তাবোধ—দেশের মধ্যে আসে সংঘবদ্ধ রাষ্ট্রীয় আন্দোলন এবং বাইরে আরম্ভ হয় বৈদেশিক প্রচার। বিবেকানন্দের আদর্শে চালিত হয়ে বাংলার বিপ্লবপন্থীরা চলে গেল সুদূর আমেরিকা ইয়োরোপ এবং জাপানে। ১৯০৫-৭ সালে ইয়োরো-আমেরিকা ও জাপানে ভারতীয় বিপ্লবীদের কার্যকলাপের কিছু পরিচয় ডাঃ তারক দাসের India's Demand For Absolute Independence প্রবন্ধে পাওয়া যায়।[৬]

বিবেকানন্দের জাতীয় আন্দোলন বিবেকানন্দের সাথে সাথে লুপ্ত হয়ে যায় নি—ঘরে বাইরে সেই আন্দোলন ক্রমশঃ হয়েছে গভীর ও ব্যাপক এবং তার ফলে এসেছে ১৯০৫ এর বিপ্লব, সম্ভব হয়েছে ১৯২১ ও ১৯৩০ এর বিপ্লব, গড়ে উঠেছে পরিপূর্ণ জাতীয় মুক্তির জন্য অনাগত ভারত-বিপ্লব।

১৯৩০ সালে ওয়েণ্ডেল টমাসের Hinduism Invades America শীর্ষক গ্রন্থ নিউইয়র্ক হতে প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থে হিন্দুধর্মকে নানাভাবে আক্রমণের চেষ্টা করা হয়েছে, যদিও গ্রন্থকার ভূমিকায় বলেছেন, "This work is not an attack on Hinduism." এই গ্রন্থে রামকৃষ্ণদেব হ'তে বিবেকানন্দ পর্যন্ত অনেককেই বিকৃত করা হয়েছে। গ্রন্থকার বলেন বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত আন্দোলনের ফলে ঘটেছে, "Anarchist movement in Bengal and the more recent drives for 'Civil Disobedience' which Manmohandas Karamchand Gandhi, the saintly politician, has been organizing on a nation-wide scale." (P. 91)[৭] ওয়েণ্ডেল টমাসের উদ্দেশ্য যদিও সাধু নয় তবুও তাঁর উক্তির মধ্যে একটি গভীর সত্য রয়েছে এবং তা হলো এই যে স্বামী বিবেকানন্দই সর্বপ্রথম ভারতবাসীর হৃদয়ে বিপ্লবের বীজ বপন করেন—বিবেকানন্দের কাছেই ভারতবাসী প্রথম বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়। বিবেকানন্দ কোথাও সন্ত্রাসবাদের সমর্থন করেছেন এ কথা কেউ প্রমাণ করতে পারবেন না। সন্ত্রাসবাদীরাও বিবেকানন্দের জাতীয়তার অগ্নিমন্ত্রে অনুপ্রাণিত হয়েছিল সন্দেহ নেই। এর জন্য বিবেকানন্দকে সন্ত্রাসবাদের জন্মদাতা বলে অভিহিত করা কি নিতান্তই পাগলামি নয়?

পরাধীন দেশের উগ্র জাতীয়তাকে সন্ত্রাসবাদের নামান্তর বলে প্রচার করা কিছুমাত্র বিস্ময়কর

৫ Lectures and Addresses in India, p. 20.

৬ Hindusthan Standard—18th May, 1946

৭ গ্রন্থকার এখানে ১৯৩০ এর অসহযোগ আন্দোলনের কথা বলেছেন। উদ্ধৃতির মধ্যে মহাত্মা গান্ধীর বিকৃত নাম উল্লেখযোগ্য।

নয়। নেতাজী সুভাসচন্দ্রের উগ্র জাতীয়তাবাদের একটি ভালো দলিল হলো তাঁর The Indian Struggle নামক গ্রন্থ। এই গ্রন্থে সন্ত্রাসবাদের সমর্থন করা হয়েছে বলে স্যার স্যামুয়েল হোর কি অভিযোগ করেন নি? সে যাই হোক, এ কথা স্বীকার করতেই হবে স্বামী বিবেকানন্দই প্রকৃত প্রস্তাবে ১৯০৫ এবং বর্তমান বিপ্লবমুখী ভারতের স্রষ্টা— স্বামী বিবেকানন্দই বর্তমান জাতীয় বৈপ্লবিক আন্দোলনের জন্মদাতা। রোমাঁ রোলাঁ স্বামিজীর জীবনী লিখতে গিয়ে সেই কথা খুব স্পষ্ট করে বলেছেন। রোলাঁ লিখেছেন, "বিবেকানন্দের পর যারা এলো তারা দেখলো তাঁর মৃত্যুর তিন বৎসর পর বাংলায় এলো বিপ্লব। বাংলার এই বিপ্লব তিলক ও গান্ধীর বিরাট আন্দোলনের ভূমিকা। বাংলার বিপ্লব যে সম্ভব হলো, আজ যে ভারতবর্ষ সংঘবদ্ধভাবে জনসাধারণকে নিয়ে এক যোগে কাজ করতে পারছে তার মূলে রয়েছে স্বামিজীর মাদ্রাজের সেই বাণী 'ঘুমন্ত ভারতবর্ষ জাগো'।"

মানুষ

শ্রীগোষ্ঠবিহারী রাণা, কাব্যতীর্থ

মানুষের ব্যবহারে
যুগে যুগে বারে বারে
যদিও ফেলিতে মোরে হয় দীর্ঘ শ্বাস,
তবু মানুষের তরে
নেত্রে মোর অশ্রু ঝরে
তবু মানুষের পরে অনন্ত বিশ্বাস।
করধৃত করবাল
থাকে না তো চিরকাল,
কণ্ঠে মোর বাহু দুটি জড়ায় সে সুখে,
বক্ষ তা'র অবিরত
ফোঁসে না ফণীর মত
মিলাতে চায় সে বুক আমার এ বুকে।
রোষবহ্নিজ্বালা চোখে
দেখুক না তা'র লোকে,
আমি যে হেরেছি সেথা অশ্রুর নির্ঝর,
কণ্ঠে তা'র গরজন
শুনুক অপর জন,
আমি যে শুনেছি সেথা পিক কুহুস্বর।

রক্ত পিপাসার মাঝে
সে তো শুধু রণসাজে
দিক্ হ'তে দিগন্তরে করেনি প্রয়াণ,
মন্থন করিয়া হৃদি
সে দিয়াছে বহু নিধি,
করিয়াছে মরুভূমে অমৃত প্রদান।
কভু সে হয়েছে দাতা,
কভু সে হয়েছে ত্রাতা,
তার মাঝে জাগিয়াছে কত অবতার,
কভু দৈব দূত হয়ে
সহস্র লাঞ্ছনা সয়ে
নাশিয়াছে ধরণীর কি দুর্ব্বহ ভার!
ত্যজিয়া সুখের পন্থা
পরিয়াছে ছিন্ন কন্থা,
ধরিয়াছে তীব্র ক্লেশ আপনার কায়,
হেম হর্ম্ম্য বিসর্জ্জন
করিয়া গিয়াছে বন
দলিয়াছে কুশাঙ্কুর সুকোমল পায়।

মানুষের হৃদিমাঝে
মানুষি সতত রাজে
সে যে মহামহিমায় সদা মহীয়ান্,
মানুষের পদতলে
নত হয়ে আঁখি-জলে
হৃদয়ের অর্ঘ্য মোর সদা করি দান।

ইহুদীনির্য্যাতন

শ্রীতামসরঞ্জন রায়, এম-এস্‌সি, বি-টি

স্মরণাতীত কাল হইতে পৃথিবীর বহু স্থানে ইহুদীগণের উপর নির্ম্মম অত্যাচারের অভিযান চলিয়াছে। গত মহাযুদ্ধের সময়ে জার্ম্মানীতে ইহুদীগণ যেরূপ নির্য্যাতিত হইয়াছে জগতের ইতিহাসে উহার তুলনা নাই। সাধারণতঃ যে সকল কারণে ইহুদীসম্প্রদায় নির্য্যাতিত হইতেছে তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কারণগুলি প্রধান :

(১) খৃষ্টানধর্ম্মপ্রবর্ত্তক যীশুখৃষ্টকে ইহুদীগণ ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া হত্যা করিয়াছিল। খৃষ্টানগণ বলে, "Jesus Christ was killed by the Jews and the Jews were responsible for the greatest of all crimes in history."

(২) কুশীদজীবীর হীন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ইহুদীগণ অন্যান্য সম্প্রদায়ের নিকট হইতে অত্যন্ত উচ্চহারে সুদ আদায় করিয়া থাকে।

(৩) উহারা অত্যন্ত সাম্প্রদায়িক মনোভাব-সম্পন্ন এবং সহজ সরলভাবে অন্য দশজনের সহিত মিশিবার অযোগ্য।

নাজি-শাসিত জার্ম্মানী আবার এতদতিরিক্ত আরও কতকগুলি অভিযোগ ইহাদের বিরুদ্ধে আনয়ন করে, যথা :—

(৪) ইহুদীরা অনার্য্যজাতিসম্ভূত।

(৫) বিগত মহাযুদ্ধে জার্ম্মান-পরাজয়ের অন্যতম কারণ এই ইহুদী। উহারা প্রভূত ধনসম্পত্তির মালিক হইয়াও অর্থ দ্বারা কিংবা জনদ্বারা রাজশক্তিকে যথোচিত সহায়তা করে নাই, অথচ জার্ম্মানীর কল্যাণেই তাহাদের সম্পদ ও শক্তি। বরঞ্চ যুদ্ধের শেষ ভাগে ইংরাজ যখন ঘোষণা করিল যে প্যালেষ্টাইন ইহুদীগণের আবাস-ভূমিতে পরিবর্ত্তিত করিয়া দেওয়া হইবে, তখনই সমগ্র ইহুদীসম্প্রদায় ইংরাজের পক্ষাবলম্বন করিল।

এ সকল অভিযোগের উত্তরে ইহুদীগণ যাহা বলে তাহা হইল এই :

(১) যে সময় যীশু ক্রুশে বিদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া কথিত, সে সময় ইহুদীগণ রোমান শাসনের অধীন ছিল; সুতরাং মৃত্যুদণ্ড দিবার ক্ষমতাই তাহাদের ছিল না। যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ইহুদী কতকটা ক্ষমতার অধিকারী ছিল তাহারা সম্পূর্ণরূপে রোমক অভিজাত সম্প্রদায়ের সহিত নিজ-দিগকে মিশাইয়া দিয়া ইহুদীসমাজে প্রচলিত সকল নীতি-নিয়মের বিপরীতানুষ্ঠান করিত। ব্যক্তিগত স্বার্থই তাহাদের কাম্য ছিল। তাহাদের কোন কুকার্য্যের জন্য বিশাল ইহুদীসম্প্রদায় দায়ী নহে। পক্ষান্তরে যে ফেরিসিগণ আধুনিক ইহুদীধর্ম্মের যথার্থ প্রবর্ত্তক তাহাদের কেহ যীশুখৃষ্টের গ্রেপ্তার, বিচার কিংবা ক্রুশবিদ্ধকরণ—ইহার কোনটিতে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া কোন Gospelএর কোনস্থানেই উল্লেখ নাই।[১]

১ "It is not pointed out that at the time of the Passion of Jesus, the Jews were under Roman rule and could not pronounce a death sentence.......It is not pointed out that the historical gospels exclude from all partici-

(২) কুশীদজীবীর বৃত্তি প্রসঙ্গে ইহুদীগণ বলে যে, অবস্থাচক্রে পড়িয়াই ইহুদীগণ ঐ ব্যবসা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

(৩) সভ্যতার অতি প্রাচীন যুগ হইতে যে সম্প্রদায়কে সর্ব্বপ্রকারে কোণঠাসা করিয়া রাখা হইয়াছে, সামাজিক অর্থ নৈতিক বা নাগরিক কোন দিকের সুখ-সুবিধা যাহাদিগকে ভোগ করিতে দেওয়া হয় নাই—আজ তাহারাই সাম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পন্ন বলিয়া যদি অভিযুক্ত হয়, তবে অদৃষ্টকে ধিক্কার দেওয়া ভিন্ন তাহাদের আর গত্যন্তর থাকে না।

ইহুদী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ বলেন যে ইহুদীর পল্লীকে "Ghetto" নাম দিয়া অস্পৃশ্য পর্য্যায়ে সরাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা যাহারা করিয়াছে, ইহুদীকে পথে বাহির হইতে হইলে বিশেষ পরিচায়ক চিহ্ন ধারণ করিয়া বাহির হইতে হয়—এ নীতির যাহারা উদ্ভাবক, সর্ব্ববিষয়ে ইহুদীসম্প্রদায়কে ঘৃণায় দূরে ঠেলিয়া দিয়া যাহারা আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছে, আজ তাহাদেরই দ্বারা ইহুদীগণ "সাম্প্রদায়িকতার" অভিযোগে অভিযুক্ত!

(৪) ইহুদীগণ 'অনার্য্যজাতিসম্ভূত' এ অভিযোগ তাহারা অস্বীকার করে না। কিন্তু শুধু অনার্য্য বলিয়াই কোন সম্প্রদায় শতাব্দীর পর শতাব্দী পশুর অধম হইয়া অত্যাচার, উৎপীড়ন সহ্য করিবে—এ ব্যবস্থা কোন নীতি কিংবা যুক্তিসঙ্গত কিনা ঐতিহাসিকগণ তাহার বিচার করিবেন। কিন্তু যে আর্য্যশোণিতের উগ্র দম্ভে হিটলার ও তৎপদানুসারী মুসোলিনী Anti-Semitism আন্দোলনের নায়করূপে আত্মপ্রসাদ লাভ করিলেন সে আর্য্যশোণিত তাঁহাদের ধমনীতেই কি পরিমাণে প্রবহমাণ তাহাও বিচারের বিষয়।

(৫) নাজিকর্ত্তৃপক্ষের শেষ অভিযোগ ইহুদীগণ সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। তাহারা বলে যুদ্ধের সময় যে সকল ইহুদী জার্ম্মানীতে ছিল তাহারা যথাযথভাবে জনবল ও অর্থবল দ্বারা জার্ম্মানীকে সহায়তা করিয়াছে। বিগত মহাসমরে জার্ম্মানীর পক্ষে ১০০,০০০ ইহুদী অস্ত্রধারণ করিয়াছিল এবং তন্মধ্যে ১২০০০ রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করে। বহু ইহুদী সৈন্যাধ্যক্ষ বিশেষ সম্মানে ভূষিতও হইয়াছিলেন। কিন্তু সে কথার উল্লেখ করিবে কে? প্যালেষ্টাইন-সম্পর্কে ইহুদীগণের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উত্থাপন করা হয় তাহা তাহারা অত্যন্ত অন্যায় বলিয়া মনে করে। বহু প্রাচীনকাল হইতেই প্যালেষ্টাইন ইহুদীগণের আবাসভূমি ছিল। কালক্রমে নানা অবস্থার চাপে পড়িয়া ঐ দেশের অধিকার হইতে তাহারা বঞ্চিত হইয়াছে। ইউরোপীয় রাজশক্তিসমূহের 'Divide and Rule' নীতির ফলে আজ নিজ বাসভূমে সে প্রবাসী। সুতরাং আজ পৃথিবীর সকল দেশ হইতে নির্ম্মমভাবে বিতাড়িত হইয়া ইহুদীগণ যদি তাহাদের সনাতন কালের জন্মভূমিতে বাস করিবার অধিকার ফিরিয়া চাহে তবে তাহা অন্যায় বলিয়া কেন বিবেচিত হইবে তাহা বুঝা কঠিন। এতদ্ভিন্ন জার্ম্মানীতে যে সকল ইহুদী বসবাস করিতেছিল, তাহারা যেমন যুদ্ধকালে জার্ম্মানীর পক্ষে সংগ্রাম করিয়াছিল, ইংলণ্ড ও ফরাসী দেশবাসী ইহুদীগণও তেমনি ঐ সকল দেশের পক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। ইহাতে অস্বাভাবিক কিছুই ছিল না। যুদ্ধের প্রায় শেষভাগে যখন উভয় পক্ষ রণক্লান্তিতে নিতান্ত অবসন্ন, কে কখন ভাঙ্গিয়া পড়িবে তাহার স্থিরতা ছিল না ঠিক সেই সময়ে ইংরাজ পক্ষে এক দারুণ

pation in the arrest, trial, and crucifixion the religious leaders of the people, the creators of modern Judaism—the Pharisees. It is not pointed out that, in any event, only a minute portion of Jewish People, a long time ago, can have been involved"—L. Golding.

সমস্যার উদ্ভব হইয়াছিল। এসিটোন (Acetone) নামক বৈজ্ঞানিক পদার্থ—যাহা কোরোডাইট-(Corodite) নির্ম্মাণের প্রধান উপকরণ—ইংরাজ পক্ষে সেই এসিটোনের অভাব ঘটিল। নিতান্ত নিরুপায় ভাবে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর নিকট সেদিন ব্যাকুল আবেদন জানান এবং যিনি তিনদিন সময় মধ্যে অক্লান্ত পরিশ্রমে—এসিটোনের নূতন প্রস্তুতিপ্রণালী উদ্ভাবন করিয়া ইংরাজশক্তিকে মহাসঙ্কট হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন তিনি প্রসিদ্ধ ইহুদী-বৈজ্ঞানিক Zionism আন্দোলনের অন্যতম নেতা Dr Wiezmann. যখন যুদ্ধ শেষ হইল ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট তখন এই মনীষী বৈজ্ঞানিককে পুরস্কৃত করিতে চাহিয়াছিলেন। সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ স্বয়ং তাঁহাকে সে পুরস্কার প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিলে Wiezmann বলিয়াছিলেন, "Nothing Your Majesty for my sake—but a home for my community."

তাঁহার ঐ প্রার্থনার ফলে কতকটা এবং যুদ্ধকালীন প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য কতকটা—ইংরাজগণ প্যালেষ্টাইনকে ইহুদীর বাসভূমিতে পরিণত করিতে অগ্রসর হয়। সুতরাং ইহার সহিত জার্ম্মানীর প্রতি ইহুদীর বিশ্বাসঘাতকতার কোন সংযোগ আছে বলিয়া মনে করিবার হেতু নাই।

ঐতিহাসিক তত্ত্বের দিক দিয়া বিচার করিলে এই কথাই সুস্পষ্ট প্রতীত হয় যে পৃথিবীর কোন জাতি বা কোন সম্প্রদায় দোষলেশহীন হইয়া তাহাদের জাতীয় বা সাম্প্রদায়িক জীবন যাপন করিতে সক্ষম হয় নাই। ব্যষ্টি-মানব যেমন দোষ-গুণে সৃষ্ট হইয়া থাকে সমষ্টি-সম্প্রদায় কিংবা জাতিও তদ্রূপ দোষগুণে পৃথিবীতে বিরাজ করে। কিন্তু কোন একটা বিশেষ সম্প্রদায় কেবল দোষেরই আকর, ৩০০০ বৎসরের অমানুষিক অত্যাচারেও তাহার পাপের নিরসন হয় না, একথা যেমন অবিশ্বাস্য তেমনি নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক।

পৃথিবীর প্রগতির ইতিহাসে ইহুদীসম্প্রদায়ের যে দান, কোন অনুরূপ সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের দান তাহার সহিত তুলনীয় নহে। যে সকল দেশ বিনা কারণে পশুচিত বর্ব্বরতায় এই সম্প্রদায়কে যুগে যুগে নির্য্যাতিত ও লাঞ্ছিত করিয়াছে সেই সকল দেশেরই সাহিত্য, বিজ্ঞান, অর্থনীতি প্রভৃতি জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্র ইহুদীর প্রভূত দানে সমৃদ্ধ হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে,—যেসকল সাহিত্যিকের সাধনায় জার্ম্মান-সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়াছে তাঁহাদের অনেকেই ইহুদী। Heine, Wassermann, Zweig, Fenchtwanger, Schnitzler, Ludwig, Toller—প্রভৃতি সকলেই ইহুদী। জার্ম্মান নাট্যসাহিত্যে এবং সঙ্গীতজগতেও ইহুদীর দান অপরিমেয়। Pirero, Sutro, Berstein, Schnitzler প্রভৃতি নাট্যকার, Brahm, Jessener, Reinhardt প্রভৃতি সঙ্গীত-স্রষ্টা জাতিতে ইহুদী। আবার শিল্প ও কলা জগতেও Liebermann, Botticelli, Jacob Epstein প্রভৃতি ইহুদীর দান উপেক্ষণীয় নহে। চিকিৎসা-শাস্ত্রে ইহুদী বৈজ্ঞানিকের দান সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। Digitalis, Salvarsan, Cocain, Insulin, Pyramidon, Antipyrin, Chloral hydrate প্রভৃতি বহু মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় ঔষধের আবিষ্কারক এবং তাহাদের বৈজ্ঞানিক ব্যবহার ইহুদীকর্ত্তৃকই সাধিত হইয়াছে। যে Microphone, Amplifier, Radio, Telephone প্রভৃতির সহায়তায় আজ স্থানের ব্যবধান লুপ্ত হইয়াছে, উহাদের আবিষ্কার ও উন্নতির অধিকাংশও ইহুদীরই সৃষ্টি। Sewing machine, Photography এবং ছায়াচিত্রের আধুনিক চমকপ্রদ উন্নতিসমূহের অধিকাংশও ইহুদীর সৃষ্টি।

প্রতি ঘরে ঘরে আজ যে safety-match ব্যবহৃত হয়, চাবিহীন যে ঘড়ি অধুনা ইউরোপে বহুলোক ব্যবহার করিয়া থাকেন তাহাও ইহুদীর আবিষ্কারেরই ফল। এইরূপ আরও কত শত চমকপ্রদ ইহুদী আবিষ্কারের কথা যে উল্লেখ করা যাইতে পারে তাহার সীমা-সংখ্যা নাই। ফলকথা, যে সম্প্রদায় Bergson, Spinoza ও Freud এর ন্যায় দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিকের জন্মদান করিয়াছে, Disraeli, Trotski, Reading প্রভৃতির ন্যায় রাজনৈতিকের উদ্ভব যে সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে সম্ভব হইয়াছে; Wiezmann, Hetz, Einstein, Ehrlich প্রভৃতির ন্যায় বৈজ্ঞানিক যে সম্প্রদায়ে জন্মিয়াছেন —কোন সভ্যদেশ বা সভ্যসমাজ সেই সম্প্রদায়কে সম্মান না করিয়া থাকিতে পারে না। অন্য কোন কারণে না হউক, শুধু সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভাণ্ডারে এই বিশেষ সম্প্রদায়ের যে প্রভূত দান তাহার জন্যও অন্ততঃ ইহাদিগকে সহানুভূতি ও মর্য্যাদার সহিত স্থান দেওয়া প্রত্যেক সভ্যজাতির কর্ত্তব্য। কিন্তু হায়, জগতের দুর্ভাগ্য এবং ইহুদীর অদৃষ্টবৈগুণ্যবশতঃ আজ বিশেষ শক্তি এবং প্রতিভাসম্পন্ন এই সম্প্রদায় দেশ হইতে দেশান্তরে পশুর ন্যায় বিতাড়িত হইতেছে! বিশাল এই পৃথিবীর বুকে নিজের বলিয়া দাবী করিবার এক টুকরা ভূমি তাহার নাই, মাথা গুঁজিয়া নিশ্চিন্তে বাস করিবার মত একটু কুঁড়েঘরেরও সে অধিকারী নহে! বিগত যুদ্ধের শেষাংশে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট 'Balfour Declaration' রূপে যে ঘোষণা করিয়াছিলেন, যাহাতে যুদ্ধান্তে প্যালেষ্টাইনকে ইহুদীগণের বাসভূমিরূপে নির্দ্দিষ্ট করিবার আভাস দেওয়া হইয়াছিল সে ঘোষণাও নানা কারণে যথাযথরূপে আজ পর্য্যন্ত কার্য্যে পরিণত হয় নাই। আরব ও ইহুদীর সংঘর্ষের ফলে প্যালেষ্টাইনকে ইহুদীর জাতীয় বাসভূমিতে পরিণত করিবার পথে বিষম অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে। সে প্রসঙ্গ নিম্নে আলোচনা করিতেছি।

*　*　*

অতি প্রাচীনকাল হইতে যেদিন এব্রাহাম ইউফ্রেটিস নদী অতিক্রম করিয়াছিলেন, সেইদিন হইতে জেরুসালেমের সহিত ইহুদী জাতির ইতিহাস জড়িত হইয়াছে। টাইটাস্ যখন ইহুদীদিগকে প্যালেষ্টাইন হইতে বিতাড়িত করিল— যখন হইতে বিভিন্ন মহাদেশের স্থানে স্থানে আশ্রয়াম্বেষণে ইতস্ততঃ লক্ষ্যহীনভাবে ইহারা ঘুরিতেছিল, তখন হইতে পুনঃ পুনঃ প্যালেষ্টাইনের কথা তাহারা চিন্তা করিয়াছে। সেই ক্ষুদ্র উষর জনপদটিকে জন্মগতভাবে তাহাদের নিজস্ব মনে করিয়া সেইস্থানে স্থায়ী ভাবে বসবাস করিবার আশা তাহারা অন্তরে পোষণ করিয়াছে। কালক্রমে ইউরোপের বিভিন্নদেশে ইহুদীনির্য্যাতন যখন সঙ্ঘবদ্ধভাবে রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় দিন দিন নিষ্ঠুর হইতে নিষ্ঠুরতর হইয়াছে তখন ইহুদীদের সেই চিরন্তন আকাঙ্ক্ষাও নূতন করিয়া যেন জাগ্রত হইয়া Zionism আন্দোলনে রূপ নিয়াছে। বিগত শতাব্দীর শেষভাগে ভিয়েনার একজন প্রথিতকীর্ত্তি ইহুদী সাংবাদিক Theodore Herzl এবং প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক Dr. Wiezmann তাঁহাদের সমগ্র শক্তি এই আন্দোলনের পশ্চাতে নিয়োগ করিয়া উহাকে ব্যাপক রূপ দিয়া বিভিন্ন সভ্যদেশের রাজশক্তির দৃষ্টি এইদিকে আকর্ষণ করিয়াছেন। ন্যায়ানুমোদিতভাবে প্যালেষ্টাইনকে ইহুদীসম্প্রদায়ের নিজস্ব বাসভূমিতে পরিণত করাই Zionism এর মূল কথা। "To establish for the Jewish people a home in Palestine guaranteed by public law"—ইহাই Zionism সম্বন্ধে সরকারী উক্তি। কিন্তু বিগত মহাসমরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এ আন্দোলন

তেমন শক্তিশালী ছিল না। ১৯১৪ সনে সমগ্র ইউরোপ পরিব্যাপ্ত করিয়া বিষম সমরাগ্নি যখন প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল তখন হইতে যুদ্ধের ক্রমবিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে Zionism আন্দোলনও বিশেষভাবে বর্দ্ধিত এবং পুষ্ট হইয়াছে। তারপর ১৯১৭ সনে মিত্রপক্ষ ও জার্ম্মানীর মধ্যে যুদ্ধের অবস্থা যখন অত্যন্ত জটিল ও সঙ্কটপূর্ণ হইয়া উঠিল সেই সময় ইংরাজ-সরকারের পক্ষ হইতে ইহুদীগণের উদ্দেশ্যে Balfour Declaration ঘোষিত হইল। এ কথা ইতিপূর্ব্বেও আমরা উল্লেখ করিয়াছি।[২] অবশ্য এ ঘোষণার মূলে কতকগুলি রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক কারণ নিহিত ছিল। প্রথমতঃ, ইহুদীগণের—বিশেষ করিয়া আমেরিকার ধনী ইহুদীগণের—আর্থিক সাহায্য লাভ করা মিত্রপক্ষের তখন বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। দ্বিতীয়তঃ, যদিও প্যালেষ্টাইন আয়তনে বৃহৎ নহে কিন্তু ইহার ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য বৃটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে এইস্থানের অধিকার অবশ্য বাঞ্ছনীয় ছিল। এই ক্ষুদ্র প্রদেশে তিনটি মহাদেশ মিলিত হইয়াছে। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম সর্ব্বদিকে প্রসারিত ব্যোমপথের মিলনস্থান এই প্যালেষ্টাইন। ইহারই অন্তর্গত হাইফাতে পূর্ব্ব ভূমধ্যসাগরীয় বিখ্যাত নৌবন্দর অবস্থিত এবং এই স্থানেই ইরাকের তৈল নলবাহিত হইয়া চলিয়া আসিয়াছে। সর্ব্বোপরি সুয়েজখালের কর্তৃত্ব রক্ষার পক্ষে এইস্থান কেন্দ্র-স্বরূপ। সে যাহা হউক, ইউরোপের বিগত মহাসমর যথাকালে শেষ হইল এবং যুদ্ধের শেষে সন্ধিবৈঠকে মিত্রপক্ষের অনুমোদনে Balfour Declaration কার্য্যকরী করিবার ভার ইংরাজরাজ গ্রহণ করিলেন। ইহুদীগণ মনে করিল যে তাহাদের বহুদিনের সুখস্বপ্ন এইবার বাস্তবে রূপ নিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে নানা দেশ হইতে বহু ইহুদী প্যালেষ্টাইনে গিয়া উপস্থিত হইল। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে যখন জার্ম্মানীতে ইহুদী-নির্য্যাতন নূতন করিয়া সুরু হইল প্যালেষ্টাইনের আকর্ষণ তখন আরও বাড়িয়া গেল এবং পাঁচ বৎসর কাল মধ্যে এক জার্ম্মানী হইতেই প্রায় ৪৫০০০ ইহুদী তথায় গিয়া উপস্থিত হইল। তাছাড়া পোলাণ্ড, রুমানিয়া, লিথুয়ানিয়া প্রভৃতি স্থান হইতেও যথেষ্ট ইহুদী প্যালেষ্টাইনে গিয়া পৌছিল। ধীরে ধীরে এই সকল বিদেশ হইতে আগত ইহুদীগণের প্রচেষ্টায় প্যালেষ্টাইনের অপূর্ব্ব উন্নতি সাধিত হইতে লাগিল। যে প্যালেষ্টাইন একদা শস্য-সম্পদে অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত ছিল এবং যে প্যালেষ্টাইন বহু শতাব্দীর উপেক্ষায় একেবারে উষর মরুভূমিতে পরিণত হইয়া গিয়াছিল—ইহুদীগণ পুনর্ব্বার তাহাদের তীক্ষ্ণবুদ্ধি, কঠোর পরিশ্রম এবং আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীর সাহায্যে সেই দেশটিকে ভূস্বর্গে পরিণত করিয়া তুলিল। মরুভূমির বুকে শ্যামল শস্যক্ষেত্র অপূর্ব্ব কোমলতায় জাগিয়া উঠিল, বালিয়াড়ির বুক চিরিয়া প্রশস্ত রাজপথ নির্ম্মিত হইল। বৈদ্যুতিক আলোক, ইষ্টকনির্ম্মিত কোঠাবাড়ী, মাঝে মাঝে সুদৃশ্য বুলভার—এক কথায় আধুনিক নগরসজ্জার যাহা কিছু উপকরণ সব কিছুতে প্যালেষ্টাইন সজ্জিত হইল। হিব্রুভাষা বর্ত্তমান যুগোপযোগী রূপে পুনঃ প্রচলিত হইল এবং বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থাদি এ ভাষায় লিখিত হইতে লাগিল। স্কুল,

[২] "His Majesty's Government view with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish People, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country."

কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল এবং নাগরিক জীবন যাপনের জন্য যতপ্রকার ব্যবসায় ও শিল্পকার্য্যাদি অবলম্বন করা প্রয়োজন তাহার সবগুলি গ্রহণ করিয়া ইহুদীগণ এক স্বাবলম্বী জাতিরূপে স্বপ্রতিষ্ঠ হইতে সুরু করিল। প্রতি গজ জমি প্রচলিত বাজারদর হইতে অনেক বেশী মূল্যে ক্রয় করিয়া কঠোর পরিশ্রমে তাহাতে উহারা সোনা ফলাইল। ফলকথা, বহুযুগ পরে পুনর্ব্বার প্যালেষ্টাইন সুখ-সমৃদ্ধিতে গড়িয়া উঠিল। কিন্তু এই দ্রুত উন্নতির প্রতিক্রিয়া সুরু হইতেও খুব বেশী বিলম্ব ঘটিল না। যে আরবগণ প্রথমতঃ ইহুদীদিগকে অনেকটা সহানুভূতির সহিত গ্রহণ করিয়াছিল ক্রমে তাহারাই যেন ইহাদের উপর বিরূপ হইতে সুরু করিল। একদিকে জার্ম্মান-কর্তৃপক্ষের ইহুদী-বিদ্বেষ প্রচার, অন্যদিকে ইহুদীর দ্রুত ঐশ্বর্য্য লাভ এই উভয় কারণ এক হইয়া আরবের মনে ক্রমশঃ ইহুদীর প্রতি ঈর্ষা জাগাইয়া তুলিল। আরবগণ প্রত্যক্ষ দেখিতে লাগিল যে, দূর বিদেশ হইতে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় আসিয়া ও অতি অল্পকাল মধ্যেই ইহুদীরা অপূর্ব্ব কর্ম্মকুশলতায় শুধু যে নিজেদের অবস্থারই আশাতীত উন্নতি করিল তাহা নহে, পরন্তু সঙ্গে সঙ্গে এক একটি ইহুদী পল্লী ও নগর আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে গঠিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিতে লাগিল। অথচ আরবগণ যে দুঃস্থ জীর্ণ অবস্থার মধ্যে এতকাল পড়িয়াছিল তাহা হইতে তিলমাত্র উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিল না। ইহুদীর কৃষি, বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি সমস্ত কিছুই যখন অভিনব সাফল্য অর্জ্জন করিতে লাগিল; আরবগণ তখনও যে তিমিরে সেই তিমিরেই পড়িয়া রহিল। ফলে, কিছু কাল মধ্যে ইহুদীগণ যাহাতে আর প্যালেষ্টাইনে আসিয়া বসবাস করিবার অবাধ অধিকার না পায়, তজ্জন্য আরবগণ আন্দোলন সুরু করিল এবং সেই আন্দোলন ক্রমশঃ অত্যন্ত তীব্র হইয়া ইহুদী এবং আরবগণের মধ্যে দারুণ দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি করিল। এইরূপে যে ইহুদীসমস্যার সমাধান প্যালেষ্টাইনে একরূপ হাতের মধ্যে আসিয়াছিল অবস্থাবৈগুণ্যে তাহাই আবার যেন দূরে সরিয়া গেল।

বৃটিশ রাজশক্তির পক্ষ হইতে Malcolm Macdonald কিছুকাল পূর্ব্বে যে ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহা আরব এবং ইহুদী উভয়েই সমভাবে অগ্রাহ্য করিয়াছে। প্যালেষ্টাইনে আজ পর্য্যন্তও খুব বেশীসংখ্যক ইহুদী যাইতে পারে নাই। ১৯৩৬ সন পর্য্যন্ত বিবরণী Gunther তাঁহার Inside Asia গ্রন্থে কত ইহুদী প্যালেষ্টাইনে গিয়াছিল তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।[৩]

পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশ হইতে, বিশেষ করিয়া মধ্য-ইউরোপীয় দেশসমূহ হইতে বহু ইহুদী প্যালেষ্টাইনে যাইতে ইচ্ছুক। কিন্তু ১৯৩৭ সালের Royal Commission এর ব্যবস্থানুসারে প্যালেষ্টাইনের যে অংশটুকু 'ইহুদী-ষ্টেট্'-রূপে ঘোষিত হইয়াছে, উপনিবেশস্থাপনেচ্ছুদের সংখ্যার অনুপাতে তাহা নিতান্তই অপরিসর। তাই প্যালেষ্টাইনের চতুষ্পার্শ্বস্থ কতক কতক স্থানে বসতি স্থাপন করিবার অধিকার আজ ইহুদীগণ প্রার্থনা করিতেছে।

৩ ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ৫৫১৪ জন ইহুদী প্যালেষ্টাইনে গমন করে, ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ৩৩,৮০১ জন, ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে এই নবাগতের সংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া ৩০,০০০এ দাঁড়ায় কিন্তু ১৯৩৪ ও ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ঐ সংখ্যা আবার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ৬১,৮৫৪ জন হয়। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে প্যালেষ্টাইনে মোট লোকসংখ্যা ৭,৫০,০০০ ছিল—তন্মধ্যে ৫,৮৯,১৭৭ জন মুসলমান, ৭১,৪৬৪ জন খৃষ্টান এবং ৮৩,৭৯০ জন ইহুদী। অর্থাৎ ঐ সময়ে ইহুদীসংখ্যা মোট শতকরা ১১ জন মাত্র ছিল। কিন্তু ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে প্যালেষ্টাইনের লোকসংখ্যা —১৩,৩৬, ৫১৮ জন ছিল, তন্মধ্যে ৮,৪৮, ৩৪২ মুসলমান, ১,০৮,৪৭৪ জন খৃষ্টান ও ৩,৭০,৪৮৩ জন ইহুদী। ঐ সময়ে ইহুদীসংখ্যা শতকরা ২৮ হইয়াছিল।

জেরুসালেমের দক্ষিণ হইতে বিয়ার সেবা (Beer Sheba)-কেও অতিক্রম করিয়া যে বিস্তৃত ভূখণ্ড নেজেব (Negeb) নামে খ্যাত—তাহা অধুনা নিতান্ত উপেক্ষিতভাবে শুধু কয়েক সহস্র যাযাবর বেদুইনের ইতস্ততঃ ভ্রমণের ক্ষেত্ররূপেই পড়িয়া আছে। সেই ভূখণ্ড যদি ইহুদীগণ পায়, তবে তাহারা বৈজ্ঞানিক উপায়ে উহাকে শীঘ্রই নিতান্ত সম্পদশালী ভূখণ্ডে পরিণত করিতে পারে। তাহাছাড়া জর্ডন নদীর তীরেও বহু ইহুদী বাসস্থাপন করিতে পারে। এই ভূখণ্ডগুলি পাইলে পৃথিবীর অধিকাংশ আশ্রয়হীন ইহুদীর মাথা গুঁজিবার একটা স্থান হয়।[৪] কিন্তু আরবগণ এসকল প্রস্তাবের কোনটাতেই বর্ত্তমানে রাজী নহে। তাহাদের মনে ক্রমশঃই এ আশঙ্কা বদ্ধমূল হইতেছে যে, ইহুদীসম্প্রদায় বহির্দ্দেশ হইতে আসিয়া ক্রমশঃ তাহাদের নিজেদের দেশের জমি দখল করিয়া বসিতেছে এবং যদি এ প্রথা এখানেই রুদ্ধ করা না যায়, তবে উত্তরকালে উহা প্রবল আকার ধারণ করিতে পারে। তাই ইহুদীর নূতন উপনিবেশ স্থাপন প্রচেষ্টায় সর্ব্বপ্রকার বাধাপ্রদান করিতে তাহারা বদ্ধপরিকর। ফলে, সেখানকার অবস্থা এখন অত্যন্ত জটিল হইয়া পড়িয়াছে। ভবিষ্যতে এ সমস্যার সমাধান কিরূপে সাধিত হইবে তাহা বলা সুকঠিন। আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি আজ যে গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে, তাহার অনিশ্চিত ভাবী পরিণতির উপর সমগ্র জগতের ভাগ্য নির্ভর করিতেছে। সুতরাং যতদিন না পাশ্চাত্য রাজনীতি-রঙ্গমঞ্চের অভিনয় সমাপ্ত হয়, ততদিন পর্য্যন্ত ইহুদী-সমস্যার কোন স্থায়ী মীমাংসা হইবে বলিয়া মনে হয় না। প্রায় ৪।৫ বৎসর কাল পূর্ব্বে ইহুদীদিগকে ভারতবর্ষে আশ্রয় দিবার একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল। আমেরিকাপ্রবাসী ডাঃ সুধীন্দ্রমোহন বসু এবং ডাঃ তারকনাথ দাস এ প্রস্তাবের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারত-গভর্ণমেন্ট কিংবা জাতীয় কংগ্রেস এ প্রসঙ্গে কোন উচ্চবাচ্য না করায় উহা অন্ততঃ বর্ত্তমান সময়ের মত চাপা পড়িয়াছে।

৪ ইহুদীগণের প্রতিনিধিরূপে প্রসিদ্ধ ইহুদী লেখক Louise Golding এ প্রসঙ্গে যে করুণ আবেদন তাঁহার "Jewish Problem' গ্রন্থের শেষাংশে আরবগণের উদ্দেশ্যে করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি বলিতেছেন যে, অধুনা পতিত নেজেবও জর্ডন-তীরবর্ত্তী অঞ্চলে যদি ইহুদীদিগকে বসবাস করিতে দেওয়া হয় তবে—

"No one would be the loser. The British would gain a colony of devoted foster-sons, guarding the most vital link in Imperial communication. The Arabs would profit from the influx of capital, the utilisation of new methods, the introduction without cost to themselves of the material advances for which their neighbours may have to wait for generations. Could I do so through the medium of this little book, I would appeal to them. I would say, "Kinsmen, you have much, your territory covers many thousands of square miles. We, the Jews, have none. Will you not admit us into one corner of your vast estate ? We wish for nothing for which we are not willing to pay, at market price and far above. In the re-establishment of our brotherhood, there will be profit, not for you only, not for us only, but for the whole world. Was it not the Arabs and the Jews, in the earlier Dark ages —when Europe was distracted by the wars of creed as she is to-day by the rivalries of commerce and the nightmare lies of race—was it not the Arabs and Jews who held the torch high on the northern littoral of Africa and illumined the darkness of the plateau of Spain ? Let us once more kindle a torch, you and we. The world is darker now than then !"

আরবে অমুসলমান

অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী

সাধারণতঃ ভারতবাসীর বিশ্বাস এই যে আরব মাত্রেই মুসলমান; এ ধারণা সত্য নয়। আরবে সাতটী সম্প্রদায় আছে যারা ন্যূনাধিক অমুসলমান। মোঘল মাত্রেই মুসলমান, কিন্তু চেঙ্গিস খান ছিলেন অ-মুসলমান। আজও বহু তুর্ক-মোঘল রয়েছে যারা রাশিয়াতে ক্যাক, জর্জিয়াতে খৃষ্টান, চীনে বৌদ্ধ, তুরস্কে মুসলমান। চেঙ্গিসের বংশধর হুলাকু খান, মংগু খান প্রভৃতি বিশ্বজয়ী বীর সম্পূর্ণভাবে অমুসলমান ছিলেন। মহম্মদের পূর্ব্বে আরবে খৃষ্টান ইয়ুদী এবং মূর্ত্তিপূজক ছিল। তাদের মধ্যে অনেকে ইসলাম গ্রহণ করেছে, কেউ বা আরবের প্রান্তদেশে চলে গেছে—যথা ইরাক, সিরিয়া পালেষ্টাইন, মিশর প্রভৃতি দেশে। তার পর একটা যুগ এল যখন থেকে ট্রান্স জরডন, পালেষ্টাইন, মিশর মরুভূমি সম্পূর্ণভাবে আরব সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। কিন্তু সেখানকার অমুসলমানগণ জিজিয়াকর দানে প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেই দেশেই রয়ে গেছে। তারা খৃষ্টান ইয়ুদী এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্মগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এবং অনেকে আবার মুসলমানধর্ম্ম আনুষ্ঠানিক ভাবে গ্রহণ করলেও অন্তরে ইসলামবিরোধী। এই প্রবন্ধে এই শ্রেণীর সম্বন্ধে আলোচনা করব।

আমার আলোচনায় আরবদেশের মধ্যে আমি পূর্ব্বে ইরাকের অপর প্রান্ত, উত্তরে তুর্কীস্থান, দক্ষিণে ভারতমহাসাগর, পশ্চিমে ভূমধ্য-সাগর এবং সিনাই মরুভমির অংশবিশেষকে আরব দেশ বলেই গণ্য করেছি। অর্থাৎ ইরাক, সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন, আদেন, সিনাই প্রদেশকে আরব বলে গণ্য করা যায়। সিরিয়া প্রদেশে দামোস্কাসে আরব জাতির বাস। মিশর খিলাফতের রাজধানী ছিল, পালেষ্টাইনের জেরু-জেলামে মহম্মদ স্বয়ং স্বর্গগমনের পথে বিশ্রাম করেছিলেন। বাগদাদ ইরাকের রাজধানী, বহুকাল আরববাসীর বংশ এইখানে রাজত্ব করেছে। আরব দেশে ইসলামের কেন্দ্র মহম্মদের জীবনলীলার অবসানে মাত্র ৩০ বৎসর মদিনায় অবস্থিত ছিল। ৬৬২ খৃঃ থেকে ৭৪৮ খৃঃ পর্য্যন্ত সিরিয়া দামোস্কাসে, ৭৪৮ খৃঃ থেকে ১২০৪ খৃঃ পর্য্যন্ত ইরাক বাগদাদে, এবং তুর্কযুগে ১২৪৮ খৃঃ থেকে ১৯১৭ খৃঃ পর্য্যন্ত কনষ্টান্টিনোপলে ইসলামের কেন্দ্র ছিল। সুতরাং আরব-সভ্যতা কথাটি অত্যন্ত ব্যাপক। আরব-সভ্যতা ইসলাম-সভ্যতা আরবের বাইরে কেন্দ্রগুলির চারপাশে গড়ে উঠেছিল। দামোস্কাসে বহু আরব রাজ-কার্য্যের সুবিধার জন্য বাস স্থাপন করেছিল, পরবর্ত্তী যুগে বাগদাদে বহু আরব চলে গিয়েছিল। এই সকল স্থানে বহু অমুসলমানের বাস ছিল এবং এখনো রয়েছে। আবার অনেক প্রাচীন ধর্ম্মাবলম্বিগণ মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করা সত্ত্বেও পুরাতন ভাব ও চিন্তাধারা সম্পূর্ণ বর্জ্জন করতে পারেনি।

বর্ত্তমানে League of Nations এর সীমা-নির্দ্দেশ অনুসারে আরব দেশের অভ্যন্তরে ইরাক, লেবানন, সিরিয়া, পালেষ্টাইন, এদেন, সিনাই, মরুপ্রান্তর নেই। ইরাকে রাজতন্ত্র, সিরিয়া লেবাননে প্রজাতন্ত্র, পালেষ্টাইনে বৃটিশ mandate, এদেন British colony, সিনাই মিশরের

অন্তর্ভুক্ত, এবং আরবের মধ্যেও ইয়ানন, আসীর, ওমান, হাদ্রামোত পৃথক। হেজাজ অধিপতি ইবন সাউদ মক্কা-মদিনার অধীশ্বর এবং রিয়াদ্ বাজারে তার রাজধানী।

বর্ত্তমান আরবের লোকসংখ্যা

আরব	৭০,০০,০০০
ইয়ামেন ও আসীর	৩০,০০,০০০
হেজাজ	১০,০০,০০০
ওমান, হাদ্রামোত	১০,০০,০০০
নেজয়া, হাসা, বেদুইন	২০,০০,০০০
	১,৪০,০০,০০০

আরব জাতিদের মধ্যে নিম্নলিখিত বিভিন্ন বংশ রয়েছে :—

(১) কাহাতান—সেনএর বংশ।

(২) মুলতার আরবী—ইসমাইল বংশ।

(৩) আফ্রিকার যাযাবর।

আরও কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভ্রমণশীল গোষ্ঠী বিভিন্ন যুগে আরবে এসে বাস করেছে এবং মরুবাসী বেদুইনদের সঙ্গে মিশে গেছে। যথা—বনী খাদীর, নিগ্রোজাতীয়, এবং সুলুবা। সুলুবা জাতি নিজেদের খৃষ্টান বলে দাবী করে। আরবগণ সুলুবা গোষ্ঠীকে নীচ জাতি বলে ঘৃণা করে। সুলুবাগণ আরবের পূর্ব্বপ্রান্তে বাস করে এবং নানাবিধ কুটীরশিল্পদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। শিকার তাদের অন্যতম উপ-জীবিকা। তারা এখনও জিজিয়ার মতন একটী বিশেষ কর রাষ্ট্রবাসের মূল্যস্বরূপ দান করে।

আরবের পশ্চিমপ্রান্তে মদিনা (প্রাক্-মুসলিম যুগের ইয়াস্তেব) প্রদেশের অধিবাসী সানা নিবাসী ইহুদীগণ ক্রমশঃ ইয়ামনের দিকে সরে গেছে। নজরান প্রান্তে এখনও একটী ক্ষুদ্র ইহুদী উপনিবেশ রয়েছে। তারা রৌপ্য-শিল্পীরূপে বিশেষ প্রসিদ্ধ।

আরবের সমুদ্র তীরবর্ত্তী বন্দরগুলিতে নানা জাতীয় নানা দেশীয় লোক উপনিবেশ স্থাপন করেছে। মক্কা ও মদিনা শহরে কোন অমুসলমান বাস করতে পারে না। বন্দরগুলিতে পারস্য তেলুঙ্গী, স্কট, ভারতীয় লোক বহু রয়েছে।

বর্ত্তমান যুগের আরবগণ বহুভাবে অন্যান্য অনারব জাতির সঙ্গে মিশে গেছে—বিশেষ করে তুর্ক, পারসী জাতির সঙ্গে। তুর্ক ও পার্শী কেহই সেমিটিক নয়। অবশ্য বেদুইন রক্ত কোথাও নিগ্রো, সোমালী ও আফ্রিকার যাযাবর জাতির সঙ্গে মিশেছে। আধুনিক সম্ভ্রান্ত আরবদের মধ্যে ইবন্ সাউদের আনাজা গোষ্ঠী মহম্মদের বংশধর বলে দাবী করেন। আল্ হুসেন ১৯১৬ সালে বিদ্রোহ করে তুর্কী আধিপত্য নষ্ট করেন। ১৫১৭-১৯১৭ সাল পর্য্যন্ত তুরস্কের অধীনে থেকে বহুভাবে আরব সভ্যতা ও রক্ত মিশ্রিত রয়েছে। ইয়ামেনের ইমামও মহম্মদের বংশগৌরব দাবী করেন। হাদ্রামোত এখনও সৈয়দ বংশীয় ধর্ম্ম-যাজক দ্বারা পরিচালিত হয়। ওমান প্রদেশের ইমাম কোন ধর্ম্মের ও বংশের গৌরবে শ্রেষ্ঠত্ব দাবী না করলেও হাদ্রামোত এবং ইয়ামেনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। আসীর প্রদেশে ইদ্রিসী বংশ শমেন শাসন-কর্ত্তা, সেখানে ওহাবী প্রাধান্য চলেছে। এ ছাড়াও আরবের মরুভূমির চারি পাশে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য রয়েছে এবং তারা প্রাচীন বেদুইন সমাজ-ব্যবস্থার ভিত্তিতে শাসিত হচ্ছে। প্রতিশোধ ও স্বাধীনতাই তাদের জীবনের মন্ত্র।

বেদুইন জাতির ধর্ম্মমত ইসলাম, ইসলাম গ্রহণ করা সত্ত্বেও তাদের আচার-ব্যবহার প্রাক্-মুসলিম সংস্কারে পূর্ণ। শিক্ষা, দীক্ষা, সভ্যতার কোন সম্পর্কই নেই। ধর্ম্মের বিলাসই তাদের ধর্ম্মের অঙ্গ।

এদেন বৃটীশ উপনিবেশ, লোকসংখ্যা প্রায়

৫৫,০০০ জন। আমি এদেন বিভ্রমণের সময় বহু ইয়ুদী দেখেছি। ইয়ামক থেকে আরম্ভ করে এদেন, উত্তর আরব দিয়ে তারা পালেষ্টাইন পর্য্যন্ত রয়েছে। বহু খৃষ্টানও আছে। তারা আরবী ভাষায় কথা বলে, আরবী আচার-ব্যবহার কিন্তু ধর্ম্মে ইয়ুদী খৃষ্টান। তাদের নামও বহু ক্ষেত্রে আবরী, যথা—আবদুল্লা, ইসমাইল, আয়ুব।

সিরিয়া-লেবানন

সীমানা—উত্তরে তুরস্ক, দক্ষিণে পালেষ্টাইন, পূর্ব্বে মেসোপটেমিয়া ইরাক, পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর।

লোকসংখ্যা—সিরিদ		১১,৯৮,৮২৯
„	নিবানন	৬,২৮,৮৬৩
„	আলাউ	২,৬১,০৬২
„	দরুজী	৫০,৩২৮
লেবাননে	খৃষ্টান অধিকার	৫০% উপর
	এবং ইয়ুদী প্রায়	১৫%

সিরিয়া দেশ প্রাক্‌মুসলিম যুগে পূর্ব্ব রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, এবং মুসলমান বিজয়ের পরে অনেক আরব এ দেশে আসে। দেশীয় লোক মুসলমান হয়েছে তা নয়, এখানে খৃষ্টধর্ম্ম খুব আনুষ্ঠানিক ভাবে আচরিত হত। বহু ইয়ুদী আদিম কাল হতে এ দেশে বাস করত, এবং বহু প্রকৃতিপূজারী (animist) এ দেশে ছিল। ওমাইয়া খলিফা মুয়াবিদ ও ইয়াজিদ মহম্মদ-সহকর্ম্মী সাহেবীদের ক্ষমতা লোপ করবার প্রেরণায় মদিনা থেকে রাজধানী পরিবর্ত্তিত করে দামোস্কাস-এ আনেন। ওমাইয়া-যুগ ইসলাম-সাম্রাজ্য ভিত্তির গৌরবোজ্জল যুগ। রাজ-ধানীর সুযোগ সুবিধার অনুরোধে বহু আরব মুসলমান এই দেশে বসবাস করেন। মুসলমান আগমনের পূর্ব্বে সিরিয়া প্রাচীন কুমুক, কীরুরেহে, টীকা, ফিনিসিয়া, গ্রীক, রোমান, কিছু তুর্ক জাতি এবং স্থানীয় লোক দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। তাদের মধ্যে অনেকেই ইসলাম-ধর্ম্ম গ্রহণ করে এবং আরব জাতির ভাষা ও সমাজপ্রথা অনুসরণ করে ক্রমশঃ তারা রাজার জাতি মহম্মদের জাতি তথা আরব জাতি বলে পরিগণিত হল। যাই হউক, প্রাচীন জাতিগুলি ইসলাম গ্রহণ করা সত্ত্বেও বহুভাবে প্রাচীন ধারা বিদ্যমান রয়েছে।

সিরিয়া দেশে খৃষ্টান, ইয়ুদী, আর্মানী, তুর্কী ও ইয়ুদী। অর্দ্ধ মুসলমান দরুজী জাতিও রয়েছে। যে খৃষ্টানগণ আরব সভ্যতা গ্রহণ করেছে, তারা প্রায়ই গ্রীক খৃষ্টান, তাদের ধর্ম্মগুরু (Patriarch) আলেক্‌জান্দ্রিয়া নামক শহরে তুর্কীস্থানের প্রান্তদেশে বাস করেন। মেরোনাইট খৃষ্টানগণ ধর্ম্মের দিক দিয়ে প্রায়ই গ্রীক খৃষ্টানের মতন, পরে তাদের ধর্ম্মগাথা ও প্রার্থনা- (Liturgy) গুলি প্রাচীন আরবিক ভাষায় লিখিত। তারা অত্যন্ত বিশ্বাসী ধার্ম্মিক, কিন্তু বেশ জাতীয়তাবাদী। তারা লেবাননে একটী বিদ্যালয় স্থাপন করেছে—নাম দারুউল হিরামা। এখানে তারা জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলকে প্রবেশাধিকার দান করেছে এবং জাতিকে, দেশকে ধর্ম্মের উপরে স্থান দিয়েছে। বহু ইয়ুদীও এই বিদ্যালয়ের ছাত্র, কিন্তু মুসলমান-পরিচালিত বিদ্যালয়ে ইয়ুদী খৃষ্টানদের স্থান নেই। তবে বর্ত্তমানে আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্ম্মাতিরিক্ত শিক্ষায় এক নতুন ভাবধারা প্রবেশ করেছে।

সিরিয়ার উত্তরপ্রান্তে এলেপ্পো। তুর্কসীমান্তে আলেকজান্দ্রিয়াতে বিভিন্ন ধারায় প্রাচীন তুর্কী সভ্যতা জড়িয়ে আছে। এখনো বহু গ্রামে মুসলমানের পরিবারে "তারকা পূজা" প্রচলিত আছে। গ্রাম্য কৃষকগণ ধর্ম্মগাথা কাগজে লিখে তাবিজের মতন হাতে বেঁধে রাখে এবং প্রাচীন সমস্ত নিয়মগুলি পালন করে।

সিরিয়ার অভ্যন্তরে একটি জাতির বসতি রয়েছে

নাম দরুজী। দরুজী জাতি এক অপূর্ব রহস্য, সাধারণতঃ তারা নিজেদের মিশরের খলিফা আল-হাকিম বিন আমর ইলাহির প্রবর্ত্তিত একটি মত অনুকরণ করে বলে দাবী করে। এই ফতিমা-বংশীয় খলিফার মাতা একজন রাশিয়ান, পিতা আরব। তিনি বিশ্বাস করতেন তিনি আল্লাহের অবতার, এবং ১০২১ খৃষ্টাব্দে তিনি অকস্মাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে যান। এই সম্প্রদায় তাদের ধর্ম্ম-যাজক আলি দরাজ এর নামানুসারে নিজেদের পরিচয় দেয়। তারা বর্ত্তমানে সংখ্যায় সিরিয়াতে ৪৮,০০০, লেবাননে ৪৩,০০০, পালেষ্টাইনে ৭০০০ এবং বহুসংখ্যক আমেরিকায়। আমেরিকায় যারা সিরিয়ান খৃষ্টান বলে পরিচিত, এরা যে দেশে বাস করে সেই দেশের ধর্ম্ম আনুষ্ঠানিক ভাবে অনুসরণ করে, কিন্তু ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত ভাবে নিজেদের ধর্ম্মই গোপনে অনুবর্ত্তন করে। এদের বাসস্থানের আদিম নাম জবল-দরেজ।

দরুজীগণ মুসলমান, এবং নিজেদের মুসলমান বলে পরিচয় দেয়। তারা একেশ্বর-বাদী। দরুজীকল্পিত আল্লাহ বাক্যের অতীত, প্রমাণের অতীত, নিঃস্পৃহ, নির্গুণ। তাদের মতে আল্লাহ যুগে যুগে অবতারের ভিতর দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করেন। দরুজীগণ যীশুকে অবতার বলে গ্রহণ করে, কিন্তু মহম্মদ সম্বন্ধে নিরুত্তর। আল হাকিম অবতার, আল হাকিমের পর আর কোন অবতার আসবেন না। মানুষের অন্যায় অধর্ম্মে বিরক্ত হয়ে আল হাকিম নরদেহ ত্যাগ করে চলে গেছেন। আবার তিনি সশরীরে অবতীর্ণ হয়ে মক্কা, জেরুজালেম এবং পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম্মস্থান জয় করবেন। সমস্ত পৃথিবী আল হাকিমের ধর্ম্মমত গ্রহণ করবে। এই পৃথিবী আল্লাহর বুদ্ধির প্রতিবিম্ব মাত্র। মানুষ পৃথিবীর প্রথম দিনে যত জন সৃষ্ট হয়েছিল, আজও তত জনই রয়েছে, মানবের সংখ্যায় হ্রাস বৃদ্ধি নাই। বস্ত্র পরিবর্ত্তনের মতন মানুষ দেহ পরিবর্ত্তন করে। সৎলোকের আত্মা ক্রমশঃ উচ্চতর দেহ গ্রহণ করে পরিশেষে আল্লাহর সঙ্গে মিশে যায়, অসৎ লোক উট কিংবা কুকুরের দেহ গ্রহণ করে।

দরুজীর মতে—প্রত্যেক ধর্ম্মপুস্তকই সত্যের অবতারণা করে কিন্তু তা আংশিক সত্য। কোরাণ অথবা বাইবেল দরুজীমতে আর্য্যগ্রন্থ কিন্তু একান্ত ধর্ম্মগ্রন্থ নয়। ধর্ম্মপুস্তক রূপে দরুজীগ্রন্থই একমাত্র গ্রহণীয় পুস্তক। দরুজী-সম্প্রদায় অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বীকে তাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবেশের অধিকার দেয় না। কারণ, আল্লাহ ব্যতিরেকে অন্য কেউ মানুষকে এই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মে প্রবেশ করার অধিকার দিতে পারে না। সুতরাং জন্ম ভিন্ন অন্য কোন অধিকারেই কেউ দরুজী-সম্প্রদায়ে প্রবেশ করতে পারে না। তারা অন্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে বিবাদ করতে প্রস্তুত নয়, সুতরাং পারিপার্শ্বিক যে কোন ধর্ম্মে বাহ্যিক অনুষ্ঠানগুলি অনুসরণ করতে দ্বিধা বোধ করে না—যথা, মুসলমানের সঙ্গে তারা ওজু (স্নান-আচমন) করে, তাদের সামাজিক নামাজ পড়ে এবং কোথাও কোথাও বা রমজান পালন করে। অন্যদিকে মেরোনাইট খৃষ্টানদের সঙ্গে পূত-বারি সিঞ্চন উৎসবও পালন করে থাকে। দরুজীগণ আল হাকিমের মন্ত্রী হামজা-প্রবর্ত্তিত নিয়মগুলি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে। যথা—দরুজীদের আল্লাহ 'একমেবাদ্বিতীয়ম্', তাঁর কাছে আত্মনিবেদন করবে, দরুজীগণ বরাবর সত্য কথা বলবে, সম্প্রদায়ের সভ্যগণের বিরুদ্ধাচরণ করবে না, অন্য ধর্ম্ম বর্জ্জন করবে, ভ্রান্তপথ-চারীদের সঙ্গ বর্জ্জন করবে, সম্প্রদায়ের গুরুর বাক্য অবশ্য পালন করবে। তারা মুসলমানদের মত প্রাক্তন স্বীকার করে না; তারা মানুষের কর্ম্ম-স্বাধীনতার উপর যথেষ্ট আস্থাশীল।

তাদের মধ্যে দুই শ্রেণিবিভাগ রয়েছে—প্রথম শ্রেণী—আকিল (পণ্ডিত) এবং দ্বিতীয় শ্রেণী—জাহিল (মূর্খ)। যে সকল জাহিল আকিল শ্রেণিভুক্ত হওয়ার জন্য এক বৎসর শিক্ষানবীশ থাকে, তাদের নিজের বিশ্বাসের গভীরতা, নিয়মানুবর্ত্তিতা এবং অন্যান্য বহুবিধ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়, আপাত দৃষ্টিতে আকিল ও জাহিলের কোন পার্থক্য নেই। আকিলগণ নিজের অন্তরের শুদ্ধতার প্রতীক রূপে শ্বেত শিরস্ত্রাণ পরিধান করেন, পুরুষ নারী উভয়ই আকিল পদে উন্নীত হতে পারেন। তারা তাম্রকূট সেবন ও মদ্য পান করবে না, নারীরা স্বর্ণ রৌপ্য অথবা রেশম ব্যবহার করবে না। সাধারণতঃ সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় নয়। তবে যদি কেহ সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করে তবে সে সম্মানার্হ। প্রত্যেক জাহিল আকিলদের ব্যবহারের জন্য খাদ্যের এক অংশ পৃথক করে রাখে এবং আকিল ভিন্ন সে অংশ অন্য কেউ গ্রহণ করতে পারে না। আমি আকিল দরুজী দেখেছি—খুব গম্ভীরপ্রকৃতি ভীষণাকৃতি, অল্পভাষী এবং সম্প্রদায়ের কল্যাণ কামনায় সর্ব্বদাই নিরত। প্রতি শুক্রবারে তাদের সপ্তাহ আরম্ভ, সপ্তাহান্তে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দরুজীগণ আকিলের নেতৃত্বে তাদের ধর্ম্মমন্দির Khalwa (খালওয়া)তে সমবেত হন, দরুজ পর্ব্বতে আমরা এই খালওয়া দেখতে গিয়েছিলাম। তাদের ধর্ম্মাচরণের সময় অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর সন্ধান পেলে তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী! এই খালওয়াতে পুরুষ-নারী উভয়েরই সমান অধিকার। খালওয়া অতি সাধারণ অনাড়ম্বর অনুষ্ঠান। বেদীর পার্শ্বে একটি গো-বৎসের প্রতিমূর্ত্তি রক্ষিত আছে। দরুজীদের ধর্ম্মগ্রন্থ অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর পক্ষে সন্ধান করা প্রায় অসম্ভব। শুনেছি এই গ্রন্থের সারাংশ ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে।

আমার সঙ্গে আসিয়া আত্‌রাম্ নাম্নী একজন দরুজী গোষ্ঠীপতির মহিষীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে; তাঁর কাছে আমি দরুজীসম্প্রদায়ের সামাজিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বহু সংবাদ পেয়েছি। সে সমস্ত সংবাদ আমি প্রকাশ করব না বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। তিনি নিজে একজন উত্তর-আরব দেশীয় বেদুইন সরকারের কন্যা—তার পিতার নাম আলি মনসুর। তাঁর পিতা স্বামী ১৯২৪ সালে বিদ্রোহের সময় ফরাসীদের হস্তে প্রাণত্যাগ করেন। সেই সময় আসিয়া আত্‌রাম তাঁর সন্তানদের নিয়ে পালিয়ে মিশরে আসেন। বর্ত্তমানে তিনি মধ্যপ্রাচ্যের বিখ্যাত গায়িকা, তাঁর কন্যা ছিলেন বিখ্যাত নর্ত্তকী আলআশমহান।

আমার মনে হয়, এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা আলহাকিম বিন আমর ইলাহি তাঁর মন্ত্রী হামজা দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। হাম্জাই প্রধানতঃ এই ধর্ম্মের প্রধান পুরোহিত। ধর্ম্মমত-গুলির সঙ্গে হামজা নাম বিশেষ ভাবে জড়িত। এই হামজা একজন পারস্য দেশীয়। এই দরুজী মতের সঙ্গে ভারতীয় মতের বহু মিল পরিলক্ষিত হয়। সিরিয়ার অভ্যন্তরে আর কয়েকটী মুসলমান সম্প্রদায় রয়েছে যারা পুনর্জ্জন্ম ও অবতারবাদ বিশ্বাস করে, যথা—মেরোনাইট্, আনসারিয়া এবং মেটাওয়ালি।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ

স্বামী ধর্ম্মেশানন্দ

পূজ্যপাদ শশী মহারাজের জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রাণতার বিকাশ দেখিয়া স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন রামকৃষ্ণানন্দ। প্রকৃতপক্ষেও শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ধ্যান, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর জ্ঞান, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর প্রাণ, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সর্ব্বস্ব ছিলেন। বরাহনগর মঠে শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণ শশী মহারাজ একমনে একপ্রাণে একাই রন্ধন করা, বাসন মাজা, জল তোলা, ঝাঁট দেওয়া প্রভৃতি হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরপূজা ও আশ্রমের অধ্যক্ষতা পর্য্যন্ত সকল কার্য্য সম্পাদন করিতেন। মঠে একজন চাকরের সহিত তিনি জলতোলা প্রভৃতি তুচ্ছ কর্ম্ম এরূপ নিরভিমান ও গোপনভাবে করিতেন যে, চাকরটী বহুকাল তাঁহাকে একজন সহকর্ম্মী বলিয়া মনে করিত।

শশী মহারাজ স্বহস্তে রন্ধন ও নিরামিষ আহার করিয়া নিষ্ঠাবান ব্রহ্মচারীর ন্যায় জীবন যাপন করিতেন। যৌবনের প্রাক্কালে ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে আসিয়াও তাঁহার নিষ্ঠার শৈথিল্য দেখা যায় নাই। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে আমিষ আহার করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী জীবনে স্বামিজীর আদেশে তিনি যে দাক্ষিণাত্যে প্রচারোদ্দেশ্যে যাইবেন এবং নিষ্ঠাবান্ দক্ষিণদেশীয়গণের সহিত সুদীর্ঘ চতুর্দ্দশ বর্ষকাল যাপন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাব প্রচার করিবেন, ইহা যেন পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট ছিল। বরাহনগরে তাঁহার তীব্র তপস্যার জীবন স্মরণ করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। তখন বরাহনগর মঠের সকলেই অপ্রতিগ্রাহী ছিলেন। কাহারও নিকট মঠের জন্য কিছু চাহিতেন না। সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া আকাশবৃত্তি অবলম্বনে দিনযাপন করিতেন। একবার অভিমান করিয়া সকলে উপবাসী রহিলেন। সারাদিন কাটিয়া গেলে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে একজন ধনী লোক ভৃত্য দ্বারা ভোগ্য-দ্রব্য প্রেরণ করেন। ভৃত্য দরজায় ধাক্কা দিতেছে শুনিয়াও কেহ অগ্রসর হইতেছেন না দেখিয়া শেষে তাহার চীৎকারে শশী মহারাজ অগ্রসর হইয়া দেখিলেন যে, প্রচুর খাদ্য-সামগ্রী মাথায় একজন অপরিচিত ব্যক্তি আসিয়াছে। ইহা শ্রীশ্রীঠাকুরের অপার মহিমা জানিয়া তাঁহারা সেই রাত্রি ঐ সমস্ত দ্রব্য ঠাকুরকে ভোগ দিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। এইরূপ আর একটি ঘটনা তাঁহার মান্দ্রাজ মঠে অবস্থানকালে ঘটিয়াছিল। আশ্রমে কিছু না থাকায় তিনি অভিমান করিয়া সমুদ্রের বালির পিণ্ড ঠাকুরের সম্মুখে রাখিয়া বলিয়াছিলেন, "এই খাও, আমিও আজ ইহাই প্রসাদ পাইব!" তখন আশ্রমে তিনি একা থাকিতেন এবং সকল কাজ তিনি একাই করিতেন, এমন সময় নানাপ্রকার খাদ্যাদি লইয়া এক ব্যক্তি আসিয়া নিবেদন করিল, "ঠাকুরের জন্য পূজোপঢৌকন আনিয়াছি, গ্রহণ করুন।" শশী মহারাজ অশ্রুপূর্ণ নেত্রে উহা ঠাকুরকে যথাবিধি নিবেদন করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের উপরে নির্ভর তাঁহার জীবনের একটি বিশেষত্ব ছিল। পূজার সময় ধ্যানকালে তাঁহার তেজোময় মূর্ত্তি জ্যোতির্ম্ময় হিমাচলসদৃশ বলিয়া অনুমিত হইত।

আমেরিকাবাসিনী ভক্তিমতী দেবমাতা কিছুকাল তাঁহার সহিত মান্দ্রাজ আশ্রমে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, "শশী মহারাজের

ধৈর্য্য মানবে অসম্ভব।" একবার দেবীপূজা উপলক্ষে দেবমাতা তাঁহাকে সকাল হইতে পরদিন প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত প্রায় ২৪ ঘণ্টা একসঙ্গে একাসনে বসিয়া পূজা ও জপধ্যানাদি করিতে দর্শন করিয়া বিস্মিতা ও মুগ্ধা হইয়াছিলেন। শশী মহারাজ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, ভক্তিতে সবই সম্ভব।

তিনি ভক্তের উদাহরণস্বরূপ কাকরূপী রাম-ভক্তের কথা বলিতেন। তপস্যাকালে অত্যন্ত পিপাসায় কাতর হইয়াও মুহূর্ত্তের জন্য রামনাম জপের বিরাম হইবে এই আশঙ্কায় জল পান করিতে গিয়াও সেই কাক জলপান করিতে পারে নাই। ভক্তিই ভক্তের প্রাণ। ভক্তির শক্তিতে আমিত্বের বিনাশ হয়। তিনি কোন কর্ম্মকে ছোট মনে করিতেন না, পরন্তু সর্ব্বকর্ম্ম শ্রীশ্রীঠাকুরের, বলিয়া মনে করিতেন। মান্দ্রাজে প্রথম অবস্থায় যখন তাঁহাকে আশ্রমের প্রায় সকল কর্ম্ম করিতে হইত, তখন তাঁহাকে নিবিষ্টমনে ঠাকুরের জন্য তরকারী কুটিতে দেখা যাইত। সন্ধ্যারতির পর তিনি ভক্তদের লইয়া যখন শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গে দুই ঘণ্টাকাল যাপন করিতেন, তখন তাঁহার শরীর হইতে যেন এক জ্যোতি বাহির হইয়া ভক্তদের মনোরাজ্যে ভাবান্তর আনয়ন করিত। সকলে তখন শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবে বিভোর হইতেন।

শশী মহারাজ ঠাকুরপূজাকালে এত বিভোর থাকিতেন যে, তাঁহার তখন বাহ্য জ্ঞান থাকিত না। অন্তরের দেবতাকে তিনি মনোরাজ্য হইতে আকর্ষণ করিয়া সম্মুখে বাহিরে প্রত্যক্ষ করিতেন এবং তাঁহার সহিত আলাপ করিতেন। তখন তাঁহার নিকট ইষ্ট ভিন্ন সকল বস্তু ও ব্যক্তি যেন অদৃশ্য হইত। তাঁহার সঙ্কোচ, লজ্জা ও ভয় থাকিত না। একবার এক যুবক মান্দ্রাজ-মঠে তাঁহার পূজাকালে নিম্নলিখিত ঘটনা দেখিয়া চমৎকৃত হন: তিনি বলেন, শশী মহারাজ সকালে শহরে ক্লাশ করিয়া আসিয়া সেদিন একটু বিলম্বে ঠাকুরের পূজা করেন। রান্নাঘর হইতে একটি বড় বাটীতে করিয়া একবাটী গরম দুধ দুই হাতে ত্রস্তপদে লইয়া যাইতেছিলেন, দেখিলাম তাঁহার হাত দুইটী লাল হইয়া গিয়াছে। একে গ্রীষ্মকালে সমস্ত শরীর ঘর্ম্মাক্ত, তায় একফোঁটা দুধ যেন মাটিতে না পড়ে, এইভাবে খুব সতর্কতার সহিত দ্রুত ঠাকুরঘরে যাইয়া ঠাকুরের সম্মুখে গরম দুধের বাটী রাখিয়া যেন একটু বিরক্তভাবে বলিলেন, 'নাও, খাও!' যেন নিজের পিতামাতার প্রতি ক্ষোভ করিয়া বলিলেন, আমি এত তাড়াতাড়ি কি পারি? আবার দেরী হইলে পিত্ত পড়িবে ত! অতএব আমার কি দোষ? তায় যদি এক-ফোঁটা দুধ মাটিতে পড়িয়া যাইত, তাহা হইলে ত আজ আর খাওয়া হইত না! আর একবার মান্দ্রাজে বর্ষাকালে ঠাকুর ঘরটি ভাঙ্গা থাকায় রাত্রিতে বৃষ্টি পড়িতে থাকে। তিনি সারারাত্রি শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতির উপর একটি ছাতা ধরিয়া কাটাইয়াছিলেন। গরমের সময় সারা দুপুর এমনভাবে তন্ময় হইয়া ঠাকুরকে পাখা করিতেন যে, মনে হইত সত্যই শ্রীশ্রীঠাকুর প্রতিকৃতিতে আবির্ভূত হইয়া গ্রীষ্মে ক্লান্ত হইয়া তাঁহার সেবা লইতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে তিনি চাক্ষুষ দেখিতে পাইতেন বলিয়া তামাকের কল্‌কেটি লইয়া হাত বাড়াইয়া নিস্পন্দভাবে অপেক্ষা করিতেন, দাঁতনটি ছেঁচিয়া দিতেন, আর ঠাকুরের মুখশুদ্ধির জন্য একটী পান কম সাজিলে বা চূণ বেশী হইলে কঠোর শাসনে সেবককে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেন। ঠাকুরের সেবায় তাঁহার নিষ্ঠা ও ভক্তি ছিল যথার্থই অপূর্ব্ব।

দেবমাতা একবার তাঁহার আলুথালু বেশে ফটো তোলা হইতেছে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "স্বামিজী, সেজে ফটো তুলিলেন না কেন?" তিনি

হাসিয়া উত্তর দিয়াছিলেন, "আমি যে এইরূপই। কৃত্রিম সৌন্দর্য্যের কি প্রয়োজন?" দেহের দিকে তাঁর মোটেই দৃষ্টি ছিল না। খুব প্রাতঃকালে তাঁহার উচ্চারিত ভগবৎগীতি শ্রবণ অতি মনোমুগ্ধকর ছিল।

একবার দেবমাতা Christmas Eve-এ খৃষ্টসম্বন্ধে তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনি যখন বক্তৃতা করিতেছিলেন, তখন অনেকেরই খৃষ্টের উপলব্ধি হইয়াছিল এবং আপনাকেও একজন অহিন্দু খৃষ্টান বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল, ইহার কারণ কি?" তিনি মৃদু হাসিয়া গম্ভীরভাবে বলিয়াছিলেন, "ঠাকুর বলিতেন, আমি ও স্বামী সারদানন্দ যীশুখৃষ্টের সঙ্গে ছিলাম। খুব ছোটবেলায়ও আমি যীশুখৃষ্টের চিন্তা করিতাম এবং ভাবিতাম যে, আমি যেন তাঁহার সহিত একসঙ্গে অবস্থান করিতেছি।" পরেও তাঁহার ঐ ভাবের গভীরতা কম দেখা যায় নাই। পিটারের ত্যাগ ও গুরুভক্তি তাঁহার আদর্শ ছিল। তিনি বলিতেন, পিটার ক্রুশবিদ্ধ হবার সময় কোন অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে আদিষ্ট হইলে বলিয়াছিলেন, "আমার মাথা নীচের দিকে করিয়া আমাকে ক্রুশ-বিদ্ধ কর। তাহা হইলে যীশুর পাদস্পর্শে, তাঁহার পবিত্র পদধূলির সংস্পর্শে আমার মস্তক পবিত্র হইবে।"

তাঁহার ইষ্টনিষ্ঠা ও উদারতা সমান ছিল। বৈষ্ণব শাক্ত বা কোন ধর্ম্মাবলম্বীর সহিত মিশিবার কালে তাঁহাকে যেন তাঁহাদেরই একজন বলিয়া বোধ হইত। এক সময়ে মান্দ্রাজে তাঁহাকে স্কুলে বালক-বালিকাদিগকে বাইবেল পড়াইতে হইত। তাহারা মুগ্ধ হইয়া শুনিতে শুনিতে ভাবিত, তিনি খৃষ্টান নাকি! মুসলমান ছাত্রগণ যখন বৈকালে তাঁহার নিকট আসিত, তখন তিনি কোরাণ এরূপভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতেন যে তাহারা লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া প্রতিদিন উহা শুনিতে আসিত। তিনি ছাত্রগণকে অঙ্ক-শাস্ত্রের দুরূহ প্রশ্নসমূহ ক্রীড়াচ্ছলে মীমাংসা করিয়া দিতেন। অঙ্কের কঠিন বিষয়, Trigonometry-র problem, Logarithms প্রভৃতি তাঁহার আমোদের অঙ্গস্বরূপ ছিল। কঠিন সংস্কৃত নাটক তাঁহার নিকট সাধারণ উপন্যাসের মত সহজপাঠ্য ছিল।

একান্ত সন্দিগ্ধজনের অন্তরেও ঈশ্বর বিশ্বাস আনয়নের জন্য তিনি দুরূহ জ্যোতিষ-শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন। এজন্য তিনি মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়া পুস্তকাদি পাঠ করিতেন। জ্যোতিষশাস্ত্রের সহায়ে ঈশ্বরের মহিমা প্রতিপাদন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। অবিশ্বাসী ব্যক্তিগণ তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া ধর্ম্মে ও ভগবানে —এমন কি অবতারে পর্য্যন্ত বিশ্বাসী হইতেন। কি শাস্ত্রাধ্যয়নে, কি পূজায়, কি গৃহকর্ম্মে, কি শিক্ষকতায়, কি ধ্যান-ধারণায় তিনি আদর্শ মানব, আদর্শ সন্ন্যাসী ছিলেন।

দেবমাতা বলেন, "শশী মহারাজের ধর্ম্মোপদেশ শ্রোতার প্রাণস্পর্শ করিত। তিনি উপদেশে যেমন ভাব দান করিতেন তেমনই যুক্তি দান করিতেন। মান্দ্রাজে একদিন সন্ধ্যারতির পর জগতের ক্ষণিকত্ব এইরূপে দুই এক মিনিটের মধ্যে বুঝাইয়াছিলেন— তিনি বলিয়াছিলেন, মন স্মৃতির সমষ্টি; অতীত ও ভবিষ্যৎ স্মৃতি ও কল্পনা মনে নিহিত। বর্ত্তমান আবার কোথায়? বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের যতটা সংস্পর্শ হয় কেবল ততটাই বর্ত্তমানের উপলব্ধি। বিষয়ানু-ভূতিই স্মৃতিরূপে মনোমধ্যে স্থান পায়। বর্ত্তমান-রূপী মুহূর্ত্ত ইউক্লিডের জ্যামিতির বিন্দুর (point) মত স্থিতিহীন (without dimension)। আমাদের বর্ত্তমানও এইরূপ স্থিতিহীন—ক্ষণস্থায়ী মাত্র। মানব ইন্দ্রিয়সম্ভোগ করিবার জন্য বাঁচিতে চায় এবং

এই ক্ষণমাত্রকে বর্ত্তমান বা আজকাল বলিয়া কেবল বৃথা বাড়াইয়া দেয়। ইহাকে মানুষ সপ্তাহ, মাস, বর্ষ বলিয়া অভিহিত করে। কিন্তু বাস্তবিক বর্ত্তমান বলিয়া কিছু নাই; সবই তখন অতীত বা ভবিষ্যৎ হইয়া গিয়াছে এবং মনেতেই ইহাদের অস্তিত্ব। এইরূপে মনেতেই জগতের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। মানুষ যখন মনের পারে যায় তখন বর্ত্তমান-রূপী জগৎ তাহার নিকট অদৃশ্য হয়। সুষুপ্তিতেই এই মিথ্যাত্ব সুন্দর প্রমাণিত হয়। তখন মানব স্ত্রী, পুত্র ও বিষয়ের দুর্ভাবনা ও কর্ত্তব্য হইতে নিবৃত্ত হয়। জাগরণে যখন মনের উদ্ভব হয়, তখন আবার সব স্মৃতির উদয় হয়। মনেতেই জগতের উদয়, মনেতেই জগতের লয়, মনই এই মরীচিকা। বাসনাশূন্য মন এই রহস্য বুঝিতে পারে। তখন এই বাহিরের জগৎ তাঁহার নিকট অসার ও শূন্য বলিয়া প্রতীত হয়। আর একদিন বলিয়াছিলেন, বাহ্য জগৎ মানবের স্নায়ুর দুই প্রান্ত মধ্যে অবস্থিত। স্নায়ুর এক প্রান্ত দেহের চর্ম্মের সন্নিকটে ও আর এক প্রান্ত মেরুদণ্ডের মধ্যে থাকে, মানব-শরীরে এই স্নায়ুরাশি যেন জাল বুনিয়াছে। এই স্নায়ুজালের এক এক প্রান্ত চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় পর্য্যন্ত গিয়া দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতি বিষয়ানুভব করে। আমরা যেন এই জালে বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি; আর যেন জালে থাকিতে ভাল লাগে না। এই জাল-রূপ গোলকধাঁধার বাহিরে আসিলে আমাদের মুক্তি, এই তুচ্ছ স্নায়ুর বন্ধন কাটিলেই মুক্তি। আবার বলিতেন, মন দ্বারা অনন্ত ঈশ্বরের উপলব্ধি হয় না। তবে কি ঈশ্বর লাভ অসম্ভব? না, তাহা নহে। কারণ, ঈশ্বর আমাদের মধ্যেই, তাতেই আমাদের মন, বুদ্ধি, অহংকার প্রভৃতির অস্তিত্ব। তিনিই আমাদের জীবনের জীবন, মনের মন, অস্তিত্বের অস্তিত্ব। অতএব তাঁহাকে আমরা পাইয়াই আছি, কেবল অন্তর্মুখীন হইলেই উহা বুঝা যায়।

একদিন খৃষ্ট-ধর্ম্মের Devil বা Satan-এর কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, হিন্দুরা যাহাকে অহং বলে, উহাকে খৃষ্টানরা Satan বলে। খৃষ্টানরা Satanকে বাহিরে দেখে, আর হিন্দুরা ইহাকে অন্তরে দেখে, এই মাত্র পার্থক্য। এই অহং নষ্ট হইলে আমাদের দুর্ভাবনা, দুশ্চিন্তার হাত হইতে নিষ্কৃতি হয়। এই অহং দূর হইলে কেবল ঈশ্বর বা আত্মাই থাকেন। তখন সকল দুঃখের অবসান হয়। এই first person বা উত্তম পুরুষরূপ আমি বা Satan কে দূর করিতে পারিলেই আত্মোপলব্ধি। বস্তুতঃ 'আমি' বলিয়া কিছুই নাই। উহা বিরাট ঈশ্বরেচ্ছার এক কণামাত্র—প্রতিবিম্ববৎ মিথ্যা।

শশী মহারাজের শ্রীরামকৃষ্ণপ্রাণতার পর তাঁহার গুরু ভাইদের প্রতি প্রীতি উল্লেখযোগ্য; বিশেষতঃ স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দের প্রতি তাঁহার আন্তরিক প্রীতি অতুলনীয়। নিষ্ঠাবান শশী-মহারাজ স্বামিজীর আদেশে তাঁহার জন্য মুসলমানের দোকান হইতে বিলাতী পাঁউরুটী কিনিয়া আনিয়া-ছিলেন। স্বামিজীর আদেশে তিনি ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দীর্ঘ ১৪ বৎসরকাল মান্দ্রাজে ধর্ম্মপ্রচার করেন। ঐ সময়ে তিনি মান্দ্রাজ হইতে বোম্বে, বাঙ্গালোর মহীশূর ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি স্থানে ধর্ম্ম বিষয়ে বহু বক্তৃতা দান করিয়াছিলেন। পণ্ডিতসভায় সংস্কৃত ভাষায়ও তিনি সুন্দর বক্তৃতা করিতেন।

তিনি মঠে প্রথমে ঢুকিয়া ধূলি পায়েই ঠাকুর ঘরে গিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিতেন, তারপর সাষ্টাঙ্গ হইয়া স্বামিজী, মহারাজ ও বাবুরাম মহারাজকে প্রণাম করিতেন।

মহারাজের অসুখ, মান্দ্রাজে চিঠি আসিয়াছে। তখন শশী মহারাজ পূজা করিতে বসিয়া ঠাকুরের ছবিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "মহারাজকে যদি ভাল করে না দাও, তোমাকে সমুদ্রের জলে ফেলে দেব!"

দেবমাতা বলেন, "মান্দ্রাজে থাকাকালীন

প্রতিদিন শেষরাত্রে দুই ঘণ্টাকাল তিনি মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা সেই স্থানকে মন্ত্রময় করিয়া দিতেন।"

যদিও প্রবর্ত্তককে বাহ্যপূজাদির খুঁটিনাটি ব্যাপার পালন করিতে উৎসাহিত করিতেন, তথাপি আত্মানাত্ম-বিবেককেই উচ্চতর স্থান দিতেন। ভক্তিসম্বন্ধে বলিতেন, "ঈশ্বরে আত্মসমর্পণই ভক্তি। যথার্থ অনন্যচিত্ত হইলে ঈশ্বর ভক্তের দাসের দাস হন। এই আত্মসমর্পণের জন্যই কঠোর তপস্যার প্রয়োজন। তপস্যা দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া অসম্ভব জানিলে তবে আত্মনিবেদন হয়।"

নিষ্ঠা সাধুকে বাঁচায় এই সম্বন্ধে তিনি নিম্নলিখিত গল্প বলিতেন: কোন শহরে এক ভজনপরায়ণ ফকির থাকিতেন। তিনি নিষ্ঠা সহকারে রোজ রোজ মস্‌জিদের দরগায় সন্ধ্যাকালে বাতি দিতেন। একদিন সেই ফকিরের মনে বিকার উপস্থিত হওয়ায় তিনি এক বারাঙ্গনার নিকট গমন করেন। বারাঙ্গনা সব বুঝিতে পারিয়াও তাঁহাকে সমাদরে বসায় এবং বাক্যালাপ করিতে থাকে। এইরূপে কথায় কথায় সন্ধ্যা হইয়া আসিলে বারাঙ্গনা তাহার পরিচারিকাকে বলিল, 'এই চেরী, চেরাগ লাগাও'। এই কথা শুনিয়া ফকিরের প্রতিদিন সন্ধ্যায় মস্‌জিদের দরগায় চেরাগ দিবার কথা মনে পড়িল। তিনি তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়া পলাইয়া গেলেন। এইরূপে সাধুর সাধুত্ব রক্ষা পাইল।

শশী মহারাজ একদিন বলিয়াছিলেন, তোরা ঠাকুরকে 'অবতার' 'অবতার' বলিস্! অবতার কি বলতো? এই বলিয়া Mathematics এর অঙ্কের ধারায় বলিলেন, স্বামিজী তাঁহার সমুদয় বাক্যে, বক্তৃতায় যাহা যাহা বলিয়া গিয়াছেন + (plus) ঠাকুরের সব পার্ষদ + (plus) অনন্ত = (equal to) ঠাকুর।

তাঁহার লিখিত "The Soul of Man," "Shree Krishna the Pastoral and King-maker" প্রভৃতি পড়িলে তাঁহার বিদ্যা-বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও আত্মোপলব্ধির গভীরতা হৃদয়ঙ্গম হয়। তাঁহার সহিত আলাপ করিলে কি আনন্দই না পাওয়া যাইত! তিনি অন্তর স্পর্শ করিয়া সকল সংশয়ের সমাধান করিয়া দিতেন।

দিনশেষে

শ্রীননী দত্ত

দিবসের শেষে আঁধার স্তব্ধ সাঁঝেতে
আপনারে দেখি আপন মনের মাঝেতে;
অজানা দেশেতে থমকি দাঁড়াই, হায়!
মনের সারথি তখনি চলিয়া যায়।

সাঁঝের প্রদীপে আলোকিত চারিধার
স্বজন প্রীতিতে মুখর গৃহের দ্বার;
মধুর-ভাষণে সে 'মন' ঘিরিয়া থাকে
এ-রহস্যেরে এমনি করিয়া ঢাকে।

জীবনের কথা যখনি ফুরায়ে আসে
স্নেহ-ভালোবাসা দেয় না যখন সাড়া;
মনের সারথি বারেক দেয় যে নাড়া
ছুটে যায় শেষে অজানারি অভিলাষে।*

* ইংরাজ-কবি জর্জ উইলিয়াম রাসেলের "আউট্‌কাষ্ট" শীর্ষক কবিতার ভাবানুবাদ।

গীতার বাণী

শ্রীতারাপদ চৌধুরী, বি-এ

(২)

গীতার একটি প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় ভক্তি-বাদ। উপনিষৎসমূহের গম্ভীর বাক্যসমূহের মধ্যে আমরা প্রধানতঃ জ্ঞানের কথাই পাইয়া থাকি। স্থানে স্থানে ভক্তির কথা থাকিলেও, উহা তত পরিষ্কার ও পরিপুষ্ট নহে। এজন্য উপনিষৎসমূহ জ্ঞানযোগের অধিকারীদিগেরই উপযোগী শাস্ত্র। গীতাকার উপনিষদুক্ত উচ্চ জ্ঞানের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিযোগের অতি মনোহারিণী বার্ত্তা প্রচার করিয়াছেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, জ্ঞান ও যোগ সকলের উপযোগী নহে। কারণ, "ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।" নির্গুণ ব্রহ্মে আসক্ত-চিত্ত ব্যক্তিদিগের পথ কঠিন; কারণ দেহিগণের পক্ষে নির্গুণ ব্রহ্মে নিষ্ঠা লাভ করা কষ্টসাধ্য। কর্ম্মযোগও সকলের উপযোগী নহে। সাধারণের পক্ষে ভক্তিপথ উপ-যোগী। কারণ, ভক্তি-ভালবাসা জিনিষটা মানুষ সহজেই ধরিতে বুঝিতে পারে এবং ভক্তিদ্বারা স্বাভাবিকভাবে বিবেক-বৈরাগ্য আসিয়া মানবাত্মাকে ব্রহ্মোপলব্ধির যোগ্য করিয়া তোলে। এই পথে জোর করিয়া মানসিক বৃত্তি নিরোধ করিবার কোন ব্যবস্থা নাই, আছে শুধু ভগবানের দিকে মনের মোড় ফিরান—যাহাতে ক্রমে ভক্তিভাব বৃদ্ধি পাইয়া অন্য সকল ভাবকে স্বাভাবিকভাবে নিরোধ করিয়া তোলে এবং ভক্তির পরিপক্কাবস্থায় সাধক আপনার ইষ্টের সঙ্গে প্রগাঢ়ভাবে তন্ময় হইয়া তাদাত্ম্য লাভ করিতে সমর্থ হন। ভক্তি-ধর্ম্মের অধিকারী তাঁহারাই যাঁহারা ভগবানে বিশ্বাসী ও তৎকৃপালাভে যত্নপর। এই বিষয়ে উত্তমা-ধমের কোন বিচার নাই। গীতাকার তাই বলিতেছেন, "কিং পুনঃ ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।" পুণ্যবান্ ব্রাহ্মণ এবং ভক্তিমান রাজর্ষিদের ত কথাই নাই—

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥

'হে পার্থ, যে কেহ অসৎকুলজাত হউক, স্ত্রী বৈশ্য বা শূদ্র হউক, আমাকে ভক্তি করিয়া এবং মদাশ্রিত হইয়া পরমগতি প্রাপ্ত হন।'

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥

'অতি দুরাচার ব্যক্তিও যদি অনন্যচিত্তে আমার ভজনে প্রবৃত্ত হয়, তবে তাহাকে সাধু বলিয়া জানিবে, যেহেতু সে সাধুকার্য্যে যত্নবান। সে অবিলম্বে ধর্ম্মাত্মা হইয়া নিত্য শান্তি প্রাপ্ত হয়।' এইরূপ ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিয়া সকলের জন্যই ধর্ম্মপথ উন্মুক্ত করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-দেব যেমন বলিতেন—কোন রকমে ভগবানে যথার্থ অনুরাগ আসিলে তাহার আর বিনাশ নাই। 'মুষলং কুলনাশনম্'। গীতাকারও সেই কথাই বলিয়াছেন, 'কৌন্তেয় প্রতিজানীহি নমে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।" হে কৌন্তেয়, আমার ভক্ত বিনষ্ট হয় না। অনন্যচিত্ত একান্ত ভক্তের সমস্ত ভার ভগবানই বহন করেন। তাহার আর যোগক্ষেমের জন্য অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। ভগবানে যুক্তচিত্ত ব্যক্তির

চিত্তে ভগবৎকৃপায় জ্ঞানালোক স্বতঃই স্ফুরিত হয়। ভগবান্ স্বয়ং গুরুরূপে তাহাদিগকে বুদ্ধি-যোগ প্রদান করেন, যাহাদ্বারা তাহারা অনায়াসে সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হয়। ভক্ত ভক্তিপূর্ব্বক যাহা কিছু ভগবানে অর্পণ করে তিনি তাহাই সাদরে গ্রহণ করিয়া তাহাকে অভিনন্দিত করেন।

মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥

মচ্চিত্ত, মদ্‌ভক্ত ও মদ্‌যাজী হও। আমাকে নমস্কার কর এবং এইরূপে মৎপরায়ণ হইয়া মন আমাতে নিযুক্ত করিলে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বসাধারণের জন্য নির্দ্দিষ্ট সাধন-পন্থা। এযুগে শ্রীরামকৃষ্ণদেবও এই বাণীর পুনঃপ্রচার করিয়া বলিয়াছেন—"কলিতে নারদীয় ভক্তি।"

গীতার গুহ্যতম যে বাণী, তাহা এই ভক্তিরই বাণী। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগের বিবিধ উপদেশ দিয়া তিনি যে কথা দ্বারা তাঁহার বক্তব্য শেষ করিয়াছেন, তাহা ভগবানে ঐকান্তিক ভক্তি-বিশ্বাস-সম্পন্ন হইয়া তাঁহাতে কায়মনোবাক্যে আত্ম-সমর্পণ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন বলিতেন, 'কিছু যদি না করতে পারিস্ ত আমাকে বকল্‌মা দে না' অর্থাৎ আমাকে সমস্ত ভার দে না। গীতাকারও সর্ব্বশেষে সেই কথাই বলিয়াছেন। কোন ক্রমে ভক্ত-সাধক যদি মন মুখ এক করিয়া অকপটভাবে ভগবানে আত্মসমর্পণ করিতে পারেন, তবে আর তাঁহার ভাবনা নাই। এইরূপ সমর্পিততনুমন ভক্তের সকল ভার ভগবানই গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে সকল অশুভ হইতে পরিত্রাণ করেন। ইহাই গীতাশাস্ত্রের সার সিদ্ধান্ত। যে বিরাট ইচ্ছাশক্তি এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পরিচালন করিতেছে, ইহার অণুতে পরমাণুতে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান থাকিয়া ইহাকে ইচ্ছামত ভাঙ্গিতেছে, গড়িতেছে, পরিচালিত করিতেছে। তাহার বিরুদ্ধে চলিতে গিয়াই আমরা যত অনর্থের সৃষ্টি করিতেছি! 'আমি' 'আমার'-রূপ ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ জীব কূপমণ্ডূকের ন্যায় আপনার ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত থাকিয়া অশেষ ক্লেশে অমূল্য মানব-জীবন নষ্ট করিতেছে। এই 'আমি' 'আমার'-রূপ অজ্ঞানই সকল অনর্থের মূল—সংসার-যন্ত্রণার প্রধান কারণ। ইহার নাশ ব্যতীত সংসার-গতি হইতে উদ্ধারের অন্য উপায় নাই। 'আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল।' গীতাকার তাই তুমিত্বের বেদী-মূলে আমিত্বকে বলিদান করিতে বলিতেছেন এবং বলিতে ও ভাবিতে শিখাইতেছেন,—নাহং নাহং তুহুঁ তুহুঁ।—হে ভগবান আমি নই, আমি নই, তুমি, তুমি। তোমাতেই আমার সকল ভার সমর্পণ করিলাম, তুমি আমার হাত ধরিয়া যে পথে লইয়া যাইবে, তাহাতেই আমার প্রকৃত কল্যাণ। ধর্ম্মাধর্ম্ম ভালমন্দ বুঝিয়া চলিবার মত আমার ক্ষমতা কিছুমাত্র নাই—আমি তোমারই একান্ত আশ্রিত। তুমি আমাকে সংসার-যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি দাও। সব কথার শেষে গীতাকার তাই বলিতেছেন—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

গীতার এই একটি বাণী অবলম্বন করিয়া জীবন পরি-চালন করিতে পারিলে আর অন্য কোন সাধনার প্রয়োজন হয় না।

কর্ম্ম ও ভক্তিযোগ ব্যতীত জ্ঞানযোগ ও রাজযোগ সম্বন্ধে গীতাকার যে সব উপদেশ দান করিয়াছেন, তাহা অতীব চমৎকার। যে কোন উপায়ের দ্বারা ভগবানে যুক্ত হইতে পারা যায়। প্রত্যেকটি গীতায় যোগ-পদবাচ্য উপায়। আন্তরিক হইলে যে কোন উপায় দ্বারাই মোক্ষপ্রাপ্তি সম্ভব, একথা গীতায় স্বীকৃত হইয়াছে। গীতোক্ত যোগকে চারিটী মুখ্য যোগে বিভক্ত করা গেলেও ইহার কোন একটী অপর তিনটী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক বলা যায় না। অর্থাৎ জ্ঞান-ভক্তি-শূন্য কর্ম্ম অথবা ভক্তি-কর্ম্ম-শূন্য শুধু

জ্ঞান, কিংবা কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তি-শূন্য যোগ অথবা যোগ-জ্ঞান-কর্ম্ম-শূন্য শুধু ভক্তি হইতে পারে না। ইহার প্রত্যেকটির মধ্যে অপর তিনটি অন্তর্ভুক্ত আছে—কেবল প্রাধান্য অনুসারে এক একটী বিশেষ যোগ-পথ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আবার সকল গুলির সম্মিলিত সাধনাই যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, একথাও গীতা পাঠে অবগত হওয়া যায়। গীতার যিনি প্রবক্তা, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবনই গীতার মহাভাষ্য-স্বরূপ। তিনি গীতার মূর্ত্তবিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণ একাধারে পূর্ণজ্ঞানী, পরমভক্ত, সর্ব্বযোগেশ্বর এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্মী। গীতায় জীবন্মুক্ত পুরুষের আদর্শ সর্ব্বযোগ সম্মিলনেরই আদর্শ। ইহা পূর্ণ অদ্বৈতজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত।

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥

তেমনি আবার 'ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ।' আবার ভক্ত 'সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।' আবার তিনি 'সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী' অর্থাৎ কোন বিষয়ে উদ্যোগী না হইয়াও দক্ষ, সতত কর্ম্মশীল। সুতরাং গীতোক্ত অতি-মানব বা মহামানব পদবীতে আরূঢ় হইতে যাহারা উৎসুক, তাহাদের দেবমানব শ্রীকৃষ্ণ ও তৎকথিত জীবন্মুক্ত পুরুষদের আদর্শ অনুসরণ করিয়া জীবন গঠনে অগ্রসর হওয়া আবশ্যক। এই ভাবে সর্ব্বভাবের সম্মিলিত জীবনের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত এযুগে আমরা পাইয়া থাকি শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার অন্তরঙ্গ শিষ্যদের মধ্যে। স্বামী বিবেকানন্দ স্বীয় গুরুর জীবনে এই সমন্বয়ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া "অদ্বয়তত্ত্বসমাহিতচিত্তং প্রোজ্জ্বলভক্তিপটাবৃতবিত্তং কর্ম্মকলেবরমদ্ভুতচেষ্টং যামি গুরুং শরণং ভববৈদ্যম্" বলিয়া তাঁহাকে বন্দনা করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনালোকে গীতার এই synthetic বা সমগ্র যোগাদর্শ আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। তবে এই সর্ব্বভাবসম্মিলিত যোগপথের সাধকসংখ্যা অতি বিরল। এজন্য বিচারশীল ব্যক্তিদের পক্ষে জ্ঞানযোগ, ভাবপ্রবণ ব্যক্তিদের পক্ষে ভক্তিযোগ এবং প্রবল ইচ্ছাসম্পন্ন ব্যক্তিদের পক্ষে কর্ম্মযোগ বা রাজযোগ অবলম্বনীয়।

ইহাই গীতার আধ্যাত্মিক দিক। ব্যবহারিক দিকেও গীতাকার যে অমূল্য উপদেশ দান করিয়াছেন, উহার দিকে লক্ষ্য না করিলে গীতার সার্ব্বজনীনতা সম্যক্ পরিস্ফুট হইবে না। স্বামী বিবেকানন্দ যেমন বলিতেন, দুর্ব্বলতাই পাপ, গীতাকারও সেই কথাই বলিয়াছেন। গীতাকারের মতে যে কোন অবস্থাতেই দুর্ব্বলতা অনার্য্যোচিত ও অযশস্কর। ভীরু কাপুরুষ ব্যক্তি কোন বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারে না। এইজন্যই শোকমোহে অভিভূত ক্লীবতাপ্রাপ্ত কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট অর্জ্জুনের প্রতি গীতাকারের প্রথম উপদেশ—

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥

"হে পার্থ, কাতরতাপ্রাপ্ত হইও না, কেননা ইহা তোমার উপযুক্ত নয়। হে পরন্তপ, তুচ্ছ হৃদয়ের দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্যসাধনের জন্য উত্থিত হও।" এখানে অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া গীতাকার জগৎবাসী সকলকেই এই বাণী শুনাইতেছেন—হে মানব দুর্ব্বল হইও না। দুর্ব্বলতা তোমাতে সাজে না, কেননা তুমি অমৃতের সন্তান। সকল শক্তি, সকল যোগ্যতা তোমাতে বর্ত্তমান। আত্মবিশ্বাসী হও—আর সেই বিশ্বাসবলে অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করিয়া তোল। আত্মবিশ্বাস ও ভগবদ্‌বিশ্বাসই কৃতকার্য্যতার মূলমন্ত্র। আর আত্মবিশ্বাস ভিন্ন ভগবৎবিশ্বাস সম্ভব নহে। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে নিজেতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে এবং এই বিশ্বাস লইয়া স্বধর্ম্মানুযায়ী কর্ত্তব্য কর্ম্মে অগ্রসর হইতে হইবে। যদি নিঃশ্রেয়স বা মুক্তি চাও, তাহা হইলে আপন আপন

স্বধর্ম্মানুযায়ী কর্ম্ম নিষ্কামভাবে করিয়া চিত্তশুদ্ধিক্রমে সাধনমার্গে অগ্রসর হইতে হইবে। আর যদি অভ্যুদয় অর্থাৎ ঐহিক বা পারত্রিক সুখভোগ তোমার কাম্য হয়, তাহা হইলেও দৃঢ়ভাবে স্বধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াই তাহা লাভ করিতে যত্নপর হইতে হইবে। ইহা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। অভ্যুদয়কামী ব্যক্তিকে তাই গীতাকার বলিতেছেন—

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ॥

"তুমি যদিই বা হত হও তবে স্বর্গ পাইবে, জয়ী হইলেও পৃথিবী ভোগ করিবে। হে কৌন্তেয়, সেইজন্য স্বধর্ম্মানুযায়ী যুদ্ধকর্ম্ম করিতে উত্থিত হও।" এই কথার তাৎপর্য্য এই যে, ইহকালে সুখভোগ করিতে হইলেও স্বধর্ম্মানুযায়ী কর্ত্তব্যানুষ্ঠান দ্বারাই তাহা সম্ভব। গীতার অন্যত্রও স্বধর্ম্মনিষ্ঠ নিম্নাধিকারীর ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুখলাভের কথা বলা হইয়াছে। তবে গীতায় প্রধানতঃ মোক্ষেরই উপদেশ থাকায় ঐ সকল গৌণ স্থান লাভ করিয়াছে। কিন্তু যাঁহারা মোক্ষলাভে অনধিকারী বা সাংসারিক সুখই যাঁহাদের কাম্য, তাঁহারা ঐ সকল কথা হইতেই আপন রুচি অনুযায়ী পথের ইঙ্গিত পাইবেন।

ক্ষুদ্রায়তন গ্রন্থ হইলেও গীতা সমুদ্র-সদৃশ গভীর, অগাধ জ্ঞানরাশির আলয়। যাহার যত ইচ্ছা উহা হইতে জ্ঞান আহরণ করিলেও উহার জ্ঞানভাণ্ডার অক্ষুণ্ণই থাকিবে। স্বামী বিবেকানন্দের বিশেষ ইচ্ছা ছিল, বর্ত্তমান যুগে গীতাশাস্ত্রের বহুল প্রচার হউক। তিনি বিশ্বাস করিতেন গীতার তেজোদ্দীপক শিক্ষারই বর্ত্তমান যুগে বিশেষ প্রয়োজন। বর্ত্তমান যুগের অন্যান্য মহাত্মাগণও একথা স্বীকার করিয়াছেন। গীতাকার শ্রীকৃষ্ণের মহান জীবন ও মহতী বাণী দেশের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া অবনত ভারতকে পুনরায় উন্নত করিয়া তুলুক।

অনুভূতি

ডাঃ শচীন সেনগুপ্ত

চন্দ্র সূর্য্য তারা আদি জ্যোতিষ্ক মণ্ডল
তোমার করুণাকণা পাইয়া প্রসাদ
কালের সীমানা ছাড়ি যেন যাত্রিদল
ঘুরিছে দিবস রাতি নাহি অবসাদ।

অণুরও অণু তুমি মহা মহীয়ান
বহুরূপে রহিয়াছ এ বিশ্ব জুড়িয়া,
সগুণ নির্গুণ তুমি বিরাট মহান্
বিস্ময়ে অবাক হই একথা ভাবিয়া।

আপন মহিমারসে হইয়া মগন
আছ তুমি জ্ঞানরূপে সর্ব্বলোক জুড়ি।
তব জ্ঞান লাভ করি ঋষি মুনিগণ
আত্মহারা হন সবে তব রূপ হেরি।

নিষ্কাম নিঃস্বার্থ কর্ম্মে তোমায় মিলিবে
ভক্তিহীন হলে তুমি নাহি দেখা দিবে।
কর্ম্ম দিয়ে কর্ম্মক্ষয় হইবে যখন
পরাভক্তি হলে তুমি মিলিবে তখন।

এ শুধু হেঁয়ালি নয় ওগো লীলাময়
অপ্রকাশ প্রকাশের তুমি পরিচয়।
মায়া দিয়ে ঘিরে রেখে কর তুমি খেলা
কিছুই বুঝি না শুধু কেটে গেল বেলা।

মায়ারূপে ছায়ারূপে অনিত্য অসার
চলিছে জগৎ হেরি যুগ যুগ ধ'রে।
কোথা হ'তে এল তবে এ বিশ্বসংসার?
কেবা তারে সাজাইল এত যত্ন ক'রে?

বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞান

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ দেবশর্ম্মা

'সত্যং শিবং সুন্দরম্‌"-কে দেখিতে বা জানিতে হইলে বাণীদেবীর জ্ঞান-মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। এই মন্দিরের মাত্র দুইটী পথ বা দরজা আছে— একটি বিজ্ঞান ও অপরটী প্রজ্ঞান। বিজ্ঞান সদর মহলের সম্মুখস্থ বড় রাস্তা ও প্রজ্ঞান অন্দর মহলের পথ। সদর রাস্তায় সর্ব্বসাধারণের চলিবার অধিকার আছে। কিন্তু মন্দিরাধিপতির বিশেষ কৃপার পাত্র ব্যতীত অন্দরের পথে প্রবেশের অধিকার সাধারণের নাই। পুরাকালে ঋষিগণ সরাসরি ঐ পথে প্রবেশ করিয়াই দেবতাদর্শনে ধন্য হইতেন। বর্ত্তমানে এই অন্দরের পথ সাধারণের পক্ষে একপ্রকার রুদ্ধ বলিলেই চলে। একমাত্র বিজ্ঞানের সদর দরজা খোলা আছে, এবং ঐ পথেই সকলে ভীড় জমাইতেছেন। যুক্তিতর্ক, বিচার-গবেষণা এই পথের পাথেয়। বহির্জগতের পরীক্ষা ও বিশ্লেষণদ্বারা খণ্ড পরিচ্ছিন্ন সত্যকে ধরিয়া জড়ের মধ্য দিয়া বিজ্ঞান ক্রমশঃ ঐ রাস্তার অভিমুখে চলিয়াছে। আর প্রজ্ঞান অন্তর্জগতের উৎকর্ষ সাধন দ্বারা পবিত্র হইয়া সর্ব্বস্ব পণ করিয়া সেই সত্যস্বরূপ জ্ঞানময় পুরুষকে দর্শন করিতে একেবারে অন্দরের পথে প্রবেশেচ্ছু। বিজ্ঞান বহুর মধ্যে একের সন্ধানে ব্যস্ত ও প্রজ্ঞান একের মধ্যে বহুকে দেখিতে তৎপর। বিজ্ঞান বহির্ম্মুখী ও প্রজ্ঞান অন্তর্ম্মুখী। বিজ্ঞানের কর্ম্মক্ষেত্র সারা বিশ্ব ও প্রজ্ঞানের কর্ম্মক্ষেত্র প্রধানতঃ অন্তর্জগৎ। বৈজ্ঞানিকের বিশ্বাস বহুকে না পাইলে একে পাওয়া যাইবে না, প্রজ্ঞানীর বিশ্বাস একে পাইলেই সকলকে পাওয়া যাইবে— "একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানম্‌"। তাই প্রজ্ঞানা তাঁহারই অনুসন্ধানে রত যাঁহাকে পাইলে "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ"। বিজ্ঞানে পাশ্চাত্যগণের ও প্রজ্ঞানে প্রাচ্যগণের বরাবর প্রাধান্য। আজ পাশ্চাত্যগণ গবেষণাবলে তাঁহাদের পথের অনেক উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন ও করিতেছেন, আর প্রাচ্যগণ তাঁহাদের পথের কথা ভুলিতে বসিয়াছেন। আর্য্যজ্ঞানভাণ্ডারে অনেক রত্ন সঞ্চিত আছে; তাহা দেখিয়াই এখনও অনেকে বিশ্বাস করেন যে বিজ্ঞান ব্যতীত অপর একটী পথ আছে যে পথে সর্ব্বজ্ঞানাধারকে পাওয়া যাইতে পারে।

বৈজ্ঞানিক তাঁহার পথের উৎকর্ষ সাধনের জন্য আবিষ্কার করিয়াছেন নানাবিধ যন্ত্র গবেষণাগার প্রভৃতি—আর প্রজ্ঞানী আবিষ্কার করিয়াছিলেন যোগদর্শন ও ব্রহ্মবিদ্যা। এই যোগজ জ্ঞানকেই প্রজ্ঞান বলে। পাশ্চাত্য জ্ঞানভাণ্ডার গবেষণায় ভরপুর। আর ভারতীয় জ্ঞানভাণ্ডারে প্রজ্ঞান বা যোগজ জ্ঞানের কথাই সুপরিস্ফুট। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ব্যতিরেকে কাহাকেও বিশ্বাস করিতে রাজী নহেন; প্রজ্ঞানী বলেন, "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি", "বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর"। এইখানেই বিজ্ঞানের সহিত প্রজ্ঞানের বিরোধ। পথের বিভিন্নতায় এরূপ বিরোধ স্বাভাবিক। সরল বিশ্বাসীর পক্ষে বিজ্ঞানের পথে প্রবেশ সম্ভব নয়। আবার অবিশ্বাসীর পক্ষে প্রজ্ঞানের পথ রুদ্ধ। বৈজ্ঞানিক বলেন, প্রত্যেক সভ্য মানুষের মধ্যে কার্য্য-কারণ জানিবার যে কৌতুহল আছে তাহা পূরণের জন্য চেষ্টা কর, ক্রমশঃ সত্য জানিতে পারিবে। আর প্রজ্ঞানী বলেন,

সকল কারণের কারণ তোমার মধ্যেই আছেন এই কথা বিশ্বাস করিয়া নিজের স্বরূপ জানিতে চেষ্টা কর, নিজের আত্মাকে জানিলেই সকলকে জানিতে পারিবে, আর কিছু জানিবার বাকী থাকিবে না—"জ্ঞাতব্যং নাবশিষ্যতে"। বিজ্ঞান বস্তুতান্ত্রিক ও প্রজ্ঞান আত্মনিষ্ঠ। একের জ্ঞান গবেষণার উপর প্রতিষ্ঠিত, অপরের জ্ঞান প্রত্যক্ষানুভূতির উপর স্থাপিত। বিজ্ঞানের উদ্ভাবনী শক্তি দেখিয়া জগৎ আজ বিস্মিত। এক সময়ে প্রজ্ঞানেরও অদ্ভুত কার্য্য-কলাপ মানুষকে স্তম্ভিত করিত। ক্ষণমাত্র ধ্যানস্থ হইয়া ভূত-ভবিষ্যতের সংবাদ বলা, এক গণ্ডূষ জলে মৃতব্যক্তির প্রাণদান প্রভৃতি কত কথাই শোনা যায়। মহারাজ রণজিৎ সিংহের সময়ে ম্যাক্‌গ্রেগর প্রভৃতি সাহেবের সম্মুখে হরিদাস সাধুকে ৪০ দিন এক বাক্সের মধ্যে চাবি বদ্ধ করিয়া মাটিতে পুঁতিয়া রাখা হইয়াছিল, ৪০ দিন পরে দেখা গেল তাঁহার মৃত্যু হয় নাই। একথা "যোগী গুরু" গ্রন্থে লেখা আছে। ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্যজনক কথা তাঁহার জীবনীতে দেখা যায়। কাশীতে ভাস্করানন্দ স্বামীকে কোন ভক্ত প্রণাম করিতে গেলে স্বামীজী তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়াই বলিয়াছিলেন, প্রণাম করিও না, তোমার অশৌচ হইয়াছে, বাড়ী যাও। সে বাসায় ফিরিয়া অনুরূপ টেলিগ্রাম্ পায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিদ্বান ছিলেন না কিন্তু তিনি সামান্য কথায় যে সকল উপদেশ দিয়াছেন তাহা অসাধারণ জ্ঞানের পরিচায়ক। পুস্তকের বিদ্যাব্যতিরেকেও এ জ্ঞান কোথা হইতে আসে? এই সে দিনও কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে নরসিংহ স্বামী অনিবার্য্য মৃত্যুদায়ক বিষাদি ভক্ষণ করিয়া অধ্যাপক সি ভি রমন প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণকে অবাক্ করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে—বিজ্ঞান যেমন মানুষকে স্তম্ভিত করিতে পারে, প্রজ্ঞানও সেইরূপ চমৎকৃত করে। অবশ্য বিজ্ঞানপথ-যাত্রিগণের বিজ্ঞানের মাহাত্ম্য যতটা গৌরবের বস্তু, প্রজ্ঞানপথের পথিকগণের পক্ষে বিভূতিপ্রদর্শন ততটা গৌরবের বিষয় নয়। তাহা হইলেও অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় বিজ্ঞান নানাবিধ যন্ত্রের সাহায্য লইয়াও যাহা পারে নাই, প্রজ্ঞান বিনা সাহায্যে তাহা পারিয়াছে।

বর্ত্তমানে বিজ্ঞানের প্রাধান্যে প্রজ্ঞান চাপা পড়িলেও প্রজ্ঞান উপেক্ষার বস্তু নয়। বহু দুরারোগ্য রোগীকে ধন্না দিয়া ঔষধ পাইতে ও রোগমুক্ত হইতে অনেকে দেখিয়াছেন। বিজ্ঞ চিকিৎসা-বিজ্ঞানবিৎ চিকিৎসকগণের বহু চেষ্টায় যে রোগীর আরোগ্য সম্ভব হয় নাই তাহা প্রজ্ঞানীর উপদেশদ্বারা সম্ভব হইয়াছে। বিজ্ঞানের ফল সর্ব্বসাধারণ ভোগ করিতে পারেন, আর প্রজ্ঞানের ফল ভোগ করেন সাধক নিজে। বৈজ্ঞানিক যতটুকু জানে, ততটুকু জানাইতে ও কাজে লাগাইতে পারেন এবং তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট ও গৌরবান্বিত। কিন্তু প্রজ্ঞানী অল্প অল্প করিয়া জানিতে বা জানাইতে চান না, তিনি চান একেবারে মূল উৎসে যাইয়া সকল জানিতে ও পাইতে। এই জন্য অল্পে তুষ্ট সাংসারিকের পক্ষে প্রজ্ঞান অপেক্ষা বিজ্ঞানই অধিকতর প্রিয়। যাহা হউক, বিজ্ঞান বড় কি প্রজ্ঞান বড়, সে মীমাংসা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। আমি এই প্রবন্ধে কেবল দেখাইতে চাই যে, বিজ্ঞানই একমাত্র সত্যের পরিমাপক নয়। যুক্তি-তর্ক-বিচার-গবেষণা ব্যতীতও সত্যজ্ঞান লাভ করা যায়।

বিজ্ঞানকে জড়তত্ত্ব ও প্রজ্ঞানকে চেতনতত্ত্ব বলে। জড়তত্ত্বের বহু বিভাগ আছে এবং প্রত্যেক বিভাগেই বহু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। যে বিষয়গুলি বিজ্ঞানের সাহায্যে জানিতে হয় উহাদিগকে শাস্ত্রকারগণ অপরাবিদ্যা বলেন। প্রত্যক্ষ অনুমানাদির ভিত্তিতে এই বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু কেবল প্রত্যক্ষ অনুমানাদির দ্বারা জ্ঞানের

পূর্ণতা সাধিত হয় না। জড়ের অভ্যন্তরে যে চিৎশক্তির ক্রিয়া চলিতেছে, সেই চেতনতত্ত্ব বা ব্রহ্মবিদ্যা জানিবার প্রয়োজন আছে। সেই জন্যই প্রজ্ঞানের আবশ্যকতা। জড় হইতে চেতনের উৎপত্তি হয় নাই বলিয়া জড়তত্ত্বে বিজ্ঞ হইলেও কাহারও চেতনতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান না জন্মিতেও পারে। কিন্তু আত্মজ্ঞ পুরুষের নিকট জড়তত্ত্বের জ্ঞান অজ্ঞাত থাকে না। ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারাই সকল বিদ্যার প্রতিষ্ঠা হয়।

যতক্ষণ মানুষ চেতনতত্ত্ব আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্ম-বিদ্যার সাহায্যে সেই প্রজ্ঞানঘন পুরুষের সাক্ষাৎকার লাভ না করে, ততক্ষণ তাহাকে প্রত্যক্ষ-অনুমান-যুক্তির উপর নির্ভর করিয়াই চলিতে হয়। কিন্তু বিজ্ঞানকে একমাত্র সত্যের সাক্ষ্যরূপে স্বীকার করিলে সত্যং শিবং সুন্দরম্-কে পাওয়া যায় না। এই কারণে আমাদের প্রত্যক্ষ শাস্ত্র আয়ুর্ব্বেদ যে চারিটী প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন তাহার প্রথমটি আপ্তবাক্য এবং প্রত্যক্ষ অনুমান যুক্তির স্থান উহার পরে। আয়ুর্ব্বেদ প্রত্যক্ষ শাস্ত্র হইয়াও কেন আপ্ত-বাক্যকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিলেন তাহার উত্তর আয়ুর্ব্বেদেই আছে। প্রত্যক্ষ অনুমানাদি সকলক্ষেত্রে সত্য নির্ণয় করিতে কেন পারে না আয়ুর্ব্বেদ তাহার বহু কারণ দেখাইয়া শেষে আপ্তবাক্যকে মান্য করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ঈশ্বরতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব, পরলোকতত্ত্ব প্রভৃতিতে এমন অনেক অপ্রত্যক্ষ বিষয় আছে যাহা প্রথমতঃ আপ্তবাক্যে বিশ্বাস ব্যতীত জানিবার উপায় নাই। আপ্তপুরুষ বা ঋষিগণ যোগবলে অসাধারণ জ্ঞানের সাহায্যে আমাদের পক্ষে দুর্জ্ঞেয় বহু তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছেন যাহা আমরা অনেক সময় বুঝিতে বা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। বেদ বেদান্ত প্রভৃতি ঐ প্রজ্ঞানের ফল বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। এখন দেখা যাক আপ্তপুরুষের লক্ষণ কি এবং কেনই বা আপ্তপুরুষের বাক্য বিশ্বাস করিব ?

আপ্তের লক্ষণ, যথা—

যেষাং ত্রৈকালমমনং জ্ঞানমব্যাহতং সদা
আপ্তাঃ শিষ্টা বিবুদ্ধাস্তে তেষাং বাক্যমসংশয়ং।
সত্যং বক্ষ্যন্তি যে কস্মাৎ অসত্যং নীরজস্তমাঃ॥

অর্থাৎ যাঁহারা জ্ঞান ও তপোবলে রজঃ ও তমোগুণ হইতে নির্ম্মুক্ত, যাঁহারা ত্রিকালজ্ঞ, যাঁহাদের নির্ম্মল জ্ঞান সর্ব্বদা অব্যাহত, তাঁহা-দিগকেই আপ্ত বা জ্ঞানী বলে। তাঁহাদের বাক্যে কোন সংশয় নাই। রজো ও তমোগুণ হইতে যিনি মুক্ত তিনি মিথ্যা বলিবেন কি প্রকারে ? কোন একটা জিনিস দগ্ধ হইতেছে বলিলে যেমন সেখানে অগ্নির ক্রিয়া হইতেছে বোঝা যায়, অগ্নি ব্যতিরেকে দগ্ধ হইতে পারে না, সেই রকম মিথ্যার উৎপত্তি রজো এবং তমোগুণ ব্যতিরেকে হইতে পারে না। যাঁহার রজঃ এবং তমোগুণ সত্ত্বগুণের দ্বারা অভিভূত হইয়াছে, তিনি যাহা বলিবেন, যাহা করিবেন, তাহা সত্যই হইবে, সত্য হইতে বাধ্য। অগ্নি না থাকিলে কোন দ্রব্য দগ্ধ হইতে পারে না, একথা যেমন সত্য, ইহাও সেই রকম সত্য। মানুষের ভ্রম-প্রমাদের সম্ভাবনা সেখানেই বেশী, যেখানে কামনা বাসনা সংস্কাররঞ্জিত মন দিয়া সে বুঝিতে চেষ্টা করে, যেখানে মানুষ কাম ক্রোধ লোভ মোহের দ্বারা অভিভূত, সেখানে সত্যের প্রকাশশীলতা রুদ্ধ থাকে। সেইজন্য সত্যকাম পুরুষকে প্রথমেই সংযম শিখিতে হয়। মমতা অহংকার পরিত্যাগ করিয়া নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সেই সত্যস্বরূপ প্রজ্ঞানঘন পুরুষের শরণাপন্ন হইতে হয়। ইহাতে সিদ্ধ হইলেই সত্যজ্ঞান সেই নির্ম্মল শান্ত চিত্তে স্বতঃই প্রকাশ হইয়া থাকে। আমাদের সাধারণ সসীম খণ্ড লৌকিক জ্ঞান সেই প্রজ্ঞানঘন

পুরুষের অস্ফুট বিকাশ মাত্র। কামনা বাসনা সংস্কার স্বার্থ অহমিকা আমাদিগের জ্ঞানের সীমা ক্ষুদ্র করিয়াছে। উহাদিগকে সরাইতে পারিলেই আমাদের ক্ষুদ্রতা চলিয়া যায়। এই কার্য্যে আমরা যতটা অগ্রসর হইতে পারি, জ্ঞানও সেই পরিমাণে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। তাহার জন্ম সাধনা আবশ্যক, নতুবা কেবল প্রতিভা বা বুদ্ধি সত্যং শিবং সুন্দরম্-কে দর্শন করাইতে পারে না। প্রতিভাবান মানুষেরই যথার্থ সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বকালিক সত্যের স্বরূপ জ্ঞান লাভ হয় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপে গীতার উল্লেখ করা যায়। গীতা সত্যজ্ঞানের আধার বলিয়া সর্ব্বজনমান্য। কিন্তু ইহা কোন বুদ্ধি বা বিদ্যাবলে সৃষ্ট হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ যখন উপদেশ দিয়াছিলেন তখন তাঁহার মনুষ্যবুদ্ধি ছিল না, ব্রহ্মভাবে আবিষ্ট হইয়া বিরাটের সহিত মিশিয়া গিয়াছিলেন। অনুগীতাতে দেখা যায় যুদ্ধের পর অর্জ্জুন পুনরায় পূর্ব্বপ্রদত্ত উপদেশ-শ্রবণে ইচ্ছুক হইলে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, তখন যোগযুক্ত অবস্থায় থাকিয়া তোমাকে উপদেশ দিয়াছিলাম—

পরং হি ব্রহ্ম কথিতং যোগযুক্তেন তন্ময়া।
ন চ সাদ্য পুনর্ভূয়ঃ স্মৃতির্মে সম্ভবিষ্যতি॥

অহঙ্কারের গণ্ডী দিয়া বিরাট পুরুষের নিকট হইতে, মহাজনের স্পর্শ হইতে, নিজেকে পৃথক্ করিয়া ফেলিলে মানুষ এত দুর্ব্বল ও ক্ষুদ্র হইয়া যায় যে কোন বড় বস্তুকে আর ধারণা করিতে পারে না। তাঁহার বিচার-বুদ্ধি তখন স্বার্থের অনুকূলে সংস্কারের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। কামক্রোধাদি দ্বারা অনভিভূত সংস্কার-বর্জ্জিত জ্ঞানোজ্জ্বল বিশুদ্ধ চিত্তে সত্যের স্বয়ং প্রকাশ হয়, কোন বাহিরের চেষ্টায় হয় না।

প্রকৃত কথা এই যে, সত্যজ্ঞান বুদ্ধির পরিচালনায় যতটা হয়, তাহা অপেক্ষা বেশী হয় মনের স্থিরতায়। মনের স্থিরতা তখনই জন্মায় যখন রজঃ ও তমোগুণের প্রভাব বা বৃত্তি হইতে মনকে মুক্ত করা সম্ভব হয়। ভগবদভিমুখীনতা ব্যতিরেকে উহা সম্ভব হয় না। বিজ্ঞান মানুষকে ভগবন্মুখী করিতে অক্ষম। অনেকের ধারণা যে যুক্তি-বিচার-দ্বারা যে জ্ঞান লাভ হয় তাহাই চরম জ্ঞান বা চরম সত্য। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের সাধক শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন, "সকল জ্ঞেয়কে যখন অতিক্রম করিব তখনই হইবে জ্ঞান।"

বিজ্ঞান বহির্জগতের বহু কল্যাণ সাধন করিয়াছে ও করিবে। তাহার অকল্যাণ করিবারও যথেষ্ট শক্তি আছে। বৈজ্ঞানিক যুদ্ধ লক্ষ লক্ষ সংসারে হাহাকার সৃষ্টি করিয়াছে। আমরা যদি বিজ্ঞানের শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে কল্যাণের পথে নিয়োজিত করিতে চাই, তাহার অশিব অসুন্দর মূর্ত্তিকে শিবসুন্দর মূর্ত্তিতে পরিণত করিবার আশা পোষণ করি, তাহা হইলে আমাদিগকে বিজ্ঞানের ন্যায় প্রজ্ঞানেরও শরণাপন্ন হইতে হইবে। কেবল বিজ্ঞানের পথে ভিড় জমাইলে চলিবে না। কারণ, ইহাতে কেবল জ্ঞানের একটা দিক দেখা যাইবে, অপর দিক দেখা যাইবে না। আমি বলিতে চাই যে, বিজ্ঞানেই জ্ঞানের আরম্ভ ও তাহার পরিসমাপ্তি প্রজ্ঞানে। বিজ্ঞানের প্রধান কার্য্য বহির্জগতের উন্নতি বিধান ও প্রজ্ঞানের প্রধান উদ্দেশ্য অন্তর্জগতের চরম উন্নতি চিরশান্তি বা মুক্তি। সুতরাং কোনটীকে বাদ দিয়া সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল অসম্ভব। জাগতিক সুখে ও ব্রহ্মানন্দে যে প্রভেদ, বিজ্ঞানে প্রজ্ঞানেও সেইরূপ। বিজ্ঞান বাহ্য কারণোদ্ভূত ও প্রজ্ঞান স্বয়ংপ্রকাশশীল। জগতে বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞান উভয়েরই প্রয়োজন আছে। যতদিন আমরা চিত্ত-শুদ্ধি দ্বারা সেই দিব্য জ্ঞানের অধিকারী হইতে না পারি—ঈশ্বরে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণের ক্ষমতা ততদিন পর্য্যন্ত না হয়, ততদিন বাঁচিয়া থাকিবার জন্য জাগতিক উন্নতিবিধানকল্পে বিজ্ঞানের পথে

প্রত্যক্ষ অনুমান যুক্তি বিচার বিশ্লেষণ গবেষণা পরীক্ষা প্রভৃতির সাহায্যে যথাসম্ভব সতর্ক বুদ্ধি লইয়া চলিতে হইবে। কিন্তু উহাকেই চরম মনে করিয়া জড়বাদের পশ্চাতে ছুটিতে থাকিলে সত্য শিব সুন্দরের পরিপূর্ণ মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যাইবে না। আমরা প্রত্যক্ষশাস্ত্র বিজ্ঞানের প্রতি অতিবিশ্বাসী হইয়া অপ্রত্যক্ষ-শাস্ত্র প্রজ্ঞানকে অবিশ্বাস করিতে শিখিতেছি। বালক যদি তাহার অভিভাবকের উপদেশমত বর্ণমালা মুখস্থ না করে, তাহা হইলে বিদ্যালাভ তার পক্ষে যেমন অসম্ভব, তেমনি অধ্যাত্ম-জগতের জ্ঞানরাজ্যে আমরা অতি শিশু হইয়াও যদি পূর্ব্বাচার্য্যগণের উপদেশ মত না চলি, সাধনাপথে অগ্রসর না হই, তত্ত্বজ্ঞান লাভ না করি, তাহা হইলে আমাদিগকে এই মরজগতের অন্ধকারেই ঘুরিতে হইবে। পূর্ণ জ্ঞানসূর্য্যের স্বতঃ প্রকাশ হৃদয়াকাশে কখনও হইবে না, শতজন্মেও বন্ধনমুক্তি হইবে না।

বিজ্ঞানকে অবহেলা করিলেও চলিবে না। কারণ, বিজ্ঞান জাগতিক উন্নতির মূল। তবে বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রজ্ঞানের প্রভাব বৃদ্ধি না পাইলে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা হইবে না। বিজ্ঞান ভোগবাদকে সংযত করিতে, সাম্রাজ্য-বাদ ধ্বংস করিতে, প্রভুত্বপ্রিয়তা নাশ করিতে, প্রেমের বিস্তৃতি সাধন করিতে, প্রবলের অত্যাচার রোধ করিতে পারে নাই, পারিবেও না। সকল অশান্তির মূল উচ্ছেদ করিবার ক্ষমতা একমাত্র প্রজ্ঞানের আছে। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়।" এইজন্য বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে যেমন বিরাট প্রচেষ্টা, বহুল অর্থব্যয় ও মস্তিষ্ক-পরিচালনা চলিতেছে, সেইরূপ প্রজ্ঞানেরও উন্নতিকল্পে বিরাট সাধনাক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া একদল সাধক যদি একাগ্রমনে সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে পারেন তাহা হইলে উভয়ের সমবায়ে সকল সমস্যার সমাধান হইবে। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আচার্য্য জগদীশচন্দ্র তাঁহার বসুবিজ্ঞান-মন্দির-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে বলিয়াছিলেন, "আজ যাহা প্রতিষ্ঠা করিলাম, তাহা মন্দির, কেবল পরীক্ষাগার নহে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্য পরীক্ষা দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়, কিন্তু ইন্দ্রিয়েরও অতীত মহাসত্য আছে, তাহা লাভ করিতে হইলে কেবলমাত্র বিশ্বাস আশ্রয় করিতে হয়। বিশ্বাসের সত্যতা সম্বন্ধেও পরীক্ষা আছে। তাহা দুই একটী ঘটনা দ্বারা হয় না। তাহার প্রকৃত পরীক্ষা করিতে সমগ্র জীবনব্যাপী সাধনা আবশ্যক। সেই সত্য প্রতিষ্ঠার জন্যই মন্দির উত্থিত হইয়া থাকে।" এইজন্য বলি, বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞান উভয় পথেরই আবশ্যকতা আছে। বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞান পাশাপাশি চলুক, "অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে" এই ঋষিবাক্যের মহিমা জগতে বিঘোষিত হউক।

"বাকী আছে জীবনের বহু পরিচয়"

শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ

বাকী আছে জীবনের বহু পরিচয়,
অদূর ভবিষ্যে যারা একে একে আসি',
এ জীবনে এঁকে দেবে আলোছায়াময়,
কি বিচিত্র চিত্রপটে হাসিকান্নারাশি।
আমার প্রাঙ্গণে শুনি' পদধ্বনি জাগে,
অনাগত দিবসের অস্ফুট আভাস ;
অতীতের পত্র-ঝরা দিনান্তের রাগে
নূতনের সূচীপত্র হ'বে কি প্রকাশ ?

আশীর্বাদে অভিশাপে তুলিয়াছি ভরি'
সীমাহীন কাল হ'তে সীমায়িত প্রাণে
কত না দানের বোঝা। ভাসায়েছি তরী
এই কূল হ'তে আজি অন্য কূল পানে।
দিগন্তের কোন পারে ওগো কর্ণধার,
কোন তীরে তরী মোর ভিড়িবে এবার।

শ্রীম-স্মৃতি

অধ্যাপক শ্রীগোকুলদাস দে

বিশ্ববরেণ্য স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত প্রথম পাইয়া পূজ্যপাদ শ্রীম-কে লিখিয়াছিলেন, "আমাদের প্রত্যেককেই নূতন আদর্শ গড়িতে হইবে, অন্যথা আমরা কিছুই হইব না। কারণ, আমাদের গুরুদেব সম্পূর্ণ নূতন ভাবেই জগতে আসিয়াছিলেন। আপনার 'কথামৃত' এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ। জগতে ইতঃপূর্ব্বে আর কেহ নিজের মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া কোন মহাপুরুষের বাণী এমন ভাবে আলোচনা করেন নাই। এই বৃহৎ কার্য্য প্রভু আপনার জন্যই নির্দ্দিষ্ট রাখিয়াছিলেন।" শুধু তাঁহার 'কথামৃত' কেন, মাষ্টার মহাশয়ের প্রত্যেক ব্যাপার, তাঁহার সমগ্র জীবন ও বাণী বাস্তবিকই অভিনব ছিল। আমরা তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যে ও কথায় উহাই দেখিতে পাই। সম্ভবতঃ ১৯১২ সালের প্রথমে মর্টন স্কুল ঈশ্বরেচ্ছায় আরও স্ফীত হওয়ায় আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের চারিতলা বাটীটি ছাড়িয়া অনতিদূরে অন্য একটী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ত্রিতল বাটী ভাড়া লওয়া হইয়াছিল। ইহাতে নীচের দিকের ক্লাসগুলি হইত। মাষ্টার মহাশয় দ্বিতলে নির্জনবাস করিতেন।

ভিতর হইতেই এই অংশটীর দ্বার সর্ব্বদাই বন্ধ থাকিত, এই জন্য সহজে কেহ তাঁহার নিকট আগমন করিতে পারিতেন না। কক্ষমধ্যে একটী ছোট তক্তাপোষে এলোমেলো ভাবে বিছানা ও একটী টেবিলে স্তূপাকারে পুস্তক খাতা প্রভৃতি রক্ষিত থাকিত এবং তাহাদের অবস্থিতির কোনই পরিপাটি ছিল না। কেহ আসিলে মেজেতে একটী মাদুর পাতা হইত এবং মাষ্টার মহাশয় এই মাদুরে বসিয়া তাঁহার সহিত ঈশ্বর-প্রসঙ্গ করিতেন। একাধিক ভক্ত সমাগম হইলে দালানে মাদুর বিছাইয়া কীর্ত্তনাদি হইত। শুধু পরিধানে এবং বিহারে নহে আহারেও তিনি অতি অনাড়ম্বর ছিলেন। এই সময় দেখিয়াছি—তাঁহার রাত্রের আহার ছিল একটু দুধ ও একখানি গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলের ছোট পাঁউরুটি। এই সময় তাঁহার আয় কোন বৃহৎ ধনী পরিবারের অপেক্ষা কম ছিল না। পালি ভাষার উপর তাঁহার বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তাঁহার স্কুলে পালি ভাষা পড়ান হইত এবং আমার নিকট হইতে একখানি 'কাচ্চায়ন' নামে পালি ব্যাকরণ লইয়া তিনি কিছুদিন যাবৎ এই কক্ষে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এই কক্ষেই একদিন আমার একটী মহাভুল তিনি সংশোধন করিয়াছিলেন। কথায় কথায় আমি আমাদের জাতির নিন্দাবাদ করিয়াছিলাম। বিষাক্ত কীট দংশন করিলে যেমন কেহ শিহরিয়া উঠে, মাষ্টার মহাশয় তেমনি করিয়া উঠিলেন এবং আমাকে বলিলেন, "তুমি ও কি বল্‌ছ? বাঙ্গালী কি জাত জান? দেবতার জাত। দেখ্‌ছ না মানুষ যেমন আত্মীয়, স্বজন, ছেলে, মেয়ে, মা, বাপ নিয়ে ঘর সংসার করে এরা সেই রকম ঠাকুর দেবতা নিয়ে নাড়া চাড়া করে, নাওয়ায় শোয়ায় খাওয়ায়, পূজা করে কত আনন্দ পায়। নিজেরা দেবতা না হলে কি দেবতা নিয়ে

এমন কেউ করতে পারে? যদি তা না হবে ত ঠাকুর কেন এদের মধ্যে জন্মেছিলেন?" আমি বলিলাম তাই হবে। বুদ্ধদেব শাক্যবংশে জন্মিবার আগে দেবতারা শাক্য হয়ে জন্মিয়াছিলেন এবং তাঁহারাই তাঁহার সংঘের প্রধান স্তম্ভ স্বরূপ ছিলেন। মাষ্টার মহাশয় বলিতে লাগিলেন—"দেখ, বেশী শিক্ষিত জাতিকে অল্প শিক্ষিত জাতি যেমন শাসন করতে পারে না, সেই রকম ইংরেজ বাঙ্গালীকে আর শাসন করতে পারচে না। অনেক কৌশল করবার চেষ্টা করচ, কিন্তু শেষে পারবে না। তুমি দেখো এই বাঙ্গালী কত বড় হয়!" নিজের জাতির উপর মাষ্টার মহাশয়ের অগাধ বিশ্বাস এবং ভালবাসা ছিল। তিনি চাহিতেন বাঙ্গালী যেন তাঁহার ভক্তি বিশ্বাস ও দেবভাব কখন ভুলিয়া না যায়। সংবাদপত্র-প্রসঙ্গে তিনি "অমৃতবাজার পত্রিকাকে" সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন দিতেন এবং বলিতেন—"এর লেখা বেশ রসান দিয়ে, মনটী বিরস থাকলে সরস হয়ে উঠে।" কিন্তু এই সব প্রসঙ্গ বেশীক্ষণ করিতেন না, সহসা বন্ধ করিয়া আবার ভগবৎপ্রসঙ্গ আরম্ভ করিতেন। ধর্ম্মভাবের সঞ্চার বেশীর ভাগ সঙ্গীতের দ্বারাই করিতেন। সন্ধ্যা হইলে কোন ভক্ত আসিয়া সন্ধ্যা দিতেন এবং তিনি সমস্ত কথা বন্ধ করিয়া অল্পক্ষণের জন্য নীরব থাকিয়া ইষ্ট মন্ত্র জপ করিতেন; পূজা আহ্নিক করিবার জন্য অন্য কোন স্থানে যাইতেন না। আবার ঈশ্বর-প্রসঙ্গ বা কীর্ত্তনাদি চলিত। তিনি বলিতেন "অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ—ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া অন্য কথা কহিবে না, কেননা শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছেন মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য একমাত্র ঈশ্বর লাভ। আর সমস্ত কার্য্য এই উদ্দেশ্যের অধীনে পরিচালিত হইবে।" যিশু খৃষ্টের কথায় বলিতেন "Seek ye first the kingdom of heaven and all of His things shall be added unto you."

১৯১২ সালের বি-এ পরীক্ষা দেওয়া বন্ধ হইবার পর হইতে নানা কারণে ১৯১৪ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত 'পাস করা' বিদ্যার প্রতি উদাসীন ছিলাম। বৈকালে প্রায় মাষ্টার মহাশয়ের কাছে যাইতাম এবং তিনি মনটা বেশ প্রফুল্ল করিয়া বিদায় দিতেন। পড়াশুনা আরম্ভ করিবার ইচ্ছা থাকিলেও আত্মীয়-স্বজন উহা হইতে নিবৃত্ত থাকিবার জন্য পরামর্শ দিতেন। কাজেই ওবিষয়ে মন দিই নাই। ১৯১৪ সালের জুলাই মাসে হঠাৎ মাষ্টার মহাশয়কে পুনরায় পড়িব কিনা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি নিরস্ত ত করিলেনই না, পরন্তু উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন "ভয় কি? কিছুমাত্র ভেবো না, উঠে লেগে যাও—The lion sleepeth and is not dead." তাঁহার সে বাণী মিথ্যা হয় নাই।

বেলুড় মঠ এবং দক্ষিণেশ্বর এই দুইটী স্থান তাঁহার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তীর্থ বলিয়া পরিগণিত হইত। ভক্তেরা এই দুই স্থান হইতে সোজাসুজি তাঁহার নিকট আসিলে তিনি সমস্ত কথা বন্ধ রাখিয়া তাঁহাদের নিকটে বসিয়া বলিতেন—"আহা! ধন্য তোমরা, ওখান থেকে আসছ, আমি অসমর্থ যেতে পারি না, তোমাদের সঙ্গ করে ধন্য হই।" আমরা হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিতাম। তাঁহার সেই অগাধ ভক্তি বিশ্বাসের কতটুকু পাইয়াছি যে এই কথাগুলির মূল্য বুঝিব? মাষ্টার মহাশয় নৌকায় বা ষ্টিমারে উঠিতেন না, সেইজন্য সাধারণতঃ বেলুড় মঠ বা দক্ষিণেশ্বরে যাইতে পারিতেন না। মাত্র তিথিপূজা বা উৎসবাদির সময়ে তিনি রেলে বেলুড়ে আসিতেন। মঠে সর্ব্বসাধারণে যখন প্রসাদ পাইতেন, মাষ্টার মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া তাহা দেখিতেন এবং বলিতেন, তিনি (ঠাকুর) বহুমুখে খাচ্ছেন বেশ দর্শন হয়। বৃহৎ জনতা দৃষ্টে বলিতেন—বেশী লোক একসঙ্গে

দেখ্‌লে ঈশ্বরের উদ্দীপন হয়। একবার স্বামী বিবেকানন্দের তিথিপূজার দিন মঠে মাষ্টার-মহাশয়ের পার্শ্বে বসিয়া প্রসাদ পাইতেছিলাম, তাঁহার অপর পার্শ্বে Mr. Francis নামক স্বামিজীর একজন মার্কিণ শিষ্যও ছিলেন। মাষ্টার মহাশয় অত্যন্ত আচার-বিচারী বলিয়া তাঁহার দিকে আমি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিতেছিলাম। তিনি আমার দিকে ফিরিয়াই বলিলেন, "দেখ, ঠাকুর বল্‌তেন ভক্তদের জাত নাই।"

'উদ্বোধনে'র উপর মাষ্টার মহাশয়ের সম্প্রীতি শ্রীশ্রীমার আগমন হইলেই বুঝা যাইত। এই সময়ে তিনি ঘন ঘন আসিতেন, কিন্তু অন্য সময়ে মোটেই আসিতেন না। উদ্বোধনে আমাকে দেখিতে পাইলে বলিতেন "বসন্তকাল এলেই কোকিল আসে"। শ্রীশ্রীমাকে মাষ্টার মহাশয় সাক্ষাৎ জগজ্জননী বলিয়া জ্ঞান করিতেন। ইহার পরিচয় দিতেন তিনি তাঁহার অসাধারণ আচরণে। ভক্তেরা শ্রীশ্রীমার দর্শন ও প্রণামাদির আশায় নীচে বসিয়া অপেক্ষা করিতেন কিন্তু মাষ্টার মহাশয় আসিয়াই উদ্বোধনের নীচে উঠানে ভূমিতে মস্তক স্পর্শ করিয়া শ্রীশ্রীমার উদ্দেশ্যে নয়নাশ্রুতে আপ্লুত হইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত প্রণাম করিতেন। পরে সময় হইলে উপরে যাইয়া দর্শন করিতেন। দেখিয়াছি শ্রীশ্রীমাও শিশুকে যেভাবে সকলে দেখেন সেই ভাবেই তাঁহাকে দেখিতেন। মাষ্টার মহাশয়ের মুখে মা শ্রীহস্ত স্থাপন করিয়া চুম্বন করিতেন। বৃদ্ধ মাষ্টার মহাশয় কি করিয়া শ্রীশ্রীমার নিকট শিশু হইতেন তাহা যিনি না দেখিয়াছেন তিনি বিশ্বাস করিবেন না। সাধারণতঃ 'প্রসাদ' অর্থে বুঝাইয়া থাকে যে দ্রব্য ভগবান গ্রহণ করিয়াছেন এবং যাহার অবশিষ্ট গ্রহণ করিলে ভগবান প্রসন্ন হইয়া লোকের কল্যাণ করেন। মাষ্টার মহাশয় একদিন উদ্বোধনে গম্ভীরভাবে বুঝাইয়া দিলেন—"প্রসাদ মানে কি জান? প্রসাদ অর্থাৎ তিনি প্রসন্ন হয়েছেন, পরে হবেন নয়।" মাষ্টার মহাশয় শ্রীভগবানকে আপনার হইতে আপনার করিবার জন্য কতই না চেষ্টা করিতেন!

গঙ্গার ঘাটে উপস্থিত হইয়া বহুক্ষণ ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেন এবং তিনি যে মা গঙ্গাকে সাক্ষাৎ ভগবতী জ্ঞান করিতেন তাহা একদিনের কথাতে বুঝিতে পারিলাম। এইঘাটে একদিন বলিলেন যেন মা গঙ্গা যিশুর কথায় বলিতেছেন "Come unto me all ye that labour and are heavy laden and I will give you rest." তখন দলে দলে মজুরগণ সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর ক্লান্তদেহে গঙ্গায় অবগাহন করিয়া শ্রান্তি দূর করিয়া গৃহে ফিরিতেছিল। আমরা প্রতিদিনই ত এই ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া থাকি কিন্তু কয়জন ভাবিয়া থাকি ইহার ভিতর দেবী সুরেশ্বরীর করুণার আহ্বান বহিয়া যাইতেছে? স্কুল সম্পর্কে মাষ্টার মহাশয়ের বিস্তৃত কার্য্যকলাপের পরিচয় পাইবার তত সুবিধা পাই নাই। তিনি শৃঙ্খলার (discipline) বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। একদিন একটী বালককে অফিস ঘরে বসাইয়া রাখিয়া আমায় বলিলেন "This boy is not amenable to discipline." উচ্চপদস্থ ব্যক্তির আজ্ঞা নিম্নপদস্থ ব্যক্তি সর্ব্বান্তঃকরণে পালন করিবে ইহাই ছিল তাঁহার অভিপ্রায়। আধুনিক গণতন্ত্রবাদকে তিনি রহস্য করিয়া 'Mobocracy' অর্থাৎ গুণ্ডাতন্ত্র বলিতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত স্কুলকমিটির গঠন ব্যাপার লইয়া তাঁহার মতভেদ হয়, তজ্জন্য কর্ত্তৃপক্ষ স্কুলের affiliation নাকচ করেন। তিনি হৃষ্টচিত্তে তাহা স্বীকার করিয়া স্কুলের উপরকার দুইটী ক্লাস তুলিয়া দেন। ইহাতে তাঁহার আয় অনেক কমিয়া যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত কেন তিনি একমত হইলেন না জিজ্ঞাসা করায় বলিয়াছিলেন, "স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে কে বাঁচিতে চায়!"—মাষ্টার মহাশয় শেষ পর্য্যন্ত আপনার মত ও ভাব বাহাল রাখিয়াছিলেন।

পরিবারবর্গ বা আত্মীয়-স্বজনের উল্লেখ কথাচ্ছলেও তাঁহার নিকট শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। কখন যদি করিয়াছেন ত এমন ভাবে বলিয়াছেন যেন তাঁহারা কত দূরের লোক। একদিন মাষ্টার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র এক তাড়া দশ টাকার নোট হাতে লইয়া স্কুলের উঠানে পাইচারি করিতেছিলেন, দ্বারবান তাঁহার ব্যাগ আনিবার জন্য উপরে গিয়াছে, তিনি ব্যাঙ্কে যাইয়া টাকা জমা দিবেন। মাষ্টার মহাশয় তাঁহাকে দেখাইয়া বলিলেন "দেখ্‌চ, টাকার কি গরম! হাতে পড়েচে ত আর স্থির থাক্‌তে দেবে না! ঐ দেখ, একবার এদিক্ একবার ওদিক করছে! টাকা কি কম জিনিস গা? ছেলে এইজন্যে বাপকে shoot করে!" আমি অবাক্ হইয়া রহিলাম এই ভাবিয়া যে, সাধারণ পিতা কৃতী পুত্রের দুর্ব্বলতাকে দৃষ্টান্ত করিয়া কখন উপদেশ দেন না। তিনি কোন্ ধারণার মূলে এই সর্ব্বগুণান্বিত পুত্রকে বাহিরের লোক বলিয়া মনে করিলেন? মাষ্টার মহাশয়ের ভজনগীত ও ভক্তদের লইয়া কীর্ত্তনাদি বরাবর সমভাবেই চলিত। সন্ধ্যার পর মর্টন স্কুলের চারিতলার ছাদে বা পুরাতন ঠাকুর বাটীর ছাদে এই অনুষ্ঠান হইত। কখন কখন একান্তে শ্রীশ্রীকথামৃতের উক্তি ছাড়া নিজের এবং স্বামিজীর সম্পর্কে অনেক কথা বলিতেন। উহাদের সমস্তগুলি উল্লেখ করা সম্ভব নয়, যেগুলি বিশেষভাবে হৃদয় মন অধিকার করিয়াছে সেইগুলি উল্লেখ করিতেছি। মাষ্টার মহাশয় বলিয়াছিলেন—"দেখ, যারা কোনদিন আন্তরিক ঈশ্বরকে ডেকেছে তাদের তাঁর (ঠাকুরের) কাছে আসতেই হবে।"

"ভক্তরা নিজের নিজের জীবনী খুলে বল্লেই তুমি বুঝতে পারবে আমরা কি করেছিলাম? সংসারের জ্বালায় অস্থির হয়ে ঈশ্বরকে ডেকেছিলাম, আর ঈশ্বর নাই মনে কোরে আত্মহত্যা কর্‌তে গিছলাম। তাই ঠাকুর দেখা দিয়েছিলেন।"

"এই পৃথিবী পড়ে রয়েচে, মানুষ বেড়াচ্চে যেন পোকা! এ দেখে তুমি কি কর্ত্তব্য স্থির কর্‌বে? তাঁকে কেঁদে কেঁদে ডাক, তিনি দর্শন দেবেন, তখন তুমি কি কর্ত্তব্য বুঝতে পার্‌বে।"

"দেখ, আমারও মনে হয় যে মাথায় একটা পাগড়ী বেঁধে বক্তৃতা দিই। কিন্তু তাতে কি হবে? তিনি যে লোকের মনগুলোকে চোক ঠেরে বলে দিয়েছেন তোমরা এই করগে। তারা তাই কর্‌বে। কে তোমার বক্তৃতা শুন্‌বে? স্বামীজি 'চাপ্‌রাশ' পেয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তিনি (অন্তর থেকে) বুঝিয়ে দিলে তবে মানুষ শুন্‌বে।" আর একদিন বলিয়াছিলেন, "Different ideology নিয়ে মানুষ ঝগড়া করে, কিন্তু তাঁকে জানলে সব জানা হয়, for all contradictions meet in Him."

"মঠে পুরাতন ঠাকুর ঘরের সামনে কাঁটাল গাছ দেখেছ? তার তলায় একখানি বেঞ্চ পাতা থাকতো, স্বামিজী প্রায়ই সেখানে বসতেন। একদিন আমায় ঐ বেঞ্চে বসে বলছেন 'মাষ্টার মহাশয়, ওরা (পাশ্চাত্য) আমাকে ছুয়ে নিয়েছে! এ শরীরে আর কিছু নাই!' তখন তাঁর দেহ অসুস্থ, তিনি জানিয়ে দিলেন এ আর থাক্‌বে না।" এই বলিয়া মাষ্টার মহাশয় অশ্রুপূর্ণ নয়নে কি ভাবিলেন এবং পর মুহূর্ত্তেই বলিলেন "তুমি মনে করছ এঁরা সব চলে গেছেন! তা নয়, আমাদের আবার দেখা হবে!"

নাথাচার্য্যগণের সময়

শ্রীসুরেশ চন্দ্র নাথ-মজুমদার

মহামহোপাধ্যায় হর প্রসাদ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন —"আজকাল যোগীরা পবিত্র যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ হওয়ার চেষ্টায় আছেন। অতীতে তাঁহারা যে কি ছিলেন তাহা তাঁহারা জানেন না। যে গৌরবান্বিত মহাবংশে মৎস্যেন্দ্র নাথ, গোরক্ষ নাথ, চৌরঙ্গী নাথ প্রমুখ আচার্য্যগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাঁহারাও সেই নাথবংশ-জাত প্রকৃত যোগী ছিলেন। তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগের অসংখ্য শিষ্য ছিল। রাজা মহারাজারাও ইঁহাদের চরণ বন্দনা করিতেন। নেপাল ও তিব্বতের মন্দিরে মন্দিরে আজও অনেক নাথের পূজা অর্চ্চনা হয়। গোরখা জাতি আজও গোরক্ষ নাথকে তাহাদের জাতীয় দেবতা বলিয়া পূজা করে" (Introduction to Modern Buddhism)। ঢাকা মিউজিয়মের অধ্যক্ষ ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী লিখিয়াছেন—"নাথসিদ্ধাগণের সময় নির্ণয় করা বাঙ্গালাদেশের সাহিত্যের এবং ইতিহাসের জন্য অত্যন্ত দরকার। কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণের অভাবে কাজটি অদ্যাবধি সুসম্পন্ন হইয়াছে বলা যায় না। বিখ্যাত সিদ্ধাগণের একজনেরও সময় অবিসংবাদিরূপে নির্ণীত হইলে অন্য সকলের সময়ের একটা নির্ভরযোগ্য অনুমান পাওয়া যায়" (গোপীচাঁদের সন্ন্যাস—৬০ পৃঃ)। আমরা এখন এ সম্বন্ধে চেষ্টা করিব।

নাথাচার্য্যগণের মধ্যে মৎস্যেন্দ্র (মীন) নাথ, গোরক্ষনাথ, জালন্ধর বা হাড়িফা নাথ, কানুপা বা কৃষ্ণাচার্য্য নাথই সমধিক প্রসিদ্ধ। ইঁহাদের মধ্যে গোরক্ষ নাথের গুরু হইলেন মৎস্যেন্দ্র নাথ এবং কানুপার গুরু হইলেন জালন্ধর বা হাড়িফা নাথ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত গোরক্ষ বিজয়ে আছে—

"নাভিতে জন্মিল মীন গুরু ধন্বন্তরি
সাক্ষাতে সিদ্ধার ভেস অনন্ত মুরারী।
হাড়িফার জন্ম হৈল হাড় হোতে
সর্ব্বাঙ্গে সিদ্ধার ভেস দেখিয়ে সাক্ষাতে।
কণ্ঠ হোতে জন্মিল কানুপা জোগাই
অতি খরতর হৈল গাভুর সিদ্ধাই।
জটা ভেদি নিকলিল যতি গোরখ নাথ
সিদ্ধ ঝুলি সিদ্ধ কাঁথা তাঁহার গলাত।"

—(গোরক্ষ বিজয়)

এ হইল ইহাদের জন্মবিবরণ। তৎপরে সংসারে আসিয়া—

"মীন নাথের চাকরী করে যতি গোরখাই
হাড়পার সেবা করে কানুপা গোসাই।"

—(গোরক্ষ বিজয়)

"হাড়িপার চেলা নাম কানুফা জোগিয়া।"

—(গোবিন্দ চন্দ্র গীত, ৫৭৫ শ্লোক)

হাড়িফা আইল যার নাম জলন্ধর॥"

* * * *

"হাড়ি নহে হাড়ি নহে হাড়িফা জলন্ধর।"

—(ভট্টশালীর গোপীচাঁদের সন্ন্যাস)

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত গোরক্ষ বিজয়, ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী-সম্পাদিত ও ঢাকা সাহিত্য পরিষদ-কর্ত্তৃক প্রকাশিত মীন-চেতন, গোপী চাঁদের সন্ন্যাস প্রভৃতি নাথ-সাহিত্যের প্রামাণিক গ্রন্থাদি পাঠ করিলে সন্দেহ মাত্র থাকে

না যে ইঁহারা সমসাময়িক। এখন মৎস্যেন্দ্র নাথের সময় বিচার করা যাক। নিঃসন্দেহে ইঁহার সময় নির্ণয় করিতে পারিলে অন্যান্য সিদ্ধাদের সময় নির্ণয় সহজসাধ্য হইতে পারে।

শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ 'সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীক'এর চতুর্বিংশতি অধ্যায়ে এবং ইহার পরবর্ত্তী ধর্ম্মশাস্ত্র 'করণ্ডব্যূহে' দেখা যে বুদ্ধদেব মীন নাথের স্তুতি গান করিতেছেন। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে মীন নাথ বুদ্ধদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী বা সমসাময়িক ছিলেন। বুদ্ধদেবের আনুমানিক সময় ৫৬৩ খৃঃ পূর্ব্ব হইতে ৪৮৩ খৃঃ পূর্ব্ব। এ সম্বন্ধে ডাঃ শহীদুল্লার সঙ্গে আমার পত্রালাপ হইয়াছে। তিনি আমাকে লিখিয়াছেন—"আপনার পুস্তকের পাণ্ডুলিপি পড়িলাম। * * * * মীন নাথের সময় সম্বন্ধে আমি Sylvain Levia যে সময় নির্দ্দেশ করিয়াছি তাহাই সঙ্গত। আপনি যে করণ্ডব্যূহ ও সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীকের প্রমাণ দিয়াছেন তাহা বিচারসহ নহে। পুস্তক দুইখানি খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের পরবর্ত্তী।" আমাদের মনে হয় ইনি ঐতিহাসিক মীন নহেন। ইনি অপ্রাকৃত বা অলৌকিক মীন নাথ।

শ্রীগুণানন্দ ও শিবশঙ্কর সিংহ প্রণীত এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত নেপালের ইতিহাসে দেখা যে নেপালের দ্বাদশ বর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ নিবারণ করার জন্য নেপাল রাজ কর্ত্তৃক বিশেষভাবে আহূত হইয়া যোগেশ্বর মীন নাথ বা মৎস্যেন্দ্র নাথ ৫২২ খৃষ্টাব্দে নেপালের ললিতপত্তন গিয়াছিলেন। মীন নাথের নেপাল আগমন বার্ত্তা তথাকার মহারাজ কর্ত্তৃক অতি শ্রদ্ধার সহিত স্মৃতিফলকে রক্ষিত হইয়াছে (Indian Antiquary, Vol IX)। নেপালের করণ্ডব্যূহ ধর্ম্মগ্রন্থে মীন নাথের জীবনী আলোচিত ও ঐ মত সমর্থিত হইয়াছে। Sylvain Levi তাঁহার Le Nepal গ্রন্থের ৩৪১-৩৪৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে গোরক্ষ নাথ নেপালের সমস্ত জলের উৎপত্তি স্থান বন্ধ করিয়া দিয়া দ্বাদশ বর্ষ কাল ব্যাপী অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এইসকল দূর করিবার জন্য ৬৫৭ খৃষ্টাব্দে নরেন্দ্রদেবের রাজত্ব সময়ে মীননাথ নেপাল গিয়াছিলেন। এই সময়-নিরূপণ যে সঙ্গত তাহা অন্যদিক দিয়াও সমর্থিত হয়। মীন নাথের শিষ্য গোরক্ষ নাথ এবং গোরক্ষ নাথের শিষ্য পদ্মবজ্রসরোরুহ বা পদ্মসম্ভব। উড্ডানের রাজা ইন্দ্রভূতি এই পদ্মসম্ভবের পালক পিতা এবং শিষ্য ছিলেন। জার্ম্মান পণ্ডিত শ্লাগিণ্টাভাইট স্থির করিয়াছেন যে এই পদ্মসম্ভব ৭২১।২২ খৃষ্টাব্দে জন্মিয়াছিলেন। হডসনের অনুমান মৎস্যেন্দ্রনাথ পঞ্চম খৃষ্টাব্দে নেপাল গমন করেন (Language, Literature and Religion of Nepal and Tibet—By Hudson)। প্রসিদ্ধ চৈনিক পর্য্যটক হুয়েন সাং তাঁহার প্রসিদ্ধ 'সিয়ুকী' গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে কপিলের শিষ্য অর্থাৎ সাংখ্য-মতাবলম্বী ভববিবেক মৎস্যেন্দ্র নাথ বা অবলোকিতেশ্বরের সহিত দেখা করিয়াছিলেন। ভববিবেক ৫৫০ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। অভিনব গুপ্ত (অনুমান ১০০০ খৃষ্টাব্দ) তাঁহার তন্ত্রালোকে মচ্ছন্দবিভু বলিয়া মৎস্যেন্দ্র নাথের উল্লেখ করিয়াছেন। এসব আলোচনা হইতে মৎস্যেন্দ্র নাথের সময় পঞ্চম খৃষ্টাব্দ হইতে সপ্তম খৃষ্টাব্দের মধ্যেই পড়িবে বলিয়া নিঃসন্দেহে সিদ্ধান্ত করা যায়। তাহা হইলে সিদ্ধা গোরক্ষ নাথও এসময়কার, কারণ গোরক্ষ নাথ মৎস্যেন্দ্র নাথের শিষ্য। সিদ্ধা জালন্দর বা হাড়িফানাথ এবং কানুপা বা কৃষ্ণাচার্য্যও এই সময়কার। ইঁহারা যে সমসাময়িক তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। রাজা গোপী চাঁদের গুরু হইলেন সিদ্ধা জালন্দর বা হাড়িফানাথ। রাজমাতা ময়নামতী বলিতেছেন—

"মায়াজাল বিশম জাল জম রাজার থানা।
গ্রিহেতে থাকিলে বাছা জমে দিবে হানা॥"

* * * *

"ছাড় বাছা রাজ্যপাট মুখে মাথ ছাই।
মাএ পুতে যুগি হৈয়া চহির যুগ্য বেড়াই॥"

—(ভট্টশালীর গোপীচাঁদের সন্ন্যাস, ৩১পৃঃ)

মাতার উপদেশে রাজা রাজ্য ধনরত্ন ত্যাগ করিয়া সিদ্ধা হাড়িফার নিকট সন্ন্যাসমন্ত্রে দীক্ষিত হইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তিনি রাণীদের বলিতেছেন—

"মায়া দুর কর রাণী না বৈশ মোর কাছে।
নিশ্চত্র হইব যুগী যাইব শন্যাশে॥
এষক শম্পদ মোর মোনে নাহি ভাএ।
চিত্য বান্ধা আছে মোর হাড়িফার পাএ॥

* * * *

"রাজ্য পট নারি পুরি শব মিথ্যা ধান্ধা॥"

—(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস, ৪২ পৃঃ)

এদিকে—

"পুত্র যুগি করিবেন এনামন্তি রাই।"

* * * *

"যেথানে হাড়িফা শির্দ্ধা আছিল বসিয়া।
সেইথানে গেলো মুনি পুত্র সঙ্গে নৈঞা।"

* * * *

"মুনি বোলে যুন গুরু হাড়িফা জলন্ধর।
"আজ হৈতে পুত্র হৈল তোমার কিঙ্কর॥"

* * * *

"হাড়িফা বোলেন মুনি থাক বার মাস।
গুপিচন্দ্রক নৈঞা আমি করিগা শন্যাশ॥
এতেক বলিয়া শির্দ্ধা আশোন তুলিল।
শিঙ্গনাদ পুরিয়া হাড়ি জাত্রা করিল॥
মাএর চরণে রাজা হইয়া বিদাএ।
শন্যাশ হইতে রাজা গুরুর শঙ্গে জাএ॥
রাজ্য ছাড়িয়া রাজা জাএ বোন পথে॥"

—(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস, ৪৭ ও ৪৮ পৃঃ)

যে সময়ের কথা সে সময় রাজা ধন সম্পত্তি ইত্যাদি ছাড়িয়া নাথ সন্ন্যাসীদের প্রভাবে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবার এক মহাধুম পড়িয়া গিয়াছিল। অবিশ্বাসীর দল ইহাকে জাতীয় জীবনের অবসাদই বলিবেন। কিন্তু পরমার্থের জন্য বিষয়ার্থ বিসর্জ্জন দেওয়া এই ভারতের মাটীতে অভিনব কিছু নহে। রাণী ময়নামতী পুত্র স্নেহবতী ছিলেন, পুত্রের সুখের জন্য তিনি লালায়িতা ছিলেন কিন্তু তিনি পুত্রের বিলাসের ক্রোড়ে লালিত পালিত হওয়ার বিরুদ্ধে ছিলেন। ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী তাঁহার 'গোপীচাঁদের সন্ন্যাসে' বহু প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে রাজা গোপীচাঁদ বা গোবিন্দচন্দ্রের রাজ্য ত্রিপুরার ময়নামতী লাল-মাইতে ছিল, এবং ইনি একাদশ বা দ্বাদশ খৃষ্টাব্দের। ডাঃ শহীদুল্লাহ ও তাঁহার 'হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালায়' সিদ্ধা কানুপার গীত ও দোঁহায় রাজা গোপীচাঁদকে একাদশ বা দ্বাদশ খৃষ্টাব্দের বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাহা হইলে রাজ-গুরু হাড়িফানাথ ও তদীয় শিষ্য কানুপা বা কৃষ্ণাচার্য্যও এসময়কার। মীন নাথের প্রসঙ্গে দেখা গিয়াছে মীন নাথ, গোরক্ষ নাথ, জালন্দরনাথ ও কানুপা বা কৃষ্ণাচার্য্য সমসাময়িক। ইহাঁদের সময় পঞ্চম খৃষ্টাব্দ হইতে সপ্তম খৃষ্টাব্দ। আর রাজা গোপীচাঁদ বা গোবিন্দচন্দ্রের প্রসঙ্গে দেখা যাইতেছে যে হাড়িফা কানুপা ও গোরক্ষ নাথ একাদশ বা দ্বাদশ খৃষ্টাব্দের। গোরক্ষ নাথ সিদ্ধা রাণী ময়নামতীর গুরু। ময়নামতী বলিতেছেন—

"মোরে গ্যান দিয়াছেন গোরখ নাথ মুনি।"

—(ময়নামতীর গান)

ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। যোগশক্তি বলে সিদ্ধারা কয়েক শত বৎসর জীবিত থাকিতে পারেন। যোগের শক্তিতে এই

সেদিন ত্রৈলিঙ্গ স্বামী মোটামুটি তিন শত বৎসর বয়সে তিরোহিত হইয়াছেন বলিয়া প্রবাদ আছে। মীনচেতনে বর্ণিত আছে মহামায়া বহুচেষ্টা করিয়াও গোরক্ষ নাথকে ব্রহ্মচর্য্যচ্যুত করিতে পারেন নাই। স্বয়ং শিব পর্য্যন্ত এক বরকামা তপস্বিনীকন্যাকে 'গোরক্ষনাথ তোমার স্বামী হউক' বর দিয়াছিলেন। শিবের বরে বাধ্য হইয়া গোরক্ষনাথ ঐ কন্যার স্বামিত্ব স্বীকার করিয়া যোগবলে শিশু হইয়া তাহার কন্যার কোলে অবস্থান করিয়াছিলেন :—

"স্তন খাইতে চাহে শিশু কান্দে হোয়া হোয়া।
তা দেখিয়া রাজকন্যায় বলে আচাভুয়া॥
ভাল স্বামী পাইল আমি দুগ্ধ খাইতে চায়ে।
শুনি কি বলিবে মোর বাপে আর মায়ে॥"
(মীন চেতন—৮পৃঃ)

এমতাবস্থায় যোগেশ্বরগণের পক্ষে সাত আট শত বৎসর জীবিত থাকা আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার বলিয়া মনে হয় না। রাজা গোপীচাঁদ সংসারাশ্রম ত্যাগ করেন ইহা রাণীদের ইচ্ছা ছিল না। তাই রাণীরা চক্রান্ত করিয়া বলিয়াছিলেন—

"হাড়িফাক মারিব বিশ করায়া ভোজন॥"
(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস—৪৩পৃঃ)

রাণীরা ষড়যন্ত্র করিয়া হাড়িফাকে বিষমিশ্রিত অন্ন খাওয়াইলেন। তাহার ফলে—

"মিথ্যা মরণে হাড়ি ঢলিয়া পড়িল॥"
(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস—৪৪পৃঃ)

তাঁহার মৃতদেহে অগ্নিসংযোগ করা অসম্ভব হওয়ায়—

"ঠেলা দিয়া হাড়িফাক গঙ্গাতে ফেলিল॥"
* * * *
এহিরূপে ভাশে হাড়ি জলের উপর॥
* * * *
হাড়িফার মরণ দেখি চারি রাণি হাশে।
মরা শরীরে হাড়ি জলের উপর ভাশে॥"
(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস)

তৎপর—

"শির্দ্ধিজল খায়া হাড়ির আনন্দ হইল।
ফুল বাড়ীতে জায়া হাড়ি ধ্যানেতে বশিল॥
জোগ আশোনে নাথ বসিল গোফাতে।
(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস)

এমন সময়—

"ফুল তুলিতে গেলো রাণি ফুলতলাতে।
দেখে হাড়ি বশি আছে আপোন গোফাতে॥
* * * *
বিশ পান করি হাড়ির নহিল মরণ।
না জানি মনস্বরূপে আছে কুনজন॥"
(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস—৪৪, ৪৫ পৃঃ)

মহাপুরুষ মহারাজের কথা

স্বামী—

একদিন মঠে সন্ধ্যার আরতির পর মহাপুরুষ মহারাজ তাঁহার ঘরে শায়িত আছেন। জনৈক ভক্ত তাঁহার পদসেবা আরম্ভ করিলে তিনি কিছুক্ষণ পর বলিতে লাগিলেন, "ঠাকুর এবার এসে ধর্ম্মের রাস্তা সহজ এবং সরল করে দিয়ে গেলেন। পরিব্রাজক অবস্থায় বহু সাধুর সংস্রবে এসে দেখেছি, পঁচিশ ত্রিশ বৎসর সাধুজীবন কাটালেও ধর্ম্ম বা ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে অনেকের একটা clear idea (পরিষ্কার ধারণা) হয় নাই, কোন রকমে গতানুগতিক ভাবে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে। ঠাকুরের ভক্তদের কাছে কিন্তু ধর্ম্মের অর্থ পরিষ্কার, কারণ তাঁর life (জীবন) ছিল true interpretation of religion (ধর্ম্মের প্রকৃত ব্যাখ্যা)। তাঁকে আশ্রয় করে এবার বহু লোক সংসার-সমুদ্র পার হয়ে যাবে।"

শ্রীশ্রীমার কৃপাপ্রাপ্ত জনৈক ভক্ত সেই ঘরে উপস্থিত ছিলেন; তাঁহাকে বলিলেন, "তোমার ছুটিটা এবার বেশ কাটল। জয়রামবাটী গিয়ে

মার কৃপা পেয়ে জীবন ধন্য করে এলে 'কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা।' যত দিন যাবে তত বুঝবে বাবা, কার আশ্রয় পেয়েছ।"

মঠে এক শনিবার বৈকালে মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে বসিয়া আছি। ষ্টুডেণ্টস্ হোমের অনাদি মহারাজও সেই সময় উপস্থিত ছিলেন। দীক্ষা-প্রার্থী জনৈক ভদ্রলোকের কথা উল্লেখ করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি দীক্ষা চান, ঠাকুরের উপর ভক্তি-শ্রদ্ধা আছে ত?" আমি বলিলাম, "মহারাজ, তাঁর ঘরে ঠাকুর ও মার ছবি আছে দেখেছি, কথামৃতও দু এক খণ্ড আছে। আমি যখন গ্রামে যাই তখন তাঁরি সঙ্গে আমার ঠাকুরের ও মার কথা হয়।" মহারাজ শুনিয়া ভাবের সহিত বলিলেন, "লিখে দাও তাঁকে আস্‌তে, তাঁকে দীক্ষা দোবো, যে আস্‌বে কাউকে ফেরাব না, আমি মা-গঙ্গা হয়ে গেছি। মুক্তির এমন সহজ উপায় আর কখন হয় নাই, একটু সরলতা, একটু প্রীতি, একটু বিশ্বাস, একটু ভক্তি—বাস্ আর কিছুর প্রয়োজন নেই।" এই কথাগুলি বলিয়াই তিনি নীরব হইয়া গেলেন। আমরাও তাঁহার করুণা-উদ্বেলিত হৃদয়ের অন্তঃস্তল হইতে উচ্ছ্বসিত বাক্যসুধা পান করিতে করিতে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বসিয়া রহিলাম।

একদিন সংবাদ পাইলাম মহাপুরুষ মহারাজ গঙ্গার ওপারে হাওড়ার অন্তর্গত রামকৃষ্ণপুরে ভক্তপ্রবর নবগোপাল ঘোষের বাটীতে অবস্থান করিতেছেন এবং সেইদিনই রাত্রের গাড়ীতে পুরী রওনা হইবেন। নৌকায় গঙ্গা পার হইয়া বৈকাল ৪টা আন্দাজ ঐ বাটীতে উপস্থিত হইয়া মহাপুরুষ মহারাজের পাদবন্দনা করিলাম। তিনি দেখিয়াই সহাস্যে বলিলেন, "তুমি কোথা থেকে এলে? কি করে টের পেলে আমি এখানে আছি?" আমি বলিলাম, "মহারাজ, সংবাদ পেলুম, আপনি আজ পুরী রওনা হবেন, তাই আপনাকে দর্শন করতে এলুম।" বসিতে আদেশ করিয়া পুরী সম্বন্ধে বলিলেন, "একবার হরি মহারাজের খুব অসুখ উপলক্ষে তাঁকে দেখতে মহারাজ প্রভৃতি আমরা পুরীতে উপস্থিত হলুম। সকলেই জগন্নাথ দর্শন করে এলেন; আমার দর্শন করতে যাবার ইচ্ছে হল না। একদিন মহারাজ বলেই ফেললেন 'কই তারকদা আপনি জগন্নাথ দর্শন করতে গেলেন না?' আমি মনের ভাব প্রকাশ না করে বল্লুম, দেখা যাবে এখন। অবশেষে মহারাজের পীড়াপীড়িতে একদিন যেতেই হল দর্শন করতে। কিন্তু যেই মন্দিরে ঢুকে জগন্নাথের সাম্‌নে দাঁড়ালুম, অমনি এক অভাবনীয় ব্যাপার ঘটে গেল—এমন একটা গম্ভীর অন্তরের ভাব মনকে আচ্ছন্ন করে ফেল্‌লে তা আর কি বলব, জগন্নাথ খুব জাগ্রত দেবতা।"

১৯২০ সালের ১৬ই নভেম্বর ভবানীপুরে, আদিগঙ্গার তীরে কালীক্ষেত্রে গদাধর আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হল। মহাপুরুষ মহারাজ স্বহস্তে ঠাকুরকে সিংহাসনে বসাইয়া প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পাদন করিলেন এবং নানাপ্রকার অসুবিধার মধ্যেও ১৭ দিন আশ্রমে বাস করিলেন। যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ পার্ষদ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের উপস্থিতিতে আশ্রমে আধ্যাত্মিকতার একটা জমাট ভাবের সৃষ্টি হইয়াছে। সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত ভক্ত এবং ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণের সমাগমে আশ্রমে আনন্দের হাট বসিয়াছে। একদিন সন্ধ্যার আরতি শেষ হইয়া গিয়াছে। ঠাকুরঘরে মহাপুরুষ মহারাজ সমাসীন। সমবেত ভক্তগণ জপ-ধ্যান করিবার জন্য সচেষ্ট হইতেছেন। জনৈক ভক্তকে মহারাজ বলিলেন, "দেখ, বহুলোকের কল্যাণের জন্য ঠাকুর এখানে বসেছেন। এখন প্রত্যহ কিছুদিন আরতির পর ভজন চালাও। দাও দেখি আমায় খোলটা,

'চিন্ময় মম মানস হরি চিদ্‌ঘন নিরঞ্জন' এই গানটা গাও।" ভক্ত গান ধরিলেন, মহাপুরুষ মহারাজ খোল বাজাইতে লাগিলেন এবং মাঝে-মাঝে 'এমন রূপ আর দেখি নাই রে' ইত্যাদি আখর দিতে দিতে স্বয়ংও গাহিতে লাগিলেন। ভক্তগণ তন্ময় হইয়া সঙ্গীতসুধা পান করিতে করিতে চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া রহিলেন। এই সময় মহাপুরুষ মহারাজ কৃপাপরবশ হইয়া ঐ অঞ্চলের বহু নরনারীর সুপ্ত ধর্ম্মভাব জাগরিত করিয়া তাহাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন।

১৯২৬ সনের মঠ ও মিশনের Conventionর পর এপ্রিল মাসে একদিন মহাপুরুষ মহারাজ, শর্ব্বানন্দ স্বামী ও যতীশ্বরানন্দ স্বামীর সহিত মঠ হইতে মাদ্রাজ রওনা হইয়া পথিমধ্যে ভুবনেশ্বরে অবতরণ করিয়া মঠে কয়েক দিন অবস্থান করিলেন। একদিন সন্ধ্যার সময় মঠের দক্ষিণ-দিকের বারাণ্ডায় মহারাজ বসিয়া আছেন। গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে মনে হইতেছে যেন মঠের বৃক্ষলতাও ধ্যানমগ্ন। মহারাজ জনৈক সাধুকে বলিলেন, "দেখ কি স্থানমাহাত্ম্য, আপনা থেকেই মন অন্তর্মুখী হয়ে আস্‌ছে।" সাধু বলিলেন, "মহারাজ, শুনেছি বড় মহারাজ বলতেন এখানে রাত্রি ৮টার সময়, বৃন্দাবনে মহানিশায় এবং কাশীতে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে একটা spiritual current (আধ্যাত্মিক ভাব) বয়ে যায়।" মহারাজ বলিলেন, "ঠিক কথা, যারা এই সব স্থানের এই সব সময়ের advantage (সুবিধা) নিয়ে জপ-ধ্যান করে, তারাই স্থানের মাহাত্ম্য feel (অনুভব) করতে পারে।"

পরদিবস ভোরে পুরী এক্সপ্রেসে পুরী রওনা হওয়ার আয়োজন হইতেছিল। মহাপুরুষ মহারাজ প্রস্তুত হইয়া দক্ষিণদিকের বারাণ্ডায় আসিয়া বসিলেন। কথাপ্রসঙ্গে বলিতে লাগিলেন, "পুরীর মন্দিরে যে জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামের মূর্ত্তি রয়েছে ও সব বৌদ্ধযুগের প্রতীক। জগন্নাথ হচ্ছেন বুদ্ধের, সুভদ্রা সঙ্ঘের, আর বলরাম ধর্ম্মের প্রতীক। পরবর্ত্তী যুগে যখন বৈষ্ণবদের প্রাধান্য হল, তখন তাঁরা এই সব বর্ত্তমান মূর্ত্তিতে পরিণত করলেন। আমাদেরও স্বামীজি হচ্ছেন বুদ্ধ, মা সঙ্ঘ এবং ঠাকুর ধর্ম্ম। বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি। সমুদ্র জগন্নাথের বিরাট মূর্ত্তি। পুরীতে ঠাকুরের স্থান হলে বেশ হয়।" শাস্ত্রে আছে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের মুখ হতে যে সকল বাক্য উচ্চারিত হয়, অর্থ সেই বাক্য সকলকে অনুসরণ করে, অর্থাৎ তাঁহাদের বাক্য কখনও নিরর্থক বা নিষ্ফল হয় না। মহাপুরুষ মহারাজের জীবনকালেই পুণ্যতীর্থ শ্রীক্ষেত্রে নীলাম্বুরাশিচুম্বিত বেলাভূমির অতি নিকটে, চক্রতীর্থে শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁহার শুভসঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিয়াছে।

১৯২৭ সালের নভেম্বর মাসে মহাপুরুষ মহারাজ মধুপুর হইতে কাশীধামে অদ্বৈত আশ্রমে শুভাগমন করেন। পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছানুসারে ১৯০২ সালে তিনি স্বয়ং এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া দীর্ঘ সাত বৎসর কাল ধরিয়া এখানে থাকিয়া কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। সুতরাং এই আশ্রম তাঁহার সাধক-জীবনের বহু পুণ্যস্মৃতির সহিত জড়িত এবং সেই জন্য তাঁহার অতীব প্রিয়। মহাপুরুষ মহারাজের শুভাগমনে আশ্রমে আনন্দের স্রোত বহিতে লাগিল। সেবাশ্রম ও অদ্বৈত আশ্রমের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণের উৎসাহদীপ্ত বদনে আনন্দ ফুটিয়া উঠিল এবং ভক্তগণের হৃদয় উন্মাদনায় ভরিয়া উঠিল। বিমল আনন্দের মধ্যে দিনের পর দিন অতীত হইয়া ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর পুণ্য-জন্মতিথির দিন সমাগত হইল। এই শুভদিনে মহাপুরুষ মহারাজ মধ্যাহ্নে কয়েক জন যুবককে

ব্রহ্মচর্য্যব্রতে এবং শেষরাত্রে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে, কয়েক জন ব্রহ্মচারীকে 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়' সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। নবীন সন্ন্যাসিগণ তাঁহাদের দণ্ড ভাসাইবার জন্য গঙ্গায় গিয়াছেন, তখনও হোমাগ্নি নির্ব্বাপিত হয় নাই, মহাপুরুষ মহারাজ বসিয়া আছেন, মন অন্তর্মুখী। এমন সময় মহীশূর রাজ্যের এ্যাসিষ্টাণ্ট কমিশনার মিষ্টার সুন্দররাজ আয়েঙ্গার আসিয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া মহারাজের পাদ বন্দনা করিলেন। কয়েক দিন যাবৎ ইনি সেবাশ্রমে অতিথিরূপে বাস করিতেছেন। কয়েক দিন পূর্ব্বে মহারাজ ইঁহাকে কৃপা করিয়া দীক্ষা দান করিয়াছেন। মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "Sundar Raj, are you happy?" (সুন্দররাজ, আনন্দে আছ ত?) সুন্দররাজ উত্তর করিলেন, "Yes, Maharaj, because you have so graciously taken my burden." (হ্যাঁ মহারাজ, কারণ আপনি কৃপা করে আমার ভার নিয়েছেন)। মহারাজ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বলিলেন, "Yes, Guru Maharaj has taken your burden through me." (হ্যাঁ, গুরুমহারাজ, তোমার ভার গ্রহণ করেছেন আমার ভেতর দিয়ে)।

একদিন রাত্রে মহারাজ ঘরে বসিয়া তামাক খাইতেছেন, এমন সময়ে জনৈক সাধু যাইয়া বসিলেন এবং কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, "মহারাজ, আমার মনে হয় আমাদের এখন কাজের চেয়ে ধ্যান-জপের উপর বেশী stress (জোর) দেওয়া উচিত।" মহারাজ বলিলেন, "ধ্যান-জপের importance (প্রাধান্য) অতীতেও ছিল, বর্ত্তমানেও আছে, এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। কাজের কথা বলছ? ধ্যান-জপ বাদ দিয়ে ঠাকুর স্বামীজির ideal (আদর্শ) অনুযায়ী work can never be done (কাজ কখনও করা যেতে পারে না)। Work and worship (কর্ম্ম এবং উপাসনা) একসঙ্গে চালাতে হবে।" Can never be done এই কথাগুলির উপর খুব জোর দিলেন।

আর একদিন রাত্রে আহারের পর মহারাজ নিজ ঘরে বসিয়া যখন তামাক খাইতেছিলেন সেই সময় জনৈক ব্রহ্মচারী আসিয়া উপবেশন করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনার স্নেহের, আপনার কৃপার গভীরতা ক্ষুদ্র বুদ্ধি বশতঃ বুঝতে না পেরে সেদিন আপনার আদেশ অনুযায়ী কাজ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম। কিন্তু আজ আমার ধারণা হয়েছে, আমার কিসে কল্যাণ হবে তা আপনি-ই জানেন, অতএব আপনি যা আদেশ কচ্ছেন তা করতে আমি প্রস্তুত।" মহারাজ সস্নেহে বলিলেন, "ঠিক বুঝেছ। এখানকার কথা শুনে চললে তোমাদের কল্যাণ নিশ্চয়ই হবে। এখান থেকে এখন যে সব কথা বেরুচ্ছে, সে সব ঠাকুরের কথা বলে জানবে, এখন ঠাকুরের সঙ্গে এক হয়ে রয়েছি।"

এই সময় অদ্বৈতাশ্রমে উপরে যাবার সিঁড়ি মেরামত হইতেছিল। সেই জন্য মহাপুরুষ মহারাজ সেবাশ্রমে যে ঘরে পূজ্যপাদ হরি মহারাজ থাকিতেন, সেই ঘরে কয়েক দিন বাস করিয়াছিলেন। একদিন সকালে কয়েক জন সাধু এবং ভক্ত ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিবার পর মহারাজ বলিলেন, "এ স্থানটি তপস্যার স্থান বলে মনে হচ্ছে। সমাধিবান পুরুষ হরি মহারাজ এখানে বাস করতেন কিনা তাই এইরূপ মনে হচ্ছে।"

কথাপ্রসঙ্গে ভক্তপ্রবর বলরাম বাবুর কথা উঠিলে মহারাজ বলিতে লাগিলেন, "বলরাম বাবুর শেষ অসুখের সময় যখন খুব বাড়াবাড়ি, একদিন তিনি কেবল বলতে লাগলেন 'কৈ আমার ভাইরা কোথায়?' এ সময় আমার ভাইরা ছাড়া আর

কাউকে চাই না। সংবাদ পেয়ে আমরা বাগবাজারে তাঁর বাড়ীতে উপস্থিত হলুম। একদিন যখন তাঁর অবস্থা খুব খারাপ, ডাক্তারেরা এক রকম জবাব দিয়ে গেছে, আমরা তাঁর পাশে বসে রয়েছি। বাড়ীর ভিতর গোলাপ মা, যোগীন মা, বলরাম বাবুর স্ত্রী প্রভৃতি মেয়েরা সকলেই খুব উদ্বিগ্নচিত্তে অবস্থান করছেন। এমন সময় বলরাম বাবুর স্ত্রী দিনের বেলায় পরিষ্কার আকাশের গায়ে এক জায়গায় এক খণ্ড ছোট মেঘের মত একটি কি দেখতে পেলেন। তারপর দেখলেন, ওটি ধীর গতিতে নীচের দিকে নেমে আসছে। নামতে নামতে একটি রথের আকার ধারণ করলে এবং ঐ রথ তাঁদের বাড়ীর ছাদে এসে নাম্‌ল। রথের ভেতর থেকে ঠাকুর বেরুলেন এবং নীচে নামবার সিঁড়ির দিকে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে দেখলেন, ঠাকুর বলরাম বাবুর হাত ধরে নিয়ে এসে তাঁকে রথের মধ্যে বসালেন এবং নিজেও বসলেন। তারপর রথ তেমনি বেগে উপরের দিকে উঠতে লাগল এবং দেখতে দেখতে আকাশের গায়ে মিলিয়ে গেল। এই vision (অলৌকিক দৃশ্য) দেখ্‌তে দেখ্‌তে বলরাম বাবুর স্ত্রীর মন এমন এক উচ্চ অবস্থায় চলে গিয়েছিল যেখানে তাঁকে শোক-তাপ স্পর্শ করতে পারে নি। যখন তাঁর চমক ভাঙ্গল তিনি এই দর্শনের কথা গোলাপ-মাকে বললেন্‌। গোলাপ-মা যখন এসে আমাদের জানালেন তার কিছুক্ষণ আগে বলরাম বাবুর শরীর গেছে। বলরাম বাবু পরমভক্ত এবং তাঁর স্ত্রী পরম ভক্তিমতী ছিলেন। তাই ঠাকুর তাঁকে এই দৃশ্য দেখিয়ে তাঁর মনকে এই সময়ে শোক-মোহের ঊর্দ্ধে নিয়ে গিয়েছিলেন।"

পূর্ববঙ্গে অরাজকতা সম্বন্ধে রামকৃষ্ণ মিশনের নিবেদন

নোয়াখালী জেলায় ও ত্রিপুরা জেলার কতকাংশে ব্যাপকভাবে স্পষ্টতঃ সম্প্রদায়-বিশেষভুক্ত দলবদ্ধ সশস্ত্র গুণ্ডাগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত নানাবিধ দানবীয় অত্যাচারের হৃদয়বিদারক দুঃখকাহিনী সংবাদ-পত্রে পাঠ করিয়া আমরা অত্যন্ত মর্মাহত হইয়াছি। বিংশ শতাব্দীতে কোন সুপ্রতিষ্ঠিত সভ্য শাসনতন্ত্রের আমলে দীর্ঘদিন ধরিয়া এরূপ ব্যাপক হত্যা, লুণ্ঠন, গৃহদাহ, নারীহরণ এবং বলপূর্বক ধর্মান্তরিতকরণ ও বিবাহ অবাধে চলিতে পারে, ইহা একেবারে কল্পনাতীত। ঐ পৈশাচিক লীলা-বিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহের অসহায় নির্যাতিত জনগণের পক্ষ হইতে আমরা ভার-প্রাপ্ত রাজকর্মচারিগণকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা যেন অচিরে এই আইনভঙ্গকারী দস্যুদলকে শাস্তি দেন এবং তাহাদের সমাজঘাতী নারকীয় কার্যকলাপ রোধ করেন। এ বিষয়ে বিলম্ব করিলে লোকে সহজেই উহাকে উদাসীনতা—এমন কি অনিচ্ছা বলিয়াও ভ্রান্ত ধারণা করিতে পারে।

নির্যাতিতগণকে আমরা বর্তমান অবস্থায় যতটা সম্ভব সাহায্য প্রেরণ করিতেছি। আমরা আশা করি যে তাঁহারা যথাশক্তি নিজেদের ঘর-বাড়ী, বিশেষতঃ কুলনারীগণের মর্যাদা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবেন। ইহাই তাঁহাদের শাস্ত্রের আদেশ। সাধারণ লোকের কর্তব্য মহাপুরুষের কর্তব্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। নিশ্চেষ্টতাকে যেন সমদর্শিতা বলিয়া ভুল বুঝা না হয়। প্রাচীন ভারতের মহামহিম স্মৃতিকার মনু আত্মরক্ষার জন্য আততায়ীকে বধ পর্যন্ত করিবার বিধান দিয়াছেন। আর শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ মহানির্বাণ তন্ত্রের "গৃহী ব্যক্তি শত্রুর সম্মুখে শূরভাব অবলম্বন করিবেন"—এই উক্তিটি উদ্ধৃত করিয়া উহার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "শত্রুগণকে বীর্য প্রকাশ করিয়া শাসন করিতে হইবে। ইহা গৃহস্থের

কর্তব্য। গৃহস্থের পক্ষে ঘরের এক কোণে বসিয়া কাঁদিলে আর 'অহিংসা পরমো ধর্মঃ' বলিয়া বাজে বকিলে চলিবে না। যদি তিনি শত্রুগণের নিকট শৌর্য প্রদর্শন না করেন, তাহা হইলে তাঁহার কর্তব্যের অবহেলা করা হয়।" ('কর্মযোগ', ২য় অধ্যায়)

তাঁহাদের ইহাও জানা উচিত যে কেহ নিপীড়িত হইয়া ধর্মান্তর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলে তাহার স্বধর্মে ফিরিয়া আসার পক্ষে কোন বাধা থাকিতে পারে না। ধর্ম মানুষের আন্তরিক বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। উহা বাহিরের জবরদস্তি দ্বারা কেহ নাশ করিতে পারে না। স্বামী বিবেকানন্দের নগণ্য অনুগামী হিসাবে আমাদের দৃঢ় ধারণা যে হিন্দুসমাজ ধর্মের নামে ছুৎমার্গ, স্বধর্মে প্রত্যাবর্তন নিরোধ ও আরও নানাবিধ বাধারূপ কূপমণ্ডূকত্বের শেষ চিহ্নগুলি মুছিয়া ফেলিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। ঐগুলি এখন শুধু নিরর্থক নহে, বরং যে সমাজ একদিন এত বলশালী ছিল যে গ্রীক, শক, হূণ প্রভৃতি বিজাতীয়গণকে নিজ অঙ্গে মিলাইয়া লইতে পারিয়াছে, তাহার জীবনীশক্তি ক্ষয় করিতেছে। বলা বাহুল্য, বলপূর্বক অপহৃতা নারীগণকে সসম্মানে সমাজে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। তাহা না হইলে যে উৎপীড়িত তাহাকেই শাস্তি দেওয়া হয়। ইহা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। সমাজ যেন নিজ অক্ষমতার দোষ নিরীহ উৎপীড়িতগণের স্কন্ধে না চাপান।

আমরা নিপীড়িতগণকে জোরের সহিত বলিতেছি যে মানবজাতির কল্যাণ ভগবানেরই হস্তে, স্বার্থান্ধ ব্যক্তিগণের হস্তে নহে—তাহারা আপাততঃ যতই শক্তিশালী বলিয়া প্রতীয়মান হউক না কেন। বিগত মহাযুদ্ধে ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। জীবনের ইহা এক অমোঘ আধ্যাত্মিক নিয়ম যে পাপ প্রথমাবস্থায় যতই প্রভাব বিস্তার করুক না কেন, পরিণামে তাহাকে নির্মূল হইতেই হইবে। শ্রীভগবান নিপীড়িতগণকে সাহস ও বল এবং অত্যাচারিগণকে বিচারবুদ্ধি ও মৈত্রীভাব প্রদান করুন।

স্বামী মাধবানন্দ
সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন
৭ই কার্তিক, ১৩৫৩

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী মাধবানন্দ মহারাজ নিম্নলিখিত সংবাদ পাঠাইয়াছেন :—

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিয়াছি যে স্বামী ভুবনানন্দ (ওরফে সাহেব মহারাজ) হাজারীবাগ রোডের শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের জন্য আমাদের বন্ধুগণের নিকট হইতে এই বলিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন যে, উক্ত প্রতিষ্ঠান ভবিষ্যতে রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত হইবে। আমরা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানাইতেছি যে ইহা আদৌ সত্য নহে। স্বামী ভুবনানন্দ বা হাজারীবাগ রোডের শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের সহিত রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠের কোন সম্পর্ক নাই। উক্ত প্রতিষ্ঠানটী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, এবং উহাকে রামকৃষ্ণ মিশন বা মঠের অঙ্গীভূত করিবার কোন পরিকল্পনাও আমাদের নাই।

আমরা জনসাধারণকে আরও জানাইতেছি যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বিভিন্ন সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছেন :— স্বামী সম্পূর্ণানন্দ (বিমল), স্বামী আত্মস্বরূপানন্দ (হিমাংশু), স্বামী ক্ষেমানন্দ (কীর্তি) এবং ব্রহ্মচারী ভূধরচৈতন্য (হিমাংশু)। এতদ্ব্যতীত স্বামী তপানন্দ (বিশু) এবং স্বামী নির্লেপানন্দ (কার্তিক) সংঘ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

স্বামী পরমানন্দ নামক গৈরিকধারী জনৈক যুবক রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিনিধি বলিয়া মিথ্যা পরিচয় দিয়া উত্তর-বঙ্গে অর্থসংগ্রহ করিতেছেন। জনসাধারণ এই ব্যক্তি হইতে সাবধান থাকিবেন।

আমাদের পক্ষ হইতে যাঁহাদিগকে অর্থসংগ্রহ করিবার ভার দেওয়া হয়, তাঁহাদের নিকট আমাদের প্রদত্ত নিয়োগ-পত্র থাকে। সন্দেহস্থলে উহা পরীক্ষা করা বাঞ্ছনীয়।

স্বামী সোমেশ্বরানন্দজী মহারাজের দেহত্যাগ—গত ২৯শে সেপ্টেম্বর দিবা প্রায় এক ঘটিকার সময়ে স্বামী সোমেশ্বরানন্দজী কানপুর আশ্রমে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার পূর্বাশ্রমের নাম ছিল হরিচরণ মল্লিক। তিনি জেলা ২৪পরগনা বারাসত সাবডিভিসনের অন্তর্গত রঙ্গপুর গ্রামে প্রসিদ্ধ তালুকদার মল্লিক বংশে ১৮৬৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল স্বর্গীয় বেণীমাধব মল্লিক। সোমেশ্বরানন্দজী শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করিয়াছিলেন এবং ঠাকুর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তুই এখানে আসবি, তবে কিছু দেরী আছে।" ইনি পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের নিকট দীক্ষা এবং শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। দেহত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত ইনি কানপুর রামকৃষ্ণ আশ্রমের কোষাধ্যক্ষ এবং আশ্রম-পরিচালিত দাতব্য ঔষধালয়ের চিকিৎসক ছিলেন। স্বামী সোমেশ্বরানন্দজী শ্রীভগবানের নাম করিতে করিতে সজ্ঞানে দেহত্যাগ করিলে তাঁহার নশ্বর দেহ পুষ্প-মাল্যে ভূষিত করিয়া বহু ভক্ত সমভিব্যাহারে নাম কীর্তন করিতে করিতে গঙ্গায় জল সমাধি দেওয়া হইয়াছে।

ভ্রম-সংশোধন—গত 'আশ্বিন' সংখ্যার ৪৯৬ পৃষ্ঠায় "ভাবে বা পরে" স্থলে "ভাবে বা ঘরে," "আজিকে ভূষণ" স্থলে "তাজিক-ভূষণ," ৪৯৭ পৃষ্ঠায় পাদ-টীকা ২০-এ দুই স্থানে "Curb" স্থলে "Orb," ৪৯৯ পৃষ্ঠায় "সকল সায়ন-বিন্দুর" স্থলে "সচল অয়ন-বিন্দুর" ও "নিরয়ন ভাব" স্থলে "নিরয়ন গ্রহ ও ভাব" এবং "অংশ-কলাদি" স্থলে "অংশ-কলাদি," ৪৯৮ ও ৫০১ পৃষ্ঠায় Count Louis এর পরে "Harmon" স্থলে "Hamon," ৫০১ পৃষ্ঠায় ৫-এ "মেষ-রাশির" স্থলে "মীন-রাশির" এবং ১১-তে "প্রথম দিনে" স্থলে "প্রথম সাত দিনে", ৫০২ পৃষ্ঠায় "তিথির উপর নির্ভরযোগ্য যাগ ও নক্ষত্র" স্থলে "তিথির উপর নির্ভরযোগ্য করণ আদি গণনা এবং অশুদ্ধ চন্দ্র ও সূর্য্য-স্ফুটের উপর নির্ভর-যোগ্য 'যোগ' ও 'নক্ষত্র' আদি" হইবে।

নব প্রকাশিত পুস্তকাবলী

Hindu Psychology—Its Meaning for the West—স্বামী অখিলানন্দ প্রণীত। আমেরিকার হারবার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্বের অধ্যাপক গর্ডন অলপোর্ট লিখিত ভূমিকা। নিউইয়র্ক হইতে হার্পার ব্রাদার্স কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ২॥০ ডলার।

Essence of Hinduism—স্বামী নিখিলানন্দ প্রণীত। নিউইয়র্ক (আমেরিকা) রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সমিতি হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৷০ ডলার।

পঞ্চশস্য—রামকৃষ্ণ মিশন স্টুডেণ্ট্স হোম্ হইতে স্বামী সন্তোষানন্দ কর্তৃক সম্পাদিত এবং প্রকাশিত। রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যার্থী আশ্রমের হস্তলিখিত মাসিক পত্র "বিদ্যার্থী" হইতে সংকলিত এবং পুস্তকাকারে প্রকাশিত। মূল্য ২৲।

ছেলেদের গান—স্বামী চণ্ডিকানন্দ প্রণীত। শ্রীহট্ট রামকৃষ্ণ আশ্রম হইতে স্বামী সৌম্যানন্দ কর্তৃক প্রকাশিত। ১৪২ পৃষ্ঠা, মূল্য বাঁধাই ১॥০ ও সাধারণ ১৷০ আনা।

দাঙ্গা সেবাকার্যে রামকৃষ্ণ মিশনের আবেদন

জনসাধারণ অবগত আছেন যে রামকৃষ্ণ মিশন নোয়াখালী ও ত্রিপুরা জেলার রোমাঞ্চকর দাঙ্গায় সর্বস্বান্ত নরনারীগণের সেবার জন্য চাঁদপুরে সেবকগণকে প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহারা পূর্ণোদ্যমে সেবাকার্য আরম্ভ করিয়াছেন। চাঁদপুরে দুর্গতগণের জন্য যে সকল সরকারী আশ্রয়স্থান নির্মিত হইয়াছে তাহার দুইটীর ভার আমাদের সেবকগণ লইয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট হইতে প্রাপ্ত খাদ্যসামগ্রীর সাহায্যে তাঁহারা প্রত্যহ প্রায় ১৫০০ জন লোককে ভোজন করাইতেছেন ও আরও প্রায় ১৫০০ জনকে

প্রতিদিন চাউল, ডাল প্রভৃতি বিতরণ করিয়াছেন। ইঁহাদের প্রয়োজনীয় অন্যান্য সেবাও তাঁহারা বর্তমান অবস্থায় যতটুকু সম্ভব করিতেছেন।

গভর্ণমেণ্টের শেষোক্ত চাউল আদি দ্রব্য সরবরাহ বন্ধ হওয়ায় আমরা প্রতিদিন প্রায় ১,১০০ জন দুঃস্থকে ভোজ্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া বিতরণ করিতেছি, এবং কতক লোককে অর্থ-সাহায্যও করিতেছি।

আমাদের কয়েক জন সেবক সরকারের আনুকূল্যে ত্রিপুরা জেলার হাইমচর, হানারচর, কড়াইতুলি প্রভৃতি অতি বিধ্বস্ত কয়েকটী গ্রামের শোচনীয় অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিতে সমর্থ হইয়াছেন।

হাইমচরে অবিলম্বে একটী সেবাকেন্দ্র খোলার ব্যবস্থা করা হইতেছে। এই বিস্তৃত অঞ্চলে ২০,০০০ আন্দাজ লোকের বাস। অবস্থা প্রতিকূল না হইলে পরে নোয়াখালী জেলার রামগঞ্জে আরও একটী সেবাকেন্দ্র খোলা হইবে। খাদ্য ও অন্যান্য জিনিষপত্র সংগ্রহ করা ও যথাস্থানে পৌছান অতি কঠিন ব্যাপার হইয়াছে।

কার্যটী বিপুল, অথচ আমাদের তহবিলে সামান্যই অর্থ আছে। এইজন্য আমরা সহৃদয় দেশবাসীর নিকট অবিলম্বে অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। এই উদ্দেশ্যে যিনি যাহা দান করিবেন, তাহা নিম্নলিখিত ঠিকানায় সাদরে গৃহীত ও তাহার প্রাপ্তি-স্বীকার করা হইবে:—(১) সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা হাওড়া; (২) কার্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১নং উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা; (৩) কার্যাধ্যক্ষ, অদ্বৈত আশ্রম, ৪নং ওয়েলিংটন লেন, কলিকাতা ১৩।

(স্বাঃ) **স্বামী মাধবানন্দ**
সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন

কাশীপুর উদ্যানবাটী

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম সূত্রপাত হয় কাশীপুর উদ্যানবাটীতে। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে এইখানে স্বামী বিবেকানন্দ-প্রমুখ প্রিয় শিষ্যগণ-সহ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার অপূর্ব জীবনের অন্তিম দিনগুলি অতিবাহিত করেন ও মহাসমাধিতে লীন হন। শুধু ভারতের কেন, সমগ্র জগতের সর্ববিধ কল্যাণকল্পে এই দুই মহাপুরুষের অলৌকিক দান সকলেরই সুবিদিত। কাশীপুরের এই বাটী ও তৎসংলগ্ন এগার বিঘা পরিমাণ ভূমিখণ্ডে স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণ শ্রীগুরুর সেবা ও তাঁহার নির্দেশে সাধন-ভজন করিয়া নিজেদের জীবন গঠন করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্যস্মৃতির সহিত এই স্থান অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। তাঁহার ভক্তগণ ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মপ্রাণ নরনারী স্থানটীকে তীর্থ জ্ঞান করিয়া ভারতের সকল প্রদেশ এবং সুদূর পাশ্চাত্য দেশ হইতেও আসিয়া দর্শন করেন। স্বামী বিবেকানন্দের বিশেষ ইচ্ছা ছিল যে ঐ স্থানটী সঙ্ঘের পক্ষ হইতে লওয়া হয়।

এই সকল কারণে এই স্থানে একটী শাখাকেন্দ্র খুলিয়া অন্যান্য লোকহিতকর কার্যের সহিত গৃহটীকে শ্রীরামকৃষ্ণের আন্তর্জাতিক স্মৃতিভবনরূপে সুরক্ষিত করিবার সঙ্কল্প করা হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তমণ্ডলী ও সহৃদয় জনসাধারণের সহায়তায় ইতিমধ্যে উক্ত বাগানের উত্তর দিকের অর্ধাংশ প্রায় দুই লক্ষ টাকা ব্যয়ে বেলুড় মঠের কর্তৃপক্ষ ক্রয় করিয়াছেন। অপর অর্ধাংশও গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে লওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। পরিকল্পনাটী সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য প্রায় দুই লক্ষ টাকার প্রয়োজন। তন্মধ্যে জনৈক বন্ধু এক লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আরও প্রায় এক লক্ষ টাকা অবিলম্বে আবশ্যক।

আমাদের পৃষ্ঠপোষক ও সহৃদয় জনসাধারণের নিকট প্রার্থনা, তাঁহারা যেন মুক্তহস্তে আমাদিগকে এ কার্যে সহায়তা করেন। সাহায্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় সাদরে গৃহীত এবং তাহার প্রাপ্তি-স্বীকার করা হইবে:—সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা হাওড়া।

(স্বাঃ) **স্বামী মাধবানন্দ**
সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন

উদ্বোধন
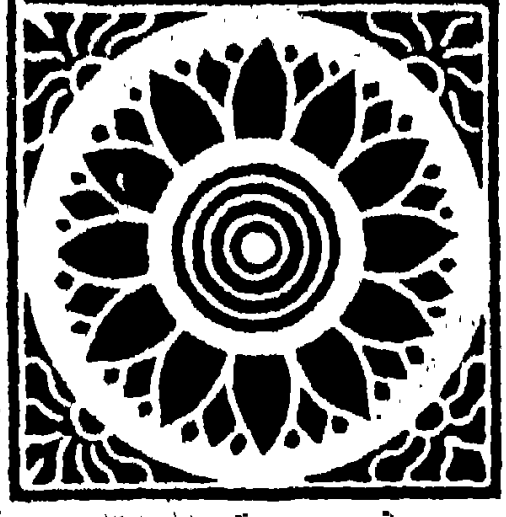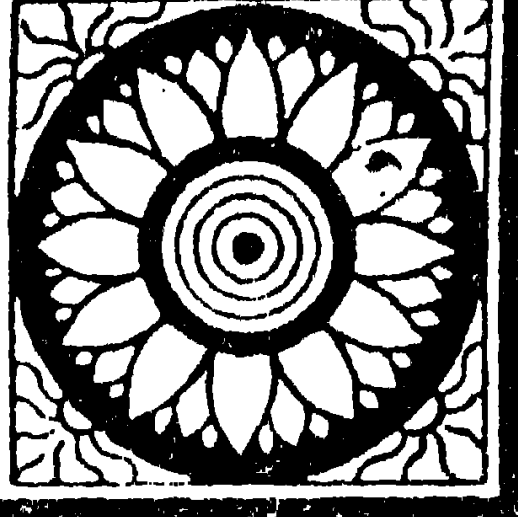
জ্ঞানযোগের মূলতত্ত্ব

সম্পাদক

(২)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মভাবে অধিষ্ঠিত হইয়া বলিয়াছেন, "আমি সকল ভূতের বীজ।"[২১] উপনিষদে আছে, "ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন।"[২২] "ব্রহ্ম হইতে প্রাণ মন সর্বেন্দ্রিয়"[২৩] এবং "আত্মা হইতে আকাশ সম্ভূত হইয়াছে।"[২৪] বেদান্ত দর্শন মতে তমঃপ্রধান বিক্ষেপশক্তিবিশিষ্ট অজ্ঞান উপাধি-যুক্ত চৈতন্য হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল এবং জল হইতে পৃথিবী ভূত-তন্মাত্র উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদিগকে সূক্ষ্মভূত ও অপঞ্চীকৃত (অস্থূল) ভূতও বলা হয়। এই সূক্ষ্মভূত পাঁচটিতে আকাশাদি পর্যায়ক্রমে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পাঁচটি গুণ আছে। সূক্ষ্মভূতপঞ্চকের সত্ত্বাংশ হইতে আকাশাদি পর্যায়ক্রমে শ্রোত্র ত্বক্ চক্ষু জিহ্বা ঘ্রাণ এই পাঁচটি সূক্ষ্মজ্ঞানেন্দ্রিয়, সূক্ষ্মপঞ্চভূতের রজঃ অংশ হইতে আকাশাদি পর্যায়ক্রমে বাক্ পাণি পাদ পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটি সূক্ষ্মকর্মেন্দ্রিয়, এই সূক্ষ্মভূতপঞ্চকের মিলিত সত্ত্বাংশ হইতে অন্তঃকরণ এবং এই সূক্ষ্মভূত পাঁচটির মিলিত রজঃ অংশ হইতে প্রাণ উৎপন্ন হইয়াছে। বিভিন্ন বৃত্তি অনুসারে একই অন্তঃকরণ বিভিন্ন নামে অভিহিত। অন্তঃকরণ বৃত্তি যখন কোন বস্তু দেখিয়া ইহা 'এই বস্তু' এরূপ নিশ্চয় করে তখন উহাকে বুদ্ধি, অন্তঃকরণ বৃত্তি যখন কোন বিষয় সম্বন্ধে সংশয়যুক্ত হইয়া সংকল্প-বিকল্প করে তখন উহাকে মন, অন্তঃকরণ বৃত্তি যখন পূর্বে অনুভূত কোন কিছু স্মরণ করে তখন উহাকে চিত্ত এবং অন্তঃকরণ বৃত্তি যখন 'আমি' ও 'আমার' বলিয়া অনুভব করে তখন উহাকে অহংকার বলা হয়। চিত্ত ও অহংকার এই দুইটি বুদ্ধি ও মনের অন্তর্ভুক্ত বৃত্তি। বুদ্ধি ও মন সূক্ষ্ম-পঞ্চভূতের সাত্ত্বিক অংশজাত। সূক্ষ্মপঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয় বুদ্ধি ও মন প্রকাশস্বভাব বলিয়া উহারা সূক্ষ্মপঞ্চভূতের সাত্ত্বিক অংশের কার্য। বুদ্ধি সূক্ষ্মপঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া বিজ্ঞানময় কোশ নামে অভিহিত। এই কোশ জ্ঞানশক্তিবিশিষ্ট কর্তারূপ। ইহা কর্তা ভোক্তা

২১ বীজং মাং সর্বভূতানাম্। —গীতা, ৭।১০

২২ তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ। —তৈঃ উঃ, ২।৬।১

২৩ এতস্মাৎ জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ। —মুঃ উঃ, ২।১।৩

২৪ তস্মাৎ আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। —তৈঃ উঃ, ২।১

সুখী দুঃখী ইত্যাদি অভিমানী ইহলোক ও পরলোকগামী ব্যবহারিক জীব বলিয়া কথিত। মন সূক্ষ্মপঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া মনোময় কোশ নামে পরিচিত।

প্রাণাদিতে আবির্ভূত পাঁচটি বায়ু আছে; তন্মধ্যে প্রাণ ঊর্ধ্বগমনশীল নাসাগ্রস্থায়ী, অপান অধোধগমনশীল পায়ু আদিস্থানবর্তী, ব্যান সর্বত্র গমনশীল সমগ্র শরীরব্যাপী, উদান ঊর্ধ্ব গমনশীল কণ্ঠস্থায়ী উৎক্রমনোন্মুখ, সমান শরীরমধ্যস্থ ভুক্ত ও পীত অন্নপানাদির সমীকরণ বা পরিপাককরণকারী। এতদ্ভিন্ন উদ্গিরণকারী নাগ, চক্ষুরুন্মীলনকারী কূর্ম, ক্ষুধাজনক কৃকর, হাই উত্তোলনকারী দেবদত্ত ও পুষ্টিবিধানকারী ধনঞ্জয় নামে পাঁচটি বায়ু বিদ্যমান। এই বায়ুগুলি সূক্ষ্মপঞ্চভূতের মিলিত রজঃ অংশ-সম্ভূত। প্রাণাদি পঞ্চবায়ু সূক্ষ্মপঞ্চকর্মেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া প্রাণময় কোশ নামে অভিহিত। এই কোশ ইচ্ছাশক্তিবিশিষ্ট করণরূপ। ইহা গমনাদি ক্রিয়াস্বভাব সূক্ষ্মপঞ্চভূতের রজঃ অংশের কার্য।

বিজ্ঞানময়কোশ মনোময়কোশ ও প্রাণময়কোশ এই কোশত্রয় দ্বারা সূক্ষ্মশরীর বা লিঙ্গশরীর গঠিত। এই শরীর সূক্ষ্মপঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় সূক্ষ্মপঞ্চকর্মেন্দ্রিয় পঞ্চবায়ু মন বুদ্ধি এই সতেরটি অবয়ববিশিষ্ট অপঞ্চীকৃত (অস্থূল)। এই সূক্ষ্মশরীর পৃথক পৃথক বহু বৃক্ষের ন্যায় বহু ব্যষ্টি জীবগত বহুবুদ্ধির বিষয়রূপে বহু এবং এক বনের ন্যায় সমষ্টিজীবগত একবুদ্ধির বিষয়রূপে এক।

সমষ্টিসূক্ষ্মশরীর উপাধিযুক্ত চৈতন্য এক সূত্রের ন্যায় জগতের সকল বস্তুতে অনুস্যূত বলিয়া সূত্রাত্মা, সকল বস্তুর জ্ঞাতা সর্বজ্ঞ বলিয়া হিরণ্যগর্ভ এবং সকল জীবের প্রাণ বলিয়া প্রাণ নামে অভিহিত। হিরণ্যগর্ভের উপাধিরূপ সূক্ষ্মসমষ্টিশরীরকে বিজ্ঞানময়াদি কোশত্রয় এবং স্থূলপ্রপঞ্চের লয়স্থান বলা হয়। ব্যষ্টিসূক্ষ্মশরীর উপাধিযুক্ত চৈতন্য তৈজস নামে কথিত। তৈজসের উপাধিরূপ ব্যষ্টিসূক্ষ্মশরীরকে বিজ্ঞানময়াদি কোশত্রয় এবং স্থূলশরীরের লয়স্থান বলে। হিরণ্যগর্ভ ও তৈজস সূক্ষ্ম মনোবৃত্তিদ্বারা সূক্ষ্ম বা প্রাতিভাসিক বিষয়সমূহ ভোগ করেন। স্বপ্নাবস্থায় প্রাতিভাসিক বিষয় প্রতীতিগোচর হয়। জ্ঞানযোগীর জানা আবশ্যক যে, সমষ্টিসূক্ষ্মশরীর উপাধিযুক্ত হিরণ্যগর্ভ এবং ব্যষ্টিসূক্ষ্মশরীর উপাধিযুক্ত তৈজস বন ও বৃক্ষাবচ্ছিন্ন আকাশের ন্যায় অভেদ।

অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্মভূত হইতে পঞ্চীকৃত স্থূলভূত উৎপন্ন হইয়াছে। পঞ্চভূতের প্রত্যেকটিতে সেই ভূতের অর্ধেক এবং অন্যান্য চারিভূতের প্রত্যেকটি একঅষ্টমাংশ হিসাবে অর্ধেক সমবায়ে পঞ্চীকৃত হইয়া স্থূলপঞ্চভূত সৃষ্ট। যেমন আকাশে অর্ধেকাংশ আকাশ ও অন্যান্য চারিভূতের প্রত্যেকটি একঅষ্টমাংশ হিসাবে অর্ধেক এবং বায়ুতে অর্ধেকাংশ বায়ু ও অন্যান্য চারিভূতের প্রত্যেকটি একঅষ্টমাংশ হিসাবে অর্ধেক বিদ্যমান, ইত্যাদি। ইহাই বেদান্তে পঞ্চীকরণ নামে প্রসিদ্ধ। স্থূলভূত পাঁচটির মধ্যে আকাশে শব্দ, বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ, অগ্নিতে শব্দ স্পর্শ ও রূপ, জলে শব্দ স্পর্শ রূপ ও রস এবং পৃথিবীতে শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধগুণ বর্তমান। পঞ্চীকৃত ভূত হইতে উপরি উপরি ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জন তপঃ ও সত্য, অধোধঃ অতল বিতল সুতল রসাতল তলাতল মহাতল ও পাতাল নামক লোকসকল, জরায়ুজ অণ্ডজ স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চতুর্বিধ শরীর এবং উহাদের ভোগ্য অন্নপানাদি উৎপন্ন হইয়াছে। এই স্থূলশরীরসমূহ পৃথক পৃথক বহু বৃক্ষের ন্যায় বহুবুদ্ধির বিষয়রূপে বহু এবং এক বনের ন্যায় একবুদ্ধির বিষয়রূপে এক।

সমষ্টিস্থূলশরীর উপাধিযুক্ত চৈতন্যকে বিরাট বা বৈশ্বানর এবং ব্যষ্টিস্থূলশরীর উপাধিযুক্ত চৈতন্যকে বিশ্ব বলে। সমষ্টি ও ব্যষ্টি উভয় স্থূলশরীরই

অন্নের বিকার বলিয়া অন্নময়কোশ এবং স্থূল ভোগের আয়তন ও কেবল জাগ্রৎ দশায় বিদ্যমান বলিয়া জাগ্রৎ নামে অভিহিত। বৈশ্বানর ও বিশ্ব শ্রোত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি দ্বারা শব্দাদি বিষয়পঞ্চক, বাক পাণি পাদ পায়ু ও উপস্থ এই কর্মেন্দ্রিয় পাঁচটি দ্বারা যথাক্রমে বচন গ্রহণ গমন ত্যাগ ও আনন্দ এই পাঁচটি বাহ্য বিষয় এবং মন বুদ্ধি অহঙ্কার ও চিত্ত এই অন্তরিন্দ্রিয় চারিটি দ্বারা যথাক্রমে সংকল্প নিশ্চয় অহংকার্য ও চৈত্ত্য এই সকল স্থূলবিষয় ভোগ করেন। এই স্থলেও স্থূলসমষ্টির সহিত স্থূলব্যষ্টির এবং তদুপহিত বৈশ্বানরের সহিত বিশ্বের বন উপাধিযুক্ত আকাশের সহিত বৃক্ষ উপাধিযুক্ত আকাশের ন্যায় অভেদ বুঝিতে হইবে।

যেমন অবান্তর বনসমূহের সমষ্টিতে একটি মহাবন হয়, সেইরূপ এই সকল স্থূলশরীর সূক্ষ্ম-শরীর কারণশরীর ও প্রপঞ্চের সমষ্টিতে একটি মহাপ্রপঞ্চ হইয়া থাকে। এই মহাপ্রপঞ্চের অন্তর্গত বিশ্ব ও বৈশ্বানর হইতে ঈশ্বর পর্যন্ত চৈতন্যও অবান্তর বনাবচ্ছিন্ন আকাশের ন্যায় এক ও অভেদ। এই জন্য জ্ঞানীর দৃষ্টিতে মহাপ্রপঞ্চ উপাধিযুক্ত চৈতন্য তপ্তলৌহপিণ্ডের ন্যায় অপৃথকরূপে "নিশ্চিত সকলই ব্রহ্ম"[২৫] এই বেদান্তবাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করে। এই সকল দৃষ্টান্ত দ্বারা বেদান্তবাদিগণ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপ সত্যবস্তুতে নামরূপের জগৎরূপ অবস্তু বা মিথ্যাবস্তুর আরোপ বা অধ্যারোপ অকাট্য যুক্তি-দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন।

বেদান্তমতে রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় ব্রহ্মবস্তুতে জগৎরূপ অবস্তুর ভ্রম হইতেছে। যে জ্ঞানদ্বারা ব্রহ্মে জগৎভ্রম নষ্ট হইয়া ব্রহ্মবোধ দৃঢ় হয় উহাকে অপবাদ বলে। অপবাদ শব্দে রজ্জুর বিবর্ত যে সর্প, সেই সর্পের রজ্জুমাত্ররূপের ন্যায় বস্তুর বিবর্ত যে অবস্তুস্বরূপ অজ্ঞানাদি প্রপঞ্চ উহার বস্তুমাত্ররূপতা বুঝায়। কারণবস্তুর স্বরূপের অন্যথা না ঘটাইয়া যে কার্য উৎপন্ন হয়, সেই কার্য বিবর্ত নামে অভিহিত। যেমন—রজ্জুর বিবর্ত সর্প। কারণ, সর্পপ্রতীতির দ্বারা রজ্জুর অন্যথা হয় না। পক্ষান্তরে কারণ-পদার্থের স্বরূপের অন্যথা ঘটাইয়া যে কার্য উৎপন্ন হয়, সেই কার্যকে বিকার বলে। যেমন—দুগ্ধের বিকার দধি। কার্যকে যেমন বিবর্ত ও বিকার বলা হয়, সেইরূপ উহাদের কারণকেও বিবর্ত-উপাদানকারণ এবং পরিণামী বা বিকারী উপাদান-কারণ বলে। বেদান্তদর্শন 'দুগ্ধের পরিণাম বা বিকার দধির ন্যায় ব্রহ্মের পরিণাম বা বিকার জগৎ' ইহা অর্থাৎ পরিণামবাদ তথা ব্রহ্মকে পরিণামী উপাদানকারণ বলিয়া স্বীকার করেন না। এই মহান শাস্ত্র রজ্জুর বিবর্ত সর্পের ন্যায় ব্রহ্মের বিবর্ত জগৎ অর্থাৎ বিবর্তবাদ তথা ব্রহ্মকে বিবর্ত-উপাদানকারণ বলিয়া স্বীকার করেন। পরিণামবাদে ব্রহ্ম স্বয়ং তত্ত্বতঃ অন্যথা হন বা অন্য আকার ধারণ করেন। কিন্তু বিবর্তবাদে ব্রহ্ম তত্ত্বতঃ অন্যথা হন না বা স্ব স্বরূপ পরিবর্তন করিয়া অন্য স্বরূপ প্রাপ্ত হন না।

লক্ষ্য করিবার বিষয় যে পূর্ববর্ণিত চতুর্বিধ স্থূলশরীর, ইহাদের ভোগ্যরূপ অন্নপানাদি, আশ্রয়ভূত চতুর্দশ ভুবন এবং উহাদের অবলম্বন-স্বরূপ ব্রহ্মাণ্ড, এই সকলই ইহাদের কারণরূপ পঞ্চীকৃত ভূতমাত্র। পঞ্চীকৃত ভূত ও সূক্ষ্মশরীর সমূহ ইহাদের কারণরূপ অপঞ্চীকৃত ভূতমাত্র। এই অপঞ্চীকৃত ভূতসমূহ উৎপত্তির বিপরীতক্রমে ইহাদের কারণভূত যে অজ্ঞান সেই অজ্ঞান উপাধিযুক্ত চৈতন্যমাত্র। উৎপত্তির বিপরীত ক্রম বলিতে পৃথিবী জলে, জল অগ্নিতে, অগ্নি বায়ুতে, বায়ু আকাশে এবং আকাশ অজ্ঞানে লয় হয়

২৫ সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।—ছাঃ উঃ, ৩।১৪।১

এরূপ বুঝিতে হইবে। এই অজ্ঞান-উপাধিযুক্ত চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বর এবং তাঁহার অবলম্বনস্বরূপ সর্বোপাধিবিমুক্ত চৈতন্যস্বরূপ তুরীয় ব্রহ্ম। এইরূপে বেদান্তবিদ্‌গণ এক অদ্বিতীয় তুরীয় ব্রহ্মে স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ প্রপঞ্চের বিলয় প্রদর্শন করিয়া বলেন, "এক ব্রহ্মই বিদ্যমান, অজ্ঞানবশতঃ তিনি বহুধা কল্পিত হন।"[২৬] ইহাই বেদান্তে অপবাদ নামে অভিহিত।

এই অধ্যারোপ ও অপবাদ অবলম্বনে 'তত্ত্বমসি' [তৎ (ব্রহ্ম) ত্বং (তুমি) অসি (হও)] মহাবাক্যের তৎ ও ত্বং পদার্থের শোধনদ্বারা উভয়ের একত্ব বা অভিন্নত্ব জ্ঞানলাভ করাই জ্ঞানযোগের মূলসাধন। শোধন-প্রক্রিয়া এইরূপ : অজ্ঞানাদির সমষ্টি, ইহার উপাধিযুক্ত সর্বজ্ঞত্বাদি-গুণবিশিষ্ট চৈতন্য এবং ইহার উপাধিবিমুক্ত চৈতন্য—এই তিনটি তপ্তলৌহপিণ্ডবৎ একরূপে প্রতীয়মান হইয়া 'তৎ' পদের বাচ্যার্থ হয়। অজ্ঞানাদির সমষ্টি বলিতে ঈশ্বরের কারণশরীর অজ্ঞানের সমষ্টি, হিরণ্যগর্ভের সূক্ষ্মশরীরের সমষ্টি ও বিশ্বের স্থূলশরীরের সমষ্টি বুঝিতে হইবে। ইহাদের উপাধিযুক্ত সর্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্ট চৈতন্যই ঈশ্বর হিরণ্যগর্ভ ও বিরাটচৈতন্য। ইহাদের উপাধিবিমুক্ত চৈতন্যই তুরীয় ব্রহ্মচৈতন্য। এই সকল 'তৎ'পদের বাচ্যার্থ। এই সকল উপাধিদ্বারা উপহিতের আধারভূত অনুপহিত চৈতন্য বা তুরীয় চৈতন্য 'তৎ' পদের লক্ষ্যার্থ। তুরীয় চৈতন্য বলিবার কারণ এই যে, অদ্বৈত ব্রহ্মে কোনরূপ সম্বন্ধের সম্ভাবনা নাই। অজ্ঞানাদি ব্যষ্টি, ইহার উপাধিযুক্ত অল্পজ্ঞত্বাদিবিশিষ্ট চৈতন্য এবং ইহার উপাধিবিমুক্ত চৈতন্য—এই তিনটিও তপ্তলৌহপিণ্ডের ন্যায় একরূপে প্রতীয়মান হইয়া 'ত্বং' পদের বাচ্যার্থ হয়। অজ্ঞানাদি ব্যষ্টি বলিতে জীবের অজ্ঞানরূপ কারণশরীর সূক্ষ্মশরীর এবং স্থূলশরীর বুঝায়। ইহাদের উপাধিযুক্ত অল্পজ্ঞত্বাদিবিশিষ্ট চৈতন্য বলিতে প্রাজ্ঞ তৈজস ও বিশ্ব এবং ইহাদের উপাধিবিমুক্ত চৈতন্য বলিতে প্রত্যগাত্মা বুঝিতে হইবে। 'ত্বং' পদে এই সকল বুঝায়। এই সকল উপাধিদ্বারা উপহিতের আধারভূত অনুপহিত প্রত্যগানন্দরূপ তুরীয় চৈতন্যই 'ত্বং' পদের লক্ষ্যার্থ। এইরূপ বহুবিধ যুক্তিবিচারদ্বারা তত্ত্বমসি বাক্যের অখণ্ডার্থ বোধ হইলে জ্ঞানযোগীর মনে "যিনি পূর্ণ আনন্দ এক এবং বোধস্বরূপ, সেই ব্রহ্মই আমি"[২৭] এইরূপ অখণ্ডাকারাকারিত চিত্তবৃত্তি বা জ্ঞানের উদয় হয়। এই জ্ঞানালোকে অজ্ঞান-অন্ধকার বিদূরিত হইয়া আত্মস্বরূপ ব্রহ্ম প্রকাশিত হন।

এইরূপ 'অহং ব্রহ্মাস্মি' জ্ঞান বা আত্মস্বরূপ সাক্ষাৎকার না হওয়া পর্যন্ত জ্ঞানযোগীর পক্ষে একনিষ্ঠ সাধন অত্যাবশ্যক। জ্ঞানযোগের সাধন-প্রণালী এইরূপ : শ্রবণ (সমগ্র বেদান্তশাস্ত্রের অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে যে তাৎপর্য তাহা পুনঃ পুনঃ শুনিয়া উহার যাথার্থ্য অবধারণ), মনন (পঠিত ও শ্রুত বিষয় বেদান্তবেদ্য অনুকূল যুক্তিদ্বারা অনবরত অনুচিন্তন), নিদিধ্যাসন (বিজাতীয় দেহাদি জ্ঞান-রহিত অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুসম্বন্ধে সজাতীয় জ্ঞানের প্রবাহ), যম (অহিংসা সত্য অস্তেয় ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ), নিয়ম (শৌচ সন্তোষ তপস্যা স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান), আসন (সিদ্ধ পদ্ম স্বস্তিক প্রভৃতি), প্রাণায়াম (প্রাণনিগ্রহের উপায় রেচক পূরক কুম্ভক), প্রত্যাহার (ইন্দ্রিয়সমূহকে উহাদের বিষয় হইতে ফিরাইয়া আনা), ধারণা (অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে অন্তরিন্দ্রিয় সন্নিবেশ), ধ্যান (অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে অন্তরিন্দ্রিয় বৃত্তিসমূহকে একমুখীকরণ)। এই সকল সাধন অভ্যাস করিলে প্রথমে সবিকল্প

২৬ একং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি।—ঋগ্বেদ, ১০।১১৪।৫

২৭ যৎপূর্ণানন্দৈকবোধস্তদ্‌ ব্রহ্মৈবাহমস্মীতি।

এবং পরে নির্বিকল্প সমাধি লাভ হয়। জ্ঞাতা জ্ঞান ও জ্ঞেয় প্রভৃতি বিকল্পের লয়কে অপেক্ষা না করিয়া অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে তদাকারাকারিত চিত্তবৃত্তির অবস্থিতিকে সবিকল্প সমাধি বলে। জ্ঞাতা জ্ঞান ও জ্ঞেয় প্রভৃতি ভেদের লয়কে অপেক্ষা করিয়া অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে তদাকারা-কারিত চিত্তবৃত্তির অতিশয় একভাবে অবস্থিতিই নির্বিকল্প সমাধি। নির্বিকল্প সমাধি লাভের পথে লয় বিক্ষেপ কষায় ও রসাস্বাদ—এই চারিটি বিঘ্ন আছে। অখণ্ডব্রহ্মবস্তুকে অবলম্বন না করিয়া চিত্তবৃত্তির নিদ্রাকে লয়, অখণ্ডব্রহ্মবস্তুকে অবলম্বন না করিয়া চিত্তবৃত্তির অন্য বিষয় অবলম্বনকে বিক্ষেপ, রাগাদি বাসনাদ্বারা চিত্তবৃত্তির স্তব্ধভাবজন্য অখণ্ড-ব্রহ্মবস্তুর অনবলম্বনকে কষায় এবং অখণ্ডব্রহ্মবস্তুকে অবলম্বন না করিয়া সবিকল্পক আনন্দ আস্বাসনকে রসাস্বাদ বলে। চিত্তকে সম্বুদ্ধ করিলে লয়রূপ বিঘ্ন এবং অধ্যবসায় দ্বারা চিত্তকে একাগ্র করিলে বিক্ষেপ অন্তর্হিত হয়। চিত্তের স্তব্ধভাব দূর করাই কষায় দোষ এবং রসাস্বাদ না করিয়া প্রজ্ঞাদ্বারা নিঃসঙ্গ হওয়াই রসাস্বাদ-বিঘ্ন দূর করিবার উপায়।

সকল বিঘ্ন দূর করিয়া নির্বিকল্প সমাধি-ভূমিতে উপস্থিত হইলে জ্ঞানযোগী জীবন্মুক্ত হন। তিনি অখণ্ড শুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা সকল অজ্ঞানের নাশ করিয়া আপনাকে স্বরূপতঃ অখণ্ড শুদ্ধ তুরীয় ব্রহ্মরূপে প্রত্যক্ষানুভব করেন। ইহার ফলে তাঁহার অজ্ঞান ও উহার কার্যস্বরূপ সঞ্চিত কর্ম এবং সংশয় ও বিপর্যয়াদি বিনষ্ট হওয়ায় তিনি জীবিতাবস্থায় সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হন। জীবন্মুক্ত ব্যক্তি ব্যুত্থিত অবস্থায় ইন্দ্রজালের রহস্যবিদের ন্যায় জগৎকে ইন্দ্রজালবৎ দেখেন। তিনি পূর্ব পূর্ব বাসনাজাত ক্রিয়মাণ কর্মসমূহ নিরপেক্ষ দ্রষ্টার ন্যায় দেহত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত ভোগ করেন। "তিনি জাগ্রৎ অবস্থায়ও সুষুপ্তবৎ বাহ্যবস্তু দেখেন না।"[২৮] দ্বৈতবস্তুকেও তিনি অদ্বৈত দেখেন বলিয়া তাঁহার ভোগকে ভোগ এবং দেখাকে দেখা বলা যায় না। বাহ্যতঃ অজ্ঞের ন্যায় দেহযাত্রানির্বাহের জন্য কর্ম করিয়াও তিনি অন্তঃকরণে আত্মস্থ ও নিষ্ক্রিয়। তাঁহার চক্ষু থাকা সত্ত্বেও তিনি চক্ষুহীনের ন্যায়, মন থাকা সত্ত্বেও তিনি মনহীনের ন্যায় এবং প্রাণ থাকা সত্ত্বেও প্রাণহীনের ন্যায় অবস্থান করেন। জীবন্মুক্ত ব্যক্তি দেহযাত্রানির্বাহের জন্য ইচ্ছা অনিচ্ছা বা পরেচ্ছাবশতঃ সুখ-দুঃখরূপ প্রারব্ধ-কর্মফলসমূহ সম্পূর্ণ অনাসক্তভাবে ভোগ করিয়া থাকেন। তাঁহার ইচ্ছাও কেবল প্রারব্ধ কর্মের ফলমাত্র। এই অবস্থায় তাঁহার নিকট "সকল নামরূপ ভস্মে পরিণত হয় এবং সকল ভূতের অন্তরাত্মাস্বরূপ এক ব্রহ্মমাত্র দর্শন হয়।"[২৯] ইহার ফলে তিনি "অন্তরে বাহিরে সর্বত্র ব্রহ্মের প্রকাশ দর্শন করেন।"[৩০] "দেহবিনাশের সঙ্গে সঙ্গে জীবন্মুক্ত ব্যক্তি প্রারব্ধ কর্মসমূহের বিনাশে অখণ্ড ব্রহ্মরূপে অবস্থিত অর্থাৎ "ব্রহ্মকে জানিয়া ব্রহ্মই হন।"[৩১] তাঁহার প্রাণ উৎক্রমণ না করিয়া পরব্রহ্মে লীন হয় এবং স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ দেহ বিমুক্ত হইয়া তিনি বিদেহ মুক্তি লাভ করেন।

২৮ সুষুপ্তবদ্ যশ্চরতি স মুক্ত ইতি কথ্যতে।
—যোগবাশিষ্ঠ, ৫।১৬।১৯

২৯ একং ভস্ম সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ। —বৃহজ্জাবালোপনিষৎ, ২।১

৩০ অন্তর্বহিশ্চ তৎসর্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ।
—নারায়ণোপনিষৎ

৩১ ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি। —মুঃ উঃ, ৩।২।৯

আরবে অমুসলমান

(পূর্বানুবৃত্তি সমাপ্ত)

অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী

কথিত আছে ইয়ামেন আরবের জন্মস্থান, বাগদাদ আরবের সমাধি। আরব জাতি ইসলামধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের ৪০ বৎসরের মধ্যেই পারস্য জয় করে। ইরাক তার পথপ্রান্তে পড়েছিল। আব্বাস বংশীয় খলিফাদের সময় বাগদাদ বহুকাল মুসলমান জগতের কেন্দ্রস্থল ছিল। এইখানেই কারবালার তীর্থ। মুসলমান আরবশাসিত হলেও ইরাকে বহু অমুসলমান রয়েছে :—ইহুদী—৮৭,৪৮৮

খৃষ্টান--৭৮,৭৯২

অন্যান্য—৪৩,৩০২

ইরাকবাসিগণ মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করা সত্ত্বেও ইসলাম-বিরুদ্ধ মত বহুদিন পোষণ করেছে, তাদের মধ্যে রওয়ানদিয়া, খুররাই মিয়া, খাকান্মিয়া সম্প্রদায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

যদিও তারা মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করেছে তবু তারা প্রাচীন ধর্ম্মবিশ্বাস নষ্ট করে নি। বিখ্যাত ঐতিহাসিক তাবারী বলেন, "রওয়ানদিয়া সম্প্রদায় পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাস করত। তারা বিশ্বাস করত যে যীশুর আত্মা আলীর দেহে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। তারপর ক্রমে বিভিন্ন একাদশ ইমামকে আশ্রয় করেছে।" রওয়ানদিয়া সম্প্রদায় সামাজিক ভাবে প্রত্যেক জিনিসে প্রত্যেক মানুষের অধিকার স্বীকার করেছে, এমন কি স্ত্রীলোক পর্য্যন্ত সমস্ত পুরুষের যৌথ সম্পত্তি। তারা আবু জাফর আল মনসুরকে ভগবানের অবতার বলে অভিনন্দন করেছিল। কিন্তু পরে এই আবু জাফর রওয়ানদিয়া সম্প্রদায়ের উপর বহু নৃশংস অত্যাচার করেন। এই সম্প্রদায় অগ্নিউপাসক, ক্রমশঃ তাদের ভাবধারা আল মোকান্না খোরাসানী, আল বাবাক খোররামী প্রভৃতি দ্বারা প্রচারিত হয়েছিল।

আল মোকান্নার মত অতি অভিনব। তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ সর্ব্বপ্রথমে আদম অবতার, ক্রমশঃ নোয়া, আব্রাহাম, যীশু, তারপর অন্যান্য মহাপুরুষের মধ্যে অবতীর্ণ হন। মহম্মদ, আলী, আলীর বংশজ ইমামগণের মধ্যে অবতীর্ণ হয়ে হয়ে শেষ পর্য্যন্ত আল মোকান্নার দেহে আল্লাহরূপ পরিগ্রহ করেন। আল মোকান্না সর্ব্বদা একটী স্বর্ণনির্ম্মিত মুখোস পরিধান করতেন। কারণ তাঁর মুখে ঈশ্বরের দীপ্তি এত বেশী যে সাধারণ মানুষের চর্ম্মচক্ষু সে ঔজ্জ্বল্যে জ্বলে যাবার ভয় ছিল। মোকান্না ইসলামের চারিটী নিয়ম—জাকাৎ, রমজান, নমাজ, হজ নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন। তাঁর মতে সমস্ত সম্পত্তিতে সকল মানুষের অধিকার—এমন কি সমস্ত স্ত্রীজাতির উপরও সকলের সমান অধিকার। মাজদকের মত তিনি সম্পূর্ণ অনুসরণ করতেন। ইসলামবিরোধী "সিজদা" সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতও তিনি পুনঃ প্রবর্ত্তন করেন। পরে তিনি মহম্মদের মত নতুন চন্দ্র সৃষ্টি করেন। এই চন্দ্র সৃষ্টির জন্য তিনি একটী বিরাট জলকূপ নির্ম্মাণ করে তার ভেতরে পারদ ঢেলে দেন। ফলে যে বিরাট রশ্মি সৃষ্ট হয়, তা বহুদূর থেকে মানুষ দেখতে পায়। তিনি তাঁর প্রিয় শিষ্য ব্যতিরেকে কাউকেও সেই দ্বিতীয় চন্দ্র দর্শনের অনুমতি দান করেন নি।

আব্বাসীয় খলিফা তাঁর বিরুদ্ধে ৭০,০০০ সৈন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু তাঁর শিষ্য সমস্ত মুসলিম দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল—বোখারা, সমরখন্দ, কাস্পিয়ান

সমুদ্র তীরেও তাঁর বহু শিষ্য ছিল। তাঁর শিষ্য যখন যুদ্ধে পরাজিত হল, তিনি তখন এক বিরাট অগ্নিকুণ্ড রচনা করে তার উপর তাম্র ও শর্করা ঢেলে সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দেন।

তাঁর স্ত্রী ও সন্তানগণকে তিনি নিজহাতে বিষ পান করান এবং তারপর তাদের জলন্ত অগ্নি-কুণ্ডে নিক্ষেপ করেন। কারণ জীবিত কি মৃত কোন অবস্থায়ই তাদের তিনি মুসলমান খলিফার হস্তে পতিত দেখতে ইচ্ছা করেন নি। ১৬৯ হিঃতে তাঁর মৃতদেহ খলিফার হস্তে পতিত হয়। এই মোকান্না জীবিতাবস্থায় খলিফার পরম শত্রু ছিলেন।

তাঁর মৃত্যুর পর ট্রানস্ আর্ম্মেয়ানা এবং তুর্কীস্থানে বহু অনুচর তাঁকে ঈশ্বর বলে গ্রহণ করেছিল এবং তাদের বিশ্বাস ছিল যে আল মোকান্না প্রত্যেক যুগে মানবের দেহ পরিগ্রহ করে থাকেন। তাঁর তিরোধান মানুষের শিক্ষার জন্য। তাঁর শিষ্যগণ তাঁর পূজার জন্য বহুস্থানে মসজিদ নির্ম্মাণ করে তাঁকে সম্মান করেছে। তারা অন্য মতাবলম্বী মুসলমানদের অনেক কাল পর্য্যন্ত নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। তারাই পরিশেষে পঞ্চদশ শতাব্দীর ইসমাইলিয়া হত্যাকারী সম্প্রদায় সৃষ্টি করে।

অন্য একটী সম্প্রদায় ইরাকে খ্যাতি লাভ করেছিল। ৫২৭ খৃঃ অব্দে প্রথম কিস্‌রার বংশধর খুর্‌রাম নাম্নী একজন মহিলা এই সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর স্বামী মাজদাক সমস্ত ইরাকে বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। খুর্‌রাম স্বয়ং আল্লাকে অবতার বলে দাবী করেন। তাঁর সম্প্রদায় খলিফা আল্‌মামুন ও আল্‌মুতাসিন-এর সমসাময়িক। বাবাক নামীয় একজন প্রসিদ্ধ খুর্‌রামিয়া দলভুক্ত ব্যক্তির নাম অনুসারে তারা কখনো বাবাকিয়া নামেও পরিচিত। এই সম্প্রদায়ও মোকান্নিয়া ও রওয়ানদিয়াদের মত স্ত্রীলোককে সাধারণ সম্পত্তি বলে দাবী করত। আরমেনিয়ার রাজা এবং বাইজেনটাইন সম্রাট বাবাকের অনুচর ছিলেন। তাদের সৈন্য সাহায্য নিয়ে বাবাক আজরবাইজান এবং পারস্য জয় করেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে বহু অগ্নি-উপাসক ছিলেন। পরে মাজদাক, মানিকান ও আবুমুসালামার সম্প্রদায়ের বহুলোক বাবাক দলভুক্ত হয়। খলিফা মুতামিম বহুকষ্টে বাবাককে হত্যা করেন। খুর্‌রামার মতন বাবাকও স্বয়ং আল্লাহর অবতার বলে বিশ্বাস করতেন। তিনি ঈশ্বরের আলোরূপে উপাসিত হতেন এবং মহম্মদের বংশধরগণকে কখনো শ্রদ্ধা করেন নি। যদিও মহম্মদকে আল্লাহর প্রেরিত বলে বিশ্বাস করতেন। নিজামউলমুলক তাঁর সিয়াসত নামা (II. p. 298) গ্রন্থে এই খুর্‌রামিয়া সম্প্রদায়কে ইসলামবিরোধী বলে উল্লেখ করেছেন।

আর একটী সম্প্রদায় বর্ত্তমানে বেঁচে রয়েছে, তারা আবেদউস্ সয়তান—আবেদ্ অর্থ দাস, আবেদউল্লা অর্থ ঈশ্বর দাস, আবেদউস্ সয়তান অর্থ সয়তানের দাস। তারা সয়তানকে আল্লাহর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য বলে সম্মান করেন। আল্লাহ আদম ও সয়তানকে সৃষ্টি করেন। সয়তান ইঞ্জিল (angel), আদম মানুষ। মানুষ অপেক্ষা ইঞ্জিল শ্রেষ্ঠ। মানুষ পাপগ্রস্ত। সয়তান পাপ করে না। সুতরাং আল্লাহর আদমপ্রীতি সয়তান নীরবে গ্রহণ না করে আল্লাহর প্রতি ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে। মহম্মদ আদমের মতন মানুষ। সুতরাং এই সম্প্রদায় মহম্মদপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম অনুসরণ না করে আল্লাহর প্রবর্ত্তিত সয়তান অনুমোদিত ধর্ম্ম আচরণ করে। এটি অতি অদ্ভুত সম্প্রদায়। মিথ্যা বলে না, রাজ্যলোভ করে না, নিজেদের ধর্ম্মের চরম সত্য স্থানে অস্থানে প্রচারের চেষ্টা করে না। এই আবেদ উস সয়তান ইরাকের পূর্ব্বপ্রান্তে বিভিন্ন স্থানে এখনো ছড়িয়ে রয়েছে।

বর্ত্তমান সময়ে আরবদেশব্যাপী একটি নিখিল আরব আন্দোলন চলেছে। এই আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল মিশর। মিশরের জনসংখ্যা প্রায় ১ কোটী ৭০ লক্ষ। তার মধ্যে শতকরা ১৭ জন খৃষ্টান, ১৫ লক্ষ ইয়ূদী এবং বহু ইটালীয়, ফরাসী এবং গ্রীক ও রয়েছে। ইয়ূদী ও খৃষ্টানগণ অনেকেই আরব আন্দোলন সমর্থন করেন। কিন্তু ইতালীয় গ্রীক এবং ইউরোপীয় জাতীয়তা অক্ষুন্ন রাখছে। তারা তুর্ক জাতির মতন মিসরীদের সঙ্গে মিশে যায় নি। তুর্কগণ মিসরীয় মুসলমানদের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করে মিসরীয় বলে দাবী করে। কারণ তার ফলে অনেক রাষ্ট্রনীতি সুবিধা পাচ্ছে। এই আন্দোলন আরব পালেষ্টাইন সিরিয়া লেবাননে সমর্থিত। কোন কোন মুসলমান এই আন্দোলনের প্রচ্ছদপটে একটি ভবিষ্যৎ মুসলমান রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন দেখছেন। অথচ ভারতবর্ষ, পারস্য ও তুরস্কদেশীয় মুসলমানকে বাদ দিচ্ছেন। পালেষ্টাইনে এই আন্দোলনের কর্ম্মধারা বর্ত্তমানে ইয়ূদী বিতাড়ন নিয়ে ব্যস্ত। লেবানন কিছুতেই মুসলমান আরব-রাষ্ট্রে যোগ দিতে প্রস্তুত নয়। আলকাতাইব দল বলেন আরবের জাতীয়তাবাদ এবং স্বাদেশিকতা এখনো ইতিহাসের কষ্টিপাথরে যাচাই হয় নি। যদি বা লেবানন খ্রীষ্টান মুসলিম আরব সঙ্গে যোগ দেয় তাহা হইলে আবার সেই খিলাফত যুগের মত খৃষ্টানগণ তাহাদের নিজ সত্তা হারিয়ে ফেলবে। লেবাননে মুসলমান্ ইয়ূদী খৃষ্টান বলে কোন পৃথক সত্তা নেই। সেখানে লেবাননই তাদের আদর্শ। সিরিয়া অত্যন্ত জাতীয়তাবাদী এবং রাশিয়ান সমাজতন্ত্রবাদের সমর্থন করে। সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট খৃষ্টান এবং লেবাননের প্রধানমন্ত্রী মুসলমান। পালেষ্টাইনের আরব আন্দোলনের উদ্যোক্তা ডাঃ কানান। মিসরের আরব আন্দোলনের নেতা স্বয়ং রাজা ফারুক। তিনি জাতিতে তুর্ক মহম্মদ আলীর বংশ। তাঁর মাতা ইটালীয়, মাতামহী ফরাসী। স্বয়ং ইবন সৌদ হেজাজের অধিপতি। তিনি আরব আন্দোলনকে কখনো অন্য আরব নেতার হস্তে তুলে দিতে প্রস্তুত নন। ইয়ামন অধিপতি ওহহাবী মতাবলম্বী এবং ইবন-সৌদের জন্মশত্রু। ইরাকের বালক অধিপতি বিখ্যাত বীর ফৈজলের বংশধর এবং মহম্মদের খুল্লতাত পিতামহ হাশেমী বংশের সন্তান। সুতরাং ইবন সৌদের আকস্মিক অভ্যুত্থান ও আধিপত্য স্বীকার করতে তিনি কুণ্ঠা বোধ করেন। ট্রেন্স্ জরডনের আমীর আবদুল্লা বৃটীশের ক্রীড়নক। তিনি সিরিয়া, লেবানন, ট্রেন্সজরডন এবং উত্তর আরবকে কেন্দ্র করিয় পুনরায় খিলাফত স্থাপনের জন্য উৎগ্রীব। এখন প্রধান সমস্যা ইয়ূদী নিয়ে। তুরস্ক নীরব হয়ে বুদ্ধিমানের মত বর্ত্তমানে নিরপেক্ষ দ্রষ্টার পথ অবলম্বন করেছে। অমুসলমান[1] আরবকে কেন্দ্র করে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র একটি নতুন আন্দোলনের চেষ্টা করছে। বিষয়টি জটিল এবং এর সমাধান আরও জটিল।

---

[1]"মহাবল পারস্য আরবের পদানত হল, মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করতে হল, কিন্তু তার ফলে মুসলমান-ধর্ম্ম আর একরূপ ধারণ করলে; সে আরবী ধর্ম্ম ও পারসিক সভ্যতা সম্মিলিত হলো।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

রসায়নী

অধ্যাপক শ্রীসুবর্ণকমল রায় এম্-এস্‌সি

রাসায়নিক দৃষ্টিতে মনুষ্যদেহ পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায় ইহা কতকগুলি মৌলিকের সমষ্টিমাত্র। প্রায় ২০টী মৌলিক বিবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার পেছনে থাকিয়া দেহের পুষ্টি ও সাম্য রক্ষা করিতেছে। কিন্তু ঐ রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলি প্রকৃতই অত্যন্ত জটিল ও দুর্ব্বোধ্য। দেহস্থ মৌলিকদের কাজ যদি সুষ্ঠু ও নিয়মিতভাবে পরিচালিত হয় তবে দেহ সুস্থ থাকে ও আয়ু বৃদ্ধি হয় কিন্তু উহাদের কাজে বাধা সৃষ্টি হইলে দেহ ব্যাধিগ্রস্ত হয়। রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলি এমন সুন্দর ও নিয়মমাফিক্ যে মনে হয় যেন কোন সুনির্দ্দিষ্ট বিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক উহা পরিচালন করিতেছেন। তাঁহার কোন ভুলচুক আছে কিনা সন্দেহ। আমাদের মানসিক ত্রুটি-বিচ্যুতিই দৈহিক অকুশলতা আনয়ন করে। এমন কি মৃত্যুদ্বার উন্মুক্ত হয় তখনই যখন আমরা তাঁহার ঐ রাসায়নিক কার্য্যধারায় সম্যক বাধা সৃষ্টি করি। কতকগুলি মৌলিক এ জীবনের পেছনে বর্ত্তমান। প্রকৃতপক্ষে প্রটোপ্লাজম্ (Protoplasm) নামক যে শারীরিক অংশে জীবনশক্তি নিহিত থাকে তাহার গঠনও কতকগুলি রাসায়নিক মৌলিক দ্বারা। মৃত্যু নাকি এই রাসায়নিক সংগঠনকে ধ্বংস করা। প্রটোপ্লাজ্‌ম্ কতকগুলি নরম পিচ্ছিল কোষের সমষ্টি—রাসায়নিক ভাষায় কতকগুলি মৌলিকের সমাবেশমাত্র। ইহার মধ্যে আছে চর্ব্বি, প্রোটীন ও অন্যান্য বহুবিধ জটিল রাসায়নিক পদার্থ। শেষোক্ত পদার্থগুলির রাসায়নিক সংগঠন অবগত হওয়া যায় নাই। প্রোটীনের মতই উহাদের কতকটা আবার অঙ্গার, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন এবং একটু লবণ দ্বারা উহাদের রাসায়নিক পরিচয়ের সামান্য ইঙ্গিত মিলিতে পারে। অণুবীক্ষণ দ্বারা ঐ আদি জৈবোপাদানকে পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে পর্য্যন্ত ঐ পদার্থটীর রাসায়নিক সংগঠন ঠিক থাকে সে পর্য্যন্ত উহার মৃত্যু নাই। এই সকল দেখিয়া মনে হয় জন্ম-মৃত্যুর পেছনে রসায়নের হাত আছে। এ কর্ত্তব্য সমাধানের জন্য নিশ্চয়ই কোন কর্ত্তার গোপন বুদ্ধি ক্রিয়া করিতেছে। তাঁহার শক্তির তুলনায় আমাদের শক্তি নগণ্য। দুনিয়ার মহামনীষিগণ চিরকাল একথা প্রচার করিয়াছেন। একটি ক্ষুদ্র জুঁই ফুল বা একটি ক্ষুদ্র জোনাকী পোকা এটম বোমার কারিগরগণ এ পর্য্যন্ত তৈরী করিতে পারেন নাই। জুঁই ফুলে আছে অঙ্গার, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সমাবেশ। উহা মাত্র সামান্য তিনটী মৌলিকের যোগক্ষেত্র, তাহাও মানুষ তৈরী করিতে সক্ষম নহে। জোনাকীতে আছে অঙ্গার, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, ফস্‌ফরস্, নাইট্রোজেন এবং কিছু সডিয়াম ও ক্লোরিন। এ কয়েকটী মৌলিককে সমাবেশ করিয়া জীবন্ত আলোর সন্ধান দেওয়াও মানুষের চেষ্টায় সম্ভব হয় নাই। সামান্য সুন্দর সহজ সরল প্রাকৃতিক শরীর পর্য্যন্ত রচনা করিতে মানুষ অপারগ। কাজেই মনে হয় এটমিক বোমার স্রষ্টা ও জুঁই ফুলের কারিগরের মধ্যে একটা সীমাহীন পার্থক্য বর্ত্তমান।

মনুষ্যশরীরে যে সমস্ত মৌলিক আছে তাহাদের বৈচিত্র্যময় সমাবেশ দেখিলে বিস্ময় উৎপাদিত হয়। ইহাতে আছে শতকরা ৬৫ ভাগ অক্সিজেন, ১৮ ভাগ অঙ্গার, আবার তাম্র আছে ·০০১৫ ভাগ,

ম্যানগানিজ আছে ·০০৩ ভাগ। এরূপ ২০টী মৌলিক আংশিক ভাবে ইহাতে বর্ত্তমান। কোন কোন মৌলিক দেহ জুড়িয়া আছে এবং কোন কোন মৌলিক একটি নির্দ্দিষ্ট অঙ্গে বিরাজমান। কোনটা অত্যন্ত বেশী, কোনটা আবার ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মাত্রায় পরিবেশিত হইয়াছে। এ বৈষম্যের পেছনে কি কোন গবেষণা নাই? গবেষণা দ্বারা যদি লবণ চিনি তৈরী হয়, এটোমিক বোমা হয়, তবে এদেহও নিশ্চয় গবেষণার ফল। যদি মনুষ্যসমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সন্তানগণ গবেষক হন, তবে নিশ্চয়ই দুনিয়ায় একজন অতিবৃদ্ধ সনাতন বিজ্ঞ গবেষক আছেন যাঁহার গবেষণায় এ দেহ ও প্রাকৃতিক সবুজ সজ্জা নির্ম্মিত হইয়াছে।

আজকাল এই প্রগতির যুগে "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই" এ কথায় প্রত্যয় বেশী দেখা যায়। কিন্তু যিনি প্রকৃত সহজ, নিরহঙ্কার বৈজ্ঞানিক তিনি গবেষণার চরম উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে একজন নিপুণ অনন্ত শক্তিশালী বৈজ্ঞানিকের পরিচয় পাইয়া থাকেন। তাঁহার কাজের বিশালতা ও মহিমার সঙ্গে মানুষের প্রতিষ্ঠার তুলনা করিলে মানুষকে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মনে হয়। কাজেই বৈজ্ঞানিক গূঢ় রহস্যের সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় বেশী তাঁহারা কখনও অহঙ্কারে আত্মহারা হন না। তাঁহারা সকলেই ঋষিতুল্য পুরুষ। বিরাটের সামান্য ইঙ্গিত পাইয়া তাঁহারা নিজ নিজ কর্ম্মধারায় নিমগ্ন থাকেন। প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানের নামে যে অবিশ্বাসের উৎপত্তি উহার পুষ্টিলাভ হইয়াছে তথাকথিত বৈজ্ঞানিক দ্বারাই বেশী।

সুন্দর

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

সুন্দর তোমা খুঁজিয়া খুঁজিয়া ফিরি
আকাশে বাতাসে পৃথিবী সলিলোপরি।
কুসুম কাননে তরুলতা পানে চাই
ঘাটে মাঠে বাটে তব সন্ধানে ধাই।
মানুষের রূপে জীবজন্তুতে দেখি
সুন্দর তুমি লুকায়ে রয়েছ নাকি।

সুন্দর তোমা খুঁজি খুঁজি নাহি মিলে
কচিৎ কখনো দেখা দেও অবহেলে।
দুর্লভ হয়ে কেবলি লুকায়ে চল
হা হুতাশ মোর নাহি আনে কোন ফল।
তুমি বুঝি ক্রুর আড়ালে দাঁড়ায়ে হাস
কঠিন দণ্ডে আমার মূঢ়তা নাশ।

একদা যখন চিত্ত শান্ত রহে
বিগত-তৃষ্ণ কোন কিছু নাহি চাহে।
সুন্দর তব অসীম বিত্ত লয়ে
অযাচিত তুমি সহসা আসিলে ধেয়ে।
দাঁড়ালে সমুখে ঊর্দ্ধে নিম্নে পাশে
অখিল ধরণী ভরিলে উদার হাসে।

তখনি বুঝিনু সুন্দর তব ঠাঁই
হেথায় হোথায় খুঁজিলে কোথাও নাই
তুমি সনাতন সকলি তোমার গেহ
নির্ম্মল চিতে অজানিতে ধরা দেহ।
আমার আপন অন্তর-লোকে আনি
রাখিনু তোমায় বিশ্ব-সত্য মানি।

সিদ্ধা গোরক্ষ নাথ ও রাণী ময়নামতী

শ্রীসুরেশচন্দ্র নাথ-মজুমদার

রাজা গোপীচাঁদ বা গোবিন্দচন্দ্রের মাতার নাম ময়নামতী। ময়নামতীর পিতার নাম তিলকচাঁদ ও স্বামীর নাম রাজা মানিকচাঁদ। ত্রিপুরা জেলার কুমিল্লার নিকট ময়নামতী পাহাড় অবস্থিত। এখানে রাজা গোপীচাঁদের রাজধানী ছিল (গোপীচাঁদের সন্ন্যাস)। এই রাজ্য রঙ্গপুর ও কামরূপ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। "পিতাপুত্র ও মাতার চরিত্র লইয়া বাংলাভাষায় বহুতর কাব্য বিরচিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে রংপুর অঞ্চলে প্রচলিত মানিকচাঁদের গান ও দুর্ল্লভ মল্লিক রচিত 'গোবিন্দচন্দ্র গীত' মাত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে। নানাস্থান হইতে যে বহুতর ধর্ম্মমঙ্গল বাহির হইয়াছে তাহা উক্ত চরিত্রত্রয়ের আদর্শ লইয়া গ্রথিত" (বিশ্বকোষ)। গ্রীয়ার্সন ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে রঙ্গপুর জেলা হইতে মানিকচন্দ্র রাজার গান সংগ্রহ করিয়া এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ করিলে আমাদের দেশের পণ্ডিতমণ্ডলীর দৃষ্টি সেদিকে পতিত হইয়াছিল। ময়নামতীর গানে গোবিন্দচন্দ্রের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহারই প্রতিচ্ছবি রংপুর অঞ্চলের মানিকচাঁদের গান ও গোবিন্দচন্দ্রের গীতিকা এবং কামরূপের শিবের গীত প্রভৃতিতে দেখা যায়। দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের জনসাধারণের উপর গোপীচাঁদের আখ্যান বেশ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। মারাঠা, হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষায় এ সম্বন্ধে অনেক কাব্য নাটক ছড়া গীত প্রভৃতি বিরচিত হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, তিব্বতেও ইহার প্রচলন দেখা যায়। (A note on the Antiquity of Chittagong compiled from the Tibetan works Pag Samjon Zan of Sumpa Khanpo and Kahbab Lundan of Lama Taranath—By Roy Sarat Chandra Dass, C. I. E, Bahadur—J. A. S. B. 1898, part 1, pp 22-23)।

নাথযোগিগণের মধ্যে গুরু গোরক্ষ নাথই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া ছিলেন। ইনি রাণী ময়নামতীর গুরু। অতি অল্প বয়সে ময়নামতীর বিবাহ হওয়ায় তিনি প্রায়ই পিত্রালয়ে থাকিতেন। সিদ্ধা গোরক্ষ নাথ সে সময় প্রায়ই তিলকচাঁদের বাড়ীতে যাতায়াত করিতেন। ময়নামতীকে দেখিয়া গোরক্ষ নাথের মনে স্নেহের সঞ্চার হইল। তিনি ইঁহাকে মহাজ্ঞান শিক্ষা দিতে চাহিলে ময়নামতী সানন্দে তাঁহার নিকট দীক্ষা নিতে সম্মত হইলেন। এ সম্বন্ধে আবদুল সুকুর মুহাম্মদ বিরচিত এবং ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত "গোপীচাঁদের সন্ন্যাসে" অনেক বিবরণ আছে। তাহাতে দেখা যায় ময়নামতী বলিতেছেন—

"পিতা বোলে জর্ম্মিল কন্না অতি ভাগ্যবান।
শর্ব্বক্ষণ শাস্ত্র পড়ে বড়ো ধর্ম্ম গ্যান॥
এতেক ভাবিয়া পিতা আপোনার মোনে।
পড়িবা কারণে দিল দ্রিজ গুরুর শ্থানে॥
প্রাতেককালে প্রিতিদিনে হশ্তে করি খড়ি।
পড়িবা কারণে জাই গুরুদেবের বাড়ি॥
এহিরূপে শাশ্ত্র পড়ি গুরুর পাটশালে।
উদএ হইল গুরু আমার কপালে॥
গুরুর বাড়ি জাই আমি শাস্ত্র পড়িতে।
দৈব জোগে দেখা হৈল জতি গোর্ক্ষনাথে॥"

—(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস, ২৭ পৃঃ)

গুরু গোরক্ষ নাথের সহিত ময়নামতীর দেখা হইল। এবং গোরক্ষ নাথ ময়নামতীকে দেখিয়া ভাবিলেন—

"এমন যুন্দর রূপ কভু দেখি নাঞি ॥

* * * *

এতো সুন্দর বার্ল্যোক জাবে জমের পুরিতে ॥

গুরু বোলে শঙ্গশারে ক্ষাতি রাখিব।

নিজ নাম দিয়া কর্ন্নাক অমর করিব ॥"

—(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস, ২৭ পৃঃ)

তৎপর গোরক্ষ নাথ ময়নামতীকে বলিলেন—

"গুরু বোলে বাছা যুন আমার ঠাঞি।

শপ্ত দিন হৈল আমি কিছু খাই নাঞি ॥

জাদি বা আমার তরে করাহ ভোজন।

আশিব্যাদ করিব বাছা না হবে মরন ॥"

—(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস, ২৭ পৃঃ)

সিদ্ধার কথা শুনিয়া ময়নামতী—

"গুরুর বচন জদি এতেক যুনিনু।

ফুলটঙ্গির মৈর্দ্ধে নাথেক অনিঞা বৈশানু ॥

ভিঙ্গারের জলে নাথের চরণ ধোলাইনু।

দুইখানি পদুকা নাথের কেশেত মুছিনু ॥

শেবা করিয়া নাথোক জত্যনে রাখিনু।

অর্ন্ন্য(১) আনিতে মোনে হরিশে চলিনু ॥

—(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস, ২৭-২৮ পৃঃ)

এভাবে ময়নামতী গোরক্ষ নাথকে ভোজন করাইলেন। তৎপর—

"হশ্ত(২) ধরি গুরুদেব বৈশাইল শামোনে।

এক নামে চৈর্দ্ধবেদ যুনাইল কানে ॥

নাম বর্ক্ষ যুনি তথন যুর্ন্যেত উড়িনু।

চৈন্ত ভুবন বাছা পর্ব্বকে দেখিনু ॥

থাপা দিয়া গুরুদেবে ধরিল বাম হাতে।

ত্রিধিনি আশোনে (৩) নাম বৈশাইল শাক্ষাতে ॥

এক অক্ষরে তিন নাম (৪) শর্ব্বনামের শার।

শোহি ব্রহ্মনাম গুরু যুনাইল তিনবার ॥

এক নামে অনন্ত নাম অনন্তে এক হএ।

শেহিশে অজপা (৫) নাম গুরুদেবে কএ ॥

এহি নাম জপিনু বাছা আশোন করিয়া।

কি করিতে পারে জম আপনে আশিয়া ॥

আশোনে বসিয়া নাম জপিনু শাক্ষাতে।

ভঙ্গ দিল জরা মৃিত্তু (৬) কাল জম দুতে ॥

জোগ আশোনে জথন শাধিনু নিজ নাম।

গুরুদেবে বোলে বাছা শিদ্ধি হৈল কাম ॥"

—(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস, ২৮ পৃঃ)

এভাবে দীক্ষাদান কার্য্য শেষ হইলে পর গোরক্ষ নাথ—

"শেবোক হইলে বাছা কি নাম তোমার ॥"

উত্তরে ময়নামতী—

"পিতাএ রাখিল নাম যুবুদ্ধি তারাই (৭)।

অথন ভজিনু গুরু জেবা নাম পাই ॥"

গোরক্ষ নাথ নামকরণ করিলেন—

"জোগ পথে হৈল নাম মএনামন্তিরাই ॥"

—(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস, ২৮ পৃঃ)

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে দীক্ষা গ্রহণের পূর্বে ময়নামতীর নাম ছিল তারামা, এবং দীক্ষা গ্রহণের পর গোরক্ষ নাথ ইহাঁর নামকরণ করিয়াছেন ময়নামন্তীরাই (ময়নামতী)।

গুরু গোরক্ষ নাথের বেশভূষা সম্বন্ধে ময়নামতী বলিতেছেন—

"পরিধন ছিল নাথের কপিন করপটি (৮)।

ভুশন আছিল আর কর্ন্নে কর্ন্ন পাটি ॥

মশ্তক মুণ্ডন ছিল মুখে চাপ দাড়ি।

চরনে শোনার খড়ম হশ্তে শোনার নড়ি ॥

১ অন্ন ২ হস্তে ৩ খেচরী মুদ্রায় ?

৪ প্রণব—অ+উ+ম যোগে। ৫ হংসগায়ত্রী। ৬ মৃত্যু। ৭ তারা+আই (মা) অর্থাৎ তারা-মা। ভবানীদাস নামকরণ করিয়াছেন "শিশুমতী আই"। ৮ ছিন্নবস্ত্র।

গলাএ দেখিনু নাথের ইঘোর মেখিলি (৯)।
শিংঙ্গনাদ (১০) ছিল আর বগলে বগলি (১১)॥
উদ্রাক্ষ (১২) ভজাঙ্গ মালা গলাএ শোভন।
কপালে চন্দন ফোটা মুখেত ভূশন (১৩)॥
যুগিরূপ দেখি মোনে না করিনু আন।
গলাএ বশন দিয়া করিনু প্রণাম॥"

—(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস, ২৬-২৭ পৃঃ)

গুরু গোরক্ষ নাথের ময়নামতী গোপীচাঁদকে লাভ করিয়াছিলেন—

"এক পুত্র হৈব তোমার আমি দিলাম বর॥
খামি রশ শেশ পুত্র করিহ ভক্ষণ (১৪)।
তাহা হৈতে হৈবে তোমার গর্ব্ভের শ্রীজন॥
গুপিচন্দ্র নামে পুত্র হইব তোমার।
আঠার বছহর প্রমাঞি হইবে তোমার॥
আঠারো বছহরের জখন হইবে বার্ব্বোক।
তখন করাবে বার্ব্বোক হাড়িফার শেবক॥
জখনে ভজিবে বার্ব্বোক হাড়িফার চরণ।
বাড়িবে পরমাঞি তখন না হবে মরণ॥"

—(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস, ২৯ পৃঃ)

তন্ত্র মন্ত্র চর্চায় ময়নামতীর ডাকিনী আখ্যা হইয়াছিল। জনসাধারণের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে ময়নামতী যমের শক্তির অতীত হইয়াছেন। গোরক্ষ নাথ প্রদত্ত মহাজ্ঞানপ্রাপ্তা ময়নামতীকে মহাদেব পর্য্যন্ত ভয় করিতেন। মহাদেব প্রসঙ্গ ক্রমে বলিতেছেন—

"মোর কথা কন যদি ময়নার বরাবর।
কৈলাস ভুবন মোর কৈর্ব্বে লণ্ড ভণ্ড॥"

—(মানিক চন্দ্র রাজার গান)

গুরুকৃপায় জরা মৃত্যু ব্যাধি ময়নার করতলগত হইল। তাঁহার শরীর অগ্নিতে দগ্ধ হইবে না, জলে ডুবিবে না, অস্ত্রে বিদ্ধ হইবে না। অধিক কি—

"গুরু বোলে দিনে মৈলে মৈনামতী আই।
সূর্য বান্দি মাঙ্গাইব এড়াএড়ি নাই॥
রাত্রিতে পড়িয়া মৈলে মএনামতী আই।
চন্দ্র বান্দি মাঙ্গাইব এড়াএড়ি নাই॥"

—(গোবিন্দচন্দ্র ও ময়নামতী)

স্বামী মানিকচাঁদের মৃত্যু হইলে ময়নামতী যমপুরীতে গিয়া—

"এক লম্ফ দিয়া গোদার পিঠেতে চড়িল।
লোহার মুদ্গর দিয়া ডাঙ্গাইতে লাগিল॥"

—(গোবিন্দচন্দ্র ও ময়নামতী)

স্বামীর মৃত্যু হইলে ময়নামতী সহমরণের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু অগ্নি তাঁহাকে দগ্ধ করিতে পারে নাই—

"উত্যর শিঅরে রাজাক চুলিতে রাখিল।
রাজার বাম পাশে মুনি(১৫) আশোন করিল॥
চত্র পাশে(১৬) কাশ্ট(১৭) তার দিল শাজাইয়া।
মুনির আগ্যাএ (১৮) অগ্নি দিলেন জ্বালিয়া॥
জলিয়া উঠিল জখন ব্রহ্ম হুতাশন।
নিজনাম(১৯) জপে মুনি করিয়া আশন॥
মানিকচন্দ্র পুড়িয়া হইল ভশ্মধুলি।
তিতাবস্ত্রে উঠে মুনি নেঞা ভিজাচুল(২০)॥"

—(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস, ৭ পৃঃ)

৯ মেখলা? ১০ শিঙ্গা। ১১ ঝুলি। ১২ রুদ্রাক্ষ। ১৩ ভস্ম। ১৪ স্বামীর শেষ বয়সে তোমার পুত্র হইবে।

১৫ ময়নামতী। ১৬ চারিদিকে। ১৭ কাষ্ঠ। ১৮ আজ্ঞায়। ১৯ ইষ্টনাম। ২০ ময়নামতী যেমন স্নান করিয়া সিক্তবস্ত্রে আর্দ্রকেশে ছিলেন তেমনই উঠিলেন।

কোরাণের ধর্ম্ম

অধ্যাপক শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র পাল, এম্‌-এ

কোরাণ মুসলমানদের একমাত্র ধর্ম্মগ্রন্থ। ইহাতে পয়গম্বর হজরত মোহম্মদের উপদেশ লিপিবদ্ধ আছে। কোরাণে বর্ণিত ধর্ম্মের নাম ইসলাম। আরবীতে 'ইসলাম' শব্দের অর্থ (আল্লা বা ভগবানের নিকট) 'আত্মোৎসর্গ'।

আরবীতে কোরাণের শব্দগত অর্থ 'পাঠ, আবৃত্তি, বা শিক্ষার বিষয়' অথবা 'যাহা পাঠ, আবৃত্তি বা শিক্ষা করা উচিত'। কোরাণকে অন্যান্য নামেও অভিহিত করা হইয়াছে—যেমন, ফোরকান। ইহার আরবীতে শব্দগত অর্থ যাহা (ভাল মন্দের) পার্থক্য করে, জিকর (উপদেশ বা বর্ণনা), এবং কেতাব বা (আদর্শ বা একমাত্র) বই।

কোরাণ ১১৪টি অধ্যায় বা 'সুরাতে' বিভক্ত। প্রত্যেক অধ্যায় আবার কতকগুলি অংশে বিভক্ত। আরবীতে ইহাকে 'আয়াৎ' বলা হইয়াছে। ইহার অর্থ (আল্লার) চিহ্ন বা রহস্য।

কোরাণের প্রত্যেক বাক্য, আদেশ বা বাণী হজরত মোহম্মদ সর্ব্বশক্তিমান আল্লার নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। কথিত আছে, মোহম্মদ অনেক সময়ই নির্জ্জনে হীরা পর্ব্বতে আল্লার 'তাহান্নুছ' বা ধ্যানে ব্যাপৃত থাকিতে ভালবাসিতেন। হঠাৎ এক পবিত্র রাত্রে (শবে কদর) তিনি আদেশ প্রাপ্ত হন, 'প্রচার কর (কুল্‌), তুমিই আল্লার প্রেরিত পুরুষ, প্রচারক বা পয়গম্বর।' ইহার পর হইতে ২৩ বৎসর ব্যাপিয়া আল্লার আদেশ বা বাণী তিনি ক্রমে ক্রমে প্রাপ্ত হন এবং মক্কা ও মদিনাবাসীদের নিকট ইহা প্রচার করেন। এই বাণীর সমষ্টির নাম হইয়াছে 'কোরাণ'।

কোরাণের ধর্ম্ম বা ইসলামের মূলমন্ত্র—আল্লা (ভগবান) ছাড়া আর সর্ব্বশক্তিমান কেহ নাই (লা আল্লা-ইল্লা-ল্লাহা)। এই ধর্ম্মকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে: 'ঈমান' ও 'দীন'—(মূলমন্ত্রে) বিশ্বাস ও (ইহার) ধর্ম্ম ও কার্য্য-প্রণালী। আল্লার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গেই আসে তাঁহার একাধিপত্যে বিশ্বাস, তাঁহার পয়গম্বর বা পয়গম্বরগণের প্রতি বিশ্বাস, তাঁহার পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ ও শেষ বিচারের দিনের প্রতি বিশ্বাস। ইহা ছাড়া কোরাণের মতে পবিত্র ও সূক্ষ্ম শরীরধারী আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করাও ইসলাম ধর্ম্মের আর এক প্রধান অঙ্গ।

আল্লা সম্বন্ধে কোরাণে বর্ণিত হইয়াছে—"আল্লা ছাড়া শক্তিমান আর কেহ নাই—তিনি চিরন্তন ও চিরঞ্জীব। তাঁহার কোন আলস্য বা জড়তা নাই। এই পৃথিবী ও স্বর্গে যাহা কিছু আছে, সবই তাঁহার। তাঁহার অনুমতি ছাড়া কাহারও কিছু করিবার সামর্থ্য নাই। পূর্ব্বে যাহা ঘটিয়াছে, এবং পরে যাহা ঘটিবে, সবই তিনি জানেন। তাঁহার ইচ্ছা ছাড়া তাঁহার কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে কাহারও কিছু ধারণা করার শক্তি নাই। তাঁহার জন্ম নাই এবং মৃত্যু নাই। তিনিই তোমাকে এই পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন এবং তাঁহার নিকটই তোমাদের আবার একত্রিত হইতে হইবে। তুমি কি সেই শক্তিমানকে দেখিয়াছ? স্বর্গ ও মর্ত্ত্যে সকলই তাঁহার প্রশংসা করিতেছে এবং পাখীরাও তাহাদের পাখা উড়াইয়া তাঁহার প্রশংসা

করিতেছে। প্রত্যেকেই তাঁহার প্রার্থনা ও তাঁহার প্রশংসা করে এবং আল্লা জানেন, তাহারা কি করিতেছে।”—আল্লা সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ, দানশীল, ইহকাল-পরকালের প্রভু, স্বর্গ-মর্ত্ত্যের অধিনায়ক ও জন্মমৃত্যুর কর্ত্তা। তিনি ক্ষমাশীল ও প্রত্যেক মানুষের অতি ক্ষুদ্র গুণ ও দোষটুকুর খাঁটি হিসাবটি পর্য্যন্ত রাখেন। তাঁহার নিকট হইতে বিশ্বাসীদের পুরস্কার না পাইবার কোন কারণ নাই।

কোরাণের মতে হজরত মহম্মদের পূর্ব্বে আরোও অনেক আল্লার প্রেরিত পুরুষ এই পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ আবার যখন অনাচার ও কুসংস্কারে দেশ ভরিয়া গিয়াছে, সেই অবনত অবস্থা হইতে উন্নত করিবার জন্য বিশেষ আদেশ নিয়া আসিয়াছেন। যেমন, মুশা, ঈশা প্রভৃতি। প্রথম শ্রেণীতে হোদ্, শেস্, লোৎ, ইসমাইল প্রভৃতিকে উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বিগণ বিশ্বাস করিয়া থাকেন যে এই প্রেরিত পুরুষগণ সাধারণতঃ কোন গুরুতর অন্যায় কাজ হইতে মুক্ত। তাঁহারা সকলই এক ইসলাম ধর্ম্মই প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

কোরাণের মতে, কোরাণের পূর্ব্বেও আল্লার বাণীরূপে আরোও অনেক ধর্ম্মগ্রন্থ এই পৃথিবীতে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদের দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে। এই ধর্ম্মগ্রন্থের সমষ্টি ১০৪ বলিয়া সাধারণতঃ কথিত হইয়া থাকে। কিন্তু উহাদের প্রায় সমস্তই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে এবং উহাতে বর্ণিত বিষয় সম্বন্ধেও কিছুই আমরা জানি না। কেবল মুশার ‘তোডা’, ঈশার ‘ইন্‌জিল্’, ও মোহম্মদের ‘কোরাণ’ সম্বন্ধেই আমরা বিস্তৃত জানিতে পারি। কিন্তু সময় ও ঘটনা বিপর্য্যয়ে কোরাণের পূর্ব্বে প্রেরিত ধর্ম্ম-গ্রন্থগুলিতে এত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে যে উহাদের উপর বিশ্বাস করা যায় না। কোরাণেও অনেকবারই উল্লেখ আছে যে ইহুদিগণ ও খৃষ্টানগণ দুষ্টবুদ্ধিবশতঃ আল্লার বাণীর অনেক পরিবর্ত্তন ও কদর্থ করিয়াছে।

সূক্ষ্ম শরীরধারী অনেক আত্মার বর্ণনাও কোরাণে আছে। যাহারা উঁহাদের প্রতি কোন আস্থা রাখে না, তাহাদের ‘কাফের’ বা আল্লার প্রতি অবিশ্বাসী বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। এই সকল পবিত্র ও সূক্ষ্মশরীরধারীদের কোন স্থূল শরীর নাই। ইঁহারা অগ্নি হইতে সৃষ্ট। ইঁহাদের কোন লিঙ্গের পার্থক্য নাই। কোন কিছু খাওয়া বা পান করার দরকার হয় না। ইঁহারা সকল সময়ই আল্লার আরাধনা করিতেছেন। তবে ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আল্লার বিশেষ প্রিয়ঃ যেমন, জেব্রাইল, এজরাইল ও ইস্রাফিল প্রভৃতি। ইঁহাদের মধ্যে জেব্রাইলকেই সাধারণতঃ শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হয়। মোহম্মদ আল্লার বাণী এই মহান আত্মার সাহায্যেই ক্রমে ক্রমে প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইঁহার উপরই মানুষের দোষগুণ হিসাব করিবার ভার ন্যস্ত। এইরূপে অন্যান্য সূক্ষ্মশরীরধারীদের উপর অন্যান্য কাজের ভার ন্যস্ত আছে। ‘শয়তান’ও প্রথমে আল্লার একজন প্রিয়-পাত্র ছিলেন, পরে তাঁহার আদেশ অমান্য করায় তাহাকে আল্লার নিকট হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। ইঁহাদের ছাড়া, স্থূলদেহধারী ‘জীন’ বা প্রেতাত্মার উল্লেখও কোরাণে আছে। পানাহার ইঁহাদের দরকার হয় এবং ইঁহারা মৃত্যুর অধীন—তাই মুক্তিও ইঁহাদের দরকার। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ মানুষের মত ইঁহাদিগকেও উদ্ধার করিতে সাহায্য করিয়া থাকেন।

কোরাণের মতে, মানুষের শরীর ও আত্মা সম্বন্ধে মৃত্যুর পর এবং শেষ বিচারের দিনের মধ্যবর্ত্তী সময়েরও বিশেষ বর্ণনা রহিয়াছে। মৃত্যুর পর মুহূর্ত্তেই ‘মুনকের’ ও ‘নকীর’ নামে দুই ভীষণাকৃতি মৃত্যুদূত মৃতের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং কর্ম্মফলানুযায়ী মৃতের শরীর এমন যায়গায় রাখিবে যেখানে ইহা সুখে ও শান্তিতে অবস্থান করিবে। অথবা

দুষ্কর্ম্মের জন্য মারাত্মক জন্তু ও কীটদ্বারা বিচারের দিনের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত দেহ ক্লিষ্ট হইতে থাকিবে।

আত্মা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আত্মা শরীর হইতে পৃথক হইয়া যায় এবং শেষ বিচারের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত একই অবস্থায় অবস্থান করে। ইহাকে কোরাণের ভাষায় বলা হইয়াছে 'বরজাথ'। মানুষ তাহার কার্য্যানুযায়ী ও স্তরভেদে বিভিন্ন ফল লাভ করিবে। পয়গম্বরগণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদের আত্মা 'বেহেস্তে' চলিয়া যায়। অন্যান্য বিশ্বাসীদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে তাঁহারা স্তরভেদে কোন সুখ ও শান্তিপূর্ণ স্থানে বাস করিতে থাকিবেন। অবিশ্বাসীদের আত্মা প্রথমে বেহেস্তে প্রেরিত হয়। কিন্তু সেখানে কোন স্থান না পাইয়া সপ্তম পৃথিবীতে 'সজীন' নামক এক পঙ্কিল স্থানে অনেক দিন পর্য্যন্ত অবস্থান করে। পরে আবার তাহাদের শরীরের সহিত যুক্ত হয়।

শেষ বিচারের কোন নির্দ্দিষ্ট তারিখ কেহই বলিতে পারে না। কেবল আল্লাই ইহার খবর রাখেন। তবে কতকগুলি সঙ্কেত বা চিহ্ন-দ্বারা বুঝা যাইবে যে এই পৃথিবীর ধ্বংসের দিন নিকটবর্ত্তী ও শেষ বিচারের দিন আগতপ্রায়। তখন পৃথিবী অন্যায় ও অত্যাচারে পূর্ণ হইবে। দুষ্টলোক সমাজে শীর্ষস্থান অধিকার করিবে। মানুষের মধ্যে ধর্ম্মবিশ্বাস তিলমাত্রও থাকিবে না। এই রকম আরোও অনেক চিহ্ন বা সঙ্কেতের উল্লেখ আছে। তারপর ইস্রাকিলের শিঙ্গা বাজিয়া উঠিবে। এর পরমুহূর্ত্তে আল্লার বিচার আরম্ভ হইবে। বিচারের ফলানুযায়ী কেহ বেহেস্তে ও কেহ দোজখে যাইবে।

দোজখ ও বেহেস্ত সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা কোরাণে রহিয়াছে। দুষ্টের শাস্তি অনুযায়ী দোজখ্‌কে সাতভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—যেমন, জাহান্নম, হোতামা, জহিম ইত্যাদি। দোজখের অবস্থার বর্ণনাও বিশদভাবে বর্ণিত আছে। সেখানে অতিমাত্রায় শীত ও অতি গরম। কেবলমাত্র অবিশ্বাসীরাই চিরকাল সেখানে অবস্থান করিবে। অন্যথা বিশ্বাসীরা তাহাদের কৃত কর্ম্মানুযায়ী পাপের ফলভোগ করিয়া পরে বেহেস্তে প্রেরিত হইবে এবং আল্লার নৈকট্য লাভ করিবে।

বেহেস্তে চিরবসন্ত বিরাজ করে। চারিদিকে নদী প্রবাহিত। কোনটা দুধের, কোনটা মধুর ইত্যাদি। তা'ছাড়া অফুরন্ত ঝরণা সবসময় প্রবাহিত। কোন কষ্টের ছায়াই সেখানে নাই। কোন কোন 'তফসীর'কার (কোরাণব্যাখ্যাকারী) এই সকল বর্ণনা তুলনামূলক (allegorical) বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

ইসলামের 'দীন' বা ধর্ম্ম ও ইহার কার্য্যপ্রণালীকে চারি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—নামাজ (প্রার্থনা), রোজা (উপবাস), জাকাত (দান), ও হজযাত্রা (তীর্থভ্রমণ)।

প্রত্যেক ইসলামধর্ম্মাবলম্বীর পাঁচবার নামাজ করা অবশ্য কর্ত্তব্য—(১) অতি প্রত্যূষে (ফজর), (২) দ্বিপ্রহরের পরে (জুহর), (৩) সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে (আসর), (৪) সূর্য্যাস্তের পর মুহূর্ত্তে (মাগরেব), (৫) রাত্রের প্রথম প্রহরে (এশা)। ইহা ছাড়া আরো দুইবার নামাজের সময়ের উল্লেখ আছে—শেষরাত্রে (তাহান্নুস) ও সূর্য্যোদয়ের কিছু পরে (জুহা)। এই দুইটি নামাজ যদিও অবশ্য কর্ত্তব্য নয়, তবে ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিরা সাধারণতঃ এই নামাজ করিয়া থাকেন। প্রত্যেকবার নামাজ করিবার পূর্ব্বে মনের ও দেহের পবিত্রতা একান্ত আবশ্যক। দেহের পবিত্রতার জন্য কতকগুলি নিয়মেরও উল্লেখ করা হইয়াছে—যেমন, 'গুসল' ও 'ওজু'। 'গুসল' (স্নান), মৃতের সৎকার প্রভৃতির পর একান্ত আবশ্যক।

কিন্তু 'ওজু' (হাত পা ও মুখ ধুইবার বিশেষ পদ্ধতি) প্রতি নামাজের পূর্ব্বেই করা আবশ্যক।

কোরাণে উল্লেখ আছে যে 'রোজার' নির্দ্দেশ এইজন্য দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে মানুষ দুষ্কর্ম্ম হইতে নিজকে রক্ষা করিতে পারে। প্রকৃত পক্ষে সমস্ত দিন আহার না করিয়া থাকিলেই রোজা রক্ষা করা হইল না—মনকেও আল্লার চিন্তায় লিপ্ত রাখিতে হইবে। রমজান মাসের সম্পূর্ণ একমাস রোজা রক্ষা করিবার নিয়ম রহিয়াছে। তবে কেহ যদি কোন বিশেষ কাজে লিপ্ত থাকেন বা কোন রোগে ভুগিতে থাকেন, তাহা হইলে তাহার রোজা রক্ষা না করিলেও চলিবে। তবে বৎসরের অন্য সময়ে সুযোগ মত যে কোন ত্রিশ দিন রোজা রক্ষা করা উচিত।

কোরাণে 'জাকাত' ও 'সদাক্কাত' নামে দুই রকম দানের উল্লেখ আছে। 'জাকাতের' শব্দগত অর্থ যাহা (যে দান) মানুষকে পবিত্র করে। 'সদাক্কাতের' অর্থ—যাহা (যে দান) আল্লার প্রতি নির্ভর আনয়ন করে। ইসলামধর্ম্মাবলম্বী সকলের জন্যই জাকাত অবশ্য কর্ত্তব্য। সঞ্চয়কারী তাহার আবশ্যকীয় খরচের জন্য আয়ের কতক অংশ রাখিয়া বাকী অংশ গরীব, দুঃখী, ঋণগ্রস্ত, ভ্রমণপথে বিপদ্‌গ্রস্ত, ধর্ম্মযুদ্ধে কারারুদ্ধ ব্যক্তি বা শহিদ্-পরিবার ও সত্যপথান্বেষীদের জন্য অথবা ধর্ম্ম বিস্তারের জন্য দান করিবেন। 'সদাক্কাত' দান সঞ্চয়কারীদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। ইহা অবশ্যকর্ত্তব্য নহে। যাঁহারা আল্লার প্রতি একান্ত নির্ভরশীল তাঁহারাই এ দান করিবার বিশেষভাবে উপযুক্ত।

প্রত্যেক ব্যক্তিকেই জীবনে অন্ততঃ একবার মক্কা শহরের পবিত্র 'কাবা'তে হজ্জ করিতে যাওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। কাবাকে আল্লার ঘর বলা হয়। হজরত মোহম্মদ ও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী পয়গম্বরগণের অনেকেই 'আল্লার ঘর'কে সম্মান করিয়া আসিয়াছেন। নববস্ত্র পরিধান করিয়া কাবা দর্শন করিতে যাওয়া ও আনুষঙ্গিক নিয়মাদি পালন করার বিস্তৃত বর্ণনা কোরাণে রহিয়াছে।

সাংসারিক জীবন সম্বন্ধে নানারকম সদুপদেশ কোরাণে আছে। বিবাহ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, এক ব্যক্তি সাধারণতঃ চারিটি বিবাহ করিতে পারে, তবে স্বামী যদি সকল স্ত্রীর সঙ্গে একই রকম ব্যবহার করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহার এক স্ত্রীর বেশী বিবাহ করা অন্যায়। 'তালাক' বা বিবাহবিচ্ছেদ-প্রথার নির্দ্দেশও কোরাণে আছে। তবে তাহা মানুষের দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য নহে—ইহার অনেক ন্যায়সঙ্গত নিয়ম ও পদ্ধতি রহিয়াছে। তালাক একান্তই দরকার হইলে, কতকগুলি নিয়ম পালন করিয়া সাংসারিক জীবনকে সুখ ও শান্তিপূর্ণ করিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। মোট কথা, সংসারযাত্রা সুশৃঙ্খলভাবে নির্ব্বাহের জন্য সকল রকম সদুপদেশই কোরাণে লিপিবদ্ধ আছে। উদাহরণ স্বরূপ আমি কোরাণের এক অংশ হইতে কয়েকটি উপদেশের উল্লেখ করিতেছি—"আল্লার শরীফ কাহাকেও করিও না। পিতামাতার প্রতি সদয় হও। অভাবের তাড়-নায় ছেলেমেয়েদের হত্যা করিও না, কারণ আল্লাই তাহাদিগকেও তোমাকে পালন করিবেন। আন্তরিক ও বাহ্যিক পঙ্কিলতার আশ্রয় গ্রহণ করিও না। সত্য ছাড়া অন্য কিছুর জন্য কাহাকেও হত্যা করিও না, কারণ ইহা আল্লা কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ। সৎ উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে পিতৃমাতৃহীনদের টাকা পয়সার প্রতি লোভ করিও না। বিচারের সময়, তোমার কোন আত্মীয়ের বিচার হইলেও সৎ বিচার করিবে। তাঁহারাই ধন্য, যাঁহারা আল্লার প্রতি বিশ্বাস আনয়ন করেন ও তাঁহাকে সব সময় সেবা করিয়া থাকেন। আল্লা আদেশ করিয়াছেন যে, তোমরা সৎ ও ন্যায়পরায়ণ হও এবং আত্মীয়-দের প্রাপ্য বিতরণ কর। কোন পাপ, অন্যায় ও অত্যাচারে লিপ্ত হইও না," ইত্যাদি।

অতি সংক্ষেপে কোরাণের মূল বিষয়গুলির একটা সাধারণ পরিচয় দিবার চেষ্টা করা হইল। একটা সুন্দর ও অপূর্ব্ব বিষয়ের উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন মনে করিতেছি। কোরাণের ধর্ম্মে কোন জাতিভেদ নাই। ধনী দরিদ্র, উচ্চ নীচ, শিক্ষিত অশিক্ষিত, ভদ্র অভদ্র, দেশী বিদেশী—ধর্ম্মের ব্যাপারে সকলই সমান। কেবল শক্তি সর্ব্বশক্তিমান আল্লার প্রতি বিশ্বাস থাকিলেই হইল। কাহাকেও হিংসা বা ঘৃণা করা অন্যায়। সর্ব্বশক্তিমান আল্লাই সকলেরই সর্ব্বময় কর্ত্তা।

সদসদ্বিচার

শ্রীরামকৃষ্ণ শাস্ত্রী

বেদান্তশাস্ত্রে সৎ ও অসৎ বলিয়া যে দুইটি শব্দ আছে তাহা লইয়া অনেক তথ্যমূলক আলোচনা দৃষ্ট হয়। এই সৎ ও অসৎ শব্দ দুইটি পরব্রহ্মরূপী মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে কিভাবে প্রযোজ্য তাহাই সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধান্তের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। সমস্ত দৃশ্য জগতের অদৃশ্য অথচ নিত্য পরব্রহ্মরূপী মূলতত্ত্বকে সৎ (সত্য) কি অসৎ (অসত্য-অনৃত) বলিবে, ইহা লইয়া বিভিন্ন টীকাকারের মধ্যে মতদ্বৈধ আছে। এই টীকাকারদের বিভিন্ন মতের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে—ব্রহ্ম অদৃশ্য হইলেও নিত্য, এবং নামরূপাত্মক জগৎ দৃশ্য হইলেও প্রতিক্ষণে পরিবর্ত্তনশীল। সৎ কিংবা সত্য শব্দের ব্যবহারিক অর্থ হইতেছে—(১) চক্ষুর সম্মুখে জাজ্জ্বল্যমান অর্থাৎ ব্যক্ত (কাল উহার বাহ্যরূপ পরবর্ত্তন করুক বা নাই করুক)। দ্বিতীয় অর্থ (২) চক্ষুর অগোচর অর্থাৎ অব্যক্ত হইলেও যে স্বরূপ চিরকাল এক রকমই থাকে, কখনও পরিবর্ত্তিত হয় না। ইহার মধ্যে প্রথম অর্থ যাঁহারা করেন তাঁহারা চক্ষুগোচর নামরূপাত্মক জগৎকে সত্য বলেন, এবং পরব্রহ্মকে তদ্বিরুদ্ধ অর্থাৎ চক্ষের অদৃশ্য সুতরাং অসৎ বা অসত্য বলেন। তৈত্তিরীয় উপনিষৎ বলিয়াছেন—দৃশ্য জগতের প্রতি 'সৎ' ও দৃশ্য জগতের অতীতের প্রতি 'ত্যৎ' (যাহা অতীত) কিংবা 'অনৃত' (চক্ষুর অদৃশ্য) শব্দ প্রয়োগ করিয়া ব্রহ্মের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে, যাহা কিছু মূলে বা আরম্ভে ছিল সেই দ্রব্যই "সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ নিরুক্তং চানিরুক্তং চ। নিলয়নং চানিলয়নং চ। বিজ্ঞানং চাবিজ্ঞানং চ। সত্যং চানৃতং চ। (তৈত্তিরীয় উপনিষৎ ২।৬)। সৎ (চক্ষুর গোচর) এবং 'তাহা' (যাহা অতীত), বাচ্য ও অনির্ব্বাচ্য, সাধার ও নিরাধার, জ্ঞাত ও অবিজ্ঞাত (অজ্ঞেয়), সত্য ও অনৃত—এই দ্বিধাবিভক্তীভূত হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মকে এইরূপ 'অনৃত' বলিলেও অনৃতের অর্থ মিথ্যা নহে; কারণ তৈত্তিরীয় উপনিষদেই কথিত আছে যে, "অনৃত ব্রহ্ম জগতের 'প্রতিষ্ঠা' কিংবা আধার, তাঁহার অন্য আধারের অপেক্ষা নাই, এবং তাঁহাকে যে জানিয়াছে সে অভয় হইয়াছে।" ইহা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, শব্দভেদে ভাবার্থের পরিবর্ত্তন হয় না। তৈত্তিরীয় উপনিষৎ ঋগ্‌বেদের সহিত একমত হইয়া বলিতেছেন—"ওঁ ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্। তদেষাঽভ্যুক্তা। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ। ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি" অর্থাৎ যিনি ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করেন, তিনি ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মস্বরূপ বিষয়ে ঋগ্বেদে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—যিনি সত্য জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ, তিনিই ব্রহ্ম। হৃদয়াকাশস্থিত বুদ্ধি-গুহায় নিহিত সেই ব্রহ্মকে যিনি জানিতে পারেন, তিনি যুগপৎ সমগ্র কামনা ভোগ করেন, তাঁহার আর কোন কামনা অবশিষ্ট থাকে না, কারণ তখন সেই বিপশ্চিৎ ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হন। ইহা হইতেও স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে, অসৎশব্দ এই স্থানে অব্যক্ত অর্থাৎ চক্ষুর অদৃশ্য এই অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। বেদান্তসূত্রে বাদরায়ণাচার্য্যও উক্ত বচনের ঐ একই রূপ অর্থ করিয়াছেন (বেদান্ত-

সূত্র ২।১।১৭)। সৎ কিংবা 'সত্য' এই শব্দের,—চক্ষুতে পরিদৃশ্যমান না হইলেও চিরস্থায়ী কিংবা নিত্য এইরূপ (অর্থাৎ উপরে প্রদত্ত দুই অর্থের মধ্যে দ্বিতীয়) অর্থ যাঁহাদের সম্মত তাঁহারা অদৃশ্য অথচ অপরিবর্ত্তনীয় পরব্রহ্মকেই সৎ কিংবা সত্য নাম দিয়া, নামরূপাত্মক মায়াকে অসৎ অর্থাৎ অসত্য সুতরাং নশ্বর রূপ বলিয়া থাকেন। ছান্দগ্যোপনিষৎ বলিয়াছেন—"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ কথমসতঃ সজ্জায়েত—হে সৌম্য, সমস্ত জগৎ প্রথমে সৎ (ব্রহ্ম) ছিল, যাহা অসৎ অর্থাৎ যাহা 'নাই' তাহা হইতে সৎ অর্থাৎ যাহা আছে তাহা কিরূপে উৎপন্ন হইবে?" আবার ছান্দগ্যোপনিষৎ অন্যত্র বলিয়াছেন—"অসদেবেদমগ্র আসীৎ, তৎ সদাসীৎ, তৎ সমভবত্তদাণ্ডং নিরবর্ত্তত, তৎসম্বৎসরস্য মাত্রামশয়ত, তন্নিরভিদ্যত, তে আণ্ডকপালে রজতঞ্চ সুবর্ণঞ্চাভবতাম্।"

এই নিখিল জগৎ অগ্রে অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ—অনভিব্যক্তনামরূপ ছিল, অর্থাৎ বর্ত্তমানের ন্যায় তৎকালে জগতের কোন প্রকার নাম কিংবা আকৃতি প্রকাশিত ছিল না। কিন্তু একেবারে অসৎই (অস্তিত্বহীন) ছিল না; কারণ অসৎ হইতে কিরূপে সৎপদার্থ জন্মিতে পারে? এইরূপে অসৎকার্য্যই প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। এই স্থলে অধ্যাত্মশাস্ত্রসম্বন্ধীয় ইংরেজ গ্রন্থকারদিগের মধ্যেও, সৎ শব্দ জগতের প্রতীয়মান আবির্ভাব (মায়া) সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইবে, অথবা বস্তুতত্ত্ব (ব্রহ্ম) সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইবে এই বিষয়ে মতভেদ আছে। কাণ্ট জগতের প্রতীয়মান আবির্ভাবকে সৎ বুঝিয়া (Real) বস্তুতত্ত্বকে অবিনাশী বলেন। হেগেল গ্রীন্ প্রভৃতি দার্শনিক পণ্ডিতগণ ঐরূপ আবির্ভাবকে অসৎ বুঝিয়া বস্তুতত্ত্বকে সৎ বলেন। গিরি একই পরব্রহ্মের বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন অর্থে একবার 'সৎ' ও একবার 'অসৎ' এইরূপ পরস্পরবিরুদ্ধ নাম দিয়াছেন। বাচ্য অর্থ এক হইলেও ব্রহ্ম সৎ বা সত্য অর্থাৎ নিত্যস্থায়ী, এবং দৃশ্য জগৎ অসৎ অর্থাৎ নশ্বর এই কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও এই মতের প্রতিধ্বনি দেখিতে পাই—

"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥"

যাহা নাই (অসৎ), তাহা হইতেই পারে না, এবং যাহা আছে (সৎ) তাহার অভাব হয় না। তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ সৎ ও অসৎ উভয়ের অন্ত দেখিয়া উহার স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন। ভগবান্ গীতায় যাহা বলিয়াছেন তাহা অনুধাবন করিলে ইহাই প্রতীয়মান হইবে যে, পরব্রহ্ম সৎ ও অবিনাশী, এবং নামরূপ অসৎ অর্থাৎ বিনশ্বর। বেদান্তসূত্রও বলিয়াছেন—দৃশ্যজগতকে 'সৎ' বলিয়া পরব্রহ্মকে 'অসৎ' বা 'তৎ' (তাহা-অতীত)। ওঁ তৎ সৎ সম্বন্ধেও গীতা বলিয়াছেন—

"ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা॥"

ওঁ তৎ সৎ এই তিনটি ব্রহ্মের নির্দ্দেশ; ওঁ এই যে ত্রিবৃৎ (অ+উ+ম) তাহা ব্রহ্ম। জগৎকারণ বলিয়া অতিপ্রসিদ্ধতা নিবন্ধন আর অজ্ঞানী ব্যক্তিদিগের পরোক্ষ (অপ্রত্যক্ষ) বলিয়া প্রসিদ্ধ থাকায় তৎ শব্দও ব্রহ্মেরই নাম। পারমার্থিক সত্তা, সাধুত্ব প্রশস্ততা প্রভৃতি বুঝায় বলিয়া সৎ শব্দও ব্রহ্মেরই বাচক। "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি শ্রুতিও প্রমাণ। এই শ্লোকের সমস্ত ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম করিলে ইহাই বুঝা যায় যে, 'ওঁ তৎ সৎ' সঙ্কল্পই সমস্ত সৃষ্টির মূল। উপনিষৎ বলিয়াছেন—

"ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত।
ওমিতি হ্যুদ্গায়তি, তস্যোপব্যাখ্যানম্॥"

'ওম্' এই অক্ষরটি ব্রহ্মের অতিপ্রিয় নাম। এই ওঙ্কার অক্ষরকে কর্ম্মাঙ্গ 'উদ্গীথ'রূপে উপাসনা করিবে, অর্থাৎ পরমাত্মার প্রতীকস্বরূপ ওঙ্কারে দৃঢ়তর একাগ্রতা সমুৎপাদন করিবে। 'তৎ' অর্থাৎ তাহা কিংবা দৃশ্য জগতের অতীত, দূরবর্ত্তী অনির্ব্বাচ্য তত্ত্ব; সৎ অর্থাৎ চক্ষুর সম্মুখস্থ দৃশ্য জগৎ। এই তিন মিলিয়া সমস্তই ব্রহ্ম। এই অর্থেই ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

"অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন।"

আমিই অমৃত, মৃত্যু, সৎ (স্থূল দৃশ্য-পদার্থ) এবং অসৎ। এস্থলেও সৎ অর্থ ব্রহ্ম ও অসৎ অর্থ দৃশ্যজগৎ—দুইই ব্রহ্ম।

লাটু মহারাজের কথা

স্বামী সিদ্ধানন্দ

কাহারও ক্রোধ হইলে লাটু মহারাজ বলিতেন, "ওকে ছুঁয়ো না, ও চণ্ডাল হয়েছে, চণ্ডাল ছুঁলে নাইতে হবে।" কেহ রাগের বশীভূত হইয়া কোন অন্যায় করিলে তাহাকে তখন কিছু বলিতেন না, পরে বুঝাইয়া বলিতেন, "রাগের সময় বললে কোন ফল হয় না, বৃথা energy (শক্তি) ক্ষয় হয়, পরে রাগ থামলে বুঝিয়ে দিলে ভাল কাজ হয়।" সাধুরা অন্যায় কাজ করিলে বলিতেন, "ওরে, তোরা আমার কাছে থেকে অন্যায় কচ্ছিস, এতে যে পরমহংসদেবের বদনাম হবে। লোকের মনে সন্দেহ হবে যে এরূপ বুঝি তাঁর শিক্ষা ছিল। তোদের সৎ পবিত্র দেখ্‌লে লোকে বুঝবে যে এরা তাঁর হুকুম মানছে।"

একদিন লাটু মহারাজ বলিয়াছিলেন, "তোদের হাতে টাকা নেই, বেঁচে গেলি। টাকা থাকলে প্রায়ই বদমতলব আসে। টাকাকড়ি থাকবে অথচ সৎ বুদ্ধি হবে, এ ঠাকুরের বিশেষ দয়া।" আর একদিন বলিয়াছিলেন, "কাশীবাস করে শিব দর্শন করা দরকার। আমার ইচ্ছা হয় রোজ শিব দর্শন করি, কিন্তু শরীরে সহ্য হয় না। তোরা আমার নকল করিস না।" কাশীতে হারায়বাগে যে বাড়ীতে তিনি থাকিতেন, উহার নীচের তলায় শিব প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আমাকে ওখানে রোজ গঙ্গাজল, বেলপাতা ও ফুল দিয়ে পূজা করিতে বলিতেন। লাটু মহারাজ মেয়ে ভক্তদের বেশী ঘোরাঘুরি করিতে নিষেধ করিতেন, এবং স্বামী সেবার উপর খুব জোর দিতেন।

জনৈক ভক্ত কাশীতে তাঁহার পিতামাতার কাজ পুরোহিত দ্বারা করাইয়া ছিলেন। এই ভক্তকে লাটু মহারাজ বলিয়াছিলেন, "তুমি যখনই কাশীতে আসবে, ঐ পুরোহিতকে যথাসম্ভব প্রণামী দিও। ইনি কাশীতে তোমার বাপমায়ের কাজ করেছেন।" অপর একজন ভক্তকে লাটু মহারাজ ওকালতি করিতে নিষেধ করেন এবং কাশীতে একটি স্কুলের শিক্ষকের কাজ ঠিক করিয়া দেন। কিন্তু ভক্তটি বেতন কম শুনিয়া বলিলেন, "আমার এত বড় সংসার, এই কম মাইনেতে চলবে না।" তখন তিনি একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তবে তুমি ওকালতি করো।" কিছুদিন পরে এই ভক্তটি অপর একজন উকিল সহ মহারাজের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি খুব খুসী হইলেন। নবাগত উকিলকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া বলিলেন, "এ একেবারে নতুন, একে বেশ ভাল করে উকিলের কাজ শিখিয়ে দাও।"

জনৈক ভক্ত পুত্রশোকে কাতর হইয়া কাশীতে আসেন। হঠাৎ একদিন লাটু মহারাজের নিকট উপস্থিত হইলেন। মহারাজ তাঁহাকে নিকটে বসাইলেন এবং তিনি তিনটি পাশ করিয়াছেন শুনিয়া খুসী হইলেন ও আদর যত্ন করিলেন। দেশে গিয়া ভক্তটি মহারাজকে টাকা পাঠাইয়া ছিলেন। লাটু মহারাজ ভক্তটিকে আর টাকা পাঠাইতে বারণ করিয়া তাঁহার বাপ মায়ের সেবা করিতে উপদেশ দিয়া পত্র লিখিলেন। পরে আমরা জানিতে পারিলাম যে তাঁহার আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। লাটু মহারাজ বলিতেন, "দেবসেবায় অর্থের সদ্ব্যবহার হয় বটে কিন্তু ঠাকুর-দেবতার জন্য

পয়সায় চারটি সন্দেশ, আর মেয়ের জামাই আসলে চার পয়সায় একটি সন্দেশ কিনলে দেবসেবা হয় না।"

লাটু মহারাজ মেয়েদের বলিতেন, "তোমরা মাকে মান। মাকে আদর্শ কর। কেবল মুখে মা মা বললে হবে না।" কোনও ভাল জিনিস আসিলে তিনি তাহা সর্ব্বাগ্রে মায়ের বাটীতে পাঠাইয়া দিতেন। লেখককে মা বলিয়াছিলেন, "লাটু কি কম গা? সে সময় লাটু আমার কত কাজ করত। অন্য ছেলেরা আমার সামনে আসতে পারত না।" আমি মাকে বলিয়াছিলাম, "মহারাজের মেজাজের ঠিক নেই। তাঁর কাছে থাকা কঠিন।" মা আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন, "লাটুর সেবা করলে তোমার কল্যাণ হবে।" লাটু মহারাজ বলিয়াছিলেন, "মা আমার ভূত ভবিষ্যৎ সব জানেন।" আমার সন্ন্যাস লইবার পরে মায়ের চরণ দর্শন করিবার জন্য মন উদ্বিগ্ন হয় এবং মায়ের নিকট যাইবার জন্য লাটু মহারাজের অনুমতি চাই। মহারাজ একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "মার কাছে গেলেই কি সব হয়ে গেল!" তিনি পুরুষদের মায়ের কাছে যাওয়া বেশী পছন্দ করিতেন না, মেয়েদের যাইতে বলিতেন। লাটু মহারাজ সকলের প্রদত্ত খাদ্য গ্রহণ করিতেন না। একদিন একজন ভদ্রলোক অনেক উপাদেয় খাবার আনিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি উহা গ্রহণ করিলেন না এবং কাহাকেও খাইতে দিলেন না। আবার অনেক ভক্তের আনীত সামান্য জিনিস অসুস্থ অবস্থাতেও গ্রহণ করিতে দেখিয়াছি। একদিন আমি বলিয়াছিলাম, "আপনি এরূপ কেন করেন?" তিনি খুব তেজের সহিত বলিয়াছিলেন, "সাধু হলে বুঝতে পারবি।" এখন বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে কাহারও প্রদত্ত জিনিস গ্রহণ করিলে মন বেশ আনন্দিত হয়, আবার কাহারও কোনও জিনিস গ্রহণ করিলে মন নীচ হয়।

লাটু মহারাজ বলিতেন, "অন্তরে শ্রদ্ধা নেই, শুধু বিশ্বনাথ-পূজায় কিছু হবে না। কাশীবাস ও কাশীপ্রাপ্তি বহু ভাগ্যে ঘটে। দেখা যায় কাশী-বাস করছে, হঠাৎ চলে গেল ও সেখানে মৃত্যু হল। কেউ হঠাৎ কাশীতে এসে কাশীপ্রাপ্ত হল।" জনৈক ভক্ত বাড়ী যাওয়ার সময় বলিয়াছিলেন, "মহারাজ, এখন যাই আবার আসব।" উত্তরে তিনি বলিলেন, "আবার আসা হবে কি না হবে, কাশী ছেড়ো না।" লাটু মহারাজ কাশীতে থাকিয়া ব্যবসা করিতে নিষেধ করিতেন এবং বলিতেন, ব্যবসা করলে মন কোথায় চলে যায়—এতে কি কাশীবাস হয়? বরং যারা অন্যত্র থেকে কেবল কাশীর চিন্তা করে তাদের সদ্‌গতি হবে। অবতার-পুরুষমাত্রই কাশীতে এসেছেন। গঙ্গা আছেন, এজন্য কাশীর মাহাত্ম্য আরও বেশী। কাশীবাস করলে অন্য তীর্থের প্রয়োজন হয় না। কাশীতে তেত্রিশ কোটি দেবতা আছেন।" তিনি বেশী তীর্থ-ভ্রমণ পছন্দ করিতেন না—বলিতেন, "আমাদের ঠাকুর কেবল নবদ্বীপ, বৈদ্যনাথ, কাশী ও বৃন্দাবন দর্শন করেছিলেন।" কাশীতে কেহ অন্যায় করিলে বলিতেন, "কেবল কাশীর চিন্তা কর, তবে স্থানমাহাত্ম্য বুঝতে পারবে।" সন্ধ্যা হইলে অন্য প্রসঙ্গ পছন্দ করিতেন না; তখন ধ্যান জপ করিতে বলিতেন। সন্ধ্যার সময় আমি একবার কোনও ভক্তের সহিত গল্প করিতেছি। পরে মহারাজের কাছে গেলে ধমক দিয়া বলিলেন, "সন্ধ্যার সময় জপ করতে হয়।" একদিন জনৈক ভক্ত রাস্তায় অসৎ চিন্তা করিয়া আসিলে তিনি কিছুতেই তাঁহাকে পা ছুঁইতে দিলেন না। আমার সংশয় হইয়াছিল। পরে ভক্তটি এইকথা প্রকাশ করিয়াছিলেন। লাটু মহারাজ বলিতেন, "গুরুর সঙ্গ না করলে কিছু বুঝতে পারা যায় না। গুরুর কৃপায় অসম্ভব সম্ভব হয়।" আবার কখনও বা বলিতেন, "কারও কারও পক্ষে

বেশিদিন গুরুর কাছে থাকলে গুরুর উপর সংশয় হয়।"

আমার পূর্ব্বাশ্রমের জনৈক আত্মীয় কাশীতে কিছুদিন ছিলেন। তাঁহার নাতিটী মারা যাওয়ায় শোকে বড় কাতর হইয়া পড়েন। তিনি কিছুদিন মহারাজের সঙ্গ করেন এবং তাঁহার কথামত তিলভাণ্ডেশ্বরে একমাস ভাগবতপাঠ শ্রবণ করেন। সাধু ভক্ত ও ব্রাহ্মণ ভোজনও করান। তাঁহাকে লইয়া আমাকে কলিকাতা যাইতে হইবে শুনিয়া লাটু মহারাজ বলিলেন, "তোমার যাওয়া খুব দরকার।" কলিকাতা যাইয়াই হঠাৎ আমার সন্ন্যাস গ্রহণের কথা মনে হয় এবং পুজনীয় স্বামী ব্রহ্মানন্দের নিকট হইতে আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করি। ব্রহ্মানন্দ মহারাজ আমাকে বলিয়াছিলেন, "তুই কাশীতে গিয়ে লাটু মহারাজকে 'নমো নারায়ণ' করবি।" আমি বলিলাম যে তা পারিব না। কিন্তু কাশীতে পৌঁছিয়া লাটু মহারাজের ঘরে ঢুকিতেই তিনিই আমাকে "নমো নারায়ণ" করিলেন। তখন আমার মহারাজের কথা মনে হইল। পরে তিনি সাধন-ভজন ও ভগবানের উপর নির্ভরের কথা বলিয়া আমাকে খুব উৎসাহিত করিলেন। বলিলেন, "এখন কনখলে যাও, সেখানে থেকে সাধন-ভজন কর। বর্ত্তমানে তোমার কাশীতে থাকা সুবিধা হবে না।" আমি হৃষীকেশ যাইয়া তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছিলাম। তিনি উত্তরে লিখিলেন, "লোক দেখান চিঠিপত্র দেওয়ার কি দরকার? ভগবানকে পাওয়ার জন্ম কর্ম্ম কর।"

সন্ন্যাস সম্বন্ধে আমাকে একজন আপত্তিকর কথা বলায় আমার দুঃখ হইল। লাটু মহারাজ আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "ও মায়ের নিকট হতে মন্ত্র পেয়েছে, আবার মহারাজ সন্ন্যাস দিয়েছেন, ওর প্রাণে দুঃখ দিলে তার কি গতি হবে তা ভগবানই জানেন।"

লাটু মহারাজ জনৈক ভক্তকে বলিয়াছিলেন, "স্বাবলম্বী না হলে ছেলেদের বিয়ে দিও না। বিয়ে সম্বন্ধে ছেলেদের স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। আগে বাপ-মারা ছেলেমেয়েদের মতের বিরুদ্ধে বিয়ে দিতেন। কোন কোন বাপ-মা ছেলেদের বলেন তোমাদের সামান্য আয়, বুঝে সংসার করবে, আমরা সংসারে থেকে অনেক দুঃখ পেয়েছি।" এই বলিয়া তিনি সংসারের অনেক দোষ দেখাইয়া দিতেন।

অনেক লোককে ব্যবসা করিতে লাটু মহারাজ উৎসাহ দিতেন এবং বলিতেন, "ব্যবসা জানা দরকার। মান-অপমান এক বোধ না হলে ব্যবসা করা যায় না। এইজন্যেই উন্নতি হয় না। সব সময় চাকরদের উপর নির্ভর করা ঠিক নয়। তারা কাঁচা পয়সার মায়া ছাড়তে পারে না। ব্যবসায় খুব খাটতে হয়।"

লাটু মহারাজ একদিন বলিয়াছিলেন, "সংস্কার যাওয়া খুব কঠিন—ভগবানের কৃপা ভিন্ন যায় না। অনেক বড়লোকের ছেলে, কোন অভাব নেই, তবুও চুরি করে। পূর্ব্বজন্মের সংস্কার। সেই জন্যেই ত জন্মান্তর মানতে হয়। শাস্ত্রে বলেছে জন্ম গ্রহণ করে ভাল কাজ করলে মঙ্গল হয়। ভায়ে ভায়ে মিল থাকা খুব দরকার। সকলে সমান রোজগার করতে পারে না। হাতের পাঁচ আঙ্গুল সমান না।" যে বেশী রোজগার করিতে অক্ষম তাহাকে বলিতেন, "এ সংসার কদিনের জন্য, বেশী ভাবিস না, কোনও রকমে সংসার চলে গেলেই হলো।"

তিথি-পরিচয়

শ্রীষষ্ঠীচরণ ভট্টাচার্য্য

জ্যোতিষ-শাস্ত্র বেদের অঙ্গ ; কিন্তু 'পঞ্জিকা' সকল আপ্ত-শাস্ত্র নহে

জ্যোতিষশাস্ত্রের দৃগ্‌বৈজ্ঞানিক চর্চ্চা লোপ হইবার ফলে এক প্রকার কুসংস্কার জন্মিয়াছে যে, হিন্দু-জ্যোতিষ এক অভিনব পদার্থ, ইহার সহিত বিজ্ঞানের কোন সম্বন্ধ নাই, ইহা ঋষি-প্রণীত আপ্ত-শাস্ত্র। এই ভ্রমবশতঃ অনেকে সহজে 'পঞ্জিকা'-সংস্কারের পক্ষপাতী হইতে চাহেন না। এবংবিধ কুসংস্কারের ফলেই স্মার্ত্ত পণ্ডিত মহাশয়েরা স্মৃতিকে জ্যোতিষের মুখাপেক্ষী না করিয়া জ্যোতিষকে স্মৃতির মুখাপেক্ষী করিতে প্রয়াসী হইয়া থাকেন। এজন্য স্মৃতি-শাস্ত্রে অজ্ঞ বা স্বল্প জ্ঞান-বিশিষ্ট কিন্তু জ্যোতিষ-শাস্ত্রে বিশিষ্ট জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তিরাও পঞ্জিকাসংস্কারে সন্দিগ্ধ-চিত্ত হইয়া রহিয়াছেন এবং সন্দর্শন দ্বারা পঞ্চাঙ্গ পঞ্জিকার শুদ্ধাশুদ্ধতা নিরূপণ অবিধেয় মনে করেন। অধিকন্তু যাঁহাদের পাণ্ডিত্যাভিমানাদির সহিত নানারূপ স্বার্থ জড়িত আছে, তাঁহারা এই কুসংস্কারকে আরও পুষ্ট করিবার বিলক্ষণ চেষ্টা করেন।

ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ কখনও গ্রহ, নক্ষত্র ও তিথ্যাদির গণনা-মূলক জ্যোতিষকে 'আপ্ত' জ্ঞান করেন নাই। তাঁহারা প্রাচীন কাল হইতেই সর্ব্বদা আবশ্যক অনুসারে পরিবর্ত্তন করিয়াছেন ও কালান্তরে পরিবর্ত্তনের উপদেশও দিয়াছেন। যাঁহারা মনে করেন যে পঞ্জিকা-সংস্কারকগণ[১] সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতা

কেবল স্মৃতি-গত আংশিক জ্যোতিষিক জ্ঞানে বিপত্তি

জ্যোতিষ-শাস্ত্রানুশীলক বিজ্ঞ পণ্ডিতবর্গ ও শিক্ষিত সমাজ পঞ্জিকা-সংস্কারের পক্ষপাতী হইলেও জনসাধারণ এখনও কাল-গতি-প্রাপ্ত প্রয়োজনীয় সংস্কারপূর্ব্বক শুদ্ধ পঞ্জিকা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তবে অধিকাংশ চিন্তাশীল ব্যক্তিই সাধারণ পঞ্জিকার ভ্রান্তি বুঝিতে পারিয়া যে সকলকে সন্দেহ-নেত্রে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সংশয়-যুক্ত হইয়া পঞ্জিকা বিষয়ে অব্যবস্থিত হইবার কারণ অনেক গুলি আছে। তন্মধ্যে বিশেষ একটি কারণ এই যে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা বহু দিনের অভ্যাস সহজে বর্জ্জনপূর্ব্বক কষ্ট করিয়া জ্যোতিষ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে চাহেন না। তাঁহারা 'স্মৃতির' পুস্তকে যেটুকু সামান্য জ্যোতিষের আভাস পান উহার উপর নির্ভর করিয়া চিন্তা ও কল্পনা বলে জ্যোতিষ সম্বন্ধে ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হন। অজ্ঞাত দেশে ভ্রমণ করিলে যেমন পদে-পদেই পথ-ভ্রম হওয়া অবশ্যম্ভাবী, কেবল 'স্মৃতি'-গত জ্যোতিষ-জ্ঞান-চালিত অনুসন্ধানে জ্যোতিষিক সিদ্ধান্ত করা সেইরূপ ভ্রমাত্মক, ইহাতে সন্দেহ নাই। জ্যোতিষজ্ঞের আবিষ্কৃত নূতন তত্ত্ব শুনিলে, ভ্রান্তি-বিবর্জ্জিত নূতন গণনা-ফল দেখিলে স্মার্ত্তগণ স্মৃতির পুঁথি খুলিয়া মিলাইতে চেষ্টা করেন ; তাঁহারা ভুলিয়া যান যে আকাশের দৃশ্যমান ব্যাপারের সহিত গণনা-ফলের তুলনা করা আবশ্যক, স্মৃতি-শাস্ত্রের শ্লোকের সহিত নহে।

[১] বিশেষ অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে পঞ্জিকা-সংস্কারকগণ ভাস্করাচার্য্যাদি-কথিত কাল-ক্রমে

আনয়ন করিতেছেন, তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে অসাধারণ ধীমান্ পণ্ডিত-প্রবর ভাস্করাচার্য্য জ্যোতিষের বেদাঙ্গত্ব অস্বীকার করেন নাই, কারণ মূল জ্যোতিষ-শাস্ত্র ষড়ঙ্গ বেদেরই অন্যতম অঙ্গ; কিন্তু বেদাঙ্গ বলিয়া তিনি ইহাকে আপ্ত-শাস্ত্র বলেন নাই।

জ্যোতিষ বেদাঙ্গ হইলেও রচিত গ্রন্থ-সমূহ তাৎকালিক

জ্যোতিষকে বেদ-সমূহের অঙ্গ-স্বরূপ বলা হইয়াছে। কারণ—

"বেদাস্তাবদ্ যজ্ঞ-কর্ম্ম-প্রবৃত্তাঃ
যজ্ঞাঃ প্রোক্তাস্তে তু কালাশ্রয়েণ।
শাস্ত্রাদস্মাৎ কাল-বোধো যতঃ স্যাৎ
বেদাঙ্গত্বং জ্যোতিষস্যোক্তমস্মাৎ॥"

—যজ্ঞাদি কর্ম্মের প্রবর্ত্তক বেদ-সমূহ এবং ঐ সকল যজ্ঞাদি কালাশ্রিত অর্থাৎ বিশিষ্ট কালে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। যেহেতু শাস্ত্র হইতে যজ্ঞাদি কর্ম্ম-সাধনের উপযুক্ত কালের জ্ঞান হইয়া থাকে, এই জন্য (বৈদিক যজ্ঞাদির কালজ্ঞান-বোধক) জ্যোতিষ-শাস্ত্রের বেদাঙ্গত্ব সিদ্ধ হইতেছে।

জ্যোতিষকে বেদের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ চক্ষু[২] বলা হইয়াছে। এই জ্যোতিষ-শাস্ত্র দ্বারা নিরূপিত

প্রাপ্ত পরিবর্ত্তনশীল গ্রহ-নক্ষত্রাদির যথাকালীন স্থান সন্দর্শন পূর্ব্বক শৃঙ্খলাবদ্ধ দৃক্-শোধিত সিদ্ধান্তরূপ সংস্কার করিবার পক্ষপাতী; কিন্তু তাঁহারা পাণ্ডিত্যাভিমানাদি-প্রযুক্ত স্বার্থ-পরবশ হইয়া পঞ্জিকা-সংস্কার-বিষয়ে সত্য প্রচার করিতে অগ্রসর হন নাই। পরন্তু যাঁহারা সকল কিছু জানিয়া শুনিয়া সংস্কারের প্রয়োজনীতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াও অশুদ্ধ পঞ্জিকা-প্রকাশনে পরাঙ্মুখ হইতেছেন না, তাঁহাদের যথার্থ ধর্ম্মপ্রাণতা ও তাত্ত্বিক সত্য-প্রিয়তা কতখানি তাহা বিজ্ঞ জনসাধারণের বিশেষ বিবেচ্য বিষয়।

২ "জ্যোতিষাময়নং চক্ষুঃ"—শিক্ষা, ৪১।

কাল পঞ্জিকায় লিপিবদ্ধ হয় মাত্র; পঞ্জিকার অন্য উদ্দেশ্য নাই। সুতরাং পঞ্জিকা জ্যোতিষ-শাস্ত্রেরই আশ্রিত, উহা 'স্মৃতি'-মূলক নহে। এ জন্য পঞ্জিকা-সংস্কার-সম্বন্ধীয় আলোচনা প্রধানতঃ জ্যোতিষ শাস্ত্র দ্বারা পরিচালিত হওয়া আবশ্যক।

জ্যোতিষ-শাস্ত্র সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বদৈশিক—সকল দেশেই জ্যোতিষ শাস্ত্র প্রচলিত। প্রাচীন ভারতের জ্যোতির্ব্বিদগণ তাঁহাদের শাস্ত্রের এই সার্ব্বজনীনত্ব উপলব্ধি করিয়া গিয়াছেন। রোমক, পৌলিশ, যবন প্রভৃতি সিদ্ধান্তের অস্তিত্ব এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে। জ্যোতিষ-শাস্ত্র সার্ব্বদৈশিক ও চাক্ষুষ দৃষ্ট সত্যের উপর উহা নির্ভর করে বলিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় প্রকার জ্যোতিষ-জ্ঞান-সম্পন্ন পণ্ডিতবর্গের দ্বারা পঞ্জিকা-সংস্কার-বিষয়ক আলোচনা হওয়া বিধেয়। কিন্তু দুঃখের সহিত আমরা বলিতে বাধ্য যে, জ্যোতিষে জ্ঞান না থাকিলে বিচারে যে জাতীয় ত্রুটি হওয়া সম্ভব, সেই জাতীয় ত্রুটির সংখ্যা প্রচলিত পঞ্জিকা-সমূহের মধ্যে নিতান্ত অল্প নহে।

জ্যোতির্ব্বিদ্‌প্রবর ব্রহ্মগুপ্ত নিজগ্রন্থ রচনার কারণ লিখিয়াছেন—"ব্রহ্মোক্তং গ্রহ-গণিতং মহতা কালেন যৎ শ্লথীভূতম্ অভিধীয়তে স্ফুটং তজ্জিষ্ণুসুত-ব্রহ্মগুপ্তেন।" এই উক্তি হইতে সহজ বুদ্ধিতে ইহা বোঝা যায় যে জ্যোতিষ-গ্রন্থ তাৎকালিক। কালে ইহার বিপর্য্যয় হয় এবং তখন দৃক্-সিদ্ধির অনুরোধে গ্রন্থান্তর রচনার প্রয়োজন হয়।

দৃক্-সিদ্ধ তিথিই গ্রহণীয়

যদি গ্রন্থ-বিশেষের দৃগ্-বিরোধী তিথি দৃক্-সিদ্ধবৎ স্বীকার্য্য হইত, তাহা হইলে স্বয়ং ব্রহ্মার উক্ত গ্রহ-গণিতে ভ্রান্তি-নিরাসের প্রয়োজন হইত না এবং ব্রহ্মগুপ্তের গ্রন্থান্তর রচনার প্রয়োজন থাকিত না। আচার্য্য মধ্যাধিকারে গ্রহদিগের মধ্য-গতি শিক্ষা দিয়া স্পষ্টাধিকারের প্রারম্ভে

লিখিয়াছেন—"যস্মান্ন মধ্যতুল্যাঃ প্রতিদিবসং দৃশ্যতে গ্রহো ভগণে তস্মাদ্দৃক্তুল্যকরং বক্ষ্যে মধ্যস্ফুটী-করণম্।" এই শ্লোক বলা হইয়াছে যে গ্রহ-গণনা দৃক্-তুল্য করাই স্পষ্টাধিকারের উদ্দেশ্য। এইরূপ গ্রহ-সাধন করিয়া তিথিসাধন করিতে হয়, তাহার প্রমাণ স্পষ্টাধিকারের শেষাংশে লিখিত হইয়াছে—"অর্কোন-চন্দ্রলিপ্তাঃ খ-যম-স্বর-ভাজিতোঃ ফলং তিথয়ঃ গতগম্যে ষষ্টি-গুণে ভুক্ত্যন্তর-ভাজিতে ঘটিকাঃ॥" যে সূর্য্য-স্ফুট ও চন্দ্র-স্ফুট দৃক্-সিদ্ধ করিবার জন্য স্পষ্টাধিকারে লিখিত হইল, সেই স্ফুটের অন্তর হইতে 'তিথি'ও সাধিত হইল। এ তিথি দৃক্-সিদ্ধ, না নিরবচ্ছিন্ন অর্থহীন অঙ্কজাল মাত্র, অথবা যুক্তিহীন কোনও প্রকার কিম্বদন্তী-আশ্রিত ?

কেবল ব্রহ্মগুপ্তের গ্রন্থেই যে এইরূপ দৃক্-সিদ্ধ তিথির আদর তাহা নহে; সূর্য্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থেও অবিকল এইরূপ উপদেশ আছে। এই সিদ্ধান্ত-গ্রন্থেও লিখিত হইয়াছে—"তত্তদ্গতি-বশান্নিত্যং যথা দৃক্‌তুল্যতাং গ্রহাঃ প্রয়ান্তি তৎ প্রবক্ষ্যামি স্ফুটীকরণমাদরাৎ।" এই প্রকার দৃক্-তুল্যতা উদ্দেশ্যে স্পষ্টাধিকারের প্রকরণসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া অধ্যায়ের অন্তে স্পষ্ট উল্লেখ করা হইয়াছে—"অর্কোন-চন্দ্র-লিপ্তাভ্যস্তিথয়ো ভোগ-ভাজিতা গতাগম্যাশ্চ ষষ্টিঘ্নানাভ্যো ভুক্ত্যন্তরোদ্‌ধৃতাঃ।" ইহারও তাৎপর্য্য অবিকল ব্রহ্ম-সিদ্ধান্তের অনুরূপ। এতদতিরিক্ত ভাস্করও স্পষ্টভাষায় বলিয়াছেন—"যাত্রা-বিবাহোৎসব-জাতকাদৌ খেটৈঃ স্ফুটৈরের ফল-স্ফুটত্বম্। স্যাৎ প্রোচ্যতে তেন নভশ্চরাণাং স্ফুট-ক্রিয়া দৃগ্‌গণিতৈক্যকৃদ্ যা।" এই প্রমাণ হইতেও জানা যাইতেছে যে যাত্রা, বিবাহাদি উৎসব ও জাতকের কোষ্ঠী-প্রণয়ন ও বিচারাদি সমস্তই নভশ্চর গ্রহগণের দৃগ্-গণিত-শোধিত যথা-সাময়িক স্ফুটের (গ্রহাবস্থানের) গ্রহণ পূর্ব্বকই করিতে হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সমস্ত সিদ্ধান্ত-গ্রন্থেরই উদ্দেশ্য দৃক্-সিদ্ধি ও তিথি-প্রকরণ ও স্পষ্ট-গ্রহ-মূলক, ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। সোম-সিদ্ধান্ত, ব্রহ্ম-সিদ্ধান্ত, পিতামহ-সিদ্ধান্ত প্রভৃতি গ্রন্থের তিথি 'অর্কোন-চন্দ্র-লিপ্তাভ্যঃ' এই মূল সিদ্ধান্তানুযায়ীই গৃহীত হইয়াছে।

তিথির লক্ষণ

তিথির লক্ষণ আলোচনা করিলেও দেখা যাইবে যে দৃক্-সিদ্ধ তিথির সত্তা প্রমাণিত হয়। সূর্য্য-সিদ্ধান্তে আমরা দেখিতে পাই—

"অর্কাৎ বিনিঃসৃতং প্রাচীং যদ্ যাত্যহরহঃ শশী।
তচ্চান্দ্র-মানম্ অংশৈস্তু জ্ঞেয়া দ্বাদশভিঃ তিথিঃ॥"

'সূর্য্য-সিদ্ধান্ত' স্বয়ং দৃক্-সিদ্ধ সূর্য্য ও দৃক্-সিদ্ধ চন্দ্রের স্ফুটদ্বয়ের অন্তরের প্রতি দ্বাদশ অংশ পরিমিত সংক্রমণের সময়কে 'তিথি' বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। লক্ষণের ব্যতিক্রম ও উদ্দেশ্যের অপলাপ করিবার অধিকার কাহারও নাই। 'সিদ্ধান্ত-শিরোমণি'ও অবিকল সৌর-পুস্তকের লক্ষণ গ্রহণ করিয়াছেন—

"চন্দ্রার্কয়োরন্তর-ভাগৈর্দ্বাদশভিরেকৈকা তিথির্ভবতি।"

'বশিষ্ঠ-সিদ্ধান্ত' বলিতেছেন—

"সূর্য্যান্নির্গত্য যৎ প্রাচীং শশী যাতি দিনে দিনে।
লিপ্তাদি-সাম্যে সূর্য্যেন্দু তিথ্যন্তেঽর্কাংশকৈস্তিথিঃ॥"

এইরূপ 'বিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তর'-এর তিথিও সূর্য্য-চন্দ্রের স্ফুটের অন্তররূপেই গৃহীত হইয়াছে—

"আদিত্যাদ্ বিপ্রকৃষ্টস্তু ভাগ-দ্বাদশং যদা।
চন্দ্রমাঃ স্যাত্তদা রাম তিথিরিত্যভিধীয়তে॥"

সুতরাং সকল সিদ্ধান্ত-গ্রন্থ অনুসারেই দেখা যাইতেছে যে দ্রুতগামী চন্দ্রের ও সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী দূরত্বের প্রতি দ্বাদশ অংশ পরিমিত ভাগ সংক্রমণে গৃহীত সময়কেই এক-এক 'তিথি' বলে। চন্দ্রের মধ্য আনয়ন মধ্যমাধিকারের অন্তর্গত; চন্দ্রের স্পষ্ট-স্ফুট-নিরূপণ-প্রণালী স্পষ্টাধিকারের আলোচ্য অংশ; এবং রবি ও চন্দ্রের স্পষ্ট-স্ফুট হইতে

তিথি-সাধন স্পষ্টাধিকারের বা তৎপরবর্ত্তী অধিকার বা অধ্যায়ের অন্তর্নিবিষ্ট।

'বিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তর'-অন্তর্গত 'পিতামহ-সিদ্ধান্তে' উল্লিখিত হইয়াছে—"অনাদি-নিধন-কালঃ প্রজাপতির্বিষ্ণুঃ। তস্য গ্রহ-গত্যনুসারেণ জ্ঞানং গণিতম্।" স্বয়ং 'বিষ্ণু' ও 'কাল' যদি অভিন্ন হন, এবং সেই কালের জ্ঞান যদি গ্রহ-গতির অনুরূপ হয়, তাহা হইলে উহার কিরূপ সংজ্ঞা দাঁড়ায়? 'বৃদ্ধ-বশিষ্ঠ-সিদ্ধান্তে' কালকে বিষ্ণু বলিয়া বন্দনা করা হইয়াছে—

"নমস্তে চিৎস্বরূপায় পরায় পরমাত্মনে।
যোগি-ধ্যেয়ায় শাস্তায় কালরূপায় বিষ্ণবে॥"

স্পষ্টাধিকারের প্রারম্ভে 'সূর্য্য-সিদ্ধান্ত'ও বলিয়াছেন—

"অদৃশ্যরূপাঃ কালস্য মূর্ত্তয়ো ভগণাশ্রিতাঃ।
শীঘ্র-মন্দোচ্চ-পাতাখ্যা গ্রহাণাং গতি-হেতবঃ॥"

সুতরাং কালের অদৃশ্য মূর্ত্তি-সমূহ গ্রহদিগের গতির হেতু। গ্রহ-গতি হেতু-অনুসারেই হইবে। হেতু অনুযায়ী গ্রহ-গতি আকাশে পরিদৃশ্যমান হইবে; অর্থাৎ যে গণনা গ্রহ-গতির মূল-ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত তাহার ফল আকাশে তদনুরূপ অবশ্য দৃষ্ট হইবে।[৩]

দৃক্-সিদ্ধি-সম্বন্ধে ভাস্করাচার্য্য

ভাস্করাচার্য্য গ্রন্থারম্ভে বলিয়াছেন—"অথ নিজকৃত-শাস্ত্রে তৎপ্রসাদাৎ পদার্থান্ শিশু-জনঘুণয়াহং ব্যঞ্জয়াম্যত্র গূঢ়ান্।" শুধু তাহাই নহে, গোলাধ্যায়ে তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, তাঁহার পুস্তকে বহু নূতন বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে, যে সকল বিষয় পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যগণ আলোচনা করেন নাই।—"অত্র যা যা অপূর্ব্বা নান্যৈরুক্তা উক্তয়ো বিষমাস্তাস্তাঃ সংক্ষেপাদ্ বিবৃণোমি।" সুতরাং ইহা হইতে আমরা এ সিদ্ধান্তে অনায়াসে উপনীত হইতে পারি যে জ্যোতিষ-শাস্ত্র বেদাঙ্গ বটে, কিন্তু জ্যোতিষ গ্রন্থ-সমূহ মনুষ্য-কৃত শাস্ত্র, ইহাতে নূতন তথ্য সন্নিবিষ্ট হইতে পারে; পর্য্যবেক্ষণে নূতন বিষয় প্রাপ্ত হইলে বা পুরাতনে ভ্রম দেখিলে মনুষ্য সাধ্যমত জ্যোতিষ-গ্রন্থের পরিবর্ত্তন[৪] করিতে পারে।

সূর্য্য ও চন্দ্র যে জ্যোতিষ-শাস্ত্রের সত্যতার সাক্ষী স্বরূপ, তাহাদের যথাসাময়িক দৃক্-সিদ্ধ স্পষ্ট অবস্থানমূলক কাল-জ্ঞানই বেদাঙ্গ জ্যোতিষ-শাস্ত্রের মূল উপজীব্য বিষয়। সূর্য্য-চন্দ্রাদির অবস্থিতির গণনা দৃক্‌সিদ্ধ না হইলে তাহা হইতে প্রাপ্ত (যজ্ঞাদি নানাবিধ অনুষ্ঠানের জন্য) তিথ্যাদি রূপ কাল-জ্ঞানও অভ্রান্ত হইতে পারে না।

৩ কিন্তু যে গণনা কালান্তর-প্রাপ্ত অশুদ্ধি-যুক্ত অঙ্ক-জাল-মাত্রে প্রতিষ্ঠিত এবং সিদ্ধান্ত-গ্রন্থোপদিষ্ট যথাসাময়িক গ্রহ-গতির মূলভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে, তাহার ফল কতখানি নির্ভুল ও আকাশে দৃক্-সিদ্ধ হইবে, তাহা সুধী পণ্ডিত-সমাজের সকলেই অনুধাবন করিবেন ইহাতে সন্দেহ নাই।

৪ জ্যোতিষ-শাস্ত্র সূর্য্য-চন্দ্রাদি গ্রহগণের গতির উপরে প্রতিষ্ঠিত। এজন্য সিদ্ধান্তকারগণ স্পষ্ট বলিয়াছেন যে কয়েক শত বৎসর পরে যখন গ্রহগণের গতি বিষম হইয়া পড়ে, তখন নলিকাদি যন্ত্র-সহায়ে আকাশে তাহাদের পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক যথাসাময়িক দৃক্-সিদ্ধ সূর্য্য-চন্দ্রাদির গতি অনুযায়ী পূর্ব্ববর্ত্তী জ্যোতিষ-গ্রন্থসকলের সংশোধন করিয়া লইতে হইবে। কয়েক শত বর্ষ মধ্যেও আমাদের জ্যোতিষ-গ্রন্থের দৃক্-শোধিত সংশোধন করা হয় নাই। এজন্য বর্তমানে প্রাচীন জ্যোতিষ-গ্রন্থোক্ত সারণী অনুসারে "পঞ্জিকা" গণনায় অনেক বৈষম্য ও দৃক্-বিরোধী ভ্রান্তি হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং কালান্তর-প্রাপ্ত সাময়িক সংস্কার-রহিত প্রাচীন সারণীসমূহসম্ভূত প্রচলিত বঙ্গীয় পঞ্জিকাসমূহে তিথি, নক্ষত্র ও গ্রহ-গণনায় ভুলগুলি দূর করিয়া হিন্দু-ধর্ম্মের কৃত্যানুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য ও পবিত্রতা রক্ষার নিমিত্ত দৃক্-জ্ঞান-শোধিত গণনামূলক বিশুদ্ধ তিথি, নক্ষত্র ও গ্রহাবস্থানযুক্ত পঞ্জিকার প্রণয়ন করা আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যে পঞ্জিকা-সংস্কারের আলোচনামূলক প্রবন্ধ-সমূহ ধর্ম্মপ্রাণ জন-সমাজের অবগতি ও বিবেচনার জন্য কিছুদিন হইল "উদ্বোধনে" প্রকাশ করা হইতেছে।

দৃগ্‌জ্ঞান-প্রাপ্ত অয়ন-গতি ও ক্রান্তি-পাত সম্বন্ধে ভাস্করাচার্য্য

অয়ন-গতি সম্বন্ধে ভাস্করাচার্য্য বলিয়াছেন—"তৎ কথং ব্রহ্মগুপ্তাদিভিঃ নিপুণৈরপি ন উক্ত ইতি চেৎ। তদা স্বল্পত্বাৎ তৈর্ন উপলব্ধঃ। ইদানীং বহুত্বাৎ সাম্প্রতৈঃ উপলব্ধঃ। অতএব তস্য গতিঃ অস্তি ইতি অবগতম্।" সুনিপুণ ব্রহ্মগুপ্ত অয়ন-গতি স্বীকার করেন নাই বলিয়া এ গতি উপেক্ষা করিতে হইবে, ইহা জ্যোতিষে হইতে পারে না। ব্রহ্মগুপ্তাদির সময়ে অয়নাংশ (সায়ন ও নিরয়ণ আদি-বিন্দুদ্বয়ের অন্তর—The total Precessions of the Equinoxes) অত্যন্ত অল্প ছিল বলিয়া উপলব্ধ হয় নাই। এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত অয়ন-গতি* বিপুলায়তন হইয়াছে বলিয়া আমরা ঐ গতি বুঝিতে পারিতেছি। প্রত্যক্ষ দ্বারা যাহা উপলব্ধ হইবে তাহাই এ শাস্ত্রে গ্রহণীয়। এ কথার সত্যতা তাঁহার এই উক্তি হইতে স্পষ্ট বোঝা যায়। ভাস্করাচার্য্য বলিয়াছেন—"ন হি ক্রান্তিপাতো নাস্তীতি বক্তুং শক্যতে। প্রত্যক্ষেণ তস্যোপলব্ধত্বাৎ।" ক্রান্তিপাতাদি সকল বিষয়ই পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্য দ্বারা যাহা উপলব্ধ হইয়াছে, তাহা যে চিরকাল একরূপ থাকিবে ও পরবর্ত্তী কালেও পূর্ব্ব-রূপই গ্রহণ করিতে হইবে, ইহা প্রত্যক্ষমূলক (দৃক্‌সিদ্ধ) জ্যোতিষ-শাস্ত্রে রক্ষণশীল ব্যক্তিগণের এক বিরুদ্ধ কল্পনা। কারণ ভাস্করাচার্য্য ক্রান্তি-পাতকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—"যদা যেহংশা নিপুণৈরুপলভ্যন্তে, তদা স এব ক্রান্তিপাত ইত্যর্থঃ।" এস্থানে ক্রান্তি-পাত সম্বন্ধে প্রসঙ্গতঃ এরূপ বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু এই নিয়মটি সনাতন ও জ্যোতিষ-শাস্ত্রে সর্ব্ব বিষয়ে প্রয়োজ্য। সুতরাং কালক্রমে যখন যাহা উপলব্ধ হইবে তখন তাহাই এ শাস্ত্রে গ্রাহ্য। একটু স্থিরভাবে বিবেচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীতি জন্মিবে যে সূর্য্যসিদ্ধান্তের "কালভেদোঽত্র কেবলম্" বিশ্লেষণ করিলে প্রত্যক্ষ উপলব্ধ সত্য গ্রহণের উপদেশ হইয়া দাঁড়ায়। সৌর-পুস্তক যাহা এক কথায় শেষ করিয়াছেন, ভাস্কর তাহাই স্পষ্ট প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিয়াছেন।

গোল-জ্ঞান

ভাস্করাচার্য্য বলিয়াছেন গোল-জ্ঞান বিনা জ্যোতির্ব্বিদের কোনও মূল্য নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে জ্যোতিষে দৃক্-সিদ্ধির আবশ্যকতা না থাকিলে গোল-জ্ঞান নিষ্প্রয়োজন হইত। 'গোল' কি পদার্থ তাহা বুঝাইতে গ্রন্থকার বলিয়াছেন—

"দৃষ্টান্ত এবাবনিভগ্রহাণাং সংস্থানমান-
প্রতিপাদনার্থম্।
গোলঃ স্মৃতঃ ক্ষেত্র-বিশেষ এব প্রাজ্ঞৈরতঃ
স্যাদ্ গণিতেন গম্যঃ॥"

এখানেও স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে আকাশের যথার্থ জ্যোতিষ্কবৃন্দই গণকের লক্ষ্য। সেই সকল

* অয়ন-গতি প্রতি বৎসরে প্রায় ৫০″২৬ বিকলা পরিমিত। সুতরাং দেখা যাইতেছে প্রায় প্রতি ২৫,৮০০ বৎসর পরে সায়ন ও নিরয়ণ বিন্দু একত্র হইয়া থাকে; অর্থাৎ বাসন্ত ক্রান্তি-পাত দিবসে মেষ-রাশির আদি সায়ন ও নিরয়ণ-বিন্দু উভয়েই 'এক' হইয়া থাকে। ইহা হইতে ব্রহ্ম-গুপ্তের' জীবন-কাল স্থূলভাবে নিরূপিত হইতে পারে যে যখন সায়ন ও নিরয়ণ আদি বিন্দুদ্বয়ের পার্থক্য এত অল্প ছিল যে তাঁহাদের দ্বারা উহা লক্ষিত হয় নাই, তিনি সেই সময়কার লোক। ইহা দ্বারা ব্রহ্মগুপ্তের গ্রন্থের প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হইতেছে। তাঁহার জীবন-কাল ও গ্রন্থরচনার সময় তাহা হইলে আজ হইতে অন্যূন ১৬৫০ বৎসর পূর্ব্বে ধরিতে হইবে। যাঁহারা তাঁহাকে কলিযুগের ও পূর্ব্বেকার লোক মানিতে চান, তাঁহাদের মত-পোষণ করিতে হইলে তাঁহাকে এখন হইতে অন্যূন ২৭,৪৫০ বৎসরের পূর্ব্বকার বলিতে হয়। কিন্তু এই প্রবন্ধের সঙ্কলক তাঁহার জীবন ও গ্রন্থ-রচনার কাল এখন হইতে ন্যূনাধিক ১৭০০ বৎসর পূর্ব্বে মনে করেন। কারণ, পূর্ব্বোক্ত আদি-বিন্দুদ্বয়ের 'এক' হইবার কিছুকাল পূর্ব্বেও উভয়ের অত্যন্ত সান্নিধ্যবশতঃ পার্থক্য লক্ষিত হয় না।

জ্যোতিষ্কের যথাসাময়িক অবস্থান বুঝিবার জন্য গোল-যন্ত্রের আবশ্যক। গণনা অর্থে যদি 'সূর্য্য-সিদ্ধান্ত' আদি কোনও পুস্তক বিশেষের অঙ্ক-বিন্যাস মাত্র হইত, তাহা হইলে খ-গোলের প্রতিকৃতি নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়িত।

দৃক্-শোধিত গ্রহাবস্থাই ভাস্করাচার্য্যের অভিপ্রেত

ভাস্কর মনে করেন যে, কোষ্ঠীর ফল সঠিক দৃক্-সিদ্ধ গ্রহাবস্থানের উপর নির্ভর করে। যাঁহারা দৃক্-সিদ্ধি-বিরোধী তাঁহারা যে ভারতবর্ষের প্রাচীন বিশিষ্ট জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের মত অবহেলা করিতেছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। অথচ জনসাধারণের বিশ্বাস যে তাঁহারাই ভারতীয় জ্যোতিষের সম্মান রক্ষা করিতেছেন।

ভাস্করাচার্য্যের 'সিদ্ধান্তশিরোমণি' গ্রন্থের আদ্যোপান্তই গগনমার্গস্থ গ্রহাদি-দর্শনাদেশে* পরিপূর্ণ। যে কেহ অনুসন্ধিৎসু অনায়াসে আমাদের কথার যাথার্থ্য পরীক্ষা করিতে পারেন। এই সমস্ত গ্রন্থের পর্য্যালোচনা করিয়াও যদি জ্যোতিষশাস্ত্রজ্ঞ সুধীজনের মধ্যে কেহ রক্ষণশীলতার মোহে হিন্দু জ্যোতিষ-শাস্ত্রকে অবস্তু-সম্ভূত কেবল অঙ্কের প্রক্রিয়া-বিশেষ বলিতে সাহস করেন, তবে তাঁহাকে আমাদের বলিবার কিছু নাই। কিন্তু তাহা হইলে সনাতন হিন্দুগৌরব ক্ষুণ্ণ করিয়া জগৎ-সমক্ষে আমাদের বলিতে হইবে যে আমাদের প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদেরা দৃষ্টির সহিত সংস্রব রাখিতেন না। অথচ ইহা সুধীবৃন্দ সকলেই জানেন যে সমগ্র ইউরোপের স্বীকৃত শিক্ষাগুরু† ভারতগৌরব ভাস্করাচার্য্য তাঁহার পুস্তকে ছত্রে ছত্রে দৃক্-সিদ্ধি সম্পাদন করিবার উপায় নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন।

আমাদের প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদেরা দৃষ্টি অবহেলা করিতেন বলিলে তাঁহাদের গৌরব বৃদ্ধি হয় এ কথা যদি কাহারও ধারণা থাকে, তাহা হইলে তাঁহার স্মরণ রাখা উচিত যে তাঁহাদিগকে এরূপ অপগৌরব-ভূষিত করা দুঃসাহস মাত্র। সেই ঋষিতুল্য ধীশক্তি-সম্পন্ন মহাপুরুষগণের কীর্ত্তি-স্তম্ভ অমিশ্র সনাতন সত্য-ভিত্তির উপর নিহিত। তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন ও পূজার জন্য কাল্পনিক আকাশ-কুসুমের প্রয়োজন হয় না; সত্যনিষ্ঠা, সত্যাশ্রয় ও সত্যানুসন্ধান দ্বারাই সেই দেবসম মহাত্মাগণের প্রীতি সম্পাদিত হয়।

অতএব শ্রদ্ধাশীল সত্যপ্রিয় জনসাধারণ স্ব স্ব ক্রিয়া-কাণ্ডানুষ্ঠানের যথার্থ তিথ্যাদিরূপ জ্যোতিষিক কাল-জ্ঞানের জন্য জ্যোতিষিক গণনামূলক ব্যবহারিক পঞ্জিকাদি প্রণয়নে মনোনিবেশ করিবেন।

* সিদ্ধান্ত-গ্রন্থসমূহের পর্য্যালোচনায় দেখা যায় যে সূর্য্য ও চন্দ্রের মধ্যবর্ত্তী প্রতি বার অংশে এক-এক তিথি সংঘটিত হয়। সুতরাং গগন-মার্গস্থ সূর্য্য ও চন্দ্রের স্ফুট (যথাসাময়িক অবস্থান-জ্ঞাপক ভূ-কেন্দ্রীয় কোণ) বিশুদ্ধ ও দৃক্-শোধিত না হইলে তাহা হইতে গণিত তিথি কাল ও বিশুদ্ধ বা ভ্রান্তি-শূন্য হইতে পারে না। সুতরাং যে সকল পঞ্জিকায় এরূপ ভাবে বিশুদ্ধ গণনা করা হয় না, উহাদের অচিরে সংস্কার করা নিতান্ত আবশ্যক।

† "His Astronomy was known to the Arabs almost as soon as it was written and influenced their subsequent writings. The results thus became indirectly known in the West before the end of the 12th century."—Hist. of Math.—W. W. R. Ball.

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের বংশ-পরিচয় *

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

চব্বিশ পরগনা জেলার জয়নগর মজিলপুর গ্রামে কালীপ্রসাদ বাপুলি নামে জনৈক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। কোন অজ্ঞাত কারণে বর্ধমানের তদানীন্তন মহারাজা তাঁহাকে হুগলী জেলার অন্তর্গত ময়াল ইছাপুর গ্রামে কিঞ্চিৎ জায়গীর প্রদান করেন। সেই অবধি ইছাপুর গ্রাম এই বংশের বাসভূমি হয়। কালীপ্রসাদের তিন সন্তান ছিলেন—রামানন্দ, রাজচন্দ্র, ও ঠাকুরদাস। রামানন্দ বাপুলি পত্নী-বিয়োগের পর স্বগ্রাম ত্যাগ করিয়া জনাই গ্রামে বাস করেন। রামানন্দের পুত্র গিরিশচন্দ্র ছিলেন শরৎচন্দ্রের পিতা। শরৎচন্দ্রই রামকৃষ্ণসঙ্ঘে স্বামী সারদানন্দ নামে সুপরিচিত। গিরিশচন্দ্র ১৮৬২ সনে কলিকাতার আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে স্বীয় বসতবাটী নির্মাণ করেন। তিনি তাঁহার শুভাকাঙ্ক্ষী গোবিন্দ চন্দ্র দত্তের ঔষধালয়ের অংশীদার ছিলেন এবং গোবিন্দচন্দ্রের অনুরোধে পণ্ডিতগণের অনুমতিক্রমে পূর্বোপাধি পরিত্যাগ করিয়া চক্রবর্তী উপাধি গ্রহণ করেন।

রামানন্দ বাপুলি স্বগ্রাম ইছাপুর ত্যাগ করিলেও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় রাজচন্দ্র ও ঠাকুরদাস পিত্রালয়েই বাস করিতে লাগিলেন। রাজচন্দ্রের একমাত্র পুত্র ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র। ঈশ্বরচন্দ্রের চারিপুত্র—শশিভূষণ, রামভূষণ, নীরদভূষণ ও ক্ষীরোদভূষণ এবং চারি কন্যা—নবকুমারী, কুসুমকুমারী, ননীবালা ও শৈলবালা। ঈশ্বরচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র শশিভূষণই রামকৃষ্ণসঙ্ঘের স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ নামে পরিচিত। শশিভূষণের পিতা ঈশ্বরচন্দ্র একজন বিশিষ্ট তন্ত্রসাধক ছিলেন। তাঁহার দীর্ঘ উন্নত স্থূল শরীর, রক্তচন্দন-চর্চিত প্রশস্ত ললাট, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষ মালা, পরিধানে কাষায় বস্ত্র, সুদীর্ঘ কেশ এবং শ্মশ্রু ও গুম্ফ-মণ্ডিত মুখমণ্ডল ছিল বলিয়া তাঁহাকে প্রাচীন ঋষির মত দেখাইত। তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়নে এবং তান্ত্রিক সাধনায় তাঁহার দিনগুলি অতিবাহিত হইত। সেইজন্য তখনকার তান্ত্রিক সমাজে তাঁহার যথেষ্ট সুখ্যাতি ছিল। সাধনার অনুকূল জানিয়া ঈশ্বরচন্দ্র অধিকাংশ সময় ইছাপুরে বাস করিতেন। বিশেষ বিশেষ রজনীতে তিনি কখনও নদীপুলিনে, কখনও বট, অশ্বত্থ, বিল্ব বা নিম্ব বৃক্ষমূলে জপ-ধ্যানে কাটাইতেন। স্বগ্রামের অনতিদূরে অবস্থিত ঘণ্টেশ্বরের মহাশ্মশান তাঁহার সাধনাস্থল ছিল। কলিকাতায় আসিলে কালীঘাটের সন্নিকটে কেওড়াতলার শ্মশানে যাইয়া তিনি জপ-ধ্যান করিতেন।

শুনা যায় এক নিশীথ রাত্রে উক্ত শ্মশান হইতে প্রত্যাগমনকালে কালীমন্দির যাইবার রাস্তার মোড়ে তিনি একটি কিশোরী বালিকা দেখিতে পান। অন্ধকার জনশূন্য পথে বালিকা ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত রাত্রে কে মা তুমি একা এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছ?" কিশোরী তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া মন্দিরাভিমুখে চলিলেন। মন্ত্রমুগ্ধবৎ ঈশ্বরচন্দ্রও তাঁহার পশ্চাদ্‌গামী হইলেন। এই সময় মন্দিরের সিংহদ্বার বন্ধ থাকে। কিন্তু

* লেখকের "স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ (জীবনী ও রচনাবলী)" নামক অপ্রকাশিত পুস্তকের একটি অধ্যায়।

ঈশ্বরচন্দ্র দেখিলেন দ্বার ঈষৎ উন্মুক্ত। নাটমন্দিরে প্রবেশ করিয়াই কিশোরীমূর্ত্তি অন্তর্হিত হইলেন। আশ্চর্যান্বিত হইয়া ঈশ্বরচন্দ্র তথায় বসিয়া পড়িলেন ও ধ্যানস্থ হইলেন। ধ্যানে তিনি বুঝিলেন, তাঁহার ইষ্টদেবী বালিকাবেশে তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন।

পাইকপাড়ার স্বনামধন্য রাজা ইন্দ্রনারায়ণ সিংহের সভাপণ্ডিত ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র। বাংলার সিদ্ধতান্ত্রিক পণ্ডিতপ্রবর জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ছিলেন রাজা ইন্দ্রনারায়ণের গুরু। কিন্তু রাজা স্বীয় গুরুর প্রধান শিষ্য ঈশ্বরচন্দ্রকেও গুরুবৎ ভক্তি করিতেন। রাজপ্রাসাদের পশ্চাতে অবস্থিত উদ্যানে পঞ্চমুণ্ডীর আসন, হোমকুণ্ড, যূপকাষ্ঠ প্রভৃতি তন্ত্রসাধনার সকল উপকরণ সদা প্রস্তুত থাকিত। ঈশ্বরচন্দ্র তথায় তন্ত্রসাধনায় নিমগ্ন হইতেন। সাধনার নিমিত্ত যখন যে দুষ্প্রাপ্য বস্তুর প্রয়োজন হইত, রাজা তাহা সযত্নে সংগ্রহ করিয়া দিতেন। চৌরঙ্গীতে রাজার যে বৃহৎ প্রাসাদ ছিল, তথায় ঈশ্বরচন্দ্র অনেক সময় অবস্থান করিতেন। গিরিশচন্দ্রও সাধকশ্রেষ্ঠ জগন্মোহনের শিষ্য ছিলেন। গিরিশচন্দ্রের পুত্র শরৎচন্দ্র যখন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের পূতস্পর্শে গৃহত্যাগের সঙ্কল্প করেন, তখন তাঁহার পিতা একদিন তর্কালঙ্কার মহাশয়কে কাশীপুর বাগানে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট লইয়া যান। উদ্দেশ্য ছিল, সাধন-রহস্যের কতকগুলি কঠিন প্রশ্ন করাইয়া পরমহংসদেবকে অপ্রতিভ করাইবেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের উদ্দেশ্য বিফল হইল। সাধক জগন্মোহন শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত দুই চারিটি কথা বলিয়াই বুঝিলেন এ জ্বলন্ত বহ্নি। অন্তরালে তিনি গিরীশচন্দ্রকে বলিলেন, "শরৎচন্দ্র যে মহৎ আশ্রয় পেয়েছে, আমি তাকে তা কোনমতেই ত্যাগ ক'রতে বলতে পারবো না।" সম্ভবতঃ ঈশ্বরচন্দ্রও শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছিলেন।

শশিভূষণ ঈশ্বরচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র। মাতাপিতা আশা করিয়াছিলেন পুত্র শিক্ষা সমাপনান্তে অর্থোপার্জন করিয়া গৃহের অর্থকষ্ট দূর করিবে। কিন্তু পুত্র বি-এ পরীক্ষা না দিয়াই সংসার ত্যাগ করিয়া ১৮৮৬ সনের শেষভাগে বরাহনগর মঠে যোগ দিলেন। মাতাপিতার আশা নির্মূল হইল। ঈশ্বরচন্দ্র বরাহনগর মঠে আসিয়া পুত্রকে কখনও মিষ্ট বাক্যে বুঝাইতেন, কখনও বা ভয় দেখাইতেন। পিতৃ বাক্যে কর্ণপাত না করিলেও গৃহের অর্থাভাবের দুশ্চিন্তা তাঁহার হৃদয় দগ্ধ করিত। তিনি অনেক সময় সজল নয়নে স্বীয় বন্ধুদিগকে বলিতেন, "আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েছি। হায়! আমি অভাবগ্রস্ত মাতাপিতার কোন সেবা করতে পারলাম না! আমার উপর তাঁরা খুব ভরসা করেছিলেন। অর্থাভাবে আমার মা কোন অলঙ্কার ব্যবহার করতে পারেন নি। মায়ের জন্য কিছু অলঙ্কার করাবার ইচ্ছা আমার ছিল। কিন্তু আমার সেই ইচ্ছা পূর্ণ করবার এখন আর উপায় নেই। গৃহে প্রত্যাবর্তন আমার পক্ষে অসম্ভব। শ্রীগুরুদেব আমাকে কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করতে উপদেশ দিয়েছেন। সুতরাং আমি সংসারে প্রবেশ করব না।" শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তিম অসুখের সময় শশিভূষণ গৃহ ছাড়িয়া কাশীপুর বাগানে বাস ও গুরুসেবা করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহত্যাগের পর উক্ত বাগান বাড়ী ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তখন শশী এবং অন্যান্য বালক শিষ্যগণ মাতাপিতার অনুরোধে কিছুদিনের জন্য গৃহে ফিরিয়া যান। বরাহনগরে মঠ প্রতিষ্ঠিত হইলে শশী প্রথমে মঠে যাতায়াত এবং কয়েক দিন পরে স্থায়ী ভাবে মঠে বাস করিতে লাগিলেন। এই সময় পিতা আসিয়া মাঝে মাঝে তাঁহাকে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করেন। কিন্তু শশী আর গৃহে ফিরিয়া যান নাই। ১৮৮৭ সনের ৯ই এপ্রিল পিতা একই উদ্দেশ্যে মঠে আসেন। পিতার আগমনের সংবাদ পাইয়া শশী গোপনে মঠ হইতে

পশ্চাদ্দ্বার দিয়া পলাইয়া যান; তিনি পিতার সহিত দেখা করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। একদিন মঠে পুত্র পিতাকে বলিয়াছিলেন, "সংসার ও গৃহ আমার নিকট শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যতুল্য।" আর একদিন পিতা পুত্রকে গৃহে ফিরাইবার জন্য অনেক বুঝাইতেছিলেন। পুত্র যখন কিছুতেই বুঝিলেন না তখন পিতা দুঃখে ও ক্রোধে শ্রীরামকৃষ্ণের নিন্দা করিয়াছিলেন। শিবতুল্য গুরুর নিন্দা শ্রবণে পুত্রের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। তিনি পিতার প্রতি কটু বাক্য প্রয়োগ করিলেন! ধর্মপ্রাণ সাধক পিতা পুত্রের গুরুভক্তি দর্শনে প্রীত হইয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া গৃহে আনিবার চেষ্টা ত্যাগ করিলেন। শশীর পিতা হতাশ হইয়া মঠের উপরের বারান্দায় শ্রীম-এর সহিত কথা বলিতে বলিতে পায়চারী করিতে লাগিলেন। তিনি নিরাশ হৃদয়ে বলিলেন, "এখানকার অধ্যক্ষ কে? নরেন্দ্র একাই সকল অনর্থের কারণ। কিছুদিনের জন্য বালকেরা গৃহে ফিরিয়া লেখাপড়ায় মনোযোগী হয়েছিল।" তিনি শ্রীম-কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আপনিই ঠিক্ করেছেন। আপনি সংসার ও ঈশ্বর উভয়েরই সেবা করছেন। এরা কি আপনার মত ধর্ম সাধন করতে পারে না? আমি শশীকে এরূপই করতে বলি। সে বাড়ীতে থাকুক এবং এখানেও আসুক। আপনি জানেন না ওর মা ওর জন্য কত কাঁদে!" তিনি আরও বলিলেন, "আপনি যদি সাধুপুরুষের সৎসঙ্গের কথা বলেন, আমি একটি ভাল সাধুর অনুসন্ধান দিতে পারি। শশী তাঁর কাছে যাক্।" সে যাহাই হউক, পরে পিতার মন পরিবর্তিত হইয়াছিল এবং পুত্রের আধ্যাত্মিক উন্নতি দর্শনে পরমানন্দিত হইয়াছিলেন। তিনি বরাহনগর মঠে, আলমবাজার মঠে এবং বেলুড় মঠে যাতায়াত করিতেন এবং মঠের সন্ন্যাসিগণের প্রতি প্রীতিপরায়ণ ছিলেন।

তান্ত্রিক সাধন-তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য শ রৎচন্দ্র (স্বামী সারদানন্দ) পিতৃব্য ঈশ্বরচন্দ্রের নিকট যথাবিধি পূর্ণাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। ঠাকুরের ভক্তিমতী শিষ্যা যোগীনমাও ঐ সঙ্গে অভিষিক্তা হন। এই অভিষেক-কার্যে শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘ-জননী শ্রীশ্রীমার অনুমোদন ছিল। শরৎচন্দ্রের ডায়েরীতে উল্লেখ আছে, "১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ১৯শে নভেম্বর, ১৩০৭ সাল ৪ঠা অগ্রহায়ণ, কার্তিক কৃষ্ণা চতুর্দশী, অধিবাস। পরদিবস রাত্রে অভিষেক।" তান্ত্রিকপ্রবর জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের প্রিয়তম শিষ্য ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র। গুরু লোকান্তরিত হওয়ার পর ঈশ্বরচন্দ্রই বাংলার তান্ত্রিক মহলে প্রখ্যাত হইলেন। শরৎচন্দ্র তন্ত্রসাধনায় পিতৃব্য ঈশ্বরচন্দ্রের উপদেশ গ্রহণ করিতেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে রাত্রে পিতৃব্যের সহিত মিলিত হইয়া শরৎচন্দ্র মহাদেবী মঙ্গলচণ্ডীর আরাধনা এবং তৎপরে এক বিরাট দুর্গাসপ্তশতী হোমের অনুষ্ঠান করেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে নবনির্মিত বেলুড় মঠে প্রথম প্রতিমায় দুর্গাপূজা হয়। পূজায় সমারোহ ও অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটী হইল না। তন্ত্রধারক হইলেন ঈশ্বরচন্দ্র। শ্রীশ্রীমা পূজার কয়েক দিন নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগান-বাড়ীতে মহিলা ভক্তগণের সহিত বিরাজ করিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের আদেশে মঠে পশুবলি নিষিদ্ধ হইল। অতঃপর ঈশ্বরচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে মঠে শ্রীশ্রীলক্ষ্মী ও শ্রীশ্রীকালীপূজাও সম্পন্ন হইল। স্বামী বিবেকানন্দ এবং তাঁহার গুরুভ্রাতাগণ মঠে উপস্থিত থাকিয়া পূজার সকল আয়োজন করেন। ঈশ্বরচন্দ্র খুব নিষ্ঠাবান, ধর্মানুষ্ঠানপরায়ণ এবং পূজাপাঠে সুদক্ষ ব্রাহ্মণ ছিলেন। সকল প্রকার পূজাদির মন্ত্র তাঁহার প্রায় কণ্ঠস্থ ছিল। বিশেষ পূজাদিতে স্বয়ং ব্রতী হইলে যথানিয়মে পূর্বদিন হইতে সংযম করিতেন; এমন কি, পূজাকালে পাছে মূত্রত্যাগের জন্য উঠিতে হয় সেইজন্য খানিকটা লঙ্কাবাটা খাইয়া আসনে বসিতেন। মঠে পূজাদির পুঁথিখানি তাঁহার নির্দেশমত সঙ্কলিত হইয়াছিল।

শশিভূষণের মাতাপিতা বৃদ্ধ বয়সে কিছুকাল কাশীবাস করিয়াছিলেন। শরতের পিতা গিরিশ চন্দ্রও কাশীবাসী ছিলেন এবং ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ১১ই নভেম্বর উত্থান একাদশীর দিন উক্ত মোক্ষক্ষেত্রে প্রায় ৭৩ বৎসর বয়সে সন্ন্যাসরোগে দেহত্যাগ করেন। গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর সময় ঈশ্বরচন্দ্র স্বগ্রাম ইছাপুরে ছিলেন। ইহার কয়েক সপ্তাহ পূর্বে তাঁহার প্রিয়তমা কন্যা শৈলবালা ইহধাম ত্যাগ করেন। কন্যাশোকে বৃদ্ধ পিতার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইল। অন্তরের সন্তাপ বাহিরে জ্বররূপে আত্মপ্রকাশ করিল। এই অসুস্থ অবস্থায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অপ্রত্যাশিত মৃত্যু-সংবাদে ঈশ্বরচন্দ্র অধীর হইয়া পড়িলেন। তিনি বালকের মত উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে রমেশ, দাদা আর নেই।" ঐদিন সন্ধ্যায় কনিষ্ঠ পুত্র ক্ষীরোদভূষণকে কহিলেন, "আমাকে বাহিরে নিয়ে চল। অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখব।" অরুন্ধতী সপ্তর্ষিমণ্ডলে বশিষ্ঠ নামক তারকার পার্শ্বস্থিত একটী ক্ষুদ্র নক্ষত্র। হিন্দুশাস্ত্রমতে এই ক্ষুদ্র তারকার যাঁহার দৃষ্টিগোচর না হয়, তাঁহার মৃত্যু আসন্ন। কনিষ্ঠ পুত্র পিতাকে বাহিরে আনিলেন। কিন্তু পিতা অরুন্ধতী দেখিতে পাইলেন না। তখন ঈশ্বরচন্দ্র কহিলেন, "তোমরা প্রস্তুত হও; আমার আর সাতদিনের বেশী নয়।" সাধক ঈশ্বরচন্দ্রের ভবিষ্যৎ বাণী সফল হইল। গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর ত্রয়োদশ দিবসে জ্ঞাতিভোজনের দিন ব্রাহ্ম মুহূর্তে পূর্বাকাশ রক্তিমরাগে রঞ্জিত হইলে উদীয়মান ব্রহ্ম-মূর্তির প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি ঈশ্বরচন্দ্র ৬৬ বৎসর বয়সে অন্তিম শ্বাস ত্যাগ করিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম ১৮ই মে, ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দ এবং মৃত্যু ২৬শে নভেম্বর, ১৯০২ খৃষ্টাব্দ।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের মাতা ভবসুন্দরী দেবী ১২৫৩ সালে (১৮৪৬ খৃষ্টাব্দ) ২২শে অগ্রহায়ণ জন্মগ্রহণ করেন, এবং ১২৩২ সালে (১৯২৫ খৃষ্টাব্দ) ২৪শে আষাঢ় প্রায় আশি বৎসর বয়সে কলিকাতায় দেহত্যাগ করেন। তিনি অতিশয় সরল, সাদাসিদে, নিরীহ, উদাসীন রমণী ছিলেন। তিনি এত লজ্জাশীলা ছিলেন যে, পরমাত্মীয়গণের সম্মুখে, এমন কি জ্যেষ্ঠ পুত্র শশীর সম্মুখেও ঘোমটা দিতেন। সংসারে সব কাজের মধ্যেও তিনি খুব নির্লিপ্ত থাকিতেন। তিনি গৌরবর্ণা ছিলেন এবং তৎপুত্র শশীও তাঁহার মত গৌরবর্ণ ছিলেন। তাঁহাদের গৃহে নারায়ণ, মনসা, শীতলা ও সিংহ-বাহিনী প্রভৃতি দেবতার নিত্যপূজা হইত। এতদ্ব্যতীত প্রতি বৎসর বাড়ীতে কালীপূজা হইত। একবার তাঁহার মধ্যমা কন্যার ও কনিষ্ঠ পুত্রের রক্তামাশয় অর্শরোগ হয়। জননী ভবসুন্দরী পুত্রকন্যার আরোগ্য মানসে কালীর কাছে ডান হাত বাঁধা দিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার পুত্রকন্যা আরোগ্যলাভ করেন। সেই অবধি তিনি বামহাতে খাইতেন, ডানহাতে খাইতেন না।

সম্ভবতঃ ১৯১০ সালে স্বামী ব্রহ্মানন্দ পুরীধামে 'শশী নিকেতনে' ছিলেন। সেই সময় শশীমহারাজের মাতাঠাকুরাণী কিছুদিন পুরীবাস করেন। তিনি দীর্ঘাঙ্গী এবং প্রাচীনা হইলেও সুস্থ ও কৃশ ছিলেন। তাঁহার সরল ব্যবহার এবং সুমিষ্ট আলাপে সকলেই মুগ্ধ হইতেন। তিনিও শ্রীশ্রীমহারাজের আদর আপ্যায়নে পরম পরিতুষ্টা হন এবং দর্শনাদির সকল সুবিধা ও সুব্যবস্থা হওয়ায় অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করেন।

রামকৃষ্ণানন্দজীর অন্তিম অসুখের সময় দেবী ভবসুন্দরী পুত্রকে প্রায়ই দেখিতে আসিতেন। মাতা আসিলেই পুত্র স্বীয় মস্তক বাড়াইয়া দিয়া বলিতেন, "মা, মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ কর।"

সন্ন্যাসী পুত্রের মৃত্যুকালে মাতা ভবসুন্দরী এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। আহারান্তে তিনি দ্বিপ্রহরে নিদ্রা যাইতেছেন। দিবানিদ্রা সাধারণতঃ গভীর হয় না। তিনি স্বপ্নে দেখেন, কয়েক জন গেরুয়া-পরা সন্ন্যাসী এসে তাঁহাকে তুলে আছাড় মারিলেন। ইহাতেই তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। কিন্তু এক অজ্ঞাত বিপদের আশঙ্কায় তিনি বিষণ্নমনা হইলেন। সন্ন্যাসী পুত্রের কুশল জানিবার জন্য তাঁহার মন উতলা হইল। বৈকালে দুঃসংবাদ আসিল সেই দ্বিপ্রহরের প্রায় এক ঘণ্টা পরে সন্ন্যাসী পুত্র পরমধামে গমন করিয়াছেন। পুত্রের মহাসমাধির সময়ই মাতা এই দুঃস্বপ্ন দেখিয়া-ছিলেন। মাতাপুত্রের সম্বন্ধ সত্যই অবিচ্ছেদ্য। এমন সাধক পিতা ও সরলা মাতা না হইলে কি এমন সুসন্তান জন্মগ্রহণ করে? স্বামী রামকৃষ্ণা-নন্দের মত দেবোপম পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে কুল পবিত্র, জননী কৃতার্থা, জনক ধন্য এবং ধরণী পুণ্যবতী হয়।

নষ্টচন্দ্র

ভক্তিতীর্থ শ্রীউমেশ চক্রবর্তী

চন্দ্রের উৎপত্তি

পঞ্চম বেদ মহাভারতে বর্ণনা আছে, দেবাসুর কর্তৃক সমুদ্র মন্থন হইতে চন্দ্রের উদয় হয়। পৃথিবী হইতে বহু যোজন দূরে ব্যোমমণ্ডলে তাঁহার স্থিতি হয় এবং তাঁহার সুধাস্নিগ্ধ তেজে ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল দীপ্তি লাভ করে। ব্রহ্মপুরাণ এবং হরিবংশে চন্দ্রের বিস্তারিত জন্মবৃত্তান্ত পাওয়া যায়। যথা—ব্রহ্মার মানস তনয় মহর্ষি অত্রির মহাতপস্যাসম্ভূত তেজ হইতে দশ দিগ্‌দেবী-গণের গর্ভে চন্দ্রের উৎপত্তি হয়। ভুবনমনোহর অতুল সৌন্দর্যের খনি সোমদেব ব্রহ্মার রথে আরোহণ করিয়া একুশবার বসুন্ধরা প্রদক্ষিণ করেন, তাহাতে তাঁহার যে সব তেজ ক্ষরিত হইয়া পৃথিবীতে পতিত হয় সে সব হইতেই ওষধি তৃণ লতাগুল্মাদির সৃষ্টি হয়। সোমদেব বহুশত বৎসর তপস্যা করেন, তৎপর ব্রহ্মা কর্তৃক বীজ, ওষধি, বিপ্র ও জল-রাশির আধিপত্যে নিযুক্ত হন। এই আধিপত্য লাভ করিয়া তিনি রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন। স্বয়ং হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা, অত্রি, ভৃগু সেই যজ্ঞে ঋত্বিক্ ছিলেন এবং বহু মুনিগণের সহিত হরি নিজে সদস্য-কর্মে ব্রতী হইয়াছিলেন।

"হিরণ্যগর্ভো ব্রহ্মাত্রির্ভৃগুশ্চ ঋত্বিজোহভবন্।
সদস্যোহভূদ্ধরিস্তত্র মুনিভির্বহুভির্বৃতঃ॥"

ব্রহ্মপুরাণ, ৯।২৫।

অতঃপর তিনি প্রভূত সম্মান ও ঐশ্বর্য লাভ করেন। প্রজাপতি দক্ষ তাঁহার সাতাশটি কন্যাকে ইঁহার করে সম্প্রদান করেন। এই কন্যাগণই চন্দ্র-মণ্ডলের সপ্তবিংশতি নক্ষত্র বা তারা। সেই হেতু চন্দ্র নক্ষত্রপতি, তারাকান্ত ইত্যাদি নামে প্রসিদ্ধ।

চন্দ্রের সহিত পৃথিবী ও পৃথিবীবাসীদের সম্বন্ধ

সূর্য চন্দ্র গ্রহ ও নক্ষত্রাদির সহিত পৃথিবী এবং সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীস্থ মানবাদির নিত্য সম্বন্ধ বর্তমান। চন্দ্র সর্বাপেক্ষা পৃথিবীর নিকটস্থ বলিয়া চন্দ্রের আকর্ষণই পৃথিবীর তথা পৃথিবীর অধিবাসিগণের উপর বেশী পরিমাণে হইয়া থাকে। তিথিবিশেষে আকর্ষণের আধিক্যহেতু পৃথিবীস্থ রসে অর্থাৎ সাগর, হ্রদ, নদ নদীতে যেমন জোয়ার হয়, তেমনই পৃথিবীর বক্ষস্থ মানবাদির দেহেও জোয়ার সঞ্চারিত হয়। দেহের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে ব্যথা, গা কামড়ানো, শরীর ভার ভার বোধ, জড়তা, আহারে অনিচ্ছা, বায়ুর প্রকোপ, কামাদি রিপুর উত্তেজনা এবং এমন কি ক্ষয়রোগের উৎপত্তি পর্যন্ত এই চন্দ্রের আকর্ষণ হইতে হইয়া থাকে বলিয়া রাসায়নিক ও আয়ুর্বিজ্ঞানবিদ্‌গণের অভিমত। চন্দ্রের হিমকর অভিষেক লাভ করিয়া মানবজাতির মহোপকারী ওষধি, তৃণ, লতা, গুল্মাদি উৎপন্ন ও বর্ধিত হয় বলিয়া ইঁহার এক নাম ওষধিনাথ। দেবগণ যে সোমরসামৃত পান করিয়া সোমপায়ী আখ্যা লাভ করিয়াছেন, সেই লোভনীয় মাদকদ্রব্য সোমলতার (Moon plant) রস হইতে প্রস্তুত। এই মাদক-দ্রব্য দেবগণের অতিশয় প্রিয় বলিয়াই সোমযাগাদি দ্বারা দেবতর্পণের বিশেষ ব্যবস্থা প্রচলিত।

চন্দ্র হইতে উপকার আমরা যথেষ্ট পাই, আবার অপকার আশঙ্কাও আছে বলিয়া সাবধানতা অবলম্বনের ইঙ্গিত আর্যশাস্ত্রে সুস্পষ্ট। গ্রীক্ শব্দ লিউনা (Luna) এবং লাটিন শব্দ লিউন-এর (Lune) অর্থ চন্দ্র। এই দুই শব্দ হইতেই যেমন ইংরাজী শব্দ

লুনার (Lunar) বা চান্দ্র হইয়াছে, তেমনই লুনাটিক (Lunatic=Moonstruck) অর্থাৎ উন্মাদ বা বাতুল শব্দও উৎপন্ন হইয়াছে। শব্দনিষ্পত্তির ভঙ্গী হইতেই বেশ প্রকাশিত হয় যে, তত্তৎভাষার আদি স্রষ্টাগণের দৃঢ় প্রতীতি ছিল—চন্দ্রের আকর্ষণ হইতেই উন্মাদরোগের উৎপত্তি।

সূর্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু, কেতু এই নব গ্রহ—অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্বফাল্গুনী, উত্তরফাল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, (অভিজিৎ) শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ, রেবতী এই সাতাশটি নক্ষত্রের সহিত পর্যায়ক্রমে মিলিত হইয়া নাক্ষত্রিকী দশাগ্রস্ত কলিতে পৃথিবীর উপর আকর্ষণ বিকর্ষণের খেলা চলিতেছে। নভোমণ্ডলের কক্ষপথে (orbit) অবিরাম ভ্রমণশীল গ্রহনক্ষত্রের গতিবিধির অতি সূক্ষ্ম বিপর্যয়, যাহা পৃথিবী ও পৃথিবীবাসীদের পক্ষে অশুভসূচক, তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই পৌরাণিক আখ্যায়িকায় নক্ষত্রপতি অকলঙ্ক চন্দ্রকে কলঙ্কিত নষ্টচন্দ্র নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

ভাদ্রমাসের স্বাস্থ্যতত্ত্ব বিচার করিলেও দেখা যায় এই মাসে বর্ষার শেষ হয় বলিয়া আকাশ ক্রমশঃ মেঘমুক্ত হয় এবং রৌদ্রের প্রখরতা বৃদ্ধি পায়। বর্ষায় রসাধিক্য বশতঃ শরীর শৈত্যগুণযুক্ত থাকে এবং এই সময়ে হঠাৎ রৌদ্রের প্রখরতায় বায়ু ও পিত্ত অল্পকারণেই বিকৃত হইয়া পড়ে, এইজন্যই এই সময়ে নানাপ্রকার পীড়া উপস্থিত হয়। এই মাসের শেষ দিক হইতে হিমপাত আরম্ভ হয়। সুতরাং হিম বা রৌদ্র উভয় হইতেই সাবধান থাকা উচিত। চন্দ্রকিরণে স্নিগ্ধতা অতিশয় বলিয়া চন্দ্রকিরণ উপভোগ বা চন্দ্র দর্শনাদি বিশেষ ভাবে নিষিদ্ধ। এই নিষেধ সারা মাস জুড়িয়া না হইয়া নির্দিষ্ট তিথি বিশেষে হইবার কারণ গ্রহ-নক্ষত্রের পূর্বোক্ত সূক্ষ্মগতিবিপর্যয়। এর সম্যক্ তাৎপর্য দূরদর্শী ঋষিহৃদয়ে স্পষ্টতমভাবে প্রতিভাত ছিল। এক্ষণে সর্বহারা হইয়া আমাদের আর তাহা উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য নাই। সামর্থ্য নাই বলিয়া কোন কিছুতে অবিশ্বাস বা অজ্ঞতা প্রদর্শন মনুষ্যোচিত ধর্ম নহে। বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা সহকারে মহাজন-নির্দেশিত পথ অনুসরণ এবং তাৎপর্যানুধাবনে যত্নশীল হওয়াই মানুষের কর্তব্য।

অকলঙ্ক চন্দ্র কেন সকলঙ্ক নষ্টচন্দ্র হইলেন ?

ব্রহ্মপুরাণ বর্ণনা করেন—

"তস্য তৎ প্রাপ্য দুষ্প্রাপ্যমৈশ্বর্যমৃষিসৎকৃতম্।
বিবভ্রাম মতিস্তস্য বিনয়াদনয়াহৃতা॥
বৃহস্পতেঃ স বৈ ভার্যামৈশ্বর্যমদমোহিতঃ।
জহার তরসা সোমো বিমত্যাঙ্গিরসঃ সুতম্॥"

অতুল সম্মান ও ঐশ্বর্যমদে উন্মত্ত হইয়া চন্দ্র শিষ্টচার নীতিহীন দুর্বুদ্ধির অধীন হইলেন এবং দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হইয়া অঙ্গিরা-তনয় দেব-গুরু বৃহস্পতির পত্নী তারাদেবীকে হরণ করিলেন। এই গর্হিত কর্মদ্বারাই তিনি কলঙ্কিত 'নষ্টচন্দ্র' নামে অভিহিত হইলেন। নক্ষত্রমাত্রই তারা, তারকা, তারা নামে প্রসিদ্ধ, সেই হিসাবেই চন্দ্র তারাকান্ত। আর তারা বলিতে পাওয়া যায় দ্বিতীয়া মহাবিদ্যা, বৃহস্পতি পত্নী, বালীসুগ্রীবপত্নী প্রভৃতিকে। তারাকান্ত শশী গুরুপত্নী তারাকে হরণ করার রহস্যটি সম্যক্ উদ্‌ঘাটন সহজ নহে। চন্দ্র একটি গ্রহ এবং বৃহস্পতিও একটি গ্রহ। চন্দ্র যেমন সাতাশ কি আটাশ নক্ষত্র বা তারার ভোগের আবেষ্টনীতে থাকিয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন, বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহগণও তেমনি নির্দিষ্ট নক্ষত্র উপগ্রহাদির ভোগের আবেষ্টনীতে থাকিয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন। তারা নামে কোন

বিশেষ নক্ষত্র জ্যোতিষ্করাজ্যে আছে কিনা জ্যোতিবিজ্ঞানবিদ্‌গণ নির্ধারণ করিবেন। সাধারণ ভাবে যতটা ধারণা করা যায়, তাহাতে মনে হয়, বৃহস্পতির ভোগান্তর্ভুক্ত নির্দিষ্ট নক্ষত্র আবর্তন-বিপর্যয়ে চন্দ্রের ভোগানুবর্তী হওয়ার ফলেই হয়ত চন্দ্রের উপর এই কলঙ্ক আরোপিত হইয়াছে। এই গ্রহনক্ষত্রের পরস্পর ভোগ, মিলন বা সঙ্ঘর্ষ হইতে বিচ্ছুরিত জ্যোতিরাশি স্বতন্ত্র জ্যোতিষ্ক বা গ্রহরূপে পরিণত হইল এবং তাঁহাকে শশিসুত বুধগ্রহ বলিয়া অভিহিত করা হইল। বুধগ্রহের জন্ম হইল, ক্রমবর্ধমান জগতের পক্ষে আনন্দই বাড়িল, কিন্তু অন্যের ভোগ্যা তারাকে নিজভোগে নিয়োগজনিত চন্দ্রের চিরস্থায়ী কলঙ্ক ঘোষিত হইল। শুভকর্ম সাধন না করিলে যেমন শুভ কর্মফল কেহ দিতে পারে না, তেমনই দুষ্কর্ম করিলে তজ্জাত দুর্ভোগ বা কলঙ্কও কেহ ঘুচাইতে পারে না। অকলঙ্ক চন্দ্রের পক্ষেও এই দুষ্কর্মজাত ফল চিরদিনের জন্য সন্নিবেশিত হইয়া জগৎকে শিক্ষা দিতেছে যে, দুষ্কর্মজাত পাপফল ভোগ হইতে কাহারও নিস্তার নাই, মনুষ্যাদি দূরের কথা ইন্দ্রচন্দ্রেরও নাই।

নষ্টচন্দ্র বিষয়ে সময়নিরূপণ

স্মার্ত রঘুনন্দন তিথিতত্ত্বের ভিতর ভোজবংশের আদিপুরুষ ভোজরাজের একটি স্মৃতিবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা—

"শুক্লচতুর্থ্যান্তু সিংহে গতে চন্দ্রস্য দর্শনম্।
মিথ্যাভিশাপং কুরুতে ন পশ্যেত্তত্র তন্ততঃ॥"

সৌর ভাদ্রের শুক্লপক্ষের চতুর্থীতে চন্দ্রদর্শন করিলে মিথ্যাপরিবাদগ্রস্ত হইতে হয়। অতএব ঐ তিথিতে চন্দ্র দর্শন অকর্তব্য। বচনান্তর আছে—

"হরিণা দীয়তে তালো ভাদ্রে মাসি সিতাসিতে।
চতুর্থ্যামুদিতশ্চন্দ্রো নেক্ষিতব্যঃ কদাচন॥"

সকল অশুভ হরণকারী হরি জগতের কল্যাণার্থে কালপরিমাণ নির্দেশ করিয়া দিলেন যে, ভাদ্র-মাসের শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থী তিথিতে উদিত চন্দ্র কখনও দেখা উচিত নয়। ব্রহ্মপুরাণ বর্ণনা করেন—

"নারায়ণোঽভিশপ্তস্তু নিশাকরমরীচিষু।
স্থিতশ্চতুর্থ্যামদ্যাপি মনুষ্যায় পতেচ্চ সঃ॥
অতশ্চতুর্থ্যাং চন্দ্রস্তু প্রমাদাদ্বীক্ষ্য মানবঃ।
পঠেদ্ধাত্রেয়িকাবাক্যং প্রাঙ্মুখো বাঽপ্যুদঙ্মুখঃ॥"

নারায়ণ নষ্টচন্দ্রের রশ্মি দর্শন করিয়া অভিশপ্ত অর্থাৎ মিথ্যা পরিবাদগ্রস্ত হইয়াছিলেন। ভাদ্রের উভয়পক্ষীয় চতুর্থীর চন্দ্র দর্শনে অদ্যাপি সেই দোষ নারায়ণের প্রিয়পাত্র মনুষ্যে আপতিত হয়। অতএব প্রিয়জনের উদ্ধারের ব্যবস্থা রাখিলেন এইভাবে যে, দৈবাৎ দর্শনকারী পূর্বাস্য বা উত্তরাস্য হইয়া বিষ্ণুপুরাণোক্ত ভল্লুকধাত্রীবাক্য উচ্চারণ পূর্বক শঙ্খোদক পান করিবে। আর্য-শাস্ত্রানুশাসনে আরও উল্লেখ আছে যে, "নষ্টচন্দ্রো ন দৃশ্যশ্চ ভাদ্রে মাসি সিতাসিতে"—ভাদ্রমাসের শুক্লা ও কৃষ্ণাচতুর্থীর চাঁদ পাপগ্রস্ত বলিয়া দেখিতে নাই। জ্যোতিষ শাস্ত্রও স্পষ্ট ঘোষণা করিতেছেন—

"পঞ্চাননগতে ভানৌ পক্ষয়োরুভয়োরপি।
চতুর্থ্যামুদিতশ্চন্দ্রো নেক্ষিতব্যঃ কদাচন॥"

সূর্য যে মাসে সিংহ রাশিতে গমন করেন সেই ভাদ্রমাসের উভয়পক্ষীয় চতুর্থীতে উদিত চন্দ্রকে কখনও দেখা উচিত নহে।

নভোমণ্ডল এবং পৃথিবীর ভিতর পরস্পর আকর্ষণ হয় এইকালে বিশেষভাবে। "আকাশং লিঙ্গমিত্যাহুঃ পৃথিবী তস্য পেটিকা" এই তন্ত্রবাক্য অনুসারে নভোমণ্ডল পুরুষ এবং পৃথিবী স্ত্রী, যাহা অসুরদের অনু এবং ইয়া, ইঁহাদের পরস্পর অত্যধিক আকর্ষণে সমুদ্রজল স্ফীত হইয়া বান ডাকে, ঐ বান প্রতিপদ দ্বিতীয়াতে তত লক্ষ্য হয় না, তৃতীয়া চতুর্থী হইতেই প্রবলতর হইতে দৃষ্ট হয়। এই বানকে চলিত কথায় ষাঁড়া ষাঁড়ির

অর্থাৎ পুরুষ প্রকৃতির বান বলা হয়। রসবর্ধক আকর্ষণকারী এই সময়কার চন্দ্রের দৃষ্টিপথে অর্থাৎ জোৎস্নাজাল সম্ভোগে যাহাতে আপতিত হইতে না হয় স্বাস্থ্যরক্ষণশীল মানুষের জন্য তাই এত শাস্ত্রানুশাসন।

নষ্টচন্দ্র দর্শনের কুফল

এই নষ্টচন্দ্র দর্শনের কুফল এমনই যে, দর্শনকারী কার্যতঃ কোন দূষণীয় কর্ম না করিলেও তাহাকে মিথ্যা কলঙ্কের ভাগী হইতে হইবে। এ বিষয়ের উজ্জ্বল প্রমাণ পাওয়া যায় শ্রীমদ্ভাগবতের স্যমন্তক-মণির উপাখ্যানে। যাদবজীবন বসুদেবতনয় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এই নষ্টচন্দ্র দর্শনের কুফলে কলঙ্কিত হইয়া পরে নিজ অসমোর্ধ্ব বীর্যবলে তাহা ক্ষালন করিয়া সেই অভূতপূর্ব ভাগবতমাহাত্ম্যকে ভিত্তি করিয়াই এই নিষিদ্ধ চন্দ্রকে দৈবাৎ দর্শনহেতু পাপক্ষালনের জন্য দর্শনকারীকে পূর্বাস্য বা উত্তরাস্য হইয়া নিম্নোদ্ধৃত ধাত্রীবাক্য পাঠ পূর্বক শঙ্খোদক পানের ব্যবস্থা প্রচলিত :

"সিংহঃ প্রসেনমবধীৎ সিংহো জাম্বুবতা হতঃ।
সুকুমারক মা রোদীস্তব হ্যেষ স্যমন্তকঃ॥"

ব্রহ্মপুরাণ ১৬।৩৬।

পরম সূর্যভক্ত যদুকুলোদ্ভব অন্ধকবংশীয় মহারাজ সত্রাজিৎ সূর্যদেবের প্রসাদে এই মণি লাভ করেন। এই মণির এমনি গুণ ছিল যে, প্রত্যহ পূর্ণ অষ্টভার সুবর্ণমুদ্রা উহা হইতে উৎপন্ন হইত। একদা তদীয় ভ্রাতা প্রসেনজিৎ এই মণি কণ্ঠে ধারণ করিয়া ঋক্ষবান পর্বতের নিকটস্থ গভীর অরণ্যে মৃগয়ার্থ গমন করিয়াছিলেন। সেখানে এই মণির প্রভায় তিনি দ্বিতীয় সূর্যের মত প্রতিভাত হওয়ায় সকল পশুপক্ষীরই মহা ত্রাস জন্মে। মহাবিক্রমশালী এক সিংহ তাঁহাকে দর্শন মাত্র বধ করিয়া মণি কাড়িয়া লইল। সিংহ মণিসহ ঋক্ষবান পর্বতের গুহায় আশ্রয় লইল। সেই গুহার সুদূর অভ্যন্তর প্রদেশে জাম্বুবান নামক ভল্লুকের নিভৃত আবাস ছিল। জাম্বুবান-তনয় মহা জ্যোতির্ময় মণি দূরস্থ গাঢ় তমসাচ্ছন্ন গহ্বর-প্রদেশ হইতে দেখিতে পাইয়া তাহা লাভের জন্য পিতা জাম্বুবানের নিকট কাঁদিতে লাগিল। তাহাতে জাম্বুবান সেই সিংহকে নিহত করিয়া স্যমন্তকমণি নিজ কুমারের হস্তে প্রদান করিলেন এবং ধাত্রী কুমারকে আর কাঁদিও না বলিয়া প্রবোধ দিতে লাগিলেন।

এদিকে সত্রাজিৎ ভ্রাতা প্রসেনজিৎকে মৃগয়া হইতে আর ফিরিয়া আসিতে না দেখিয়া মহাসন্তপ্ত হইলেন এবং মণিলোভে কেহ তাঁহাকে সংহার করিয়াছে বলিয়া স্থির ধারণা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পূর্বে কোনও সময়ে প্রয়োজন বশতঃ এই মণিটি সত্রাজিতের নিকট চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সত্রাজিৎ তাহা কিছুতেই দেন নাই। এক্ষণে প্রসেনজিতের সংহারবার্তা সর্বত্র ঘোষিত হইলে সত্রাজিৎ এবং অন্যান্য যাদবগণ মনে মনে সকলেই শ্রীকৃষ্ণকে প্রসেনহন্তা বলিয়া সন্দেহ পোষণ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এই মিথ্যা কলঙ্কের বিষয় জানিতে পারিয়া তৎপূর্ববর্তী নষ্টচন্দ্র দর্শনের কুফল বলিয়া বুঝিলেন এবং অপবাদ ঘুচাইবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। তিনি প্রসেনের গমনচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া গভীর অরণ্যে প্রবেশ করতঃ প্রসেনের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ দেখিতে পাইলেন। তৎপরে রক্তচিহ্ন অনুসরণক্রমে সমীপস্থ পর্বতগুহায় উপনীত হইয়া মৃত সিংহদেহ দেখিলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর গুহার অভ্যন্তর-প্রদেশে গভীর অন্ধকারের ভিতর এক সুড়ঙ্গ পথ আবিষ্কার করিলেন। সিংহহত্যাকারী মণিচোরের ইহাই গন্তব্য পথ বুঝিয়া অনুচর যাদবগণকে গুহামুখে প্রত্যাবর্তন কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলিয়া সর্বভয়মুক্ত মধুসূদন সুড়ঙ্গপথে সুগভীর ভল্লুকবিলে ধাবমান হইলেন, তথায় ভল্লুকশিশুর হস্তে স্যমন্তকমণি দৃষ্ট হইল। মণি উদ্ধারার্থে তিনি ভল্লুকরাজ জাম্বুবানের সহিত দীর্ঘ একুশ দিন

ব্যাপী তুমুল সংগ্রাম করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণে বর্ণনা আছে, শ্রীকৃষ্ণ প্রসেনহত্যাকারী সিংহঘাতক ভল্লুকের সুগভীর বিলপ্রদেশ হইতে "সিংহঃ প্রসেনমবধীৎ সিংহো জাম্ববতা হতঃ। সুকুমারক মা রোদীস্তব হ্যেষ স্যমন্তকঃ॥"—এই বাক্য ভল্লুক-বালকের ধাত্রীমুখে উচ্চারিত হইতে শুনিয়াছিলেন সুড়ঙ্গ প্রবেশের দ্বারদেশ হইতেই। তাই তিনি বলরাম প্রভৃতি যদুসৈন্যগণকে গুহামুখে অপেক্ষা করিতে বলিয়া স্বয়ং ভল্লুকবিলে প্রবেশ করিলেন। "কুমারক্রীড়নকীকৃতঞ্চ ধাত্রীহস্তে তেজোভিঃ জাজ্বল্যমানং স্যমন্তকং দদর্শ। তঞ্চ স্যমন্তকাভিলাষ-চক্ষুষমপূর্বং পুরুষমাগতমাবেক্ষ্য ধাত্রী ত্রাহি ত্রাহীতি ব্যাজহার। তদার্তনাদশ্রবণানন্তরঞ্চামর্ষপূর্ণহৃদয়ঃ স জাম্ববান্ আজগাম, তয়োশ্চ পরস্পরং যুধ্যতোর্দ্বয়োর্যুদ্ধমেকবিংশতিদিনান্যভবৎ। তে চ যদুসৈনিকাস্তত্র সপ্তাষ্টদিনানি তন্নিষ্ক্রান্তিম্ উদীক্ষমাণাস্তস্থুঃ। অনিষ্ক্রমমাণে চ মধুরিপৌ অসাববশ্যমত্র বিলেহত্যন্ত-নাশমাপ্তো ভবিষ্যত্যন্যথা তস্য কথং এতাবন্তি দিনানি শত্রুজয়ে ব্যাক্ষেপো ভবতীতি কৃতাধ্যবসায়া দ্বারকামাগতা হতঃ কৃষ্ণ ইতি কথয়ামাসুঃ। তদ্বান্ধবাশ্চ তৎকালোচিতমখিলমুপরতক্রিয়াকলাপং চক্রুঃ। তত্র চাস্য যুধ্যমানস্যাতিশ্রদ্ধাদত্তবিশিষ্ট-পাত্রোপযুক্তান্নতোয়াদিনা কৃষ্ণস্য বলপ্রাণপুষ্টিরভূৎ॥" —সেখানে ভল্লুক বালককে খেলা দেখাইতে রত ধাত্রীর হাতে উজ্জ্বল স্যমন্তক মণি দেখিলেন। ধাত্রী স্যমন্তকলুব্ধচক্ষু তাঁহাকে দেখিয়া ত্রাহি ত্রাহি বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। এই আর্তনাদ শুনামাত্র ক্রোধপূর্ণ হৃদয় জাম্ববান্ ছুটিয়া আসিল এবং নবাগতের সহিত (ভাগবতমতে) একুশ দিন দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিল। এদিকে পনর দিন পর্যন্ত গুহামুখে অপেক্ষা করিয়াও অনুচরগণ যখন আর শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যাবর্তন করিতে দেখিল না, তখন ভল্লুকগহ্বরে তাঁহার অত্যন্ত বিনাশপ্রাপ্তি স্থির করিয়া দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে দ্বারকায় ফিরিয়া গেল এবং কৃষ্ণ নিহত হইয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করিল। তখন যাদবেরা যথাযোগ্য শ্রাদ্ধ, তর্পণ, পিণ্ডদানাদি করিতে লাগিলেন। তাহার ফলে পানাহারবঞ্চিত দীর্ঘ-দিন যুদ্ধরত কৃষ্ণের দেহে বল সঞ্চার হইয়াছিল এবং তাহাতেই জাম্ববানকে পরাভূত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। জাম্ববান পরাভব স্বীকার করিল এবং স্বীয় প্রভু শ্রীরামচন্দ্রই যে শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা সম্যক্ অবগত হইয়া পরম শ্রদ্ধা-সহকারে স্তবস্তুতি করতঃ আত্মজা জাম্ববতীসহ স্যমন্তক মণি শ্রীকৃষ্ণ করে সমর্পণ করিয়া ধন্য হইল।

"সত্রাজিতং শপন্তস্তে দুঃখিতা দ্বারকৌকসঃ।
উপতস্থুশ্চন্দ্রভাগাং দুর্গাং কৃষ্ণোপলব্ধয়ে॥
তেষাস্তু দেব্যুপস্থানাৎ প্রত্যাদিষ্টাশিষা স চ।
প্রাদুর্বভূব সিদ্ধার্থঃ সাদরো হর্ষয়ন্ হরিঃ॥
উপলভ্য হৃষীকেশং মৃতং পুনরিবাগতম্।
সহ পত্ন্যা মণিগ্রীবং সর্বে জাতমহোৎসবাঃ॥"

দ্বারকাবাসী যাদবগণ শ্রাদ্ধাদি শেষ করিয়া সত্রাজিৎকে অভিশাপ দিতে দিতে শ্রীকৃষ্ণকে পুনরায় লাভ করিবার জন্য চন্দ্রভাগা নাম্নী দুর্গার উপাসনায় ব্রতী হইলেন। তাঁহাদের উপাসনায় সন্তুষ্টা দেবী যখন মঙ্গলবাক্য উচ্চারণ ও আশীর্বাদ দান করিতে-ছিলেন ঠিক সেই মুহূর্তে শ্রীকৃষ্ণ নবপরিণীতা জাম্ববতীসহ স্যমন্তক মণি কণ্ঠে ধারণ করিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাতে সকল যাদবেরা মৃত শ্রীকৃষ্ণকে দেবীর অসীম দয়ায় পুনরায় ফিরিয়া পাইলেন ভাবিয়া মহানন্দে মহোৎসবাদি করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ সর্বসমক্ষে স্যমন্তকমণি সত্রাজিৎ মহারাজকে অর্পণ করিয়া মিথ্যা কলঙ্ক হইতে এবারকার মত মুক্তি লাভ করিলেন। সত্রাজিৎ অতীব লজ্জিত হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ বিধানার্থ স্বীয় দুহিতা সত্যভামা দেবীকে মণিসহ তাঁহার করে সমর্পণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামার পাণিগ্রহণ করিলেন, কিন্তু সূর্যদত্ত স্যমন্তকমণি সূর্যভক্ত সত্রাজিৎকেই ফিরাইয়া দিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় অপবাদ ক্ষালন

প্রসেনজিৎ বধের মিথ্যাপবাদ হইতে মুক্ত হইবার পর কিছুদিন যাইতে না যাইতেই হস্তিনাপুরী হইতে জতুগৃহদাহে পাণ্ডবগণের বিনাশবার্তা শ্রবণ করিয়া পাণ্ডবনাথ অগ্রজসহ হস্তিনায় গেলেন। তাঁহাদের অনুপস্থিতিতে অক্রূর, কৃতবর্মা ও শতধনু প্রভৃতি যাদবগণ সত্রাজিৎ হইতে স্যমন্তক উদ্ধার করিবার জন্য মন্ত্রণা করেন। শতধনু একদা নিদ্রিত সত্রাজিৎকে হত্যা করিয়া স্যমন্তক অপহরণ করিলেন। রামকৃষ্ণ এই বার্তা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ দ্বারকায় আসিলেন এবং সত্রাজিৎহন্তার সন্ধান পাইয়া তাহার বিনাশ ও স্যমন্তক উদ্ধার করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। শতধনু সব বুঝিতে পারিয়া স্যমন্তকমণি অক্রূরের নিকট রাখিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিলেন। কৃষ্ণবলদেব তাঁহার অনুসরণ করিয়া মিথিলার নিকট বনে তাঁহাকে ধরিতে সমর্থ হন। বলরাম দূরে রথের উপর ছিলেন, আর কৃষ্ণ একাকী অগ্রসর হইয়া শতধনুকে চক্রাঘাতে নিধন করিলেন, কিন্তু মৃতদেহ বা দেহস্থ পরিচ্ছদাদি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও মণির সন্ধান পাইলেন না। ব্যর্থমনে দাদার কাছে ফিরিয়া আসিলে বলরাম তাঁহার নিকট মণি প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সত্যকথা বলিলেও বলরাম অতীব অসন্তুষ্ট হইলেন এবং (ব্রহ্মপুরাণের বর্ণনানুসারে) ভাইকে বলিলেন—

"ভ্রাতৃত্বান্মর্ষয়াম্যেষ স্বস্তি তেঽস্তু ব্রজাম্যহম্।
কৃত্যং ন মে দ্বারকয়া ন ত্বয়া ন চ বৃষ্ণিভিঃ॥"

—ভাই বলিয়া এই ব্যবহার ক্ষমা করিলাম, তোমার মঙ্গল হউক, আমি চলিয়া যাইতেছি; দ্বারকাদ্বারা, তোমাদ্বারা আর বৃষ্ণিবংশীয়দের দ্বারা আমার কোন কাজ নাই। শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে অযথা বধভাগী মনে করিয়া দুঃখিত মনে দ্বারকায় ফিরিলেন আর বলরাম রুষ্টমনে মিথিলায় গিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্যোধনও জনকপুরীতে অভ্যর্থিত হইয়া কিছুদিন ছিলেন এবং বলদেবের নিকট গদাযুদ্ধ শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরিয়া আসিলে শতধনুর নিধনবার্তা শুনিয়া অক্রূর এবং কৃতবর্মাও দ্বারকা ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন। অক্রূরের দ্বারকা-ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে অনাবৃষ্টি প্রভৃতি নানা অলক্ষণ আপতিত হওয়ায় যাদবদের অনেকেই শ্রীকৃষ্ণকে এই অনিষ্টপাতের নিমিত্ত বলিয়া ভাবিলেন এবং মণি বিষয়েও অনেকেই এমন কি বলরাম পর্যন্ত তাঁহাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিলেন। এই সব মিথ্যা কলঙ্ক নষ্টচন্দ্রদর্শনেরই কুফল বুঝিয়া চতুর শ্রীকৃষ্ণ বহু অনুসন্ধানে অক্রূরকে দ্বারকায় আনয়ন করিলেন এবং বলদেবকেও মিথিলা হইতে ফিরাইয়া আনিয়া সর্বসমক্ষে একবার মাত্র মণিটি দেখাইবার জন্য অক্রূরকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন। অক্রূর বসনাবৃত সূর্যপ্রভ স্যমন্তক মণি প্রকাশ্যে শ্রীকৃষ্ণকরে অর্পণ করিলেন। ভগবান কলঙ্কভঞ্জনানন্তর অক্রূরের হস্তেই পুনরায় তাহা দিলেন।

ভাগবত বর্ণনা করেন—

"যস্ত্বেতদ্ভগবত ঈশ্বরস্য বিষ্ণোঃ বীর্যাঢ্যং বৃজিনহরং সুমঙ্গলঞ্চ।
আখ্যানং পঠতি শৃণোত্যনুস্মরেদ্বা দুষ্কীর্তিদুরিতমপোহ্য যাতি শান্তিম্॥"

ব্রহ্মপুরাণ বর্ণনা করেন—

"ইমাং মিথ্যাভিশস্তিং যঃ কৃষ্ণস্য সমুদাহৃতং।
বেদ মিথ্যাভিশাপাস্তং ন স্পৃশন্তি কদাচন॥"

ভগবানের বীর্যগাথাসমন্বিত, অনিষ্টনিবারক ও মঙ্গলাবহ এই আখ্যান যে ব্যক্তি পঠন, শ্রবণ, স্মরণ মনন করেন তিনি অপকীর্তিজনিত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া নিরন্তর শান্তি লাভ করেন।

শ্রীকৃষ্ণের মিথ্যাপবাদের কাহিনী যিনি জানেন, তাঁহাকে মিথ্যা অভিশাপাদি বা কলঙ্কসমূহ কখনও স্পর্শ করিতে পারে না।

বেদাঙ্গ পুরাণাদিতে স্যমন্তক উপাখ্যানের এইরূপ মাহাত্ম্য বর্ণিত থাকায় নষ্টচন্দ্র দর্শনকারী-গণের পাপক্ষালনের জন্য শ্রদ্ধা সহকারে এই আখ্যান পঠন, কীর্তন, শ্রবণ ও স্মরণ মননের কথা আর্যঋষিগণ কর্তৃক বিশেষভাবে নির্দিষ্ট হইয়াছে।

জাতি ও সমাজ

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

জাতিকে লইয়াই সমাজ এবং এই সমাজের অখণ্ডতা ও শক্তি বজায় থাকে তখনই যখন সকল জাতির ভিতর মিলন ও মৈত্রীর ভাব থাকে অক্ষুণ্ণ। কিন্তু বর্তমান সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখি বাঁধনের পর বাঁধন চাপাইয়া তাহার শরীরকে আমরা পঙ্গু ও দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছি, পঙ্কিল আবিলতায়ও তাহা ভরিয়া গিয়াছে। নানা সংস্কারের পাপ আমাদের মাথায় চাপিয়া বসিয়াছে। পাপ পাপ করিয়া সকলকেই আমরা পেগানধর্মীদের মত পাপী সাজাইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছি, কিন্তু সত্যকার পাপ ও পুণ্য কাহাকে বলে তাহার বিচার করিবার প্রবৃত্তি আমাদের এ পর্যন্ত হইল না! দোষ তো জীবনে আমরা সকলেই করিয়া থাকি, কিন্তু তাহার জন্য পাপ পাপ করিয়া সমাজের শরীর ও মনকে দুর্বল করিয়া আর লাভ কি? এখন আমরা চাই এমন লোক যিনি বুক ফুলাইয়া উপনিষদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া বলিতে পারেন: ভারতবাসী, তোমরা অমৃতের পুত্র, পাপ তোমাদের নাই। সর্বপাপ-হারী ভগবান অন্তর্যামিরূপে সকলের অন্তরেই রহিয়াছেন, সুতরাং পাপচিন্তাই মহাপাপ। বল—পাপজয়ী তোমরা, চির পবিত্র তোমরা, পৃথিবীর তুচ্ছ পঙ্কিলতা তোমাদের কখনও অপবিত্র করিতে পারিবে না। অনেকে আজীবন গীতা, চণ্ডী, ভাগবত, উপনিষৎ, বেদ-বেদান্ত পড়িতেছেন কিন্তু কোনটীরও সার্থকতা কি তাঁহাদের জীবনে কোন দিন ফুটিবে না? সমাজ-জীবনের মিলনসূত্র রচনায় কি চিরদিন তাঁহারা ব্যর্থকাম হইয়াই বসিয়া থাকিবেন? সমাজ-শৃঙ্খলার জন্য স্মৃতি-সংহিতার সৃষ্টি সমাজপতিরা করিয়াছেন। ইস্পাতের মোড়কে সমাজ-শাস্ত্রের আয়ুকে তাঁহারা বাঁধিয়া দেন নাই। ইচ্ছা করিলেই সমাজের কল্যাণের জন্য সমাজশাসন-নীতির পরিবর্তন অবশ্যই করা যাইতে পারে।

রাজনৈতিক প্রবল ঝঞ্ঝা বাঙলার বুকের উপর দিয়া বহিয়া না গেলে হয়তো সামাজিক সমস্যা কোনদিনই তীব্র হইয়া উঠিত কিনা সন্দেহ। গড্ডলিকাপ্রবাহে সমাজ গা ভাসাইয়া চলিয়াছে। সমাজের বুকে অত্যাচার কতবার হইয়া গিয়াছে। প্রতিদিন ও প্রতিক্ষণে কত পরিবর্তন হইতেছে। বর্তমান সমাজের চলমান শ্মশান-চিত্র দেখিয়াই স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন: "এই দেশ কেমন করিয়া বাঁচিবে? সমাজে সমাজে মিল নাই, জাতিতে জাতিতে মিল নাই, শ্রেণীতে শ্রেণীতে মিল নাই, অথচ আচার-বিচার সংস্কার ও ভেদনীতির অন্ধকূপে পড়িয়া সমগ্র দেশের আজ শ্বাসরোধ হইতে বসিয়াছে।" শাস্ত্র আমাদের অনেক আছে; উহাদের বচনকে আমরা সম্মান ও শ্রদ্ধা না করিয়া পারি না; কিন্তু শাস্ত্রবিধানের ভার যাঁহাদিগের উপর, তাঁহারা কি কোন দিন সমাজের ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া দেখিয়াছেন? ভাবিয়া দেখিলে সমগ্র সমাজের ভিত্তি এরূপভাবে শিথিল ও শতধা বিচ্ছিন্ন হইয়া ধসিয়া পড়িত না! বিপদ দেখিয়া সকলের প্রাণই কাঁদিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু বিপদের বীজ ধ্বংস করিবার জন্য সমাজপতিরা এতদিন কি করিয়াছেন? রোগ দূর করিতে হইলে ঔষধের ব্যবস্থা

আগে হইতেই করিতে হয়, রোগের চাপে রোগী মরিয়া গেলে আর ঔষধ দিয়া কি ফল হইবে?

এইজন্য আমাদের বক্তব্য—জাতির মঙ্গল সাধন করিতে হইলে শুধু শাস্ত্রের নজির দিলে আর চলিবে না। চারিদিকের শক্ত বাঁধনের গ্রন্থি এখন শিথিল করিতে হইবে, প্রায়শ্চিত্তের অজুহাত এখন দিনকতকের জন্য বন্ধ রাখিতে হইবে, দেশ ও জাতিকে বাঁচিবার জন্য একটু স্বাধীনতার নিঃশ্বাস ফেলিতে হইবে। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, হারিত, বশিষ্ঠ, রঘুনন্দন বাঁচিয়া থাকিলে হয়তো বিপদ আমাদের এতদুর গড়াইত না, কিন্তু মুশ্‌কিল হইয়াছে সমাজের ভার যাঁহাদের উপরে রহিয়াছে, সমাজ লইয়া ভাবিবার অবসর তাঁহাদের নাই, জাতিকে অগ্রগতি ও বলিষ্ঠ করিবার চিন্তা তাঁহাদিগের মস্তিষ্কে এতদিন স্থান পায় নাই—আপনার ধাঁধা লইয়াই তাঁহারা এতদিন ব্যস্ত ছিলেন। বিপদ না আসিলে তো তাঁহাদের ঘুমের ঘোর ভাঙিত না! বিপদ আসিলেই তাঁহারা বক্তৃতা দেন ও লেখনী ধরেন; বিপদের সময় আসিলেই তাঁহারা সচেতন হন। তাঁহারা মনে করেন কর্মফল ভারতের নিজস্ব। অদৃষ্টের উপর হাত দিবার অধিকার ভগবানেরও নাই! মহামারী, প্লাবন, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্পও মানুষের দুষ্কৃতিরই প্রতিফল! মানুষ যন্ত্র, তাহাদের করিবার আর কি আছে? অদৃষ্টের পরিহাসে সকল শক্তি ও আত্মবিশ্বাস আমরা এইরূপেই হারাইতে বসিয়াছি। আমরা যে মানুষ, স্বাধীনভাবে সকল-কিছু করিবার জন্য যে ভগবানই আমাদের বুদ্ধি দিয়াছেন, একথা ভাবিবার শিক্ষা আমাদের নাই। পরাধীনতার শৃঙ্খল পরিয়া আমরা নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধি খাটাইতে পারি না, কিন্তু অপরের সর্বনাশ করিবার জন্য নেতা সাজিবার আগ্রহ আমাদের অপরিসীম!

পাপ পাপ করিয়া অনেক পাপের বোঝা আমরা ভারতের ঘাড়ে চাপাইয়াছি। স্বামী বিবেকানন্দও এই দুর্বলতা দেখিয়া বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন: "শক্তিহীন ভাবিয়াই তোরা নিজেদের শক্তিহীন করিয়া ফেলিয়াছিস্। পাপী পাপী ভাবিয়াই তোদের সমস্ত জাতটা আজ অধঃপাতে যেতে বসেছে।" সত্যই পাপ-চিন্তা দুর্বলতা। দোষ-ত্রুটী জীবনে সকল মানুষই চিরদিন করে ও করিবে, কিন্তু এজন্য তুষানলের ব্যবস্থা করিয়া কোন ফল হইবে না; অনুতাপ করিলেই মানুষ পবিত্র হইয়া যাইবে। হিন্দুমাত্রেই গীতা চণ্ডী উপনিষৎ পড়িবে ইহাতে আর বিচিত্রতা কি? কিন্তু বিচিত্রতা দেখি সেখানেই যেখানে ইহা পুরাতন নীরস প্রতিধ্বনি মাত্রে পর্যবসিত হইয়া আকাশে মিলাইয়া যায় এবং ইহা দ্বারা সত্যকার নূতন করিয়া জীবন গড়িবার আকুলতার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।

দেশ এখন কেবল বাণী ও শাস্ত্রের বিধি চায় না। দেশের বিবেক ও চেতনা এখন জাগিয়াছে, পাপ পাপ করিয়া প্রায়শ্চিত্তের জীর্ণ মনোভাব আঁকড়াইয়া থাকিবার ধৈর্য আর মানুষের নাই। মানুষ চায় আজ শান্তি, নূতন আলোক, অভয় ও আশ্বাসের বাণী! এজন্য দেশের সমাজপতিদের বর্তমানে উদারতার আসনে বসিয়া নূতন করিয়া সমাজশাস্ত্র রচনা করিতে হইবে। দেশের কল্যাণ-চিন্তা কয়েকজন মুষ্টিমেয় লোকের হাতে ছাড়িয়া দিয়া নিজেদের নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিবে না। জাতিতে জাতিতে, বর্ণে বর্ণে, গোত্রে গোত্রে, সমাজে সমাজে বিধি-নিষেধের প্রাচীর গড়িয়া তুলিয়া কতটুকু কল্যাণ সাধন করিয়াছি, এখন তাহা বুঝিতে আর কষ্ট-কল্পনা করিতে হইবে না। নীচ, অস্পৃশ্য, ঘৃণ্য বলিয়া যাহাদের আমরা এতদিন অবহেলা করিয়াছি, তাহাদের আপনার করিয়া লইতে আমরা কি

করিতেছি? লেখা ও কথার বিনিময় ছাড়িয়া আমাদের এইবার সকল-কিছুকেই বাস্তবে পরিণত করিতে হইবে। ভালবাসার অপেক্ষা বড় জিনিস আর নাই। ভালবাসিলে যখন বনের হিংস্র জন্তুও পোষ মানিয়া থাকে, তখন আমাদেরই মনুষ্যজাতি—আমাদেরই নির্যাতিত পতিত ভাইদের ভালবাসা খুব কঠিন কাজ নহে। শাস্ত্র বলে ভগবান সকলের ভিতর থাকিলেও মানুষের ভিতরই তাঁহার বেশী প্রকাশ; কিন্তু মানুষ-ভগবানের দিকে চাহিবার শিক্ষা আমরা কতটুকু পাইয়াছি? সমাজের ও জাতির কতটুকু মঙ্গল সাধনই বা আমরা করিয়াছি তাহাও এখন ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। পুরাতনের মর্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও কি আমরা সমাজকে নূতন রূপ দিতে পারি না? এজন্য হৃদয়ের সংকীর্ণতা অবশ্য বলি দিতে হইবে। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য ও রঘুনন্দন যে যুগে ছিলেন তাহার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। এখন পুরাতনের মোহ করিয়া লাভ নাই। তবে পুরাতনের প্রতি সম্মান অব্যাহত রাখিয়াই নূতন সমাজ-শাস্ত্র আমাদের তৈরী করিতে হইবে। ভগবান অচল ও চিরন্তন করিয়া সামাজিক প্রথা সৃষ্টি করেন নাই, সমাজের আবশ্যকতা বুঝিয়া মানুষই সমাজ-শাস্ত্র রচনা করিয়াছে। কাজেই নূতন করিয়া রচনা করিবার অধিকার সকলেরই আছে। সর্বসাধারণকেই তাহার জন্য অবশ্য সাহায্য করিতে হইবে। দেশ ও দশের উন্নতির জন্য নূতন সমাজ-শাস্ত্র প্রণয়ন করিতে হইবে। জাতি ও সমাজকে বাঁচাইবার ও নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্যই শাস্ত্র। পুরাতনের চাপে পড়িয়া সমগ্র জাতি ও সমাজ পচিয়া মরিবার উপক্রম করিয়াছে। সমাজ ও জাতিকে বাঁচাইতে হইলে দেশের বর্তমান পরিস্থিতি ও আবহাওয়ার অনুকূল করিয়া উহাকে গঠন করিতে হইবে। বাদসাহী আমলের টাকা ইংরাজ আমলে চালাইবার চেষ্টা করা বৃথা। পুরাতন সমাজ-শাস্ত্র শাসনের আমরা আমূল পরিবর্তনেরই আশা করি। দেশের দায়িত্বশীল লোকদের এখন সমাজের প্রতি দৃষ্টি দিতে হইবে। সমাজ অচল করিয়া রাখিলে সহস্র গঙ্গাস্নান, গীতা ও চণ্ডীপাঠে বিশেষ ফল হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না। গঙ্গাস্নান, গীতা ও চণ্ডীপাঠকে রাখিয়াই আমাদের নূতন সমাজশাসনতন্ত্র রচনা করিতে হইবে। দেশের অচল মনোবৃত্তির এখন উচ্ছেদ সাধন করিতেই হইবে, কেননা রাষ্ট্রীয় উন্নতি, দেশের উন্নতি ও সমাজকে সবল করার উপরই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে।

সমাজসংস্কারের জন্য দেশের যাঁহারা বরেণ্য, জ্ঞানী ও চিন্তাশীল মনীষী তাঁহাদের আশ্বাস আমরা পাইতেছি এবং তাহার জন্য তাঁহাদের নিকটে সর্বসাধারণ চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিবে। দেশ ও সমাজের জীর্ণ শতচ্ছিন্ন প্রাণহীন মূর্তি তাঁহারা সত্য সত্যই উপলব্ধি করিয়াছেন। ভালবাসা ও মৈত্রীর ভাব যাহাতে সকলের ভিতর উদ্দীপিত হইয়া উঠে তাহার জন্য তাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদিগের প্রচেষ্টায় দেশের জনসাধারণের চিরদিনই সমর্থন থাকিবে। এখন সকলেই চায় প্রাণের বাস্তব পরিচয়, বাণী বক্তৃতা ও প্রবন্ধের ছড়াছড়ি যথেষ্ট হইয়াছে। গোঁড়ামি এবং জাতি ও আচারের হৃদয়হীন বিচার এখন কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখিতে হইবে। আসল যাহা, তাহা খোসার চাপে পড়িয়া বিপর্যস্ত হইয়া গিয়াছে। বাহ্যিক আড়ম্বরে দেশের বাষ্প কলুষিত হইয়াছে। মন ও মুখ এক করিয়া আমাদের সত্যিকার সংগঠন করিতে হইবে এবং সংকীর্ণ ও কপটভাব বিসর্জন দিয়া ভালবাসার বিনিময়ে সকলের হৃদয় জয় করিতে হইবে। জাতিতে জাতিতে ঘৃণা ও তুচ্ছ তাচ্ছিল্য যথেষ্টই হইয়াছে। উচ্চ ও নীচের পরীক্ষা সমাজে এখনো পর্যন্ত হয় নাই। আমরা নীচ বলিয়া যাহাদের অবজ্ঞা করি, তাহাদেরও হৃদয় আছে, তাহাদেরও মনুষ্যত্ব আছে। এখন এই সকলের উদ্বোধন করিয়া জাতির দুর্বলতা দূর করিতে হইবে।

রবীন্দ্রচিন্তাকণা

শ্রীবলেন্দ্র নাথ কুণ্ডু, বি-এস্‌সি

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গদ্যগ্রন্থাবলীর চতুর্থভাগের 'সাহিত্য'নামক এক ক্ষুদ্র পুস্তিকায় সাহিত্যের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এক জায়গায় লিখেছেন—"বাহিরের জগৎ আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আর একটা জগৎ হইয়া উঠিতেছে। তাহাতে যে কেবল বাহিরের জগতের রং, আকৃতি, ধ্বনি প্রভৃতি আছে, তাহা নহে—তাহার সঙ্গে আমাদের ভালো-মন্দ লাগা, আমাদের ভয় বিস্ময়, আমাদের সুখদুঃখ জড়িত—তাহা আমাদের হৃদয়বৃত্তির বিচিত্ররসে নানাভাবে আভাসিত হইয়া উঠিতেছে। এই হৃদয়বৃত্তির রসে জারিয়া তুলিয়া আমরা বাহিরের জগৎকে বিশেষরূপে আপনার করিয়া লই।"

মনের ব্যাপ্তি যাঁর যত বেশী বাইরের জগৎ তাঁর কাছে তত বৃহৎরূপে তার রূপসম্ভার নিয়ে প্রকাশিত হয়। সেখানে সুখদুঃখের সংমিশ্রণে যে মহনীয় সৌন্দর্য্যচূড়া রচিত হবে—সত্যিকার চিন্তাবীর মাত্রই সেই রূপে অভিভূত হবেন। রবীন্দ্রনাথের মনের ব্যাপ্তি এত প্রসারিত যে তা কল্পনা করা দুঃসাধ্য। একমাত্র 'সাহিত্য' পুস্তিকার প্রতিটি অধ্যায় সম্যকরূপে পর্য্যালোচনা করলে তাঁর প্রসারিত মনোজগতের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়।

ছোট শিশুর মত বিশ্বপ্রকৃতির নিত্যনূতন রূপে তিনি বিমুগ্ধ হয়ে যেতেন। বাতাস, জল, আকাশ, আলো আমাদের হৃদয়-পর্দায় কোন অপরূপ রূপ প্রকাশ করে না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কাব্য আর চিন্তাধারার উৎস ওই বাতাস, জল, আকাশ, আলো। গীতাঞ্জলির একটি গানের মধ্যে আছে—

"বাতাস, জল, আকাশ, আলো
সবারে কবে বাসিব ভালো,
হৃদয় সভা জুড়িয়া তারা
বসিবে নানা সাজে।"

বাতাস, জল, আকাশ, আলো দেখে তিনি আত্মহারা হয়ে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিতেন। তিনি তাঁর জীবনস্মৃতিতে বলেছেন—"নদীতে স্নান করার সময় জলের স্পর্শে আমার সমস্ত দেহ মন আনন্দে পুলকিত হয়ে ওঠে।" যাঁরা প্রকৃতির শোভা যত বেশী হৃদয়ঙ্গম ও উপলব্ধি করতে পারেন তাঁদের হৃদয়ের প্রসার ততো বেশী হয়, আর আনন্দোজ্জ্বল হৃদয় নিয়ে যাঁরা কবিতা লেখেন তাঁদের কবিতা হয় জীবন্ত। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। তিনি সারাটি জীবন ধরে শুধু উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে গিয়েছেন।

প্রসারিত হৃদয় নিয়ে তিনি নিখিল বিশ্বকে ভালবাসতে চাইছেন—

"নয়ন দুটী মেলিলে কবে
পরাণ হবে খুসি,
যে পথ দিয়া চলিয়া যাব,
সবারে যাব তুষি।"—গীতাঞ্জলি।

এত বড়ো কথা তাঁর মুখেই শোভা পায়—যেম্‌নি ভাব, তেম্‌নি ভাষা, তেমনি ছন্দ, সব কিছুই অতুলনীয়। অতি সাধারণ কথা নয়ন আর পরাণ, কিন্তু তিনি এই সামান্য কথা দিয়েই এক ব্যাপক

ভাবের সৃষ্টি করলেন। 'যাকে চোখ দিয়ে দেখ্‌ব তাকেই ভালবাস্‌ব'—আমার যেন কেউ পর থাকে না—এই মনোভাব।

"রয়েছ তুমি এ কথা কবে
জীবন মাঝে সহজ হবে,
আপনি কবে তোমারি নাম
ধ্বনিবে সব কাজে।"—গীতাঞ্জলি।

কবি তাঁর জীবন-দেবতাকে স্মরণ করে বলছেন—হে চিরসুন্দর, কবে তোমায় সহজভাবে আমার জীবনের প্রতিটি কাজে দেখ্‌তে পাব।

তিনি কৃচ্ছ্রসাধন ভালবাসতেন না—ভাল, মন্দ সব কিছুই সত্য। মন্দকে বর্জ্জন করে ভাল হবার দম্ভ তাঁর নেই; তাই তিনি মুক্তির চেয়ে বন্ধনকে বড় করলেন—

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।"

যাঁরা সত্যদ্রষ্টা তাঁরা মন্দের মধ্যেও সত্যের রূপ দেখ্‌তে পান। ভাল-মন্দ বিচার মনুষ্য-জীবনের প্রথম অবস্থায়, তারপর সব সমান। তাই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—"তুমি ভালো, মন্দ যা কিছু কাজ করেছ, তাদের সম্বন্ধে একদম ভেবো না—সেগুলি থুথু করে উড়িয়ে দাও। যা করেছ করেছ। কুসংস্কার দূর করে দাও। মৃত্যু সম্মুখে এলেও দুর্ব্বলতা আশ্রয় করো না। অনুতাপ করো না—পূর্ব্বে যে সব কাজ করেছ, সে সব নিয়ে মাথা ঘামিও না, এমন কি যে সব ভালো কাজ করেছ, তাও স্মৃতিপথ থেকে দূর করে দাও। দুর্ব্বল, কাপুরুষ ও অজ্ঞ ব্যক্তিরা কখনও আত্মাকে লাভ করতে পারে না।" রবীন্দ্রবীণাতেও ওই একই সুর বাজ্‌ছে।

'সাহিত্য' পুস্তিকায় সাহিত্যের সংজ্ঞানির্দ্দেশ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ এমন সুন্দর সব কথা বলেছেন যা শুনে চমৎকৃত হতে হয়। যেমন —"জঠরে জারকরস অনেকের পর্য্যাপ্ত পরিমাণে না থাকাতে বাহিরের খাদ্যকে তাহারা ভাল করিয়া আপনার শরীরের জিনিষ করিয়া লইতে পারে না—তেমনি হৃদয়বৃত্তির জারকরস যাহারা পর্য্যাপ্তরূপে জগতে প্রয়োগ করিতে পারে না, তাহারা বাহিরের জগৎটাকে অন্তরের জগৎ, আপনার জগৎ, মানুষের জগৎ করিয়া লইতে পারে না।

"এক একটি জড় প্রকৃতির লোক আছে, জগতের খুব অল্প বিষয়েই যাহাদের হৃদয়ের ঔৎসুক্য—তাহারা জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াও অধিকাংশ জগৎ হইতে বঞ্চিত। তাহাদের হৃদয়ের গবাক্ষগুলি সংখ্যায় অল্প এবং বিস্তৃতিতে ও সংকীর্ণ বলিয়া বিশ্বের মাঝখানে তাহারা প্রবাসী হইয়া আছে।"

হৃদয়ের গবাক্ষ যাদের বন্ধ তারা প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে সাড়া পান না—তাদের কাছে শরতের চাঁদ আর শহুরে ঘরের বিজলী বাতি একই মূল্য বহন করে। রবীন্দ্রনাথ বলেন, এই ধরনের বিচিত্র মানুষগুলি কখনও আদর্শ সাহিত্যিক হতে পারেন না। যাঁদের হৃদয়ের ব্যাপ্তি নেই তাঁরা জগৎকে ভালবাস্‌তে বা জগতের কোন উপকার করতে অক্ষম। এই ধরনের লোকের হৃদয়-কবাট বন্ধ।

আবার একধরনের মানুষ আছেন যাঁদের হৃদয়ের বিস্তার খুব বেশী, তাদের কথা উল্লেখ করে কবি বলছেন—"এমন সৌভাগ্যবান লোকও আছেন, যাঁহাদের বিস্ময়, প্রেম এবং কল্পনা সর্ব্বত্র সজাগ—প্রকৃতির কক্ষে কক্ষে তাঁহাদের নিমন্ত্রণ; লোকালয়ের নানা আন্দোলনে তাঁহাদের চিত্ত-বীণাকে নানা রাগরাগিণীতে স্পন্দিত করিয়া রাখে। বাহিরের বিশ্ব ইঁহাদের মনের মধ্যে হৃদয়বৃত্তির নানা রসে, নানা রংয়ে, নানা ছাঁচে নানা রকম করিয়া তৈরী হইয়া উঠিতেছে। ভাবুকের মনের

এই জগৎটি বাহিরের জগতের চেয়ে মানুষের বেশী আপনার। তাহা হৃদয়ের সাহায্যে মানুষের হৃদয়ের পক্ষে বেশী সুগম হইয়া উঠে। তাহা আমাদের চিত্তের প্রভাবে যে বিশেষত্ব লাভ করে, তাহাই মানুষের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপাদেয়।"—সাহিত্য।

প্রকৃতির কক্ষে কক্ষে যাঁদের নিমন্ত্রণ তাঁরা সত্যই সৌভাগ্যবান—কারণ এখানকার মত রূপ আর কোথাও পাওয়া যায় না। এই অফুরন্ত আনন্দ আমাদের হৃদয়ের অন্ধকার দূর করে সেখানে বেঁচে থাকার মত উদারতা এনে দেয়। তথাকথিত মানুষ, যাঁরা সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই জীবন অতিবাহিত করেন তাঁদের হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তিগুলো পরিস্ফুট হতে পারে না, তাঁদের মহত্ত্ব কালো, ফরসা, লম্বা, ছোট বিচার করতেই ম্লান হয়ে যায়—ভালো, মন্দ, উদার, অনুদার প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ বৃত্তিগুলোকে বিচার করবার মত মানসিক প্রসার তাঁদের নেই। এই স্তরের মানুষ সাহিত্যিকের উপযুক্ত নয়। উদারচেতা মানুষের চিত্তবীণা দুনিয়ার নানা রাগরাগিণীতে স্পন্দিত হয়। বিশ্বপ্রকৃতির নানা রূপ হৃদয়হীনের চোখে অকিঞ্চিৎকর হলেও হৃদয়বানের চোখে তারই কত কদর! প্রভাত-বেলা সকলেরই ভালো লাগে কিন্তু কেন যে ভালো লাগে তা ভাববার অবসর অধি-কাংশের নেই। কবি এই প্রভাতে দেখেন—বিশ্বনিয়ন্তা তাঁর দীপ্তি বিকিরণ করে, চোখে স্বপ্নের জাল কাটিয়ে, রাত্রির অন্ধতামস অপসারণ করে মানুষের হৃদয়দ্বারে উপস্থিত হয়েছেন, তাই এই প্রভাতবেলা শয্যাত্যাগ না করে পারা যায় না। মনে হয় আর উঠে কাজ নেই কিন্তু যখন দেখা যায় জীবন-দেবতা দ্বারে দাঁড়িয়ে আবাহনবাণী শোনাচ্ছেন, তখন তন্দ্রা পরিত্যাগ করে মেঘলোকপানে চেয়ে থাক্‌তে হয় যেখানে সিংহবাহনে আস্‌ছেন তিনি, যিনি মিলনযজ্ঞের অগ্নি জ্বালাবেন। তিমির রাত্রির শেষে তাঁকে যদি লাভ করা যায়—মহাসম্পদ্ লাভ করা হবে, তাঁর চরণস্পর্শে মৃত্যুও অমৃত হবে।

সমাজের সকল মানুষ ভাব্‌বার অবসর পান না—জনসাধারণের সুবিধার জন্য সাহিত্যিক ও চিন্তাবীরের একান্ত প্রয়োজন। ভাবুক যা ভাবেন সাহিত্যে তা প্রকাশ করেন, আর সাহিত্য থেকে আমরা সেই ভাবুকের ভাবনার সঙ্গে পরিচিত হই—আমাদের কষ্টের লাঘব হয়। তাই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"ভাবুকের মনের জগৎটা হৃদয়ের সাহায্যে মানুষের হৃদয়ের পক্ষে বেশী সুগম হইয়া উঠে। তাহা আমাদের চিত্তের প্রভাবে যে বিশেষত্ব লাভ করে তাহাই মানুষের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপাদেয়।"—সাহিত্য।

বাহিরের জগতের সঙ্গে মানবের জগতের প্রভেদ তিনি অল্প কয়টী কথায় সুন্দররূপে ব্যক্ত করেছেন—"অতএব দেখা যাইতেছে, বাহিরের জগতের সঙ্গে মানবের জগতের প্রভেদ আছে। কোন্‌টা শাদা, কোনটা কালো, কোন্‌টা বড়, কোন্‌টা ছোট মানবের জগৎ সেই খবরটুকু মাত্র দেয় না। কোন্‌টা প্রিয়, কোনটা অপ্রিয়, কোন্‌টা সুন্দর, কোন্‌টা অসুন্দর, কোনটা ভালো, কোন্‌টা মন্দ, মানুষের জগৎ সেই কথাটা নানা সুরে বলে।"—সাহিত্য।

মানুষের জগৎ শুধু বাইরের পরিচয় দেয় না—অন্তরের পরিচয়ও দেয়। বাইরে থেকে কোনটা শাদা, কোন্‌টা কালো, কোন্‌টা বড়, কোন্‌টা ছোট, আমরা বলতে পারি কারণ এখানে শুধু খালি চোখের কাজ কিন্তু প্রিয়, অপ্রিয়, সুন্দর, অসুন্দর, প্রভৃতি অন্তর্বৃত্তি-গুলো বিচার করার সময় অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন হয়। মানুষের জগতে অন্তর্দৃষ্টি বিদ্যমান। মহাকবি এখানে সেই কথাই বলেছেন।

'ভানুসিংহের পদাবলী'র 'মরণ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ মরণকে শ্যামরূপে কল্পনা করেছেন—

"মরণ রে,
তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান।
মেঘবরণ তুঝ মেঘ জটাজুট,
রক্ত কমলকর, রক্ত অধরপুট,
তাপ-বিমোচন করুণ কোর তব
মৃত্যু অমৃত করে দান।
তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান॥"

শ্যামরূপী মরণকে ডেকে কবি বলছেন—মরণ তুমি শ্যামতুল্য। শ্যামসুন্দরের মত তুমিও আমাদের অপরিচিত, অথচ অপরিচিত মোটেই মনে হয় না। অপরিচিত বলেই তোমার মেঘের মত রং, তোমার পদ্মহস্ত রক্তবর্ণ, অধরপুট রক্তবর্ণ কারণ তুমি দিনশেষের বন্ধু। তুমি জীবজগতের সকল তাপ দূরীভূত করে দাও। তুমি শ্যামের মত অমৃত দান কর—তোমায় দেখে যে ভয় করে করুক আমি তোমায় শ্যামরূপী ভগবান মনে করি—আমি তোমার রাধা।

'ছবি ও গান'এর 'রাহুর প্রেম' কবিতার প্রারম্ভেই আছে—

"শুনেছি আমারে ভালোই লাগেনা,
নাই বা লাগিল তোর।
কঠিন বাঁধনে চরণ বেড়িয়া,
চিরকাল তোরে রবো আঁকড়িয়া,
নিবিড় লৌহ ডোর।

* * *

জগৎমাঝারে যেথায় বেড়াবি,
যেথায় বসিবি, যেথায় দাঁড়াবি,
বসন্তে শীতে, দিবসে নিশীথে,
সাথে সাথে তোর থাকিবে বাজিতে
কঠিন কামনা চিরশৃঙ্খল, চরণ জড়ায়ে ধরে,
একবার তোরে দেখেছি যখন কেমনে এড়াবি
মোরে।"

এই কবিতায় মহাকবি সত্যিকার প্রেমের লক্ষণগুলো রাহুর মুখে অভিব্যক্ত করেছেন। রাহু চাঁদকে ভালবাসে—চাঁদ দেখতে ভালো লাগে বলেই ভালবাসা। এখানে অন্য কোন স্বার্থ নেই রাহুর—যে তার জীবন মন সব সমর্পণ করে তার প্রেমের আধারকে ভালবেসে চলেছে। তার লোক লজ্জার ভয় নেই। রাহু জানে, চাঁদ তাকে মোটেই ভালবাসে না কিন্তু তবুও রাহু তাকে ভালবাসতে ভোলেনি, তাই সে বলছে—জগতের যেখানেই তুই যাবি, যেখানে বেড়াবি, যেখানে দাঁড়াবি সেখানেই আমি তোর সাথে সাথে রবো—বসন্তে, শীতে, দিবসে, নিশীথে, সমান ভাবে। আমার কামনা-রূপী কঠিন শৃঙ্খল তোর চরণ জড়িয়ে ধরে থাকবে। একবারে তোকে ভালবেসেছি যখন, জীবনেও ভুলব না সেই কথা।

বিমুগ্ধ প্রেমিক আবার বলছেন—

"চাও নাহি চাও, ডাকো নাহি ডাকো,
কাছেতে আমার থাকো নাই থাকো,
যাব সাথে সাথে, রবো পায় পায়, রবো
গায় গায় মিশি।"
—রাহুর প্রেম।

প্রেমোচ্ছ্বাসে হৃদয়ের সব কথা উজাড় হয়ে যায়—

"নিত্যকালের সঙ্গী আমি যে, আমি যেরে তোর
ছায়া,
কিবা সে রোদনে, কিবা সে হাসিতে,
দেখিতে পাইবি কখনো পাশেতে,
কভু সম্মুখে, কভু পশ্চাতে আমার আঁধার কায়া।"

আবার এক যায়গায়—

"গভীর নিশীথে, একাকী যখন বসিয়া মলিন প্রাণে,
চমকি উঠিয়া দেখিবি তরাসে,
আমি ত রয়েছি বসি তোর পাশে,
চেয়ে তোর মুখপানে।"

অফুরন্ত ছন্দে ভালবেসে যায় রাহু। ভালবাসায় তার হৃদয় পরিপূর্ণ—দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে শুধুই ভালবেসে যায়। নিজের সব ক্ষতি স্বীকার করেও তার এই ভালবাসা—তার প্রেম অজয়, অক্ষয়।

এমনি করে অগণিত চিন্তা তিনি করে গেছেন, কিন্তু আপনার জীবন-দেবতার কথা কোনদিন তাঁর ভুল হয়নি। তাই অধ্যাত্মলিপ্সু কবি লিখ্‌ছেন—"চিরন্তন বিরাট মানবকে আমি ধ্যানের দ্বারা আমার মধ্যে গ্রহণ করবার চেষ্টা করি।····· তার মধ্যে অনুভব করতে চাই আমার মধ্যে সত্য যা—জ্ঞানে, প্রেমে, কর্ম্মে তার উৎস তিনি। সেই জ্ঞানে, প্রেমে, কর্ম্মে আমি আমার ছোট আমিকে ছাড়িয়ে যাই, সেই যিনি বড় আমি, মহান আত্মা, তাঁর স্পর্শ পেয়ে ধন্য হই, অমৃতকে উপলব্ধি করি।"

রবীন্দ্রনাথ অধ্যাত্মকবি, তিনি আদর্শ দার্শনিক। তাই তিনি 'চিরন্তন বিরাট মানব' বা পরমাত্মাকে ধ্যানের দ্বারা গ্রহণ করবার চেষ্টা করেন—তিনি তাঁকে তাঁর সকল কর্ম্মের মূলাধার মনে করেন।

অবশেষে কবি বিশ্বনিয়ন্তাকে সকল দেহে ধরে ফেল্‌লেন—অমৃতপিপাসু কবির সকল আশা সার্থক হলো—

"বিশ্বরূপের খেলাঘরে কতই গেলেম খেলে,
অপরূপকে দেখে গেলেম দুটী নয়ন মেলে;
পরশ যাঁকে যায় না করা, সকল দেহে
দিলেন ধরা।"

মেথর

শ্রীউপেন্দ্র রাহা

কে বলে তোমায় বন্ধু, অস্পৃশ্য অশুচি,
শুচিতায় সর্বোত্তম তুমি মহাজন,
ঘৃণারে করেছ জয়, ধন্য তব রুচি,
লোকহিতে পুণ্যব্রত করেছ গ্রহণ।

পুতিগন্ধে নাহি কর নাসিকা কুঞ্চিত,
চন্দনে পুরীষে জ্ঞান তোমার সমান,
তথাপি হয়েছ তুমি বর্জিত বঞ্চিত,
সমাজের ত্রিসীমায় নাহি তব স্থান।

তুমি না থাকিলে হত নরক-নিলয়
বাসের অযোগ্য এই রম্য জনস্থান,
বিগলিত শব বিষ্ঠা-আবর্জনাময়,
বিষবাষ্প সমাকুল বিকট শ্মশান!

সুন্দর নির্মল তুমি করেছ ধরণী
মহান্ সেবার ধর্মে, হে আত্মবিস্মৃত,
আপনাতে পরিতৃপ্ত রয়েছ আপনি,
কত যে সাধিছ তুমি জগতের হিত।

নাহি তব জ্ঞান, তাই নাহি অভিমান,
সকলেরে শুচি করে হয়েছ অশুচি,
তুমিই মানুষ সত্য, ওহে মহাপ্রাণ,
ঘৃণা-অভিমান জয়ী, অবিকৃতরুচি।

সমাজ তোমায় প্রাপ্যে করেছে বঞ্চিত,
সহিছ কতই অপমান অত্যাচার,
নহ হীন, নহ ঘৃণ্য, তুমি যে বন্দিত,
মহত্তম, হে মেথর, করি নমস্কার।

রামকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা

ভগিনী নিবেদিতা

অনুবাদিকা শ্রীমতী বেলারাণী দে, এম-এ

যেদিন বৃটিশ সাম্রাজ্য ভারতকে আধুনিক জগতের একটি দেশ বলিয়া ঘোষণা করিল সেদিনই মাত্র যে সকল পরিবর্ত্তন হিন্দু শিক্ষাধারাকে একটি পাশ্চাত্য সমস্যা করিয়া তুলিয়াছে সেগুলি পূর্ণতা লাভ করিল।

সুদূর প্রাচীন যুগ হইতে তখনও পর্য্যন্ত এই উপদ্বীপটির ভৌগোলিক স্বাতন্ত্র্যের জন্য বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া এখানে একটি বিশিষ্ট সম্পূর্ণাঙ্গ সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে এবং সামাজিক সৌধের উপযোগী করিয়া ব্যক্তিগত শিক্ষার আবশ্যকতা উপলব্ধি করা হইয়াছে।

পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতার ভিতর দিয়া সকল শ্রেণীর কার্য্যক্ষেত্রের অবকাশ ছিল। স্বাচ্ছন্দ্যের পরিমিত মান সকলের আয়ত্তাধীন ছিল, এবং ইহার সংজ্ঞা সাধারণের গ্রহণযোগ্য ছিল। যে শিক্ষা প্রত্যেক নরনারীকে তাহাদের জীবনী শক্তিকে নিজেদের ও সমাজদেহের মধ্যে পরিমিতভাবে বিতরণ করিতে সমর্থ করিত তাহা কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

আজ এই সকলের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সনদ এই সর্ত্তে নবকলেবর প্রাপ্ত হইল যে ইহাকে ব্যবসা বা পণ্য উৎপন্ন করা হইতে বিরত হইতে হইবে অর্থাৎ স্বদেশের বিরুদ্ধে দেশের শিল্প এবং রপ্তানির পৃষ্ঠপোষকতা ও উন্নতিসাধন করিতে পারিবে না, তখন হইতে ভারত বিশ্ববাণিজ্যের পূর্ণ স্রোতের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কোন প্রাচীন গুপ্তধন যেরূপ বায়ুর সংস্পর্শ সহ্য করিতে পারে না, সেইরূপ ভারতের নিজস্ব শিল্পকলা এবং ঐশ্বর্য্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া ধূলায় পরিণত হইয়াছে ও সেই স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। তাহার রহস্যময় সৌন্দর্য্যমণ্ডিত সূতীবস্ত্র এখনও পর্য্যন্ত ভেনিস ও জেনোয়া শহরে কিনিতে পাওয়া যায় কিন্তু এখন সেগুলি 'অত্যন্ত পুরাতন' হইয়া পড়িয়াছে। একজন মাত্র বৈদেশিক সাহ জেহানের এই সামান্য দেশীয় প্রস্তরের উপর কারুকার্য্য ও প্রস্তর কর্ত্তন শিল্প সম্বন্ধে কি করা যাইতে পারে সেই সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া দেখিবার মত প্রতিভা এবং তাহা লইয়া কাজ করিবার মত উদারতা ছিল, কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহার উত্তরাধিকারী নাই। অ্যানিলাইন রংগুলি সেই ভাবেই প্রাচ্যের উজ্জ্বল বর্ণবৈচিত্র্যের স্থান অধিকার করিয়াছে যেভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপের ক্ষণস্থায়ী সাহিত্য সংস্কৃত, হিন্দী এবং দ্রাবিড়ী ভাষায় জাতীয় সম্পদকে স্থানচ্যুত করিতে যাইতেছে—এইগুলির পরিণাম একই হইয়াছে। পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য, এমন কি বাঞ্ছনীয়, কিন্তু পরিবর্ত্তনের অর্থ ধ্বংস নয়। ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে ভারতবর্ষ এখনও বর্ত্তমান বিশ্বব্যাপী পরিবর্ত্তনের প্রথম আঘাতের মধ্যে রহিয়াছে, তাহার সমস্যা সমাধানের উপায় উদ্ভাবন করা দূরে থাকুক নূতন সমস্যার উপাদানগুলি সে এখনও পর্য্যন্ত হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। ইহাও সুস্পষ্ট যে জাতীয় জীবনে এই বর্ত্তমান বিরতিকে যদি ধ্বংস হইতে

বাঁচাইয়া অভ্যুদয় ও উন্নতির ভূমিকা স্বরূপ করিতে হয় তাহা হইলে এমন শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্ত্তন করিতে হইবে যাহা এদেশবাসীকে তাহার অর্জ্জিত সব কিছু রক্ষা করিতে এবং সেই সঙ্গে তাহাদের নূতন যুগের চাহিদা মিটাইয়া চলিতে উপযোগী করিয়া তুলিবে।

যখন তাঁতের উপর দিয়া মাকু যাতায়াত করে তখন তাঁতীর মস্তিষ্ক নিশ্চেষ্ট থাকে না। সমাজের প্রত্যেক অংশের সহযোগিতা ব্যতীত তাহাকে এই কার্য্যে নিয়োজিত করা যাইতে পারে না। সুতরাং যেখানে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শিল্পরাজি বর্ত্তমান রহিয়াছে সেখানেই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দর্শন ও বিশ্বতত্ত্বের ধারা, জাতীয় মহাকাব্য, গূঢ় বা দুর্ব্বোধ্য বিষয়ের আলোচনানিরত সংঘসমূহ এবং উন্নত ব্যক্তিত্বের অন্যান্য নিদর্শন থাকিবেই। ভারতের পক্ষেও প্রধানতঃ তাহাই ঘটিয়াছে। এখানে গণিতশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র এবং অন্যান্য বিজ্ঞানের দান প্রাচীন কালে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান ছিল এবং সম্ভবতঃ পুনরায় সেইরূপ হইবে। অতএব যে কোন শিক্ষা যাহা কার্য্যকরী ভাবে ভারতকে তাহার নিজস্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার উপযোগিকরণের প্রয়োজনের দাবী মিটাইবে তাহা অপরাপর ফলের মধ্যে অন্ততঃ উচ্চবর্ণের মধ্যে বর্দ্ধিত জাতীয় আত্মচেতনা, যৌবনোচিত দায়িত্ববোধ ও তেজের ভাব এবং জগতের অপর জাতি সকলের প্রতি বন্ধুত্ব ও শুভেচ্ছার দৃষ্টিভঙ্গী উৎপাদন করিবে। প্রাচ্যভাবে উদ্বুদ্ধ একজন প্রাচ্যদেশীয়কে গড়িয়া তোলার মধ্যে প্রতীচ্যের মানবতা, দেশ ও সমগ্র জাতির সম্বন্ধে ধারণা, উদ্যোগিতা ও সংগঠনের শক্তি, পাশ্চাত্যের উদ্যম ও ব্যবহারিকতামিশ্রণের আদর্শের দ্বারাই আমাদের প্রাচ্যের কৃষ্টি-প্রচেষ্টাকে অনুপ্রাণিত করা উচিত। ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে যে এই "জাতীয় কীর্ত্তিকলাপ রক্ষার" অর্থ কোনক্রমে প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসু অথবা বিদ্যাভিমানীর মার্জ্জিত স্বার্থপরতার সহিত সব কিছুর প্রাচীন সৌন্দর্য্য রক্ষা করিবার মনোভাব নহে।

এই সকল উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ এবং অন্য সকলে যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছেন সেই উপায়গুলি যেখানে প্রকৃতপক্ষে ভ্রমে চালিত হয় নাই সেখানে সেগুলিকে কেবলমাত্র প্রাথমিক প্রচেষ্টা বলা যাইতে পারে। কিন্তু সবগুলিকেই দেশবাসী সাগ্রহে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়াছে। শিক্ষাব্রতী মিশনারীর নিকট ঋণ ভারতীয়েরা কখনও বিস্মৃত হইবে না। হিমালয় হইতে কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত এই দলের প্রধান প্রধান সভ্যদিগকে প্রটেষ্টাণ্ট অথবা রোমান ক্যাথলিক যাহাই হউন না কেন—সহৃদয়তা ও কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করা হয়। আজ পর্য্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি হিন্দু ছাত্র স্বদেশী প্রথা অনুসারে তীর্থ দর্শনের মত ডেভিড হেয়ারের সমাধি দর্শনের প্রয়োজনীয়তা বোধ করে। স্কটলণ্ড বাসী এই মনীষী শত বৎসর পূর্ব্বে যে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা ক্রমশঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। তিনি ওলাউঠা-আক্রান্ত এক ছাত্রের সেবা করিতে গিয়া ঐ রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যু বরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মবিষয়ে এই যুক্তিবাদী মনোভাবের জন্য খৃষ্টানদিগের সমাধিস্থলে তাঁহাকে সমাধিস্থ করিতে দেওয়া হইল না, অবশেষে তাঁহার নিজের ছাত্রগণ তাঁহাকে মস্তকে বহন করিয়া লইয়া গেল এবং বর্ত্তমান কলেজ স্কোয়ারের মধ্যে একস্থানে তাঁহাকে সমাধিস্থ করিল। সেই ক্ষুদ্র বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানের প্রতিটি কার্য্যে যিনি হিন্দুর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন কেবল তাঁহার নিকটই অর্থপূর্ণ। যতই ক্লেশ ও ক্ষতি হউক না কেন অতিথিকে তাঁহার নিজের প্রথা অনুসারে আপ্যায়িত করাই ভারতীয় রীতি।

দাহ না করিয়া সমাধিস্থ করা হিন্দুর পক্ষে একান্ত রুচিবিরুদ্ধ হইলেও ডেভিড হেয়ারের ভাগ্যে তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই—এই ঘটনার মধ্য দিয়াই এই সূক্ষ্ম সম্মান প্রদর্শন উজ্জ্বল হইয়া আছে। ইহা ব্যতীত মৃতের সহিত বাস্তব সংস্পর্শের ব্যাপারটিও নিম্নস্তরের ভাড়াটিয়াদের হস্তে ন্যস্ত হয় নাই, অনেকখানি ব্যক্তিগত দায়িত্বে উচ্চ বর্ণের যুবকগণ নিজেরা উহা বহন করিয়াছিলেন। কোন স্নেহপ্রসূত কার্য্যের বিশ্লেষণ মানবোচিত নহে কিন্তু এই বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপের প্রকৃত মর্য্যাদা বুঝিবার জন্য উহার পশ্চাতে কি চিন্তাধারা রহিয়াছে তাহা জানা আমাদের প্রয়োজন। অধিকন্তু সমাধিস্তম্ভ এবং স্মরণচিহ্নের উপর শ্রদ্ধা অতিমাত্রায় মুসলমানী প্রথা হওয়ায় বর্ত্তমান কালে ডেভিড হেয়ারের স্মৃতিমন্দির দর্শনের অভ্যাস, যাহা এই পার্থিব শিক্ষার দেবদূত কর্তৃক নাগরিক মনের উপর গভীর রেখাপাতেরই পরিচায়ক, তাহা মোটেই উপেক্ষণীয় নহে।

জাতীয় শিক্ষাধারার অনুকূলে নবশিক্ষাপদ্ধতি প্রাচ্য বা প্রতীচ্যের গ্রন্থাদির দ্বারা প্রভাবান্বিত হইবার সমস্যা রাজনীতিজ্ঞদের সমাধানের বহুপূর্ব্বে ডেভিড হেয়ারের এবং বহু প্রখ্যাত শিক্ষকমণ্ডলীর হইয়াছিল। অবশেষে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে স্যার চার্লস উডের পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া লর্ড ড্যালহাউসি ইহার সমাধান করিলেন। ইহার দ্বারা বর্ত্তমান দেশীয় বিদ্যালয়গুলিকে স্বীকার করিয়া লওয়া হইল, সেগুলি পরিদর্শন করা হইল এবং তাহাদের সাহায্যদানের ব্যবস্থা করা হইল। অপর পক্ষে প্রথমতঃ মাতৃভাষার সহিত ও দ্বিতীয়তঃ ইংরাজীর সহিত পরিচয় শিক্ষার বিশিষ্ট উদ্দেশ্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। সেই সময় ইহাই সমস্যার আশ্চর্য্যজনক সমাধান বলিয়া অনুভূত হইল। কিন্তু ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের পর হইতে আমাদের সকলেরই মনে হইয়াছে যে শিক্ষা কেবলমাত্র শব্দসমষ্টি বা তথ্যসংগ্রহের ব্যাপার নহে; ইহার ফলাফলের বাস্তব অভিজ্ঞতা, যে ভাবে শিক্ষাবিধান চলিতেছে তাহার প্রতি অধিকাংশ ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীকেই অপ্রীত করিয়াছে।

তথাপি কোন দিকে পরিবর্ত্তন করিতে হইবে তাহা সুস্পষ্ট নহে। বঙ্গদেশে শিক্ষাদানের ব্যয় বৎসরে জনপ্রতি কোনমতে উনত্রিশ সেণ্ট অথবা এক শিলিং আড়াই পেন্স। স্পষ্টতই এখানে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার অথবা শিল্পবিদ্যালয়ের জন্য অর্থব্যয়ের কোন অবকাশ নাই।

অপর পক্ষে ত্রিশ কোটির মত অত বৃহৎ জনসংখ্যার জন্য যে পথ একবার গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা হইতে আর কখনই ফিরিয়া আসা যায় না, যদিও ইহাকে অন্যদিকে পরিবর্ত্তিত করা যাইতে পারে এবং ফলাফলের, গুণাগুণের দিক দিয়া যতই অপ্রত্যাশিত হউক না কেন ইহাকে মানিয়া লইতে হইবে। স্যার উইলিয়ম হাণ্টার দর্শিত অর্দ্ধ পেনি মূল্যের পোষ্টকার্ড, সুলভ রেলভ্রমণ এবং ইংরাজী শিক্ষার মধ্য দিয়া ভারতের একত্রীকরণের প্রচেষ্টা ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অচিন্তনীয় ছিল। ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে কেবলমাত্র পুস্তকলব্ধ সুলভ এবং নিস্তেজ ইউরোপীয় ভাবাপন্নতা দ্বারা আনীত এইরূপ একত্রীকরণ স্বভাবতঃই শাসক ও শাসিত এই উভয় সম্প্রদায়েরই সর্ব্বোচ্চ স্বার্থের পক্ষে প্রতিকূল হইবে।

এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু বলা হইয়াছে তাহা সমভাবে বালক ও বালিকাদের পক্ষে প্রযোজ্য। যাহা হউক আমরা যখন পরবর্ত্তীদের কথা পৃথক সমস্যা হিসাবে আলোচনা করিতে যাই তখন আমাদের নূতন নূতন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে।

প্রাচ্য দেশীয় পুরুষদের অপেক্ষা স্ত্রীলোকগণ প্রাচীন সামাজিক রীতি নীতি ও শিক্ষাপদ্ধতির বিষয়ে অধিকতর রক্ষণশীল। অপরাপর দেশের প্রাচীন-

কালের মহিলাগণের ন্যায় বাল্যেই তাহাদের বিবাহ করিতে হয়। আজকাল কতকগুলি অর্থনৈতিক কারণ এই পবিত্র বিবাহবন্ধনের বয়স দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত পিছাইয়া দিয়াছে। এই উৎসব এবং চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে শ্বশ্রূগৃহে প্রবেশ—এই কালটুকু যেন বালিকাবধূর পক্ষে তাহার নূতন ও পুরাতন গৃহে গমনাগমনের জন্য বিভক্ত বলিয়া মনে হয়।

এই সময়ের মধ্যে যদি স্বামীর মৃত্যু হয় তাহা হইলে বালিকা তাহার স্বামীর সহিত বাস করিলে যেমন হইত অনুরূপ ভাবেই সে বিধবা বলিয়া গণ্য হয় এবং সামাজিক সম্মানবশতঃ তাহার পুনর্বিবাহ অসম্ভব হইয়া উঠে। এই জাতীয় ঘটনা "বাল-বিধবা" বলিয়া একটি শ্রেণীর সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার পর হইতে তাহাদের সন্ন্যাসিনীর জীবন যাপন করিতে হয়। তাহাদের নিকট হইতে বিশেষ প্রকার ভক্তি ও কঠোরতার উচ্চ আদর্শ প্রত্যাশা করা হয়। ইহার পরিবর্ত্তে তাহারা সকলের নিকট সম্মান ও সমাদর পাইয়া থাকে—ভ্রমবশতঃ যেরূপ মনে করা হয় যে তাহারা ঘৃণা ও অবজ্ঞা পাইয়া থাকে, তাহা নহে।

যদি নির্ব্বিঘ্নে সব চলিতে থাকে তাহা হইলে দ্বাদশ বৎসর বয়স্কা বধূ চতুর্দ্দশ বৎসরে পত্নীত্বে উপনীত হয় এবং পতির জননীর গৃহে দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যপ্রাপ্ত হয়। এই সময় পর্য্যন্ত সে অতি-মাত্রায় স্নেহের ও আদরের সন্তান থাকে। হিন্দু পরিবারে বালিকারা এত শীঘ্র গৃহ ত্যাগ করিয়া যায় বলিয়া তাহাদের প্রতি অত্যধিক স্নেহ বিদ্যালয়ে বিশেষ অসুবিধার কারণ হইয়া থাকে। এই সময়ে সঠিক ভাবে তাহার শিক্ষা আরম্ভ হয়, হিন্দুরমণীর সহিষ্ণুতার বিস্ময়কর মহত্ত্ব এবং দেবীত্ব সতর্ক শ্বশ্রূর শিক্ষার প্রকৃত নিদর্শন।

প্রাচীন ফিউডাল (বিলাতী জমিদারী প্রথা) যুগের মহিলাদের অন্তঃপুরকে গভীর সরলতা ও দারিদ্র্যমণ্ডিত করিলে যেরূপ দেখা যাইবে আধুনিক যুগের হিন্দু পরিবারের অন্তঃপুরকে সেরূপ মনে হয়। বস্তুতঃ নানাবিধ কারুকার্য্য ও শিল্পকার্য্য লইয়াই আমাদের কুমারীগণ নিযুক্ত থাকে না, বরং গৃহাদি পরিষ্কৃত করা, রন্ধন, গাভীদোহন, শিশুপালন ইত্যাদি সাংসারিক কার্য্যও তাহারা করে; পরিবারের মধ্যে তাহাদের ভ্রাতা ও জ্ঞাতিভ্রাতাদিগের স্ত্রীরূপ সমবয়স্কা-বালিকারাও অনেক সময়েই অবস্থান করে। সংসারে প্রধান কর্ত্তার মাতা অথবা সহধর্ম্মিণীরূপে অধিষ্ঠিতা প্রধানা গৃহিণীর প্রতি তাহারা যেরূপ সম্মান প্রদর্শন করে পরিবারের অন্যান্য প্রাচীনাদিগকেও তাহারা সেইরূপ শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। অন্তঃপুরের মধ্যে ভারতীয় মহাকাব্য ও পৌরাণিক কাহিনী অপেক্ষা প্রকৃতপক্ষে অন্য কোন পুরাতন কাব্য অথবা উপকথা প্রাচীন শৌর্য্যের যুগের সুন্দরীদিগের দ্বারা অধিকতর আগ্রহের সহিত অধীত হয় নাই। এমন কি ভ্রাম্যমাণ গায়কসংঘ যাহারা দুর্গপ্রকোষ্ঠে গান গাহিয়া অভিনয় করিত তাহাদের অনুরূপ এখনও আছে। অনেক সময়ে বসন্তের সন্ধ্যায় রামায়ণ-গানের আয়োজন হয়: প্রাঙ্গণের অলিন্দে, পর্দ্দার অন্তরালে, যেখান হইতে অপর কর্ত্তৃক দৃষ্ট না হইয়াও দেখা যায়, সেখানে বসিয়া মহিলাগণ সীতারামের চিরপুরাতন ও চিরনূতন বনবাসের কাহিনী শুনিয়া থাকেন।

এই জাতীয় নির্দ্দোষ আমোদপ্রমোদ কমিয়া যাইতেছে। কারণ যে সকল ভাল ভাল উপায় উহাদের সংগ্রহ করিবার জন্য প্রয়োজন, সেগুলি প্রতি বৎসরই কমিয়া যাইতেছে। উচ্চবর্ণের ভারতীয়েরা ইংরাজদিগের সুলভ কেরাণীর জাতিতে পরিণত হইতেছেন এবং তাঁহারা ক্রমশঃ তাঁহাদের বহুসংখ্যক আশ্রিতদের প্রতিপালন করিতে অক্ষম হইতেছেন। ইহার যদি পরিবর্ত্তন করিতে হয় তাহা হইলে তাঁহাদের উদ্যমের ও সংঘবদ্ধ হইবার

শক্তিমূলক কার্য্যধারার উদ্ভব করিতে হইবে। এইরূপ পুনর্গঠনের যুগে সামাজিক প্রেরণার উৎসরূপে নারীসমাজের সহানুভূতি ও সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজনীয়।

ইহা স্পষ্ট যে নারীদের বর্ত্তমান শিক্ষা বিকাশের অপেক্ষা অনেকাংশে নিয়মানুবর্ত্তিতার ব্যাপার। তথাপি ইহা মহীয়সী নারীর আবির্ভাব সম্পূর্ণভাবে নিবারণ করে নাই। এইরূপ অনেকের মধ্যে ঝান্সীর বিধবা রাণীর কথা চিন্তা করিয়া দেখুন। তিনি সিপাহীবিদ্রোহের দিনে অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিয়া তাঁহার আদেশ ঘোষণা করিলেন, নূতন মুদ্রা প্রচলিত করিলেন, কামান চালনা করিলেন এবং সর্ব্বশেষে নিজ সৈন্যবাহিনীর পুরোভাগে থাকিয়া যুদ্ধ করিতে করিতে মৃত্যু বরণ করিলেন।

যাহা হউক এই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জাতীয় উদাহরণ কোন শিক্ষাপদ্ধতির সঠিকতা অপেক্ষা একটি জাতির পৌরুষেরই পরিচায়ক। ইহা অস্বীকার করা যায় না যে যদি আমরা ভারতীয় নারীর জীবনে ব্যক্তিত্ব বিকাশের অধিকতর অবকাশ, অধিকতর সামাজিক সম্ভাবনীয়তা এবং বর্ত্তমান ব্যবস্থার মুখ্য বা গৌণভাবে প্রতিকূল সমালোচনা না করিয়া অর্থনৈতিক দুঃখমোচনের কিছু ক্ষমতা আনিয়া দিতে পারিতাম তাহা হইলে অবশ্য কিছু প্রয়োজনীয় কার্য্যই সাধিত হইত।

এখন খৃষ্টান মিশনারী এবং অপর সকলকে ধন্যবাদ দিতে হয় যে তাঁহাদের জন্যই কয়েকজন প্রাইমারী স্কুলের "থ্রি আর" পদ্ধতি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী এই দুই জাতীয় শিক্ষা লাভ করিয়া থাকেন। রক্ষণশীল ব্যক্তিগণ নিজেদের কন্যাদের বিবাহের পর তাহাদের বর্হির্জীবন হইতে পৃথক করিয়া রাখেন। অতএব তাহাদের বিদ্যালয়ের বিদ্যা আহরণ দশম বা দ্বাদশ বৎসর বয়সেই শেষ হইয়া যায়। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মসমাজভুক্ত এবং পার্শী মহিলারাই সাধারণতঃ ডিগ্রীগুলি লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু এইগুলি এবং এই জাতীয় সমস্ত উদাহরণ বিবেচনা করিয়া দেখা যায় যে লোকসংখ্যার অনুপাতে তথাকথিত শিক্ষিতা বাঙ্গালী বালিকার সংখ্যা শতকরা সাড়ে ছয়জন মাত্র এবং এই বিষয়ে বঙ্গদেশকেই সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রগামী বলা হইয়া থাকে।

সুতরাং এই বিষয়ে আলোচনার একটা বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। ইহার উত্তরের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা অনেকখানি একমত। এখন প্রশ্ন এই যে কোথায় এবং কি ভাবে ভারতীয় নারীর বাস্তব জীবনের প্রকৃত প্রয়োজন অনুযায়ী বিকাশমূলক শিক্ষার উদ্বোধন করা যায়।

এই জাতীয় সমস্যাগুলি বিশেষভাবে অনুধাবন ও বিবেচনা করিয়া রামকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা করা হইয়াছে।

যদি অর্থসংগ্রহ ব্যাপারে আমরা সাফল্যলাভ করি তাহা হইলে কলিকাতার নিকটে গঙ্গার তীরে একটি বাটী ও একখণ্ড জমি কিনিয়া সেখানে কুড়িজন বিধবা ও কুড়িজন অনাথা বালিকাকে লইয়া কাজ আরম্ভ করিবার আমাদের ইচ্ছা আছে। এই সমগ্র পরিবারটি সারদাদেবীর কর্ত্তৃত্ব ও পরিচালনার অধীন থাকিবে, যাঁহাকে সম্প্রতি অধ্যাপক মোক্ষমুলার তাঁহার "রামকৃষ্ণের জীবনী ও উপদেশাবলী" নামক পুস্তকে বিশ্বের সম্মুখে প্রকাশিত করিয়াছেন। অধিকন্তু ইহাতে প্রস্তাব করা হইয়াছে যে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আর একটি বিদ্যাভবন থাকিবে, সেখানে সর্ব্বোত্তম শিল্প শিক্ষা দেওয়া হইবে।

বিদ্যালয়ের পাঠ্যপ্রণালীর ভিত্তি হইবে শিশুদিগের বস্তু উপলক্ষে শিক্ষাদানের বিশেষ পদ্ধতি (কিণ্ডার গার্টেন) এবং ইংরাজী ও বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সেই পাঠ্যের অন্তর্ভুক্ত হইবে। প্রাথমিক গণিত এবং কিছু প্রাথমিক বিজ্ঞান খুব

ভালভাবে শিক্ষা দেওয়া হইবে। পুরাতন ভারতীয় শিল্পের পুনরুত্থানের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া শিল্পশিক্ষা দিতে হইবে। শেষোক্ত বিষয়ের উপস্থিত সার্থকতা হইতেছে যে ইহা প্রত্যেক ছাত্রীকে তাহার গৃহ পরিত্যাগ না করিয়া মর্য্যাদাসম্পন্ন ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতে সমর্থ করিবে।

কিন্তু বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় কার্য্যও থাকিবে। আমরা মনে করিতে পারি যে অষ্টাদশ হইতে বিংশ বৎসর বয়স্কা বিধবাগণ যে কেবলমাত্র সত্যকার হিন্দু ভাবধারার ভিত্তি ও গার্হস্থ্য জীবন যাপন করিবার উপযোগী হইবেন তাহা নহে, তাঁহাদের দ্বারা আমাদের এমন দুই তিনটি শিল্প ব্যবসায় সংগঠন করাইবার ইচ্ছা আছে যাহা দ্বারা বিলাত, আমেরিকা ও ভারতের বাজারে উৎপন্নের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদার সৃষ্টি করা যাইতে পারে। দেশীয় আচার, কাসুন্দী ও চাটনি ইহাদের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে।

ধরা যাক্ যে, সকল দিক দিয়া আমাদের প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে, সর্ব্বোপরি ইহা কোন প্রকারে জাতীয়তাবিরোধী নহে বলিয়া হিন্দু-সমাজের অনুমোদিত। সম্ভবতঃ অল্পদিন পরে আমাদের প্রত্যেক বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিব যে সে বিবাহিত জীবন মনোনয়ন করিতে চায় অথবা জাতীয় কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিতে চায়। যাহারা প্রথমটি মনোনীত করিবে তাহাদের জন্য আমরা পূর্ণভাবে আস্থাজনক উপায়ের ব্যবস্থা করিতে পারিব। যাহারা তাহাদের স্বদেশ ও নারী-সমাজের হিতকল্পে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করিতে চায়, আমরা আশা করি, তাহাদের জন্য অধিকতর বিস্তৃত ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে বয়োজ্যেষ্ঠা মহিলাদিগের কর্ত্তৃত্ব ও রক্ষণাবেক্ষণে অন্যান্য কেন্দ্রে নূতন নূতন রামকৃষ্ণ বিদ্যালয় স্থাপন করিতে পারা যাইবে।

পরিশেষে আমি বলিতে যাই যে আমার বিশ্বাস যে আমি নিকটবর্ত্তী কর্ত্তব্য হইতে দূরবর্ত্তী কর্ত্তব্যের দিকে কোন উদ্যম অথবা প্রতিভা বিক্ষিপ্ত করিতে যাইতেছি না। এই আন্তর্জাতিক ব্যবসা ও আয় ব্যয়ের দিনে আমরা নিশ্চিতভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতেছি যে কেবলমাত্র বিশ্বসেবাই হইতেছে প্রকৃত গৃহসেবা। ওয়াল্ট হুইটম্যান যে মহৎ প্রশ্ন করিয়াছিলেন—সকল জাতি কি সম্মিলিত হইতেছে ? সমগ্র বিশ্বের একাত্মবোধ কি জাগ্রত হইতেছে ?—আমরা ইতিপূর্ব্বেই ইহার সম্মতিসূচক উত্তর দিয়াছি বলিয়াই মনে হইতেছে।*

* ভগিনী নিবেদিতা প্রণীত ' Hints on National Education in India" শীর্ষক পুস্তক হইতে অনূদিত।

অভিলাষ

ডাঃ শচীন সেনগুপ্ত

ভুবন ভোলানো
পরাণ মাতানো
রূপের তুলনা কেমনে করি,

(যাঁর) কণাটুকু পেলে
প্রেমে যাই গলে
বিশ্বজগৎ অনুরূপ হেরি।

যাঁহার পরশে
ভাবের আবেশে
ভুলে যাই সব তাঁহাতে মাতি।

তাঁহাকে কেমনে
লইব পরাণে
করিয়া আপনা মরমসাথী ?

সাধ হয় মনে
ও রাঙ্গা চরণে
নানা ফুল দিয়ে সাজাই বসি।

ভয় হয় তায়
যদি ব্যথা পায়
কোমল চরণে পরাণ-শশী।

(সে) দূরে যায় পাছে
ছুটে আসি কাছে
কাছে গিয়ে তবু থাকিতে নারি।

চলে গেলে দূরে
প্রাণ যায় পুড়ে
জ্বালা কি হায় সে বুঝাতে পারি ?

সমালোচনা

(১) Sadhana, (২) Mayavada— এই ইংরাজী বই দুইখানি সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ে সুপরিচিত সাধু শান্তিনাথ কর্তৃক লিখিত এবং ওরিয়েণ্টাল বুক এজেন্সি, পুনা হইতে প্রকাশিত। প্রথম পুস্তক ২৯৪ পৃষ্ঠায় এবং দ্বিতীয়টী ১৭৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। উভয় পুস্তকই বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।

'সাধনা' নামক গ্রন্থখানিতে গ্রন্থকার গুরুবাদ, অবতারবাদ, বেদের অপৌরুষেয়তা, ঈশ্বর দর্শনের অসম্ভবতা এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব কর্তৃক প্রচারিত ধর্মসমন্বয় নানা যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ধর্মসাধনার জন্য যদি গুরুকরণ অনাবশ্যক, তবে গ্রন্থকার নিজে গুরু গ্রহণ করিয়াছিলেন কেন? অবতারবাদ যদি মিথ্যা হয় তবে প্রত্যেক ধর্মে ইহার এত প্রভাব কেন? বেদ যদি অপৌরুষেয় না হয় তাহা হইলে সনাতন হিন্দুধর্ম দাঁড়াইবে কাহার উপর? সাধু শান্তিনাথের ভাগ্যে ঈশ্বরদর্শন সম্ভব হয় নাই বলিয়া যে কাহারো পক্ষে উহা সম্ভব নয়, তাহা তিনি কোন্ সাহসে বলেন? বর্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ঈশ্বর সাক্ষাৎকার করিয়া মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন যে, ঈশ্বরকে দর্শন করা যায়। অন্ধ বা তিমির রোগী দিবালোক দেখিতে পায় না বলিয়া কি চক্ষুষ্মান্ বিশ্বাস করিবে যে সূর্য নাই? যদি এই সবই মিথ্যা হয় তবে শান্তিনাথজী এত বৎসর স্বাধ্যায় ও সাধনা করিয়া কি ফল লাভ করিয়াছেন? গুরু, অবতার, বেদ ও ঈশ্বর বর্জন করিলে সাধক কি লইয়া সাধনা করিবে? অবতারের অনুভূতির উপর ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। অবতারকে অস্বীকার করিলে ধর্ম-সংস্থাপক হইবেন কে? বৌদ্ধ, বেদান্ত, জৈন, সাংখ্য প্রভৃতি দার্শনিক মত শান্তিনাথজী যে যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহাই যে অকাট্য ও অখণ্ডনীয় তাহা তিনি কিরূপে বলেন? বৈদিক ঋষি সত্যই বলিয়াছেন, "নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া।"

পুস্তকের উপসংহারে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "পরমার্থ সত্য সম্বন্ধে রামকৃষ্ণ পরমহংসের সিদ্ধান্ত সকল ধর্ম ও দার্শনিক মতের সমন্বয় সাধনে অসমর্থ। তাঁহার সর্বধর্মসমন্বয় অনুভূতি বা যুক্তিমূলক অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে।" "সমাধি বা যুক্তির দ্বারা পরমার্থ সত্য নির্ণীত হয় না। সাধকগণের স্ব স্ব বিভিন্ন ধারণা অনুযায়ী এবং ধ্যেয় বস্তুর ও সাধনার ভেদানুসারে অনুভূতির পার্থক্য হয়। তাঁহাদের অনুভূতিসমূহের মধ্যে তারতম্য করা যায় না, কারণ, তাঁহাদের ধর্মমত অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় সত্যের উপর স্থাপিত।" শান্তিনাথজীর এই মত একপ্রকার অজ্ঞেয়বাদ মাত্র। এইরূপ অজ্ঞেয়বাদ অভিনব নহে; প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে উহা নানারূপে দেখা যায়। ব্যর্থ সাধনার বিষময় ফলদ্বারা তিনি সরল বিশ্বাসীর বুদ্ধিভেদ সৃষ্টি করিতে চান কেন? সাধককে 'ইতো নষ্টস্ততো ভ্রষ্টঃ' করা সাধুর অনুচিত। শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধিজ সিদ্ধান্ত সত্য না হইলে শান্তিনাথের বিভ্রান্ত বুদ্ধির সিদ্ধান্তকে সত্য বলিয়া কে বিশ্বাস করিবে? সৎসংস্কার না থাকিলে সাধনা সফল হয় না। শান্তিনাথের সাধনা ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া সকলের সাধনা ব্যর্থ হইবে কেন?

এই গ্রন্থপাঠে সাধকের বুদ্ধিভেদ জন্মিবে এবং বিশ্বাসীর বিশ্বাস টলিবে। আমরা সাধকগণকে এই অশাস্ত্রীয় সংশয়বৃদ্ধিকর গ্রন্থপাঠ করিতে নিষেধ করি।

'মায়াবাদ' গ্রন্থখানি পাণ্ডিত্যপূর্ণ। ইহার ভূমিকায়

গ্রন্থকার স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের সন্ন্যাসী শিষ্য স্বামী তুরীয়ানন্দজীর নিকট গভীর ভাবে ঋণী এবং তাঁহার প্রেরণাপ্রদ উপদেশ তাঁহাকে সাধনায় অশেষ উৎসাহ দান করিয়াছে। এই গ্রন্থ বহু বৎসর বেদান্ত-গবেষণার ফলপ্রসূত। তিনি বাচ্ছাঝাকৃত তত্ত্বালোক, মধুসূদন সরস্বতীর অদ্বৈত-সিদ্ধি ও অদ্বৈতরত্নরক্ষণ এবং নৃসিংহাশ্রমকৃত অদ্বৈতদীপিকা প্রমুখ অদ্বৈত বেদান্তের সকল প্রসিদ্ধ গ্রন্থ বহু পরিশ্রমপূর্বক অধ্যয়ন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, অধিকন্তু তিনি বোম্বাই, মান্দ্রাজ, বরোদা, পুণা, নাসিক, ব্রোচ, শৃঙ্গেরী, মহীশূর, শ্রীরঙ্গম্, তাঞ্জোর ও কলিকাতায় অবস্থিত লাইব্রেরীতে যে সকল অপ্রকাশিত বেদান্ত গ্রন্থ রক্ষিত আছে, উহাদের ছয় শত খণ্ড পাঠ করিয়াছেন! আলোচ্য গ্রন্থে ষাটখানি অপ্রকাশিত বেদান্ত গ্রন্থ হইতে বাক্য উদ্ধার করিয়া পণ্ডিত শান্তিনাথ এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। দার্শনিক পণ্ডিতগণ এই পুস্তক পাঠে উপকৃত হইবেন।

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

বিপ্লবের পথে বাঙালী নারী—শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত। সান্ন্যাল এণ্ড কোং, ৮৫নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। ১৪০ পৃষ্ঠা, মূল্য—২৲ টাকা।

সমাজে নারীর স্থান সামান্য নয়। জাতির এই অর্ধাঙ্গ যদি সবল ও সুস্থ না থাকে তবে সমাজ-শরীর দুর্বল হইবার সম্ভাবনা। আধুনিক পরিবেশে নারীসমাজকে নানারূপ সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। সমাজব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করে এই সব সমস্যার সমাধানের উপর। আলোচ্য গ্রন্থে লেখক এই সকল সমস্যারই আলোচনা করিয়াছেন। সমাজশাস্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া লেখক বাঙ্গালী নারীর বর্তমান সমস্যাসমূহের সুচিন্তিত গবেষণা করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও বিপ্লবী চিন্তাধারার ছাপ পুস্তকের সর্বত্র বিদ্যমান। তবে এই ব্যাপক ও জটিল বিষয়ের আলোচনা সংক্ষেপেই করা হইয়াছে। আরও বিশদ আলোচনার প্রয়োজন। প্রত্যেক সংস্কারকামী ব্যক্তিই এই ক্ষুদ্র পুস্তকে চিন্তার খোরাক অনেক পাইবেন। নারী-আন্দোলন সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক কর্মীকেই আমরা এই পুস্তক পাঠ করিতে অনুরোধ করি। অধ্যাপক বিনয় সরকার মহাশয় ঠিকই বলিয়াছেন—"এত ছোট বহরে এমন শাঁসাল বই বাঙ্গালীর হাতে বেশী বাহির হয় নাই।"

ব্রহ্মচারী শাশ্বত চৈতন্য

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

লণ্ডনে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রচার-কার্য—গত কয়েক বৎসর যাবৎ রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী অব্যক্তানন্দজীর প্রচারকার্যের ফলে লণ্ডনের বিদ্বৎসমাজ ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধিৎসা প্রকাশ করিতেছেন। লণ্ডন শহরের উৎসাহী ভারতীয়গণ স্বামীজীর নেতৃত্বে বেদান্তধর্মের সার্বজনীনতা এবং কার্যকরিতা প্রচার করিবার জন্য আন্দোলন চালাইতেছেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতি, সমাজ ও ধর্মের মূলীভূত ঐক্য প্রদর্শন করাই ইহার উদ্দেশ্য। হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টান জৈন পারসিক প্রমুখ সকল ধর্মেরই অনুপম বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এই বৈশিষ্ট্যকে অব্যাহত রাখিয়া সাম্য ও মৈত্রীভাবভূয়িষ্ঠ অসাম্প্রদায়িক জনমত গঠনই এই আন্দোলনের লক্ষ্য। হিন্দি ও উর্দুর সংমিশ্রণে হিন্দুস্থানী ভাষার প্রচার, দেবনাগরী অক্ষরমালার প্রচলন, বিভিন্ন সংস্কৃতির যাহা অতুলনীয় অবদান তাহা আংশিক ভাবে সহজ সরল হিন্দুস্থানী ভাষায় অনুবাদ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ, জাতিবর্ণনির্বিশেষে সহভোজন, অসাম্প্রদায়িক আবাস (Hotel) সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জনমত সৃষ্টি, ভারতবর্ষের বিভিন্ন সমাজ ও ধর্মের গঠনমূলক অবদানের উপর জোর দিয়া ভারতবর্ষের একটি ইতিহাস প্রণয়ন ইত্যাদি দ্বারা উৎকট সাম্প্রদায়িক ভাব দূর করিবার প্রচেষ্টা এই আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য। স্বামী অব্যক্তানন্দজী এই সাংস্কৃতিক ঐক্য আন্দোলনের সভাপতি। তিনি গত ২৫শে আগষ্ট হইতে ৩১শে আগষ্ট পর্যন্ত লণ্ডনে একটি ধর্মমহাসভা আহ্বান করেন। ইহাতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বিগণ যোগদান করিয়াছিলেন। এই ধর্মমহাসভায় তিনি 'ধর্ম ও বর্তমান সমস্যা'

এবং 'ধর্ম ও বিশ্বের পুনর্গঠন' সম্বন্ধে দুইটি সুচিন্তিত বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। সমবেত জনসংঘে হিন্দু উপাসনা অনুষ্ঠিত হয়। তিনি বিভিন্ন পুস্তিকার সাহায্যে বেদান্ত ধর্ম ও ভারতীয় জীবনাদর্শ ব্যাপকভাবে প্রচার করিতেছেন।

রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, আমিনাবাদ, লক্ষ্ণৌ—১৯৪৫ সনের কার্য-বিবরণী—এই সেবাশ্রমটি গত ৩৫ বৎসর যাবৎ লোককল্যাণকর কার্যে ব্যাপৃত আছে। আশ্রম-পরিচালিত দাতব্য চিকিৎসালয়ে এ্যালোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক দুইটি বিভাগ আছে। আলোচ্য বর্ষে উভয় বিভাগে সর্বসমেত ৬৭,৮৪২ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছেন। এই বৎসর আশ্রম হইতে আসন্নপ্রসবা নারী ও শিশুগণের মধ্যে ৯ মণ ১৫ সের দুগ্ধ বিতরণ করা হইয়াছে। গত ৩০ বৎসর যাবৎ এই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক একটি নৈশবিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে। আলোচ্য বর্ষে ইহাতে ৬১ জন ছাত্র অধ্যয়ন করিয়াছে। ইহাতে প্রাপ্তবয়স্কদিগের শিক্ষাদানেরও ব্যবস্থা আছে। সেবাশ্রমে হরিজন শিশুদের জন্য দুই বৎসর যাবৎ একটি অপরাহ্ণ বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে। আলোচ্য বর্ষে ৬৬ জন শিশু এই বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছে।

সেবাশ্রম লাইব্রেরীতে মোট ৪৪৩৬ খানা পুস্তক, ১৯ খানা সাময়িক পত্রিকা এবং ইংরাজী, হিন্দি, বাঙ্গলা ও উর্দু ভাষায় ৬ খানা দৈনিক সংবাদ-পত্র আছে। রিডিং রুমের পাঠকসংখ্যার দৈনিক গড় ৪০। এই বৎসর অনাথা বিধবা ও ও অন্যান্য দুঃস্থদিগকে নিয়মিতভাবে ৮৮৲ টাকা এবং সাময়িক সাহায্য হিসাবে ১৪৮২ পাই দান করা হইয়াছে। বর্তমানে সেবাসদনের সম্প্রসারণ, নৈশ ও অপরাহ্ণ বিদ্যালয় এবং লাইব্রেরীর জন্য গৃহ নির্মাণ প্রভৃতি সেবা-শ্রমের অপরিহার্য প্রয়োজন। আলোচ্য বর্ষে সেবাশ্রমের মোট আয় ১৬,০০১৻১১ পাই এবং মোট ব্যয় ১২,৮৩৯৬৮ পাই।

বিবিধ সংবাদ

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের দেহত্যাগ—গত ১২ই নবেম্বর দেশবরেণ্য পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ৮৫ বৎসর বয়সে কাশীধামে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার নশ্বর দেহ পুষ্প-মাল্য ভূষিত করিয়া বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে মণিকর্ণিকা শ্মশানে দাহ করা হইয়াছে। হাজার হাজার নরনারী শ্মশানে উপস্থিত হইয়া এই পুণ্যশ্লোক মনীষীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিয়াছেন।

পণ্ডিত মালব্য ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর এলাহাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় ব্রজনাথ মালব্য খ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন। তৎপ্রণীত কয়েকটি সংস্কৃত গ্রন্থ বিদ্বৎ সমাজে সমাদৃত। সংস্কৃত পাঠশালাতেই পণ্ডিত মদনমোহন শিক্ষা আরম্ভ করেন। পরে আধুনিক কলেজে উচ্চ শিক্ষালাভ এবং আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আদালতে যোগ দেন।

এই সময় হইতেই পণ্ডিতজী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করিয়া সর্বপ্রযত্নে দেশের সেবা করিতে থাকেন। তিনি কয়েক বৎসর 'হিন্দুস্থান' ও 'ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত মালব্য এল-এল-বি ডিগ্রি লাভ করিয়া ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে হাইকোর্টে যোগ দেন। তিনি বহু বৎসর এলাহাবাদ মিউনিসিপাল বোর্ডের সদস্য এবং দুইবার ইহার ভাইস চেয়ারম্যান এবং তত্রত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হইয়া-ছিলেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে তিনি ব্যবস্থাপক সভার সভ্যরূপে বহু উল্লেখযোগ্য কার্য করেন। মালব্যজী স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন। দেশসেবার পুরস্কাররূপে তিনি চারিবার কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত এবং দুইবার সরকার কর্তৃক গ্রেপ্তার হন।

রাজনীতিক্ষেত্রে দীর্ঘকাল কার্য করার ফলে অধঃপতিত হিন্দুজাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতির দিকে পণ্ডিত মালব্যের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং সর্বপ্রযত্নে তিনি হিন্দুধর্ম ও সমাজের উন্নয়ন ও শিক্ষা-বিস্তারের জন্য আত্মোৎসর্গ করেন। মালব্যজী হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির যথার্থই জীবন্ত বিগ্রহ ছিলেন। ক্রমে তিনবার তিনি হিন্দুমহাসভার সভাপতি নির্বাচিত হন। পণ্ডিতজী

সনাতনী হইলেও অস্পৃশ্য জাতির উন্নয়ন এবং অহিন্দুকে হিন্দুধর্মভুক্ত করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বহু অস্পৃশ্যকে দীক্ষা দান করেন। কাশীর হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনার অক্ষয় কীর্তি। ইহা হিন্দুজাতির শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিশাল কেন্দ্ররূপে তাঁহার পুণ্যস্মৃতিকে চিরকাল জাগরূক করিয়া রাখিবে।

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে যে সকল মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া দেশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন মালব্যজী তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। তাঁহার ধর্মনিষ্ঠা, স্বদেশপ্রাণতা, ত্যাগ ও কর্মশক্তি অসাধারণ ছিল। আমরা এই দেশপূজ্য মনীষীর পুণ্যস্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিতেছি।

শ্রীমৎ স্বামী যোগবিমল মহারাজের দেহত্যাগ—কলিকাতা, কাঁকুড়গাছি শ্রীরামকৃষ্ণ-যোগোদ্যানের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ স্বামী যোগবিমল মহারাজ গত ১২ই নভেম্বর ৬৩ বৎসর বয়সে বৈদ্যনাথ ধামে (দেওঘরে) দেহত্যাগ করিয়াছেন। ১৯১৩ সালে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ যোগোদ্যানে যোগদান করিয়া ১৯১৪ সালের ১লা জানুয়ারী কল্পতরু দিবসে যোগোদ্যানের তদানীন্তন অধ্যক্ষ স্বামী যোগবিনোদ মহারাজের নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা গ্রহণ করেন। স্বামী যোগবিনোদ মহারাজের দেহত্যাগের পর স্বামী যোগবিমল মহারাজ যোগোদ্যানের অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অর্ধ-নির্মিত সমাধি-মন্দিরের কার্য সমাপ্ত করেন। তাঁহার চেষ্টায় ১৯৪৩ সনের এপ্রিল মাসে যোগোদ্যানের পরিচালন ভার বেলুড় মঠের ট্রাষ্টিগণের উপর অর্পিত হয়। তাঁহার সাধুত্ব, কর্মশক্তি ও অমায়িক ব্যবহার প্রশংসনীয় ছিল। তিনি বহু শিষ্য রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পরলোকগত আত্মা ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পাদপদ্মে চিরশান্তি লাভ করুক।

দাঙ্গা সেবাকার্যে রামকৃষ্ণ মিশনের আবেদন

জনসাধারণ অবগত আছেন যে রামকৃষ্ণ মিশন নোয়াখালী ও ত্রিপুরা জেলার রোমাঞ্চকর দাঙ্গায় সর্বস্বান্ত নরনারীগণের সেবার জন্য চাঁদপুরে সেবকগণকে প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহারা পূর্ণোদ্যমে সেবাকার্য পরিচালন করিতেছেন। চাঁদপুরে দুর্গত-গণের জন্য যে সকল সরকারী আশ্রয়স্থান নির্মিত হইয়াছে তাহার দুইটীর ভার আমাদের সেবকগণ লইয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট হইতে প্রাপ্ত খাদ্যসামগ্রীর সাহায্যে তাঁহারা প্রত্যহ প্রায় ১৫০০ জন লোককে ভোজন করাইতেছেন ও আরও প্রায় ১৫০০ জনকে প্রতিদিন চাউল, ডাল প্রভৃতি বিতরণ করিয়াছেন। ইঁহাদের প্রয়োজনীয় অন্যান্য সেবাও তাঁহারা বর্তমান অবস্থায় যতটুকু সম্ভব করিতেছেন।

গভর্ণমেণ্টের শেষোক্ত চাউল আদি দ্রব্য সরবরাহ বন্ধ হওয়ায় আমরা প্রতিদিন প্রায় ১১০০ জন দুঃস্থকে ভোজ্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া বিতরণ করিতেছি, এবং কতক লোককে অর্থসাহায্যও করিতেছি।

আমাদের কয়েকজন সেবক সরকারের আনুকূল্যে ত্রিপুরা জেলার হাইমচর, হানারচর, কড়াইতুলি প্রভৃতি অতি বিধ্বস্ত কয়েকটী গ্রামের শোচনীয় অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিতে সমর্থ হইয়াছেন। হাইমচরে অবিলম্বে একটী সেবাকেন্দ্র খোলার ব্যবস্থা করা হইতেছে। এই বিস্তৃত অঞ্চলে ২০,০০০ আন্দাজ লোকের বাস। অবস্থা প্রতিকূল না হইলে পরে নোয়াখালী জেলার রামগঞ্জে আরও একটী সেবাকেন্দ্র খোলা হইবে। খাদ্য ও অন্যান্য জিনিষপত্র সংগ্রহ করা ও যথাস্থানে পৌঁছান অতি কঠিন ব্যাপার হইয়াছে।

কার্যটী বিপুল, অথচ আমাদের তহবিলে সামান্যই অর্থ আছে। এইজন্য আমরা সহৃদয় দেশবাসীর নিকট অবিলম্বে অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। এই উদ্দেশ্যে যিনি যাহা দান করিবেন, তাহা নিম্নলিখিত ঠিকানায় সাদরে গৃহীত ও তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করা হইবে :—(১) সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা হাওড়া; (২) কার্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১নং উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ; (৩) কার্যাধ্যক্ষ, অদ্বৈত আশ্রম, ৪নং ওয়েলিংটন লেন, কলিকাতা ১৩।

(স্বাঃ) স্বামী মাধবানন্দ
সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন

উদ্বোধন

রাজযোগের মূলতত্ত্ব

সম্পাদক

মহর্ষি পতঞ্জলিকৃত যোগসূত্র যোগশাস্ত্রের প্রধান প্রামাণিক গ্রন্থ। মানুষের সকল দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি এবং শাশ্বত সুখ ও শান্তি লাভের জন্য আত্মার স্বরূপ ব্যক্ত করিবার কার্যকর উপায় শিক্ষাদান এই যোগের আদর্শ। ইহা কোন ধর্মমত বা বিশ্বাসের উপর নির্ভর না করিয়া প্রত্যক্ষানুভূতির দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত। প্রকৃত পক্ষেও প্রত্যক্ষানুভূত না হওয়া পর্যন্ত সকলের পক্ষেই 'ধর্ম' একটি অর্থহীন শব্দ মাত্র। রাজযোগ এরূপ ফলপ্রদ যে, কোন ধর্মে বিশ্বাস না থাকিলেও কেবল এই যোগের সাধনগুলি অভ্যাস করিলে মানুষ তাহার আত্মস্বরূপ ব্যক্ত করিয়া সকল বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে।

মহর্ষি পতঞ্জলি এই পরিদৃশ্যমান নাম-রূপের স্থূলজগতের কারণরূপে এক অদৃশ্য সূক্ষ্মজগতের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তিনি বলেন যে, বাহ্য-জগতের শক্তিসমূহ আন্তর্জগতের শক্তির বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এই সূক্ষ্মজগৎ বা আন্তর্জগৎকে বশীভূত করিতে পারিলে স্থূলজগৎ বা বাহ্যজগৎকে বশীভূত করা যায়। ইহার একমাত্র উপায় মনকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া উহাকে ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ। কারণ, মনই সূক্ষ্মজগৎ ও স্থূলজগৎ অনুভবের একমাত্র অবলম্বন। মনের সাহায্যেই সকল অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয় কার্য করে। মন যুক্ত না হইলে স্থূল বা সূক্ষ্ম জগতের অনুভব এবং অন্তরিন্দ্রিয় বা বহিরিন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সম্ভব হয় না। এইজন্য মহর্ষি পতঞ্জলি শারীরিক ও মানসিক কতকগুলি যৌগিক ক্রিয়া সহায়ে মনকে সম্পূর্ণ অধীন করিয়া বহির্জগৎ আন্তর্জগৎ বৌদ্ধজগৎ ও অধ্যাত্মজগতের উপর আধিপত্য স্থাপনের উপায় শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার মতে মনের উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য স্থাপনই আত্মস্বরূপ ব্যক্ত করিয়া মুক্তি লাভের একমাত্র উপায়। মনকে বশীভূত করিতে না পারিলে কর্ম ভক্তি ও জ্ঞান কোন সাধনই সম্ভব নয়। এই কারণে এই ত্রিবিধ সাধকগণের পক্ষেও মনকে বশীভূত করিবার উপায়রূপে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে যোগের কোন-না-কোন প্রণালী অবলম্বন অপরিহার্য বলিয়া এই তিনটিকেও যোগ বলা হয়।

মনের উপর প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য মহর্ষি পতঞ্জলি মনের বৃত্তিগুলিকে নিরুদ্ধ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার মতে "চিত্তের বৃত্তিসমূহের নিরোধই যোগ।"[১] চিত্ত বা মন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় মাত্রেরই সম্পর্কে আসিলে উহার যে পরিণাম হয় উহাকে চিত্তবৃত্তি বলে। মানুষের মন অসংখ্য বিষয়ের সম্পর্কে আসে বলিয়া উহার বৃত্তিও সংখ্যাতীত। মনের সকল বৃত্তি নিরুদ্ধ করিয়া মনকে বশীভূত করাই যোগের

১ যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।
পাতঞ্জল যোগসূত্র, সমাধিপাদ, ২

লক্ষ্য। মানুষের মন ক্ষিপ্ত মূঢ় বিক্ষিপ্ত একাগ্র ও নিরুদ্ধ এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত। মন কোন বিষয়ে স্থির না থাকিয়া অবিরত এক বিষয় হইতে অপর বিষয়ে দৌড়াইলে উহাকে ক্ষিপ্ত, মন কাম-ক্রোধ-লোভাদি রিপু এবং নিদ্রা-তন্দ্রা-আলস্যাদি তমোগুণ-বশীভূত থাকিলে উহাকে মূঢ়, মন ক্ষণিক স্থিরতার মধ্যেও নানাবিষয়ে ধাবিত হইলে উহাকে বিক্ষিপ্ত, মন কোন এক বাহ্য বা আভ্যন্তর বিষয় আশ্রয়ে নির্বাত নিশ্চল ও নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় স্থির ও শান্ত আকার ধারণ করিলে উহাকে একাগ্র এবং মন একেবারে বিষয় অবলম্বন শূন্য হইয়া ঐরূপ একাগ্র হইলে উহাকে নিরুদ্ধ অবস্থা বলা হয়। সাধারণ নরনারীর মন ক্ষিপ্ত বা মূঢ় অথবা বিক্ষিপ্ত। এই ত্রিবিধ অবস্থাপন্ন মনকে যৌগিক অভ্যাস দ্বারা ক্রমে একাগ্র হইতে নিরুদ্ধ অবস্থায় উপনীত করাই যোগ।

মহর্ষি পতঞ্জলির মতে মন নিরুদ্ধ হইলে "দ্রষ্টা অর্থাৎ আত্মা স্বরূপে অবস্থিত হন।"[২] মনের নিরুদ্ধ অবস্থা ব্যতীত অন্য সময়ে আত্মা মনের বৃত্তির সহিত একীভূত হইয়া সুখ-দুঃখাদি অনুভব করেন। যোগশাস্ত্রানুসারে মানুষের মনোবৃত্তিসমূহ পাঁচ প্রকার, যথা: (১) প্রমাণ। ইহা তিন প্রকার: প্রত্যক্ষ (সাক্ষাৎ অনুভব), অনুমান (প্রত্যক্ষ বস্তুদ্বারা উহার সহচর বস্তুর জ্ঞান, যেমন—গন্ধের দ্বারা পুষ্পের প্রতীতি) ও আগম (আপ্তবাক্য বা বিশ্বস্ত লোকের বাক্য)। (২) বিপর্যয় (মিথ্যাজ্ঞান, যেমন—রজ্জুতে সর্পভ্রম)। (৩) বিকল্প (বস্তু নাই কিন্তু শব্দ শুনিয়া জ্ঞান, যেমন—আকাশ-কুসুম)। (৪) নিদ্রা (বৃত্তিশূন্য ভাবে অবস্থান)। (৫) স্মৃতি (অনুভূত বিষয় যাহা সংস্কাররূপে অবস্থান করে এবং পরে জ্ঞানের আয়ত্ত হয়)। মনের এই পঞ্চবৃত্তি এবং ইহাদের অন্তর্গত রাগ-দ্বেষ-কাম-ক্রোধ-লোভাদি বৃত্তি ক্লেশদায়ক বলিয়া ক্লিষ্ট এবং শ্রদ্ধা-করুণা-ভক্তি-মৈত্রী প্রভৃতি বৃত্তি সুখের কারণ বলিয়া অক্লিষ্ট নামে অভিহিত। রাজযোগীর জানা আবশ্যক যে, ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট উভয় বৃত্তিই বন্ধনের কারণ এবং একমাত্র সর্ববৃত্তিনিরুদ্ধ মনই মুক্তির হেতু।

যোগশাস্ত্র মতে "অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা মনোবৃত্তিসমূহের নিরোধ হয়।"[৩] মনের বৃত্তিগুলিকে বশীভূত করিবার চেষ্টার নাম অভ্যাস এবং দৃষ্ট ও শ্রুত সকল বিষয়ে যাঁহার তৃষ্ণা দূর হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে 'লৌকিক ও অলৌকিক সকল বিষয়ই আমার বশীভূত, আমি উহাদের বশীভূত নই' এইরূপ বদ্ধমূল ভাব বা জ্ঞানই বৈরাগ্য। আত্মসাক্ষাৎকারে যোগী যতই অগ্রসর হন, ততই তাঁহার বৈরাগ্য দৃঢ় হইতে এবং গুণের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মিতে থাকে। তখন প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য আর তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে পারে না। গুণ বলিতে বুঝায়—সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিনটি প্রকৃতির গুণ। পাতঞ্জল দর্শন সাংখ্য দর্শনের উপর স্থাপিত। সাংখ্যমতে প্রকৃতি জড়া এবং ইহার অন্তর্গত সকল প্রপঞ্চই এই তিন গুণের সমবায়ে উৎপন্ন। মানবাত্মা ইহাদের সম্পূর্ণ বাহিরে। তিনি নিত্যমুক্ত। জড়া প্রকৃতিতে যে চৈতন্যের বিকাশ দেখা যায় উহা আত্মার প্রতিবিম্বমাত্র। মন এবং চিন্তাও প্রকৃতির অন্তর্গত। ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতিই জীবের আত্মার স্বরূপ আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। মহর্ষি পতঞ্জলি বলেন, বৈরাগ্য দ্বারা প্রকৃতির এই আবরণ অপসারিত করিয়া সমাধি লাভ করিলে আত্মা নিজ স্বরূপে প্রকাশিত হন। এই জন্য তাঁহার মতে সমাধিলাভই যোগের চরম আদর্শ।

২ তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্।
পাঃ যোঃ, সমাধিপাদ, ৩

৩ অভ্যাস-বৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ।
পাঃ যোঃ, সমাধিপাদ, ১২

মহর্ষি পতঞ্জলি সমাধি লাভের অনেক উপায় নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে "শ্রদ্ধা (ভক্তি-বিশ্বাস), বীর্য (কর্মশক্তি), স্মৃতি (ধ্যানশক্তি), সমাধি (মনের একাগ্রতা) ও প্রজ্ঞা (সত্যবস্তুর বিবেক) হইতে সমাধি হয়।"[৪] ভক্তিযোগ কর্ম-যোগ ও জ্ঞানযোগ সমাধিলাভেরই এক একটি পথ। "ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিদ্বারাও সমাধি লাভ করা যায়।"[৫] এ স্থলে উল্লেখযোগ্য যে সাংখ্যদর্শন ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না বটে কিন্তু প্রকৃতির উপর আধিপত্যস্থাপনকারী যোগভ্রষ্ট পুরুষদের অস্তিত্ব স্বীকার করে। সাংখ্য-মতাবলম্বিগণ বলেন, এই পুরুষদের মন প্রকৃতিতে লীন থাকে, কিন্তু যখন আবার উৎপন্ন হন তখন ইঁহারা প্রকৃতির প্রভু হইয়া আসেন। তাঁহাদের মতে এই পুরুষগণকে ঈশ্বর বলা যায়। যোগিগণ এই প্রকৃতিলয় যোগভ্রষ্ট পুরুষদের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন না। তাঁহারা সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করিলেও "ক্লেশ কর্ম কর্মফল বা বাসনা দ্বারা অস্পৃষ্ট এক পরম নিয়ন্তা পুরুষ-বিশেষকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন।"[৬] রাজযোগে ঈশ্বর সংসারী আত্মা ও মুক্ত আত্মা হইতে পৃথক এবং সর্বজ্ঞ ও অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ। যোগিগণ বলেন, অল্পজ্ঞ মানুষের জ্ঞান এই অনন্ত জ্ঞানের স্ফুলিঙ্গ। তাঁহাদের মতে তিনি গুরুদিগেরও গুরু—ঈশ্বর। কারণ, তিনি দেশ-কাল দ্বারা সীমাবদ্ধ নন, তাঁহার আদি নাই এবং অন্তও নাই। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "আমি অজ, আমার জ্ঞানশক্তির ক্ষয় নাই। আমি সর্বভূতের ঈশ্বর হইয়াও প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া আপন মায়ায় জন্মগ্রহণ করি।"[৭] যোগিগণ বলেন, এই ঈশ্বরের ধ্যানদ্বারাও সমাধি হয়।

মহর্ষি পতঞ্জলির মতে "প্রণব অর্থাৎ ওঙ্কার ঈশ্বরবাচক।"[৮] হিন্দুধর্মাবলম্বী মাত্রই প্রণবকে ঈশ্বরবাচক বলিয়া স্বীকার করেন। প্রণবের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ ও উহার অর্থ ধ্যান দ্বারা সমাধি হয়। এতদ্ব্যতীত মন্ত্রযোগশাস্ত্রে ঈশ্বর-বাচক বহু মন্ত্রজপ ও উহার অর্থ চিন্তাদ্বারা সমাধিলাভের উপায় বর্ণিত আছে। মন্ত্রজপ বাচিক উপাংশু ও মানস ভেদে তিন প্রকার। শ্রুতিগোচর জপকে বাচিক, যে জপে শব্দ শোনা যায় না কিন্তু ওষ্ঠ স্পন্দিত হয় উহাকে উপাংশু এবং মনে মনে জপ ও তৎসহ মন্ত্রার্থ স্মরণকে মানস জপ বলে। এই তিনটির পর্যায়ক্রমে শেষোক্ত জপ উৎকৃষ্ট। এই জপদ্বারাও সমাধি লাভ হয়।

হঠযোগিগণ বলেন যে, হঠযোগ সমাধিলাভের শ্রেষ্ঠ উপায়। তাঁহারা মনকে বশীভূত করিবার জন্য প্রথমতঃ স্থূলশরীরকে বশে আনিবার আবশ্যকতা প্রচার করেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা সর্বাগ্রে ঘটযোগ সাধন করিতে উপদেশ দেন। প্রাণ অপান নাদ বিন্দু জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলিত অবস্থায়ই ঘট। সোজা ভাষায় ঘট মানে শরীর। হঠযোগিগণ শরীরকে দীর্ঘস্থায়ী এবং রোগমুক্ত রাখিবার জন্য প্রথমতঃ শোধনযোগ,[৯]

৪ শ্রদ্ধাবীর্যস্মৃতিসমাধিপ্রজ্ঞাপূর্বক ইতরেষাম্।
পাঃ যোঃ, সমাধিপাদ, ২০

৫ ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা। পাঃ যোঃ, সমাধিপাদ, ২৩

৬ ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।
পাঃ যোঃ, সমাধিপাদ, ২৪

৭ অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥ গীতা, ৪।৬

৮ তস্য বাচকঃ প্রণবঃ। পাঃ যোঃ, সমাধিপদ, ২৭

৯ ধৌতি বস্তি নেতি লৌলিকী ত্রাটক ও কপালভাতি এই ছয়টি যোগকে শোধন বলে। ধৌতি যোগদ্বারা শরীর-মল নাশ হয়, বস্তি যোগদ্বারা জঠর সুস্থ থাকে, নেতি যোগদ্বারা শ্লেষ্মাদোষ নিবারিত হয়, লৌলিকী যোগদ্বারা দেহাগ্নি বৃদ্ধি পায়, ত্রাটক যোগদ্বারা দৃষ্টিশক্তি অক্ষয় থাকে এবং কপালভাতি যোগদ্বারা জরা ও বার্ধক্য নিবারিত হয়। যোগতত্ত্ব-বারিধি, ১০পৃঃ

শারীরিক দৃঢ়তা অর্জন ও জড়তা আলস্য প্রভৃতি দূর করিবার জন্য বত্রিশটি আসন[১০] এবং শরীর ও মনের স্থৈর্যসম্পাদন ও দেহমধ্যস্থ কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করিবার জন্য প্রধানতঃ পঁচিশটি মুদ্রা[১১] অভ্যাস করিতে উপদেশ দেন।

রাজযোগিগণ বলেন, ঐকান্তিক চেষ্টা সত্ত্বেও ধ্বংসশীল স্থূল শরীরকে চিরকাল রক্ষা করা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। কাজেই মানব-জীবনের আদর্শ সমাধিলাভের উদ্দেশ্যে মনকে বশীভূত করিবার জন্য যতটা আবশ্যক, স্থূল শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখিবার জন্য ততটা চেষ্টা করাই বাঞ্ছনীয়। এই যুক্তিমূলে তাঁহারা স্থূলশরীর অপেক্ষা মনকে বশীভূত করিবার উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ বলেন, "হঠযোগদ্বারা (কতকগুলি শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়ার সাহায্যে) এবং রাজযোগ দ্বারা (যুক্তির সহায়তায়) এই দুই প্রকারে মনকে বশীভূত করা যায়।"[১২] তাঁহার মতে "অধ্যাত্মবিদ্যা অর্জন, সাধুসঙ্গ, সম্যক প্রকারে বাসনাত্যাগ এবং প্রাণবায়ুনিরোধই মন জয় করিবার শ্রেষ্ঠ উপায়।"[১৩]

মহর্ষি পতঞ্জলি সমাধিলাভের উদ্দেশ্যে তত্ত্ব-বিচারমূলক ক্রিয়াযোগ সাধন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার মতে "তপস্যা অধ্যাত্মশাস্ত্রপাঠ ও ঈশ্বরে সমুদয় কর্মফল সমর্পণই ক্রিয়াযোগ।"[১৪] এই যোগসাধনে সাফল্য লাভ করিতে হইলে সর্বাগ্রে বিঘ্নসমূহ দূর করা আবশ্যক। রোগ জড়তা সন্দেহ উদ্যমরাহিত্য আলস্য বিষয়তৃষ্ণা মিথ্যানুভব চিত্ত-বিক্ষেপ অসংযতশ্বাস-প্রশ্বাস প্রভৃতি প্রধান বিঘ্ন। যোগশিক্ষার্থীর আহার-বিহারে সংযম, অধিক বিলাস ও কঠোরতা ত্যাগ, মানসিক প্রশান্তি, উপযুক্ত স্থানে ও কালে নিয়মিত ভাবে যোগাভ্যাস করা অবশ্য কর্তব্য। গ্রন্থ সাহায্যে বা অনভিজ্ঞ ব্যক্তির উপদেশে যোগাভ্যাস না করিয়া অভিজ্ঞ গুরুর নিকট যোগ শিক্ষা করা উচিত। এই সকল বিষয়ে সতর্ক হইয়া যোগাভ্যাস না করিলে উহা কখনও ফলপ্রদ হয় না। মহর্ষি পতঞ্জলি যোগ-সাধনের একমাত্র উদ্দেশ্য সমাধিলাভের প্রতিবন্ধক বহুবিধ বিঘ্ন এবং ঐগুলি দূর করিবার উপায় আলোচনা করিয়াছেন। এই বিঘ্নগুলি ক্লেশ নামে অভিহিত। তাঁহার মতে অসংখ্য ক্লেশের মধ্যে অবিদ্যা অস্মিতা রাগ দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পঞ্চবন্ধনই প্রধান। ইহাদের মধ্যে অবিদ্যা অপর-গুলির উদ্ভবক্ষেত্র। এই ক্লেশবন্ধন কয়টি কখনও লীন, কখনও সূক্ষ্ম, কখনও অন্য বৃত্তিদ্বারা অভিভূত এবং কখনও স্থূলভাবে প্রকাশ্যে থাকে। আপনাকে নিত্যা-নন্দ স্বরূপ আত্মা মনে না করিয়া শরীর মনে করাই অবিদ্যা। আত্মা নিরপেক্ষ দ্রষ্টা—যন্ত্রী। আত্মা হইতে

১০ সিদ্ধাসন পদ্মাসন স্বস্তিকাসন বজ্রাসন ভদ্রাসন মুক্তাসন বীরাসন গুপ্তাসন সিংহাসন মৃতাসন ধনুরাসন মৎস্যাসন গোমুখাসন মৎস্যেন্দ্রাসন সংকটাসন গোরক্ষাসন উৎকটাসন পশ্চিমোত্তানাসন যোগাসন ভুজঙ্গাসন উষ্ট্রাসন মকরাসন বৃষাসন গরুড়াসন শলভাসন মণ্ডুকাসন বৃক্ষাসন কূর্মাসন কুক্কুটাসন ময়ূরাসন উত্তানকূর্মাসন উত্তানমণ্ডুকাসন।

যোগতত্ত্ব-বারিধি, ৩৩ পৃঃ

১১ মহামুদ্রা নভোমুদ্রা মহাবেধ মহাবন্ধ মূলবন্ধ উড্ডীয়ান জলন্ধর খেচরী যোনি বিপরীতকরণী বজ্রোলী মাণ্ডবী শক্তিচালনী তড়াগী শাম্ভবী ভুজঙ্গিনী মাতঙ্গী অশ্বিনী কাকী পাশিনী পৃথিবীধারণা আম্ভসীধারণা বৈশ্বা-নরীধারণা বায়বীধারণা, আকাশীধারণা।

যোগতত্ত্ব-বারিধি, ৪৭ পৃঃ

১২ হঠতো যুক্তিতশ্চাপি দ্বিবিধো নিগ্রহো মতঃ।

যোগবাশিষ্ঠ, ৩৫

১৩ অধ্যাত্মবিদ্যাধিগমঃ সাধুসঙ্গম এব চ॥
বাসনাসম্পরিত্যাগঃ প্রাণস্পন্দনিরোধনম্॥

যোঃ বাঃ, ৩৬

১৪ তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ।

পাঃ যোঃ, সাধনপাদ, ১

পৃথক্ ইন্দ্রিয়সমূহ মনের সাহায্যে বাহ্য জগৎ দর্শন ও অনুভব করিবার যন্ত্র। আমরা সাধারণতঃ যন্ত্রীর সঙ্গে যন্ত্রগুলিকে একীভূত করিয়া বলি 'আমি সুখী, আমি দুঃখী', ইত্যাদি। এই একীভূত অনুভূতিই অস্মিতা। "সুখকর পদার্থের দিকে ধাবমান মনোবৃত্তি-প্রবাহকে রাগ বা আসক্তি"[১৫] এবং "যাহা দুঃখদায়ক তাহা ত্যাগ করিবার বৃত্তি-বিশেষকে দ্বেষ বলে।"[১৬] বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক মমতাই অভিনিবেশ। এই বন্ধন-ক্লেশগুলিকে দূর করিতে হইলে উহাদের মূল বীজ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। সংযমরূপ অগ্নি দ্বারা এই মূলবীজ দগ্ধ করিলে উহা আর সংস্কাররূপ অঙ্কুর উৎপাদন করিতে পারিবে না।

একত্বের ধ্যান দ্বারা মনকে কোন একটি বিশেষ আকারে আকারিত করিতে পারিলে চিত্তবৃত্তিগুলি নিষ্ক্রিয় হয়। তখন অবশিষ্ট থাকে সূক্ষ্মসংস্কার বা বাসনা। উহা প্রতিপ্রসব অর্থাৎ প্রতিলোম-পরিণামের দ্বারা নাশ করা আবশ্যক। প্রতিলোম-পরিণামের অর্থ—কার্যের কারণে লয়। চিত্তবৃত্তিরূপ কার্য যখন বৃত্তিশূন্য সমাধি দ্বারা উহার কারণে লীন হয়, তখন চিত্তের সহিত উহার সংস্কারগুলিও নাশ হয়। যোগিগণ বলেন, আমাদের ভাল-মন্দ প্রত্যেক চিন্তা ও প্রত্যেক কার্য মনের গভীরতম প্রদেশে গিয়া সংস্কাররূপে অতি সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে এবং যখন আমরা উহা পুনর্বার স্মরণ করিতে চেষ্টা করি, তখনই ছবির ন্যায় উহা আমাদের মনে উপস্থিত হয়। আমাদের বর্তমান জীবন ও ইহার কার্যাবলী পূর্বার্জিত সংস্কারের ফল এবং এইগুলি আবার ভবিষ্যৎ জীবন ও উহার কার্যাবলীর কারণস্বরূপ। কার্য-কারণ বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নীতি অনুসারে সৎকার্যের ফল সুখ এবং অসৎ কার্যের ফল দুঃখ। এই নীতির বাহিরে কেহ যাইতে পারে না। তবে ইহা অবশ্য স্বীকার্য যে কর্মফল বা সংস্কার মানুষই সৃষ্টি করে এবং মানুষ উহাকে নাশও করিতে পারে। আমরা বর্তমানে যে কর্মের ফল ভোগ করিতেছি, উহা আমাদিগকে ভোগ করিতেই হইবে। কারণ, যে তীরটি নিক্ষেপ করা হইয়াছে উহাকে আর ফিরাইয়া আনা নিক্ষেপকারীর পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের যে সকল কর্ম ভবিষ্যতে ফলদানোন্মুখী হইয়া আছে, উহাদিগকে আমরা চেষ্টা করিলে নাশ করিতে পারি।—যেমন বাণ নিক্ষেপকারীর পৃষ্ঠস্থিত তূণে যে তীর-গুলি থাকে ঐ গুলিকে নিক্ষেপ করা বা না করা তাহার সম্পূর্ণ করায়ত্ত। যোগিগণ বলেন, সমাধি লাভ করিতে হইলে যোগীর সমুদয় শক্তি সঞ্চিত-কর্মগুলিকে নাশ করিবার জন্য নিয়োজিত করিতেই হইবে। কারণ, সর্ববিধ কর্মবন্ধনের বাহিরে যাইতে না পারিলে নির্বিকল্প সমাধি লাভ করা সম্ভব হয় না। আমরা আত্মাকে প্রকৃতির সহিত মিশ্রিত করিয়া কর্মফলজনিত সুখ-দুঃখ ভোগ করিতেছি। যখনই আমাদের জ্ঞান হইবে যে আমাদের আত্মা নিত্যমুক্ত, সুখ-দুঃখের বন্ধন তাঁহাতে কোন কালেই নাই, তিনি প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তখনই এই জ্ঞানাগ্নি দ্বারা ফলদানোন্মুখী সকল কর্মবীজ ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে এবং উহা দগ্ধীভূত বীজের ন্যায় আর কোন ফলোৎপাদন করিতে পারিবে না। জীবিতাবস্থায় এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা কর্মবীজ ভস্মীভূত হইলে যোগী জীবন্মুক্ত হন। কিন্তু তাঁহার স্থূলদেহ যে কর্মফলে আরব্ধ হইয়াছে, সেই কর্মফল দেহপাত না হওয়া পর্যন্ত জ্ঞাতসারে দ্রষ্টার ন্যায় তাঁহাকে ভোগ করিতে হয় এবং তাঁহার দেহপাতের সঙ্গে সঙ্গে তিনি আত্মস্বরূপ ব্যক্ত করিয়া মুক্তিলাভ করেন। মহর্ষি বশিষ্ঠের মতে মোক্ষ লাভ করিতে হইলে বাসনাক্ষয়

১৫ সুখানুশয়ী রাগঃ। পাঃ যোঃ, সাধনপাদ, ৭

১৬ দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ। পাঃ যোঃ, সাধনপাদ ৮

মনোনাশ ও তত্ত্বজ্ঞান যুগপৎ অভ্যাস করা আবশ্যক। কারণ, এই তিনটি কার্য-কারণ সম্বন্ধাশ্রিত। তিনি লিখিয়াছেন, "যেমন কোন মন্ত্রকে খণ্ডে খণ্ডে প্রয়োগ করিলে উহা ফলপ্রদ হয় না, তেমন যতদিন না এই তিনটি পুনঃ পুনঃ যুগপৎ অভ্যাস দ্বারা সম্যক্‌রূপে অভ্যস্ত হয়, ততদিন পর্যন্ত শত শত বৎসর অতীত হইলেও সেই পরমপদ বা মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে না।"[১১] দীপশিখার ন্যায় মনোবৃত্তি আপাত-দৃষ্টিতে একটি মাত্র বোধ হইলেও বস্তুতঃ উহা অসংখ্য মনোবৃত্তির সমষ্টি। বৃত্তিমাত্রই বাসনাত্মক এবং বাসনাত্মক বৃত্তিই মন। মন বাসনাত্মক বৃত্তিরূপ পরিণাম ত্যাগ করিয়া নিরুদ্ধ হইলে মনের নাশ হয়। কাজেই মনোনাশে বাসনানাশ এবং বাসনানাশে মনোনাশ অবশ্যম্ভাবী। তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন না হইলে রূপ-রসাদি বিষয়ক চিত্তবৃত্তিসমূহ নিবারণ করা সম্ভব নয়। কারণ, বিষয়রূপ ইন্ধনাদি থাকিলে বৃত্তিরূপ দীপশিখা কখনও নির্বাপিত হইবে না। এইজন্য তত্ত্বজ্ঞান বাসনাক্ষয় ও মনোনাশ একটি অপরটির সাপেক্ষ।

১১ ত্রয় এতে সমং যাবন্ন স্বভ্যস্তা মুহুর্মুহুঃ।
তাবন্ন পদসম্প্রাপ্তির্ভবত্যপি সমাশতৈঃ॥
যোঃ বাঃ, উপঃ প্রঃ, ৯২।১৬

যোগ

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

খেয়ালী পথিক আমি ধরণীর নৃত্যরঙ্গ মাঝ
কর্ম্মহীন অপরাহ্ণ খেলা দেখি কাটাতেছি আজ।
হেথাকার হোথাকার কোন বাঁধ নাহি যেন মানি,
কারা পর, কে আপন, কোথা ঘর, কিছুই না জানি।
অসীম আকাশচারী কক্ষ-হারা তারকার মত
একক বিচরি লয়ে সঙ্গহীন উদাসীর ব্রত।

ঐ দূর ছায়াঘেরা ছোট ছোট গৃহগুলি হতে
কাহাদের কণ্ঠস্বর কানে আসি বাজে আচম্বিতে।
কারা যেন অনাহূত শব্দহীন ধূসর সন্ধ্যায়
আমার হৃদয়-পটে নানামত ছবি রেখে যায়।
না চাহিতে ছোট বড় যাহা পাই অখিল সংসারে
তাহাই কুড়ায়ে ফিরি বিত্ত মানি বহু সমাদরে।

বহুধা-চঞ্চল-গতি পলাতকা এ জগৎ পর
সব কিছু চলে যায় সব্ তব্ রহিছে অমর।
'নাই,' 'নাই' নিরন্তর গর্জি ওঠে প্রলয় বিষাণ
'আছে' 'আছে' সৃষ্টি-বেণু ফুকারি তা করে প্রত্যাখ্যান।

অনন্ত আকৃতি ক্ষণে রূপ পায় আঁধারে লুকায়
অগণ্য মূরতি নব অনুরাগে আসিয়া দাঁড়ায়।

নিখিলের যত সুর আমার সঙ্গীতে দিল ধরা
বিশ্বের অবোধ রূপ অন্তরে অরূপে হল হারা।
যেথায় যত না আলো হৃদয়-আলোকে আসি মিশে—
সবারে বাসিনু ভাল অন্তহীন প্রেমের প্রকাশে।
অখিল আনন্দ ধারা আমার আনন্দে যায় বহি
যেথাকার যত সত্য আত্ম-সত্যে রহে অবগাহি।

মৃত্যুরহস্য

শ্রীতামসরঞ্জন রায়, এম্‌-এসসি, বি-টি

মৃত্যু মনুষ্যজীবনে সর্ব্বপ্রহেলিকার নিগূঢ়তম প্রহেলিকা। মানুষের জীবননাট্যে যবনিকাপাত যে কত নির্ম্মম আকস্মিকতায় হইতে পারে, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ঈপ্সা-অভিলাষের সুবর্ণ-সৌধ মুহূর্ত্তে যে কী ভাবে ধূলায় লুটাইতে পারে, ভবিষ্যতের সহস্র জল্পনা-কল্পনা কামনা-বাসনা যে কি ভাবে শূন্যে বিলীন হইতে পারে, —এক কথায় কত ক্ষণিক, কত অনিশ্চিত যে মানুষের এই জীবন—অকস্মাৎ নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে ধূমকেতুর মত আবির্ভূত হইয়া মৃত্যু যেন তাহাই আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ বুঝাইয়া দিয়া যায়। তাই মৃত্যুসম্বন্ধে মানুষের জিজ্ঞাসাও যেমন চিরন্তন, রহস্যও যেমনি কুহেলিকাচ্ছন্ন, আতঙ্কও তেমনি গভীর এবং দুরপনেয়। এই জন্যই প্রচলিত বিভিন্ন ধর্ম্মসমূহে মৃত্যুসম্বন্ধে বিবিধ মতবাদ স্থান লাভ করিয়াছে। মানবের প্রগতি-ইতিহাসে, বিশেষ করিয়া তাহার ধর্ম্মবুদ্ধির উদ্ভব-আখ্যায়িকায় মৃত্যুর বিশিষ্ট প্রভাব স্বীকৃত হইয়াছে। ভয়, বিস্ময় প্রভৃতি জটিল মনোবৃত্তির ক্রিয়ায় আংশিক ভাবে ধর্ম্মবোধ মানবের মধ্যে প্রথম জাগ্রত হইলেও মৃত্যুর সহিত তাহার ভীতচকিত পরিচয় যে ভগবানে বিশ্বাসী হইতে এবং ইহলোক ভিন্ন আর এক লোকের অস্তিত্বে আস্থাবান হইয়া উঠিতে তাহাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল সেকথা সর্ব্ববাদি-সম্মত। এইমাত্র যে ব্যক্তি সুখে-দুঃখে, হাসি-কান্নায় তাহাদেরই একজন হইয়া নাচিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে ছিল—কিসের প্রভাবে, কাহার স্পর্শে সে সহসা অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল, আর উঠিল না?—কি সে দুর্ব্বোধ্য প্রহেলিকা?

প্রাগৈতিহাসিক যুগের অসভ্য, নগ্নকায়, বনচারী, যাযাবর মানব-মানবী এ প্রশ্নের সম্মুখীন হইয়া জ্ঞানের আলোকবর্জ্জিত, তমিস্রাবৃত সেই আদিমকালে যেরূপ বিহ্বল হইয়াছিল অন্য কোন প্রাকৃত কিংবা অপ্রাকৃত ঘটনায় সে তদ্রূপ হয় নাই। অথচ, প্রশ্নটিকে এককালে মন হইতে ঝাড়িয়া পুঁছিয়া যে সে পরিষ্কার হইয়া দাঁড়াইবে তাহাও সে পারিয়া উঠিতেছিল না। ফলে, রজনীর গাঢ় তমিস্রায়, নিদ্রার আবরণতলে দিবাচিন্তার বিকৃত-পরিণতি স্বপ্নাকারে সেই মৃতজনের পার্থিব বাস্তবরূপ তাহার সম্মুখে পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত হইয়াছিল। ইহলোক ভিন্ন অন্য আর এক লোকের অস্তিত্বে আস্থা, ভূতপ্রেত প্রভৃতিতে ভয় ও বিশ্বাস অনেকাংশে এই স্বপ্নদর্শন হইতেই প্রথম জাগ্রত হইয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। তারপর, সেইকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত মৃত্যুর স্বরূপ, জন্ম ও পুনর্জন্ম, ভূত প্রেত প্রভৃতি লইয়া কত মতবাদই না মাথা তুলিয়াছে, কত অলৌকিক, অতীন্দ্রিয়-দর্শন কথা, কত কালের ইতিবৃত্তি, ভগবান বুদ্ধের জরা ও মৃত্যুর বিভীষিকা-দর্শনে গৃহত্যাগরূপ কত অনবদ্যকাহিনী আমরা শুনিতে পাইয়াছি। কিন্তু তাহাতে মৃত্যুর তুহিনগহ্বরের ঘনান্ধকার ছায়া সাধারণ মনুষ্যের সম্মুখ হইতে কিছুমাত্র দূরীভূত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। মৃত্যুপারের অনাবিষ্কৃত

দেশ সাধারণ মানবের নিকট চিরকালেরই মত অনির্ব্বচনীয় রহস্তে আবৃত রহিয়াছে। মৃত্যুভীতি—সংসারী, ভোগলিপ্সু মানবমনকে একই ভাবে কণ্টকিত ও আতঙ্কিত করিয়াছে এবং করিতেছে। অনাগত ভাবীকালে মানবের জ্ঞান-পরিধি আরও বিস্তৃত হইলে, অতীন্দ্রিয় দর্শনক্ষেত্রে বিচরণক্ষমতা আরও অবাধ হইলে তাহার মনোভাব কীদৃশ হইবে তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত বহু আবিষ্কার, বহু মতবাদ সত্ত্বেও মৃত্যুসম্বন্ধে সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য করিয়া এইটুকুই শুধু বলা চলে যে, মৃত্যু মানবজীবনের অবধারিত পরিণতি। অকস্মাৎ তাহার আগমন হইতে পারে এবং যে দেহটি মৃত্যুস্পর্শে হীমশীতল হইয়া একবার ভস্মীভূত হইল অথবা ভূগর্ভে সমাহিত হইল সে দেহটি পুনর্বার কখনো ফিরিয়া আসিবে না। 'ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং' কখনো হইবে না, কখনো হইবে না। সুতরাং চরম-সমস্যা ও প্রশ্ন এই দাঁড়াইল যে—মৃত্যুতেই কি তবে জীবনের পরিসমাপ্তি? মানবের হাসি-কান্না, স্নেহপ্রেম, প্রীতিভালবাসা সুকৃতি-দুষ্কৃতি মৃত্যুস্পর্শে সব কিছুরই কি পূর্ণাবসান? মানবের সমগ্র অস্তিত্ব কি কেবল দেহেই পর্যবসিত এবং উহার নাশেই কি জীবনের পূর্ণচ্ছেদ? তাহার আশাবাদী মন কিন্তু ইহাতে সায় দিল না, নিভৃত ইঙ্গিতে সান্ত্বনা দিয়া তাহাকে যেন বলিল—'না তাহা নহে; 'দেহই মানবের সবখানি নহে।' মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার পঞ্চতন্মাত্র প্রভৃতি হইতে সুরু করিয়া আত্মা পর্য্যন্ত বিবিধ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুর সমষ্টিতেই তাহার সর্ব্বাবয়বসত্তা পর্য্যবসিত। তাহা যদি হয়, তবে মৃত্যুর পরে, দেহের বিনাশের পরে উহাদের কি পরিণতি হইয়া থাকে? বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বিভিন্ন মতবাদের যে কথা আমরা ইতঃপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি তাহাদের উদ্ভব এই প্রশ্নের সমাধান প্রচেষ্টা হইতেই সম্ভব হইয়াছে। জন্মান্তরবাদ Transmigration কিংবা Metempsychosis তত্ত্ব লইয়া দার্শনিক মতানৈক্য এই ক্ষেত্র হইতে জন্ম লইয়াছে। খ্রীষ্টানজগতে জাষ্টিনিয়ান্ এর পূর্ব্বসময় পর্য্যন্ত অরিজেন এবং অন্যান্য ধর্ম্মযাজকগণ Transmigration এ বিশ্বাস করিতেন। গ্রীক দার্শনিক পিথাগোরাস্, যিনি ভারতীয় সাংখ্য-দর্শনের অনুসরণে সংখ্যাসহায়ে সৃষ্টিপ্রপঞ্চ ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তিনি লিখিয়াছিলেন—"After death the rational mind having been freed from chains of the body, assumes an ethereal vehicle and passes into the region of the dead, where it remains till it is sent back to other world to inhabit some other body, human or animal. After undergoing successive purgations it is received among the Gods and returns to the eternal source from which it first proceeded." কিন্তু পরবর্ত্তী কালে বিশেষ করিয়া জাষ্টিনিয়ান্-এর সময় হইতে এ মতবাদে খৃষ্টানগণ অবিশ্বাসী হইয়া উঠেন। অধুনা কেবলমাত্র খ্রীষ্টানগণ নহেন, প্রাচীন ইহুদী, পার্শী, মুসলমান প্রভৃতি ধর্ম্মসম্প্রদায়ও Metempsychosis মতবাদে অবিশ্বাসী। পুনর্জন্মবাদ ইঁহারা অস্বীকার করেন। একটিমাত্র জন্মে জীবনের সূত্রপাত ও অবসান—জন্মের সঙ্গে দেহের ও আত্মার সমসাময়িক যুগপৎ সৃষ্টি ভগবদ্‌বিধানে সম্ভব হইয়া থাকে—ইহাই তাঁহাদের মত। মৃত্যুর পরে স্বর্গ কিংবা নরক নামক স্থানে সুখ বা দুঃখ ভোগ করিবার অদৃষ্ট লইয়া 'Soul'-কে অনন্তকাল বাস করিতে হইবে। সেই Soul বেদান্তের আত্মা নহে! "After death each one of us will continue either in heaven or hell to

enjoy or suffer throughout eternity".—মোটামুটি ভাবে ইহাই তাঁহাদের মতবাদের সারকথা। আবার আধুনিক যুগের Spiritualist-গণও জন্মান্তরবাদ মানেন না—একজন্মবাদই তাঁহারা স্বীকার করেন। পূজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দ কৃত 'Life Beyond Death' নামক গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা দেখিতে পাওয় যায়।

প্রাচীন মিশরীয়গণের মধ্যে Transmigration মতবাদ প্রচলিত ছিল। তাঁহাদের মতে একটি দেহত্যাগের পর তন্মধ্যস্থ আত্মা বা 'soul' সহস্র বৎসর ধরিয়া অভিজ্ঞতা লাভব্যপদেশে দেহান্তরে পরিভ্রমণ করিয়া চলিতে থাকে কিন্তু তাহাতে soul-এর নিজস্বগুণ বা পরিমাণ কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হয় না। তাহার নিজ বৈশিষ্ট্য ও আকাঙ্ক্ষানুযায়ী সে ক্ষেত্র অন্বেষণ করিয়া লয় মাত্র।

"The soul after leaving the dead body would travel from one body to another for thousands and thousands of years in order to gain experiences in each of the different stages of life. The migrating substance (soul) being a fixed quantity, with fixed qualities chooses its form according to its taste, desire and best of character."—ইহাই প্রাচীন মিশরীয়গণের ধারণা ছিল। ভারতবর্ষে আবার অতি প্রাচীন যুগ হইতেই মৃত্যুরহস্য ভেদ করিবার প্রচেষ্টা সুরু হইয়াছিল। ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনায় মৃত্যুরহস্য উদ্ঘাটন ও মৃত্যুভীতি-জয়-প্রয়াস একটা বিশিষ্টস্থান অধিকার করিয়া আছে। কৃষ্ণযজুর্বেদের অন্তর্গত উপনিষৎসমূহের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কঠোপনিষৎ এই মৃত্যু রহস্যালোচনায়ই সমৃদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। স্মরণাতীত কালের সেই রহস্যাবৃত আরণ্যক সভ্যতার যুগে—যখন জগতের অন্য কোন দেশে জ্ঞান ও সংস্কৃতির ঈষন্মাত্র আলোকপাত হইতেও বহু বহু শতাব্দী বিলম্ব আছে,—সেই শতকল্প ও মন্বন্তরকাল পূর্ব্বেকার দিনে নচিকেতার মুখে ভারতীয় সাধক মৃত্যুদেবতার নিকট এই শাশ্বত প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন—

> যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে
> অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
> এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহং
> বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ॥

'মানুষের মরণ হইলে যে সংশয় উপস্থিত হয়—কেহ বলেন, পরলোকবাসী আত্মা আছেন, কেহ বলেন তিনি নাই—আপনার উপদেশ হইতে আমি সেই আত্মার অস্তিত্বের বা অনস্তিত্বের বিষয় জানিতে চাই। বরসমূহের ইহাই আমার তৃতীয় বর।' এইটি নচিকেতার প্রশ্ন ছিল। শুধু প্রশ্ন উত্থাপনই নহে, পরন্তু আত্মসমাহিত হইয়া ধ্যানের তৃতীয় নেত্রে অপরাজ্ঞানের অপরিসর পরিধির বাহিরে দৃষ্টিপাত করিয়া সে জটিলতম প্রশ্নের সমাধান ও আবিষ্কার করিয়াছিল। আর সেই সমাধানের অন্তর্নিহিত গূঢ় তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে স্তম্ভিত-বিস্ময়ে আজ পর্য্যন্ত ভারত-ভারতী সর্ব্বথা তৎপর হইয়া আছে। নচিকেতার প্রশ্নের উত্তরে মৃত্যুদেবতা গূঢ়তম তত্ত্বকথা সেদিন বিবৃত করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন—হে নচিকেতা, মৃত্যু শুধু দেহেরই হইয়া হইয়া থাকে, দেহীর মৃত্যু নাই। 'দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ম্' বলিয়াছিলেন,—

> ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
> নায়ং ভূত্বাঽভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
> অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
> ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

আত্মরূপই মানুষের যথার্থরূপ। ব্রহ্ম ও আত্মা অভিন্ন। জন্ম, জরা ও মৃত্যুহীন এই ব্রহ্ম বা আত্মা

কারণান্তর হইতে উদ্ভূত হন না—শরীর নাশ হইলেও ইহার নাশ হয় না।

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্
আত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো
ধাতুঃপ্রসাদাৎ মহিমানমাত্মনঃ।

'সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, এবং বিশাল হইতে বিশালতর এই আত্মা প্রত্যেক জীবের হৃদয় গুহায় অবস্থিত। অন্তঃকরণাদি বিশুদ্ধ হইলে নিষ্কামব্যক্তি তাঁহাকে দর্শন করিয়া শোকাতীত হন এবং অব্যাহত আনন্দধারায় সিক্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভে ধন্য হন।'

এতচ্ছ্রুত্বা সম্পরিগৃহ্য মর্ত্ত্যঃ
প্রবৃহ্য ধর্ম্মমণুমেতমাপ্য।
স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধ্বা
বিবৃতং সদ্ম নচিকেতসং মন্যে॥

'এই আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া এবং তাঁহাকে সম্যক গ্রহণ করিয়া এবং ধর্ম্মসহায়ে দেহ হইতে ইহাকে পৃথক করিয়া (দেহী) সূক্ষ্ম আত্মাকে লাভ করে এবং এই আনন্দের আকরকে লাভ করিয়া সে আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে।' সে আনন্দ অব্যাহত, সর্ব্বোত্তম। উহা লাভ করিলে অন্য কোন লাভই—'মন্যতে নাধিকং ততঃ'। এই আত্মা সর্ব্বশেষ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বোচ্চ এবং পরমাগতি।

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥
মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥

ইন্দ্রিয় হইতে বিষয় শ্রেষ্ঠ, বিষয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ এবং বুদ্ধি হইতে মহান আত্মা (যাঁহাকে ভাষ্যকার 'হিরণ্যগর্ভ' অথবা প্রাণী মাত্রের অন্তর্নিহিত বলিয়াছেন) শ্রেষ্ঠ। আবার হিরণ্যগর্ভ হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ। পুরুষ বা পরমাত্মা হইতে শ্রেষ্ঠতর আর কিছুই নাই। তিনিই পরাকাষ্ঠা ও পরাগতি। সুতরাং আর্য্যঋষির মতে মৃত্যু অর্থে দেহ এবং ইন্দ্রিয়েরই কেবল মৃত্যু বুঝাইবে, কিন্তু প্রত্যেকের হৃদয়-গুহায় অশরীরী ভাবে নিত্যরূপে বিরাজমান যে সর্ব্বব্যাপী আত্মা তিনি—'ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।' পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ জনৈক মার্কিন মহিলার নিকট লিখিত একটি পত্রে এই তত্ত্বটি যথাসম্ভব সহজ ভাষায় বিবৃত করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন,—

"Coming and going are all delusion. The soul never comes nor goes. Where is the place to which it shall go, when all space is in the soul? When shall be the time for entering and departing, when all time is in the soul? The earth moves, causing the illusion of the movement of the sun, but the sun does not move. So Prakriti or Maya or Nature is moving, changing, unfolding veil after veil, leaf after leaf of this grand book which the witnessing soul drinking in knowledge, unmoved, unchanged. All souls that ever have been—are or shall be, are all in the present tense, and to use a material simile—are all standing at one geometrical point. Because, the idea of space does not occur in the soul, therefore, all that were ours, are ours and will be ours, are always with us, were always with us, and will be always with us."

সুতরাং মৃত্যু একটি বাহ্যিক পরিবর্ত্তন ভিন্ন আর কিছুই নহে। বসন জীর্ণ হইয়া গেলে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া মানব যে রূপ নববস্ত্র পরিধান করে, দেহ জীর্ণ হইয়া গেলে নূতন দেহও ঠিক সেইরূপেই সে গ্রহণ করিয়া থাকে—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি
সংযাতি নবানি দেহী॥

মৃত্যুরহস্যের এই যে অনুপম তত্ত্ব, ইহার সম্যক উপলব্ধি হইলে আনন্দস্থিতি ও শোকাতীত অবস্থা লাভ হয়—একথা শাস্ত্রকারগণ দৃঢ়তার সহিত পুনঃ পুনঃ বিবৃত করিয়াছেন। বহুগ্রন্থে, বহুস্থলে নানাভাবে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়া এই তত্ত্বটিকে মানবমনে বিশেষভাবে মুদ্রিত করিবার অশেষ প্রয়াস আর্য্য ঋষিগণ করিয়া গিয়াছেন। অনন্ত শাস্ত্রসমুদ্র হইতে শ্লোকশতক উদ্ধৃত করিয়া সে প্রয়াসকে সর্ব্বথা ব্যক্ত করা সহজ-সাধ্য নহে। সে প্রচেষ্টাও আমরা করিব না। এ প্রসঙ্গে শুধু এইটুকুই বলিব যে আত্মার মহিমাজ্ঞাপক ও মৃত্যুরহস্যচ্ছেদক শ্লোক উপনিষৎ গ্রন্থাদির সর্ব্বত্র আমরা বহুল পরিমাণে দেখিতে পাই। মাত্র কঠোপনিষদেই নহে—বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, কেন, ঈশ প্রভৃতি উপনিষদেও আত্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনা-ব্যপদেশে মৃত্যুসম্পর্কীয় ইঙ্গিত বহু দৃষ্ট হইয়া থাকে। আবার ঐ শ্লোকরাশির পাশাপাশি এমন শ্লোকও যথেষ্ট দেখি যাহাতে আত্মায় অবিশ্বাসী, মৃত্যু-তত্ত্বজ্ঞানহীনদের পরিণতি যে কী হইবে তাহাও বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে।

যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।
মনসৈবেদমাপ্তব্যম্ নেহ নানাস্তি কিঞ্চন
মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি।

যাহা এখানে তাহাই সেখানে, যাহা সেখানে তাহাই এখানেও উপাধি অনুযায়ী বিভাবিত হন। যে এই ব্রহ্মে নানা বা বহুদর্শন করে সে মৃত্যুর পর মৃত্যুই প্রাপ্ত হয়। মনের দ্বারাই এ ব্রহ্ম উপলভ্য, ইঁহাতে অণুমাত্র ভেদ নাই। যে ইঁহাতে ভেদ দর্শন করে সে মৃত্যুর পর মৃত্যুই প্রাপ্ত হয়। সুতরাং এই অবিশ্বাসকে হৃদয়ে স্থান দেওয়া উচিত নয়। পরন্তু, বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া অধ্যবসায় সহায়ে, দৃঢ় নিষ্ঠায় আত্মতত্ত্ব লাভের জন্য হে মানব, তুমি—

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।

মনে রাখিও, সহজ সুগম বিঘ্নহীন পথ ইহা নহে—

ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।

যদি তাহা কর, যদি ভগবৎবিধানে প্রচেষ্টা তোমার সার্থক হয় তবে অমৃতের অধিকারী তুমি অবশ্য হইবে। কিন্তু তজ্জন্য অমিত সাহস তোমাকে অবলম্বন করিতে হইবে। অকুতোভয়ে মৃত্যুর একেবারে সামনাসামনি, একেবারে মুখো-মুখি দাঁড়াইতে হইবে। মহামায়ার মায়াজাল তবেই ছিন্ন হইবে, আত্মতত্ত্ব তবেই অধিগত হইবে।

সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়
মৃত্যুরে যে বাঁধে বহু পাশে
কাল নৃত্য করে উপভোগ,
মাতৃরূপা তারই কাছে আসে।

অপরোক্ষ-জ্ঞান-সম্পন্ন আপ্তকাম ঋষি অভয় দিয়া তাই বলিতেছেন—

অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরমধ্রুবং
নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে।

অনাদি অনন্ত মহত্তত্ত্ব হইতে বিলক্ষণ কূটস্থ নিত্যকে জানিতে পারিলে মৃত্যুমুখ হইতে বিমুক্তি অবশ্য লাভ করা যাইবে। ইহার পরে আবার, এই তত্ত্ব ভাবী কালের সাধকগণ কী ভাবে, কোন্ প্রণালীতে উপলব্ধি করিতে পারিবেন তাহারও উপায় তাঁহারা নিরূপণ করিয়াছেন। বহু চেষ্টায়, বহু তপস্যায়, বহু সাধনমার্গ তাঁহারা আবিষ্কার করিয়াছেন এবং চরমে ভূয়োদর্শন ও বহুশ্রুতির ফলে একথা নিসংশয়ে প্রচার করিয়াছেন যে, যে-কোনো পথের অনুসরণ করিয়া, যে-কোন মতের অনুবর্ত্তী হইয়া মানুষ অগ্রসর হইলে—মৃত্যুরহস্য পরিজ্ঞাত হইয়া অমৃতত্ব ও ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করিতে পারে। সাধনক্ষেত্রের অসীম প্রান্তরমধ্যে তাঁহারাই পথনির্দ্দেশক ধ্রুবতারকা।

ধন, জন, যোগ, ভোগ কোন কিছুতেই অমৃতত্ব লাভ হইবে না। তাঁহাকে লাভ করিবার একটি মাত্র কৌশল আছে—সকল কৌশলের মূলীভূত সে কৌশলটি 'ত্যাগ' নামে অভিহিত। "ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ"—একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ হইবে। তেন ত্যক্তেন 'ভুঞ্জীথাঃ' ত্যাগবুদ্ধিদ্বারা ভোগ করিতে হইবে—নান্যঃ পন্থাঃ।

অমৃতত্বলাভ সম্বন্ধে আর একটি উক্তি—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ
তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥

প্রবচন (বেদজ্ঞান) বা মেধা বা বহুশ্রুতি—কোন কিছুতেই এই আত্মতত্ত্ব লভ্য নহে—যাঁহার প্রতি ইনি অনুগ্রহ করিবেন তিনিই কেবল ইঁহাকে লাভ করিবেন। সুতরাং বাসনা ত্যাগ কর, তাঁহারই কৃপার অনুবর্ত্তী হইয়া, 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য' সর্ব্বধর্ম্মের আড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারই শরণাপন্ন হও, মৃত্যুরহস্য ছিন্ন করিয়া তাঁহাকে লাভ কর। মৃত্যুর পারে যাইবার, মৃত্যুঞ্জয়ী হইবার ইহাই কৌশল। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের ইহাই প্রত্যক্ষানুভূতি-লব্ধ অভিনব আবিষ্কার এবং পরবর্ত্তী কালের সমগ্র হিন্দুদর্শনের ভিত্তি। তাই দেখিতে পাই, শাস্ত্রসমূহের কৌস্তুভমণি, সর্ব্বহিন্দু-শাস্ত্রসার 'ভগবদ্গীতা' ভয়াবহ যুদ্ধক্ষেত্রে অথবা মৃত্যুর ঘনান্ধকার ছায়ার মধ্য হইতে উদ্ভূত হইল। অধুনা বহু-আলোচিত, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানানুমোদিত, যুক্তিবিচারসহনক্ষম বেদান্তদর্শনেরও উহাই অন্যতম ভিত্তি। এই আবিষ্কারের ফলে ভারতীয় সাধক শুধু যে মৃত্যুভয়কে অতিক্রম করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন—তাহা নহে, পরন্তু উত্তরকালে তাহাকে তিনি একান্ত আপন বলিয়া, 'প্রিয়তম' বলিয়া গ্রহণ করিতেও সমর্থ হইয়াছিলেন। উত্তরাখণ্ডের জনৈক সন্ন্যাসীকে বিষাক্ত কালকূট দংশন করিলে "আমার প্রিয়তমের দূত আমাকে চুম্বন করিয়াছে"—বলিয়া তিনি যে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন এ কাহিনী আজ সর্ব্বজনবিদিত। আমাদের এই বাংলাদেশে, উত্তরকালের বাংলা সাহিত্যের কত বিচিত্র রচনায়, কত বেহুলা-লক্ষ্মীন্দরের মর্ম্মন্তুদ কাহিনীতে, কত সাবিত্রী-সত্যবানের উপাখ্যানে, সতীর দেহত্যাগে, অভিমন্যুর অন্যায় সমরে অকালে প্রাণ বিসর্জ্জনে, ভীষ্মের শরশয্যায় দেহরক্ষার কত করুণ আখ্যায়িকায় এই মৃত্যুরহস্য যে বর্ণিত হইয়াছে তাহার অবধি নাই। বস্তুতঃ, সর্ব্বভীতির মূলীভূত কারণরূপ যে মৃত্যু মানুষের চক্ষে নিতান্ত অনাকাঙ্ক্ষিত বলিয়া সর্ব্বলোকে সর্ব্বকালে প্রতিভাত—তাহাকেই

একান্ত প্রিয় বলিয়া, বহু-বাঞ্ছিত অতিথি বলিয়া স্বাগত আহ্বান করিবার মত সাহস ও প্রেরণা আমাদের সাধক ও কবিকুল প্রভূত পরিমাণে অর্জ্জন করিয়াছিলেন উত্তরকালে। তাই, বাংলার কবিকণ্ঠে আমরা শুনিতে পাই—

মরণ যেদিন দিনের শেষে
　আসবে তোমার দুয়ারে,
সেদিন তুমি কি ধন দিবে উহারে ?
　ভরা আমার পরাণখানি,
　সম্মুখে তার দিব আনি
শূন্য বিদায় করব না তো উহারে ?

কল্পনারাজ্যে আরও অগ্রসর হইয়া প্রেম সম্বন্ধে আরও নিবিড়ভাবে মৃত্যুকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে সে মাধুর্য্যরসেও অভিষিক্ত করিয়াছে। রজনীর স্তব্ধ নীরবতায় বিলাস-কুতূহলী অভিসারিকা যেমন উদ্বেলিত অন্তরে ও নিভৃত চরণে ছায়াচ্ছন্ন কুঞ্জবীথি দিয়া প্রেমাস্পদের উদ্দেশ্যে বাহির হয়, ঠিক তেমনি ভাবেই মরণের সন্ধানে বাহির হইয়া ভারতীয় সাধক, বিশেষ করিয়া বাংলার কবি, গান করিয়াছেন—

কহ মিলনের একি রীতি এই
ওগো মরণ, হে মোর মরণ !
তার সমারোহ ভরা কিছু নেই
　নেই কোন মঙ্গলাচরণ।
তব পিঙ্গল ছবি মহাজট
সেকি চূড়া করি বাঁধা হবে না,
তব বিজয়োদ্ধত ধ্বজাপট
　সেকি আগে পিছে কেহ রবে না !
তব মশাল আলোকে নদীতট
　আঁখি মেলিবে না রাঙা চরণ,
ত্রাসে কেঁপে উঠিবে না ধরাতল—
　ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

যদি কাজে থাকি আমি গৃহমাঝ
　ওগো মরণ, হে মোর মরণ !
তুমি ভেঙ্গে দিয়ো মোর সব কাজ
　করো সব লাজ অপহরণ।
যদি স্বপনে মিটায়ে সব সাধ
　আমি শুয়ে থাকি সুখশয়নে,
যদি হৃদয়ে জড়ায়ে অবসাদ
　থাকি আধ জাগরূক নয়নে,
তবে শঙ্খে তোমার তুলো নাদ
　প্রলয় শ্বাসভরণ
আমি ছুটিয়া আসিব ওগো নাথ
　মরণ, হে মোর মরণ।

বর্ত্তমান যুগে বাংলার কবিকণ্ঠনিঃসৃত এই সব অপূর্ব্ব মৃত্যুছন্দগাথা রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য রসরচনা। ইহার অনুরূপ আরও অসংখ্য কবিতা স্মরণ, নৈবেদ্য, নবজাতক, আরোগ্য, শেষলেখা, রোগশয্যায়—প্রভৃতি কাব্য-গ্রন্থেও আমরা বহুল পরিমাণে দেখিতে পাই। ইহাদের মধ্যে শেষোক্ত গ্রন্থগুলির অন্তর্ভূত অধিকাংশ কবিতাই মৃত্যুসম্পর্কীয়। রবীন্দ্রনাথ জীবনের প্রান্তে আসিয়া কত অকুতোভয়ে মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়াইয়াছিলেন, অনন্ত জীবনালোকে উদ্ভাসিত, সুবিশাল কল্পলোকের সন্ধান পাইয়া মৃত্যুকে কীভাবে এককালে অস্বীকার করিয়া-ছিলেন—এই কবিতাগুলি যেন তাহারই পরিচয় বহন করিতেছে।

আমি জানি, যাব যবে
সংসারের রঙ্গভূমি ছাড়ি,
সাক্ষ্য দেবে পুষ্পবন ঋতুতে ঋতুতে
এ বিশ্বেরে ভালোবাসিয়াছি।
এ ভালোবাসাই সত্য, এ জন্মের দান।
বিদায় নেবার কালে
এ সত্য অম্লান হয়ে মৃত্যুরে করিবে অস্বীকার।

অথবা—যে রশ্মি অন্তরে আসে
সে দেয় জানায়ে—
এই ঘন আবরণ উঠে গেলে
অবিচ্ছেদ দেখা দিবে
দেশহীন, কালহীন, আদিজ্যোতি,
শাশ্বত প্রকাশ পারাবার।
সূর্য্য যেথা করে সন্ধ্যাস্নান
যেথায় নক্ষত্র যত মহাকায় বুদ্‌বুদের মত
উঠিতেছে ফুটিতেছে—
সেথায় নিশান্তে যাত্রী আমি,
চৈতন্ত সাগর তীর্থপারে।

এই রূপে অজস্র কবিতাংশ বা কবিতা এই-কালের রচনা হইতে উদ্ধৃত করা যায়। আবার ইহাদেরও বহুকাল পূর্ব্বে—১২৯০ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ কবিজীবনের প্রথম জাগ্রত যৌবনে 'ভানুসিংহের পদাবলী'র একস্থানে এই মরণকে ব্রজবুলি ছন্দে নন্দিত করিয়া, 'শ্যাম' সম্বোধন করিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন—

মরণরে, তুঁহু মম শ্যাম সমান।
মেঘবরণ তুঝ, মেঘ জটাজুট
রক্ত কমল কর, রক্ত অধর পুট
তাপ বিমোচন করুণ কার তব
মৃত্যু অমৃত করে দান
মরণরে, তুঁহু মম শ্যাম সমান।

মরণরে, শ্যাম তোহারই নাম
চির বিসরল যব, নিরদয় মাধব
তুঁহু ম ভইবি মোর বাম
আকুল রাধা রিঝ অতি জরজর
ঝরই নয়ন দউ অনুখন ঝরঝর
তুঁহু মম মাধব, তুঁহু মম দোসর
তুঁহু মম তাপ ঘুচাও
মরণরে আওরে আও।

এইরূপ আরও কত মনোজ্ঞ রচনাই না উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। কিন্তু বাহুল্যভয়ে তাহা হইতে বিরত হইয়া উপসংহারে আমরা শুধু এই কথাই বলি যে, অতি প্রাচীন যুগ হইতে বর্ত্তমান বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিবিচারের দিন পর্য্যন্ত মৃত্যুরহস্য লইয়া মানুষ নানা ভাবে চিন্তা-গবেষণা করিয়াছে, ধ্যান-তপস্যায় মাতিয়াছে এবং সেই সাধন-লব্ধ তত্ত্বসমূহ কখনো শাস্ত্রের চরমসিদ্ধান্ত ও নির্দ্দেশরূপে কখনো কল্পনা-মণ্ডিত মনোরম ছন্দগাথায় প্রকাশ করিয়া মানুষকে মৃত্যুভীতির পারে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিয়াছে। যাঁহারা সাধক, বাণী-উপাসক—তাঁহাদের পক্ষে ঐ সকল অভয় বাণী অতীতে যেমন পরম উদ্দীপকরূপে ক্রিয়া করিয়াছে ভাবী কালেও তদ্রূপ করিতে থাকিবে।

কিন্তু সাধনহীন, সন্দিগ্ধমনা, ক্ষীণশক্তি সাধারণ মানুষ শত আবিষ্কার, শত অভয়বাণী সত্ত্বেও মৃত্যুকে ভয় করিবে; তাহাকে এড়াইয়া, ফাঁকি দিয়া—চিরদিনই বোধ করি এই সংসারের হাটে বিকিকিনি সে করিতে চাহিবে। তাহার পক্ষে তাই আর্য্য ঋষির আবিষ্কার নহে, উপনিষদের আত্মতত্ত্ব নহে পরন্তু একদা বকরূপী ধর্ম্মের প্রশ্নোত্তরে যুধিষ্ঠির যাহাকে 'আশ্চর্য্য-তম' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন—মহাভারতে সেই সর্ব্বজনবিদিত বাণীটিই বোধকরি চরম ও পরম সত্য থাকিয়া যাইবে—

অহন্যহানি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্॥

চিরদিনই মানুষের দ্বিধাক্ষুব্ধ, সংশয়-শঙ্কিত মন জন্মমৃত্যুর বিচিত্র প্রহেলিকায় উদ্বেলিত ও বিভ্রান্ত হইবে। মৃত্যুই জীবনের অবধারিত পরিণতি, দেহের নাশে আত্মার নাশ হয় না ইত্যাদি দার্শনিক তত্ত্বকথা বহুমুখে বহুধা শ্রুত হইলেও—প্রত্যক্ষ, বাস্তবক্ষেত্রের দিকে তাকাইয়া মানুষ যে অবিশ্রাম

অন্ধের মত মায়ামরীচিকার মোহাকর্ষণে মাতিতেছে,
ছুটিতেছে তাহা সে অস্বীকার করিতে পারিবে না।
ঘুরিয়া ঘুরিয়া, নিত্যকাল ধরিয়া বোধ করি তাই
সেই একই প্রশ্ন সে করিতে থাকিবে—
ভোগের লালসা মানবে সদায়,
চরমে অশেষ দুঃখ ভোগায়,
—ভোগায় বিশদ, বিষম গ্লানি
এ কথা যদিও নিত্য শুনি।
তবু সংসারে কত না মানব
মায়াজাল নিতি রচিছে সুখে,
স্বপ্ন দেখিছে কত অভিনব,
নরকের জ্বালা পুষিছে বুকে।
বুঝিয়া না বুঝে—একি প্রহেলিকা,
চিত্তভ্রান্তি প্রতিটি পদে,
বৃথা উদ্যম, তবু অহমিকা—
তবু শতকোটি বাসনা হৃদে।
ঋষিগণ যাহা ইঙ্গিতে কহে
অনুভূতিসার—পরমবাণী,
সুপ্ত বাসনা তাহারে না লহে,
দূরে রাখে তারে মিথ্যা মানি।
জীবনের গতি তাই রহে নিতি,
জটিল-কুটিল প্রশ্নভরা,
নাহি টুটে ভীতি, শ্লথ হয় গতি
মানুষের দুঃখে পূর্ণ ধরা।
একি কৌশল খেলিছে মায়াবী,
কেন বা মানবে দিতেছে ফাঁকি ?
ফুৎকারে বাতি নিভাইয়া সবি
আঁধারের মাঝে রাখিছে ঢাকি।

তুমি ও আমি

শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য্য, এম্-এ কাব্যতীর্থ, শাস্ত্রী

(তুমি) অন্তর দেব ! মরম বেদনা নাহিক তোমারে কব,
(আমি) জঞ্জালে শত ক্ষত বিক্ষত নীরবেতে তবু রব।
(তুমি) দাও সখা দাও বেদনার ভার তোমাতেই মতি রাখি,
(আমি) সহিব সকল ভুবন ভুলানো রূপেতে মাতিয়া থাকি।
(তুমি) আছ নীলিমায় গগনের গায়, সাঁজের মিলন মাঝে,
(আমি) হেরি তারকায় কুসুমের গায়, চপলায় হাসি রাজে।
(তুমি) তটিনীর মৃদু চঞ্চল ক্ষেপে ডাকিছ দিবস যামী,
(আমি) মধুর বাঁশরী হৃদি-যমুনায় শুনেছি জীবনস্বামী।
(তুমি) ফিরে গেছ কত ডাকিয়া ডাকিয়া আঘাতি হৃদয়-দ্বারে,
(আমি) ছুটেছি হে তাই বিরামবিহীন জীবনের অভিসারে।

সক্রেটিসের মতবাদ

শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত, এম-এ

কি করে এবং কি উদ্দেশ্য নিয়ে জগতের সৃষ্টি হল, কি শক্তি এই সৃষ্টির পেছনে আছে, এবং এই পরিদৃশ্যমান জগতের শেষ কোথায়, ইত্যাদি বহুবিধ চিরন্তন প্রশ্ন মানুষের মনে এনেছে চরম বিস্ময়। চমৎকৃত মানুষ যুগ যুগ ধরে সৃষ্টির উৎস খুঁজেছে এবং জানতে চেয়েছে জগৎ মানুষের জন্য, না মানুষ জগতের জন্য? সে প্রশ্ন করে মানুষ ব্যক্তিগত না সার্ব্বজনীন? সে জিজ্ঞাসা করে মানুষের স্বতন্ত্র জীবন ভাল, না মানুষের জীবনে সর্ব্বব্যাপকতা থাকা দরকার? সে চিন্তা করে মানুষ কিভাবে একই সময়ে ব্যক্তিগত ও সার্ব্বজনীন হতে পারে। মানুষের মনের এই স্বাভাবিক চিন্তাগুলি গ্রীক-দর্শন রূপ দিতে চেষ্টা করেছে। সৃষ্টির আদিম উপাদান ও জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক আলোচনা গ্রীকদর্শনে হয়েছে। অবশ্য এই আলোচনার গতি স্তরে স্তরে এগিয়ে গেছে। ফলে কালক্রমে এমন এক স্তর এল যেখানে মানুষকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল এক নূতন দর্শন এবং মানুষের উপর ন্যস্ত হল সমস্ত জাগতিক ঘটনা ও বিষয়বস্তুর মূল্য ও পরিমাণ নির্দ্ধারণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব। এই মতবাদ যাঁরা পোষণ করতেন তাঁদের গ্রীকদর্শনে বলা হত সোফিষ্ট। এঁদের কাছে মানুষই হল মূল সত্য এবং মানুষের ব্যবহারিক জীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি হল একমাত্র উদ্দেশ্য। এঁরা মনে করতেন সার্ব্বজনীন মানুষ বলে কিছু নেই এবং থাকতে পারে না।

সোফিষ্টদের এই মতবাদ সক্রেটিস সম্পূর্ণ-রূপে মেনে নিতে পারলেন না। তিনি বলেন মানুষের ভেতরে যে মহত্ত্ব এবং বিশালতা—আছে, সে মহত্ত্ব ও বিশালতাকে জানা দরকার। তাঁর মতে জগতের মূলপদার্থ আবিষ্কারের চেষ্টা নিষ্প্রয়োজন। এর কারণ অবশ্য অত্যন্ত পরিষ্কার। অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিনটি হল সৃষ্টির ক্রমবিকাশের প্রধান স্তর। প্রথমে সৃষ্ট হল জগৎ। তার পর এল প্রাণী। ভবিষ্যৎ কি সম্ভাবনা নিয়ে আসছে তা দিব্যদৃষ্টি যাঁদের আছে তাঁরাই একমাত্র বলতে পারেন। জগতের উৎপত্তি ও মূলপদার্থ সম্বন্ধে বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন মতবাদ পোষণ করেন। ফলে কোন একটি বিশেষ সিদ্ধান্তকে জগতের কারণ বলে ব্যক্ত করা চলে না। এজন্য বোধ হয় জগতের আদিম উপাদান' সম্বন্ধে কোন আলোচনায় সক্রেটিস মনোযোগ দেন নি। তিনি মনে করতেন—জগতের আদিম উপাদানের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার চেয়ে মানুষের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার সার্থকতা অনেক বেশী। মানুষের জীবনে যা কিছু মহৎ তা জানা অত্যন্ত দরকার। তিনি বিশ্বাস করতেন—যদি মানুষের সার্ব্বজনীন প্রকৃতিকে বাদ দেওয়া হয়, তাহলে মানুষের ব্যক্তিগত অস্তিত্বকে উপলব্ধি করা অসম্ভব। তাঁর মতে মানুষের অখণ্ড এবং বিশ্বব্যাপী প্রকৃতি মানুষের ব্যক্তিগত গুণ অথবা রূপের চেয়ে অনেক বেশী সত্য। তিনি বলেন চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দিয়ে জগৎসম্বন্ধে যে বোধ

এবং প্রতীতি জন্মে, সে বোধ এবং প্রতীতি কেবলমাত্র প্রজ্ঞার সাহায্যে কার্য্যকরী হয়ে উঠতে পারে। প্রজ্ঞাসম্বন্ধে সক্রেটিসের মত অত্যন্ত সুস্পষ্ট। বস্তুসম্বন্ধে ইন্দ্রিয় দিয়ে যে উপলব্ধি হয়, সে উপলব্ধির সাথে সাথেই প্রজ্ঞার ক্রিয়া আরম্ভ হয়ে থাকে। ব্যক্তি বা বস্তুবিষয়ক মনোগত সাধারণ ভাব প্রজ্ঞার মাঝে নিশ্চয়ই থাকবে এবং প্রজ্ঞা এই সাধারণ ভাব ও উপলব্ধির মাঝে নিয়ে আসে এক অদ্ভুত সঙ্গতি। সক্রেটিস জোর দিয়ে বলেছেন যে হেতু প্রত্যেক জিনিষেরই বিশ্বজনীন রূপ আছে, সে হেতু সে বিশ্বজনীন রূপসম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার, এবং এই ধারণা তখনই জ্ঞানে পরিণত হতে পারে যখনই এই ধারণার মধ্যে বস্তুবিষয়ক মনোগত সাধারণ ভাবগুলি পরিপূর্ণভাবে ফুটে উঠে।

সক্রেটিস বিশ্বাস করেন জ্ঞানই হল চরম ধর্ম্ম, শক্তি এবং উৎকর্ষ। ধর্ম্মসম্বন্ধে মানুষের যদি সুস্পষ্ট ধারণা থাকে, তাহলে মানুষ কখনও অনুচিত বা নীতি-বিরুদ্ধ কাজ করবে না, কারণ মানুষের পাপ ও অন্যায়ের জন্য বিশেষভাবে দায়ী মানুষের অজ্ঞতা। মানুষের মনোবৃত্তিগুলি যদি ঠিকপথে পরিচালিত হয়, তাহলে মানসিক উন্নতি নিশ্চয়ই হবে। সক্রেটিস মনে করেন—মানসিক উন্নতিই মানুষের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। তিনি বিশ্বাস করেন—মানসিক উন্নতি লাভ করতে হলে অন্তরের স্পৃহা, লোভ এবং কামনাগুলোকে সংযত করা দরকার। বিশেষতঃ সার্ব্বজনীন জীবনের সাথে ব্যক্তিগত জীবনকে এমনভাবে নিয়মিত করা প্রয়োজন যার ফলে আসবে কল্যাণ ও অনাবিল আনন্দ।

সক্রেটিসের এই মতবাদ পরবর্ত্তী গ্রীকদর্শনকে বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত করেছে এবং তিনি যে ভাবে নূতন আলোকে মানুষকে দেখেছেন, সেজন্য তিনি দর্শনের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

চাওয়া ও পাওয়া

প্রণব

খুব বেশী কিছু চাহি নি তো পৃথিবীতে ;
যতটুকু পারি হেথা দিতে আর নিতে,
সেই সম্পদে স্বর্গটি রচিবার,
চেয়েছিনু শুধু দু'দিনের অধিকার,
স্বপ্নকামনা নিশিদিন মম ছেয়ে ছিল চারিভিতে।
খুব বেশী কিছু চাহি নি তো পৃথিবীতে।

পথ চলি আর করি অনুভব ধীরে,
বিপুলা ধরণী এ মহাজীবন ঘিরে,
যতটুকু আলো ততটুকু ছায়া দিয়ে
চাওয়া আর পাওয়া রেখেছে মিশিয়ে,
জনম-মরণ ছেয়ে আছে সেই অপরূপ সংগীতে
খুব বেশী কিছু চাহি নি তো পৃথিবীতে।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের কথা

স্বামী অপূর্বানন্দ

১৯৩৪ সনের ২৩ শে ডিসেম্বর এলাহাবাদ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে পূজ্যপাদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ বাল্মীকি রামায়ণ ইংরাজীতে অনুবাদ করছেন এবং কয়েক অধ্যায় ছাপতে দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে মহারাজজী বললেন, "বইতে সীতার ছবি, চার ভাই ও মহাবীরের ছবি দিয়েছি। কয়েক দিন আগে বাইরে শুয়ে আছি হঠাৎ ঠাকুরের কথা মনে পড়ল। তিনি একদিন বলেছিলেন, 'কৈ আমার ধনুর্বাণ কৈ?' তাই ভাবলাম ঠাকুর ও মায়ের ছবিও রামায়ণে দেব। ছোট ব্লক করিয়ে ফেললাম, কিন্তু ব্লকটী ইংরাজী মতের হয়ে গেছে। মা আগেই বসে গেছেন, ঠাকুর মার বাঁ দিকে বসেছেন। তা আর কি করা যাবে—মায়ের যা ইচ্ছা।"

পরে তিনি বলতে লাগলেন, "ঠাকুর আমাকে একদিন বলেছিলেন,—সত্যি আমি চৌদ্দবৎসর ঘুমুইনি—খাইনি। চৌদ্দবৎসর বনবাস করেছিলাম, ইত্যাদি। লক্ষ্মণ চৌদ্দবৎসর ঘুমননি—খাননি। তা লক্ষ্মণ ও রাম যে অভেদ—একই বিষ্ণুর অবতার।"

১লা জানুয়ারী ১৯৩৫—মঙ্গলবার। ন-বাবু মহারাজজীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মহারাজ, আজকার দিনে ঠাকুর কল্পতরু হয়েছিলেন। আপনি কি সে সময় ঠাকুরের কাছে উপস্থিত ছিলেন?"

মহারাজজী—"না। আমি তখন বাঁকীপুরে ছিলাম, পাটনা কলেজে পড়তাম। ঠাকুর যে দিন দেহ রাখেন সেদিন তাঁর vision (দর্শন) পাই। আমি এক মেসে যেতাম, সে মেসে তখন শ্রীকৃষ্ণ-প্রসন্ন সেনও ছিলেন। আমি দুপুরবেলা ঘুমুতাম না—ঐ সময় ওখানে সে দর্শন হয়। স্বামীজীর দেহত্যাগের পূর্বেও তাঁর vision (দর্শন) পেয়েছিলাম। তখন তোমাদের ব্রহ্মবাদিন্ ক্লাবে থাকতাম। স্বামিজী হঠাৎ শরীর ছেড়ে দিলেন। তাঁকে কতকটা সুস্থ দেখেই যে দিন তিনি উত্তরপাড়া লাইব্রেরী দেখতে যান—সেদিন আমি বেলুড় মঠ থেকে বাগবাজার হয়ে এলাহাবাদে চলে আসি। তার কয়েক দিন পরেই তিনি দেহরক্ষা করেন। যেদিন তাঁর দেহত্যাগের টেলিগ্রাম আসে তার পূর্বেই আমি ধ্যান করতে গিয়ে ক্লাবের ঠাকুর ঘরের বেদীতে তাঁকে দেখি। ঐ দেখেই ভাবলাম, একি হল? তার পরেই তার এল যে স্বামীজী মহারাজ দেহ ছেড়ে চলে গেছেন। রাখাল মহারাজের দেহত্যাগের পূর্বেও তাঁর vision (দর্শন) পাই। মহাপুরুষ মহারাজের দেহ রাখবার চার পাঁচ দিন পূর্বে দেখে এসেছিলাম, তাঁর যে দেহ যাবে তা টের পেয়েছিলাম। তাঁর সঙ্গে সাধু হবার আগে হঠাৎ মোগলসরাই ষ্টেশনে প্লেট-ফর্মের উপর দেখা হয়। খুব active (কর্মঠ) ও quick (চটপটে)। ঠাকুরও খুব quick (চটপটে) ছিলেন। ঐ টুকু ঘরের (দক্ষিণেশ্বরের) ভিতর যেন ভেল্কী খেলছেন!"

অন্য একদিন জনৈক ভক্ত জিজ্ঞাসা করেন—"মহারাজ, সেদিন যে বলেছিলেন বেদান্তে ত্যাগ করতে বলেছে, ঠাকুর কিন্তু ঠিক তা বলেন না, এ কথাটা ভাল বুঝতে পারলুম না।" তদুত্তরে মহারাজ, বললেন, "বেদান্ত বলে সংসার মিথ্যা—মায়া। সংসার ত্যাগ করতে হবে, তবে ভগবান

লাভ বা ব্রহ্মানুভূতি হতে পারে। ঠাকুর ঠিক তা বলেন নি। তিনি বলেছেন, সংসারে থেকেও হবে, তবে কর্মফল ত্যাগ করতে বলেছেন। মহাপুরুষদের ঐ রকম কথা—apparently contradictory (বাহ্যতঃ বিপরীত অর্থবোধক), তাঁদের উপদেশ সময় সময় enigmatic (প্রহেলিকাপূর্ণ)।

"আজকাল বাইবেল পড়ছি। খুব forceful (শক্তিপূর্ণ) কথা। Truth (সত্য) আছে কি না! ঋষিমুনিদের কথা ভারি forceful. Facts (সত্য ঘটনা) এর উপর based (প্রতিষ্ঠিত)। Facts এর so-called (তথাকথিত) মানে নয়। Facts অর্থাৎ জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি ও তুরীয় এই সকল অবস্থায়ই সত্য।

"শুকদেব যখন হিমালয়ে তপস্যা করছিলেন তখন তিনি পর্বতে সকল দিক হতে "ব্রহ্ম ব্রহ্ম" শব্দ শুনতে পেতেন। "জ্যোতি ব্রহ্ম জ্যোতি ব্রহ্ম" এই শব্দ শুনতেন। সে জ্যোতি কি জান? বড়ই sweet pleasing light, bliss and knowledge (মধুর স্নিগ্ধ জ্যোতি আনন্দ ও জ্ঞানস্বরূপ)। দেবীভাগবতে আমি শুকদেবের কথা লিখেছি। সুবিধে মত পড়ো। ঐ জ্যোতি আমি সারনাথে museum (যাদুঘর)-এ বুদ্ধদেবের মূর্তির সম্মুখে একবার দেখি। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার! পূর্বথেকে কিছু মনে করে যাইনি। কাশী সেবাশ্রম হতে সকাল বেলায় অমনি একাই বেড়াতে বেরিয়েছি তখন হঠাৎ মনে হল যে সারনাথে যাব। সারনাথে পৌঁছে এদিক সেদিক ঘুরে দেখছি তখন guide (পথপ্রদর্শক) বললে যে একটী পাথরে বুদ্ধদেবের জন্ম থেকে মহানির্বাণ পর্যন্ত সব বৃত্তান্ত খোদা আছে। সেখানে আমায় নিয়ে গেল। বুদ্ধদেবের ঐ মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে দেখছি আর হঠাৎ world vanish (জগৎ অদৃশ্য) হয়ে গেল। An ocean of light (এক জ্যোতির সমুদ্র), আর আমি তাতে যেন একটী drop (বিন্দু) এর মত। ocean-এ (সমুদ্রে) যেমন waves (তরঙ্গমালা)-র সদাই শব্দ হয় তেমনি এই ocean of light (জ্যোতির সমুদ্রে)-এও এক অতি মধুর শব্দ হচ্ছিল। Body consciousness (শরীরের বোধ) ছিল না। আমি বোধ হয় নেই তবে একটু সামান্যমাত্র বোধ ছিল। সে যে কী আনন্দ! আমি এখনও সেই light (জ্যোতি) এর আনন্দের কথা কইতে কইতে আনন্দ অনুভব করছি। এই রকম অবস্থায় কতক্ষণ আছি তারপর কানে যেন দূর হতে শব্দ এল "আগে চলিয়ে আগে চলিয়ে" গাইড্ বলছিল আর কি। তখন আমার বাহ্যিক জ্ঞান এল। সেবাশ্রমে যখন ফিরে এলাম তখন সকলেই জিজ্ঞাসা করতে লাগল—কোথায় গিয়েছিলাম, খাবার ঢাকা আছে, ইত্যাদি। আমি বললাম, শরীর তত ভাল নেই, খাব না। চুপচাপ শুয়ে পড়লাম। তখনও সে আনন্দের নেশা পুরো মাত্রায় ছিল।

"বুদ্ধদেবের এক অদ্ভুত personality (ব্যক্তিত্ব)। তাঁকে কাশ্যপাদি ব্রাহ্মণরা শত্রুতা করে মেরে ফেলতে চেয়েছিলেন। তখনও তাঁরা তাঁর শিষ্য হন নি। তিনি এক সময় এসেছেন, তাঁকে একটী ঘরে শুতে দিয়েছিলেন, সে ঘরটি সাপের ঘর। তাঁরা মনে করেছিলেন রাত্রিতে বুদ্ধদেবকে সাপে কামড়াবে তাহলেই তাঁর মৃত্যু হবে। মাঝে মাঝে রাত্রে উঠে গিয়ে দেখেন। একবার দেখলেন যে ঘর একেবারে আলোকিত হয়ে গেছে; আরও নিকটে গিয়ে দেখেন—বুদ্ধদেব ধ্যানমগ্ন, আর একটা প্রকাণ্ড বাস্তুসাপ, তাঁর মাথায় মাণিক, ফণা ধরে তাঁর মাথার উপর ছত্র ধরে আছে। তাঁরা দেখেতো অবাক্! সকাল হতেই বুদ্ধদেবের পায়ে জড়িয়ে ধরে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন। তিনিও তাঁদের ক্ষমা করলেন আর তাঁরা শিষ্য হয়ে গেলেন।

"বুদ্ধদেব রাজার ছেলে ছিলেন। তাই তাঁর হৃদয় ও খুব উদার ছিল। আহা এমন মহাপুরুষকেও মেরে ফেলতে চেয়েছিল! তাঁর ক্ষমাগুণ অসীম ছিল কেউ দোষ করবার পর যদি তাঁকে গিয়ে বলত—প্রভু অপরাধ করেছি ক্ষমা করুন, তা হলে তিনি তখনই ক্ষমা করতেন। একজন লোক তাঁকে অযথা কটুবাক্য বলে গালাগাল করছিল। বুদ্ধদেব চুপ করে সব শুনে গেলেন, পরে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, মানুষ যদি কারো কাছে উপঢৌকন নিয়ে যায় আর সে যদি উহা গ্রহণ না করে তবে উপঢৌকনগুলি কোথায় যায়? লোকটী উত্তর করলে, যে নিয়ে এসেছিল সে ঐগুলি ফেরত নিয়ে যায়। তখন বুদ্ধদেব বললেন, আপনি যা আমাকে এতক্ষণ দিচ্ছিলেন, আমি তার কিছুই গ্রহণ করিনি, আপনি সব ফেরত নিয়ে যান। লোকটা এ কথা শুনে ভারি অপ্রতিভ হয়ে গেল এবং ক্ষমা চাইল।

"স্বামিজী মহারাজ বলতেন, বুদ্ধদেবের মত দু একজন এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছেন। এঁদের মত বড় লোক বড় একটা জন্ম নিতে চান না। তাঁদের জীবের দুঃখকষ্ট দেখে হৃদয় একেবারে গলে যেত—তাই আসতে চান না।"

অন্যসময় মহারাজজী বলেছিলেন, "স্বামিজী মহারাজকে একরাত্রি দেখেছি যে তিনি বসে ধ্যান করছেন, আর তাঁর অঙ্গজ্যোতিতে ঘর একেবারে আলো হয়ে গেছে। আমি তখন বেলুড় মঠে উপরে স্বামিজীর ঘরের পাশের ছোট ঘরটীতে থাক্‌তাম। এক রাত্রে প্রস্রাব ফিরতে উঠেছি, আর দেখি যে স্বামিজীর ঘরে যেন আলো জলছে। প্রথমটায় বিশেষ কিছু খেয়াল করিনি। প্রস্রাব করে যখন ফিরে এলাম তখনও দেখলাম যে সে আলো সমভাবেই জলছে অথচ ঘরে কোন প্রকার সাড়াশব্দ নেই। একবার মনে হল হয়ত ছারপোকা মারবার জন্য আলো জ্বালা হয়েছে। শেষটায় ব্যাপার কি দেখবার জন্য তাঁর ঘরের উত্তর দিকের খোলা দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে যা দেখলাম তাতে আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলাম। দেখলাম যে স্বামিজী গভীর ধ্যানে মগ্ন, আর তাঁর শরীর থেকে একটা স্নিগ্ধ জ্যোতি বেরিয়ে সারা ঘর আলো করে ফেলেছে। তোমরা হয়ত একথা শুনে বিস্মিত হচ্ছ কিন্তু আমি প্রত্যক্ষ দেখেছি। সে যে কী দেখেছি তা জীবনে ভুলতে পারব না। এখনও তোমাদের কাছে ঐ কথা বলতে বলতে ও যেন চোখের সামনে ঐ দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি। যে কোন মানুষ প্রয়াণকালে এই মহাপুরুষদের কাউকে যদি স্মরণ করতে পারে তাহলে তার গতি নিশ্চিত ভাল হবে।"

অন্য এক দিন যীশুখৃষ্টের transfiguration (রূপান্তর পরিগ্রহ) সম্বন্ধে মহারাজজী বলছিলেন, "যীশু একদিন পাহাড়ের উপরে পিটার, জেম্‌স্ ও জোনকে আলাদা ডেকে নিয়ে গিয়ে transfigured হলেন। তাঁর দেহ জ্যোতির্ময়। যীশুখৃষ্ট সম্বন্ধে কত উচ্চাঙ্গের কথা বাইবেলে লিপিবদ্ধ রয়েছে কিন্তু যীশু তাঁর প্রিয় শিষ্যদের বলেছেন, এ যা বললাম সবই exoteric (বহিরঙ্গ); তোমাদের esoteric (গুহ্য) বিষয় আরও কত শেখাব। আমার বোধ হয় ধ্যান ধারণা ও সমাধির বিষয়ে যীশুর বলার উদ্দেশ্য। ধর্মরাজ্যে জানবার বিষয় অনন্ত—ঐ পথে যত এগিয়ে যাবে আরও কত জানবে; জানার অন্ত নেই। purity, truthfulness ও honesty (পবিত্রতা, সত্যবাদিতা ও সততা)-র উপর জীবন গঠন করবে। আর বিশ্বাস। এইসব অবলম্বন করলে যে যে কোন অবস্থায়ই থাকুক না কেন তার তৃপ্তি আসবে। প্রকৃত শান্তিলাভের লক্ষণ হল সর্বাবস্থায় তৃপ্তি।"

গোরক্ষ-গাথা

শ্রীসুরেশ চন্দ্র নাথ-মজুমদার

এমন একদিন গিয়াছে যখন ভারত ও ভারতের বাহিরের জনসাধারণ জাতিধর্মনির্বিশেষে যোগী গোরক্ষ নাথের পূত কাহিনী শ্রবণের জন্য সর্বদা লালায়িত ছিল। এই সম্বন্ধে দেশ-বিদেশের পণ্ডিত ও প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে বাংলা, আসামী, নেপালী, জাপানী, চীনা, হিন্দী, গুজরাটী, মারাঠী, পাঞ্জাবী, উড়িয়া প্রভৃতি ভাষায় গোরক্ষ নাথের চরিত্র অবলম্বনে বহু গাথা ও গীতিকা রচিত হইয়াছে। এই সকল গাথা ও গীতিকা জনসাধারণের চিত্ত বিশেষ ভাবে এককালে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। বিভিন্ন স্থানের হিন্দু ও মুসলমান কবিগণের বিরচিত গোরক্ষ নাথের চরিত্র, ধর্ম্ম ও সাধনমাহাত্ম্যপূর্ণ সাহিত্য এদেশবাসীর বিশেষ করিয়া বঙ্গের বাণীভাণ্ডারে সমাদৃত।

অধ্যাপক অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "* * * গোরক্ষ নাথের কীর্তি ও ধর্মমত-বিজ্ঞাপক একটি গাথাসাহিত্য ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রচার লাভ করিয়াছে। নানা প্রাদেশিক ভাষায় এসব গাথাসাহিত্য প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। * * * এই গাথাগুলি ভারতের জাতীয় সাধনার অমূল্য সম্পত্তি। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষিত সম্প্রদায়ে উহার অধিকাংশই অপরিচিত।" —পল্লীশ্রী, ২য় সং, ১৩৩১ বাং।

অধ্যাপক বেণীমাধব বড়ুয়া বলেন—"যে গোরক্ষ নাথের নামে একদিন সুদূর জলন্ধর ও সুরাষ্ট্র হইতে গৌড় বঙ্গ আসাম উড়িষ্যা পর্যন্ত আর্যাবর্তের সকল লোক সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিতেন তাঁহার বিষয়ে নাথসমাজ অজ্ঞ।"

অধ্যাপক তমোনাশ চন্দ্র দাশগুপ্ত বলেন—"নাথ-গুরুদের অত্যাশ্চর্য ক্রিয়াকলাপের কথা এ সমস্ত গাথার অঙ্গীভূত বলিয়া তৎসম্প্রদায় কর্তৃক ইহা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে গীত ও সেই সেই দেশের ভাষায় প্রচলিত হইয়াছে। ভিক্ষোপজীবী যোগীরা এই কাজে কম সহায়তা করে নাই।"—প্রবর্তক, অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪ বাং। এখন এসব গাথা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক :—

বাঙ্গালী রাজা গোপীচাঁদের মাতার নাম ছিল ময়নামতী। ময়নামতী খুব সুন্দরী ছিলেন। একদিন স্নান করিবার সময় সরোবরের জলে নিজের রূপ দেখিয়া—

"আপনার অবোছেয়া ময়না জলেতে দেখিল।
আপনার রূপ দেখি ময়না কান্দিতে লাগিল।"

এমন সময়—

"রথ বএয়া যায় গোরথ নাথের রথ আটকিল॥"

গোরক্ষ নাথ ময়নামতীর পরিচয় গ্রহণ করিয়া এবং তাঁহার রোদনের কারণ অবগত হইয়া বলিলেন—

"গোরথ নাথ বলে মা রূপের বিদ্যাধরী।
তন্ত্র মন্ত্র নিলে মা রক্ষা করিতে পারি॥
তন্ত্র মন্ত্র নিলে মা যমক নাই আর ডর।
অই যমক করিয়া দেইম তোমার ঘরের নকর॥"

গোরক্ষ নাথের বাণী শুনিয়া ময়নামতী আনন্দিত হইলেন এবং গোরক্ষনাথকে গুরু পদে বরণ করিলেন—

"গোরখনাথ দিল মন্ত্র মহিমা অপার।
সেই মন্ত্র পাইয়া ময়না হইল অমর॥
আগুনত না যায় পোড়া জলে নাহি হয় তল।
ত্রিভুবন টলিয়া গেলে না যায় যমের ঘর॥"

—গোপীচাঁদের মাতা

অধিক কি—

"গুরু বোলে দিনে মিলে মৈনামতী আই।
সূর্য্য বান্দি মাঙ্গাইব এড়াএড়ি নাই॥
রাত্রিতে পড়িয়া মিলে মএনামতী আই।
চন্দ্র বান্দি মাঙ্গাইব এড়াএড়ি নাই॥"

—গোবিন্দচন্দ্র ও ময়নামতী

গুরুর কৃপায় ময়নামতী অমর হইয়াছেন, এখন পুত্র গোপীচাঁদকে কি উপায়ে অমর করা যায় তাহাই চিন্তা করিতেছেন—

"শুন পুত্র গোপীচন্দ্র যোগে কর মন।
বরাক্ষাণ জ্ঞান সাদ যুগী হইবার॥
বরাক্ষণ জ্ঞান সাদিলে নাহিক মরণ।
জিয়া থাক গোবির্চাদ নাথে দেউক বর॥"

—ময়নামতীর গান

ময়নামতীর বাক্য ছিল তেজস্বিতাপূর্ণ। তিনি পুত্রের প্রতি স্নেহবতী ছিলেন। পুত্রের সুখের জন্য ও তিনি ব্যস্ত ছিলেন। প্রতাপশালিনী ময়নামতী স্বীয় পুত্রকে বিলাসের ক্রোড়ে লালিত পালিত হওয়ার বিরুদ্ধে ছিলেন। সেই জন্যই তিনি স্বীয় পুত্রকে যোগধর্ম গ্রহণের জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন। মাতার উপদেশের উত্তরে পুত্র রাজা গোপীচাঁদ বলিতেছেন—

"আরের মাহে বাটা চাহে রাখিবারে ঘর।
তুমি মা'এ কহ মোরে যুগী হইবারে॥
আর মা'এ পুত্র দেখি দুগ্ধ ভাত খাওয়া এ।
তুহ্মি মা'এর হিয়াখানি পাতারে বান্দিয়া॥
নিত্যপ্রতি কহ মোরে যাইতে যুগী হইয়া।
নিত্য প্রতি কহ মোরে যুগী হইবার॥
কোন যোগীর সহিত মা'ও কহ যাইবার।
হেন জ্ঞান পাইলে আমি যোগী হইয়া যাই॥"

—ময়নামতীর গান

রাণী ময়নামতী একমাত্র পুত্র গোপীচাঁদকে যোগ ধর্মাচরণের উদ্দেশ্যে দ্বাদশ বৎসরের জন্য সন্ন্যাসে প্রেরণ করিলেন এবং ইহাই হইল গোরক্ষ নাথের শিষ্যা রাণী ময়নামতীর জীবনের প্রধান কীর্তি। আজ যে ভারতের নানা স্থানে নানা ভাষায় বাঙ্গালী রাজা গোপীচাঁদের গৌরবগাথা সসম্মানে আদৃত ও গীত হইতেছে তাহার মূলে গোরক্ষ নাথ ময়নামতী ও হাড়িপা-নাথের যোগশক্তি বর্তমান ছিল। ময়নামতীর আদেশে গোবিন্দচন্দ্র নাথযোগী হাড়িপানাথকে গুরুপদে বরণ করিলেন। ময়নামতী যোগী বেশধারী রাজা গোবিন্দচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

"কোথায় উৎপত্তি হইল পৃথিবী সংসার।
কোথায় রহিল পুনঃ কহ সমাচার॥
মরণ কিবা হেতু জীবন কিরূপ।
ইহার উত্তর যোগী কহিবা স্বরূপ॥"

—দুর্লভ মল্লিক

গুরু হাড়িপার প্রসাদে রাজা উত্তরে বলিতেছেন—

"শূন্য হইতে আসিয়াছি পৃথিবীতে স্থিতি।
আপনি জল স্থল আপনি আকাশ।
আপনি চন্দ্র সূর্য্য জগত প্রকাশ॥"

—দুর্লভ মল্লিক

রাজা গোবিন্দচন্দ্র স্বীয় গুরুকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

"রাজা বলে কোন ধর্ম্মে সবলোক তরে।
ইহার উত্তর গুরু আজ্ঞা কর মোরে॥"

—দুর্লভ মল্লিক

গুরু উত্তর দিতেছেন—

"হাড়িপা কহেন বাছা শুন গোবিন্দাই।
অহিংসা পরম ধর্ম্ম যার পর নাই॥"

—দুর্লভ মল্লিক

রাজা গোপীচাঁদ সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। যে একদিন রাজপ্রাসাদে শত শত দাস-দাসী পরিবৃত থাকিতেন, যাঁহার চিত্তবিনোদনের জন্য রাণীরা ব্যস্ত থাকিতেন, আজ সে নিঃসঙ্গ পথের ভিখারী। তাঁহার এই দুঃখ রাণী ব্যতীত কে বুঝিবে? রাণী বলিলেন—"কে তোমার সঙ্গে যাইবে? কে তোমার সঙ্গে দুইটা কথা কহিবে? তোমার চরণ কে ধুইয়া দিবে? কে তোমাকে দুধ ভাত খাওয়াইবে?"

"কোন কোন রাজা তোরী সঙ্গমে চলে গীনে
কোনরে করেগী দো দো বাঁতা হোজী
কোন কোন রাজা তোরী চরণ পখালশেনে
ক্যাঁরে জমশো দুধনে ভাতা হোজী॥"

—রটিয়ালীরাত

রাজা গোপীচন্দ্র উত্তর দিলেন—
"ধনীনে পানী মোরী সঙ্গমে চলে গীনে
রেন করেগী দো দো বাঁতা হোজী
গঙ্গানে জমুনা মারা চরণ পখালশেনে
ঘের ঘের জমশু দুধনে ভাতা হোগি॥"

—রটিয়ালীরাত

অর্থাৎ ধুনী এবং জল আমার সঙ্গে যাইবে। রাত্রি আমার সঙ্গে দুটি কথা কহিবে। গঙ্গা এবং যমুনা আমার চরণ ধুইবে এবং ঘরে ঘরে দুধ ভাত খাইব। সন্ন্যাসগ্রহণের নিয়ম অনুসারে রাজা স্বীয় রাণীকে মাতৃসম্বোধন করিয়া ভিক্ষা চাহিলেন, তখন রাণী একমুষ্টি ভিক্ষা দিয়া রাজাকে চিরতরে নিজের হৃদয় হইতে বিদায় দিলেন। রাণীগণের ও প্রজাসাধারণের ক্রন্দনে সমগ্র রাজ্য মুখরিত হইল।

গোপীচাঁদের মাতা ময়নামতী গোরক্ষ নাথের কৃপায় এত শক্তি লাভ করিয়াছিলেন যে স্বয়ং শিবও তাঁহাকে ভয় করিতেন—

"মোর কথা কন যদি ময়নার বরাবর।
কৈলাস ভুবন মোর কৈর্ব্বে লণ্ড ভণ্ড॥"

—ময়নামতীর গান

ময়নামতী স্বীয় স্বামীর মৃত্যুর কারণ জানিবার জন্য যখন যোগশক্তিবলে পথের সকল বাধা অতিক্রম করিয়া যমপুরীতে উপস্থিত হইলেন, তখন—

"হাতে মাথে গোদাযম কাঁপিয়া উঠিল।"

—গোবিন্দচন্দ্র ও ময়নামতী

বিপদ আসন্ন দেখিয়া গোদাযম প্রাণভয়ে একটা খড়ের স্তূপের অন্তরালে লুকাইয়া রহিল। ময়নামতী জ্ঞানদৃষ্টির দ্বারা তাহা দেখিতে পাইয়া সর্পরূপ ধারণ করিলেন—

"চ্যাদা বোড়া হইয়া ময়না এক ঝম্প দিল।
চটকি যাইয়া গোদা যমের ঘাড়েতে বসিল॥"

এই ভাবে গোদাযম আত্মরক্ষার জন্য যে রূপই গ্রহণ করে ময়নামতী যোগশক্তিবলে তৎক্ষণাৎ তাহার ভক্ষকের আকৃতি ধারণ করিয়া তাহাকে আক্রমণ করেন। এমনই ভাবে গোদাযমের আত্মরক্ষার সকল চেষ্টা নিষ্ফল করিয়া ময়না তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন—

"এক লম্ফ দিয়া গোদার পিঠেতে চড়িল।
লোহার মুদ্গর দিয়া ডাঙ্গাইতে লাগিল॥"

—গোবিন্দচন্দ্র ও ময়নামতী

গোদাযমের আর নিস্তার নাই। উপায়ান্তর না দেখিয়া গোদা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু ময়নার ভয়ে কেহ নিকটে আসিয়া গোদাকে মুক্ত করার চেষ্টা করিতে সাহসী হইল না। তখন স্বয়ং শিব আসিয়া নানাপ্রকার প্রবোধবাক্যে ময়নাকে শান্ত করিয়া গোদাকে মুক্ত করিলেন।

স্বীয় গুরু মীন নাথের আয়ুষ্কাল জানিবার জন্য যখন সিদ্ধা গোরক্ষ নাথ যমপুরীতে গিয়াছিলেন তখন—

"গোর্খের দেখিয়া কোপ যমে কাপে ডরে।
জতেক কাগজ আনি দিলেক গোচরে॥"

—গোরক্ষবিজয়

অধ্যাপক তমোনাশ চন্দ্র দাশগুপ্ত বলেন—"নাথদের নেতাগণ সিদ্ধাই বা সিদ্ধ বলিয়া প্রসিদ্ধ। * * * হিন্দুর দেবতা ব্রাহ্মণ, নাথপন্থিগণ মানিলেও ইঁহাদিগের স্থান মহাজ্ঞান-প্রাপ্ত সিদ্ধাইগণের অনেক নিম্নে।"—ইতিহাস ও আলোচনা, শ্রাবণ, ১৩২৮ বাং।

ময়নামতীর গানে কয়েকজন সিদ্ধার নাম পাওয়া যায়—

"তবে সিদ্ধা চলি গেলা যার যেই ঘরে।
প্রথমে হাড়িপা গেলা মৈনামতির ঘরে॥
ত্বরিত গমনে গেল মৈনামতির পুরি।
তথা গিয়া রহিলেক হাড়ি রূপ ধরি॥
কানফা চলিয়া গেল অবিবির ঘরে।
গাবুর চলিয়া গেল আপন বাসরে॥
গোর্ক্ষ নাথ চলি গেল বঙ্গ নিকেতন।
কদলিতে চলি গেল মিন মহাজন॥
বাম হাতে যতি নাথ মাদলে দিল ঘাত।
সর্ব্বপুরী মোহিত করিল গোর্ক্ষ নাথ॥
নন্দ মহানন্দ দুই চেলায় পুরে তাল।
ঝমকে ঝমকে ভাল উঠে শব্দ তাল॥"

—দুর্লভ মল্লিক

রূপ

ডাঃ শচীন সেনগুপ্ত

যেদিন বাগানে
প্রথম ফুটিল
একটি গোলাপ-
ফুল,

ভেবেছিনু মনে
রূপে এ ভুবনে
নাহি এর সম-
তুল।

বুঝিয়াছি আজ
কতটুকু রূপ
গোলাপে থাকিতে
পারে ?

কোটি গোলাপের
রূপ লাজে মরে
তোমার রূপের
দ্বারে।

স্বামীজীর উত্তর-সাধক গান্ধীজী

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

স্বামীজীর জ্ঞানযোগে আছে, "আমরা দুর্ব্বল বলিয়াই নানাবিধ ভ্রমে পড়িয়া থাকি, আর অজ্ঞান বলিয়াই আমরা দুর্ব্বল।" জীবনে আমরা বহু দুঃখ ভোগ করিয়া থাকি আমাদের দুর্ব্বলতার জন্যই। কতকগুলি দুঃখকে অবশ্য এড়াইবার উপায় নাই। মৃত্যুর হাতকে আমরা কেমন করিয়া ঠেকাইব? অমরত্ব মানুষের জন্য নয়। কিন্তু বার্ট্রাণ্ড রাসেল (Bertrand Russell) যেগুলিকে 'evils of power' বলিয়াছেন তাহাদের হাত হইতে মুক্তি খুবই সম্ভব যদি আমরা দুর্ব্বলতা ত্যাগ করিতে পারি। একদল মানুষ আর একদল মানুষের উপর অত্যাচার করিতেছে, একজন মানুষ আর একজন মানুষকে জোর করিয়া দাবাইয়া রাখিতেছে—এমন ঘটনা সংসারে অহরহই ঘটিয়া চলিয়াছে। এক সম্প্রদায় অথবা এক জাতি কর্ত্তৃক অপর এক সম্প্রদায়ের অথবা অপর এক জাতির উপর এই যে অত্যাচার —এই অত্যাচার লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনকে অভিশপ্ত করিয়া রাখিয়াছে। ভারতবর্ষ আজ একটি বিরাট কারাগারের সামিল হইয়া আছে। এই সুবৃহৎ কারাগারে যে চল্লিশ কোটী মানুষ বন্দী হইয়া রহিয়াছে তাহাদের দুঃখ-দুর্দ্দশার সীমা নাই। চল্লিশকোটী ভারতবাসীর দুঃখদুর্দ্দশার জন্য প্রধানতঃ দায়ী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ। গান্ধীজী ঠিকই বলিয়াছেন: "I am convinced that the sufferings of the people cannot be alleviated until India has real political power." "ভারতবর্ষ যতদিন সত্যিকারের রাজনৈতিক ক্ষমতা না পাইতেছে ততদিন জনসাধারণের দুঃখের উপশম সম্ভব নয়—ইহাই আমার বিশ্বাস।" দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া এক জাতির উপর আর এক জাতির প্রভুত্ব—ইহার নামই তো সাম্রাজ্যবাদ, আর এই সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষের মতো আরও অনেক দেশকে দুর্ভাগা করিয়া রাখিয়াছে—ইহা একটা অবিসংবাদিত সত্য। সুতরাং 'evils of power' কে স্বীকার করিতেই হয়।

অত্যাচারীর আকাশস্পর্শী স্পর্দ্ধাকে জীয়াইয়া রাখিয়াছে যাহারা অত্যাচারিত তাহাদের ভীরু-হৃদয়ের দুর্ব্বলতা। উৎপীড়িতের দল উৎপীড়কদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে বলিয়াই অত্যাচারীরা অত্যাচার করিতে সাহস পাইতেছে। বশ্যতা স্বীকারের মূলে ভীরুতা। সবলের উদ্ধত অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিলে তাহার ফল একেবারেই প্রীতিপ্রদ নহে। বিদ্রোহীর ভাগ্যে কারাগার, ফাঁসি, 'শ্রাবণ রাত্রির বজ্রনাদ'। জীবন হারাইবার, সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবার ভয়েই অত্যাচারীর কাছে আমরা বশ্যতা স্বীকার করি। দিকে দিকে এই যে স্পর্দ্ধিত ক্রূরতা, মত্ততার এই নির্লজ্জ হুঙ্কার—ইহার মূলে তো 'ভীরুতার দ্বিধাগ্রস্ত চরণ বিক্ষেপ', কাপুরুষের 'নিরাপদ নীরব নম্রতা'। অনেকে মনে করেন আধুনিক সমাজে দুঃখের মূলীভূত কারণ দারিদ্র্য এবং দারিদ্র্যের উচ্ছেদের মধ্যেই দুঃখের অবসান রহিয়াছে। কিন্তু দারিদ্র্য তো রোগের লক্ষণ, আসল ব্যাধি দাসত্ব। বহু লোক ক্রীতদাস হইয়া আছে দরিদ্র বলিয়া নহে,

দাসত্বের জন্যই তাহারা দরিদ্র হইয়া আছে। G. D. H. Cole-এর ভাষায় "The many are not enslaved because they are poor, they are poor because they are enslaved." তবুও সোস্থালিস্টরা নিরন্নদের অন্নবস্ত্রের দুঃখটাকেই একান্ত বড়ো করিয়া দেখিয়া আসিতেছে। তাহারা ভুলিয়া যায়, এই দুঃখের মূলে ক্রীতদাসের আধ্যাত্মিক অধোগতি। সমাজের একদিকে স্তূপীকৃত ঐশ্বর্য্য, আর একদিকে অসহনীয় দারিদ্র্য—এই লজ্জাকর বৈষম্য ঘুচিতে পারে না যতক্ষণ ভারতবাসীরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকার না পাইতেছে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার মূলে তো আমাদের দাসসুলভ মনোবৃত্তি। আর আমরা অত্যাচারীর দাসত্ব স্বীকার করিতেছি ভয়ে। ভয় আমাদের আধ্যাত্মিক অধোগতিরই লক্ষণ। ভয় মানে প্রাণ হারানোর ভয়, বিষয় সম্পত্তি হারানোর ভয়। এই দুইটী ভয়কে মানুষ যেখানে পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছে সেখানে কে তাহাকে দাসত্ব-নিগড়ে বাঁধিয়া রাখিতে পারে? আর দাসত্ব-নিগড় যেখানে ভাঙিয়া গিয়াছে সেখানে ঐশ্বর্য্য এবং দারিদ্র্যের বৈষম্য থাকিতেই পারে না। সুতরাং লক্ষ লক্ষ সর্ব্বহারার দুঃখদৈন্যের মৌলিক কারণ, Cole-এর ভাষায়, the spiritual degradation of the slave. গান্ধীজী তাই বলেন: "No power on earth can subdue a man who has shed these two fears." এখানে যে দুইটী ভয়ের কথা গান্ধীজী বলিয়াছেন তাহারা হইল fear of death and fear of loss of material possessions.

কিন্তু ভয়ের তো একটা কারণ আছেই। সাম্রাজ্যবাদীর হাতে বারুদ আর বারুদের জোরেই তাহারা আজ সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর। বার্ট্রাণ্ড রাসেল (Bertrand Russell) তাঁহার Roads to Freedom-এ অকপটে স্বীকার করিয়াছেন, "What stands in the way of the freedom of Asiatic populations is not their lack of intelligence, but only their lack of military prowess, which makes them an easy prey to our lust for dominion." "এসিয়ার অধিবাসীরা স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হইয়া আছে তাহাদের বুদ্ধির দীনতার জন্য নহে, সামরিক শক্তির অভাবের জন্য। এই সামরিক শক্তির অভাবেই তাহারা আমাদের রাজ্যলালসার যূপকাষ্ঠে বলি হইয়া থাকে।" লাখ কথার এক কথা। শ্বেতকায় জাতির মারিবার ক্ষমতা এসিয়ার অধিবাসীদের মারিবার ক্ষমতা অপেক্ষা অনেক বেশী। তাই এসিয়ার এই দুর্দ্দশা। মরণের ভয়ে এসিয়া ইউরোপের বারুদের শাসনকে মানিয়া লইল।

মৃত্যুভয়ের মূলে দেহাত্মবুদ্ধির মূঢ়তা। দেহে আমরা আত্মবুদ্ধি আরোপ করিয়া থাকি বলিয়াই জীবন হারাইবার ভয় আমাদিগকে অভিভূত করে। খ্যাতনামা ইংরেজলেখক অলডাস্ হাক্সলি (Aldous Huxley) ভয়ের যে সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহা চমৎকার। হাক্সলি বলিতেছেন: "Fear is a painful and obsessive identification of the self with its body." দেহ আর আত্মা এক এবং অভিন্ন—এই বেদনাময় দেহাত্মবুদ্ধিই ভয়। ভয়ের জন্যই প্রবলের মারকে আমরা এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করি। আমরা জানি প্রবলের উদ্ধত অন্যায়কে ঠেকাইতে গেলে মার অনিবার্য্য এবং মার খাওয়ার অভিজ্ঞতা বেদনাদায়ক। যাহাকিছু আমাদিগকে দুঃখ দেয় আমরা স্বভাবতই তাহার পাশ কাটাইয়া চলিতে চাই। সুখের প্রতি আমাদের মজ্জাগত অনুরাগ, দুঃখের প্রতি আমাদের মজ্জাগত বিতৃষ্ণা। দুঃখকে, মারকে আমরা ভয় করি বলিয়াই রেগুলেশন লাঠি এবং বারুদের আস্ফালন দেখাইয়া প্রবল আমাদের নিকট

হইতে কুর্নিশ আদায় করে আর ভয় দেখাইয়া কুর্নিশ আদায় করিতে সক্ষম হয় বলিয়াই দুর্ব্বলের উপরে সবলের অত্যাচার এখনও চলিতেছে। তাহা হইলে মার খাওয়ার অভিজ্ঞতা কষ্টদায়ক বলিয়াই আমরা প্রবলের বশ্যতা স্বীকার করি। দেহকে আমার আসল সত্তার সহিত এক করিয়া দেখি। তাই শরীর যখন আঘাত পায় মনে করি আমিই আঘাত পাইতেছি, আমারই লাগিতেছে। শরীরকে যদি আমার আসল সত্তা বলিয়া মনে না করি তবে আমার লাগার না লাগার প্রশ্নই উঠিতে পারে না। লাগিতেছে মাংসপিণ্ডটার—আমার নহে। যতক্ষণ নিজেকে মাংসপিণ্ড বলিয়া মনে করিতেছি ততক্ষণই আঘাত পাওয়ার দুঃখের অনুভূতি হইতেছে আর দুঃখের ভয়ে মারকে এড়াইবার ক্রমাগত প্রয়াস পাইতেছি। দেহে আত্মবুদ্ধি আরোপ করিবার মোহ যেমন চলিয়া গেল, আত্মাকে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিবার দিব্যদৃষ্টি যেমন জাগিল মারের ভয়ও সঙ্গে সঙ্গে পলায়ন করিল।

রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা'য় ধনঞ্জয় বৈরাগী মারের ভয়ে ভীত প্রজাদের নির্ভীক করিবার জন্য বলিতেছে :

"মার জিনিষটাকেই একেবারে গোড়া ঘেঁষে কোপ লাগাও !"

প্রজারা বলিতেছে :

"সেটা কি ক'রে হবে, প্রভু ?"

ধনঞ্জয়ের উত্তর :

"মাথা তুলে যেমনি বলতে পারবি লাগ্‌চে না, অমনি মারের শিকড় যাবে কাটা।"

প্রজারা বলিতেছে :

"লাগ্‌চেনা বলা যে শক্ত।"

ধনঞ্জয়ের কণ্ঠ হইতে পুনরায় উত্তর আসিল :

"আসল মানুষটি যে, তার লাগেনা, সে যে আলোর শিখা। লাগে জন্তুটার, সে যে মাংস, মার খেয়ে কেঁই কেঁই করে' মরে।"

ধনঞ্জয় বৈরাগী দেখিতেছে, প্রজারা দুর্ব্বলচেতা আর এই হৃদয়দৌর্ব্বল্যের কারণ লাগার ভয়। পুলিশের লাঠি যখন মাথার খুলিকে ফুটির মত ফাটাইয়া দেয় তখন "লাগচে না বলা যে শক্ত।" কেমন করিয়া এই লাগার ভয় হইতে প্রজাদের মনকে মুক্ত করা যায় ? যদি তাহাদিগকে বুঝাইতে পারা যায়, তাহারা আসলে মাংস নয় আত্মা, আর আত্মা অবিনাশী। জগতের সমুদয় অগ্নির সাধ্য নাই আত্মাকে দগ্ধ করিতে পারে।

"যে আমার সত্য পরিচয়
মাংসে তার পরিমাপ নয় ;
পদাঘাতে জীর্ণ তা'রে নাহি করে দণ্ডপলগুলি,
সর্ব্বস্বান্ত নাহি করে পথপ্রান্তে ধূলি ॥"

রক্তমাংসের স্থূল মানুষটার মধ্যে যে-মানুষটী প্রচ্ছন্ন আছে তাহাই যে আসল আমি এবং এই আমির মৃত্যু নাই—এই বোধ যাহার জাগিয়াছে তাহার কোন দুর্ব্বলতাই থাকিতে পারে না। সে যে আপনার সত্যরূপকে চিনিয়া দেহাত্মবুদ্ধির মূঢ়তা হইতে মুক্তি পাইয়াছে। এইজন্যই স্বামীজী অনেক দিন পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন :

"আমাদের ইহা বুঝা আবশ্যক যে, আমরা দুর্ব্বল বলিয়াই নানাবিধ ভ্রমে পড়িয়া থাকি, আর অজ্ঞান বলিয়াই আমরা দুর্ব্বল।"

যেখানে দেহে আত্মবুদ্ধি আরোপ করার অজ্ঞানতা লোপ পাইয়াছে সেখানে দুর্ব্বলতাও নিশ্চিহ্ন হইয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দ যে মন্ত্র তন্দ্রাচ্ছন্ন ভারতের কর্ণে মেঘমন্দ্রস্বরে উচ্চারণ করিলেন তাহা ঐক্যের মন্ত্র। তিনি ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণের অপরিমেয় দুঃখকে মজ্জায় মজ্জায় অনুভব করিয়াছিলেন, আপনাকে তাহাদের সহিত একীভূত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাই জীবনের যে পরিপূর্ণতা তিনি আপনার জন্য কামনা করিয়া-

ছিলেন সেই পরিপূর্ণতা জনসাধারণের জন্যও দাবী করিয়াছিলেন। ভারতের প্রত্যেকটি মানুষকে তিনি দেখিতে চাহিয়াছিলেন মুক্ত, শুদ্ধ, পূর্ণ। জনসাধারণের আত্মপ্রকাশের পথে 'evils of power' বিরাট অন্তরায় হইয়া আছে, ইহা উপলব্ধি করিতে তাঁহাকে বেগ পাইতে হয় নাই। তিনি দেখিয়াছিলেন রাজশক্তির প্রচণ্ড ঔদ্ধত্যকে, কোটী কোটী ক্ষুধার্ত্ত নরনারীর ও মুষ্টিমেয় ধনকুবেরের মধ্যে বিরাট ব্যবধানকে, জীর্ণ পৌরোহিত্যের আকাশস্পর্শী স্পর্দ্ধাকে। আর তিনি ইহাও দেখিয়াছিলেন, জনসাধারণের ভীরুতাই মৃত্যুর দিগন্তপ্রসারিত শাসনকে অব্যাহত রাখিয়াছে। তাই তাঁহার তূণের বাছাবাছা অস্ত্রগুলি তিনি ব্যবহার করিয়াছেন ভীরুতাকে লক্ষ্য করিয়া। জ্ঞানযোগের 'অমৃতত্ব' প্রবন্ধে আছে :

"জানিয়া রাখ, যে কোন চিন্তা বা বাক্য আমাদিগকে দুর্ব্বল করে, তাহাই একমাত্র অশুভ ; যাহাই মানুষকে দুর্ব্বল করে, যাহাই তাহাকে ভীত করে, তাহাই একমাত্র অশুভ, তাহারই পরিহার করিতে হইবে। কিসে তোমাকে ভীত করিতে পারে ? যদি শতশত সূর্য্য জগতে পতিত হয়, কোটি কোটি চন্দ্র গুঁড়াইয়া যায়, কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড যদি বিনষ্ট হয়, তাহাতে তোমার কি ? অচলবৎ দণ্ডায়মান হও, তুমি অবিনাশী।"

স্বামীজী ছিলেন শক্তির উপাসক। শক্তির মন্ত্র তাঁহার কণ্ঠে। দুর্ব্বল ভারতকে তিনি দীক্ষিত করিলেন অভয় মন্ত্রে আর তাহাকে রাজভয়, লোকভয়, মৃত্যুভয় হইতে মুক্ত করিবার জন্য তিনি বলিলেন, মানুষ জন্তু নয়, মাংস নয়—সে শুদ্ধস্বরূপ নিত্যানন্দময় আত্মা। নব্যভারতকে যে শক্তির তিনি সন্ধান দিলেন তাহা শরীরের শক্তি নয়, আণবিক বোমার শক্তিও নয়, আত্মার অপরাজেয় শক্তি যাহার জয়গান 'মুক্তধারা'র ধনঞ্জয় বৈরাগীর কম্বুকণ্ঠে। স্বামীজী বলিলেন :

"জগতে কতকগুলি সাহসী নরনারীর প্রয়োজন। সাহসী হওয়া বড় কঠিন। শারীরিক সাহস বিষয়ে ব্যাঘ্র মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। * * * এই শারীরিক সাহসিকতার কথা কেন কও ? সেই সাহসিকতার অভ্যাস কর, যাহা মৃত্যুর সমক্ষেও ভয় পায় না, যাহা মৃত্যুকে স্বাগত বলিতে পারে, যাহাতে মানুষ জানিতে পারে—সে আত্মা, আর সমুদয় জগতের মধ্যে কোন অস্ত্রেরই সাধ্য নাই, তাহাকে সংহার করে, সমুদয় বজ্র মিলিলেও তাহাদের সাধ্য নাই, তাহাকে সংহার করে, জগতের সমুদয় অগ্নির সাধ্য নাই, তাহাকে দগ্ধ করিতে পারে—যে সাহসিকতা সত্যকে জানিতে সাহসী হয় এবং জীবনে সেই সত্য দেখাইতে পারে, সেই ব্যক্তিই মুক্ত পুরুষ, সেই ব্যক্তিই প্রকৃতপক্ষে আত্মস্বরূপ হইয়াছেন।"

আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি মেরুদণ্ডহীন দুর্ব্বল জাতিকে শক্তিতে অপরাজেয় করিবার জন্য যে সাহসের তিনি জয়গান করিয়াছেন তাহা শারীরিক সাহস নয়, আত্মিক সাহস। কিন্তু এই আদর্শবাদের প্রতিবাদ করিয়া একদল লোক বলিয়া থাকেন, আত্মিক সাহস প্রদর্শন করিতে পারেন দুই একজন খ্রীষ্ট, বুদ্ধ, গান্ধী। সাধারণ মানুষের পক্ষে অকুতোভয়ে মৃত্যুবরণ করা সম্ভব নয়। স্বামীজী কিন্তু এই যুক্তিতে চলিবার পাত্র ছিলেন না। তিনি ছিলেন সত্যের নির্ভীক সাধক। বাস্তবের সঙ্গে খাপ খাওয়াইবার জন্য সত্যকে খর্ব্ব করার আদৌ পক্ষপাতী ছিলেন না তিনি। যাহা সত্য তাহারই স্তরে বাস্তবকে উঠাইতে হইবে, সত্যকে বাস্তবের স্তরে নামানো চলিবে না। স্বামীজীর জ্ঞানযোগে আছে :

"আর এক প্রশ্ন ইহা কি কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব ? বর্ত্তমান সমাজে ইহা কি কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে ? তাহার উত্তর এই, সত্য—প্রাচীন বা আধুনিক কোন সমাজকে

সম্মান প্রদর্শন করে না। সমাজকেই সত্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে; নতুবা সমাজ ধ্বংস হউক, কিছুই ক্ষতি নাই। সত্যই সকল প্রাণী এবং সকল সমাজের ভিত্তি স্বরূপ। সুতরাং সত্য কখনো সমাজের মত আপনাকে গঠিত করিবে না।"

ইহাই হইল যুগে যুগে যুগস্রষ্টা সত্যসাধকদের কথা। সত্যই তাঁহাদের কাছে ঈশ্বরস্বরূপ। সত্যকেই সর্ব্বোচ্চ মূল্য দিতে হইবে। সমাজ যদি এই সত্যকে অনুসরণ করিতে প্রস্তুত না থাকে জাহান্নমে যাক সমাজ। স্বামীজী বলিলেন,

"সেই সমাজই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, যেখানে সর্ব্বোচ্চ সত্য কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে—ইহাই আমার মত। আর যদি সমাজ এক্ষণে উচ্চতম সত্যকে স্থান দিতে অপারগ হয়, তবে উহাকে উপযুক্ত করিয়া লও।"

এই সর্ব্বোচ্চ সত্যই ঐক্যবুদ্ধি। প্রত্যেকটী মানুষের মধ্যে একই অপাপবিদ্ধ, চিরশুভ্র, চিরমুক্ত আত্মা রহিয়াছে—এই সত্যদর্শনই শুধু আমাদিগকে মানবপ্রেমিক করিতে পারে। এই আত্মার অস্তিত্বসম্পর্কে বিগতসন্দেহ হইলে তবেই মানুষ সর্ব্বপ্রকারের ভয় হইতেও আপনাকে মুক্ত করিতে পারে। স্বামীজী চাহিয়াছিলেন সেই আদর্শ ভারত, "চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির"। এই আদর্শভারত সৃষ্টির ব্যাকুলতা সর্ব্বপ্রকারের ভীরুতার বিরুদ্ধে জেহাদ করিতে তাঁহাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল।

স্বামীজীর উত্তরসাধক গান্ধীজী। গান্ধীজীও স্বামীজীর মতই সত্যকেই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। বাস্তবের সহিত দিনরাত কারবার করিতে হইলেও গান্ধীজী স্বামীজীর মতই আদর্শবাদী। তাঁহারও জেহাদ সর্ব্বপ্রকারের কাপুরুষতার বিরুদ্ধে। তিনিও মনে করেন, সমস্ত অশুভের মূলে মানুষের ভীরুতা, আর ভীরুতা হইল দেহকে 'আমি' মনে করিবার সর্ব্বনেশে মূঢ়তা। গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আত্মিক শক্তির প্রয়োগ ছাড়া আর কিছুই নহে। বিবেকানন্দ যে আত্মিক সাহসের জয়গান করিয়াছেন গান্ধীজী সেই সাহসের আদর্শকে জাতির রাজনৈতিক জীবনে সত্য করিয়া তুলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের ধনঞ্জয় বৈরাগী আসলে গান্ধীজী। ধনঞ্জয় বৈরাগীর কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ যে আদর্শ প্রচার করিয়াছেন গান্ধীজীর জীবনে ও বাণীতে সেই আদর্শেরই বন্দনাগান। বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী—নব্যভারতের এই তিনজন স্রষ্টার কণ্ঠে একই সত্যের জয়ধ্বনি, আর এই সত্য হইল—মানুষ জন্তু নয়, মাংস নয়, সে অবিনাশী আত্মা।

জ্ঞানী ও ভক্ত

প্রতিপদ

জ্ঞানীর চেষ্টা নিজের ভিতরে
শিবরূপ দরশন।
ভক্ত মাগেন কৃপাকণা তাঁর
দীন ভাবে অকিঞ্চন।

সমন্বয়ই ভারতপন্থা

শ্রীভূপেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে বহুজাতি এই ভারতের মাটিতে যোদ্ধার বেশে এসেছে, এবং বিজয়ের গর্ব্বে ধ্বংসলীলায় মেতেছে। কিন্তু কালে তাদের পরিণাম কি হয়েছে? কবির কথায় বলতে গেলে:

'কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা,
দুর্ব্বার স্রোতে এল কোথা হতে, সমুদ্রে হল হারা।'

ভারতীয় সাধনার এমনি একটা মহিমা ছিল যে পরকে সে আপন করে নিয়েছিল, একতার মন্ত্রে অনেকতা নিঃশেষে লয় পেয়েছিল। ভারতবর্ষ তো কোনদিন পররক্তে নিজের হাত কলঙ্কিত করেনি, পররাজ্যের প্রতি লোভ দেখায়নি, উপরন্তু জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে বিদেশী বিধর্ম্মীকেও নিজের কোলে আশ্রয় দিয়ে ভারতবর্ষ জগতের সামনে এক সমন্বয়ের পাদ-পীঠ রচনা করেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই পাদ-পীঠের উত্তরসাধক। যুগ যুগ ধরে যে সমন্বয়ের বাণী প্রচারিত হয়েছে, তিনি ছিলেন তাঁর মূর্তপ্রতীক। বিষয়টি আরো পরিষ্কার করে বুঝতে গেলে দু'একটি ঐতিহাসিক ঘটনা উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি খৃষ্টপূর্ব্ব দুই শতকের একটি শিলালিপি পাওয়া গেছে বেসনগরে। তাতে দেখা যায় তক্ষশিলাবাসী ডিয়সের পুত্র হেলিয়োডোরাস নামে জনৈক গ্রীক ফোঁটা তিলক কেটে বিষ্ণুমন্দিরে গরুড়ধ্বজ তৈরি করিয়ে দিয়েছেন। বিজয়ী গ্রীকদেরও একদিন ভারতবাসী নিজের উদার ধর্ম্মে আকৃষ্ট করেছিল। শক হূণ যবচি প্রভৃতি জাতিরাও একদিন 'মার মার' করে ভারতের মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, কিন্তু মাটির এমনি যাদু যে, দুদিন পরেই তারা একেবারে শৈব বনে গিয়ে 'বোম, বোম' করেছিলেন। কেড্‌ফাইসস্‌ যাঁর নামটাই এমন উৎকট রকমের বিদেশী, তিনিও কিনা পরম মাহেশ্বর হয়ে গিয়েছিলেন। ইংরেজরাজশক্তি এদেশে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বহু শত বৎসর আগেই দেখতে পাই দক্ষিণদেশের হিন্দু রাজারা খৃষ্টীয় সাধকদের নিষ্কর জমি দিয়ে তাঁদের সাধনার সহায়তা করেছেন। পারশীরা যখন ধর্ম্মচ্যুত হওয়ার ভয়ে জাহাজে করে পালিয়ে এলেন, তখনও দেখি গুজরাটের যদুরাণা তাঁদের পরম সমাদরে নিজের রাজ্যে আশ্রয় দিলেন। জৈনদের পুরাতন প্রবন্ধগ্রন্থে দেখতে পাই যে মুসলমানবিজয়ের বহু বৎসর আগেই এদেশে আগত মুসলমান সাধকদের জন্য দেবী অনুপমা চৌরাশিটী মস্‌জিদ তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন। এমনি ধারা ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আমরা জোর দিয়ে একথা বলতে পারি যে ভারতাত্মার মর্ম্মবাণী হচ্ছে সমন্বয়ের বাণী।

কিন্তু আজকের দিনে ভারতবর্ষের যে ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি তাতে মনে এই প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক যে অতীতের সঙ্গে বর্ত্তমানের সামঞ্জস্য কৈ? ভারতের সাধনা তবে কি ব্যর্থ? ঐক্যের স্থানে এমন অনৈক্যের বিভীষিকা চলেছে কেন?

একটা গল্প আছে যে একজন সাধু তাঁর বেড়ালটিকে একটা খোঁটায় বেঁধে ধ্যান করতে বসতেন, সাধনার সময় কোন বিঘ্ন ঘটাবে

বলে। দেখাদেখি তাঁর শিষ্যরাও তাই করতে লাগলেন। ক্রমে তাঁর চেলার চেলারা আসল উদ্দেশ্যটা ভুলেই গেলেন। সাধনার আর কোন বালাই রইল না। অথচ বেড়ালগুলিকে নিয়মমাফিক খোঁটায় বাঁধা চাই। ভারতীয় ঋষিকুলের চেলা আমরা, আমাদেরও হয়েছে সেই দশা। মহাত্মা কবীরের ভাষায় বলতে গেলে:

'বেহ্রা দীন্হী ক্ষেতকো, বেহ্রা ক্ষেতহী খায়।
তিন লোক সংশয় পড়ি, মেঁ কাহি কহো সমুঝায়।'

ক্ষেত রক্ষার জন্যে বেড়া দিলাম। কিন্তু বেড়াই ক্ষেতকে খায়। ত্রিভুবন এমনি সংশয়ে পড়ে আছে। আমি কাকে কেমনে বুঝাই?

ধর্ম্মের নামে জগৎময় এমনি অনুষ্ঠানের রাজত্ব চলেছে। মনে হচ্ছে অনুষ্ঠানের ফাটলে দিয়ে ধর্ম্ম বুঝি তলিয়েই যাবে। কিন্তু আচার অনুষ্ঠানে তো আর মানুষের আত্মার ক্ষুধাকে মেটাতে পারে না। তাই আজ "সারি দুনিয়া বিনশতি অপ্‌নি অপ্‌নি আগি।"—সারা দুনিয়া আজ নিজের আগুনে জ্বলে পুড়ে ছাই হতে বসেছে।

কিন্তু শ্রীভগবান্ একদিন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ঘোষণা করেছিলেন, "সম্ভবামি যুগে যুগে"। ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্যে তিনি যুগে যুগে আসবেন। ভারতবর্ষে তিনি আবার এসেছেন। তাই স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে সদর্পে বললেন, "এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।" ভারতকে কেন্দ্র করে আজ মহাসমন্বয়ের ভাব-প্রবাহ জগতে বিস্তৃত হতে চলেছে। "বুদ্ধিমান, বুঝিয়া লহ।"

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণই হচ্ছেন এই ভাব-প্রবাহের কেন্দ্রশক্তি। এক দরিদ্র সংস্কারাচ্ছন্ন ব্রাহ্মণ-পরিবারে তিনি জন্ম নিয়েছিলেন। পুঁথিগত বিদ্যার তিনি সংস্পর্শে আসেননি। অথচ এমন একজন সামান্য পূজারী ব্রাহ্মণের মধ্যে আমরা দেখতে পেলাম ভারতবর্ষের সনাতন সমন্বয় আদর্শের পরিপূর্ণ বিকাশ। যে আদর্শের কাছে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সকলের শির শ্রদ্ধায় নুয়ে পড়েছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার্য্যেরা এপর্য্যন্ত এক একটি প্রচলিত পন্থায় সাধনা করে সত্যের সাক্ষাৎ পেয়েছেন। কিন্তু এই পূজারী ব্রাহ্মণ বিভিন্ন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে দ্বিধাহীন কণ্ঠে জগৎকে ডেকে বললেন, 'যত মত, তত পথ।'

মত ও পথের সমস্যাকে তিনি কত সহজেই না সমাধান করে দিলেন। বাড়ীর গিন্নি জানেন কার পেটে কি সয়। তাই তিনি যার যেটি পেটে সয়, সেইভাবে রান্না করেন। রান্নার একীকরণ যেমন স্বাস্থ্যের পক্ষে ভুল হবে, রান্নার রকমারি নিয়ে ঝগড়া করাও তেমনি নিরেট বোকামি। শ্রীরামকৃষ্ণ এসে এই বোকামির উচ্ছেদ করলেন। তিনি বললেন, যতদিন মানুষের মধ্যে অধিকারিভেদ আছে, ততদিন ধর্ম্মেরও বিভিন্নতা থাকতে বাধ্য। তাই বলে যে শুধু ধর্ম্মের খোলসটা দেখে ভেদবুদ্ধিতে আচ্ছন্ন হয়, সে নিজেরই অনর্থ করে। মৃত্যোঃ স মৃত্যু-মাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।' যে এই জগতে নানারূপ দর্শন করে সে মৃত্যুকেই আলিঙ্গন করে।

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ তাই বলতেন, 'অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা খুশি তাই কর।' অদ্বৈতভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের মন এতই ভরপুর থাকতো যে একবার গঙ্গাবক্ষে একজন মাঝির পিঠে আর একজন মাঝিকে আঘাত করতে দেখে ঠাকুর যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠলেন! দেখা গেল ঠাকুরের নিজের পিঠেই সে আঘাতের দাগ পড়ে গেছে। কতখানি গভীর একত্বের অনুভূতি থাকলে তবে এমনটি হয়।

সেদিন 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রে একজন পাশ্চাত্ত্য-লেখক শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্বৈতানুভূতির কথা সকলকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলছেন, এই আণবিক যুগে জগৎকে যদি বাঁচাতে হয় তবে

Atomic এর 'o' টিকে বাদ দিয়ে Atmic (আত্মিক) শক্তিকেই নিতে হবে। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়। এ ছাড়া আর পথ নেই।

কিন্তু বিভেদের নেশা মানুষকে এমনি পেয়ে বসেছে যে তাকে ছাড়ানো কঠিন। সেই নেশার ঝোঁকে আজ তাই ভারতে উঠেছে পাকীস্থান, হিন্দুস্থান, শিখীস্থান, তপসিলীস্থান, রাজস্থান, দ্রাবিড়ীস্থান প্রভৃতির দাবী। এমনি যখন ভারতের দুরবস্থা, বিভেদের কালিমায় আমাদের দৃষ্টি যখন আচ্ছন্ন, তখন শ্রীরামকৃষ্ণের মত মহামানবের সার্ব্বজনীন আদর্শের যত বেশি আলোচনা হয় ততই মঙ্গল।

কবীর যখন ভারতের হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ দূর করতে এগিয়ে এলেন, তখন এক-শ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমান দিল্লীর বাদশাহ সিকান্দার শা লোদীর কাছে কবীরের নামে নালিশ করে। বাদশাহ কবীরকে ধরে এনে প্রশ্ন করলেন, "তুমি হিন্দু, না মুসলমান?" কবীরের আঁচলে কিন্তু অদ্বৈতজ্ঞান বাঁধা ছিল। তাই তিনি নির্ভয়ে জবাব দিলেন:

"হিন্দু কহুঁ তো ম্যায়্ নহী, মুসলমান ভী নহী।
পাঁচ তত্ত্বকী পুতলা গৈবী খেলে মাহিঁ॥"

আমি হিন্দু ও নই, মুসলমানও নই। পঞ্চ-ভূতের পুতুল আমার এই দেহে অসীমের খেলা চলেছে। কবীর আরো বল্লেন, "হাম্ বাসী উস্ দেশকো জহাঁ জাতিবরণ কুল নহী।" আমি সেই দেশের বাসিন্দা যেখানে জাতি, বর্ণ কুলের বিভেদ নেই।

কবীর সেদিন যা বলেছিলেন, যুগে যুগে ভারতের আচার্য্যরা আমাদের সেই শিক্ষাই দিয়ে গেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণও বলেছেন অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বাঁধতে, আর অনুভব করতে—"যত মত, তত পথ"। শ্রীরামকৃষ্ণের এই যে সমন্বয়পন্থা, কবীর একেই বলেছেন ভারতপন্থা। শ্রীরামকৃষ্ণপন্থী নর-নারী যেন কায়মনোবাক্যে ভারতপন্থী হয়। বর্ত্তমানের ঘনঘোর তবেই কাটবে। যে বিভেদের বেদনায় সারা ভারত আজ কাতর হয়েছে, সে শুধু নব জীবনের প্রসব-বেদনা।

"দুঃসহ ব্যথা হয়ে অবসান
জন্ম লভিবে কি বিশাল প্রাণ,
পোহায় রজনী, জাগিছে জননী
বিপুল নীড়ে,
এই ভারতের মহামানবের
সাগর-তীরে।"

"শুধু ভারতের নয়, সমগ্র জগতে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সামঞ্জস্য ভাব বিদ্যমান, তাহা প্রদর্শন করা আমাদের কার্য্য-প্রণালী।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

সব্যসাচী

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষাল, এম্‌-এ, বি-এল্‌

সব্যসাচী ধনুক তোল,
যুদ্ধের আজ মাঝখানে এসে
ত্যাগের মহিমা ভোল।

অন্ধকারেতে মঞ্জীর বাজে
অতিথি এসেছে দ্বারে,
বরণ করগো তারে,—
এখনো কি তুমি বৃহন্নলার বেশে—
ক্লীব ভঙ্গুর রেশে
নৃত্যে উঠিবে মাতি ?
প্রলয়ের রাতি
দেখিছ না আজ তোমারে ধরেছে ঘিরে ?
অজ্ঞাত বাস কেটেছে তোমার ;
এবার এস না ফিরে।

জাগায় আজি আনন্দ
চলার পথের ছন্দ,
আর কেন দ্বিধা সন্দ,
গাণ্ডীব আজি ধর,
বিশ্বজয়ীর আশা বুকে নিয়ে
অর্জুন-বেশ পর।

দূর সাগরের আবাহন-বাণী
জানাইছে আজ তীরে
মৃত্যু এসেছে ধীরে,
হাতে কঙ্কণ পায়ে শিঞ্জিনী
ছন্দে ছন্দে বাজে রিনি রিনি
মনে হয় তারে যেন চিনি চিনি

বহুবার তারে দেখেছি তোমার দ্বারে
বাসর-শয়নে মদালসরূপে
বরণ করেছ তারে ;
দেখনি তো তুমি খাঁটি রূপ তার
সম্মুখে প্রদীপ ধরি ;
(শুধু) লালিমালালসে কুসুম উরজে
নিঃশেষে গেছ মরি !

জুঁই যাথী আজ ঝরে গেছে সব
নেমেছে অমার সন্ধ্যা,
দূর উপবনে সাথীহারা আজ
কাঁদিছে রজনীগন্ধা,
দিকে দিকে শুধু কৃষ্ণ অলক
ধরেছে আজিকে চেপে,
অবদমনিত শৌর্য্যের ভারে
ঝঞ্ঝা উঠেছে ক্ষেপে।

ও মোর অগ্রগামী,
তোমারে শতেক নমি,
গাণ্ডীব ধর, বাজাও পাঞ্চজন্য,
তোমার দৃষ্টি করুক সৃষ্টি
নতুন পথের রেখা,
ইতিবৃত্তিতে রবে শুধু তাই লেখা।

নিঃশেষ হয়ে যাওয়া,
সেও ভাল সখা—
তাতেও হবে তো পাওয়া,
জীবন-মৃত্যু দু'ধারে নাচিবে
মাঝখানে তুমি রবে,

আলো ও আঁধার কানে কানে
কথা কবে।

কৃষ্ণা তোমার ঘরে, পার্থসারথি পাশে,
অভিমন্যুর জন্মবিধাতা, কৌরবরা যে হাসে,
এখনো পড়ে না মনে
বিদ্রূপ অপমানে
একদিন তব শিরায় শিরায় রক্ত উঠেছে নেচে!
তবুও যেচে,
ব'য়ে নিয়ে সব শিরে
চ'লে গেছ ধীরে ধীরে।

এবার এসেছে দিন,
অঙ্গীকার ও সর্ত কি আজ
হয়ে যাবে সব ক্ষীণ?
ও মোর কৃষ্ণসখা,
তোমায় যেরূপে দেখা
সেইরূপ আজি প্রকট কর না তুমি,
বলিতেছি আমি তোমার চরণ চুমি—

যত শঙ্কা ও মায়া
দুর্বল-মন-আঙ্গিনায় তারা
ফেলে যে দীর্ঘ ছায়া,
ভবিষ্যতের কল্পনা আর অতীতের সুখস্মৃতি
বর্ত্তমানের কাজেরে ভোলায়
এই তো তাদের রীতি,
কেন তবে আজ ফুলের দোলায়
ব্যর্থ প্রেমের গীতি!

ভুল যদি হয় হোক,
আসুক না ব্যথা শোক,
এগিয়ে চলার মন্ত্র এসেছে
জঞ্জাল দূরে রাখি,
বাঁধো আজ তুমি সর্বনাশের রাখি।

শুনিতে পাওনা
তোমার কানেতে মৃত্যুরা সব
করিতেছে ডাকাডাকি?
তুমিও রবে না, আমিও রব না
সব কিছু হেথা ফাঁকি;
তবে কেন শুধু জীবনে আঁকড়ে থাকি?

প্রণয় তোমার ভোল
অনুরোধ মোর—
গাণ্ডীব তুমি তোল
দু'নয়নে তব বহ্নি লুকানো
জ্বলিবে কুরুক্ষেত্রে
ধ্বংসের সাথে প্রলয়ের আলো
জ্বলিবে তোমার নেত্রে,
তারপরে সেই নামিবে আবার
ভীষণ বিজন রাত্রি—
তুমি আমি শুধু যাত্রী।

শত শত ভয় শত ব্যর্থতা
নাচিবে মোদের ঘিরে,
মৃত্যুপথের শুদ্ধ মহিমা
বহিবে মোদের শিরে;
শর্বরী শেষে উঠিবে আবার নতুন দিনের সূর্য
নতুন যাত্রী নতুন মন্ত্রে বাজাবে আবার তূর্য।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের মহাপ্রয়াণ

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘ-জননী শ্রীসারদাদেবী এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দকে দাক্ষিণাত্যে লইয়া যাইবার জন্য স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ অতীব আগ্রহান্বিত ছিলেন। তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া স্থানীয় ভক্তগণ ধন্য হইবে এবং তাঁহাদের শুভাগমনে দক্ষিণ-ভারতে শ্রীরামকৃষ্ণসংঘ সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে—এই আশায় তিনি তাঁহাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য এত উৎসুক ছিলেন। তাঁহাদিগকে বিভিন্ন সময়ে রামেশ্বরাদি তীর্থ দর্শন করাইয়া রামকৃষ্ণানন্দজী বলিয়াছিলেন, "এই আমার শেষ।" শশী মহারাজের প্রার্থনায় শ্রীশ্রীমা ১০৮টি সোনার বেলপাতা দিয়া রামেশ্বরের পূজা করেন। শ্রীশ্রীমা কলিকাতা ফিরিবার অল্পকাল পরেই তিনি মান্দ্রাজে রোগে শয্যাশায়ী হইলেন। শ্রীগুরুর ভাবপ্রচারে এবং হিন্দুধর্মের নবজাগরণের জন্য প্রায় চৌদ্দ বৎসর কঠোর পরিশ্রম করিয়া তাঁহার স্বাস্থ্য ইতিমধ্যেই ভগ্ন, এবং তাঁহার শরীর বহুমূত্র, কাশি ও যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়াছিল। তাঁহার রোজ সামান্য জ্বর হইত এবং কাশিও আরম্ভ হইল। ভক্তগণের পরামর্শে তিনি ১৯১১ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে বাঙ্গালোর আশ্রমে বায়ু পরিবর্তনে গমন করেন। তথায় তাঁহার স্বাস্থ্যের কোন উন্নতি হইল না। ডাক্তার রোগ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, ইহা দুরারোগ্য যক্ষ্মা। শশী মহারাজ বুঝিলেন তাঁহার কার্য সমাপ্ত হইয়াছে। তিনি অন্তরে শ্রীগুরুর আহ্বান অনুভব করিয়া মহামিলনের অপেক্ষায় উৎফুল্ল হইলেন।

সংঘের অধ্যক্ষ ও সম্পাদক তাঁহাকে চিকিৎসার্থ অবিলম্বে কলিকাতায় আসিতে লিখিলেন। সংঘাধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ তখন পুরীধামে ছিলেন। রামকৃষ্ণানন্দজীর রওনা হইবার তার পাইয়া তিনি পুরী হইতে খুরদা রেলওয়ে ষ্টেশনে আসিয়া মান্দ্রাজ-মেলে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য প্রতীক্ষা করিলেন। গাড়ী প্লাটফর্মে উপস্থিত হইলে ব্রহ্মানন্দজী তাঁহার কামরায় উঠিলেন। তখন রামকৃষ্ণানন্দজী তাঁহার প্রিয় গুরুভ্রাতাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। তাঁহার সবল দেহ জীর্ণ শীর্ণ এবং স্বর্ণকান্তি মলিন দেখিয়া মহারাজ বলিয়া উঠিলেন, "শশী এ সব কি? সব ঝেড়ে ফেলে দাও।" স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বলিলেন, "রাজা, তুমি আশীর্বাদ করলেই হ'বে।" মহারাজ পুনরায় এইরূপ বলিলে তিনি আবার একই উত্তর দিলেন। কলিকাতায় যথাবিধি চিকিৎসা করিবার পরামর্শ প্রদানকালে মহারাজ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "ডাক্তার কবিরাজ যেমনটি বলেন তেমনটী করিবে।" মহারাজের এই আদেশ তিনি রোগশয্যায় অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন। গাড়ী ছাড়িবার সময় মহারাজ প্ল্যাটফর্মে নামিয়া আসিলে রামকৃষ্ণানন্দজী পুনরায় তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ইহাই উভয়ের শেষ সাক্ষাৎ।[১]

শশী মহারাজ ১০ই জুন (২৬শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮) কলিকাতায় আগমন করেন। বাগবাজার উদ্বোধন অফিসে[২] তাঁহাকে চিকিৎসার্থ রাখা হয়। তিনি

১ 'স্বামী ব্রহ্মানন্দ' পুস্তকের ২৪২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২ উদ্বোধন অফিস যে গলিতে অবস্থিত তাহার আধুনিক নাম উদ্বোধন লেন। উক্ত নামকরণের পূর্বে এই গলির নাম ছিল মুখার্জি লেন।

কলিকাতায় মাত্র দুইমাস এগার দিন জীবিত থাকিয়া ২১শে আগষ্ট (৪ঠা ভাদ্র) মহাসমাধিমগ্ন হন। গুরুভ্রাতাগণ তাঁহার চিকিৎসার এবং সেবাশুশ্রূষার যথাসাধ্য ব্যবস্থা করেন। স্বামী সারদানন্দ উদ্বোধন অফিসে অবস্থান করিতেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা চলিল। স্বামী প্রেমানন্দ ও স্বামী শিবানন্দ প্রভৃতি গুরুভ্রাতাগণ বেলুড় মঠ হইতে নিয়মিত ভাবে আসিয়া শশী মহারাজের অন্তিম শয্যায় বসিয়া তাঁহার সংবাদ লইতেন। ডাঃ বিপিন ঘোষ তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "ইহা galloping phthisis (ক্রমবর্ধমান যক্ষ্মা) শরীর তিন মাসের বেশী থাকিবে না।" ডাঃ ঘোষের কথা সত্য হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ কবিরাজ দুর্গাপ্রসাদ সেনও তাঁহাকে চিকিৎসা করিয়াছিলেন। ঠাকুর যখন কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের নিকট চিকিৎসার্থ গিয়াছিলেন তখন বালক দুর্গাপ্রসাদ গঙ্গাধরের ছাত্র ছিলেন এবং ঠাকুরকে পরীক্ষা করিয়া তিনিই স্বীয় গুরুকে বলিয়াছিলেন, এ যোগজ ব্যাধি। দুর্গাপ্রসাদ শশী মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি স্বপ্নে শ্মশান, তুলসীকানন প্রভৃতি দেখেন কি?" তদুত্তরে শশী মহারাজ বলিয়াছিলেন, "ও সব দেখি না। তবে ঠাকুর, মা, স্বামিজী, দক্ষিণেশ্বর প্রভৃতি স্বপ্নে দেখি।" মাত্র ৪৯ বৎসর বয়সে অকালে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন, "Madras life was too straining—অর্থাৎ মান্দ্রাজে আমাকে কঠোর পরিশ্রম ও অত্যন্ত কষ্ট করিতে হইয়াছিল।" তথায় নানাস্থানে শাস্ত্রব্যাখ্যা ও বক্তৃতা প্রদান, ঠাকুরের পূজা সেবা, ভোগরন্ধন ও নিবেদনাদি বহু কাজ তাঁহাকে একলাই করিতে হইত। মান্দ্রাজ মঠে প্রথম কয়েক বৎসর তিনি নিজেই নিজের পাচক, নিজেই নিজের চাকর ছিলেন। ১৮৯৯ খৃঃ স্বামী তুরীয়ানন্দকে সঙ্গে লইয়া স্বামী বিবেকানন্দ দ্বিতীয় বার পাশ্চাত্যে যাইবার সময় যখন মান্দ্রাজ বন্দরে উপস্থিত হন তখন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ পনের সের ময়দা আনিয়া একাকী সবগুলি জলে মাখিয়া ঠেসিয়া কড়া পাকের নিমকি, গজা প্রভৃতি আহার্য তৈরী করিয়া কয়েকটি টিনে পুরিয়া স্বামী বিবেকানন্দকে জাহাজে খাবার জন্য প্রদান করেন। এই ঘটনা হইতে বুঝা যায় তিনি দেহ তুচ্ছ করিয়া ঠাকুরের কাজে মাতিয়া যাইতেন। কিন্তু তিনি এতই নিরভিমান ও সুনম্র ছিলেন যে, মান্দ্রাজ অঞ্চলে বিপুল কর্মানুষ্ঠানের প্রসঙ্গে বলিতেন, "ঠাকুরের কৃপা ও স্বামীজির আদেশ, নিজের কোন গুণে নয়।"

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের শরীর পিত্তপ্রধান ছিল এবং তাঁহার গাত্রে শুষ্ক বিথাউজ (eczema) হইত। দুইটি বড় তাল-পাখায় দুইজন সেবক দুইদিকে তাঁহাকে হাওয়া করিতেন। কখনও কখনও একটি ছোট তাল-পাখা দিয়া মাথায়ও হাওয়া করিতে হইত। তাঁহাকে হাওয়া করা ছিল সেবকগণের প্রধান কাজ। তিনি ঢালা বড় বিছানাতে যন্ত্রণায় গড়াগড়ি দিতেন ও ছটফট্ করিতেন এবং বলিতেন, "জয় প্রভু, জয় গুরুদেব।" বিশ্বরঞ্জন মহারাজ (স্বামী হরিহরানন্দ) তাঁহাকে ঔষধ খাওয়াইতেন এবং তাঁহার শুশ্রূষা করিতেন। তিনি বলেন, "শশী মহারাজের সেবা করা খুব শক্ত ছিল। কারণ, ডাকা মাত্রই সাড়া দেওয়া এবং বলা মাত্রই করে দেওয়া চাই। নচেৎ বিরক্ত হইতেন ও বকৃতেন। এই তাঁর স্বভাব ছিল।" তিনি কিরূপ কড়া মেজাজের সাধু ছিলেন তাহা নিম্নোক্ত ঘটনা হইতে বোঝা যায়। মান্দ্রাজ মঠে একদিন স্বামী ধ্যানানন্দ (রুদ্র মহারাজ)-কে দিয়া একখানি চিঠি লিখাইতেছিলেন। চিঠিখানি আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের প্রধান শহর পোর্টব্লেয়ার নামক স্থানে যাইবে। রুদ্র মহারাজ খামের উপর আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ লেখা

অনাবশ্যক মনে করিয়া পোর্টব্লেয়ার লিখিয়াছিলেন। ঠিকানা পড়াইয়া শুনিয়া যখন দেখিলেন যে, আন্দামান শব্দটি লেখা হয় নাই তখন তিনি রুদ্র মহারাজকে আঘাত করেন। আঘাতে ধ্যানানন্দজী পড়িয়া যান এবং তাঁহার হস্তস্থিত কলমটি শশী মহারাজের পায়ে বিঁধিয়া যাওয়ায় রক্তপাত হয়। ধ্যানানন্দজী উঠিয়া যখন তাঁহার পায়ের রক্ত মুছিয়া ব্যাণ্ডেজ করিতেছিলেন তখন শশী মহারাজ তাঁহাকে সুশান্তভাবে ও সুমিষ্ট স্বরে বলিলেন, "আমি জানি তুমি যে ঠিকানা লিখেছ তাতেই চিঠি যাবে। তথাপি আমি রেগেছিলাম কেন জান? যেমনটি বললাম তেমনটি না লিখে নিজের বুদ্ধি খাটালে কেন? আমরা যেমনটি বলি তেমনটি করলে তোমাদের প্রভূত কল্যাণ হবে। ঠাকুর আমাদের এইরূপ শিক্ষা দিয়েছেন।" পরদিন মঠে পাকা আম এসেছিল। খাবার সময় সবচেয়ে বড় আমটি তাঁহার পাতে দেওয়া হয়। তিনি আমটিতে একটি কামড় দিয়া বলিলেন, "বা! বেশ মিষ্টি।" এই বলিয়া আমটি পার্শ্বে উপবিষ্ট ধ্যানানন্দজীর পাতে দিয়া বলিলেন, "এইটি তুমি খাও।" তিনি কখনো বজ্রবৎ কঠোর এবং কখনো কুসুমবৎ কোমল হইতেন। তাঁহার চরিত্রে কঠোর ও কোমল ভাবের অদ্ভুত সমাবেশ ছিল। যোগীন ঠাকুর নামক এক ব্যক্তির অনেক যুবক অনুগত ছিল। তিনি তাহাদের দ্বারা পাড়ায় পাড়ায় দুঃস্থ ও পীড়িতের সেবা শুশ্রূষা ও সৎকাজ করাইতেন। তিনি ও তাঁহার কয়েকজন অনুচর শশী মহারাজকে প্রায়ই সেবা করিতেন। জনৈক ব্রহ্মচারী সেবকের গামছা ছিঁড়িয়া যায় এবং তাঁহার বসিবার মাদুর ছিল না। শশী মহারাজ যোগীন ঠাকুরকে বলিয়া একখানি ভাল গামছা ও একটি সুন্দর মাদুর আনাইলেন। পরে সেবককে ডাকিয়া গামছাখানি ও মাদুরটী দিয়া বলিলেন, "এই মাদুরে একটু শোও।" সেবক অত্যন্ত ক্লান্ত এবং রাত্রি জাগরণ হেতু অত্যন্ত নিদ্রালু ছিলেন। মাদুরে একটু শুইয়া থাকিতেই ঘুমাইয়া পড়িলেন। রামকৃষ্ণানন্দজীও সেবককে নিদ্রিত দেখিয়া আনন্দিত হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকায় তাঁহারও ঘুম আসিল এবং তিনিও কিছুক্ষণ ঘুমাইলেন। ঘুম থেকে উঠে সেবককে বলিলেন, "তোমাকে ঘুমুতে দিয়ে আমারও খুব ঘুম হলো।"

নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ বংশজ বলিয়া শশী মহারাজের গভীর নিষ্ঠা ছিল। ঠাকুর বলিতেন, ভক্তের জাত নাই। ঠাকুরের কথায় তাঁহার এত বিশ্বাস ছিল যে, তিনি একজন অব্রাহ্মণ সেবকের হাতে খাইতে রাজী হইলেন এবং তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "রঞ্জন, তুমি রান্না করো; তুমি ঠাকুরের ভক্ত ও ব্রহ্মচারী। তোমার হাতে খেতে আমার কোন আপত্তি নেই।"[৩]

শ্যামবাজারের শ্যামাপদ মুখার্জি নামক জনৈক কলেজের ছাত্র (বর্তমানে তিনি এম্-বি ডাক্তার) শশী মহারাজের নিকট মাঝে মাঝে আসিতেন। মহারাজ তাঁহাকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা প্রায়ই বলিতেন। একদিন তাঁহাকে বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গে বলিলেন, "এমন মহান্ দয়ার্দ্রহৃদয় মহাপুরুষের জীবন প্রত্যেক হিন্দুযুবকের সম্মুখে রাখা উচিত। যখন তিনি বিদ্যার্থী যুবক ছিলেন তখন কত প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়াও বড় হলেন; মনুষ্যত্ব হারান নি। তাঁর দয়াদাক্ষিণ্যও অসামান্য ছিল।" শ্যামাপদ বাবু সেই সময় একবার পুরী বেড়াইতে গিয়াছিলেন। পুরীতে তিনি জনৈক সাধুকে দর্শন করিয়া প্রীত হন নাই। তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া শশী মহারাজের কাছে পুরীর অভিজ্ঞতা বর্ণনার সময় বলিলেন, "সাধুর প্রতি বিশ্বাস করা কঠিন। আমার পুরীবাস ভাল

৩ বিশ্বরঞ্জন মহারাজের (স্বামী হরিহরানন্দ) নিকট হইতে এই তথ্য সংগৃহীত।

লাগে নি।" শশী মহারাজ শ্যামাপদ বাবুকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "কেন সাধুকে পরীক্ষা করতে গেলে? এইরূপ মন লইয়া তীর্থ দর্শন করলে কোন ফল হয় না।" সেই সময় গিরীশ বাবুর শঙ্করাচার্য নামক নাটক নূতন প্রকাশিত হয়। তাঁহার আদেশে উক্ত নাটকের প্রথম কয়েকটি দৃশ্য পড়িয়া তাঁহাকে শুনান হইয়াছিল। দুপুরে আহারান্তে এই নাটক শুনিয়া তিনি খুব আনন্দ করিতেন। উক্ত নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে চণ্ডাল-বেশী ব্যাসদেব ও তাঁহার চারিটী কুকুরের কথা আছে। কাশীতে শঙ্করাচার্য মণিকর্ণিকা ঘাটে গঙ্গা স্নানার্থ যাইতেছিলেন। পথে তাঁহার সহিত চণ্ডালরূপী ব্যাসদেবের সাক্ষাৎ হইল। শঙ্কর অস্পৃশ্য চণ্ডালকে পথ ছেড়ে দিবার জন্য আদেশ করিলেন। কিন্তু চণ্ডাল তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া তৎসঙ্গে বেদরূপী কুকুর চারিটির সহিত কথা বলিতে লাগিলেন। চণ্ডাল তাঁহার কুকুরদের নাম ধরিয়া ডাকিয়া বলিলেন, 'আরে কেলে, আরে ভুলো, কি বলে?' (অন্য কুকুরকে সম্বোধন করিয়া) 'ওরে ধোলো, কি বলছে? চণ্ডালিনী বলিলেন, 'আরে কে বটে রে কে বটে?' এই অংশ শুনিয়া শশী মহারাজ খুব হাসিতেন, এবং 'কে বটেরে কে বটে' এই কথাটি বার বার উচ্চারণ করিতেন। এই নাটক সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "এ কলমের খোঁচা বইত নয়।" তারপর তিনি ঐ নাটক আর শুনেন নাই। যখন তিনি প্রসন্নমনে থাকিতেন সদানন্দ বালকবৎ 'তাক্ ঝিঙ্গে ফুল তাকুড় তাকুড়' এই অর্থহীন বাক্যটী বার বার আওড়া-ইয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেন। রথযাত্রার দিন শশী মহারাজ ব্রহ্মচারী সেবককে কয়েকটি পয়সা দিয়া বলিলেন, "কাছে কোথাও রথ দেখে এস, এবং দু চার পয়সার কিছু কিনে এনো।" সেবক তাঁহাকে ফেলিয়া যাইতে ইতস্ততঃ করায় তিনি তাঁহাকে বলিলেন, কাশীপুর বাগানে ঠাকুরও আমাকে রথযাত্রার দিন এইরূপ করিতে বলিয়াছিলেন। আমি প্রথমে তাঁহার সেবা ফেলিয়া যাইতে রাজী হই নাই। পরে তিনি যাইতে বিশেষ ভাবে বলায় আমি স্থানীয় রথযাত্রা দেখিয়া তাঁহার জন্য দুই পয়সা দামের একটি ছুরী (লেবু কাটিবার জন্য) আনিয়া-ছিলাম। তাহাতে তিনি আমার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইয়া বলিয়াছিলেন, "এইগুলি মেনে চলতে হয়। গরীব লোকে দু পয়সা পাবার জন্য দোকান দেয়। এই সব মেলাতে দু চার পয়সার কিছু কেনা উচিত।" এই ঘটনাটি শুনিয়া সেবক শশী মহারাজের আদেশ পালনের জন্য বাগবাজারের রথ দেখিয়া তাঁহার জন্য একটি ছোট হাতপাখা (অল্প দামের) কিনিয়া আনিয়াছিলেন। সেবকের উক্ত কার্যে শশী মহারাজ তাঁহার প্রতি অতিশয় প্রীত হন।

বাবুরাম মহারাজকে শশী মহারাজ অতিশয় ভালবাসিতেন ও শ্রদ্ধা করিতেন। একদিন বাবুরাম মহারাজকে কাছে বসাইয়া শশী মহারাজ অত্যন্ত প্রীতির সহিত তাঁহার হাত পা সপ্রেমে টিপিয়া সেবা করিলেন। তাহাতেও তিনি সন্তুষ্ট না হইয়া বাবুরাম মহারাজকে শুকনো ফল খাওয়াইতে ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার আদেশে সেবক অল্পপরিমাণে নানা রকম ফল একটি পাত্রে বাবুরাম মহারাজকে খাইতে দিলেন। বাবুরাম মহারাজ ফলগুলি নিঃশেষে আহার করিয়া প্রস্থান করিলেন। তখন শশী মহারাজ উচ্ছিষ্ট থালাটি কাছে আনিয়া দেখিলেন যে, উহাতে আদৌ ফলাবশেষ নাই। তাহাতে তিনি বিরক্ত হইয়া সেবককে এত অল্প পরিমাণে ফল পরিবেশন করার জন্য ভর্ৎসনা করিলেন। পরে থালাটি নিজ হাতে মুছিয়া নিজের গায়ে মাখিলেন। ঠাকুরের অন্তরঙ্গ শিষ্য, পবিত্রতার প্রতিমূর্তি

বাবুরাম মহারাজের প্রসাদ গ্রহণ করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। তাহাতে অসমর্থ হইয়া তিনি এরূপ করিলেন। বাবুরাম মহারাজ দু একদিন অন্তর বেলুড় মঠ হইতে শশী মহারাজকে দেখিতে আসিতেন। একবার কয়েকদিন তাঁহাকে না দেখিয়া শশী মহারাজ খোঁজ করিয়া জানিলেন যে, বেলুড় মঠের গরুগুলির জন্য খড় কাটিতে কাটিতে বাবুরাম মহারাজের দুইটি আঙ্গুল কাটিয়া গিয়াছে, এবং সেই জন্যই তিনি আসিতে পারেন নাই। শশী মহারাজ এই সংবাদে বিশেষ দুঃখিত হইয়া সমীপবর্তী ব্রহ্মচারিগণকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "ঠাকুর বাবুরামকে এত ভালবাসতেন। তোরা কোথায় তাঁর সেবা করবি, না তাঁকে দিয়ে এসব কাজ করাচ্ছিস! এঁরা ঠাকুরের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি। এঁদের সেবা করলেই তোদের সব হবে।"

কলিকাতার বিখ্যাত চিকিৎসক শ্যামাদাস কবিরাজও কিছুদিন শশী মহারাজকে সেবা করিয়াছিলেন। তিনি মধুর অনুপানসহ খাইবার জন্য একটি ঔষধ দিয়াছিলেন। প্রত্যেক বটিকার সহিত ঠিক কত পরিমাণে মধু দিতে হইবে তাহা তিনি বলিয়া যান নাই। ঔষধ বৈকালে চারিটার সময় খাইতে হইবে। তিনটার পরে সেবক ঔষধ খাওয়ার কথা তুলিতেই শশী মহারাজ মধুর পরিমাণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সেবকের তাহা জানা না থাকায় তিনি তাঁহাকে তখনি শ্যামাদাস কবিরাজের বাটীতে পাঠাইলেন। অসময়ে ব্রহ্মচারীকে আসিতে দেখিয়া কবিরাজ মহাশয় ব্যস্ত হইয়া খবর জিজ্ঞাসা করিলেন এবং বার হইতে পনের ফোঁটা মধু দিয়া প্রত্যেকবার ঔষধ খাওয়াইতে বলিলেন। খুরদা ষ্টেশনে ব্রহ্মানন্দজী চিকিৎসার যেরূপ পরামর্শ দিয়াছিলেন তাহা আক্ষরিক ভাবে পালন করিবার জন্যই শশী মহারাজ এরূপ করিলেন। তাঁহার নিকট গুরুভ্রাতার বাক্য গুরুবাক্যতুল্য অলঙ্ঘনীয় ছিল।

শশী মহারাজের ছোট ভাই তাঁহার রোগশয্যার পাশে প্রায়ই আসিয়া বসিতেন। একদিন তাঁহাকে শশী মহারাজ বলিলেন, "আমার আড়াই বা তিন বছর বয়সের সময় দেবীকে একটি পাঁঠা মানত করা হয়েছিল। বাল্যকালে সেই মানত দেওয়া হয় নি। মাকে জিজ্ঞাসা করে মানতটি দিয়ে দিও।" ছোট ভাই বাড়ী ফিরিয়া মায়ের কাছে জানিলেন, সত্যই সেই মানত দেওয়া হয় নাই। তখন তিনি মানত দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া মুমূর্ষু সন্ন্যাসী ভ্রাতার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন।

একদিন বাবুরাম মহারাজ শশী মহারাজের রোগ-শয্যার পাশে বসিয়া কিছু ফল কাটিয়া একটি থালায় তাঁহাকে খাইতে দিলেন। থালায় ফল দেওয়ায় তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বালকের ন্যায় বলিলেন, "শেষে তুমিও এরূপ কল্লে? আমায় থালায় খেতে দিলে?" তখন বাবুরাম মহারাজ ফলগুলি নিজের হাতে লইয়া এক একটুকরা তাঁহার মুখে দিলেন। শশী মহারাজ সানন্দে ফলগুলি খাইয়া পরম পরিতৃপ্ত হইয়া বলিলেন, "হাঁ, এমনটি তোমার কাছে চাই। ভাই তুমি ত এমনি করেই খাওয়াবে।"

প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণের চিকিৎসা সত্ত্বেও রোগের আদৌই উপশম হইল না। বরং দুরারোগ্য ব্যাধি ক্রমশঃই বাড়িতে লাগিল। শশী মহারাজের সর্দি ও কাশি বাড়িয়া চলিল। তিনি এত দুর্বল হইয়া পড়িলেন যে, পায়খানায় বসিয়া উঠিতে পারিলেন না, সেবক তাঁহাকে হাতে ধরিয়া তুলিতেন। শেষে তিনি ঘরের মধ্যেই মলমূত্র ত্যাগ করিতেন, পায়খানা যাইতে পারিতেন না। তাঁহার খাওয়াও একেবারে কমিয়া

গেল। সকালে তিনি ক্রীম ক্রেকার (Cream Cracker) বিস্কুট দু চার খানি দুধে ভিজাইয়া খাইতেন। ভাত খাওয়ার সময় শরৎ মহারাজ তাঁহার কাছে আসিয়া বসিতেন ও বলে কয়ে দুই এক গ্রাস বেশী করিয়া খাওয়াইতেন। একদিন শশী মহারাজ তাঁহাকে বলিলেন, "ভাই শরৎ, আমার খাওয়া উঠে যাচ্ছে। মহামায়া খেতে দিচ্ছেন না। তুমি খাবার সময় আর এসো না।" ডাক্তার কাঞ্জিলাল প্রায় রোজই আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়া যাইতেন। প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথ ডাক্তার ইউনান্ এবং বিখ্যাত এলোপ্যাথ স্যার নীলরতন সরকারকে আনা হইয়াছিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। শরৎ মহারাজের ভাই সতীশ চক্রবর্তী ডাক্তার-কবিরাজগণের ব্যবস্থাপত্রগুলি যত্ন করিয়া পড়িতেন। যখন কোন চিকিৎসায় কিছু ফল হইল না তখন সতীশ বাবু নিজে একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবেন বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। শরৎ মহারাজ শশী মহারাজকে সতীশ বাবুর অনুরোধ জানাইলেন। তাহাতে শশী মহারাজ কোন মত প্রকাশ না করিয়া বলিলেন, "পরে বলব।" পরে তিনি সেবককে দিয়া শরৎ মহারাজকে বলিয়া পাঠাইলেন, "এ দেহ মন প্রাণ ঠাকুরের চরণে বিলিয়ে দিয়েছি। তাঁর প্রতিনিধি মহারাজ, বাবুরাম ইত্যাদি আছেন। তাঁদের নির্দেশমত যেন চিকিৎসা করা হয়। শরৎ যেন নিজের খাম-খেয়ালীতে কিছু না করে। এই বিষয়ে আমার নিজের কোন মতামত নেই।" এক এক দিন সকালে শশী মহারাজ ভাত খাইবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। কিন্তু ভাতের থালা সামনে আসিলে আদৌ খাইতে পারতেন না। একদিন তাঁহার গর্ভধারিণী ভবসুন্দরী দেবী তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। তিনি মাথা বাড়াইয়া জননীকে বলিলেন, "মা, মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ কর।" মা মুমূর্ষু পুত্রের মাথায় ও পিঠে হাত বুলাইয়া আশীর্বাদ করিলেন। মাদ্রাজী ভক্ত রামস্বামী তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। শশী মহারাজ তাঁহাকে দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, "মাদ্রাজের সব ভক্তকে আমার ভালবাসা দেবে। আচার্যগণের পুণ্য জন্মভূমি দাক্ষিণাত্যেই আমার দেহত্যাগ করতে ইচ্ছা হয়।"

বলরাম বাবুর পুত্র রামকৃষ্ণ বাবু, পণ্টুবাবু, মাষ্টার মহাশয়, বাবুরাম মহারাজ প্রভৃতি আসিলে তিনি খুব সন্তুষ্ট হইতেন। মৃত্যুশয্যায় পরমানন্দ স্বামীকে দেখিবার জন্য তিনি খুব আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরমানন্দ স্বামী আমেরিকা হইতে ইউরোপ হইয়া ভারতে আসিতেছিলেন। তিনি কলিকাতায় পৌঁছিবার পূর্বে শশী মহারাজের দেহত্যাগ হয়। যোগীন ঠাকুরকে শশী মহারাজ পরমানন্দ স্বামীর সম্বন্ধে জননীর ন্যায় সস্নেহে প্রায়ই বলিতেন "তুমি জাহাজ ঘাটে গিয়ে ওকে নিয়ে আসবে। ও বড় ছেলে মানুষ, কিছু বোঝে সোঝে না। তুমি না গেলে ওর খুব কষ্ট হবে। তুমি নিশ্চয়ই যেও।" গিরিশ বাবুর নদিদি গঙ্গা স্নানান্তে প্রায় শশী মহারাজকে দর্শন করিয়া যাইতেন। একদিন জনৈক সেবককে শশী মহারাজের সেবার জন্য খুব পরিশ্রম করিতে দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "আহা! তোমা-দের খুব কষ্ট হচ্ছে গো।" তাহাতে শশী মহারাজ বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন, "ওরা ঐসব করবে না ত আর কারা করবে? ওরা বাড়ী ঘর ছেড়ে এসেছে, সাধু হয়েছে। এসব কাজ করে ধন্য হয়ে যাচ্ছে। এও ঠাকুরের কাজ। এতেও ঠাকুরের সেবা হচ্ছে।"

শেষের দিকে শশী মহারাজ রক্তবমি করিতেন এবং এত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, বিছানা ছেড়ে উঠিতে পারিতেন না। প্রচুর রক্তবমি এবং ভীষণ কাশির পর ঠাকুরের ছবির দিকে তাকাইয়া বলিতেন, "আর কষ্ট দিওনা প্রভু! দেহত আর এ যন্ত্রণা সহ্য করতে পারে না। একটু শান্তি দাও।" তিনি যখন শুইয়া কাশিতেন তখন হাত পা শূন্যে উঠিয়া যাইত। একদিন খুব রক্তবমি হওয়ার পর ঠাকুরের ছবিখানি দেয়াল হইতে নামাইয়া আনাইয়া সম্মুখে ধরিয়া অভিমান-ভরে বলিলেন, "এই শরীর দিয়ে কোন পাপ করিনি। তবুও এত কষ্ট দিচ্ছ। এত যন্ত্রণা দিয়েও তোমার প্রাণে দয়া হলো না। কি অপরাধ করেছি যে এত কষ্ট দিচ্ছ।" পরে আবার ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন, "শত অপরাধ করেছি। ক্ষমা করো প্রভু।" ঠাকুরের ছবিখানি সেবকের হাতে দিয়া বলিলেন, "প্রাণা-রামকে যথাস্থানে রেখে দাও।" রাত্রে তাঁহার আদৌ ঘুম হইত না। দিনরাত শুইয়া থাকিতে ভাল লাগিত না, উঠিয়া বসিতেও পারিতেন না। মাঝে মাঝে বলিতেন, "চারদিকে বালিশ দিয়ে বসিয়ে দাও।" ঘুম না হওয়ায় অতিষ্ঠ হয়ে বালকবৎ বলিতেন, "মা যেমন ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়, তেমনি আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দাও। মা যেমন ছেলের গায় হাত বুলিয়ে দেয় তেম্নি আমার গায় হাত বুলিয়ে দাও।" রোগযন্ত্রণা তুচ্ছ করিয়া তিনি প্রায়ই তন্ময় হইয়া ঠাকুরের কথা বলিতেন। কথা বলিলে তাঁহার কষ্ট হয় এইজন্য সেবক তাঁহাকে নীরব থাকিতে প্রার্থনা জানাইলে তিনি বলিয়াছিলেন, "ঠাকুরের কথা যখন বলি তখন দেহজ্ঞান থাকে না, মৃত্যুযন্ত্রণা তুচ্ছ হয়।" 'দুর্গা,' 'দুর্গা', 'শিব,' 'শিব,' 'শ্রীগুরু', 'শ্রীগুরু' উচ্চারণে তাঁহার প্রলাপও প্রার্থনায় পরিণত হইত, মৃত্যু-শয্যা তপঃক্ষেত্রে পরিণত হইত। জ্ঞানী মৃত্যু জয় করিলেন। এই সময় তিনি যীশুখৃষ্টের কথাও খুব বলিতেন।

শরীর যাইবার দুই তিন দিন পূর্বে একদিন সকাল ৮৷৯ টার সময় তিনি চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া শুইয়া আছেন। সেবক* নিঃশব্দে অদূরে উপবিষ্ট। কিছুক্ষণ পরে তিনি সহসা উঠিয়া ব্যস্তভাবে সেবককে বলিলেন, "ঠাকুর এসেছেন। আসন দে।" সেবক এই বাক্যের তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। তখন শশী মহারাজ সেবককে বলিলেন, "দেখ্‌তে পাচ্ছনা? ঠাকুর এসেছেন, মা এসেছেন, স্বামিজী এসেছেন, মাদুর পেতে দে, আর তিনটে তাকিয়া দে।" সেবক বিস্মিত হইয়া আদেশ পালন করিলেন। তখন শশী মহারাজ হাত জোড় করিয়া তিনবার প্রণাম করিলে নির্নিমেষ নয়নে কোন অদৃশ্য বস্তু দেখিতে লাগিলেন। একটু পরে বলিলেন, "তাঁরা চলে গেছেন। এখন মাদুর ও তাকিয়া তুলে নে।" তাঁহার বিরাট দেহ রোগে এত শীর্ণ ও জীর্ণ হইয়াছিল যে, তাঁহাকে একটি ক্ষুদ্র মানুষ বলিয়া মনে হইত, চক্ষু প্রায়ই শূন্যদৃষ্টি ও পলকশূন্য থাকিত। একদিন স্বামী বিবেকানন্দের গৃহী শিষ্য সুগায়ক শ্রীযুক্ত পুলিনকৃষ্ণ মিত্র আসিলে শশী মহারাজ তাঁহাকে স্বামিজীরচিত "নাহি সূর্য্য নাহি জ্যোতি নাহি শশাঙ্ক সুন্দর" এই গানটি গাহিতে অনুরোধ করিলেন। এই গান যখন পুলিন বাবু গাহিতে-ছিলেন, তখন শশী মহারাজ তাহা তন্ময় হইয়া শ্রবণ করেন এবং শুনিতে শুনিতে গভীর ধ্যান-মগ্ন হন। অন্তিমকাল সন্নিকট বুঝিতে পারিয়া রামকৃষ্ণানন্দজী দেহত্যাগের পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘ-জননী শ্রীশ্রীসারদাদেবীর সন্দর্শন প্রার্থনা

* স্বামী অভয়ানন্দ (ভরত মহারাজ)

করেন। মাতাঠাকুরাণী সেই সময় কলিকাতায় ছিলেন না, জয়রামবাটীতে ছিলেন। স্বামী ধীরানন্দ তাঁহাকে আনিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি আসিতে পারেন নাই। তিনি স্থূলশরীরে আসিতে না পারিলেও সন্তানকে দিব্য দর্শন দিয়া কৃতার্থ করেন। সম্ভবতঃ তাঁহার এই অলৌকিক দর্শন মৃত্যুর পূর্বরাত্রিতে হইয়াছিল; কারণ, শেষদিন প্রভাতে পুলিন বাবুর নিকট দর্শনের ভাবটি ব্যক্ত করিয়া গানের প্রথমচরণ "পোহাল দুঃখরজনী" ভক্তবীর গিরিশচন্দ্রকে বলিয়া পাঠান। মহাকবি পূর্ণ গানটী অচিরে এই ভাবে রচনা করিয়া দেন:—

বেহাগ—একতাল

পোহাল দুঃখ-রজনী।
গেছে 'আমি' 'আমি' ঘোর কুস্বপন,
নাহি আর ভ্রম জীবন মরণ,
হের জ্ঞান-অরুণ বদন বিকাশে, হাসে জননী॥
বরাভয়করা দিতেছে অভয়
তোল উচ্চতাল, গাও জয় জয়
বাজাও দুন্দুভি, শমন-বিজয় মার নামে পূর্ণ অবনী॥
কহিছে জননী "কেঁদো না, কেঁদো না;
রামকৃষ্ণ-পদ দেখনা।
নাহিক ভাবনা, রবেনা যাতনা॥"
(হের) মম পাশে করুণায় দুটী আঁখি ভাসে।
ভুবন-তারণ গুণমণি॥

গানটি পুলিন বাবু বহুক্ষণ ধরিয়া গাহিলেন এবং শশী মহারাজ মুদ্রিত নয়নে আবিষ্ট ভাবে শুনিলেন। গানটি তাঁহার এত মনোমত হইয়াছিল যে ইহা শ্রবণে তিনি পরম শান্তি পাইলেন। শেষ দিনে ডাক্তার কাঞ্জিলাল তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "আজ তিনি একটু সুস্থ।" সেইদিন "উদ্বোধন" পত্রিকার নূতন সংখ্যা বাহির হইয়াছিল। তিনি নূতন সংখ্যা একখানি হাতে লইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া রাখিয়া দিলেন। ঐ দিন তাঁহার জন্য যে ভাত রান্না হইয়াছিল সেই ভাতের হাঁড়িটি সেবকের হাত হইতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যায়। "ঐ দিন প্রভাত কাল হইতেই তিনি ঘন ঘন সমাধিস্থ হইতে লাগিলেন এবং শেষ তিন ঘণ্টা আচ্ছন্ন ভাবে ছিলেন। মহাসমাধির কয়েক ঘণ্টা পূর্বে তিনি ঠাকুরের চরণামৃত পান করিলেন। বেলা একটার কিছুপূর্বে তাঁহার নাড়ী বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল। একটার সময় তাঁহার মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল। তাঁহার শরীরে এক অপূর্ব ভাবের সমাবেশ হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সর্ব শরীর পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। মুখ এমন লাল হইল যেন শরীরের সমস্ত রক্ত মাথায় উঠিয়াছে। শরীরে একটু ঘামও দেখা দিল। মাথার চুলগুলি পর্যন্ত খাড়া হইয়া গেল।"[৫] ১৩১৮ সালের ৪ঠা ভাদ্র, ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ২১শে আগষ্ট সোমবার বেলা ১টা ১০ মিনিটের সময় স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ শিবনেত্র হইয়া মহাসমাধিমগ্ন হইলেন। তাঁহার চতুর্দিকে তাঁহার গুরুভ্রাতাগণ দাঁড়াইয়া ঠাকুরের নাম উচ্চারণ করিতেছিলেন। মহাসমাধির পরে বহুক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার পবিত্র শরীরে রোমাঞ্চের লক্ষণ বর্তমান ছিল। স্বামী সারদানন্দ ১৩১৮ সালের "উদ্বোধন" পত্রিকার ভাদ্র সংখ্যায় লিখিয়াছিলেন, "সমাধিতেই যে তিনি দেহরক্ষা করেন তদ্বিষয়ে তাঁহার ঐকালে সর্বাঙ্গে অসাধারণ দীর্ঘকালব্যাপী পুলক দেখিয়াই তদীয় গুরুভ্রাতৃগণ অনুমান করিয়াছিলেন।"

শশী মহারাজের নশ্বরদেহ পত্রপুষ্পমাল্যে শোভিত ও চন্দনলিপ্ত করিয়া একটী খাটে স্থাপিত হইল। উদ্বোধন মঠের

৫ "তত্ত্বমঞ্জরী" পত্রিকার ১৩১৮ সালের ভাদ্র সংখ্যায় 'স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

প্রাঙ্গণে ভগ্নী নিবেদিতা নতজানু হইয়া স্বর্গত স্বামীজির পদদ্বয়ে স্বীয় শির স্পর্শ করিলেন। মঠের সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও ভক্তগণ খাটটী স্কন্ধে লইয়া চলিলেন। শবযাত্রিগণের সঙ্গে সংকীর্তনদল হরিনাম গান করিতেছিল। পুষ্প, ধূপাদির সৌরভে বায়ু সুগন্ধিত হইয়াছিল। সাধু ও ভক্তগণের মুখনিঃসৃত 'জয় শ্রীগুরু মহারাজকী জয়', 'জয় মহামায়ীকী জয়', 'জয় স্বামিজী মহারাজকী জয়', 'জয় গঙ্গামায়ীকী জয়', 'জয় রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজকী জয়' ইত্যাদি জয়ধ্বনিতে আকাশ বাতাস পরিপূর্ণ হইল। আবালবৃদ্ধবনিতা গৃহের বাহিরে আসিয়া এই স্বর্গীয় দৃশ্য দর্শনে রাস্তার উভয় পার্শ্বে সারিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাসংবরণের স্থান কাশীপুর বাগানে আসিয়া শবদেহ রাখা হইল এবং সকলে মিলিয়া সমগ্র রামনামকীর্তন করিলেন। পুনরায় কাশীপুর শ্মশানঘাটে শবদেহ কিয়ৎক্ষণ রক্ষিত হইল। এই পুণ্যস্থানে শ্রীশ্রীঠাকুরের স্থূলদেহ পঞ্চভূতে বিলীন হইয়াছিল। শবযাত্রিগণকে বেলুড় মঠে লইয়া যাইবার জন্য কুঠীঘাটে বহু নৌকা প্রস্তুত ছিল। তখন সন্ধ্যা সমাগতা। গঙ্গাদেবী দেবোপম পুত্র হারাইয়া শোকাকুলা হইয়া নিঃশব্দে প্রবাহিতা। বেলুড় মঠ নীরব, নিঝুম। শান্ত সমীরণ শোকার্তগণের দৈহিক ক্লান্তি দূর করিতে ছিল। চন্দন কাষ্ঠের চিতা সজ্জিত হইল।[৬] বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের সমাধি-মন্দিরের পার্শ্বে শশী মহারাজের পাঞ্চভৌতিক দেহ অগ্নিসাৎ করা হইল। তাঁহার প্রাণমন যেমন গুরুপাদপদ্মে বিলীন হইয়াছিল তাঁহার স্থূলদেহও তদ্রূপ রামকৃষ্ণাগ্নিতে ভস্মীভূত হইল। শ্রীগুরুর পাদপদ্মে উৎসর্গীকৃত তাঁহার দেবজীবন ইহধামে মাত্র ঊনপঞ্চাশ বৎসর হোম-শিখার ন্যায় জ্বলিয়াছিল। তাঁহার শ্মশানে কোনও স্মৃতিফলক আজও নির্মিত হয় নাই যাহা দ্বারা দর্শক স্থানের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিবে। কিন্তু তাঁহার অমরস্মৃতি রামকৃষ্ণ-সংঘের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকিবে। তাঁহার জীবৎকালে লোকে যেমন তাঁহার পূত স্পর্শে আসিয়া নবজীবন লাভ করিয়াছে তেমনি বর্তমানে ও ভবিষ্যতে তাঁহার লোকোত্তর জীবন ও দেববাণী স্মরণে অনেকে ধর্মজীবন লাভ করিবে।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের মহাসমাধির সংবাদে স্বামী ব্রহ্মানন্দ বিষাদগম্ভীর স্বরে বলিয়াছিলেন, "একটী দিকপাল চলে গেল। দক্ষিণ দিকটা যেন অন্ধকার হয়ে গেল।" ১৯১৬ খৃঃ ব্রহ্মানন্দজী যখন দ্বিতীয়বার মান্দ্রাজে গমন করেন তখন মান্দ্রাজ মঠে তিনি রামকৃষ্ণানন্দজীর কথা অনেক সময় উল্লেখ করিতেন। একদিন তথায় তাঁহার প্রসঙ্গে বলিলেন, "শশী মহারাজের প্রভাব দিগ্বিজয়ী শঙ্করের মত এই প্রদেশে জ্বলজ্বল করছে। তাঁর হাতের তৈরী রামু ও রামানুজ; ঠাকুরের উপর তাদের কী গভীর ভক্তি। তারা মান্দ্রাজ মঠ ও ষ্টুডেন্টস্ হোমের জন্য প্রাণপাত করে খাটছে। আমাদের উপর তাদের কী গভীর ভক্তি আর শ্রদ্ধা। মঠের প্রতি তাদের কত যত্ন আর প্রীতি।"[৭]

মান্দ্রাজের অধুনালুপ্ত ইংরাজি মাসিক 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকার ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর সংখ্যায় এই সম্পাদকীয় মন্তব্য ছিল: "স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের মৃত্যুতে মান্দ্রাজের ভীষণ ক্ষতি হইয়াছে। বেদান্তের বাণী প্রচারের এবং উহার সনাতন তত্ত্ব জনসাধারণকে অবগত করাইবার জন্য মন্দস্বাস্থ্য লইয়া তিনি প্রায় চৌদ্দবৎসর প্রধানতঃ মান্দ্রাজে এবং সাধারণতঃ সমগ্র দক্ষিণ-ভারতে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যে রামকৃষ্ণ মিশনের জনপ্রিয়তা ও প্রভাব তাঁহার প্রাণপাতী প্রচেষ্টা

৬ বিস্তৃত বিবরণের জন্য 'প্রবুদ্ধভারত' পত্রিকার ১৯১১ সনের অক্টোবর সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৭ 'স্বামী ব্রহ্মানন্দ' পুস্তকের ২৪৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ও আদর্শ জীবন যাপনের অমৃতপ্রসূ ফল। আধুনিক কোন কোন ধর্মান্দোলনে যে রহস্তবিদ্যার প্রচার দেখা যায় তাহা স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের ধর্মব্যাখ্যানে বা বক্তৃতায় লক্ষিত হইত না। উক্ত ভাব মানব-মনকে নিম্নগামী, সংকীর্ণ ও দুর্বল করে বলিয়া তিনি ধর্ম ও সত্যের এইরূপ রুগ্নভাবপ্রদ ব্যাখ্যা পছন্দ করিতেন না। অভয়লোকগত স্বামিজীর আশীর্বাদ আমরা সদাই ভিক্ষা করিতাম। জীবিতাবস্থায় আমরা তাঁহাকে অশেষ ভক্তি করিতাম। তাঁহার পুণ্যস্মৃতিও এখন আমরা গভীর প্রেম ও শ্রদ্ধার সহিত হৃদয়ে রক্ষা করিব।"

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের মৃত্যুসংবাদ কলিকাতা হইতে অচিরে মাদ্রাজে প্রচারিত হইল। তাঁহার মৃত্যু উপলক্ষে মাদ্রাজ, ত্রিচিনোপল্লী, ভিজাগাপটম্, মহীশূর এবং দক্ষিণ-ভারতের অন্যান্য স্থানে শোকসভা আহূত হয়। মাদ্রাজে পাঁচাইয়াপ্পা কলেজ হলে ৪ঠা সেপ্টেম্বর স্থানীয় বিশিষ্ট হিন্দুগণের একটি শোকসভা হয়। হাইকোর্টের জজ্ সুন্দর আয়ার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি দীর্ঘকাল স্বামিজীর পূতসঙ্গ-লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "স্বামিজীর অভাব আর পূর্ণ হইবে না। তিনি একাকী এত কাজ কিরূপে করিতেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহার উৎসাহে বহু প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হইয়াছে, বহু নরনারীর জীবন আধ্যাত্মিক আলোকে উজ্জ্বল হইয়াছে। তাঁহার মত মহাপুরুষের কখনও মৃত্যু হয় না। তিনি আমাদের সহিত এখনও বর্তমান। তাঁহার আশীর্বাদ, তাঁহার আশ্বাসবাণী আমাদের জীবন-পথের সম্বল।" সভায় বহু টেলিগ্রাম ও পত্র পঠিত হয়। ভি কৃষ্ণস্বামী আয়ার এবং অন্যান্য বিশিষ্ট মাদ্রাজীগণ স্বামিজীর অনুপম চরিত্র ও কর্মময় জীবনের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বক্তৃতা দেন। এডভোকেট জেনারেল পি এস শিবস্বামী আয়ার এই মর্মে একটি প্রস্তাব উত্থাপিত করেন যে দক্ষিণ-ভারতের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ জীবনপাত করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে যে ক্ষতি হইল মাদ্রাজের হিন্দুসমাজ তাহা শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে স্বীকার করিতেছে।" শিবস্বামী বলিলেন—"অশেষ গুণালঙ্কৃত স্বামিজী আমাদের পরম প্রিয় ছিলেন। সুদীর্ঘ পনের বৎসর এই অঞ্চলে কঠোর পরিশ্রম করিয়া তিনি বহু নরনারীর জীবনে যে ধর্মবীজ রোপণ করিয়াছেন তাহা অদূর ভবিষ্যতে বিশাল বৃক্ষে পরিণত হইবে। বিন্দুমাত্র স্বার্থপরতা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। প্রতিষ্ঠা বা প্রশংসা তিনি ঘৃণা করিতেন। স্বামিজী ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব সৃষ্টি। মাদ্রাজে স্বামিজী যেস্থান গ্রহণ করিাছিলেন তাহা দীর্ঘকাল শূন্য থাকিবে। তিনি যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন তাহা সুদূরপ্রসারী ও দীর্ঘস্থায়ী হইবে।"

টি ভি শেষগিরি আয়ার দ্বিতীয় প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বলেন, "স্বামিজীর সহিত সুপরিচিত হইবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। তাঁহর বৈশিষ্ট্য ছিল অসাধারণ নিঃস্বার্থপরতা এবং গভীর মানবপ্রীতি। তিনি করুণার প্রতিমূর্তি ছিলেন। আমি যতদূর জানি তাঁহাকে একটিও কর্কশ কথা বলিতে শুনি নাই। তিনি এত মিষ্টভাষী ও সৌম্যদর্শন ছিলেন যে, তাঁহাকে দেখিলে একজন প্রাচীন ঋষি মনে হইত। তাঁহার সহানুভূতি সার্বজনীন ছিল। মাদ্রাজে তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠাংশ অতিবাহিত হইয়াছে।" অধ্যাপক এম রঙ্গাচারিয়ার স্বামিজীর স্মৃতিরক্ষার জন্য একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সি পি রামস্বামী আয়ার বলেন, স্বামিজী যে কর্ম করিয়া গিয়াছেন সেইগুলিকে পুষ্ট ও বিস্তৃত করাই তাঁহাদের প্রধান কর্তব্য। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের স্মৃতিরক্ষার জন্য উক্ত সভায় একটি কমিটি গঠিত হইয়াছিল।

২৯শে আগষ্ট সন্ধ্যায় ত্রিচিনোপল্লীর হিন্দুস্কুলে একটি শোকসভা হয়। টি বি শ্রীনিবাসাচার্য এবং এস্ জি দীক্ষিত স্বামিজীর স্মরণে দুইটি সংস্কৃত কবিতা রচনা করেন। সভায় কবিতা দুইটি পঠিত হয়। সভাপতি রাধাকৃষ্ণ আয়ার স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের গুণরাশির ও কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়া একটি বক্তৃতা দেন। স্থানীয় হিতকারিণী সমাজের উদ্যোগে ভিজাগাপটমে ও একটি শোকসভা হয়। সমাজের সম্পাদক স্বর্গগত স্বামিজীর মহত্ত্ব বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলেন, "তিনি বর্তমান ভারতের আদর্শ ঋষি ছিলেন। কর্মজীবন যাপন করিলেও তিনি সর্বদা নিজেকে সকলের পশ্চাতে রাখিতেন। তাঁহার সহিত ক্ষণকাল আলাপ করিলে প্রকৃত ধর্মশিক্ষা হইত। এই জড়বাদ ও ভণ্ডামীর যুগে তিনি ছিলেন আমাদের পথপ্রদর্শক গুরু।" বানিয়ামবাদী বিবেকানন্দ-সংঘের উদ্যোগে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে একটি সভা হয়। সভাপতি প্রকাশ করেন যে, স্বামিজীর স্মৃতিতে অদূরবর্তী পুত্তুর নামক গ্রামে একটি ছত্র স্থাপিত হইবে। বানিয়ামবাদী হইতে ছয় মাইল দূরে নেত্তারামপল্লীগ্রামে একটি রামকৃষ্ণমঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্বামিজীর প্রাণপাতী পরিশ্রমে তাঁহার জীবনকালে দক্ষিণ-ভারতে শ্রীশ্রীঠাকুরের নামে প্রায় পনেরটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়।

শ্রী রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

আচার্য শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথিপূজা—আগামী ২৮শে পৌষ, ১৩ই জানুয়ারী, সোমবার, পূজ্যপাদ আচার্য শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের পঞ্চাশীতিতম জন্মতিথি পূজাদি অনুষ্ঠিত হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, ত্রিচুর (কোচিন)—১৯৪৫ সনের কার্য-বিবরণী—এই আশ্রম কর্তৃক একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় (বিদ্যামন্দির), বিদ্যার্থীদের গুরুকুল, বালিকাদের মাতৃমন্দির, একটি শিল্পবিদ্যালয়, দুঃস্থরিলিফ কার্য, ধর্মানুষ্ঠান ও প্রচার, কৃষি ও ডেয়ারী, সমবায় সমিতি, লাইব্রেরী ও রিডিং রুম এবং দাতব্য ঔষধালয় পরিচালিত হইতেছে।

এবার উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ৬৩০ জন ছাত্র অধ্যয়ন করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ১৫৯ জন উচ্চবর্ণের হিন্দু, ৩৫৪ জন অস্পৃশ্য শ্রেণীর হিন্দু ও ১১৭ জন খৃষ্টান। ছাত্র ৩৮৬ জন ও ছাত্রী ২৪৪ জন।

গুরুকুলে ৩১ জন বালক এবং মাতৃমন্দিরে ১৭ জন বালিকা আছে। ইহাদের মধ্যে ১৭ জন হরিজন ও ৮ জন অনাথ বালক-বালিকার সকল ব্যয় আশ্রম হইতে বহন করা হইয়াছে।

শিল্পবিদ্যালয়ে ৩৮ জন বালক ও ২৪ জন বালিকা বয়ন শিক্ষা করিতেছে। আলোচ্য বর্ষে এই বিদ্যালয় হইতে ১৪,৪০৪ গজ কাপড় তৈরি করিয়া বিক্রী করা হইয়াছে।

রিলিফ বিভাগ হইতে এবার ৯ জনকে কয়েক মাস নিয়মিত ভাবে এবং ৯৫ জনকে সাময়িক ভাবে ১৬২৮/৮ পাই এবং বস্ত্রাদি দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীগণকে প্রত্যহ আহার্য

এবং বালক-বালিকাগণকে দুগ্ধ দেওয়া হইয়াছে।

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও আশ্রমে নিয়মিত ভাবে ধর্মগ্রন্থ পাঠ, ভজনসঙ্গীত, সময়ে সময়ে ধর্মসভা, শিবরাত্রি, দশেরা, ধর্মাচার্যগণের জন্মোৎসব প্রভৃতি যথানিয়মে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

কৃষি ডেয়ারী ও সমবায় বিভাগের কার্যাবলী ও সন্তোষজনক ভাবে পরিচালিত হইতেছে।

লাইব্রেরী ও রিডিং রুমে এবার ৫৬৮ জন পাঠক পুস্তকাদি অধ্যয়ন করিয়াছেন।

দাতব্য ঔষধালয় হইতে দৈনিক গড়ে ৪০ জন দুঃস্থরোগীকে ঔষধ দেওয়া হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে গত বৎসরের উদ্বৃত্তসমেত এই প্রতিষ্ঠানের মোট আয় ৭৪,৯৫৬৸৴১১ পাই এবং মোট ব্যয় ৭৪,১৯৮৵৴৮ পাই।

থুরাভুর (ত্রিবাঙ্কুর) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম পরিচালিত আর্তত্রাণ ও পুনর্গঠন কার্যের বিবরণী:—১৯৪২ সনে এই প্রতিষ্ঠানের আর্তত্রাণ ও পুনর্গঠন কেন্দ্র স্থাপিত হয় এবং ১৯৪৫ সন পর্যন্ত ইহার কার্য চলে। ত্রিবাঙ্কুরের সমুদ্রতীরবাসী দুঃস্থ জনসাধারণের সাহায্যদানের জন্যই ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। গত যুদ্ধের সময় নারিকেলের দড়ি প্রস্তুত করিয়া এই অঞ্চলের দরিদ্র জনসাধারণ জীবিকা অর্জন করিত। কিন্তু ক্রমে দড়ির চাহিদা কমিয়া যাওয়ায় তাহারা খুবই বিপন্ন হইয়া পড়ে। আশ্রমকর্তৃপক্ষ থুরাভুর, আবুর এবং পুন্নামুডি এই তিন কেন্দ্রের ৮৫৯০০ জন দুঃস্থ নরনারীকে সাময়িকভাবে খাদ্য দেন ও ৫১৮ ইউনিট রেশনের খাদ্যসামগ্রী বিনামূল্যে বিতরণ করেন। এতদ্ভিন্ন ৪৬২টি শিশুকে সাত মাস নিয়মিতভাবে দুগ্ধ, চার গ্যালন সার্কলিভার তেল, ৮৫০০ ভিটামিন পিল এবং ৩০০ জন দুঃস্থব্যক্তিকে প্রতি শনিবার সাত মাসের জন্য তেল ও সাবান দেন। ২০৭টি পরিবারের জন্য কুটীর নির্মাণ ও ২১৭৪ খানা কাপড় ও ১১৬৮ খানা ব্লাউজ বিতরণ করেন। আশ্রমপরিচালিত দাতব্য আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসালয়ে প্রতিমাসে গড়ে ১৩২জন রোগীর চিকিৎসা হইয়াছে। আশ্রমকর্তৃপক্ষ একটি এ্যালোপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়ও স্থাপন করিয়াছেন। উহা বর্তমানে স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠান ৭০ জন রোগীকে সরকারী হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।

সাহায্যদানের সঙ্গে সঙ্গে পুনর্গঠন কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়া ২৯৬ জন দুঃস্থ ব্যক্তিকে সূতা-কাটা ও বয়ন শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষত্রয়ে তিনটি কেন্দ্রে ২৯টি তাঁত ছিল। দুঃস্থ ব্যক্তিগণ ৩৬৩৩৫ গজ কাপড় এবং নারিকেলের দড়ি তৈরী করিয়া অর্থোপার্জন করিয়াছে। তাহারা যাহাতে মিতব্যয়িতায় অভ্যস্ত হয় তজ্জন্য তাহাদের অর্জিত অর্থ তাহাদের নামে সেভিং ব্যাঙ্কে জমা রাখা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষত্রয়ে এই কেন্দ্রের মোট আয় ৪৪,৫৭১।৶৪ পাই এবং মোট ব্যয় ৩৮,৮৩৯৸৴১ পাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়, কোইম্বাটোর (মান্দ্রাজ)—১৯৪৫ সনের কার্য বিবরণী—বিদ্যালয়টি দক্ষিণ-ভারতের একটি আদর্শ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ছাত্রদের মধ্যে ধর্মভাব, দেশপ্রীতি এবং আত্মনির্ভরশীলতা জাগরিত করাই বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য। এই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, ট্রেনিং স্কুল, কলানিলয় এবং গ্রামোন্নয়ন কার্য পরিচালিত হইতেছে। উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে আলোচ্য বর্ষে ১২৭টি ছাত্র ছিল। বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ স্বাবলম্বী এবং কর্মপটু। তাহারা প্রতিবৎসর দেশের প্রখ্যাত মহাপুরুষ ও দেশনায়কগণের জন্মোৎসব উদ্‌যাপন করে।

বিদ্যালয়ের একটি শিল্পবিভাগ আছে। তাহাতে কাঠের কাজ, দর্জির কাজ এবং সূতাকাটা শিক্ষা দান করা হয়। লাঙ্গল প্রভৃতি কৃষি-সরঞ্জামও ছাত্রেরা প্রস্তুত করে। ট্রেনিং স্কুলে দশ জন ছাত্র ছিল। তাহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাজ করিতেছে। ট্রেনিং স্কুলের জন্য ৫৫,০০০৲ ব্যয়ে একটি ছাত্রাবাস নির্মিত হইয়াছে। কলানিলয় ট্রেনিং স্কুলের সহিত যুক্ত। আলোচ্য বর্ষে ১৯৩টি শিশু এই স্কুলে পড়িয়াছে। তাহাদের মধ্যে ৯৩টি বালিকা। সকলকেই সূতাকাটা শিখান হইয়াছে। এই বৎসরে তাঁহারা ৩০০৲ টাকা মূল্যের সূতা কাটিয়াছে। গত নয় বৎসর যাবৎ শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী স্মারক গ্রাম্যক্রীড়া-কৌতুক অনুষ্ঠিত হইতেছে। তেরটি গ্রামের তেরটি স্কুলের ছাত্রগণ এবং স্থানীয় মিলের কর্মীরা এই ক্রীড়া-কৌতুকে পরম উৎসাহের সহিত যোগদান করে। প্রতিযোগিতায় কৃতকার্য ছাত্রগণ পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। প্রতি বৎসর প্রবন্ধ, গল্প, গানরচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা এবং নবরাত্রি উৎসব দ্বারা গ্রামের বালক-বালিকাদের মধ্যে উৎসাহ ও কর্মপ্রেরণা জাগান হইতেছে। এবার ৬০টি বালক-বালিকা এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়াছিল। কয়েক বৎসর ধরিয়া বিদ্যালয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে। ইহাতে দূরাঞ্চলের অগণিত নরনারী যোগদান করেন। বিদ্যালয়ের একটি সমবায় ভাণ্ডার আছে। ইহা কয়েকটি গ্রামে শস্য বিতরণ করিতেছে। বিদ্যালয়ের সাহায্যে গ্রামের আগ্রহান্বিত ছাত্রদের মধ্যে কলেজের শিক্ষা দিবার পরিকল্পনা চলিতেছে। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ও স্থাপন করিবার প্রয়াসী। অর্থানুকূল্য হইলেই তাঁহাদের সাধু ইচ্ছা কার্যে পরিণত হইতে পারে। আলোচ্য বর্ষে বিদ্যালয়ের মোট আয় ১,৪০,১৪৮ ॥/৬ পাই এবং মোট ব্যয় ১,৩৪,৭৫৭।৵১ পাই।

ভগিনী নিবেদিতার জীবনী

কয়েক বৎসর যাবৎ প্রাচ্য তথা ভারতীয় চিন্তাধারার সঙ্গে ফরাসীগণকে পরিচিত করিবার জন্য মঃ জিন হারবার্ট শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী, শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বিশিষ্ট ভারতীয় মনীষিগণ সম্বন্ধে ফরাসী ভাষায় পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার পত্নী মাদাম লিজেল রেমণ্ডও এই কার্যে ব্রতী হইয়া সম্প্রতি ফরাসী ভাষায় ভগিনী নিবেদিতার জীবনী প্রকাশ করিয়াছেন। (A French Biography of Sister Nivedita. By Lizelle Reymond. Victor Attinger Co., Paris. 1945. pp 350) ইহা ভগিনী নিবেদিতার সর্বতোমুখী প্রতিভা ও কর্মবহুল জীবনের আলেখ্য-স্বরূপ। পুস্তক খানির প্রথমভাগে তাঁহার বাল্যজীবন, ছাত্রীজীবন, স্বাধীনচিত্ততা, অধ্যাপনা, ভাবী গুরু সন্দর্শন, স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগে ভারতীয় জীবনের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয়, ভারতের সেবায় আত্মনিবেদন, শ্রীশ্রীসারদাদেবীর সাহচর্য, অন্তঃপুরিকাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার, ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবৃন্দের সহিত সৌহার্দ্য, পাশ্চাত্যে পুনর্গমন ও স্বামী বিবেকানন্দের তিরোধানের বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। তৃতীয় ভাগে জাতীয় উন্নয়নে সক্রিয় সহযোগিতা, বলিষ্ঠ হিন্দুত্বের স্বরূপ উদ্ঘাটন, বুদ্ধগয়াগমন, স্বদেশী আন্দোলন, নিবেদিতা-বিদ্যালয়, নারীজীবন-সমস্যা, কাশীতে কংগ্রেসের

অধিবেশন, কেদার-বদরিদর্শন প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দপদে যথার্থই নিবেদিতা ভগিনী নিবেদিতার একখানি সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ জীবনীর অভাব অনেকেই বিশেষভাবে অনুভব করিতেছেন। আলোচ্য গ্রন্থখানি ইংরাজী ও বাংলায় অনূদিত হইলে এই অভাব অনেকটা পূর্ণ হইবে।

দাঙ্গা সেবাকার্য্যে রামকৃষ্ণ মিশনের আবেদন

রামকৃষ্ণ মিশন গত ২২শে অক্টোবর ত্রিপুরা জেলার চাঁদপুরে সেবাকার্য্য আরম্ভ করেন এবং ১১ই নভেম্বর হাইমচরেও সেবার সূত্রপাত করা হয়। শীঘ্রই নোয়াখালি জেলার রামগঞ্জে কার্য্যের প্রসারের জন্য ব্যবস্থা করা হইতেছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ, বহরমপুর ও আসানসোলে স্থানীয় মিশন আশ্রম হইতে নোয়াখালির গৃহহারাদের সেবা করা হইতেছে।

প্রাথমিক পর্য্যবেক্ষণের পর হাইমচর কেন্দ্র হইতে হাইমচর ও আলগী দুর্গাপুর ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত খোলাদি, হাইমচর, গাজীপুর, কৃষ্ণপুর ও মহজমপুর গ্রামের ৫০০ পরিবারের মধ্যে ৫০০ খানি নূতন কাপড় ও ৫০টী জামা ও প্যাণ্ট বিতরণ করা হয়। এতদ্ব্যতীত হাইমচরে একটী দুগ্ধ বিতরণ কেন্দ্র ও একটি ঔষধালয় খোলা হইয়াছে।

চাঁদপুর কেন্দ্র হইতে প্রায় ১২০০ ব্যক্তির মধ্যে এ-যাবৎ প্রায় ২০০/ মণ খাদ্যদ্রব্য বিতরিত হইয়াছে। মিশনের তত্ত্বাবধানে গভর্ণমেণ্টের যে দুইটী রিলিফ ক্যাম্প পরিচালিত হইতেছিল উহাদের মধ্যে চিত্রলেখা ক্যাম্পটী গভর্ণমেণ্ট পূর্ব্বেই বন্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহারা জুবিলী স্কুলের ক্যাম্পও ২৫শে নভেম্বর বন্ধ করিয়াছেন।

উপদ্রুত অঞ্চলের জন্য আরও বস্ত্র, কম্বল, গৃহস্থালীর সামগ্রী, গুঁড়া দুগ্ধ প্রভৃতি চাঁদপুরে পৌঁছিয়াছে বা শীঘ্রই পৌঁছিবে। সত্বর গৃহনির্ম্মাণের কার্য্যে হাত দিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও কারিগরদিগকে টাকা দিয়া সাহায্য করিতে হইবে।

সম্প্রতি দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চলের ক্যাম্পগুলিতে ও অন্যান্য স্থলে ভ্রমণ করিয়া দুর্গতদিগকে উৎসাহাদি দিবার জন্য ২জন সন্ন্যাসীকে পাঠান হইয়াছে।

শ্রীহট্ট ও হবিগঞ্জের কেন্দ্রদ্বয়ে যথাক্রমে ২৫০ ও ৫০০ গৃহহারাকে বিভিন্নরূপে সাহায্য করা হইতেছে।

লোকের দুর্দ্দশা বর্ণনাতীত, সাহায্য দান ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার সমস্যা অতীব জটিল। সহস্র সহস্র দুর্দ্দশাগ্রস্ত ভ্রাতাভগ্নীদের সাহায্যার্থ আমরা সহৃদয় দেশবাসীর নিকট উপযুক্ত অর্থ ভিক্ষা করিতেছি। এই উদ্দেশ্যে যিনি যাহা দান করিবেন তাহা নিম্নলিখিত ঠিকানায় সাদরে গৃহীত ও উহার প্রাপ্তি স্বীকার করা হইবে:—

(১) **সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন,**
পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা হাওড়া;

(২) **কার্য্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন কার্য্যালয়,**
১নং উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা;

(৩) **কার্য্যাধ্যক্ষ, অদ্বৈত আশ্রম,**
৪, ওয়েলিংটন লেন, কলিকাতা।

স্বামী মাধবানন্দ
সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন
২৯।১১।৪৬